আরো আরামভরা, আরো শৌখিন, বাটার সানওয়ে স্যান্ডাল যুগপৎ স্নিগ্ধ, বিলাসী ও হালকা। যেখানে-খুশি যখন-খুশি পায়ে দিন —দেখবেন কখনো আর পা থেকে খুলতে ইচ্ছে করবে না। এতই ভালো। স্যান্ডাল পরার এ এক নতুন শৌখিন সুখ—স্বাচ্ছন্দ্যের এক নতুন আবেশ। আজই পায়ে গলিয়ে নিন বাটার সর্বাধুনিক স্যান্ডাল : তার নকশায় সুরুচি, নকশায় আরাম।

বাটা সানওয়ে

সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ২৪তম কংগ্রেস সম্পর্কে সোভিয়েত দেশ প্রকাশনীর বই

সোভিয়েত দেশ প্রকাশনী আনন্দের সঙ্গে ঘোষণা করছে যে তার প্রকাশিত পরবর্তী পুস্তিকাগুলির মধ্যে থাকবে: (১) ২৪তম কংগ্রেসে এল. ব্রেঝনেভ কতৃক উপস্থাপিত সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির রিপোর্ট, (২) ১৯৭১-১৯৭৫ সালের জন্য সোভিয়েত ইউনিয়নের অর্থনৈতিক বিকাশের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার নির্দেশ সম্পর্কে সোভিয়েত ইউনিয়নের মন্ত্রীপরিষদের চেয়ারম্যান এ. এন. কোসিগিনের রিপোর্ট, (৩) সোভিয়েত পররাষ্ট্র মন্ত্রী এ. এ. গ্রোমিকোর, প্রতিরক্ষা মন্ত্রী গ্রেচকোর, সোভিয়েত বিজ্ঞান আকাদামির প্রেসিডেন্ট এন. ভি. বেলডিশের এবং প্রখ্যাত সোভিয়েত লেখক এ. চাকোভসকির ভাষণ, (৪) সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ২৪তম কংগ্রেসে গৃহীত প্রস্তাব এবং অন্যান্য দলিল।

বাংলা ভাষায় এগুলি সোভিয়েত সমীক্ষার ৪টি সংখ্যায় প্রকাশিত হবে। অসমীয়া এবং ওড়িয়া ভাষায় প্রকাশিত হবে ৩টি পুস্তিকা।

—এই বইগুলির জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করুন:

সোভিয়েত দেশ প্রকাশনী

১।১ উড স্ট্রীট

কলিকাতা—১৬
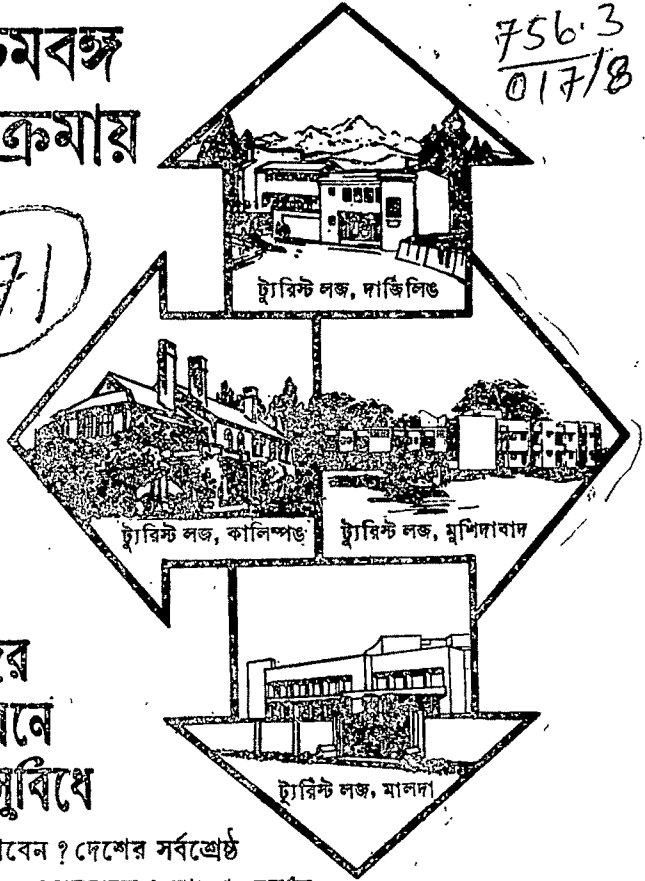
পশ্চিমবঙ্গ পরিক্রমায়
ট্যুরিস্ট লজ, দার্জিলিঙ
ট্যুরিস্ট লজ, কালিম্পঙ
ট্যুরিস্ট লজ, মুর্শিদাবাদ
ট্যুরিস্ট লজ, মালদা
আমাদের যাত্রীভবনে ওঠাই সুবিধে
কোথায় যাবেন? দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ শৈলাবাসে? সমুদ্রকূলে? বাংলা দেশের অন্য কোনও দর্শনীয় স্থানে? দার্জিলিঙ, কালিম্পঙ, দীঘা, ডায়মণ্ড হারবার, শান্তিনিকেতন, মালদা, মুর্শিদাবাদ, দুর্গাপুর,—সর্বত্রই সুরম্য অভিজাত 'লাক্সারি ট্যুরিস্ট লজ' রয়েছে। কম খরচে থাকার জায়গা পাবেন দার্জিলিঙ, কালিম্পঙ, দীঘা, শান্তিনিকেতন, মালদা ও মুর্শিদাবাদে। শুধু সারাদিনের ছুটি কাটানোর জন্যেও ডায়মণ্ড হারবারে রয়েছে লাউঞ্জ।
রিজার্ভেশনের জন্য নীচের ঠিকানায় যোগাযোগ করুন:
ট্যুরিস্ট ব্যুরো পশ্চিমবঙ্গ সরকার
৩/২ বিনয়-বাদল-দীনেশ বাগ (ডালহৌসি স্কোয়ার) ঈস্ট, কলিকাতা-১
ফোন: ২৩-৮২৭১ টেলিগ্রাম: 'TRAVELTIPS'
TCP/TB 169A1

Sulekha®
drawing ink
AVAILABLE IN EIGHT DIFFERENT COLOURS.
SULEKHA WORKS LTD.
SULEKHA PARK.
CALCUTTA - 32
ardeeyar

ঘোষণা

বাঙলাদেশ সংখ্যা 'পরিচয়'-এর জন্য আমন্ত্রিত আরও কিছু বিশিষ্ট রচনা আমরা বর্তমান সংখ্যায় প্রকাশ করতে না-পারায় দুঃখিত। এইসব রচনাসহ আরও মূল্যবান রচনায় সমৃদ্ধ হয়ে আগামী সংখ্যা জুলাই-এর প্রথম সপ্তাহতেই প্রকাশিত হবে। এ-সংখ্যাতেও উভয় বাঙলার বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীরা লিখবেন।

সম্পাদক : পরিচয়

পরিচয়
বাঙলাদেশ সংখ্যা
সংখ্যা ৮-৯ । বর্ষ ৩৯
১৩৭৭-৭৮

সূচিপত্র

প্রবন্ধ

কাহিনী

স্মৃতিচারণ

কবিতাগুচ্ছ

বিবিধপ্রসঙ্গ

সম্পাদক : দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। তরুণ সান্যাল

প্রচ্ছদ : ধ্রুব রায়

পরিচয় প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে অচিন্ত্য সেনগুপ্ত কর্তৃক নাথ ব্রাদার্স প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ৬ চালতাবাগান লেন, কলিকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত ও ৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড কলিকাতা-৭ থেকে প্রকাশিত।

বাঙলাদেশে চলেছে মরণপণ জাতীয় মুক্তি লড়াই

পশ্চিম পাকিস্তানের জঙ্গীশাহী শেষ মরণকামড় দিতে ঝাঁপিয়ে পড়েছে
হত্যা, অত্যাচার, ধর্ষণ, গৃহচ্যুত ও সর্বস্বচ্যুত করার জন্য
সভ্যতাঘাতী সশস্ত্র দানববাহিনী নিয়ে

বাঙলাদেশের মানুষ মৃত্যুঞ্জয়
তাঁরা লড়ছেন

পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, মেঘালয়, ত্রিপুরায় আশ্রয়প্রার্থী এসেছেন পঞ্চাশ লক্ষেরও বেশি নরনারী-শিশু, এসেছেন শ্রমিক-কৃষক-বৃত্তিজীবী-বুদ্ধিজীবী

আমরা বাঙলাদেশের ন্যায্য সংগ্রামের পাশে আছি, থাকব
মনুষ্যত্বের এতবড় অসম্মানের সময় আমরা হাত গুটিয়ে বসে থাকতে পারি না।

আমাদের দিতে হবে

* গৃহহীনকে আশ্রয়, ক্ষুধিতকে খাদ্য, বেদনার্তকে সান্ত্বনা, রোগার্তকে ঔষধ ও শুশ্রূষা

  এজন্য গোটা ভারতে আপৎকালীন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সবাইকে একসঙ্গে কাজে নামতে হবে

পাকিস্তানী গুপ্তচরচক্রের সংগ্রামবিরোধী কাজ, সাম্প্রদায়িকতার প্রচার ও চক্রান্ত রোধ করতে বিশেষভাবে পশ্চিমবঙ্গবাসীদের ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে আসতে হবে।

আমাদের মনে রাখতে হবে

* বাঙলাদেশে বাঙালির সর্বনাশ হলে পশ্চিমবঙ্গের বাঙালির জীবন নিরুপদ্রব থাকতে পারে না
* বিশ্ববাসীর সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রাম এবং স্বাধীন, সুখী, গণতান্ত্রিক বা সমাজতান্ত্রিক জীবন বিকাশের লড়াই শক্তিশালী হতে পারে না

বাঙলাদেশের জয় মুক্তবুদ্ধি বিশ্বমানবের শান্তি, স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের জয়
বাঙলাদেশের এ-জয় অবশ্যম্ভাবী।

বাঙলাদেশ সহায়ক শিল্পী-সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবী সমিতিকে
এই সংগ্রামের সহায়তায় অকুণ্ঠ সাহায্য প্রেরণ করুন।

কার্যালয় ১৪৪ লেনিন সরণী। কলকাতা-১২ (টেলিফোন ২৪-৩৯৩০)

পরিচয়
বর্ষ ৪০ । বাঙলাদেশ সংখ্যা
১৩৭৭-৭৮

'বাঙলাদেশ' ঃ ভাবী বাঙালির আবির্ভাব

গোপাল হালদার

[১৯৪৭এ দেশ বিভাগের পরে অনিবার্যরূপেই একটা জিজ্ঞাসা আমাকে পেয়ে বসেছিল, কি করে সম্ভব হলো বাঙালির এই 'হারিকরি' ? যা আমার ধারণা তা বলবার জন্যই লিখতে বসেছিলাম 'বাঙলা সাহিত্যের রূপরেখা' । লেখা শেষ হয়নি—বিশেষ করে যেখানে এসে দুর্ভাগ্যের সূচনা—উনবিংশ শতাব্দী—সেখানে পৌছতে-পৌছতেই দ্বিতীয় ভাগ শেষ হয়েছে । উনবিংশ শতাব্দীর বাঙলা সাহিত্য থেকে বাঙালি মুসলমানের স্বেচ্ছা নির্বাসন কেন, তার ফল কী ? বিশদ করে তা বলবার সমর্থ আয়ুতে আর কুলোবে কিনা জানি না, কিন্তু তার কথা বলবার সুযোগ আর উপেক্ষা করলাম না । দিল্লীতে ১৯৭১এর গত ১০ই এপ্রিলের বাঙলা সাংস্কৃতিক উৎসবের আয়োজিত সমসাময়িক 'বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যে'র আলোচনাসভার সভাপতির মৌখিক ভাষণে সে-চেষ্টা করেছি । সে-সভায় সমসাময়িক বাঙলা সাহিত্যের বিষয়ে চমৎকার আলোচনা করেছিলেন শ্রীযুক্ত নীহাররঞ্জন রায়, শ্রীযুক্তা আশাপূর্ণা দেবী, শ্রীশান্তি সিংহরায়, আমার বক্তব্য কিন্তু 'সমসাময়িকে'র সেরূপ সমীক্ষা ও পরীক্ষা নয়,—তার পরিপ্রেক্ষিতের সন্ধান । ইতি ১৭।৪।৭১ ইং, লেখক]

সমসাময়িক বাঙলা ভাষা ও সাহিত্য একটা বিশেষ বিবর্তনের সম্ভাবনায় এসে দাঁড়াচ্ছে—কারণ ভাবী বাঙলার জন্মবেদনায় আজকের বাঙলা অস্থির। নতুন আশা-আকাঙ্ক্ষায় বাঙলা ভাষা ও সাহিত্য সোনার বাঙলার জন্য অপেক্ষমান । গোড়ার একটা কথা, সমসাময়িক কাল বলতে আমি শুধু এই ১৯৭০-৭১এর বা ওরূপ দু-একটা বৎসর বোঝাতে চাই না। অবশ্য এ-যুগে সভ্যতার গতিবেগ দিনের পর দিন খরতর হয়ে উঠছে । তাই মানুষ আর দীর্ঘ করে যুগ গণনা করে না। বাঙলা সাহিত্যে প্রায়ই 'পঞ্চাশের দশক' 'ষাটের দশক' এরূপ দশক হিসাবে সাহিত্য সমীক্ষাও এখন একটা নিয়ম। সে-হিসাবে সমসাময়িক বলতে ষাটের দশকই বোঝানো উচিত ।—সত্তরের দশক মাতৃগর্ভে না হোক এখনো মাতৃক্রোড়ে । এরূপ গণনায় সাময়িকতার সম্মান রক্ষা হতে

পারে। সমতার অর্থ সঙ্কীর্ণ হওয়া অনিবার্য। সাহিত্যের দিক থেকে বরং আমরা বলতে পারি—রবীন্দ্রনাথের মহাপ্রয়াণের (১৯৪১) পরেই সমসাময়িক কালের প্রারম্ভ। অথবা, ১৯৪৭এ স্বাধীনতা লাভের থেকেই কালান্তর; আর বাঙলাদেশের পক্ষে বাঙলা বিভাগেই সেই কালান্তর—অর্থাৎ সঙ্কটকাল,—কালগ্রাসের বিভীষিকা। অবশ্য কেউ কেউ ১৯৪৭ থেকে ১৯৬০ পর্যন্ত কালটাকে 'সাম্প্রতিক' বলতে পারেন, আর ১৯৬০এর পরেকার বছরগুলিকে বলতে পারেন, 'সমসাময়িক'। আপত্তি করি না। তবে ১৯৪৭এ যে একটা কালান্তর তা এই ১৯৭১এ পৌঁছে আমাদের কাছে স্পষ্ট। কথাটা স্পষ্টতর হয়ে ওঠে যদি আমরা সমগ্রভাবে বাঙলা সাহিত্যের পরিপ্রেক্ষিত বুঝতে চেষ্টা করি—তাহলেই ১৯৭০-৭১এর বাঙালি জীবনের এই মুহূর্তের তাৎপর্য উপলব্ধি করা যায়, সঙ্গে সঙ্গে সমসাময়িক বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রকৃত রূপটা প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে।

অতীতের উত্তরাধিকার

সে দৃষ্টিতে রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত কালটাকে আমরা বলতে পারি 'আধুনিক যুগ', তার পূর্বেকার যুগটাকে 'মধ্যযুগ' অন্তত 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' থেকে ভারতচন্দ্র পর্যন্ত যার বিস্তার। পিছনে অবশ্য ছিল চর্যাপদের কাল বা প্রাচীন বাঙলা সাহিত্য। এই প্রেক্ষাপটও অবশ্য চূড়ান্ত নয়, কারণ বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের পিছনেও তো ছিল ভারতীয় জীবন ও সংস্কৃতির হাজার দুই বৎসর। বাঙলা ভাষা ও সাহিত্য তো সে-উত্তরাধিকার বঞ্চিত নয়—ভারতের আধুনিক ভাষা ও সাহিত্যের থেকে বাঙলায় এ-সম্পদ বেশি সঞ্চিত। সমসাময়িক বাঙলা সাহিত্য সে-বিষয়ে উৎসাহী না হতে পারে, কিন্তু সে-দান অস্বীকার করাও তার পক্ষে অসম্ভব। রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথে এই উত্তরাধিকার আবার নায়িত হয়েছে।

বাঙলা সাহিত্য আরও যে বিষয় গৌরবে পরিপুষ্ট তা মনে রাখাও এজন্য প্রয়োজনীয়। বাঙলা সাহিত্যের প্রধান বিষয় কি কি?—একটা প্রধান বিষয় তো দেখলাম—প্রাচীন ভারতীয় বিষয়; সংস্কৃত, পালি, প্রাকৃত ভাষায় রচিত সাহিত্যের মধ্য দিয়ে তা বাঙলা ভাষায় এসে পৌঁছেছে—বেদ, উপনিষদ রামায়ণ মহাভারত জাতক কাব্য, অলঙ্কার, দর্শন প্রভৃতি অজস্র গ্রন্থের সূত্রে একটা বৃহৎ ঐতিহ্য প্রবাহিত হয়ে চলেছিল—সমগ্র ভারতেই তার বিস্তার কখনো ক্ষীণ কখনো বিপুল, কিন্তু একেবারে লুপ্ত হতে পারেনি। এ-একটা সর্বভারতীয়

ঐতিহ্য—প্রাচীন ভারতীয় বিষয়। বিশেষ করে 'রামায়ণ' ভারত 'মহাভারত' ও ভাগবত মুক্তি দিল এক অফুরন্ত উৎস। দ্বিতীয় বিষয় হলো মধ্যযুগের দেশজ বিষয়—অঞ্চলে-অঞ্চলে তা বিভিন্ন হলেও ভারতীয় ভূমিতেই সকল কথারই উদ্ভব। আমাদের মঙ্গল কাব্যের কাহিনীগুলি তার একটা অংশ,—মনসা মঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, ধর্মমঙ্গল প্রভৃতি। এবং অন্যঅংশ শ্রীচৈতন্য। কবির, নানক, শঙ্করদেব, নামদেব প্রভৃতি মধ্যযুগের সাধকদের প্রেরণায় উদ্ভূত ভক্তি সাহিত্য—প্রাচীন ভারতীয় বিষয়ের সঙ্গে অন্তরে-বাইরে তার গভীর যোগ, অঞ্চল বিশেষে তবু তার বৈশিষ্ট্যও আছে, তাও স্পষ্ট। বাঙলা দেশের দিক থেকে এই 'দেশজ বিষয়' হচ্ছে একদিকে তাই মঙ্গলকাব্য অন্যদিকে চৈতন্য সাহিত্য মধ্যযুগ পর্যন্ত বাঙলা সাহিত্যের দুটি প্রধান বিষয় ই ভারতীয়। কিন্তু মধ্যযুগেই তৃতীয় একটা বহির্ভারতীয় বিষয় এসে হানা দিয়েছিল—তাও মধ্যযুগীয় ধর্মে ও ধারণায়। বাঙলা সাহিত্যে সে আপনার স্থান করে নিতে পারল মধ্যযুগের শেষপর্বে—সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ দিক থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীতে। তুর্ক, পাঠান, মোগল বিজয়ে ইসলামের ধ্বজা উড়িয়ে এল এক নতুন বিষয়—যা নিছক আরবের নয়, বলা যেতে পারে প্রধানত ফারসি, এবং ফারসিতে চোয়ানো আরব্য ঐতিহ্য, এক কথায় বাঙলা সাহিত্যের এই তৃতীয় বিষয়কে বলা যায় 'ফারসি-আরব্য বিষয়'—একদিকে নানা রম্য কাহিনী, জাগতিক প্রণয় কথা, অন্যদিকে স্ফুফী আধ্যাত্মিক কথা যার অন্তর্গত। এই তৃতীয় বিষয়টা বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যে আপনার হতে সময় নিয়েছে প্রায় চার শ বৎসর। যখন তা আর বাইরের রইল না তখন বাঙালি জীবনে ও সমাজে ফারসি-আরব্য কায়দা-কানুনের একটা ছাপ সহজ হয়েছে—হিন্দু-মুসলমানের শিক্ষিত অংশ তখন ফারসি-ঐতিহ্যকে ভারতীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে একরকমে মানিয়ে নিয়েছে। আলাওল থেকে ভারতচন্দ্র পর্যন্ত আমরা সপ্তদশের শেষার্ধ ও অষ্টাদশ শতকের বাঙলায় পাই তার প্রমাণ—ভাষায়ও যে ফারসি-আরবী কতকটা তখন গৃহীত, তা তখনকার বাঙলা চিঠিপত্রের ভাষা দেখলে বোঝা যায়। আসলে, হিন্দু-মুসলমান সকল বাঙালির একটা মিলিত জীবন ও ভাবনা ১৮শ শতকে গড়ে উঠছিল। কিন্তু তা ঠিক স্থির ভিত্তিতে দৃঢ় হবার আগেই এসে গেল ব্রিটিশ শাসন। সঙ্গে সঙ্গে ছেদ পড়ল মধ্যযুগের জীবনধারায় আর ছেদ পড়ল সেই অষ্টাদশ শতকের নাতিপুষ্ট মিলিত জাতীয় ভাবনায়। তাতে করে ইংরেজ শাসনে ফারসি-আরব্য বিষয়টা বাঙলা সাহিত্যে ক্ষীণ হয়ে রইল।

আধুনিক যুগের অবদান

অবশ্য বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের আধুনিক যুগ শুরু হলো ব্রিটিশ শাসনে। আর তাতে অনিবার্য হলো চতুর্থ একটি বিষয়ের বিপ্লবী আবির্ভাবে—এটি হলো আধুনিক যুগের বিষয়—এটিও বহির্ভারতীয়, তবে মধ্যযুগীয়ও নয়—বরং দুর্জয় এবং অভিনব। আধুনিক যুগ যে বিপ্লবী আবির্ভাব তা না মেনে উপায় নেই। তার কারণ ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের মধ্য দিয়ে আমরা যার সন্ধান পেলাম তাকে বলা যায় 'আধুনিক যুগ' ইংরেজি শাসন, ইংরেজি ভাষা—ইংরেজি ভাষা বাহন হলো তখনকার ১৮শ-১৯শ শতাব্দীর উন্নততম বুর্জোয়া সংস্কৃতির—যে সংস্কৃতির মূল বাণী যুক্তিবাদিতা, বৈজ্ঞানিক জিজ্ঞাসা, জাতীয় স্বাধীনতা, মানুষের অধিকার; যে সংস্কৃতির মধ্যে একদিকে মিশেছিল গ্রীক-লাতিন-হিব্রু চিন্তার ধারা, অন্যদিকে যার সম্পদ ইউরোপীয় 'রেনাইসেন্স,' ইউরোপীয় রিফর্মেশন, ইউরোপীয় ফরাসী বিপ্লবের সম্মিলিত সামাজিক-রাজনৈতিক দান। ফারসি-আরব্য বিষয় বা সংস্কৃতি কিন্তু এরূপ বৈপ্লবিক শক্তির আধার ছিল না—তা মধ্যযুগেরই জিনিস। কিন্তু ইংরেজি শিক্ষা-দীক্ষার মধ্য দিয়ে আমরা মধ্যযুগের ভাবলোক ছাড়িয়ে আধুনিক যুগের ভাবলোকে উত্তীর্ণ হতে চললাম, অবশ্য জীবনযাত্রায় তখনো আমরা পরাধীন। সেই বন্ধনে আমাদের পা তখনো শৃঙ্খলাবদ্ধ। তাই বাস্তব ক্ষেত্রে আমরা আধুনিক যুগে উত্তীর্ণ হতে পারব কেন? সেই বিক্ষোভে মানসিক ক্ষেত্রে আরও বেশি আগ্রহ নিয়ে আধুনিক ভাবলোকের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইলাম। সম্পূর্ণ যে পারলাম তা নয় তথাপি আমাদের ভাষা ও সাহিত্যে বিপুলভাবে লাভ করল একটা নতুন বিষয়, যাকে বলেছি আধুনিক কালের বিষয়, নতুন মন্ত্র—বিজ্ঞানসম্মত যুক্তির মুক্তি, জাতীয় মুক্তি এবং মানুষের অধিকার আর পরোক্ষ ভাবে তাতেই আধুনিক যুগের বাঙলা ভাষা ও সাহিত্য যখন বিকশিত হতে লাগল তখন তাতে 'প্রাচীন ভারতীয় বিষয়', মধ্যযুগের 'দেশজ বিষয়' এবং 'ফারসী আরব্য বিষয়' সবই রূপান্তরিত হয়ে গেল ইংরেজি শিক্ষার আধুনিক ভাবনা ধারণার সংযোগে। বিশেষ করে আবার ফারসী-আরব্য বিষয়টা যা সবল হতে পারেনি তা প্রায় চাপাই পড়ে যেতে লাগল। কেন, তা বুঝতে হলে উনবিংশ শতকের বাঙালি জাগরণের (রিনাইসেন্সের) স্বরূপটা একটু মনে রাখতে হয়।

খর্বিত 'জাগরণ'

বাঙলার জাগরণ ঘটল বাইরের থেকে আঘাতে ইংরেজি শাসন ও সভ্যতার সংঘাতে, দেশের ভেতর থেকে সহজভাবে এ-স্রোত উদ্ভূত হয়নি—হতো কিনা সে ভিন্ন বিতর্ক। প্রথমত তা ঘটল আমাদের পরাধীন অবস্থায়—রাজনৈতিক পরাধীনতার সঙ্গে তাতে ছিল দেশের অর্থনৈতিক পরাধীনতার দুর্যোগ। তাই বাস্তব ক্ষেত্রে বাঙালির উদ্যোগ ছিল ব্যাহত, বৈষয়িক প্রয়াসে, শিল্পোদ্যোগে, ব্যবসা-বাণিজ্যে, এমনকি বৈজ্ঞানিক চিন্তায় চেষ্টায়ও নিরুদ্যম, সংরুদ্ধ। ঠিক সে-জন্যই এই জাগরণকালীন জীবনোন্মাদনা চেয়েছে ভাবলোকে সুতীব্র প্রকাশ, অন্তর্মুখী চিন্তায়-ভাবনায় (subjective) লাভ করেছে প্রখর গতি, শিল্পে, সাহিত্যে তীব্রতা ও সূক্ষ্মতা ভাবাতিশয্য কল্পনার প্রবণতা। দ্বিতীয়ত এই নবজীবনের জোয়ার একটা সঙ্কীর্ণ সমাজ চক্রের মধ্যেই আবর্তিত হতে থাকে—যাকে বলা যায় 'ভদ্রলোক' শ্রেণী,—বাঙালি মধ্যবিত্ত ইংরেজি শিক্ষিত গোষ্ঠী, প্রধানত হিন্দু উচ্চবর্ণের মধ্যেই যারা আবার সীমাবদ্ধ। ১৭৯৩এর চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত এক মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অর্থনৈতিক সুবিধা সৃষ্টি করে দিয়ে তাদের আত্মপ্রসারের পথে করে দিয়েছিল। ইংরেজি ভাষা ও ইংরেজি শিক্ষা বিশেষ করে এই ভদ্রলোক শ্রেণীকে ইংরেজের শাসন-চক্রে সুযোগ দান করে, কিন্তু অন্যদিকে দেশের ও সমাজের আপামর সাধারণের থেকে আরও বিচ্ছিন্ন করে দেয়। এই গণ্ডী ভেঙে তাই বাঙলাভাষী ও বাঙলা শিক্ষিতদের নিকট বাঙলা রিনাইসেন্সের ধ্যান-ধারণাকে ভদ্রলোকরা পৌছতে পারেনি। এমনকি শিক্ষিত গোষ্ঠীর ধর্ম ও সমাজ-সংস্কার আন্দোলনও ভদ্রলোকদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে থাকে। সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থে শাসক-গোষ্ঠী চায়নি বিদ্যাসাগরের পরিকল্পনা মতো বঙ্গ বিদ্যালয়, বা বাঙলা ভাষায় শিক্ষা-দীক্ষার প্রসার করে সেই আধুনিক যুগের জ্ঞান-বিজ্ঞান ('Western science and knowledge) দেশের সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রবর্তিত করতে ; শ্রেণী স্বার্থে সে-শতাব্দীর শিক্ষিত ভদ্রলোকরাও চাননি সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষায় বা আধুনিক যুগের জ্ঞান-বিজ্ঞান দেশের ভাষার খাতে ঢেলে দিতে, সেই কৌশলে স্বদেশের সাধারণ হিন্দু-মুসলমানকে জাগ্রত করতে, ভদ্রলোক বা শিক্ষিত শ্রেণীর নতুন যুগের উদ্যোগী ভাবনায় নিজেদের জনগণকে সহযোগী করে নিতে। এমনকি, যা এই শতাব্দীর ভদ্রলোক শ্রেণীর প্রধান দুই কীর্তি

—বাঙালির স্বাধীনতার সাধনা ও বাঙালির সাহিত্য সাধনা—তাও এই জনসমাজের থেকে তাই প্রাণরস আহরণ করতে পারেনি। সেই 'ভদ্রলোকের জাগরণ' অনেকাংশে একদিকে দেশের জনশক্তির থেকে বিচ্ছিন্ন স্বাদেশিকতা (national movement with weak democratic content), হয়ে গেল এবং অন্যদিকে দেশের মাটির সঙ্গে ঐতিহ্যের সঙ্গে স্বাভাবিক সম্পর্ক খুঁজে না পেয়ে হয়ে উঠল জন-জীবনের প্রাণ-সম্পদে বঞ্চিত এক ভাবকল্পনায় সমৃদ্ধ, কিন্তু বহুলাংশে খণ্ডিত জাগরণ 'ভদ্রলোকের সংস্কৃতি'। তা সমগ্র বাঙালির নয়। একাংশের প্রকাশ এরই অনিবার্য বিকৃতি একদিকে 'হিন্দু স্বাজাত্য' অন্যদিকে 'বাবু কালচার'।

বাঙালি মুসলমানের বিভ্রান্তি

অবশ্য, আরেকটা বিষম দুর্বিপাকের কথাও এই সূত্রেই স্মরণ না করলে এই বিকৃতির অন্য একটা কারণও অনুল্লেখিত থাকে। তা হচ্ছে মুসলমান ধর্মাবলম্বী বাঙালিদের সাধারণভাবে উনবিংশ শতাব্দীতে যুগধর্মের প্রতি বিমুখতা। এই শতাব্দীতে হিন্দু 'ভদ্রলোকের অভ্যুদয়' যেমন ঘটছিল একদিকে আধুনিকতা সম্বন্ধে সচেতনতা অন্যদিকে তখনি জুটেছিল মুসলমান বাঙালি শিক্ষিত শ্রেণীর (ফারসি-আরবী শিক্ষিত কাজী আমলা প্রভৃতি) দুর্ভাগ্য। ইংরাজ শাসন এলে হিন্দু শিক্ষিত শ্রেণীর (ফারসি ও সংস্কৃত শিক্ষিত মসীজীবী) পক্ষে জীবিকার দায়ে ফারসির মতোই ইংরেজি গ্রহণে বাধা হয়নি। কিন্তু রাজ্যাধিকার হারা বিক্ষুব্ধ মুসলমান শিক্ষিতদের পক্ষে সেই পালাবদল.'নসারা'র ভাষা ও শিক্ষা-দীক্ষা গ্রহণ ছিল স্বভাবতই ঘৃণার্হ। তা 'হারাম' হয়েও উঠল সাবেক কারণে, অচিরেই। 'কেন মুসলমানের এই রাজ্যচ্যুতি?'—এ-প্রশ্ন নিয়ে যে-মুসলমান নেতারা সেদিন ভারতে বসেছিলেন তাদের পক্ষে মনে হলো—ইসলামের বিশুদ্ধিতা থেকে বিচ্যুতিই মুসলমানদের দুর্ভাগ্যের কারণ। অতএব উদ্ধারের উপায় বিশুদ্ধ ইসলামে পুনঃপ্রবর্তন। এই ধারণাই নবোদ্বুদ্ধ ওহাবী-নীতিই মনে হলো মুসলমানের আত্মসংগঠনের একমাত্র পথ। তার অর্থ আধুনিক যুগকে অস্বীকার করে পঞ্চম-সপ্তম শতকে আরব্য ইসলাম-এ পুনঃপ্রবর্তন। ভারতের তথা বাঙলাদেশের বুকে স্বাভাবিকভাবে যে ইসলাম বিকশিত হয়েছে তাকেও মনে হলো ইসলামের নীতি-লঙ্ঘন—ভারতের ও বাঙলা-দেশের দুয়ারে যখন আধুনিক যুগের ডাক এসে পৌছেছে হিন্দু শিক্ষিতরা

তাতে জাগ্রত হয়েছেন,—মুসলমান শিক্ষিতরা তখন তার প্রতি মুখ ফিরিয়ে দূরে বসে রইল। (এমনতর বিশুদ্ধ 'আর্য গরিমা'র নামেই উনবিংশ শতাব্দীর রিনাইসেন্স অনেকটা 'হিন্দু পুনর্জীবনে' Hindu Revivalএ পরিণত হবার হাস্যকর চেষ্টা করেছিল, তাতেই হিন্দু স্বাজাত্যও দেখা দিয়েছিল।) বাঙলাদেশে এই ওহাবি আন্দোলনের যথেষ্ট বিস্তার ঘটেছিল—তিতুমীর তারই এক সংগ্রামী মুখপাত্র—তার সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতারও তাই মূল প্রেরণা। সাধারণভাবে মুসলমান সমাজ বিশেষ করে পূর্ববাঙলার মুসলমান-গণ, আসলে ঐ নসারার প্রতি বিদ্বেষে উনবিংশ শতাব্দীর দুই-তৃতীয়াংশ কাল ধরে ইংরেজি শিক্ষা বা আধুনিক যুগের শিক্ষা-দীক্ষা, জীবনযাত্রার প্রতি বিমুখ থাকে। সেই প্রভাবেই নিজেদের আরব পারস্যের ঐতিহ্যের বাহক বলেও ক্ষুব্ধ অভিমান পোষণ করে, এবং আধুনিক শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ হিন্দু ভদ্রলোকদের পক্ষে দূরতর হয়ে যায়, বরং হিন্দু শিক্ষিতের চক্ষে 'বিদেশীয়' 'বিজাতীয়' (?) 'যবন' সম্প্রদায় হয়ে ওঠে। কারণ আধুনিক শিক্ষিত হিন্দু ঠিক এই শতাব্দীতেই পুনরাবিষ্কার করে প্রাচীন (অর্থাৎ হিন্দু ভারতের) মহিমা। বাঙলায় অনুবাদ ও প্রবর্তন করতে থাকে বৈদিক, বৌদ্ধ, পৌরাণিক হিন্দুশাস্ত্র। মূঢ় মোহে মেকস্‌মূলর প্রভৃতির সার্টিফিকেট পেয়ে 'আর্যামি'তে নতুন করে দীক্ষিত হয়ে ওঠে এবং ইংরেজিতে নতুন-শেখা ইতিহাসের পাঠে সুলতান মামুদ থেকে নবাব সিরাজদ্দৌলা পর্যন্ত সকল মুসলমান শাসকদেরই এক সূত্রে গেঁথে স্থির করে বসে মুসলমান শাসকমাত্রই 'ভারতের স্বাধীনতার শত্রু' 'অত্যাচারী যবন'। এক কথায় বিপরীতমুখী হয়ে উঠতে থাকে দুই ধর্মের বাঙালি শিক্ষিতদের দৃষ্টি, এমনকি, শিক্ষিতদের মধ্যে পরস্পরের সম্পর্কে ধারণা সন্দেহের ও সংশয়ের হয়ে ওঠে তাই উনবিংশ শতকের বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের নব-আয়োজনে আধুনিক বুদ্ধির হিন্দু ভদ্রলোক যতই এগিয়ে গেল তার কাছে সেই 'ফারসি-আরবী বিষয়' ততই বিজাতীয় মনে হলো, অন্যদিকে, আধুনিক শিক্ষাদীক্ষায় বিমুখ মুসলমান শিক্ষিতরাও বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের সেই আধুনিক আয়োজনে (নিজেদের আধুনিক দৃষ্টির অভাবে) যোগদান করতে অসমর্থ হলো—ভাবল বাঙলা-চর্চা ও ভারত-চর্চা থেকে ফারসি-চর্চা বুঝি তাদের বেশি বাঞ্ছনীয়। তাই উনবিংশ শতকে মুসলমান বাঙালি শিক্ষিতরা আলাওল দৌলৎ কাজীদের মতো আর সৃষ্টি ক্ষেত্রে উদ্যোগী হতে পারল না বরং বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি কতকটা উদাসীন হয়ে উঠল। অন্তত পঞ্চাশ বৎসর পিছনে পড়ে গেল

আধুনিক যুগের হিসাবে মুসলমান বাঙালি।

যখন সত্যই মুসলমান বাঙালি তার বিভ্রান্তি কাটিয়ে উঠল তখন বিংশ শতাব্দী সমাগত। তার অনেক পূর্বেই বাঙালি হিন্দু ভদ্রলোকরা অর্থনৈতিক জীবনে সর্বত্র প্রতিষ্ঠিত—তারাই জমির মালিক মহাজন তালুকদার; তারাই ১৮৩৮এর পর থেকে সরকারী চাকরিতে সাহেবদের আজ্ঞাবহ আমলা-মণ্ডল বেসরকারী নানা জীবিকায় উকিল, ডাক্তার, মাস্টার হিসাবে একচ্ছত্রাধিকারী। আবার, এই কয়েক দশকে সেই ভদ্রলোকদের বংশবৃদ্ধি ঘটেছে, শিক্ষার বিস্তারে সংখ্যাবৃদ্ধি দেখা দিয়েছে। বিশেষ করে দেখা দিয়েছে এসব শিক্ষা, জীবিকা ক্ষেত্রে ভিড়। ইংরেজি শিক্ষিত মুসলমানদের সে-ক্ষেত্রে আবির্ভাবও তাই ভদ্রলোকের কায়েমী স্বার্থের (vested interest) পক্ষে ভয়ঙ্কর কথা। বলা বাহুল্য, সাম্রাজ্যবাদী শাসকের থেকেই এই বৈষম্যের বিস্তার, আর সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থেই তার তাণ্ডবের আরম্ভ। বঙ্গভঙ্গের যুগ থেকেই তাই স্পষ্ট এই বাঙালির অন্তঃপ্রতিদ্বন্দ্বিতা, চাকরির কাড়াকাড়ি, পর্যায়ে পর্যায়ে তা হয়ে উঠল হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িক বৈষম্য, বিচ্ছেদ, বিদ্বেষ, বিরোধ, দাঙ্গা, সংহারলীলা এবং শেষ পর্যন্ত বঙ্গ-বিভাগ (১৯৪৭)। তুর্কী, আরব, ইরাণ প্রভৃতি পৃথিবীর মুসলমান দেশে স্বাভাবিক দেশপ্রীতির সঙ্গে বহির্জগতের মুসলমান প্রীতির সামঞ্জস্য যখন সহজে ঘটেছে, বাঙলা ও ভারতে ঠিক তখনই মধ্যযুগীয় ধর্মপ্রীতির কাছে এ-যুগীয় দেশপ্রীতির সংঘর্ষ ঘটল,—তারই একটা সংক্ষিপ্ততম হিসাব আমরা এখানে গ্রহণ করলাম। এ-সংঘর্ষের আরও অনেক ছোটবড় কারণ এ-হিসাবে বাদ দিতে বাধ্য হলাম। মূলত এই কথাটাই আমাদের স্মরণীয়—উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে মুসলমান বাঙালি ভিতরের বাহিরের নানা সংঘাতে না পেয়েছে আধুনিকতার সুস্থ চেতনা—রিনাইসেন্স. রিফর্মেশন. ফরাসী বিদ্রোহের সম্মিলিত দান, সেই জীবনবোধ, সমাজবোধ, না পেরেছে মুসলমান বাঙালিকে মধ্যযুগীয় অবস্থা ছাড়িয়ে আধুনিক ভাবনায় দীক্ষিত করতে। ফলে তাদের স্বদেশেও তাদের দান থেকে বঞ্চিত হয়েছে. স্ব-ভাষা ও স্ব-সাহিত্যকেও তারা ওভাবে বঞ্চিত করেছে। আর তাতে আপনাকেই করেছে মুসলমান বাঙালি সর্বাধিক বঞ্চিত। সে বঞ্চনা শেষ করতেই ওয়াজিদ আলী, নজরুল ইসলাম প্রমুখেরা আধুনিক যুগের প্রবক্তারাই প্রথম অগ্রসর হন। কিন্তু যুগের দুর্যোগ তখন ঘনায়িত. ওয়াজিদ আলি, নজরুল প্রভৃতির শ্রেষ্ঠ দানও তখন বাঙালি মুসলমান এগিয়ে এসে গ্রহণ করতে পারেননি। আজ তাই বাঙলা ভাষা ও

বাঙলা সাহিত্য ১৯৪৭ পর্যন্ত দুই-তৃতীয়াংশ বাঙালির সুস্থ, প্রাণবন্ত ভাবনা ও চেতনা থেকে বঞ্চিত থেকে যায়। বাঙলা ভাষার ও সাহিত্যের ইতিহাসও থাকে খর্বিত।

ভাষা আন্দোলন ও সার্বিক জাগরণ

১৯৪৭এ সেই বঞ্চনার বলি হতে না হতেই বাঙালি মুসলমান ১৯৪৮এ চীৎকার করে ঘোষণা করলে—'না, না, না.' কায়দে আজমের হুকুমেও সে আত্মবঞ্চনার বলি হবে না বাঙালি মুসলমান। বাঙলাই তার মাতৃভাষা। তারপর, ১৯৫২এর ২১এ ফেব্রুয়ারি এই দুই-তৃতীয়াংশ বাঙালির আত্ম-অভ্যুদয়ের সূচনা। আর সেদিন থেকে বলতে পারি—'সমসাময়িক বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের' আত্ম-আবিষ্কারের প্রারম্ভ। খণ্ডিত, খর্বিত বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের স্থলে বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের পূর্ণতার সাধনা সেদিন থেকে সমারব্ধ হয়েছে, আজ বাঙলা দেশের প্রতিষ্ঠায় তা অপ্রতিরোধ্য হতে চলেছে—এই কথাটি আজ আমাদের প্রথম ও প্রধান উপলব্ধ সত্য। 'বাঙলাদেশ' অর্থ ভাবী বাঙলার আবির্ভাব—বাঙালির পরিপূর্ণ প্রকাশের উদ্যোগ—খর্বিত বাঙালির নয়, সমগ্র বাঙালি জীবনের বিকাশ। সমসাময়িক বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের হিসাব নিতে হলে আজ তাই পশ্চিমবঙ্গের বাঙলা সাহিত্যের হিসাব নেওয়া হয়ে ওঠে গৌণ—সৃষ্টিতে বা পরিমাণে তা তুচ্ছ নয়, কিন্তু সম্ভাবনার দিক থেকে তা গৌণ। ভাবীকালের পরিপ্রেক্ষিতে বাঙলাদেশই মুখ্য। কারণ ভাবীকাল ওই দুই-তৃতীয়াংশ বাঙালিরই হাতে পাচ্ছে প্রাণ, শুধু সংখ্যার জন্য নয়, বাঙলাদেশের সম্ভাবনা উদ্ভাসিত তার জীবন উম্মাদনায়, জাগরণ-দীপ্তিতে বৈপ্লবিক অগ্নিপরীক্ষায় বিচ্ছুরিত প্রাণসম্পদে—জীবনে জীবনযোগে। অবশ্য সংখ্যাও স্মরণীয়।

একবার আমরা যেন মনে রাখি—'বাঙলাদেশ' আন্দোলনের প্রাণভিত্তি কী—১৯৫২এর ভাষা আন্দোলন। এই বিষয়টা বিশেষ তাৎপর্যময়। অনেক দেশেতে জাতীয় আন্দোলনই ভাষা ও সাহিত্য আন্দোলনকে আশ্রয় করে বিকাশ লাভ করেছে দেখা যায়। ভাষা জনসমাজের আত্মীয়তার প্রধান বন্ধন, আত্মীয়তাবোধ জাতিসত্তার প্রাণমূল, আর ভাষা ও সাহিত্যেই জাতিসত্তার প্রাণ স্বরূপ। পূর্ববাঙলায়ও তারই প্রাধান্য দেখলাম। গভীরতর তার তাৎপর্য বাঙালি মাত্রেরই পক্ষে। বাঙলার উনবিংশ শতাব্দীর স্বাধীনতা আন্দোলন ও

সাহিত্য-সাধনার মধ্যে ছিল অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক—একই জাতীয় আত্মপ্রকাশের দুই পিঠ—সাহিত্যে জাতির আত্মপরিচয়, স্বাধীনতায় জাতির আত্ম-প্রতিষ্ঠা। সেদিনের রিনাইসেন্সে দুএরই অঙ্কুর ছিল। তাইতো উনবিংশ শতাব্দীর সেই জাগরণ খণ্ডিত জাগরণ হলেও মিথ্যা নয় সে জাগরণ, কিন্তু সে রিনাইসেন্স যে শত হলেও খণ্ডিত রিনাইসেন্স, তাও বাঙালি ভদ্রলোকের আত্মপ্রকাশ। তারই প্রতিক্রিয়ায় বিংশ শতকের প্রথম পাদে বাঙালি শিক্ষিত মুসলমান চেয়েছিল তার সঙ্কীর্ণ আত্মপ্রকাশের সুযোগ—'বাবু কালচারের' মতোই 'মিঞা কালচার'। কিন্তু ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলনকে অবলম্বন করে পূর্ববাঙলায় যে 'রিনাইসেন্স' (বা 'জাগরণ') ঘটল তা কোনো মধ্যবিত্ত শিক্ষিতের আন্দোলন নয়, শ্রেণী বিশেষের আত্মস্বার্থের সিদ্ধলাভ তার উদ্দেশ্য নয়।—এ সার্বিক জাগরণ—সর্বাঙ্গীন, সার্বজনীন।

প্রথমত, মুসলমান সমাজে, মুসলমান বাঙালির মধ্যে অমন জাতি-ও-বিত্তে পাকা করা ভদ্রলোক গোষ্ঠী পাকাপোক্ত হয়ে উঠতে পারেনি। পূর্ববাঙলায় শিক্ষিতরা সেরূপ শ্রেণীবদ্ধ হবার মতো যথেষ্ট সময়ও পায়নি। পৃথিবীর পারি-পার্শ্বিক অবস্থাও আজ অমন সঙ্কীর্ণ বিত্তমান শ্রেণীর নেতৃত্বলাভের পক্ষে অনুকূল নয়। এবং জনগণের জীবনের সঙ্গে জীবন যোগ না করে কোনো যথার্থ জাগরণ বা রিনাইসেন্সই আজ অসম্ভব। কোনোদিনই তা প্রকৃতপক্ষে সম্ভব হয় না। পূর্ববাঙলার শিক্ষিত শ্রেণী জনগণের সন্তান। সে বন্ধন ছেদনের মতো দুর্বিপাকে পড়েনি—বাঙলার ভদ্রলোকেরা যেমন পড়েছিলেন উনবিংশ শতকে ইংরেজির মোহে। পূর্ববাঙলা প্রথম থেকেই প্রাণ দিয়ে গ্রহণ করেছে বাঙলা ভাষা। তার ভাবনা চিন্তা ধ্যান-স্বপ্ন সেই মাতৃভাষার খাতেই প্রবাহিত। তাতেই তার নিরক্ষর সাধারণ মানুষের মধ্যেও পূর্ববাঙলার শিক্ষিতদের চেতনা, ভাবনা সহজেই উৎসারিত হয়ে গিয়েছে। উনবিংশ শতাব্দীর জাগরণে ঠিক যা হতে পারেনি,—আর তাই পূর্ববাঙলার ভাষাভিত্তিক জাগরণ সেখানকার সাধারণ মানুষেরও জাগরণ, তার সাহিত্যসৃষ্টি শিক্ষিত-অশিক্ষিত নারী পুরুষ সকলের প্রাণের রঙে রাঙা, শ্যামলশ্রী পূর্ববাঙলার জীবনরসে সতেজ, পূর্ববাঙলার নদী জল বিধৌত মাটির রসে গন্ধে ভরা। আর ঠিক এই কারণেই তার হাইকোর্টের বাঙালি জজ থেকে তার পাঞ্জাবি লাটের বাঙালি বাবুর্চি একই সঙ্গে দাঁড়ায় তার নেতৃত্বের নির্দেশে, একইভবে পেতে দেয় ট্যাঙ্ক ও মেশিনগানের সামনে। বাঙলাদেশে বাঙলা ভাষা, বাঙলা সাহিত্য, বাঙালি সাধনা শ্রেণী-সঙ্কীর্ণতার বাধা উড়িয়ে দিচ্ছে সার্বজনীন ও প্রাণবন্ত সংস্কৃতি হয়ে উঠছে, ১৯ শতকের বাঙালির অসম্পূর্ণ জাগরণ বাঙলাদেশে রক্তের অভিষেকে আজ লাভ করছে পরিপূর্ণতার দীক্ষা। পশ্চিম-বাঙলার বাঙালির মধ্যে উনবিংশ শতকের প্রাণোত্তম যখন মনে থিতিয়ে

এসেছে, হয়তো বা মন্দস্রোত, বুঝি কোথাও বা বদ্ধস্রোত, তখনি পূর্ববাঙলার বাঙালির মধ্যে দেখলাম বাঙলা সংস্কৃতির দুরন্ত প্রাণময় প্রকাশ—ভাষায়, গবেষণায়, সাহিত্যের আলোচনায়, সৃষ্টির সাধনায়—সর্বত্রই দেখি সেখানে প্রাণৈশ্বর্য, অকুণ্ঠিত সাহসিকতা, দুর্বার গতিময়তা। যা একদিন আরম্ভ হয়েছিল পশ্চিমবাঙলায়, আজ সেখানে স্তিমিত, সে প্রয়াসই আজ পরিস্ফুরিত পূর্ব বাঙলায়। ভাষার হিসাবে দেখি আজ প্রায় পূর্ববাঙলার প্রাত্যেকটি জেলার উপভাষার বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে। 'পূর্ব পাকিস্তানে'র আঞ্চলিক অভিধানের মতো মহৎ কীর্তি ডক্টর শহীদুল্লাহ-এর সম্পাদনায় সুসম্পূর্ণ। বাঙলা ভাষার আলোচনার পক্ষে যদি সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের গ্রন্থ (ODBL) হয় প্রধান গ্রন্থ, ডঃ শহীদুল্লাহ্-এর সম্পাদিত এই অভিধানও হবে দ্বিতীয় অপরিহার্য উৎস—যার অনুরূপ পশ্চিমবাঙলার আঞ্চলিক অভিধান আমরা এখন পরিকল্পনা করতেও সাহসী নই। ঢাকা বাঙলা একাদেমি, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, কিংবা ইতিহাসের গবেষণায় পূর্ববঙ্গের এশিয়াটিক সোসাইটি স্থির কীর্তির অধিকারী। লোককথা, লোকগীতি প্রভৃতির সংগ্রহ আরম্ভ হয়েছিল পশ্চিমবঙ্গে। আজ পূর্ববঙ্গ সে-পথেও সে কীর্তি ছাড়িয়ে যাচ্ছে। সাহিত্যে নতুন যারা এগিয়ে এসেছে, বিশেষ করে পূর্ববাঙলার নতুন কবিরা, দেখে চমৎকৃত হতে হয়—কী সরল, সতেজ, কল্পনার সজীব প্রকাশ। তাদের সাহিত্যে গল্পে-উপন্যাসে উঠে আসছে চাষী, মাঝি-মাল্লা, মজুর, মেয়ে-পুরুষের আশ্চর্য মিছিল—জীবনে জীবন যোগ করা সাহিত্যিকদের দান।

এমন কথা কেউ বলব না—পূর্ববাঙলার সবই পারফেক্ট অথবা, পশ্চিম বাঙলার সাহিত্যকীর্তি সবই সে-তুলনায় ম্লান। বরং এ-কথাই সত্য—অপরিণত শক্তির চিহ্ন পূর্ববাঙলার রচনায় এখনো যথেষ্ট,—যেমন বিকৃত বুদ্ধির চিহ্নও আজকের পশ্চিমবাঙলার পরিণত সাহিত্যে অজস্র। তবে একদিকে আছে নব জীবনের সবল প্রাণশক্তির উন্মাদনা, অন্যদিকে পরিক্লান্ত ক্ষীয়মান শক্তির সূক্ষ্মতা-জটিলতা, কলা-কৃতিত্বের মোহবশতা। অর্থাৎ পশ্চিমবাঙলার সৃষ্টি বৈদগ্ধ্য সত্ত্বেও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সংশয় ও আশঙ্কা জমে উঠে বই কমে না; আর পূর্ব বাঙলার সৃষ্টি সমৃদ্ধিতে জন্মে এক নূতন আশা, দেখি বলিষ্ঠ জীবনের প্রতিশ্রুতি। তাই পূর্ববাঙলার জীবনে জীবন লভিয়ে সমগ্র জাতি জাগবে—দুইশত বৎসরের (১৮৬৪-১৯৭০) দুর্যোগ পীড়িত বাঙালির ইতিহাসের এবার অপেক্ষিত কন্‌সামেশন—পরম পরিণতি—বাঙালির ভাষা বাঙালির আশা সত্য হয়ে উঠছে।

সমসাময়িক বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যকে এই পরিপ্রেক্ষিতে দেখে আজ অনুভব করি—বাঙলাদেশের আত্মপ্রতিষ্ঠায় ভাবী বাঙালির আবির্ভাব।

সংস্কৃতিকেন্দ্র ঢাকা : তখন ও এখন

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

বাঙলাদেশ জলছে। জলছে ঢাকা শহর, এখনকার বাঙলাদেশের রাজধানী। শুধু জলেনি, অনেক পরিমাণে নিশ্চিহ্ন। যেমন বাঙলাদেশের আর সব গ্রামে ও শহরে তেমনি পূর্ববঙ্গের এই ইতিহাস-প্রসিদ্ধ সংস্কৃতিকেন্দ্র ঢাকায়ও হানা দিয়েছে মনুষ্যত্বহীন বিবেকবুদ্ধি বর্জিত মারণাস্ত্রে সুসজ্জিত রক্তচক্ষু শাসকের নরখাদক বাহিনী। ঢাকা এখন ধ্বংসস্তূপ, লড়াই চলেছে এখানে-সেখানে। নির্জন পথঘাটে শ্মশানের স্তব্ধতা।

এই ঢাকা শহরেই জন্মেছিলাম, কাটিয়েছি শৈশব থেকে যৌবনের বেশ কিছু সময় পর্যন্ত। কখনো ভাবিনি ঢাকা ছেড়ে অন্য কোথাও যেতে হবে। খাওয়া-দাওয়া শস্তা, লেখা-পড়ার সুযোগ পর্যাপ্ত, বারো মাসে তেরো পার্বনের ঢেউ। ঢাকা শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র, রাজনীতির প্রাণকেন্দ্রও নিশ্চয়। ছেলেবেলা থেকেই দেখেছি ঢাকায় শিক্ষিত মধ্যবিত্ত তরুণ ছেলেদের মধ্যে স্বদেশপ্রেমের উদ্বোধন, শরীরচর্চা খেলাধুলোর মধ্য দিয়ে জাতীয়তাবোধকে প্রতিষ্ঠিত করবার চেষ্টা। শিক্ষার সঙ্গে স্বদেশ-চিন্তা অঙ্গাঙ্গীভাবে মিলেমিশে ছিল, আলাদা করে দেখার উপায় ছিল না। হিন্দু-মুসলমানের বিরোধকে জিইয়ে রাখবার জন্যে বাঙলাদেশকে দু-ভাগ করতে চেয়েছিল তৎকালীন বৃটিশ শাসক। কিন্তু প্রবল আন্দোলনের ফলে ১৯০৫ সনের বঙ্গবিভাগ রদ হলেও পূর্ব-বাঙলার মুসলমান সমাজের জন্য কতকগুলো সুযোগ-সুবিধা অব্যাহত রাখা হলো ঢাকা শহরে। ঢাকা কলেজ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এই সুযোগ-সুবিধার নিদর্শন। বৃটিশ সরকার ভেবেছিল কোনো বিশেষ সম্প্রদায়ের জন্যে আলাদা শিক্ষাব্যবস্থা থাকলে সাম্প্রদায়িক বিভেদ অব্যাহত থাকবে। অথচ শেষ পর্যন্ত ফল হলো অন্য রকম। ঢাকা কলেজ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শুরু থেকেই সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও মৈত্রীর সৌধ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সমবেত হয়েছিলেন বাঙলাদেশের শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিজীবী ও মনীষীবৃন্দ।

আমার কাছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চার বছরের ছাত্রজীবন এখন স্বর্ণ যুগের একটি অধ্যায় বলে মনে হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ তখন শুরু হয়ে গিয়েছে,

চতুর্দিকে দুর্যোগের ঘনঘটা। সাহিত্যচর্চায় আগ্রহ ছিল, রাজনীতি সম্পর্কেও সচেতন হয়েছিলাম। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের করিডোরে, মাঠে, গাছের নিচে ছাত্রদের সাহিত্য ও রাজনীতির আলোচনা। টেররিস্ট যুগের অবসানের পর ঢাকার রাজনীতি তখন নতুন মোড় নিয়েছে, দেশের যুবশক্তি ক্রমশই মার্কসবাদের দিকে ঝুঁকেছে, নতুন উদ্দীপনা আর আলোড়ন প্রত্যেকের মনে। সাহিত্য যারা ভালোবাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরি এবং পাঠাগারের আকর্ষণ তাদের কাছে ছিল দুর্নিবার। দেশী-বিদেশী অনেক পত্র-পত্রিকা হাতের কাছেই পাওয়া যেত। বিরাট হলঘর, ছাত্ররা বসে বসে পড়ছেন, কোথাও শব্দ নেই। ছাত্রাবাস গুলো ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছাকাছি : ঢাকা হল, জগন্নাথ হল, সলিমুল্লা হল। প্রতিটি হল থেকে একটি করে বার্ষিকী প্রকাশিত হতো ছাত্র এবং অধ্যাপকদের রচনায় সমৃদ্ধ হয়ে। আমি সে-সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র. যে-সময় কৃতী অধ্যাপকের সংখ্যা অনেক। কলা বিভাগে ছিলেন মোহিতলাল মজুমদার, মহম্মদ শহীদুল্লাহ, প্রফুল্ল কুমার গুহ, সুশীল কুমার দে প্রভৃতি। বিজ্ঞান বিভাগে স্বনামধন্য জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ এবং অধ্যাপক সত্যেন বসু। আরো যাঁরা তরুণ অধ্যাপক তাঁদের মধ্যে অমলেন্দু বসু, আশুতোষ ভট্টাচার্য, জসীম উদ্দীন, অমিয় কুমার দাশগুপ্ত, পরিমল রায়। হরিদাস ভট্টাচার্য, নলিনীকান্ত ভট্টশালী, দেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তখন বিভিন্ন শাস্ত্রের বিভাগীয় প্রধান। এঁদের মধ্যে অধিকাংশই পরবর্তীকালে উচ্চতর পদমর্যাদায় ভূষিত হয়েছিলেন।

তিরিশের শেষাশেষি বামপন্থী রাজনীতির ঢেউ এসে লাগল ঢাকা শহরে। তার প্রভাব দেখা দিল সাহিত্যেও। একদল তরুণ লেখকের উদ্যোগে স্থাপিত হলো 'প্রগতি লেখক সঙ্ঘ'। ১৯৩৯ থেকে ১৯৪৯ পর্যন্ত একটানা দশ বছর এই সঙ্ঘের কর্মোদ্যোগ ব্যাপকতা লাভ করেছিল। ১৯২৮-২৯ সনে ঢাকায় আধুনিক সাহিত্য আন্দোলন ছিল প্রধানত বুদ্ধদেব বসু ও অজিত দত্ত সম্পাদিত 'প্রগতি' মাসিক পত্রকে অবলম্বন করে। 'প্রগতি'র লেখক গোষ্ঠী রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের প্রভাব এড়িয়ে ভিন্নতর দৃষ্টিকোণ থেকে আধুনিক সাহিত্য সৃষ্টিতে উৎসাহী হলেও এই গোষ্ঠীর কোনো লেখকই রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন সাহিত্য আন্দোলনের সামিল হননি। 'প্রগতি'র লেখকরা ছিলেন মোটামুটিভাবে বিশুদ্ধ শিল্পের সমর্থক, বুদ্ধদেব বসু, জীবনানন্দ দাশ, অজিত দত্ত প্রমুখের তৎকালীন রচনায় যার নিদর্শন। বুদ্ধদেব বসু, অজিত দত্ত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, জীবনানন্দ লেখা পাঠাতেন বরিশাল থেকে।

ঢাকায় প্রগতি লেখক সঙ্ঘের সূচনাকাল থেকেই তরুণতর লেখকদের সাহিত্য সৃষ্টিতেও নতুন স্বাক্ষর। এই সঙ্ঘের লেখকদের অনেকেই তখন মার্কসবাদে বিশ্বাসী। মার্কসবাদে তেমন অভিজ্ঞ নন এমন লেখকও বেশ কিছু যোগ দিয়েছিলেন এই সঙ্ঘের মানবিক, বিপ্লবী ও কল্যাণকর আদর্শকে অনুধাবন করে। সপ্তাহে একবার সাহিত্যসভার আয়োজন হতো। একএক বার একএক সভ্যের বাড়িতে। কখনো নারিন্দায়, কখনো দক্ষিণ মৈশুণ্ডী, কখনো কোর্ট হাউস স্ট্রীট, পাটুয়াটুলী, সূত্রাপুর কিংবা গেণ্ডারিয়ায়। সভায় অনেক তরুণ নতুন মুখ দেখা যেত; পরবর্তীকালে এদেরই অনেকে প্রগতি লেখক সঙ্ঘের এবং সেই সঙ্গে মার্কবাদী আন্দোলনেরও উৎসাহী কর্মী। সন্ত্রাসবাদী স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এমন অনেক কর্মী এই সময়েই ঢাকায় কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিয়েছিলেন।

ঢাকায় প্রগতি লেখক সঙ্ঘের প্রথম সম্পাদক রণেশ কুমার দাশগুপ্তর সঙ্গে একই পাড়ায় বাস করতাম। ইনি তখন ঢাকা থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক 'সোনার বাঙলা' পত্রিকায় কাজ করতেন। মার্কসবাদী সাহিত্য সম্পর্কে তখনই তাঁর প্রচুর পড়াশোনা ছিল এবং আমরাও তাঁর কাছ থেকে বইপত্র এনে পড়তাম। এখন যেমন সর্বত্র প্রগতিশীল বইপত্র পাওয়া যায় এবং কিনেও পড়া যায় তখন এ-রকম সুযোগ ছিল না। কমিউনিস্ট পার্টি তখন পর্যন্ত বেআইনী এবং যে-কোনো সময়ে যে-কোনো অজুহাতে গ্রেপ্তার হবার সম্ভাবনাও বড়ো অল্প ছিল না। নতুন লেখকদের আকর্ষণ করার ক্ষমতা থাকায় রণেশবাবু তরুণ লেখকদের মধ্যে জনপ্রিয় হয়েছিলেন। পাকিস্তান হবার পরেও তিনি ঢাকায় থেকে যান এবং 'সংবাদ' পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগে কাজ করছিলেন। এখন তাঁর অবস্থা কী হয়েছে জানি না। ১৯৩৯ সনে কলকাতা থেকে 'প্রগতি লেখক সঙ্ঘে'র উদ্যোগে 'প্রগতি' নামের সঙ্কলন গ্রন্থ সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী ও হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছিল। রণেশবাবু প্রস্তাব করলেন ঐ ধরনের একটি সঙ্কলন যেন আমরা ঢাকা থেকে প্রকাশ করি। আরো স্থির হলো যে ঢাকা জিলা 'প্রগতি লেখক সঙ্ঘে'র লেখকরাই শুধু ঐ সঙ্কলনে লিখবেন। তদনুযায়ী ১৯৪০ সালে বেরুলো 'ক্রান্তি' নামের ১৬০ পাতার একটি সঙ্কলন। লেখক সূচির অন্যতম ছিলেন রণেশ কুমার দাশগুপ্ত, সোমেন চন্দ, অচ্যুত গোস্বামী, কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, সরলানন্দ সেন এবং আরো কেউ কেউ। প্রগতিশীল চিন্তাধারার পরিপোষক এরূপ একটি সাহিত্য সঙ্কলন প্রকাশিত

হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বেশ সাড়া পড়ে যায় এবং কলকাতার লেখক সমাজও এই লেখক গোষ্ঠীকে স্বাগত জানান। ঢাকা 'প্রগতি লেখক সঙ্ঘে'র পক্ষ থেকে সোমেন চন্দ এই গ্রন্থের প্রকাশক হয়েছিলেন। তাঁর অন্যতম বিখ্যাত গল্প 'বনস্পতি' এই সঙ্কলনেই প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। এই সঙ্কলনটি বেরুবার সঙ্গে সঙ্গেই বেশ কয়েকজন নতুন লেখককে আমরা সঙ্গী হিসেবে পেয়েছিলাম। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য জীবন চক্রবর্তী ও রণেন মজুমদার। এঁরা দু-জনেই দু-চারটি গল্প রচনায় অসামান্য ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছিলেন। জীবন চক্রবর্তী দেশ বিভাগের কিছু আগে বিমানে বর্মা যাবার পথে বিমান দুর্ঘটনায় নিহত হন। রণেন মজুমদার ঠিক ঐ সময়েই কলকাতায় চলে আসেন এবং বস্তীতে বসবাস করতে শুরু করেন শ্রমজীবী জনসাধারণের জীবন সংগ্রাম সম্পর্কে খুঁটিনাটি জানবার আশায়। সম্ভ্রান্ত পরিবারের সুশিক্ষিত এই যুবক আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক না রেখে দারিদ্র্য ও ক্ষুধার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে গিয়েছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত মৃত্যুবরণও করেছিলেন। মার্কসবাদে বিশ্বাসী চিন্তার জগতে পরিশুদ্ধ এই যুবক যেন দিশেহারা হয়ে পড়েছিলেন ; তাঁর এ-ধরনের মৃত্যুবরণের তাৎপর্য তাঁর বন্ধুদের অনেকেই হৃদয়ঙ্গম করতে পারেননি।

'ক্রান্তি' সঙ্কলন প্রকাশের পর থেকেই ঢাকা 'প্রগতি লেখক সঙ্ঘে'র আসর জমজমাট হয়ে উঠেছিল। এই সময় থেকে তরুণ মুসলমান লেখকরাও কেউ কেউ যাতায়াত শুরু করেন। ১৯৪১ সনের জুন মাসে সোভিয়েত ইউনিয়ন হিটলার বাহিনী কর্তৃক আক্রান্ত হবার পরে 'প্রগতি লেখক সঙ্ঘ' 'ফ্যাসিস্ত বিরোধী লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘে' রূপান্তরিত হলে ঢাকা 'প্রগতি লেখক সঙ্ঘে'র উদ্যোগে ঢাকায় 'সোভিয়েত সুহৃদ সমিতি' সংগঠিত হয়। এই সমিতির সম্পাদক ছিলেন বর্তমান প্রবন্ধকার এবং দেবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েরই একজন কৃতি ছাত্র। ঐ বছরেই ডিসেম্বর মাসে ঢাকা ব্যাপটিস্ট মিশন হলে এক সপ্তাহব্যাপী সোভিয়েত চিত্র প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়েছিল। দৈনিক প্রায় তিন হাজার নরনারী ঐ চিত্র-প্রদর্শনী দেখতে আসতেন। সোভিয়েত সুহৃদ সমিতির উদ্যোগেই ১৯৪২ সনের মার্চ মাসে ঢাকায় ফ্যাসিবিরোধী সম্মেলনের আলোচনা করা হয়। কলকাতার বিশিষ্ট লেখক, বুদ্ধিজীবী ও ট্রেডইউনিয়ন নেতৃবৃন্দও আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। ১৯৪২ সনের ৮ই মার্চ ঢাকায় সূত্রাপুর এলাকায় এই সম্মেলন যেদিন শুরু হলো সেদিনই ঘটলো আমাদের প্রিয়তম সুহৃদ ও তরুণ লেখক সোমেন চন্দের হত্যাকাণ্ড। এইসময় ঢাকা ই. বি.

রেলওয়ে ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সম্পাদকরূপে কাজ করছিলেন। বিকেল তিনটে নাগাদ শ্রমিকদের একটি ছোট মিছিল নিয়ে তিনি যখন সূত্রাপুরে পৌছন তখনই রাস্তার ওপরে কমিউনিস্ট বিরোধী রাজনৈতিক দলের লোকদের দ্বারা আক্রান্ত হন। সোমেন শোভাযাত্রার পুরোভাগে ছিলেন সুতরাং একটি আঘাতও লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়নি। যেভাবে সোমেনকে হত্যা করা হয় তা নৃশংস, এখনকার অনেক রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডের তুলনায়ও তা নৃশংস। সোমেনের হত্যাকাণ্ড তৎকালীন বিধানসভায় তুমুল আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল এবং বাঙলাদেশের প্রায় সমস্ত লেখকই এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ ও ঘৃণা প্রকাশ করেছিলেন। সোমেনের মৃত্যু মাত্র একুশ বছর বয়সে। তাঁর মৃত্যুর ঠিক পরেই সুধীন্দ্রনাথ দত্ত সম্পাদিত 'পরিচয়' পত্রিকায় প্রকাশিত হলো তাঁর 'ইঁদুর' গল্পটি। এই গল্পটি পড়েই বাঙলাদেশের লেখক ও পাঠক সমাজ উপলব্ধি করতে পারলেন এই তরুণের কলমে কতো সুদূরপ্রসারী প্রতিভার সম্ভাবনা ছিল। ধূর্জটি প্রসাদ, অন্নদাশঙ্কর, বুদ্ধদেব বসু, অমিয় চক্রবর্তী, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ লেখকও বুদ্ধিজীবী এই তরুণ লেখকের অকালমৃত্যুকে স্মরণ করে সেদিন নিঃসঙ্কোচে তাঁদের শ্রদ্ধা নিবেদন করেছিলেন।

সোমেন চন্দের সংগ্রামী জীবনের শুরু তাঁর শৈশব থেকেই। পিতা সামান্য বেতনের সরকারী কর্মচারী হওয়ায় তখনকার শস্তা জিনিষপত্রের যুগেও ক্রমবর্ধমান অভাব অনটনের সঙ্গে সোমেনকে মোকাবেলা করতে হয়েছিল। ১৯৩৮-৪১ সনে যখন কমিউনিস্ট পার্টি বেআইনী তখন পার্টির অনেক সক্রিয় কর্মী সোমেনের দক্ষিণ মৈশুণ্ডীর ভাড়া-বাড়িতে আত্মগোপন করে থাকতেন। প্রায়ই একজন-না-একজন রাতের দিকে আসতেন; এঁদের খাবার সংগ্রহ করাও এক সমস্যা হতো। বন্ধুদের কাছ থেকে ধার করে সোমেনকে কর্মীদের আহারের ব্যবস্থা করতে দেখেছি। সোমেন অবশ্য এ-ব্যাপারে তাঁর মাকে পেয়েছিলেন সঙ্গে এবং বিস্তর অভাব থাকলেও যে কোনো সময়ে কর্মীদের জন্যে যথাসম্ভব ব্যবস্থা করতে সোমেন-জননী কখনো ক্লান্তি বোধ করেননি। সোমেনের অকাল মৃত্যুর পর প্রতিরোধ পাবলিশার্স থেকে ১৯৪৩এ প্রকাশিত হলো তাঁর প্রথম গল্পগ্রন্থ 'সঙ্কেত'। কিছুকাল পরে দ্বিতীয় গ্রন্থ 'বনস্পতি' বার করলেন শরৎ দাস—কলকাতার মডার্ন পাবলিশার্স থেকে। এই গ্রন্থের ভূমিকা লিখে দিয়েছিলেন গোপাল হালদার।

সোমেনের মৃত্যুর সময় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পুরোদমে চলছে। মনে পড়ে

সোমেনের শবদেহ যখন মহাশ্মশানে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল তখন আরো অনেকের সঙ্গে সঙ্গী হয়েছিলেন বঙ্কিম মুখোপাধ্যায় ও জ্যোতি বসু। জ্যোতি বসু শ্মশানে আমার পাশেই স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন, আর তাঁর পাশেই চিরকালের বিপ্লবী, ঢাকার রণেশ দাশগুপ্ত। শ্মশানযাত্রীদের মধ্যেই কে একজন যেন ছুরির ফলা দিয়ে দেয়ালে লিখেছিলেন : 'সোমেন চন্দ : আমাদের প্রিয় সংগ্রামী লেখক'। তখন যুদ্ধের দরুন ব্ল্যাক আউট চলছে, ঢাকা শহরের রাস্তাগুলো অন্ধকার, অন্ধকার নীলিমায় নক্ষত্রের মালা। সোমেনের শেষকৃত্য সমাধা হবার পর সবাই ফিরে এলেন জীর্ণতা ও প্রতিক্রিয়াশীলতার বিরুদ্ধে সংগ্রামের অধিকতর দৃঢ়তা ও প্রত্যয় নিয়ে।

জীর্ণতা ও প্রতিক্রিয়াশীলতার বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্যে একটি সাহিত্যপত্র প্রকাশের ব্যাপারে আমরা সক্রিয় হয়েছিলাম। অল্পকালের মধ্যেই 'প্রতিরোধ' নাম দিয়ে একটি পাক্ষিকপত্র প্রকাশিত হলো ঢাকা কোর্ট হাউস স্ট্রীট থেকে। তৎকালীন জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের এজলাস এবং কোর্ট কাছারির পেছনের এই গলিটাতে 'প্রতিরোধ' পত্রিকার খুব কাছেই ছিল ঢাকা জিলা কমিউনিস্ট পার্টিরও সদর কার্যালয়। পার্টির ওপর থেকে বিধিনিষেধ প্রত্যাহৃত হওয়ায় কার্যালয় এ-সময় কর্মচঞ্চল হয়ে উঠেছিল। একসময় খবর পেলাম আন্দামান প্রত্যাগত সদ্যমুক্ত রাজবন্দীরা প্রায় সকলেই এসে উঠেছেন পার্টি-কার্যালয়ে। শুনেই গেলাম। এই প্রথম এতো বেশি সংখ্যক বিপ্লবীদের একসঙ্গে দেখার সুযোগ পেলাম। মনে পড়ে তাঁদের মধ্যে ছিলেন বিপ্লবী লালমোহন সেন যিনি কিছুকাল পরেই নোয়াখালি জেলার সন্দীপে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিরুদ্ধে শান্তি ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে মৃত্যুবরণ করেছিলেন। বিপ্লবী লাল-মোহনের অসামান্য আত্মত্যাগের উদ্দেশ্যে নিবেদিত দুটি কবিতা লিখেছিলেন একালের দুজন বিশিষ্ট কবি, অমিয় চক্রবর্তী ও বিষ্ণু দে। অনেক কাব্যপাঠকই হয়তো সে-কবিতা দুটি পড়েছেন।

১৯৪২ থেকে ১৯৪৫ পর্যন্ত 'প্রতিরোধ' পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল। প্রথম দুবছর সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্ররূপে এবং পরবর্তীকালে ত্রৈমাসিক আকারে। প্রথম দুবছর বাঙলাদেশের অনেক সুপরিচিত লেখকের রচনাবলী প্রতিরোধ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। কবিদের মধ্যে ছিলেন জীবনানন্দ দাশ, বুদ্ধদেব বসু, অমিয় চক্রবর্তী, অন্নদাশঙ্কর রায়, বিষ্ণু দে, বিমলচন্দ্র ঘোষ, অরুণ মিত্র, কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ এবং প্রবন্ধ ও গল্প লেখকদের অন্যতম

ছিলেন গোপাল হালদার, বিনয় ঘোষ, সন্তোষকুমার ঘোষ, নবেন্দু ঘোষ, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। মনে পড়ছে সে সময় পত্রিকাটি যাতে কিছুকাল অন্তত প্রকাশিত হতে পারে তারজন্যে সাহায্য করেছিলেন 'ভারতীয় চা' কোম্পানীর তৎকালীন কর্মকর্তা প্রভু গুহঠাকুরতা। 'প্রতিরোধ' যখন প্রকাশিত হয়েছে তখন শুরু হলো আগস্ট আন্দোলন এবং তারপরেই শুরু হলো সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। আমি এবং অচ্যুত গোস্বামী পত্রিকার যুগ্ম সম্পাদক ছিলাম এবং রচনা সংগ্রহ ও নির্বাচন করতাম। কিন্তু পত্রিকার সম্পাদকীয় প্রতি সংখ্যার জন্যে লিখে দিতেন রণেশ দাশগুপ্ত। দাঙ্গার সময় পাড়ায় পাড়ায় শান্তি কমিটি করে পাহারা দেবার দায়িত্ব আমার এবং আরো অনেক লেখকেরই তখন নিতে হয়েছিল। ১৩৫০এর মন্বন্তর শুরু হবার পরেই সারা বাঙলাদেশের জনগণের সঙ্গে আমরাও অভূতপূর্ব দুর্যোগের মুখোমুখি হয়েছিলাম। চাল, তেল, নুন যেমন পাওয়া যায় না তেমনই দুষ্প্রাপ্য মুদ্রণের কাগজ। 'প্রতিরোধ' পত্রিকার প্রকাশ অনিয়মিত হয়ে পড়ল। শেষের দিকে মিলের কাগজের অভাবে দেশী তুলোট কাগজেও দু-তিনটি সংখ্যা ছাপা হয়েছিল। এই সময় প্রতিরোধ পাবলিশার্স নাম দিয়ে ঢাকায় জি. ঘোষ লেনে একটি পুস্তক প্রকাশক ও বিপনন কেন্দ্রও খোলা হয়। দেশী-বিদেশী প্রগতিশীল বই ও পত্র-পত্রিকা ছাড়াও ঢাকার লেখকদের কিছু কিছু বই ও পুস্তিকা প্রতিরোধ পাবলিশার্স-এর তরফ থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। উল্লেখ্য এই ধরনের বইয়ের অন্যতম ছিল অনিল মুখার্জীর 'সাম্যবাদের ভূমিকা', সরলানন্দ সেনের 'মাও সে তুং' এবং সোমেন চন্দের 'সংকেত ও অন্যান্য গল্প'। এছাড়া সোমেনের স্মৃতিতে ঢাকা কোর্ট হাউস স্ট্রীটে সোমেন পাঠাগার নাম দিয়ে একটি নতুন পাঠাগারও স্থাপিত হয়েছিল। জি. ঘোষের গলিতে একটি ত্রিতল বাড়ির একতলায় ছিল প্রতিরোধ পাবলিশার্স, দোতালায় ঢাকা প্রগতি লেখক সংঘের ঘর যেখানে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও সাহিত্যসভা অনুষ্ঠিত হতো। ঐ সময় ঢাকার লেখকদের উদ্যোগে বেশ কিছু সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। বিভিন্ন সময়ে যাঁরা কলকাতা থেকে এইসব অনুষ্ঠানে যোগ দিতে ঢাকায় এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, বিনয় রায়, বিনয় ঘোষ, গোপাল হালদারের নাম মনে পড়ছে। এক সময় ঢাকা শহরের ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী ও অধ্যাপকের 'প্রগতি লেখক সঙ্ঘে'র তরুণ লেখকদের সঙ্গে যোগাযোগ ঘটেছিল। এঁদের মধ্যে

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পরিমল রায়, অমিয়কুমার দাশগুপ্ত, পৃথ্বীশ চক্রবর্তীর নাম উল্লেখ্য। শহীদুল্লাহ্ এবং কাজী মোতাহার হোসেনের উৎসাহ থেকেও 'প্রগতি লেখক সঙ্ঘ' বঞ্চিত হয়নি। এক সময় পুরনো পল্টনের একটি বাড়িতে প্রগতি লেখকদের উদ্যোগে একটি সাহিত্যের আলোচনাচক্রে সভাপতিত্ব করেছিলেন প্রফেসর সত্যেন্দ্রনাথ বসু। সংস্কৃতি কেন্দ্র ঢাকা শহরে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সমাজের এই সক্রিয় ভূমিকা পাকিস্তান হবার পরে আরো ব্যাপকতা লাভ করেছিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলি ছিল ছাত্র সমাজের সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকর্মের ক্ষেত্র। ছাত্রজীবনে আড্ডার মৌতাত সেখানে অনেকের মতো আমিও উপভোগ করেছিলাম। কার্জন হলে হতো বিশ্ববিদ্যালয়-এর নানা অনুষ্ঠান। প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্রদের বাৎসরিক প্রীতি-সম্মেলন ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম আকর্ষণ।

'প্রতিরোধ' প্রকাশিত হবার পর থেকেই ঢাকার তরুণ মুসলমান লেখকদের সঙ্গে যোগাযোগ হলো। এঁদের প্রায় সকলেই ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র। 'প্রগতি লেখক সঙ্ঘে'র বৈঠকে অনেকেই নিয়মিত আসতেন, রচনাদি পাঠ করতেন এবং নানা আলোচনায় অংশ নিতেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন সর্দার ফজলুল করিম, মুনীর চৌধুরী, সানাউল হক ; ছিলেন সৈয়দ নুরুদ্দিন, আহমদুল কবীর ও খায়রুল কবীর ভ্রাতৃদ্বয়। খায়রুল ছিলেন 'আজাদ' পত্রিকার বার্তা-সম্পাদক। পরে ঢাকা থেকে প্রকাশিত 'সংবাদ' দৈনিকের সম্পাদক। সর্দার ফজলুল করিম পাকিস্তান হবার পরেও বেআইনী কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য ছিলেন এবং কারাবরণও করেছিলেন। সানাউল হক পূর্ববাঙলার কবি সম্প্রদায়ের অন্যতম এবং বর্তমানে পাকিস্তান অ্যাডমিনেস্ট্রেটিভ সার্ভিসের দায়িত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত। মুনীর চৌধুরী অধ্যাপক এবং সম্প্রতিকালে বাঙলা সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ে গবেষণামূলক প্রবন্ধাদিও লিখেছেন বাঙলা আকাদমির মুখপত্রে এবং অন্যত্র। সৈয়দ নুরুদ্দিন কবিতা লিখতেন 'প্রতিরোধ' পত্রিকায়। আজাদ পত্রিকার বার্তা-সম্পাদক ছিলেন, পরে 'সংবাদ' পত্রিকার বার্তা সম্পাদক হয়েছিলেন। এছাড়াও প্রগতি লেখক সঙ্ঘের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন আবদুল মতিন চৌধুরী, আলমুতি শরাফউদ্দিন, আলাউদ্দিন আল আজাদ এবং উপন্যাসিক আবু জাফর সামসুদ্দিন। সৈয়দ আলী আহ্‌সান এবং তাঁর ভাই আলী আশরাফ উভয়েই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। আলী আহ্‌সান কবি হিসেবে এখন সুপরিচিত এবং বাঙলা আকাদমি ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গেও

কিছুকাল পূর্বেও সংশ্লিষ্ট ছিলেন। আলী আশরফও এখন বাঙলাদেশের বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে অন্যতম। পাকিস্তান হবার পরে আমার পরিচিত যেসব অধ্যাপক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনায় নিযুক্ত হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে মুজাফর আমেদ চৌধুরী, অজিত গুহ, জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা অন্যতম। অজিত গুহ 'প্রগতি লেখক সঙ্ঘে'র সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ছিলেন এবং তাঁর ও আমার সম্পাদনায় ১৯৪৭ সনে পাকিস্তান হবার পরে 'ক্রান্তি' সঙ্কলন গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয়েছিল। ইনি গতবছর পাকিস্তানেই কুমিল্লায় তাঁর বাসভবনে হৃদরোগে হঠাৎ মারা যান। অধ্যাপক জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতার মৃত্যু হলো বড়ো সাংঘাতিক। ইয়াহিয়ার বেতনভুক পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্যরা এই বছরের মার্চ মাসের শেষ সপ্তাহে গভীর রাত্রে যখন মেশিনগান নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী ও অধ্যাপকদের হত্যা করতে শুরু করেছিল তখন শহীদ হলেন এই অধ্যাপক। জানতে পারলাম ঐ কালরাত্রে শহীদ হয়েছেন কবীর চৌধুরীও। আরো একজনকে মনে পড়ছে। ইনি সারওয়ার মুরশেদ। সারওয়ার মুরশেদের সঙ্গে আলাপ ছিল। অমিয় চক্রবর্তী (বর্তমানে যাদবপুর বিজয়গড় কলেজের প্রধান) যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করছিলেন তখন ১৯৪৯ সনে তাঁর ও মুরশেদের যৌথ সম্পাদনায় ঢাকা থেকে 'নিউ ভ্যালুস' (New Values) নামের একটি ইংরেজি মাসিকপত্র প্রকাশিত হয়েছিল। এই কাগজের প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গী তরুণ সমাজকে আকর্ষণ করেছিল। কবীর চৌধুরী ছিলেন মুনীর চৌধুরীর ভাই এবং তিনি খুব সম্প্রতি ঢাকার বাঙলা আকাদমির প্রধান হয়েছিলেন।

'প্রতিরোধ' পত্রিকা প্রকাশের সময় থেকে সত্যেন সেন সাংস্কৃতিক আন্দোলনের পুরোভাগে। বস্তুত ঢাকায় রণেশ দাশগুপ্ত ও সত্যেন সেনের নাম একই সঙ্গে উচ্চারিত হতে দেখেছি। কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন বলে তাঁকে কয়েকবার কারাবরণ করতে হয়েছে। তাঁকে প্রায়ই গোপন ভাবেও থাকতে হতো। যে কজন হিন্দু সাংবাদিক ও লেখক পাকিস্তান হবার পরেও পূর্ববঙ্গে থেকে যান এবং তরুণ মুসলমান লেখকদের সহায়তায় প্রগতিশীল ভাবধারা প্রচারে যত্নবান ছিলেন রণেশ দাশগুপ্ত এবং সত্যেন সেন তাদের অন্যতম। জানতে পেরেছি কিছুকাল আগে উল্লেখযোগ্য উপন্যাস লেখক হিসেবে সত্যেন সেন আদমজী সাহিত্য পুরস্কার লাভ করেছিলেন। এখন তাঁর কী অবস্থা জানতে পারা যায়নি। এইসঙ্গে মনে পড়ছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের

বাঙলা বিভাগের অধ্যাপক আহম্মদ শরিফের কথা। ইনিও সাহিত্যকর্মের জন্যে আদমজী পুরস্কার পেয়েছিলেন। খবর পেলাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পাকিস্তানী ফৌজ যে নারকীয় হত্যাকাণ্ড চালায় তাতে ইনিও গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা গিয়েছেন।

১৯৫২ সনের ভাষা আন্দোলনের পর থেকেই পূর্ববঙ্গে সাংস্কৃতিক জগতে নবজাগরণের শুরু, বাঙলাদেশ ও বাঙলা ভাষার প্রতি বাঙালি মুসলমান বুদ্ধিজীবী ও লেখকদের ক্রমবর্ধমান আকর্ষণ এসময় লক্ষণীয়। পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী শুরু থেকেই বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের কণ্ঠরোধের যে গভীর ষড়যন্ত্র করেন তা বিফলে যায়। পূর্ববঙ্গের সাম্প্রতিককালের এই অধ্যায়ের সঙ্গে এপার বাঙলার পাঠকসমাজ সুপরিচিত। বদরুদ্দীন উমর-এর 'মুসলমানদের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন' প্রবন্ধটি সাম্প্রতিককালে বাঙলাদেশে আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল এ-তথ্য এখানকার অনেক পাঠকেরই অজানা নয়। পাকিস্তান হবার পর থেকেই সেখানকার অবাঙালি শাসকদের চেষ্টা হয়েছিল বাঙলা ভাষার প্রভাবকে খর্ব করা। ভাষাই জাতির প্রাণ ; সুতরাং ভাষাকে খর্ব করতে পারলে, পূর্ববঙ্গের বাঙালি মুসলমানকেও আয়ত্বে-রাখা সম্ভবপর হবে। বাঙলাদেশ ও বাঙলা সংস্কৃতিকে সামনে রেখে নয়, আরব-ইরাণ-তুর্কী জগৎকে কেন্দ্র করে বাঙালি মুসলমানের সাহিত্যচিন্তা ঘুরপাক খেতে থাকবে এ-রকম একটা ফতোয়া যেন অলিখিতভাবে জারি করা হয়েছিল। বলা বাহুল্য, অন্তত কিছুকালের জন্যে বাঙালি মুসলমান লেখক সমাজের একাংশ এই চিন্তাধারায় আচ্ছন্নও হয়েছিলেন। কিন্তু ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন পূর্ববঙ্গের মধ্যবিত্ত মুসলমান সমাজকে ফিরিয়ে নিয়ে এলো স্বদেশ ও সমাজের বুকের কাছে ; বাঙলাদেশের তরুণ চিন্তাবিদ লেখক ও শিল্পীরা বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের মাধ্যমে স্বদেশ জননীর কাছে পরিপূর্ণভাবে আত্মনিবেদন করলেন, সম্ভব হলো স্বদেশ প্রত্যাবর্তন। তারপর গত কয়েক বছরের সাহিত্য চিন্তায় পরিপূর্ণরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে পূর্ববঙ্গের মুসলমান বাঙালির নবজাগরণ এবং এই মুহূর্তে লক্ষ লক্ষ প্রাণ আহুতি দিয়েও রক্তচক্ষু শিশুঘাতী নারীঘাতী দানবের সঙ্গে সংগ্রামের জন্যে ঘরে ঘরে চলেছে বাঙালি মুসলমানের নিরবচ্ছিন্ন প্রস্তুতি।

বাঙলা দেশ জ্বলছে, জ্বলেছে ঢাকা শহর। কিন্তু ঢাকা শহরের যে বৈপ্লবিক ইতিহাস ও প্রগতিশীল চিন্তাধারা একদা গড়ে উঠেছিল তার উত্তরাধিকার বাঙলা দেশের জনগণকে, তার সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে আবার বাঁচিয়ে তুলবে এ বিষয়ে সন্দেহ করবার কিছু নেই ; বরং একথা প্রবল প্রত্যয়ের সঙ্গে উচ্চারিত হবার যোগ্য।

ইতিহাস লেখার সমস্যা

মমতাজুর রহমান তরফদার

সম্প্রতি আমাদের দেশে সামাজিক ইতিহাস রচনার জন্য যথেষ্ট আগ্রহের সৃষ্টি হয়েছে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যে, এই আগ্রহ রাজনৈতিক ইতিহাস রচনার গতানুগতিকতার বিরুদ্ধে এক প্রতিক্রিয়াশীল মানসিকতার পরিচায়ক। সামাজিক ইতিহাসের সমস্যা সম্বন্ধে এবং এই জাতীয় ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে গবেষকের যে-সকল মৌলিক অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়, তাদের সম্বন্ধে, আমাদের চেতনা কতটা প্রখর, সে কথা বুঝতে পারা যায় না; কেননা আমাদের দেশের পণ্ডিতগণ আজ পর্যন্ত এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনার সূত্রপাত করেন নি। প্রাচীন যুগ, মধ্য যুগ ও বর্তমান যুগ—কাল-বিভাজনের এই কাঠামো ইয়োরোপের ইতিহাস থেকে ধার করা। এই কালবিভাগ ইয়োরোপের ইতিহাসে বিশেষ অর্থ বহন করে এবং এই ধরনের কালবিভাগ ইয়োরোপীয় অর্থে এদেশের ইতিহাসের প্রতি আদৌ প্রযোজ্য কিনা, সে সম্বন্ধে এদেশের কোন পণ্ডিতের লেখা সচরাচর চোখে পড়ে না। এ-সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য আলোচনা পাওয়া যায় ম্যাক্‌স ওয়েবার ও ভ্যান লিউর কর্তৃক লিখিত গ্রন্থাবলীতে; কিন্তু এই লেখাগুলোয় অর্থনীতি ও সমাজতত্ত্বের প্রতি অত্যধিক গুরুত্ব আরোপিত বলে কাল-বিভাজনের ধারণাও উক্ত গুরুত্বের প্রভাবে বিশেষভাবে ভারাক্রান্ত। এইজন্য ঐ কাল-বিভাজনের রূপ-রেখা সীমিতশক্তি ঐতিহাসিকদের কাছে অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য। কালবিভাগের সমস্যা ছাড়া আরো কতকগুলো বাস্তব সমস্যা মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকে। এদের মধ্যে একটি হচ্ছে মাল-মশলার দুষ্প্রাপ্যতা এবং অপরটি একটি বিশেষ ধারণার প্রতি আমাদের আত্যন্তিক মোহ। আমরা অতি সহজেই বিশ্বাস করি যে, এই উপ-মহাদেশে শত শত বৎসরেও বিশেষ কোন পরিবর্তন ঘটেনি।

রোমের পতন, সামন্ততন্ত্রের উদ্ভব ও তার ফলে ইয়োরোপীয় সমাজ-জীবনের মৌলিক পরিবর্তন, কনস্ট্যান্টিনোপলের পতন, রিনেসাঁস, শিল্প-বিপ্লব এই ধরনের কোন ঘটনা পাক-ভারত উপ-মহাদেশে সংঘটিত হয়নি বলে পূর্বোক্ত কালবিভাগে এদেশের ইতিহাসকে চিহ্নিত করতে যাওয়া বিপজ্জনক। তবু ঐতিহাসিককে অনন্তকালের বুকে কোথাও না কোথাও নির্দিষ্ট ছেদ টানতে

হয় এবং স্পষ্টভাবে একটি সীমারেখা অঙ্কিত করতে হয়। এই সীমারেখা অনেক ক্ষেত্রে সুবিধার খাতিরে অঙ্কিত এবং এটি কোন দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীরের মতো শক্তিশালী নয়। এর এপারে ওপারে যে সমাজ, রাষ্ট্র ও সংস্কৃতি বর্তমান, তাদের মধ্যে একটু-আধটু সাদৃশ্য দেখে বিস্মিত হবার কোন কারণ নেই। প্রশ্ন হচ্ছে— এই ছেদবিন্দু বা সীমারেখার অবলম্বন কি? অর্থনীতি, রাজনীতি, সমাজ ব্যবস্থা ও সংস্কৃতির প্রতি আরোপিত গুরুত্বর তারতম্য অনুযায়ী এই প্রশ্নের বিভিন্ন রকমের উত্তর হতে পারে।

তথাকথিত প্রাচীন যুগ ও মধ্যযুগের ইতিহাস সম্বন্ধে আমাদের দেশে অল্পবিস্তর আলোচনা হয়েছে। বর্তমান লেখক নিজেও তথাকথিত মধ্যযুগের সীমাবদ্ধ ও অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ কোন একটি এলাকায় বিচরণ করে থাকেন। কাজেই এই মধ্যযুগ সম্বন্ধে পূর্বোক্ত বিষয়টি নিয়ে কিছু আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হবে না বলেই মনে করি। প্রাক-মুসলিম আরব সমাজ-জীবনে ধর্মের প্রভাব ছিল অত্যন্ত প্রবল এবং মুসলিম শাসনকালেও ধর্ম তার নিজস্ব পথে অগ্রসর হয়েছে। তবু একটি বৈশিষ্ট্য এখানে অত্যন্ত স্পষ্ট এবং ধর্মের প্রতি মানুষের দৃষ্টিভঙ্গির তারতম্য এক্ষেত্রে সীমা নির্দেশের কাজ করছে বলে মনে হয়। সুদীর্ঘ কাল ধরে সাহিত্য ও শিল্পের বিভিন্ন শাখা ধর্মের ছোপ গায়ে লাগিয়ে বিকশিত হয়ে ওঠে এবং এই ধর্মও আবার মানুষের বৈষয়িক ও আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার ছোঁয়া পেয়ে যুগে যুগে জটিল রূপ ধারণ করেছে। হিন্দুধর্ম, বৌদ্ধধর্ম, জৈনধর্মকে বাদ দিয়ে কি কথনো ইলোরার ভাস্কর্য ও অজন্তার চিত্রকলার কথা কল্পনা করা যায়? হিন্দু পুরাণের আবহ থেকে যদি কালিদাসের কাব্যিক পরিমণ্ডলকে দূরে সরিয়ে নিতে চেষ্টা করা যায়, তবে সেই চেষ্টা কি সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হবে না? একথা ঠিক ধর্মীয় প্রবণতার সঙ্গে ঐযুগের ঐহিক বা যথার্থ মানবীয় মানসিকতা মিশ্রিত হয়ে গেছে। উর্বশী পুরুরবার (প্রেমকাহিনীর মনস্তত্ত্ব হয়ত বা মানবীয়। কিন্তু এখানে প্রেমিক-প্রেমিকার মধ্যে একজনের প্রতি স্বর্গীয় সত্তা আরোপিত না করে কাহিনীটি লিখতে পারা যায়নি। মেঘদূতের বিরহী যক্ষ ও যক্ষপত্নীর স্থানে কালিদাস যদি মানব-মানবীকে প্রতিষ্ঠিত করতেন তা হলে যথেষ্ট শিল্পজ্ঞানের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও কাব্যটি সমকালীন পাঠক সমাজে সমাদর পেত কিনা এবং যুগের চাহিদাকে অগ্রাহ্য করে কবি ঐ ধরনের দুঃসাহসিকতার কাজে আদৌ অগ্রসর হতে পারতেন কিনা এগুলো গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। আমাদের মনে হয়, কালিদাসের কাব্য-জগৎ থেকে ধর্মীয় পরিবেশকে বাদ দিলে সেখানে

কালিদাসের কালের অস্তিত্ব লোপ পেয়ে যাবে। ধর্মীয় আবহে উপস্থিতি ছাড়া যে-কালের শিল্প বা সাহিত্য আদৌ পুষ্টি লাভ করতে পারে না, যদিও সেখানে মনোজগতের সমগ্র পরিচয় একান্তভাবে মানবীয়। কিন্তু তিনি মানুষকে নিয়ে খুব কমই নাড়াচাড়া করেছেন। শিল্পী যখন তাঁর শিল্পকর্মের বিষয়বস্তুর মধ্যে মানুষ এনে ফেলেছেন তখন তাঁকে কিন্তু কোন না কোন ধর্মীয় আন্দোলনের সঙ্গে অবিচ্ছিন্নভাবে যুক্ত করেই দেখা হয়েছে। যে যুগে মানুষের দৃষ্টিতে ধর্মের এতটা গুরুত্ব এবং মানুষেরই গুরুত্ব এতটা কম, সেই যুগকে যদি প্রাচীন কালরূপে চিহ্নিত করা যায়, তাহলে কি খুব অন্যায় হবে ?

মুসলমানের আগমনের পরে এই উপ-মহাদেশের সাংস্কৃতিক জীবনে কতকগুলো বৈশিষ্ট্য প্রকট হয়ে দেখা দিল। নতুন লোকগোষ্ঠীর আবির্ভাবের সঙ্গে এই পরিবর্তনের কোন না কোন সম্পর্ক আছে বলে মনে করা যেতে পারে। সাহিত্য ও শিল্পকলার ধর্মীয় ভাব বর্জিত, ঐহিক পরিবেশ প্রতিষ্ঠা পেল, এবং মানুষের সৃষ্ট সাংস্কৃতিক জগতে মানুষই মুখ্য হয়ে দাঁড়াল। কালিদাস ও তাঁর অনুকরণে বহু হিন্দু কবি দূতকাব্য রচনা করেছিলেন। মুসলমান কবি আবদুর রহমান 'সংনে হয় রাসয়' নামক একটি দূতকাব্য লিখেন ঐ একই ঐতিহ্যের অনুসরণে। এই কাব্যে কালিদাসের যক্ষ ও যক্ষ পত্নীর স্থান দখল করেছে মানব ও মানবী এবং মেঘদূতের কুয়াসাচ্ছন্ন অলকাপুরীর স্থানে আমরা পাচ্ছি গন্তাইও নামক একটি স্থান যার অবস্থিতি মাটির পৃথিবীতে। বিরহিনী তার দয়িতের কাছে যে বাণী পাঠিয়ে দিচ্ছে তা আবেগের উষ্ণতায় সম্পূর্ণভাবে মানবীয়, তা কিন্তু বিরহী যক্ষের হিসেবি মনের উত্তাপবিহীন মন্ত্রোচ্চারণ মাত্র নয়। আমরা বুঝতে পারি যে কালিদাসের জগৎ থেকে আমরা একটি স্বতন্ত্র জগতে চলে এসেছি। আসলে 'মেঘদূত' ও 'সংনে হয় রাসয়' কাব্যের মাঝে রয়েছে দুটি যুগের ব্যবধান। মুসলমানদের শাসনকালে ভারতে ফারসী কাব্যে ও আঞ্চলিক ভাষায় লিপিবদ্ধ কাব্যে মানবীয় অনুভূতি, মানবীয় প্রেম ও কামনা-বাসনার অভিব্যক্তি একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। কোনো রূপক কাব্যে যখন বিশেষ কোনো ধর্মীয় ভাবকে প্রকাশ করার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হলো, তখন এই ভাবকে পরিস্ফুট করে তোলা হলো মানবীয় পরিবেশের মধ্য দিয়ে ও মানবীয় আচার-আচরণের মাধ্যমে। প্রাক-মুসলিম যুগের কোন ভারতীয় ইতিহাস-সাহিত্য আজো আবিষ্কৃত হয়নি। প্রাচীন-সাহিত্যে প্রাপ্ত, 'ইতিবৃত্ত' 'পুরাবৃত্ত' 'ইতিহাস' প্রভৃতি কয়েকটি শব্দের উপর জোর দিয়ে আধুনিক কালের কোন কোন পণ্ডিত

মনে করেছেন যে, ইতিহাস রচনায় প্রথা এ দেশে অজানা ছিল না। লিখিত ইতিহাসের কোনো নমুনা হাতের কাছে না পেলে এই ধরনের থিওরীকে বিনা আপত্তিতে কখনো গ্রহণ করা যাবে না। খুব সম্ভব, সে যুগের পণ্ডিতগণ পুরাণগুলোকেই যথার্থ ইতিহাস বলে মনে করেছিলেন। পুরাণ সাহিত্যে কিম্বদন্তীমূলক রাজারাজড়ার কাহিনী প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। কাহিনী-গুলো সন-তারিখ বিহীন কোন এক অনন্ত অতীতের মাঝে স্থাপিত এবং তাদের সমগ্র আবহ ধর্মীয় ভাবধারায় সম্পৃক্ত। মানুষের ঐহিক কার্যাবলীর ফিরিস্তিকে অবলম্বন করে ইতিহাস-সাহিত্য গড়ে ওঠে। প্রাক-মুসলিম যুগের ভারতীয় মানসের কাছে এই ফিরিস্তির কোনো আবেদন ছিল বলে মনে হয় না। মুসলমানদের হাতে যে ইতিহাস-সাহিত্য গড়ে উঠল, তার পরিমাণ বিপুল ও বৈচিত্র্য বিস্ময়কর। এ ক্ষেত্রেও বোধ হয় দুটি যুগের বৈশিষ্ট্য ও দুটি মানসিকতার বিভিন্নতা স্পষ্টভাবে প্রকাশ পাচ্ছে। মুসলিম আমলের স্থাপত্য ও চিত্রকলাতেও ধর্মীয় প্রভাব খুবই কম এবং ঐহিক মানসিকতার ছাপ সুস্পষ্ট। মুসলিম স্থাপত্যের একটি অংশকে আমরা ধর্মীয় স্থাপত্যরূপে অভিহিত করে থাকি শুধু মাত্র তার ব্যবহারিক দিকের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করার জন্য। ধর্মীয় স্থাপত্যের উপায় ও বৈশিষ্ট্যকে বিশ্লেষণ করলে তাদের মধ্যে যথার্থ ধর্মীয় উপকরণ কমই পাওয়া যায়। কিন্তু মন্দির শিল্পের প্রসঙ্গে কি কখনও এই কথা বলা যায়? জীবন ও জগতের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির এই পরিবর্তনকে সত্যিই কি গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয় না? এই পরিবর্তন যে যুগকে বিশিষ্ট করে তুলেছিল, সেই যুগকে মধ্যযুগ বলে অভিহিত করা কি অযৌক্তিক? রোমের পতনের পরে ইয়োরোপে বাণিজ্যভিত্তিক সভ্যতা অবসান হয় এবং তার পরিবর্তে কৃষিভিত্তিক সামন্ততান্ত্রিক সভ্যতার বিকাশ লাভ ক'রে সেই মহাদেশের জীবনে এক ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করে। এই গুরুত্বপূর্ণ রূপান্তরের সাহায্যে প্রাচীন যুগ থেকে মধ্যযুগকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা হয়। পাক-ভারতের ইতিহাসে যখন এই ধরনের অর্থনৈতিক রূপান্তরের সন্ধান মিলছে না তখন পূর্বোক্ত মানসিক রূপান্তরকে এদেশের মধ্যযুগের আত্মিক বৈশিষ্ট্য বলে ধরে নিলে বোধহয় অসঙ্গত হবে না। একথা এখানে পরিষ্কার ভাবে বলে রাখা ভাল যে প্রাচীন ও মধ্যযুগের এই সংজ্ঞাটি কোন স্থায়ী ও অনমনীয় সূত্র নয়। কাজ চালিয়ে নেবার মতো যুগ-বৈশিষ্ট্যভিত্তিক এই কালবিভাগটি অত্যন্ত সাধারণ ধরনের—এই বিভাগে সমগ্র উপ-মহাদেশকে চিহ্নিত করতে

গিয়ে বিশেষ বিশেষ অঞ্চলে বৈশিষ্ট্য ও ব্যতিক্রমকে আদৌ ধর্তব্যের মধ্যে নেওয়া হচ্ছে না। অধিকতর স্পষ্ট ও নির্দিষ্ট কোন সূত্রের সন্ধান পেলে এটাকে অনায়াসে পরিত্যাগ করা যেতে পারে।

দুই

মধ্যযুগের সামাজিক ইতিহাসের উপাদান খুবই কম। যে সকল ইতিবৃত্তি-মূলক গ্রন্থ পণ্ডিত সমাজে সুপরিচিত, তাদের অধিকাংশই সমাজ ও অর্থনীতি সম্বন্ধে নীরব। বিভিন্ন অঞ্চলের সাহিত্য এসম্বন্ধে যথেষ্ট কাঁচামাল সরবরাহ করতে পারে। কিন্তু এই কাঁচামালের মধ্যেও আমাদের প্রশ্নের উত্তরগুলো তৈরী করে রাখা হয়নি। বিশেষ ধরনের প্রশ্ন নিয়ে তথ্যগুলোর সম্মুখীন হয়ে জেরা জবানবন্দীর সাহায্যে তাদের কাছ থেকে উত্তর আদায় করতে পারলে সামাজিক ইতিহাসের বহু অন্ধকারময় স্থানে আলোকপাত করা সম্ভব হবে বলে আমাদের ধারণা। এই সওয়াল জওয়াবের ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক কল্পনা একটি শক্তিশালী হাতিয়ার। এই হাতিয়ারের প্রয়োগ-ক্ষেত্রের সঙ্গে সম্পর্কিত হয়ে আছে স্থান, কাল ও মানবীয় দৃষ্টিকোণের এক জটিল পরিপ্রেক্ষিত—যার চেহারা পরিবেশ অনুযায়ী বিভিন্নতা নিয়ে দেখা দেয়। পূর্ব ভারতের সাহিত্য থেকে একটি উদাহরণ দেয়া যাচ্ছে। বিদ্যাপতি 'কীর্তিলতা' কাব্যে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের একটি চিত্র এঁকেছেন। বর্ণনাটি পড়তে গিয়ে কবির মানসিকতা ও স্থান কালের গুরুত্বের প্রশ্নটিকে এড়িয়ে গেলে বিভ্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশী। বিদ্যাপতি মিথিলার লোক। সে দেশে তখন একটি হিন্দু রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত এবং সে দেশ মুসলিম শাসনের আওতায় আসে মুসলমানদের ভারত আক্রমণের বহু পরে। তখনকার দিনে মিথিলাতে কম মুসলমানই বসবাস করত। এই অবস্থায় কবি তাদের সম্বন্ধে যে কোন তথ্য পরিবেশন করেছেন, সেগুলো আদর্শায়িত হওয়া খুবই সম্ভব এবং সেগুলো তাঁর পূর্ব ধারণা-প্রসূত হওয়াও অসম্ভব নয়। শূন্যপুরাণ মুসলমান আক্রমণকে ব্রাহ্মণদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে ধর্মঠাকুরের আক্রোশ রূপে কল্পনা করে মুসলিম পীর-পয়গম্বরকে হিন্দু পুরাণের দেব দেবীর সঙ্গে অভিন্ন বলে মনে করা হয়েছে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যে কবি মুসলিম আক্রমণকে স্বাগত জানিয়েছেন। কিন্তু ব্রাহ্মণদের সঙ্গে স্বধর্মীয়দের সম্পর্কে সুন্দর ধারণা না থাকলে কবির এই দৃষ্টিভঙ্গিকে সঠিকভাবে বুঝতে পারা যাবে

না। চৈতন্য-জীবনীতেও মনসা মঙ্গল কাব্যে হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কে যে রচনাগুলো বিধৃত, তাদের সমগ্র পটভূমিতে কোনো ধর্মীয় নেতার দেবদেবীর অবস্থান। এখানে যে প্রশ্নটি সবচেয়ে জরুরী হয়ে দেখা দিয়েছে, সেটি হল উক্ত মহাপুরুষ বা দেব-দেবীর অসাধারণ শক্তির প্রতি কবির বিদ্বেষ বা সহানুভূতির প্রশ্ন বিচার করতে গেলে সমগ্র পরিপ্রেক্ষিতের মূল্যায়ন আবশ্যকীয় হয়ে পড়ে। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের কবি মুকুন্দরাম শাসকদের অত্যাচারের কথা উল্লেখ করছেন এবং কালকেতুর গুজরাট পত্তন প্রসঙ্গে মুসলমানদের আচার ব্যবহার ও শ্রেণী বিভাগের বর্ণনা দিয়েছেন। এখানে মুসলিম সমাজের সঙ্গে কবির অপরিচয়ের প্রশ্নটিও আছে। তাছাড়া বর্ণনাটি সম্পর্কিত হয়ে আছে দেশের রাজনৈতিক পরিবর্তনের ইতিহাসের সঙ্গে। হিন্দু-মুসলিম সংক্রান্ত এই সকল বর্ণনার ক্ষেত্রে যদি উক্ত পরিপ্রেক্ষিতে আদৌ বিচার না করে একটি নির্দিষ্ট বিন্দু থেকে পরবর্তী বিন্দু পর্যন্ত ঐতিহাসিক কল্পনার সূত্রকে টেনে নেওয়া যায়, তাহলে এই ধরনের ঐতিহাসিক কল্পনা যে ইতিহাসের নামে এক ভ্রান্তিকর চিত্রের সৃষ্টি করবে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। ইতিহাসের উপকরণের পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য তাই কোনো একটি সমালোচনামূলক পদ্ধতির প্রয়োজন অনস্বীকার্য।

Trevelyan-এর English Social History, Henli Pyrenne কর্তৃক দক্ষিণ ইয়োরোপের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাসের উপর লিখিত গ্রন্থগুলো এবং Mark Bloch-এর বিভিন্ন গ্রন্থ ও প্রবন্ধগুলোর পাতা উল্টোলে এ-কথা ভেবে বিস্মিত হতে হয় যে ইংল্যাণ্ড ও ইয়োরোপের ইতিহাসের উপাদান অত্যন্ত পরিমিত। এই পরিস্থিতিতে আঞ্চলিক ভাষায় লিখিত গ্রন্থগুলোর মধ্যে সে উপকরণসমূহ বিধৃত, তাদের যথাযথ বিশ্লেষণ একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। অবশ্য একথা বলার কোনো কারণ নেই যে, ভ্রমণ কাহিনী, দালান-ইমারত, মুদ্রা ও শিলালিপি এ ক্ষেত্রে গুরুত্ববিহীন। এদের আপেক্ষিক গুরুত্ব নিশ্চয়ই আছে এবং সামাজিক ইতিহাস লিখতে গিয়ে সাহিত্যের মাল মশলার আবশ্যক মতো প্রত্নতাত্ত্বিক উপকরণ নিশ্চয়ই মিশ্রিত করা যেতে পারে। তবে সাহিত্য মানুষের আত্মার সৃষ্টি এবং এই সাহিত্যের মধ্যে মানুষের আত্মার সন্ধান পাওয়া যায়। অতীতের ইতিহাসের আত্মার কাছাকাছি আসতে হলে সে যুগের সাহিত্যের আত্মার ভিতরে প্রবেশ করতে হবে। সব রকমের উপকরণ একত্রিত করেও ইতিহাসের কোনো যুগ সম্বন্ধে পূর্ণাঙ্গ বিবরণ প্রদান আদৌ

সম্ভব নয়। অতীতের এক বিরাট অংশ সম্পূর্ণ ভাবে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। সাহিত্য, সমকালীন ভ্রমণকাহিনী, দালান ইমারত, মুদ্রা ও শিলালিপির মাধ্যমে অতীতের প্রতীকের যে ক্ষুদ্র অংশটি আমাদের কাছে পৌঁছেচে, অতীতের সামগ্রিকতার সঙ্গে তুলনা করলে তা অত্যন্ত তুচ্ছ, অত্যন্ত নগণ্য। কিন্তু এই তুচ্ছ ও নগণ্য অংশই ঐতিহাসিকের কাছে অত্যন্ত মূল্যবান। ঐ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন প্রতীকগুলোকে একত্রিত করে তিনি অন্ততঃ একটি মনগড়া চিত্র অঙ্কিত করতে পারেন। এই চিত্র বাস্তবের কতটা কাছাকাছি, তা নির্ভর করে ঐতিহাসিকের মানসিক গুণাবলী, তার কল্পনাশক্তি ও তার পরিপ্রেক্ষিত জ্ঞানের উপর। ঐ ক্ষুদ্র তুচ্ছ প্রতীক যদি আমাদের কাছে না থাকত, তাহলে অতীতের খণ্ডিত কুয়াশাচ্ছন্ন রূপটিও আমাদের কাছে বোধগম্য হতো না, অতীত বর্তমানের দৃষ্টিসীমার বহুদূরে নিশ্চিহ্ন হয়ে লোপ পেয়েছে।

তিন

মধ্যযুগের সমাজজীবনে বিশেষ কোন পরিবর্তন সংঘটিত হয়নি—এই ধারণাটি আমাদের মনে বদ্ধমূল। একথা এই প্রবন্ধের গোড়ার দিকেই বলেছি। দীর্ঘকাল ধরে এইদেশে সমাজ ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে কৃষিকে অবলম্বন করে, এমন কি আজকের দিনেও যাঁরা শহরে-বন্দরে বুদ্ধিজীবী ও মধ্যবিত্ত রূপে পরিচিত, তাঁদের অনেকেরই গ্রামের সঙ্গে সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ এবং জোত-জমা তাঁদের জীবিকার অন্যতম অবলম্বন। আমাদের দেশে এখন কোন নাগরিক সভ্যতা গড়ে উঠতে পারেনি। কৃষি-নির্ভর জীবনে পরিবর্তনের সম্ভাবনা খুবই কম। এই ধরনের সমাজ বহির্জগতের সঙ্গে সচরাচর কোনো সংঘাতে লিপ্ত হয় না। একটি বিশেষ এলাকা পরিত্যাগ ক'রে কোনো মানব-গোষ্ঠী এক্ষেত্রে অন্য কোথাও চলে যায় না, কোনো অপরিচিত লোক-গোষ্ঠীর সংস্পর্শে আসে না। তার ফলে কৃষিজীবিদের সমাজে যে সকল আচার-অনুষ্ঠান, ধর্মীয় বিশ্বাস ও প্রতিষ্ঠান জন্ম নেয়, দেশের মাটিতে তাদের ভিত্তিমূল গভীরভাবে প্রোথিত, তারা নিশ্চল। কিন্তু কৃষি-ভিত্তিক এই স্থবির জীবনেও পরিবর্তন আসে। সে পরিবর্তনের ধারা হয়ত বা মন্থর ; তাকে অগ্রাহ্য করা ঐতিহাসিকের কাজ নয়।

জৈবিক প্রয়োজনের ক্ষেত্রে সামান্য প্রকৌশলগত পরিবর্তনের ফলে কি অসাধারণ বিপ্লবই না সাধিত হতে পারে। হাজার হাজার বছর আগে এদেশে

যখন অষ্ট্রিকদের আগমন হলো, কল্পনা করুন, তখন দেশের চেহারাটা কেমন ছিল। নদনদী, জলাভূমি, শ্বাপদ-সঙ্কুল অরণ্য ও পাহাড়-পর্বতের সে কি এক ভয়াবহ পরিবেশ। তারপর সেই আদিম মানবগণ বিরাট ভূখণ্ডকে মানুষের বাসোপযোগী করে তুলল, পাহাড়ের গা কেটে স্তরে স্তরে সেখানে আবাদ করল, লাঙ্গল দিয়ে জমি চষল, ধান, নারিকেল, সুপারী, কলা, কার্পাস প্রভৃতির উপর কর্তৃত্ব করল। তার চেহারাকেও পরিবর্তিত করল, শুধু মাত্রই প্রকৃতির আইন-কানুনগুলোকে বদলাতে পারল না। ভাষাতত্ত্বের কল্যাণে আজ আমরা এই ইতিহাসের সঙ্গে সুপরিচিত। কৃষির সাজ-সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতির পরিভাষায় যে শব্দগুলো স্থান পেয়েছে, তাদের প্রায় সবগুলোই অষ্ট্রিক শব্দ। কৃষি-ব্যবস্থা ও খাদ্যাভ্যাসের সঙ্গে সঙ্গে অষ্ট্রিকদের নিকট থেকে আমরা বহু পরিভাষা ও শব্দ-সমষ্টি লাভ করেছি উত্তরাধিকার সূত্রে। সংস্কৃত ও প্রাকৃতের সঙ্গে তুলনা করে এবং ধ্বনি-বিজ্ঞানের সাহায্যে ভাষাতাত্ত্বিকগণ এই শব্দগুলোর একটি রূপ-বিন্যাস নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। ইতিহাস বিলুপ্তির নির্মম গ্রাস থেকে মুক্তি পেয়েছে। প্রকৌশলের কথাটি আর একটু ভেবে দেখা দরকার। অষ্ট্রিক চাষী যখন লাঙ্গলের সাহায্যে জমি চাষের ব্যবস্থা প্রবর্তিত করল, তখন এই লাঙ্গলকে কেন্দ্র করে মানব সমাজে এক নতুন শ্রেণী বিন্যাসের সৃষ্টি হলো। কাঠুরিয়া, সূত্রধর ও কর্মকারদের পূর্বপুরুষ চাষীর সঙ্গে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সহায়তার জন্য এগিয়ে এল এবং আজকের দিনেও এই সহযোগিতা অব্যাহত।

প্রাচীন কালে যদি এই ধরনের বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন সাধিত হয়ে থাকে, মধ্যযুগে কি অনুরূপ অথবা আপেক্ষিকভাবে কম গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের সম্ভাবনা আদৌ ছিল না? তুর্কী, আফগান, আরব, আবিসিনিয়ান ও মোঘল লোক-গোষ্ঠী এই উপ-মহাদেশে প্রবেশ করে দীর্ঘকাল রাজত্ব করেছে। তারা কি শুধু খালি হাতে এসেছিল, সঙ্গে করে কি কোনো প্রকৌশল নিয়ে আসেনি? সেই প্রকৌশলের প্রয়োগের ফলে সমাজজীবন শ্রেণীবিন্যাসের ক্ষেত্রে কি কোন পরিবর্তন দেখা দেয় নি? প্রশ্নগুলোর কোন জবাব পাওয়া যাচ্ছে না, কেননা লিখিত দলিল-দস্তাবেজে তাদের সম্বন্ধে কোন ইঙ্গিত নেই। একথা চিন্তা করা মুসকিল যে উক্ত নতুন নতুন লোকগোষ্ঠী কোনো প্রকৌশলকেই বহন করে এদেশে আনে নি। হিন্দু-মুসলিম অর্থনৈতিক ইতিহাসের উপর লিখিত মোরল্যাণ্ডের গ্রন্থগুলো মনোযোগ দিয়ে পড়লে কিন্তু কতকগুলো প্রকৌশলের ব্যবহার সম্বন্ধে ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এগুলো কারিগরি শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য

জাহাজ নির্মাণ ও সামরিক কার্যাবলীর সঙ্গে সম্পর্কিত। একথা মনে করার কোনো কারণ নেই যে, মোঘল শাসনকালেই এদের সবগুলোর উদ্ভব ঘটেছে।

অন্য কতকগুলো পরিবর্তনের কথা আমাদের জানা আছে। পশ্চিমের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপিত হওয়ার ফলে এদেশে খেত-খামারে ও বাগানে নতুন নতুন শস্য ও ফলের আমদানি হয়েছে। এগুলোর মধ্যে তামাক, আনারস, আলু, হিজলী বাদাম, পেঁপে, কামরাঙ্গা, পেয়ারা প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মোরল্যাণ্ড বলেছেন যে, মধ্যযুগে পাটশিল্প উন্নতি লাভ করেছিল। পাটচাষের প্রচলন নিশ্চয় ছিল এবং পাট থেকে চট অথবা ঐ জাতীয় মোটা বস্ত্রও হয়ত তৈরি করা হতো। কিন্তু পাট থেকে মিহিবস্ত্র তৈরি করার জন্য যে কলা-কৌশলের প্রয়োজন, তা সেকালের বস্ত্রশিল্পীদের অধিগত হয়েছিল কিনা, মোরল্যাণ্ড সে-কথা আদৌ চিন্তা করেননি। নীলচাষের ঘাটতি পড়লে গত শতকে পাট চাষ বিস্তৃতি লাভ করে এবং পাটের বস্ত্র যথার্থ শিল্পের পর্যায়ে উন্নীত হয়। যুগে যুগে আমাদের ব্যবহারিক জীবনে নতুন নতুন উপকরণের আমদানী হয়েছে, হয়ত বা নতুন নতুন প্রকৌশলও সমাজ জীবনে পরিবর্তন এনে দিয়েছে। কোন দলিলপত্রে লিখিত প্রমাণ নেই বলে এই পরিবর্তনের ব্যাপকতা নির্ণয় করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। অথচ সমাজ ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে পরিবর্তন ও প্রবহমানতার ধারাকে অনুসন্ধান করাই ঐতিহাসিকের পক্ষে এক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব।

চার

বহু প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি হচ্ছে, আবার বহুপ্রতিষ্ঠান কালক্রমে লোপ পেয়ে যাচ্ছে। কোন কোন প্রতিষ্ঠান অতি প্রাচীন কালের বিশ্বাস ও ধারণার জের টেনে চলেছে। কোন প্রতিষ্ঠান যদি লোপ পেয়ে যায়, সেজন্য ঐতিহাসিকের বিশেষ কোন আফশোসের কারণ নেই। প্রতিষ্ঠান বিশেষকে বাঁচিয়ে রাখা তাঁর কর্তব্যের মধ্যে পড়ে না, যেমন কোন মতবাদকে পোষা বিড়ালছানার মতো বুকের ওমে লালিত করাও তাঁর কর্তব্য নয়। টেনিসনের একটি সুবিখ্যাত কবিতার কথা এই প্রসঙ্গে মনে পড়ছে। রাজা আর্থার যুদ্ধক্ষেত্রে বিধ্বস্ত হলেন। সামন্ত স্যার গ্যালাহাডের মনে জাগল তীব্র বেদনাবোধ। ক্ষত-বিক্ষত, রক্তাক্ত আর্থার সামন্তকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন ঃ

Old order changeth, yielding place to new

And God fulfils himself in many ways,
Lest one good custom should corrupt the world.

রাজা আর্থার মুখে যা বললেন, কার্যতঃ তাই ঘটল। দেবদূতের দল তাঁর রক্তাক্ত দেহটিকে সুন্দর সাম্পানে তুলে নিয়ে লেকের মধ্য দিয়ে দাঁড় টেনে টেনে দূর দিগন্তের বুকে অন্তর্হিত হলো। স্যার গ্যালাহাড বিস্মিত নির্বাক। তাঁর হাতে রয়েছে তখনো সুদৃশ্য তলোয়ার, সেটি শিভ্যালরীর প্রতীক। তিনি সেটিকে লেকের মধ্যে ফেলে দিলেন। রহস্যময়, রেশমের মতো সুন্দর শুভ্র একটি হস্ত উত্তোলিত হয়ে তলোয়ারটাকে ধারণ করল, পরে সে হস্ত তলোয়ার নিয়ে ধীরে ধীরে লেকের জলে আত্মগোপন করল। মৃদু জ্যোৎস্নালোকে স্যার গ্যালাহাড সবই লক্ষ্য করলেন। একটি যুগের অবসান হলো। সময় তার রহস্যময় সুন্দর, শুভ্র হস্ত বিস্তৃত করে অতীতের বহু প্রতীককে বহু প্রতিষ্ঠানকে ধীরে ধীরে বুকে টেনে নিচ্ছে। সেজন্য স্যার গ্যালাহাডের মতো দুঃখ করে লাভ নেই। রাজা আর্থারের মনোভাবই এ-ক্ষেত্রে বোধহয় কাম্য। এখানে ঐতিহাসিকের অন্যতম কর্তব্য ও পবিত্র দায়িত্ব হচ্ছে এই কথাটি জানাঃ প্রতিষ্ঠানগুলো সমাজ-জীবনে কি করে স্থায়িত্ব পেল। কি করেই বা তাদের বিলোপ ঘটল, মানুষের জৈবিক ও আর্থিক জীবনের উপরে তাদের প্রভাব কতটা ব্যাপক ছিল। সমাজতাত্ত্বিক এবং সম্ভব হলে ঐতিহাসিক প্রতিষ্ঠান-গুলোর সম্বন্ধে লিখিত দলিল দস্তাবেজ রেখে যাবেন। সেগুলোর প্রতি সময়ের হস্ত একবার বিস্তৃত হলে তাদের খুঁজে পাওয়া যাবে না, ভবিষ্যতের লোকজন জানতেও পারবে না যে এক কালে ঐ প্রতিষ্ঠানগুলোর কোনরূপ অস্তিত্ব ছিল।

আপাতদৃষ্টিতে যে অনুষ্ঠানগুলোকে গুরুত্ববিহীন বলে মনে হয়। তাদের মধ্যে অত্যন্ত মূল্যবান ঐতিহাসিক উপকরণ লুকিয়ে থাকতে পারে। বাঙলা দেশের গ্রামীন জীবন থেকে কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া গেল। অশিক্ষিত মুসলমান চাষীদের কেউ কেউ কার্তিক মাসের অমাবস্যা উপলক্ষে ধানক্ষেতে মাটির দীপাধারে করে আলো জালিয়ে দেয়। এই অনুষ্ঠানটি সমাজতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিকের কাছে একটি চিন্তাকর্ষক সমস্যাকে উপস্থিত করেছে। যে পাত্রটিতে আলো জালানো হয়, তাকে ঐ অঞ্চলের ভাষায় বলা হয় 'দীয়ার'। দীয়ার>দীয়াল>দীপাল>দীপালী। ভাষাতাত্ত্বিক প্রমাণের বলে মনে হচ্ছে যে কার্তিক মাসের অমাবস্যায় অনুষ্ঠিত দীপালী বা দীপান্বিতা উৎসবের সঙ্গে

মুসলমান চাষীর ঐ অনুষ্ঠানটি সম্পর্কিত। কিন্তু ধানের সঙ্গে দীপালীর কি সম্পর্ক? সহজ বুদ্ধিতে মনে হয় যে মুসলমান চাষী উক্ত অনুষ্ঠানটি পালন করে ধানের দেবতাকে খুশী রাখার চেষ্টা করে। বার শতকের নিবন্ধকার জীমূত-বাহনের 'কালবিবেকে' দীপালী উৎসবের উল্লেখ আছে। কাজেই উৎসব এক হাজার বৎসর আগেও বাঙালি হিন্দুসমাজে প্রচলিত ছিল এবং কোনো না কোনো সময়ে কৃষকদের সংস্কারের সঙ্গে এই উৎসবটি সম্পর্কিত হয়ে যায়। মুসলমান চাষীর ঐ অনুষ্ঠান উক্ত লুপ্ত ইতিহাসের প্রতি বোধহয় ইঙ্গিত দিচ্ছে। স্থানটি হিন্দু প্রধান হলে উক্ত অনুষ্ঠান হিন্দু প্রভাব বলে মেনে নেওয়া যেত। কিন্তু ঐ স্থানটি মুসলমান প্রধান। ফলে এই থিওরীকেই বোধহয় গ্রাহ্য করতে হয় যে উক্ত মুসলমান চাষীদের কোন হিন্দু পূর্বপুরুষ ইসলামে দীক্ষিত হয়েছিল। তারপর পুরুষ পরম্পরায় একটি বিশ্বাস ও অনুষ্ঠান তাদের অজ্ঞাতসারে তাদের মধ্যেই বেঁচে আছে। ঐ একই অঞ্চলের অশিক্ষিত মুসলমানদের ছেলেরা পৌষ সংক্রান্তি পালন করে। পৌষ-পার্বণের আঞ্চলিক নাম পুষণা। ছেলেরা শেষরাতে খড়-নাড়া স্তূপাকার করে তাতে আগুন ধরিয়ে দিয়ে আগুন পোয়ায়। সকালে মাঠের মধ্যে নতুন চালের ভাত রেঁধে খেয়ে বিদায় নেয়। শিক্ষিত ও আহলেহাদীন সম্প্রদায়ের ছেলেরা অভিভাবকের সতর্ক দৃষ্টিকে ফাঁকি দিয়ে এই উৎসবে যোগদান করে। এই অনুষ্ঠানটি হিন্দু প্রভাবের নির্দেশক কিনা, একটু আগেই এই ধরনের প্রশ্নের উত্তর দিতে চেষ্টা করা হয়েছে। কৃষি জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত একটি প্রবাদ এতদিন খুবই চালু ছিল। এই প্রবাদটি হচ্ছে 'ধান ভানতে শিবের গীত গাওয়া।' এর অর্থ অবান্তর কথা বা প্রসঙ্গ। কিন্তু ধান ভানতে শিবের গীত গাইলে এর অর্থ অবান্তর কথা বা অপ্রাসঙ্গিক হবে কেন? কোনো কোনো পণ্ডিত ইতিমধ্যে এই ধরনের ইঙ্গিত করেছেন যে, শিব কৃষির দেবতা এবং অনার্য দেবতা। এই কথা ঠিক হলে ধান ভানবার সময় শিবের গীত গাওয়া খুবই সঙ্গত, আদৌ অবান্তর নয়। স্বভাবতই মনে হয় যে, অতীতে ধান ভানবার সময় শিবের গীত গাওয়া হতো। তারপর শিবের প্রাধান্যের বিরুদ্ধে আর্য প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় এবং অনার্য শিবের গাজনকে নিন্দা করে ধান ভানার সঙ্গে এই দেবতার গীতকে সম্পর্কিত করার প্রথার বিরুদ্ধে ফতোয়া হয়। একটি মাত্র ছড়ার মধ্যে এতটা ইতিহাস ও সমাজতত্ত্ব লুকিয়ে আছে। বিশুদ্ধিকরণের প্রবণতা প্রবল হলে এই প্রবাদটি লোপ পেয়ে যেতে পারে এবং অন্য কোনো প্রবাদ তার স্থানে এসে প্রতিষ্ঠা পেতে পারে। ধরুন এই প্রবাদটি পূর্ববাঙলার

কোনো কোনো এলাকায় প্রচলিত এই প্রবচন—দাদীর কবর কোথায়, কাঁদে কোথায়। একদিক দিয়ে দেখতে গেলে, এই পরিবর্তনের ফলে কিছুই আসে যায় না ; কেননা তাৎপর্যের দিক দিয়ে শেষোক্ত প্রবাদটি অধিকতর সঙ্গতিপূর্ণ। ক্ষতি যেটুকু হলো সেটুকু এই যে পূর্ববর্তী প্রবাদটি অবলুপ্ত হওয়ার ফলে আমরা সামাজিক ইতিহাসের অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ হারিয়ে ফেললাম। এখনো কোনো কোনো গ্রামে সত্যপীরের সিন্নী দেয়ার রীতি চালু আছে। কাঁচা আটা, কাঁচা দুধ ও কলা একত্র মিশ্রিত করে এই সিন্নী তৈরী করে উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে ভাগ করে দেয়া হয়। আজ পর্য্যন্ত সত্যপীরের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশের ইতিহাসটি লেখা হয় নি। গ্রাম্য রীতিনীতিগুলো খুঁটিয়ে দেখলে এ সম্বন্ধে হয়ত বা মূল্যবান তথ্য খুঁজে পাওয়া যাবে এবং সত্যপীরের পটভূমিও সহজবোধ্য হয়ে আসবে। মহরম উপলক্ষে তাজিয়া নির্মাণ ও লাঠি খেলা গ্রামীয় বাঙলার এক উল্লেখযোগ্য উৎসব। এই অনুষ্ঠানগুলো সত্যিকার শীয়া প্রভাব নির্দেশক কিনা অথবা শীয়া প্রভাবের আবরণে এরা অন্য কোনো প্রকার হিন্দু প্রভাবের ইঙ্গিতবহ কিনা, সে-প্রশ্নের উত্তর খুঁজে বের করার কাজও সামাজিক ইতিহাসের আওতায় পড়ে। মুসলমানদের বিয়ে-শাদীতে এমন লোকাচার ও রীতিনীতি দৃষ্টিগোচর হয় যে তারা হিন্দু বিয়ের রীতি-নীতির সঙ্গে যথেষ্ট সাদৃশ্যপূর্ণ। হিন্দু বিয়েতে মুখচান্দ্রির রেওয়াজ চালু আছে। মুসলমানদের বিয়েতে সামনে একটি আয়না রেখে বর ও কনে মুখ দেখাদেখি করে। এই প্রথাকে মুখচান্দ্রির অনুকৃতি বলে মনে করার সঙ্গত কারণ আছে। বিয়ের শেষে বর-কনে একত্র হলে কনের শাড়ীর আঁচলের সঙ্গে বরের শেরওয়ানীর প্রান্তভাগ বেঁধে দিয়ে উভয়ের পূর্ণ মিলন কামনা করা হয়। হিন্দু বিয়েতে অনুরূপ লোকাচার দেখতে পাওয়া যায়। স্মৃতিশাস্ত্রের বিধান অনুযায়ী হিন্দু বিবাহ অবিচ্ছেদ্য। দরবেশদের আস্তানায় দেখা গেছে যে তাঁরা গাঁজার কলকেতে দম দিয়ে সৃষ্টি রহস্য আলোচনা করছেন। তাঁদের মতে সৃষ্টির পর্যায়গুলো অন্ধকার, ধন্ধকার, কুয়াকার ও নৈরাকার রূপে অভিহিত। কথা শুনলেই মনে হয় যে বিভিন্ন আদিম অধিবাসিদের মধ্যে যে সৃষ্টি-তত্ত্ব প্রচলিত, এগুলো তারই প্রতিধ্বনি।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকে সমাজ জীবনে পরিবর্তন আসছে অত্যন্ত দ্রুত গতিতে। ঢেঁকি ইতিমধ্যেই লোপ পেতে বসেছে, কেননা আজকের দিনে বহুগ্রামে কলে ধান ভানা হয়। অষ্ট্রিকদের লাঙ্গলের স্থান জবর দখল করে

পাকিস্তানী সংস্কৃতির তাৎপর্য

আবদুল হক

এ-দেশের সংস্কৃতি-আলোচনায় অনেক সময় শিথিলভাবে এ-রকম একটা ধারণা সৃষ্টির চেষ্টা করা হয় যে পাকিস্তানের সংস্কৃতি সর্বাত্মকভাবে ইসলামী বৈশিষ্ট্যেই বিশিষ্ট, এবং ভবিষ্যতে যে সংস্কৃতি গড়ে উঠবে তাও হবে ইসলামী সংস্কৃতি। পাকিস্তানের সংস্কৃতি যে সর্বাত্মকভাবে ইসলামী সংস্কৃতি নয় তা প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না; কিন্তু ভবিষ্যতের সংস্কৃতি সর্বাত্মকভাবে ইসলামী সংস্কৃতি হবে কিনা, সেটা একটা প্রশ্ন। অনেকে বলেন, পাকিস্তানের সংস্কৃতি সর্বাত্মকভাবে ইসলামী সংস্কৃতিই হবে, কেননা পাকিস্তান একটা আদর্শভিত্তিক 'রাষ্ট্র' তার শাসন-সংবিধানেও সেই কথা বলা হয়েছে, এবং ইসলামী আদর্শ রূপায়ণের জন্যই পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠা।

এ-বিষয়ে বোধ হয়, দ্বিমতের অবকাশ নেই যে পাকিস্তানে ইসলামী সংস্কৃতি বিকাশ সাধন মুসলমানদের একটা বিশেষ দায়িত্ব। এ-দায়িত্ব উপলব্ধির নির্ভুল প্রমাণ আমরা স্বাধীনতা লাভের পর যথেষ্টই পেয়েছি। ইসলাম আমাদের এবং সেই সঙ্গে বিশ্বমানবকে এমন কতকগুলি মৌলিক নীতি এবং মূল্যবোধ দিয়েছে যে জন্য আমরা সঙ্গতভাবে গর্ববোধ করতে পারি। সেইসব মৌলিক নীতি এবং মূল্যবোধ—যেমন তাওহিদ, মুসলিম-ভ্রাতৃত্ব, সামাজিক সাম্য, গণতন্ত্র, মানবতাবোধ, নারীর মর্যাদা—এ-দেশের মুসলীম সমাজ-জীবনে পূর্ণভাবে রূপায়িত হলে তা তাদের জন্য কল্যাণকর হবে, এ-সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠতে পারে না; এবং এর প্রভাব অন্য সমাজের পক্ষে অকল্যাণজনক হবে তাও মনে হয় না, অন্ততঃ আমাদের মনে হয় না। পরাধীন আমলে কতকটা বাইরের অপ্রতিরোধ্য প্রভাবে, এবং কতকটা আমাদের নিজেদেরও দোষে ক্লাসিক্যাল ইসলামী সংস্কৃতি এবং ইসলামী মূল্যবোধগুলি থেকে আমরা অনেক দূরে সরে পড়েছি। সাহিত্য-দর্শন-বিজ্ঞান-ললিতকলার ক্ষেত্রে মুসলমানেরা একদিন উন্নতির সুউচ্চ শিখরে উন্নীত হয়েছিল, পশ্চিমী দেশগুলি আজ তার প্রশংসা করছে এবং তাদের কাছে ঋণ স্বীকার করেছে, অথচ আমরা অবনতির নিম্নতম স্তরে। এইসব চিন্তা-ভাবনা ইসলামী সংস্কৃতির জন্য মুসলমানদের মধ্যে একটা আবেগময় উদ্দীপনা এনে দিয়েছে। স্বাধীনতার যুগে, অনুকূল রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশে

ইসলামী সংস্কৃতির বিকাশ-সাধন তাই মুসলমান তার একটা বিশেষ দায়িত্ব হিসেবে গ্রহণ করেছে।

কিন্তু তার মানে এই নয় যে, ইসলামী সংস্কৃতি এবং পাকিস্তানী সংস্কৃতিকে সম্পূর্ণ একার্থবোধক হতে হবে। এ-প্রসঙ্গে প্রথমেই মনে রাখা দরকার যে পূর্ব-পাকিস্তানের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলির উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে। এ-প্রদেশের যাত্রা, কবি-গান, লোক-গাথা, লোকগীতি, হস্তশিল্প, নৃত্যকলা, নাট্যমঞ্চ, সাহিত্য এবং এমনি আরও অনেক ক্ষেত্রে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলি বরাবরই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়ে এসেছে, এমনকি কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাদের প্রায় একাধিপত্য রয়েছে, যেমন যাত্রায়, সাঁওতালী নৃত্যে, মনিপুরী নৃত্যে। এ-সব ক্ষেত্রে পূর্ব-পাকিস্তানের যে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য তাতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলির অবদান অস্বীকার করা সম্ভব নয়, এবং ভবিষ্যতেও যে তাদের এইসব সাংস্কৃতিক কার্যকলাপ চলবে না এবং তারা নতুন কিছু সৃষ্টি করতে পারবে না এমন মনে করার কোনো কারণ নেই।

পূর্ব-পাকিস্তানের এই সংখ্যালঘু সংস্কৃতিকে আমরা ভারতীয় সংস্কৃতি বলতে পারি না এবং এখানকার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলির উপরও আমরা জোর করে ইসলামী সংস্কৃতি চাপিয়ে দিতে পারি না। আমরা তাদের বলতে পারি না, "আমরা যেমন ইসলামী সংস্কৃতি গড়ে তুলছি তেমনি আপনারাও ইসলামী সংস্কৃতি গড়ে তুলুন এবং আপনাদের এতদিনকার অনৈসলামিক সংস্কৃতি বর্জন করুন।" এই সাংস্কৃতিক জবরদস্তি যদি সম্ভব না হয় তবে পূর্ব-পাকিস্তানে এতদিন যেমন অনৈসলামিক সংস্কৃতি ছিল ভবিষ্যতেও তেমনি থাকবে, এবং ইসলামী সংস্কৃতি ও সংখ্যালঘু সংস্কৃতির যে সামগ্রিক যোগফল তাই হবে পূর্ব-পাকিস্তানের সংস্কৃতি। এই সংস্কৃতির সামগ্রিক চেহারাটা পুরোপুরি ইসলামানুগ হবে না, তা বলাই বাহুল্য। রোমান্টিক কল্পনার কাছে আত্মসমর্পণ করা এবং যুক্তি ও বাস্তব-জ্ঞান বর্জন করা সব-যুগের সব-দেশের মানুষেরই একটা বড় দুর্বলতা। একমাত্র এইরকম কল্পনার কাছে পুরোপুরি আত্মসমর্পণ করলে তবেই ভুলে থাকা সম্ভব যে পূর্ব-পাকিস্তানের সংস্কৃতিতে এখানকার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলির উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে; এবং এই কারণে এ-প্রদেশের সংস্কৃতি পুরোপুরি ইসলামী সংস্কৃতি হওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু আরও একটা বড় কারণ আছে।

সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলির কথা বাদ দিয়ে যদি কেবল মুসলমানদের কথা ধরা

যায়, তবু এমন কথা বলা যায় না যে সব মুসলমানকেই বিশুদ্ধ ইসলামী আদর্শে সংস্কৃতিমূলক কাজ করে যেতে হবে। মুসলমান সর্বদা পিউরিটানিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে বিশুদ্ধ ইসলামী সংস্কৃতি গড়ে তোলেনি, ভবিষ্যতেও তুলবে না, কারণ সেটা সম্ভব নয়। পল্লীগীতি বা বাউল-সঙ্গীত, লোকগাথা বা আধুনিক সাহিত্য কোনোটাই বিশুদ্ধ ইসলামী বস্তু নয়, এমনকি এ-সবের মধ্যে বে-শরা অনৈসলামিক জিনিস যথেষ্ট পরিমাণে মিশে রয়েছে। কিন্তু তাই বলে কি বলতে হবে যে এগুলি পূর্ব-পাকিস্তানী সংস্কৃতির অঙ্গীভূত নয়, ভারতীয় সংস্কৃতির অঙ্গীভূত ? এবং এছাড়াও আরও বিস্তর ক্রিয়া রয়েছে যার সঙ্গে ইসলামের পুরোপুরি সামঞ্জস্য হয় না। যেমন নৃত্যকলা। মরহুম বুলবুল চৌধুরী তাঁর নৃত্য উদ্ভাবনীগুলির মধ্য দিয়ে মুসলিম সংস্কৃতির রূপ দিয়েছিলেন, কিন্তু নৃত্যকলা ক্লাসিক্যাল ইসলাম-অনুমোদিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান নয়। নাট্যমঞ্চও ক্লাসিক্যাল ইসলামী-সংস্কৃতির বহির্ভূত সাংস্কৃতিক উদ্যম। মধ্যযুগের মুসলমানেরা গ্রীকদের কাছ থেকে দর্শন বিজ্ঞান সব-কিছুই নিয়েছিল, কিন্তু নেয়নি নাটক। তা বলে আমরা নাট্যমঞ্চ বর্জন করতে যাচ্ছি না। তারপর চিত্রকলা। ইসলাম চিত্রকলাকে অনুমোদন করেনি, এর বিরোধিতাই করেছে। এসব আমাদের নায়েবে-নবীদেরই কথা। (মাত্র দু'একজন অন্যরূপ বলেন।) কয়েক বছর আগে একজন বিশিষ্ট আলেম তাঁর নিজের ফটো পর্যন্ত নিতে আপত্তি করেছিলেন। কায়েদে আজমের ছবি ঘরে টাঙিয়ে রাখতে বা বই বই-পত্রিকায় ছাপতে আলেম সমাজের আপত্তি না থাকলেও, পাকিস্তানী নোটে তাঁর প্রতিকৃতি ছাপতে আপত্তি উঠেছিল। চিত্রকলার প্রতি এই বিরূপতার জন্যই মধ্যযুগের গোঁড়া ধর্মবাদীরা এ্যারাবেস্ক ছাড়া আর কোনো চিত্রপদ্ধতি সমর্থন করেননি। সে যুগের ইরাণী পুঁথিচিত্রণ এবং মোগল চিত্রকলা এই ধর্মবাদীদের উপেক্ষা করেই গড়ে উঠেছিল। এই চিত্রকলাকে কি বলা হবে ? ইসলামী ? আমি ইরাণী পুঁথিচিত্রণের মধ্যে হজরত মোহম্মদের চিত্র দেখেছি। তা ছাড়া বর্তমান যুগের কোনো কোনো শিল্পীর কতকগুলি চিত্র, যেমন জুবায়দা আগার "যৌবন" কামরুল হাসানের নগ্ন "স্নানার্থিনী", এগুলিকে কোনো মতেই বিশুদ্ধ ইসলামী সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত করা চলে না। চিত্রকলার প্রতি ইসলামের বিরূপতার অন্যতম ফল হিসাবে মুসলিম শিল্পীরা চিরদিনই ভাস্কর্যশিল্পকে উপেক্ষা করে এসেছেন। কিন্তু ধর্মবাদীদের প্রভাব-মুক্তির যে-সব লক্ষণ গত কয়েক শতাব্দীতে লক্ষ্য করা গেছে তার যদি কোনো তাৎপর্য থাকে তবে অনায়াসেই

বলা চলে, ভাস্কর্যশিল্পও চিরদিন পূর্ব-পাকিস্তানী শিল্পী ও জনসাধারণের কাছে অনাদৃত থাকবে না।*

এইভাবে চিত্রে ও নৃত্যে, সঙ্গীতে ও সাহিত্যে এবং সাংস্কৃতিক কার্যকলাপের আরও বহুবিধ ক্ষেত্রে মুসলীম শিল্পী-সাহিত্যিকরা এমন অনেক জিনিস সৃষ্টি করেছেন যা ইসলামী বস্তু নয়, যার সঙ্গে ধর্মের আদৌ কোনো সম্পর্ক নেই, এমনকি যা কখনো কখনো অনৈসলামিক। অতীতে এরূপ ঘটেছে, ভবিষ্যতেও ঘটবে এবং ঘটাই স্বাভাবিক। এই মুসলীম সংস্কৃতির সঙ্গে সংখ্যালঘু সংস্কৃতি যোগ করে যে সামগ্রিক সংস্কৃতি, তাই পূর্ব-পাকিস্তানের এবং সংস্কাত তা পাকিস্তানেরও সংস্কৃতি। পশ্চিম পাকিস্তানের সংস্কৃতিকে আমরা ঘনিষ্ঠভাবে জানি না; কিন্তু বিশ্বাস করি, সেখানকার সংস্কৃতিও পুরোপুরি ইসলামানুগ নয়। সেখানকার (এবং এখানকার) পরিচ্ছদরীতি, যেমন শালওয়ার, টুপী, পাগড়ী মূলতঃ আরব থেকে আমদানী হয়নি, হয়েছিল মধ্য-এশিয়া থেকে; (শাড়ী সম্পূর্ণ বাঙালি তথা ভারতীয় বস্তু) সেখানকার খটক নৃত্য বা লুড্ডি নৃত্যকেও ক্লাসিক্যাল ইসলামী সংস্কৃতির অনুমোদিত অনুষ্ঠান বলা যায় না। তাই বলে সংস্কৃতির এই বহিরঙ্গগুলিকে অপাকিস্তানী বলে বাতিল করতে কেউ বলছেন না।

পাকিস্তানী সংস্কৃতিতে "অনৈসলামিক" বস্তুর পরিমাণ কম নয়, সংখ্যালঘু-সংস্কৃতি এর মধ্যে ধরা হোক বা না হোক। এই "অনৈসলামিক" সংস্কৃতিকে বাদ দিয়ে যদি আমরা বিশুদ্ধ ইসলামী সংস্কৃতিকেই আমাদের জাতীয় সংস্কৃতি বলি তবে আমাদের সংস্কৃতির অনেক-কিছু, এমনকি হয়তো অধিকাংশই বাদ দিতে হবে এবং সে দাবি হবে যেমন অযৌক্তিক, তেমনি অবাস্তব। কেবল অতীত বা বর্তমান সম্বন্ধে নয়, ভবিষ্যৎ সম্বন্ধেও সেই কথা। আমাদের জাতীয় সংস্কৃতির মধ্যে ইসলামী সংস্কৃতি থাকবে, থাকা অনিবার্য এবং জীবনের বহু ক্ষেত্রেই তার প্রভাব পড়বে, কিন্তু বিশুদ্ধ ইসলামী সংস্কৃতিই আমাদের সব কথা এবং শেষ কথা হবে না, যেমন এতদিন হয়নি। পিউরিটানিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে অতীতের মুসলমানেরা বিশুদ্ধ ইসলামী সংস্কৃতি গড়তে পারেননি; ভবিষ্যতেও সেটা সম্ভব হবে না। এই কারণে যে, সংস্কৃতির সব-কিছুই ইসলাম বা আর কোনো ধর্মেরই চতুঃসীমার মধ্যে পড়ে না, এবং এক্ষেত্রে এমন অনেক-কিছু আছে—যেমন নৃত্য চিত্রকলা, এমনকি সঙ্গীত—যা ধর্ম সম্বন্ধীয় ব্যাখ্যাকে উপেক্ষা করেই গড়ে উঠেছে। ভবিষ্যতেও তা হবে এবং হবে সাংস্কৃতিক প্রয়োজনে। অতীত এবং

* সম্প্রতি সরকারী আর্ট কলেজে ভাস্কর্য শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে (পাদটীকা ১৯৬৮)

বর্তমানের অভিজ্ঞতা সেই ভবিষ্যতের ইঙ্গিত বহন করে। শুনতে অপ্রীতিকর মনে হলেও এবং হৃদয়ে বেদনার অনুভূতি জাগলেও বিশ্বমানবের ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা এই যে, আজ পর্যন্ত খৃস্টান, হিন্দু বা মুসলমান যে সংস্কৃতি গড়ে তুলতে পেরেছে, তা অনেকাংশে ধর্মবাদীদের ধর্মীয় ব্যাখ্যাকে উপেক্ষা বা লঙ্ঘন করেই সম্ভব হয়েছে। ধর্মীয় ব্যাখ্যার চতুঃসীমার মধ্যে তারা যদি তাদের কর্মক্ষেত্রকে সীমিত করে রাখত, তাহলে তারা, এবং সেই সঙ্গে সারা বিশ্ব, সংস্কৃতির দিক দিয়ে অনেক দরিদ্র থেকে যেত, যেমন দরিদ্র থেকে যেত বিজ্ঞানে, দর্শনে, সাহিত্যে।

স্বাধীনতার আমলে পাকিস্তানের অধিবাসীদের সামনে আজ নূতন নূতন দিগন্ত উন্মুক্ত হচ্ছে। তারা সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ছে, এবং বিদেশের মানুষও এদেশে আসছে। এই আন্তর্জাতিক সংযোগের ফলে এদেশের সাহিত্য, সঙ্গীত, নৃত্য, চিত্রকলা, দর্শন এবং সমাজের ক্ষেত্রে বিচিত্র রকমের প্রভাব পড়ছে, ভবিষ্যতেও পড়বে। এর মধ্যে কিছু কিছু মন্দ জিনিস হয়ত থাকবে কিন্তু ভাল জিনিসও থাকবে। অতীতে সংস্কৃতির যেমন রূপান্তর হয়েছে ভবিষ্যতেও তেমনি হবে। বিশুদ্ধ ধর্মীয় ব্যাখ্যার নির্দিষ্ট পথে এ-রূপান্তর ঘটেনি এবং ঘটবে না। এই কারণেই আমাদের জাতীয় সংস্কৃতি হিসাবে বিশুদ্ধ ইসলামী সংস্কৃতির কথা বলা অবাস্তব রোমান্টিকতা মাত্র।

আমাদের যে সংস্কৃতি গড়ে উঠবে তা হবে জাতিভিত্তিক, তার ধর্মীয় বৈশিষ্ট্যগুলি প্রধান হতে পারে, অপ্রধানও হতে পারে। সে সংস্কৃতি আমাদের সামাজিক এবং জাতীয় জীবনকে সুন্দর ও সমৃদ্ধ করলেই খুশী হব, সেটাই হবে তার বিচারের মানদণ্ড। পিউরিটানিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে সংস্কৃতি গড়ে তুলতে গেলে এবং তার বিচার করতে গেলে আমাদের অনেক-কিছু থেকেই বঞ্চিত হতে হবে। আমরা শুধু এইটুকু নিম্নতম শর্ত দিতে পারি যে আমাদের সংস্কৃতি যেন রাষ্ট্রবিরোধী না হয় এবং সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ প্রচার না করে। এই শর্তটুকু পালিত হলে সে সংস্কৃতি গোঁড়া ধর্মবাদীদের ব্যাখ্যা মাফিক বিশুদ্ধ ইসলামী সংস্কৃতি হলো কিনা, তা আমরা দেখতে যাব না।

[১৯৫৮

ধানচোর

সত্যেন সেন

সন্ধ্যাবেলা আমাদের জনৈক গুপ্তদূত মারফত একটা গোপন খবর পাওয়া গেল। জমিদার ধীরেন ভট্টাচার্যের লোকেরা আজই নাকি ফেরেজতুল্লাহর জমির ধান কেটে নিয়ে যাবে। ফেরেজতুল্লাহ আমাদের কৃষক সমিতির একজন কর্মী। ওরা রাত্রির অন্ধকারে এসে কাজ সেরে নিয়ে দিনের আলো দেখা দেবার আগেই অন্তর্ধান হয়ে যাবে। ওদের সঙ্গে নাকি বাছা বাছা লাঠিওয়ালা আসছে। খবরটাকে অবিশ্বাস করে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। আমাদের এই গুপ্তদূতটি এ পর্যন্ত এ ধরনের যত খবর নিয়ে এসেছে, তার একটিও মিথ্যে হয়নি।

খুলনার প্রখ্যাত কৃষক নেতা বিষ্ণু চ্যাটার্জি তাঁর অতীত দিনের কৃষক আন্দোলনের স্মৃতিকথা বলে চলছিলেন। সেই সমস্ত রোমাঞ্চকর কাহিনী মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনছিলাম। শ্রাবণের সন্ধ্যা। সেই কখন থেকে একটানা বৃষ্টি চলেছে। চায়ের পেয়ালায় শেষ চুমুক দিয়ে বললাম, জমিদাররা চিরদিনই কৃষকদের ধান হরণ করত, তা জানি। কিন্তু তাই বলে এমন চোরের মত গোপনে, রাত্রিবেলা?

হ্যাঁ তাই। চোরের মতই। দিনের আলোয় এভাবে হামলা করবার মত দুঃসাহস ওদের ছিল না।

আমি বললাম, ব্যাপারটা একটু পরিষ্কার করে বলুন। এভাবে ধান চুরি করবার উদ্দেশ্যটা কি? জমিদার কি ফেরেজতুল্লাহর উপর তার মনের ঝাল মিটাতে চাইছিল বা তাকে জমি থেকে উৎখাত করবাব মতলব আঁটছিল?

জমি থেকে উৎখাত করার মতলব? হ্যাঁ তাই বটে। আইন মোতাবেক সেই ব্যবস্থা আগেই সুসম্পন্ন হয়ে গিয়েছিল। জমিদার ধীরেন ভট্টাচার্য ইতিপূর্বেই বাকী খাজনার দায়ে তার সমস্ত জমি নীলামে উঠিয়ে নিজের হাতে নিয়ে এসেছিলেন, কিন্তু হাতে আসার পরেও হাতের মুঠোর মধ্যে পাচ্ছিলেন না। ফেরেজতুল্লাহ তার জমি দখল ছাড়েনি। যেন কিছুই হয়নি, এইভাবে সে তার চাষবাসের কাজ চালিয়ে যাচ্ছিল। কৃষক সমিতির সেই রকম নির্দেশই ছিল।

একটু আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করলাম, কৃষক সমিতি এমন নির্দেশ দিয়েছিল?

এ ব্যাপারে আইন তো সম্পূর্ণভাবে জমিদারের পক্ষে। ফেরেজতুল্লাহ কি করে তাকে ঠেকিয়ে রাখবে ?

কি করে ঠেকিয়ে রাখবে ? সংঘবদ্ধ শক্তির জোরে ঠেকিয়ে রেখেছিল তারা শেষ পর্যন্ত। একা ফেরেজতুল্লাহ নয় তো, সেখানকার বহু কৃষকেরই এই সমস্যা—আরও তাদের জীবন-মরণ সমস্যা। আইন বাঁচিয়ে এই সমস্যার সমাধান সম্ভব ছিল না। এর পিছনকার ইতিহাসটা শুনলে বুঝতে পারবেন।

শৈলেন ঘোষ আর ধীরেন ভট্টাচার্য, এরা তুজন এ অঞ্চলের বড় জমিদার। শোভন ইউনিয়নের বিল অঞ্চলের জমিগুলিকে কি করে কৃষকদের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে নিজেদের খাস করে নেওয়া যায় বহুদিন আগে থেকে তারা এই ফন্দী আঁটছিল। জমিদাররা প্রয়োজন মনে করলে ছলে বলে কৌশলে নানা ভাবেই প্রজাদের জমি খাস করে নিত। কিন্তু এরা এ ব্যাপারে যে কৌশল অবলম্বন করল তা যেমন অভিনব, তেমনি অমানুষিক। আপনাকে তো আগেই বলেছি, এই বিল অঞ্চলের সমুদ্রের নোনা পানি প্রবেশ করার ফলে ধান জন্মাতে পারত না। আর ধানই হচ্ছে এই সমস্ত জমির একমাত্র ফসল। কাজেই মাঠের পর মাঠ সারা বছর খিল হয়ে পড়ে থাকত। বাঁধ তুলে নোনা পানির প্রবাহকে আটকে দিতে পারলে এই সমস্যার প্রতিকার হয়। এখানকার কৃষকরাও অনেকদিন থেকে নিজেদের উদ্যোগে বাঁধ তুলবার জন্য চেষ্টা করে আসছিল। কিন্তু জমিদারের ঘোর আপত্তি, ওখানে কোন বাঁধ বাঁধা চলবে না। এতগুলো লোকের বহু আবেদন সত্ত্বেও হুজুরের মন গলল না।

কিন্তু জমিদার কি এমন হুকুম দিতে পারে ?

ঠিক বলেছেন। প্রজারা নিজেদের জায়গায় নিজেদের খরচে বাঁধ তুলবে, তার বিরুদ্ধে কার কি বলবার থাকতে পারে ? কিন্তু তখন জমিদাররা ছিল দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। তাদের কথাই আইন। ন্যায়ই হোক আর অন্যায়ই হোক, তাদের কথা অমান্য করবে, কার ঘাড়ে এমন দশটা মাথা ?

কিন্তু জমিদারের আপত্তির কারণটাই বা কি ? জমিতে যদি ফসল না ফলে তাহলে কৃষকেরাই বা কেমন করে খাজনা যোগাবে ?

সাধারণ বুদ্ধিতে এই কথাই মনে হবে। কিন্তু এই আপত্তির পিছনে ছিল এক বিরাট ষড়যন্ত্র। জমিদাররা কামনা করছিল এই সমস্ত জমি এইভাবে অজন্মা পড়ে থাকে। তা'হলে কৃষকরা টাকার অভাবে সময়মত খাজনা দিতে পারবে না. শেষকালে বাকী খাজনার দায়ে ওদের জমি নীলামে তুলে তাদের খাস করে

নেবে। এই ষড়যন্ত্রের ফাঁদ পেতে ওরা একের পর এক কৃষকদের জমি খাস করে নিয়ে চলছিল। সে সংকটের মুখে কৃষক সমিতি গড়ে উঠল। সমিতি নির্দেশ দিল, কেউ জমির দখল ছাড়বে না।

এবার জমিদার আর কৃষকদের মধ্যে জমির মালিকানা নিয়ে এখানে ওখানে কিছু কিছু সংঘর্ষও হয়ে গেল। কিন্তু কৃষকরা এক জোট হয়ে উঠবার ফলে জমিদার বিশেষ স্থবিধা করে উঠতে পারছিল না। আর এই সমস্ত লড়াইর মধ্য দিয়ে কৃষকের সাহসও বেড়ে গিয়েছিল। তারা জমিদারের নিষেধ অমান্ত করে বরাবুনিয়ার বাঁধ গড়ে তুলল। তার ফলে অদ্ভুত পরিবর্তন ঘটল। বছর তুই যেতে না যেতেই দেখা গেল যে, সেই অভিশপ্ত মাটি ফসলের সম্ভার বুকে নিয়ে সোনালী হাসি হেসে উঠেছে। সেই হাসি জমিদারের বুকে শেলের মতই বিঁধছিল।

ফেরেজতুল্লাহর জমিতে এবার চমৎকার ধান ফলেছে। এ-বছরের সেরা ধান। দেখলে পরে চোখ ফেরানো যায় না। ধীরেন ভট্টাচার্যের নায়েবও বোধ হয় ফেরাতে পারছিল না।

এ কি কম আফসোসের কথা। এত বুদ্ধি খাটিয়ে এনে কৌশল করে ফেরেজতুল্লাহর জমি খাস করে নেওয়া হলো আর সে কিনা সেই জমিতে এমন খাসা ফসল ভোগ করবে? এ কি সয়? নায়েব এবার বোধহয় শক্তি পরীক্ষায় নামছে। আজ যদি সে ধান লুটে নিতে পারে, তা হ'লে এই ধরনের হামলা ব্যাপকভাবে চলতে থাকবে। কাজেই প্রথম কিস্তিতেই তাকে ভালমত শিক্ষা দিয়ে দেওয়া দরকার, যাতে এর পরে আর এগোতে সাহস না করে।

দেরী করার সময় ছিল না। সবাইকে ডাকিয়ে এ-বিষয়ে পরামর্শ করা যাবে সে স্থযোগও নেই। নিজ দায়িত্বে গ্রামে গ্রামে খবর পাঠিয়ে দিলাম, যাতে সবাই তৈরী থাকে, আর বিপদ সঙ্কেতের শব্দ শোনা মাত্রই যেন যার যার হাতিয়ার নিয়ে ফেরেজতুল্লাহের জমির দিকে ছুটে যায়। আমি যেখানে ছিলাম সেখানে থেকে ফেরেজতুল্লাহর বাড়ির দূরত্ব তু'মাইল।

এক বিষয়ে একটু ভাবনা হচ্ছিল। আমাদের এই অঞ্চলে ভাল লাঠিয়ালের দল নেই। আর ওরা নাকি জবরদস্ত লাঠিয়ালদের নিয়ে আসছে। তার উপরে তুটো একটা বন্দুকও হয়তো থাকবে। বন্দুক আমাদের নেই। তার জন্ত কিছু নয়, এসব ক্ষেত্রে বন্দুক বন্দুকে লড়াই কমই হয়। কিন্তু ওদের লাঠিয়ালরা খালি মাঠে গোল না দিয়ে যায়। সেটা বিষম কেলেঙ্কারীর কথা হবে।

আগে জানা থাকলে খবরাখবর করে জানা শোনা কিছু কিছু লাঠিয়ালকে আনিয়ে নেওয়া যেত। কিন্তু এখন সেই শেষ মুহূর্তে তা কেমন করে সম্ভব? হঠাৎ মনে পড়ে গেল ধানীবুনিয়ার হীরালাল বাইনের দলের কথা। খুলনা জেলার যে কয়টা প্রথম শ্রেণীর লাঠিয়ালদের দল আছে, হীরালাল বাইনের দল তার মধ্যে একটি। হীরালালকে দেখার সুযোগ হয়নি কোনদিন। সে আমাদের কৃষক সমিতির লোকও নয়। সাহায্যের জন্য ডাকতে পারি, কোন দিক দিয়ে এমন সম্পর্ক নেই। তবে একটা কথা, কিছুদিন আগে আমাদের এখানকার একজন কৃষক কর্মী ধানীবুনিয়ায় গিয়েছিল তার এক আত্মীয় বাড়িতে। আমাদের কর্মীটি ধানীবুনিয়ার লোকদের মধ্যে কৃষক সমিতির আলোচনা তুলেছিল। তারা নাকি খুব মন দিয়ে তার কথা শুনেছিল। আমাদের সেই কর্মীটির নাম সোনা। হঠাৎ কেমন এক খেয়ালের ঝোঁকে সোনাকে পাঠিয়ে দিলাম ধানীবুনিয়ায়।

আজ রাতে আর ঘুমিয়ে কাজ নেই। জমিদারের দল যদি আসেই, তবে তাদের সঙ্গে একবার মোলাকাত করতে হবে তো। এ কাজে ও কাজে দুপুর রাত গড়িয়ে গেল। সারা দিনের ক্লান্তিতে দেহটা ভেঙে পড়ছিল। ভাবলাম, একটু গড়িয়ে নেওয়া যাক, ঘুমিয়ে না পড়লেই হলো। কিন্তু রাজ্যের ঘুম শিকারীর মত আমার পাশ ঘেঁসে অপেক্ষা করছিল। নিঃশব্দে তারা তাদের মায়াজাল ছড়িয়ে দিল। ধরা পড়ে গেলাম।

তারপর কখন কে জানে একসঙ্গে কতকগুলো শিঙ্গা আর ঢোলের শব্দে সচেতন হয়ে তড়াক করে উঠে বসলাম। এই যে, তাহলে সত্যসত্যই এসে গেছে ওরা। দু'মাইল দূরের বিপদ সংকেত গ্রাম থেকে গ্রাম হয়ে এগোতে এগোতে এখানে এসে পৌছেচে।

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলাম, ঘণ্টাখানেক রাত বাকী আছে। যে যেমন অবস্থায় ছিলাম সেই অবস্থাতেই কেউ লাঠি, কেউ দা, কেউ সড়কি, যার যা হাতিয়ার নিয়ে ছুটলাম। প্রথমে ৩০।৪০ জন একসঙ্গে তারপর যতই এগোই, সংখ্যা ততই বেড়ে চলে। যখন অকুস্থলে এসে পৌছলাম, তখন আমাদের সংখ্যা কয়েক শ'তে এসে দাঁড়িয়েছে। এ রকম দল চারিদিক থেকেই আসছে।

এসে যে অবস্থা দেখলাম, তাতে অনুশোচনার অবধি রইল না। কেন এমন সময় এ জায়গায় না থেকে ওখানে পড়ে রইলাম। অসংগঠিত জনতা সময় বিশেষ চরম উত্তেজনার মুখে যথেষ্ট বীরত্বপূর্ণ কাজ করলেও সুসংগঠিত দলের

বিরুদ্ধে তারা প্রায়ই চূড়ান্ত দুর্বলতার পরিচয় দেয়। এ-ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। এখানে সংগঠিত ভলানটিয়ার বাহিনী ছিল না, না ছিল উপযুক্ত সাহসী নেতা। এ-কথাটা আগেই বিবেচনা করে দেখা উচিত ছিল। আমাদের লোকেরা ওদের চেয়ে সংখ্যায় অনেক বেশী হলেও ওদের লাঠিয়ালদের রণহুঙ্কার শুনে আর নায়েবের হাতের বন্দুক দেখে ভয়ে পিছিয়ে জড়সড় হয়ে রইল। এমন কি ঘাবড়ে গিয়ে বিপদ সংকেতটা জানাতেও দেরী করে ফেলল। আর ওরা সেই সুযোগে চটপট ধান কেটে সাত আটটা নৌকা বোঝাই করে নিয়ে শাখাবাহী নদী দিয়ে পালিয়েছে।

ওদিকে চোরেরা তাদের কাজ হাসিল করে পালিয়ে যাচ্ছে। এদিকে চলছে হট্টগোল। একে অপরকে দুষছে। আর বাইরে থেকে যারা এসেছে, তাদের মধ্যে কেউ কেউ এ-অবস্থায় কি করা উচিত ছিল সে সম্পর্কে মূল্যবান উপদেশ ঝেড়ে চলেছে। অনেকেই আমার অভিমত জানবার জন্য আমার মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল। কিন্তু আমাকে কোন কথা বলবার সুযোগ না দিয়ে সামনে এগিয়ে এল এক বুড়ো। সবাইকে উদ্দেশ্য করে সে কুৎসিৎ আর অশ্লীল ভাষায় গাল দিয়ে উঠল। তারপর বলল, কুত্তার বাচ্চারা, ধান নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে ওরা, আর তোরা এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি দেখছিস? ছোট্ ব্যাটারা ছোট্ ওই শালার ধানচোরদের কান ধরে টেনে নিয়ে আসতে হবে।

বুড়ো আর কোন কথা না বলে কাঁধে লাঠি নিয়ে সবার আগে ছুটল। দুদিন আগেও তাকে দেখেছি একটু নুয়ে পড়ে পা টেনে টেনে হাঁটতে। পায়ে নাকি রস জমেছিল। কোথায় গেল রস, কোথায় কি, জোয়ানদের পিছনে ফেলে বুড়ো এগিয়ে যাচ্ছে। এরই নাম নেতৃত্ব। কি ছিল তার কথায় কে জানে! হা-হুতাশ আর পরস্পর কথা কাটাকাটি ছেড়ে লোকগুলো এখন উর্দ্ধশ্বাসে তার পেছনে পেছনে ছুটে চলেছে। আমিও ছুটলাম সবার সঙ্গে। শাখাবাহী নদীর কাছে আসতেই অস্পষ্টভাবে নৌকাগুলোকে দেখা গেল। নৌকাগুলো আমাদের চেয়ে বেশ কিছুটা এগিয়ে গেছে; কিন্তু আমাদের দৃষ্টিসীমার বাইরে চলে যেতে পারেনি এখনও।

আমরা দুভাগ হয়ে শাখাবাহী নদীর দুই তীর ধরে ছুটে চলেছি। হাজার হাজার লোক ছুটছে, কারু মুখে কথা নেই, কোন আওয়াজ নেই, নিঃশব্দে শিকারীর মত ছুটে চলেছে। ওরাও দেখতে পেয়েছে আমাদের। তাই ওদের গতিবেগ বেড়ে গেছে। আমরা এখান থেকেও তা বুঝতে পেরেছি। কিন্তু

যত জোরই থাক্ না কেন ধরা পড়তেই ওদের হবে ; এ বিষয়ে আমাদের মনে কোনই সংশয় নেই। মুখ দেখে বোঝা যায় এই একই বিশ্বাস সকলেরই মনে। মনে হচ্ছে ওদের ধরবার জন্য যদি প্রয়োজন হয় আমরা পৃথিবীর এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত পর্যন্ত যেতে প্রস্তুত আছি।

কঠিন প্রতিযোগিতা। কিন্তু একটা জিনিস পরিষ্কার, আমাদের ব্যবধান ক্রমেই কমে আসছে। ধরা ওদের পড়তেই হবে। রাতের অন্ধকার কেটে গিয়ে দিনের আলো ছড়িয়ে পড়ছে। আকাশের সব তারা ডুবে গেছে। শুধু আকাশের পশ্চিম প্রান্তে শুকতারাটা জ্বল জ্বল করে জ্বলছে। এখন আমরা স্পষ্টভাবে নৌকাগুলোকে পৃথক পৃথক ভাবে দেখতে পাচ্ছি। একটা বিরাট ভাওয়াইয়া নৌকা। তার পিছনে আরও ৭।৮ খানা নৌকা। উল্লাসে চীৎকার করে উঠলাম আমরা, এবার আর রেহাই নেই ওদের। আমাদের হাতে ধরা দিতেই হবে।

কিন্তু আর কিছুদূর এগোতেই আমরা সবাই চমকে গেলাম। সামনেই ভদ্রা নদী। এ-কথাটা আমাদের মনেই ছিল না। ওদের নৌকাগুলো যদি কোনমতে ভদ্রায় গিয়ে পড়তে পারে, তাহলে আর অনুসরণ করা চলবে না, ওরা আমাদের নাগালের বাইরে চলে যাবে। অথচ এখন আমরা একেবারেই কাছে এসে পড়েছি। ওদের নৌকার মাঝিরা ভদ্রায় গিয়ে পড়বার জন্য উর্দ্ধশ্বাস বৈঠা টেনে চলেছে। এতদূর এসে একটুকুর জন্য হেরে যাব আমরা! উত্তেজনায়, আশঙ্কায় আমাদের বুক কেঁপে উঠল।

ঠিক এমনি সময় এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটল। অবাক হয়ে দেখলাম ওদের নৌকাগুলো স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে। ছুটতে ছুটতে আমরা ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম, এবার নতুন বল পেয়ে আরও বেগে ছুটলাম। আরও কিছুটা সামনে এগিয়ে দেখি, গোটা দশেক নৌকা পাশের খাল থেকে বেরিয়ে এসে ওদের পথ আটকে দাঁড়িয়েছে। প্রতিটি নৌকায় ৪।৫ জন করে লোক। তাদের হাতে ঢাল আর সড়কি। প্রথমে কয়েক মুহূর্ত আমরা কিছু বুঝতে পারলাম না। হঠাৎ আমাদের মধ্যে একজন চেঁচিয়ে উঠল, ওই যে সোনা হাত নেড়ে ইশারা করছে। এরা ধানীবুনিয়ার হীরালাল বাইনের দল, আমাদের সাহায্য করতে এসেছে। তাই বটে, তাই বটে, এবার আমাদের মধ্যে আনন্দের কোলাহল পড়ে গেল। জমিদারের ভাওয়াইয়া নৌকার মধ্যে কতক্ষণ পরামর্শ চলল। তারপর জমিদারের দল হার মেনে আত্মসমর্পণ করল। পরে শুনেছি, ওদের লাঠিয়ালরা ধানীবুনিয়ার লাঠিয়ালদের সংগে লড়তে সাহস করেনি। ভাওয়াইয়ার ছাদের

উপর স্বয়ং নায়েব মশাই বন্দুক বাগিয়ে বসেছিলেন। অবস্থা বিপর্যয় দেখে তিনি আমার দিকে তাকিয়ে আর্তকণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠলেন, বিষ্ণুবাবু, আমি আপনার সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই, যদি ভরসা দেন তো যেতে পারি। বললাম, ভয় করবেন না নেমে আসুন।

আমাদের লোকেরা তেতে আগুন হয়েছিল। এই নায়েবের বিরুদ্ধে তাদের বহুদিনের ক্রোধ জমাট বেঁধে আছে। বহু কষ্টে শান্ত করলাম তাদের। তারা দুভাগ হয়ে পথ করে দিল। তাদের মধ্য দিয়ে নায়েব মশায় কাঁপতে কাঁপতে এগিয়ে এলেন। কাঁপবার কথাই। যাদের মধ্য দিয়ে আসছিলেন, দেখলাম তাদের চোখগুলো ক্ষুধার্ত বাঘের মত জ্বলছে। নায়েব মশাই এসেই আমাকে জড়িয়ে ধরলেন। কাতরকণ্ঠে বললেন, বিষ্ণুবাবু, আপনি ব্রাহ্মণ সন্তান, দেবতার সমান, আমি আপনার স্মরণাগত; আমাকে রক্ষা করুন। বলেই তাঁর হাতের বন্দুকটা আমার হাতে তুলে দিয়ে বললেন, এই বন্দুকটাও আপনার জিম্মায় ছেড়ে দিলাম। বন্দুকের ব্যাপারটা প্রথমে বুঝতে পারিনি। একটু বাদেই বুঝলাম। এদের যুদ্ধের নিয়ম অনুসারে বিজেতা ধানীবুনিয়ার লাঠিয়ালরা পরাজিত জমিদারের লাঠিয়ালদের ঢাল, সড়কি এবং অন্যান্য যা কিছু হাতিয়ার ছিল, সব কিছু দখল করে নিল। কিন্তু নায়েবের বন্দুকের বেলায় গোলমাল বাঁধল। বুদ্ধিমান নায়েব ভবিষ্যৎ চিন্তা করে আগেই বন্দুকটা আমার জিম্মায় রেখে দিয়েছেন। ওদের বলে কয়ে বুঝিয়ে তার বন্দুকটা শেষ পর্যন্ত তাকে ফিরিয়ে দিলাম।

ধানীবুনিয়ার দলের সর্দার হীরালাল বাইন দেখা করতে এলেন। শান্ত সুন্দর কমনীয় চেহারা। দেখে অবাক হয়ে গেলাম। এত বড় লাঠিয়াল সর্দার এই চেহারা! দু'হাত বাড়িয়ে জড়িয়ে ধরে বললাম, আমাদের এই বিপদের সময় আপনারা যেভাবে সাহায্য করেছেন সেকথা কোনদিন ভুলতে পারব না। কৃষক সমিতির পক্ষ থেকে আমি আপনাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমার কথা শুনে লাঠিয়াল সর্দার হীরালাল বাইন লজ্জায় আরক্ত হয়ে উঠলেন। বললেন, ছি, ছি, এ সব কি বলছেন। আমরা কৃষকের সন্তান, আমাদের কৃষক ভাইদের জন্য যেটুকু পেরেছি, তাই করেছি, এতে ধন্যবাদের কি আছে?

তার এই কথাটুকুর মধ্য দিয়ে আন্তরিকতা ঝরে পড়ছিল। মুগ্ধ হয়ে গেলাম। যারা ধান চুরি করে নিয়ে যাচ্ছিল, শেষ পর্যন্ত তারা নিজেরাই ফেরেজতুল্লাহর ধান ফেরেজতুল্লাহর ঘরে পৌঁছে দিয়ে এল। হাজার হাজার কৃষক বিজয় গৌরবে জয়ধ্বনি করতে করতে ফিরে এল ঘরে।

পরদিন আমরা ক'জন মিলে ঘরে বসে আলাপ করছি, এমন সময় ৭।৮ জন লোক আমার সঙ্গে দেখা করতে এল। পরিচয় নিয়ে জানলাম তারা জমিদার পক্ষের লাঠিয়াল, যারা কাল ধান কেটে নিতে এসেছিল। তাদের মধ্যে মাতব্বর গোছের একজন বয়স্ক লোক সামনে এগিয়ে এসে সেলাম দিয়ে একটা দশ টাকার নোট আমার হাতে তুলে দিল।

আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করলাম, এ আবার কি, টাকা কিসের?

ওরা কয়েকজন একসঙ্গে বলে উঠল কৃষক সমিতির নজর।

আপত্তি করলাম, ফিরিয়ে দিতে চেষ্টা করলাম, কিন্তু কিছুতেই কিছু হ'ল না, ওরা টাকাটা জোর করে গছিয়ে দিল। সবার পক্ষ থেকে প্রতিনিধি স্থানীয় লোকটি দুঃখ প্রকাশ করে বলল, আমরা না বুঝে শুনে অত্যন্ত গর্হিত কাজ করে ফেলেছি। সেজন্য আমরা কৃষক সমিতির কাছে মাফ চাই। যাবার সময় ওরা সবাই কৃষক সমিতির সভ্য হয়ে গেল, আর বলে গেল যে, ওরা ওদের নিজেদের গ্রামে কৃষক সমিতি বানাবে। সমস্ত কৃষক যখন দল বাঁধছে, তখন তারাই বা আল্‌গা হয়ে পড়ে থাকবে কেন?

ওরা চলে যাবার সময় আমাদের এখানকার কৃষক সমিতির লোকেরা খুশী হয়ে কাল ওদের কাছ থেকে যে সমস্ত হাতিয়ার কেড়ে নিয়ে এসেছিল, তার সবগুলো ফিরিয়ে দিল। দিনটি ভালই বলতে হবে। ঠিক সেই দিনই ধানীবুনিয়া থেকে একজন লোক এসে হাজির সঙ্গে হীরালাল বাইনের এক চিঠি। চিঠিতে লিখেছে, আমরা যেন এখান থেকে কৃষক সমিতির কাগজপত্র সহ একজন ভাল কর্মীকে তাদের ওখানে পাঠিয়ে দেই। তারা স্থির করেছে গ্রামশুদ্ধ সবাই কৃষক সমিতির সভ্য হবে।

একসঙ্গে অনেকক্ষণ কথা বলে বিষ্ণুদা এবার থামলেন। একটা বক সিগারেট আমার হাতে এগিয়ে দিয়ে নিজেও একটা ধরালেন।

অনেকক্ষণ বাদে আমি এবার মুখ খুললাম। বললাম, হীরালাল বাইন সম্বন্ধে কৌতুহলী হয়ে উঠেছি। সে কি সত্য সত্যই কৃষক সমিতির কিছু কাজ করেছিল?

কিছু কাজ মানে? শেষকালে হীরালাল বাইন আর সব কাজ ফেলে রেখে একান্তভাবে কৃষক সমিতির আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। এই আন্দোলনই তাঁর কাছে ধ্যান জ্ঞান জপমন্ত্র হয়ে দাঁড়াল। আর তাঁর জন্য উপযুক্ত পুরস্কারও মিলেছে তাঁর। তাঁকে বুড়ো বয়সে বহুদিন রাজশাহী সেণ্ট্রাল জেলে রাজবন্দী হয়ে থাকতে হয়েছে।

তাই নাকি ? আশ্চর্য হয়ে বললাম।

এতেই আশ্চর্য হয়ে গেলেন! আরও একটু শুনুন। তাঁর এলাকায় তিনিই আন্দোলনের নেতৃত্ব নিয়েছিলেন। সেই আন্দোলন যখন দুর্বার হয়ে উঠল, তখন পুলিস গেল তাদের দমন করতে। ওরা তাদের গ্রামটা ঘিরে ফেলে তার উপর তাদের অত্যাচারের রোলার চালিয়ে দিল। কৃষকরা নিঃশব্দে পড়ে পড়ে মার খেল না। তারাও পাল্টা আঘাত হানল। তারপরেই চলল গুলী। গুলীবর্ষণের ফলে হীরালাল বাইনের ছেলে রামকান্ত বাইন আর তার ভাই সতীশ বাইন ঘটনাস্থলে মারা যায়। ছেলের মৃত্যু সংবাদ শুনে হীরালাল বাইন কি বলেছিলেন শুনবেন ? কোন কথা না বলে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে তাকালাম। বলেছিলেন, ওরা এক ছেলেকে মেরে ফেলেছে সে জন্য হীরালাল বাইন দমে যাবে না। তার এক ছেলে গেছে, আরও ছেলে আছে। আর আমার সব ছেলেও যদি যায়, দেশের লক্ষ লক্ষ কৃষকের ছেলেরা থাকবে। ওরা তাদের সবাইকে মেরে ফেলতে পারবে না।

বিষ্ণুদা থামলেন। আমি চুপ করে রইলাম। এক একটা অবস্থা আসে যখন মানুষ নিঃশব্দ হয়ে যায়। এও সেই রকম অবস্থা। হীরালাল বাইনের সেই কথা ক'টি কানের কাছে গুঞ্জন করে ফিরছে—আমার সব ছেলেও যদি যায়, দেশের লক্ষ লক্ষ কৃষকের ছেলেরা থাকবে, ওরা তাদের সবাইকে মেরে ফেলতে পারবে না।

স্মৃতি-উৎসর্গ

কল্যাণকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

পূর্ববঙ্গের সেই অঞ্চলে দুটি উৎসব বাল্যকালে মনকে খুব বেশি নাড়া দিত, দুটিই ছিল স্নানের উৎসব। তার মধ্যে প্রধান ছিল অতি জনপ্রিয় ব্রহ্মপুত্র-স্নান, অন্যটি ছিল বারুণী স্নান, চৈত্র মাসের কৃষ্ণাত্রয়োদশীতে।

এই উপলক্ষ্যে অসংখ্য নারী-পুরুষ দলবেঁধে স্নান করবার জন্য লাঙ্গলবন্ধের দিকে যেতো—নয়তো স্থানীয় নদী বা পুকুরে স্নান করত। কিন্তু বাল সমাজের প্রধান আকর্ষণ ছিল এই উপলক্ষে অনুষ্ঠিত মেলা যাকে চলিত ভাষায় বলা হতো গলইয়া। এখানে সদ্য আকর্ষণের বস্তু ছিল চিনির গড়া মঠ আর পোড়ামাটির আল্লাদী। সাধারণ নাম মঠ হলেও সব চিনির মিষ্টিই মঠের আকারের ছিল না; হাতি ঘোড়া নানা পোশাকের মানুষের আকারের এই চিনির মিষ্টি এখনও বাজারছাড়া হয়নি। কিন্তু চলতি মাটির পুতুলের আকৃতির পরিবর্তন হয়ে গেছে মৌলিক। দেশভাগের পর হঠাৎ কলকাতার বাজারে সেই সুদূর মৈমনসিং-এর পুতুল দেখে অনেক পুরোনো স্মৃতিই মনে এসেছিল; আমাদের আশুতোষ সংগ্রহশালায় ঐ পুতুলের খুব ভালো একটা সংগ্রহ তাড়া-তাড়ি জোগাড় করে নেওয়া হয়েছিল প্রাণকৃষ্ণবাবুর উৎসাহ আর তৎপরতায়। ঢাকার সরা, বরিশালের মনসাঘট, ফরিদপুরের কাঁথা আর যশোরের পোড়া-মাটির মন্দির ফলক নিয়ে পূর্ববঙ্গের চলিত শিল্পের একটা সংগ্রহ আমাদের সংগ্রহশালার অন্যতম আকর্ষণ হয়ে উঠতে খুব বেশি সময় নেয়নি। শুনেছি বাঙলাদেশে চলতি সংস্কৃতির দিকে স্থানীয় অধিবাসীদের দৃষ্টি ক্রমে গভীর অনুরাগের দিকে এগুচ্ছিল। তবে এই সংস্কৃতির অঙ্গ হিসেবে চলতি সাহিত্যই যে হয়ে উঠেছিল প্রধান আকর্ষণের উপকরণ এ-সংবাদ সকলেই রাখেন। আকাশী বোমা আর জঙ্গী মারণাস্ত্রের নির্ঘোষের সঙ্গে সঙ্গে পুরোনো দিনের যেসব কথা মনে পড়ছে গভীর বেদনার সঙ্গে তার মধ্যে উজ্জ্বল একটা ছবি—একদিন সেই আধাসহর চৌকির পথে হঠাৎ দেখা হয়ে গিয়েছিল জসীমউদ্দীনের সঙ্গে। বয়সে তরুণ কবি তখন মৈমনসিং-এর গ্রামে গ্রামে গীতি কবিতার সন্ধানে ঘুরছেন; কদিন আগেই হঠাৎ আগে থেকে না-জানা অনেকগুলি পদ আবিষ্কার

করে মনটা তার খুবই উৎফুল্ল। কলকাতায় কেশব সেন স্ট্রিটের ওয়াই এম সি এ তে অবস্থানের সময় কবির সঙ্গে তার গ্রাম অঞ্চলে বেড়াবার গল্পের সমজদার শ্রোতা খুব বেশি ছিল না। পরে আশুতোষ মিউজিয়ম প্রতিষ্ঠিত হলে প্রায়ই জসীমউদ্দীন মিউজিয়ামে এসে আড্ডা জমাতেন, তাঁর লোকশিল্প প্রীতির অনেক নিদর্শন, কিছু কাঁথা, ছবি, পুঁথির পাতা মিউজিয়ামের সংগ্রহে সযত্নে রাখা আছে।

পূর্ববঙ্গের আর যারা আমাদের সংগ্রহশালার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা করে চলতেন তাদের মধ্যে ঢাকা সংগ্রহশালার কার্যাধ্যক্ষ নলিনী কুমার ভট্টশালী আর রাজসাহী বরেন্দ্র সংগ্রহশালার শ্রীযুত নীরদবরণ সান্যালের কথাও আজ মনে পড়ছে। নীরদবাবুকে পরে রাজসাহী ছাড়তে হলেও নলিনী-বাবু জীবনের শেষদিন পর্যন্ত ঐকান্তিক যত্ন ও আবেগের সঙ্গে ঢাকা সংগ্রহশালার সেবা করে গিয়েছেন। রাজনৈতিক পুনর্বিন্যাসের পরেও ঢাকার মানুষ যে ভট্টশালী মশাইকে ভুলতে পারেনি তার পরিচয় আছে পূর্বে ঢাকা সংগ্রহ-শালার পঞ্চাশৎ বৎসর পূর্তী উপলক্ষে প্রকাশিত ভট্টশালী স্মৃতি গ্রন্থ। বস্তুত ভিন্ন সম্প্রদায়ের এক পরলোকগত গুণীজনের স্মৃতির উদ্দেশ্যে এ শ্রদ্ধার্ঘ্য ঢাকার শিক্ষানুরাগীদের সাম্প্রদায়িকতার উর্ধে উত্তরণের দিকে ছিল এক বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। আজ বিশেষ করে এই গ্রন্থপ্রকাশের উদ্যোক্তা ডাক্তার মহম্মদ হবিবুল্লা মশাই এবং তদীয় জামাতা ঢাকা সংগ্রহশালার তরুণ কর্মাধ্যক্ষ ভট্টশালীর যোগ্য উত্তরাধিকারী ডাক্তার এনামুল হকের কথা গভীর বেদনার সঙ্গে স্মরণ হচ্ছে। এনামুল হক এখন কোথায় আছেন জানি না কিন্তু হবিবুল্লা সংক্রান্ত সংবাদে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ওঁর সহকর্মীরা তীব্র আবেগ ও জঙ্গীপাশবতার বিরুদ্ধে দুর্দমনীয় ঘৃণা অনুভব না করে পারবে না। হবিবুল্লা ছিলেন বর্ধমানের মানুষ; লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি এইচ ডি ও গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে উপাধি লাভের পর এখানে তিনি ইতিহাস বিভাগে অধ্যাপকতায় ব্রতী হয়েছিলেন। তাঁর একখানি পুস্তকে দিল্লী আগ্রার চতুষ্পার্শ্বের অধিবাসী ভারতজনের বহিরাগত তুর্কী-মুঘল শাসনের বিরুদ্ধে কালজয়ী দুর্দান্ত সংগ্রামের ইতিহাস ভারতীয় ইতিহাসবিদদের অবজ্ঞাত এক অধ্যায়ের প্রতিষ্ঠায় সত্যানু-সন্ধানের এক অগ্রণী ভূমিকার পরিচয় বিধৃত আছে। আশুতোষ ভবনের অধ্যাপকদের কামরায় চল্লিশের-দশকে যে বহুগুণসমৃদ্ধ স্থিতধী শিক্ষককূলের সমাবেশ হয়েছিল সেখানে বহু অপরাহ্নে—হবিবুল্লার বুদ্ধিদীপ্ত উপস্থিতি তাঁর

সহকর্মীরা সহজে বিস্মৃত হতে পারবে না। এই অপরাহ্ণিক আড্ডায় অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণণ, প্রবোধচন্দ্র বাগচী শ্রীযুত মোহিনীমোহন ভট্টাচার্য, কালিদাস নাগ, শ্রীযুত ডাক্তার নরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ, শ্রীযুত ডাক্তার বিনয়চন্দ্র সেন আমার গবেষণা শিক্ষক অধ্যাপক সুহরাবর্দী ইত্যাদির সঙ্গে হবিবুল্লাকে তখনি কম জ্যোতিষ্মান বলে মনে হতো না। পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের-ইতিহাস বিভাগের প্রধান অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করার পরও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিন্ন হয়নি। মাস কয়েক আগেও তিনি আমাদের সংগ্রহশালার তথা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত পুস্তক সম্ভার সংগ্রহের আগ্রহ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর দরদের পরিচয় দিয়ে গিয়েছিলেন। এক আন্তর্জাতিক মিউজিয়াম বিশেষজ্ঞ দলের সঙ্গে এনামুল হকও কিছুদিন আগে কলকাতা ঘুরে গিয়েছিলেন। এঁদের স্মৃতি ব্যক্তিগতভাবে আমাকে গভীরভাবে বেদনার্ত করে রেখেছে। এঁদেরই কাছে সংগ্রহশালার মাধ্যমে লোকশিল্প সম্পর্কে পূর্বাঞ্চলে যে উৎসাহের সঞ্চার হচ্ছে তারও সংবাদ পেয়েছিলাম। ইসলামী অনুশাসন সত্ত্বেও পারস্য, তুরস্ক, ইরাক, ও মিশরে মূর্তি এবং চিত্রকলার প্রতি উৎসাহের কোনো অভাব দেখা যায় না, মুসলিম অধ্যুষিত ইন্দোনেশিয়ায় ভারত সংস্কৃতির প্রতি অনুরাগ আজও দুর্বার ; মহাভারতের ভীমার্জুন বা রামায়ণের রামসীতাকে ইন্দোনেশিয়াবাসীরা যত আপনার বলে মনে করে গোঁড়া ভারতীয়েরাও ততটা অনুরাগের সঙ্গে তাদের স্মরণে রাখেনি। হুসেনসাহী রাজত্বে বাঙলার মুসলমানেরা যেভাবে বাঙালিত্বে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার চেষ্টা করেছিল পূর্ববঙ্গে আজ তারই পুনরাবর্তন স্বভাবতই স্বার্থান্বেষী শাসক মহলের মনঃপুত হয়নি। এই বাঙালিত্বে স্বপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার গতিবেগ সাম্প্রতিক বৎসরগুলিতে যেভাবে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছিল তাতে এই ধারণাই দৃঢ়মূল হয়ে উঠেছিল যে পূর্ববঙ্গের মানুষ পশ্চিমবঙ্গবাসী অপেক্ষা অনেক বেশি পরিমাণে নির্ভেজাল বাঙালিয়ানায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সাধনায় ব্রতী হয়েছে।

সাম্প্রতিক ঘোষণায় পূর্ববাঙলার মানুষেরা "বাঙলাদেশ" নামটি আত্মসাৎ করায় স্বভাবতই মনটা একটু খুঁতখুঁত করেছিল। কিন্তু এই প্রসঙ্গে ১৯৪৭ সালে মাসিক বসুমতীতে প্রকাশিত আমারই একটি বিস্মৃতপ্রায় প্রবন্ধের কথা মনে পড়ল। পাকিস্তান আন্দোলন তখন পরিণত সিদ্ধান্তে রূপায়িত হয়েছে ; এদিকে বাঙলা প্রদেশকে বিভক্ত করে সংখ্যালঘুদের একটি নিরাপদ আশ্রয় স্থান লাভ করবার আন্দোলনও বেশ সোচ্চার। লীগের দাবি হলো সমগ্র বাঙলার

উপর। একশ্রেণীর সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোক বাঙলার অখণ্ডতা রক্ষা করার বুদ্ধি ভিত্তিক প্রয়োজনীয়তায় উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠেছিলেন। মহাত্মাজীর আশীর্বাদে উদ্বুদ্ধ সুহ্‌রাওয়ার্দীর-শরৎ বসুর প্রয়াসে অখণ্ড বাঙলা দ্বিতীয় পাকিস্তানে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায় আতঙ্কিত হয়ে উঠলে খণ্ডিত বাঙলার সপক্ষে শ্যামাপ্রসাদের নেতৃত্বই অগ্রাধিকার লাভ করেছিল। এই সময় অখণ্ডবাঙলার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ প্রগতি ও বুদ্ধিমত্তার দৃষ্টিতে যুক্তিহীন ও প্রতিক্রিয়াশীলতার পরিচায়ক বলে গণ্য হয়ে উঠেছিল। সেই সময় দুই বাঙলার সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের বিশ্লেষণ করে পারস্পরিক সৌহার্দ্যের ভিত্তিতে স্বতন্ত্র স্বয়ং শাসিত রাষ্ট্রের সম্ভাব্যতা সম্পর্কেই ছিল আমার প্রবন্ধ।

মনে পড়ছে সেই প্রবন্ধে আমি দুই বাঙলার নামকরণে "রাঢ়দেশ" ও "বঙ্গদেশ" এই দুই শব্দই ব্যবহার করেছিলাম। বস্তুত সমতট বিস্তৃত নারিকেল কুঞ্জশোভিত গঙ্গা ভাগীরথী সীমিত দেশই বঙ্গনামের উত্তরাধিকারের প্রকৃত দাবিদার এখন দ্বিধাহীন চিত্তেই এ-সত্য গ্রহণ করবার প্রস্তুতি আমার এসেছে। রাঢ়ের অধিবাসীরা যখন বেতসলতার মতো নতজানু হয়ে বহিরাগতের নিকট আত্মসমর্পণ করেছে সেই যুগেরই পরিপ্রেক্ষিতে 'নেতা নৌসাধন উদ্যত' বঙ্গবাসীরা যে বীরত্বের অধিকারে প্রতিষ্ঠিত ছিল রঘুর দিগ্বিজয় প্রসঙ্গে কালিদাস তার দৃপ্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন। আর এই বঙ্গদেশ-যে প্রাচীন যুগেই উত্তরাঞ্চলের পুণ্ড্র বা বরেন্দ্রভূমি আত্মসাৎ করে নিয়েছিল প্রাচীন তাম্রপট্টলীর উল্লিখিত "বঙ্গে বিক্রমপুরভাগে পুণ্ড্রবর্দ্ধন ভূক্তৌ" এই ঘোষণাতেই উপলব্ধি করা যায়। আজ বাঙলাদেশ স্বশাসন প্রতিষ্ঠায় যে রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করেছে সেই ঐতিহ্য মহাভারতের যুগ থেকেই প্রতীয়মান। মহাভারতে দিগ্বিজয়ব্যপদেশে নির্গত হয়ে বহু উত্তুঙ্গ কৃষ্ণকায় হস্তীযূথের অধিকারী বঙ্গপতিকে পরাজিত করতে ভীমের পক্ষে কম নিগ্রহ পেতে হয়নি। ঐতিহাসিক যুগে অশোকের আমলে পশ্চিমাঞ্চলের তাম্রলিপ্ত পর্যন্ত মৌর্যসম্রাটের অধীনে থাকলেও বঙ্গে মৌর্যাধিপত্যের কোনো নিদর্শন নেই। গুপ্তদের বঙ্গাধিকার যে সহজসাধ্য হয়নি চন্দ্রের মেহেরৌলী লৌহস্তম্ভলিপি এবং কবি কালিদাসের সাক্ষ্যে তারই প্রমাণ বিধৃত। অনেকে পাল-সম্রাটবংশের প্রতিষ্ঠাতা বপ্যটকে বঙ্গদেশ অঞ্চলেরই অধিবাসী বলে মনে করেন। গৌড়ে গোপালদেবের আধিপত্য লাভের প্রাক্কালে গৌড়বঙ্গে প্রবল অরাজকতার (মাৎসন্যায়ের) উল্লেখ আছে। এই মাৎসন্যায়ের উত্তরকালে উত্তর ভারতে পালরাজগণের দুর্বার

দিগ্বিজয় কাহিনী বঙ্গদেশবাসীদেরই অভ্যুত্থানের কাহিনী বলে অনুমান করবার যথেষ্ট কারণ আছে। শশাঙ্কের আরব্ধ উজ্জীবন পর্ব পালরাজারাই সুসম্পন্ন করেছিলেন। দীর্ঘ ত্রিশত বৎসরকালের পালযুগ ঐতিহাসিক আমলে যুক্তবঙ্গের সুবর্ণযুগ। স্থৈর্য ও সুশাসনে এবং সাম্প্রদায়িক সহাবস্থানে বৌদ্ধ-ধর্মাবলম্বী পাল সম্রাটদের রাজত্বকাল ভারতীয় রাষ্ট্রতন্ত্রে আদর্শ স্থানীয় ছিল। এই যুগেই বঙ্গেতর ভারতে বৌদ্ধব্রাহ্মণ্য সাম্প্রদায়িক অসম্প্রীতিই যে ভারতের অধঃপতনের সূচনা করেছিল ভারতের উত্তরপশ্চিম সীমান্ত রক্ষাকারী ব্রাহ্মণ-শাহী রাজতন্ত্রের পতনের ইতিহাসে সেই কাহিনীই বিধৃত হয়ে আছে। আবার উত্তরকালে বঙ্গেতর ভারত যখন তুর্কীপদানত তখন মুসলমান রাজশক্তির নায়কত্বে বাঙালির দুর্বার প্রতিরোধ ও আত্মস্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠা ও সংরক্ষণ ইতিহাসবিস্মৃত বাঙালির স্মৃতিপট থেকে মুছে গিয়ে থাকলেও সত্যসন্ধ ইতিহাসের পাতায় এখনও উজ্জ্বল অক্ষরে বিধৃত হয়ে আছে। ভারতীয় রাজনীতি চিন্তায় রাজার কোনো জাতি নাই ; তিনি ক্ষত্রিয় এবং রাজা। নীতি-ভিত্তিক শাসন পরিচালনেই রাজশক্তির প্রতিষ্ঠা। এই নীতিতেই ধর্মনির্বিশেষে বাঙালি বৌদ্ধ পাল আমলে, কট্টর ব্রাহ্মণ্যধর্মী সেন আমলে ও মুসলমান তুর্কী আমলে ঐক্যবদ্ধ এক দুর্মদ জাতিরূপেই সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। আজ যদি পূর্ব-বাঙলার বাঙালি বঙ্গদেশবাসী হিসেবে তাঁদের আত্মস্বাতন্ত্র্য ঘোষণা করে থাকেন তাকে স্বাগত জানাবার সৎসাহস ও দৃঢ়তা পূর্বাঞ্চলাবশিষ্ট বাঙালি মাত্রেরই অবশ্য কর্তব্য। বঙ্গদেশের স্বাতন্ত্র্য লাভে সুদৃঢ় আস্থা নিয়ে উৎসর্গীকৃত প্রাণ বঙ্গবাসীর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা সহকারে আমার এই স্মৃতিচারণ উৎসর্গীত হলো।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

আশুতোষ ভট্টাচার্য

ইতিহাসে লেখা আছে একদিন বখ্‌তিয়ার যখন তার তুর্কী সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে কামান নিয়ে এসে বিহারের নালন্দা আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর অতর্কিত কামান দাগ্‌তে আরম্ভ করেছিলেন সেদিন কয়েক হাজার দেশ-বিদেশের ছাত্র সেই বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করত, তোপের সামনে তাদের কেউ পালিয়ে বাঁচল, কেউ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। সে আজ সাতশ বছরের ইতিহাসের কথা। আমরা জানি, মধ্যযুগ ছিল বর্বরতার যুগ, ধর্মান্ধতার যুগ, সামন্ততন্ত্রের বা স্বৈরাচারের যুগ; কিন্তু বিংশ শতাব্দীর গণতন্ত্রের যুগেও যে সেই মধ্যযুগের ঐতিহাসিক ঘটনার পুনরাবৃত্তি হতে পারে তা' কেউ কল্পনাও করতে পারেনি। অথচ তাই ঘটেছে গত ২৫এ মার্চ মধ্যরাত্রিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ভবনে।

একদিন নালন্দার প্রান্তরে প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয়ের ধ্বংসস্তূপের দিকে তাকিয়ে মনে হয়েছিল, যে নিদারুণ দুর্দিনে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের পবিত্র ভবনের উপর বখ্‌তিয়ারের তোপ এসে পড়ল, সেদিন আবাসিক ছাত্র অধ্যাপকদের মধ্যে কি আতঙ্ক না জানি দেখা দিয়েছিল। তারপর তাদের সর্বস্ব সেখানে ফেলে কেউ প্রাণ নিয়ে পালাবার চেষ্টা করতে তোপের মুখে পড়ল, কেউ হয়তো প্রাণে বেঁচেও এই নিদারুণ আঘাত শেষ পর্যন্ত সইতে পারল না। সেজন্য নালন্দার চারদিককার জনমানবের মধ্যে তার কোনো চিহ্নই আজ অবশিষ্ট দেখতে পাওয়া যায় না।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তেমনই এক আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়, অনেকটা নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের মতোই বললেও ভুল হয় না; তবে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে মূল শিক্ষণীয় বিষয় ছিল বৌদ্ধ ধর্ম ও দর্শন, বুদ্ধের মূর্তি সেখানে উপাসিত হতো, বৌদ্ধ আদর্শে জীবন গঠিত হতো; কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আধুনিক বিংশ শতাব্দীর আদর্শে গঠিত, ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষাই সেখানকার শিক্ষা ছিল।

তবু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে একটু ভুল ধারণা আমাদের বাইরের জগতের মধ্যে প্রচলিত ছিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পূর্ববাঙলার শিক্ষায় অনগ্রসর মুসলমান সমাজের মধ্যে শিক্ষার প্রসারের উদ্দেশ্যেই সে সময়কার

ইংরেজ সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এ-কথা সত্য, তথাপি আমার সেখানকার ষোল বছরের ছাত্র এবং অধ্যাপক জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে এ-কথা বলতে পারি যে ১৯৪৭ সন পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যত হিন্দু ছাত্র এবং অধ্যাপক উপকৃত হয়েছেন, মুসলমান ছাত্র ও অধ্যাপক তার অর্ধেকও উপকৃত হয়নি।

ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সাহেব একদিন বলেছিলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে লোকে মক্কা বিশ্ববিদ্যালয় বলে; তুমি ত দেখছ, এর শতকরা দশ ভাগ অধ্যাপকও মুসলমান নয়, সবই হিন্দু; আর শতকরা পঁচিশ ভাগ ছাত্রও এখন পর্যন্ত মুসলমান নয়, সবই হিন্দু। সুতরাং একে বরং ঢাকেশ্বরী বিশ্ববিদ্যালয় বলা উচিত।

শহীদুল্লাহ সাহেব যখন এ-কথা বলেছিলেন, তখন সম্ভবত ১৯৩২ সন। তাঁর কথা বিন্দুমাত্রও অতিরঞ্জিত ছিল না। এমনকি, দেশ বিভাগের সময় পর্যন্তও হিন্দু অধ্যাপকের সংখ্যা শতকরা পঁচাত্তর ভাগ এবং হিন্দু ছাত্রের সংখ্যাও পঞ্চাশ ভাগের বেশি ছিল। সেইজন্যই বলছিলাম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দেশ বিভাগের পূর্ব পর্যন্তও হিন্দু সমাজের যত উপকার হয়েছে, মুসলমান সমাজের তত উপকার হয়নি। সেইজন্য সকল শ্রেণীর ছাত্র অধ্যাপকই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে নিজের বলে মনে করত। আজ তাই তার এই দুর্দিনে ভারতের হাজার হাজার অধিবাসীর মনে সুগভীর বেদনা অনুভূত হচ্ছে।

আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় নিজের আবাস বা গৃহের মতো, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ও আমাদের কাছে তাই ছিল। অধ্যাপকগণও সেখানে ছাত্রদের থেকে দূরে থাকতেন না, সর্বদা ছাত্রদের সুখদুঃখের সঙ্গে নিজেদের জড়িয়ে রাখতেন। সেইজন্য তাঁদের সকলেরই পরম আত্মীয় বলে মনে হতো। ঢাকায় তখন সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন চলছে, ছাত্র সমাজ পুলিশী নির্যাতনের লক্ষ্য। কত ছাত্রকে যে কত ভাবে কত রকম বিপদ থেকে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ রক্ষা করেছেন, তা কোনোদিনই কোনো স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে লেখা হবে না।

তখন একজন ইংরেজ ভাইস-চ্যান্সেলার ছিলেন, তাঁর নাম জি. এইচ. ল্যাংলি (G. H. Langley)। আমরা তাঁকে নিজেদের মধ্যে গৌরহরি ল্যাংলি বলতাম, তাঁর পুরো নাম ছিল জর্জ হ্যামিলটন ল্যাংলি। একদিন কয়েকটি ছাত্র—তারা বিশ্ববিদ্যালয়েরই ছাত্র কি না জানা যায়নি—কোনো একটা রাজনৈতিক অপরাধ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের আঙ্গিনার মধ্যে ঢুকে আত্মগোপন করেছিল।

সঙ্গে সঙ্গে কয়েকজন পুলিশ কর্মচারী তাদের ধরবার জন্য ভিতরে প্রবেশ করল। উপাচার্য ল্যাংলি নিজের অপিশ ঘরে ছিলেন, তিনি এই সংবাদ শুনবামাত্র তাঁর চেয়ার ছেড়ে উঠে এসে পুলিশ কর্মচারীদের বিশ্ববিদ্যালয়ের আঙ্গিনা থেকে তৎক্ষণাৎ বাইরে চলে যেতে বললেন। তারা একজন ইংরেজকে এমন মূর্তিতে দেখতে পাবে বলে আশা করেনি ; ইংরেজের সাম্রাজ্য রক্ষায় ইংরেজ সাহায্য করছে না দেখে তারা বিস্মিত হয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে কিছু বলবার চেষ্টা করল। তারপর ধীরে ধীরে বাইরে চলে গেল। যতক্ষণ তারা বাইরে বেরিয়ে না গেল, ততক্ষণ পর্যন্ত উপাচার্য ল্যাংলি সেখানে দাঁড়িয়ে রইলেন। ক্রোধে এবং মধ্যাহ্ন রৌদ্রের উত্তাপে তাঁর মুখ আগুনের মতো রাঙা হয়ে উঠল। অপরাধীকে ধরবার পুলিশ কর্মচারীদের সকল চেষ্টা ব্যর্থ হলো।

এইভাবে যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহ্য গড়ে উঠেছিল, বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে পাক সৈন্যবাহিনী সেই বিশ্ববিদ্যালয়কে কামান দাগিয়ে ধূলিসাৎ করল। সঙ্গে সঙ্গে তার অধ্যাপক এবং ছাত্র সমাজের উপর আক্রমণ করে তাদেরও এক বিপুল অংশের প্রাণনাশ করল। সংবাদপত্রে মৃতের তালিকায় আমার সেখানকার সহকর্মী ছাত্র ও বন্ধুবান্ধবদের নাম দেখতে পেলাম। ভয়ে, বিস্ময়ে এবং ঘৃণায় অন্তর পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে আমার সম্পর্ক নাড়ীর সম্পর্ক। ছাত্র হয়ে সেখানে প্রবেশ করেছিলাম, দেশ বিভাগের সময় অধ্যাপক রূপে সেখান থেকে বিদায় নিয়েছি কিন্তু তারপরও বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে আমার সম্পর্ক পুরোপুরি ছিন্ন হয়নি, আমি তখনও তার বি. এ. অনার্স এবং এম. এ. পরীক্ষার পরীক্ষক। ঢাকা থেকে কোনো ছাত্র কিংবা গবেষক গবেষণার জন্য কলকাতায় এলে তারা আমার কাছেই আসত, ভারতীয় মুদ্রা দিয়ে তাদের আমি কলকাতার খরচ চালাতে সাহায্য করতাম, ন্যাশনাল লাইব্রেরী ও সাহিত্য পরিষদে তাদের পরিচয় করিয়ে দিতাম। দেশবিভাগ হবার বার বছর পর অর্থাৎ ১৯৫৯ সনে তখনও যখন আয়ুব খাঁর সামরিক শাসন প্রচলিত, তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আমাকে বাঙলার লোকসাহিত্য গবেষণার জন্য 'ডক্টরেট' দেবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল। সকল সাম্প্রদায়িকতা কিংবা জাতীয় সঙ্কীর্ণতা থেকে' ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় যে উর্ধ্বে ছিল, তা এ থেকেই বুঝতে পারা যাবে। কারণ, তখন আমি ভারতীয় নাগরিক। দুই দেশের মধ্যে তখন যে কূটনৈতিক সম্পর্ক চলছিল, তাতে 'পূর্ব-পাকিস্তান'এ একজন ভারতীয় নাগরিককে 'ডক্টরেট' দেবার সংবাদে সকলেই বিস্ময় প্রকাশ করল। কিন্তু ঢাকা

বিশ্ববিদ্যালয় সেদিন মনে করেছিল, ছাত্রর সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়-এর সম্পর্ককে সকল রাজনৈতিক বাদবিসম্বাদের ঊর্ধ্বে রাখতে হবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সর্বদাই তা বজায় রেখে চলেছিল। সেইজন্য ধর্মের দোহাই দিয়ে যারা রাষ্ট্র পরিচালনা করে, তাদের কামানের গোলা থেকে সে রক্ষা পেল না।

সেদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের মধ্যে মৃতের তালিকায় বাঙলা বিভাগের অধ্যাপিকা শ্রীমতী নীলিমা ইব্রাহিমের নাম দেখে চমকে উঠলাম। তিনি উনবিংশ শতাব্দীর বাঙলা নাটকের উপরে গবেষণা করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি-এইচ-ডি উপাধি লাভ করেছিলেন। শরৎচন্দ্রের সাহিত্য সম্পর্কে তাঁর একখানি বই তাঁর মৌলিক চিন্তাশীলতার পরিচায়ক। এই বিদুষী শান্ত স্বভাবা নারী, কয়েকটি সন্তানের জননী, পাকসৈন্যের কাছে কি অপরাধে অপরাধী ছিলেন, তা কল্পনাও করতে পারি না। তিনি খুলনা শহরের অধিবাসিনী ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাঙলায় এম..এ. পাশ করে খুলনারই একজন ডাক্তারকে বিবাহ করেছিলেন। দেশ বিভাগের পর স্বামীর সঙ্গে ঢাকায় গিয়ে সেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপিকার পদটি লাভ করেন। তাঁর চরিত্র এবং শিক্ষার গুণে তিনি সকলেরই প্রিয় হয়েছিলেন। ১৯৫৯ সনে আমাকে যে বছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় 'ডক্টরেট' উপাধি দেয় তিনিও সেই বছরই তাঁর উক্ত গবেষণার জন্য ডক্টরেট লাভ করেন। একই সমাবর্তন উৎসবে আমরা উভয়ে পাশাপাশি বসে একসঙ্গে তখনকার সামরিক শাসনকর্তা আজম খাঁর কাছ থেকে আমাদের অভিজ্ঞান পত্র নিয়েছি। তারপর থেকে তাঁর পরিবারের সঙ্গে আমার পরিবারের নিবিড় যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছিল। তিনি যখনই কলকাতায় আসতেন, তখনই আমার স্ত্রীর জন্য ঢাকাই শাড়ি নিয়ে আসতেন, আমার জন্য ঢাকার প্রসিদ্ধ প্রাণহরা সন্দেশ আনতেন। বলতেন, এ-জিনিস ত আপনারা এখানে পাবেন না।

সেদিন তাঁর সংবাদ খবরের কাগজে দেখবার পর থেকে আমার পরিবারেও এক বিষাদের ছায়া নেমে এসেছে, তাঁর ছেলেমেয়ে এবং স্বামীর সংবাদ জানবার জন্য ব্যাকুলতা বেড়েই চলেছে, কিন্তু তাঁদের কোনো সংবাদই আর জানতে পারিনি।

মৃতের তালিকায় আর একজন অধ্যাপকের নাম পেলাম, আব্দুর রেজ্জাক খাঁ। তিনি রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিষয়ের অধ্যাপক ছিলেন। তিনি বয়সে আমার কয়েক বছরের ছোট হলেও আমরা প্রায় একসঙ্গেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের

কর্মজীবনে প্রবেশ করেছিলাম। শীর্ণকায়, নিরীহ ব্যক্তি, অথচ তীক্ষ্ণ বুদ্ধি এবং গভীর রসজ্ঞানের অধিকারী। হয়ত শারীরিক কোনো অসুস্থতার জন্যই তাঁর প্রকৃতি একটু শান্ত এবং অলস ছিল। ইউনিভার্সিটি ক্লাবের সুরম্য 'লাউঞ্জে'র মধ্যে তাঁকে কখনও নিদ্রিত কিংবা কখনও অর্ধনিদ্রিত অবস্থায় পাওয়া যেত। কিন্তু সেই অবস্থায়ও পৃথিবীর সকল অংশের রাজনৈতিক ঘটনার উপর খবর রাখতেন। কখনও কখনও দাবা খেলায় মন দিতেন, কাউকে সঙ্গী হিসেবে না পেলে একা একাই খেলতেন তবে পদার্থ বিজ্ঞানের অধ্যাপক কাজি মোতাহর হোসেনকে প্রায়ই সঙ্গী হিসাবে পেতেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞ অধ্যাপকেরা যখন তাঁদের জ্ঞান ও বিদ্যার বিষয় নিয়ে তর্কের তুবড়ি ছাড়তেন, তখন তাঁরা দুজন দাবা খেলায় সব কিছু ভুলে গিয়ে রাজা মন্ত্রীর কিস্তি দিতেন। আব্বার রেজ্জাক খাঁ সর্বদাই খুব গাঢ় রংয়ের পোষাক পরতেন, আমাদের সাদা ধুতি পাঞ্জাবীকে ব্যঙ্গ করে বলতেন, আপনাদের বর্ণ জ্ঞান নেই, নইলে সাদা আবার একটা রঙ, আমার আচ্‌কানের দিকে তাকিয়ে দেখুন, বর্ণজ্ঞান কাকে বলে। বলে একটা সোফার মধ্যে ছোট্ট শরীরটাকে গুঁজে দিয়ে এমনভাবে হাসতে থাকতেন যে আমার মনে হতো তাঁর এখুনি শ্বাসরুদ্ধ হয়ে যাবে। তাঁর এই প্রকৃতিটি আমার বড় মিষ্টি লাগত। একদিন তিনি আমাকে এক অদ্ভুত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলেন। বল্লেন, আমি হিন্দু মহাসভার সভ্য হতে চাই, হতে পারব না? কেন হতে পারব না, আমাকে বুঝিয়ে দিতে হবে।

আমি হিন্দু মহাসভার সভ্য হবার নিয়ম কানুন কিছুই জানতাম না, কারণ, আমি কোনোদিনই ও-সবের ধার ধারিনি; তবু সাধারণ বুদ্ধিতে এইটুকু বুঝেছিলাম যে একজন হিন্দুর পক্ষে যেমন মুসলীম লীগের সভ্য হওয়ার পক্ষে বিধিগত কোনো বাধা থাকতে পারে, তেমনই একজন মুসলমানের পক্ষেও হিন্দু মহাসভার সদস্য হতে বাধা থাকতে পারে। আমি বললাম, ওগুলো সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান; ভিন্ন সম্প্রদায়ের লোককে সেখানে সম্ভবত প্রবেশ করবার অধিকার দেওয়া হয় না।

তিনি বললেন, আমি ভারতের মাটিতে জন্মেছি, মুসলমান হয়ে যদি জন্মে থাকি তাও আমার ইচ্ছায় জন্মাইনি, জন্মাবার পর যখন আমি দেখলাম, আমি মুসলমান, তবে কেন আমি হিন্দু মহাসভার সদস্য হব না, আমাকে ঐ কথা বুঝিয়ে দিতে হবে। আমি বললাম, আপনি সভারকার কিংবা ডাঃ মুঞ্জের নিকট চিঠি লিখুন, আমি আর বেশি কিছু বলতে পারব না। পরিচিত হাসিটিতে

তারমুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সত্যই যে সেদিন হিন্দু মহাসভার সভ্য হতে চেয়েছিলেন, সে কথা সভ্য নয়, তবে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক বলে সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানগুলোর অন্তঃসারশূন্যতা সেদিন এইভাবে ব্যাখ্যা করেছিলেন। দেশ বিভাগের পর তিনি উচ্চতর ডিগ্রি লাভের জন্য লণ্ডন ঘুরে এসেছিলেন, সেখানে গিয়েও তিনি তাঁর উদ্যমহীনতা, কিংবা অলসতার হাত থেকে পরিত্রাণ পাননি। সুতরাং কিছুই করতে না পেরে তাঁকে শূন্য হাতে ফিরে আসতে হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত তিনি রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের রীডার হয়েছিলেন।

নিহত অধ্যাপকদের তালিকায় আর একজন অধ্যাপকের নাম দেখলাম তিনি আমার বন্ধুস্থানীয় লোক ছিলেন। তাঁর নাম গোবিন্দ চন্দ্র দেব। তিনি দর্শন বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ছিলেন; দর্শন কেবল তাঁর শিক্ষা এবং অধ্যাপনার বিষয় ছিল না, দার্শনিক সত্যকে তিনি জীবনেও আচরণ করতেন। তিনি চিরকুমার ছিলেন, একটু উদাসীন প্রকৃতির লোক। মানুষের চরিত্রে যে কোনো দোষ থাকতে পারে তা তিনি বিশ্বাস করতেন না, সব রকম মানুষকেই বিশ্বাস করে তিনি সংসারে যেন ঠকতেই ভালোবাসতেন।

দেশবিভাগের পর পূর্ববাঙলা থেকে হিন্দু দলে দলে পালাতে লাগল, তখন তিনি পশ্চিমবাঙলা থেকে পূর্ববাঙলার রাজধানী ঢাকা শহরে গিয়ে হাজির হলেন, সেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকুরি নিলেন। তারপর থেকে বিভাগটি নিজের হাতে গড়েছেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের অত্যন্ত সুনাম ছিল, তার প্রথম অধ্যক্ষ ছিলেন অধ্যাপক ল্যাংলি, তিনিই প্রথম উপাচার্য স্যার ফিলিপ হর্টগ চলে যাবার পর উপাচার্য নিযুক্ত হলেন। তার কথা আগে উল্লেখ করেছি। তারপর যিনি এর অধ্যক্ষ হন তিনি ভাটপাড়ার পণ্ডিত বংশের সন্তান অধ্যাপক হরিদাস ভট্টাচার্য। বি. এ. তে আমার দর্শনশাস্ত্র ছিল, এমন কৃতী অধ্যাপক আমি কল্পনাও করতে পারিনে। ছাত্র এবং সহকর্মীদের সমান প্রিয়, ইংরেজি এবং বাঙলায় অসাধারণ বাগ্মী। দেশ বিভাগের কিছু পূর্বে তিনি অবসর গ্রহণ করলেন। তাঁরই ছাত্র গোবিন্দ চন্দ্র দেব দর্শন বিভাগে দেশবিভাগের গোড়া থেকেই যোগ দিয়েছিলেন। তিনি নানা ছাত্র প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। বোধহয় সেই অপরাধেই তাঁকে প্রাণ বলি দিতে হলো। আরও যেসব অধ্যাপকের নাম মৃতের তালিকায় দেখেছি তাঁরা অধিকাংশই আমার ছাত্র। পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের নানা বিষয়ে অধ্যাপক হয়েছিলেন। আমি তাঁদের কথা কিছুই

লিখতে পারব না, কারণ, আমি এখনও বিশ্বাস করি তারা বেঁচে আছেন, এই বিশ্বাস নিয়েই আমি বেঁচে থাকতে চাই, তাঁরা সকলেই বয়সে তরুণ, তাঁদের কাছে দেশ অনেক কিছু আশা করেছে, দেশের এবং সমাজের সে-আশা পূর্ণ করবার তাঁদের ক্ষমতাও আছে। আমি যতদিন বেঁচে আছি, ততদিনই বিশ্বাস করব যে তাঁরা বেঁচে আছেন, আবার সুযোগ মতো আত্মপ্রকাশ করবেন। কারণ, তাঁরা আমার একান্ত স্নেহের ছাত্র এবং বিশ্বাসভাজন।

ঢাকা রমনার মাঠে, সবুজ ঘাসের বিস্তৃত চত্বরে, বিশ্ববিদ্যালয়ের কক্ষে, ছাত্রাবাসে এক অনুপম প্রাকৃতিক পরিবেশে আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ ষোল বছর কেটেছে। তার স্বপ্ন এখনও মাঝে মাঝে দেখতে পাই। যখন বসন্তকাল আসে তখন স্বপ্নে দেখতে পাই যেন পথিপার্শ্বের সারি সারি অশোক গাছে অশোকের স্তবক মুঞ্জরিত হতে আরম্ভ করেছে, সুদীর্ঘ কৃষ্ণচূড়ার বিস্তারিত শাখা-প্রশাখা লাল রঙের ফুলে ভরে গেছে, কালবৈশাখী ঝড়ে ফুল শুদ্ধ ডালগুলো ভেঙে মাটিতে কাদায় জলে লুটিয়ে পড়েছে, ঝড়ের বেগ সইতে না পেরে একটা মাছরাঙা পাখি আমাদের জগন্নাথ হলের ছাত্রাবাসের দেয়ালে এসে বার বার মাথা ঠুকছে, তারপর কালবৈশাখীর ঝড় থেমে গেছে, রমনার পিচঢালা পথগুলো জলে ভিজে চক চক করে উঠেছে, তার উপর দিয়ে ঘোড়ার খুরে একরকম শব্দ করে আবার সুদৃশ্য পাল্কী গাড়িগুলো তালে তালে চলতে আরম্ভ করেছে। এই রমনা যারা চোখে দেখেনি, কোন প্রাকৃতিক পরিবেশে যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল তারা তা বুঝতে পারবে না।

বাঙলা ভাষার প্রতি অনুরাগ সৃষ্টির মূলে ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলা বিভাগ। বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সময় থেকে সেখানে বাঙলা দেশের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত এবং সাহিত্যিকের সমাবেশ হয়েছিল, তাঁরা সবাই পশ্চিমবাঙলার অধিবাসী ছিলেন, প্রথমত মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এবং তারপর আচার্য সুশীল কুমার দে বিভাগীয় অধ্যক্ষ হলেন, ১৯৩৭ সনে ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বাঙলা বিভাগের অধ্যক্ষ হলেন। অধ্যাপক চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, কবি সমালোচক মোহিতলাল মজুমদার আগে থেকেই ছিলেন। তার বহুদিন পর তাঁদেরই ছাত্ররূপে প্রথমে শ্রীযুক্ত গণেশচরণ বসু, পরে আমি বাঙলাবিভাগে প্রবেশ করলাম। এ-কথা ভাবতে আমি গৌরব অনুভব করি যে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী থেকে আরম্ভ করে এই যে ক্ষুদ্র আমি, আমরা সকলে মিলে বাঙলা ভাষার সৈনিকদের সেদিন প্রেরণা দিয়েছিলাম। কারণ, পরবর্তীকালে আমাদের ছাত্রেরা বাঙলাভাষার মর্যাদা রক্ষার জন্য আত্মবলি দিয়েছিল।

খুলনার দুর্ভাগা আধিয়ার চাষী

বিষ্ণু চট্টোপাধ্যায়

বঙ্গোপসাগরের কোলে শুয়ে দোল খাচ্ছে খুলনা। খুলনা বুঝি তার আদরিণী কন্যা। দক্ষিণে তার প্রাচীর, সু-উচ্চ সুন্দরী বনের।

সেই খুলনায় সংগ্রামী মানুষের ইতিহাস, আবার সে ইতিহাস হচ্ছে খুলনার কৃষক সংগ্রামের ইতিহাস। সত্যই কি সংগ্রামী কৃষকের পূর্ণ ইতিহাস? না। সম্ভব নয়। আমি কতটুকু জানি যে লিখব? আমি শুধু বিচ্ছিন্ন দুটি একটি পাতা যে কালের ঝোড়ো হাওয়ায় আমার জীবন ধারায় এসে মিশেছে, তা থেকেই কিছু বলতে পারি, তার বেশি নয়।

এরা সংগ্রাম করেছে প্রকৃতির বীভৎস সর্বনাশী শক্তির বিরুদ্ধে। সুন্দরী বনের বাঘে ওদের খেয়েছে, সাপে কামড় মেরেছে। কর্মক্লান্ত মানুষ আর গরু ঘুমিয়ে ছিল উন্মুক্ত প্রান্তরে বা ভঙ্গুর চালাঘরে শুকনা খড় বিচালি বিছিয়ে—বিশ্রামে সংগ্রহ করছে আগামী দিনের কর্মশক্তি, নিশুতি রাতের অন্ধকারে অতি সন্তর্পণে চুপি চুপি কুমীর এসে টেনে নিয়ে গেছে তাদের নদীর অথৈ জলের মধ্যে। রোগ, মহামারীতে মেরেছে মশা-মাছির মতো। কত? তার হিসাব কে রেখেছে।

আর নোনা জল? যে রাক্ষসী মুহূর্তে গ্রাস করে ফেলে কৃষকের রক্ত জল করা সারা বছরের সোনার ফসল? এ জলের আর এক নাম জীবন নয়, এর আর এক নাম মৃত্যু। জলে জলাকার। জলের মধ্যে তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে গেলেও এক গণ্ডুষ জল তুমি পান করতে পারবে না,—করলে স্বয়ং মৃত্যু পরোয়ানা নিয়ে এসে দাঁড়াবেন তোমার জীবনের দরজায়। যদি মুখ-হাত ধোবার জন্য এক ঝাপটা জল চোখে মুখে দাও—সারা মুখ তোমার জলে পুড়ে যাবে, চোখে নেমে আসবে অমানিশা। বাঁধ ভেঙে সে যদি একবার কৃষকের জমিতে উঠতে পারে শুধু সে বারই যে সমস্ত ফসল গ্রাস করল তা নয়, আগামী দুই তিন বছরের জন্য সে জমি হলো বন্ধ্যা। অনেক বছর পরিশ্রম করে কৃষক তার চালা ঘরের জন্য

সংবাদে প্রকাশ প্রখ্যাত কৃষকনেতা বিষ্ণু চট্টোপাধ্যায় বাঙলাদেশে নিজ গৃহে পাকিস্তানের পরিপোষক প্রতিক্রিয়া চক্রের হাতে ৬৫ বছর বয়সে নিহত হয়েছেন। সম্পাদক।

তৈরি করেছে শক্ত মাটির ভিটা। তার কিনারে কিনারে সযত্নে লাগিয়েছে দুই একটি নারকেল স্থপারীর গাছ। নোনা জল এসেছে বাঁধ ভেঙ্গে বিলে, সেখান থেকেই তার বিষাক্ত নিশ্বাসে পুড়িয়ে ছাই করে দেবে ঐ নশ্বর গাছগুলিকে। তারপর আসবে দুর্ভিক্ষ, মহামারী, মৃত্যু।

কিন্তু সত্য সত্যই নোনাজলের এই প্রাদুর্ভাব একদিন খুলনায় ছিল না। সেদিন দুধ আর মধুর দেশ বলে পরিচিত ছিল খুলনার দক্ষিণ অঞ্চল। হরিৎবর্ণের ধানে ভরে যেত সারা দেশ, উদার হস্তে প্রকৃতি ছড়িয়ে দিত তার দান খুলনার সারা অঙ্গে। গোয়ালে ছিল চাষের আর দুধের গরু, ছিল হাঁস, মুরগী ঝাঁকে ঝাঁকে। নদী, খাল, বিলে ছিল প্রচুর মাছ। সারা বছরের মধ্যে তিন চার মাস জমির কাজ করে তারা বাকী কয় মাস কুটুম বাড়ি গিয়ে যাত্রা-গান, কৃষ্ণ-যাত্রা, জারী গান গেয়ে আর মাছ ধরে দিন কাটাত। মাঝে মাঝে হরি সংকীর্ত্তন, কবিগান বসাত গ্রামের মধ্যে। আবার কোন কোন সময় ধর্ম-উপদেশ শুনবার জন্য আলেম ও ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণকেও ডেকে নিয়ে আসত গ্রামে। ছিল না খাদ্যের অভাব অনটন, ছিল না দুঃখ অশান্তি। শান্তি আর সুখ ছিল বাঁধা। তারপর একদিন আস্তে আস্তে হয়ে গেল এই পটের পরিবর্তন। সে অনেক দিন আগের কথা।

শিবশা ও পশর খুলনার প্রধান দুটি নদ ও নদী, তারা তাদের বিশালতা ও গভীরতা নিয়ে দক্ষিণ অঞ্চল ভেদ করে সমুদ্রে গিয়ে মিশেছে। এদের শাখা-প্রশাখা শিরা উপশিরার মতো ছড়িয়ে পড়েছে এই এলাকার অঙ্গপ্রত্যঙ্গে। ওই দুটি নদ ও নদী প্রতি বছর বর্ষাকালে দুই হাতে ঢেলে দিয়ে যেত জমির প্রাণশক্তি পলিমাটি। যত নদীর জল উঠবে ততই জমি হবে উর্ব্বরা—ফসল হবে বেশি, আরো বেশি। এখনকার বেড়ি-বাঁধের কথা কৃষকের কল্পনায় স্থানও পায়নি সে সময়।

তারপরে, আস্তে আস্তে শিবশার উপরের মুখ গেল শুকিয়ে মরে। উপরের মিষ্টি জলের প্রবাহ বন্ধ হয়ে এখন জোয়ারে ওঠে সমুদ্রের নোনা জল, ভাটিতেও নামে ঐ নোনা জল। এই বিস্তৃত ও গভীর নদের বহু শাখা প্রশাখা ছড়িয়ে আছে খুলনার দক্ষিণ অঞ্চলে। এখন তারা ছড়িয়ে দিতে লাগল বিষ, পুড়িয়ে দিল ক্ষেত খামার, কৃষককে করল নিঃস্ব, কুমীর কামোট (হাঙ্গর) আবাস স্থল বেছে নিল এই নোনা জলের রাজ্যে।

নোনা জল। নোনা জলের বন্যায় সমস্ত এলাকার বেড়ি বাঁধ ভেঙে নদী জমি

একাকার হয়ে যায়। ফসল থাকে না একটা দানাও। ধানের গোড়া পর্যন্ত পচে যায়। গাছ-গাছালি যা অতি যত্নে লাগিয়েছিল কৃষক সব পুড়ে ছাই। মানুষ, গরু না খেয়ে মরেছে, শুকনো বেড়ি বাঁধ ও বিলের ফাঁকে-ফাঁকে যে অসংখ্য বিষধর সাপ লুকিয়েছিল, বন্যার জল গর্তে ঢুকতেই তারা বেরিয়ে পড়েছে, সাঁতার দিয়ে ডাঙা খুঁজছে। শুকনো জমি তারা আর কোথায় পাবে, একমাত্র কৃষকের ছোট্ট ভিটা, তাতেই এসে এখন তারা ভিড় করছে। সাপে মানুষ মারছে, মানুষ সাপকে মারছে। এ এক লড়াই। ঘুমন্ত মানুষের হাত সাপের গায়ে পড়েছে, সাপ ছোবল দিয়েছে, মানুষ ছট-ফট করে উঠে পড়েছে কিন্তু কাল বিষের জ্বালায় ঢলে পড়েছে। কৃষাণী ঘরের কোণে কি কাজ করছিল। হাতে ছোবল দিয়েছে সাপে। কৃষাণীর কাজ শেষ হয়ে গেল এ জীবনের মতো। ডাঙা এখন নদী, কুমীর এখন সোজা হানা দিচ্ছে কৃষকের চালা ঘরে, মুখে করে নিয়ে যাচ্ছে তারা মানুষ, গরু, ছাগল। শুরু হলো অর্ধাহার, তারপর অনাহার। চুনো কচুগুলো তুলে তুলে খাবে। গলা ফুলে ওঠে, পেট যন্ত্রণায় মোচড় দেয়। কি এসে যায় তাতে, পেট তো ভরতেই হবে, যা দিয়ে পার। কলা গাছের থোড়, শুধু থোড় নয় নিচের মোথা পর্যন্ত তুলে তুলে খাবে। যে বিলে সাপলা আছে সে বিল মুহূর্তে পরিষ্কার হয়ে যাবে। সব চেছে মুছে খেয়ে ফেলবে মানুষ। ছোট ছোট কাপড় বা গামছায় ছাঁকনি দিয়ে কুচো চিংড়ি মাছ ধরবে। সুস্বাদু, উপাদেয় খাদ্য তালিকা। সে ও কি সেদ্ধ করা হয়। কাঠ পাবে কোথায়? নৌকা ছাড়া কাঠ সংগ্রহের কোনো উপায় নাই। জলের উপর মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে যে বড় বড় গাছগুলি তারই দু একটি শুকনো ডাল ভেঙে আনতে হবে। তাতেও বাধা, দেখতে হবে নোনা জলের জ্বালায় সে গাছে সাপ উঠে বসে আছে কিনা।

দুর্ভিক্ষ। দুর্ভিক্ষ শুরু হয়েছে সারা দক্ষিণ অঞ্চল ব্যাপী। একদানা খাদ্যও কোথাও নাই। খাদ্য নাই, আবার এক ফোঁটা খাবার জলও নাই। কোথাও কোথাও দু একটি পুকুর যা ছিল তাতে নোনা জল ভরে রয়েছে, পুকুর আর নদী এখন একাকার। সব জল নোনা জল, সব জল মৃত্যু।

জমি জমা বিক্রী করছে, বন্ধক রাখছে মহাজনের কাছে। দলিলে লেখা হচ্ছে প্রকৃত মূল্যের চারগুণ বেশী আর এদিকে কৃষক পাবে প্রকৃত মূল্যের চার ভাগের একভাগেরও কম টাকা। মৌখিক সর্ত থাকল—সুদিনে কৃষক আবার সুদ সহ টাকা দিয়ে ফিরিয়ে নেবে তার জমি।

কিন্তু মৌলিক সর্ত শুধু মুখেই থেকে গেল, কাজে আর পরিণত হলো না কোন দিন। দলিলে লেখা ঐ মিথ্যা উচ্চমূল্য কৃষক জীবনভর চেষ্টা করেও পরিশোধ করতে পারবে না। এমনি করেই সাধারণ কৃষকের জমি একে একে জমে উঠেছে মহাজনের ঘরে। মহাজন হয়েছে জোতদার, হাজার হাজার বিঘার জমির মালিক। জমি লেখা-পড়ার সময় জোতদার সত্যই কৃষকের সাথে ভাল ব্যবহার করে। তাকে বসতে দিয়ে তামাক খেতে দেয়। কোন কোন সময় এক বেলা তার বাড়িতে খাইয়েও দেয়। তারপর জমি রেজেষ্ট্রি হয়ে গেলে সব খাতির, সব সম্বন্ধ শেষ। কৃষক তার ছেঁড়া গামছার কোণায় টাকা কটা বেঁধে বা ধানের বস্তা মাথায় করে রাস্তা চলবে, আর সারা পথ ধরে তার চোখের সামনে বার বার ভেসে উঠবে সেই জমিখানা—যাতে একদিন চাষ করেছে তার বাপ, তার দাদা, যাকে সে এই মাত্র তুলে দিয়ে এলো অন্যের হাতে। উপায় নাই, কোন উপায় নাই, এইবার কপালের লিখন। বুকের পাঁজর ভেঙে হুস করে খানিকটা নিশ্বাস বেরিয়ে আসে—হ্যাঁ অদৃষ্ট।

মানুষ অনাহারে শুকিয়ে মরছে। ব্যাধিতে মরছে। ছোট ছেলেটা সকালেও চিঁ চিঁ করে কাঁদছিল, এখন ঝিমিয়ে আসছে। কিছু পরেই ওর সব কান্না একেবারেই শেষ হয়ে যাবে। বাপ-মা নির্বিকার, উদাস চোখে তাকিয়ে আছে। কান্না থেমে গেল। হ্যাঁ, একেবারেই থেমে গেছে। মার বুকের জিরজিরে হাড় গুলো একবার ফুলে উঠলো, চিৎকার করে বিকৃত গলায় কি যেন বলতে গেল, কিন্তু লুটিয়ে পড়ল ঐ মরা ছেলেটার পাশে।

তারপর? কৃষাণী কৃষকের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে, বিদায় দিয়েছে সাতপুরুষের ভিটা, তোমার কাছ থেকে বিদায়। কঙ্কালসার মৃত সন্তান তার চোখের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। দাঁড়িয়েছে এসে মৃত শ্বশুর-শাশুড়ি, যারা তাকে এ বাড়িতে এনেছিল, বরণ করে তুলেছিল ঘরে। শ্বশুর-শাশুড়ি স্বামীর আদরে আদরিণী বধু, সন্তান গর্বে গরবিনী জননী, ধারায় জল নেমে এল দুই চোখ বেয়ে। হাত ভাঙা মেটে পুতুলটা পড়ে রয়েছে এক পাশে। তাকে আদর করত যে সে চলে গেছে। পারা-চটা একখানা আয়না আর দাঁত ভাঙ্গা একখানা চিরুণী বিয়ের সময় বুঝি বা পেয়েছিল, কত যত্নের ছিল ঐ ঐশ্বর্যগুলি। কয়েকটা ভাঙা হাড়ি কলস, কত সাবধানেই না ব্যবহার করেছে কৃষাণী, সব পড়ে থাকল। ভাঙা বেড়ার গায়ে সস্তা কালীর পট টানানো, কবে যেন কৃষক কিনেছিল এক মেলা থেকে, সিঁদুরের ফোঁটায় ফোঁটায় ভরে গেছে সে কালী মূর্তি। সুখে দুঃখে কত

প্রণাম করেছে কৃষক কৃষাণী। আজও প্রণাম করল। প্রণাম শেষ করে উঠতে পারছে না, মুখ ভরে গেছে চোখের জলে, মাটিও ভিজে গেল।

আয়নাটার পাশ থেকে রং-চটা সিন্দুরের কৌটটা তুলে নিয়ে জীর্ণ শাড়ির আঁচলে বাঁধল। ছেঁড়া মাদুরে জড়ান একটা কাঁথা নিয়ে কৃষক প্রস্তুত। এইবার বিদায়। সন্ধ্যার মঙ্গলপ্রদীপ আর এ ভিটায় কেউ জ্বালবে না, সব আলো নিভে গেল। চোখের নোনা জল বন্যার নোনা জলে মিশে একাকার হয়ে গেল।

মানুষ পালাচ্ছে,—পরাজিত মানুষ প্রকৃতির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে হেরে গেছে। নৌকা বোঝাই করে হাঁস, মুরগী, ছাগল, ভেড়ার মতো একটার উপর একটা গাদাগাদি করে চলেছে যে এলাকায় দুর্ভিক্ষ নাই, নাই মন্বন্তর—শহরে, সমৃদ্ধশালী গ্রামে তারা দলে দলে উঠে পড়েছে। 'মানুষ রাখবা', 'কৃষাণ রাখবা', 'জোন রাখবা' দরজায় দরজায় তারা হেঁকে ফিরছে। 'দু বেলা খেতে দিও, আর যা তোমার ইচ্ছা তাই দিও' 'আচ্ছা, আর কিছু চাই না শুধু দুই মুট ভাত দিও', 'একটু আশ্রয়, একটু আশ্রয় দাও'। মানবতার কাছে সর্বহারা মানুষের করুণ আবেদন।

কিন্তু পরাজয় এরা স্বীকার করে না, পরাজয় এরা স্বীকার করতে জানে না। নোনা জল নেমে গেলে আবার ফিরে আসে, যেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সৈনিক। জান কবুল করে আবার লড়াই সুরু হয়। মাটিকে এরা ভালবাসে, মাটির প্রেম এদের টেনে নিয়ে আসে মাটির কোলে, মাটি ছাড়া এরা থাকতে পারে না, সব দুঃখ, সব নির্যাতন, সব কষ্ট ভুলে যায় মাটির কোলে এসে। ক্লান্ত হয়ে কাদা গায়ে মেখে মাটির উপর শুয়ে পড়ে, মাটি তার হারান সন্তানকে ফিরে পেয়েছে। কোলে তুলে নিয়ে হাত বুলিয়ে আদর করছে, মিষ্টি হাওয়া বয়ে যায় মায়ের আঁচলের বাতাসের মতো। আঃ কি শান্তি, কি আরাম।

আবার ডাল পালা, ঘাস, বিচালি সংগ্রহ করে ছোট ছোট কুঁড়ে ঘর-তৈয়ারি হয়, জমিতে লাঙ্গল পড়ে, ফসল হয়। পাড়ায় পাড়ায় কাঁসর, ঘণ্টা, আজানের ধ্বনি ভেসে বেড়ায়। শত সংগ্রামের বীর সেনানী এরা। এরা অপরাজেয়।

মহামারী। করাল গ্রাস নিয়ে মহামারী আসে এদের গিলে খেতে। পাড়াকে পাড়া, গ্রামকে গ্রাম উজাড় হয়। ওষুধ পত্র? পাবে কোথায়। মুখে জল দিবারও লোক থাকে না। সমস্ত এলাকা স্তব্ধ হয়ে থর থর করে কাঁপে, আর অসহায় নিস্পলক দৃষ্টিতে অতি নিশ্চিত মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করে। এর বিরুদ্ধে লড়াই এরা জানে না, বুঝে না, পোকা মাকড়ের মতো শুধু মরে। গ্রামগুলি

নিঝুম হয়ে থাকে। কোন সাড়া শব্দ নাই, দিনেও লোক চলাচল বন্ধ। কেউ এদের সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসে না, আসে না সরকার, আসে না জমিদার, কেউ না। কিন্তু কোন অভিযোগ নাই, নালিশ নাই, শুধু নীরবে মরে।

মহামারীর গ্রাস অবস্থায় এরা গুনিন আনায় ফকির আনায় তারা মন্ত্রপুতঃ মাটি ছড়ায় সমস্ত গ্রামে—কলেরা, বসন্ত পালাবে এই মন্ত্রের জোরে। যে গ্রামে এখনও মহামারী প্রবেশ করে নাই, সেখানেও এ গুনিন; ফকিরের ডাক পড়ে গ্রাম বন্ধ করার জন্য। মন্ত্র পড়ে গ্রামের চতুঃসীমানায় ইঁদুরের মাটি ছড়িয়ে দেবে যাতে মহামারী প্রবেশ করতে না পারে ঐ গ্রামে। আসবে গোঁসাইয়ের দল আর মোল্লা-মৌলবীর দল। মন্ত্রপড়া জল খাবে ব্যাধিগ্রস্ত ব্যাধিহীন সকলে। এ জল খায় এরা সুখের দিন থেকে মৃত্যুর দিন পর্যন্ত। বিংশ শতাব্দীতে এই এদের একমাত্র মহাঔষধ। এই খেয়ে এরা বাঁচে আবার এই খেয়েই মরে। রুগীকে উঠানে শুইয়ে তার চারিপাশে কাঁসর, ঘণ্টা, জয়ঢাক বাজিয়ে হরিনাম করা হবে আর কলস কলস জল ঢালবে রুগীর গায়। আর একদিকে হবে মিলাদ, দোয়া দরুদ পাঠ।

কিন্তু পরে ঐ সব করারও আর ক্ষমতা থাকে না, হতাশাগ্রস্ত, অসহায় মানুষ মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে প্রতিদিন দলে দলে। কেউ এদের করুণা করে না। না—মানুষ, না—দেবতা।

এ সত্ত্বেও এ জাতি মরে না, মৃত্যু এদের পরাজিত করতে পারে না। মৃত্যুর দংশনক্ষত আর কঙ্কালসার দেহ নিয়ে এরা মৃত্যুর দিকে ভ্রূকুটি করে ফিরে দাঁড়ায়। শক্ত করে আবার লাঙ্গলের মুঠি ধরে, ফসল ফলায়। এরা মৃত্যুঞ্জয়।

শুধু কি তাই, এরা সংগ্রাম করেছে বাঘের থেকে হিংস্র, কুমীরের থেকে কৌশলী, সাপের থেকে খল, নোনা জল থেকেও রাক্ষসী, দুর্ভিক্ষ, মহামারী থেকেও সর্বগ্রাসী একদল মানুষের বিরুদ্ধে। এরা হল বিদেশী সরকারের সাহায্য ও স্নেহপুষ্ট—জমিদার জোতদার, মহাজন—সমাজের উচ্চশ্রেণীর জীব। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে জমিদার ও মহাজন একই ব্যক্তি, একেবারে সোনায় সোহাগা। এরা বিদেশী প্রভুর ছত্র-ছায়ায় বসে অজন্মা ও দুর্ভিক্ষের বৎসরের খাজনা পরিশোধের অছিলায় আর মিথ্যা মামলায় কৃষকের ঘর ভেঙেছে, পুড়িয়ে দিয়েছে, সাতপুরুষের ভিটা-মাটি থেকে উচ্ছেদ করে জমিজমা ছিনিয়ে পথের ভিখারী করেছে, পরিণত করেছে দাসে। মহাজনের টাকার সুদ বেড়েছে চক্রবৃদ্ধি হারে, আসলের সাথে প্রতি বৎসর সুদ যুক্ত হয়ে আসলের কলেবর

হয়েছে আরও ভয়াল, আরও বিরাট। কৃষক সন্তান মহাজনের ঋণের জালে জড়িত হয়ে দেখেছে পৃথিবীর প্রথম আলো, পেয়েছে প্রথম বাতাস আর এমনি করেই বংশ বংশ ধরে শীর্ণ ও কুব্জ দেহে মাথায় বয়ে নিয়ে চলে এরা মহাজনের ঋণের জগদ্দল পাথর।

কৃষক নিজের জমির কাজ বন্ধ করে ঐ লোকগুলোর বাড়িতে বেগার খাটতে বাধ্য হয়েছে। তারা নিজেদের শিশুকন্যাকে উপবাসী রেখে খাজনা ছাড়াও ধান, চাল, হাঁস, মুরগী, খাসী, টাকা-পয়সা যোগাত জমিদার, জোতদার মহাজনের উৎসব-ব্যসনে, বিয়ে-শাদিতে, ধর্মের ধ্বজাধারী জমিদারের মন্দির মসজিদ নির্মাণে। আর যোগাতে না পারলে হয়েছে অত্যাচার, নির্যাতন। বাধা দিবার, প্রতিবাদ করার ক্ষমতা নাই, শুধু দুই হাত বুকে চেপে কোটরাগত নিষ্প্রভ চোখ আকাশে মেলে আর্তনাদ উঠেছে—ভগবান।

ধান যখন পাকে তখন পাখি থেকে আরম্ভ করে সারা জাহানের লোক এদের দরজায় এসে হাজির হয়। জাত নাই, ধর্ম নাই, উচ্চ নাই, নিম্ন নাই সব শ্রেণী এদের কাছে হাত পাতে। এরা দাতা আর সব গ্রহীতা। ঝাঁকে ঝাঁকে আসে লাল ঠোঁট সবুজ টিয়াপাখি। বাবুই এসে বাসাবাঁধে খেতের অনেক উপর তাল গাছে। সটাং থাকবে ধানের ক্ষেতে লুকিয়ে, চরাই দল বেঁধে কখন লম্বা, কখন গোল আবার কখন ত্রিকোণাকার হয়ে নানা ভঙ্গিতে উড়ে এসে কোনো এক সময় ধানের ক্ষেতের মধ্যে মিলিয়ে যাবে। আসবে দীঘড়, বুনো হাঁস, সবুজ কবুতর। কাকগুলোও বসে থাকবে না, তারা মোটা মোটা ঠোঁট দিয়ে ধানের খোসা ছাড়িয়ে চাল খাবে।

রাত প্রভাত হবার অনেক আগে থেকেই প্রতি বাড়িতে বোষ্টম বোষ্টমী এসে মন্দিরা বাজিয়ে গেয়ে যাবে রাধাকৃষ্ণের কাহিনীর মাঙ্গলিক প্রভাতী গান। কৃষকের বাড়িতে ধান উঠলে, বোষ্টমেরা ছোট ছোট নৌকায় বস্তা, ধামা নিয়ে যাবে প্রত্যেক বাড়িতে। কৃষক আদর করে তাদের বসতে দেবে, তামাক দেবে সেজে। কৃষক বধূ এনে দিবে দুই এক টুকরা পান সুপারী মাজা-ঘষা পিতলের থালায়। আর বয়স্কা ফরমাইস করবেন দুই একটি গানের। কাদামাটি মাখা শিশু ছেলেমেয়ের দল বোষ্টম বোষ্টমীকে গোল হয়ে ঘিরে দাঁড়িয়ে গান শুনবে কাজ বন্ধ করে। তারপর সাধ্য-সামর্থ মতো এরা ধান এনে দেবে বোষ্টমের পাত্রে। আগামী বৎসর আসবার ওয়াদা করে তারা বিদায় নেবে। এ কোন নির্দেশ না, না কোন আইন, নাই কোন চুক্তি। এই হচ্ছে নিয়ম। যার বাড়িতে তারা

প্রভাতী গাইবে সেই কৃষকই তাদের ধান দিবে এবং তা খুশি হয়েই দেবে।

আসবে পাটনী। সে নদীর খেয়া কৃষক হয়তো জীবনে পার হয়নি আর হবারও প্রয়োজন হয় তো হবে না বাকি জীবনে তাকেও কৃষক এক মুঠা না দিয়ে ফিরিয়ে দেবে না। দাতা যে সে ত্রুটি বিচার করে দান করতে জানে না।

ধান যে বৎসর ভাল হবে সে বৎসর কৃষকপল্লীর পাড়ায় পাড়ায় গজিয়ে উঠবে পাঠশালা। পাঠশালার জন্য ঘর তৈয়ারির প্রয়োজন নাই, সম্ভবও নয়—কারও বাইরের ঘরে বা বারান্দায় পাঠশালা বসে যাবে গুলজার করে। কাদামাটি মাখা উলঙ্গ, অর্ধউলঙ্গ ছাত্রের দল বগলে তালপাতা, কারও স্লেট পেনসিল ও দুই একখানি প্রাথমিক বই। বসবার ব্যবস্থা মাটি, কোনো কোনো ছাত্র তার বাড়ির তৈয়ারি তালপাতার চাঁচ বা পাতি ঘাসের ছোট্ট মাদুর বগল দাবায় করে এনে বসবে। পণ্ডিত সংগ্রহ হবে গ্রামের বা পার্শ্ববর্তী গ্রাম থেকে। তিনিও শিক্ষালাভ করেছেন এই ছাত্রদের মতোই শৈশবে। শিক্ষার দিকে অজ্ঞ মূর্খ কৃষকের আগ্রহ ধান চাষের মতোই প্রবল। বলে—আমি তো চোখ থাকতে অন্ধ তাইতো চেষ্টা করছি বাচ্চাটার চোখ ফুটিয়ে যেতে।

তাকে ঠকিয়েছে সারা জাহানের লোক। জমিদার, মহাজন যোগ বিয়োগের প্যাঁচে ফেলে তাদের প্রাপ্য বাড়িয়েছে কয়েকগুণ, শয়তানী শোষণের তীব্র জ্বালায় কৃষক তা বুঝেছে কিন্তু প্রতিবাদ করতে পারেনি—সে তো অঙ্ক বুঝে না। ধানের ব্যাপারী তাকে ঠকিয়েছে ওজনের ও হিসাবের মাধ্যমে।

তাকে ঠকিয়েছে সরকারী আমলা-কয়াদ থানার দারোগা-পুলিশ, ঠকিয়েছে চৌকিদার, গ্রাম্য ইউনিয়ন বোর্ডের মাতব্বরের দল। তাদের কুৎসিত লোলুপতাকে তৃপ্ত করতে উজাড় করে দিয়েছে তাদের রক্তধারায় সিক্ত অর্থ সম্পদ।

তারা ঐ পরস্বাপহরণকারীদের রাক্ষসী ক্ষুধাকে যত তৃপ্ত করেছে নিজেদের শেষ মুঠা মুখের অন্ন তুলে দিয়ে—তত তারা বিনিময়ে পেয়েছে অসম্মান, নির্যাতন, উপেক্ষা।

তাই এরা চায় তাদের ছেলে যেন জমিদারের খাজনা ও মহাজনের সুদ বুঝে শোধ করতে পারে। পারে যেন ব্যাপারীর কাছ থেকে ঠিক মতো টাকা পয়সা হিসাব করে নিতে। শিক্ষকের সাথে দেখা হলে বলে—ও পণ্ডিত, ছেলেটার দিকে একটু নজর রাখবা, আর যাই হোক হিসাবটা কিন্তু ভাল করে শিখাবা, ঐ সে বড় দরকার। আরেক সময় তোমারে আমি এক পালি ধান বেশি দেব, বুঝলে আমার কথা, একটু নজর রাখবা।

এখানে ধানই আদান-প্রদানের প্রধান মাধ্যম। এরা ধান দিয়ে কিনবে হাঁড়ি, কলস, যদি জন বা কৃষি মজুর রাখবার প্রয়োজন হয়, সেও ঐ ধানে-মাহিনায়। একটু অবস্থাপন্ন কৃষকের বাস যে গ্রামে বেশি, তারা স্থায়ী স্কুল ঘর একটা খাড়া করবে—দুই একখানা ছোট বেঞ্চ ও চেয়ারও তাতে থাকবে। তার জন্য সংগ্রহ হবে ধান প্রত্যেকের বাড়ি থেকে। গ্রাম বা পার্শ্ববর্তী গ্রাম থেকে যদি কৃষক অন্য কৃষকের কাছ থেকে গরু, ছাগল প্রভৃতি কেনে তারও মূল্য পরিশোধ হবে ধানে। নৌকা করে কাঁচের চুড়ি, গ্লাস ইত্যাদির ব্যাপারী আসবে, কৃষক সখ করে তার দুই একটি কিনবে ধান দিয়ে। চাষের বোরো বাঁধের বা অন্য কাজের সময় তাঁতীদের তৈয়ারী ছোট ছোট ধুতি যাকে এরা বলে যুগের কাচা, গামছা প্রভৃতি প্রায় সবই এরা ধান দিয়ে কিনবে। ধান কাটার সময় প্রায় সমস্ত ধান এক সাথে পেকে ওঠার দরুণ কৃষকের সাহায্য নিতে হয় বাইরের লোকের। এরা দূর দূর দেশ থেকে ছোট ছোট নৌকায় করে এসে ধান কেটে নিয়ে যায়। এদের বলা হয় কাচেল বা পর-বাসী। এরাও মজুরী পাবে ধানে।

পণ্ডিতও তার মাহিনা পাবে ধানে। পণ্ডিত এই সময় প্রত্যেক বাড়ি থেকে তার প্রাপ্ত ধান নিয়ে যাবে। ধান এদের কাছে সব, ধানই টাকা, টাকাই ধান।

আসবে গুরু-পুরোহিত, পীর, মোল্লা-মৌলবি দলে দলে। কোন এক অবস্থাপন্ন কৃষকের বাড়িতে এসে উঠবেন আর সারা এলাকায় বাৎসরিক টাকা আদায় হবে টাকায়, ধানে, খাওয়া-দাওয়ার ধুম পড়ে যাবে—হাঁস, মুরগী, পাঁঠা, খাসি, ডিম, দুধ, সর বাটা ঘি সংগ্রহ হবে বিভিন্ন বাড়ি থেকে। উৎসব, মহা-উৎসব পড়ে যাবে সারা গ্রামে। সন্ধ্যায় ভক্তগণ গুরুপীরকে ঘিরে বসে তাঁর কাছ থেকে শুনবে ধর্মের কাহিনী আর উপদেশ। মেয়েরা এসে বসবে অন্তরালে। এঁরাও বিদায়ের সময় দুই হাত তুলে আশীর্বাদ করে বলবেন—ভগবানের যদি দয়া হয় আগামী বছর আবার দেখা হবে।

বুড়ো পীর জব্বর পীর, তাকে মানে না এমন লোক ঐ নোনা এলাকায় নাই —সে হিন্দুই হউক আর মুসলমানই হউক। তাঁর বাৎসরিক দেবে না, তাঁর বিরাগভাজন হবে কার সাধ্য! দক্ষিণ অঞ্চলে ডাঙায় বাঘ, আর জলে কুমীর আর এই কুমীরের উপর হুকুমজারী করতে পারেন বুড়ো পীর। সারা নদীতে কুমীর গিজ গিজ করছে। শীতকালে নদীর চড়ায় বড় বড় ডিঙ্গি নৌকার মত তারা পড়ে থেকে রোদ পোয়াবে। দেখলে মনে হবে মড়া। যদি অসাবধানে

নৌকোয় করেও তার কাছে গিয়েছ, সে মিট্ মিট্ করে একবার দেখে নেবে আর পর মুহূর্তে ঐ নৌকার উপর ঝাপিয়ে পড়বে। যদি বড় নৌকা হয়। কোনও প্রকারে রক্ষা পাওয়া যেতে পারে। আর ছোট নৌকা হলে কোন উপায় নাই; সেখানেই নৌকা ডুবিয়ে দেবে, আর তারপর যা হবার তাই হবে। কুমীরের শিকার হবে মানুষ। যদি কোন প্রকারে নৌকা বাঁচিয়ে সরে আসতে পার, কুমীর একটু পরে জলের উপর ভেসে উঠে অপলক দৃষ্টিতে তোমার দিকে তাকিয়ে থাকবে, এক ইঞ্চিও সে যায়গা থেকে নড়বে না, তোমার কাজ হবে তখন দিক পরিবর্তন করে প্রাণপণে বৈঠা চালানো আর বুড়ো পীরকে ডাকা। হয়তো ছোট ছোট নদী উজান বেয়ে নদীর কিনার দিয়ে আস্তে আস্তে যাচ্ছে। কুমীর মুহূর্তে তার শরীরের খানিকটা নৌকার উপর উঁচিয়ে দিয়ে নৌকা উলটিয়ে দেবে। বড় নৌকার মাঝিও বাদ যাবে না, চলতি নৌকার হালের উপর আচমকা আঘাত করে মাঝিকে জলে ফেলে দেবে। ভাটির সময় সুন্দরী বনে ছোট ছোট খালে মাছ ধরতে যাও সেখানে পাবে, ভেটকী, পাঙ্গাস, রেখা, চিত্রা, পারসে, ভোলা, তপতী, গলদা চিংড়ি প্রভৃতি মাছ কিন্তু কুমীরও থাকবে সেখানে। অসাবধান যদি হয়েছ, তুমি নিজেই হবে কুমীরের শিকার।

রাস্তা বলে কোন বস্তু এ সমস্ত এলাকায় নাই, এক বাড়ি থেকে অন্য বাড়ি যেতে হলে নদীর পাশ ঘেষে বিলের যে বেড়ি-বাঁধ আছে তার উপর দিয়ে যেতে হবে আর অন্য গ্রাম হলে তো কথাই নাই, ঐ বেড়ি-বাঁধই সম্বল অথবা নৌকা যোগে যেতে হবে। চলবার সময় দুটি চোখ দুটি যায়গায় রেখে চলতে হবে—একটি বেড়ী-বাঁধের উপর যেখানে হর হামেশা বিষাক্ত সাপ থাকতে পারে, আর বাঁধের এক হাত নিচে নদীর কিনারায়, যেখানে শুধু চোখ দুটি ভাসিয়ে কুমীর ওৎ পেতে অপেক্ষা করছে পথিককে আক্রমণ করার জন্য।

বিলের মধ্যে দড়ি দিয়ে গরু বেঁধে রেখেছে দিনের বেলায়, কুমীর ডাঙায় উঠে ঐ দড়ি ধরে টেনে নিয়ে যাবে জলে। যদি কৃষক দেখতে পেল তবে হৈ হৈ করে লাঠিসোঁটা নিয়ে তাড়া করবে এবং অনেক সময় কুমীর পরাজয় স্বীকার করে এদের হাতে মৃত্যুবরণ করবে। আর যদি কোন প্রকারে চষা জমির উপর গিয়ে উঠতে পারে তবে কার সাধ্য তার পিছনে যায়। চার পা দিয়ে সে এত জোরে চষা মাটি পিছনে ছুঁড়বে—যেন শিলা বৃষ্টি হচ্ছে। সে অবস্থায় কুমীরের ধারে কাছে যাবে এমন শক্তি কারও নাই।

চাষের সময় খাটুনী পড়ে শেষ রাত্রি থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত। এ সময় খাদ্যের

দিক থেকে ভীষণ অনটন হয়, অন্য সময় বয়স্ক পুরুষরাই মাছ ধরে—যা এদের প্রধান খাদ্য, কিন্তু এ সময় তাদের মরবারও ফুরসৎ নাই। কৃষকরা কথায় বলে, 'মা মরলে কুলো দিয়ে ঢেকে রেখে বিলে চলো।' কাজেই মাছ ধরার প্রধান দায়িত্ব পড়ে উলঙ্গ ছেলেমেয়ে আর বাড়ির বুড়িদের উপর। এদের মাছ ধরার পদ্ধতি যেমন সোজা, তেমনি মাছও ধরা পড়ে সামান্য। দুই হাত লম্বা ও চওড়ায় প্রায় মশারীর মত পাৎলা বুনানীর কাপড়ের চার কোণায় দুইখানা বাঁশের চটা ধনুকের মত বেঁকিয়ে বেঁধে দিয়ে ঐ চটার মাঝখানে হাত তিনেকের মত সরু বাঁশ বাঁধবে এবং ঐ জালের উপর কিছু কুঁড়া, খুদ মাটির সাথে মিশিয়ে জলের মধ্যে ডুবিয়ে রাখবে এবং কিছু সময় বাদে বাদে ঐ সরু বাঁশখানা দ্বারা জালটি উঁচু করে কিছু ছোট ছোট চিংড়ি ধরবে। আর দুই তিন হাত দড়ির মাথায় একটা ইঁট বেঁধে ঐ দড়ির গায় শক্ত করে কয়েকটা মাছের টুকরো বা বাঙ্গ বেঁধে দিয়ে জলে ফেলে দেবে। কাঁকড়া এসে যখন ঐ মাছের টুকরা ধরে টানাটানি করবে তখন অতি সন্তর্পণে দড়ি টেনে জলে থাকতেই ছোট ছাঁকনি দিয়ে কাঁকড়া তুলে ফেলবে। এতে বঁড়শি প্রভৃতির কোন কারবার নাই। এই মাছ ও চাষের সময়ের খরচের জন্য কেনা চাংড়া চাংড়া কয়েকটি মেটে আলু ও বীচ কলা, এরা বলে ভয়াল কলা—তাই হবে কৃষকের এই সময়ের প্রধান খাদ্য।

কিন্তু এই মাছ ধরাও কম বিপদের নয়। কুমীর বহুদূর থেকে চোখ ভাসিয়ে তাদের লক্ষ্য করে ডুব দিয়ে সোজা এখানে এসে লেজের বাড়ি দিয়ে মৎস শিকারীকে ফেলে দিয়ে নিয়ে যাবে। ছোট শিশুগুলিও কম সাহসী বা হুঁশিয়ার নয়। তারা জাল বা দড়ি জলে ফেলে পাশের কোন মোটা গাছের আড়ালে চুপ করে বসে উঁকি মেরে দেখবে তাদের শিকারের যন্ত্রের অবস্থাটা। কুমীর যদি জলের তলা দিয়ে কিনারায় আসতে থাকে তখন জল ফুলে ওঠে বা অল্প অল্প ঢেউ ওঠে। বাচ্চার দল তা দেখা মাত্র ছুট দেবে উর্ধশ্বাসে বিলের দিকে। কুমীর হয়ত গাছটাতেই একটা লেজের বাড়ি দিয়ে ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ফিরে যাবে। এতো হরহামেশার ব্যাপার।

এ হেন ভয়ঙ্কর কুমীরের সাথে পাশাপাশি বসবাস করতে হয় কৃষকের সারা জীবন ধরে। আর এহেন কুমীরের উপর হুকুম চলে একমাত্র বুড়ো পীরের। এই পীরকে অমান্য করে এমন কোন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব পাওয়া দুস্কর।

পীর আসবেন ছৈ দেওয়া প্রকাণ্ড পদ্মী নৌকায়, তার ভিতরে বসবাসের জন্য ছোট একটা কুঠুরি, বাকী সব জায়গা ধান রাখবার জন্য। পীর সাহেব মুরিদ সহ উঠানের মধ্যখানে এসে আসনে গম্ভীর মুখে বসে দোয়া দরুদ পাঠ করবেন। মুরিদ উচ্চৈস্বরে ঘোষণা করবে পীরের আগমন বার্তা। গৃহস্থ ধামা ভরে দেবে ধান। পীর আশীর্বাদ করে বিদায় নেবেন।

জমিদারের কাছারি ঝাড়ামোছা হবে, প্রকাণ্ড উঠান গোবর মাটি দিয়ে নিকিয়ে ঝকঝকে করে তুলবে ধান উঠাবার জন্য। নায়েব গোমস্তা পূর্বেই স্থির করে রাখবে—কোন প্রজা দুধ দেবে, কে দেবে খাসি বা পাঁঠা, কার দিতে হবে হাঁস, মুরগী, ডিম। তালিকায় পরিস্কার করে লেখা থাকবে প্রজার নামের পাশে পরিমাণ সহ জিনিষের। পাইক, বরকন্দাজ বড় বড় লাঠি নিয়ে ঘুরবে গ্রামে গ্রামে—জমিদারের শুভাগমন বার্তা ঘোষণা করে আর খাজনা পরিশোধের তাগিদ দিয়ে। সমস্ত গ্রাম তখন সন্ত্রস্ত।

কাছারির ফরাসের উপর তাকিয়া ঠেস দিয়ে জমিদার গম্ভীর মুখে বসে আছেন। সামনে মাজা-ঘষা প্রকাণ্ড এক তামার থালা। প্রজারা একে একে আসছে, থালায় নজরের টাকা রেখে প্রণাম করে বিদায় নিচ্ছে। তারপরে হবে 'পুণ্যে' (পুণ্যাহ উৎসব), ঢাক-ঢোল, কাঁসর বাজিয়ে সারা গ্রাম প্রদক্ষিণ করবে এবং ঐ একই কাঁসার থালায় টাকা দিয়ে কৃষক 'পুণ্যে'র উৎসবে যোগদান করে বুঝি কৃতার্থ হবে। খাজনা আদায় হবে সুদ সহ, আইনী ও বেআইনী আদায় হবে সকাল থেকে রাত দশটা পর্যন্ত নির্মমভাবে। উঠানে পাহাড়ের মত উঁচু হয়ে উঠবে বর্গা জমিগুলোর ধান বা ধান-কড়ারি ধানে।

এ দেশে ধানে খাজনাকে বলে ধান-কড়ারি বা গুলো ধান। কোন দৈব দুর্বিপাকে একবার যদি কৃষকের জমি জমিদার খাস করতে পারে, তবে সে জমি আর টাকায় খাজনায় পত্তন করবে না। পত্তন করবে ধান-কড়ারিতে। কারণ টাকায় খাজনায় জমিদার পাবে বিঘা প্রতি দুই কি আড়াই টাকা আর ধান-কড়ারিতে পাবে কমপক্ষে তিনভাগের একভাগ ধান। আর ধান দিতে না পারলে কৃষককে দিতে হবে নির্দিষ্ট পরিমাণ বা বাজার দর হিসাবে মূল্য। এর আরও সুবিধা এই যে বর্গা জমির ধান বন্যা, দুর্ভিক্ষ, মহামারীতে অনেক সময় জমিদার পায় না কিন্তু ধান-কড়ারির ধান বা ধার্য টাকা কবুলিয়তের শর্ত হিসাবে কৃষককে দিতেই হবে। কাজেই প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রভৃতি যা কিছুই হউক না কেন জমিদারের কোন অবস্থাতেই ক্ষতি হবে না। ব্যবস্থা চমৎকার।

এদিকে আবার যে সমস্ত জমি জমিদার ভাগে দিবে, সে সমস্ত জমি মাতব্বর প্রজাদের মধ্যে ভাগ করে দিয়ে নির্দিষ্ট পরিমাণ বা অর্ধেক ফসল বৎসরান্তে নেবে। এই সমস্ত মাতব্বরই হচ্ছে সেই এলাকায় জমিদারের খুঁটি। এরা জমিদারের সর্বপ্রকার শাসন ও শোষণের দক্ষিণ হস্ত। এরা সর্বপ্রকার আইনী ও বেআইনী আদায়ে সহযোগিতা করবে। কোন কৃষকের কি পরিমাণ ফসল হয়েছে, কার কাছে চাপ দিয়ে কত বেশি আদায় করা যেতে পারে এবং চাপ দিবার পন্থা এরাই বাতলে দেবে। কোন কৃষক বেয়াড়া কথাবার্তা বলছে জমিদার সম্বন্ধে, সমস্ত কিছু জমিদারকে সে সঙ্গোপনে জানাবে। জমিদারের কাছারিতে তার বড়ই খাতির। জমিদার তার সাথে হেসে কথা বলে, পূজা পার্বনীতে নূতন ধুতি, গামছা, গেঞ্জি উপহার পায় আর তাই পরে সমস্ত গ্রামে জমিদারের মহানুভবতা কীর্তন করে বেড়ায়। সাধারণ কৃষকেরা কাষ্ঠহাসি হেসে তাতে সায় দেয়। উপায় নাই না দিয়ে। এরা জমিদারের কিছু চাকরান জমিও ভোগ করে এবং মাঝে মাঝে নগদ টাকাও বকশিস লাভ করে। জমিদারের অবর্তমানে এরাই করবে গ্রামের যত শালিসি বা বিচার। কোনো প্রজাকে জমি থেকে উচ্ছেদ করতে হলে বা কারও উপর অত্যাচার করতে হলে এরাই যাবে লাঠি-সোঁটা নিয়ে সকলের আগে। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের আশীর্বাদ পুষ্ট জমিদার, আর জমিদারের অনুগ্রহপুষ্ট মাতব্বর।

এই মাতব্বরদের অনেক জমি থাকলেও জমিদারের খাস জমিগুলি এরা ভাগে নেবে, নিজের চাষের জন্য নয়, স্থানীয় জমিহারা কৃষকগণের মধ্যে পুনরায় ভাগে দিবার জন্য। জমির পরিমাণ বুঝে দশ, বিশ, পঁচিশ টাকা সেলামি নিয়ে ঐ জমি বন্দোবস্ত করবে। যদি চাষী নগদ টাকা না দিতে পারে তবে ফসল ওঠার মুখে কৃষকের অংশ থেকে সস্তায় ঐ টাকার সুদ সহ আদায় করে নিবে মাতব্বরেরা। জমিদারের অর্ধেক অংশ ঠিকই থাকবে। জমির পরিমাণ স্বল্প এবং যা আছে তাও বেশির ভাগ কয়েকজনের হাতে কেন্দ্রীভূত। নাই কোন বিকল্প রুজি-রোজগারের সুযোগ সুবিধা। কাজেই জমিহারা বা দরিদ্র কৃষক বাধ্য হয় ঐ জমি ভাগে বর্গা নিতে। বাধ্য হয় সে গরু, লাঙ্গল, বীজধান করজা করতে, আর অমানুষিক পরিশ্রম করে নোনা জলের দেশে বেড়ি-বাঁধ বেঁধে তুলতে। একরে যে ফসল তারা বৎসরান্তে পাবে তাতে ক্ষুধার হবে না নিবৃত্তি, তৃপ্ত হবে বুঝি শুধু ফসল ফলানোর অদম্য আকাঙ্ক্ষার। ভরা বোঝাই করে জমিদার একদিন বিদায় হবেন, বাকী টাকা সত্বর সদরে পৌছিয়ে দিবার তাগাদা

দিয়ে। সমস্ত এলাকা হা করে নিঃশ্বাস ছেড়ে ভাববে—যাক্ এবারকার মতো বাঁচা গেল।

কিন্তু ভাগে জমি দেওয়া বা বর্গা প্রথা একদিন সাধারণ কৃষকের কাল হলো। পূর্বে জমিদারগণের এক একটি এলাকায় সত্তর আশি কি বড় জোর একশত বিঘার মতো খাস জমি থাকত। লম্বা টাকার সেলামি, ভেট আর নায়েবকে কিছু প্রণামী দিয়ে খুসি করতে পারলে কৃষক টাকা-খাজনার জমি বন্দোবস্ত নিতে পারত। কিন্তু জোতদারের আবির্ভাব এবং বহুক্ষেত্রে স্বয়ং জমিদার নিজেই জোতদারের অংশ গ্রহণ করায় সমস্ত এলাকায় সাধারণ কৃষকের দারিদ্র্য এক ভয়ঙ্কর মূর্তিতে প্রকট হয়ে উঠল। তারা জমি হারাল। ভিটে থেকে উচ্ছেদ হল, তারপর একদিন নিরন্ন ভিখারীতে পরিণত হল।

জমিদার তো জোতদারের অংশ গ্রহণ করল পরে। কাজেই তার কথা কিছু পরেই বলা যাবে। আগে জোতদারের শোষণ দেখা যাক। শতশত বিঘার বিরাট এলাকার মধ্যে বিস্তর জায়গা জুড়ে জোতদারের বাড়ি, তার সাথে দিঘির মত প্রকাণ্ড পুকুর। সমস্ত বাড়িটা পেট মোটা বড় বড় ধানের গোলার প্রাচীর দিয়ে ঘেরা, যার চাল পর্যন্ত ধানে বোঝাই। এরা পাকা বাড়ি তৈয়ার করতে পারে না, মাটি পাকা বাড়ি বা দালান তৈয়ারি করার উপযোগী শক্ত নয় বলে। এরা প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গোলপাতার ঘর তৈয়ার করে সুন্দরী পশুর, ধুন্দোল গাছের খুঁটি দিয়ে। বেড়া হয় সুন্দরী বনেরই গাছের তক্তায়। লম্বা লম্বা গোয়াল ঘরে ঠাসা রয়েছে দুধের আর চাষের গরু, বাড়ির কাছে জলা জায়গাটায় রয়েছে একপাল মহিষ। হাঁস, মুরগী যে কত তার হিসাব রাখা যায় না। পুকুরে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড রুই, কাৎলা, মৃগাল মাছ, কিন্তু তা সাধারণত মারা হয় না; মারা হবে দারোগা বাবু বা ঐ শ্রেণীর কোন ব্যক্তির শুভ পদার্পণ উপলক্ষে অথবা কোন সরকারী কর্মচারীর নিকট থেকে কাজ উদ্ধারের জন্য ভেটে। দৈনিক যে পর্যাপ্ত মাছের দরকার হয় তা নদী, বিল বা সুন্দরী বনের খাল থেকে মেরে নিয়ে আসা হবে। আর দেখা যাবে নবাব বাদশার আমলের মতো একদল দাস-দাসী এই বাড়ির মালিক জোতদারের সুখ, স্বাচ্ছন্দ, আয়াস আরামের জন্য দিনরাত খেটে মরছে। এই দাস দাসীদের পেট জোতদারের কাছে বাঁধা, এদের না আছে কোন বেতন না আছে কোন স্বাধীনতা। একেবারে ক্রীতদাস।

আর একদিকে দেখা যাবে, ঐ এলাকার চার পাশে নদী বা খালের কিনারা

দিয়ে কিছু ছোট ছোট কুঁড়ে ঘর। যে ঘরের মধ্যে ঢুকতে হলে মাথা নিচু করে কুঁজো হয়ে ঢুকতে হয়। তার মধ্যে সোজা হয়ে দাঁড়ান সাধারণ স্ত্রী-পুরুষের পক্ষে সম্ভব নয়। সেঘরের ছাউনি ঘাস বা ধানের নাড়া দিয়ে। যা কোনক্রমে এক বৎসর টিকে থাকতে পারে। আর দেখা যাবে অনেক ছাড়া ভিটা যা আগাছায় ভরে গেছে। এ ভিটায় একদিন বসবাস করত মানুষ, সন্ধ্যায় জ্বালান হত সন্ধ্যাপ্রদীপ, শিশুর কলকাকলিতে ভরে যেত সে গৃহের ছোট আঙ্গিনা, কিন্তু সেদিন কবে হয়েছে অতীত। এখন সেখানে বসবাস করে বন্য শ্বাপদের দল। এই লোকগুলি কোথায় চলে গেছে তার খোঁজ কেউ রাখে না। অখ্যাত অজ্ঞাত মানুষ শুধু দুটি অন্নের জন্য আদিম কালের যাযাবর মানুষের মত ঘুরে বেড়াচ্ছে দেশ হতে দেশান্তরে।

এই দলের যারা চলে গেছে তারা তো গেছেই কিন্তু এখনও যারা মরণপণ করে ভিটে কামড়ে পড়ে আছে, তাদের কাছ থেকে খোঁজ নিলে জানা যাবে এই যে হাজার বিঘার উপর জমি দেখা যাচ্ছে এর প্রায় জমিই একদিন এই শ্রেণীর লোকের ছিল। এদের পূর্বপুরুষ এক সময় জঙ্গল কেটে এই জমি উঠিত করেছে। এরা বলে 'দা-কাটা' সম্পত্তি। এই নিরীহ অজ্ঞ কৃষকদের ধারণা ছিল —তাদের এই দা-কাটা জমি কেউ কোনদিন ছিনিয়ে নিতে পারবে না। কারণ? কারণ আবার কি? এই জমি আবাদ করতে তাদের পূর্বপুরুষের কি কম রক্ত জল করতে হয়েছে। দিনের পর দিন বড় বড় সুন্দরী, পওর, বাইন প্রভৃতি গাছ কাটতে হয়েছে, মাটি খুঁড়ে খুঁড়ে তাদের মূল পর্যন্ত তুলে ফেলতে হয়েছে। আর সে অবস্থা কত লোক যে বাঘের পেটে গিয়েছে আর সাপের কাপড়ে মরেছে তার তো ইয়ত্তা নাই। চাষের সময় একমাজা জলের মধ্যে ডাল-পালা, ঘাস প্রভৃতি দিয়ে ভিটা তৈয়ার করে গরু মানুষ বাস করেছে তার উপর। আর ঐ জলের মধ্যে সমস্ত দিন ধরে চাষ করেছে গরু লাঙ্গল দিয়ে। সন্ধ্যায় নিশ্চিন্ত হয়ে বিশ্রাম করবে তারও উপায় নাই 'মুসো'র উৎপাতে। 'মুসো' কি বস্তু তা আপনারা বুঝবেন না। মুসো হচ্ছে মশার থেকে অনেক ক্ষুদ্র কাল কাল বিন্দুর মতো, তার মুখ পাখা কিছুই বুঝা যাবে না সাদা চোখে। সূর্যাস্তের পর পরই—এরা বলে 'চাপ চুপনী' বেলা থাকতে। এরা জলো দেশের লোক, তাই জলের অবস্থার সঙ্গে বেলার অবস্থারও মিল করে কথা বলে। চাপ চুপনী জল মানে অল্প জল, চাপ-চুপনী বেলা থাকতে মুসো দল বেঁধে সুন্দরী বনের জঙ্গল থেকে একখণ্ড কালো মেঘের মতো গুণ গুণ করে উড়ে আসবে

লোকালয়ের উপর। এদের ভয়ে মানুষ গরু সন্ত্রস্ত। কৃষকের কাজ হবে তখন টিন বাজিয়ে শব্দ করা এবং আগুন জালিয়ে ধোঁয়া করে মুসোর ঝাঁককে সরে যেতে বাধ্য করা। কিন্তু আগুন করা কি সহজ ব্যাপার ঐ ডাল-পালা ঘাসের ভিটার উপর পুরু করে মাটির প্রলেপ্ দিয়ে তার উপর আগুন জ্বালাতে হবে, তা না হলে ভিটে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। এ সব সত্ত্বেও কিছু মুসো নেবে পড়বে কৃষকের ভিটার উপর তখন তাদের কামড়ে অস্থির হয়ে উঠবে, মুহূর্তে প্রায় নগ্ন কৃষকের শরীর চাকা চাকা হয়ে ফুলে উঠবে, কেবলই চুলকাতে থাকবে, চুলকে চুলকে গায়ের ছাল উঠে গেলেও চুলকানোর বিরাম হবে না। যতই হাতের থাপ্পড় মেরে তাদের মারবার চেষ্টা করো না কেন, তাতে দুই চারটা মরলেও সংখ্যায় অধিক বলে কামড়ানোর বিরাম হবে না। এই সমস্ত এলাকায় মশারী ছাড়া মানুষ গরু একটা রাত্রও টিকতে পারে না। এ বিষয়ে কৃষককে বলা যেতে পারে বিলাসী। নিজের জন্য সে তৈয়ার করবে নেটের বা তাঁতের ফাঁকওয়ালা মশারী নয়, খাঁটি মার্কিন কাপড়ের নিশ্চিদ্র মশারী, একটু ফাঁক পেলেই মুসো ঢুকে পড়বে তার মধ্যে। গরুর জন্য চটের মশারী। যদি কোন অবস্থায় গরু মশারীর বাইরে থাকে তবে সে গরুকে বাঁচান প্রায় অসম্ভব। গরুর সমস্ত গায়ে আলাদা একটা পর্দার মত মুসো লেগে যাবে, একটু জায়গাও ফাঁক থাকবে না। গরু তখন ছুটবে, যে দিকে পারে সেই দিকেই ছুটবে, মাটিতে গড়াগড়ি দেবে, উঠে আরও ছুটবে। অসংখ্য মুসোও তার গায়ে আঠার মতো লেগে থাকবে এবং আর একঝাঁক তার পিছনে ছুটবে। এমনি করে সারা রাত্রি ছোটার পর ক্লান্ত গরু নেতিয়ে পড়বে কোনো এক জায়গায়। তখন মুসো পুরোপুরি ছেঁকে ধরবে গরুটিকে। সকালে কৃষক এসে খুঁজে পাবে সারা গায়ে বিন্দু বিন্দু রক্তে ভরা মৃত গরু। কোন কোন সময় গরু অতিষ্ঠ হয়ে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে মুসোর হাত থেকে বাঁচার জন্য, সে অবস্থায় মুসোর হাত থেকে বাঁচে সত্য কিন্তু প্রায়ই কুমীর কামটের পেটে যেতে হয়।

এই জমিকে আবাদযোগ্য করতে কৃষককে শুধু ঘর্মই ব্যয় করতে হয়নি ব্যয় করতে হয়েছে গরু আর মানুষের তাজা রক্ত, অনেক রক্ত, তার সাথে প্রাণ। সেই দা-কাটা সম্পত্তি থেকে কৃষক যে কোনদিন অধিকারচ্যুত হতে পারে, এতবড় অন্যায় পাপের কথা তার কল্পনার বাইরে ছিল। মূর্খ কৃষকের মোটা বুদ্ধির কল্পনার বাইরে থাকতে পারে, কিন্তু শোষকের সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে জানা ছিল ভবিষ্যতের ইতিহাস। আর অন্যায় পাপ—ছো! ও তো শিশু পাঠ্যপুস্তকে লিখে রাখার

বস্তু আর মূর্খ ভোলানোর হাতিয়ার।

আজ এরা নিঃস্ব সর্বহারা। জোতদারের বাড়ির দিকে আঙ্গুল দিয়ে দেখায়,—ঐখানে চলে গেছে সমস্ত দা-কাটা সম্পত্তি। নিজের জমিতে এখন উদয় অস্ত বর্গা চাষ করে। চাষ বাদে অন্য সময় ঐ জোতদারেরই বিভিন্ন কাজে গোলামের মতো খাটে। একেই বলে অদৃষ্টের পরিহাস। এক বৎসরের জন্য জোতদারের নিকট থেকে মোটা সেলামি দিয়ে বর্গা জমি নিয়ে দক্ষিণ অঞ্চলের দুরূহ বাঁধ তাকে বাঁধতে হবে। বীজ ধান, বাঁধের সময় খোরাকি, চাষের সময় খোরাকি—এক কথায় পাঁচ ছয় মাসের যাবতীয় খরচা জোতদার বর্গাদার কৃষককে দেবে দেড়া সুদে উদার হস্তে। অর্থাৎ পাঁচ ছয় মাস বাদে পৌষ মাঘ মাসে এক মণ ধানের জন্য দেড় মন ধান দিতে হবে। এক মন আসল আর আধা মণ সুদ। নিয়ম হচ্ছে জোতদারের নিকট থেকে জমি বর্গা নিলে তার কাছ থেকে ধান কর্জা নিতে তুমি বাধ্য। যদি না লও তা হলেও নির্ধারিত পরিমাণ ধানের সুদ তোমাকে দিতে হবে। জোতদার বলবে—তোর ধান তো গোলায় পড়ে আছে, তুই লইস নাই তার জন্য দায়ি তো আমি না। কাবুলিওয়ালার সুদ আদায় দেখে আমরা নানা প্রকার হাসি বিদ্রূপ ঠাট্টা করে থাকি। কিন্তু এদের কাছে কাবুলি-ওয়ালা নাবালক, শিশু।

ধান পাকলে কৃষক নিজ খরচায় ঐ ধান জোতদারের খলেনে (ধান মাড়াইয়ের জন্য উঠান) তুলতে হবে। এই খলেন তৈয়ার করা দক্ষিণ অঞ্চলে খুব সোজা কথা নয়। প্রথমে ঐ প্রকাণ্ড জমিখণ্ডের সমস্ত ঘাস, আগাছা মূল সহ খুঁড়ে তুলে ফেলতে হবে, তারপর কোদাল দিয়ে কুপিয়ে জল ঢেলে সমস্ত জমি ভিজিয়ে জব্‌জবে করে দুই একদিন রাখতে হবে, পরে পিটুনি দিয়ে পিটিয়ে সমান ও শক্ত করে পর পর দুই তিনবার গোবর গোলা লেপে খলেনকে ধান ও মাড়াইয়ের উপযুক্ত করে তুলতে হবে, যাতে কোনো অবস্থায় গরুর খুরের চাপে খলেনের মাটি উঠে না যায়, না গজায় কোন ঘাস বা আগাছা।

সকাল নয়-দশটায় ধান মাড়াই আরম্ভ হবে আর শেষ হবে ঐ দিনের মতো রাত দশ-এগারোটায়। এমনি করে বর্গাদার কৃষক দিনের পর দিন ধান মাড়াই করে, একদিকে করবে ধানের পাহাড় আর একদিকে খড়ের স্তূপ। পরে সমস্ত ধান কুলার বাতাস দিয়ে পরিষ্কার করে শুকিয়ে জোতদারের অংশ গোলায় তুলে দেবে। জোতদার নিজে বসে থেকে বা প্রতিনিধিদ্বারা তার-বর্গা অংশ প্রথম ভাগ করে নেবে। তারপর শুরু হবে কর্জা ধান, তার সুদ, সুদের সুদ, তস্য

সুদ আদায়।

এ এক অদ্ভুত দৃশ্য। একটা মাংসলোভী শকুনী তার কুৎসিত ঠোঁট গলা পর্যন্ত ঢুকিয়ে দিয়ে, একটা জীবন্মৃত গরুর কলিজা টেনে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে। গরুটা চলতে পারে না, নড়তে পারে না, শুধু বিস্ফারিত বড় বড় কালো চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে। উদর পূর্ণ করে খাওয়া শেষে শকুনী চলে যায়, পড়ে থাকে শুধু গরুর হাড়। আর জোতদারের সমস্ত অংশ আদায়ের পর ধামা ও কুলা। জোতদার কিন্তু একেবারে শকুনের মতো নয়। শকুন তো উদর পূর্ণ করে চলে যায় অন্যত্র, জোতদার কিন্তু মৃতপ্রায় কৃষককে ত্যাগ করে চলে যায় না, আগলে বসে থাকে আরো শোষণের, বারবার শোষণের শয়তানী মতলব নিয়ে। তার ঋণদানের উদার হস্ত কৃষকের দিকে প্রসারিত করে অভয় দিয়ে বলে, খালি হাতে যাবি কেন, কয়েক পালি ধান নিয়ে যা। তোর কাছে তো আরও অনেক ধান বাকী থাকল, সে আর কি করা যাবে। আর দেখ—তুই এক দিনের মধ্যে নৌকা নিয়ে বাদায় বেরিয়েপর। ঘরে বসে থেকে লাভ কি? আর যাবার সময় বৌকে আমার বাড়িতে রেখে যাবি। খাবে দাবে কাজকর্ম করবে নিজের বাড়ির মত। অনর্থক বাড়িতে রেখে খরচা বাড়িয়ে লাভ কি তোর?

ধান ওঠার প্রথম মৌসুমে কৃষককে করতে হয় ধান কর্জা, গৃহের সুখ ও শান্তি যায় তার ভস্ম হয়ে, বৌকে রেখে যায় সেবাদাসী করে জোতদারের বাড়িতে।

জোতদারের আছে বড় বড় পদী নৌকা যাকে এরা বলে 'বাদা কাঠ নাও'। সেই নৌকাগুলি নিয়ে ভাগচাষী কৃষকেরা বেরিয়ে পড়ে জঙ্গলে। বন বিভাগের অফিস থেকে পাশ করে এরা নৌকা বোঝাই করবে—সুন্দরী, পশুর, বাইন, ধুন্দোল গড়ান প্রভৃতি গাছ। এই গাছগুলি থেকে তৈয়ার হবে ঘরের খুঁটি, রুয়ো। নৌকা ও অন্যান্য জিনিষ তৈয়ারের জন্য তক্তা, জ্বালানি কাঠ প্রভৃতি। ঘর ছাইবার জন্য গোলপাতাও আনবে। কোনো কোনো নৌকায় জঙ্গলে মধু সংগ্রহ করতেও একদল লোক যাবে।

সুন্দরী বনের মৌমাছিগুলি আকারে সাধারণ মৌমাছির থেকে অনেক বড় এবং হিংস্রও সেই পরিমাণ। মৌচাকের আকার হিসাবে আধমণ, ত্রিশ সের এমনকি একমণ পর্যন্ত মধু হয় কোন কোন চাকে।

এই ভয়ঙ্কর জঙ্গলে এরা দিনের পর দিন কাটিয়ে ঐ সমস্ত সম্পদ সংগ্রহ করবে জোতদারের অর্থ বৃদ্ধির জন্য। ঐ দুর্গম জঙ্গলে এদের হাতিয়ার শুধু মরু-

সুন্দরী গাছের লাঠি, আর গুনিনের মন্ত্র। এই মাত্র সম্বল করে এরা সারা বন চষে বেড়াবে দৈত্যের মত। খুঁজে খুঁজে পচ্ছন্দমত গাছ কাটবে, মধুর চাক ভাঙবে, গোলপাতা কাটবে। অনেক সময় বাঘ এদের পিছনে আসে, কোন এক অসতর্ক মুহূর্তে কারো ঘাড়ে পড়ে চক্ষের পলকে নিয়ে যাবে গভীর জঙ্গলে।

কিন্তু এ লোকগুলিও কম নয়, সুযোগ যদি পায় তবে সুন্দরী গাছের লাঠি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে বাঘকে লাঠি পেটা করে ক্ষত বিক্ষত সঙ্গীকে টেনে নিয়ে আসবে। বাঘকে এরা ভয় করে না, শুধু সতর্ক থাকে। প্রয়োজন হলে বুক ফুলিয়ে দাঁড়াতে একটুও ইতস্তত করে না।

কিন্তু জোতদারের কাছে অসহায়, নিরুপায়। শত শোষণে জর্জরিত হয়েও এরা মাথা উঁচু করে বুক ফুলিয়ে দাঁড়াতে পারে না। ভুলে যায় ব্যবহার করতে সুন্দরীর লাঠি আর গুনিনের মন্ত্র। সেটা তার বাঁধা। স্ত্রী তার ক্রীতদাসী ঐ জোতদারের কাছে। নির্মম ভয়ঙ্কর, বাঘের থেকেও শক্তিশালী, বুঝি অনেক শক্তিশালী।

এমনি করে আগামী ধান চাষের মৌসুম পর্যন্ত সে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস গ্রামছাড়া, বাড়িছাড়া হয়ে একবার জঙ্গল আর একবার গঞ্জে মাল সংগ্রহ ও বিক্রয়ের জন্য নৌকাপথে ছোটাছুটি করবে। আর ওদিকে ভাগচাষীর স্ত্রী জোতদারের বাড়ির খুঁটিনাটি কাজ থেকে আরম্ভ করে ধান ভানা, গরুর গোয়াল পরিষ্কার করা, তাদের খাবার খড় বিচালি দেওয়া, কাঠ চেলা করা, রান্নাবান্না করা, কাপড় কাচা প্রভৃতি যাবতীয় কাজ সকাল থেকে অনেক রাত পর্যন্ত করবে। এখানেই কি শেষ? না। শেষ হয় মনুষ্যত্বের চরম অপমানে, ন্যায়ধর্ম নীতির বিসর্জনে। নারীমাংস-লোভী জোতদার ও তার যুবক পুত্রদের লালসার চরিতার্থতার মধ্য দিয়ে। শুধু এক মুঠো অন্নের জন্য, পেটের জন্য দেশের, জাতির বুকের উপর নারীত্বের এত বড় অপমান, মনুষ্যত্বের এমন অপমৃত্যু বুঝি আর কোথাও হয় না!

জোতদারের এই সীমাহীন শোষণে প্রলুব্ধ হয় জমিদার। লালসায় তার চোখ চক চক করে উঠে, তার লোল জিহ্বা সিক্ত হয়ে আসে। ক্ষুধার্ত কুকুরের চোখের সামনে এ একখণ্ড মাংস।

কিন্তু কি করে তা হবে সম্ভব? কি করে পূর্ণ হবে তার লালসার চরিতার্থতা? খাস জমি না হলে এ নির্মম শোষণ তো কোন অবস্থায় সম্ভব নয়। কিন্তু হায়রে, তার সমস্ত জমি যে টাকায় খাজনায় বন্দোবস্ত করা। তাতে আর

সে কত পাবে,—বিঘা প্রতি একটাকা, দেড়টাকা, বড় জোর দুইটাকা বৎসরান্তে। আর খাস জমি বর্গা দিলে পাবে অর্ধেক ফসল, সে যে অনেক গুণ বেশি।

মনে মনে জমিদার বুঝি অভিশাপ দিল তার পূর্ব পুরুষকে, যারা খাস জমি না রেখে সমস্ত জমিতে প্রজাপত্তন করতেন,—টাকার খাজনায়। সে যুগে জমিদারেরা ধানের ময়লা হাতে লাগাত না, তাদের হাতে আসবে চকচকে টাকা, যার টুং টাং শব্দে সারা দেশের লোক মোহিত, তার অনুগত। ধানের হিসাবপত্র করা—ওটা নেহায়েত ছোটলোকের কারবার, চাষা চাষা ভাব। তাদের আভিজাত্য বাড়ত বেশিবেশি প্রজাপত্তনের মধ্য দিয়ে। কোন জমিদারের কত ঘর বেশি প্রজা, এ একটা বড়াই করার, দম্ভ প্রকাশ করার মতো বস্তু ছিল এবং এই নিয়ে তারা হরহামেশা তা করত।

কিন্তু বর্তমান জমিদার ভাবছে তার বাপ-ঠাকুরদাদা কি মূর্খই না ছিল। আরে, ধানেই তো টাকা; টাকা কি এমনি হয়? প্রজা নিয়ে আমি কি করব, ধুয়ে খাব? যদি সম্ভব হয়, সে সমস্ত প্রজা উচ্ছেদ করবে। পারলে সে কলের লাঙ্গল বসাবে সমস্ত এলাকা জুড়ে। কিন্তু তাতে অনেক হাঙ্গামা, তার উপর খুলনার দক্ষিণ অঞ্চলের জমি এত নিচু আর জলকাদায় ভরা, সে খুবই অসুবিধা। কি হবে অত হৈ-হুজ্জুত করে, তার থেকে ঐ চাষাগুলোকে সে বানাবে কলের লাঙ্গল; ওরাই হবে তার ঐশ্বর্যবৃদ্ধির যন্ত্র, মানুষ-যন্ত্র। কিন্তু কি করে তা হবে সম্ভব? জমিদাররা এই নিয়ে বুদ্ধি পাকিয়ে চলে।

ঠুলি

প্রেমেন্দ্র মিত্র

বুড়িগঙ্গা, ধলেশ্বরী,
শীতলক্ষ্যা, মেঘনা,
উথাল ব্রহ্মপুত্র আর উতলা পদ্মা
তোমাদের তীরে আর তরঙ্গে
কি যে কবে এসেছিলাম ফেলে
মনে ছিল না।
আজ হঠাৎ পিশাচদের বেয়নেটে,
আর কামান বন্দুকে জানলাম
তা বিদীর্ণ রক্তাক্ত
আমারই হৃদয়।

তবু সেই শয়তান-শাহীকেই জানাব সেলাম
পা রাখবার জমিন
আর মন মেলবার আসমান নিয়ে
যুগযুগান্ত ধরে যাদের ঠগবাজির কারবার
দু চোখে আঁটা ঝুটো তাদের ঠুলি
যদি ফেলতে পারি ঠেলে।

হাওয়ায় হাওয়ায় ছিন্নপত্রে পত্রে

বিষ্ণু দে

নিতান্তই বাঙালি যে, এই প্রাচীন বিস্তৃত
বাঙলার ভূগোলে মনের ভাষার রক্ত চলাচল—
অপটু শরীরে বটে—কিন্তু আজও, সগু উষায় উত্থিত
চৈতন্যে প্রবল।
অথচ কি দিন কিবা রাত্রি আজ স্ফীত
অনির্দিষ্ট অস্থির আবেগে যেন বা বন্যায়
নৌকা কিংবা দেহমাত্র এ নদী কিংবা বদ্বীপের সমুদ্রের—
নিরুদ্দেশ ন্যায় ও অন্যায় কার মাৎস্যন্যায়ে বোঝা দায়।

অথচ জীবন চায় চোখে চোখে স্বচ্ছ বোধ,
চায় স্বস্থ প্রেম চায় সুস্থ ঘৃণা চায় মুক্ত ক্রোধ,
চায় রাবীন্দ্রিক সূর্যোদয়ে সত্যের রুদ্রের
পুষণের—আমরা যা প্রায় ভুলি—
আবির্ভাব, আকাশে হৃদয়ে যেখানেই জীবন্ত ন্যগ্রোধ,
প্রতীক্ষায়, আস্তিক্যের প্রশ্নে প্রশ্নে স্পন্দমান,
যেমনটি শোনা যায় এ বাঙলায় বাঙলাভাষায় ছন্দময়
এদেশে ওদেশে, গঙ্গার তিস্তার পদ্মার মেঘনার জলে
কল্লোলে তন্ময়, যার গান বয় কর্ণফুলি
ইছামতী আত্রাই যমুনা যেন সব হাওয়ায় হাওয়ায়
জীবনস্মৃতিতে ছিন্নপত্রে পত্রে দীর্ঘ বহুব্যাপ্ত অস্তিত্বের গান।

এপার ওপার

বিমলচন্দ্র ঘোষ

এপারে জীবন রুদ্ধ নিশ্বাস
চেতনাও রক্তাক্ত,
হাড়িকাঠে মাথা পাতা বারোমাস
খড়্গ নাচায় শাক্ত!
ওপারে ক্ষিপ্ত শিয়া ইয়াহিয়া
কোরবানি অসমাপ্ত।

মরু ভেবে মিঞা মেঘনার বুকে
দিয়েছিল বেগে লম্ফ,
নাকানি চোবানি খেতে খেতে শেষে
শুরু হলো হৃদকম্প,
কূলে কূলে বাজে ভরা পদ্মার
মেঘরোল জগঝম্প।

ওপারের দিকে চেয়ে দেখ ওরে
এপারের যত বাঙালি!
কুটিল সহরে গড়তে গড়তে
ক্রমাগত দল ভাঙালি,
ভাই মেরে ভাই হলি ঠাঁই ঠাঁই
রক্তের ধ্বজা টাঙালি।

বাজেদের ওরা ময়না করেনি
বাঁধাধরা বুলি পড়িয়ে,
সাড়ে সাত কোটি কাস্তে গালিয়ে
খর তরবারি গড়িয়ে
ওরা লাখে লাখে হায়দরী হাঁকে
মান রাখে জান লড়িয়ে।

এবার বুঝতে পেরেছে

দক্ষিণারঞ্জন বসু

হুনেরা ওদের জিহ্বা ছেদন করতে চেয়েছিল,
ওরা তাতে ক্ষিপ্ত হয়ে তীব্র প্রতিরোধ করেছে।
শুধু তাই নয়, প্রচুর রক্ত ও প্রাণের বিনিময়ে
ওরা রক্ষা করেছে আপন মাতৃভাষার জবানীকে।

হুনেরা চির-নির্বাসন দিতে চেয়েছিল ওদের প্রিয়
সাহিত্য-গুরুকে ; প্রচণ্ড বাধায় তা ব্যর্থ হয়েছে।
রবীন্দ্রসঙ্গীত ও রবীন্দ্রভাব-বন্যায় এখন তো
ভেসে চলেছে বাঙলাদেশের সমস্ত মানুষ !

হুনেরা ভেবেছিল ওদের অর্ধভুক্ত করে রাখবে,
কিন্তু ওরা একগাট্টা হয়ে এমন রুখে দাঁড়িয়েছে—
শত্রু এখন আর পরিত্রাণের পথ খুঁজে পাচ্ছে না ;
সাড়ে সাত কোটির সবাই যে আজ দোর্দণ্ড সৈনিক !

হুনেরা এবার বুঝতে পেরেছে, যারা মরতে শিখেছে
তাদের মেরে শেষ করা যায় না। আরো জেনেছে,
নেতার নির্দেশে ওদের প্রত্যেকটি ঘর এখন দুর্গ ;
ওরা স্বাধিকার চেয়েছিল, এখন স্বাধীন সার্বভৌম !

একদিন স্বপ্ন ছিল

মণীন্দ্র রায়

একদিন স্বপ্ন ছিল, শীতলাই, তোমার
বিলের শালুক ফুলে জ্যোৎস্না দেখি ; একদিন আমি
পুকুরের ভাঙাঘাটে মায়েদের বাসন-মাজার
হাতের শাঁখায় দ্রুত রৌদ্র ঝলকিত
দেখেছি সকাল ;
একদিন পাঠশালার বিমনা কিশোর
চৈতালি মাঠের আলে চড়কের ঢাকের বাজনায়
ধুলোর ঘূর্ণির পাকে ঘুরেছি উধাও ;
ঠাকুমার পাশে শুয়ে, মনে কি পড়ে না,
বেহুলার ভেলা বেয়ে বুকের ভিতরে
মানুষেরই মমতার স্বর্গ পেয়ে একদিন আমি
জাগি লখিন্দর !

এখন উন্মাদ রাতে পোড়া অন্ধকার।
এখন দাউদাউ চিতা। বুকে তার উঠে-বসা ঐ
হাত-পা বাঁধা শীতলাই আমার
সেকালের সতীদের আর্ত অভিশাপে
জ্বলে যায় সারা বাঙলাদেশে ;

এখন কবিতা কেন শমীশাখা থেকে
গাণ্ডীবের টঙ্কারের ছদ্মবেশ ছিঁড়ে
হবে না সশস্ত্র।

বিন্দু বিন্দু আলো

গোলাম কুদ্দুস

নিরন্ধ্র অন্ধকারে যে ধ্রুব নক্ষত্রটি জ্বলে আকাশে
ভালবাসার মতো, বিবেকের মতো,
সে আজ নেমে এল মাটিতে
ক্ষুদ্র জোনাকি হয়ে,
জ্বলতে থাকল বনে বাদাড়ে আনাচে কানাচে
ঝোপেঝাড়ে-খালেবিলে নদীর পাড়ে পাহাড়ের ধারে,
জ্বলে উঠে ঝাঁপিয়ে পড়ে অন্ধকারের ঘন কেশরে,
নিভে গিয়ে মিলিয়ে যায় অন্ধকারের চোখ এড়িয়ে।
বিন্দু বিন্দু আলো ছাড়া আমার আর কোনো আশা নেই
আর কোনো ভাষা নেই।
যেদিন ওরা উঠে আসবে দিগন্তের প্রান্তে
রাত্রিশেষের শুভ্র শুকতারার মতো
সেদিন বহু দূরে।
আজ ক্ষুদ্র জোনাকিরা যদি না পায় স্বীকৃতি
কাল পূর্বাচলে উদার সূর্যোদয়কে
স্বাগত করার পাবে না অবকাশ।

আমার জন্মভূমি

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

আমার জন্মভূমি আমার সমস্ত রাত্
ঝরা ফুলের কুয়াশা ; আমার
জীবন কাটল ঘুমপাহাড়ে সূর্য ওঠার রূপকাহিনী
প্রতিটি সূর্যাস্তে ভেলায় ভাসতে দেখে ;

নদী
রক্ত করলো আমার পিপাসার শিশুবেলা, আমার
সমস্ত যৌবন ;

আজ
কোথাও যদি দ্বিতীয় ভোর কাঁপতে থাকে, আমি
পুণর্জন্মে বোনের হাতের ফোঁটা নিয়ে
দেখব তোমার অমল মুখ কেমন প্রত্যাশায় জলে,

তবু
কবিতা আর বাজবে না আর আমার হাতে
কিশোর রাখালের অবাক বাঁশির মতো, আমি
এখন ক্লান্ত, ঘুমুতে চাই।

পদ্মার চরে

অসীম রায়

'ছিন্নপত্রের' এই বাঙলাদেশে
এরা কারা ছিন্ন তরুণ ?
ধূ ধূ পদ্মার চরে ঝিরি ঝিরি জল,
চারটি তরুণ, পাশে চারটি রাইফেল।

রাজশাহীর শফিকুল পাবনার কাদের
ঠিক জেনেছিল ঃ
মুক্তিযুদ্ধ দুর্গাপূজো নয়
কিংবা বন্যাত্রাণ সভা-সমিতির
ধূমধাম নয়,
তারা মৃত্যুঞ্জয়।

সবচেয়ে কি দরকার বেঁচে থাকতে
যা না হলে বাঁচা দায়—
ভাত গান ভালবাসা
সবচেয়ে কি দরকার ?
রাজশাহীর শফিকুল পাবনার কাদের
ঠিক বুঝেছিল—
আত্মমর্যাদার।

সে

সিদ্ধেশ্বর সেন

পিঠে-ঠেকানো বন্দুকের নল
হুকুম করল—
গান গাও

পিঠে-ঠেকানো বন্দুকের ফৌজি-ধমক
হাঁক দিল, গাইতে হবে—
গাও
প্রেমের, গান সমর্পণের

গলা ফাটিয়ে যেই সে চীৎকার
ক'রে উঠল—"আমার সোনার······

অমনি "বাঙ্‌লা" শব্দটার
বুক ছেঁদা করে, ছুটে
বেরিয়ে গেল
গরম একটা তালগোল্‌-পাকানো
সিসে

আর, মুখথুবড়ে মাটিতে শুয়ে পড়ার আগে
সে
নিঃশ্বাসটা শেষবারের মতো নিজের জেনে নিয়ে
উস্‌খুস্‌ হাওয়ার কানে, ধরিয়ে
দিয়ে যেতে পারল, "বাঙ্‌লা"

যেন শব্দটা তাতেই প্রাণ
পেয়ে গেল
এদিক-ওদিক খানিক আন্‌চান্‌—তারপরে, শেষে
"তোমায় ভালবাসি" ব'লে

জগৎ-সংসারে
বেরিয়ে পড়ল।

দেশহীন

শঙ্খ ঘোষ

আজ তোমার সামনে দাঁড়িয়ে বলতে চাই জয়
কিন্তু সেকথা বলা আমার সাজে না।
আমার সমস্ত শরীর
তরুণ শষ্পের মতো উদ্‌গত করে দিয়ে বলতে চাই জয়
তবু গলায় ঠিক স্বর বাজে না।
আমার মুখে অন্তহীন আত্মলাঞ্ছনার ক্ষত
আমার বুকে পালানোর পালানোর আরো পালানোর
দেশজোড়া স্মৃতি
তাই আজ যদি দু-হাতে তুলতে চাই অভয়
কেঁপে যায় হাত, মনে পড়ে
এতো দীর্ঘ দিন আমি কখনোই তোমার পাশে ছিলুম না
না

সুখে না দুখে না লাজে না
তবু তোমার সামনে আজ বলতে চাই জয়
যে কথা আমার বলা সাজে না।

জাগো সুখ

বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিত

জাগো সুখ—পাটাতনে, নয়তো আকাশ থেকে নীল
অনিঃশেষ ঝরেনাকো, দৃশ্যত উড়ছে বালিহাঁস।
উড়েছে বা গভীর বুননে রাঙা পাড়—
সবুজ ও লাল বুটিদার নক্সাখানি।
হয়তো রূপালি আভা চমকে ওঠে রৌদ্রাঘাতে···
জ্যোৎস্নার রূপা কি ?
আশৈশব এইভাবে ঝরে গিয়ে
কখনো আত্রাই
থেকে থেকে বিদ্যুৎ চমকে
ভাসিয়ে দিয়েছে এমনি ভেলা।

সীমানাবিহীন নীলে, বা ঐ প্রান্তরে—ভেলা থামে,
ভেসে আসে বজ্রসমান
সম্মিলিত ক্রোধ ; দেখি একাগ্র আত্মদান।
স্বাধিকারে
ঐ না নিশান
উড়েছে, যেমন ওড়ে সবুজে ও লালে
বনানীর টিয়া।
আরক্তিম বৃত্তই হৃদয়, বৃত্তে
স্বর্ণরেণু মাখা দীপ্ত তোমারি প্রতিমা।
আজীবন তেমনই রয়েছ সুখ,

এই বুকে—
ভিতরে-বাহিরে—পাটাতনে।

৯

নয় পরবাস নিজভূমে

অমিতাভ দাশগুপ্ত

সেই শ্যামা মেয়ে
কালো চুল মেলে দিয়ে সন্ধ্যা আনে পিঠের প্রান্তরে
এপারে ওপারে জ্বলে
আগুন ফস্‌ফর স্বর্ণচাঁপা
তার গ্রীবাভঙ্গিমায়, আননের টানে
ছেলেরা ফেরে না ঘরে
অদৃষ্টনদীতে খেলে বাচ্‌
কামিজের রক্তে ভাসে পুণ্যিপুকুরের বুক নদী
একহাঁটু জলে ডোবে একগলা ভালোবাসা
জোয়ারে জোয়ারে কাঁপে সমর্পিত স্বরলিপি—
চাই জয় বা চির বিদায়।

পাথর-প্রতিমা প্রিয়তমা
তারও মর্ম টলে যায় এত স্বেচ্ছাচার হাহাকারে
পূর্ব গোলার্ধের জবাশঙ্কাশ সূর্যের দিকে
ছিন্ন স্তন তুলে ধরে
মরদের সোহাগী রমণী
কীর্তনখোলার পারে, গিতলদহের ঘরে ঘরে
ধূমার্দ্রলোচন রাত
নিহত শিশুর ঘ্রাণে সুনীলে শকুন. পথে শিবা
হাজার প্রাণের সমুদ্র শাসাবে ব'লে
ছত্রি-সমাবেশে নামে মধ্যযুগ। নথি, শৃঙ্গী। রাজা।

মগ্ন বেলাভূমিময় ওঠে গান গাঢ়তম গান
শুধু মুক্তি প্রার্থিত—স্বদেশ

নয় পরবাস নিজভূমে
বাষ্পাকুল কেন্দ্র—নিচে খর স্রোত্ শিয়রে অশনি
বৈঠায় কামট নক্সা কাটে—
তবু পদতল ছুটি, আরক্তিম পায়ের পাতায়
রুদ্ধবাক যৌবনের তুমুল প্রণয়ে
ফোটাতে চুম্বনে লক্ষ নীপ
বুকে শব্দটান···জন্মভূমি

সে শ্যামা মেয়ের অভিমুখী
ছেলেরা ফেরে না ঘরে
অদৃষ্টনদীতে খেলে বাচ্
জোয়ারে জোয়ারে ভাসে সমর্পণ প্রণয়ে প্রয়াণে—
চাই জয় বা চিরবিদায়।

বাঙলাদেশ ঃ আমার বাঙলাদেশ

আবুল আহসান চৌধুরী

বাঙলাদেশ ঃ আমার বাঙলাদেশ
এখন একখণ্ড ছিন্ন পবিত্র কাপড়ের মতো
ক্রমশঃ হাওয়ায় দুল্ছে
শোকার্ত চোখগুলো নিষ্পন্দ
বৈঁচীফল, বনকাসুন্দীর ঝাড়ে ঝাড়ে
জোনাকীরা জ্বলে রয়েছে, নিবছে না
বাঙলাদেশ ঃ আমার বাঙলাদেশ
এখন প্রান্তরে অগ্নিদগ্ধ ফসলের মতো
প্রেমহীন, মৃত ভাগাড়
বাঙলাদেশ ঃ আমার স্মৃতির প্রতিমা

ক্রমাগত বিদীর্ণ হৃদয়ে কাঁদছে
জলের কল্লোল থেকে নিয়ত
প্রশান্ত শোক ভেসে আসছে
বাঙলাদেশ : আমার বাঙলাদেশ
এখন কেবলি স্মৃতির প্রাক্তনী রম্যতা
একদা স্বরে স্বরে গেয়ে যাওয়া পুরাতনী
বাঙলাদেশ : আমার বাঙলাদেশ
অসহ্য যন্ত্রণায় এখন কেবলি পুড়ছে
কল্যাণ নিহত, শান্তি পলাতক, প্রেম প্রতারক
আমার স্বপ্নের বাঙলাদেশ এখন শুধু
ধ্বসনামা ধ্বংসের ইতিহাস।

জনতাকে দেখছি

সিকানদার আবু জাফর

বিস্ববিয়াসের অগ্ন্যুৎপাত দেখিনি
দেখছি বাঙলাদেশকে
বুলেট বোমার গানে গানে
কি করে হার মানাচ্ছে শত্রুকে
বিদ্যুতের দীপ্তিকে
দেখছি
প্রথম বৃষ্টির মতো নরম গন্ধে ভরা
জনতা-মনে
নবান্নের খুশির দোলায়
কাঁপন লাগায়
বিপ্লবের অগ্নি ঢেউয়ে।

দেখছি
বর্ষাতি মন গ্রীষ্ম হলো
নরম থেকে শক্ত হলো
শক্ত হলো রক্ত দিল
রক্ত নিল
স্বাধীনতার আস্বাদে
দেখছি
বাঙলাদেশের জননীকে
ঘুম পাড়ানীর নতুন গানে
ছেলে ঘুমিও না
পাড়া জুড়োয়নি
বর্গীরা এসেছে আবার দেশে
দেখছি
জনতা চোখ জ্বলছে
বর্গী তাড়ানোর নতুন গানে
'বাঙলাদেশে' মুক্ত করেই
নতুন করে গড়বে তারা
জীবনবোধের অন্য মানে।

জন্মভূমি-জননীর আমি

আতাউর রহমান

অনেকের কণ্ঠস্বর আছে,
কণ্ঠ-স্বর আছে পশুর পাখির
সেই কণ্ঠ-স্বরে তারা নিজেকে জানায়।
যখন শত্রু তাড়া করে
তখন তার স্বরে আবেদন ফোটে,
ছানা কেড়ে নিলে তার স্বরে বাজে তীব্র প্রতিবাদ
শিকারীর গুলি খেলে সেই স্বর বেদনায় ভিজে।

কপোত—কোকিল—কাক সকলেরই কণ্ঠস্বর আছে।
কামনায় নিস্পেষিত হলে
প্রভুর চাবুক খেলে
শৈত্য বা উষ্ণতার শরে বিদ্ধ হলে
অশ্ব-মেষ-গরু-গাধা সকলেই আর্তস্বর তোলে।
কখন বা জ্যোৎস্নায় হর্ষধ্বনি দেয়
ইতর সারমেয়,
বর্ষণের তালে তালে ময়ূরেরা কেকা রব তোলে
ভেকেরা উন্মত্ত হয়ে গান গেয়ে চলে।

আমারও রয়েছে কণ্ঠস্বর
সেই স্বর পাখিদের কাছে
কম ঋণী নয়,
তবু তা পাখির চেয়ে ইঙ্গিতে উচ্ছল।
আমার স্বরের আছে সাকার প্রতীক
আমি সে প্রতীক পাই মা'র কাছে ভাষার ভাণ্ডারে,
আর আমার প্রতীক
স্বদেশের শত শত বৎসরের সমৃদ্ধ শব্দের মরাই
আমার বুকের মধ্যে রাত্র দিন
সংখ্যাহীন আশার বুদ্বুদ
আমার হৃদয়ে ফোটে প্রেমের গোলাপ
লাল-নীল-স্বপ্নের
ভাঙা-চোরা বাসনার অসংখ্য ঘূর্ণন
রাত্রি দিন রঙে রঙে রঞ্জিত হয়।
সেই বাসনাকে আমি কবিতার ছন্দ দিয়ে
শব্দের সড়ক-তুলে
উপমার সেতু দিয়ে
সুরের কল্পনা দিয়ে ফুটে তুলতে চাই
আমার দেশের শব্দে জননীর শেখানো ভাষায়।
বহুরূপী প্রকৃতির অপরূপ বৈচিত্র্য-লীলায়

আমার নয়নে ফোটে বিস্ময়ের নীল শতদল
বৈশাখের রৌদ্রে যেন প্রতিভাত হয়
আমাদের তৃপ্তিহীন যৌবনের ক্ষুধা
বর্ষার মেঘে মেঘে কি গভীর মায়া জাগে
প্রিয়ার চোখের
আমাদের কৈশোরের স্বপ্নগুলি দেখি,
রূপালি ফুলের মতো ফোটে
শরতের হিম হিম শিশিরে শিশিরে।

আমার চোখের দেখাকে
আমার হৃদয়ের বিস্ময়কে
আমার ঘৃণার তিক্ততাকে
আমার চেতনার বিষণ্ণতাকে
আমার ক্রোধের উত্তাপকে
আমার সুপ্ত লজ্জিত ভালোবাসাকে
গড়ে তুলি ভাষার বিগ্রহ রূপে।
আমার অস্তিত্ব হয় ভাষার অস্তিত্বে দীপ্যমান
আমার কামনা হয় ভাষার ইঙ্গিতে মূর্তিমতী
আমার এই মানবিক সত্তা যেন ভাষাতেই গড়া

সে ভাষা পেয়েছি আমি
জন্মভূমি—জননীর কাছে।

বাঙলাদেশ ঃ নবজাগরণ ও স্বাধীনতা

তরুণ সান্যাল

আমাদের যখন বয়স কম ছিল, সেই প্রাক্-স্বাধীন ভারতবর্ষে, আমাদের নানা স্বদেশপ্রেমমূলক গল্প-কাহিনী-কবিতা পড়তে হতো। মেবারের বীরত্বের কাহিনী, বারো ভুঁইঞার কাহিনী, এমনি কত কি। দেশটা তখন স্পষ্টতই পরাধীন ছিল। কিন্তু লেনিন যেমন বলেছিলেন, জবরদস্তিমূলক প্রতিক্রিয়ার শাসনকালে অনেক সময় ঈশপীয় কায়দায় সত্য কথা বলতে হয়, তেমনি ভাবে পুরনো দিনের গল্প-কাহিনীর মধ্য দিয়ে আমাদের স্বাজাত্যবোধ জাগাবার চেষ্টা চলত। জাতীয় মুক্তি-সংগ্রামের সেই যুগে শিক্ষাব্রতীরা অনেকেই ছিলেন স্বদেশব্রতী। স্বদেশ সম্পর্কে আদর্শবোধও ছিল। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ছে যখন ভারতের পঞ্চতন্ত্র চেকোশ্লোভাকিয়ায় অনুবাদ হয়েছিল, অনুবাদক-সম্পাদক বইখানির পরিচিতি দিতে গিয়ে লিখেছিলেন, অনেক সময় পশুপাখির মুখ দিয়েই সত্য কথা বেরোয়। বলা বাহুল্য, চেকোশ্লোভাকিয়া তখন পরাধীনই ছিল।

আমাদের ছোটবেলায় পড়া চাঁদ রায় কেদার রায়ের কাহিনীতে উল্লেখিত দুটি চিঠির কথা মনে পড়ছে। আমি ভুলি না যে বারো ভুঁইঞার সেই বালক-পাঠ্য গল্পকথায় ইতিহাসের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী অনুপস্থিতই ছিল। আমি জানি, রায় ভ্রাতাদের মধ্যে মানুষের আত্মবিকাশের লক্ষ্যগুলি আদৌ পরিচ্ছন্ন ছিল না, জাতীয়তার বোধেও ঐ জমিদারীগুলির অধিবাসীরা উদ্দীপ্ত ছিলেন না। এমন কি জাতীয়তার বোধ জাগাবার মতো রাজনৈতিক, আর্থনীতিক সমাজব্যবস্থাও তখন গড়ে ওঠেনি।

সে যাই হোক। পড়েছিলাম, মানসিংহ চাঁদ রায়-কেদার রায়কে একটি চিঠি লিখেছিলেন ঃ 'ত্রিপুর মগ-বাঙালি কাকুলি চাকুলি/সকল পুরুষমেতৎ ভাগ্ যাও পলায়ি/...হয় গজ নর-নৌকা প্রকম্পিত বঙ্গভূমি...' ইত্যাকার। অর্থাৎ ত্রিপুর-মগ ও বাঙালি অধ্যুষিত বঙ্গদেশের অধিবাসীরা প্রতিবারই কেন্দ্রীয় সম্রাটশাহীর আক্রমণে পালিয়ে প্রাণ বাঁচায়। সুতরাং মানসিংহের সেনাপতিত্বে আকবর

বাদশার পদাতিক, অশ্বারোহী, হস্তি ও নৌ-বাহিনী দ্বারা আক্রান্ত বাঙলাদেশের পরাজয় স্বীকার করা ছাড়া কোনো পথ নেই।

পড়েছিলাম, মানসিংহকে চিঠির উত্তরে রায় ভ্রাতারা লিখেছিলেন, 'ভিনত্তি নিত্যং করীরাজ কুম্ভং বিভর্তিবেগং পবনাতিরেকং। করোতি বাসং গিরিরাজ শৃঙ্গে। তথাপি সিংহ পশুরেবনান্য॥' অর্থাৎ গজমস্তক বিদীর্ণকারী সিংহ যে গিরি-শৃঙ্গবাসী, সেবিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু এই রাজকীয় ম্যাজেষ্টি থাকা সত্ত্বেও, সিংহ পশু ছাড়াতো আর কিছুই নয়। মানসিংহ সেই সিংহ। অপরদিকে ত্রিপুর মগ ও বাঙালি মানুষ। পশু ও মানুষের মধ্যে যে তফাৎ, শাহানশাহের বাহিনীর সঙ্গে বাঙালি পাইক-লাঠিয়াল বাহিনীর ঠিক সেটুকুই তফাৎ। অবশ্য আমরা যে বইখানি পড়েছিলাম তাতে মানসিংহের সিংহত্ব ভুলে গিয়ে 'বৃটিশ লায়ন'ই ইঙ্গিতবহ হয়ে আমাদের মনে অন্য অনুসঙ্গের আলোড়ন তুলত। এখন পূর্ববঙ্গে 'বাঙলাদেশে' যে লড়াই চলেছে, কেন যেন তা আমার কাছে বারবার এই আধা বাঙলা আধা সংস্কৃত ছড়া দুটির কথা মনে পড়িয়ে দিচ্ছে।

কেন মনে পড়িয়ে দিচ্ছে, সে কথাও বলি। আমার মতে 'বাঙলাদেশে' সত্যিকারের 'নবজাগরণ' এসেছে। অর্ধসমাপ্ত বা ভাঙাচোরা নয়। আর এযুগে নবজাগরণের সারাৎসার বা কনটেণ্ট সোশ্যালিস্ট হতে বাধ্য। এবং এই সামাজিক কনটেণ্ট নিয়ে যে জাতীয় স্বাধীনতা অর্জিত হবে তার পথ-সমাজতন্ত্রের মধ্যেই প্রসারিত হতে বাধ্য। পূর্ব-বাঙলায় এই নবজাগরণের ব্যাখ্যা করার কাজে, অন্তত নিজের বোঝার জন্যেও এমন চিন্তাটাও লেখা দরকার। কে না-জানে মনের মধ্যে উঁকিঝুঁকি মারা অস্পষ্ট চিন্তাগুলিও লেখার মধ্য দিয়ে নিজের কাছেই অনেকখানি পরিষ্কার হয়ে যায়।

ভারত-ইতিহাসের পৃষ্ঠপট

ইণ্ডিয়া দ্যাট ইজ ভারতের কথা বলছি না। বলছি, বিশেষ ভাবে উপমহা-দেশের উত্তরভারতের কথা। আমাদের দেশের দীর্ঘ ইতিহাস কি-ভাবে ব্যাখ্যা করা যায়? সেই, মোটা ধারা—অর্থাৎ আদিম সাম্যতন্ত্র, দাসযুগ, সামন্তযুগ ও পুঁজিবাদী ব্যবস্থা এই চার পর্বের মধ্যে কি ধরা যাবে? যাঁরা মার্কসবাদী, তাঁদের কাছে এমন সাধারণীকৃত কালপর্ব পাওয়া যায়। বিশেষভাবে শোনা যায় স্বয়ং স্তালিন কোনো দেশের ইতিহাস ব্যাখ্যা করার কাজে সোভিয়েত ইতিহাস চর্চাকারীদের তৎবিলিসি ও লেনিনগ্রাদ সম্মেলনে (১৯৩০-৩১) প্রাক

সমাজতান্ত্রিক ইতিহাস কালপর্ব বিচারে এই চার ধাপের সরলীকরণের মধ্য দিয়ে সর্ব প্রশ্নের উপরে যবনিকা টেনে দেন। কিন্তু ইতিহাস বড়ই নির্মম। কোনো কোনো ভাবনার উপরে স্থূলহস্তাবলেপের ফলে রাহুগ্রাস ঘটে যেতে পারে কিছুদিনের জন্য কিন্তু "They suffer eclipses but they come back again,...These we may call great ones—it is no disadvantage of this definition that links greatness to vitality. Taken in this sense, this undoubtedly the word to apply to the message of Marx." (J. Schumpeter)। এবং ভারত-ইতিহাস সম্পর্কে মার্কসের সেই message কি ?

ভারতের ইতিহাসের মার্কসবাদী ব্যাখ্যার সূত্রপাত করে গেছেন স্বয়ং মার্কস। ১৮৫৩ সালে মার্কস নিউ ইঅর্ক ডেইলি ট্রিবিউনে দুটি প্রবন্ধ লেখেন— 'ভারতে বৃটিশ শাসন' ও 'ভারতে বৃটিশ শাসনের ভবিষ্যৎ ফলাফল'। ঐ প্রবন্ধ দুটি অদ্যাবধি স্থায়ীমূল্যে চিহ্নিত হয়ে আছে। ঐ প্রবন্ধ দুটিতে বৃটিশ-পূর্ব ভারতের অবস্থা সম্পর্কে মার্কসের মন্তব্য আছে। যেমন, "ভারতীয় সমাজের কোন ইতিহাস নেই, অন্তত জানা ইতিহাস নেই। আমরা যাকে ভারতের ইতিহাস বলে জানি আসলে তা অপ্রতিরোধী অপরিবর্তমান সমাজের উপরে যে আক্রমণ-পরম্পরা সাম্রাজ্য বিস্তার করেছে তারই ইতিহাস।"

সেই ভারতীয় সমাজ ছিল বর্ণাশ্রম ধর্মের শিকলে আপাদমস্তক বাঁধা। গ্রাম-সমাজ বা ভিলেজ কমিউনিটির আবহমানতার ঐতিহ্যসাপেক্ষ ছিল তার রাজনীতি-আর্থনীতিক জীবনচারণা। তাবৎ ভূমির মালিকানা ছিল কেন্দ্রীয় রাজশক্তির করায়ত্ত (অর্থাৎ রাষ্ট্রের) এবং উত্তর ভারতের শুষ্ক ভূমিকে কৃষিকার্যের প্রয়োজনে জল সরবরাহের দায়িত্ব নিতে হতো কেন্দ্রীয় রাজশক্তিকে। এই কেন্দ্র পরিচালিত এবং গ্রামসমাজ থেকে খাজনা আহরক রাজপ্রতিনিধি পরিচালিত সেচব্যবস্থার কল্যাণে এশীয় স্বৈরতন্ত্রের উপরে সে সমাজের নির্ভরশীলতা ছিল। ভারতীয় সমাজের নিষ্ক্রিয়তা ও স্থাবরত্ব ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মার্কস তাই বর্ণাশ্রমধর্ম, গ্রামসমাজ, এশীয় স্বৈরতন্ত্রের ভিত্তি, কেন্দ্রীয় সেচ সংগঠনের অস্তিত্ব এবং ব্যক্তিগত ভূ-সম্পত্তির অনুপস্থিতির কথাই উল্লেখ করেছেন। ফলে "ভারতের অতীত রাজনৈতিক চেহারাটা যতই পরিবর্তনশীল বলে মনে হোক না কেন, সুদূর পুরাকাল থেকে উনিশ শতকের প্রথম দশক পর্যন্ত তার সামাজিক অবস্থা অপরিবর্তিত থেকেছে।"

এ ধরনের সম্পত্তিব্যবস্থা কেবল ভারতেই নয়, এঙ্গেলস ১৮৭৮ সালে অ্যান্টি ড্যুহরিং গ্রন্থে লিখেছিলেন যে, 'আ-ভারত রুশদেশ'-এ টিকে থাক। আদিম সমাজ প্রাচ্য স্বৈরতন্ত্রের ভিত্তি ছিল। বিবিধ সম্পত্তিধারার মধ্যে বলাবাহুল্য গ্রাম-সমাজের হাতে ব্যক্তিগত মালিকানাহীন সম্পত্তির অস্তিত্বের এই বিশেষ রূপটি সবচেয়ে আদিম এবং তা বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে পরিব্যাপ্ত ছিল (এশিয়া, রাশিয়ার শ্লাভ অঞ্চলগুলিতে ও কেল্টিয় অঞ্চলে)। প্রাচীন নগরভিত্তিক সমাজ দাস-প্রথায় বিকাশ লাভ করে। গের্মান সমাজ শেষ ধাপে ভূমিদাস প্রথার রূপ ধারণ করে। এগুলি সহ এশীয় ধারাটি ধরলে, মার্কসের মতে এই এশীয় ধারা (যার মধ্যে প্রাক্-বৃটিশ ভারত পড়ে যায়) "সবচেয়ে বেশি দিন আর সবচেয়ে একদেশদর্শী হয়ে অপরিহার্যতায় টিকে রয়েছে।" অবশ্য এঙ্গেলস আলোচনা প্রসঙ্গে এও বলেছেন যে, প্রাচ্য দেশগুলিতে বিজেতা তুর্কীরা জমিতে "এক ধরনের সামন্ততান্ত্রিক মালিকানার সৃজন ঘটায়"।

এতটা আলোচনার প্রয়োজন হলো, কেননা আমাদের দেশে ঐতিহ্যচারণার নামে হয় অতীত ভারত সম্পর্কে গদ্‌গদ ভাষণ চোখে পড়ে, অথবা একেবারে উল্টো, অতীত ভারতে প্রায় কিছুই পাবার নেই—এসব উৎকেন্দ্রিক ভাষ্যও নজরে আসে। আবার ভারত-ইতিহাসের এই পৃষ্ঠপটের উল্লেখ এজন্যেই প্রয়োজনীয়, কেননা এর উপরেই ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে ভারতের বর্ণাশ্রমভিত্তিক সনাতন সংস্কৃতি। "যেন না ভুলি যে, ছোট ছোট এই সব গোষ্ঠী ছিল জাতিভেদ-প্রথা ও ক্রীতদাসত্ব দ্বারা কলুষিত, অবস্থার প্রভুরূপে মানুষকে উন্নত না করে তাকে করেছে বাহিরের অবস্থার অধীন, স্বয়ং বিকশিত একটি সমাজব্যবস্থাকে তারা পরিণত করেছে অপরিবর্তমান প্রাকৃতিক নিয়তিরূপে এবং এইভাবে আমদানি করেছে প্রকৃতির পশুবৎ পূজা, প্রকৃতির প্রভু যে মানুষ তাকে হনুমানরূপী বানর এবং শবলারূপী গরুর অর্চনায় ভূলুণ্ঠিত করে অধঃপতনের প্রমাণ দিয়েছে।" আমি বলতে চাই যে, উত্তর ভারতের নিরঙ্কুশতন্ত্রের নিয়ন্ত্রণাধীন এই কেন্দ্রীয় সেচব্যবস্থা-সাপেক্ষ গ্রামসমাজ ও জাতিভেদ-প্রথার দুর্মর হস্তাবলেপের বাইরে ছিল পূর্ববঙ্গের অস্তিত্ব। তাই পূর্ববঙ্গের ইতিহাসে ও মানব-সংস্কৃতিতে স্বাভাবিক ভাবেই জীবনধর্মী মানবতাবাদী ঐতিহ্যের বীজ আবশ্যিকভাবে উপস্থিত ছিল।

ভারত-সংস্কৃতির পৃষ্ঠপট ও বাঙালি সংস্কৃতির ভিত্তি

ভারতের সংস্কৃতি সাধনার মঞ্চটি তাহলে উল্লিখিত চারটি পায়ার উপরে

দাঁড়িয়ে আছে—যার ক্ষুদ্রতম রাজনৈতিক জীবন ও আর্থনীতিক জীবন গ্রাম-সমাজ ভিত্তিক। অন্য দিকে তার পেশা এবং সামাজিক অবস্থান বর্ণভিত্তিক। বর্ণভিত্তিক বলে যে-কোন পেশা কুলপেশা, এবং পুনরাবৃত্তির মধ্য দিয়ে বিস্তৃত তার প্রক্ষেপ ও পৌনপুনিকতা। বংশানুক্রমিক অভিজ্ঞতায় হস্তকৌশল বেড়েছে কিন্তু কৃৎকৌশলের পরিবর্তন হয়নি। এমন-কি শ্রম-প্রয়োগের রীতি-নীতিও প্রথানির্ভর হয়ে দাঁড়ায়। এর অন্যতম প্রমাণ, হরপ্পার যুগের লাঙলের কায়দা এই সেদিন পর্যন্তও বদলায়নি। কৃৎকৌশল যেমনি অনড়, উৎপাদিত সামগ্রীর সামাজিক বণ্টনও তেমনি প্রথানির্ভর ছিল। আর এজন্য ভারতে, বিশেষভাবে উত্তর ভারতে সাংস্কৃতিক জীবনে দুটি স্পষ্ট ধারা ছিল। একদিকে রাষ্ট্রশক্তির চতুর্দিকে সজ্জিত 'নবরত্নের' মেলা, অন্যদিকে গ্রাম-সমাজের তলার মানুষগুলির শ্রমভিত্তিক কৃতি বা সংস্কৃতি। এ সংস্কৃতির বিচারে প্রাকৃতিক অন্ধ শক্তির সঙ্গে যুধ্যমান সাধারণ মানুষের উৎপাদন ভিত্তিক আবশ্যিক জীবনচারণা বা বিশ্বদৃষ্টি আবর্তিত ছিল। কিন্তু যেহেতু উৎপাদন-পদ্ধতি (mode of production) অপরিবর্তিত এবং উৎপাদনশক্তি জাড্যতায় সুস্থির ছিল, সেইহেতু একই লোকায়ত আবেষ্টনীতে সাধারণ মানুষের সংস্কৃতিভাবনা নিশ্চিত ও নির্ধারিত পথে অনুক্রমিত হয়েছে। ফলে স্বয়ংবিকশিত একটি সমাজ-ব্যবস্থাকে তারা পরিণত করেছে অপরিবর্তমান প্রাকৃতিক নিয়তিরূপে। কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রশক্তির দেব-দ্বিজে ভক্তি রাষ্ট্রের শোষণভিত্তিক ভাবাদর্শই প্রকাশ করে। রাজা এবং দেবতাকে সমান আসন দেবার মধ্য দিয়ে সেচ পরিচালনার কেন্দ্রকে সাধারণ মানুষের শ্রদ্ধা জানাবার পথ বলে ধরে নিতে পারা যায়। অবশ্য সুলতানশাহী যুগে এবং মোগল যুগে রাজসভাকে ঘিরে এক ধরনের সামন্তপ্রথার রূপ দেখা দেয়। তাও অবশ্য অনেকখানি সামরিক প্রয়োজনে গড়ে উঠেছিল।

রাজসভায় তাই সংস্কৃত ও ফারসি চর্চা হয়েছে। লৌকিকভাষা কখনও রাজ-ভাষা হয়ে গড়ে ওঠেনি। বরং সঙ্কীর্ণ একটি শোষকসম্প্রদায় এবং শোষণব্যবস্থা অব্যাহত রাখার কাজে গ্রামসমাজ, প্রদেশ, সুবা প্রভৃতিতে ঐ স্বল্পসংখ্যক শাসকদের যোগাযোগের ভাষা সংস্কৃত বা ফার্সীতেই পর্যবসিত হয়েছে। কেন্দ্রীয় শোষকেরা শোষণেরও একটি ব্যাপ্তভূমির পিরামিড গড়ে তুলেছিল। প্রথাসিদ্ধ বণ্টনের তাৎপর্যে ব্রাহ্মণ ও রাজা ছিল সেই শোষণ ব্যবস্থার গ্রামীণ ভিত্তি। সুলতানশাহী ও মোগল যুগে সামরিক বাহিনীর অংশীভূত ফারসি বয়ান ও সাধারণ গ্রামসমাজের হিন্দুস্তানি ভাষা মিলে সামরিক শিবিরের ভাষা উর্দু ভাষা

গড়ে উঠেছিল।উত্তর ভারতের এই সমাজব্যবস্থার সঙ্গে বাঙলাদেশের, বিশেষত পূর্ববঙ্গের বেশ তফাৎ ছিল।

প্রকৃতপক্ষে, পূর্ববঙ্গের ব্যাপারটি ছিল অনেকখানিই আলাদা।

নদীমাতৃক পূর্ববাঙলায় তথাকথিত সেচব্যবস্থার প্রয়োজন ছিল না। দ্বিতীয়ত, শোষণের চাপ ও শাসনের দাপট বাড়লে নদীমাতৃক জঙ্গলাকীর্ণ অঞ্চলে সাধারণ মানুষ দল বেঁধে চলে যেতে পারত এবং উৎপাদন ও বণ্টনের ক্ষেত্রে একটি গণতান্ত্রিক পদ্ধতি অব্যাহত রাখতে সক্ষম হতো। এজন্য খাজনা আদায়ের জন্য কেন্দ্রীয় রাজশক্তি অনেকখানিই প্রায় বংশানুমিক জমিদারের উপর নির্ভর করতে বাধ্য হতো। সেই জমিদারের উপরে খাজনার চাপ বাড়লে একদিকে তার নিজের খাজনা আদায়ের নিরঙ্কুশ ভূমিকার বলে, অন্যদিকে নদীমাতৃক জঙ্গলাকীর্ণ ভূমিখণ্ডের তাৎপর্যে তারা বিদ্রোহীও হয়ে উঠতে পারত। কিন্তু কোনক্রমেই তারা চাষী বা অন্যান্য উৎপাদনবৃত্তিজীবী মানুষের উপরে ক্রমবর্ধমান চাপ সৃষ্টি করতে পারত না।

অবস্থা বদলালো ইংরেজ শাসনে।

বাঙলাদেশের সমস্ত ভূমিই কার্যত জমিদারদের মধ্যে বণ্টিত হলো। নির্ধারিত রাজস্বদানের অধিকার পেয়ে জমিদাররা জমির প্রজাকে ব্যক্তিগত মালিকানা দিল উচ্চ খাজনার পরিবর্তে। লক্ষ লক্ষ মানুষ ভূমিহীন হলো। তাদের উপরে নেমে এলো উচ্চ খাজনার শোষণ; তা ছাড়া নানকার, চাকরান, ঠিকা, টঙ্ক প্রভৃতি নানা ধরনের শোষণ এবং অন্যবিধ অ-আর্থনীতিক শোষণ ও শুরু হয়ে গেল। কিন্তু এই শোষণ ও শাসনের ইতিহাস খুব বেশি দিনের নয়, মাত্র শ' দুই বছরের।

বাঙলাদেশের মুসলমান ধর্মাবলম্বীর সংখ্যা দেখলেও একথার যাথার্থ্য আরো বেশি করে প্রমাণিত হয়। মধ্য বা উত্তর ভারতে সুলতানী বা মোগল আমলে জনসংখ্যা ক্রমাগত মুসলমান হয়েছে, এ ছবি পাওয়া যায় না। শাসককুল ভিন্ন ধর্মাবলম্বী হওয়া সত্ত্বেও জাতিভেদ প্রথা ও গ্রামসমাজকে তাঁরা ভাঙতে অগ্রসর হননি, কেননা বর্ণাশ্রমধর্মভিত্তিক গ্রামসমাজে যে উৎপাদন ব্যবস্থা ছিল, বর্ণাশ্রম ভেঙে দিয়ে তাঁরা তা পরিবর্তন করতে চাননি। গ্রামসমাজ অব্যাহত থাকলেই তাঁরা অবলীলাক্রমে রাজস্ব পেতে পারতেন, সুতরাং রাজস্ব আদায়-প্রবাহের এতদিনের পরীক্ষিত পদ্ধতিটি তাঁরা ভাঙলেন না। ফলে ধর্মান্তরকরণের প্রশ্ন কখনই জরুরি হয়ে ওঠেনি। তাই মুসলমানী শাসনের একেবারে ভর-

কেন্দ্রের কাছাকাছি রয়ে গেল অনড় বর্ণাশ্রম প্রথা ও গ্রামসমাজ। সেচ-ভিত্তিক উৎপাদনে যখনই শোষণ ও অবহেলার চাপ বেড়েছে, লোকজন তখন বিদ্রোহী হয়েছে, যেমন পাঞ্জাবের শিখ-সম্প্রদায়।

পূর্ববাঙলার জনগণের একদা ধর্ম ছিল লোকায়ত। পরে নাথপন্থা বা পরিবর্তিত বৌদ্ধধর্ম সেখানে দেখা যায়। উৎপাদন ও বন্টন-পদ্ধতি যেখানে অনেকখানিই গণতান্ত্রিক, সেখানে ধর্মগত দৃষ্টিও অনেকখানি বর্ণাশ্রমধর্মবিরোধী হতে বাধ্য। বর্ণাশ্রমধর্মের চাপ যে-উৎপাদন পদ্ধতিতে দুর্বল, গ্রামসমাজের উত্তর ভারতীয় রূপ যেখানে প্রায় অনুপস্থিত, সেখানে কেন্দ্রীয় রাজশক্তি উৎপাদন বাড়াবার জন্য উৎপাদকদের নানা সুযোগ দিতে বাধ্য। এমন কি রাজশক্তির ভাবাদর্শ ব্যবহার করে যে অঞ্চলে গ্রামসমাজ ও বর্ণাশ্রমের মতো built-in stabiliser নেই, সে অঞ্চলে এক দিকে শাসন অক্ষুণ্ণ রাখা অন্যদিকে রাজস্বের প্রয়োজনে উৎপাদনের পরিধি বাড়ানো, এ-দুটির জন্যে ইসলাম ধর্মপ্রচার তাদের প্রয়োজন ছিল। তারা তা করেছে। পশ্চিম দেশ থেকে একাধিক বিশিষ্ট পীর, মওলানা ও হাজী ঐ পাণ্ডববর্জিত অঞ্চলে গেছেন এবং নানা লোকায়ত সূত্র ধরে জনগণের কাছে কেন্দ্রীয় শাসক ও শোষকদের ধর্মাদর্শ পৌঁছে দিয়েছেন। ইতিপূর্বে উচ্চবর্ণের যেসব ব্রাহ্মণ্য ধর্মাবলম্বী জমিদাররা জনগণের প্রতি নানা ধরনের বৈষম্যমূলক আচরণ করেছে, এবং কেন্দ্রীয় রাজশক্তির শাসনের পরিধির বাইরে উৎপাদনের মোটা অংশ স্বাধীনভাবে ভোগ করার প্রচেষ্টা চালিয়েছে, তাদের খর্ব করার জন্য এবং সঙ্গে সঙ্গে কেন্দ্রীয় শাসন অব্যাহত রাখার জন্য রাজধর্মের তাঁরা প্রচার ঘটিয়েছেন। জনগণ তা গ্রহণও করেছে। কে না জানে, ইসলাম ধর্ম জাতিভেদ প্রথা মানে না। কে না জানে, ইসলামের মধ্যে গণতান্ত্রিক বোধ অনেক বেশি। একদিকে ব্রাহ্মণ্যধর্মাবলম্বী স্থানীয় প্রপীড়ক জমিদারদের হাত থেকে আত্মরক্ষা, লোকায়ত ও বৌদ্ধ জীবনচর্যার গণতান্ত্রিক ঐতিহ্যের সঙ্গে ইসলামের আত্মিকতা, অন্যদিকে কেন্দ্রীয় রাজশক্তির নিজস্ব স্বার্থ চেতনা—এই তিনে মিলে পূর্ববঙ্গে ইসলাম ধর্মের বিস্তার ঘটে। কিন্তু এই ইসলাম ধর্মের ভিত্তিতে ছিল লোকায়ত গণতান্ত্রিক জীবনচর্চা—যা উত্তরভারতে অনুপস্থিত ছিল। শূন্যপুরাণ, ধর্মমঙ্গল এবং নানা লৌকিক উপকাহিনীতে লোকায়ত হিন্দু দেব-দেবীর সঙ্গে মুসলিম পীরের সহাবস্থান—এ-সবের স্মৃতিবহ।

অর্ধসমাপ্ত নবজাগরণের ভিত্তি

উনিশ শতকে বাঙলাদেশে নবজাগরণ এল। কোন্ নবজাগরণ ?

১৭৯৩ সালের পর থেকে বাঙলাদেশের তাবৎ ভূ-সম্পত্তিতে সাধারণ প্রজা অধিকার হারলো। সূর্যাস্ত আইনের নির্ধারিত রাজস্ব দেওয়ার নিয়মে বাঁধা জমিদারবর্গ বিভিন্ন জমিদারীর মালিক হলো। ইংরেজ সাম্রাজ্যের সামন্ততান্ত্রিক ভিত্তি হলো তারা। ইংরেজ শাসনের সূত্রপাতে অবশ্য শোষণ আরও প্রত্যক্ষ ও আতঙ্কজনক ছিল। তখন দু-এক বছরের জন্য রাজস্ব আদায় দেওয়া এবং ঐ ক-বছরে লাথোপতি হবার তাগিদে নিলাম ডাকত নানা দুষ্কৃতকারী। রমেশচন্দ্র দত্ত লিখেছেন, "পুরনো জমিদাররা নীলামে যারা ডাক তুলছে তাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় যদি ব্যর্থ হতেন তবে যে ভূ-সম্পত্তি তাঁদের পিতৃপুরুষ পুরুষানুক্রমে ভোগ দখল করছিলেন সেখান থেকে তাঁদের বিতাড়িত করা হতো। যদি বর্ধিত রাজস্ব দিয়ে চাষী হিসাবে তাঁরা তাঁদের ভূ-সম্পত্তি রাখতেন এবং সত্বর রাজস্ব প্রদানে ব্যর্থ হতেন, তাহলে তাঁদের জমি-জোতের উপরে জোর করে ম্যানেজার চাপিয়ে দেওয়া হতো এবং তারা জমির চাষীদের উপর লুণ্ঠন চালাত, দুঃখ-দুর্দশা ডেকে আনত ও গ্রামকে গ্রাম জনশূন্য করে তুলত। অবশ্য চরম বলপ্রয়োগ সত্ত্বেও ভূমি-রাজস্ব ঠিক মতো আদায় হলো না ; বঙ্গদেশের কর্ষিত জমির এক-তৃতীয়াংশ জঙ্গলে ছেয়ে গেল।"

এইভাবে কৃষি ধ্বংস হলো। কেবলমাত্র কাঁচা মাল উৎপাদন এবং নানা শিল্প-উৎপাদনের বৃত্তিজীবীদের যথার্থ শ্রমমূল্য না দিয়ে, ইংলণ্ডের উৎপাদিত দ্রব্য সামগ্রীর প্রতিদ্বন্দ্বী উৎপাদন ধ্বংস করে এবং বাণিজ্যকেন্দ্রগুলিতে জবরদস্তির মধ্য দিয়ে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পউৎপাদন চূর্ণ করা হলো। বঙ্গদেশ থেকে জবরদস্তি করে মূলধন তুলে তা লাগানো হলো চীনদেশে উপনিবেশ বাড়ানোর কাজে। লগ্নি চললো বৃটেনে। ব্যয় হলো ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে দমনমূলক কাজে, সৈন্যবাহিনী রাখার প্রয়োজনে। রমেশচন্দ্র দত্তের ভাষায় বলা যায়, "ভূমি-প্রশাসনের এক নিপীড়নমূলক ও চিরপরিবর্তনশীল ব্যবস্থার কুফলগুলি আরো গুরুতর হয়ে উঠল এই কারণে যে, কর্ষিত প্রদেশের সমস্ত রাজস্বই বাইরে চলে যেতে লাগল এবং জনসাধারণের ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প ও কৃষিকে ফলপ্রসূ করার জন্য তা কোনো রূপেই তাদের কাছে ফিরে এল না।" আর এ-সবের ফলে অযোধ্যা প্রদেশে "অসংখ্য মানুষ তাদের গ্রাম ত্যাগ করে এবং দেশ ছেড়ে পালিয়ে যায় এবং তাদের পলায়ন বন্ধ করার জন্য ফৌজ মোতায়েন করা হয়।

অবশেষে এক বিরাট বিদ্রোহ দেখা দেয় ; ভূ-স্বামী ও কর্ষকেরা অসহ্য জবরদস্তি আদেশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন ; তারপর আসে বীভৎস ভয়াবহতা ও জল্লাদবৃত্তি যার সাহায্যে ক্রোধোন্মত্ত সৈন্যরা অসামরিক চাষীদের দমন করে।"

উপরের উদ্ধৃতিগুলির সঙ্গে বাঙলা দেশ-এর সাম্প্রতিক পরিস্থিতির যথেষ্ট মিল আছে। যাই হোক, 'নবজাগরণের' কথা বলছিলাম, সে প্রসঙ্গেই ফিরে আসা যাক।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দরুন একদল 'অনুপস্থিত ভূ-স্বামী' দেখা দিল, যারা কৃষির উন্নতি তো দূরের কথা, তার সম্পর্কে সামান্য চিন্তাও মাথায় স্থান দিল না। স্থবির উৎপাদনপদ্ধতি, জমির উপর অত্যধিক চাপ, বঙ্গদেশের তাবৎ অঞ্চলে নানা ঘরানার জমিদারি—সব কিছু মিলে জবরদস্তির বিরুদ্ধে লড়াই করে জঙ্গল কেটে নতুন আবাদ গড়ে তুলে স্বাধীন চাষবাসের আর সুযোগ রইল না। অবশ্য ইংরেজদের আর্থনীতিক আক্রমণ "এদেশের অর্থনৈতিক ভিত্তিকে উড়িয়ে দিয়ে এবং এইভাবে যে সামাজিক বিপ্লব সংঘটিত করেছে সেটা এশিয়ায় যা শোনা গেছে তার মধ্যে সর্ববৃহৎ, সত্যিকথা বললে একমাত্র বিপ্লব"—তার ধ্বংসকারী ফলের বিপরীতে যে সৃষ্টিধর্মী দিক আসবার ব্যাপার ছিল তা বিড়ম্বিত হলো। আর তখনই কলকাতায় এলো মেকলে প্রবর্তিত ইংরেজি শিক্ষা, যে-শিক্ষা এ-দেশে ইংরেজ প্রশাসনে কাজ করার জন্য করণিক তৈরি করতে পারে। ১৭৮৩ সালের সিলেক্ট কমিটির নবম রিপোর্টের ৫৫ পৃষ্ঠায় এই ধরনের কাজ সম্পর্কে বলা হয়েছে, "সামান্য কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া তারা (ভারতীয়রা) শুধু ইউরোপীয়দেরই নফর বা এজেন্ট হিসাবে নিযুক্ত হয় অথবা যখন তাদের সাহায্য ছাড়া এক পা-ও অগ্রসর হওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ে তখন তাদের নিযুক্ত করা হয় আমাদের নিম্নতর বিভাগগুলিতে।"

এই সমস্ত জমিদারদের সন্ততি ও ইংরেজদের এজেন্ট বেনিয়ানের দল কলকাতায় বসবাস করার সময়, হতভাগ্য স্বদেশবাসীদের সম্পর্কে খুব বেশি মানবিকতা সম্পন্ন না হয়েও ইংরেজি শিক্ষার কল্যাণে পুঁজিবাদী উৎপাদন ও তার ভাবাদর্শের সংস্পর্শে আসে। সে যুগটা ছিল ইয়োরোপের 'বাধারহিত পুঁজিবাদ বিকাশের' যুগ। জমি থেকে উদ্বৃত্ত ও বেনিয়ান-বৃত্তি থেকে অর্জিত মুনাফা এরা ইংরেজ মালিকানার অন্তর্ভুক্ত ব্যবস্থার মধ্যে ব্যবহার করতে চেয়েছে। অবশ্য উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বৃটিশ শাসন ভারতের পুরনো ঘরানার সামন্ততন্ত্রকে আঘাত করেছে, নতুন বৃটিশ প্রবর্তিত সামন্ততন্ত্রের জন্ম

দিয়েছে এবং নির্মমভাবে পুরনো রাজন্যবর্গের অধিকার খর্ব করে পুরনো সামন্ততন্ত্রের গোড়া ধরে টান দিয়েছে। সতীদাহ প্রথা রদ, দাসব্যবস্থা বিলোপ, শিশু হত্যা ও ঠগী অত্যাচার বন্ধ, পশ্চিমী শিক্ষা ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা প্রবর্তন সে-শাসনের অনেকগুলি প্রগতিশীল দিক। কিন্তু এগুলি প্রায়ই সুপার-স্ট্রাকচারের ব্যাপার। এশীয় ধরনের উৎপাদন ভিত্তিক সমাজব্যবস্থার মানসজগৎ তখনও অনড়। এ-পরিবর্তন এক জগদ্দল পাথর সরিয়ে আরেক পাথর আমদানি করল মাত্র। এক ঘরানার সামন্ততন্ত্রের বদলে তারা জমিদারীপ্রথার সামন্ততন্ত্রের সৃজন ঘটাল। বৃটিশ পুঁজিবাদের বিস্তারের সেই যুগে উদারনীতি তখনও কার্যকর ছিল—অবশ্য বৃটিশ প্রশাসন ভারতে চালু রাখবার জন্য যেসব প্রগতিশীল কাজ তাঁদের দরকার ছিল সেগুলিই তাঁরা করেছেন। তাঁরা "Rigid in their outlook, unsympathetic to all that was backward in Indian tradition, convinced that the Nineteenth Century British Bourgeois and Christian conception was the norm for humanity, and early administrators nevertheless carried on a powerful work of innovation, representing the spirit of the early ascendant bourgeoisie of the period." (R. Palme Dutt : India Today, pp305)। এই সভ্যতাবিস্তারমূলক কাজগুলি একদিকে পুরনো ভারতীয়-এশীয় ধাঁচের সামন্ততন্ত্রকে চূর্ণ করছিল এবং অন্যদিকে বাণিজ্য পুঁজির পর শিল্প-পুঁজির দ্বারা শোষণ-ব্যবস্থার ভিত্তি রচনা করছিল। রজনী পাম দত্ত এ-প্রসঙ্গে বলছেন, "The most progressive elements in Indian society at that time, represented by Ram Mohan Roy and the reform movement of the Brahmo Samaj, looked with unconcealed admiration to the British as the champions of progress, gave unhesitating support to their reforms, and saw in them the vanguard of a new civilization." (ঐ, পৃ ৩০৫,)

উপনিবেশ বাঙলাদেশ ও খণ্ডিত 'নবজাগরণ'

বৃটিশ শিল্পপুঁজির শাসনের প্রথম যুগে, অর্থাৎ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে, বৃটিশ প্রবর্তিত সংস্কার সাধনকে এক অর্থে নতুন শোষণ ও শাসন-ব্যবস্থা পরিচালনা করার জন্য 'clearing of the decks' বলা চলতে পারে। কিন্তু

তার আগে 'আদি পুঁজি-সঞ্চয়ে'র কাজে বঙ্গদেশকে কিভাবে রক্তশূন্য করা হয়েছে—বাণিজ্যপুঁজির অন্তিম যুগে ১৭৫৭ থেকে ১৭৯৩ পর্যন্ত, তার অকিঞ্চিৎ-কর একটি চিত্র আমরা ইতিপূর্বেই দিয়েছি। বলেছি, কিভাবে এক তৃতীয়াংশ ভূ-ভাগ জনশূন্য হলো। অর্থাৎ, ইংরেজ শিল্পপুঁজি কাজে লাগাবার মতো ঔপনিবেশিক সমাজ-আর্থনীতিক ভিত্তিভূমি রচনায় যখন ব্রতী তখন তাদের সহযাত্রী হয়েছিলেন এ দেশের 'নবজাগরণে'র পথিকৃতেরা। এ-কথা ঠিক তাঁরা আচার-আচরণের মধ্য দিয়ে অনেকাংশেই পুরনো এশীয় সামন্ততন্ত্রের বিরোধী ছিলেন, কিন্তু বৃটিশ প্রবর্তিত সামন্তশাসন—যার ফলে চাষী জমি হারাল—অনেকেই তার বিরোধী ছিলেন না। সে যাই হোক, তাঁদের কারো কারো কাছে হিন্দু রিভাইভালিজ্‌ম, কারো কাছে নির্ভেজাল বুর্জোয়া উদারনৈতিকতা, কারো কাছে হিন্দু ও প্রোটেস্টাণ্ট খৃস্টান ধর্মের সমন্বয়, কারো কাছে খৃস্টান আদর্শ মুখ্য হয়ে দেখা দেয়। সম্ভবত একমাত্র বিদ্যাসাগর শিক্ষাবিস্তার, নারীমুক্তি, সমাজসংস্কার, ভাষা-গঠন ও নতুন সাহিত্য আন্দোলন ইত্যাদির তাৎপর্যে একই সঙ্গে এশীয় সামন্ততন্ত্রের ভাবাদর্শ ও বৃটিশ প্রবর্তিত সামন্ততন্ত্রের ভাবাদর্শের বিরুদ্ধে আঘাত করেছিলেন। সে যাই হোক, এ-কথা অস্বীকার করলে চলবে না যে, এই 'নবজাগরণে'র নায়কদের মুক্ত মানবতার ভাবাদর্শ বঙ্গভূমিতে প্রোথিতমূল হতে পারেনি। এ ছিল ওপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া ব্যাপার। সাম্রাজ্যবাদী শাসনের সহযোগী হয়ে এ-দেশে গলা টিপে ধরা স্বদেশী বুর্জোয়ার বিকাশের পক্ষে তা পরিপূরক হওয়া সম্ভবপর ছিল না। বৃটিশ প্রবর্তিত সামন্ততন্ত্রের পরিপোষকতা, যে সামন্ততন্ত্র এ-দেশে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী শোষণ ও শাসনের ভিৎ শক্ত করার জন্য সৃষ্টি হয়েছে, তার অন্তর্গত হয়ে তো স্বাধীন বুর্জোয়া বিকাশ হতে পারে না! সেই সামন্ততন্ত্রের ধ্বংসাবশেষের উপরেই ছিল স্বদেশী শিল্পবিস্তারের সম্ভাবনা। বৃটিশ পুঁজির সহযাত্রীদের পক্ষে সমাজের সাধারণ মানুষের কাছে নব-জাগরণ নবমানবতার বার্তা পৌঁছে দেওয়া তাই প্রকৃত অর্থে অসম্ভব ছিল। নবজাগরণ গড়ে ওঠার জন্য প্রয়োজন মৌল আর্থনীতিক-সামাজিক অবস্থা। শিকড়ে যেখানে সাম্রাজ্যবাদ-প্রবর্তিত শোষণের বিষ সঞ্চারিত, সেই প্রশাসন-শিক্ষা-অর্থনীতি ও সমাজের গাছের মাথায় নবজাগরণের সূর্যোদয়ের কথঞ্চিৎ রক্তছাপ পড়তে পারে, কিন্তু তা বাইরের, শিকড়কে তা স্পর্শ করেনি। এই সূর্যোদয়ের আকাশও ছিল মেঘম্লান। ফলে, সেই সূর্যালোক আমাদের জাতির গভীর শিকড়ে পৌঁছতে পারেনি। শহুরে

শোষণের থাবার নিচে ছিল অন্ধকারাচ্ছন্ন গ্রাম। আলোর তলায় যেন অন্ধকার। অথচ সেই অন্ধকারের মধ্যেই প্রাক্-বৃটিশ সামন্ততন্ত্রে যেমন, তেমনি বৃটিশ-প্রবর্তিত সামন্ততন্ত্রেও অন্ত্যজ, নিম্নবর্ণের হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে গায়ে-গতরে খেটে-খাওয়ার জীবন অব্যাহত ছিল। চাষীর ধান বিনিময় হতো তাঁতীর মোটা কাপড়ের সঙ্গে, কামারের লাঙলের ফলার সঙ্গে। জীবনধারণে ছিল সেখানে গণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গী, গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি। সেদিকে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের বুর্জোয়া পেটিবুর্জোয়া নায়কদের নজর পড়েনি।

এই ইতিহাস গঠন সঠিক নয়। তবু বলা যেতে পারে বৌদ্ধ ধর্মের পর ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পুনপ্রতিষ্ঠা, বঙ্গদেশে বাহ্মণাধিকার, কান্যকুব্জের ব্রাহ্মণ আনা—ইত্যাদি নানা ধরনের সত্য ও অর্ধকল্পনা মিলে একটি সত্যের দিকে চোখ ফেরায়—তা হলো রাজশক্তি ব্রাহ্মণ্য ধর্ম প্রতিষ্ঠায় ব্রতী হয়ে গণতান্ত্রিক জীবন-ভাবনার উজান খাতে রাষ্ট্রতরণী ভাসিয়েছিল। বঙ্গদেশের বিভিন্ন মুসলিম রাজন্যবর্গ এই ব্রাহ্মণ-ধিকারকে মেনে নিয়েছিলেন। কিন্তু ইংরেজদের আগমনে মুসলিম বুদ্ধিজীবীরা ইংরেজি শিক্ষা বর্জনের হাঁক দিলেন 'নসারা' [ইহুদিভাবাপন্ন] বলে। মুসলিম বুদ্ধিজীবী ইংরেজ প্রবর্তিত শিক্ষা-ব্যবস্থা ও শোষণ-ব্যবস্থায় অপাঙ্‌ক্তেয় রইল। কুম্ভকবৃত্তির মধ্যে তাঁরা ইসলাম বাঁচাতে চেয়েছিলেন কিন্তু তাও বাঙালি দরিদ্রের সঙ্গে সম্পর্কিত হয়ে শোষিতের আত্মাভিমানের জন্ম দেয়।

আমরা ভালো বলি বা মন্দ বলি, এখন তাতে আর কিছু এসে যায় না। বঙ্গদেশের ভূম্যধিকারী, বেনিয়ান, পাটের দালাল, তেজারতি কারবারী—যারা বৃটিশ সাম্রাজ্যের পরিপোষক ছিল, তাদের অধিকাংশই ছিল হিন্দু-ধর্মাবলম্বী। স্বাধীনতার অর্থ যে চাষীর হাতে জমি পাওয়া, ফসলের ন্যায্য দাম পাওয়া, দালাল ও তেজারতি শোষণ থেকে অব্যাহতি পাওয়া—গণতান্ত্রিক বিপ্লবের আদর্শ হিসাবে এখন আমরা তা জানতে পেরেছি। দরিদ্র হিন্দু-মুসলমান চাষীর সামন্তবাদী শত্রুর বিরুদ্ধে যে ক্ষোভ পুঞ্জীভূত হয়েছিল, ইংরেজ সেই আর্থনীতিক ও সামাজিক বিক্ষোভকে ধ্বংস করতে পারত না, ফলে গণতান্ত্রিক ও জাতীয় বিপ্লবের বিপ্লব-বিকাশের নিয়মটি বুঝতে পেরে, এবং তা ধ্বংস করা অসম্ভব বিবেচনা করে তারা তাকে নিয়ন্ত্রণ ও বিকৃত করার প্রচেষ্টা চালায়। সাম্প্রদায়িক শক্তিকে তারা মদত দেয়। আমাদের খণ্ডিত নবজাগরণ যে কতখানি অগভীর ছিল, তার প্রমাণ বাঙলাদেশে সাম্প্রদায়িকতার জবরদস্তির মধ্যেই প্রকট। ১৯০৬ সালে হিন্দু-মহাসভা ও মুসলিমলীগ জন্ম নেয়।

মুসলিম লীগের রাজনীতি শ্রেণীঘৃণাকে সাম্প্রদায়িকতার দিকে ঠেলে দেয়। ১৯৩৫ সালের ভারত-সংস্কার আইন ও জনপ্রতিনিধি আইন মারফত বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তি 'ডিভাইড এ্যাণ্ড রুল' রাজনীতি কার্যকর করে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর যখন দেশে দেশে জাতীয় মুক্তি-আন্দোলন জোরালো হয়ে উঠল, মুসলিম সাম্প্রদায়িকতার ঘেরাটোপে আচ্ছাদিত সামন্ততন্ত্রকে মদত দিয়ে তারা তখন ভারত বিভাগ করে দিল। উনিশ শতকের 'নবজাগরণে'র মধ্যে দিয়ে যে সমঝোতায় বিশ্বাসী বুর্জোয়াভাবুকদের দেখতে পাই, তাদেরই ঐতিহ্যে গড়ে ওঠা, প্রদীপের তলার অন্ধকারের মানুষগুলির জীবনযাপন ও জীবনচারণা থেকে বিযুক্ত রাজনীতিক নেতাদের কাছে স্বাধীনতা বা জাতীয় বিপ্লবের অন্তত আট আনা অংশই ছিল সহযোগিতার ব্যাপার, আপোষের ব্যাপার, নিয়মতান্ত্রিকতার ব্যাপার। আর স্বাধীনতার পরবর্তী তেইশ বছর ধরে পর্বে পর্বে নয়া ঔপনিবেশিকতার চাপ বিভক্ত ভারতের পাকিস্তান অংশে বাড়তেই থাকে। একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের নাগরিক হয়েও পূর্ববঙ্গের মানুষ সাম্রাজ্যবাদ ও তার দালাল্ রাষ্ট্রশক্তির চাপে পিষ্ট হতে থাকে।

নয়া ঔপনিবেশিকতা কি ?

সস্তা কাঁচামাল, সস্তা মজুর এবং পুঁজিবাদী দেশের উৎপাদিত পণ্যের ব্যাপক বাজার নিয়ে গড়ে ওঠে ঔপনিবেশিকতা। অর্থাৎ অন্যদেশে পুঁজি খাটিয়ে অর্ধসমাপ্ত পণ্য উৎপাদন করা এবং ঐ অর্ধসমাপ্ত পণ্যকে মূল পুঁজিবাদী দেশে সম্পূর্ণ করা এবং তারপর সেই পণ্য পুনরায় অর্ধ-সমাপ্ত পণ্য উৎপাদনকারী দেশে বিক্রয় করা ঔপনিবেশিকতার অন্যতম মূল লক্ষণ। এই সব কাঁচামাল তুলে আনা বা সস্তা মজুর ব্যবহার করার প্রয়োজনে সাম্রাজ্যবাদী দেশ এই অংশে নিজের দেশের সর্বোচ্চ আমলাদের দিয়ে প্রশাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলে। সাম্রাজ্যবাদী দেশের সরকার এই অঞ্চলে শাসন-ব্যবস্থা প্রচলিত রাখে। এই পরাধীন দেশই ধ্রুপদী অর্থে উপনিবেশ।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর বিশেষভাবে এই সব পরাধীন দেশে স্বাধীনতার আন্দোলন জোরালো হয়ে ওঠে। তখন বহুক্ষেত্রেই সাম্রাজ্যবাদী শক্তি আপোষের মধ্য দিয়ে দেশবাসীকে ভাঁওতা দেয়। এবং বহুক্ষেত্রেই একটি করে পুতুল সরকার স্বাধীনতা দেওয়ার নামে উপহার দেয়। প্রত্যক্ষত সাম্রাজ্যবাদী উচ্চপদস্থ আমলারা এ সব দেশে তখন প্রশাসন চালায় না। যদিও পুরনো আমলের প্রশাসনিক কায়দাকানুন বজায় থাকে। তখন ঐ পুতুল সরকারকে

তারা কোনো না কোনো এক সামরিক গোষ্ঠীতে জড়িয়ে ফেলে, এবং দেশের জনগণের সংগ্রামের হাত থেকে অব্যাহতি পাবার জন্য এই সব সামরিক চুক্তিবদ্ধ দেশগুলির পুতুল সরকার নানাবিধ সহায়তা পায়। আসলে সমস্ত সহায়তার পেছনে থাকে কলকাঠি হাতে সাম্রাজ্যবাদ। আর এই সাম্রাজ্যবাদই শেষ পর্যন্ত গণবিদ্রোহ ঠেকাতে নিজেই সাঙ্গ-পাঙ্গ নিয়ে লড়াইয়ে নেমে পড়ে। যেমন ঘটেছিল কোরিয়ায়, ঘটছে ভিয়েতনাম-কম্বোডিয়া-লাওসে। পাকিস্তানের পুতুল সরকার বর্তমানে বাঙলা দেশের সংগ্রামের বিরুদ্ধে লড়বার জন্য সামরিক চুক্তিবদ্ধ দেশগুলির সহায়তা পাচ্ছে। সংগ্রামের নায়কতার শ্রেণী-চরিত্র বদল হলে, নিজেই নেমে পড়বে পালের গোদা। পশ্চিম পাকিস্তানের পুতুল সরকার, অর্থাৎ সামরিক-আমলাতন্ত্রী চক্রকে মদত দেবার জন্য আছে একচেটিয়া পুঁজিপতি ও বড় বড় ভূম্যধিকারীর দল। এদের রাজনীতিক দলই হলো মুসলিম লীগ, জামাত-ই-ইসলাম ইত্যাদি। অর্থাৎ, পশ্চিম পাকিস্তানের সামরিক 'জুন্টা'শক্তি আসলে পুরনো উপনিবেশে নতুন পুতুল সরকার। পাকিস্তান হয়ে পড়েছে নয়া উপনিবেশ। বাঙলাদেশকে তারা গোলামের গোলাম বানাতে চায়।

বাঙলাদেশের সংগ্রামের আর্থনীতিক ভিত্তি

পূর্ববঙ্গ, অধুনা বাঙলা দেশের জাতীয়তা বিকাশের পেছনে রাজনৈতিক অর্থনৈতিক কারণ বড় কম নেই। ১৯৫২-৫৩ সালে খাদ্যের ঘাটতি সে দেশে দুর্ভিক্ষের অবস্থা সৃষ্টি করে। মার্কিন তোষামোদের উপঢৌকন স্বরূপ ১৯৫০,১৯৫১, ১৯৫২ পর্যন্ত কোরিয়ার যুদ্ধের ফলাফল হিসাবে পাটের দাম বাড়ে। পাট আড়তদারদেরই এতে মুনাফা বৃদ্ধি পায়। পাট চাষীদের ভাগ্যে কিছুই জোটে না। তার উপর আবার ১৯৫৩-৫৪ সালে কোরিয়া-যুদ্ধের পর পাটের দাম হু হু করে পড়ে যেতে থাকে। সরকারের বিনা অনুমতিতে বোনা পাটের ক্ষেত ধ্বংস করে দিল পাক-সরকার। চাষীর আয় সর্বনিম্ন ধাপে পৌছলো। খাদ্য ও কাঁচামালের অভাবে সৃষ্টি হলো কালোবাজারি, মুনাফাখোরি। ফাটকাবাজারের চাপে অর্থনীতিতে নাভিশ্বাস উঠল। অন্যদিকে তাঁতবস্ত্রের মতো কুটিরশিল্পও শেষ হতে বসল। সুতো আমদানি হতো বিদেশ থেকে। পশ্চিম পাকিস্তানের শিল্পপতিরা অন্তত বাঙলাদেশের তন্তুবায়দের চেয়ে শতকরা কুড়ি থেকে পঞ্চাশ শতাংশ কম দামে সুতো কিনতে পেতো। এ-ছাড়া ছিল রঙের অভাব। পশ্চিম-

পাকিস্তানী বস্ত্র-শিল্পের প্রতিযোগিতা, রঙ ও সুতোর অভাব তাঁতশিল্পীদের নিরন্ন করে ফেলে। বাস্তুহারার চাপে এবং দরিদ্র পাটচাষী ও হস্তশিল্পের ভাঙনের ফলে দেশে নিরন্ন কর্মপ্রার্থীর সংখ্যা হু হু করে বেড়ে যায়। নয়া ঔপনিবেশিক-তার পুতুল সরকারের রাজনৈতিক দল মুসলিম লীগের এতে কিছুই এসে যেতো না। মুসলিম লীগের রণধ্বনি ছিল সাম্প্রদায়িকতা ও ভারত-বিদ্বেষ। স্বাভাবিক আর্থনীতিক পরিবেশ থেকে বাঙলা দেশকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে সাম্প্রদায়িকতার জিগির দিয়ে শোষণের মাত্রা তারা বাড়িয়েই চলে। ভারত-বিদ্বেষের প্রয়োজনে ক্রমবর্ধমান সামরিক বাজেটের দায়ে পূর্ববঙ্গের উপরে চেপে বসলো ট্যাক্সের বোঝা। আগে যেসব আদায়ীকৃত ট্যাক্স পূর্ববঙ্গেই ব্যয়িত হতো এখন তা বরাদ্দ হলো শেষহীন সামরিক ব্যয়ের 'গহ্বর' ভরাট করার কাজে। [S. M. Akhtar, Distribution of Revenue Resource between Centre and Provinces, Lahore, P11]. অন্যদিকে চললো পশ্চিম-পাকিস্তানকে আর্থনীতিকভাবে বিকাশ করা। ফলে, পূর্ববঙ্গের কৃষিজাত কাঁচা মালের অঢেল রপ্তানী শুরু হয়ে গেল। কিন্তু শিল্পবিকাশের জন্য আমদানীর পরিমাণ গেল কমে। এরি ফলে ১৯৪৮ থেকে ১৯৫৩ সাল পর্যন্ত ২৯০ কোটি টাকা তার বাণিজ্য-উদ্বৃত্ত হয়। আর পূর্ববঙ্গের এই বাণিজ্য-উদ্বৃত্ত পশ্চিম-পাকিস্তানের বাণিজ্য-ঘাটতি পূরণ করার জন্য ব্যবহার করা হয়। অর্থাৎ, পশ্চিম পাকিস্তানে শিল্প-বিকাশের জন্য যন্ত্রপাতি, শিল্প-কাঁচামাল ইত্যাদির চলছিল বিপুল আমদানী, আর সেই আমদানীকৃত বিদেশী শিল্পবিকাশকারী দ্রব্যসামগ্রীর দাম মেটাচ্ছিল পূর্ববঙ্গের গরীব চাষী। পশ্চিম-পাকিস্তান পূর্ব-বঙ্গের চেয়ে ঢের কম মূল্যের সামগ্রী রপ্তানী করত, কিন্তু আমদানী করত পাকিস্তানের মোট আমদানীর সত্তর শতাংশ। অন্তত পক্ষে প্রতি বছর ৩০ কোটি টাকা পূর্ববঙ্গ থেকে দোহন করে পশ্চিম পাকিস্তানকে বিকাশের জন্য কাজে লাগান হতো (The Pakistan Times, Feb.—7, 8, 1956). এর মধ্যে পাকিস্তানের দু-অংশের বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ভারি এক মজার ছবি পাওয়া যায়। ১৯৪৮ থেকে ১৯৫৩ পর্যন্ত পূর্ববঙ্গ পশ্চিম পাকিস্থানের কাছে দ্রব্য আমদানী-খাতে ঋণী হয়ে পড়ে। এর পরিমাণ দাঁড়ায় ৯০ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা। (স্টাটিসক্যাল বুলেটিন, ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৯)। ১৯৫৩-৫৪ সালের নয় মাসে পশ্চিম পাকিস্তানের পূর্ববঙ্গের উপরে বাণিজ্য-উদ্বৃত্ত দাঁড়ায় ১৬ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা। এসবের অর্থ কি? (১) পূর্ববঙ্গ থেকে সস্তা দামে কাঁচামাল

কিনে নিয়ে গিয়ে সর্বশেষ পণ্য পশ্চিম-পাকিস্তানে তৈরি করে পূর্ববঙ্গে বিপণনের মধ্য দিয়ে মুনাফার পাহাড় গড়ে তোলা—আর সেই মুনাফা পশ্চিম পাকিস্তানে স্থানান্তরিত করা। (২) পূর্ববঙ্গের উৎপাদিত বহু কাঁচামাল বিদেশে রপ্তানী করে উপার্জিত বৈদেশিক মুদ্রা দিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য শিল্পসম্ভার ক্রয় করা এবং বিদেশী মূলধনের ঋণ, মুনাফা ও আসল পরিশোধ করা। (৩) পূর্ববঙ্গে ট্যাক্স বাড়িয়ে, গরীব মানুষের পকেট কেটে পশ্চিম-পাকিস্তানের সামরিক আমলাতন্ত্রী চক্রের ক্ষমতা বাড়িয়ে তোলা। 'তোর শিল তোর নোড়া, তোরই ভাঙি দাঁতের গোড়া'—অনেকখানি এই বৃটিশ প্যাটার্ণ। বৃটিশ আমলা ও ভূমধ্যসাগরে বৃটিশ নৌবাহিনী রাখবার জন্য যে ধরনের হোমচার্জের গুনগার দিতে হতো, একেবারে সেই ধরনের ব্যয় করতে হতো পূর্ববঙ্গকে ; আর এ-টাকা আসত অতিরিক্ত ট্যাক্স থেকে। ১১৩ কোটি টাকা ১৯৪৮ থেকে ১৯৫১ পর্যন্ত পাকিস্তানে বিকাশের জন্য নানা প্রকল্পে ব্যয় করা হবে বলে কেন্দ্রীয় সরকার ঠিক করে। তার মাত্র ২৫ কোটি টাকা, বা ২২.১ শতাংশ ব্যয়-বরাদ্দ হলো পূর্ববঙ্গের জন্য। কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিম পাকিস্তানকে ব্যয়-বরাদ্দ করলেন ১০০০ কোটি টাকা, কাঙাল বাঙালির ভাগ্যে জুটলো ১২৬ কোটি টাকা। (Dawn, Jan, 9, 1956)।

পাকিস্তান শিল্প-বিকাশ কর্পোরেশন যে-সব মূলশিল্প গড়ে তুলছিল সেগুলির সবই হচ্ছিল পশ্চিম পাকিস্তানে, শিল্প-বিকাশমূলক আমদানীর ৮০ শতাংশই যাচ্ছিল পশ্চিম অঞ্চলে। পশ্চিম পাকিস্তানী পুঁজির মালিকানায় পূর্বাঞ্চলে যে পাটকলগুলি তৈরি হয়, তাদের মালিকদেরও ছিল একই লক্ষ্য—স্বর্ণতন্তুজ পণ্য বিশ্বের বাজারে বিক্রয় করে অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রায় পশ্চিমাঞ্চলে শিল্প গড়ে তোলা। ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত ১৫৫টি নতুন কারখানা স্থাপিত হয়েছে পূর্ববঙ্গে। মোট সংখ্যা দাঁড়ায় ৩৩৫ থেকে ৪৯০ তে। এ সব প্রতিষ্ঠানে কাজ করতো ১ লক্ষ ৩০ হাজার শ্রমিক (পাটশিল্পে, ৪৪,০০০, বস্ত্রশিল্প ১৬,০০০, চর্মশিল্পে ১০,০০০, চা শিল্পে ২৪,৬০০)। এই কলকারখানা-বাগিচাগুলির অধিকাংশেরই মালিক পশ্চিম পাকিস্তানী পুঁজিপতি।

কৃষি বিকাশেও পশ্চিম পাকিস্তানের ভাগ্যে সিংহভাগ জোটে। পশ্চিম পাকিস্তানে গেল ৭৯.৬ শতাংশ বা প্রায় সাতানব্বই কোটি টাকার মতো। কেন্দ্রীয় ঋণেরও ৮৩.৯ শতাংশ জুটলো পশ্চিমের ভাগ্যে। বাকি যেটুকু জুটল পূর্বাংশের কপালে, বরাদ্দকৃত সেই অর্থেরও ৪৯.৯ শতাংশ মাত্র ব্যয় হলো। অবশ্য

পশ্চিম বললেও সবটাই পুরো পশ্চিম-পাকিস্তানের জন্য ব্যয় হবার নয়। অধিকাংশটাই ব্যয়িত হলো পাঞ্জাবে ও করাচীতে। পাঞ্জাবী খানদানী ভূম্যধিকারী পরিবারগুলি তাদের সঞ্চিত মূলধন শিল্পে খাটাচ্ছিল। পশ্চিম পাকিস্তানের কৃষিবিকাশের জন্য ২২ কোটি ৬৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ হয়েছিল। এর মধ্যে সিন্ধুপ্রদেশ মাত্র ৬০ লক্ষ টাকা, আর উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ৪ কোটি ৫২ লক্ষ টাকা পায়। বালুচিস্তানের জন্য একটি কানাকড়িও ধার্য করা হয়নি। বাদবাকি টাকার সবটাই ব্যয়িত হয় পাঞ্জাবের কৃষি-বিকাশের জন্য। পাঞ্জাবের হাজার হাজার একর জমির মালিক ছিল বড় বড় সামন্ততন্ত্রী পরিবার। তাদের প্রয়োজনেই এ-টাকা বরাদ্দকৃত হলো।

তা ছাড়া ছিল আমলাতান্ত্রিক চাপ। উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের অধিকাংশই ছিল পাঞ্জাবী। তারা বাঙালিদের মানুষ বলেই গণ্য করত না। পূর্ববঙ্গে কাজ করতে আসাটাকে তারা উনিশ শতক বা বিশ শতকের গোড়ার দিকে কৃষ্ণ আফ্রিকায় সাদা চামড়া আমলাদের কাজ করার মতো মনে করত। (ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ান, জানুয়ারি, ৭.৮.১০, ১৯৫৫)। জনাব আতাউর রহমান কন্সটিটুয়েণ্ট অ্যাসেম্বলিতে বলেছিলেন, "...মুসলিম লীগের নেতারা মনে করেন আমরা হলাম বিজিত জাতি এবং তাঁরা হলেন বিজয়ী জাতি।" (K. Callard, Pakistan : A Political Study, London 1957, p. 172-173)।

গোলামের গোলাম বাঙলাদেশ

বাঙলাদেশের আয়তন প্রায় ৫৫,১৪৬ বর্গমাইল। ১৯৬১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী প্রতি বর্গমাইলে লোক-সংখ্যা ১১০০ জনেরও বেশি। আর, পশ্চিম পাকিস্তানে প্রতি বর্গমাইলে লোকসংখ্যা মাত্র ১০০ জন। পূর্ববঙ্গে জমি মাথাপিছু বণ্টন করলে দাঁড়ায় মাত্র আধ একরের মতো। অথচ পশ্চিম পাকিস্তানে অনাবাদী জমির পরিমাণ বহুগুণ বেশি। ফলে ১৯৫২ সালে পাকিস্তান সরকার আর্থনীতিক বিকাশ সম্পর্কে যে কমিশন বসান, তার প্রধান সদস্য প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ কলিন ক্লার্ক বলেন, পশ্চিম পাকিস্তানে সেচ-ব্যবস্থা বিকশিত হবার যেমন চমৎকার সম্ভাবনা আছে, তেমনি রয়েছে বিপুল পরিমাণ অনাবাদী জমি। ফলে, পশ্চিম পাকিস্তানের উন্নয়নের ক্ষেত্রে কৃষির উপরেই ঝোঁক দেবার সুপারিশ করেন তিনি। অন্যদিকে পূর্ববঙ্গে কৃষিযোগ্য জমির অনুপাতে লোকসংখ্যার ঘনত্ব হ্রাস করার জন্য ও ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার

কর্মসংস্থানের প্রয়োজনে তিনি পরিকল্পিতভাবে শিল্পবিকাশের সুপারিশ করেন। পূর্ববঙ্গে বিশাল কাঁচামালের উৎস বিশেষভাবে লক্ষ্য করার মতো ছিল। কিন্তু পাকিস্তানী সরকার ঠিক এর উল্টো কাজটিই করলেন। তারা পূর্ববঙ্গে অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা দিয়ে, এমনকি কাঁচামাল ও শিল্পদ্রব্য আমদানী করে পশ্চিমাংশকে, বিশেষ করে পাঞ্জাব প্রদেশকে শিল্পায়িত করে তোলেন। এতে পশ্চিম পাকিস্তানে কৃষিবিকাশ বিড়ম্বিত হয়, পূর্ববঙ্গের কৃষিবিকাশকে ত্রস্ত রাখা হয়, এবং এই সুপারিশের তিনবছরের মধ্যেই গোটা পাকিস্তান জুড়ে দেখা দেয় তীব্র খাদ্যসঙ্কট।

দেশবিভাগের সময় পাকিস্তানের ভাগে অবিভক্ত ভারতবর্ষের শিল্পোৎপাদনের মাত্র চার শতাংশ পড়েছিল। ১৯৪৯ সালে পাকিস্তানে একটি শিল্পনীতি ঘোষিত হয়। তার আগে মোট জাতীয় আয়ের সাড়ে সাত শতাংশ ছিল মাত্র শিল্পজাত আয়। কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের অংশ ছিল ছয় ভাগ। বৃহৎ সংগঠিত শিল্পের উৎপাদন ছিল মাত্র দেড় শতাংশ। ১৯৫২ থেকে ১৯৬২ সালের মধ্যে পাকিস্তানের ৬৫৫টি শিল্পে ৬৪৪ কোটি টাকা লগ্নি করা হয়; পূর্বাঞ্চলে মোট লগ্নির পরিমাণ দাঁড়ায় ১৭৮ কোটি টাকার মতন; পশ্চিম পাকিস্তানে লগ্নির পরিমাণ দাঁড়ায় ৪৯১ কোটি টাকার কাছাকাছি। সরকারী লগ্নির পরিমাণ ছিল ৮৩ কোটি ২৩ লক্ষ টাকার মতো। পূর্বাঞ্চলের ভাগ্যে জুটলো তার থেকে মাত্র চারকোটি টাকা।

বিদেশী পুঁজির শোষণের অবস্থাটা দাঁড়ায় আরও ভয়াবহ। ভারতে যেমন দেশী পুঁজিপতিদের সঙ্গে বিদেশী পুঁজিপতিদের সহযোগিতার চুক্তি করতে হয়, পাকিস্তানের নিয়মটি তেমন নয়। পাকিস্তানে সরাসরি বিদেশী পুঁজি লগ্নি হতে পারে। প্রায় দু হাজার কোটি টাকার বিদেশী ঋণ ও লগ্নিপুঁজি এবং তজ্জাত মুনাফা ও সুদ মিলে পাকিস্তান হয়ে উঠেছে শোষণের একটা চমৎকার মৃগয়াভূমি। বিদেশী পুঁজির মুনাফা, সুদ ও পরিশোধের খাঁই মেটাতে পূর্বাঞ্চলকে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতে হয়। ১৯৫০ সালে বিদেশী ঋণ বাবদ পাকিস্তানের দায় ছিল ৫০ কোটি টাকা, ১৯৬৮ সালে এর পরিমাণ দাঁড়ায় ২০০০ কোটি টাকা, আর এ-টাকার দায় নিতে হয়েছে কামধেনুরূপী পূর্ববঙ্গকে।

১৯৬৩-৬৪ সালে পরিচালিত জরিপে দেখা যায় যে, পূর্বাঞ্চলের বর্তমান লোকসংখ্যার ৭৬ শতাংশ কৃষিজীবী, ৬% শিল্পউৎপাদনে নিরত, ৮% চাকুরি-জীবী ও ১০ শতাংশ অন্যান্য কার্যে রত। ১৯৫১-৬১ সালে কৃষিশ্রমের বৃদ্ধি ঘটেছে ৩৩·৮ শতাংশ। এ-সময় পশ্চিম-পাকিস্তানে লোকসংখ্যার ৬০ শতাংশ ছিল

কৃষিজীবী, ১৪% শিল্পউৎপাদনে নিরত এবং ২৬ শতাংশ অন্যবিধ নানাকার্যে রত। পশ্চিম পাকিস্তানে কৃষিবহির্ভূত জনসংখ্যা যেখানে বেড়েছে ৫৫·১ শতাংশ পূর্বাঞ্চলে সেখানে তা বেড়েছে মাত্র ১৬·৭ শতাংশ। অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রার ৬৮ শতাংশ পূর্বাঞ্চলের পাটের উপরেই নির্ভরশীল। অথচ পাট চাষের বিকাশ বা পাটচাষীর আয় বাড়াবার কোনো প্রচেষ্টাই হয়নি। বরং গ্রাম্য ঋণ ও আড়তদারীর মধ্য দিয়ে ব্যাপক সামন্ততান্ত্রিক শোষণ অব্যাহত রেখেছে বৃহৎ ভূস্বামী, মহাজন ও মহাজনকে ঋণদাতা পশ্চিম পাকিস্তানী ব্যাঙ্কগুলি। দেশ বিভাগের পর পূর্ববঙ্গে ৩১,৯০৫টি সমবায় ঋণদান সংস্থার ২৪,৬৭৫টি লোপ পায়। খাদ্যদ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি, করবৃদ্ধি এবং পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আগত ভোগ্য পণ্যের অতিরিক্ত মূল্য—সব মিলিয়ে পূর্ববঙ্গের কৃষককে ঋণগ্রস্ত করে তুলেছে। একমাত্র উত্তর বাঙলাতেই ১৩ লক্ষের বেশি চাষীর উপরে সার্টিফিকেট-মামলা রুজু করা হয়। ১৯৭০-এর স্বাধীনতা সংগ্রামের পূর্বে পূর্ববঙ্গ পাকিস্তানের দুই-তৃতীয়াংশ রপ্তানি দ্রব্য উৎপাদন করত। কিন্তু জাতীয় আমদানীর মাত্র এক-তৃতীয়াংশ তার ভাগ্যে জুটেছে। বিদেশী সাহায্য ও বিকাশ তহবিলের অর্ধেকের কম অর্থই এ-অঞ্চলের জন্য বরাদ্দ হয়ে থাকে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হবার পর কেন্দ্রীয় সরকার সর্ববিধ আর্থনীতিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতা পশ্চিম পাকিস্তানের পাঞ্জাব অঞ্চলে কেন্দ্রীভূত করেন। কেন্দ্রীয় আয়ের ৯৫ শতাংশ পশ্চিমাংশেই শেষ দিকে ব্যয়িত হয়েছে।

অন্যদিকে পূর্ববঙ্গে সরকারী দপ্তরের সংখ্যা ক্রমাগত বেড়েছে। দপ্তরগুলির মাথায় এনে বসানো হয়েছে পাঞ্জাবী সামন্ততান্ত্রিক প্রবল প্রতাপান্বিত পরিবারগুলির সন্তানদের। ঐ দপ্তরগুলির মধ্যে অনেকগুলিই অপ্রয়োজনীয়। এগুলি চালাবার জন্য কৃষিকর বেড়ে দাঁড়ায় ১৯৪৭ সালে তিনকোটি টাকা থেকে ১৯৬৫ সালে ১৬ কোটি টাকায়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে দরিদ্র কৃষককে আগের চেয়ে প্রাদেশিক সামরিক সরকারের খাঁই মেটাবার জন্য দশগুণ বেশি কর দিতে হয়েছে।

বিদেশী মালিকানার কথা বাদ দিলে, পাকিস্তানের মোট শিল্পের ৬৬ শতাংশ, বীমা কোম্পানীর ৭৯ শতাংশ এবং ব্যাঙ্কিং কোম্পানির ৮০ শতাংশের মালিক মাত্র ২২টি পরিবার। এদের মধ্যে পূর্বাঞ্চলের একটি পরিবারকেও দেখা যাবে না। মাত্র ১৫টি পরিবার সরকারী ঋণদান সংস্থার ৮০ শতাংশ ঋণ পেয়ে থাকে। করাচী স্টক এক্সচেঞ্জে রেজিস্ট্রি করা ১৮৯টি কোম্পানীর ৭৫ শতাংশ

শেয়ারের মালিক মাত্র ১৯টি পরিবার। বাকি ২৫ শতাংশের মাত্র পাঁচ শতাংশ আছে সাধারণ মানুষের হাতে। ২০টি বড় ব্যবসায়ী ডিরেক্টর ১৫৯টি কোম্পানীর মাথায় বসে আছে। ৩৪'৫ শতাংশ শহরের আয় ধনীব্যক্তিদের উপরতলার দশ শতাংশের কব্জার মধ্যে রয়ে গেছে। ৫০ শতাংশ শহরের মানুষ মাত্র ২৩'৫ শতাংশ শহরের আয় পেয়ে থাকে। এ-যদি মোট পাকিস্তানের ছবি হয়, পূর্বাঞ্চলের অবস্থা আরও ভয়াবহ। চাকরি-বাকরির বাজারে বাঙালির অবস্থা আরও খারাপ। পাকিস্তানের উন্নয়ন দপ্তরে নিযুক্ত ১৫২০ জনের মধ্যে বাঙালির সংখ্যা মাত্র ১৬৬ জন; ৯৩ জন ক্লাস ওয়ান অফিসারদের মধ্যে বাঙালির সংখ্যা মাত্র সাত; ১১৯ জন ক্লাস টু গেজেটেড অফিসারের মধ্যে চার জন মাত্র বাঙালি। সৈন্য বিভাগে নিযুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে চার শতাংশ মাত্র বাঙালি। পূর্বাঞ্চলে নার্সের সংখ্যা ৬১৯, পশ্চিম পাকিস্তানে ৪২৯০।

ওপরের পরিসংখ্যানের জঙ্গলে পথ না হারিয়েও এ কথা দিনের আলোর মতো স্পষ্ট যে, বিদেশী পুঁজি আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরেছে পাকিস্তানের অর্থনীতি'; আর তারই মাইনর পার্টনার হয়ে ২২-২৩টি বৃহৎ পুঁজিবাদী পরিবার বিদেশী পুঁজিবাদের পথপ্রদর্শক ফেউয়ের কাজ করছে। এই বৃহৎ পুঁজিবাদী পরিবারগুলি সামন্ততান্ত্রিক জোটের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আমলাতন্ত্র ও সামরিক শক্তির মাধ্যমে পূর্বাঞ্চলকে উপনিবেশে পরিণত করেছে। বিদেশী পুঁজির গোলামেরা আবার পূর্ববঙ্গের জনগণকে গোলাম বানিয়েছে। দাসের দাস। পূর্ববঙ্গ এখন এই নয়া ঔপনিবেশিক শাসনের ও শোষণের বিরুদ্ধে জাতীয় মুক্তির লড়াই করছে। বিশ্বের পটপরিবর্তনের বিশাল লড়াইয়ে তারা তাই সার্থক ও অগ্রণী যোদ্ধা।

গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক বাঙলাদেশ

এতটা আলোচনার একটাই লক্ষ্য—আর সেটি হলো বাঙলাদেশের বাঙালি জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের পরিপ্রেক্ষিতটি বোঝার প্রচেষ্টা। লেনিনের মন্ত্রীসভার জাতি-বিষয়ক মন্ত্রকের কর্ণধার জে. ভি. স্তালিন-এর জাতি গড়ে ওঠার মূল-চাবিকাঠি-মূলক বক্তব্যটি এ-প্রসঙ্গে স্মরণে আসছে। তিনি বলেছিলেন, "ইতিহাস বিকাশের মধ্য দিয়ে একটি স্থায়ী জনগোষ্ঠী যখন ভাষা, ভূ-খণ্ড, আর্থনীতিক জীবন এবং মানসিক গঠনভঙ্গীর সাযুজ্যের মধ্য দিয়ে একটি সাংস্কৃতিক সাধারণ অধিকার ভোগ করে থাকে, তখনই গড়ে ওঠে তার জাতি।"

এই সংজ্ঞাটিতে বাঙলাদেশে 'বাঙালি জাতিসত্তা' গঠনের সবগুলি দিকই বিধৃত হয়ে আছে।

আমাদের এই আলোচনায় পূর্ববঙ্গের ভাষা আন্দোলনের মধ্যে জাতিসত্তার কতখানি প্রকাশ ঘটেছে, সে বিষয়ে বিস্তৃত কিছুই বলা হয়নি। পূর্ববঙ্গের ভাষা আন্দোলনের তাৎপর্য নিয়ে বহু আলোচনা হয়েছে। তবে এ-প্রসঙ্গে লেনিনের একটি উদ্ধৃতি দেওয়া যেতে পারে। "বিশ্বজুড়ে সামন্ততন্ত্রের উপরে পুঁজিবাদের চূড়ান্ত বিজয় জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে সম্পর্কিত থাকে। পণ্য উৎপাদনের চূড়ান্ত বিজয়ের জন্য বুর্জোয়াশ্রেণীকে স্বদেশী বাজার দখল করতেই হয় এবং রাজনৈতিক-ভাবে ঐক্যবদ্ধ ভূখণ্ড থাকতেই হবে। ভাষা ও তার সাহিত্যকে সংহত করার জন্য সমস্ত বাধা দূর করে যেখানকার জনগণ একটি ভাষাতেই কথা বলে, সেখানেই আছে জাতীয় আন্দোলনের আর্থনীতিক ভিত্তি। মানুষের ভাবের আদান-প্রদানের জন্য ভাষাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বাহন।…সুতরাং প্রতিটি জাতীয় আন্দোলনের প্রবণতাই হলো জাতীয় রাষ্ট্র গঠন…।…জাতীয় আন্দোলনের ঐতিহাসিক আর্থনীতিক প্রেক্ষিতগুলি পরীক্ষা করে অবধারিতভাবে আমরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছাই যে, জাতিসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণ বলতে বোঝায় বিদেশী জাতীয় অঙ্গ থেকে রাজনৈতিক বিচ্ছিন্নতা এবং একটি স্বাধীন জাতীয় রাষ্ট্র গঠন।"

এই বিজয়ের আবার অন্যবিধ তাৎপর্য আছে।

পূর্ববঙ্গে আর্থনীতিক শোষণের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সাংস্কৃতিক আক্রমণ। বাঙলাদেশের জাতীয় জীবনে যে গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির প্রভাব রয়েছে, তাকে গোড়া ধরে নড়িয়ে দেবার জন্য পাকিস্তানী শাসকদের চক্রান্তের শেষ নেই। শাসকচক্র জানে, বাঙালির জাতিসত্তা ভুলিয়ে দিতে পারলে সহজেই ইসলামী তমুদ্দুনের নামে তাদের আরও কিছুদিন শাসন করা যাবে এবং শোষণের ব্যবস্থাটা আরও দুর্মর করা যাবে। তাই আর্থনীতিক শোষণের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের উপর নির্মম আক্রমণ করায়, গণতান্ত্রিক জীবন-ভাবনায় ও লোকায়ণে জারিত বাঙালি জাতি উঠে দাঁড়িয়েছে। এক্ষেত্রে পূর্ব-বাঙলার বাঙালি জাতির শিকড়সন্ধানী বুদ্ধিজীবিদের ভূমিকাও নিতান্ত কম নয়।

আমরা আগেই বাঙলাদেশের মানুষের সাংস্কৃতিক জীবনের বিশেষ গণতান্ত্রিক অভিব্যক্তির কথা উল্লেখ করেছি। আমরা লক্ষ্য করেছি যে, বাঙলা-দেশের বুদ্ধিজীবিরা তাদের মূল অন্বেষণ করতে গিয়ে বাঙালি লোকজীবনের সংস্কৃতির উপর জোর দিয়েছেন। অর্থাৎ, এমন এক নবজাগরণের ইঙ্গিত

সেখানে আমরা পাই, যা কেবল গণতান্ত্রিক ভাবাদর্শ নয়, এ-যুগে সমাজতন্ত্রী উত্তরণের দিক পর্যন্ত তা বিস্তৃত। য়ুরোপীয় নবজাগরণের যুগ ছিল বুর্জোয়া মানবিকতা বিকাশের যুগ। এ-যুগে নবজাগরণ যখন বাঙলাদেশের কৃষকের ঘর থেকে উৎসারিত হয়, বাঙলাদেশের নতুন বুদ্ধিজীবী যখন তা ধারণ করেন, তখন সেই গণতান্ত্রিক অভিব্যক্তি এই সমাজতান্ত্রিক যুগে কখনই বুর্জোয়া মানবিকতার খণ্ডিত অভিব্যক্তি হতে পারে না। আমরা ইতিপূর্বে লক্ষ্য করেছি, বাঙলাদেশের দীর্ঘ ঐতিহ্যের মধ্যে নিহিত রয়েছে গণতান্ত্রিক মনুষ্যত্ব, যাকে তথাকথিত গ্রাম-সমাজ, সেচব্যবস্থা ও বর্ণপ্রথার মধ্যে বিড়ম্বিত করা কোনোকালে নিরঙ্কুশভাবে সম্ভব হয়নি। এই ঐতিহ্যের সামগ্রিক ও পরিপূর্ণ মুক্তি সমাজতন্ত্রের মধ্যেই একমাত্র সম্ভব। আমরা তাই দেখেছি, পূর্ববঙ্গের স্বাধীনতার সঙ্কল্প কার্যকর করার জন্য বারংবার কি নিদারুণ জন-অভ্যুত্থান ঘটেছে। রক্তদানের জন্য সমাজের বিভিন্ন স্তর যেন তৈরি হয়ে গেছে। হাইকোর্টের বিচারপতি থেকে বাবুর্চি পর্যন্ত সে-সঙ্কল্পে অনমনীয়। একে আমরা একই সঙ্গে গণতান্ত্রিক ও জাতীয় বিপ্লবের রূপ ছাড়া অন্য কোনো নামে আখ্যায়িত করতে পারি?

বিশ্বের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে এবং বাঙলাদেশে বাঙালির ব্যক্তিগত মালিকানায় পুঁজিবিকাশের স্বল্পতার জন্য, রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্য থেকে বেরিয়ে এসে স্বাধীন বাঙলাদেশ আর কখনই পুঁজিবাদীবিকাশের ও শোষণের মৃগয়াক্ষেত্র হয়ে উঠতে পারে না।

স্বাধীন বাঙলাদেশের স্বাভাবিক আর্থনীতিক বিকাশ বুর্জোয়া কায়দায় ঘটাও তাই এখন প্রায় অসম্ভব। সাংস্কৃতিক ও ঐতিহ্যগত আকাঙ্ক্ষা যে রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের জন্ম দিয়েছে, আর্থনীতিক শোষণ ও অগণতান্ত্রিক শাসন যে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের দিকে জনগণকে ঠেলে নিয়ে গিয়েছে, গণতান্ত্রিক বিজয়াভিযানের প্রতি সাধারণ মানুষের আপ্রাণ আকুতি সাম্রাজ্যবাদ-একচেটিয়া পুঁজি, সামন্ততন্ত্র-আমলা ও সামরিকতন্ত্রের বিরুদ্ধে যে রায় জানিয়েছে, তা এশিয়ায় নতুন মনুষ্যত্বের জন্ম দেবে। অর্থাৎ, ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালি জাতির যে অর্ধসমাপ্ত নবজাগরণের কথা আমরা এই প্রবন্ধের প্রথমে বেদনার সঙ্গে উল্লেখ করেছি, অন্যতর পরিপ্রেক্ষিতে তাকেও সফল সমাপ্তির দিকে অগ্রসর করে দেবে। মোটকথা, আর্থনীতিক ক্ষেত্রে তা যেমন আপোষহীনভাবে অ-মূলধনতান্ত্রিক বিকাশের ধারা অর্গলমুক্ত করবে, তেমনি তা গণতান্ত্রিক সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে সমাজতান্ত্রিক ঐতিহ্যে রূপান্তরিত করবে। নতুন বাঙালি জাতির যে মহৎ রূপটি নানা বাধা ও আবরণের মধ্যে ঢাকা ছিল, তার স্বরূপটি এইভাবে আমাদের চোখে পড়ছে। আমরা বাঙলাদেশের বাঙালি জাতির এই নবজাগরণকে তাই আজ স্বাগত সম্বর্ধনা জানাই।

মাজু

চিত্তরঞ্জন ঘোষ

'ঘর জ্বালাইয়া দিছে। আমার ছাওয়ালগো খুন কইর‍্যা ফ্যাললো চক্ষুর সামনে। আমি বুড়া মানুষ। ঠ্যাকাইতে পারলাম না। কিন্তু চক্ষুর আরো ভাখবার বাকী ছিল, হা রে পোড়া চক্ষু। আমার মাইয়্যারে অরা আমারই চক্ষুর সামনে হায় আল্লা। না তারপরেও ছাড়ে নাই ছেরিডারে, টাইন্যা লইয়া গেছে। হায় আল্লা, তাও আমার জানডারে বাচাইয়া রাখছ। আল্লা, আমারে মাইরা ফ্যালো, আল্লা, আমার চক্ষু দুইড্যা ছিড়া লইয়া যাও। আর নাইলে আমারে যোয়ান কইর‍্যা দাও, বন্দুকের মুখে ঝাপাইয়া পড়ি, মারি, মরি। লাশটা আমার ভাইস্যা যাক পদ্মা দিয়্যা—আমার ছাওয়ালগো লাশের সঙ্গে।' শরণার্থী বুড়ো বিড়বিড় করেছিল কাল, কিন্তু আজও কানে আমার লেগে আছে। আমার চোখে ভাসছে না-দেখা সেই মেয়েটি। যতবার মেয়েটির মুখ কল্পনা করতে চেষ্টা করি, ভেসে ওঠে মাজুর মুখ। মাজু একটি কিশোরী মেয়ে।

কলকাতার রাজপথ। রোদ চড়েছে। আমি বাড়িবাড়ি ঘুরছি। 'বাঙলা-দেশে'র জন্যে চাঁদা তুলছি। আর কীই বা করতে পারি! কাগজ পড়ি, তর্ক করি, নিজেদের পরিচ্ছন্ন রাখবার চেষ্টায় একটু চাঁদাও আদায় করি। চাঁদা একটু-আধটু পাওয়াও যায়। সবাই বুঝি একটু নাড়া খেয়েছে।

'আজিজুল মারা গেছে। ছোটবেলায় একসঙ্গে খেলেছি আমরা।' চাঁদা দিতে দিতে বললেন বন্ধুপত্নী।

'আমার দিদি ঢাকায় রিসার্চ করে। কোনো খবর নেই তার।' বলে ছাত্রী।

বন্ধুর মামা বলেন, 'চাঁদপুরে লো ফ্লাইটে এসে প্লেন থেকে মেসিন্-গান্ চালায়। তারপরে নেমে মহল্লা ধরে ধরে আগুন দিয়েছে—বেরোবার রাস্তাতেও মেসিন্-গান্ নিয়ে বসেছিল।'

এক বন্ধু বলে, 'আমার একটি আত্মীয় পরিবারের সব ছেলে মারা পড়েছে, মেয়েরা সব লুট হয়ে গেছে।'

বাসের জানালায় আমি বসে আছি। রোদে কলকাতাটা ঝাপসা হয়ে গেল।

একটি শিশু নরম মাটির ওপর দিয়ে ছোটাছুটি করছে। মাঘমণ্ডলের ছড়া শোনা যাচ্ছে। পাট-পচানো গন্ধ। শিউলি ঝরে। পাকা গাব দুহাতের চাপে ফাটিয়ে বীচিগুলো চুষতে কী স্বর্গময়! জম্বুরা—খাও বা খেলা করো, দুইই সমান উপাদেয়। কলার ডাউগার পাঁটা বলি দাও। ড্যাডাং ড্যাডাং ড্যাডাং ড্যাং।

শিউলি ফুলগুলোতে হঠাৎ আগুন লেগে গেছে। গাছটা দাঁড়িয়ে আছে খাড়া, কিন্তু পুড়ছে। মানুষগুলোর দেহে সব কিছু জ্বলে যাচ্ছে। কাপড় চুল। ছটফট করছে সব বাতাস। সোনার শরীর জীবন্ত পুড়ছে। পোড়া মাংসের গন্ধ। পচা লাশের গন্ধ।

খবর-কাগজে চোখ রাখি। সকালে বেরিয়েছি, ভাল করে কাগজপড়া হয়নি। উপোসী মর্ন লাইনের ফাঁকে ফাঁকে বুঝি খোঁজে পাকা গাব, শিউলি ফুল, পাট, কলার ডাউগা, জম্বুরা। কিন্তু কিছুই দেখতে পাই না—শুধু মাজুর মুখ ছাড়া। মুসলমান চাষীর ঘরের মেয়ে। হয়তো বাড়ির মেজো মেয়ে। তাই নাম মাজু।

আমিও বোধহয় সেন্টিমেন্টাল হচ্ছি। নস্টাল্‌জিয়ার ঝোঁক আসছে। এক বন্ধু বলেছিল, 'যার বাড়ি তারকেশ্বরে, সে বুঝি তোর পূর্ববঙ্গকে সমর্থন করতে পারে না?'

পারে, নিশ্চয়ই পারে। ঔপনিবেশিকতা, শোষণ ও সাম্প্রদায়িকতা যে মাটিতে ফণা তুলেছে সে মাটি কাছে বা দূরে যেখানেই হোক, তার বিরুদ্ধে তারকেশ্বরের লোকও দাঁড়াতে পারে। তাছাড়া মুজিব গরিষ্ঠের নির্বাচিত। সারা বিশ্বে গণতন্ত্রের ধ্বজাধারী যারা তারা নীরব। সুতরাং একটু না-হয় সেন্টিমেন্টালই হলাম, বন্ধু। মাফ করে নাও।

হঠাৎ কাগজের একটা খবর চোখে পড়তে সোজা হয়ে বসলাম। গোয়ালন্দয় পাকিস্তানী সৈন্য নেমেছে। রাজবাড়ির সব বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। এখন তারা যাচ্ছে মাদারীপুরের দিকে। ফরিদপুর জেলাকে চিরে পিষে তারা চলেছে। ঘরগুলো পুড়ছে। লোকগুলো মরছে। মেয়েদের—না, থাক। আমি খবর-কাগজের হরফের ফাঁকে ফাঁকে ফরিদপুরের অনেক পরিচিত মেয়ের মুখ দেখতে পাই। অনেক পড়শির বাড়ি আমার চোখের ওপর পোড়ে। অনেক চেনা লোকের রক্তাক্ত মৃতদেহ রাজপথে ছড়ানো। পচা মড়ার গন্ধ আমার নাকে আসে।

কত গন্ধই জড়িয়ে আছে শিশুটির ঘ্রাণের রাজ্যে। ভিজে ভিজে মাটির গন্ধ।

কলমীলতার তাজা বুনো গন্ধ। খাল-বিলের জলের স্নিগ্ধ গন্ধ। সে-জলের গন্ধও ঋতুভেদে পালটায়। মাঠের পর মাঠ, ক্ষেতের পর ক্ষেত, সবুজের পর সবুজ, সেই মাঠের শ্যামল রৌদ্রের গন্ধ। নানা পার্বণের নানা গন্ধ। নৌকোর মধ্যে রাঁধা নৈমুদ্দি মিঞার ছালুনের গন্ধ। নেবুফুলের সৌরভ। হাসনুহেনার খুশবু। আম-মাথায় ঘসা নেবু পাতার সুগন্ধ। কাগজ থেকে ফরিদপুরের বিবরণ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়ি।

কুমার নদের একটি শাখা বয়ে গেছে ফরিদপুর সহরের একটা পাশ দিয়ে। তার ওপরে একটা ব্রিজ। ব্রিজের ওপারের পাড়ার নাম গোয়ালচামট। এইখানে থাকে শিশুটি।

না, আর শিশু নয়। এখন শিশু বললে সে চটে ওঠে। বারো পেরিয়েছে, কিন্তু তেরোয় পৌঁছোয় নি। এর অনেক আগেই সে ঠিক করে ফেলেছে যে সে স্বাধীনতা-অর্জনের জন্যে কাজ করবে। ইংরেজদের বুটের তলায় থাকতে তার ঘেন্না হয়, অপমানিত লাগে। এখুনি লেগে পড়তে ইচ্ছে হয় তার, কিন্তু হাফ-প্যান্টের বৃন্ত থেকে বেরিয়ে আসা দুখানা লিকলিকে ঠ্যাংয়ের জোর কতটা তা সে জানে না।

এই ঠ্যাং-এ ভর দিয়ে মাইলখানেকের ওপর হেঁটে সে রোজ ইস্কুলে যায়। ব্রিজটা পেরিয়ে বাঁয়ের রাস্তা ধরে হাঁটতে হয়। এই তার নিত্য যাওয়া-আসা। তাই এ-পথের দুধারের দোকান-বাড়ি-লোক-গাছ সব তার মুখস্ত।

বাঁয়ে না গিয়ে ডাইনে গেলে বাজার। এখানেও তাকে আসতে হয়। মরসুমের সময় এই বাজারেই সে তিন পয়সা দিয়ে সের দেড়েক ওজনের মনোরম ইলিশ মাছ কিনেছে। (এ নস্টাল্‌জিয়া মাফ করে দাও, বন্ধু। ইলিশের দোহাই।) বাজারের ওপাশেই ষ্টিমার ঘাটা। এই ঘাট থেকে ব্রিজ পর্যন্ত খালের কিনার ধরে অসংখ্য ছোট বড় নৌকো এসে লাগে হাটের দিনে। নৌকোয় থাকে নানা পণ্য। কিন্তু তার মধ্যে পাটই প্রধান। পাটেরই জেলা এটা। ভারতের পাটরাণী। মাল পত্তর নিয়ে ব্যাপারী চলে যায় হাটে। একটা চইড় পুঁতে তাতে বেঁধে রেখে যায় নৌকো। বেওয়ারিশ বে-পাহারা, কিন্তু কোনদিনই চুরি হয় না। শুধু বালকের দল দুএকটা নৌকো খুলে নিয়ে নৌবিহারে বেরিয়ে পড়ে। ইস্কুলে যাওয়ার রাস্তাটার বাঁ-হাতি খাল ধরে চলে যায় নৌকো—হুমায়ুন কবীরের বাড়ির পেছন দিয়ে। গিয়ে পড়ে মরা পদ্মায়। নদী একদিন পাড় ভাঙতে ভাঙতে শহরের দিকে এগোচ্ছিল। স্টেশন

সরিয়ে আনতে হয়েছিল দেশবন্ধুর বাবার ম্যাজিস্ট্রেটি আমলে। অস্থিরমতি নদী আবার ফিরে গেছে। সরে গেছে এদিক থেকে। রয়ে গেছে বিশাল ভূখণ্ডে নিচু জমি। শুকনোর সময় খটখটে। সবুজ ঘাসে-ঢাকা মাঠ, গরু চরে, ছেলেরা খেলে, যাতায়াতের সরু সরু পথ। দুএকটা জায়গায় জল আটকে ছোট ছোট ডোবা। কোনো যায়গায় বা উঁচু—সেখানে চালা ঘর বেঁধে লোক থাকে। কিন্তু বর্ষাকালে দিগন্ত পর্যন্ত শুধুই জল। মধ্যে দ্বীপের মতো দুএকটি ভূখণ্ড, দুএকটি গাছ। এরই নাম মরা-পদ্মা। অনেক লোক বলে—ঢোল-সমুদ্দুর। এই মরাপদ্মায় চলে যায় নৌকো।

নৌকোয় বালকটির স্থান খুবই মর্যাদার। সে হাল ধরে, পাশে বসে ছপ্ ছপ্ শব্দে বৈঠা মারা তো সহজ। কিন্তু হালে বসে নৌকোর দিকনির্দেশ করা সহজ কর্ম নয়। অবশ্য প্রবল গতির মুখে দুএক সময় তার হাতে থেকেও নৌকো দিকভ্রষ্ট হয়ে ঘূর্ণী নৃত্যে পাক দেয়। অন্য ছেলেরা ক্ষুব্ধ হয়ে চেঁচামেচি করে ওঠে। ততক্ষণে বালকটি আবার নৌকোর হাল সামলে নিয়েছে। কিন্তু গতিটা নষ্ট হয়ে গেছে, আবার বহু বৈঠা একসঙ্গে পড়তে থাকে—ছপ্ ছপ্ ছপ।

মরাপদ্মা ধরে গিয়ে গোবিন্দপুরের খালে পড়ে নৌকো। নৌকো থেকেই দেখা যায় শ্মশান, দেখা যায় কবি জসিমউদ্দিনের বাড়ি। তারপর গোয়াল-চামটের খাল। এপাশে ঐ বালকদেরই খেলার মাঠ, ওপাশে আলিপুর। তারপর আবার ব্রিজ। নিচে মোটা মোটা থাম—জলের স্রোত সেখানে আবর্ত তোলে। ব্রিজের ওপর দিয়ে যাওয়ার সময় বালকটি রেলিং-এ ঝুঁকে পড়ে বহুবার এ-আবর্ত দেখেছে। ওটা প্রায় তার নেশা।

কিন্তু চক্করটা মস্ত বড় দেওয়া হয়েছে। সন্ধ্যে গড়িয়ে রাত্তির। নদীর ধারে ধারে নৌকোয়, ওপরে দোকানে টিমটিমে সব বাতি জ্বলে গিয়েছে। নৌকোর মালিক বেচা-কেনা সেরে বাড়ি ফিরতে না পেরে রাগে ফুঁসছে। এর মধ্যে ছপ্ ছপ্ শব্দে বালকদের আবির্ভাব। সন্ধ্যের মধ্যে এলে শান্তি। নয়তো কিঞ্চিৎ অশান্তি। বেশি রাত হয়ে গেলে এক আধ দিন চইড় ও বৈঠার ঠকাঠক, ক্ষুদ্র এক কাজিয়া, নদীতে বা ঝম্পপ্রদান, সন্তরণ, এবং পরের হাটে পুনরাবির্ভাব।

নদী দিয়ে যাওয়ার সময় ইয়াহিয়ার সৈন্যরা দুই তীরে গোলা বর্ষণ করছে—কাগজের খবর। কাগজে চোখ রেখে নদীর তীরে গ্রামগুলো আমি দেখতে

পাই। ঘাটের মানুষজনকে দেখতে পাই। ছেলেরা হুটোপুটি করে স্নান করছে। একটু উদ্যোগী ছেলেরা সাঁতরে চলে গেছে দূরে। কেউ বা জলাকীর্ণ জঙ্গলের মধ্যে ডুবেডুবে মুঠোর মধ্যে ছোট ছোট মাছ ধরে কানা-ভাঙা কলসীতে মজুত করেছে। মেয়েরা জলে গা ডুবিয়ে সুখ-দুঃখের কথা বলছে। হঠাৎ ভীম শব্দ, গোলার আওয়াজ। কুঁড়েগুলো জ্বলছে। রক্তের স্রোত। লাশ ভেসে চলেছে। আতঙ্কের আর্তনাদ। শোকের কান্না। এই মৃতদেহ যাদের, তারাই সংখ্যাগুরু। শান্তিপূর্ণ গণতান্ত্রিক উপায়ে ভোটের মাধ্যমে তারা, নিজেদের মনের মতো একটি সরকার চেয়েছিল। চেয়েছিল মর্যাদা, স্বাধীনতা। চেয়েছিল সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে সেক্যুলারিজম্। মিলেছে বুলেট, ধর্ষণ, লাখ লাখ উদ্বাস্তু।

এমনি এক নদীর ধারের মাঠে ঝোপের আড়ালে বালকটি একদিন মাজুকে দেখেছিল, সবুজ কলমীলতার মত শ্যামল সতেজ মেয়ে। বাপ জন খাটত। ঘরে তার নুন-পান্তাও জুটত না। মাজু নদী থেকে কুঁচো মাছ ধরে সংসারের সাশ্রয় করত। জঙ্গল থেকে শুকনো ডাল-পাতা আনত জ্বালানির জন্যে। ফলমূল কুড়োত বন-বাদাড় থেকে। তার বাপ-মা জানত না, বা জানলে তাদের চলত না যে মেয়ে আর ছোট নেই। সদ্য-কিশোরী কলমীলতা। একদিন তাকে পিষে দিল স্থানীয় জমিদার নুরু মিঞার দুর্ধর্ষ পুত্র। বর্বর ও শয়তান সে তরুণটি।

ছেলেটি দেখেছিল, মাজু পড়ে আছে। রক্তে ভেসে গেছে তার নিম্নাঙ্গ, ভিজে গেছে গায়ের ময়লা তেনা। মুখে কোনো শব্দ নেই। বোবা হয়ে গেছে সে। যন্ত্রণাটা অসহায় ভাবে চোখের তারায় ছটফট করছে। আল্লা, তোমার আসমানখানাকে অত উঁচুতে অত বড় করে রেখো না। ছোট করে একেবারে ভুঁয়ে নামিয়ে এনে মেয়েটাকে একটু ঢেকে দাও।

কাগজে খবর পড়ি: ইয়াহিয়া বলেছেন—'সব স্বাভাবিক।'

মাজু উঠে দাঁড়াতে পারছিল না। তবু তাড়াতাড়ি যাওয়ার চেষ্টা করল। পা দুটো ঠিক মতো ফেলতে পারছে না। সর্বাঙ্গ তখনও কাঁপছে। রক্তে আর চোখের জলে নদীর ধারের নরম মাটি আরো নরম হচ্ছে।

নুরু মিঞার দুর্ধর্ষ ছেলের কিছু হয় নি।

কেউ ইয়াহিয়াকে অপরাধী বলে নি। বাঙলাদেশকে স্বীকৃতি দেয় নি কেউ। অনেকে বলেছে, 'বাংলাদেশের বাড়াবাড়ি করাটাই দোষ।'

মাজুও অপরাধী। ও কেন ফলমূলের সন্ধানে স্বাধীন ভাবে ঘুরে বেড়াত ?

'কাল তের জন নিহত।'—পশ্চিমবঙ্গের খবর। এখানেও রক্ত ও চোখের জল ঝরছে। বেসরকারী হত্যার সংখ্যাও এর সঙ্গে যোগ করা উচিত। এই মোট সংখ্যা ইন্‌টু তিনশো পঁয়ষট্টি। ইয়াহিয়ার সংখ্যাকে আমরা ধরে ফেলব।

'বাঙলাদেশের সাহায্যে পশ্চিমবঙ্গ এগিয়ে এসেছে।' —পশ্চিমবঙ্গের খবর। কলঙ্কের খবর নয়, গৌরবের খবর। কিন্তু গৌরবের ভাব আমার মনে আসে না। আসে আত্মপ্রতারণার ভাব। বাঙলাদেশকে সাহায্য করবার অধিকার কি আমার আছে, সে যোগ্যতা কি আমি অর্জন করেছি ? না। আমার আত্মিক সম্পর্ক কি 'বাঙলাদেশে'র সঙ্গে ? না। 'বাঙলাদেশ' কি আমার আত্মীয় ? সুনিশ্চিতভাবে—না। এই পশ্চিমবঙ্গে আমি, আমরা প্রত্যেকে, প্রতিদিন গণতন্ত্রকে হত্যা করছি। ইয়াহিয়া যেমন করছেন। অন্যের রাজনৈতিক মত আমি সহ্য করি না। অন্যমতের লোককে আমি হত্যা করি। সে-হত্যার সংখ্যা ইয়াহিয়ার সংখ্যাকে শীগগিরই ধরে ফেলবে। আমার হাতের রক্ত শুকোয় না। প্রতিদিন আমি খুন করি। প্রতিদিনের তরুণ তাজা রক্তে আমার উল্লাস। যাদের খুন করি, তাদের একটিই মাত্র অপরাধ—তারা অন্য একটি মত পোষণ করে। সবাই আমার মতে সায় দেবে, সবাই গোলাম হয়ে আমার পায়ের তলায় থাকবে, কেউ স্বাধীন চিন্তা করবে না। অন্য রকম দেখলেই আমি খুন করে থাকি। আমাদের খুনখারাবির রক্তাক্ত দাপটে আজ পশ্চিম-বঙ্গের বহু লোক ঘর ছাড়া শত শত উদ্বাস্তু। লাখ লাখ বাঙলাদেশের উদ্বাস্তুর মতোই। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে রাজনৈতিক মতের অপরাধে বহু লোককে তাদের বাড়ি থেকে বিতাড়িত করেছি আমরা। এই রক্তাক্ত অত্যাচারী হাতে আমি কি বাঙলাদেশকে কিছু দিতে পারি ? আমি তো ইয়াহিয়ার সগোত্র।

এসব ভাবলে নিজের মাথা গরম হয়। সেই ছেলেটির যেমন হয়েছিল মাজুর ঐ অবস্থা দেখবার পর, যেমন হয়েছিল বিয়াল্লিশের বিদ্রোহের আর একটা দিনে।

লাঞ্ছিত মাজুকে দেখে অসহায় ক্রোধে সে জ্বলে উঠেছিল। কিন্তু কী যে করবে তা জানত না। জমিদার তনয়কে গুঁড়িয়ে দিতে পারলে হতো। কিন্তু তার গায়ে আঁচড়টি পর্যন্ত দেওয়া যায় নি। ফলে ক্রোধোন্মত্ত রক্তটা নিজেরই মাথায় চড়ে দগ্ধ করতে লাগল। নদীর ধারে এলোপাথাড়ি খানিকটা ঘুরে যখন সে বাড়িতে ফিরেছিল তখন মাথাটা প্রচণ্ড ধরে গেছে। রাতে মাথার যন্ত্রণা

আর তন্দ্রার ফাঁকে সে লাঞ্ছিতা মাজুর রক্ত দেখে শিউরে উঠছিল। তার মনে হচ্ছিল, রক্তে তার চোখটা ঝাপসা, কিছুই স্পষ্ট করে দেখা যাচ্ছে না।

বিয়াল্লিশের একটা দিনেও সে নিষ্ফল ক্রোধে ও অপমানে নিজের মাথা ধরিয়েছিল। ৯ই আগস্ট। ছেলেটি তখন ক্লাস নাইনে পড়ে। ধর্মঘট, মিটিং, মিছিল। কিছু ধরপাকড়। স্লোগান, উত্তেজনা। কিন্তু খুব দ্রুত সব ঠাণ্ডা হয়ে গেল। তবে ভাঙ্গা আর মাদারীপুরে বিদ্রোহীরা আরো জোরদার ভাবে লড়ছে। দারোগাকে খুন করে ফেলেছে। ছেলেটির বুক গর্বে ফুলে ওঠে। ইচ্ছে হয়, এখনি মাদারীপুরে চলে যায়।

মাদারীপুরে যেতে হলো না। একদিন মাদারীপুরই এল। বিদ্রোহীদের পুলিশ গ্রেপ্তার করে সদরে নিয়ে আসছে। সকালের দিকে ছেলেটি চলে গেল স্টিমার-ঘাটে। লোকারণ্য। এইখানেই আসবে মাদারীপুরের বিদ্রোহী বীরেরা। থমথমে একটা ভাব। দারোগা খুন, ইংরেজ কি আর সহজে ছেড়ে দেবে। তবে হ্যাঁ, হিম্মৎ আছে ছেলেগুলোর।

স্টিমার এসে লাগল ঘাটে। স্টিমার ভর্তি বন্দী। ছাদে পর্যন্ত গিজগিজ করছে। কিন্তু তাদের আর নামানো হয় না। ঘাটে এত লোক দেখে পুলিশ একটু ভড়কে গেছে। এত বন্দী—তাদের এত লোকের মধ্যে দিয়ে কি করে নিয়ে যাওয়া হবে! খানিক বাদে তারা বুদ্ধি ঠিক করে নামল। কিছু পুলিশ নেমে ঠেলে ঠেলে লোকজনকে সরালো খানিকটা। তারপর নামল বিদ্রোহীরা। সংখ্যায় তারা ঠিক কত ছেলেটি তা বলতে পারে না। দুশো, তিনশো বা আরো বেশিও হতে পারে।

'বন্দে মাতরম্।' 'বন্দে মাতরম।'—জনতার গর্জন।

দুটো লাইনে তাদের রাস্তা দিয়ে চালানো হচ্ছে। লম্বা দড়ি দিয়ে হাত বাঁধা—সেই দড়িই আবার পরের লোকের হাত বেঁধেছে। অর্থাৎ দুটো লম্বা দড়িতে সবাই গাঁথা। আর তাদের দু-পাশে পুলিশ। লম্বা লাঠি হাতে। জনতাকে ভেদ করে এই পাহারাধীন বন্দী-মিছিল চলতে লাগল।

মুহুর্মুহু স্লোগান। বন্দেমাতরম। আপ্ আপ্ ন্যাশনাল ফ্ল্যাগ। ডাউন ডাউন ইউনিয়ন জ্যাক। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হোক। জাতীয় কংগ্রেস জিন্দাবাদ।

জনতার একটা অংশ ঐ মিছিলের সঙ্গে চলমান, ছেলেটিও চলেছে। হোঁচট খেতে খেতে। ধাক্কা দিতে দিতে। পুলিশের পাহারার মধ্যে বন্দীদের মাঝে

মাঝে থেমে সে দেখছে। অল্প বয়স সবার। পনের-ষোলো থেকে বাইশ-তেইশ। একটু ক্লান্ত, বিধ্বস্ত। তারা চলেছে, বা টানতে টানতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। বেঁধে, রাজপথে, দিবালোকে।

জনতার মধ্যে গুঞ্জন উঠেছে। কেন এমন করে নিয়ে যাওয়া হবে ওদের? ওরা কি গরু-ছাগল, বা চোর-ডাকাত? ওরা রাজনৈতিক বন্দী। ওদের মর্যাদা দাও।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ নিপাত যাক। বন্দে মাতরম। ডাউন ডাউন ইউনিয়ন জ্যাক।

বাজার পেরিয়ে মিছিল এল ব্রিজের এক মুড়োয়। সেখান থেকে তারপরে সেই পথ, যে-পথ দিয়ে ছেলেটি রোজ ইস্কুলে যায়।

অসন্তোষের গুঞ্জন ক্রমেই বাড়ছে। সামনে, দুপাশে ও পেছনে পুলিশ জনতাকে ঠেলে পথ তৈরি করছে। গুঞ্জন ক্রমে ক্রোধের গর্জনে পরিণত হয়। ধাক্কাধাক্কি চলছিলই, এখন বেড়ে ওঠে। স্লোগানগুলো বাঁধা চাল ছেড়ে উচ্চকণ্ঠ উচ্ছৃঙ্খলতায় ফেটে পড়ে। পুলিশের ভয় হয়, এখুনি হয়তো এরা ঝাঁপিয়ে পড়ে বন্দীদের ছিনিয়ে নিয়ে চলে যাবে। সঙ্গে সঙ্গেই আক্রমণ। লম্বা লাঠিগুলি সাঁই সাঁই রবে বাতাস কেটে নেমে আসতে লাগল জনতার ওপর। দৃঢ়, সবল, কঠোর। অন্ধ, নির্বিচার। মুহুর্মুহু। জনতা চেঁচাতে লাগলো: বন্দে মাতরম, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হোক। বন্দীরা এই শ্লোগানে সাড়া দিল। বন্দী ও মুক্ত উভয়ে এক। ভাঙচূর জনতার মধ্য দিয়ে মিছিল দ্রুত চলতে লাগলো।

বন্দীরা লাঠি-চার্জে আপত্তি করায় তাদের ওপরেও লাঠি পড়তে লাগলো। জনতা তবু সরে যেতে পারছিল, কিছুটা বাঁচাতে পারছিল নিজেদের। কিন্তু বন্দীদের তা নয়। তারা বাঁধা। প্রতিটি আঘাতকে পূর্ণভাবে নিল তারা। এমন কি তারা থেমে ব্যথার জায়গায় হাত বোলাতেও পারবে না। চোট খেয়ে পড়ে গেলেও চলতে হবে। জখম হলেও থামা অসম্ভব। কারণ দড়ি তো চলছেই— আগের চেয়ে বরং আরো জোরে।

জনতা ঢেউয়ের মতো। লাঠির আঘাতে পিছিয়ে যাচ্ছে। আবার স্লোগানের গর্জনের মধ্যে এগিয়ে আসছে। কখনোই ছিনিয়ে নিতে চেষ্টা করে নি অবশ্য।

ছেলেটির রাগ চরমে উঠেছিল বন্দীদের ওপর লাঠি চালানোর সময়। তখন সে পুলিশকে মারতে অনেকটা এগিয়ে গিয়েছিল। আর তখনই সে

চোটটা খায়। কাঁধে। পুলিশের লাঠি বা জনতার ধাক্কা, বা অন্য কিছু। সে ঠিক জানে না।

ঝড়ের মতো মিছিলটা চলে গেল হাজতের দিকে। ধুলোয় বাতাস ভারি। ছেলেটা খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে মাথাটা নিচু করে আস্তে আস্তে বাড়ি মুখো হাঁটতে লাগল। অজ্ঞাতসারেই তার একটা হাত কাঁধে।

ব্রিজ। এখানে এলে সে রেলিং ধরে সাধারণত দাঁড়ায়। তাকিয়ে দেখে নিচের জলরাশি। থামের ধাক্কায় জলের আবর্ত। কখনো বা ফেলে এক টুকরো কাগজ বা একটা কিছু। দেখে সেগুলোর আকস্মিক জলারোহী ঘূর্ণাগতি। কিন্তু আজ সে দাঁড়াল না রেলিং ধরে। আস্তে আস্তে হাঁটতে লাগলো। মাথাটা ঝাঁ ঝাঁ করছিল তার। রাগে বা লাঠির ঘায়ে কে জানে। ঘাড়ে হাত দিয়ে দেখল রক্ত।

হঠাৎ প্রবল ব্রেক্। হাতের কাগজগুলো ছিটকে পড়ল। আমি ঠক্ করে গিয়ে পড়লাম সামনের সীটে। দুম্ দাম্ শব্দে কয়েকটা বোমা ফাটল রাস্তায়। তাড়াতাড়ি নেমে পড়লাম।

কয়েকটা ছেলে একজন তরুণকে মারছে। আরো কয়েকটা বোমা। ধোঁয়া। সামনে কেউ এগোতে পারছে না। কেউ প্রায় চাইছেও না।

ধোঁয়াটা সরতে দেখলাম, তরুণটিকে কুপিয়ে রেখে খুনিরা চলে গেছে। রক্তশয্যায় মৃত তরুণ। দৈনন্দিন দৃশ্য। একে তুলে নিয়ে এখন যেতে হবে হাসপাতালে—'মৃত' এই ঘোষণাটি শোনবার জন্যে। তাকে ছুঁতেই দেখি, হাতে রক্ত। হাতটা তুলে ধরলাম চোখের সামনে। ঝাপসা একটা লাল কুয়াশা আমার চোখে লেপটে গেছে।

এই লাল কুয়াশার ভেতর দিয়ে আমি বাঙলাদেশকে দেখছি। উনত্রিশ বছরের এপার থেকে আমি ওপারের সেই ছেলেটিকে ডাকছি। পাঁচ শো লোককে বাঁধবার মতো দড়ি হয়তো পাওয়া যায়। কিন্তু সাড়ে সাত কোটি লোককে বাঁধে এত লম্বা দড়ি পৃথিবীতে তৈরি হয় নি। এই কথাটা আমি বলতে চাইছি ডেকে। বলতে চাইছি—মাজু আজ রোশনারা। কিন্তু ছেলেটি শুনতে পাচ্ছে না। কাঁধে হাত বোলাতে বোলাতে নিচু মাথায় আস্তে আস্তে সে ব্রীজ পার হচ্ছে।

আমি ছেলেটিকে অনেক বছর দূর থেকে ডাকছি ঃ দড়িতে টান পড়ে গেছে, মাজু আজ রোশেনারা।

পূর্ব-পাকিস্তানের ঐতিহ্যগত সংস্কৃতি

ডঃ মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ্

আয়তন ঃ লোকসংখ্যার গঠনপ্রকৃতি ঃ

আগেকার পূর্ববাঙলা, আধুনিক পূর্ব পাকিস্তানের আয়তন ৫৪,১৪১ বর্গমাইল, লোকসংখ্যা ৫,০৮,৪০, ২৩৫। লোকসংখ্যার শতকরা প্রায় ৭৭ জন ইসলাম ধর্মাবলম্বী; অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে হিন্দুরাই গরিষ্ঠ। প্রতি বর্গমাইলে লোকবসতি ৭৭৪ জন। পদ্মা-ব্রহ্মপুত্রের বদ্বীপ কিংবা তাদের অসংখ্য শাখা-প্রশাখার অববাহিকা অঞ্চলে অথবা উত্তর-পূর্ব সীমান্তের ছোট ছোট পাহাড়-পর্বতে অবস্থিত ৬১,৪২৪টি গ্রামেই প্রধানত গ্রামীণ জনসাধারণ বসবাস করেন। পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন অর্থনৈতিক জনগোষ্ঠীর লোকজনদের প্রধান উপজীবিকা হোল কৃষিকাজ, পশুপালন এবং মৎস্য চাষ। চট্টগ্রামের পার্বত্য অঞ্চলের প্রধান অধিবাসীরা হলেন বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ভুক্ত। ভারত-পাক উপমহাদেশে এঁরাই হলেন একমাত্র দেশীয় বৌদ্ধ-ধর্মাবলম্বী অধিবাসী। এছাড়া অল্প সংখ্যক দেশীয় খৃষ্টান এবং সাঁওতাল, চাকমা, মণিপুরী, হাজং ও গারো সম্প্রদায়ের আদিবাসীও এখানে বসবাস করেন। হিন্দু আর মুসলমান পরস্পর প্রতিবেশী। প্রদেশটির মধ্যে নিছক হিন্দু বা মুসলমান অধ্যুষিত গ্রাম একরকম নেই বললেই চলে। মুসলমানদের মধ্যে সৈয়দ এবং পাঠানরা দাবি করেন যে, তাঁরা ভারত-পাক উপমহাদেশের পশ্চিমে অবস্থিত এশিয়ার দেশগুলি থেকেই সরাসরি এদেশে এসে বসতি স্থাপন করেছেন। চট্টগ্রাম জেলার কেউ কেউ দাবি করেন, তাঁদের ধমনীতে রয়েছে খাঁটি আরবদেশের রক্ত। হিন্দুদের মধ্যে ব্রাহ্মণদের দাবি, তাঁরা নাকি খাঁটি আর্যরক্ত-সম্ভূত। যদিও সামাজিক আচার-আচরণ ও রীতিনীতিতে হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে কিছুকিছু পার্থক্য বিরাজিত, তবু সাধারণভাবে বলা যায়, ঐতিহ্যগত সংস্কৃতির ক্ষেত্রে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সাদৃশ্যের ভাবই বেশি। একজন সাধারণ মুসলমান এবং একজন সাধারণ হিন্দু, একজন ব্রাহ্মণ ও একজন অব্রাহ্মণের মধ্যে মানব জাতিতত্ত্বের দিক দিয়ে বিশেষ কোনো পার্থক্য সম্পর্কে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ আছে।

প্রাচীন ইতিহাস ঃ

এদেশের প্রাচীন ইতিহাসের দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায় যে, খৃঃ পূঃ ১৫০০ সালে আর্যরা যখন পশ্চিম দেশ থেকে ভারত-পাক উপমহাদেশে আগমন করেন তখন এদেশ ছিল অনার্য অধিবাসীদের বাসভূমি। পশ্চিমদেশে আর্যরা ইরাণীদের সঙ্গে একই জনগোষ্ঠীভুক্ত ছিলেন। এদেশের অনার্যদের মধ্যে পশ্চিমাংশে ছিলেন দ্রাবিড়গণ এবং পূর্বভাগে অস্ট্রো-এশীয় গোষ্ঠীর লোকেরা। আর্যরা পূর্ববঙ্গে বসতি বিস্তার করার পর মঙ্গোলীয় জাতির তিব্বত-বার্মা জনগোষ্ঠীর একটি অংশ এদেশে আগমন করেছিলেন।

ভাষা ও উপভাষা ঃ

ভারত-পাক উপমহাদেশের পূর্বভাগে আর্যদের অনুপ্রবেশ ঘটেছিল সম্ভবত খৃঃ পূঃ ৪০০ সালে। 'বাঙলা ও মুণ্ডা ভাষার ঘনিষ্ঠতা' নামক গবেষণা পত্রে** আমি ইতিপূর্বে বলতে চেষ্টা করেছি যে, বাঙলা ভাষার উপর মুণ্ডা (কোল) ভাষার প্রভাব বিদ্যমান। আর্যভাষার ঘ, ধ, ভ-এর গ, দ এবং ব উচ্চারণের মধ্যে এবং বিশুদ্ধ আর্য তালব্য বর্ণের দন্ত্য ও তালব্য বর্ণের মিশ্রিত উচ্চারণের মধ্যে পূর্ব-পাকিস্তানের উপভাষায় তিব্বত-বার্মার প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। পূর্ব পাকিস্তানের, বিশেষ করে ত্রিপুরা এবং চট্টগ্রামের উপভাষার মধ্যে সন্নিকটবর্তী তিব্বতী-বর্মী ভাষার অনেক শব্দেরও অনুপ্রবেশ ঘটেছে।

সংস্কৃতি ঃ

বাঙালি জনগণের অন্তর্ভূমিতে রয়েছে সম্ভবত অস্ট্রো-এশীয় জনগোষ্ঠী। যাহোক, এটা নিশ্চিত করে বলা যায় যে, এইসব জাতিগোষ্ঠী বাঙালি জীবনের মধ্যে তাঁদের সংস্কৃতির স্বাক্ষর রেখে গিয়েছে। সাধারণ বাঙলা শব্দ 'কুড়ি' মুণ্ডা ভাষা থেকেই আমদানি করা। সোরবোনের অধ্যাপক প্রৎস্লাস্কি (Przyluski) দেখিয়েছেন যে, সংস্কৃত শব্দ ময়ূর, কদলী, তাম্বুল, অলাবু প্রভৃতি শব্দ অস্ট্রো-এশীয় ভাষারই দান। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় (বর্তমানে জাতীয় অধ্যাপক) মনে করেন যে, 'চাউল' শব্দও অস্ট্রো-এশীয় ভাষা থেকে ধার করা একটি শব্দ। বাঙালিদের ভাতের সঙ্গে মাছের ঝোল খাওয়ার অভ্যাসও সম্ভবত আদিবাসীদের থেকে পাওয়া। চাউল কোটার

* The census of Pakistan, 1961.—থেকে ৮৫২ পৃষ্ঠার সংখ্যাতথ্য গৃহীত।

** All India Oriental Conference, 6th Session Patna 1961.

জন্যে কাঠের তৈরি ঢেঁকি এবং ডোঙা নৌকাও সম্ভবত তাদের দ্বারা আবিষ্কৃত। কোনো কোনো লোক-গাথা, লোক-সঙ্গীত এবং লোক-নৃত্যও সম্ভবত অস্ট্রো-এশীয়দের নিকট থেকে আহরণ করা। বেদোত্তর হিন্দুধর্মের মধ্যেও এ-সবের প্রভাব কেউ কেউ লক্ষ্য করেছেন। বিবাহিত হিন্দু নারীদের সিঁথিতে সিন্দুর এবং হাতে শাঁখা ব্যবহার করার রীতিও অনার্য অধিবাসীদের নিকট থেকেই নেওয়া হয়েছে।

১৩০০ খৃস্টাব্দে মুসলমানগণ পূর্ববঙ্গ পুরোপুরি জয় করে নেন। বাঙলার পাঠান শাসক দায়ুদ খাঁকে পরাজিত করে ১৫৭৬ খৃস্টাব্দে মহামতি আকবর বঙ্গদেশ জয় করেন। ১৬০০ খৃস্টাব্দের মধ্যেই পূর্ব-পাকিস্তানের সমগ্র অংশই মোগল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। মোগল রাজত্বের কিছু পূর্বে ব্যবসা-বাণিজ্য করবার জন্যে পর্তুগীজরা বঙ্গদেশে আগমন করে। মোগল শাসনের মধ্যেই ইংরেজ, ডাচ এবং ফরাসী ব্যবসায়ীর দল এদেশে আসে। ১৭৫৭ খৃস্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধের পরই ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি কার্যত এদেশের শাসক হয়ে ওঠে।

সাহিত্য ও শব্দসম্ভার :

মুসলমান আমলেই বাঙলা সাহিত্যের উন্নতি সাধিত হয়। প্রকৃতপক্ষে, মুসলমান শাসক এবং অভিজাত ব্যক্তিগণের উৎসাহই রয়েছে মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যের উৎপত্তি এবং উন্নয়নের মূলে। মধ্যযুগের প্রাচীনতম কবি চণ্ডিদাসের গুণগ্রাহী ছিলেন গৌড়ের সিকান্দার শাহ্ (১৩৫৭-৯৩ খৃস্টাব্দ), সিকান্দার শাহের পুত্র এবং উত্তরাধিকারী গিয়াসউদ্দিন 'আজম শাহে'র (১৩৯৩-১৪১০ খৃস্টাব্দ) রাজত্বকালে শাহ্ মুহাম্মদ সগির সমৃদ্ধিলাভ করেন। গৌড়ের মুসলমান রাজা, সম্ভবত জালালউদ্দিন মহম্মদ শাহের (১৪১৮-৩১ খৃস্টাব্দ) আদেশেই কৃত্তিবাস বাঙলা রামায়ণ রচনা করেছিলেন। ভাগবত পুরাণ থেকে 'শ্রীকৃষ্ণ বিজয়' নামে বাঙলায় শ্রীকৃষ্ণের জীবনী রচনা করেছিলেন মালাধর বসু এবং এ-কাজের জন্যে তাঁকে 'গুণরাজ খাঁ' উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন সামসুদ্দিন ইউসুফ শাহ্ (১৪৭৪-৮১ খৃস্টাব্দ)। গৌড়ের শাসক হুসেন শাহের (১৫১৩-১৫১৯ খৃস্টাব্দ) অন্যতম সেনাধ্যক্ষ পরাগল খাঁ-এর উৎসাহে মহাভারতের বাঙলা অনুবাদ করেছিলেন কবীন্দ্র পরমেশ্বর। যদিও ফারসি ভাষা ছিল সে সময়কার রাজভাষা তবুও বহু মুসলমান শাসক এবং উচ্চ পদমর্যাদা

সম্পন্ন ব্যক্তিদের বাঙলা ভাষার প্রতি এমনি ধরনের পৃষ্ঠপোষকতার উদাহরণ আরও অনেক দেওয়া যেতে পারে। মুসলমান রাজত্বকালে বহু ফারসি শব্দ এবং পারস্য ভাষার মাধ্যমে আরবি ও তুর্কী শব্দের অনুপ্রবেশ ঘটে বাঙলা ভাষায়। কখনো কখনো পুরনো দেশি শব্দের বদলে ফারসি শব্দ ব্যবহৃত হতে থাকে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, মধ্যযুগীয় বাঙলা শব্দ বুহিত (জাহাজ), কুকড়া (মোরগ), শশারু, মাঝা, ধলা প্রভৃতি শব্দের বদলে ফারসি শব্দ জাহাজ, মোরগ, খরগোস, কোমর, সাদা প্রভৃতি ব্যবহৃত হতে থাকে। বঙ্গদেশের হিন্দু এবং মুসলমানদের সাধারণ ব্যবহৃত প্রায় দু'হাজার বাঙলা শব্দেরই মূলে রয়েছে মুসলমানদের অবদান।

বাঙলা ভাষার শব্দসম্ভারে পারসিক প্রভাব ছাড়াও জীবনযাত্রার বহু ক্ষেত্রেই এমনকি ধর্মীয় ব্যাপারেও হিন্দুরা মুসলিম সংস্কৃতির দ্বারা প্রভাবান্বিত। বহু মিশ্রবর্ণ সমন্বিত হিন্দু নামটিও ভারতীয় মুসলমানদের অবদানবিশেষ। হিন্দুদের পোষাক ছিল তুলো বা রেশম দিয়ে তৈরি ধুতি (প্রায় পাঁচ গজ লম্বা এবং দেড় গজ চওড়া কাপড় যা কোমরে জড়িয়ে কাছা দিয়ে পরিধান করা হয়) এবং উড়নি (দেহের উর্ধ্বাঙ্গ আবৃত করবার জন্যে—যার পরবর্তীকালে নাম হয় চাদর)। গরু যেহেতু হিন্দুদের নিকট পবিত্র জীব সেজন্যে গরুর চামড়া দিয়ে তৈরি জুতো ব্যবহার করা হতো না। মুসলমান রাজত্বকালে হিন্দুরা জামা এবং জুতো ব্যবহার করতে অভ্যস্ত হন। তাঁদের ভোজনতত্ত্ব এবং রন্ধনতত্ত্বের যথেষ্ট উন্নতি ঘটে পারসিক খাবার পোলাউ, কোরমা, কোপ্তা প্রভৃতি আত্মীকরণের ফলে। ইসলামের প্রভাবে তাঁদের অস্পৃশ্যতার কঠোরতাই যে শুধু হ্রাসপ্রাপ্ত হয়েছে তা নয়, পরন্তু নানক, কবীর, চৈতন্য এবং অন্যান্য ধর্ম-সংস্কারকদের আবির্ভাবও সম্ভব হয়েছে। হিন্দুরা অদ্যাবধি মুসলমান শাসকদের দেওয়া সম্মানিত উপাধি খাঁ, সরকার, সরখেল, মল্লিক (আরবি মালিক, প্রভু), মজুমদার, তরফদার, সাহা (পারস্য শাহ্, রাজা) প্রভৃতি ব্যবহার করে থাকেন।

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে মোগল শাসনের আমলে উর্দু ভাষার প্রভাবে কতগুলি উর্দু-হিন্দী শব্দ, যেমন, চাচা (কাকা), চাচী (কাকীমা বা কাকার স্ত্রী), ফুপি (পিসী), ফুপা (পিসে), নানা (দাদু), নানী (দিদিমা), বকরী (ছাগল), ঝুট (মিথ্যা) প্রভৃতি শব্দ বঙ্গদেশের মুসলমানরা গ্রহণ করেন। এর ফলে বাঙলা ভাষায় একটা নতুন ধারার (যার প্রচলিত নাম দো-ভাষী বাঙলা) প্রচলন হয়। বহু মুসলমান এবং কতিপয় হিন্দু এ-ভাষার মাধ্যমে বহু পদ্য রচনা

করেন, যার নাম দেওয়া হয়েছে 'পুঁথি সাহিত্য'। যেহেতু মুর্শিদকুলি খাঁ (১৭১৭-২৭ খৃস্টাব্দ) থেকে সুরু করে বঙ্গদেশের মোগল শাসকরা ধর্মে ছিলেন 'সিয়া'মতাবলম্বী তাই মুসলমান জনসাধারণ মুসলিম ধর্মের হানাফী সম্প্রদায়-ভুক্ত হয়েও মহরম উৎসবে সিয়া সম্প্রদায়ের রীতিনীতি গ্রহণ করেন। অনেকের নামের দ্বিতীয় অংশে যুক্ত রয়েছে আলি, হাসান এবং হোসেন, যেমন মুহাম্মদ আলি, মাহমুদ হাসান, আহমদ হোসেন প্রভৃতি। আরবি ও ফারসি মিশ্রিত নামও ব্যবহৃত হতে দেখা যায়, যেমন আফতাব (ফারসি) উদ্দিন, পানা (ফারসি) উল্লা ইত্যাদি। এমনকি বিশুদ্ধ পারসিক নামও অপ্রচলিত নয়, যেমন রুস্তম, বহরম, কায়কোবাদ, খোসরু, পরভেজ, জামসীদ, খোদাবকস প্রভৃতি। কোনো মুসলমান ভগবানের উদ্দেশ্যে ঈশ্বর বা ভগবান শব্দটি ব্যবহার করবেন না ঠিকই, কিন্তু আল্লাহর বিকল্প হিসেবে ফারসি শব্দ 'খোদা' ব্যবহার করতে কোনো দ্বিধাও করবে না। উত্তর ভারত এবং পাকিস্তানের সব কটি ভাষাতেই বিশুদ্ধ আরবি শব্দ রসুল (ঈশ্বর প্রেরিত দূত), সালাত (প্রার্থনা), সওয়াম (উপবাস), জিন্নৎ (স্বর্গ), জাহান্নম (নরক) প্রভৃতি শব্দের বদলে ফারসি শব্দ পয়গম্বর, নামাজ, রোজা, বেহেস্ত, দোজখ প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়ে আসছে। ফলে, শুধু বঙ্গদেশই নয়, পুরো ভারত-পাক উপমহাদেশের মুসলিম সংস্কৃতি প্রকৃতপক্ষে পারসি-আরব্য এবং ভারতীয় সংস্কৃতিরই মিশ্রণবিশেষ। এই মিশ্রিত সংস্কৃতির একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ হলো মোগল চিত্রকলা।

১৭৬৫ খৃস্টাব্দে দিল্লীর সম্রাটদের দেওয়া একটি সনদ বলে ঈস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানি প্রকৃতপক্ষে বঙ্গদেশের শাসনকর্তা হয়ে দাঁড়ায়। ১৮০০ খৃস্টাব্দে কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ স্থাপিত হয়। শিক্ষণীয় দেশীয় ভাষাগুলির মধ্যে বাঙলা ভাষা ছিল এখানে অন্যতম। এইভাবে বাঙলা ভাষা এবং সাহিত্যের ক্ষেত্রে সুরু হয় একটি নতুন অধ্যায়। ১৮৩৫ খৃস্টাব্দে এদেশে পারস্য ভাষার বদলে ইংরেজিই হলো রাষ্ট্রভাষা। এর ফলে লোকের জীবনে এল পশ্চিমী ভাবধারা। রেলগাড়ি এবং স্টিমারের আবির্ভাবে ভারত-পাক উপমহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থা সহজতর হলো। দেশের চিরাচরিত সংস্কৃতির মধ্যে ইংরেজি পোষাক, আচারব্যবহারেরও অনুপ্রবেশ ঘটলো। প্রচুর ইংরেজি শব্দও বাঙলার মধ্যে তাদের স্বাভাবিক স্থান করে নিল। ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রয়োজনে প্রায় দুশো পর্তুগীজ শব্দ বাঙলাভাষায় গৃহীত হলো। এই একই কারণে কিছু কিছু ডাচ এবং ফরাসি শব্দও আত্মস্থ করে

নিল বাঙলাভাষা।

পাকিস্তান রাষ্ট্রের পত্তন হওয়ার পরেও 'পাকিস্তানের ইসলামী গণতন্ত্রে' ইংরেজি ভাষা রাষ্ট্রভাষা হিসেবে রয়ে গেছে। ইংরেজি যদি পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা হারায়ও তবু স্কুল-কলেজে অবশ্য শিক্ষণীয় ভাষাসমূহের মধ্যে ইংরেজি অন্যতম ভাষা হিসেবে যে থাকবে তাতে সন্দেহ নেই। পাকিস্তানের ভাষা ও সংস্কৃতির ওপর ভবিষ্যতে ইংরেজি ভাষা ও সংস্কৃতি যে প্রভাব বিস্তার করবে তার সম্ভাবনাই সমধিক।

উপসংহার

যা বলা হলো তা থেকে এটা স্পষ্ট যে, পূর্ব-পাকিস্তানের ঐতিহ্যগত সংস্কৃতি হলো বিভিন্ন ভাবধারা, যথা অস্ট্রো-এশীয়, তিব্বতী-বর্মী, ভারতীয়-আর্য, আরবি, পারসিক, তুরস্ক, পর্তুগীজ এবং ইংরেজ-সংস্কৃতির নানা উপাদানের সমষ্টিগত ফল। পাকিস্তানের রাষ্ট্রের পত্তনের পর পশ্চিম পাকিস্তানী সংস্কৃতিও পূর্ব-পাকিস্তানের সংস্কৃতিতে আর একটি নতুন বাস্তব সংযোজন, যা আকৃতি-প্রকৃতিতে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে নিশ্চিত বৃদ্ধি পাবে। **কিন্তু একথা বলা কঠিন যে, পাকিস্তানের দুটি শাখার মধ্যে একমাত্র ধর্মীয় ঐক্য ছাড়া সংস্কৃতিগত কোন ঐক্য সাধিত হবে কিনা!** (বড় হরফ আমাদের,/সম্পাদক)।

বহু জাতি এবং ভাষার মিশ্রণ ছাড়া সুদূর অতীতকাল থেকে অদ্যাবধি পূর্ব-পাকিস্তানে বিভিন্ন ধর্মের যোগাযোগও ওখানকার ঐতিহ্যগত সংস্কৃতির উপর প্রভাব বিস্তার করেছে। আর্যদের আগমনের পূর্বে এখানকার আদিবাসীদের ধর্ম ছিল সর্বপ্রাণবাদ। আর্যরা ব্রাহ্মণ্যবাদ প্রবর্তন করেছিলেন। আদিবাসীদের অনেকেই এই নতুন ধর্ম গ্রহণ করে হিন্দু সমাজের নিম্নবর্ণে স্থানলাভ করেছিলেন। এরপর এসেছে বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম। জৈনধর্ম রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতা পায়নি বলে শেষ পর্যন্ত তা বৌদ্ধধর্ম বিস্তারের পথ প্রশস্ত করে দিয়েছিল। প্রায় সমগ্র বঙ্গদেশ শাসনকারী পাল রাজারা (অষ্টম শতাব্দী থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত) ধর্মে ছিলেন বৌদ্ধ। এ-সময়ের পূর্বে এবং তৎসমকালীন দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গদেশের চন্দ্র, দেব এবং খড়্গ রাজবংশও বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ছিলেন। পাল রাজবংশের পতনের মুখে সেন রাজবংশ ক্ষমতাসীন হন এবং শেষ পর্যন্ত পাল-রাজাদের হাত থেকে রাজত্ব কেড়ে নিতে সমর্থ হন। সেন রাজারা ছিলেন সংস্কৃত ভাষার পৃষ্ঠপোষক। তাঁরাই বঙ্গদেশে নৈষ্ঠিক হিন্দুধর্মকে পুনরুজ্জীবিত

করেন। সেন রাজবংশের রাজা লক্ষ্মণ সেনের আমলে মুসলমানরা ১২০১ খ্রীস্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গ জয় করেন।

লোকশ্রুতি এই যে, মুসলমান বিজয়ের বহু পূর্ব থেকেই মুসলমান ধর্মগুরুরা বঙ্গদেশে ইসলাম ধর্ম প্রচার করেছেন। অষ্টম অথবা নবম শতাব্দীতে আরবি বণিকেরা চট্টগ্রাম বন্দরে ইসলাম ধর্ম প্রচার করেছেন, এটা কিছু অসম্ভব ঘটনা নয়। ইসলামধর্মের মধ্যে সাম্য ও সৌভ্রাতৃত্বের সর্বাত্মক ভাবধারা থেকে অনুপ্রেরণা লাভ করে বৌদ্ধ জনগণ এবং কিছু সংখ্যক হিন্দু ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। ষোড়শ শতাব্দীতে পর্তুগীজ ধর্মযাজকেরা বঙ্গদেশে খ্রীস্টান ধর্মের প্রবর্তন করেছিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইংরেজ কর্তৃক বঙ্গ বিজয়ের পর খ্রীস্টান ধর্মপ্রচারকদের কর্মতৎপরতা বৃদ্ধি পেয়েছিল। কিছু সংখ্যক হিন্দু; বিশেষ করে নিম্নবর্ণের হিন্দুরা খ্রীস্টান ধর্ম গ্রহণ করেছেন। ১৯৪৭ খৃস্টাব্দের ১৪ই আগস্ট পূর্ববঙ্গ 'ইসলামিক স্টেট অফ্ পাকিস্তানে'র একটি অংশে পরিণত হয়।

অনুবাদ : কুঞ্জবিহারী পাল

লোকসংস্কৃতির চর্চায় বাঙলাদেশ

আবদুল হাফিজ

বিশ্ব-লোকসংস্কৃতির একটি সমৃদ্ধ এলাকা হলো বাঙলাদেশ, কারণ লোকসংস্কৃতির এমন কোনো উপাদান নেই, যা বাঙলাদেশে নেই। জনগণের, বিশেষত বাঙালি কৃষক ও শ্রমজীবী মানুষের সঙ্গে লোকসংস্কৃতির সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ। লিখিত সাহিত্যে যাদের পরিচয় নেই, তাদের প্রকৃত পরিচয় রয়েছে লোকসংস্কৃতির মধ্যে। কাজেই জনগণের গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির সন্ধান করতে হলে লোকসংস্কৃতির যথার্থ সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও চর্চা অপরিহার্য। ১৯৫২ সালে ভাষা-আন্দোলন বাঙালি জনগণকে নিজের স্বরূপ জানার দিকে আগ্রহী করে তোলে। ভাষা-আন্দোলনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ফল 'বাঙলা একাডেমী'র প্রতিষ্ঠা। একাডেমী প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর একটি লোকসাহিত্য বিভাগ খোলা হয়। প্রথম দিকে এ বিভাগের প্রধান কাজ ছিল লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন উদাহরণের সংগ্রহ ও সংরক্ষণ। বৈজ্ঞানিক-ভাবে সংগ্রহ ও সংরক্ষণের কাজ কিভাবে হতে পারে, তা নির্ণয় করতে একাডেমীকে প্রচুর সময় ব্যয় করতে হয়েছে। এ-ব্যাপারে একাডেমীর অভিজ্ঞতা ছিল না। ফলে প্রথমদিকে সংগ্রহের কাজে বৈজ্ঞানিক উদ্যোগ ছিল না। যাই হোক পরবর্তীকালে, একাডেমী বেতনভুক্ সংগ্রাহক নিয়োগ করেন। প্রতিটি জেলা থেকে সংগৃহীত লোকসাহিত্যের উপাদানকে জেলাভিত্তিক নথিতে সাজানো হয়। ফলে লোকসংস্কৃতির আঞ্চলিক ও প্রাদেশিক পর্যায়ে আলোচনা ও গবেষণার সুযোগ বৃদ্ধি পায়। লোকসংস্কৃতির যেসব উপাদান সংগৃহীত হয়, সেগুলো হলো : লোককাহিনী, লোকসঙ্গীত, ছড়া, ধাঁধা, প্রবাদ, লোকসংস্কার, লোকশিল্পের নানা উদাহরণ এবং লোকবাদ্যযন্ত্র। সংগ্রহের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক হল লোককাহিনীর বিস্তৃত সংকলন।

বাঙলা একাডেমীর নিয়মিত সংগ্রাহক ছাড়াও বিভিন্ন ব্যক্তি অনিয়মিত-ভাবে সংগ্রহের কাজ করেছেন। একাডেমী এঁদেরকেও পারিশ্রমিক দেবার ব্যবস্থা করেছিলেন। বাঙলা একাডেমীর সংগ্রহই হলো বাঙলাদেশের বৃহত্তম লোকসাহিত্যের সংগ্রহশালা। লোকসাহিত্যের সংগ্রহ এবং তার সংরক্ষণ একেবারে ভিন্ন ভিন্ন ব্যাপার। সংগ্রহের যেমন সমস্যা আছে, তেমনি আছে

সংরক্ষণের সমস্যা। প্রথম দিকে একাডেমী সবরকম সংগৃহীত উপাদানকে একই নথিভুক্ত করেন। একাডেমী কর্তৃপক্ষ পরে প্রতিটি উপাদানের জন্য কার্ড-স্থচি প্রণয়নের দিকে নজর দিয়েছিলেন। বাঙলা একাডেমীর সংগ্রাহকরাই হলেন সংগ্রহের জন্য দায়ী এবং অন্যদের চেয়ে এঁদের দায়িত্ব ছিল সর্বাধিক। আমি একাডেমীর সংগ্রহশালাটি বিভিন্ন সময়ে পরিদর্শন করবার সময় অনুভব না করে পারিনি যে, এই সংগ্রাহকরাই আমাদের লোকসংস্কৃতির একটি অসামান্য সংগ্রহশালা নির্মাণে সহায়তা করেছেন। সেইসঙ্গে অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে সংগ্রহ ও সংরক্ষণের কাজ সর্বদা বৈজ্ঞানিকভাবে পরিচালিত হয় নি। কিন্তু আবার একথাও সত্য যে বাঙলা একাডেমীর সমস্ত কাজকর্ম নির্বাহের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার যে অর্থ বরাদ্দ করত, প্রয়োজনের তুলনায় তা ছিল অতি সামান্য। অন্যদিকে ব্যয় করবার পর 'লোকসাহিত্য বিভাগ'-এর জন্য যা থাকত, তাকে অকিঞ্চিৎকর না বলে উপায় নেই। ফলে কিছুদিন আগে সংগ্রহের কাজ বন্ধ হয়ে যায়। এখানে উল্লেখ করা যায় যে, কেন্দ্রীয় সরকার বাঙালি সংস্কৃতিকে ধ্বংস করার জন্য BNR বা ব্যুরো অব ন্যাশন্যাল রিকন্সট্রাকশন নামক একটি প্রতিক্রিয়াশীল সংগঠনকে যে অর্থ দিতেন, তার তিনভাগের একভাগ টাকাও বাঙলা একাডেমী পেত না। ১৯৭০-৭১ সালে বি-এন-আর প্রায় অর্ধকোটি টাকা পায় আর বাঙলা একাডেমী আট-দশ লাখের বেশি পায়নি। প্রসঙ্গত বলে রাখি, বাঙলা উন্নয়ন বোর্ড একই আর্থিক দৈন্যে ভুগছে জন্মাবধি।

যাইহোক, প্রতিকূলতাসত্ত্বেও, বাঙলা একাডেমী লোকসাহিত্যের উদাহরণ সংগ্রহ করে বাঙলাদেশের জনগণের জন্য একটি উল্লেখযোগ্য কাজ করেছেন। একাডেমীর সংগ্রাহকদের মধ্যে ময়মনসিংহ জেলার মোহাম্মদ সাইদুর রহমান (ইনি মোহাম্মদ সাইদুর নামে লিখে থাকেন), রংপুর জেলার সামীয়ুল ইসলাম, সিলেট জেলার চৌধুরী গোলাম আকবর বিশেষভাবে লোকসাহিত্যের চর্চায় নিরলস। মোহাম্মদ সাইদুর রহমান লোকশিল্প সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে অনেক চিত্রশোভিত প্রবন্ধ লিখেছেন। এছাড়া বিভিন্ন জেলার মেলা ও অনুষ্ঠানের চিত্র তুলে লোকসাহিত্য-বিভাগে একটি স্থায়ী প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেছেন তিনি। সামীয়ুল ইসলাম প্রধানত রংপুর জেলার লোকসঙ্গীত সম্পর্কে অনেকগুলি প্রবন্ধ লিখেছেন। চৌধুরী গোলাম আকবরও লোকসাহিত্যের বিভিন্ন বিষয়ে আলোকপাত করেছেন।

সংগ্রহ ও সংরক্ষণ ছাড়াও বাঙলা একাডেমী লোকসাহিত্যের সংগ্রহ প্রকাশ করেছেন। 'লোকসাহিত্য' নামে একটি অনিয়মিত সঙ্কলন ৮টি খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। বিভিন্ন অঞ্চলের আঞ্চলিক সঙ্কলন যেমন 'কিশোরগঞ্জের লোক-কাহিনী', 'ঢাকার লোককাহিনী' 'উত্তরবঙ্গের মেয়েলী গীত', 'সিলেটের লোক-গীতিকা', 'রাজশাহীর ছড়া' এবং 'যশোর-খুলনার ছড়া' প্রকাশিত হয়েছে। এগুলোর মধ্যে 'সিলেটের লোকগীতিকা' গীতিকার সঙ্কলন হিসেবে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কারণ, ময়মনসিংহ গীতিকার পর এটিই প্রণিধানযোগ্য গীতিকা সঙ্কলন। প্রসঙ্গত বলে রাখি, বাঙলা একাডেমীর সংগ্রাহকদের হাতে প্রয়াত ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় কর্তৃক সম্পাদিত অধিকাংশ গীতিকার নতুন ভাষ্য সংগৃহীত হয়েছে এবং ফলে ময়মনসিংহ গীতিকার নতুন পাঠনির্ণয়ের সমস্যা দেখা দিয়েছে। গীতিকায় বাঙলা দেশ যে কত সমৃদ্ধ তার প্রমাণ বাঙলা একাডেমীর সংগ্রহশালা। বাঙলাদেশের অধিকাংশ জেলা থেকেই লোকগীতিকা সংগৃহীত হয়েছে।

বাঙলা উন্নয়ন বোর্ড এ-পর্যন্ত একখানি উল্লেখযোগ্য লোকসঙ্গীতের সংগ্রহ প্রকাশ করেছেন। কবি জসিমউদ্দীন সম্পাদিত এই সংগ্রহটির নাম 'জারীগান'। বাঙলাদেশে প্রকাশিত এটিই হলো প্রথম সংগ্রহ যাতে জারী গানের আন্তর্জাতিক স্বরলিপি প্রদান করা হয়েছে। বাঙলা একাডেমী পত্রিকা ও বাঙলা উন্নয়ন বোর্ড পত্রিকা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলা বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত 'সাহিত্য পত্রিকা'য় লোকসংস্কৃতি বিষয়ক অসংখ্য গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মধ্যে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলা বিভাগের নিজস্ব লোকসাহিত্য সংগ্রহশালা রয়েছে। বাঙলা বিভাগের অধ্যক্ষ ডঃ মযহারুল ইসলামের পরিচালনায় একটি গবেষণাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই বিভাগ থেকে এ-পর্যন্ত ডঃ মযহারুল ইসলামের 'লোকলোর পরিচিতি ও লোকসাহিত্যের পঠন-পাঠন' এবং পূর্ব পাকিস্তানী লোককাহিনী প্রকাশিত হয়েছে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অনার্স ও এম. এ. পাঠক্রমে লোকসাহিত্য পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েও লোকসাহিত্য পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

ব্যক্তিগত উদ্যোগে লোকসাহিত্যের সংগ্রহের কাজে নিযুক্ত ছিলেন অধ্যাপক মনসুরউদ্দিন, কবি জসিমউদ্দিন, ডঃ আশরাফ সিদ্দিকী ও

ডঃ মযহারুল ইসলাম। এঁদের মধ্যে ডঃ সিদ্দিকী ও ডঃ ইসলাম লোকসংস্কৃতির বৈজ্ঞানিক পঠন-পাঠনের সূত্রপাত করেছেন। এবং এঁদের দুজনেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইণ্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ে লোকসাহিত্য বিষয়ে ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেন। ডঃ মযহারুল ইসলাম 'ভারত, পাকিস্তান ও সিংহলে' সংগৃহীত ও ইংরেজিতে প্রকাশিত লোকসাহিত্য সংগ্রহের ইতিহাস রচনা করে ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেন, অন্যদিকে ডঃ সিদ্দিকী অবিভক্ত বাঙলাদেশে সংগৃহীত ও ইংরেজিতে প্রকাশিত লোকসাহিত্য সঙ্কলনের ইতিহাস পর্যালোচনা করে তাঁর পি-এইচ-ডি লাভ করেন। যাঁরা ভারত ও বাঙলাদেশের লোকসাহিত্যের গবেষণায় নিরত, তাঁদের পক্ষে এ দুটি গ্রন্থই বিশেষ জরুরি বলে গণ্য হবে। ডঃ ইসলামের গ্রন্থটি A History of English Folktale Collections in India, Pakistan and Ceylon নামে বর্তমানে বাঙলা একাডেমী কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছে। একাডেমী ডঃ সিদ্দিকীর গ্রন্থটিও প্রকাশের জন্য গ্রহণ করেছেন বলে জানি।

কবি জসিমউদ্দিনের 'বাঙালীর হাসির গল্প' দুখণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। এতে বাঙলাদেশের হাসির লোককাহিনী সংগৃহীত হয়েছে। তিনি বর্তমানে লোকনাট্য সংগ্রহের কাজে নিযুক্ত রয়েছেন। অধ্যাপক মনসুরউদ্দিন বাঙলার লোকসঙ্গীত সম্পর্কে অনেকগুলি প্রবন্ধ প্রকাশ করেছেন। বিভাগোত্তর কালের এই দুজন সংগ্রাহকের সঙ্গে ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ও আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের নাম উল্লেখ করতে হয়। কবি রওশন ইজদানী ও সিরাজুদ্দিন কাশিমপুরি মূলত ময়মনসিংহ জেলার লোকসাহিত্য বিষয়ে গবেষণা করেছেন।

বাঙলা দেশের জেলা কাউন্সিল (প্রাক্তন জেলা বোর্ড) গুলিও লোক-সাহিত্যের দু-একটি সঙ্কলন প্রকাশ করেছে। চট্টগ্রাম ও ময়মনসিংহ জেলা কাউন্সিল যথাক্রমে চট্টগ্রামের লোকসাহিত্য ও ময়মনসিংহের লোকসাহিত্য নামে দুটি গ্রন্থ ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির সম্পাদনায় মুদ্রিত করেছে। সম্প্রতি প্রকাশিত বিশেষ বিশেষ অঞ্চলের ইতিহাসেও লোকসাহিত্যের নানা বিষয় প্রকাশিত হয়েছে। এরকম একটি উল্লেখযোগ্য ইতিহাস হলো আবদুল জলিলের 'সুন্দরবনের ইতিহাস' (দুখণ্ড)।

বাঙলাদেশে ব্যক্তিগত উদ্যোগে যাঁরা লোকশিল্পের সংগ্রহ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে শিল্পী জয়নুল আবেদিনের সংগ্রহশালা সবচেয়ে সমৃদ্ধ। তাঁর একার সংগ্রহ দিয়েই একটি বিশাল ম্যুজিয়ম স্থাপিত হতে পারে। শিল্পী কামরুল

হাসানের ব্যক্তিগত সংগ্রহও নাকি সমৃদ্ধ বলে শুনেছি, যদিও তা দেখার সৌভাগ্য হয়নি। রাজশাহী পাকিস্তান কাউন্সিলের পরিচালক তোফায়েল আহমদের সংগ্রহও বেশ উল্লেখযোগ্য। 'আমাদের প্রাচীন শিল্প' নামে এঁর একটি গ্রন্থও আছে।

বাঙলাদেশে সংগৃহীত লোকসাহিত্য বিষয়ক যে-সমস্ত প্রবন্ধাদি বিভাগোত্তর কালে প্রকাশিত হয়েছে, তার সংখ্যা হবে কয়েকশত। এমন কোনো দৈনিক ও মাসিক পত্রিকা নেই যাতে লোকসাহিত্যের সংগ্রহ এবং আলোচনা প্রকাশিত হয় নি। লোককাহিনীকে ভিত্তি করে নির্মিত চলচ্চিত্র গত দশ বছরে সিনেমা দর্শকের প্রীতি কুড়িয়েছে। ঘটনাটা যে খুব আশাব্যঞ্জক তা নয়, কিন্তু যেটা উপলব্ধি না করে পারা যায় না, তা হলো বাঙলাদেশের তথাকথিত শিক্ষিত সমাজের মূল শেকড়টা এখনও গ্রামবাঙলার মাটিতে প্রোথিত।

লোকসংস্কৃতি বিষয়ক যেসব আলোচনা ও বই-পুস্তক এ-পর্যন্ত আমরা দেখেছি, তা যে সবসময়ই বৈজ্ঞানিক ও বস্তুনিষ্ঠ হয়েছে তা নয়। কিন্তু ভবিষ্যতে সাবধানী গবেষক ও পণ্ডিতের কাজ করবার মতো একটা বিশাল পটভূমি প্রস্তুত হয়েছে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কৃষিপ্রধান বাঙলাদেশের লোকসংস্কৃতিতে ধর্ম ও যাদুবিদ্যার প্রভাব অসীম, কিন্তু অনুসন্ধান করলে দেখা যায়, কিভাবে লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদান ক্রমাগত ধর্ম ও যাদু-নিরপেক্ষ হয়েছে, কিভাবে দেব-দেবীর কাছে বাঙলার কৃষক অন্নাভাব ও দারিদ্র্য দূরীকরণের জন্য প্রার্থনা জানাচ্ছে, কিভাবে লোককাহিনীর ক্ষুদে ও দরিদ্র নায়ক অসম সাহসিকতার সঙ্গে প্রতিকূল অবস্থার বিরুদ্ধে লড়াই করে জয়লাভ করছে এবং কিভাবে সামন্ততান্ত্রিক পরিবেশে এবং ধর্মীয় গোঁড়ামির মধ্যে বসবাস করেও কৃষকেরা নিজেদেরকে আনন্দ দেবার ব্যবস্থা করেছে।

বাঙলাদেশে সংগৃহীত লোকসংস্কৃতির ভিন্ন ভিন্ন উপাদানের মধ্যে রয়েছে অত্যাচারিতের মর্মবেদনা। অদূর ভবিষ্যতে এই মৌখিক সাহিত্যের মধ্যেই পাওয়া যাবে সামন্ততান্ত্রিক সভ্যতার ভগ্নাবশেষ, বাঙলার কৃষক ও ক্ষেতমজুরের শোষণপেষণের কাহিনী এবং তাদের মিলিত সংগ্রাম ও প্রতিরোধের ইতিহাস। বাঙলাদেশের লোকসংস্কৃতি চর্চার সুফল এদিক থেকেই গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হবে।

স্মৃতির গায়ে রক্ত

চিত্ত ঘোষ

পুরনো ছবিগুলো দিনে দিনে আবছা হয়ে আসছিল। অনেক দিনের পুরনো সব ছবি।

পূব বাঙলা এখন বাঙলাদেশ। বাঙলাদেশ আমার জন্মভূমি। সেখানে আমার জীবনের উদ্দাম দুরন্ত দিনগুলো কেটেছিল। সেই স্মৃতি আমার সত্তায় আমি বহন করেছি, সেই স্মৃতির গায়ে এখন শুধু রক্ত।

অনেক সব কথা মনে পড়ে এখন। অনেক মুখ জেগে ওঠে যেন। ঢাকা ছাড়ার কথা মনে পড়ে। দেশভাগ হওয়ার কথা মনে পড়ে। তারপর আর দেশে যাওয়া হয়নি। দেশ তখন বিদেশ।

জন্মভূমি পরভূমি হওয়ার ব্যাপারটা দিনে দিনে সয়ে গিয়েছিল। পুরনো স্মৃতির ওপর নতুন স্মৃতির স্তূপ জমা হচ্ছিল। মাঝে মাঝে ঢাকা ফেরত কোনো বন্ধুর মুখে শুনতাম শহরের গল্প। ঢাকা শহরের দিন বদলের গল্প। মন বদলের গল্প।

কি এক আশ্চর্য মায়াবী সেতু তৈরি হয়েছিল দিনে দিনে। সাহিত্যের সেতু। আর এক মানসিক গভীরতার মধ্যে সংযোগ স্থাপিত হয়েছিল। সেখানে সীমান্ত নেই। সেখানে শুধু বাঙলা ভাষা।

ওপার বাঙলার কবিতা পড়েছি। গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ পড়েছি। গভীর আগ্রহ নিয়ে পড়েছি; মনে হয়েছে পৃথিবীর কিছু কিছু জায়গা অস্তিত্বে এখনো তরঙ্গ তোলে। ভাষা সত্তার শিকড়ে এখনো টান ধরায়। তখন যেন বাড়ি যাওয়ার কথা মনে হয় গোয়ালন্দ হয়ে যেমন আগে যেতাম। মনে আছে গাড়ি যখন গোয়ালন্দে পৌঁছুত, আকাশে তখন শুকতারা। পদ্মার একঝলক উদ্দাম বাতাস লাগত চোখে মুখে। আস্তে আস্তে হাল্কা অন্ধকার হাওয়ায় মিলিয়ে যেত। পদ্মার ওপরে সাদা ভোর একটু একটু করে লাল হয়ে উঠত। আর ঢেউ-এর ধাক্কায় খাড়া পাড় থেকে ঝুর ঝুর করে ঝরে পড়ত রূপোর মতো বালু।

ভয়ঙ্কর সব ব্যাপার ঘটে গেল। তার পুরো চেহারাটা এখনও যেন বোধের মধ্যে আনতে পারিনি। মানুষের ইতিহাসে ভয়ঙ্কর অমানুষিক আরো একটা অধ্যায় জুড়ে গেল। দুঃস্বপ্নের বিশাল বিপুল শবাকীর্ণ গহ্বর যেন চোখের সামনে। তারপর একটা বিরাট শব্দ একেবারে ভেতরের দিক থেকে উঠে এল। আর একটা একরোখা জেদ ঘুরপাক খেল রক্তের মধ্যে।

খবরের সময় রেডিওর দিকে কান পেতে না রেখে উপায় নেই। সীমান্তের খবরের দিকে কান পেতে না রেখে উপায় নেই। শোনা গেল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। নিহতদের মধ্যে আছেন জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতাও। এ-খবর রেডিওতে ঘোষণা করা হলো। এখবর কাগজে বেরুল। চোখ দুটো মনের মধ্যে খুঁজে পেল সেই মুখ। জ্যোতির্ময় মুখ।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় সেই মুখ কত পরিচিত ছিল! মধুর চায়ের দোকানে, লাইব্রেরিতে, করিডরে বা কমনরুমে। জ্যোতির্ময় আমাদের চেয়ে বড় ছিলেন। পড়ায়ও। তীক্ষ্ণ, পরিহাসপ্রিয়, বিদগ্ধ একজন। দেশভাগের পর এপারে আসেননি। ওপারেই থেকে গিয়েছিলেন। ওপারেই থেকে গেলেন। বন্দুকের গুলি না কামানের গোলা বুকে নিয়ে, তাঁর সমস্ত অস্থি, মজ্জা, রক্ত, সত্তা বাঙলাদেশের মাটিতে মিশে থাকল।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহপাঠীদের মধ্যে ছিলেন আলী আহসান, কবীর। ওদের কি হয়েছে? ওরা কি বেঁচে আছে? জানি না। কেউ হয়তো জানে। কামানের গোলায় বিধ্বস্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শবদেহ এখন দিন ও রাত্রির অন্ধকার ঘিরে আছে। জগন্নাথ হল বলতে বোঝায় ধ্বংসস্তূপের মধ্যে দাঁড়ানো কয়েকটি নিঃসঙ্গ থাম। আর তার সংলগ্ন মাঠ এখন পৃথিবীর নির্জনতম, নিষ্ঠুরতম কবর।

কবীরকে মনে পড়ে। উচ্ছল, উদ্দীপ্ত, মেধাবী। আলী আহসানকে মনে পড়ে। শান্ত, তীক্ষ্ণ, বুদ্ধিমান। জ্যোতির্ময়কে মনে পড়ে। পরিহাসপ্রিয় বিদগ্ধ একজন। ওদের সবাইকে কি হত্যা করা হয়েছে? কেউ কি বেঁচে নেই?

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় আমি আর কবীর ক্লাশে পাশাপাশি বসতাম। অবশ্য পেছনের বেঞ্চে। প্রায়ই পাতা ভর্তি কবিতা লেখা হতো। ও এক লাইন আমি এক লাইন। ছাত্র-অধ্যাপকদের নাকি দেয়ালের সামনে লাইনে দাঁড় করিয়ে গুলি করা হয়েছে।

বুড়িগঙ্গার ধারে সদরঘাটে, পটুয়াটুলিতে, বাঙলাবাজারে, রমনায়, পুরনো পল্টনে, সিদ্ধেশ্বরীতে, দয়াগঞ্জে, নারিন্দায়, রাজার দেউড়িতে, সূত্রাপুরে চতুর্দিকে ছড়ানো মৃতদেহের মধ্যে রাজধানী ঢাকার জীবনের একটা অধ্যায়ের অবসান ঘটল। এবার অন্যদিন সুরু। এমন দিন আর আগে কখনো আসেনি।

ঢাকার পথঘাট অলিগলি আমার নখদর্পণে ছিল একদিন। টো টো করে

ঘুরে বেড়িয়েছি শহরের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত। তখনকার দিনে সাড়ে চার আনা পয়সা হলেই রূপমহলে বুক ফুলিয়ে বায়স্কোপ দেখা যেত। আর ছিল মুকুল থিয়েটার। ওখানকার বাদাম গাছগুলিতে অসংখ্য বাদুড় ঝুলে থাকত সারাদিন। শুধু ইংরাজি ছবি দেখানো হতো রমনার ব্রিটানিয়ায়। ঘোড়ার গাড়ির ওপরে বসে একদল লোক বাদ্য বাজিয়ে লাল কাগজ বিলি করত। বায়স্কোপের কাগজ।

আমি থাকতাম গেণ্ডারিয়ায়, ধোপখোলায়। জায়গাটা ঢাকা-নারানগঞ্জ রেল লাইনের ধারে। একটা পুকুরের চারদিকে বাড়িগুলো সাজানো। পুকুরটা বেশ গভীর ছিল। বর্ষাকালে বাজি ধরে মাটি তোলা হতো পুকুরের মাঝখান থেকে। রেল লাইন ধরে পুবের দিকে কিছুদূর হাঁটলেই স্টেশন। গেণ্ডারিয়া স্টেশন। রাস্তার ডাইনে রজনী চৌধুরীর বাগান। এই রাস্তার ওপরই একটা কালভার্ট ছিল। আমাদের আড্ডার জায়গা। বাঁ-দিকে গ্রামের দিকে চলে গেছে পায়ে-হাঁটা রাস্তা। ওখান থেকে আসত ইল্লাস মিঞা। ইল্লাস মিঞা আমাদের দুধ দিত। জলমেশানো দুধ নয়, খুব খাঁটি দুধ। আর নিয়ে আসত যে দিনের যা। পেয়ারার দিনে পেয়ারা, আখের দিনে আখ। শক্ত সমর্থ চেহারা ইল্লাস মিঞার। একমুখ কালো দাড়ি। দাড়িতে হাত বুলিয়ে কখনো হেসে বলত 'আমার ক্ষেতের আউথ, পোলাপানরে খাইতে দিলাম, দাম লাগবে না'।

রেল লাইনের উল্টোদিকের রাস্তাটা ধরে কিছুদূর হেঁটে গেলেই পাওয়া যেত মানেদার মুদি দোকান। তার পাশেই ছিল ঈস্ট এণ্ড ক্লাবের খেলার মাঠ। আর ওই রাস্তা ধরেই যাওয়া যেত লোহার পুল পেরিয়ে ঢাকা শহরের নানা দিকে।

গোণ্ডারিয়া স্টেশন থেকে ট্রেন ধরেই বিশ্ববিদ্যালয়ে যেতাম আমরা। গেণ্ডারিয়ার পরের স্টেশনই ঢাকা। স্টেশন থেকে হেঁটে বিশ্ববিদ্যালয়ে যেতে লাগত আটদশ মিনিট। সেই রাস্তার দুদিকে ছিল অনেকগুলো অর্জুন গাছ। সেই অর্জুন গাছগুলো কি এখনো আছে?

স্কুল কলেজ ছুটির দিনে মামাবাড়ি যাওয়ার কথা মনে পড়ে। সদর ঘাট থেকে তখনকার দিনে নৌকো ভাড়া পাওয়া যেত। প্রায় ঘণ্টাখানেক লাগত গ্রামে পৌছুতে। নৌকোয় বসে দেখা যেত ঢেউএর মাথায় বালিহাঁস আর শুশুকের ভেসে-ওঠা। আর দেখতাম খাড়ির ধারে জেলেদের মাছ ধরা। জাল শুকোনো। নৌকোয় গাব দেওয়া। যে জায়গায় নৌকো ভিড়ত সেই ঘাটের

কাছে অনেকগুলো মাদার গাছ ছিল মনে আছে। তারপর খানিকটা এগিয়েই একটা অক্ষয় বট। তার পাশেই লিচু বাগান। আর সেখানে গ্রামের ডাকঘর। তারপর একটা খাল। গ্রীষ্মকালে খালে জল থাকত না। বর্ষাকালে জলে টৈ-টম্বুর। তখন নদী থেকে খালের ভেতর দিয়ে গ্রামে ঢুকতে হতো। নৌকো এসে ভিড়ত বাড়ির ঘাটে। আজো আমার মনে পড়ে মুদি নৌকোর কথা। একটা গোটা মুদি দোকান নিয়ে নৌকো ভেসে চলত এক গ্রাম থেকে আরেক গ্রামে। চারদিকে শুধু জল। আর সবুজ গাছপালা। এক বাড়ি থেকে আর এক বাড়িতে যেতে হলেও চাই নৌকো। শুকনোর দিনে হেঁটে আসতাম নদীর ঘাট থেকে বাড়ি। চালতে সপেদা গাছের তলা দিয়ে রাস্তা। মাঝে মাঝে বেত ঝোপ। বেতের ফলের চোখ। দেওয়ান বাড়ির রান্না ঘরের পাশ দিয়ে যেতে যেতে পাওয়া যেত সেদ্ধ ধানের গন্ধ।

মহীউদ্দিনের কথা মনে পড়ে। আমার স্কুলের বন্ধু মহীউদ্দিন। সামু খলিফার ছেলে মহীউদ্দিন। কালীগঞ্জ স্কুলে পড়তাম ওর সঙ্গে। একবার থিয়েটার হলো গ্রামে। মানময়ী গার্ল্‌স্ স্কুল। মহীউদ্দিন সেজেছিল নীহারিকা। তারপর শুনেছিলাম ও হয়েছে গ্রামের রাজা। ওর রাজত্বে গ্রামে কখনো দাঙ্গা হয়নি। মহীউদ্দিন হতে দেয়নি। মহীউদ্দিন এখন নিশ্চয়ই মুক্তি-সংগ্রামের নেতা হয়েছে। এখন কোথায় আছে, আছে কিনা কিছুই জানার উপায় নেই।

জন্মাষ্টমীর মিছিল হতো ঢাকায়। দুটো মিছিল দুদিন বেরুত। নবাবপুরের মিছিল আর ইসলামপুরের মিছিল। সোনার চৌকি রূপোর চৌকি বেরুত। তার সঙ্গে সং বেরুত। নানারকম রাজনৈতিক এবং সামাজিক সমস্যা প্রতিফলিত হতো এই সব সং-এ। সারা শহর এই দুদিন যেন উৎসবে মেতে উঠত।

বাঙলাদেশের মানুষ আজ দাঁড়িয়ে উঠেছে এক পায়ে। এমনভাবে মানুষকে দাঁড়াতে খুব কমই দেখা গেছে। এমনভাবে ট্যাঙ্কের সামনে, মেশিনগানের সামনে, মৃত্যুকে এতটুকু পরোয়া না করে জলন্ত গোলার সামনে। একটা ভীষণ তোলপাড়ের মধ্যে আমরা এখন। আমাদের চোখের সামনে এমন এক দেশ, বাঙলাদেশ। স্মৃতির গায়ে এখন শুধু রক্ত।

এপার বাঙলায় এক নিষ্ফল রক্তপঙ্কে আমাদের দিনযাপন। ওপার বাঙলায় রক্তস্নানে এক শুদ্ধির জন্য প্রাণপাত। কিন্তু কেন? আমাদের পূর্বপুরুষদের কৃত-কর্মের মধ্যে এই ভবিষ্যতের ব্যবস্থা করা ছিল যেন। তাই তর্পণ হচ্ছে রক্তে।

শ্রেণীদৃষ্টিতে পূর্ববাঙলার মুক্তিসংগ্রামের চিত্তভূমি

রণেশ দাশগুপ্ত

জনগণের যে বিভিন্ন স্তর ও শ্রেণী পূর্ববাঙলার মুক্তিসংগ্রামে ব্রতী, তাদের চিন্তা-চেতনার গতিধারা সম্পর্কে একটি সঠিক ধারণা বৈপ্লবিক শ্রেণীদৃষ্টিতে যাচাই করে দুইভাবে পাওয়া যেতে পারে। প্রথমত, বিগত চব্বিশ বছরে পর্যায়ে পর্যায়ে যে লোক-অভ্যুদয় হয়েছে, তার ঘটনাবলীর মধ্যেকার চেতনার উত্তরণগুলিকে বিশ্লেষণ করলে বিভিন্ন স্তর ও শ্রেণীর চিন্তার নব নব উপাদানকে বার করে আনা যেতে পারে। দ্বিতীয়ত, গত চব্বিশ বছরে রাজনৈতিক নিবন্ধ রচনা এবং যেসব সাহিত্যচর্চা ও সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে, তার হিসাব-নিকাশ করলেও মুক্তিসংগ্রামের চেতনার উপাদানগুলির সাক্ষাৎ পাওয়া যেতে পারে।

এখানে লোক-অভ্যুদয়ের ব্যাপারটিকে প্রাথমিকভাবে যাচাই করে নিতে গেলে দেখা যাবে, কয়েকটি নির্দিষ্ট বিষয়ে লক্ষ্য অর্জনে ব্রতী গণ-আন্দোলন শ্রেণীসজ্জার দিক দিয়ে পরিমাণগতভাবে বৃদ্ধি পেয়ে আসছে। জনগণের একটি বিশেষ অংশ ছাত্রসমাজ বরাবরই এই আন্দোলনের উদ্যোক্তা হিসেবে রয়েছে। ছাত্রসমাজ উনিশ'শ বাহান্নর বাঙলাভাষার সংগ্রামের স্রষ্টা ছিল। তারাই উনিশ'শ উনসত্তরের গণতান্ত্রিক অধিকারের দাবি সমন্বিত এগারো দফা আন্দোলনের স্রষ্টা হয়েছে। গণ আন্দোলনের উদ্যোগ গ্রহণকারী ছাত্রসমাজের সঙ্গে ক্রমবর্ধমান হারে সংগ্রামী জনতার সংযোগ স্থাপিত হয়েছে গত চব্বিশ বছরে। স্বাধীন পূর্ববাঙলার ঘোষণাটিও এসেছে ছাত্র সমাজের মধ্য থেকে।

শ্রমিকশ্রেণী বসে থাকেনি। ১৯৬৪ সালে আয়ুব-বিরোধী সংগ্রামে পূর্ব-বাঙলার সাধারণ ধর্মঘট প্রমাণ করেছিল যে, মূলত গণতন্ত্র ও স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতৃত্ব শ্রমিকশ্রেণীর হাতেই যাওয়া উচিত। কিন্তু এ-ঘটনা পারম্পর্য রক্ষা করতে পারেনি। এই কারণেই সংগ্রামী ছাত্রসমাজকে শ্রমিকশ্রেণী বরং লালন করারই দায়িত্ব নিয়েছে। পূর্ববাঙলার গণমুক্তি সংগ্রামের ছাত্র-সত্তাকে জনৈক বুদ্ধিজীবী পূর্ববাঙলার একটি ছাত্রসম্মেলনে কাব্যিকভাবে

উপস্থিত করেছিলেন। তাঁর বক্তব্য ঃ নদীমাতৃক পূর্ববাঙলার একটি নতুন ধরনের নদী হচ্ছে ছাত্র আন্দোলন। এই নদী পূর্ববাঙলার মুক্তি আন্দোলনের প্রাণ।

হৃদয়গ্রাহী হলেও এটা নৈসর্গিক ব্যাখ্যা—বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা নয়। এতে ছাত্রসমাজের চরিত্রের পরিবর্তমান রূপটি অথবা ছাত্রসমাজের সঙ্গে সংযুক্ত পূর্ববাঙলার ব্যাপকতম জনগণের সক্রিয় ও সচেতন ভূমিকা বেরিয়ে আসে না। তবু, এই ধরনের ব্যাখ্যা যে সামনে আসে, তার কারণটিও ইতিহাসের দিক দিয়ে সত্য। ছাত্রসমাজের পতাকাতেই পর্যায়ে পর্যায়ে শহীদের বুকের রক্ত ঢেলে আঁকা হয়েছে পূর্ববাঙলার মুক্তি-সংগ্রামের লক্ষ্যমাত্রাগুলি।

এই ঐতিহাসিক সত্যটিকে সামনে রেখে কিছুটা গভীরে যাবার চেষ্টা করলে দুটি বিষয় আমাদের চোখে পড়বে। প্রথমত, ছাত্রসমাজের চেতনার বৃত্তটি ক্রমাগত প্রসারিত হয়ে এসেছে, অর্থাৎ ছাত্রসমাজের চিন্তাধারাতে নতুন নতুন লক্ষ্যমাত্রা লাভ করেছে। দ্বিতীয়ত, ছাত্রসমাজের নেতৃত্বে পূর্ব-বাঙলার জনগণও মুক্তি-সংগ্রামের আদর্শকে প্রসারিত করে নিয়ে এসেছে।

কিন্তু গভীরে যাবার চেষ্টা থেকেই স্বাভাবিকভাবে একটা প্রশ্ন বেরিয়ে আসতে বাধ্য। এই যে চিন্তাধারার বৃত্তের সম্প্রসারণ, এই যে মাতৃভাষা বাঙলাকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা করার সংগ্রাম থেকে পূর্ববাঙলার স্বাধীনতা-যুদ্ধে উত্তরণ, এতে কি ছাত্রসমাজ এবং জনগণের সম্পর্কের মধ্যে ভিতরে ভিতরে কোনো গুণগত পরিবর্তন ঘটেনি? নিপীড়িত শ্রমিক-শ্রেণী এবং কৃষকদের সঙ্গে কি ছাত্রসমাজের চেতনাগত সম্পর্ক স্থাপিত হয়নি? এই প্রশ্নের কিনারা করতে গিয়ে প্রথমত যদি ছাত্রসমাজের দিকে তাকানো যায়, তবে খোলা চোখেও একটি ছবি নজরে পড়বে। সেটি এইযে, ছাত্র-সমাজের কাঠামোটা গত চব্বিশ বছরে বদলে গিয়েছে ভিতরে ভিতরে। এবং এই পরিবর্তনে শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষকদের চেতনার ঘনিষ্ঠ সংযোগ রয়েছে। দ্বন্দ্বাত্মক বস্তু-গতিবাদের দর্শনের আলোকে বিষয়টি আলোচনাযোগ্য। এই প্রসঙ্গে একটা ঘটনার উল্লেখ করা দরকার। পাকিস্তানের শাসক ও শোষকচক্র পূর্ববাঙলা তথা বাঙলাদেশকে দমন করে রাখার জন্যে যেসব ব্যবস্থা করে এসেছে, তার মধ্যে শিক্ষা-সংকোচন নীতি অন্যতম। আয়ুব খানের আমলের প্রথম দিকে দশ বছরের মধ্যে একটা সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা 'মহাপরিকল্পনা'কে বাস্তবায়িত করার জন্যে যে বাদশাহী 'হুকুম' জারী হয়েছিল, তা দুতিন বছর পরেই পরিত্যক্ত হয়। কায়েমী স্বার্থবাদী শাসক ও শোষকরা অচিরেই বুঝতে পারে যে, যে-কোটি

কোটি ছেলেমেয়ে প্রাথমিক শিক্ষালাভ করতে পারে, তারা শুধু মাধ্যমিক শিক্ষার জন্যে নয়, উচ্চশিক্ষার জন্যেও আগ্রহী হয়ে উঠবে। প্রাথমিক শিক্ষার মহাপরিকল্পনা লাটে ওঠে। কিন্তু শিক্ষার প্রসারের জন্যে পূর্ববাঙলার জনসাধারণের তাগিদকে লাটে ওঠানো যায়নি। পূর্ববাঙলার গণমুক্তিসংগ্রামের বৈষয়িক লক্ষ্যমাত্রাগুলি অঙ্কিত হয়নি বলেই অবৈষয়িক বা আত্মিক লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের দিকে জোর পড়েছে বেশি।

পূর্ববাঙলার মুক্তিসংগ্রামের এটি বৈশিষ্ট্য। লোক-অভ্যুদয়ের তরঙ্গরাশি যখন প্রশমিত হয়েছে, তখনও শূন্যতার সৃষ্টি হয়নি। আপাতদৃষ্টিতে যখন ব্যর্থতা এসেছে, তখন প্রস্তুতি চলেছে নতুন অভ্যুত্থানের। এই প্রস্তুতি যতটা বাস্তব উপকরণজাত (অবজেকটিভ), তার চেয়ে বেশি মানসিক উপকরণজাত (সাবজেকটিভ)। যা সাধ্য, তার চেয়ে সাধনা বেশি। যা করণীয় তার চেয়ে ভাবনা বেশি। শিক্ষার ক্ষেত্রে জনগণের নিজস্ব উদ্যোগ-আয়োজনের আপেক্ষিক ব্যাপকতা এই কারণেই সম্ভব হয়েছে। পূর্ববাঙলার জনগণ খালি হাত পায়ে বন্যা নিরোধের ব্যবস্থা করতে পারেনি। পারেনি ভারী শিল্প স্থাপন করতে। অথচ নতুন বিজ্ঞানের জগতের দিকে এগিয়ে চলার তাগিদ নষ্ট তো হয়ইনি, বরং প্রত্যেকটা বড় বড় লোকঅভ্যুদয় এই তাগিদকে উস্কে দিয়েছে। একারণেই শাসকচক্রের শিক্ষা সংকোচনের নীতিকে অগ্রাহ্য করে নিদারুণ লাঞ্ছনা আর উপেক্ষা এবং অসহনীয় দারিদ্র্যের মধ্যেও পূর্ববাঙলায় শিক্ষাবিস্তার ঘটেছে। গ্রামে গ্রামেও স্থাপিত হয়েছে মহাবিদ্যালয় বা কলেজ।

এই শিক্ষাবিস্তারের মধ্য দিয়ে ছাত্রসমাজের ভিতরে শ্রেণীসজ্জার পরিবর্তন ঘটেছে।

পূর্ববাঙলার ছাত্রসমাজে নাগরিক উচ্চ বা নিম্ন মধ্যবিত্তের প্রাধান্য ছিল ইতিপূর্বে, তা অক্ষুণ্ণ থাকলেও কৃষকসমাজ থেকে সোজাসুজি আসা ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় ছাত্র আন্দোলনে কতকগুলি নতুন চিন্তার উপকরণ যোগ হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য এই যে, পূর্ববাঙলার অধিকাংশ ছাত্রসম্মেলনে ছাত্র-সমস্যার প্রতিকারের দাবির অনুপাতে বিশ বছর আগেও জাতীয় সমস্যাবলীর সমাধানের প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছে অনেক বেশি। ছাত্রসমাজই যেখানে ভাষা থেকে শুরু করে খাদ্য এবং স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের দাবিতে আয়োজিত গণ-বিক্ষোভের জাতীয় হোতা, সেখানে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু ইতিপূর্বে বিভিন্ন নির্যাতিত শ্রেণী ও স্তরের বক্তব্য বিচারে ছাত্রসমাজ

যে-পরিমাণ সহানুভূতির পরিচয় দিত, তার তুলনায় বাস্তবায়নের তাগিদে ধারাবাহিকতা রক্ষা করা তাদের পক্ষে সম্ভব হতো কম। ছাত্রসমাজের নতুন চরিত্র গড়ে ওঠায়, অর্থাৎ ছাত্রসমাজে বিশেষ করে দরিদ্র কৃষকের সংখ্যানুপাতিকতা বৃদ্ধি পাওয়ায়, নির্যাতিত শ্রেণী ও স্তরের বক্তব্যগুলি একটা বিশেষ ধারাবাহিকতা ও কার্যকারিতা লাভ করেছে।

কথাটা এইখানেই শেষ নয়। ছাত্রসমাজের অভ্যন্তরেই নয়, ছাত্রসমাজ এবং জনগণের বিভিন্ন শ্রেণী ও স্তরের মধ্যেকার সংযোগের ক্ষেত্রেও ছাত্রসমাজের নতুন চরিত্রের প্রতিফলন প্রণিধানযোগ্য।

গত দুই দশকে এ-ব্যাপারে দুটি ঘটনা ঘটেছে। ১৯৫২ সালে বাঙলা ভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠার আন্দোলন পূর্ববাঙলার ছাত্রসমাজে একটি আদর্শবাদী সাধনার প্রবর্তন করে। কিন্তু ছাত্রআন্দোলনে যারা আত্মনিয়োগ করে, তাদের পক্ষে ছাত্রসমাজের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখা পাঁচ-ছ বছরের বেশি সম্ভব হয় না। অত্যন্ত কর্মঠ ও বৈপ্লবিক চেতনা সম্পন্ন ছাত্র-ছাত্রীদের জন্যেও ছাত্রোত্তরজীবনে আসে অসংলগ্নতার সমস্যা।

এ-সমস্যা অত্যন্ত প্রকট ছিল প্রথম দিকে, যখন ছাত্রজীবন শেষ করে কৃষক বা শ্রমিক আন্দোলনে অবিলম্বে অবতীর্ণ হওয়ার ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়নি ছাত্রসমাজে।

সে-সময়ে ছাত্র-আন্দোলনের অনেক সেরা কর্মী পাকিস্তান সিভিল সার্ভিসে যোগদান করেছিল। জন-বিচ্ছিন্ন এই সার্ভিসের কৃত্রিমতার খোলসের মধ্যে অনেক তাজা এবং বিপ্লবী মন অবরুদ্ধ হয়ে কোনো কোনো ক্ষেত্রে শেষ হয়ে গিয়েছে। তবে এবার যখন ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে এই সার্ভিসের জিঞ্জীর ভেঙে গেল, তখন দেখা গেল, অনেক অবরুদ্ধ মন মুক্তি পেয়েছে এবং অতীতের সংগ্রামী সূত্র তুলে ধরেই যেন জেলায় জেলায় মহকুমায় মহকুমায় মুক্ত এলাকার দায়িত্ব গ্রহণ করেছে বিনা দ্বিধায়। এই মুক্তি-বিহঙ্গেরা যে-দিগন্ত স্থাপন করেছে তাদের চোখের সামনে সেটা বৈপ্লবিক শ্রমিকশ্রেণীর দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে একটা স্বাভাবিক আত্মিকতা স্থাপনেরই প্রয়াস।

তবে এতে পূর্ববাঙলার মুক্তিসংগ্রামের ছাত্রসত্তার প্রমাণ পাওয়া যায় নতুনভাবে। ছাত্রসমাজের আদর্শবাদ আজও প্রাক্তন ছাত্রদের মনে কাজ করে চলেছে।

দুই দশকের দ্বিতীয় ঘটনা: ছাত্রআন্দোলনের কর্মীরা ছাত্রজীবন শেষ হওয়া

মাত্র শ্রমিক এবং কৃষকদের মধ্যে বিপ্লবী সংগঠক হিসেবে কাজ করার রেওয়াজ গড়ে তুলেছে একটা।

প্রগতিবাদী প্রত্যেকটি ছাত্রদলের মধ্যে একটা শ্রমিকমুখী ও কৃষকমুখী প্রবণতা কম-বেশি গড়ে উঠেছে। অর্থাৎ, ছাত্রসমাজের মধ্যে শ্রমিক-কৃষক সংযোগ স্থাপনের একটা সূত্র স্থাপিত হয়েছে। গত দুই দশকের প্রথম দশকে যত ছাত্র শ্রমিক-কৃষক আন্দোলনে বিপ্লবী সংগঠক হিসেবে কাজে নেমেছিল, তার তুলনায় এবারকার দশকের ছাত্রসমাজের মধ্য থেকে বিপ্লবী সংগঠক বেরিয়ে এসেছে তুলনামূলকভাবে বেশি। এর একটা কারণ নিশ্চয় এই যে, শ্রমিক এবং কৃষক আন্দোলনের ভূমিকা স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে পূর্বের তুলনায় অনেক বেশি সক্রিয় এবং প্রভাবশালী। শুধু ছাত্রদের একটি অংশেই নয়, কিছু সংখ্যক ছাত্রীও যে লাল নিশান নিয়ে কিংবা লালটুপি পরে কৃষক সমাবেশে যোগ দিয়েছে, তাতে আনুষ্ঠানিকতা অনেকখানি অতিক্রান্ত হয়েছে নিশ্চয়। কৃষক বিক্ষোভে কোনো কোনো ক্ষেত্রে লাল নিশানধারী কিংবা লালটুপি পরিহিত ছাত্র-ছাত্রীরা কৃষকদের তুলনায় সংখ্যায় বেশি এ-অভিযোগ এসেছে নিন্দুক এবং শুভার্থী উভয়ের কাছ থেকেই। এতে হয়তো কৃষক আন্দোলনের দুর্বলতা প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এর মধ্যে দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে পূর্ববাঙলার মুক্তিসংগ্রামের বিশেষ সত্যটি। ছাত্রসমাজই এখনও চূড়ান্ত পদক্ষেপের প্রধান উদ্যোক্তা থেকে গিয়েছে।

অবশ্য ছাত্রসমাজের কাঠামোর যে-চরিত্র বদল হয়েছে গত একদশকে এবং ছাত্র ও ছাত্রীদের উভয়েরই মধ্যে শ্রমিক ও কৃষকদের সঙ্গে বৈপ্লবিক সম্পর্ক স্থাপন করার যে ধারা প্রবর্তিত হয়েছে, তাতে জনগণের ছাত্রসভা একটা গণমুখী রূপ নিয়েছে, এ-কথা নিসংশয়ে বলা যায়। এই পটভূমিটিকে চোখের সামনে রাখলে পূর্ববাঙলার বর্তমান সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের বিপ্লবী মর্মভূমিকে অনুধাবন করা সহজ হবে।

যে-ছাত্রসমাজ স্বাধীন বাঙলাদেশের পতাকা নির্দিষ্ট করেছে, তারাই যে সমাজতন্ত্রকে এগিয়ে নিয়ে যাবার ব্যাপারে উদ্যোক্তা হবে, এ-বিশ্বাসকে উপরোক্ত বিশ্লেষণ একটা সঙ্গতি দিতে সক্ষম।

গত চব্বিশ বছরে পূর্ববাঙলার ছাত্রসমাজ এবং তারই পাশাপাশি শ্রমিক-কৃষক এবং অন্যান্য মেহনতী মানুষের চিত্তভূমি যে-বৈপ্লবিক সমৃদ্ধি লাভ করেছে, সেটা একটা পরম্পরার মধ্য দিয়ে প্রসারিত হয়ে এগিয়ে এসেছে।

বৈপ্লবিক শ্রমিকশ্রেণীর দৃষ্টিতে একে দেখার অর্থ, একে ভেঙে ভেঙে টুকরো করে দেখা নয়। যে-বাঙালি জাতীয়তাবাদী বাতাবরণের মধ্যে শ্রমিক-কৃষক ও অন্যান্য মেহনতী মানুষের মুক্তির অনিবার্যতা রয়েছে, তাকে ভেঙে ফেলে দেবার ব্যাপার নয়। বাঙলার মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত মেহনতী মানুষের মুক্তিকে অনিবার্য করে তোলাই একে বৈপ্লবিক শ্রেণী-দৃষ্টিতে দেখা।

ছাত্রসমাজের বিকাশের ধারাটিকে পুরোপুরি বুঝতে পারলে পূর্ববাঙলার মুক্তিসংগ্রামের বিপ্লবী চিত্তভূমিকে অনুধাবন করা যাবে অনায়াসেই। পূর্ব-বাঙলার শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষকরা ইতিমধ্যে যে যে বৈপ্লবিক চিত্তভূমি গড়ে তুলেছে, তাকে সরাসরি বিশ্লেষণ করারও একটা পথ আছে এবং সেটা হচ্ছে প্রথাসিদ্ধ পথ। তবে ছাত্রসমাজের যখন চরিত্র বদলে গিয়েছে, তখন এদিক থেকে বিশ্লেষণে এগিয়ে যেয়ে শেষ পর্যন্ত একই সিদ্ধান্তে উপনীত হবো।

স্বাধীন শোষণমুক্ত বাঙলা—ছাত্রসমাজ এবং মেহনতী মানুষের উভয়েরই চিন্তাচেতনার ফসল।

রবীন্দ্রনাথ ঃ পূর্ববাঙলায়

আনিসুজ্জামান

জয়ন্তীতে-জয়ন্তীতে পুষ্পমাল্যের অর্ঘ্যনিবেদন সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে বাদ-বিসংবাদের অবসান হয়নি কখনো। সেকাল থেকে একাল পর্যন্ত অনুরাগ ও বিদ্বেষের শাদা-কালো ধারায় আপ্লুত হয়েছেন তিনি। তাঁকে নিয়েই সকল গর্ব আমাদের, আবার বিক্ষোভের কেন্দ্রস্থলে পাতা হয়েছে তাঁর আসন।

শতাব্দীর প্রথমার্ধে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে বাঙালি মুসলমান সমাজে যে-ভাবনা দেখা দিয়েছিল, তার কয়েকটি দিকের উল্লেখ করা চলে এখানে। রবীন্দ্রনাথ যে মহাকাব্য রচনায় নামলেন না, এ-নিয়ে নবীন সেনের মতো কবি কায়কোবাদ ও ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন। ঐ আঙ্গিকের মোহে তিনি এমনই আবদ্ধ ছিলেন যে, যিনি মহাকাব্যকার নন, তাঁকে বড় কবি বলতে কুণ্ঠাবোধ করেছিলেন তিনি। 'গীতাঞ্জলি'র কাব্য-সৌন্দর্য মেনে নিতে সরাসরি অস্বীকার করেছিলেন 'মোহম্মদী' পত্রিকা। রবীন্দ্রনাথের রচনায় মুসলমানের জীবন উপেক্ষিত, এ-বিষয়ে অভিমান প্রকাশ করা হয়েছিল। তাঁর বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িকতার অভিযোগও এনেছিলেন কেউ কেউ। আবার আধ্যাত্মিকতার সন্ধানীরা তাঁর মধ্যে খুঁজে পেয়েছিলেন আত্মার আত্মীয়কে—যেমন, তৃতীয় দশকে প্রকাশিত "ইসলাম ও রবীন্দ্রনাথ" শীর্ষক প্রবন্ধে গোলাম মোস্তাফা বলেছিলেন যে, শুধু এই 'গীতাঞ্জলি'তেই ইসলামের সকল মর্মকথা লুকিয়ে রয়েছে। অনুরাগী মন নিয়ে একরামউদ্দীন লিখেছিলেন 'রবীন্দ্র-প্রতিভা'। আর 'মুসলিম-সাহিত্য-সমাজে'র সদস্যেরা তাঁদের প্রেরণার উৎস বলে ঘোষণা করেছিলেন রামমোহন-রবীন্দ্রনাথ-কামাল আতাতুর্ককে। এই সমাজের বিশিষ্ট নেতা কাজী আবদুল ওদুদের রবীন্দ্রচর্চার সঙ্গে সকলেরই পরিচয় আছে।

স্বাধীনতা-লাভের পরেই রবীন্দ্রনাথ জনগণের কবি কিনা, সে তর্ক পূর্ব-বাঙলায়ও উঠেছিল। তারপরে আরো নানাভাবে রবীন্দ্রনাথকে দেখা হয়েছে সেখানে। পূর্ববাঙলায় রবীন্দ্রনাথের যে-ব্যাখ্যাদান করা হয়েছে, তাঁকে মূলত তিনটে ধারায় ভাগ করে দেখা যেতে পারে।

সংখ্যায় অল্প, এমন এক দল রবীন্দ্রনাথকে দেখেছেন প্রধানত সনাতন

ভারতীয় ঐতিহ্যের ধারক হিসেবে। রবীন্দ্র-ভুবন নির্মাণে উপনিষদের যে-দান, তাকেই তাঁরা গুরুত্ব দিয়েছেন বেশি। তাঁদের মতে, এই ঐতিহ্যের ধারা থেকে বাঙালি মুসলমানের লাভ করবার মতো কোনো প্রেরণা নেই—কেননা, এ তার ধর্মবোধের পরিপন্থী। এঁরা আরো গুরুত্ব দেন 'কথা ও কাহিনী'র মতো কাব্য, "দুরাশা" ও "সমস্যাপূরণে"র মতো গল্প ও "ব্রাহ্মণে"র মতো প্রবন্ধকে। এসব চিত্র ও বক্তব্য মুসলমানের মর্মে আঘাত করে—এই হলো তাদের বক্তব্য। রবীন্দ্রনাথ যে বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা করেছিলেন এবং "শিবাজী-উৎসবে"র মতো কবিতা লিখেছিলেন, এ-কথাও তাঁরা ভুলতে পারেন না। সুতরাং তাঁরা কবিকে পরিত্যাগ করার পক্ষপাতি।

দ্বিতীয় দলে কিছু প্রবীণ লেখক আছেন। তাঁরা জোর দেন রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিকতার উপরে। ব্রাহ্মরা যে-চিন্তায় মুসলমানের সন্নিকটবর্তী, দেবেন্দ্রনাথ যে হাফিজের অনুরাগী পাঠক ছিলেন, এ-সব কথাও তাঁরা স্মরণ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের শ্মশ্রুমণ্ডিত আলখেল্লা-পরিহিত চিত্র তাঁদেরকে বেশ আশ্বস্ত করে। 'গীতাঞ্জলি'-'গীতিমাল্য'-'গীতালি'তে তাঁরা অন্বিষ্ট আধ্যাত্মিকতার পোষকতা দেখতে পেয়েছেন, 'রাজা'র মতো নাটক ও 'শান্তিনিকেতন' প্রবন্ধাবলীর কয়েকটিতেও তাঁরা নিজেদের চিন্তার সমর্থন খুঁজেছেন। ডক্টর শহীদুল্লাহ্‌র মতো পণ্ডিতজন "উর্বশী" কবিতারও একটা সুফীবাদী ব্যাখ্যা রচনা করেছিলেন।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের যে-আধুনিক পাঠকের দল পূর্ববাঙলায় দলে ভারি, ধর্মভাবনায় তাঁরা উৎকণ্ঠিত নন। উপনিষদ ও সুফীবাদ দুইই তাঁদের দিগ্বলয়ের বহিরে। 'বলাকা' থেকে রবীন্দ্রনাথের কবিতা, 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাস, 'রক্তকরবী'র মতো নাটক, 'রাজা-প্রজা'-'কালান্তর'-'সভ্যতার সঙ্কটে'র মতো প্রবন্ধ—এগুলো থেকেই তাঁরা প্রেরণা লাভ করেন সবচাইতে বেশি। শুধু সাহিত্যগত নয়, সামাজিক প্রেরণাও। সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে, কি প্রবলের প্রতাপের মুখে যখন তাঁরা দাঁড়ান, বঞ্চিতের অধিকার প্রতিষ্ঠার, কি অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করার কথা যখন তাঁরা বলেন, রবীন্দ্রনাথের বাণী তখন তাঁদের সহায় হয়।

সেই সঙ্গে তাঁরা এ-কথাও বলেন যে, রবীন্দ্রনাথকে সমগ্ররূপে দেখতে হবে। রবীন্দ্র-ভাবনায় যেখানে তাঁদের মতে দুর্বলতা, সেখানে তাঁরা তা স্পষ্ট করে বলবার পক্ষপাতী। এত দীর্ঘকাল ধরে, এত বিচিত্র ধারায় যাঁর লেখনী প্রবাহিত তাঁর মধ্যে ভাবের ঐক্য দাবী করা সঙ্গত নয়। কিন্তু তাই বলে মনগড়া আদর্শের

পরিমাপে ছেঁটেকেটে ফেলতে হবে কবিকে, এতে তাঁদের ভয়ানক আপত্তি।

সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে পূর্ববাঙলার বুদ্ধিজীবিদের সঙ্গে সরকারী নীতি-নির্ধারক ও তাঁদের পৃষ্ঠপোষিত কিছুসংখ্যক ব্যক্তির বিরোধের একটা মূল এখানেই নিহিত। বাঙলাদেশের সংস্কৃতির যে প্রবহমান ধারার উত্তরাধিকার আমরা দাবী করি, জাতীয় আদর্শের নামে তার থেকে পূর্ববাঙলার মানুষকে দূরে সরাবার অপচেষ্টা চলেছে দীর্ঘকাল ধরে। বাঙলার সাহিত্য ও সংগীত-ধারার বড় বড় সাধককে দূরে রেখে, রবীন্দ্রনাথকে বিসর্জন দিয়ে, নজরুল ইসলামকে খণ্ডিত করে সাংস্কৃতিক অতীতের একটা মনগড়া চিত্র রচনার প্রয়াস চলেছে বহুদিন থেকে। রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে বিতর্ক এরই একটা অংশ।

পাকিস্তান-ভারত সংঘর্ষের সময়ে বেতারে রবীন্দ্রসংগীতের প্রচার বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। সারা পূর্ববাঙলায় এ-নিয়ে বিক্ষোভ দেখা দেওয়ায় বেতারে রবীন্দ্রসংগীতের পুনঃপ্রচার শুরু হয়। এই অবস্থায় জাতীয় পরিষদে একদিন কেন্দ্রীয় তথ্যমন্ত্রী প্রকাশ করেন যে, জাতীয় আদর্শের সঙ্গে সঙ্গতিবিহীন বিবেচনা করায় রবীন্দ্রসংগীতের প্রচার বেতারে কমিয়ে দেবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। একদিন পরেই ঢাকার বুদ্ধিজীবীরা এই বক্তব্যের নিন্দা করে বিবৃতি দিলেন। বললেন, রবীন্দ্রনাথ বাঙলাভাষী পাকিস্তানীদের সাংস্কৃতিক অস্তিত্বের অবিচ্ছেদ্য অংশ : সরকারী নীতি-নির্ধারণে একথার গুরুত্ব সম্যক প্রতিফলিত হওয়া উচিত। সরকারী নীতির সমর্থনেও এক-আধটা বিবৃতি বের হলো, তবে বিরোধিতায় বের হলো উল্লেখযোগ্যদের বিবৃতি। রীতিমতো একটা আন্দোলন দেখা দিল। সেবারে বাইশে শ্রাবণে সারা পূর্ববাঙলায় এত অনুষ্ঠানের আয়োজন হলো, সচরাচর পঁচিশে বৈশাখেই অত হয়। মন্ত্রীমহোদয় বিবৃতির ব্যাখ্যাও দিলেন একটা। বেতারে রবীন্দ্রসংগীতের প্রচার শুরু হলো, টেলিভিশনেও রবীন্দ্রসংগীতের অনুষ্ঠান বাড়ল।

তবু সরকারী প্রচারযন্ত্রে রবীন্দ্রনাথের সমগ্র গ্রহণযোগ্য হয়নি, যেমন নজরুলের সমগ্র নয়। সরকারী নিষেধের পাহারা ডিঙিয়ে তাই বাইরের অনুষ্ঠানে আর অনুরাগীর হৃদয়ে রবীন্দ্রনাথ আপন স্বরূপে অভিষিক্ত হয়েছেন—সবরকম গানে, সব যুগের কবিতায়, নানাকালের নাটকে, নানা সময়ের বাণীতে। অভিষিক্ত হয়েছেন সেই বৈচিত্র্যে—যাকে মনে রেখে কবি নিজেই বলেছিলেন—"নানা রবীন্দ্রনাথের মালা"।

বাঙলাদেশ বনাম পশ্চিমবাঙলার বিপ্লবী বুলি

বাঙলাদেশের জাতীয় স্বাধীনতা-সংগ্রাম সম্পর্কে ইতিমধ্যেই বিভ্রান্তি প্রচারের প্রয়াস স্বরু হয়ে গিয়েছে।

বাঙলাদেশের অভ্যন্তরে মুসলীম লীগ কিংবা জামায়েত ঈ-ইসলামীর কথা বলছি না, বলছি না পশ্চিমবাঙলায় অখণ্ড বঙ্গ পরিষদ, কিংবা 'জাগো বাঙালী' আন্দোলনের কথা; কেননা, সমগ্র বাঙলাদেশে বা পশ্চিমবাঙলার জনজীবনে এরা এতই নগণ্য যে ব্যাপক ক্ষতি করার ক্ষমতাও এদের নেই।

বাঙলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে প্রকৃত কার্যকরী বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা হচ্ছে কোনো কোনো বামপন্থী মহল থেকে, বিপ্লবী বুলির আড়ালে, তথাকথিত শ্রেণী-বিশ্লেষণের নামে।

কলকাতার রাস্তায় পোস্টার পড়ছে, 'মুজিব মাকিন দালাল। চীন বিরোধী যুদ্ধ ঘাঁটি হিসাবে পূর্ব-পাকিস্তানকে (এঁরা বাঙলাদেশ বলেন না) ব্যবহার করতে চায়'—ইত্যাদি।

এইসব বক্তব্য ইয়াহিয়া খাঁর প্রতি এমনই সমর্থনসূচক যে স্বাভাবিক কারণে এও কোনো বাঙলার মানুষের মনে রেখাপাত করে না, তাই এইসব বক্তব্যও তেমন বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে না।

কিন্তু আর এক ধরনের রাজনৈতিক বক্তব্য হাজির করা হচ্ছে যা নিঃসন্দেহে মারাত্মক এবং পশ্চিম-বাঙলার কোনো কোনো অংশের শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে এইসব বক্তব্যের প্রবক্তাদের এখনও কিছুটা গণভিত্তি আছে বলে এদের বিকৃত মতবাদ নিঃসন্দেহে ক্ষতিকারক। এদের মতে ঃ

(ক) বাঙলাদেশের স্বাধীনতা-সংগ্রাম ঠিক আছে, কিন্তু নেতৃত্ব প্রতিক্রিয়াশীলদের হাতে, স্থতরাং এঁদের উপর ভরসা করা যাবে না; সমান্তরাল নেতৃত্ব এবং আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে।

(খ) পশ্চিম-বাঙলারও একই দশা, বাঙলাদেশের সঙ্গে যেটুকু তফাৎ তা শুধু ডিগ্রীর; স্থতরাং এখানকার আন্দোলনও একই খাতে বহাতে হবে।

২

এই সব বক্তব্য আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় ইংরেজ আমলে অবিভক্ত ভারতে জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনের কোনো কোনো পর্যায়ে অবিভক্ত কমিউ-নিস্ট পার্টির ভ্রান্ত রাজনীতি এবং রণকৌশলের কথা। ভ্রান্ত রাজনীতি ও রণকৌশলের ফলে, কংগ্রেসের নেতৃত্বে পরিচালিত স্বাধীনতা আন্দোলনকে বুর্জোয়া নেতৃত্বে পরিচালিত এই অজুহাতে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করা হয়েছে। শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্ব, কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্ব ছাড়া জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলন হলে তা বুর্জোয়াদের খপ্পরে পড়বে এবং সেই আন্দোলন জাতীয় স্বাধীনতা-সংগ্রামের ক্ষতি করবে এই ধরনের সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গীর ফলে শ্রমিক-শ্রেণীকে এবং কমিউনিস্ট পার্টিকে জাতীয় আন্দোলনের ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখে।

যদিও আমরা সবাই জানি, মার্কস-এঙ্গেলস-লেনিনের নির্দেশ ঃ

পরাধীন দেশে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে জাতির মুক্তিতে আগ্রহী সমস্ত শ্রেণীকে নিয়ে মোর্চা গড়ে তুলতে হবে, শ্রমিকশ্রেণী থেকে জাতীয় বুর্জোয়া পর্যন্ত সমস্ত শ্রেণী এই ফ্রণ্টে সামিল হবে।

সেই সময় আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনে স্তালিনের নেতৃত্ব ও প্রভাব ছিল অবিসম্বাদিত। জাতীয় মুক্তি-আন্দোলন সম্পর্কে স্তালিনের কিছু কিছু সংকীর্ণতা পরবর্তীকালে প্রকাশ পাওয়া সত্ত্বেও একথা অনস্বীকার্য যে, তিনিও বারংবার এই পর্যায়ে সমস্ত শ্রেণীকে নিয়ে ফ্রণ্ট গড়ে তোলার উপর জোর দিয়ে গিয়েছেন।

কংগ্রেসকে এবং জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীকে বাদ দিয়ে জাতীয় স্বাধীনতা-সংগ্রামের যে মোর্চা গঠনের কথা একদা ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির রণ-নীতিতে স্থান পেয়েছিল, তার সঙ্গে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের তো কোনো সম্পর্ক ছিলই না এমনকি স্তালিনের বা কমিনটার্নের ষষ্ঠ কংগ্রেসের বক্তব্যও সেখানে মানা হয়নি। জাতীয় মুক্তিসংগ্রাম প্রসঙ্গে ট্রটস্কী এবং এম. এন. রায়ের সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গীই ছিল ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির তৎকালীন রণকৌশল; এই লাইনের উৎসাহী প্রবক্তা ছিলেন, বি. টি. রণদীভে-মুজফ্‌ফর আহমদ প্রমুখ তৎকালীন কমিউনিস্ট নেতৃত্বের একাংশ।

৩

আমরা লক্ষ্য করেছি, এই পশ্চিমবঙ্গ থেকে স্বাধীন বাংলাদেশ প্রজাতন্ত্রের নেতৃত্ব তথা আওয়ামী লীগের শ্রেণী-চরিত্র বিশ্লেষণের নামে সেই একই বিভ্রান্তি ছড়ানোর চেষ্টা হচ্ছে—একই ধরনের বিপ্লবী বুলির আড়ালে। প্রশ্ন উঠতে পারে পশ্চিমবঙ্গে বাঙলা দেশের নেতৃত্ব সম্পর্কে যে সমালোচনাই হোক্ না কেন, বাঙলাদেশ পৃথক স্বাধীন রাষ্ট্র, তার প্রভাব ওখানে পড়বে কেন,—এপারের সমালোচনা ওপার বাঙলার ক্ষতিই বা করবে কিভাবে ?

আমরা জানি, আজকের দুনিয়াটা এত ছোট হয়ে গিয়েছে যে ভালো-মন্দ যে-কোন তত্ত্বের প্রভাবই সারা পৃথিবীর উপর পড়ে। আমরা চোখের সম্মুখেই তো দেখলাম, সঙ্কীর্ণ রাজনীতির ফলে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি কিভাবে তিন টুকরো হয়ে গেল। চে-গুয়েভারা লাটিন আমেরিকায় ফ্যাসিস্ট ডিক্টেটরশীপের বিরুদ্ধে যে পদ্ধতিতে লড়েন, গুয়েভারার নামে সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিস্থিতিতে সিংহলে তারই অনুকরণ করতে গিয়ে বিপত্তির সৃষ্টি হয়। আর বাঙলাদেশতো একসময় ভারতবর্ষের মধ্যে ছিল; একই কমিউনিস্ট পার্টির অন্তর্ভুক্ত ছিলেন উভয় দেশের কমিউনিস্টরা। সুতরাং এ-দেশের কমিউনিস্টদের কোনো অংশের বিকৃত রাজনীতির প্রভাব সহজেই বাঙলাদেশে পড়তে পারে, এই বাস্তব সত্য অস্বীকার করে লাভ নেই। কমিউনিস্ট পার্টি যেমন আন্তর্জাতিক, তার বিভ্রান্তিও তেমনি আন্তর্জাতিক। বামপন্থী বুলির আড়ালে একই ধরনের বিকৃতি ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন দেশে ঘটতে দেখা গেছে।

তাছাড়া, কোনো দেশের মুক্তি আন্দোলন শুধু নিজের জোরে জয়লাভ করে না। আন্তর্জাতিক শ্রমজীবী মানুষের সক্রিয় সমর্থন যে কোনো মুক্তি-যুদ্ধেই অপরিহার্য। স্বয়ং লেনিন স্বীকার করেছেন, বিশ্বের শ্রমজীবী মানুষের সমর্থন ছাড়া অক্টোবর বিপ্লব জয়যুক্ত হতো না। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পক্ষে যে-কথা সত্য, জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনের পক্ষে সেকথা আরও বেশি সত্য। ভৌগোলিক এবং ঐতিহাসিক কারণেই ভারতের বিশেষত পশ্চিম-বাঙলার জনসাধারণের সমর্থনের প্রয়োজন বাঙলাদেশের মানুষের পক্ষে খুব বেশী। এই সময় যদি আমরা পশ্চিম-বাঙলার জনমনে বিপ্লবী বুলির আড়ালে বাঙলা-দেশের মুক্তি-আন্দোলন সম্পর্কে বিভ্রান্তি ছড়াতে সুরু করি, তবে সে ক্ষতিকে পরবর্তীকালে কোনোক্রমেই শোধরানো যাবে না।

৪

পূর্বেই বলেছি, জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনের শ্রেণী-বিন্যাস সঙ্কীর্ণতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে দেখলে কি বিপত্তি ঘটতে পারে। জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সমস্ত শ্রেণীর ঐক্যবদ্ধ মোর্চা গড়ে তুলতে হয়—কমিউনিস্ট পার্টির নিজস্ব ভূমিকা খর্ব না করেই। বরঞ্চ এই মোর্চা গড়ে তুলতে না পারলেই কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকা খর্ব হয়। শ্রমিকশ্রেণী তার যথাযোগ্য ভূমিকা পালন করতে পারে না।

এই ঘটনা বাঙলাদেশের পক্ষেও সত্য, বরঞ্চ একটু বেশি করেই সত্য। কারণ মনে রাখতে হবে, বাঙলাদেশে বাঙালি জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণী গড়ে ওঠেনি, মনোপলি তো দূরস্থান। বাঙলাদেশের কলকারখানা যে বাইশটি পরিবারের হাতে তাঁরা সবাই পশ্চিম-পাকিস্তানী পুঁজিপতি। এর সঙ্গে আছে বৃটিশ পুঁজির উল্লেখযোগ্য অবস্থান এবং সাম্প্রতিক কালের মার্কিন অনুপ্রবেশ।

বাঙলাদেশে বাঙালি সামন্ততন্ত্রও প্রচণ্ডভাবে ধাক্কা খেয়েছে; কেননা, প্রাক্-পাকিস্তান যুগে জমিদাররা প্রধানত ছিল হিন্দু। তারা দেশত্যাগ করায় ক্লাসিক্যাল জমিদারী প্রথার সেখানে প্রায় অবলুপ্তি ঘটেছে।

সুতরাং বাঙলাদেশে শোষণের রূপ মুখ্যত বাঙালি জাতির বিরুদ্ধে অবাঙালি পুঁজিপতি এবং ভূস্বামীদের।

স্বাধীন বাঙলাদেশ প্রজাতন্ত্রের নেতৃত্ব যাঁদের হাতে তাঁরা হলেন প্রধানত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর (অবশ্যই বুর্জোয়া মতাদর্শের প্রভাব এদের কোনো কোনো অংশ বা ব্যক্তির মধ্যে রয়েছে)। মার্কসীয় রাজনৈতিক পারিভাষায় জাতীয় বিপ্লবী গণতন্ত্রী বলে যাঁদের অভিহিত করা হয়ে থাকে এঁরা মূলত সেই অংশের প্রতিনিধিত্ব করেন। জাতীয় মুক্তিসংগ্রামে কিংবা জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবে এঁদের ভূমিকা জাতীয় বুর্জোয়াদের থেকেও অনেক বেশি সক্রিয়, এঁদের দোদুল্যমানতা অনেক কম, সাধারণভাবে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামে এঁরা অনেক বেশি নির্ভরযোগ্য। সর্বশেষে মুক্তি-আন্দোলনে বিজয় অর্জনের পর জাতীয় পুনর্গঠনে এই শ্রেণীর পক্ষে অ-ধনবাদী বিকাশের পথ গ্রহণ করার সম্ভাবনা সমধিক। কোনো সন্দেহ নেই, এই নেতৃবৃন্দের মধ্যে অনেকে কমিউনিস্ট বিরোধীও বটে; কিন্তু যদি কমিউনিস্ট পার্টি জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত থাকে, জাতীয় ঐক্যে ফাটল ধরাতে না দেয়, শ্রমিকশ্রেণী তার নিজস্ব উদ্যোগ গ্রহণ করে তবে ইতিহাস দেখিয়েছে এঁদের কমিউনিস্ট

বিরোধিতা দূর করা সম্ভব এবং অ-ধনবাদী বিকাশের পথে এদের টেনে আনা সম্ভব।

বস্তুতপক্ষে মুজিবনগরে অনুষ্ঠিত স্বাধীন বাঙলাদেশ প্রজাতন্ত্র সরকারের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে বাঙলাদেশ সরকারের যে কর্মনীতি ঘোষিত হয়েছে সেই ঘোষণায় বিশ্বসাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা, জোটনিরপেক্ষতা এবং শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার আদর্শের কথা ঘোষিত হয়েছে।

এই ঘোষণা বাস্তবে কতখানি রূপায়িত হবে, তা নির্ভর করবে কমিউনিস্ট-দের সঙ্গে বাঙলাদেশের অন্যান্য গণতান্ত্রিক শক্তির ঐক্যের পরিধির উপর। সুখের বিষয় বাঙলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি প্রায় জন্মলগ্ন থেকেই বামপন্থী সঙ্কীর্ণতা পরিহার করে ব্যাপক জাতীয় ঐক্য গড়ে তোলার ব্যাপারে যে পরিপক্কতা দেখিয়েছে তা নিঃসন্দেহে প্রসংশার যোগ্য। সঙ্গে সঙ্গে লক্ষণীয়, এই ঐক্য গড়ে তুলতে গিয়ে পূর্ববাঙলার কমিউনিস্ট পার্টি কখনও তার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বিসর্জন দেয়নি, শ্রমিকশ্রেণীর আন্তর্জাতিকতাবাদ থেকে কখনও বিচ্যুত হয়নি, উগ্র জাতীয়তাবাদকে ঠেকিয়ে রাখতে সক্ষম হয়েছে। এ-জন্য সেখানকার কমিউনিস্ট পার্টিকে যে নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছে বা হচ্ছে তার দৃষ্টান্তও বিরল।

১৯৪৮ থেকে ১৯৫০ এই দুটি বছর বাদ দিলে পরে বাঙলাদেশের (তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তানের) কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস সমস্ত শ্রেণীকে নিয়ে জাতীয় ফ্রন্ট গড়ে তোলার ইতিহাস। কোনো কোনো সময় জাতীয় গণতন্ত্রী পার্টিগুলি হয়তো কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে ঐক্য করতে রাজী হয়নি, কিন্তু কমিউনিস্ট পার্টি সেজন্য তার প্রচেষ্টা থেকে বিরত থাকেনি। ওঁরা ঐক্য গড়তে রাজী হয়নি বলে কমিউনিস্ট পার্টি গোঁসা করে সে-পথ ছেড়ে সঙ্কীর্ণতার পথ ধরেনি। কমিউনিস্ট পার্টি তার ঐক্যের প্রচেষ্টা নিরলসভাবে চালিয়ে গেছে। এর সর্বশেষ প্রমাণ, আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে গঠিত স্বাধীন বঙলাদেশ প্রজাতন্ত্র সরকারের প্রতি বাঙলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির অকুণ্ঠ সমর্থন। শুধু মৌখিক সমর্থন নয়, রণক্ষেত্রে সে-সমর্থন প্রকাশ পেয়েছে। স্বাধীনতার সংগ্রামে আওয়ামী লীগ, ভাসানীপন্থী ন্যাপ এবং বাঙলার কমিউনিস্টদের রক্ত একই সাথে মিশেছে। জেলায় জেলায় সর্বদলীয় কমাণ্ড তৈরি হয়েছে। একদিকে মাওপন্থীদের সঙ্কীর্ণ এবং পাক জঙ্গীশাসকদের সমর্থক রাজনীতি, অন্যদিকে বাঙলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির ব্যাপক জাতীয় ঐক্য গড়ার কার্যক্রমের ফলে

মৌলানা ভাসানীও তার পূর্ব অবস্থান থেকে সরে এসেছেন। তাঁর পরিচালিত ন্যাপের অংশ আজ বাঙলাদেশে আওয়ামী লীগ এবং মূল ন্যাপের কর্মীদের সঙ্গে একই সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করছেন, বাঙলাদেশের সরকারকে জানিয়েছেন অকুণ্ঠ সমর্থন।

৫

আরও দু-একটি বিভ্রান্তিমূলক শ্লোগান বাঙলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামকে ক্ষতিগ্রস্থ করছে। যেমন—যখন বলা হয়, 'ইয়াহিয়া-ইন্দিরা এক হ্যায়', অথবা 'বাঙলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের অত্যাচারের রূপ একই রকমের শুধুমাত্র ডিগ্রীর তফাৎ' তখন এইসব বিপ্লবী বুলির আড়ালে আসলে বাঙলাদেশে ইয়াহিয়া জঙ্গীচক্রের অত্যাচারকে ছোট করে দেখানো হয়।

বাঙলাদেশে যে-অত্যাচার চলছে, ইতিহাসে তার তুলনা মেলা ভার। ইন্দোনেশিয়ায় যখন হাজার হাজার কমিউনিস্ট এবং গণতন্ত্রীকে হত্যা করা হয়েছে, তখনও কিন্তু কেউ বলেননি পশ্চিম-বাঙলায়ও ইন্দোনেশিয়ার মতো অত্যাচার চলছে। অথচ বাঙলাদেশ স্পষ্টতই অত্যাচারের মাত্রা ইন্দোনেশিয়া থেকে অনেক বেশি। ইন্দোনেশিয়ায় খুন করা হয়েছে প্রধানত কমিউনিস্ট এবং জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবীদের। কিন্তু পূর্ববাঙলায় অত্যাচার চলছে সমগ্র জনসাধারণের উপর—সে রাজনীতি করুক আর নাই করুক। গ্রামকে গ্রাম পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় হোস্টেলের সমস্ত ছাত্রকে লাইনবন্দী করে হত্যা করা হয়েছে, অধ্যাপকরাও রেহাই পাননি।

এই গণনিধন যজ্ঞের সঙ্গে পশ্চিমবাঙলা বা ভারতকে এক করে দেখালে বাঙলাদেশের অত্যাচারকে লঘু করে দেখানো হয় মাত্র। এ-ছাড়া ইসলামাবাদের জঙ্গীশাসক চক্রের সঙ্গে ভারতের শাসকদের চরিত্রের যে-মৌলিক পার্থক্য রয়েছে সে-কথা না হয় ছেড়েই দিলাম।

এই প্রসঙ্গে একটি ঘটনা মনে পড়ে গেল। কয়েকবছর আগে কোনো উগ্রপন্থী নেতা পশ্চিমবাঙলার কংগ্রেসী শাসনকে ফ্যাসিস্ট শাসন বলে উল্লেখ করেছিলেন। সেই বক্তব্যের সমালোচনা প্রসঙ্গে আজকের দিনে যাঁরা 'ইয়াহিয়া-ইন্দিরা এক হ্যায়' বক্তব্যের প্রবক্তা তাঁরা সঠিকভাবেই বলেছিলেন 'এই ধরনের শ্লোগান হিট্‌লার-মুসোলিনির অত্যাচারকে লঘু করে দেখায়। সুতরাং এই বক্তব্য ক্ষতিকারক।

ইয়াহিয়ার সঙ্গে ইন্দিরা গান্ধীকে এক করে দেখিয়ে তাঁরাও কি একই দোষে দোষী হচ্ছেন না?

'দুই বাঙলার চেকপোস্ট উড়িয়ে দেবার' শ্লোগানও সমান ক্ষতিকারক। এই শ্লোগান জনসংঘ, অখণ্ড বাংলা সংসদ অথবা বি, এন, ভি, পি ওয়ালারা যখন দেন তার অর্থ বুঝতে কষ্ট হয় না, কিন্তু এই একই শ্লোগান যখন বিপ্লবী বুলি হিসাবে হাজির হয় তখন তার ক্ষতি করার ক্ষমতা অনেক বেড়ে যায়, ইয়াহিয়া খাঁর অনুচরদেরই তা শক্তি যোগায়। এইসব বক্তব্য ভারত তথা পশ্চিমবাঙলা থেকে হস্তক্ষেপ হচ্ছে—ইয়াহিয়ার এই অপপ্রচারকে শক্তিশালী করে।

বাঙলাদেশের যুদ্ধে সমগ্র দুনিয়ার তথা পশ্চিমবাঙলা সহ সমগ্র ভারতের জনসাধারণের সমর্থন প্রয়োজন তাতে কোনো সন্দেহ নেই; কিন্তু তা বাঙলাদেশের স্বতন্ত্র অস্তিত্বকে অস্বীকার করে নয়, বাঙলাদেশ যে আলাদা রাষ্ট্র একথা মনে রেখেই আমাদের সেই মুক্তিযুদ্ধকে সক্রিয় সমর্থন জানাতে হবে। চেক্‌পোস্ট উড়িয়ে দেবার আওয়াজ সেই স্বতন্ত্র অস্তিত্বকে অস্বীকার করার অপচেষ্টা ছাড়া কিছু নয়।

বাঙলাদেশের মুক্তি-আন্দোলনকে স্তব্ধ করতে পারে এমন ক্ষমতা কারো নেই, কারণ যে-ব্যাপক জাতীয় ঐক্য তাঁরা গড়ে তুলেছেন তার কাছে ইয়াহিয়ার অস্ত্রশক্তি তুচ্ছ।

আমাদের কর্তব্য তাঁদের সেই ঐক্যের বাণী পশ্চিমবাঙলার জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া। তার পরিবর্তে ওপার বাঙলার জনসাধারণ রক্তের মধ্য দিয়ে যে-সংগ্রামী জাতীয় ঐক্য গড়ে তুলেছেন বিপ্লবী বুলির আড়ালে তাতে যদি ফাটল ধরাবার চেষ্টা করি, তবে ইতিহাস আমাদের ক্ষমা করবে না।

রণমিত্র সেন

বাঙলা দেশের স্বীকৃতি প্রসঙ্গে

বাঙলা দেশের অভ্যুদয় (২৫-২৬ মার্চ্চ, ১৯৭১) এবং তার স্বতন্ত্র রাষ্ট্র ব্যবস্থা হিসেবে আত্মপ্রকাশ (১৭ই এপ্রিল) দক্ষিণ এশিয়ায়, তথা সমগ্র বিশ্বে, রীতিমত এক আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। এই আলোড়নের অন্যতম একটি কারণ হলো এই যে এই নতুন রাষ্ট্রব্যবস্থা পূর্ব পরিকল্পিত কোনও এক রাজনৈতিক চক্রান্তের প্রতিফল নয় অথবা কোনও বিদেশী শক্তির (ভারতেরতো নয়ই)

ষড়যন্ত্র প্রসূত নয়। বাঙলাদেশ নিঃসন্দেহে কয়েকটি ঐতিহাসিক ঘটনাচক্রের এক অবশ্যম্ভাবী পরিণতি। বাস্তবিকই, সুদীর্ঘ ২৩ বছর ধরে যে অসহ্য শোষণ ব্যবস্থা পশ্চিম পাকিস্তান পূর্ব-পাকিস্তানের উপর আরোপ করেছিল, তার অবসান কামনা প্রত্যেকটি পূর্ববাঙলার মানুষের হৃদয়ের দাবি হিসেবে দেখা দিল। তারপর যখন গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এই দাবি পরিপূরণের সমস্ত পথ বন্ধ হয়ে গেল, তখনই প্রশ্ন উঠল সক্রিয় আন্দোলনের। এই আন্দোলন প্রাথমিক পর্যায়ে ছিল সম্পূর্ণ অহিংসাত্মক ও শাসনতান্ত্রিক। আওয়ামী লীগের নেতৃবর্গ প্রায় গান্ধীজীর প্রদর্শিত এবং মার্টিন লুথার কিং পরিচালিত আন্দোলনের ধারায় মানবিক মর্যাদা পুনরুদ্ধারের ও অধিকার প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হয়েছিলেন। কিন্তু ভুট্টো-ইয়াহিয়া চক্রান্ত সব বরবাদ করে দিল এবং তাদের ২৫-২৬ মার্চের কর্মসূচি বাঙলাদেশকে স্বাধীন ও সার্বভৌম স্বতন্ত্র এক রাষ্ট্রব্যবস্থা হিসেবে সংগঠিত করতে বাধ্য করল। অর্থাৎ, বাঙলাদেশের অভ্যুদয় যদি কেউ অবশ্যম্ভাবী করে তোলে সে হলো পাকিস্তানের সাম্রাজ্যবাদী নীতি এবং এই ঔপনিবেশিক লুঠতরাজ বজায় রাখার জন্য ব্যাপক গণহত্যার চক্রান্ত।

ঔপনিবেশিক শোষণও কিন্তু এক ধরনের গণহত্যা। তবে এখানে শোষণ-ব্যবস্থা এমনভাবে পরিচালিত হয় যে হঠাৎ করে সাধারণ মানুষের কাছে তার স্বরূপ ঠিক ধরা পড়ে না। তবে ঔপনিবেশিক শোষণও ধীরে ধীরে শোষিত অঞ্চলকে রক্তশূন্য করে ফেলে, এবং জনগণকে অকালে ভবলীলা সাঙ্গ করতে বাধ্য করে। তবে সাম্রাজ্যবাদের এই প্রক্রিয়া বহুদিন ধরে চলতে থাকে বলে এর গণহত্যার প্রতিফল অনেকেই অনুভব করে উঠতে পারে না। এই শোষণ বজায় রাখার জন্যই শেষ পর্যন্ত ভুট্টো-ইয়াহিয়া জল্লাদচক্র মরীয়া হয়ে উঠল। শুরু হলো অবর্ণনীয় ও মধ্যযুগীয় অত্যাচারের পালা, যে পালার উদাহরণ জ্ঞাত ইতিহাসে পাওয়া যাবে না। আর এই রক্তস্নাত অধ্যায়ের মধ্যেই জন্ম নিল বাঙলাদেশ, যে বাঙলাদেশ এখন বিশ্ববাসীর প্রায় প্রধান এক আলোচ্য বিষয়ের রূপ পরিগ্রহ করেছে। ভুট্টো-ইয়াহিয়ার বর্তমান নরমেধ যজ্ঞ বিগত ২৩ বছরের সাম্রাজ্যবাদী শোষণেরই সর্বাধুনিক এক পদ্ধতি ছাড়া আর কিছু নয়।

বাঙলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়া হবে কি হবে না সেই দ্বিধা-দ্বন্দ্বের মধ্যে এই ঐতিহাসিক সত্য বারবার মনে করা দরকার যে বাঙলাদেশ পাকিস্তানেরই বিবর্তনের অবশ্যম্ভাবী এক প্রতিফল। সুতরাং এই কারণেই একে সাদরে অভিনন্দন জানানোই যে কোনও প্রকৃত শান্তিকামী ও স্বাধীনতাকামী রাষ্ট্রের অন্যতম

এক মহান দায়িত্ব। যে ঐতিহাসিক ঘটনাস্রোত বাঙলাদেশের জন্ম অবধারিত করেছে সেই ঐতিহাসিক শক্তির বলেই পুর্বপাকিস্তানের মহাশ্মশান সোনার বাঙলার রূপ পরিগ্রহ করবে। ইতিহাসের এই ধারা স্মরণ রাখলেই বাঙলাদেশকে স্বীকৃতির প্রশ্ন নতুন করে বিশ্লেষণ করা যাবে।

আন্তর্জাতিক আইনে স্বীকৃতির বিষয়ে কোনও বাঁধাধরা নিয়ম নেই। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রকমের রাষ্ট্রীয় স্বার্থ অনুযায়ী নতুন রাষ্ট্রব্যবস্থা স্বীকৃতি লাভ করেছে। স্বীকৃতির প্রশ্নে আন্তর্জাতিক আইনের কোনও সুনির্দিষ্ট অনুশাসন নেই। বাস্তবিকই, বিভিন্ন রকমের স্বীকৃতির দৃষ্টান্ত যদি বিশ্লেষণ করা হয় তবে দেখা যাবে যে এর ধরন-ধারণ এত নানামুখী যে শুধুমাত্র আন্তর্জাতিক আইনের অজুহাতে কোনও রকম নিষ্ক্রিয়তা সমর্থনযোগ্য নয়। মূলত জাতীয় স্বার্থের পরিপ্রেক্ষিতেই এক একটি রাষ্ট্র অপর রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দিয়েছে এবং ভবিষ্যতেও দেবে।

একদিকে যেমন রাষ্ট্রব্যবস্থা সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়া সত্ত্বেও তাকে অনেক রাষ্ট্র স্বীকৃতি দেয়নি (যেমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ১৯৩৩ সালের আগে সোভিয়েত ইউনিয়নকে স্বীকার করেননি এবং এখনও পর্যন্ত চীনকে পিংপং কূটনৈতিক অধ্যায় সত্ত্বেও স্বীকার করে নেয়নি) আবার অপরদিকে চালচুলো কিছু না থাকা সত্ত্বেও রাষ্ট্রব্যবস্থাকে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে (যেমন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ল্যাটভিয়া, এস্তোনিয়া, ইত্যাদি এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় মিত্র রাষ্ট্রবর্গকর্তৃক নির্বাসিত সরকারদের নিঃশর্ত স্বীকৃতি)। প্রসঙ্গত স্মরণ করা যেতে পারে যে, ১৯৪০ সালের ফ্রান্সের পতনের পর যখন দ্যুগল এককভাবে হিটলারের কাছে ফরাসী সরকারের আত্মসমর্পণ নীতির বিরোধিতা করলেন এবং ইংলণ্ডে রাজনৈতিক আশ্রয় নিলেন তখন কিন্তু বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিল কোনোরকম সঙ্গতি না থাকা সত্ত্বেও দ্যুগলকেই ফরাসী সরকার হিসেবে প্রকাশ্যভাবে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন।

বাঙলাদেশ একটি সুপরিচিত রাষ্ট্রব্যবস্থা। এতদিনের মারমুখী সামরিক অভিযান সত্ত্বেও, ভুট্টো-ইয়াহিয়া চক্র একে ধ্বংস করতে পারেনি। সুতরাং এর স্থায়িত্ব ও জনপ্রিয়তা সম্পর্কে কোনও রকম সন্দেহের অবকাশ থাকতে পারে না। এদিক থেকেও, বাঙলাদেশ নিছক আইনানুগভাবেই স্বীকৃতি দাবি করতে পারে।

বাঙলাদেশের স্বাধীন সরকার ইতিমধ্যেই জনসাধারণের অকৃত্রিম

ভালোবাসা পেয়েছে। ইয়াহিয়া-মুজিব আলোচনা চলার সময়ে যেভাবে মুজিবরের ব্যক্তিগত নির্দেশাবলী প্রশাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রিত করেছিল তার তুলনা সত্যিই ইতিহাসে পাওয়া যাবে না। মুজিব-নেতৃত্বের অনন্যসাধারণ জনপ্রিয়তার এর থেকে বড় স্বাক্ষর আর কি থাকতে পারে ?

ভুট্টো-ইয়াহিয়ার প্রতিবিপ্লবী আক্রমণ নিঃসন্দেহে এই জাতীয় জন-জাগরণের ভিত্তি অনেকটা দুর্বল করে দিয়েছে। সুপরিকল্পিতভাবে বুদ্ধিজীবীদের হত্যালীলার কর্মসূচি প্রয়োগ করে বাঙলাদেশের মেরুদণ্ড ভেঙে দেবার এক চক্রান্ত করা হয়েছে। বাঙলাদেশ থেকে ৫০ লক্ষের উপর মানুষ ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করেছে। এর ফলে পশ্চিম-পাকিস্তান অধিকৃত অঞ্চলে স্বাধীনতা সংগ্রাম স্তিমিত হয়ে এসেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও, গুরুত্বপূর্ণ বৈপ্লবিক আক্রমণের ঘটনায় আজ সুস্পষ্ট ভাবেই প্রতীয়মান হয়েছে যে ইয়াহিয়ার জল্লাদ বাহিনী তার কর্তৃত্বকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে তুলতে পারেনি ; বরং ফল হয়েছে ঠিক বিপরীত। প্রভূত রণসম্ভার থাকা সত্ত্বেও ইয়াহিয়া-বাহিনী আজ বিভ্রান্ত ও সন্ত্রস্ত। স্থানীয় জনসাধারণের কোনও রকমের সহানুভূতি বা স্বেচ্ছামূলক সহযোগিতা এই বাহিনী আজও পর্যন্ত পায়নি এবং সে আশাও সুদূর পরাহত। এই কারণেই, পশ্চিম-পাকিস্তানের এই জল্লাদ-বাহিনী গণহত্যা, গণধর্ষণ, সন্ত্রাস ও সর্বাত্মক ধ্বংস দ্বারা আজ বাঙলাদেশের ঐতিহাসিক সত্যতার বিরোধিতায় মগ্ন আছে। এই ধরনের মারমুখী অভিযান তার ব্যর্থতার নিদর্শনই বহন করে আছে না কি ?

বাঙলাদেশ আজ সুপ্রতিষ্ঠিত একটি রাষ্ট্র এবং এই রাষ্ট্রের প্রতি স্থানীয় অধিবাসীদের অবিমিশ্র আনুগত্য আছে। অবশ্য একথা স্বীকার করতেই হবে যে এই সরকারের সুনির্দিষ্ট কোনও সীমারেখা আজও পর্যন্ত নেই। সুতরাং, এক্তিয়ার ও অধিকার প্রয়োগের ক্ষেত্রে বিতর্ক ওঠা অস্বাভাবিক নয়। তবুও প্রত্যুত্তরে এ কথা বলা যেতে পারে যে সুস্পষ্ট সীমারেখা না থাকা সত্ত্বেও দক্ষিণ ভিয়েতনামের অস্থায়ী বিপ্লবী সরকারকে যদি পৃথিবীর ২৬টি রাষ্ট্র স্বীকৃতি দিতে পেরে থাকে তবে বাঙলাদেশকে স্বীকৃতি দেবার পথে বাধা কোথায় ?

স্থায়িত্ব, জনপ্রিয়তা, সুনির্দিষ্ট সরকারী ব্যবস্থা, ইত্যাদির দাবিতে বাঙলা-দেশ নিঃসন্দেহে স্বীকৃতি পাবার যোগ্য এক রাষ্ট্রব্যবস্থা। তবে এর যে সব আনুষঙ্গিক দুর্বলতা আছে সেগুলি নিতান্তই সাময়িক এবং আপৎকালীন ; সময়ে এইসব ঠিক হয়ে যাবে। সুতরাং, বাঙলাদেশকে স্বীকৃতি দেবার প্রশ্ন

কোনো রকম আইন-কানুনের বাধা নেই বা থাকতে পারে না।

এখন এই নতুন রাষ্ট্রব্যবস্থাকে স্বীকার করা হবে কি হবে না সেটি নির্ভর করবে ভারতীয় সরকারের নিজস্ব জাতীয় স্বার্থের সংজ্ঞার উপর। এখানেও মনে হয় যে, এদিক থেকেও স্বীকৃতির প্রশ্নে পরিপক্কতার একরূপ ইতিমধ্যেই ধারণ করেছে। বাঙলাদেশ সর্বপ্রথম ভারতের এক প্রকৃত বন্ধু রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। ভারতের রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার দিক থেকে এর অপরিসীম অবদান উত্তরোত্তরকালে স্বীকৃতি পাবে। বিশ্ব শান্তি ও ন্যায়ভিত্তিক সৌহার্দ্য বিস্তারের ক্ষেত্রে এবং জোট নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতির সম্প্রসারণের দিক থেকেও বাঙলাদেশ ভারতীয় জাতীয় স্বার্থের সর্বাপেক্ষা সহায়ক এক শক্তি। যে দিক থেকেই প্রশ্নটি বিবেচিত হোক না কেন, বাঙলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়া ভারতের অবশ্য এক পবিত্র কর্তব্যে পরিণত হয়েছে। এই কারণেই ভারতীয় সরকারের হ্যামলেটের মতো আর দ্বিধাদ্বন্দ্বের কাছে স্বীকৃতির সিদ্ধান্তকে বন্ধক দেওয়া সঙ্গত কাজ হবে না।

রঘুবীর চক্রবর্তী

বিয়োগপঞ্জী

বাঙলাদেশ জাতীয় আওয়ামী পার্টির (ওয়ালী-মুজফফর অংশ)

সহ-সভাপতি দেওয়ান মাহবুব আলী

নরেন্দ্র দেব

অমিয়রতন মুখোপাধ্যায়

গঙ্গাপদ বসু

গিওর্গি লুকাচ

হেলেন ভাইগেল

এঁদের স্মৃতির উদ্দেশে 'পরিচয়' শ্রদ্ধা নিবেদন করছে।

পার্টি কংগ্রেস উপলক্ষে বুনিয়াদী মার্কসবাদের যে বইগুলি মনীষা থেকে পাওয়া যাবে

Documents of 24th Congress of C. P. S. U	Rs. 1·00
ঐ বাঙলা (যন্ত্রস্থ)	
ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির গঠনতন্ত্র (বাঙলা)	০·৩০
,, ,, ,, ,, (হিন্দী)	০·৩০
রাজনৈতিক প্রস্তাব ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (বাঙলা)	০·২০
,, ,, ,, ,, ,, (হিন্দী)	০·২০
ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির কর্মসূচী (বাঙলা)	০·৫০
,, ,, ,, ,, (হিন্দী)	০·৫০

লেনিনের লেখা—

গ্রামের গরীবদের প্রতি	০·২৫
এশিয়ার জাগরণ	০·৭৫
মার্কসবাদের ঐতিহাসিক বিকাশের কয়েকটি দিক	০·৮০
সর্বহারার সংস্কৃতি প্রসঙ্গে	০·৫০
কোথা থেকে সুরু করতে হবে? পার্টি সংগঠন ও পার্টি সাহিত্য, শ্রমিকশ্রেণী ও তাঁদের সংবাদপত্র	০·৮০
সংগ্রামী বস্তুবাদের তাৎপর্য সম্পর্কে	০·২০
বরং কম তবে আরো ভালো	০·৪০
ফসলে (দেয়) ট্যাক্স	০·৫০
আমাদের বিপ্লবে সর্বহারার কর্তব্য (সর্বহারার পার্টি প্রস্তাবিত মঞ্চ)	০·৭৫
জাতীয় এবং ঔপনিবেশিক প্রশ্ন সম্পর্কিত প্রাথমিক খসড়া	০·২০
কৃষি সংস্কারের সমস্যা সম্পর্কিত প্রাথমিক খসড়া	০·৩০
সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির থিসিস	০·৫০
আসন্ন বিপর্যয় ও কিভাবে তাহাকে প্রতিরোধ করা যায়	০·৬০
যে উত্তরাধিকার আমরা বর্জন করি	০·৬০
যুব সমস্যা প্রসঙ্গে লেনিন	০·৫০
সমবায় সম্পর্কে	০·২০
সাম্যবাদের বৈষয়িক ও কৃৎকৌশলগত ভিত্তি প্রসঙ্গে	০·৬০
গণতান্ত্রিক বিপ্লবে সোশ্যাল ডেমোক্রাসীর দুই কৌশল	২·০৫
সোশ্যালিস্ট গণতন্ত্র	১·৫০
মার্কসবাদ প্রসঙ্গে	০·৮০
বামপন্থী কমিউনিজম শিশুদের রোগ	১·৫০

বাঙলাদেশে চলেছে মরণপণ জাতীয় মুক্তি লড়াই
পশ্চিম পাকিস্তানের জঙ্গীশাহী শেষ মরণকামড় দিতে ঝাঁপিয়ে পড়েছে
হত্যা, অত্যাচার, ধর্ষণ, গৃহচ্যুত ও সর্বস্বচ্যুত করার জন্য
সভ্যতাঘাতী সশস্ত্র দানববাহিনী নিয়ে

বাঙলাদেশের মানুষ মৃত্যুঞ্জয়
তাঁরা লড়ছেন

পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, মেঘালয়, ত্রিপুরায় আশ্রয়প্রার্থী এসেছেন সত্তর লক্ষেরও বেশি নরনারী-শিশু, এসেছেন শ্রমিক-কৃষক-বৃত্তিজীবী-বুদ্ধিজীবী

আমরা বাঙলাদেশের ন্যায্য সংগ্রামের পাশে আছি, থাকব
মনুষ্যত্বের এতবড় অসম্মানের সময় আমরা হাত গুটিয়ে বসে থাকতে পারি না

আমাদের দিতে হবে

* গৃহহীনকে আশ্রয়, ক্ষুধিতকে খাদ্য, বেদনার্তকে সান্ত্বনা, রোগার্তকে ঔষধ ও শুশ্রূষা
  এজন্য গোটা ভারতে আপৎকালীন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে সবাইকে একসঙ্গে কাজে নামতে হবে

পাকিস্তানী গুপ্তচরচক্রের সংগ্রামবিরোধী কাজ, সাম্প্রদায়িকতার প্রচার ও চক্রান্ত রোধ করতে বিশেষভাবে পশ্চিমবঙ্গবাসীদের ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে আসতে হবে।

আমাদের মনে রাখতে হবে

* বাঙলাদেশে বাঙালির সর্বনাশ হলে পশ্চিমবঙ্গের বাঙালির জীবন নিরুপদ্রব থাকতে পারে না
* বিশ্ববাসীর সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রাম এবং স্বাধীন, সুখী, গণতান্ত্রিক বা সমাজতান্ত্রিক জীবন বিকাশের লড়াই শক্তিশালী হতে পারে না

বাঙলাদেশের জয় মুক্তবুদ্ধি বিশ্বমানবের শান্তি, স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের জয়
বাঙলাদেশের এ-জয় অবশ্যম্ভাবী।

বাঙলাদেশ সহায়ক শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবী সমিতিকে
এই সংগ্রামের সহায়তায় অকুণ্ঠ সাহায্য প্রেরণ করুন।
কার্যালয় ১৪৪ লেনিন সরণী। কলকাতা-১২ (টেলিফোন ২৪-৩৯৩০)

পরিচয়
বাঙলাদেশ সংখ্যা ২
সংখ্যা ১১-১২। বর্ষ ৩৯
১৩৭৮

সূচিপত্র

উপদেশকমণ্ডলী

গিরিজাপতি ভট্টাচার্য। হিরণকুমার সান্যাল। সুশোভন সরকার
অমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র। গোপাল হালদার। বিষ্ণু দে। চিন্মোহন সেহানবীশ
সুভাষ মুখোপাধ্যায়। গোলাম কুদ্দুস।

সম্পাদক: দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। তরুণ সান্যাল
প্রচ্ছদ: ধ্রুব রায়

পরিচয় প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে, অচিন্ত্য সেনগুপ্ত কর্তৃক নাথ ব্রাদার্স প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ৬ চালতাবাগান লেন, কলিকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত ও ৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড কলিকাতা-৭ থেকে প্রকাশিত।

পরিচয়
বর্ষ ৩৯। সংখ্যা ১১-১২
জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় । ১৩৭৮

জাতিতত্ত্বের বিচারে বাঙলাদেশের সংগ্রাম

শ্যামল চক্রবর্তী

["মার্কসীয় তত্ত্বের সুনিশ্চিত দাবি হলো যে যে-কোনো সামাজিক সমস্যার বিচার করতে হলে তাতে নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক সীমার মধ্যেই ত করতে হবে এবং যদি কোনো বিশেষ দেশের ব্যাপার হয়—(যথা, কোনো বিশেষ দেশের জাতীয় কর্মসূচী) তবে একই ঐতিহাসিক যুগের মধ্যে অন্যান্য দেশের তুলনায় সেই দেশের পৃথক চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলিকে হিসেবে নিয়ে বুঝতে হবে।"]১

ইতিহাসের দিক থেকে বিচার করলে এটা পরিষ্কার যে পূর্ব-বাঙলার মানুষের রাজনৈতিক চেতনায় ১৯৪৭ থেকে ১৯৭১এর মধ্যে একটা বিপ্লব ঘটে গেছে। এই মৌল পরিবর্তন একটা আকস্মিক ঘটনা নয়, কোনো সম্মোহনী বিদ্যায় পারদর্শী নেতৃত্বের অলৌকিক অবদান নয়, ২৪ বছরের অভিজ্ঞতা, ২৪ বছরের নিরবচ্ছিন্ন লাঞ্ছনা যন্ত্রনা ও সংগ্রাম, পূর্ব-বাঙলার মানুষের চেতনায় নিশ্চিতভাবেই এই পরিবর্তন সাধন করেছে।

কারণ, এ-বিষয়ে সন্দেহের বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই যে ১৯৪৭ সালে ধর্মের ভিত্তিতে ভারত-বিভাগের সময়ে পূর্ব-বাঙলার সাধারণ মুসলমান নির্দ্বিধায় তাকে স্বাগত জানিয়েছেন, নবসৃষ্ট পাকিস্তান রাষ্ট্রকে সানন্দে বরণ করে নিয়েছেন। সে-সময়কার উন্মাদনা প্রকাশ পেয়েছিল, 'এক ধর্ম—ইসলাম, এক রাষ্ট্র—পাকিস্তান, এক নেতা—কায়দে-এ-আজম জিন্নাহ্'—এই রণধ্বনিতে। অন্যকোনো যুক্তিই সেদিনের পূর্ব-বাঙলার সাধারণ মুসলমান শুনতে রাজি ছিলেন না।

এ-ঘটনাও আকস্মিক ছিল না। প্রাক-স্বাধীনতা যুগের ভারতবর্ষের দীর্ঘ ইতিহাসের বিবর্তনের মধ্য দিয়ে এ-অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল। সে-ইতিবৃত্ত আলোচনার স্থান এটা নয়। কিন্তু পূর্ব-বাঙলার মুসলমানের কাছে পাকিস্তানের উদ্ভবের অর্থ ছিল না—শুধুই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের শাসন থেকে মুক্তি, এর

আরও একটি সুস্পষ্ট অর্থ ছিল হিন্দুদের থেকে বিচ্ছিন্নতা। তাদের বাস্তব অভিজ্ঞতায় ছিল—জমিদারদের, মহাজনদের, ব্যাপারী-ব্যবসায়ীদের অধিকাংশই হিন্দু। মুসলমানরা উপরোক্ত অর্থনৈতিক গোষ্ঠীতে থাকলেও বড়ো অংশটাই ছিল হিন্দু। উপরন্তু যুক্ত-বাঙলায় ফজলুল হকের মন্ত্রিত্ব প্রণীত বঙ্গীয় কৃষি ঋণ আইন সত্যই ঋণগ্রস্ত কৃষকদের বেশ কিছু অংশের উপকারে লেগেছে। এমনকি ১৯৪৩ সালের মন্বন্তরকেও মুসলিম লীগ নেতৃত্ব হিন্দু ব্যবসায়ীদের কারসাজি হিসাবে বোঝাতে কিছুটা সক্ষম হয়েছিল। পূর্ব-বাঙলার অধিকাংশ মানুষ তথা সাধারণ কৃষকের চেতনায় ঐশ্লামিক রাষ্ট্র পাকিস্তানের মানে ছিল সে এবার জমি পাবে, ঋণের জাল থেকে মুক্তি পাবে, ছেলেপিলে লেখাপড়া শিখবে, দেশে ব্যবসা-বাণিজ্য বাড়বে—এক কথায় গড়ে উঠতে চলেছে স্বাধীন উন্নতিশীল দেশ।

এটা ঠিক যে মুসলমান শিক্ষিত মধ্যবিত্ত অংশ যুক্ত-বাঙলায় লীগ মন্ত্রিসভার আমলে সরকারি চাকরিতে প্রচুর পরিমাণে ঢুকতে পেরেছিলেন, কিন্তু তবুও ওপরতলার অফিসারদের মধ্যে সংখ্যাধিক্য ছিল হিন্দুদের। উপরন্তু ওকালতি, ডাক্তারি, শিক্ষকতা বা অধ্যাপনার ক্ষেত্রেও মুসলমানরা নিতান্তই সংখ্যালঘু। এমনকি সাহিত্য সৃষ্টি ও সংস্কৃতির অন্যান্য ক্ষেত্রেও হিন্দুদের প্রাধান্য। সুতরাং শিক্ষিত বাঙালি মুসলমানের পক্ষে ভাবা সহজ ছিল—আমরা পিছিয়ে আছি হিন্দুরা বৃটিশের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে আমাদের চেপে রেখেছে বলে, আমরা পিছিয়ে আছি আমরা স্বতন্ত্র বলে।

বস্তুত শিক্ষিত বাঙলার মুসলমানই দ্বিজাতিতত্ত্ব ও পাকিস্তানের বাণী পূর্ব-বাঙলার ঘরেঘরে পৌঁছে দিয়েছেন। তাঁরাই ছিলেন পাকিস্তান-বন্দনার মূল গায়েন।

শুধু চাকরি, বৃত্তি বা সংস্কৃতির ক্ষেত্রেই নয়, তাঁদের দৃষ্টি ছিল আরও প্রসারিত। তাঁদের মনে ছিল যে, ২৩এ মার্চ ১৯৪০ মুসলিম লীগের লাহোর প্রস্তাব বলেছিল, "...the areas in which the Muslims are numerically in a majority, as in the North-Western and Eastern Zones of India, should be grouped to constitute Independent States, in which the constituent units shall be autonomous and sovereign."[২] অর্থাৎ, যেসব এলাকায় মুসলমানরা সংখ্যাগুরু, যথা ভারতের উত্তর-পশ্চিম ও পূর্বাঞ্চলে, তাদের গোষ্ঠিবদ্ধ করে স্বাধীনরাষ্ট্র গড়ে তুলতে হবে, তার মধ্যকার সংযোগী এককগুলি হবে স্বায়ত্বশাসিত সার্বভৌম। তার

তাৎপর্য হলো এই যে, পাকিস্তান রাষ্ট্রের মধ্যে পূর্ব-বাঙলার আত্মনিয়ন্ত্রণ অনিবার্য। দ্বিতীয়ত, তাঁরা জানতেন যে, সারা পাকিস্তানে এলাকা হিসাবে পূর্ব-বাঙলার মানুষই সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং পাকিস্তানের রাষ্ট্রকাঠামো যে গণ-তান্ত্রিকই হবে তাও ছিল ব্যাপকভাবে স্বীকৃত। সুতরাং শুধু পূর্ববঙ্গেই নয়, সারা পাকিস্তানের রাজনীতিতে পূর্ব-বাঙলার মুসলমানেরা যে বিশেষ গুরুত্ব পাবে সে-বিষয়ে তাঁদের যথেষ্ট ভরসা ছিল। সুতরাং রাষ্ট্রশক্তির সহায়তায় নতুন করে শিল্পায়ন এবং শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে অবাধ অগ্রগমনের পথ উন্মুক্ত হবে তাতেও তাঁরা ছিলেন নিঃসন্দেহ।

এই সমস্ত স্বপ্ন, সকল আশা ও আকাঙ্ক্ষা, গত ২৪ বছরে একের পর এক আঘাতে ভেঙেছে। পূর্ব-বাঙলার মুসলমান দেখেছেন—এক ধর্ম হওয়া সত্ত্বেও পশ্চিম-পাকিস্তানি শাসকচক্রের নির্মম শোষণ-শাসন চলেছে অবাধ তাঁদের ওপর ; দেখেছেন, সর্ব বিষয়েই বৈষম্য বজায় রাখা হয়েছে তাঁদের বিরুদ্ধে ; দেখেছেন, ধর্মের নামে ও ভারতদ্বেষিতার নামে তাঁদের স্বাভাবিক বাণিজ্য পথ রুদ্ধ করা হয়েছে, দেখেছেন শিক্ষা-সংস্কৃতি ও অর্থনৈতিক উন্নতির দরজা খোলা হয়েছে পশ্চিম-পাকিস্তানের স্বার্থে, তুলনায় পূর্ব-বাঙলাকে ঠেকিয়ে রাখা হয়েছে পেছনে ; দেখেছেন, তাঁদের ভাষা ভুলিয়ে দেবার চেষ্টা হয়েছে ; দেখেছেন বাঙালি নামের প্রতি শাসকমহলের অপরিসীম তাচ্ছিল্য ও অবজ্ঞা। তাই যে-বাঙালি সত্তাকে বেশ কিছুকাল ভুলিয়ে রাখা সম্ভব হয়েছিল, তা নতুনভাবে নতুন স্তরে ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করেছে।

স্তালিন বলেছেন, "ইতিহাসের বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে এক স্থায়ী জনসমাজ যখন ভাষা, ভূখণ্ড, অর্থনৈতিক জীবন এবং মানসিক গঠন-প্রণালীর ঐক্যের মাধ্যমে একই সংস্কৃতির সাধারণাধিকার ভোগ করে, তখন গড়ে ওঠে জাতি"।[৩] কোনো বিজ্ঞানসম্মত সিদ্ধান্তেই সারা পাকিস্তান এক জাতি ছিল না। বালুচ, পাঠান, সিন্ধি ও পাঞ্জাবী এই মূল চারটি জাতি অধ্যুষিত পশ্চিম-পাকিস্তান এবং বাঙালিদের মাতৃভূমি পূর্বাঞ্চলের মধ্যে ভৌগোলিক ভূখণ্ডের বন্ধন পর্যন্ত ছিল না। তবুও যে ঐতিহাসিক ঘটনাপরম্পরায় পাকিস্তানের উদ্ভব ঘটেছিল তাতে শুভার্থিগণ আশা করতে পারতেন যে জাতিগত বৈষম্য ও শোষণ দূর করতে পারলে, প্রত্যেকের স্বাধীন বিকাশের সুযোগ করে দিলে, হয়তো একটা তুলনামূলক স্থায়ী ঐক্য গড়ে উঠতে পারত। তা ঘটেনি। বরং সাথেসাথে বালুচ, পাঠান, সিন্ধি প্রভৃতি পশ্চিম-পাকিস্তানের সংখ্যালঘু জাতীয়

জনসমাজের ওপর একই ধরনের শাসন-শোষণের নিগড় চাপিয়ে দিয়েছে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধা সামরিক-আমলাতান্ত্রিক-একচেটিয়া পুঁজিপতি চক্র ও জমিদার শ্রেণী। এদের অধিকাংশই হলো পাঞ্জাবী। এবং এঁদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন ভারতবর্ষের বিভিন্ন অংশ থেকে ছেড়ে আসা সামান্য সংখ্যক মুসলমান বড়ো পুঁজিপতি ও ব্যবসায়ী। মালিক ফিরোজ খাঁ নূন, মুস্তাক আহম্মদ গুরমানি, মিঞা মমতাজ মহম্মদ দৌলতানা, সৈয়দ আহম্মদ নবাব শা গরদেসী, ইফতিকার হুসেন খাঁ মামদোতদের সঙ্গে হাত মেলালেন এসে আদমজি, হাবিব রহিমতুল্লা, চিনয়, ভালিভাই, দাদা, ইস্পাহানি, দায়ুদ, ইব্রাহিম, আলি মহম্মদ, বসির, ইদ্রিস, শাকর, সালাম, রশদি ; তাছাড়া আগে থেকেই ছিলেন সর্দার মমতাজ আলি খাঁ, শেখ আল্লা বক্স, শেখ ইসমাইল, খাড়া, ভুট্টো প্রভৃতি।

পূর্ব-বাঙলায় ভাষার প্রশ্নটা গুরুত্ব পায় একেবারে গোড়ার দিক থেকেই। ১৯৪৮ সালের মার্চ মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে জিন্নাহ্ ঘোষণা করেন, পাকিস্তানের যে একটিমাত্রই রাষ্ট্রভাষা হতে পারে তা হচ্ছে উর্দু। বিস্ময়ের বিষয় সেই উৎসব মণ্ডপের এক কোণ থেকে কয়েকজন ছাত্র চেঁচিয়ে উঠেছিল, "না, না"। শুধু তাই নয়, এরপরে জিন্নাহ সাহেবের আবাসস্থলের বাইরে বিক্ষোভ মিছিল হয় এবং অনেক ছাত্র গ্রেপ্তার হয়। অবশ্য এর সঙ্গে নাগরিক অধিকারের সমস্যাও জড়িয়ে গিয়েছিল। পরে বিক্ষোভ প্রশমনের জন্য খাজা নাজিমুদ্দিন ছাত্রদের মুক্তি দেন এবং আশ্বাস দেন যে, বাঙলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হবে। কিন্তু ইতিমধ্যে বাঙলাভাষার জন্য আন্দোলন চালিয়ে যাবার উদ্দেশ্যে বিশ্ববিদ্যালয় কমিটি গঠিত হয়েছে।

১৯৪৮ সালে যে-পুলিস ধর্মঘট হয়েছিল তার খবর সংবাদপত্রে মেলে না। কিন্তু শ্রীজ্যোতি সেনগুপ্ত তাঁর Eclipse of East Pakistan গ্রন্থে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে, মাহিনা বৃদ্ধি ও কাজের অবস্থার উন্নতির জন্য যে-ধর্মঘট হয় তার দমনের জন্য খানাতল্লাশি, গ্রেপ্তার থেকে গুলিচালনা পর্যন্ত করা হয়। কত মারা গিয়েছিল তার সরকারী হিসাব নেই। বেসরকারী হিসাব, মৃতের সংখ্যা কম-পক্ষে ৬০০। (পৃষ্ঠা ৬৩)

এর কিছুকাল পরে ১৯৫১ সালে সমগ্র খুলনা জেলায় এবং নোয়াখালি ও বরিশাল জেলার কোনো কোনো অংশে দুর্ভিক্ষ ছড়িয়ে পড়ে। সুন্দরবন অঞ্চলের ৯০ বর্গমাইল এলাকার ১২ লক্ষ লোক ভীষণ দুর্বিপাকে পড়ে এবং পরপর

তিন বছরে প্রায় ২০ হাজার লোক মারা যায়। এদের বিপদের মূল কারণ জোর করে পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে লেনদেন বন্ধ করে দেওয়া। (পৃষ্ঠা ৬৪-৬৫)

যুক্ত-বাঙলার কৃষক-আন্দোলনের বৃহত্তম সংগ্রাম ও সাফল্য ঘটেছিল তেভাগা আন্দোলনে। ১৯৪৮এর মধ্যে যশোহরে তেভাগা আন্দোলন দমনের জন্য সরকার নড়াইল মহকুমাকে প্রায় যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত করেছিল। ১৯৪৮ সালের নভেম্বর মাসে চট্টগ্রামের মাদারশা এলাকায় ২০ হাজার কৃষকের জমিদার-বিরোধী জমায়েতের ওপর গুলি চলে, ১২ জন মারা যায়। ১৯৪৯ সালে শিলেটে নানকর প্রথার বিরুদ্ধে কৃষক-আন্দোলন দানা বেঁধে ওঠে। এর ওপর পুলিস অমানুষিক অত্যাচার চালায়। পরে অবশ্য লীগ সরকার এই বর্বর প্রথা রদ করতে বাধ্য হয়। ১৯৪৯ সালে ঢাকার করোনেশন পার্কে মহিলা জমায়েতের ওপর যে-তদানীন্তন পুলিস ও গুণ্ডাদের ধর্ষণলীলা চলেছিল তা অবর্ণনীয়। ঐ সময়েই ময়মনসিংহের গারো পাহাড়ের তলদেশে হাজং এলাকায় টঙ্ক প্রথার বিরুদ্ধে ব্যাপক কৃষকবিদ্রোহ সুরু হয়। অমানুষিক অত্যাচার চালান হয় এ-আন্দোলন দমন করতে। সবচেয়ে ঘৃণ্য প্রয়াস হলো অত্যাচারে পালিয়ে যাওয়া মানুষের জমিতে বহিরাগতদের পাকাপাকিভাবে বসিয়ে দেওয়া। ১৯৪৯-৫০ সালে নাচোলে সাঁওতালদের বিক্ষোভ দমনে যে-বর্বরতা অনুষ্ঠিত হয়েছিল তার তুলনা ইতিহাসে বিরল। শ্রীযুক্তা ইলা মিত্রর কাহিনী পশ্চিমবঙ্গেও সুপরিচিত। সেই অত্যাচারে ১৪০০ সাঁওতাল চাষী ভিটেছাড়া হয়; তাঁরা আর ফিরে যেতে পারেননি।

সাধারণ অর্থনৈতিক দুর্দশাও ক্রমেই বাড়তে থাকে। পাটের প্রধান বাজার ছিল পশ্চিমবঙ্গের চটকল। স্বাভাবিক বাজার সম্পর্ক অচিরেই নষ্ট হলো। ১৯৫০ সালে কোরিয়ার যুদ্ধের সময় থেকে কিছুকাল পরে পর্যন্ত আন্তর্জাতিক মজুতের ঢেউয়ে বেশ লাভ হতে থাকে, যদিও তার অধিকাংশটাই যায় ব্যবসায়ীদের পকেটে কিন্তু বাজার পড়ার সময়ে ব্যবসায়ীরা লোকসান সামলে নিতে পারলেও সাধারণ চাষীর আয় পড়ে গিয়ে দাঁড়ায় দেশভাগের সময়ের অর্ধেকে।

ইতিমধ্যে ব্যবস্থা হয় বিদেশী আমদানি আসবে প্রথমে পশ্চিম-পাকিস্তানে, পরে সেখান থেকে পুনরায় রপ্তানি হবে পূর্ববঙ্গে। ফলে, বাঙালি ক্রেতাকে পশ্চিম-পাকিস্তানি ব্যবসায়ীর মুনাফা ও জাহাজ ভাড়া বাবদ প্রতিটি জিনিষে বাড়তি কড়ি গুনতে হয়।

পূর্ববঙ্গ নদীমাতৃক দেশ। কিন্তু দেশভাগের পর ১১ বছর পর্যন্ত কোনো ডক্-

ইয়ার্ড ছিল না। আগেকার মতো কলকাতায় আসাও বন্ধ ছিল পূর্ব-বাঙলার তিন লক্ষ জলযানের।

দেশভাগের সময় পূর্ব-বাঙলার সরকারী রাজস্ব ছিল মাত্র ১৬'৮৬ কোটি টাকা; আর জনসংখ্যা সাড়ে চার কোটি। বিক্রয়-কর কেন্দ্রের কুক্ষিগত। ১৯৪৯-৫০, ১৯৫০-৫১, ১৯৫১-৫২ সালে যথাক্রমে ৩'৪৩, ২'৮৩ ও ২'৫৯ কোটি টাকা রাজস্বখাতে ঘাটতি চলতে থাকে।

প্রাদেশিক সরকার আয়কর এবং তামাক, চা ও সুপারির ওপর অন্তঃশুল্কের অংশ পায়। কিন্তু ন্যায়বিচার পায় না। যথা, নিয়ম হলো, কেন্দ্রীয় অঞ্চলে আয়কর আদায় হলে প্রাদেশিক সরকার তার ভাগ পাবে না। আসলে দেখা গেল পূর্ব-বাঙলায় ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের অনেকেরই হেড-অফিস করাচিতে, তাই তাদের আয়করের অংশ থেকে পূর্ববঙ্গ বঞ্চিত। অন্তঃশুল্ক সম্বন্ধেও অভিযোগ ছিল যে পূর্ববঙ্গ থেকে আদায়ীকৃত শুল্ক সেখানকার জন্যেই ব্যয়িত হওয়া উচিত ছিল। ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত সেখানে মোট রাজস্ব-ঘাটতি ২২ কোটি টাকা, উন্নয়ন পরিকল্পনা কিছুই হাতে নেওয়া যায়নি।

১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত কেন্দ্রীয় রাজস্ব থেকে পশ্চিম-পাকিস্তান পেয়েছে ১০০০ কোটি টাকা, পূর্ববঙ্গ ১২৬ কোটি টাকা, কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিম-পাকিস্তানে মূলধন নিয়োগ করেছেন ২১০ কোটি টাকা, পূর্ববঙ্গে ৬২ কোটি টাকা, প্রাদেশিক সরকার কেন্দ্রীয় অনুদান পেয়েছে পশ্চিম-পাকিস্তানে ৫৪ কোটি টাকা এবং পূর্ববঙ্গে ১৮ কোটি টাকা; বৈদেশিক সাহায্যের বণ্টন হয়েছে পশ্চিমে ৭৫ কোটি টাকা, পূর্বে ১৫ কোটি টাকা।

পাকিস্তানের রাজনীতিতেও কিন্তু একের-পর-এক পরিবর্তন ঘটে যাচ্ছে। জিন্নাহ্‌র মৃত্যুর পর খাজা নাজিমুদ্দিনকে ডেকে গভর্ণর জেনারেলের তখ্‌তে বসানো হলো ক্ষমতা সঙ্কুচিত করে। ১৯৫১ সালের অক্টোবরে লিয়াকৎ আলি খুন হলেন। নাজিমুদ্দিন প্রধানমন্ত্রী হলেন। প্রাক্তন ভারতীয় 'অডিট এণ্ড একাউন্টস সার্ভিসে'র অফিসার গোলাম মহম্মদ গভর্ণর জেনারেল হলেন এবং তাঁর জায়গায় অর্থমন্ত্রী হলেন আর একজন অনুরূপ পাঞ্জাবী প্রাক্তন অফিসার, চৌধুরী মহম্মদ আলি। এইভাবে দুটি ব্যাপার ঘটল। প্রথমত, রাষ্ট্রযন্ত্র আমলাতন্ত্রের কুক্ষিগত হলো; দ্বিতীয়ত, রাষ্ট্রযন্ত্রে পাঞ্জাবীদের প্রাধান্য কায়েমী হলো। গোলাম মহম্মদ রাজনৈতিকদের নিয়ে খেলেছেন। নাজিমুদ্দিনকে সরিয়ে বসিয়েছেন বগুড়ার মহম্মদ আলিকে; মহম্মদ আলিকে সরিয়ে বসিয়েছেন

চৌধুরী মহম্মদ আলিকে। পূর্ব-বাঙলাকে জব্দ করবার নামে পশ্চিম-পাকিস্তানের বিভিন্ন প্রদেশকে মিশিয়ে একটি 'ইউনিট' করেছেন; আর সেইটিকেই ব্যবহার করা হয়েছে পশ্চিম-পাকিস্তানের অন্যান্য সংখ্যালঘু জাতিগুলির ওপর পাঞ্জাবী প্রাধান্য নিশ্চিত করার জন্য।

আর কয়েকটি ঘটনা মনে রাখা প্রয়োজন। স্বাধীনতার অব্যবহিত পূর্বের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এবং ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগ হিন্দু ও মুসলমানের মনে পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাসের গভীর ক্ষত সৃষ্টি করেছিল। দেশভাগের সঙ্গে সঙ্গেই উভয় দেশেই সংখ্যালঘুর দেশত্যাগ শুরু হয় ও চলতে থাকে। পাঞ্জাবের ব্যাপক দাঙ্গা পশ্চিমাঞ্চলে জনবিনিময় সম্পূর্ণ করে দেয়; পূর্বাঞ্চলে তা ঘটেনি। কিন্তু কাশ্মীর নিয়ে ভারত-পাক যুদ্ধ এবং ১৯৫০ সালের ভয়াবহ দাঙ্গা পূর্ব ও পশ্চিম বঙ্গে সংখ্যালঘুর দেশত্যাগ ত্বরান্বিত করে তুলল। সংখ্যাতত্ত্বের হিসাবে হয়তো দেখা যাবে, যে-পরিমাণ মুসলমান পশ্চিমবঙ্গ ছেড়ে গেছেন পূর্ববঙ্গ থেকে হিন্দু এসেছেন তার চেয়ে বেশি বছরের পর বছর ধরে ঢেউয়ের পর ঢেউয়ে। সংখ্যার হিসাবের চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হলো যে-পূর্ববঙ্গে বিত্তশালী হিন্দু মূলত দেশত্যাগ করে চলে এলেন। মুস্লিম সাম্প্রদায়িক নেতৃত্ব পূর্ববঙ্গে সাধারণ মুসলমানের কাছে যে-প্রচার এতদিন সাফল্যের সঙ্গে চালিয়ে এসেছে যে, সাধারণ মুসলমানের দুর্দ্দশার জন্য হিন্দু জমিদার, মহাজন, ব্যবসায়ী-কারবারিরাই দায়ী, সে-প্রচারের ভিত্তিই গেল নষ্ট হয়ে। আঙুল দিয়ে দেখাতে গেলে যেসব থেকে-যাওয়া হিন্দু চোখে পড়ে অর্থনৈতিক সামাজিক দিক থেকে তারা সাধারণ মুসলমানেরই সগোত্র।

১৯৫২ সাল থেকে পাকিস্তানে খাদ্যসমস্যা গুরুতর আকার ধারণ করতে আরম্ভ করে। সরকারী মহল থেকে বিভ্রান্তিমূলক প্রচার চালানো সত্ত্বেও ক্রমেই ব্যাপারটা পরিষ্কার হতে থাকে যে, খাদ্যোৎপাদনের ঘাটতির আসল কারণ বন্যা ও অনাবৃষ্টি, খাল সম্পর্কে অবহেলা, জমির অচল মালিকানা প্রথা, আমলাতান্ত্রিক অকর্মণ্যতা, ব্যাপক দুর্নীতি এবং সরকারী উপেক্ষা। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় পূর্ববাঙলায় কৃষি যান্ত্রীকরণের পরিকল্পনা কার্যত রূপায়িত হলো না, সেচ-পরিকল্পনা সামান্যই এগোলো, মধ্যস্বত্ববিলোপের আইন বরিশাল জেলার দুটি মাত্র তহশিলে প্রয়োগ করা হলো।[8]

আর একটি বিষয়ও লক্ষ্য করা প্রয়োজন। পাকিস্তান সরকার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে সাহায্য নিতে আরম্ভ করেছে ১৯৫১ সালের ৯ই

ফেব্রুয়ারি থেকে যখন প্রথম কারিগরি সহযোগিতা-চুক্তি সই হয়। এই যে 'এইড' বা সাহায্য নেওয়া শুরু হয় তা ধাপেধাপে এগিয়ে পাকিস্তানের অর্থনীতি ও রাজনীতিকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধেছে। এর প্রাথমিক বৈশিষ্ট্য ছিল অন্য কারো কাছ থেকে সাহায্য পেতে হলে পূর্বাহ্নে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকারের অনুমতি নিতে হবে। এই 'সাহায্যে'র মূল উদ্দেশ্য ছিল প্রথমত গ্রহিতাকে রাজনীতিগত ভাবে কুক্ষিগত করা, দ্বিতীয়ত প্রতিদ্বন্দ্বী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে এলাকা ছাড়া করা, তৃতীয়ত ব্যাবসায়িক লুণ্ঠনের পথ প্রশস্ত করা।

অন্য এক বিশেষ কারণেও পাকিস্তানকে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের প্রয়োজন ছিল। সেটা হচ্ছে, বিশ্বজোড়া সোবিয়েত ও চীন বিরোধী যুদ্ধচুক্তি ও যুদ্ধঘাঁটি নির্মাণের কাজে পাকিস্তানকে তার চাই। পায়ে পায়ে কাজ এগোতে লাগলো।

ডালেস ও ষ্ট্যাসেন ১৯৫৩ সালের মে মাসে করাচি এলেন। কিছু পরে তুরস্কের যুক্তরাষ্ট্রের মিশনের সহকারী নেতা ঘুরে গেলেন। তারপর এলেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধিসভায় সমর-বিভাগীয় কমিটির ৭ জন সদস্য। সেপ্টেম্বরে জেনারেল ইস্কান্দার মির্জা ও সেনাবিভাগের প্রধান জেনারেল আয়ুব খান যুক্তরাষ্ট্রে হাজির হলেন। নভেম্বর মাসে প্রেসিডেণ্ট গোলাম মহম্মদ চিকিৎসার জন্য যুক্তরাষ্ট্রে এলেন। প্রেসিডেণ্ট আইজেনহাওয়ার ও ডালেসের সঙ্গে তাঁর গোপন পরামর্শ ঘটল ১২ই নভেম্বর ১৯৫৩। লক্ষ্য—যুদ্ধচুক্তি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পাবে যুদ্ধঘাঁটি, যুদ্ধে 'কামানের খোরাক' সৈন্যবাহিনী ও রাজনৈতিক সমর্থন, তথা বশ্যতা। পাকিস্তান পাবে খাদ্য, সমরসম্ভার ও সাহায্য।

২রা এপ্রিল, ১৯৫৪ তুরস্কের সঙ্গে চুক্তি; মে, ১৯৫৪ পাক-মার্কিন চুক্তি; ৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৫৪ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া যৌথ নিরাপত্তা চুক্তি; ১৯৫৫ সালে এলো বাগদাদ চুক্তি। সোবিয়েত ও চীনকে অবরুদ্ধ করার যুদ্ধচক্রে পাকিস্তান এশিয়াতে কেন্দ্রপ্রস্তরের স্থান গ্রহণ করল।

১৯৫১ সাল থেকে ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত পাকিস্তান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে প্রায় ৩০০ কোটি ডলার (বা প্রায় ১৫০০০ কোটি টাকা) অর্থনৈতিক সাহায্য পেয়েছে। আর সামরিক সাহায্য, গোপন তথ্য হলেও আন্দাজ করা হয়, ১৫০ থেকে ২০০ কোটি ডলার (বা ৭৫০ থেকে ১০০০ কোটি টাকা) মূল্যের হবে।[৫]

সরকারী হিসেবেই বিবৃত হয়েছে যে, পাকিস্তানে দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে (১৯৬০/৬১—১৯৬৪/৬৫), পি. এল. ৪৮০ ও ইণ্ডাস বেসিন ওয়ার্কস বাবদের খরচ মিলিয়ে মোট বৈদেশিক সাহায্য এসেছে ১১৬৫ কোটি টাকা (সামগ্রিক খরচের

৪৮%) ও তৃতীয় পরিকল্পনাকালে (১৯৬৫/৬৬—১৯৬৯/৭০) মোট বৈদেশিক সাহায্যের আমদানি ১২৭৪'৩ কোটি টাকা (সামগ্রিক খরচের ৪৫%)।[৬]

এর রাজনৈতিক মূল্য দেওয়া শুরু হলো খাজা নাজিমুদ্দিনকে তাড়িয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তদানীন্তন রাষ্ট্রদূত বগুড়ার মহম্মদ আলিকে প্রধানমন্ত্রী করা দিয়ে। ক্রমে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে পাকিস্তান মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী রাজনীতির অন্যতম বিশ্বস্ত তল্পিবাহকে পরিণত হলো। এদিকে আভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে সামরিক কর্তাব্যক্তি ও আমলাতন্ত্রের প্রভুত্ব অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পেল। এরই পরিণতি অক্টোবর ৭-৮, ১৯৫৮ সামরিক ক্যু-দে-তা; শাসনতন্ত্র খারিজ, প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মির্জার শাসনভার স্বহস্তে গ্রহণ। ২৭এ অক্টোবর ১৯৫৮, আর এক ক্যু; ইস্কান্দার মির্জাকে হঠিয়ে জেনারেল আয়ুব খান ক্ষমতা স্বহস্তে গ্রহণ করলেন।

এর পাশাপাশি গড়ে উঠল বৈদেশিক সাহায্যের সমস্ত মধুটুকু শুষে নিয়ে ২২টি একচেটিয়া ধনিক পরিবার, যাদের মধ্যে পুরোনো বড়ো পুঁজিপতি-জমিদারদের সঙ্গে যোগ দিল কিছুকিছু সমরনায়ক ও বড়ো অফিসার যাঁরা রাষ্ট্রক্ষমতা ব্যবহার করে বৃহৎ ধনিকগোষ্ঠীর ক্ষুদ্র চক্রে স্থান করে নিলেন। উদাহরণস্বরূপ আয়ুবপুত্র ক্যাপ্টেন গওহর আয়ুবের নামোল্লেখ করা যায়। তিনি ১৯৬১ সালে সামরিক বাহিনী থেকে পদত্যাগ করে, জেনারেল মোটর্সের দাক্ষিণ্যে গান্ধার ইণ্ডাষ্ট্রীজ গড়ে তোলেন। ১৯৬১-৬৫ এই চার বছরে আয়ুব পরিবারে মোট সম্পদ ২৫ কোটি টাকারও অধিক হয়েছে বলে জনশ্রুতি।[৭]

আর এই বৈদেশিক সাহায্যের অংশ পূর্ব-বাঙলার ভাগ্যে কি জুটেছে ?

বৈদেশিক পর্যবেক্ষকদের মতে ১৯৫০/৫১—১৯৫৪/৫৫ সালের মধ্যে কেন্দ্রীয় উন্নয়নমূলক ব্যয়ের ২০% পূর্ব-বাঙলায় ব্যয়িত হয়েছে; ১৯৬৫/৬৬—১৯৬৯/৭০ সালে, অর্থাৎ তৃতীয় পরিকল্পনাকালে এর পরিমাণ সবচেয়ে বেশি অর্থাৎ ৩৬%। আর বেসরকারী মূলধন নিয়োগের অংশ আরও কম, মোটে ২৫%।[৮]

সরকারী বিবরণী থেকে নিম্নলিখিত তথ্য পাওয়া যাচ্ছে :—

আঞ্চলিক উন্নয়নমূলক ব্যয় (কোটি টাকার হিসাবে)[৯]

	দ্বিতীয় পরিকল্পনা		তৃতীয় পরিকল্পনা	
	পূর্ব পাকিস্তান	পশ্চিম পাকিস্তান	পূর্ব পাকিস্তান	পশ্চিম পাকিস্তান
সরকারী খাতে	৬৭০	১০৮০	১১৩০	১৩৭০
বেসরকারী খাতে	৩০০	১০৭০	৫৫০	১৬০০
মোট	৯৭০	২১৫০	১৬৮০	২৯৭০
শতকরা অংশ	৩১	৬৯	৩৬	৬৪

বিদেশী পর্যবেক্ষকরা দেখাচ্ছেন যে রপ্তানি মারফৎ পাকিস্তানের বৈদিশিক মুদ্রা আয়ের ৫০% থেকে ৭০% ভাগ হয় পূর্ব-বাঙলার দৌলতে; কিন্তু পূর্ব-বাঙলায় বিদেশী দ্রব্যের আমদানি মোট আমদানির ২৫% থেকে ৩০% ভাগ। অন্তঃশুল্ক ও কোটাপ্রথার মারফৎ পূর্ব-বাঙলাকে পশ্চিম-পাকিস্তানের বন্দীবাজারে বা "captive market"এ পরিণত করা হয়েছে। ১৯৬৮/৬৯ সালেই পশ্চিম পাকিস্তান পূর্ব-বাঙলা থেকে যা কিনেছে তার ৫০% বেশি বিক্রি করেছে। বস্তুত পূর্ব-বাঙলা থেকে পশ্চিম-পাকিস্তান অত্যন্ত সুশৃঙ্খলভাবে লুণ্ঠন চালিয়েছে গত ২৪ বছর ধরে। সরকারী হিসাব থেকেই জানা যায় যে, ১৯৪৮/৪৯ থেকে ১৯৬৮/৬৯ সাল পর্যন্ত প্রায় ২৬০ কোটি ডলার (বা প্রায় ১৩০০ কোটি টাকা) পূর্ববঙ্গ থেকে পশ্চিম-পাকিস্তানে স্থানান্তরিত হয়েছে।[১০]

ওঁরাই আবার দেখিয়েছেন যে, রাষ্ট্র পরিচালনায় সামরিক অফিসাররা সবাই এবং সিভিল সার্ভিসের প্রধান কর্মচারীদের ৮৭% ভাগ হলেন পশ্চিম পাকিস্তানি। ১৯৬৬ সালে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রথম শ্রেণীর অফিসারদের মধ্যে বাঙালির সংখ্যা ২০% ভাগের বেশি ছিল না।[১১]

"পররাষ্ট্র দপ্তরের পার্লামেন্টারি সেক্রেটারি জনাব আবদুল আওয়াল ভুঁইয়া এক প্রশ্নোত্তরে পাকিস্তানের বৈদেশিক সারভিসে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানি কর্মচারীদের যে-সংখ্যা জানান তাতে দেখা যায়—

	পশ্চিম-পাকিস্তানি	পূর্ব-পাকিস্তানি
রাষ্ট্রদূতসহ প্রথমশ্রেণীর কর্মচারী	১৭৯	৫৮
দ্বিতীয় " "	১৯৬	৪৮
তৃতীয় " "	৫৮	১৭
চতুর্থ " "	৮৯	৮
মোট সংখ্যা	৫২২	১৩২ [১২]

ঢাকা সেন্ট্রাল জেলের ভেতরে আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবর রহমানের মামলার বিচার চলার সময়···আসামী পক্ষের উকিল জনাব জহিরুদ্দিন সরকারী পরিসংখ্যান এবং পাকিস্তানের বিবৃতিকে ভিত্তি করে পাকিস্তানের দুই অঞ্চলের মধ্যে বৈষম্যের বিষয়গুলি তুলে ধরেন।

দৃষ্টান্তস্বরূপ দুই অঞ্চলের চাকরির শতকরা হারের কথা বলা হয়েছিল"[১৩]

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়—	পশ্চিম-পাকিস্তান	৯১·৯%;	পূর্ব-পাকিস্তান	৮·১%
শিল্পমন্ত্রক —	"	৫৪·৩%	"	৪৫·৭%

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	—পশ্চিম-পাকিস্তান	৭৭.৫%;	পূর্ব-পাকিস্তান	২২.৫%
শিক্ষা দপ্তর	—	,,	৭২.৭%;	,,	২৭.৩%
তথ্য মন্ত্রণালয়	—	,,	৭৯.৯%;	,,	২০.১%
স্বাস্থ্য মন্ত্রীদপ্তর	—	,,	৮১%;	,,	১৯%
কৃষি মন্ত্রণালয়	—	,,	৭৯%;	,,	২১%
আইন মন্ত্রণালয়	—	,,	৬৫%;	,,	৩৫%

সরকারী দলিল থেকেই জানা যায় যে পূর্ববাঙলায় ১৯৫১ থেকে ১৯৬১ সালের মধ্যে কৃষিনির্ভর লোকের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৮৩% থেকে ৯৫%; পূর্ব-বাঙলার একটি সাধারণ-কৃষক-পরিবারের মোট খরচের ৪৫% ভাগ খাদ্যশস্য কিনতেই বেরিয়ে যায়; দুধ, ঘি, তেল্ এবং স্নেহজাতীয় খাদ্যের জন্য পূর্ব-বাঙলার সাধারণ গ্রাম্য পরিবার তাদের মোট আয়ের ৫% ভাগ মাত্র খরচ করতে পারে। পূর্ব-বাঙলা আজ কৃষিঋণের জন্য সম্পূর্ণভাবে সরকার ও সরকার-সৃষ্ট কৃষিব্যাঙ্কের ওপর নির্ভরশীল। হিসেবে জানা যায় যে, ১৯৪৭-৪৮ থেকে ১৯৫৯-৬০ পর্যন্ত পশ্চিম-পাকিস্তানে কৃষিতে ঋণ বাবদ দেওয়া হয়েছে ২১ কোটি ৬৩ লক্ষ টাকা। অন্যদিকে পূর্ব-বাঙলায় দেওয়া হয়েছে মাত্র ১ কোটি ৩২ লক্ষ টাকার কিছু বেশি।[১৪]

১৯৬৩ সালের জুন মাসে চট্টগ্রামে ভয়াবহ সাইক্লোনের পর চট্টগ্রাম বন্দর ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বহুদিন পর্যন্ত আয়ুব সরকার বন্দরটির সংস্কার করে উঠতে পারেনি। ফলে আমেরিকান জাহাজ কোম্পানিগুলি, চট্টগ্রাম বন্দরে জাহাজ ভিড়তে অযথা দেরি হয়—এই কারণ দেখিয়ে তাদের চার্জ শতকরা ৪০ ভাগ বাড়িয়ে দিয়েছিল। অন্যান্য বিদেশী কোম্পানীও এইভাবে দর বাড়াবার জন্য চাপ দেওয়ার ফলে পূর্ব-বাঙলার অর্থনীতি আজ এক সঙ্কটের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে।[১৫] বন্যা জলোচ্ছ্বাসের প্রকোপ ঠেকাবার জন্য পূর্ব-বাঙলার সমুদ্রতীরে যে-বিরাট বাঁধ দেবার প্রতিশ্রুতি আয়ুব সরকার দিয়েছিল, তার কাজ বিশেষ কিছু এগোয়নি। অথচ পশ্চিম-পাকিস্তানে সিন্ধুউপত্যকা পরিকল্পনা সমাপ্ত হবার পর আবার হাজার কোটি টাকার "তারবেলা পরিকল্পনা" চালু হয়। এর জন্য অর্থ বা বৈদেশিক সাহায্যের অভাব হয়নি। বাঙালি স্বাভাবিক-ভাবেই ভেবেছে, তারবেলায় পরিকল্পনা, আর আমার বেলায় শূন্য।

এর পাশাপাশি পশ্চিম-পাকিস্তানের সঙ্গে পূর্ব-বাঙলার শিক্ষার ক্ষেত্রে তুলনামূলক অগ্রগতির চিত্রটি লক্ষ্য করা প্রয়োজন:

প্রাথমিক শিক্ষা	পূর্ব-বাঙলা স্কুলের সংখ্যা	ছাত্র-সংখ্যা লক্ষ	পশ্চিম-পাকিস্তান স্কুলের সংখ্যা	ছাত্র-সংখ্যা লক্ষ
১৯৪৭/৪৮	২৯,৬৩৩	২৭'৬	৮,৪১৩	৭'৭
১৯৫৭/৫৮	২৬,৫৭৯	২৯'০	১৬,৯৩০	১৭'২
১৯৬৮/৬৭	২৮,২২৫	৪৬'০	৩৪,৬৭৮	৩৩'৮
মধ্যশিক্ষা				
১৯৪৭/৪৮	২১৭৫	১'৮৩	২,১৯০	২'২১
১৯৫৭/৫৮	১৩৯২	২'৬৯	১৮৭০	৩'৯৯
১৯৬৭/৬৮ (হিসাব)	১৭৩০	৭'০৫	৩১৬০	৮'০৫
উচ্চমাধ্যমিক				
১৯৪৭/৪৮	১৩০৬	০'৭৬	৪০৮	০'৫৮
১৯৫৭/৫৮	১৬৩৮	১'১৫	৯৪৬	১'৪৬
১৯৬৫/৬৬	২৪২৩	—	১৬৫৮	—
১৯৬৬/৬৭	—	২'৭৫	—	২'৭৩

(ছাত্র ভর্তির ক্ষেত্রে প্রাথমিক শিক্ষার বেলায় প্রথম থেকে চতুর্থ শ্রেণী, মধ্যশিক্ষার বেলায় ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণী ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষার বেলায় নবম থেকে দশম শ্রেণীর ছাত্রদের ধরা হয়েছে।)

কলেজী শিক্ষা	পূর্ব-বাঙলা কলা ও বিজ্ঞান কলেজ	ছাত্র ভর্তি (হাজার)	পশ্চিম-পাকিস্তান কলা ও বিজ্ঞান কলেজ	ছাত্র ভর্তি (হাজার)
১৯৪৭/৪৮	৫০	১৮'৬	৪০	১৩'৫
১৯৫৭/৫৮	৮০	৩৭'০	৯৪	৫৫'৫
১৯৬৬/৬৭	১৭৩	১,৩৯'৬	২০৮	১,৪৯'৬

দেশভাগের সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় এই দুটি মাত্র পুরনো বিশ্ববিদ্যালয় ছিল পাকিস্তানে। তারপর ১৯৪৭ সালে সিন্ধু, ১৯৫০ সালে পেশোয়ার ও ১৯৫১ সালে করাচি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয় পশ্চিম-পাকিস্তানে। পূর্ব-বাঙলায় আর একটি মাত্র, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৫৪ সালে। এরপর চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

এইসূত্রে শিক্ষাখাতে সরকারী ব্যয়ের হিসাবও প্রণিধানযোগ্য।

শিক্ষা খাতে সরকারী ব্যয় (লক্ষ টাকা)

		পূর্ব-বাঙলা	পশ্চিম-পাকিস্তান
প্রাথমিক শিক্ষা	১৯৪৭/৪৮	৩৭	১০৯
	১৯৫৭/৫৮	৩০৯	৫০৯
	১৯৬৭/৬৮	১০১৫	১৬১৪
মাধ্যমিক শিক্ষা	১৯৪৭/৪৮	২৪	৫১
	১৯৫৭/৫৮	১২০	২৬৪
	১৯৬৭/৬৮	৬০৬	৭১৯
কলা ও বিজ্ঞান কলেজ	১৯৪৭/৪৮	১০'৩	১৮'৬
	১৯৫৭/৫৮	৬৩'৫	১২৫'৩
	১৯৬৭/৬৮	১৭১'৮	৪২৭'১
বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা	১৯৪৭/১৯৬৭ (মোট)	২১,৬৮'৭	৩১,৭৯'৮ [১৬]

উপরোক্ত তথ্যগুলি থেকে পাকিস্তান সরকারের পূর্ব-বাঙলার প্রতি বিমাতৃসুলভ ব্যবহার সম্বন্ধে সামান্যতম সন্দেহেরও অবকাশ থাকে না। কিন্তু তারই সাথে সাথে আরও একটি বিষয় লক্ষ্যণীয়। এই ২৪ বছরের মধ্যে, যত ধীরগতিতে হোক না কেন, পূর্ববাঙলায় শিক্ষিত মানুষের সংখ্যা বেড়েছে, ছাত্র-সংখ্যা বেড়েছে। সেই সঙ্গে ছাত্র-বিক্ষোভও বেড়েছে। একদিকে বেড়েছে বেকারি ঃ কারণ, পূর্ব-বাঙলায় শিল্পবিকাশের গতি এতই মন্থর যে প্রায় স্তব্ধ বলেই মনে হয়; অপরদিকে সরকারী চাকরিতে প্রবেশের দ্বারও প্রায় অবরুদ্ধ। কিন্তু বিক্ষোভের তীব্রতা বেড়েছে আরও একটি কারণে,—তা হচ্ছে পাকিস্তানি শাসকমণ্ডলীর পূর্ববাঙলার বিরুদ্ধে সাংস্কৃতিক অভিযান।

সাংস্কৃতিক অভিযানের মূল লক্ষ্য হলো বাঙলাভাষা। বাঙলাভাষা হিন্দুয়ানি দোষে দুষ্ট বলে ঘোষণা করে তাঁরা এর গুরুত্বকে সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করলেন। প্রথম পর্যায়ে বাঙলাভাষাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দিতে অস্বীকার করা হলো। দ্বিতীয়ত, প্রস্তাব করা হলো বাঙলাভাষাকে আরবি বা রোমান হরফে লিখতে হবে। তৃতীয়ত, বাঙলাভাষার মধ্যে এন্তার আরবি-ফারসি কথা ঢুকিয়ে বাঙলার শুদ্ধিকরণের চেষ্টা চলতে থাকল।

শাসকশ্রেণীর এ-কূটচক্রান্ত সফল হতে পারেনি বাঙালির প্রতিরোধের সামনে। এ-প্রতিরোধ সংগ্রামে প্রথম আগুয়ান হন ছাত্রসমাজ। ১৯৫২ সালের ২১এ ফেব্রুয়ারি, পুলিশের গুলিতে প্রাণ দিলেন ছাত্রশহীদ আবদুল জব্বার,

রফিউদ্দিন আহমেদ, আবুল বরকত প্রভৃতি। ঐদিন মৃতের সংখ্যা সরকারী মতে ৯ জন, বেসরকারী হিসাবে ৩৯ জন। কিন্তু লড়াইয়ের এ-ফুল্‌কি ছাত্ররা জ্বালালেও, এ-দাবানলে পরিণত হয়ে জাতির অন্যান্য অংশকেও টেনে এনেছিল। শাসকশ্রেণীকে সাময়িকভাবে পেছু হঠতে হয়েছে। ২১এ ফেব্রুয়ারি পূর্ব-বাঙলায় অমর হয়ে রয়েছে শহীদ-দিবস—জাতীয়-দিবস রূপে। কিন্তু ২১এ ফেব্রুয়ারি সবচেয়ে বড়ো সাফল্য এইখানেই যে সমস্ত পূর্ব-বাঙলার মানুষকে বিদ্যুৎচমকের মতো এক ঝলকে হুঁসিয়ার করে দিল তাদের জীবনের মহাসম্পদ সম্পর্কে, যার অবহেলা সহ্য করা চলে না।

পাকিস্তানের শাসকশ্রেণী ভুলে গিয়েছিলেন যে মানুষের সঙ্গে মানুষের মনের কথার দেয়া-নেয়ার হাতিয়ার হলো তার ভাষা। এই ভাষা সে শোনে মায়ের কোলে শুয়ে, এই ভাষা সে শেখে মা-বাবা-ভাই-বোন তার নিকটতম আত্মীয়বন্ধুদের কাছ থেকে, এই ভাষায় সে নিজেকে প্রকাশ করে, নিজেকে খুঁজে পায়। এই ভাষা কালজয়ী, অতীতের ঐতিহ্য সঞ্চয় করে ধরে রেখেছে তারই জন্য। তাঁরা হিসেবের মধ্যে ধরেননি যে সাধারণ বাঙালি মুসলমান তার ধর্মীয় চিন্তাও করেছে এই বাঙলা ভাষাতে। আরও ভুলেছিলেন যে সৈয়দ আলাওল থেকে নজরুল পর্যন্ত বরণীয় লেখক ও শতশত লোককবি ও গীতিকার। এই বাঙলাভাষাকেই সমৃদ্ধ করেছেন তাঁদের অবদানে। পূর্ব-বাঙলার মুসলমান বুঝেছেন,—শাসকশ্রেণী বোঝেননি,—বাঙলাভাষা শুধু হিন্দুর নয়, হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ-খৃস্টান সমস্ত বাঙালির ভাষা। আর তাঁরা এই সংগ্রামে আরও আগ্রহী হয়েছেন যখন দেখেছেন যে পূর্ব-বাঙলার মানুষের ওপর শোষণ ও শাসন বজায় রাখবার সুচতুর কৌশলই হলো এই সংস্কৃতি ধ্বংসের উদ্যোগ।

সংগ্রাম চলতে থাকে। সাম্প্রদায়িকতাকেও ধীরে পেছু হঠতে হয়। ১৯৫১ সালের মার্চ মাসে জন্মাল ইউথ লীগ অসাম্প্রদায়িক বিপ্লবী রণধ্বনি নিয়ে। ১৯৫৩ সালের জানুয়ারিতে রাজনীতিতে আবির্ভূত হলো পাকিস্তান গণতন্ত্রী দল। ১৯৫৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ফজ্‌লুল হকের নেতৃত্বে গঠিত হলো কৃষক শ্রমিক পার্টি। ১৯৪৯ সালের ২৩এ জুন নারায়ণগঞ্জে মুস্লিম লীগ কর্মিদের এক সম্মেলন থেকে জন্ম নেয় পূর্ব-পাকিস্তান আওয়ামি মুস্লিম লীগ। এর প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি ছিলেন মৌলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানি। পার্টির অসাম্প্রদায়িকতার চিহ্নস্বরূপ নাম থেকে "মুস্লিম" শব্দটি বাদ দেওয়া হয় ১৯৫৫ সালে। পূর্ব-পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টিকে অবশ্য ১৯৫৪ সাল থেকেই বেআইনি অবস্থায়

কাজ করতে হয়। এ-অসুবিধা সত্ত্বেও ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে একলা লড়ে ৪টি আসন জয় করেছিল।

১৯৫৩ সালের ডিসেম্বরে ২১ দফা দাবির ভিত্তিতে কৃষক শ্রমিক পার্টি ও আওয়ামি মুস্লিম লীগ যুক্তফ্রণ্ট গঠন করে ১৯৫৪ সালের নির্বাচনী লড়াইয়ে নামবার জন্য। এই নির্বাচনে মুস্লিম লীগ পর্যুদস্ত হয়; মোট ৩০৯টি আসনের ৯টি মাত্র তারা সংগ্রহ করতে সমর্থ হয়। ২১৮টি আসন জয় করে যুক্তফ্রণ্ট একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দলে পরিণত হয়।

গভর্ণর জেনারেল গোলাম মহম্মদের ষড়যন্ত্রে অল্পকালের মধ্যেই যুক্তফ্রণ্ট সরকারের প্রধানমন্ত্রী ফজলুল হক স্বগৃহে অন্তরীণ হন। একদিকে সন্ত্রাস, অপরদিকে প্রলোভন ও উৎকোচের সাহায্যে তিনি রাজনৈতিক আবহাওয়াকে সম্পূর্ণ বিষাক্ত করে তোলেন। স্বীকার করতেই হবে যে রাজনৈতিক নেতাদের সুবিধাবাদ, নীতিহীনতা ব্যক্তিকেন্দ্রিক দলাদলি যুক্তফ্রণ্টের নির্বাচনী বিজয়কে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে সাহায্য করে।

কিন্তু নেতাদের ব্যর্থতা সত্ত্বেও নির্বাচনী প্রতিশ্রুতিগুলি যে-রাজনৈতিক জমিতে ছড়ানো হয়েছিল তাকে উৎপাটন করা অত সহজ ছিল না। ২১ দফা কার্যক্রমের ১৯ দফায় ছিল—"ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাব অনুযায়ী পরিপূর্ণ স্বায়ত্বশাসন অর্জন করতে হবে এবং দেশরক্ষা, বৈদেশিক সম্পর্ক এবং মুদ্রা-ব্যবস্থা ছাড়া আর সমস্ত বিষয়ই পূর্ব-পাকিস্তানের এক্তিয়ারভুক্ত করতে হবে।" ১৮ বছর পরে সেই স্বায়ত্বশাসনের দাবির চারাগাছটি এক বিরাট মহীরুহে পরিণত হয়েছে।

নেতাদের ব্যর্থতা সত্ত্বেও সংগ্রাম চলতে থাকে। নির্বাচনের পূর্বে আওয়ামি মুশলিম লীগ পাক-মার্কিন চুক্তির তীব্র নিন্দা করা সত্ত্বেও, আওয়ামি মুসলিম লীগ নেতা সোহরাওয়ার্দ্দি প্রধানমন্ত্রী হিসাবে পার্টির প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করতে থাকাতে বিরোধ চরমে ওঠে ১৯৫৭ সালের ফেব্রুয়ারিতে কাগমারি সম্মেলনে। ঐ সালেরই জুলাই মাসে ঢাকা সম্মেলনে নতুন পার্টির জন্ম হয়, নাম ন্যাশনাল আওয়ামি পার্টি (ন্যাপ)। এ-পার্টির প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে ছিলেন মৌলানা ভাসানি, খান আবদুল গফর খান, খান আবদুল সামাদ খান, আচাকজাই, মিঃ জি. এম. সৈয়দ, মিঃ আবদুল মজিদ সিন্ধি, মিয়া ইফতিকারউদ্দিন প্রভৃতি। পার্টির মূল লক্ষ্যগুলি ঘোষণা করতে গিয়ে বলা হয়েছে: (ক) পাকিস্তানের উভয় অংশকেই পূর্ণ স্বায়ত্বশাসন দিতে হবে, কেন্দ্রীয় যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের

হাতে থাকবে মাত্র দেশরক্ষা, বৈদেশিক সম্পর্ক ও মুদ্রাব্যবস্থার ভার ; অন্যান্য বিষয় পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান সরকারের হাতে থাকবে। (খ) পশ্চিম পাকিস্তানে সাংস্কৃতিক ও ভাষাগত ঐক্য ও ভৌগোলিক অখণ্ডতা অনুযায়ী প্রদেশগুলিকে পুনরায় গঠন করতে হবে। (গ) পুনর্গঠিত প্রদেশগুলিতে একইরকম গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা তৈরি করা হবে, সেগুলি পশ্চিম পাকিস্তানের আঞ্চলিক যুক্তরাষ্ট্রে সংগঠিত হবে এবং সেই আঞ্চলিক যুক্তরাষ্ট্রের আইনসভায় কোনো এক প্রদেশের প্রতিনিধিসংখ্যা অন্য সমস্ত প্রদেশের মিলিত প্রতিনিধিসংখ্যার বেশি হতে পারবে না। এ-লক্ষ্যাবলীর মধ্যে জোটনিরপেক্ষ স্বাধীন বৈদেশিক নীতির কথাও বলা হয়।

রাজনৈতিক দলগুলির ব্যর্থতা চরমভাবে সূচিত হয় ১৯৫৮ সালে সামরিক একনায়কত্ব কায়েম হবার মধ্যে। কিন্তু সামরিক একনায়কত্ব সন্ত্রাস ও সুচতুর "মৌল গণতন্ত্র" "বেসিক ডেমোক্র্যাসির" পরিকল্পনা দিয়েও সংগ্রাম বন্ধ করতে সক্ষম হয় না। মার্শাল ল জারি, বিনাবিচারে গ্রেপ্তার, লাঠি, টিয়ার-গ্যাস, গুলি, ষড়যন্ত্র মামলা, সমস্ত কিছুর মধ্যে দিয়ে পূর্ব-বাঙলার জনতা রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা ও পক্বতা অর্জন করে এগোতে থাকেন।

সামরিক আইনের বিরুদ্ধে ১৯৬২ সালের মিলিত ছাত্র আন্দোলন একটা বিশিষ্ট ঘটনা। ১৯৬৫ ভারত-পাক যুদ্ধের সময় প্রতিক্রিয়াচক্র কোনো কোনো জায়গায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে দাঙ্গা বাধাতে সক্ষম হলেও, মোটামুটি পূর্ব-বাঙলা ভারতবিরোধী জেহাদে অংশ নেয়নি ; বরং তাশখন্দ চুক্তিকে স্বাগত জানিয়েছিল। ছোটবড়ো নানা আন্দোলন চরম আকার ধারণ করে ১৯৬৮ সালে, যার ঢেউয়ের সামনে রাজা ক্যানিউটের মতোই ফিল্ড মার্শাল আয়ুব খানকে সরে দাঁড়াতে হয়েছিল।

শাসকচক্র কিন্তু এতো সহজে ছাড়তে রাজি ছিল না। আয়ুবের স্থান নিলেন ইয়াহিয়া খান। মুখে মধুর বাণী ; প্রতিশ্রুতি দিলেন 'মার্শাল ল' তুলে নেওয়া হবে, সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচন হবে, নির্বাচিত সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করে তিনি শাসকের গদি থেকে সরে দাঁড়াবেন।

তারপরের সাম্প্রতিক ইতিহাস সকলেরই জানা ১৯৬৬ সালে প্রণীত ৬ দফা দাবির ভিত্তিতে শেখ মুজিবর রহমানের নেতৃত্বে আওয়ামি লীগ ১৬৯টি আসনের ১৬৭টি আসনই জয় করে। এই ৬ দফা দাবি নিশ্চয়ই উদ্ধৃতির দাবি রাখে। (১) পাকিস্তানের সংবিধান যুক্তরাষ্ট্রীয় এবং পার্লামেণ্টারি হওয়া চাই এবং সর্বজনীন

ভোটাধিকারের ভিত্তিতে আইনসভা নির্বাচিত হবে। (২) কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা দেশরক্ষা ও বৈদেশিক নীতি পরিচালনা—এই দুটি কাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে। (৩) পাকিস্তানের দুই খণ্ডের মুদ্রা পৃথক হবে এবং এক খণ্ডের মুদ্রা অন্য খণ্ডের মুদ্রার সঙ্গে পরিবর্তন করার সহজ ব্যবস্থা রাখতে হবে। যদি তা সম্ভব না হয় তবে বিকল্প ব্যবস্থা হিসাবে পাকিস্তানে একই ধরনের মুদ্রা প্রচলন করে পূর্বখণ্ড থেকে পশ্চিমখণ্ডে যাতে মূলধন পাচার করা সম্ভব না হয়, তার ব্যবস্থা করতে হবে। (৪) কর স্থাপন এবং অর্থ আদায় করার ক্ষমতা অঙ্গ-রাজ্যগুলিকে দেওয়া হবে। কেন্দ্রীয় সরকারকে তার কার্য পরিচালনার জন্য রাজ্য সরকারগুলি প্রয়োজনীয় অর্থপ্রদান করবে। (৫) বৈদেশিক মুদ্রা সম্পর্কে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের পৃথক হিসাব রাখতে হবে। কেন্দ্রীয় সরকারকে প্রয়োজনীয় মুদ্রা পাকিস্তানের দুই খণ্ডে সমান হারে অথবা অন্য কোনো নীতি অনুযায়ী প্রদান করবে। (৬) দেশরক্ষার ব্যাপারে পূর্ব-পাকিস্তানের স্বনির্ভরতা আনতে হবে। পূর্বখণ্ডে অস্ত্র উৎপাদনের একটি কারখানা এবং সামরিক শিক্ষা প্রদানের জন্য একটি শিক্ষায়তন গড়ে তুলতে হবে। কেন্দ্রীয় নৌবাহিনীর প্রধান দপ্তর পূর্ব পাকিস্তানে রাখা চাই।

এই ৬ দফা দাবি পাকিস্তান ভেঙে ফেলার দাবি ছিল না; এ-ছিল গত ২৪ বছরের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে গড়া পশ্চিম-পাকিস্তানি একচেটিয়া পুঁজিপতি-জমিদারতন্ত্র ও সামরিক গোষ্ঠীর অর্থনৈতিক শোষণ ও রাজনৈতিক শাসন থেকে মুক্তির দাবি—গণতন্ত্র ও প্রকৃত স্বায়ত্বশাসনের দাবি। এটা ঠিকই যে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর পার্টি, আওয়ামি লীগের তৈরি এই ৬ দফা দাবিতে গণতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রয়োজনীয় অন্যান্য দাবিগুলি ছিল না, যেমন ছিল ছাত্রদের জয়েণ্ট কাউন্সিল অফ একশনের ১১ দফা দাবিতে। তবু সমস্ত জাতির মূল অধিকারকে এই ৬ দফা ভাষা দিতে পেরেছিল; সমস্ত শ্রেণীর সমর্থনও সেইজন্যই এসেছিল এই দাবির পেছনে।

স্বভাবতই শাসকগোষ্ঠী স্বার্থ ছাড়তে রাজি ছিল না। ইয়াহিয়া খান জাতীয় এসেম্বলির সংখ্যাগুরুর দাবি অগ্রাহ্য করে অধিবেশনের তারিখ পেছিয়ে দিলেন। তারপর দিনের পর দিন ছল আলোচনা চালালেন মুজিবর রহমানের সঙ্গে যাতে মুজিবর ঘোষিত নীতি পরিত্যাগ করেন। ইতিমধ্যে পূর্ব-বাঙলায় সৈন্যসমাবেশ হতে থাকল, বিভিন্ন জায়গায় পাক সেনাবাহিনী নিরস্ত্র জনতার ওপর গুলি চালাল। ইস্টবেঙ্গল রেজিমেণ্ট ও ইস্টপাকিস্তান রাইফ্‌ল্‌সকে নিরস্ত্র করা হতে

থাকল। প্রতিবাদে শেখ মুজিবরের আহ্বানে সারা পূর্ব-বাঙলায় অভূতপূর্ব সাফল্যমণ্ডিত অসহযোগ আন্দোলন চলল। বস্তুতপক্ষে এই সময়ে পাকসরকার সম্পূর্ণ অকেজো হয়ে পড়েছিল। তারপর যখন পরিষ্কার বোঝা গেল পাক সৈন্য-বাহিনী সামগ্রিক আক্রমণ করতে উদ্যত, তখন ২৩এ মার্চ ছাত্ররা স্বাধীন বাঙলার পতাকা তুললেন; শেখ মুজিবর ঘোষণা করলেন. "আমি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হতে চাই না; আমি আমার জাতির স্বাধীনতা চাই।"

তারপর ২৫এ মার্চ নিষুতি রাত্রে ইয়াহিয়া খানের সামরিক বাহিনীর নির্মম আক্রমণ। আর পূর্ব-বাঙলার মানুষ দৃঢ়পণ হয়ে নামল সশস্ত্র আক্রমণের বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রতিরোধে।

এই হলো ইতিহাস; দীর্ঘ ২৪ বছরের শোষণ, পেষণ ও প্রতিরোধের ইতিহাস। বহু অভিজ্ঞতা, বহু যন্ত্রনা, বহু রক্তঢালা সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে পূর্ব-বাঙলার সাতকোটি বাঙালি, মুসলমান-হিন্দু-বৌদ্ধ খ্রীস্টান বাঙালি, তার স্বকীয়তা ও সত্তাকে খুঁজে পেয়েছে এবং তার জাতীয়তাকে প্রতিষ্ঠা করতে এগোচ্ছে। এই জাতীয়তা অর্জন করেছে সাম্রাজ্যবাদের আঁচলে বাঁধা ভূস্বামী-একচেটিয়া পুঁজিপতি-আমলাতন্ত্র-সামরিক শাসকচক্রের কবল থেকে মুক্তি পাবার সংগ্রামের মধ্যে। মার্কসবাদের বিচারে এই জাতিসত্তা অনস্বীকার্য সত্য; বস্তুত কোনো রাষ্ট্রনৈতিক, কোনো সমাজবিজ্ঞানী একে অস্বীকার করতে পারেন না।

প্রশ্ন হতে পারে, স্বায়ত্তশাসনের কিছুটা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকলেই চলত, একেবারে স্বাধীনতার ঘোষণা কি অন্যায় হয়নি? এর জবাব প্রথমত বুঝতে হবে যে স্বাধীনতার ঘোষণা পূর্ব-বাঙলার মানুষের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। কারণ সামরিক একনায়কত্ব সর্বজনীন ভোটে প্রকাশিত মতকে উপেক্ষা করে সামরিক শক্তি প্রয়োগ করতে যদি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়, তবে তার গ্রাস থেকে বেরিয়ে আসার জন্যে স্বাধীনতা ঘোষণা ছাড়া আর কোনো উপায়ই রাখেনি।

দ্বিতীয়ত, অতীতের অভিজ্ঞতা প্রমাণ করেছে যে ৬ দফা দাবি কার্যকর করতে না পারলে পশ্চিম-পাকিস্তানের একচেটিয়া শোষকচক্রের অক্টোপাস-বন্ধন থেকে বেরোবার আর কোনো পথই ছিল না। সমস্ত পূর্ববঙ্গবাসীর অভিজ্ঞতাই যে অনুরূপ তা প্রমাণিত হয়েছে আওয়ামী লীগের অসামান্য নির্বাচনী সাফল্যে।

আর মার্কসবাদীদের পক্ষ থেকে তো লেনিনই এ-প্রশ্নের জবাব দিয়ে গেছেন অনেক আগে, "আমরা যদি স্বাধীন হয়ে যাবার অধিকারের (the right to

secession) আওয়াজ না তুলি, প্রচার না করি, তবে শুধু ধনিকশ্রেণী নয়, শোষণ-পীড়ণকারী জাতির সামন্ত-ভূস্বামী ও স্বেচ্ছাচারতন্ত্রের হাতের ক্রীড়নক বনে যাবো। কাউট্স্কি রোজা লুক্সেমবুর্গের বিরুদ্ধে বহু আগেই এ-যুক্তি দিয়েছেন, আর সেই যুক্তি অখণ্ডনীয়। পোলাণ্ডের ধনিকশ্রেণীর "সমর্থন" হয়ে যাবার আশঙ্কায় রোজা লুক্সেমবুর্গ রুশ মার্কসবাদীদের কর্মসূচি থেকে স্বাধীন হয়ে স্বতন্ত্র হয়ে যাবার অধিকার বাদ দিতে চান, কিন্তু তাতে তিনি গ্রেট রাশিয়ান ব্ল্যাক হানড্রেড্স্-এরই সহায়তা করছেন।" ১৭

আর আজকে পূর্ব-বাঙলার স্বাধীনতার দাবি অস্বীকার করে একমাত্র মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের গাঁটছড়ায় বাঁধা সামন্তপ্রভু ও একচেটিয়া পুঁজিপতির প্রতিভূ সামরিক চক্রকেই সাহায্য করা হবে।

এটা ঠিক, পূর্ব-বাঙলা সরে গেলে রাষ্ট্র হিসাবে পাকিস্তান দুর্বল হবে। কিন্তু এতে ক্ষতিগ্রস্ত হবে একচেটিয়া মালিকরা ও সামরিক একনায়কত্ব। তাদের যুদ্ধনীতি খর্বিত হবে। পশ্চিম-পাকিস্তানের অন্যান্য জাতিগুলির ন্যায্য দাবি মেটাতে হবে ক্রমেই। প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সহযোগিতার জন্য তাকে আগ্রহী হতে হবে।

বলা হতে পারে পূর্ব-বাঙলাও তো তুলনায় ছোট ও দুর্বল রাষ্ট্র হবে। আজকের দুনিয়ায় এর ফলে কি পূর্ব-এশিয়ায় ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যাবে না? উপরন্তু এ-ধরনের ছোট রাষ্ট্র কি নয়া-উপনিবেশবাদের শিকার হবে না? উত্তরে বলা যায়—ঠিকই, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ভারসাম্য পাল্টাবে। কিন্তু ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য পুরানো শোষণ ব্যবস্থা পাল্টানো চলবে না, এতো সাম্রাজ্য-বাদী যুক্তি। বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিতে এ-বক্তব্য সমর্থন করা যায় না। আর ভবিষ্যতে নয়া-উপনিবেশ আবার আসতে পারে এই আশঙ্কায় বর্তমানের নয়া উপনিবেশ-বাদের বিরুদ্ধে আঘাত শক্ত করা যাবে না, এতো যুক্তি হতে পারে না।

সুতরাং বোঝা দরকার, পূর্ব-বাঙলার যে-জাতীয়তাবাদ যার ভিত্তি প্রোথিত সুদূর অতীতে, তা নূতন রাজনৈতিক সত্তালাভ করেছে গত ২৪ বছরের অভিজ্ঞতায়। এ-বিজ্ঞানসিদ্ধ সত্য; এর গতি অমোঘ, দুর্নিবার। একে যে অস্বীকার করবে বা এর সাথে যে-শক্তি শঠতা করবে, সে নিজেই ঠকবে।

পরিশেষে একটা কথা স্মরণে রাখা ভালো। পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গ, উভয় বঙ্গের মানুষই এক ভাষায় কথা বলে, তবু দুইয়ে মিলিয়ে এক জাতি নয়। আজকে যাঁরা উভয় বঙ্গ এক হওয়ার কথা ভাবছেন, বা বলছেন, তাঁরা কার্যত

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের সহায়তা করছেন তাই নয়, তাঁরা সম্পূর্ণ স্বপ্নরাজ্যে বাস করছেন। স্বাধীনতা-উত্তর যুগে দুই বাঙলার অভিজ্ঞতা আলাদা; উভয় বাঙলার অর্থনীতি, শ্রেণী-সমন্বয়, সংগ্রামের চরিত্র বিভিন্ন। এটা ঠিকই, পূর্ব-বাঙলার দুঃখে ভারতের অন্য অংশের মানুষের চেয়ে পশ্চিমবঙ্গবাসী বেশি কাতর হয়েছে। তা সত্ত্বেও, পশ্চিমবঙ্গের মানুষ চান পূর্ব-বাঙলার মানুষ স্বাধীনভাবে জীবনযাপন করুন; সেখানে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হোক; উভয় বাঙলায় ব্যবসা-বাণিজ্য, চিন্তা-ভাবনার লেনদেন সুস্থ ও স্বাভাবিক হয়ে উঠুক। কিন্তু এ তো জাতীয়তার চিন্তা নয়; এ তো সুস্থ আন্তর্জাতিকতার মনোভাব। তাছাড়া যাঁরা নিতান্তই ভাবালুতার বশে দুই বাঙলা মিশে যাবার কথা ভাবেন, তাঁরা বুর্জোয়া ও পেটিবুর্জোয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও সংঘর্ষের কথাটা ভেবে দেখেননি। সে-সংঘাত কি মৈত্রীবন্ধন বজায় রাখতে সক্ষম হবে? তবে হাঁ, বুর্জোয়া ব্যবস্থারই যখন অবসান হবে উভয় বঙ্গে, তখন পাশাপাশি সমাজতন্ত্র গঠনের সম-অভিজ্ঞতা ও পারস্পরিক প্রয়োজনবোধ আবার দুই বাঙলাকে কোনোদিন কাছে আনবে কি না তা আজই খড়ি পেতে বলা যায় না। উপরন্তু সে-কল্পনাবিলাস বর্তমান কঠিন সংগ্রামে সাহায্যকর্মকেই ব্যাহত করবে।

পূর্ব-বাঙলায় ইয়াহিয়া খানের ভাড়াটে সৈন্যরা গণহত্যার লীলা চালিয়েছে। কোনো রাষ্ট্রের নিজস্ব সৈন্যবাহিনী সেই দেশেরই নাগরিকদের একটা অংশের উপর যে-অমানুষিক আক্রমণ চালিয়েছে তার নজির ইতিহাসে আর দ্বিতীয় আছে কি-না সন্দেহ। শিশু-নারী-বৃদ্ধ নির্বিশেষে নিরস্ত্র নাগরিকদের গুলি করে হত্যা করা, গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে দেওয়া, স্কুল-কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়-ছাত্রাবাস গোলার আঘাতে গুঁড়িয়ে দেওয়া, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের লাইন বেঁধে গুলি করে মারা, ছাত্র-শিক্ষক-লেখক শিল্পীদের বাছাই করে হত্যা করা, বিমান আক্রমণে শহরের পর শহর ধ্বংস করে দেওয়া, সবার ওপর নারীত্বের অপমান, তথা মনুষ্যত্বের অপমান,—জনবিচ্ছিন্ন, বর্বর, ইয়াহিয়া সরকার অস্ত্রের মুখে একটা জাতির সত্তাকে সম্পূর্ণ বিনষ্ট করবার চেষ্টা করছে। এ-সরকার মূর্খ, অন্ধ; এরা বুঝছে না যে একদিকে যেমন জমছে মৃতের পাহাড়, ঠিক তার পাশেই আকাশ ছুঁয়ে উঠছে ঘৃণার অগ্নিবলয়। বাঙালি পাকিস্তানকে ভাঙেনি; মিলিত পাকিস্তানকে কবরে পাঠিয়েছে ইয়াহিয়া সরকার।

তবু এতো দুঃখের মাঝেও বাঙলাদেশের মানুষ ঘোষণা করছে তার স্বাধীনতার যুদ্ধ বালুচ-সিন্ধি-পাঠান-পাঞ্জাবী জাতিগুলির বিরুদ্ধে নয়। বাঙলা

দেশের স্বাধীনতা তাদের আত্মনিয়ন্ত্রণকেও ত্বরান্বিত করবে। শত্রু ২২টি পরিবারের একচেটিয়া গোষ্ঠী, শত্রু সামরিক একনায়কত্ব।

বাঙলাদেশের সংগ্রাম ন্যায়ের সংগ্রাম, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম। বাঙলা দেশের স্বাধীনতা মুক্তি আনবে বঙ্গভাষীর পাশাপাশি সাঁওতালিভাষীর, আরাকান হিল্সের বর্মীভাষীর। বিহার থেকে চলে আসা হিন্দিভাষীরও। বাঙালি তো শুধু বঙ্গভাষা-ভাষী নয়; বাঙালি সেই যে এ-মাটিতে জন্মেছে। এর হাওয়া নিঃশ্বাসে নিয়ে বুক ভরিয়েছে, এই দেশকে আপন বলে মেনেছে। এ-বাঙালি কারো ক্ষতি চায় না; বিশ্বের সকল স্বাধীনতাকামী, গণতন্ত্রপ্রেমী, শান্তিপ্রিয় জাতির মিত্র এ। এই বাঙালির বিনাশ নেই; এ-শক্তি অপরাজেয়। জয় বাঙলা।

নির্দেশিকা

১। Lenin : Critical Remarks on the National Question. Foreign Languages Publishing House, Moscow P.74

২। Dr. R. N. Aggarwala : National Movement and Constitutional Development of India, Delhi. Pp. 258.

৩। Stalin : Marxism and National and Colonial Question. Burman Publishing House. Calcutta. Pp. 7.

৪। J. V. Gaukovsky & L. R. Gordon-Polonskaya—A History of Pakistan. Nauka Publishing House, Moscow. Pp, 121 & 250,

৫। Mason, Dorfman and Marylin—Pakistan's War in Bangla Desh. Mainstream, May 15, 1971, Quoting Stern & Falcon—Growth and Development in Pakistan 1955-69; Sattar –United States Aid and Pakistan's Economic Development; New York Times, September 28, 19(,4; Frank N. Jrager, "United States and Pakistan," Orbis, Vol. IX, Fall 1965, No. 3,

৬। The Fourth Five Year Plan (1970-75)—Planning Commission—Government of Pakistan—Pp. 64-65.

৭। অমিতাভ গুপ্ত—পূর্ব-পাকিস্তান। আনন্দধারা প্রকাশন। পৃঃ ১৩৬।

৮। Mason, Dorfman and Marylin—Mainstream, May 15, 1971 (Pp. 16) Quoting Report of the Advisory Panels for the Fourth Five Year Plan, 1970-75, Vol. I.

৯। The Fourth Five Year Plan (1970-75)—Planning Commission—Government of Pakistan—Table 4.

১০। Mason, Dorfman and Marylin, Mainstream, May 15, 1971. Pp. 16. Quoting official statistics issued by the Central Statistical Office, Government of Pakistan and Reports of the Advisory Panel of the Fourth Five Year Plan, 1970-75.

১১। Ibid Quoting A. Rahman. East and West Pakistan —A Problem in Political Economy of Regional Planning. Harvard University Centre for International Affairs, 1968.

১২। অমিতাভ গুপ্ত—পূর্ব-পাকিস্তান। আনন্দধারা প্রকাশন। পৃঃ ৩৫১।

১৩। ঐ —পৃষ্ঠা ৩৭১।

১৪। ঐ —পৃষ্ঠা ৩৭৮-৩৭৯। উৎস ; P. D. R. Vol III. No. 3, Pp. 399-414. A Note on Consumption Pattern in the Rural Areas of East Pakistan by Irshad Khan ; P. D. R. Vol III, No. 1, Development of Institutional Agricultural Credit in Pakistan by Irshad Khan.

১৫। ঐ —পৃষ্ঠা ৩৮১।

১৬। শিক্ষা সম্পর্কে সমস্ত তথ্যেরই উৎস হলো—Pakistan Education Index, Central Bureau of Education. Islamabad, 1970.—by Dr. W. M. Zaki and M. Sarwar Khan.

১৭। Lenin, Critical Remarks on the National Question. Pp. 93.

পূর্বপাকিস্তানের সামাজিক শ্রেণীবিন্যাস

বাসব সরকার

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর এক পরিবর্তিত আন্তর্জাতিক পটভূমিতে ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্ট পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা হয়। সেদিনের সেই পৃথিবীতে বিশেষ-ভাবে লক্ষ্যণীয় দুটি পরিবর্তন প্রকট হয়ে উঠেছিল। সেগুলি হলো প্রথমত বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা, যা ফ্যাসিবাদকে পরাস্ত ও ধ্বংস করে নিজের অধিকারেই সমগ্র পূর্ব ইউরোপে প্রাধান্য বিস্তার করেছে এবং দ্বিতীয়ত সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশবাদ-বিরোধী জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনের দুর্বার অগ্রগতি।

এই দুই বিশেষ লক্ষণাক্রান্ত আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে যেসব দেশের জনগণ রাজনৈতিক সার্বভৌমত্ব অর্জন করতে পেরেছিলেন, তাঁদের জাতীয় সত্তার বিকাশে ও বিস্তারে এই পরিস্থিতির প্রভাব পড়তে বাধ্য। সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার অস্তিত্ব, প্রেরণা ও সমর্থন যে-জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে শক্তিশালী করে এবং সাম্রাজ্যবাদের দখলদারীকে খর্ব করে পরাধীন জাতিসমূহের আত্মবিকাশের পথ প্রশস্ত করেছিল তা আজ আর কোনো বিতর্কের অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু দেশভেদে বাস্তব অবস্থার তারতম্য শ্রেণীগত শক্তিসমূহের আপেক্ষিক সম্পর্কের পার্থক্য এবং মুক্তি-আন্দোলনের রাজনৈতিক নেতৃত্বের দৃষ্টিভঙ্গি মানসিকতা, যোগ্যতা ও শ্রেণীভিত্তি আন্তর্জাতিক অনুকূল পরিস্থিতিকে সমভাবে কাজে লাগাতে পারেনি এমনকি চায়ওনি।

তাই দেখা যায় উপনিবেশের শাসন ও শোষণের অবসানে জাতিসমূহ যখন রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করেছে, তখন জনজীবনে তার প্রতিফলন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিতান্ত সীমিত থেকে গেছে। সন্দেহ নেই যে বহু দেশে সাধারণ মানুষের কাছে রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও জনজীবনের স্বাধীনতার পার্থক্য সেদিন স্পষ্ট ছিল না। কারণ এই ধারণা স্পষ্ট থাকলে মুক্তি-আন্দোলন রাজনৈতিক স্বাধীনতার স্তরেই পরবর্তীকালে আবদ্ধ না থেকে তা মানুষের সর্বাঙ্গীন মুক্তিকে সফল করে তুলত।

সন্দেহ নেই যে সদ্য স্বাধীন দেশগুলির শাসকশ্রেণী রাজনৈতিক স্বাধীনতাকে মূলধন করেই অর্থনৈতিক সামাজিক স্বাধীনতা অর্জনে অগ্রণী হতে পারতেন। উপনিবেশের সামাজিক-অর্থনৈতিক বনিয়াদ রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের পরেও অপরিবর্তিত থাকলে যে সেই স্বাধীনতাকেই বিপর্যস্ত করে দেয়, এ-কথা যে তাঁদের অজানা ছিল তা নয়। বরং আসল কথা হলো এই যে অনেক সদ্য-স্বাধীন দেশের রাজনৈতিক নেতৃত্ব, সামাজিক অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তনের জন্যে কোনো কর্মসূচি গ্রহণে অনিচ্ছুক ছিলেন। শাসকশ্রেণীর স্বার্থের তাগিদেই সেই অনিচ্ছা। পূর্ব-পাকিস্তানের সামাজিক শ্রেণীবিন্যাসের আলোচনায় এই পরিচিত ধারণার পুনরুল্লেখ প্রাসঙ্গিক।

দুই

ভারতীয় মুসলিম লীগের যে-রাজনৈতিক নেতৃত্ব পাকিস্তান আন্দোলন করেছিলেন, তাঁদের গরিষ্ঠ অংশ ছিলেন সামন্ত জমিদার শ্রেণীর প্রতিনিধি। লাহোরে পাকিস্তান প্রস্তাবের রচয়িতা লীগের কাউন্সিলের ৫০৩ জন সদস্যের মধ্যে ১৬৩ জন ছিলেন বড়ো বড়ো জমিদার। লীগের সম্পাদক জনাব লিয়াকৎ আলী খান, সংগ্রাম পরিষদের সভাপতি ইসমাইল খান ছিলেন বিরাট জমিদারীর মালিক। জমিদাররা কাউন্সিলে ছিলেন সবচেয়ে বড়ো জোটবদ্ধ গোষ্ঠী। ব্যবসায়ী ব্যাঙ্কার ও শিল্পপতিদের সংখ্যা নগণ্য না হলেও, তাদের প্রভাব খুবই কম ছিল। (খালিদ বিন সৈয়দ পাকিস্তান, দি ফর্মেটিভ ফেজ পৃষ্ঠা ২৪৪)

খালিদ বিন সৈয়দ বলেছেন লীগ কাউন্সিলের জমিদার সদস্যদের মধ্যে, সবচেয়ে বড়ো দল ছিলেন পাঞ্জাবী সদস্যরা। তারপরেই উল্লেখ্য হলো উত্তর প্রদেশ ও বাঙলাদেশের জমিদারদের সংখ্যা। পাকিস্তান আন্দোলনে মুসলীম লীগ দেশের সাধারণ মুসলমান নাগরিকদের সামনে কোনো সামাজিক অর্থনৈতিক কর্মসূচি রাখেননি। তাঁদের লক্ষ্য ছিল পাকিস্তান কায়েম করা— একটা ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্রগঠন করা যা গড়ে ওঠার পরে কিভাবে, কোন আদর্শ লক্ষ্যের দিকে পরিচালিত হবে তা নিয়ে কোনো চিন্তা-ভাবনার দরকার আছে তাঁরা স্বীকার করেননি।

রাজনৈতিক আদর্শ ও লক্ষ্যের বিচারে মুসলীম লীগ নেতৃত্ব ছিলেন কয়েক পুরুষ আগেকার ইংরেজ রক্ষণশীলদের মানসিকতার শরিক। তাঁদের বিশেষ

সুবিধাভোগী স্বার্থ অক্ষুন্ন রেখে, কিছু করা গেলে এমনকি যদি কোনো তথাকথিত "প্রগতিশীল" কাজও করা যায়, তাতে তাঁদের আপত্তি ছিল না। সুতরাং পাকিস্তান কায়েম হওয়ার আগে প্রস্তাবিত রাষ্ট্রের সামাজিক অর্থনৈতিক বনিয়াদ সম্পর্কে কোনো মত বিনিময় না করলেও, তাঁরা একটি বিষয়ে গোড়া থেকেই একমত ছিলেন যে. জমিদার, শিল্পপতি, ব্যাঙ্কার, ব্যবসায়ী ইত্যাদি স্বার্থের প্রতিনিধিবর্গের কোনো রকমেই বিশেষ সুবিধা সুযোগের রদবদল করা হবে না। কিন্তু এই ধারণা নিয়ে পাকিস্তান আন্দোলন পরিচালিত হলেও স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মুহূর্তে দেখা গেল যে, লীগ নেতৃত্বের মধ্যে স্বার্থগত টানাটানি আরম্ভ হয়েছে।

দেশবিভাগের সময়ে ভারত থেকে বিত্তবান মুসলমান শরণার্থীরা পূর্বে না গিয়ে, পশ্চিমে পাকিস্তানে বাস করতে শুরু করলেন। পাকিস্তানের শিল্পপতি, ব্যবসায়ী ও ব্যাঙ্কাররা ছিলেন এই ভারত থেকে আগত বিত্তবান অংশ। অবিভক্ত ভারতের মুসলমান সংখ্যালঘিষ্ঠ প্রদেশগুলির এই বিত্তবান মুসলমান শরণার্থী দল. যাঁরা লীগের কাউন্সিল ও ওয়ার্কিং কমিটিতে ছিলেন বিশেষ প্রভাবশালী অংশ, নবগঠিত রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক বাণিজ্যিক ও প্রশাসনিক কাঠামোর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে বসলেন। মিরডাল তাঁর সুবিখ্যাত "এশিয়ান ড্রামা" গ্রন্থে লিখেছেন যে, এই শ্রেণীর একজন কর্তা ব্যক্তি মানুষ আলোচনা প্রসঙ্গে শ্লেষের সঙ্গে তাঁর কাছে মন্তব্য করেছেন যে, পাকিস্তান হলো একটা "অধিকৃত দেশ"। এই দেশের মানুষদের "আমরাই প্রশাসনিক ব্যবস্থা, শিল্পক্ষেত্রে নেতৃত্ব, সংস্কৃতি এমনকি ভাষা দিয়েছি।" (পৃষ্ঠা ৩১০)

অবিভক্ত ভারতে পরাধীনতার মধ্যেও সামাজিক অর্থনৈতিক জীবনে এই শ্রেণীর বিত্তবান মুসলমান নাগরিকরা ইংরেজদের অনুগ্রহপুষ্ট হয়ে যে বিশেষ সুযোগসুবিধা ভোগ করতেন, নবগঠিত পাক-রাষ্ট্রের কর্ণধার হয়ে, তাঁদের সেই স্বার্থ সংরক্ষণের ক্ষেত্র সঙ্কুচিত হওয়া দূরে থাক, আরো অনেক সম্প্রসারিত হলো। পশ্চিম-পাকিস্তানে বসবাস করার জন্যে, সেই অঞ্চল পাক-রাষ্ট্রের মূল ভূখণ্ডে পরিণত হলো, এবং সমগ্র অবিভক্ত ভারতের অনুন্নত পশ্চিম অঞ্চলে, পাঞ্জাবী, সিন্ধি ভূ-স্বামীদের সঙ্গে যোগসাজসে তাঁরা নিরঙ্কুশ শাসন ও শোষণের ঢালাও ব্যবস্থা করে নিলেন। স্বাধীনতাপূর্ব মুসলিম লীগের রাজনীতিক দল হিসেবে কোনো সামাজিক, অর্থনৈতিক কর্মসূচি না থাকায় এবং সদ্য গড়ে ওঠা পাকিস্তান রাষ্ট্রের নাগরিকদের মনে ধর্মীয় উন্মাদনা

তীব্রভাবে বজায় থাকায়, কায়েমী স্বার্থের পক্ষে সকলের অলক্ষ্যে ক্ষমতার কেন্দ্রগুলি করায়ত্ত করার কোনো বাধা এলো না। প্রসঙ্গত আরেকটি কথা স্মরণীয় যে, এই কায়েমী স্বার্থবাদী দলের কাছে, পাকিস্তানের দুই অংশ ছিল সমান পরদেশ—সমান "অধিকৃত" রাজ্য। তাই অধিকৃত রাজ্যের সাধারণ মানুষ, চাষী, শ্রমিক, মেহনতি জনগণ, শিল্পী-কারিগর, মধ্যবিত্ত নিম্নবিত্তদের জন্যে তাঁদের কোনো মমত্ববোধ ছিল না। পশ্চিম-পাকিস্তানে মুসলমান শরণার্থীদের পুনর্বাসন সম্পর্কে তাঁদের মনোভাব, অনুসৃত নীতি, সে-কথা প্রমাণ করে।

তিন

লাহোর প্রস্তাব বা পাকিস্তান প্রস্তাবের ওয়াদা ছিল ভারতের দুই মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলে, পশ্চিমে ও পূর্বে, ব্যাপক স্বায়ত্বশাসন ক্ষমতা ভোগী, "সার্বভৌম" দুই রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা। ক্ষমতা হস্তান্তরের সময়ে সেই ওয়াদা ভেঙে তৈরি হলো অখণ্ড পাকিস্তান। অখণ্ড রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় যাঁরা বাধা দিতে পারতেন, যাঁরা লাহোর প্রস্তাব কার্যকরী করার জন্যে চাপ সৃষ্টি করতে পারতেন, অবিভক্ত বাঙলাদেশের সেই মুসলিম লীগ সদস্যরা কিন্তু কোনো প্রতিবাদ করলেন না। পাকিস্তান কায়েম করার মধ্যে তাঁরা যেমন বাঙলার অবহেলিত মুসলমান সমাজের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার স্বপ্নকে রূপায়িত দেখেছিলেন তেমনি দেখেছিলেন, পূর্ব-পাকিস্তানে নিজেদের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা। লীগের সর্বভারতীয় নেতৃত্বের সামাজিক-অর্থনৈতিক কর্মসূচি সম্পর্কে যেমন কোনো দুর্বলতা ছিল না, বাঙালি লীগ নেতাদেরও তেমনি তা নিয়ে কোনো দুশ্চিন্তা ছিল না। তাঁরা কায়েদে আজমের কথায় আন্তরিক বিশ্বাস স্থাপন করে ভেবেছিলেন "ভূখণ্ড, সরকারবিহীন মুসলিম জাতির" আগে নিজের রাষ্ট্র হোক, তারপর দেখা যাবে। (খালিদ বিন সৈয়দ, ঐ, পৃষ্ঠা ১৯৬)

স্বাধীনতার সামাজিক-অর্থনৈতিক বনিয়াদ সম্পর্কে রাজনৈতিক নেতৃত্বের ছিল উদাসীনতা, অনাগ্রহ, তেমনি বুদ্ধিজীবী মহলেও ছিল সুস্পষ্ট ধারণার অভাব। পূর্ব-পাকিস্তানে দেশবিভাগের সময় যেখানে শিক্ষিতের সংখ্যা ছিল শতকরা মাত্র ৭ জন, যেখানে দরিদ্র, শ্রমজীবী মানুষদের কাছে সামাজিক অর্থনৈতিক কর্মসূচি সম্পর্কে কোনো বড়ো রকমের প্রত্যাশা রাখা সম্ভব নয়। পাকিস্তান আন্দোলনে উৎসাহী বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের মানসিকতা স্বাধীনতাকে

কেন্দ্র করে কিভাবে আলোড়িত হয়েছিল মননশীল প্রবন্ধকার বদরুদ্দীন উমর তার এক বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি বলেন, "পাকিস্তান আন্দোলনের সময় মুসলমানদের তাহজীব, তমদ্দুন ইত্যাদি সম্পর্কে কোনো নিশ্চিত ধারণার অবর্তমানে কেউ এ-সবের দ্বারা মনে করল কোরমা, পোলাউ, কোফতা ও গরু খাওয়ার স্বাধীনতা। কেউ বা আবার মনে করল ভাষার মধ্যে যথেচ্ছভাবে আরবী-ফারসী শব্দের আমদানীর স্বাধীনতা। কেউ ভাবল মরুভূমির উপর যথেচ্ছ কবিতা লেখার স্বাধীনতা। কারো কাছে বা মুসলমানদের সাংস্কৃতিক আত্মনিয়ন্ত্রণ মানে বোঝাল মসজিদের সামনে হিন্দুদের বাদ্যবাদনের পরিবর্তে মুসলমানদের সেই কাজের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা। কারো কাছে এর অর্থ হলো বিদ্যাসাগর-বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথকে বর্জন করে তার স্থলে আলাওল, গরীবুল্লা, এবং কায়কোবাদকে অভিষিক্ত করা" (হাসান মুরশীদের "বাঙলাদেশের বর্তমান সংগ্রামের সাংস্কৃতিক পটভূমি" শীর্ষক প্রবন্ধে উদ্ধৃত আনন্দবাজার, ১৯শে এপ্রিল)।

উমরের উদ্ধৃতি থেকে বোঝা যায় এবং প্রবন্ধকার হাসান মুরশীদের প্রতিপাদ্য বিষয়ও তাই যে, স্বাধীনতাকে গণস্বার্থের সঙ্গে মিলিয়ে দিয়ে, মানুষের কল্যাণে তার ফলশ্রুতি কাজে লাগানোর জন্যে যে পরিমণ্ডলের দরকার পূর্ব-পাকিস্তানে তা ছিল না। পশ্চিম-পাকিস্তানের কথা আপাতত অপ্রাসঙ্গিক, তবু এটুকু স্মরণীয় যে, রাজনৈতিক আন্দোলনের ঐতিহ্য পশ্চিম-পাকিস্তানে সীমান্ত প্রদেশ ও কিছুটা সিন্ধু, বেলুচিস্তানে আবদ্ধ থাকায়, তার অবস্থা হয়েছিল এই বিচারে আরো মর্মান্তিক।

কোনো সমাজের সাংস্কৃতিক পটভূমি তার সামাজিক, অর্থনৈতিক অবস্থার উপরে একান্ত নির্ভরশীল। তার সঙ্গে যার যোগ নেই, সেরকম সংস্কৃতি মেকী, ফ্যাশান দুরস্ত ব্যাপার, অর্থাৎ বাইরেকার আয়োজন, সমাজের আন্তর তাগিদের প্রতিফলন নয়। স্বাধীনতা যে সমাজ জীবনের গুণগত পরিবর্তন আনার প্রাথমিক স্তর, সেই ধারণা পূর্ব-পাকিস্তানের মানুষের এসেছে অনেক দেরীতে। তাই সেখানে সামাজিক-অর্থনৈতিক প্রয়োজনে রাজনৈতিক আন্দোলনের শুরু হয়েছে যথেষ্ট পরে এবং সেই আন্দোলনেরও সূত্রপাত হয়েছে এমন এক দাবিকে কেন্দ্র করে, যা যে-কোনো জাতির সমাজের শ্রেণী নিরপেক্ষ গণদাবি হতে পারে। সেই দাবি হলো ভাষার দাবি।

১৯৪৮ থেকে ১৯৫২ সালের মধ্যে পূর্ব-পাকিস্তান আলোড়িত হয়েছে ভাষার স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যে। এর সঙ্গে মানুষের যে নাড়ীর টান, তা যে-কোনো

সমাজের গরিষ্ঠতম অংশকে ঐক্যবদ্ধ করতে পারে। কিন্তু এটাও মনে রাখা দরকার যে, পরাধীনতার যুগে উচ্চ শিক্ষিত, সংস্কৃতিবান উপর-তলার বাঙালি মুসলমান পরিবার কোনোদিনই বাঙলা ভাষাকে মাতৃভাষার মর্যাদা দেননি। সন্দেহ হয় যে, পাকিস্তান কায়েম হওয়ার পরে, পূর্ব-পাকিস্তানের চার বছরের অভিজ্ঞতায়, তাঁরা চিন্তা-চেতনায় কিছুটা উন্নত হতে পেরেছিলেন কিনা? যাইহোক ভাষা আন্দোলনে যে বাঙালি জাতি-সত্তার বিকাশ, প্রায় দুই দশক পরে, তাই আরো তীব্র, স্পষ্ট রাজনৈতিক চেহারা নিয়েছে, সাম্প্রতিককালের ছয় দফার দাবিতে। ছয় দফার দাবি প্রায় সমগ্র বাঙালি মুসলমান সমাজের দাবি সংখ্যালঘু হিন্দুরাও যার সক্রিয় সমর্থক। ছয় দফার দাবিতে পূর্ব-পাকিস্তান বিস্ময়করভাবে ঐক্যবদ্ধ, তার প্রমাণ পাওয়া গেছে গত ডিসেম্বরের নির্বাচনে এবং গত মার্চের ঘটনাবলীতে, যখন ১৫ই মার্চ থেকে শেখ মুজিবর রহমান সারা পূর্ব-পাকিস্তানে দ্বৈত শাসন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। শ্রেণীগত পার্থক্যের চিন্তাকে মুলতুবী রেখে, পূর্ব-পকিস্তানের মানুষ, একটা পূর্ণাঙ্গ সমস্ত শ্রেণীর সহযোগিতা সমর্থনের ভিত্তিতে আস্থাবান সকল শ্রেণীর সম্মিলিত ও ব্যাপক গণআন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন।

বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রথম বলিষ্ঠ প্রকাশের কাল থেকে তার এক চরম সঙ্কটময় পর্বে গভীর আত্মবিশ্বাস নিয়ে আত্মপ্রকাশের কাল পর্যন্ত, প্রধান লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হলো পূর্ব-পাকিস্তানের শ্রেণীগত বিরোধিতার উর্ধ্বে উঠে যাওয়া ব্যাপক গণতান্ত্রিক ঐক্য। অর্থাৎ বাঙালি জাতীয়তাবাদ শ্রেণী স্বার্থের দ্বন্দ্বের উপরে নিজেকে আপাতত প্রতিষ্ঠা করেছে। অথচ বিজ্ঞানের ধারায় বিশ্লেষণ করলে স্পষ্টই ধরা পড়বে যে, শ্রেণী স্বার্থের দ্বন্দ্ব মুলতুবী আছে মাত্র মীমাংসিত হয়নি। কারণ তা হতে পারে না।

ছয় দফার দাবিতে গ্রামের নিরন্ন ক্ষেতমজুর থেকে বিত্তবান বাঙালি পর্যন্ত যে সবাই একই সুরে একই জিগির দিতে পেরেছেন তার প্রধান কারণ এই দাবি পূরন হলে সমাজের সমস্ত অংশই সামগ্রিকভাবে উপকৃত হবে। শ্রেণী স্বার্থের সংঘাত তাই আপাতত মাথা চাড়া দেয়নি, কারণ তাহলে এই বিস্ময়কর সার্বিক ঐক্য হতো না। ছয় দফা হলো এমনই দাবি যাকে বাঙালি "বুর্জোয়া" শ্রেণী থেকে ভূমিহীন কৃষক পর্যন্ত সকলেই আশু কর্মসূচি হিসেবে মেনে নিতে পেরেছে। স্বায়ত্বশাসনের অধিকার লাভ করলেই যে ভূমিহীন কৃষক জমি পাবে না, শ্রমিকের আর হবে না মজুরীবৃদ্ধি। এই সত্য পূর্ব-পাকিস্তানের মানুষ

জেনেই আন্দোলনে নেমেছিলেন। পূর্ব-পাকিস্তানের সামাজিক শ্রেণী অন্তুদের আলোচনায় একথা বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা দরকার।

চার

অর্থনৈতিক বিচারে পাকিস্তান রাষ্ট্র হিসাবে ভারতের চেয়েও অনুন্নত ছিল। ইংরেজ আমলে উপনিবেশের শাসনে, শোষণে এদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে যে সীমিত অর্থনৈতিক অগ্রগতি ঘটেছিল, দেশবিভাগের সময় তার সামান্য অংশ পড়লো পাকিস্তানের ভাগে। এক নজরে সেদিনের অবস্থাটা দেখে নেওয়া যাক।

দেশবিভাগের সময় সংখ্যাগরিষ্ঠ পূর্ব-পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যার শতকরা ৯৫'২ ভাগ ছিলেন গ্রামের বাসিন্দা, পশ্চিম-পাকিস্তানে এই হার ছিল শতকরা ৮৫'২ ভাগ। সারা পাকিস্তানে তখন মাত্র আটটি শহর ছিল, যার লোকসংখ্যা এক লক্ষের বেশি। পূর্ব-পাকিস্তানের ঢাকা ছিল একমাত্র সেই রকম শহর। অবিভক্ত ভারতের মোট ১৪,৬৭৭টি শিল্পসংস্থার মধ্যে পাকিস্তানের অংশে পড়েছিল ১৪১৪টি, অর্থাৎ ৯'৬ শতাংশ। এর মধ্যে আবার পূর্ব-পাকিস্তানে ছিল মাত্র ৩৩৫টি শিল্পসংস্থা। পূর্ব-পাকিস্তানের শিল্পসংস্থাগুলি ছিল মূলত প্রাথমিক উৎপাদনের স্তরে আবদ্ধ ঋতুকালীন সংস্থা যাদের কাজ কারবার হতো কৃষিজাত শিল্প উৎপাদনে প্রয়োজনীয় কাঁচা মাল নিয়ে। পূর্ব-পাকিস্তানে ছিল না কোনো বৃহদায়তন বা ভারী শিল্পকেন্দ্র যেমন রেল কারখানা, ইঞ্জিনিয়ারিং বা রাসায়নিক দ্রব্য সামগ্রী উৎপাদন কেন্দ্র। জন্মের মুহূর্তে পাকিস্তানে কর্মরত মোট শিল্প শ্রমিকের সংখ্যা ছিল ২,০৬,১০০ যা ভারতের মোট শ্রমিক সংখ্যার ছিল মাত্র ৬'৫ শতাংশ। বলা বাহুল্য যে এরই একটা নগণ্য অংশ ছিল পূর্ব-পাকিস্তানে। (গণকোভ্স্কি ও পোলানস্কায়া ঃ হিস্ট্রী অব্ পাকিস্তান, পৃষ্ঠা ৯০-১০০)

পূর্ব-পাকিস্তান তথা সমগ্র পাকিস্তানের গরিষ্ঠতম অংশ যে ছিলেন কৃষিজীবী সেকথা কোনো বিতর্কের অবকাশ রাখে না। এবং তাঁদের সংখ্যা আবার দুই অংশের মধ্যে পূর্ব-পাকিস্তানেই ছিল বেশি। সুতরাং দেশবিভাগের সময় পাকিস্তান রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক বনিয়াদ গঠনের যে উপকরণ পাওয়া গেল, তার চরিত্র স্পষ্টতই প্রমাণ করে যে, পাকিস্তানের অর্থনীতিকে এতদিনে গড়ে ওঠা ঐতিহাসিক এক কাঠামো ভেঙে বের হয়ে আসতে হবে। অন্যথায় তার রাজনৈতিক স্বাধীনতা ধীরেধীরে ব্যর্থ হতে বাধ্য। সেই ঐতিহাসিক কাঠামো হলো

ঔপনিবেশিক অর্থনৈতিক কাঠামো যা ভাঙতে না পারলে রাজনৈতিক স্বাধীনতার বাগাড়ম্বরের আড়ালে নয়া-উপনিবেশবাদ আসর জাঁকিয়ে বসে পড়বে। পাকিস্তানের শাসককুল যে এতো কাল নয়া-উপনিবেশবাদের নির্দেশেই শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করেছেন তা অনস্বীকার্য। তাঁদের লক্ষ্য ছিল বিদেশী কোনো শক্তির (সেসময়ে তাঁদের বিচারে সেটা ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র) অনুগৃহীত থেকে আখের গুছিয়ে নেওয়ার ব্যবস্থা করা। বিগত চব্বিশ বছরে পাকিস্তানের শাসকশ্রেণী যে বিস্ময়কর সাফল্যলাভ করেছে, তা বলাই বাহুল্য। সে-দেশে জাতীয় উৎপাদনের ৭৫ শতাংশ মাত্র যে ২৩টি পরিবার নিয়ন্ত্রণ করে থাকে, তাদের বাড়বাড়ন্ত হয়েছে এইসময়েই।

পূর্ব-পাকিস্তানে সামাজিক শ্রেণীবিন্যাসের যে ছক পাওয়া যায়, তার একটা মোটামুটি আলোচনা করেছেন পশ্চিম-পাকিস্তান তথা বৃটেনের সুপরিচিত ট্রট্স্কিপন্থী ছাত্রনেতা তারিক আলী।

পাঁচ

পূর্ব-পাকিস্তানে সামাজিক শ্রেণীবিন্যাসের আলোচনার গোড়াতেই বলে নেওয়া দরকার যে, উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত একটা ঔপনিবেশিক অর্থনীতি নিয়ে স্বাধীন পাকিস্তান জীবন শুরু করলেও, তার দুই অংশের বাস্তব অবস্থা তথা শ্রেণী সম্পর্কের ধারা বহু ক্ষেত্রেই এক রকমের হয়নি। অর্থাৎ বিগত ২৪ বছরে সামাজিক শ্রেণীবিন্যাস পূর্ব-পাকিস্তানে যে-পথে গড়ে উঠেছে, পশ্চিম-পাকিস্তানে তার দেখা গেছে ভিন্ন রূপ। এই বিভিন্নতা শুধু পরিমাণগত ব্যাপার নয়। এর বনিয়াদ হলো গুণগত বিভিন্নতা। একই নয়া-উপনিবেশবাদ পাকিস্তানের দুই অংশে অনুপ্রবেশ করে শোষণের ঘাটি গড়ে তোলা সত্ত্বেও, পূর্ব-পাকিস্তানের ভাগ্যে জুটেছে এরই সঙ্গে অতিরিক্ত পশ্চিম-পাকিস্তানী শোষণ। এই শোষণের শিকার হয়েছে সমগ্রভাবে পূর্ব-পাকিস্তান তার কোনো বিশেষ অংশ নয়। শ্রেণী সম্পর্কের বিকাশে দুই অংশের মধ্যে তাই দেখা গেছে একের প্রতি অন্যের সার্বিক বিরূপতা যা বৈজ্ঞানিক বিচারে গ্রহণযোগ্য নয়। অথচ বাস্তব অবস্থাটা তাই। গণতান্ত্রিক আন্দোলন জাতীয়তাবাদী রূপ না গ্রহণ করলে তা হতে পারে না। পাকিস্তানের ইসলামিক জাতীয়তাবাদ আজ যে শেষ হয়ে গেছে, অন্তত লক্ষ লক্ষ শরণার্থী ও সংগ্রামী মানুষের জীবনে যে শেষ হয়ে গেছে সে কথা নিঃসন্দেহে বলা চলে।

পূর্ব-পাকিস্তানের সামাজিক শ্রেণীবিন্যাসে প্রথমেই উল্লেখ দরকার বুর্জোয়া শ্রেণীর কথা। আজকের মুক্তি-আন্দোলন গড়ে তোলায়, সারা দেশে সংগ্রামের পটভূমি সার্বিক ঐক্যের বনিয়াদে খাড়া করায়, তার অবদান অস্বীকার করা যায় না। সমস্ত জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে যা হয়ে থাকে, পরাধীন ভারতের মুক্তি সংগ্রামে যা ঘটেছিল, এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম নেই।

কেন্দ্রীয় পাক নেতারা পূর্ব-পাকিস্তানী কোনো পুঁজিপতি শ্রেণী গড়ে ওঠায় আমল দেননি! অবিভক্ত বাঙলাদেশের ছোট ছোট কলকারখানা, শিল্প-সংস্থার মালিকানা এবং সাধারণভাবে ব্যবসা-বাণিজ্য ছিল হিন্দু পুঁজিপতি ও ব্যবসায়ীদের হাতে। দেশবিভাগের পরে তাদের অধিকাংশই চলে আসে পশ্চিমবঙ্গে। তাদের কেউ কেউ এসেছিল নিজের তাগিদে, আবার অনেকেই বিতাড়িত হয়ে। ফলে পূর্ব-পাকিস্তানে শিল্পসংস্থা ও ব্যবসা-বাণিজ্যে যে শূন্যতা সৃষ্টি হয়, তা পুরণ করা হলো বাঙালি মুসলমানদের সুযোগ সাহায্য দিয়ে না, পশ্চিম-পাকিস্তান থেকে অবাঙালি প্রধানত পাঞ্জাবী ও ভারত আগত মুসলমান শরণার্থীদের দিয়ে। ফলে বাঙালি পুঁজিপতি শ্রেণী গড়ে ওঠার সুযোগ থেকে বঞ্চিতে হলো। আজকের পাকিস্তানে যে কুখ্যাত ২২টি পরিবার পরোক্ষে দেশ শাসন করছে বলা হয়, তাদের সমগোত্রীয় হতে পারা দূরে থাক ধারে কাছে যেতে পারে এমন কোনো বাঙালি পুঁজিপতি নেই। ফলে অবস্থাটা দাঁড়াল এই রকম যে, স্বাধীনতাপূর্বকালে কোনো বাঙালি মুসলমান পুঁজিপতি শ্রেণী গড়ে ওঠেনি, এবং স্বাধীনতা-উত্তরকালেও তা গড়ে ওঠার সুযোগ পেল না।

পাকিস্তান আন্দোলনে বাঙালি মুসলমানদের যাঁরা নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, তাঁরা প্রধানত ছিলেন পেটি বুর্জোয়া শ্রেণীর লোক। হিন্দু জমিদার, ব্যবসায়ী ও কল কারখানার মালিকদের সঙ্গে আমলাতন্ত্রের যোগাযোগ থাকায় তাঁরা তাঁদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন এ-জাতীয় একটা ক্ষোভের প্রতিক্রিয়া, ধর্মীয় জাতীয়তাবাদের সঙ্গে মিলে অবিভক্ত বাঙলাদেশে, পাকিস্তান গঠনের বাসনাকে জোরালো করে তোলে। তাই পাকিস্তান কায়েম হওয়ার পরে যখন পূর্ব-পাকিস্তানের শিল্প বাণিজ্যে সুপরিকল্পিত উপায়ে পশ্চিম-পাকিস্তানী পুঁজিপতিদের অনুপ্রবেশ ঘটল, তখন সাধারণ বাঙালি পাকিস্তানী তার গুরুত্ব চরিত্র ও সুদূরপ্রসারী ফল বুঝতে পারেননি। সেদিন তা সম্ভবও ছিল না।

কিন্তু পশ্চিম-পাকিস্তানী বিনিয়োগকারীদের উদ্যোগে যখন পূর্বাঞ্চলের পাট,

চা, চামড়ার রপ্তানী বাণিজ্যে প্রাপ্ত অনুকূল উদ্বৃত্ত পশ্চিম-পাকিস্তানে চালান হয়ে যেতে লাগল তখন থেকেই বাঙালি জাতীয়তাবাদী ভাবধারা মাথা চাড়া দিতে শুরু করে। পেটি বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদীদের যে সীমাবদ্ধতা এতোকাল বাঙালিদের মতো বিশিষ্ট জাতিসত্তা জীবনের আড়ালে পড়েছিল, তা সামনে হাজির হয়ে গেল। সকলে ক্রমেই বুঝতে শুরু করলেন যে, পাকিস্তান কায়েম হলেই বাঙালি সমাজের সব সমস্যার সমাধান হয়ে যায়নি। পূর্ব-পাকিস্তানে স্বায়ত্বশাসনের দাবির সূত্রপাত এখান থেকেই। আওয়ামী লীগ প্রধানত সমাজের এই অংশেরই মুখপাত্র। তাই আওয়ামী লীগের ছয় দফা দাবির মধ্য দিয়ে প্রধানত প্রকাশ পেয়েছিল বাঙালি বুর্জোয়া শ্রেণীর ব্যর্থতার কথা, যা সমগ্রভাবে পশ্চিম-পাকিস্তানী শোষণের জন্যে পূর্ব-পাকিস্তানের জাতীয় দাবিতে পরিণত হয়েছে।

ছয়

তুলনামূলক বিচারে পূর্ব-পাকিস্তানের কৃষিনির্ভরতা পশ্চিমের চেয়ে বেশি। এখানকার লোকসংখ্যাও বেশি পশ্চিম-পাকিস্তানের তুলনায়। অথচ পূর্বাঞ্চলে সমীক্ষা চালিয়ে দেখা গেছে যে এখানে জমির পরিমাণ হলো ২ কোটি ১০ লক্ষ একর যা সমগ্র পাকিস্তানের মাত্র এক পঞ্চমাংশ। পূর্ব-পাকিস্তানে জনবসতির ঘনত্ব এবং জমির উপর মানুষের নির্ভরতা কতটা ব্যাপক তা এর থেকে বোঝা যায়। দেশবিভাগের পূর্ব-বাঙলার সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানরা মনে করতেন যে ক্ষুদ্রায়তন পূর্ব-বাঙলার সীমিত সম্পদ কাজে লাগাচ্ছে সংখ্যালঘু হিন্দুরা। বিরাট বিরাট জমিদারী ও অন্যান্য বাণিজ্যিক স্বার্থ হিন্দুদের দখলে রয়েছে কয়েক পুরুষ ধরে। গ্রামীণ সমাজের অত্যাচার, অনাচার যা সামন্ত সমাজের সঙ্গে একান্তভাবে যুক্ত অবিভক্ত বাঙলাদেশে তার পরিচয় পেয়েছে মুসলমান চাষী বেশিরভাগ হিন্দু জমিদারদের থেকে। তার মানে এটা নয় যে, পূর্ব-বাঙলায় অত্যাচারী মুসলমান জমিদার, জোতদার মোটেই ছিল না। কিন্তু তাদের সংখ্যা নগণ্য হওয়ায় সামন্ত স্বার্থের প্রতিভূ বলতে বোঝাতো সাধারণত হিন্দুদের। পাকিস্তান আন্দোলনও মোটামুটি এ-ধারণাটাকেই সাধারণ মানুষের মনে বদ্ধমূল করে দেয়।

এইরকম একটা মানসিকতা থেকেই ১৯৫০ সালে পূর্ব-পাকিস্তান আইন-সভা জমি দখল ও মালিকানা সংক্রান্ত এক আইন পাশ করলেন। আইনে

ব্যক্তিগত মালিকানার সর্বোচ্চ সীমা ধার্য করা হলো ৩৬ একর এবং জমিতে সবরকমের মধ্যস্বত্বভোগী স্বার্থের অবসান ঘোষণা করা হলো। এইসব মধ্যস্বত্ব ভোগীদের অনেকেই জমিদারের হয়ে কৃষকের কাছ থেকে খাজনা আদায়ের তহশীলদারী করত।

পূর্ব-পাকিস্তানের ভূমিব্যবস্থা পড়েছিল একেবারে আদিম স্তরে। মোট আবাদযোগ্য জমির শতকরা ৮০ ভাগ ছিল জমিদার ও তাদের কর্মচারী নায়েব গোমস্তা, তহশীলদারদের হাতে। মধ্যস্বত্বভোগী এইসব জমিদারী সেরেস্তার কর্মচারীদের স্বার্থ এতোই সুদূরপ্রসারী ছিল যে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে কৃষক ও জমিদারের মধ্যে প্রায় ৫০ রকমের মধ্যস্বত্বভোগী দেখা যেত। (এ্যাণ্ডরুজ্ ও মোহাম্মদ: দি ইকনমি অব্ পাকিস্তান, পৃষ্ঠা ৬৮, সোভিয়েতে প্রকাশিত ইতিহাসে উদ্ধৃত, পৃষ্ঠা ১০৪)।

১৯৫০ সালের আইন সামন্ত-শোষণকে বন্ধ করতে উদ্যত হওয়ায় দলে-দলে হিন্দু জমিদারশ্রেণীর মানুষরা দেশ ছাড়তে শুরু করেন। জমিদার-জোতদারদের এইসব ছেড়ে আসা জমি-জায়গা দরিদ্র, ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে বণ্টন করা হয়। তখন এইটুকু লক্ষ্য রাখা হয়েছিল যে, কোনো জমিতে কর্মরত কোনো ভাগচাষীকে অন্যদের মধ্যে জমির বিলিব্যবস্থা করার সময়ও উচ্ছেদ করা হবে না। এর থেকে এইরকমের একটা সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে যে ভূমিব্যবস্থার স্বাধীনতা-পূর্বকালের নগ্ন সামন্ত-শোষণ ব্যবস্থার অবসান ঘটেছে।

সাত

যদিও তত্ত্বগতভাবে এই আইনের আওতায় সব ধর্মের মানুষই পড়বে, তবু হিন্দুদের মধ্যে এই আইন এমনই একটা মনের দিক থেকে ভেঙে পড়া ভাবের সূচনা করে যে, এরপরে তারা আর ওখানে থাকতে সাহস করেনি, বা মর্যাদা নিয়ে বাস করা যাবে না মনে করে দেশত্যাগী হয়। কিন্তু বড়ো জোতদার, জমিদারদের জমি-জায়গার মালিকানায় কিছুটা রদবদলের সূচনা হলেও, দরিদ্র, ভূমিহীন কৃষকের এই আইন থেকে বিশেষ কোনো সুবিধা হয়নি। বরং দেখা গেছে যে, যতই দিন কেটেছে দরিদ্র চাষীদের সংখ্যাও ক্রমাগত বেড়েছে। একটি পরিসংখ্যানে দেখা যায় ৫ একরেরও কম জমির মালিকদের অধীনে রয়েছে পূর্ব-পাকিস্তানে মোট ৯২, ৫৪, ১৩৪ একর জমি। এরমধ্যে আবার মাত্র আড়াই একর জমির মালিকদের অধীনে মোট জমির পরিমাণ ছিল ৩৫, ২৯,

৯৯৫ একর। আড়াই একর জমির মালিকদের সংখ্যা হলো ৪০ লক্ষেরও বেশি সংখ্যক কৃষক ও কৃষক-পরিবার।

পূর্ব-পাকিস্তানে ভাগচাষীর সংখ্যা তুলনামূলক আকারে পশ্চিম-পাকিস্তানের চেয়ে কম। এদের আনুমানিক সংখ্যা হলো ১ লক্ষের মতো। যাদের কোনো জমি নেই সেইসব ক্ষেতমজুর ও তাদের পরিবারবর্গের সংখ্যা প্রায় ১৪ লক্ষ। এছাড়া মাঝেমধ্যে অন্যের জমিতে জনমজুরী খাটতে বাধ্য হয় এমন মোট প্রায় ৩২ লক্ষ লোক হিসেবে ধরলে দেখা যাবে যে, ছোট-ছোট জোতজমির মালিক ও ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যার মধ্যে আনুমানিক ব্যবধান হলো মাত্র ৬ লক্ষ।

ঋণের দায় ও জমির উপর ধার্য নানা কর নিয়মিত দিতে বাধ্য থাকার জন্যে ছোট-ছোট জোতজমির মালিকদের প্রায়ই জমি বন্ধক রেখে অথবা বিক্রি করে টাকা দিতে হয়। ফলে তাদের মালিকানা ক্রমেই সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে। তাছাড়া উত্তরাধিকার আইনের নানা জটিলতার জন্যে ছোট-ছোট জোতজমির মালিকদের মৃত্যুর পরে, জমির এলাকা নানাভাগে খণ্ডীকৃত হয়ে আরো বেশি লাভজনক চাষের অযোগ্য হয়ে যায়। তখন বহুসময়ে উত্তরাধিকারীরা সেই জমি বিক্রি করে দিতে বাধ্য হয়। এইসব কারণেই ভূমিহীন কৃষকদের সংখ্যা এখন ক্রমশ বাড়তির দিকে। এক কথায় বলা যায় ভারতীয় কৃষিব্যবস্থার মৌল চরিত্রের সঙ্গে পূর্ব-পাকিস্তানের কৃষিব্যবস্থার চরিত্রগত বিধি তো আছেই, বরং বিশেষ যে কোনো পার্থক্য নেই তা বোঝা যায়। ভারতের বিশেষ করে পশ্চিম-বাঙলার মতো পূর্ব-পাকিস্তানের ভূমিহীন কৃষকরা বা গ্রামীন সর্বহারা সারা বছরের মধ্যে মাত্র কয়েক মাসের জন্যে কাজের যোগাড় করতে পারে, কোনোমতে ক্ষুধার অন্ন পায়।

ছোট-ছোট জোতজমির মালিক কৃষকরা সরকারী ব্যবস্থার জন্যে সবদিক থেকে উৎপীড়িত, শোষিত হয়ে থাকে। জমির খাজনা থেকে শুরু করে, কৃষকের উৎপাদিত সবকিছুর উপরে কর ধার্য করার জন্যে এমনকি বাস্তুজমির উপরে যথেষ্ট পরিমাণে কর বসানোর ফলে, কৃষকদের ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্য দিনদিন প্রকট হয়ে উঠেছে। সরকারকে দেয় টাকা যথাসময়ে ঠিকমতো দিতে না পারলে, তার বাস্তুজমি থেকে ক্ষেত-খামার নীলাম হয়ে যেতে পারে সরকারী নির্দেশে প্রাপ্য টাকা উসুল করার জন্যে। জমি-জমা ও বাস্তু হারাবার ভয়ে কৃষকরা তাই অনন্যোপায় হয়ে ঋণের সন্ধান করে যার ফলে ঋণের বোঝা

ক্রমাগত বেড়েই যায়। কৃষি ঋণের ব্যাপারে পাকিস্তানের সরকারী নীতি আদৌ কিছু নেই বলা চলে। কারণ পাক রাষ্ট্রের শাসকশ্রেণীর মধ্যে সামন্ত-স্বার্থের জোরালো প্রভাব থাকায়, দরিদ্র কৃষকদের জন্যে সরকারী সাহায্য প্রাপ্তির কোনো সুযোগ নেই। তবু আনুষ্ঠানিকভাবে যা-কিছু সাহায্যের ব্যবস্থা সরকারী উদ্যোগে করা হয়েছে, তার সুযোগ পেয়ে থাকে বড়োবড়ো জোতজমির মালিকরা এবং মূলত পশ্চিম-পাকিস্তানে।

পূর্ব-পাকিস্তানে পরিকল্পনাকালে যে-সমস্ত কৃষি-উন্নয়নমূলক কর্মসূচি রূপায়িত হয়েছে, প্রসঙ্গত উল্লেখ্য হলো, তার সুযোগ-সুবিধা গেছে গ্রামের সেইসব লোকদের কাছে, যারা স্থানীয়ভাবে জঙ্গীশাহীর প্রত্যক্ষ প্রতিনিধি। সারা পাকিস্তানে ফৌজী-আমলা-সামন্ত-শিল্পপতি চক্র যে-বুনিয়াদী গণতন্ত্র চালু করে ১৯৬২ সালে, কৃষি-উন্নয়ন কর্মসূচি সেই বেসিক ডেমোক্র্যাটদের জঙ্গী শাসনের খুঁটি হিসেবে গড়ে তুলেছে। পূর্ব-পাকিস্তানের গ্রামাঞ্চলে দরিদ্র কৃষকদের ঋণের যোগান দেওয়ার উৎস একমাত্র তারাই।

আট

১৯৬১ সালের আদমসুমারীতে পূর্ব-পাকিস্তানে গ্রামীন অর্থনীতির চিত্র পরিষ্কারভাবে ধরা পড়ে। এখানে শতকরা ৫২ জন কৃষক নিজেদের কিছু-না-কিছু জমিতে চাষ করলেও দেখা যায় যে তাদের এক গরিষ্ঠ অংশের দারিদ্র্য ভয়াবহ। জমির মালিকানা আছে এমন কৃষিজীবী পরিবারের শতকরা ৫১ ভাগের মোট জোতের পরিমাণ হলো ২'৫ একর। আবার গ্রামাঞ্চলে কোনো জমিই নেই এমন লোকের সংখ্যা হলো মোট জনসংখ্যার শতকরা ২৬ ভাগ। এরসঙ্গে জমির মালিকানার হস্তান্তরের দিকে নজর দিলে দেখা যাবে যে পরবর্তী দশ বছরে ভূমিহীন কৃষকদের সংখ্যা বেড়েছে অন্তত আরো শতকরা ১০ ভাগ। দেশের মোট জনসংখ্যার শতকরা ৭৫ জনের নির্ভরতা কৃষিকাজ হলে, এই শতকরা প্রায় ৩৬ ভাগ গ্রামীন সর্বহারার যে ভয়াবহ অর্থনৈতিক অবস্থার কথা প্রকাশ পায় তাতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই।

ভূমিব্যবস্থার এই বাস্তব চিত্রের পরিপ্রেক্ষিতে এ-কথা বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, কেন ১৯৬৫-৬৬ সাল থেকে পূর্ব-পাকিস্তানে পরপর তিন বছর ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ হয়েছে। ১৯৬৫-৬৬ সালে যেখানে পূর্ব-পাকিস্তানে ধান উৎপাদিত হয়েছে ১০৩ লক্ষ টন, ১৯৬৬-৬৭ সালে তা নেমে দাঁড়ায় ৯৪ লক্ষ

টনে। যদি জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার শতকরা ৩ ভাগ ধরা হয়, তাহলে ১৯৬৬-৬৭ সালে মোট খাদ্যশস্যের প্রয়োজন ছিল প্রায় ১১৫ লক্ষ টন। সুতরাং এই বছরে খাদ্যশস্যের নীট ঘাটতির পরিমাণ ছিল ২০ লক্ষ টনের বেশি। এরসঙ্গে চালের শতকরা ৩০ ভাগ মূল্যবৃদ্ধি ও সাধারণভাবে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস পশ্চিম-পাকিস্তান থেকে আমদানী করার জন্যে শতকরা প্রায় ৫০ ভাগ অতিরিক্ত মূল্য দিতে হওয়ায়, পূর্ব-পাকিস্তানের কোটিকোটি মানুষ কি নিদারুণ অবস্থার মধ্যে পড়েছিল অনুমান করা যায়। এরসঙ্গে প্রাকৃতিক প্রাণহানি যুক্ত হতে পারে, তা সহজেই অনুমান করা যায়।

নয়

পাকিস্তান কায়েমের দিন থেকে শিল্পায়নে পূর্ব-পাকিস্তান পশ্চিম-পাকিস্তানের তুলনায় অনগ্রসর। স্বাধীনতার ২৪ বছরে এই আপেক্ষিক হার পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে সামান্যতম পরিবর্তিত হয়নি, পূর্ব-পাকিস্তানের সম্পদ শোষণ করে পশ্চিমে যে শিল্পায়ন করা হয়েছে, তাতে দুই অংশের শ্রমিকশ্রেণীর জীবনের মান বিশেষভাবে পরিবর্তিত হয়নি, বা তার কোনো বিশেষ তারতম্য দেখা যায়নি। অর্থাৎ শ্রমিকশ্রেণী পশ্চিমে অথবা পূর্বে শাসকশ্রেণীর দ্বারা সমভাবে শোষিত। ১৯৬৯ সালের একটি পরিসংখ্যানে তা স্পষ্ট বোঝা যায়। পূর্ব-পাকিস্তানে শ্রমিকদের মাথাপিছু গড় মাসিক আয় যেখানে ১৭ টাকা, পশ্চিম পাকিস্তানে সেখানে মাথাপিছু গড় মাসিক আয় হলো ১৭.৪ টাকা। সুতরাং পাকিস্তানের দুই অংশে শ্রমিকদের শ্রেণীগত স্বার্থ ও সমস্যা মূলত একই, যদিও সমকালীন জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রভাবে এবং রাজনৈতিক দলগুলির শ্রেণীভিত্তি দুর্বল ও অসংগঠিত হওয়ার জন্যে, এই বাস্তব অবস্থা মানুষের নজর এড়িয়ে যাচ্ছে। সম্ভবত এছাড়া উপায়ও বোধহয় আপাতত নেই।

পূর্ব-পাকিস্তানের শিল্পবিকাশ কোনোদিনই পাক-শাসকদের অভিপ্রেত ছিল না। তাঁরা পূর্বাঞ্চলকে পশ্চিমের কাঁচামাল রপ্তানীর কেন্দ্র ও পশ্চিমাঞ্চলে উৎপাদিত শিল্প-পণ্যের সংরক্ষিত বাজার হিসেবে ব্যবহার করতে চেয়েছেন। অর্থনৈতিক কাঠামো সেইভাবেই গড়ে তোলা হয়েছে। পূর্ব-পাকিস্তানের পাট, চা, চামড়া রপ্তানী থেকে প্রাপ্ত অনুকূল বাণিজ্য-উদ্বৃত্ত বিনিয়োজিত হয়েছে পশ্চিম-পাকিস্তানের শিল্পায়নে। ফলে পূর্ব-পাকিস্তানে শিল্প-শ্রমিকদের সংখ্যা ১৯৫১ থেকে ১৯৬১ সালের মধ্যে যেখানে বৃদ্ধি পেয়েছে শতকরা ৪.৪ ভাগ

থেকে ৫.৩ ভাগ, সেখানে পশ্চিম-পাকিস্তানে অনুরূপ বৃদ্ধির হার হলো শতকরা ১৭.৮ ভাগ থেকে ২৪.৫ ভাগ।

পূর্ব-পাকিস্তানের শিল্পসংস্থাগুলি মাত্র কয়েকটি জায়গায় কেন্দ্রীভূত হওয়ায়, যথা ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, খুলনা ইত্যাদি এবং প্রদেশের অর্থনৈতিক জীবনে তাদের প্রভাব পরোক্ষ বা গৌণ হওয়ায় সমগ্রভাবে শ্রমিকশ্রেণী সমাজ-জীবনে বিশেষ কোনো প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। শ্রমিকশ্রেণীর অসংগঠিত অবস্থাও এরজন্যে বহুলাংশে দায়ী। তাছাড়া শ্রমিক-শ্রেণীর মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে অবাঙালি থাকায় এবং এই অঞ্চলের সাম্প্রতিক রাজনীতি মোটামুটি জাতীয়তাবাদী পথে পরিচালিত হওয়ার জন্যে, শ্রমিক-শ্রেণীর প্রভাব সীমিত থেকেছে।

কৃষিপ্রধান পূর্ব-পাকিস্তানে সামাজিক শক্তি হিসেবে কৃষক-সমাজই বর্তমান স্তরে মুখ্য শক্তি। কিন্তু অনুন্নত দেশের কৃষক-সমাজ যেহেতু সামাজিক শক্তি হিসেবে তার যথাযথ দায়িত্ব পালনে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করতে বহু বিলম্ব ঘটায়, যেহেতু কৃষকদের রাজনৈতিক সচেতনতার মান নানা সংস্কার ও গতানুগতিকতার মোহে যথেষ্ট সক্রিয় না হয়ে, মাঝেমাঝে সুবিধাবাদী ঝোঁক দেখায়, তাই রাজনৈতিক জীবনে উদ্যোগী ভূমিকা নেওয়ার দায়দায়িত্ব এসে যায় শহরবাসী মধ্যবিত্ত, নিম্নমধ্যবিত্ত বিভিন্ন পেশার, শিক্ষিত মানুষের হাতে। ১৯৬৬ সাল থেকে পূর্ব-পাকিস্তানের রাজনীতিতে সমাজের এই অংশের ভূমিকাই প্রধান। পেটিবুর্জোয়া ভাবধারার অধীন এই সক্রিয় অংশ, জাতীয়তা-বাদী আন্দোলনের স্তরে যতটা সক্রিয়, এমনকি গণতান্ত্রিক আন্দোলনে বামপন্থী কর্মসূচি গ্রহণ করে যতটা অগ্রসর হতে পারে তার পরবর্তী পর্যায়ে কৃষক-সমাজের সংগঠিত অংশগ্রহণ ছাড়া সেই আন্দোলন তার নির্দ্ধারিত লক্ষ্যে পৌছতে পারে না। পূর্ব-পাকিস্তান তথা আজকের বাঙলাদেশের পটভূমিতে তাই সামাজিক শ্রেণীসমূহের ঐতিহাসিক ভূমিকার নবমূল্যায়ন ও দায়িত্ব বণ্টনের প্রসঙ্গটি একান্ত জরুরী।*

---

* প্রবন্ধের পঞ্চম বিভাগ থেকে শেষ পর্যন্ত আলোচিত কাঠামো ও তথ্যের জন্যে তারিক আলির 'পাকিস্তান, মিলিটারী রুল অর পিপ্‌ল্‌স্ পাওয়ার' গ্রন্থের উপর বিশেষভাবে নির্ভর করা হয়েছে।

পাকিস্তান থেকে বাঙলাদেশ

জহির রায়হান

পাকিস্তানের গত তেইশ বছরের ইতিহাসের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক হলো, পাকিস্তান কখনো জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা শাসিত হয়নি।

প্রথম প্রধানমন্ত্রী নবাবজাদা লিয়াকত আলী খান জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি ছিলেন না। তিনি চক্রান্তের রাজনীতিতে আস্থাবান ছিলেন এবং তাঁর আমল থেকেই পাকিস্তানের রাজনীতিতে ইঙ্গমার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও তাদের তল্পিবাহকদের প্রতিযোগিতামূলক ক্ষমতার দ্বন্দ্ব ও চক্রান্তের জাল বিস্তার পেতে থাকে। চৌধুরী মোহাম্মদ আলী, গোলাম মহম্মদ, ইসকান্দার মির্জা, এঁরা সবাই বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের অনুগত ভৃত্য ছিলেন এবং চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রের রাজনীতির গুপ্ত পথ বেয়ে পাকিস্তানে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করেছিলেন।

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সরাসরি নিয়োগপত্র নিয়ে ক্ষমতায় আসেন বগুড়ার মোহাম্মদ আলী। ক্ষমতায় আসার সঙ্গেসঙ্গে পূর্বপরিকল্পিত পন্থায় বিভিন্ন সামরিক চুক্তি সম্পাদন করে পাকিস্তানকে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের লেজুড়ে পরিণত করেন তিনি।

পাঞ্জাবের মালিক ফিরোজ খান নূন আর করাচীর আই. আই. চুন্দ্রিগড়ও সেই একই চক্রান্তের সিঁড়ি বেয়ে ক্ষমতায় আরোহণ করেন। আইয়ুব খান ছিলেন বৃটিশ সামরিক বাহিনীর একজন পেশাদার সৈন্য। তিনি ক্ষমতায় এসেছিলেন সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে। একটি সামরিক 'জুন্টা'র সহায়তায়। আইয়ুব খানের অনুচর কালাতের খান মোনায়েম খান, সবুর খান্ এঁরাও কেউ প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে গদীনসীন হননি।

পাকিস্তানের সর্বশেষ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানও ক্ষমতায় এসেছেন সামরিক বাহিনীর দৌলতে, ষড়যন্ত্রের রাজনীতির অন্ধকার পথ বেয়ে; আর তাই লিয়াকত আলী খান থেকে ইয়াহিয়া খান, পাকিস্তানের গত তেইশ বছরের ইতিহাস হচ্ছে গুটিকয়েক ক্ষমতালিপ্সু; কায়েমী স্বার্থবাদী, আমলা

মুৎসুদ্দি; সামন্তপ্রভু, ধনপতি, সাম্রাজ্যবাদের পদলেহী, সামরিক ও রাজনৈতিক স্বার্থশিকারীদের প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের ইতিহাস।

যেহেতু, চক্রান্ত, দলাদলি ও ষড়যন্ত্রের পঙ্কিলতার মধ্যে এই শাসকগোষ্ঠীর জন্ম, লালন-পালন ও মৃত্যু, সেইহেতু ওই তিনটি প্রক্রিয়ার প্রতিই তাঁরা আস্থাবান ছিলেন। জনগণের কথা তাঁরা ভাবতেন না, কিম্বা ভাববার অবসর পেতেন না। জনগণের কোনো তোয়াক্কা তাঁরা করতেন না। জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষা তাঁদের চাওয়া-পাওয়া আর দাবি-দাওয়ার প্রতি সবসময় এক নিদারুণ নিস্পৃহতার পরিচয় দিয়ে এসেছেন এই শাসকচক্র।

তাই এই গণবিমুখ শাসকচক্রের হাতে পড়ে পাকিস্তানের সাধারণ মানুষ এক দুঃসহ সময় অতিবাহিত করেছে গত তেইশ বছর ধরে। ধনীরা আরো ধনী হয়েছে। গরিবের দল আরো গরিব হয়ে গেছে। যেহেতু এই শাসকচক্র, পাঞ্জাবী ভুস্বামী, পাঞ্জাবী ধনপতি, পাঞ্জাবী আমলা-মুৎসুদ্দি ও পাঞ্জাবী সামরিক 'জুণ্টা'র দ্বারাই বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত হতো, সেইহেতু পাকিস্তানের বাকি চারটি প্রদেশ, পূর্ববাঙলা, বেলুচিস্তান, সিন্ধু ও সীমান্তপ্রদেশের সাধারণ মানুষ এই শাসকচক্রের হাতে আরো বেশি লাঞ্ছিত, নিগৃহীত ও শোষিত হয়েছে। সবচেয়ে বেশি শোষিত হয়েছে পূর্ববাঙলা ও পূর্ববাঙলার মানুষ। পাকিস্তানের জনসংখ্যার শতকরা ছাপান্ন ভাগ অধ্যুষিত পূর্ববাঙলা এই শাসক চক্রের হাতে সবচেয়ে বেশি উপেক্ষিত হয়েছে। যদিও পাকিস্তানের আয়-করা বৈদেশিক মুদ্রার অধিকাংশ আসত পূর্ববাঙলা থেকে তবু পূর্ববাঙলাকে তার আয়ের সিকিভাগও ভোগ করতে দেওয়া হতো না। সব তারা ব্যয় করত পশ্চিম-পাকিস্তানে, বিশেষ করে পাঞ্জাবে কলকারখানা তৈরির কাজে। যদিও কেন্দ্রীয় পাক সরকারের আয়ের শতকরা সত্তরভাগ আসত পূর্ববাঙলা থেকে। তবু, শিক্ষাখাতে পশ্চিম-পাকিস্তানের জন্যে ব্যয় করা হতো মাথাপিছু চার টাকা ছআনা তিন পাই, আর পূর্ববাঙলার জন্যে মাথাপিছু মাত্র এক পাই।

শিল্পক্ষেত্রে পশ্চিম-পাকিস্তানের জন্যে মাথাপিছু একাত্তর টাকা চার আনা পনেরো পাই, আর পূর্ববাঙলার জন্যে মাথাপিছু মাত্র পাঁচ টাকা বারো আনা পাঁচ পাই। সমাজ উন্নয়নের ক্ষেত্রে পশ্চিম-পাকিস্তানে মাথাপিছু পাঁচ টাকা দুই আনা সাত পাই, আর পূর্ববাঙলার জন্যে মাথাপিছু মাত্র নয় আনা ছয় পাই।

বৈষম্যের এখানেই শেষ নয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে যে-বছরে মাত্র সত্তর

লক্ষ টাকা সাহায্য দেয়া হয়েছে সেই একই বছরে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়কে সাহায্য দেয়া হয়েছে চার কোটি দশ লক্ষ টাকা। যে-বছরে ঢাকা রেডিওর জন্যে ব্যয় করা হয়েছে মাত্র এক-লক্ষ বিরানব্বুই হাজার টাকা। সেই একই বছরে পশ্চিম-পাকিস্তানের রেডিও স্টেশনগুলোর জন্যে ব্যয় করা হয়েছে নয় লক্ষ বারো হাজার টাকা। কেন্দ্রীয় সরকারের সর্বস্তরে নিযুক্ত পূর্ববাঙলার অধিবাসীদের হার হচ্ছে শতকরা মাত্র চারজন। আর পশ্চিম-পাকিস্তানের অধিবাসীদের হার শতকরা ছিয়ানব্বই জন।

বৈদেশিক বিভাগে রাষ্ট্রদূত পদসহ সমস্ত শ্রেণীর বঙ্গবাসী কর্মচারীর সংখ্যা শতকরা মাত্র পাঁচজন, আর পশ্চিম-পাকিস্তানের অধিবাসীদের হার হচ্ছে শতকরা পঁচানব্বই জন।

আর দেশরক্ষা বিভাগ? শতকরা ৯১'৯ ভাগ পশ্চিম-পাকিস্তানের অধিবাসী, আর শতকরা ৮'১ ভাগ পূর্ববাঙলাবাসী। কী নিদারুণ বৈষম্য কী ভয়াবহ শোষণ! পূর্ববাঙলার সদাজাগ্রত মানুষ তাই সংঘবদ্ধভাবে এই শোষণের অবসান দাবি করল। স্বায়ত্বশাসনের আওয়াজ তুলল তারা। আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবর রহমানের ছয় দফা দাবির মধ্যে স্বায়ত্বশাসনের কথাই বলা হয়েছে, তার বেশি কিছু নয়।

পূর্ববাঙলার সাধারণ মানুষের সঙ্গে পশ্চিম-পাকিস্তানের সাধারণ মানুষের কোনো বিরোধ ছিল না, এখনো নেই। পাকিস্তানের যে-কোনো অঞ্চলের মানুষের ওপরে যে-কোনো রকমের অত্যাচারের বিরুদ্ধে পূর্ববাঙলার জনগণ সবসময় সোচ্চার হয়েছে। পূর্ববাঙলার জনগণ শুধুমাত্র নিজেদের স্বাধিকার চেয়েই ক্ষান্ত থাকেনি, তারা পাকিস্তানের সকল ভাষাভাষী অঞ্চলের মানুষের স্বাধিকারের দাবি তুলেছে। পশ্চিম-পাকিস্তানের দুর্বল প্রদেশগুলোর ওপরে যখন শাসকচক্র জোর করে এক ইউনিটের জোয়াল চাপিয়ে দিয়েছে, তখন পূর্ববাঙলার জনগণ প্রতিবাদের ঝড় তুলেছে। পশ্চিম-পাকিস্তানের ক্ষুদ্রপ্রদেশ-গুলোর জনগণের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে তারাও এক ইউনিটের বিলোপ সাধনের দাবি তুলেছে।

বেলুচিস্তানের নিরীহ নিরস্ত্র মানুষের ওপর যখন জঙ্গী আইয়ুবশাহী তার সৈন্যদের লেলিয়ে দিয়েছে, যখন অসংখ্য অসহায় নরনারীকে লক্ষ্য করে মেশিনগানের গুলি চালিয়েছে তখন পূর্ববাঙলার মানুষ প্রতিবাদমুখর হয়েছে। এই গণহত্যার নায়ক আইয়ুব খানের বিচার দাবি করেছে।

পাকিস্তানের শাসকচক্র সবসময় পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সাধারণ মানুষের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করার চেষ্টা করেছে, এবং সেই বিরোধের ঘোলা জলে নির্বিঘ্নে সাঁতার কেটে বেঁচে থাকতে চেয়েছে। কিন্তু ১৯৬৯ সালে তাদের সে-প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলো। সারা পাকিস্তানের মানুষ একসঙ্গে আইয়ুব খানের ডিক্টেটরী শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করে দিল। পূর্ববাঙলা, সিন্ধু, সীমান্ত প্রদেশ, বেলুচিস্তান আর পাঞ্জাব একসঙ্গে গর্জে উঠল।

খাইবার থেকে টেকনাফ প্রতিটি অঞ্চলের জনগণ, ছাত্র, শ্রমিক, কৃষক, মধ্যবিত্ত, বুদ্ধিজীবী প্রতিটি স্তরের মানুষ গণতন্ত্রের পতাকা হাতে নিয়ে আইয়ুব খানের স্বৈরাচারী শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে অভূতপূর্ব আন্দোলনের জন্ম দিল।

পাকিস্তানের ইতিহাসে এই প্রথম সারা পাকিস্তানের মানুষ দল-মত-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে ঐক্যবদ্ধ হলো গণবিমুখ শাসকচক্রকে উৎখাতের লড়াইয়ে। ১৯৬৯-এর এই ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন পাকিস্তানের শাসকচক্রের ভিত নড়িয়ে দেয় এবং তারা বুঝতে পারে যে জনতার এই একতায় ফাটল না ধরাতে পারলে তাদের একচেটিয়া শোষণ আর গণবিমুখ শাসনব্যবস্থাকে দীর্ঘদিন বাঁচিয়ে রাখা সম্ভবপর হবে না। জনতার মধ্যে ভাঙন ও বিরোধ সৃষ্টির সবচেয়ে সহজ পন্থা হচ্ছে সাম্প্রদায়িক কলহের জন্ম দেয়া। হিন্দু-মুসলমান বিরোধ, বাঙালি-অবাঙালি বিরোধ, পাঞ্জাবী-পাঠান বিরোধ, শিয়া-সুন্নি বিরোধ। অতীত ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যাবে যখনই শাসকশ্রেণীর মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছে, যখনই গদীচ্যুত হবার সম্ভাবনা প্রকট হয়ে উঠেছে, তখনই যে-কোনো একটি সাম্প্রদায়িক পদ্ধতি অবলম্বন করে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্তির পথে চালিয়ে, আত্মকলহে লাগিয়ে দিয়ে নিজেদের আসন পাকাপোক্ত করেছে তারা।

১৯৬৯এর ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে ফাটল ধরাবার চেষ্টা করেও যখন শাসকচক্র ব্যর্থ হলো তখন একটি দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার অংশ হিসেবে আইয়ুব খান সরে গিয়ে ইয়াহিয়াখানের হাতে ক্ষমতা তুলে দিলেন। জেনারেল ইয়াহিয়া খান চক্রান্তের পরিকল্পিত পথে ধীরে ধীরে এগোতে থাকলেন। মুখে বলতে লাগলেন, প্রত্যক্ষ ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে তিনি ক্ষমতা হস্তান্তর করবেন। আসলে তাঁর পরিকল্পনা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন।

ছোট-বড় সকল রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে তিনি পৃথক-পৃথকভাবে মিলিত হতে লাগলেন; কখনো প্রকাশ্যে, কখনো গোপনে। উদ্দেশ্য ছিল পরস্পরের বিরুদ্ধে পরস্পরকে লাগিয়ে দেয়া। সকল দলের সঙ্গে সমানে তাল

রেখে চলছিলেন তিনি। নিজেকে সাধুসজ্জন হিসেবে উপস্থিত করছিলেন সবার কাছে। নির্বাচনের দিন তারিখ ঘনিয়ে আসতে লাগল। এমন সময় ১৯৭০ সালের নভেম্বর মাসের শুরুতে ভয়াবহ এক প্রাকৃতিক দুর্যোগের শিকার হলো পূর্ববাঙলার মানুষ। সর্বনাশা ঝড় আর সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসে দশ লক্ষ মানুষ মাত্র কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে প্রাণ হারাল। পঞ্চাশ লক্ষ মানুষ সহায়-সম্বলহীন হয়ে পড়ল। পৃথিবীতে এত বড়ো প্রাকৃতিক দুর্যোগ আর কখনো হয়নি। এই দুর্যোগের সময়ে হাজার হাজার বিদেশী সৈন্য, বিদেশী সাংবাদিক, বিদেশী সাহায্যকারীতে ভরে গেল পূর্ববাঙলার ঝড়-উপদ্রুত অঞ্চল। কিন্তু পাকিস্তানের শাসকচক্রের একটি লোকও এলেন না এই অসহায় মানুষগুলোকে একটু সান্ত্বনা জানাবার জন্যে। বাতাসে অনেক কথা শোনা যেতে লাগল। নানা প্রশ্ন উঠল নানা মহল থেকে। ত্রাণকাজের নাম করে বিদেশী সৈন্য কেন এসে নামবে আমাদের মাটিতে? আমাদের সৈন্যরা বসেবসে করছে কি? এতবড়ো দুর্যোগ ঘটে গেল কিন্তু দেশের প্রেসিডেন্ট আর তার সাঙ্গ-পাঙ্গরা নীরবে ইসলামাবাদ বসেবসে করছেন কি? বিদেশ থেকে হেলিকপ্টার আনতে হলো। কিন্তু আমাদের হেলিকপ্টারগুলো গেল কোথায়। নানা গুজব ছড়াতে লাগল দ্রুত। জনৈক বিদেশী সাংবাদিক জানালেন, তোমাদের জন্যে দুঃখ হয়। দশ লক্ষ লোক তোমরা ঝড়ে হারিয়েছ। কিন্তু আরো দুঃখ আছে তোমাদের কপালে। আরো অনেক প্রাণ তোমাদের দিতে হবে খুব শীঘ্রই। বিদেশী সাংবাদিকের এই উক্তি তখন থেকেই নানা আলোচনা, সমালোচনা, সন্দেহ এবং জল্পনা-কল্পনার জন্ম দিয়েছিল পূর্ববাঙলায়। অনেকের মনেই সন্দেহ জেগেছিল, আমরা কি কোনো বিশ্বরাজনীতির দাবা-খেলার ছকের মধ্যে পড়ে যাচ্ছি?

নির্বাচনের দিন ঘনিয়ে এলো। যথাসময়ে শান্তিপূর্ণভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠিতও হলো। পাকিস্তানের চব্বিশ বছরের ইতিহাসে এই প্রথম প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটে সারা পাকিস্তান ব্যাপি সাধারণ নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করার সুযোগ পেল পাকিস্তান নাগরিকেরা। নির্বাচনের ফলাফল বেরোবার সঙ্গেসঙ্গে দেখা গেল, পাকিস্তানের পাঁচটি প্রদেশের মধ্যে তিনটি প্রদেশে গণতন্ত্র, স্বায়ত্বশাসন ও একচেটিয়া শোষণের অবসানকামী দুটি দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছে। দল দুটি হলো, আওয়ামী লীগ আর ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি।

আর প্রদেশ তিনটি হলো, পূর্ববাঙলা, বেলুচিস্তান আর উত্তর-পশ্চিম

সীমান্ত প্রদেশ। বাকি দুটি প্রদেশ সিন্ধু ও পাঞ্জাবে জয়ী হলো জুলফিকার আলী ভুট্টোর দল পিপলস পার্টি। পিপলস পার্টির নির্বাচনী ইস্তাহারেও একচেটিয়া শোষণের অবসান ও সমাজতান্ত্রিক প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল।

নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশিত হলে দেখা গেল, যে-সমস্ত দল ও গোষ্ঠী দীর্ঘদিন ধরে পাকিস্তানে সাম্প্রদায়িকতার বীজ ছড়িয়ে এসেছে, পাকিস্তানের বিভিন্ন ভাষাভাষী জাতীর আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারকে অস্বীকার করে এসেছে এবং সাধারণ মানুষকে শোষণের জোয়ালে আবদ্ধ রাখতে চেয়েছে—সেই সমস্ত দক্ষিণপন্থী দলগুলোকে পাকিস্তানের জনগণ নির্বাচনের মাধ্যমে সরাসরিভাবে বর্জন করেছে।

পূর্ববাঙলায় নির্বাচনের ফলাফল গণতন্ত্রের ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় ঘটনা। জাতীয় পরিষদের ১৬৯টি আসনের মধ্যে ১৬৭টি আসন দখল করলেন শেখ মুজিবর রহমান ও তাঁর দল আওয়ামী লীগ। জাতীয় পরিষদে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করলেন তাঁরা। আওয়ামী লীগের এই বিজয়ের পেছনে যে-সকল সম্প্রদায়ের লোকের সমর্থন ছিল তার প্রমাণ হলো, ঢাকার মীরপুর, মোহাম্মদপুর, খুলনার খালিশপুর, রংপুরের সৈয়দপুর ও ঈশ্বরদী প্রভৃতি অবাঙালি অধ্যুষিত অঞ্চলেও আওয়ামী লীগের প্রার্থীরা বিপুল ভোটাধিক্যে, মুসলীম লীগ জামাতে ইসলাম ও নেজামে ইসলাম নামক সাম্প্রদায়িক দলের প্রার্থীদের পরাজিত করেছে।

নির্বাচনের এই ফলাফল পাকিস্তানের শাসক ও শোষকচক্রের নাভিশ্বাস তুলে দেয়। তাঁরা ভেবেছিলেন, নির্বাচনের কোনো একটি দল নিরঙ্কুশ সংখ্যা-গরিষ্ঠতা পাবে না। তাদের মধ্যে তখন ক্ষমতা নিয়ে কলহ দেখা দেবে এবং সেই কলহের সুযোগ নিয়ে পুরোন পাপীরা আবার নতুন করে ক্ষমতা দখল করে বসবে।

কিন্তু ফলাফল যখন উল্টো হয়ে গেল তখন আবার চক্রান্তে লিপ্ত হলো ষড়যন্ত্রের রাজনীতির ধারক-বাহক পাকিস্তানের শাসকচক্র। আবার সেই পুরনো বিভেদের রাজনীতির দাবা খেলা শুরু করল তারা। এবং এই দাবা খেলায় সুযোগ্য সহযোগী হিসেবে তারা ভুট্টো আর কাইউম খানকে দলে টেনে নিল। চারিত্রিক ও শ্রেণীগত দিক থেকে ভুট্টো আর কাইউম খান দুজনেই ছিলেন এই ষড়যন্ত্রকারীদের গোত্রভুক্ত।

খান আবদুল কাইউম খান হলেন সেই হিংস্র বর্বর রাজনীতিবিদ যিনি

উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলকে গণহত্যা আর জেল-জুলুমের মাধ্যমে সংখ্যালঘু দলে পরিণত করে ক্ষমতায় এসেছিলেন।

আর জুলফিকার আলী ভুট্টো হচ্ছেন সেই ব্যক্তি যিনি আইয়ুব খানের পোষ্যপুত্র হিসেবে তাঁর মন্ত্রীসভায় থাকাকালীন ছয় দফার প্রশ্নে শেখ মুজিবর রহমানকে বিচ্ছিন্নতাবাদী আখ্যা দিয়েছিলেন। পরে আইয়ুব খানের সভাসদের দল থেকে বিতাড়িত হয়ে সহসা সমাজতন্ত্রের বুলি কপচাতে থাকেন। আসলে তিনি একজন চরম প্রতিক্রিয়াশীল, ক্ষমতালোভী, বৃহৎ ভূস্বামী।

ভুট্টো এবং কাইউম খানকে দলে টেনে নিজেদের শক্তিশালী করলেন শাসকচক্র। তাঁরা দেখলেন পূর্ববাঙলার মানুষ স্বাধিকারের প্রশ্নে সবচেয়ে বেশি সোচ্চার। তাদেরকে যদি চিরতরে দাবিয়ে দেয়া যায় তাহলে বেলুচিস্তান, সিন্ধু আর সীমান্ত প্রদেশের জনগণের স্বাধিকার আন্দোলনকেও বানচাল করে দেয়া যাবে। এক ঢিলে চার পাখি মারতে সক্ষম হবেন তাঁরা।

তাই নির্বাচনের ফলাফল বের হবার সঙ্গেসঙ্গে পাকিস্তানের শাসকচক্র নানা ছল-চাতুরির আশ্রয় নিয়ে, ভুট্টো ও কাইউম খানের মাধ্যমে, পাকিস্তানের উভয় অংশের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি ও তিক্ততা সৃষ্টির চেষ্টা চালাতে লাগলেন। সঙ্গেসঙ্গে পূর্ববাঙলার মাটিতে বাঙালি ও অবাঙালিদের মধ্যে একটা সামগ্রিক দাঙ্গা-হাঙ্গামা বাঁধানোর চেষ্টাও করলেন তাঁরা, তাঁদের অনুচর মুসলীম লীগ, জামাতে ইসলাম আর নেজামে ইসলামের দালালদের মাধ্যমে। কিন্তু, পূর্ব-বাঙলার সদা সচেতন মানুষ এই প্ররোচনায় সাড়া না দেওয়ায় শাসকচক্র আবার বিপদে পড়ে গেলেন।

তখন জুলফিকার আলি ভুট্টো তাঁর মুখোশের কিছুটা খুলতে বাধ্য হলেন। শাসকচক্রের কলের পুতুল ভুট্টো হঠাৎ আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করলেন। তিনি জানালেন, জাতীয় পরিষদের নির্ধারিত বৈঠক পিছিয়ে দিতে হবে, নইলে, পেশোয়ার থেকে করাচী পর্যন্ত রক্তগঙ্গা বইয়ে দেবেন তিনি। তিনি জানালেন জাতীয় পরিষদের সভা বসার আগে শেখ মুজিবর রহমান ও তাঁর দলকে ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র ও ক্ষমতার বিলিবণ্টন সম্পর্কে তাঁর সঙ্গে একটা সমঝোতায় উপনীত হতে হবে। তা না করা পর্যন্ত জাতীয় পরিষদের বৈঠক ডাকা যাবে না।

এই ধরনের একটি অযৌক্তিক দাবি ও অন্যায় আবদার গণতন্ত্রের ইতিহাসে বিরল হলেও এটাই ছিল শাসকচক্রের চক্রান্তের আসল চেহারা, গোপন

বৈঠক ও আলোচনায় স্থির করা সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত। আর ইয়াহিয়া খান যে এই সিদ্ধান্তের অন্যতম ছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া গেল যখন ভুট্টোর হুমকীর সঙ্গে সঙ্গে তিনি জাতীয় পরিষদের ৩রা মার্চে আহূত সভা কোনো কারণ না দেখিয়েই অনির্দিষ্টকালের জন্যে মুলতুবি ঘোষণা করে দিলেন। যদিও জাতীয় পরিষদের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য তখন পরিষদের অধিবেশনে যোগ দেবার জন্যে ঢাকায় এসে জমায়েত হয়েছিলেন। এরমধ্যে কাইউম খান ও ভুট্টোর দল ছাড়া অন্য সব দলের সদস্যরা ছিলেন।

ইয়াহিয়া খানের এই হঠকারী ঘোষণা স্বাধিকারকামী পূর্ববাঙলার জনগণের মনে অসন্তোষের আগুন জ্বালিয়ে দিল। শাসকচক্রের চক্রান্তের কথা বুঝতে তাদের বাকি রইল না।

আওয়ামী লীগের নেতা শেখ মুজিবর রহমান জনগণকে শান্তিপূর্ণ অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের মাধ্যমে প্রতিবাদ জানাবার আহ্বান জানালেন। জনগণ অহিংস অসহযোগ আন্দোলন শুরু করল। ইয়াহিয়া খানের সেনাবাহিনী এই অহিংস জনতার ওপর বিনা প্ররোচনায় গুলিবর্ষণ করল। সহসা ঢাকা শহরে কারফিউ জারী করে একরাতে তাঁর বর্বর সৈন্যরা প্রায় দু-হাজার দেশ-প্রেমিককে খুন করলো। কিন্তু এই প্ররোচনার মুখেও শেখ মুজিবর রহমান জনগণকে শান্ত থাকার আহ্বান জানালেন। জনগণ শান্ত রইল। তখন শাসক-চক্রের ভাড়াটে দালালরা পূর্ববাঙলায় বাঙালি ও অবাঙালিদের মধ্যে একটা দাঙ্গা বাঁধাবার আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগল। এ-সময়ে শেখ মুজিবর রহমান দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করলেন পূর্ববাঙলায় বসবাসকারী প্রতিটি মানুষ, হিন্দু-মুসলমান, বৌদ্ধ-খৃষ্টান, বাঙালি-অবাঙালি সবাই সমান অধিকারের দাবিদার, সবাই পরস্পরের ভাই। শাসকচক্র দাঙ্গা বাধাতে ব্যর্থ হলো। কিন্তু অহিংস জনতার ওপরে তাঁরা গুলিবর্ষণের মাত্রা আরো বাড়িয়ে দিলেন। ইতিমধ্যে জেনারেল টিক্কা খানকে পূর্ববাঙলার সামরিক প্রশাসনের প্রধান ও গভর্নর হিসেবে নিয়োগ করে ঢাকায় পাঠান হলো।

জেনারেল টিক্কা খান হচ্ছেন সেই জেনারেল যিনি বেলুচিস্তানের নিরীহ জনগণ যখন ঈদের নামাজে অংশ নেওয়ার জন্যে কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন তখন তাঁদের ওপরে বিমান থেকে বোমাবর্ষণ করে ও মেশিনগান চালিয়ে কয়েক শ বালুচকে হত্যা করেন। সেই টিক্কা খানকে পূর্ববাঙলায় পাঠানো তাই অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

টিক্কা খান এলেন এবং তার কিছুদিন পরে ইয়াহিয়া খানও দলবল নিয়ে এলেন ঢাকায়। ১৬ই মার্চ তিনি শেখ মুজিবর রহমানের সঙ্গে আলোচনায় বসলেন। মুখে আলোচনার বাণী। এবং আলোচনার মাধ্যমে সকল সমস্যার সমাধানের ইঙ্গিত আর অন্যদিকে লোকচক্ষুর অন্তরালে এক বিরাট সামরিক অভিযানের প্রস্তুতি নিতে থাকলেন ইয়াহিয়া খান আর তার সামরিক 'জুন্টার' প্রধানরা।

জল এবং বিমান পথে হাজার হাজার সৈন্য আমদানি করলেন তাঁরা পূর্ব-বাঙলার মাটিতে। সামরিক নিবাসগুলোকে আরো সুদৃঢ় করলেন। ঢাকা সৈন্যশিবির ও বিমানপোতের চারপাশে অসংখ্য বিমানধ্বংসী কামান বসান হলো। মেশিনগান বসান হলো বিমানপোতের আশেপাশের বাড়ির ছাদে। একদিকে আলোচনার প্রহসন চলল আর অন্যদিকে চলল দ্রুত সামরিক প্রস্তুতি।

২৫এ মার্চ, ১৯৭১ সাল।

এল সেইদিন যে-দিনটির জন্যে পাকিস্তানের শাসকচক্র ১৯৬৯ সালের ২৫এ মার্চ থেকে অপেক্ষা করছিল। রাতের অন্ধকারকে আশ্রয় করে মিথ্যেবাদী তস্কর ইয়াহিয়া খান চুপিচুপি ঢাকা থেকে পালিয়ে গেলেন, এবং যাবার আগে তার বর্বর সেনাবাহিনীকে লেলিয়ে দিয়ে গেলেন বাঙলার নিরীহ নিরপরাধ নিরস্ত্র মানুষ নিধনযজ্ঞে।

ইতিহাসের এক বিভীষিকাময় গণহত্যা শুরু হলো। ট্যাঙ্ক, মেশিনগান, মর্টার, বোমারুবিমান ব্যবহৃত হলো নিরস্ত্র মানুষকে মারার জন্যে।

লক্ষ লক্ষ মানুষকে নির্মমভাবে হত্যা করল তারা।

কৃষক, শ্রমিক, মধ্যবিত্ত, নারী, পুরুষ, দুগ্ধপোষ্য শিশু, ছাত্র, কেরাণী, বুদ্ধিজীবী, কেউ বাদ গেল না তাদের এই নৃশংস বর্বরতার হাত থেকে। ইয়াহিয়া খানের হিংস্র বন্য সেনারা অসউইজ আর বুখেনওয়াল্‌ডের হত্যা-কাণ্ডকেও ম্লান করে দিল।

মৃত্যুর এই বিভীষিকার মধ্যে অসহায় বাঙলার মেহনতি মানুষ তার দুর্জয় মনোবল আর সাহস নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল মরণপণ প্রতিরোধ যুদ্ধে। বাঙলার বীর বেঙ্গল রেজিমেণ্ট, ই. পি. আর, আনসার আর পুলিশ বাহিনী তাদের মা বোনদের ইজ্জত রক্ষার জন্যে অস্ত্র তুলে নিল হাতে। আর অন্যদিকে, ইয়াহিয়া খানের বর্বর সেনারা গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে দিয়ে পুরো দেশটাকে শ্মশানে

পরিণত করতে লাগল।

হিংসার এই উন্মত্ততার মধ্যে বাঙলাদেশের জনগণের নিজস্ব সরকার গঠন ছাড়া আর অন্যকোনো পথ রইল না। বাঙলাদেশের জন-প্রতিনিধিরা তাই মুজিবনগরে সমবেত হয়ে স্বাধীন সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাঙলাদেশ সরকার প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষণা করলেন।

পাকিস্তান এখন বাঙলাদেশের মানুষের কাছে মৃত।

পাকিস্তানের এই অপমৃত্যুর জন্যে বাঙলাদেশের মানুষ দায়ী নয়। দায়ী পাকিস্তানের শাসকচক্র, যারা পাকিস্তানের সকল ভাষাভাষী অঞ্চলের মানুষের স্বাধিকারের প্রশ্নকে লক্ষলক্ষ মৃতের লাশের নিচে দাবিয়ে রাখতে চেয়েছে। পাকিস্তানের এই মৃত্যুর জন্যে শেখ মুজিবর রহমান ও তাঁর দলও দায়ী নয়। দায়ী, লিয়াকত আলীখান থেকে শুরু করে গোলাম মোহাম্মদ, চৌধুরী মোহাম্মদ আলী, ইস্কান্দার মির্জা, খাজা শাহাবুদ্দিন, খান আবদুল কাইউম খান, আইয়ুব খান, মোনায়েম খান, সবুর খান, ইয়াহিয়া খান, টিক্কা খান আর জুলফিকার আলী ভুট্টো প্রভৃতি গুটিকয়েক ক্ষমতালিপ্সু কায়েমী স্বার্থবাদী আমলা মুৎসুদ্দি, সামন্তপ্রভু, ধনপতি, সাম্রাজ্যবাদের পদলেহী রাজনৈতিক স্বার্থশিকারীর দল। যারা গত চব্বিশ বছর ধরে পাকিস্তানকে তাদের ব্যক্তিগত জমিদারি হিসেবে ব্যবহার করে এসেছে।

বাঙলাদেশ এখন প্রতিটি বাঙালির প্রাণ।

বাঙলাদেশে তারা পাকিস্তানের ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হতে দেবে না।

সেখানে তারা গড়ে তুলবে এক শোষণহীন সমাজব্যবস্থা, সেখানে মানুষ প্রাণভরে হাসতে পারবে, সুখে-শান্তিতে থাকতে পারবে।

বাঙলার সাড়ে সাত কোটি মানুষ আজ ঐক্যবদ্ধভাবে লড়ছে।

লড়ছে সর্বাধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত এক পেশাদার বাহিনীর সঙ্গে। লড়ছে, মৃত্যুকে তুচ্ছ করে জীবনকে অর্জন করার জন্যে।

বাঙলার মানুষের এই মুক্তির লড়াই পশ্চিম-পাকিস্তানের নিপীড়িত অঞ্চলের মেহনতি মানুষকেও শোষণমুক্ত হবার প্রেরণা যোগাবে।

বাঙলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামকে আমরা কেন সাহায্য করছি?

গৌরী আইয়ুব

পূর্ববাঙলা কবে স্বাধীন হবে এবং কিভাবে হবে সেসব প্রশ্নের নানাজাতীয় উত্তর দেওয়া হচ্ছে। প্রথম ধাক্কায় যেহেতু এই লড়াইয়ে বাঙালিরা জয়ী হননি তাই আমরা মনেমনে এখন একটি দীর্ঘ অন্ধকার রাত্রির জন্য নিজেদের প্রস্তুত করছি। একটি কথা যুদ্ধ বিশারদ ও রাজনীতি বিশেষজ্ঞরা বলছেন এবং সাধারণ মানুষও একরকম বুঝতে পারছেন যে বহুদিন ধরে একাহাতে এই লড়াই চালিয়ে যাবার সাধ্য পশ্চিম-পাকিস্তানী রণনায়কদের নেই। তবে এই আত্মক্ষয়ী যুদ্ধকে কল্পতরু দাদারা কতদিন চালিয়ে যেতে সাহায্য করবেন সে-বিষয়ে নানামুনির নানা মত। আমাদের দিক থেকে অন্তত কয়েক বছরের জন্য প্রস্তুত থাকা দরকার।

এই প্রস্তুতির একটা বড় অঙ্গ হলো আমাদের লক্ষ্য সম্বন্ধে দৃষ্টিকে স্বচ্ছ রাখা। নয়ত শেষে আশাভঙ্গের বেদনা আমাদের তিক্ত করে তুলবে। দীর্ঘ সংগ্রামের আনুষঙ্গিক হিসেবে যে-দুঃখবরণ করতে হয়, যন্ত্রণা সহ্য করতে হয় প্রত্যেকটি মানুষকে তা করবার শক্তি থাকে যদি লক্ষ্য সম্বন্ধে মনে একটা স্পষ্ট ধারণা করতে পারি। চীন ও পাকিস্তানের সঙ্গে গতদশকে দুবার সংক্ষিপ্ত মোকাবেলা হয়েছিল বটে কিন্তু সত্যিকারের একটা যুদ্ধ কবে আমরা করেছি তার কোনো স্মৃতিপরম্পরা কিছু নেই এমনকি আমাদের পিতামহীদের মনেও; ইতিহাসের পাতায় আমাদের পূর্বপুরুষদের কিছু যুদ্ধ ও বীরত্বের কাহিনী পড়েছি বটে। তাই যোদ্ধা জাতির যেসব চরিত্র-লক্ষণ থাকে সেসব আমাদের মধ্যে নেই। উপরন্তু দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধে পৃথিবীর বহু জাতির মধ্যেই চারিত্রিক অনেক দুর্বলতা দেখা দিয়েছে বলে শুনেছি। কারণ অভাব ও যন্ত্রণা একটা সীমা ছাড়িয়ে গেলে এবং বহুদিন ধরে চলতে থাকলে অনেকেরই মেরুদণ্ড গুঁড়িয়ে দেবে। ১৯৩৯-৪৪এর পরস্মৈপদী যুদ্ধেও আমাদের যেসব চরিত্রবিকার ঘটেছিল তার স্মৃতি হয়ত এখনও অনেকের স্পষ্ট মনে আছে। অবশ্য প্রয়োজনীয়

জিনিষ নিয়ে কালোবাজারী, মেয়ে নিয়ে ব্যবসা—কিছুই বাকি ছিল না, যার পচনক্রিয়া এখনও আমাদের সমাজে চলছে। এমনটা যাতে আবার ঘটতে না পারে তারজন্য দেশের অধিকাংশ মানুষকে একটি আদর্শে উদ্বুদ্ধ করে স্পষ্ট লক্ষ্যের দিকে পরিচালিত করা দরকার নয় কি ?

এবারও বলতে গেলে যুদ্ধটা একরকম পরস্মৈপদী, কিন্তু ঠিক তাও নয়। অনেক বড় আকারে এবং অনেক গভীর ও ব্যাপকভাবে এই লড়াইয়ে আমরা পশ্চিমবাঙলার মানুষরা প্রথমত এবং সারা ভারতের মানুষও; ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক এই লড়াইয়ে জড়িয়ে পড়েছি। প্রত্যক্ষত এই লড়াই এখনও যাঁরা চালিয়ে যাচ্ছেন তাঁদের অস্ত্র দিয়ে, খাদ্য দিয়ে, মনোবল জুগিয়ে সাহায্য করা তো আমাদের সম্পূর্ণ দায়িত্বের একটি ভগ্নাংশ মাত্র। এই লড়াইয়ের ফলে এক বিপুল সংখ্যক মানুষ প্রাণের ভয়ে ছুটে এসে সীমান্তের এইপারে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছেন। এত বড় শরণার্থীর বন্যা এত অল্প সময়ের মধ্যে আর কোন দেশে এসেছে ? যে-ইংরেজ সরকার অত্যন্ত ঠাণ্ডা মাথায় এখনও ইয়াহিয়া খানকে সাহায্য দিয়ে যাচ্ছে, কারণ পাকিস্তানী অর্থনীতি একবার ভেঙে পড়লে নাকি তাকে আবার দাঁড় করান সহজ হবে না, সেই সরকারেরও নিজের দেশে দু'মাসে চল্লিশ লক্ষ শরণার্থী এসে পৌছলে কেমন নাভিশ্বাস উঠত আর কি পরিমাণ ত্রাহিত্রাহি আর্তনাদ শোনা যেত সেটা ভেবে দেখবার বিষয়। যাই হোক এই লক্ষলক্ষ শরণার্থীকে আশ্রয় দেওয়া, আহার দেওয়া, মহামারী থেকে রক্ষা করা, এদের মনোবল জাগিয়ে তোলা এবং কোনো আত্মঘাতী হানাহানির প্ররোচনা থেকে এদের বাঁচিয়ে রাখা সহজ কাজ নয়। তাছাড়া সারা বিশ্বে অনুকূল জনমত গড়বার চেষ্টা করাও আমাদেরই দায়িত্ব, কারণ একদল পাক-প্রেমী প্রথম থেকেই দেশে-বিদেশে বলতে শুরু করেছে যে "If Pakistan splits no country in the world stands to gain except India"। অতএব ভারতবর্ষই পাকিস্তানকে ধ্বংস করতে নেমেছে। এর সমুচিত জবাব কথায় এবং কাজে প্রতিদিন দেওয়া প্রয়োজন। তাছাড়া পূর্ববাঙলায় কামানের মুখে পড়ে যে সাতকোটি মানুষ বিহ্বল ও শুব্ধ হয়ে পড়েছেন তাঁদের চিত্তকেও জাগিয়ে রাখার এবং প্রয়োজন হলে দুর্ভিক্ষের কবল থেকে তাঁদের বাঁচাবার দায়িত্বও বর্তেছে আমাদের এই গরিব দেশের উপর। আর এই গুরুদায়িত্ব যে আজ আমরা ইচ্ছা করলেই এড়াতে পারি তাও নয়। ভাগ্য আমাদের এমন আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছে পূর্ববাঙলার ভাগ্যের সঙ্গে যে, ওরা যদি মরে আমরাও

বাঁচব না। তাই শেষপর্যন্ত বাঙালি হিসেবে আত্মরক্ষার তাগিদেও এই ভার বওয়ায় কাঁধ আমাদের দিতেই হবে।

তাই বলছি, কাঁধ যখন আমরা সোৎসাহে দিয়েছি এবং যে-কোনো রকমেই হোক দিয়ে যাব বলেই মনে হচ্ছে তখন স্পষ্ট করে ভেবে রাখা দরকার সামনে আমাদের লক্ষ্যটা কি, কিসের আশায় আমরা আমাদের জাতীয় সম্মান ও সম্পদকে বাজি রেখেছি। সাধারণ মানুষকেও সে-বিষয়ে অবহিত করা দরকার। আমার আশেপাশে যাঁদের দেখছি সক্রিয়ভাবে নানারকম সাহায্য দিতে এগিয়ে এসেছেন কিংবা যাঁরা নিষ্ক্রিয়ভাবে খবরের কাগজ পড়ে আর উত্তেজিত আলোচনা করে সাহায্য করছেন পূর্ববাঙলাকে, তাঁদের সবারই কথাবার্তা আমি মন দিয়ে অনুধাবন করবার চেষ্টা করি। বলতে গেলে বাজারের মৎস্য ব্যবসায়ী (যাঁরা গত ২৩ বছরের কোনো এক পর্যায়ে পূর্ববাঙলা থেকেই চলে এসেছেন) থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক কিংবা রাজনৈতিক নেতা —সবারই প্রত্যাশার চেহারাটা আমি এঁচে দেখতে চেষ্টা করি তাঁদের কথাবার্তা থেকে। এঁদের মধ্যে আবার সব সম্প্রদায়ের মানুষ এবং ভিন্নভিন্ন ভাষাভাষী মানুষও আছেন। লক্ষ্য সম্বন্ধে এঁদের ধারণাগুলির আলাদা আলাদা চেহারা আছে। সেগুলিকে এভাবে সাজিয়ে দেওয়া যেতে পারে—

প্রথমত হিন্দুসমাজের একদল সোৎসাহে মনে করেন যে, যাক শেষপর্যন্ত ভিতর থেকেই পাকিস্তানে ফাটল ধরেছে। এবার ভারতবর্ষ একটা ধাক্কা দিতে পারলেই আবার যা আমাদের ছিল তা আমাদেরই হবে। কিন্তু এমন একটা ঈশ্বরপ্রেরিত সুযোগেরও সদ্ব্যবহার ইন্দিরা গান্ধী করলে হয়।

এরই উল্টোপিঠ হলো ভারতীয় কিছু মুসলমানের মনে সেই অবিশ্বাস যে ভারতবর্ষ এতদিন তক্কেতক্কেই ছিল—পাকিস্তানের দুই অংশ নিজেদের মধ্যে লড়াই বাধিয়ে দিয়ে এখন ভারতবর্ষের পথ প্রশস্ত করে দিল। হতভাগা বাঙালি মুসলমানদের এই হঠকারিতার ফলেই পূর্বপাকিস্তান আবার ভারতবর্ষের খপ্পরে এসে পড়বে।

ভারতবর্ষের সর্বত্রই বিরাট একদল নাগরিক আছেন যাঁরা গোড়া থেকেই দুই বাঙলা সম্বন্ধেই সন্দিগ্ধ। তাঁদের সন্দেহ বাঙালিদের আসল মতলব সম্বন্ধে। দুই বাঙলা এক হয়ে শেষে ভারতবর্ষ থেকেও সম্ভবত বেরিয়ে যাবে এবং ভারতবর্ষের বুকের উপর চীনের তাঁবেদার একটি কমিউনিস্ট রাষ্ট্র হিসেবে চেপে বসবে—এমনতর একটি আশঙ্কা এঁরা পোষণ করেন।

আর একদল নৈরাশ্যবিলাসী সেয়ানা মানুষ আছেন যাঁরা বলে থাকেন যে আমরা যেহেতু নির্বোধ তাই এই চোরাবালিতে পা দিয়েছি। শেষপর্যন্ত দেখব পূর্ববাঙলার বাঙালিরা আমাদের পিঠে চেপে নদী পার হয়ে আমাদেরই বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাচ্ছে। অর্থাৎ স্বাধীন পূর্ববাঙলায় আমাদের কোনো ঠাঁই হবে না। এমনকি এখানে এসে আশ্রয় নিয়েছেন যে শরণার্থীরা, যাঁদের অধিকাংশই হিন্দু, তাঁরাও আর ফিরে যেতে পারবেন না।

বলা বাহুল্য উপরোক্ত কোনো মতের প্রতিই আমার সহানুভূতি নেই। এ-জাতীয় বিকৃত চিন্তার অরণ্যে মাঝেমাঝে যে সুস্থচিন্তা চোখে পড়ে তার কথাই বলছি। সেই লক্ষ্য রাজ্যবিস্তারের লক্ষ্য নয়, গণতন্ত্র বিস্তারের লক্ষ্য। আমাদের দেশশুদ্ধ মানুষ এবং আমাদের সরকারও যে পূর্ববাঙলার এই রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্তে জড়িয়ে পড়েছে এবং যথাসাধ্য সাহায্য দেবার চেষ্টা করছে—এ কিসের আশায় ? শুনে কেউ হতাশ হবেন, কেউ বা আশ্বাস পাবেন যে ভৌগোলিক অর্থে রাজ্যবিস্তারের লোভ আমাদের সরকারের নেই, অন্তত না থাকা উচিত বলেই আমি মনে করি। আমরা পূর্ববাঙলাকে এই আশায় সাহায্য করছি না যে পূর্ববাঙলা মুক্ত হয়ে শেষে ভারতবর্ষের একটি অঙ্গরাজ্যে পরিণত হবে।

কেন ? কারণ পূর্ববাঙলার মানুষ তাদের দেশকে ভারতবর্ষের অঙ্গরাজ্যে পরিণত করতে চান এমন ইচ্ছা তাঁরা প্রকাশ করেননি। এই প্রসঙ্গে মাঝে মাঝে কেউ প্রশ্ন করেন, ওঁদের দিক থেকে বাধা কোথায় ? যদি ওঁরা সত্যিই বাঙালি হন, যদি ওঁরা ভারতবিভাগের মূলসূত্র দ্বিজাতিতত্ত্বে বিশ্বাস না করেন তবে ভারতবর্ষে ফিরে আসতে ওঁদের বাধা কোথায় ? বাধাটা স্বাভাবিক স্বার্থবুদ্ধিতে এবং আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকতর ক্ষমতালাভের বাসনায়। বিশ্বকে রাজনৈতিক ও ভৌগোলিক সীমানায় খণ্ডখণ্ড করা বিশ্বভ্রাতৃত্বের পরিপন্থী সত্যিই কিন্তু এই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরবর্তীকালে ইতিহাসটিই পর্যালোচনা করে দেখুন না মানচিত্রের সাহায্যে। এস্টোনিয়া, ল্যাটভিয়া, লিথুয়ানিয়া জাতীয় দু-চারটি দেশের বিলোপ ঘটলেও কত নতুন নতুন রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটেছে ! আমাদের দেশের দিকে তাকালেও সেই একই প্রবণতার প্রকাশ দেখব। লর্ড কার্জনের বঙ্গভঙ্গ নিয়ে কত আন্দোলন—কিন্তু আমরা স্বহস্তে এই ২৩ বছরে কতবার কতগুলি প্রদেশকে ভাঙতে বাধ্য হয়েছি ? আর এখনই যে খণ্ডীকরণের অবসান হয়েছে তাও কেউ সাহস করে বলতে পারব না। ত্রিপুরাকে কি আমরা রাজী করাতে পারব পশ্চিমবাঙলার সঙ্গে যোগ দিতে ? ধর্মে—ভাষায়—কোথায়

পার্থক্য ? মেঘালয় কি আর ফিরে যাবে পুরনো সেই আসাম রাজ্যের আওতায়। তবে সে-প্রত্যাশা আমরা পূর্ববাঙলার বেলাতেই বা করব কেন ? একটা পৃথক রাজনৈতিক অস্তিত্ব গড়ে উঠলে স্থানীয় কতগুলি প্রত্যাশার পুরণ হয়, স্থানীয় লোকেদের কিছু স্থযোগ-স্থবিধা লাভ হয়, সেগুলি তারা চট করে প্রত্যাহার করবে এমন আশা করা ঠিক নয়। যদি বৃহত্তর কোনো আশা বা আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে তাঁরা Toynbee নির্দেশিত confederation-এ রাজি হন স্বেচ্ছায় তো ভালো, না হলেও আমাদের ক্ষতি নেই।

না হলেও যে আমাদের ক্ষতি নেই বরং অনেকটা লাভ যে তাসত্ত্বেও থাকবে সে-কথাটা ভালো করে বোঝা দরকার। ধরে নিচ্ছি দুবছর ধরে এই প্রতিরোধ চালিয়ে যাওয়া হলো এবং শেষপর্যন্ত পশ্চিম-পাকিস্তানী সামরিক গোষ্ঠী মুজিবর রহমানকে মুক্তি দিয়ে একটা সমঝোতায় আসতে বাধ্য হলো। পশ্চিম-পাকিস্তানের মুখরক্ষার জন্য সেই সমঝোতাকে যে নামই দেওয়া হোক কার্যত সেটা স্বাধীন বাঙলাই হবে। এই স্বাধীন বাঙলার চেহারাটা কেমন হবে ? একটা সমাজতান্ত্রিক-গণতান্ত্রিক চেহারাই হয়ত হবে তারিক আলির মুখে ছাই দিয়ে। সমধর্মী পশ্চিম-পাকিস্তানের হাতে এভাবে নিগৃহীত হবার পর ধর্মসম্বন্ধে পূর্ববাঙলার মানুষের আরও অনেকটা মোহমুক্তি ঘটবে বলেই মনে হয়, ফলে এই নতুন রাষ্ট্রটি ধর্মনিরপেক্ষ চেহারা নেবে বলে ভরসা করা যায়। অতএব আজ সীমান্তের এইপারে যে অগণিত শরণার্থীকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যাঁদের অধিকাংশই হিন্দু, তাঁরাও আবার ফিরে যেতে পারবেন স্বদেশে। ধর্মনিরপেক্ষ হলেও যেহেতু পূর্ববাঙলা একটি মুসলমান প্রধান রাষ্ট্র হবে তাই এখানকার মুসলমানেরা এই নতুন রাষ্ট্রকে কেন আগের মতো ভরসার আশ্রয় বলে মনে করতে পারবেন না সেটা কিন্তু বুঝতে পারছি না। পৃথিবীতে কোনো একটি রাষ্ট্রের সরকারী ভাষা যে বাঙলা হবে এতে বাঙালিমাত্রই সুখী হবে, অর্থাৎ ভারতবর্ষের বাঙালিরাও। ভৌগোলিক এবং সাংস্কৃতিক উভয় অর্থেই এই স্বাধীন বাঙলার ঘনিষ্ঠতম প্রতিবেশী হওয়ার ফলে দুই বাঙলার মধ্যে অবশ্য প্রয়োজনীয় বহু পণ্যের আদান-প্রদান শুরু হবে। এমনকি কলকাতা এবং ঢাকায় প্রকাশিত বই বা তৈরি করা চলচ্চিত্রের বাজারও প্রসারিত হবে অনেকটা। আর্থিক দিক থেকে আরও বেশি কি লাভ হতো যদি পূর্ববাঙলা পুরোপুরি ভারতবর্ষের একটি অঙ্গরাজ্যে পরিণত হতো ?

পরিণত না হলেই বরং কিছু রাজনৈতিক ও নৈতিক লাভ আছে বলে আমি

মনে করি। একটি মুসলমান প্রধান ও যথার্থ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় যদি আমরা সাহায্য করতে পারি এবং এই নব প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রের কাছ থেকে আমরা সৌহার্দ্য, সাংস্কৃতিক যোগাযোগ ও বাণিজ্যিক আদান-প্রদানের বেশি কিছু প্রত্যাশা যদি না করি তবেই খুব মুখের মতো জবাব দেওয়া হবে। প্রথমত পৃথিবীর মুসলমান দেশগুলিকে আর সেইসঙ্গে ভারতবর্ষেরও কিছু মুসলমানকে যাঁরা আজ বোবার মতো রয়েছেন ইয়াহিয়ার নারকীয় হত্যাকাণ্ড দেখেও, যেন পূর্ববাঙলার মানুষ সারা পৃথিবীর মুসলমানের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে হিন্দুপ্রধান ভারতের কাছে সাহায্যপ্রার্থী হয়ে। তাছাড়া নানা জাতের গণতান্ত্রিক যত দেশ আছে যারা বিশ্বে গণতন্ত্র রক্ষার মহৎ উদ্দেশ্যে অমোঘ বহু মারণাস্ত্র তৈরি করছে আর বিবেকবুদ্ধিহীন তাঁবেদার দেশগুলির হাতে তুলে দিচ্ছে, সেইসব তথাকথিত গণতন্ত্রের রক্ষাকর্তা দেশগুলির সামনেও ভারতের এই নির্লোভ সাহায্য একটি নৈতিক দৃষ্টান্তস্বরূপ হবে। আমরা একদা তৃতীয় শিবির গড়ার কথা বলেছিলাম অসহায় দেশগুলির রক্ষাকল্পে। অন্তত একটি অসহায় জাতিকে বাঁচাতে পারলে আমাদের কথার মতো কাজও করা হবে।

এই শতাব্দীতে যেসব সামাজিক-রাজনৈতিক সমস্যা ভারতবর্ষকে বিব্রত করে রেখেছে তার মধ্যে নিষ্ঠুরতম ও জঘন্যতম হলো আমাদের সাম্প্রদায়িক সমস্যা। জিন্নাহ্ সাহেব দ্বিজাতিতত্ত্ব ব্যাখ্যান করে সে-অনুযায়ী দেশকে ভাগ করে এ-সমস্যার সুরাহা করতে চেয়েছিলেন। আজ ডঃ রফিক জ্যাকেরিয়ার মতো লোকেরা বলছেন never in recorded history, did a solution turn out to be so worse than the disease ; আর বাঙলাদেশের স্বাধীনতার লড়াই তো ঐ দ্বিজাতিতত্ত্বের বিষবৃক্ষটাই উপড়ে ফেলেছে গোড়া ঘেঁসে। তাই বলে যে এই তত্ত্বের ভূত অত সহজে ভারত-ছাড়া হবে সে-আশা না করাই ভালো। তবু এই সংগ্রাম আমাদের সাম্প্রদায়িক আবহাওয়াকে একটু পরিচ্ছন্ন করবেই। পাকিস্তানের হিন্দু এবং এদেশের মুসলমান হাড়েহাড়ে টের পাচ্ছিলেন যে দেশ ভাগ করেও সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান হয়নি। অবশ্য দেশ ভাগ হওয়ার সঙ্গেসঙ্গেই উকুন বাছার মতো করে যদি দুই দেশের সংখ্যালঘুদের বেছেবেছে উৎখাত করা হতো তাহলেই দ্বিজাতিতত্ত্বের হৃদয়হীন কিন্তু যথার্থ যুক্তিসম্মত পরিণতি হতো। এভাবে মাথা কেটে মাথাব্যথা সারিয়ে ফেলবার পর সাম্প্রদায়িকতার সমস্যা এই দুই দেশে যে আর থাকতো না সে-কথা বলাবাহুল্য। কিন্তু সেটা সম্ভব হয়নি। ফলে দেশ ভাগ করে

সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান করার experimentটা যে ব্যর্থ হয়েছে সে-কথা এতদিনে আমরা অসঙ্কোচে বলতে পারি। কিন্তু কি বিপুল মূল্য দিতে হয়েছে এই ব্যর্থ পরীক্ষার জন্য।

আমি পূর্ববাঙলার সংগ্রামের দিকে তাকিয়ে আছি অন্য আশায়। আমার বিশ্বাস আমাদের উপমহাদেশের সাম্প্রদায়িক সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে এই সংগ্রাম একটি নতুন পদক্ষেপ। খান আবদুল গফফার খান বলেছেন, 'বাঙলাদেশ যদি পাকিস্তানের বাইরে চলে যায় তাহলে পাকিস্তান আর ক'দিন টি'কবে ?' পাখতুনরা তো আগেই আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার চেয়েছিল. বালুচরাও পাকিস্তানে সুখী নয়। তাহলে কি শুধু পাঞ্জাবী মুসলমানরাই পাকিস্তান আঁকড়ে পড়ে থাকবে ? পাকিস্তানের ধর্মীয় সৌধ এত অল্পদিনে এমনভাবে গুঁড়িয়ে যাচ্ছে বলে বহু মুসলমান বেদনাবোধ করছেন। কিন্তু একদিন তাঁরা ঠিকই বুঝতে পারবেন যে এই উপমহাদেশের মুসলমানের পক্ষে সেটা অমঙ্গলকর হবে না। নতুন করে অমুসলমানের সঙ্গে সহাবস্থানের শিক্ষা তাঁরা নেবেন সাম্প্রদায়িক ধর্মকে আজকের জীবনযাত্রায় নগণ্য জ্ঞান করতে শিখে। পাকিস্তান সৃষ্টি হয়ে মুসলমানের ব্যবহারিক জীবন সমৃদ্ধ হয়েছিল সন্দেহ নেই, তবু বলতেই হবে যে সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনে এ-ছিল পশ্চাৎমুখী পদক্ষেপ। কিন্তু বাঙালি মুসলমান এই যে পিছু হটতে রাজি হননি, এই যে যুগের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সাম্প্রদায়িক ধর্মের খোলস থেকে সংস্কৃতির মহত্তর ক্ষেত্রে তাঁদের উত্তরণ হয়েছে এরজন্যে বিশ্বের মুসলমান প্রসন্ন হতে না পারলেও ভারতের বহু হিন্দু-মুসলমান তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞ বোধ করবেন। কারণ আমাদের হৃদয়ে হৃদয়ে দ্বিজাতিবোধের যে-বিষবীজ উপ্ত আছে এরপর সেগুলি আর অঙ্কুরিত হবার অনুকূল আবহাওয়া পাবে না। আমরা বাঙলাদেশকে এই উত্তরণে সাহায্য করছি যেহেতু শেষপর্যন্ত এর ফলে এই উপমহাদেশেরই উত্তরণ ঘটবে সুস্থতর জীবনবোধে।

প্রতিরোধের কাহিনী

সত্যেন সেন

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার সঙ্গে শেখ সাহেবের আলোচনা ভেঙে গেছে। সংবাদটা সমস্ত শহরবাসীর মনের উপর কালো ছায়ার মত নেমে এসেছে। বাতাসটা যেন ক্রমেই ভারী হয়ে আসছে। বেশ বুঝতে পারছি এক মহাবিপর্যয়ের ধারালো খড়্গ ক্ষীণসূত্রে আমাদের মাথার উপর ঝুলছে। যে-কোনো সময় তা ছিঁড়ে পড়ে যেতে পারে। আমরা ক-জন বন্ধু সেই কথা নিয়েই আলাপ আলোচনা করছিলাম। কিন্তু সেই ভয়ঙ্কর সময়টা যে এখনই এসে গেছে তা আমরা কেউ ভাবতে পারিনি।

বড়ভাই হাঁপাতে হাঁপাতে ঘরের মধ্যে এসে ঢুকলেন। বড়ভাই ট্রেড ইউনিয়ন কর্মী। ঘরের মধ্যে ঢুকেই তিনি উত্তেজিত কণ্ঠে বলে উঠলেন, এখানে বসে বসে করছ কি তোমরা। এখন কি বসে থাকার সময় আছে। আজ রাত্রেই ওরা হামলা করতে এসেছে।

—হামলা করতে এসেছে? কারা?

—কারা আবার, মিলিটারী।

আমরা সবাই বসেছিলাম, উত্তেজিত হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে পড়লাম, সত্যি খবর?

—সত্যি বই কি! আমি খুব নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানতে পেরেছি।

—এখন কি করব আমরা? কি করতে হবে?

বড় ভাই ব্যস্ত হয়ে বলে উঠলেন:

—এক মুহূর্ত দেরী করার সময় নেই। এখনই ছুটে বেরিয়ে যাও তোমরা। পাড়ার সমস্ত ছেলেদের ডেকে জড়ো কর। মালীবাগ আর শান্তিনগরের মোড়ে ব্যারিকেড গড়ে তুলতে হবে। ইতিমধ্যে অন্যান্য জায়গায় কাজ শুরু হয়ে গেছে। এক্ষুনি চলে যাও! আমাদের হাতে কতটুকু সময় আছে তাও জানি না। খুব ভাল করে ব্যারিকেড দেবার চেষ্টা করবে। একটা কথা যেন মনে থাকে, এবারকার হামলা এক প্রচণ্ড রূপ নিয়ে আসবে। কিন্তু যতই প্রচণ্ড হোক না

কেন, আমাদের যেটুকু শক্তি আছে তাই নিয়ে প্রতিরোধ করতে হবে। এ-নিয়ে কোনো দ্বিধা বা ইতস্তত করবার মতো সময় নেই।

আমার বয়স আঠারো। এসব বিষয়ে অভিজ্ঞতা খুবই সামান্য। কিন্তু তা হলেও বুঝতে পারছিলাম এবারকার হামলা প্রচণ্ড মূর্তিতে নেমে আসছে। কিন্তু সেই প্রচণ্ডতার রূপটা কি হতে পারে, আমি কেন, বড় ভাইও কল্পনা করতে পারেনি। সারা পূর্ববঙ্গে এমন একটি লোকও নেই যার কল্পনায় এ-কথা আসতে পারে। আমার মনে হয় না পৃথিবীতে এর অনুরূপ দৃষ্টান্ত আছে।

আমরা ক-জন আর দেরী না করে ছুটে বেরিয়ে পড়লাম। আমাদের মালীবাগ পাড়ায় ইতিমধ্যেই খবরটা কিছুকিছু ছড়িয়ে পড়েছে। দেখতে দেখতে মালীবাগের মোড়ে লোকের ভিড় জমে গেল। সবাই উত্তেজিতভাবে এই নিয়ে জল্পনা-কল্পনা করছে। কিন্তু কি করতে হবে স্থির করে উঠতে পারছে না। অথচ কিছু ত' একটা করতেই হবে। সেই ভিড়ের মধ্যে দুটো একটা গাদাবন্দুক দেখতে পাচ্ছি। এই হাতিয়ার নিয়ে ওরা প্রবল পরাক্রান্ত সামরিকবাহিনীর সাথে মোকাবিলা করতে এসেছে। দেখলে হাসি পায়, দুঃখও হয়। আমরা তাদের সামনে গিয়েই হেঁকে উঠলাম :

—দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি করছেন আপনারা? এক মুহূর্ত দেরী করার সময় নেই। ব্যারিকেড গড়ে তুলুন। ওরা এসে পড়লো বলে।

এদের মধ্যে ছাত্রের সংখ্যাই বেশি। দু-চারজন বয়স্ক ভদ্রলোকও আছেন। আর আছে রিক্সাওয়ালা; মোটবওয়া মেহনতী মানুষ যারা। এবারকার আন্দোলনে প্রথম থেকেই এরা একটা বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করে আসছে। এরা কিছু একটা করবার জন্য অধীর হয়ে উঠেছিল। আমাদের কথা শোনামাত্রই তারা কাজে হাত লাগাল। সামনেই তিতাস গ্যাসের অফিস। সেখানে কতগুলো পাইপ পড়ে আছে। আমরা সেগুলো ধরাধরি করে রাস্তার মাঝখানে নিয়ে এলাম। অফিসের লোকেরা আপত্তি জানিয়েছিল, কিন্তু তাদের সেই আপত্তি টিকল না। কিন্তু এতেও চলবে না, আরো বড় করে—আরো উঁচু করে—আরো মজবুত করে এই ব্যারিকেডের প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। পরে বুঝতে পেরেছিলাম আমরা বালির বাঁধ তুলে সমুদ্রোচ্ছ্বাসকে ঠেকিয়ে রাখতে চেয়েছিলাম। কিন্তু কি করব আমরা? এইটুকুই তো আমাদের সম্বল।

ব্যারিকেড তৈরি করবার জন্য যে যা পারছে তাই নিয়ে আসছে। আর যে যা আনছে তাই স্তূপীকৃত করে তোলা হচ্ছে। বাছবিচার করবার মতো সময়

নেই। কিন্তু তবুও মনের মতো হচ্ছে না ব্যারিকেড। অবশেষে পাশের একটা মোটবওয়া লরিকে ঠেলতেঠেলতে নিয়ে এলেম আমরা; চাকার টিউবের হাওয়া ছেড়ে দিয়ে লরিটাকে ব্যারিকেডের সামনে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হলো। সবাই খুশি হয়ে বললো, হ্যাঁ, এবার ঠিক হয়েছে।

মোড়ের সামনেই রাজারবাগের সুবিস্তৃত পুলিশ লাইন। এখানে সারা প্রদেশের পুলিশের ট্রেনিং দেয়া হয়ে থাকে। প্রায় ৪-৫ হাজার পুলিশের আস্তানা। আজ রাত্রিতে যে মহানাটক অভিনীত হতে চলেছে, তাতে রাজারবাগের পুলিশেরা যে কোন্ ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে, সে-কথা আমরা কেউ ভাবতেও পারিনি।

এখানে যারা ব্যারিকেড তুলছিল, সেই জনতার একটা অংশকে রাজার-বাগের মোড়ের ব্যারিকেড তুলবার জন্যে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। কিছু চলে গেছে শান্তিনগরের দিকে।

রাত বাজে আটটা। রাস্তায় গাড়ি চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে। একমাত্র ব্যারিকেড রচনাকারীরা ছাড়া রাস্তায় লোকজন নেই বললেই চলে। সেই নির্জন রাজপথের উপর দিয়ে, একটা রহস্যজনক কালো মোটর দ্রুতবেগে ছুটে এসে রাজারবাগের পুলিশ ঘাঁটির ভিতর ঢুকে পড়ল। আমরা কৌতুহলী দৃষ্টি নিয়ে গাড়িটার গতিপথের দিকে তাকিয়ে আছি। এরা কি আমাদের সপক্ষের লোক? একটু বাদেই বেরিয়ে এলো গাড়িটা। গাড়িটা যেমনি দ্রুতবেগে এসেছিল তেমনি দ্রুতবেগে ছুটে চলে গেল। গাড়ির ভিতর থেকে মাইকযোগে বলা হচ্ছে, আপনারা পথেপথে ব্যারিকেড গড়ে তুলুন। রাস্তা কেটে দিন। শত্রুবাহিনীকে অচল করে ফেলুন। এবার বুঝলুম, এরা আমাদেরই লোক, আমরা বুঝলুম, রাজারবাগের পুলিশদের সঙ্গে এদের যোগাযোগ আছে। এরা চিরকাল আমাদের উপর ডাণ্ডা চালাতে আর গুলি চালাতে অভ্যস্ত এই সঙ্কট মুহূর্তে এরা কি আমাদের পক্ষ হয়ে মিলিটারীর বিরুদ্ধে দাঁড়াবে? স্বাধীনতা আন্দোলন বা কোনো বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানে পুলিশ কি কোনোদিন তার পক্ষে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছে?

আসন্ন মিলিটারী হামলার কথা ইতিমধ্যে এই অঞ্চলে ব্যাপকভাবে প্রচার হয়ে গেছে। রাস্তার বাতিগুলোকে নিভিয়ে দেয়া হয়েছে। আমাদের সারা অঞ্চল জুড়ে কারো কোনো নির্দেশ ছাড়াই ব্ল্যাক-আউট করা হয়েছে। অন্ধকার রাজপথ। বাড়িগুলো ভূতের মত দাঁড়িয়ে আছে। রাত বাজে দশটা। মারাত্মক

মুহূর্তের প্রতীক্ষা করছি। আজ এই প্রবল শত্রুকে প্রতিরোধ করব এমন কোনো হাতিয়ার আমাদের নেই। তবু আমাদের প্রতিরোধ করতে হবে। ভয় করছে। বারবার নিজেকে পরীক্ষা করে দেখছি। না, ভয় করছে না। কিন্তু এই নিরস্ত্র অক্ষম হাতে কি করে প্রতিরোধ করবো, অনেক ভেবে ভেবেও এই প্রশ্নটার উত্তর খুঁজে পাচ্ছি না।

হঠাৎ চোখে পড়ল রাজারবাগের পুলিশ ঘাঁটির গেট দিয়ে একের পর এক কতগুলো ছায়ামূর্তি বেরিয়ে আসছে। ওরা আমাদের সামনে এসে দাঁড়াতে আকাশের তারার কিছু মৃদু আলোয় দেখতে পেলাম এরা পুলিশ। প্রত্যেকের হাতে একটা করে রাইফেল। এরা কি তবে অবস্থা সঙ্কটজনক বুঝতে পেরে প্রাণের ভয়ে পালিয়ে যাচ্ছে?

ওদের মধ্যে একজন সামনে এসে আমাদের উদ্দেশ্য করে বলল, 'ভাইরা, আপনারা যে যার ঘরে গিয়ে নিরাপদ আশ্রয় নিন। ওরা হয়ত এক্ষুনি এসে পড়বে।'

—আর আপনারা? আপনারা কি চলে যাচ্ছেন?

আমরা জানতে চাইলাম।

—না, আমরা কোথায় যাবো? আমরা ওদের মোকাবেলা করবার জন্য ভিতরে আর বাইরে নানা জায়গায় দাঁড়িয়ে পজিশন নিচ্ছি।

মৃদু অথচ কি দৃঢ় ওদের সেই কণ্ঠস্বর! যে-কথা ভাবতে পারিনি, তবে সত্যসত্যই তাই ঘটতে চলেছে, পুলিশ মিলিটারীকে প্রতিরোধ করবার জন্য তৈরি হচ্ছে।

পুলিশের ইতিহাসে এই এক অভিনব ঘটনা। ওরা আবার বলল:

—আপনারা চলে যান, এখানে দাঁড়িয়ে থাকবেন না। যা করবার আমরাই করব।

আমরা কিন্তু যেমন দাঁড়িয়েছিলাম, তেমনিই দাঁড়িয়ে রইলাম। পুলিশ দাঁড়িয়েছে প্রতিরোধ করতে, আর আমরা ঘরে ফিরে যাব? না, কিছুতেই না, অসম্ভব। এই সঙ্কট মুহূর্তে আমরা কি কোনো কাজেই লাগব না। ওরা বেশি কথা বলতে চায় না। কিন্তু আমরা প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে সমস্ত অবস্থাটা জেনে নিলাম। হাজার চারেক পুলিশের মধ্যে প্রায় ৮০০ জন মিলিটারিকে প্রতিরোধ করার জন্য অপেক্ষা করছে। বাকি সবাই লাইন ছেড়ে যে যেদিকে পারে চলে গিয়েছে।

'এই অবস্থায় আপনাদের এই বিপদের মুখে ফেলে তারা চলে গেল?'—উদ্বিগ্ন কণ্ঠে প্রশ্ন করলাম আমরা।

—কি করবে না গিয়ে! তাদের মধ্যে অনেকেই লড়াই করতে রাজি ছিল। কিন্তু অস্ত্র কোথায়? কি দিয়ে লড়বে? আমাদের আর. আই. নিজের আর তার পরিবারের জান বাঁচানোর জন্য এই দুঃসময়ে আমাদের ছেড়ে চলে গিয়েছে। গেছে যাক! ভালই হয়েছে! এমন তিত্‌পুঁটির প্রাণ যাদের এই কঠিন সময়ে তাদের কাছে না-থাকাটাই ভাল। কিন্তু বিপদের কথা হচ্ছে এই যে, যাবার সময় ম্যাগাজিনের চাবিটা তার সঙ্গে চলে গিয়েছে। প্রথমেই আমরা বুঝতে পারিনি। এখন মনে হচ্ছে ইচ্ছে করেই নিয়ে গেছে। কাজেই যে রাইফেল আর কার্তুজগুলি আমাদের হাতে আছে, তাই আমাদের একমাত্র সম্বল। তাই দিয়ে আমাদের লড়াই চালিয়ে যেতে হবে।

—এই নিয়ে কতক্ষণ লড়াই চালাতে পারবেন আপনারা?

—কতক্ষণ পারব তা জানিনে। কিন্তু যতক্ষণ সম্ভব আমাদের বাধা দিতেই হবে। বিনা প্রতিরোধে আমরা আমাদের জমি ছেড়ে দেব না। আমরা ইচ্ছে করলে পালিয়ে প্রাণ বাঁচাতে পারতাম। কিন্তু বাঙালি দেশের জন্য লড়াই করতে জানে, এই কথাটা ওদের ভাল করে বুঝিয়ে দিয়ে যাব।

ওদের কথা শুনতে শুনতে গর্বে আমাদের বুক ফুলে উঠছে। যো-হুকুম পুলিশের উর্দির তলায় যে এমন সাচ্চা দেশপ্রেমিক প্রাণ থাকতে পারে, এ-কথা ত' কোনোদিন কল্পনাও করতে পারিনি। কে ভাবতে পেরেছিল এমন এক দুঃসময়ে এমনি করে জনতা আর পুলিশের মোর্চা গড়ে উঠবে!

এরপরেও কি আর মনে ভয় থাকতে পারে! আমরা সঙ্কল্প করলাম, আজ এই অগ্নিপরীক্ষার রাত্রিতে কিছুতেই ঘরে ফিরে যাওয়া চলবে না। আজ যা ঘটবার ঘটুক, আমাদের এই সংগ্রামী পুলিশ ভাইদের পাশাপাশি দাঁড়িয়ে সচক্ষে সব কিছু দেখব। জানি, এই প্রতিরোধ সংগ্রামে আমরা কোনোভাবে তাদের সাহায্য করতে পারব না। কিন্তু পাশাপাশি দাঁড়িয়ে মরতে তো পারব। তাতেও আনন্দ।

কি আশ্চর্য, মরবার কথা ভাবতে আজ আর একটু ভয় করছে না। নিজের দিকে তাকিয়ে নিজেই অবাক হয়ে যাচ্ছি। যেন চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি, সেই দিন বেশি দূরে নয় যে দিন সারা বাঙলাদেশের মানুষের মন অভয়মন্ত্রে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠবে। সমস্ত পৃথিবীর সামনে দুর্বল বাঙালি, ভীরু বাঙালি, এই

কথাটা মিথ্যে বলে প্রমাণিত হয়ে যাবে।

পুলিশ লাইনের বিস্তারিত এলাকা ঘিরে রাইফেলধারী ছায়ামূর্তিগুলি যে যার পজিশন নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। শুনলাম, চারতলা পুলিশ ব্যারাকের ছাদের উপর একদল পুলিশ উদ্যত রাইফেল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। পুলিশ ভাইরা বলাবলি করছিল, রাস্তার ধারের বাড়িগুলির ছাদের উপর পজিশন নিয়ে দাঁড়ানো দরকার। কিন্তু বাড়ির মালিকরা কি তাতে রাজি হবে?

আমরা আশ্বাস দিয়ে বললাম, 'কোনো চিন্তা করবেন না। আপনারা যেই যেই বাড়ির ছাদে উঠতে চান, আমরা ছাত্ররা সেখানে পৌঁছে দেব।'

দেখতে দেখতে পুলিশ ভাইয়েরা তাদের পরিকল্পনা অনুযায়ী দলে দলে ভাগ হয়ে বিভিন্ন বাড়ির ছাদে উঠে পড়লেন। সে সমস্ত লোকদের মধ্যে কেউ কেউ ভয় পেয়ে বাধা দেবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু আমরা কোনো বাধা মানলাম না। আমরা মরিয়া হয়ে গিয়েছিলাম। ওরা আমাদের ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না, হ্যাঁ, এমনি করে আমাদের শত্রুর বিরুদ্ধে প্রতিটি গৃহকে দুর্গে পরিণত করতে হবে। সে-সময় এসে গিয়েছে আজ।

আমি পঁচিশ জন পুলিশ নিয়ে এক বাড়ির ছাদে উঠে পড়েছিলাম। ওরা ছাদের উপর পঁচিশজন নিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। কিছু কিছু পুলিশ রাস্তার উপর পজিশন নিয়ে দাঁড়িয়েছে। আমরা অচল মূর্তিতে দাঁড়িয়ে উদ্বিগ্ন প্রতীক্ষার মুহূর্তগুলি গুনছিলাম। রাত বারটা বাজল। তার একটু বাদে, হ্যাঁ, তার একটু বাদেই শুনতে পেলাম ওরা আসছে। জনশূন্য নগরীর রাজপথের উপর দিয়ে গভীর রাত্রির নিঃশব্দতা ভঙ্গ করে একটির পর একটি জীপগাড়ি চলে আসছে। যে-সঙ্কট মুহূর্তের জন্য অধীরভাবে প্রতীক্ষা করছিলাম, অবশেষে সেই মুহূর্ত এসে গিয়েছে।

ব্যারিকেডের সামনে এসে গাড়িগুলো থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। এই ব্যারিকেডের বাধা ঠেলে এগিয়ে আসা তাদের অসম্ভব। তারা পুলিশ লাইনের খোলা গেটের মধ্যে দিয়ে ঢুকে পড়তে চেয়েছিল। মনে হয়, পুলিশের কাছ থেকে বাধা পাবে এই আশঙ্কা ওরা করেনি। তাই ভেবেছিল, পুলিশরা নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমিয়ে আছে। ওরা তাদের যা করবার তা স্বচ্ছন্দে করে যেতে পারবে। ব্যারিকেড আছে থাক সেজন্য চিন্তা করবার কিছু নেই। অন্ধকার রাত্রি হলেও আমরা অস্পষ্টভাবে দেখতে পেলাম, ওরা একে একে জীপ থেকে নেমে পড়ছে। বুঝলাম, ওরা ব্যারিকেডের পাশ ঘেঁসে পায়ে হেঁটে এগিয়ে

আসছে। ওরা মেশিনগান নিয়ে এসেছে। তার বিরুদ্ধে পুলিশ ভাইদের রাইফেল নিয়ে প্রতিরোধ করতে হবে। আধুনিক দিনের যুদ্ধে এই প্রতিরোধ কতক্ষণ টিকতে পারে? যুদ্ধবিদ্যা সম্পর্কে কোনো অভিজ্ঞতা না থাকলেও আমার কাছে এই কথা অজানা নয়। এই কথা আমার চেয়ে বেশি ভাল করে জানে আমার এই পুলিশ ভাইয়েরা। তাহলেও তারা দুর্জয় সংকল্প নিয়ে তৈরি হয়ে আছে। ওরা মৃত্যু পণ করে দাঁড়িয়েছে।

ওরা সারি বেঁধে পায়ে পায়ে এগিয়ে আসছে। একটা সংকেত শব্দ। সঙ্গে সঙ্গে শত শত রাইফেল একই সঙ্গে গর্জে উঠল। যারা এগিয়ে আসছিল তাদের মধ্যে বেশ কয়েকজন গুলি খেয়ে পড়ে গেছে। শুধু চোখে দেখা নয়, দূর থেকে আহতদের কাতর উক্তি শোনা গেল। এমনভাবে বাধা পাবে এটা এই হানাদাররা ভাবতে পারেনি। ওরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পিছন দিকে হটে গেল। একটু বাদেই একটা জীপ গাড়ি যেন আর্তনাদ করতে করতে বিপরীত দিকে ছুটে চলে গেল। একজন পুলিশ স্থির কণ্ঠে মন্তব্য করল, ওরা এবারেই নতুন ভাবে তৈরি হয়ে আসবে। এবার শুরু হবে আসল লড়াই।

পুলিশ ভাইরা ইচ্ছে করলে তখন প্রাণ নিয়ে পালাতে পারত। কিন্তু যে যেখানে যেভাবেই ছিল, সেই ভাবেই দাঁড়িয়ে আছে। একটু বাদে আক্রমণ প্রচণ্ড মূর্তিতে নেমে আসবে, একথা ওরা জানে। কিন্তু শেষপর্যন্ত না দেখে ওরা হটবে না।

আবার সেই উদ্বিগ্ন প্রতীক্ষা। কিছু সময় বাদে অনেকগুলি গাড়ির সম্মিলিত গর্জন শোনা গেল। সারাটা রাজপথ কাঁপিয়ে গাড়িগুলো ছুটে আসছে। ওরা এবার রীতিমতো সমরসজ্জা করে এসেছে। প্রথমে ট্রাকটর, তারপর গোটাকয়েক ট্যাঙ্ক, জীপগাড়িও আছে। কাছাকাছি এসে ওরা অন্ধকারের আড়ালে ওদের প্রতিপক্ষের আস্তানা বুঝে নিতে চাইল। একটা রিভলবারের গর্জন শোনা গেল। সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকার কেটে নিয়ে সামনের দিকটা নীল আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। একজন পুলিশ স্বগতোক্তির মতো বলে উঠলো, 'ওরা ম্যাগনেশিয়ার আলো জ্বেলেছে; এবার আমরা ওদের নজরে পড়ে গেছি।' সেই আলোয় ওদের দৃষ্টিতে যেটুকু ধরা পড়ল, তাই দিয়ে তাক করে ওরা নানাদিকে মেশিনগান চালাতে লাগল। পুলিশেরা সঙ্গে সঙ্গে বসে পড়েছে। বসে পড়ে রাইফেলের সাহায্যে ওদের গুলির জবাব দিচ্ছে। ওদের দেখাদেখি আমিও বসে পড়েছি। মাথার উপর দিয়ে বৃষ্টির ধারার মতো বুলেট ছুটে চলেছে। এই

এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা। পুলিশ ভাইদের মধ্যে কয়জন উদ্বিগ্ন কণ্ঠে আমাকে উদ্দেশ্য করে বলছে 'শিগ্‌গীর শিগ্‌গীর নেমে যান, এখানে বসে আপনি কি করছেন? এটা কি তামাসা দেখার জিনিস?' আমি প্রবল আপত্তি জানিয়ে বললাম, 'না, আমি আপনাদের ছেড়ে কিছুতেই যাব না।' ওরা বলল, 'আপনি এখানে বসে আমাদের কোনো সাহায্য করতে পারবেন না, শুধু আমাদের মনের উদ্বেগ বাড়াবেন। যান শিগগীর নেমে যান। এক্ষুনিই নেমে যান।'

আমি নড়লাম না। অবাধ্য ছেলের মতো গোঁ ধরে বসে রইলাম। ওরা কিন্তু আমার কোনো আপত্তি শুনল না। বলতে গেলে একরকম জোর করে ওরা আমাকে ছাদ থেকে নামিয়ে দিল। আমি সিঁড়ির কয়েক ধাপ নিচে হুমড়ি খেয়ে বসে আছি। কিন্তু কিছুতেই সেখানে নিজেকে ধরে রাখতে পারছিলাম না। একটু সময় বাদে যে নিজের অজানাতে আবার ছাদের উপর উঠে পড়েছি, ওরা তা দেখতে পায়নি। ওদের দৃষ্টি এড়িয়ে মাথা তুলে দেখলাম হামলাকারী সৈন্যরা ট্রাক্টর দিয়ে ব্যারিকেডের বাধা ঠেলে সরিয়ে দিয়েছে। এবার ইচ্ছে করলেই পুলিশ লাইনের ভিতর ঢুকে পড়তে পারে। কিন্তু ওরা ভয় পাচ্ছে। প্রতিপক্ষের শক্তি সম্পর্কে ঠিক ধারণা করতে পারছে না। তাই, এগিয়ে যেতে চাইলেও এগোতে ভরসা পাচ্ছে না।

দুই পক্ষ থেকে প্রবলভাবে গুলিবর্ষণ চলছে। মেশিনগানের জবাবে রাইফেল। কিন্তু রাত্রির অন্ধকারে কোনোপক্ষই সঠিকভাবে তাক করতে পারছে না। অধিকাংশ গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হচ্ছে। তবু বৃষ্টির ধারার মতো গুলিবর্ষণ চলছে। শুধু মেশিনগান নয়, আধুনিক যুদ্ধবিদ্যায় সুশিক্ষিত পাকিস্তানী সৈন্যরা মর্টার চালাচ্ছে। কামানের গর্জনে সারাটা অঞ্চল থরথর করে কেঁপে উঠছে। মর্টারের গোলার ঘায়ে এখানে ওখানে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে। আকাশ আলোয় আলোয় উজ্জ্বল হয়ে উঠছে। কিন্তু বেপরোয়া পুলিশবাহিনী মেশিন-গান কামানের জবাবে তখনও রাইফেলের গুলিবর্ষণ করে চলেছে। কি হাস্যকর অথচ কি নির্ভীক আর মহিমাময় এই সংগ্রাম।

মাঝেমাঝে দু'পক্ষই থেমে যাচ্ছে। মিলিটারীর লোকেরা কি ভাবছে কে জানে। এই নির্বোধ ও মৃত্যুপণ লোকগুলির প্রতিরোধের মুখে দাঁড়িয়ে ওরা কেমন যেন হয়ে গিয়েছে। সামান্য রাইফেলের বিরুদ্ধে ওরা ওদের মারণাস্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে এসেছে। তবু ওরা পুলিশ লাইনের ভিতর ঢুকে পড়তে সাহস করছে না। কি এক অজানা আশংকায় ওরা এগোতে গিয়েও এগোতে পারছে না।

কিছুক্ষণ বাদে বাদেই পরস্পরের প্রতি গুলিবর্ষণ। আবার কিছুক্ষণ বাদে বাদেই নিস্তব্ধতা। এরই মধ্যে দিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা গড়িয়ে চলতে লাগল। রাত্রি প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। ওদের মেশিনগান একটানা গর্জন করে চলেছে। কিন্তু আমাদের রাইফেলগুলো নিঃশব্দ হয়ে গেছে। বুঝলাম, এবার যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটতে চলেছে। আমারই পাশে দাঁড়িয়ে পুলিশ ভাইদের মধ্যে একজন নিতান্ত ছেলেমানুষের মত হাউ হাউ করে কেঁদে উঠেছে। কি হয়েছে? সচকিত হয়ে উঠলাম, এমন করে কাঁদছে কেন?

না, প্রাণের ভয় নয়। কাঁদছে ওদের কার্তুজ ফুরিয়ে গেছে বলে। ওদের হাতের রাইফেল এখন আর কোনো কাজে আসবে না। কান্নাভরা কণ্ঠে সে গাল দিয়ে চলেছে 'শালা, কুত্তার বাচ্চা। যাবার সময় আমাদের ম্যাগাজিনের চাবিটা নিয়ে গেল। ম্যাগাজিন খুলতে পারলে আরো অনেকক্ষণ পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যেতে পারতাম।'

রাত্রি শেষ হয়েছে। অন্ধকার কেটে গিয়ে আকাশ ফর্সা হয়ে আসছে। ছাদের উপর আর পথের ধারে দাঁড়িয়ে যে-সমস্ত পুলিশ লড়াই করছিল, তারা হাতের রাইফেল ফেলে দিয়ে উর্দ্ধশ্বাসে পালাচ্ছে। আমি যেখানে দাঁড়িয়েছিলাম, সেখানে আমি একা। তার মধ্যে দিয়ে এরা যেদিকে পারছে উর্ধশ্বাসে ছুটে চলেছে। কেউ কেউ পালাতে গিয়ে গুলি খেয়ে মুখ থুবড়ে মাটির উপর পড়ে যাচ্ছে। সৈন্যরা লাইনের গেটের ভিতর ঢুকে পড়েছে। আর সেই বিরাট অঞ্চলটিকে ঘেরাও করে ফেলেছে। যারা ভেতরে আটকা পড়ে গেছে তাদের আর বেরোবার পথ নেই। কে জানে আজ কত লোককে মিলিটারীর হাতে প্রাণ দিতে হবে।

পুলিশ লাইনের চারতলা বাড়িটার ছাদের উপর তখনো কয়েকজন পুলিশ দাঁড়িয়ে আছে। সকালবেলার আলোয় এখান থেকে আমি ওদের স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। ওরা কেমন দিশেহারার মতো হয়ে গেছে, কি করবে বুঝে উঠতে পারছে না। তাদের মধ্যে থেকে একজন ছাদের কিনারায় এসে দাঁড়াল। সে কি করতে চায়, বুঝতে পারছিলাম না। কিন্তু পরক্ষণেই বুঝলাম, কোনো রকম দ্বিধা বা ইতস্তত না করে সে তলায় ঝাঁপিয়ে পড়ল সেই মুহূর্তে। তার এই মতলবটা বুঝতে পেরে তার বন্ধুরা তাকে ধরবার জন্য ছুটে এল। কিন্তু ইতিমধ্যে সে তাদের ধরাছোঁয়ার নাগালের বাইরে চলে গেছে। সে কি তবে লাফ দিয়ে পড়ে প্রাণ বাঁচাতে চেয়েছিল? কিন্তু তখন পালাবার আর কোনো

পথ ছিল না। সমস্ত লাইনটাকে ওরা ঘিরে ফেলেছে। না, পালাতে চায়নি সে। আমার মনে হলো, ওদের অত্যাচার আর হত্যার চেয়ে সে আত্মহত্যার পথটাকে বেছে নিয়েছে। অত উঁচু থেকে পড়লে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী।

বাইরে কারফিউ শুরু হয়ে গেছে। আমার এখুনি ঘরে ফিরে যাওয়া দরকার। কিন্তু যে সমস্ত পুলিশ ভাইয়েরা লাইনের ভিতর আটকা পড়ে গেছে তাদের অবস্থা কি হয় দেখবার জন্য আমি উদ্‌গ্রীব হয়ে দাঁড়িয়ে আছি। এখানে দাঁড়িয়ে লাইনের ভিতর অনেক কিছু দেখা যায়। একটু বাদেই দেখলাম, সৈন্যরা ব্যারাকের উপর থেকে একদল পুলিশকে মারতে মারতে বাইরে নিয়ে আসছে। একদল পশুর মতো ওরা তাদের টেনে নিয়ে এসে খোলা ময়দানে দাঁড় করিয়ে দিল। ওরা সংখ্যায় পঁচিশ জনের কম হবে না। এবার ওদের লক্ষ্য করে মেসিনগান গর্জে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে ওরা সবাই একসঙ্গে ভূমিশয্যা নিল। আর উঠল না। আর উঠবে না কোনোদিন। স্বাধীনতার বীর যোদ্ধারা তাদের জন্মভূমির কাছ থেকে, তাদের স্বদেশবাসীর কাছ থেকে চিরদিনের মতো বিদায় নিয়ে গেল। আমার চোখের সামনে সব কিছু ঘটে গেল। জানি না, এই দৃশ্য আর কেউ দেখেছে কিনা? এই দৃশ্য আমি কোনোদিন ভুলতে পারব না।

বীর শহীদদের উদ্দেশ্যে নতশির হয়ে অভিবাদন জানালাম। মনে মনে বললাম, 'বীর দেশপ্রেমিক ভাইয়েরা আমার, আমি স্থির জানি তোমাদের এই আত্মোৎসর্গের মহৎ দৃষ্টান্ত সমস্ত জাতিকে অনুপ্রাণিত করে তুলবে। তোমরা তোমাদের বুকের রক্ত দিয়ে যে স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু করে দিয়ে গেলে, আমাদের সমস্ত জীবন দিয়ে আমরা তাকে সার্থক ও সফল করে তুলব। শহীদের রক্তদান বৃথা যাবে না।

একুশ শতকের জন্যে

মণীন্দ্র রায়

না, খোকন, না—
ঐ মরচে-ধরা টিনের ট্রাঙ্ক
আর প্রাচীন ন্যাপথলিনের গন্ধ,
তুমি দাদুর ঐ আদরের জামা
পরো না।
কেউ কি বাস করেছে কখনো
টুটেনখামেনের পিরামিডে,
কিম্বা বয়ে বেড়িয়েছে
কোনো ব্যাবিলনীয় সম্রাটের তরোয়াল ?
না খোকন, ঐ পোকায়-কাটা পোশাকে
মানায় না তোমাকে।
ও তো পচে-যাওয়া বাসি জগতের চক্রান্ত।

জানি, প্রথম চেতনার বিস্ফোরণে
আর্যঋষির চোখে আদিত্যবর্ণ উষার আবিষ্কার ;
জানি, উলঙ্গ চৌবাচ্চার উচ্ছলিত জলে
আর্কিমেডিসের উল্লাস ;
কিন্তু ঐসব মহৎ পায়ের ছাপ ধরেও
যাওয়া যাবে কি কোথাও ?

কেননা, কোনো গাছই তো বেঁচে থাকে না
পাতা না ঝরিয়ে, নতুন পাতার জন্ম না দিয়ে ;
কেননা, এক অদৃশ্য ক্র্যাঙ্ক শ্যাফটের
অশ্রুত ধাতব সংঘর্ষে
এই মাটির গাড়িও তো ছুটে চলেছে
মহাশূন্যের বুক চিরে।

না খোকন, দাদুর ঐ পুরনো স্মৃতির খাঁচায়
গ্রীষ্ম-বর্ষা-শীতের রোমশ আক্রমণ থেকে
আড়াল খুঁজো না।

স্খলন তো পায়ে পায়েই থাকে ;
তাই বলে কি চতুষ্পদ বানর
শিরদাঁড়া খাড়া করে মানুষ হয় নি ?
কী নিষ্ঠুর এই সুন্দরী পৃথিবী,
তাকে লাঙলের ফালে না বিঁধলে সে ফসল দেয় না।
সময়ের শিং ধরে তাইতো আমাদের
মরণপণ ষাঁড়ের লড়াই।

খোকন, তুমি দাদুর ঐ জরদ্গব আরামের
কাঠামো থেকে বেরিয়ে
ছুঁড়ে ফেলো ঐ দামহারানো কাকতাড়ুয়ার সাজ ;
মাটির ওপর পা রাখো ;
মাথা ঠেকাও আকাশে ;
তারপর দিগন্তের তলা থেকে
টেনে তোলো এক নতুন সূর্য—
যা তোমাকে অনাবিষ্কৃত ঐশ্বর্যের রঙে পরিয়ে দেবে
একুশ শতকের সহজাত কবচকুণ্ডলের সাহস।

বাঙলাদেশ

অসীম রায়

মুজীব

মুজীব মুজীব
মুজীব কী জীব :
বুর্জোয়া ডেমোক্র্যাটিক
না জনগণতান্ত্রিক

এ জবাব কেউ না কেউ হলফ্ করুক
মুক্তিযুদ্ধ ততক্ষণ অপেক্ষা করুক।

মৃতদেহ প্রশ্ন করে না
মৃতদেহ হাজারে হাজারে
রাজশাহী খুলনায় কুমিল্লা যশোরে
থরে থরে ঢাকায় চাটগাঁয়
অলিতে গলিতে মাঠে প্রাসাদে বাদাড়ে,
অপলক মৃতদেহ আকাশে খোঁজে না
বিপ্লবের অভ্রান্ত নিরিখ,
তারা জানে যেখানেই অত্যাচার
সেখানেই মুক্তির পতাকা
যেখানেই কামানের ধোঁয়া
সেখানেই লক্ষ লক্ষ মানুষের রোষদীপ্ত চোখ
গ্রীষ্ম-বর্ষা সমস্ত ঋতুতে
সমস্ত আকাশ জুড়ে জ্বলে।

৩১. ৩. ৭১

যশোরে এলাম

খাঁ খাঁ রাজপথ শুধু খাঁ খাঁ নয় প্রতিটি মোকাম,
লালনীল সাদা হলুদ বাড়ির নীরব মিটিং,
আকণ্ঠ পানা বুকে নিয়ে স্থির ভৈরবতীর,
চা-পান স্বপ্ন, পাত্তাও নেই নেড়িকুত্তার—

এরই মাঝে চৈত্রের দুপুরে
মালঞ্চি, ফুলের হাট, চাঁচড় পেরিয়ে
রৌদ্রদগ্ধ প্রেতপুরী যশোরে এলাম।

রোদে টলমল জলে একটি দ্বীপ, একটি হাসপাতাল,
আহত মানুষ নার্স ওষুধ ডাক্তার,
অকস্মাৎ শত্রুর কামান—

ফুলন্ত শিরীষ ছিন্ন প্রাইমারি স্কুলে
রাজপথ শেলবিদ্ধ,
নিস্তব্ধতা শুদ্ধ করে ক্ষিপ্ত মেসিনগান।
চম্‌কে তাকালাম
যে ছবিটা স্বপ্নে খুঁজে কেটেছে যৌবন
তারই এক উদ্দীপ্ত প্রহার :
নারকেল গাছের নিচে বাঙলাদেশ ধরেছে ট্রিগার।

৩. ৪. ৭১

সাতক্ষীরার পথে

একটাই কাঠের পুল
বুকে লরী চিরনিদ্রামগ্ন, হত-যাত্রী
ধাবমান সাইকেল রিক্সায়,
অস্তাচলে ধোঁয়ার কুণ্ডলী—

এমনি এক ত্রস্তব্যস্ত চৈত্রের সন্ধ্যায়
পাঁজর পোড়ায়
অকস্মাৎ গন্ধের বিদ্যুৎ।

সে গন্ধে কি যেন ছিল, ছিল জন্মভূমি
বাল্যকাল সমস্ত যৌবন
যাকে ভালোবাসি আর যাকে কোনোদিন
ভালোবাসতাম,
পুল ছেড়ে নামতে না নামতেই
চষা ক্ষেত নিমগাছ রোদ্‌জলা ঝোপে
অন্ধকার, গন্ধরাজ ডাকে।

৮. ৪. ৭১

কমরেড, তোমরাই লড়ছ

বিতোষ আচার্য

কমরেড, তোমরাই লড়ছ বাঙলাদেশে
রক্ত দিচ্ছ : তাজা, ফিনকি রক্তের জোয়ার কর্ণফুলী মধুমতী
মেঘনা ও পদ্মার
সবকূল ভাসিয়ে উতরোল :
কমরেড, তোমরাই লড়ছ

দুর্ভাগ্য, এ-বঙ্গ ভূভাগে আষ্টেপৃষ্ঠে নাগপাশে
কার্যত : কয়েদী আমরা :
কর্মিষ্ঠ যে-হাত দিয়ে হিমালয় উপড়ে ফেলতে পারি—
সে-হাত বেকার
যে-শরীর দুর্দান্ত আবেগে অভ্রভেদী মিনারের মতো
টানটান টানটান হতে চায়—
মুখ থুবড়ে পড়ে থাকে আত্মঘাতী মৃত্যুর গুহায়

কমরেড, তোমরাই লড়ছ···রক্ত ঝরছে অনর্গল
টোপটোপ টোপটোপ :
কমরেড, কী করব আমরা ? সহোদর রক্তের বন্যায়
ইস্পাতের কল্‌জেগুলো ফেটে যাচ্ছে ভেসে যাচ্ছে চৌচির পদ্মায়
কী করব, কী করব আমরা ?
জন্মনাড়ী কাঁপছে, ফুলছে লক্ষ পাকেপাকে তার যন্ত্রণা বিষম,
উদ্বেলিত কণ্ঠা ব্যেপে রি রি শুধু রি রি'ই সম্বল ?

কমরেড, তোমরাই লড়ছ, বাঙলাদেশে লড়াই-এর স্বাদ
প্রান্তরে, ট্রেঞ্চের মধ্যে, পাহাড়ে ও সমুদ্রে-বন্দরে
কমরেড, তোমরাই ঋণ শুধে যাচ্ছ দুর্দম কদমে
ইতিহাসকে দিয়েছ আগাম ।

সূর্যমন্দিরে, ১৯৭১-র বাঙলাদেশে

শিবশম্ভু পাল

আমি চাই রৌদ্রকণা। তোমার মন্দিরে
সাত কোটি পূজার্থীর বুকভরা জ্যোতির্ময় রৌদ্র নিবেদিত
বিনিময়ে পেতে চায় সূর্যচিহ্ন বৈজয়ন্তীখানি শুচিস্মিত
স্নায়ুর গভীরে।

অথচ আমার নেই প্রার্থনার সবল যোগ্যতা
ক্রমাগত সহোদর হননে অথবা শুধু হননের চতুর প্রশ্রয়ে
আমার ভেতর থেকে আমি গেছি ক্ষয়ে ;
শূন্য বেদি, নর্দমায় ভেসে গেছে নিহিত দেবতা।

অথচ জাগালে স্মৃতি, নদীশস্যহাওয়াময় জন্মভূমি, জননী আমার
জাগালে আনন্দধ্বনি সাতকোটি সন্তানের তোমারই উদ্দেশে
আমার বিনষ্ট রক্তে এনে দিলে ধিক্কারের বেশে
অপ্রস্তুত উত্তরাধিকার।

আমার সর্বাঙ্গে দুষ্ট সংক্রামক মর্মরোগ, জর্জরিত প্রাণ
তবুও চাইতে পারি রৌদ্রকণা, হে সূর্যপ্রতিমা,
আমার কারণে নয়, যাতে চূর্ণ করে দেয় কাপুরুষ নরকের সীমা
আমাকে পেছনে ফেলে আমারই সন্তান।

সন্দেহ

গৌরাঙ্গ ভৌমিক

আপনি তো ভাষণ দেন
　　　　বড় বেশি উজ্জ্বলতা কথায় ছড়িয়ে।
আপনি তো বলেন :
　　　　বাঁচার জন্যেই নাকি মরা প্রয়োজন।

দারুণ চমক লাগে! বিশ্বাস করুন,
একথা শুনব বলে দীর্ঘকাল মিছিলে ঘুরেছি,
এমন ভাষণ শুনলে রক্তে ঢেউ জাগে,
এরই জন্যে বহুকাল রাত্রিজাগরণ।

সামান্য সন্দেহ শুধু, একটি প্রশ্ন, দিনে দিনে বাড়ে—
সামনে খালি এই যে সিংহাসন,
তার ছায়া দেখি কেন আপনার রক্তে খেলা করে?

আমি সবুজ মশাল হয়ে গেছি

সত্য গুহ

যে থাকে থাকুক শুয়ে ধানসিঁড়ি নদীর কিনারে আর জাগবে না জেনে
আমার দু চোখ থেকে ঘুম ছুটে গেছে
লক্ষ্মী প্যাঁচা উড়ে উড়ে কালোমেঘে ঘোর হওয়া আকাশগঙ্গার তীরে তীরে
তার লক্ষ্মীটিরে খুঁজে উদ্ধার করে দিতে সাপের মতন পার্ক স্ট্রীটের মাথার মণি
পাথর বিগ্রহটিতে গলা থেকে রক্তপাত করে
তার বিলাপের তপ্ত ভাষার ভেতর দিয়ে দেখা যায় শ্যামশ্রী ও মুখ
ধান ওঠার ভাপ-এ আর্দ্র—চাল ধোয়া হাতখান নেড়ে
নদীকে সমুদ্র হতে বিদায় জানিয়ে তার বুকে বাঁধা আসা
তুমুল জোয়ার হয়ে ফিরে আসবে সব গাঙ—ঝাঁপি তার ভরে দেবে পলির উৎপন্ন
প্রতিভায়
আবেগে ধানভানার দ্রুত ঢেঁকি শব্দ করে নেপথ্য হৃদয়-পুরে আর
সবার উঠোনে তার পদচিহ্ন দেখে ঠিক চেনা যায় সোনার বাঙলাই

হায়রে বেচারা পাখি! আমি তারে কি করে শোনাব (কোন বড়মুখ আছে
আর) হায়
শিশুকে বুকের দুধ বিলিদান রত তার শ্যামশ্রী লক্ষ্মীর
শিশুটি আছড়ে ভেঙে পৌনপুনিক ভাবে বলাৎকার করে গেছে কামার্ত কামান
সওয়ারী

দাঁতে নখে ছেঁড়া তার শরীর রক্তমাখা ধানের ভেতরে অই পড়ে আছে হিম
কি করে জানাব আমি দ্রৌপদীর পুণ্য শাড়ি উৎখাত হতে দেখে নির্বাক দর্শক
ছিল যারা
সময়ের মুদ্রাদোষে তারাই গাছের কাছে গাছ
স্থবির পাণ্ডব, অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রর তৃতীয় নয়নে পাতা অন্ধতার স্বর্ণ সিংহাসন
তারে আমি কি করে বোঝাব, হায়, সতীত্বসর্বস্বহারা কে চুল করল না
খোপাভেঙে
জীবনকে কুরুক্ষেত্র করে আজ সন্ন্যাসী হবার মতো মানবিক আলোটুকুকেও
নষ্ট করে ফেলেছে সময়, হায় পাখি, কেঁদে কেঁদে শ্মশানে উড়ো না……
আমি বলতে পারব না—না যে থাকে থাকুক শুয়ে ধানসিঁড়ি নদীর কিনারে
কোনো দিন জাগবে না জেনে ; আমি তরঙ্গ ও জোয়ারের তীরে
শিকড় শক্ত গেড়ে এঠেল স্বদেশে
শব্দ আগুন সব মুক্ত পাখা করে আজ সবুজ মশাল হয়ে গেছি
আমি ভাবতেই পারি না
কামার্ত যন্ত্রের ক্ষত সর্বাঙ্গে হৃদয়ে লয়ে খোপাভাঙা চুলে মুখ ঢেকে থাকবে নারী
আর সকলেই পার্কস্ট্রীটের মাথার মণি কিম্বা মহাভারতের পিত্তলবিগ্রহ থেকে যাবে
চব্বিশঘণ্টাময়রজনী, লক্ষীপ্যাঁচা ঘোরমেঘে কালোহওয়া আকাশগঙ্গার তীরে তীরে
কাঁদে তার লক্ষীটিরে খুঁজে : কই শ্যামশ্রী ও মুখ, আহা, ক—ই
আমি জানি শটি ক্ষেতে ভাটপিঠালির বনে কালামেঘ পাতার আড়ালে
ভাঙা ঝাঁপি স্বপ্ন সাধ পাহারা দেবার ফাঁকে আগ্নেয় জোনাকী
বিনিময় করে যায় শিশিরের সঙ্গে হৃদয় : কিছু আগুনের সেঁক দিয়ে দেখা যাবে
নাকি
রাজরাজেশ্বরী অই জঙ্গলে পড়ে আছে হিম—বীভৎসা নিঃসীম
রক্তমাখা ধানিশাড়ি ছত্রাখান শস্য ; কার শিরিষপাতার মতো চোখবুঁজে আসে
এই নারকীয় দৃশ্য পাশে রেখে ঘুমোবে যে দুঃস্বপ্ন দেখবে না
ক্রোধেদুঃখেআতঙ্কে সে জিরাফের মতো ডান তর্জনী তুলে কি বলবে না 'হুশিয়ার'
আমার বুকের রক্ত কলমে পুরেছি আমি দরকারে আগুন ভরে নেব

যে থাকে থাকুক ঘুমে ধান সিঁড়ি নদীর কিনারে আর জাগবে না জেনে
শিকড় শক্ত করে এঠেল স্বদেশে আমি সবুজ মশাল হয়ে গেছি।

একটি খোলা চিঠি

আশিস সান্যাল

তোমার সাথেই বলেছিলাম, ভিয়েত কবি তো হোয়াই—
আমার নাম তোমার নাম ভিয়েতনাম।
কঙ্গোদেশের বন্ধু ভাই
বলেছিলাম তোমার দেশের শত্রুসেনার নিপাত চাই।

কিন্তু যখন বাঙলাদেশে মরছে মানুষ হাজার হাজার—
কোথায় তোমরা? কোথায় বন্ধু এল সেবাই,
দেখছ না কি দিচ্ছে হানা পাক সেপাই
বাঙলা দেশের ঘরে ঘরে? মারছে মানুষ হাজার হাজার?
রক্তে যে তার ভাসছে দেশ ভাসছে পদ্মা মেঘনা আর।

কোথায় বন্ধু লাওয়েল, ব্লাই, আমেরিকার বিবেক প্রাণ?
তোমার দেশের ভারী কামান দেখছো না কি পাচ্ছে এবার
গণতন্ত্রের খুনী জল্লাদ ইয়াহিয়ার পাকিস্তান?
ঐ কামানেই মরবে রশিদ, রক্ত গঙ্গা বইবে দেশে;
অবশ্য তার বিনিময়ে কবর দেবার দিচ্ছ ডলার আমার দেশে।

মানবতা কিসের নাম বলো এবার বন্ধু ভাই?
মানুষ মারা মানবতার এসো এবার নিপাত চাই।
মরছে যারা বাঙলাদেশে মুক্তিযুদ্ধে দিচ্ছে প্রাণ,
তারাও মানুষ, তারাও প্রেমিক, স্বাধীনতা তাদের নাম।
এসো এবার সবাই মিলে, বলে উঠি সর্বশেষ,
আমার নাম, তোমার নাম সবার নাম বাঙলাদেশ।

প্রতিরক্ষা

রত্নেশ্বর হাজরা

অস্ত্র অনেকেই দিল বর্ম শুধু তুমি—
আমি মধ্য রণাঙ্গনে
সামনে শত্রুব্যূহ
পিছে
তোমার উদ্যত তরবারি
মুখ ফেরালেই হাতে তুলে দাও কার্পাস তুলোর মেঘ যাকে
বিদ্যুৎ ছোঁয় না যার
ছায়া যায় গঙ্গা বেয়ে বঙ্গোপসাগরে—

আছি দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধে স্ববিরোধী হাওয়ার স্বদেশে
অহরহ সান্ধ্য আইন —ভয়-ভয়—বিপদসূচক নির্জনতা
ছায়ার দূরত্বে শত্রু
নিজের দুহাত প্রতিযোগী—
ঘোড়াগুলো ছুটে যায় বিকেলে ঘরের পাশ দিয়ে
নিরুদ্দেশ মাঠে ঘাটে
এবং ফেরে না—।
কোথাও আগুন লাগে—মানচিত্র জলে—কারো ঘর
হঠাৎ প্লাবনে ডোবে
আশ্রয় খোঁজার নামে পথ যায় পালিয়ে পালিয়ে

তারই মধ্যে কোনোদিন তিলফুল ফেরি করে তোমার আকাশ
ফেরিঅলা হেঁকে যায় বিকেলের অলিতে-গলিতে
নগররক্ষীর হাতে স্টেনগান তখন থাকে না
আশ্চর্য রাত্রির দেহ রোদ্দুরে সংহত করে গড়ে তোলে চাঁদ
কার্পাস তুলোর জোছনা
যোদ্ধার শরীরে ঝরে
প্রত্যহ যুদ্ধের দিন
বর্ম হয়—।

এ কেমন মানবমহিমা

তুলসী মুখোপাধ্যায়

এ কোন্ মানবতাবোধ, এ কেমন মানবমহিমা ?
তবু নিত্য জলস্থল অন্তরীক্ষ বিজ্ঞানের বশে
নিরক্ষর বস্তি উদ্ধারে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ অভিযান
পাহাড় ও সমুদ্র ডিঙিয়ে ছুটে যায় রেডক্রস
রাষ্ট্রসংঘে মনুষ্যত্ব কথা বলছে আকাশ ফাটিয়ে
সবই আছে অথচ হয়ত অবিকল সমস্ত সাজানো
কেননা এই মুহূর্তে যখন পঙ্গপালের মতো পশুপাল
ছিঁড়ে খাচ্ছে সাড়ে সাত কোটি মানুষের স্বাধীনতা
তাদের দাঁতের বিষে ঢুলে পড়ছে হাসপাতাল, মাতৃসদন
গুঁড়ো হচ্ছে বিদ্যালয়, ক্রীড়াভূমি, মসজিদে আজান
তাদের নখের ধারে মাইল-মাইল পড়ে আছে ধর্ষিত পৃথিবী !
অথচ পৃথিবীর মানচিত্রে কোথাও তেমন কোনো
দাগ পড়েনি—চিড় খায়নি তেমন আহ্নিক গতিতে
কেবল কাগুজে ক্ষোভ, বিবৃতি আর প্রতিবাদ
এবং কিছু কিছু উদ্বিগ্ন কণ্ঠ, মৃদু অশ্রুপাত
এ কেমন বিড়ম্বনা, এ কেমনতর মানবতাবাদ ?
তবে কি মুখোস পরে নাটমঞ্চে পুতুলের নাচ
কিংবা মানুষের মহিমা গানে অবসর চিত্তবিনোদন
না কি প্রবীন মানুষ জরাভারে নত মনুষ্যত্বহীন
এবং বিবেক পড়েছে চাপা জঞ্জালের স্তূপে !
এ কেমন মানবতাহীন ভয়ানক মানব ঘোষণা ?
যখন পঙ্গপালের মতো পশুপাল ছিঁড়ে খাচ্ছে
বাঙলাদেশ—সাড়ে সাতকোটি মানুষের স্বাধীন এষণা !

হে আমার বাঙলাদেশ, আ-স্বপ্নময়তা

গণেশ বসু

এ হাতে জানি অক্ষমতা, অন্তরালে ঝড়
অন্ধকারের ভিতরে জাগে স্বপ্নমতীর চর
দৃপ্ত আশার উর্মিলতার নদী
আছড়ে হাঁকে, মর্মমূলে হাঁকে
মন ও মনন হাওয়ার বাঁকে বাঁকে
জীবন শুধু জীবনই স্বয়ংবর
মৃত্যু ভালোবাসারই নাম অন্তরালে ঝড়।

এ হাতে জানি অক্ষমতা, ও হাতে জাগে মন
ঘূর্ণিঘাতে গৌরীচূড়া রঙ্গিনী যৌবন
অশ্রুপাতে নদী
ভাসায় ভেলা বিদ্যুতেরই ভেলা
জন্ম মৃত্যু পরুষ অবহেলা
জীবন জাগে জীবনই অনুক্ষণ

কেউ ভোলে না মৃত্যু-জালা, ও হাতে জাগে মন

এ হাতে গাঢ় আত্মঘাতী বিষাদবুনো ঝড়
ও হাতে নয় ঝলসানো সব ভ্রান্তিবিলাস চর
কোন্ উপমার ক্রুদ্ধ জোয়ার নদী
হাওয়ায় হাঁকে, মর্মমূলে হাঁকে
দুর্নিরোধ্য রক্ত পাকে পাকে
যৌবনেরই অগ্নিমুখী ঝড়

বাঙলাদেশ জীবন শুধু জীবন শুধু জীবনই স্বয়ংবর।

রানওয়ের বুলা

শিশির সামন্ত

নিশ্চুপ যে রানওয়ে, বুড়ো জাহাজের ভাঙা প্রপেলার পড়ে,
সেখানে অন্তিম কিছু হয়ে আছে ঘাস,
সেখানে দাঁড়িয়ে বুলা খোঁপাতে গুঁজল এক কাঠচাঁপা,
জীবনের সাথে এসে লুকোচুরি করে যায় গন্ধর্ব বাতাস।

বিপর্যয়ের মুগ্ধ ক্যানভাসে ওই যে বুলার ছবি, বুলা যে দাঁড়িয়ে আছে
রানওয়ের পীচে,
পশ্চাদপটের ওই চালচিত্রে দুর্ভাগ্য আকাশ,
যুদ্ধ কিন্তু শেষ নয় পৃথিবীতে, তুমি যে পালিয়ে এলে ;
এখানেই শিখে নিও যে ভাবে শিখতে হয় ধ্বংসের ছায়ার মাঝে
আত্মপ্রতিরোধ।

বুলা, তুমি চোখ তোলো। তোমার চোখের মাঝে আবহমানের এক
রয়েছে রূপক ;
স্মৃতি, ওই সারিবদ্ধ রঙরুটে ঘোরে ফেরে লোক ;
সাম্রাজ্যবাদের এক বৈষয়িক যুদ্ধ শেষে ভাঙা বাঙলা,
বুক ভরা শোক।

এই যে রানওয়ে, ছিল ব্যস্ত যত বিমানের ওঠা নামা, যে দশকে
হুমড়ি খেয়ে পড়েছিল একটা যুদ্ধের কাছে সমূহ মানুষ ; মহিমের
কিংবা চাষী আফজলের স্বার্থে নয়, গ্রাম করে ফসলের ক্ষেত
গড়ে ওঠে বিমান বন্দর ;
পূর্বপুরুষেরা বেচে নিজের তালুক আজ, বুলা ও আমার জন্য রইল স্বদেশ।

এখন বুলার পিঠে খোলা চুল, তুমি এই স্বদেশের ভূমিতে দাঁড়িয়ে,
আত্মপ্রতিরোধী এক বিমূঢ় সত্তায় ; মানুষের অধিকারে
পৃথিবীতে কবে হবে শেষযুদ্ধ, সেই যুদ্ধ শেষ।

জননী গো, ফিরে আসি

অমিয় ধর

চেতনায় কণ্ঠস্বরে
মধুমতী,
বেদনার মন্দিরা বাজে!
আমারই বুকের রক্তে,
উত্তরোল অশ্রুনদী
বেহুলার ভেলা ভাসে,
বাউল-কীর্তন আর,
ভাটিয়ালি সারি গানে—মঙ্গল রাগিণী!
জননী গো ফিরে আসি!
এত দুঃখ, তবু সুখ—
রক্তের আখরে রাখী,
বেঁধে দিলে রোশেনারা বোন্!
ইতিহাস-ভূগোলের পরপারে
সত্তার গভীরে কিছু বোধঃ
যার নাম ভালবাসা,
স্মৃতির পাঁজর কেটে
বসে যাওয়া জননীর মুখ,—
সে মুখ যায় না ভোলা
পরবাসে বেদনায় স্মৃতি—!
জননী গো, ফিরে আসি!

আমরণ সংগ্রামে তৎপর

রবীন সুর

বন্যায় গিয়েছে কিছু, কিছু গেছে অকাল খরায়।
ভেঙেচুরে স্বাধীনতা, মাটি ও ভাষায়
এপার ওপার—

যতটুকু বাকি থাকে, উদয়াস্ত সূর্যের সীমানা
দিগন্তে দিগন্তে ব্যাপ্ত বাঙলাদেশ, মিলিত মোহানা।

কিছু রক্ত ঝরে যায় আরোপিত সংঘর্ষে দাঙ্গায়
তবু চৈত্র চেতনার লৌকিক নির্ঝর
আত্মঘাতী ভুল ভেঙে
ধমনীর দিগ্বিদিকে দৃঢ় প্রতিজ্ঞায়
দ্বিতীয় ভিয়েতনাম : আমরণ মুক্তিযুদ্ধে ক্রমশ তৎপর।

বাঙলাদেশ : নিজের সঙ্গে

শুভ বসু

সেই কয়জন লোক নিজের জন্মের মাটি ভালোবেসেছিল
সেই কয়জন লোক নিজের মুখের ভাষা ভালোবেসেছিল
সহোদর পুরুষের হাতে হাত রেখে তারা চেয়েছিল সামর্থমাফিক
সন্ততিজনের জন্য হীনমন্যতাহীন স্বচ্ছল সংসার।

এখন দরিয়া জুড়ে ভেসে যায় মৃতদেহ হয়ে।

সেই রূপমতীদেশ নিজের মুখের ছবি চেয়েছিল সময়ের কাছে।
শহর এবং গ্রাম নদী আর নদীনীর উচ্চকিত বোলে
খুজেছিল উজ্জীবন, স্বাধীন শ্লোগান, ভালোবাসা।

এখন সমস্ত বুকে অসংখ্য শ্মশান জেলে রাখে।

সেই দেশ, সে সব মানুষ আজ তোমার বিবেকে প্রশ্ন রাখে
চাঁদের প্রত্যয়, নাকি মনসার কুটিল উচ্চাশা ?
(জাতিসঙ্ঘের সেই সুস্থ ন্যায়বোধ
নাকি সৎকারের শেষে সংকীর্তন আবেগে বিধুর)

চায় তোমার চৈতন্যে সেই সংগ্রামের সহজ স্বীকৃতি।

সমস্ত বিরুদ্ধশক্তি ঠেলে তাই তোমার বিশ্বাসে
পদ্মার মেঘনার থেকে প্রাণপাওয়া 'প্রতিরোধ' এই ধ্বনিরাশি
এখনও রাক্ষসীদিনে জাগন থাকিতে বলে যায়।

আমার ঈশ্বর

দুলাল ঘোষ

পরম নির্ভরতায় নিজের অস্তিত্ব সমর্পণ করেছিলাম
ঈশ্বরের কাছে
তিনি আমার ভীত-বিহ্বল চোখে, স্বচ্ছ দৃষ্টি রেখে
বলেছিলেন ঃ
আমি হিরোসিমার বুক থেকে শতাব্দীর কালিমা মুছে নেব
রক্তক্ষরা ভিয়েতনামে ওড়াব শান্তির পারাবত।

হায় ভালোবাসা, হায় প্রতিশ্রুতি—সহসা কার উলঙ্গ হাতে
ভেঙে পড়ল
আর এক সভ্যতা
অর্দ্ধদগ্ধ স্বাধীনতার বুক ঠিকরে বেরিয়ে এলো
কুণ্ডলী পাকানো বিষাক্ত ধোঁয়া
মরিয়া আমার ভাইয়ের মুখ
যুগপৎ দুর্জয় এবং হাহাকার।

আমি সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত ঈশ্বরের কাছে ছুটে গেলাম
একটুকরো আলোর জন্য
একবুক বায়ু…
মুহূর্তে তিনি ক্ষুধার্ত নেকড়ের মতো
চীৎকার করে উঠলেন ঃ
চুপ করে থাকো, নয়তো তুমিও শেষ হয়ে যাবে একদিন।

শিলাইদহ

হিরণকুমার সান্যাল

বিশ্বাসঘাতকদের চক্রান্তে মহাবীর সেনাপতি মেনাহাতীর মৃত্যুর পর রাজা সীতারাম রায় অল্পদিনই তাঁর রাজত্ব রক্ষা করতে পেরেছিলেন। দিঘাপতিয়ার দয়ারাম রায় যুদ্ধে পরাজিত সীতারামকে নিয়ে যান মুর্শিদাবাদে নবাবের দরবারে। পথে নাটোর রাজবাড়ির কারাগারে সীতারামকে বন্দী থাকতে হয়েছিল। সীতা-রামের বিপুল ভূসম্পত্তির একটি অংশ, বিরাহিমপুর পরগনাও হয়েছিল নাটোরের রাজার হস্তগত। এরপর নবাবদের পালা ফুরোলো। বাঙলার তথা ভারতবর্ষের রাজদরবারের প্রতিষ্ঠা হয় কলকাতা শহরে। যশোর থেকে এসে সেখানে বাসা বাঁধলেন ঠাকুর পরিবার। ঠাকুর বংশের কৃতী সন্তান দ্বারকানাথ লক্ষ্মীর কৃপালাভ করলেন এই নতুন শহরে। কিন্তু তখনকার দিনে আভিজাত্যের নিদর্শন ছিল ভূসম্পত্তি। তাই বিখ্যাত কার-ঠাকুর কম্পানির মালিক দ্বারকানাথ প্রভূত জমিদারি সম্পত্তি খরিদ করেন বাঙলাদেশের একাধিক অঞ্চলে। কিন্তু বিরাহিম-পুর পরগনা, যার সদর শিলাইদা রবীন্দ্রনাথের নামের সঙ্গে বিজড়িত হয়ে ইতিহাসবিখ্যাত হয়েছে—তা তিনি পেয়েছিলেন উত্তরাধিকারসূত্রে।

বিলেতে দ্বারকানাথের মৃত্যুর পর কার-ঠাকুর কম্পানি ও দ্বারকানাথের আর-এক কীর্তি ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক, কোনোটি বেশিদিন টেঁকেনি। ব্যবসা গুটোতে গিয়ে দেখা গেল পর্বতপরিমাণ দেনা, বেশির ভাগই কিন্তু বিনা খতে, কেননা দ্বারকানাথের নামের জোরেই রাশি রাশি টাকা ধার পেতে কিছু অসুবিধা হতো না। কিন্তু জ্যেষ্ঠ পুত্র দেবেন্দ্রনাথ আইনের চেয়ে নীতি বড়ো বলে মানতেন, তাই কড়ায়-গণ্ডায় তিনি মিটিয়ে দিলেন পাওনাদারদের দাবি। লোকে চমৎকৃত হলো কিন্তু জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবার হলো প্রায় নিঃস্ব। কিন্তু বিরাহিমপুর, সাজাদপুর ও কালীগ্রাম বা পতিসরের জমিদারি থেকে, গেল এঁদেরই দখলে, তা ছাড়া উড়িষ্যাতেও এঁদের কিছু জমিদারি ছিল। দেবেন্দ্রনাথের কনিষ্ঠ ভ্রাতা গিরীন্দ্রনাথের চেষ্টায় এই জমিদারির আয় ক্রমে বেশ মোটা অঙ্কেই দাঁড়াল।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ জীবিতাবস্থাতেই এই বিস্তৃত জমিদারি ভাগবাটোয়ারা করে দেন যাতে পরে কোনো গোলমাল না হয়। কিন্তু এর পরিচালনা করতেন তিনি নিজে, কেননা গিরীন্দ্রনাথের মৃত্যু হয় অল্পবয়সেই। উত্তরাধিকারসূত্রে পরে সাজাদপুর পরগনার মালিক হন গিরীন্দ্রনাথের তিন পৌত্র ঃ গগনেন্দ্রনাথ, সমরেন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথ। কিন্তু বার্ধক্যে তিনি চান সম্পূর্ণভাবে সংসারের দায়মুক্ত হতে, তাই জমিদারির ভার দেন স্বভাবতই জ্যেষ্ঠ পুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথের উপর। দ্বিজেন্দ্রনাথ ছিলেন ঋষিতুল্য লোক; খাজনা আদায়ের থেকে খাজনা মকুবের দিকেই তাঁর ঝোঁক; সুতরাং জমিদারি প্রায় লাটে ওঠার অবস্থা হলো। তখন ভার পড়ল জ্যোতিরিন্দ্রনাথের উপর। বালক রবীন্দ্রনাথ এই সময়ে একবার শিলাইদা গিয়ে তাঁর জ্যোতিদাদার সঙ্গে একদিন বেরিয়েছিলেন হাতির পিঠে চড়ে বাঘ শিকারে। এই ঘটনার জলজলে বর্ণনা আছে 'ছেলেবেলা'তে। এরপরে বোধহয় রবীন্দ্রনাথ আর কোনোদিন হাতির পিঠে চড়েন নি। অন্তত তাঁর রচনায় তার কোনো উল্লেখ আছে বলে মনে পড়ছে না। তবে বৃদ্ধ বয়সে বরোদায় গেলে মহারাজা রেল-স্টেশনে কবির জন্যে জমকালো সাজ-পরা রাজহস্তী পাঠিয়েছিলেন কিন্তু কবি এই সম্মান একটু দুঃসহ বোধ করে মোটরকারে রাজপ্রাসাদ যাওয়াই প্রশস্ত বিবেচনা করেন। ফলে কবির ভৃত্য বনমালীর ভাগ্যে জুটল হস্তীপৃষ্ঠের আসন। শান্তিনিকেতনে ফিরে বনমালী সগৌরবে এই ঘটনার সবিস্তার বর্ণনা করেছিল।

স্ত্রী কাদম্বরী দেবীর মৃত্যুর পর খুব বেশিদিন জমিদারির কাজে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মন বসে নি। মহর্ষি তাই রবীন্দ্রনাথের উপর ভার দিলেন বাঙলাদেশের ও উড়িষ্যার জমিদারি তদারক করার। রবীন্দ্রনাথ উনত্রিশ বছর বয়সে আস্তানা গাড়লেন শিলাইদার কুঠিবাড়িতে, আবার মাঝে মাঝে তাঁকে যেত হতো উড়িষ্যার জমিদারিতেও।

এই সময়কার কুঠিবাড়ির নানা কথা সংগ্রহ ক'রে শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ অধিকারীর লেখা 'পল্লীর মানুষ রবীন্দ্রনাথ', 'রবীন্দ্রমানসের উৎস সন্ধানে' প্রভৃতি বইগুলিতে জমিদার রবীন্দ্রনাথের যে-ছবি আমরা পাই তাতে ফুটে উঠেছে আশ্চর্য এক কর্মবীরের অলৌকিক ব্যক্তিত্ব, দেশবাসীকে যিনি উপহার দিয়েছিলেন 'স্বদেশী সমাজ'-এর পরিকল্পনা। নিজের জমিদারিতে তিনি হাতে কলমে এই পরিকল্পনা কার্যকর করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন,

প্রভাবশালী অনেক প্রজার, এমনকি, তাঁর নিজের অনেক কর্মচারীরও প্রতিকূলতা সত্ত্বে। এই প্রসঙ্গে শচীনবাবু তাঁর 'রবীন্দ্রমানসের উৎস সন্ধানে' বইতে উদ্ধার করেছেন একটি চিঠি যাতে রবীন্দ্রনাথ তাঁর এক কর্মচারীকে লিখছেন :

"প্রজাদের অবস্থা ও উৎপন্ন ফসলের পরিমাণের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই আদায় তহশীল করা শ্রেয়।... সর্বতোভাবে প্রজাদের সহিত ধর্মসম্বন্ধ রক্ষা করিয়া তাহাদের পূর্ণ বিশ্বাস আকর্ষণ করিতে হইবে। আমরা যে সর্বপ্রকারে প্রজাদের হিত ইচ্ছা করি তোমাদের ব্যবহারে তাহা প্রতিপন্ন করিতে হইবে। তোমার অধীনস্থ মণ্ডলের অন্তর্গত পল্লীগুলির যাহাতে সর্বপ্রকারে উন্নতিসাধন হয় প্রজাদিগকে সেজন্য সর্বদাই সচেষ্ট করিয়া দিবে।... প্রজাদিগের প্রতি যেমন ন্যায় ধর্ম ও দয়া রক্ষা করিবে তেমনি অধীনস্থ কর্মচারীদিগকে বিশেষভাবে কর্মের শাসনে সংযত করিয়া রাখিবে।..."

শচীনবাবুর ঐ বইতে আছে রবীন্দ্রনাথের আর-একটি উল্লেখযোগ্য চিঠি। জমিদারির এক কর্মচারী, দ্বারিকানাথ বিশ্বাস, চাতুরী অবলম্বন করে নিজের বেশ একটু সুবিধা করে নিয়েছিলেন অন্যায়ভাবে। ম্যানেজার জানকীনাথ রায় তাকে শাস্তি দিবার প্রস্তাব করলে রবীন্দ্রনাথ উত্তরে লিখলেন :

"স্বার্থরক্ষার জন্য প্রবল ব্যক্তি স্বভাবত চাতুরী অবলম্বন করিয়া থাকে। সে স্থানে দুর্বল পক্ষের বেলায় চাতুরী দেখা গেলে আমরা যে রাগ করি সে চাতুরীর প্রতি রাগ নহে, দুর্বলের প্রতিই রাগ। কারণ এই দ্বারিক বিশ্বাসই চতুরতার দ্বারা আমাদের কোনো কাজ উদ্ধার করিলে প্রশংসা ও পুরস্কারের পাত্র হয়। এমন স্থলে নিজের স্বার্থসাধনের উদ্দেশ্যে চাতুরী প্রয়োগ দেখিলে আমাদের রাগ করিবার কারণ নাই। আমার প্রজারা নিজের বৈষয়িক স্বার্থরক্ষার জন্য যখন চতুরতা করে আমার মনে তখন রাগ হয় না। তাহাদের বেদনা ও ব্যাকুলতা বুঝিবার আমি চেষ্টা করি।

"দ্বারিক বিশ্বাসকে আমি তোমার কাছেই ফিরাইয়া দিব, নিজে কোন হুকুম দিব না। তোমরা যেটা কর্তব্য বোধ করিবে, তাহাই করিবে। কেবলমাত্র দণ্ড দিবার জন্য কিছুই করিবে না। দ্বারিক বিশ্বাস যদি প্রবল হইত তবে সে আমাকে দণ্ড দিবার চেষ্টা করিত। আমি দৈবক্রমে প্রবল হইয়াছি বলিয়াই যে ক্রোধ পরিতৃপ্তির জন্য তাহাকে দণ্ড দিব এবং সে তাহা অগত্যা বহন করিবে, এ আমি সঙ্গত মনে করি না।"

শিলাইদহের যে কুঠিবাড়ি পাকিস্তানি দানবেরা চুরমার করে দিয়েছে সেটি খুব প্রাচীন নয়। এখানকার প্রাচীন কুঠিবাড়ি ছিল একটি নীলকুঠি আর তা পরিচিত ছিল নীলকর শেলি সাহেবের কুঠি বলে। এরই বর্ণনা পাওয়া যায় 'ছেলেবেলা' বইতে। জার্মানীতে কৃত্রিম নীল রঙ যখন তৈরি শুরু হলো তখন এদেশে নীল চাষের গর্বও হলো শেষ। দোর্দণ্ড প্রতাপ নীলকর সাহেবেরা নিরুপায় হয়ে পাততাড়ি গুটিয়ে ফিরে গেলেন দেশে। কিন্তু শিলাইদহের শেলি সাহেবের কুঠি, যার থেকে 'শিলাইদহ' নামের উৎপত্তি, দ্বারকানাথের হস্তগত হয়েছিল তার অনেক আগেই। আরো শত শত কীর্তির মতন সাহেবদের এই কীর্তিটিও কীর্তিনাশা গ্রাস করার পর তৈরি হয় শিলাইদহের নতুন কুঠিবাড়ি। এই কুঠিবাড়ি সম্বন্ধেই রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

> "মনে পড়ছে সেই শিলাইদহের কুঠি, তেতালার নিভৃত ঘরটি, আমের বোলের গন্ধ আসছে বাতাসে। দিনগুলো অবকাশে ভরা— সেই অবকাশের উপর প্রজাপতির ঝাঁকের মতো উড়ে বেড়াচ্ছে রঙিন পাখাওয়ালা কত ভাবনা এবং কত বাণী···মনের গভীরে ছিল অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা, পরিচয়হীন বেদনা।"

কিন্তু একদিন এই বেদনা কবিকে অভিভূত করেছিল তীব্রভাবে, সুস্পষ্ট কারণে। পদ্মাতীরের যে কুঠিবাড়ি ছিল দ্বারকানাথের উত্তর-ও মধ্যবঙ্গের সমগ্র জমিদারির সদর, পরে যা হয়েছিল রবীন্দ্রজগতের প্রাণকেন্দ্র, ক্রমে পদ্মা সেই কুঠিবাড়ি থেকে সরে গেল বহুদূরে। ১৩২৮ বঙ্গাব্দের চৈত্র মাসে শ্রীযুক্ত অমিয়চন্দ্র চক্রবর্তীকে লেখা একটি চিঠিতে কবি লিখছেন :

> "পুরানো শিলাইদহে সবই তেমনি আছে— বাড়ির দক্ষিণদিকে সিসু-বীথিকায় অবিশ্রাম মর্মর ধ্বনি চল্‌চে, পূবদিকের আমবাগানে দুই কোকিলে সমস্ত দিন কুহুধ্বনির কবির লড়াই চলেইচে, চষা মাঠের মাঝে মাঝে গ্রামগুলি অবগুণ্ঠিতা গ্রামবধূর মত বেণুবনের ছায়ায় ঢাকা দাঁড়িয়ে আছে, পুকুরপাড়ে দুটো একটা গোরু আলস্যমন্থর ভাবে চরে বেড়াচ্চে, বাগানের পাঁচিলের ধারে নারকেল আর সুপুরি গাছ ঠিক যেন শিশুর মতো আকাশের দিকে কেবলি হাত নাড়চে,—আকাশের নীল শুদ্ধ আর পৃথিবীর সবুজ চঞ্চল, এই উভয়ের মধ্যে দিনরাত কেবলি রঙের ইসারা চল্‌চে, দিনগুলো খেলার নৌকোর মত কেবলমাত্র পাখীর গান, কনকচাঁপার গন্ধ.

বেণুবনের মর্মর আর আলোছায়ার ঝিকিমিকি বোঝাই হয়ে আকাশের পূবঘাট থেকে পশ্চিমঘাটে পারাপার করচে— সবই তেমনি আছে কেবল আমার চিরপরিচিত পদ্মা শিলাইদা ছেড়ে দূরে কোথায় চলে গেছে তার আর নাগাল পাবার জো নেই। আমার পক্ষে এই বিচ্ছেদটি সামান্য নয়— যেন অলকাপুরীতে ঐশ্বর্য সবই আছে কেবল স্বয়ং লক্ষ্মীই নেই— সোনার নূপুরগুলি রয়েচে পড়ে, মুরজমুরলী মৃদঙ্গ কিছুরই অভাব নেই, কেবল যে পা দুখানি নিরন্তর নৃত্য করে বেড়াত তারাই গেছে কোথায় চলে। যেখান থেকে কিছুদিনের জন্মেও চলে যাই ঠিক সেখানটিতে কিছুতেই আর পৌঁছতে পারিনে— রেলের ষ্টেশন ঠিক আছে, রেলগাড়িও চল্‌চে কিন্তু আসল জায়গাটি লুকিয়ে লুকিয়ে কোথায় যে সরে যায় তার ঠিকানা পাবার জো থাকে না।"

'যেখান থেকে কিছুদিনের জন্মেও চলে যাই, সেখানটিতে কিছুতেই আর পৌঁছতে পারিনে।' মনে পড়ে রবীন্দ্রনাথের জীবনে আর-একটি যুগান্তকারী স্মরণীয় ঘটনা। ১৯১৮ সাল। জালিয়ানওয়ালাবাগের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের খবর সরকারের চেষ্টা সত্ত্বেও চাপা থাকল না। কবি এই খবর পেয়ে এত বিচলিত যে প্রায় অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। আকুলভাবে চেষ্টা করছেন যার প্রতিকার নেই তার অত্যন্ত জোরালো প্রতিবাদ হয় সমগ্র ভারতীয় জনগণের পক্ষ থেকে। কিন্তু রাজনৈতিক নেতাদের কাছ থেকে তেমন সাড়া পাচ্ছেন না। অসহ অস্থিরতায় কবি ব্যাকুল। একটু শান্তি পাবার জন্মে তাঁর নিত্যসহচর প্রশান্তচন্দ্র মহলানাবিশকে তিনি বললেন তাঁকে নিয়ে যেতে সেই গঙ্গাতীরের পেনেটির বাগানে যার বর্ণনা আছে জীবনস্মৃতিতে। সেখানে গিয়েও কিন্তু তাঁর অশান্তি দূর হলো না। তিনি বললেন না, সেখানে আর ফেরা যায় না।

এরপর তিনি সুস্থ হলেন বড়লাটকে 'নাইট'-খেতাব ত্যাগ করে তাঁর সেই অবিস্মরণীয় চিঠি লেখার পর। একটি মানুষের এই প্রতিবাদে সারা ভারতবর্ষে যে আলোড়ন উঠেছিল তার ঢেউ পৌঁছেছিল সাত সমুদ্রের ওপারেও।

কিন্তু পদ্মা, তাঁর একান্ত আপন পদ্মাকে তিনি কি করে ভুলবেন? একদিন পদ্মার জনহীন পুলিনে শুভ গোধূলিলগ্নে পশ্চিমের অস্তমান সূর্যকে সাক্ষী করে তিনি প্রাণ সমর্পণ করেছিলেন তাঁর এই নদীকে। বহুদিন পরে রচনাবলী-সংস্করণের 'সোনার তরী'র সূচনায় কবি লিখলেন:

"আমি শীত গ্রীষ্ম বর্ষা মানিনি, কতবার সমস্ত বৎসর ধরে পদ্মার আতিথ্য নিয়েছি, বৈশাখের খররৌদ্রতাপে, শ্রাবণের মুষলধারাবর্ষণে। পরপারে ছিল ছায়াঘন পল্লীর শ্যামশ্রী, এ পারে ছিল বালুচরের পাণ্ডুবর্ণ জনহীনতা, মাঝখানে পদ্মার চলমান স্রোতের পটে বুলিয়ে চলেছে দ্যুলোকের শিল্পী প্রহরে প্রহরে নানাবর্ণের আলোছায়ার তুলি। এইখানে নির্জন-সজনের নিত্যসংগম চলেছিল আমার জীবনে।··· মানুষের পরিচয় খুব কাছে এসে আমার মনকে জাগিয়ে রেখেছিল। তাদের জন্য চিন্তা করেছি, কাজ করেছি, কর্তব্যের নানা সংকল্প বেঁধে তুলেছি, সেই সংকল্পের সূত্র আজও বিচ্ছিন্ন হয় নি আমার চিন্তায়। সেই মানুষের সংস্পর্শেই সাহিত্যের পথ এবং কর্মের পথ পাশাপাশি প্রসারিত হতে আরম্ভ হল আমার জীবনে।"

ঐ সূচনাতেই আরো আছে :

"বাংলাদেশকে তো বলতে পারিনে বেগানা দেশ ; তার ভাষা চিনি, তার সুর চিনি। ক্ষণে ক্ষণে যতটুকু গোচরে এসেছিল, তার চেয়ে অনেকখানি প্রবেশ করেছিল মনের অন্দরমহলে আপন বিচিত্র রূপ নিয়ে। সেই নিরন্তর জানাশোনার অভ্যর্থনা পাচ্ছিলুম অন্তঃকরণে, যে উদ্‌বোধন এনেছিল তা স্পষ্ট বোঝা যাবে ছোটোগল্পের নিরন্তর ধারায়। সে ধারা আজও থামত না যদি সেই উৎসের তীরে থেকে যেতুম। যদি না টেনে আনত বীরভূমের শুষ্ক প্রান্তরের কৃচ্ছ্রসাধনের ক্ষেত্রে।"

এই কৃচ্ছ্রসাধনের ক্ষেত্র রবীন্দ্রনাথ নিজেই রচনা করলেন ১৯০১ সালে শান্তিনিকেতন বোলপুর ব্রহ্মচর্যাশ্রম প্রতিষ্ঠা করে। এর পর তাঁকে প্রচুর সময় দিতে হতো আশ্রমের কাজে। কিন্তু অহরহ তাঁর মনে বেজেছে নদীমাতৃক বাঙলাদেশের ডাক। তাঁর ছোটো গল্প ও কবিতার মধ্য দিয়ে সে ডাক পৌঁছল সমগ্র বাঙালি জাতের কানে, বাঙালির চোখের সামনে ফুটে উঠেছে বাঙলাদেশের অপরূপ মূর্তি। এই তো সোনার বাঙলা যার বুক বিদীর্ণ করল ব্রিটিশ শাসক বঙ্গ বিভাগ করে। সেদিন রবীন্দ্রনাথের একান্ত অন্তরঙ্গ বাঙলার মাটি বাঙলার জল স্পর্শ করেছিল বাঙালির মর্মকে। শাসক ও শাসিতের মিলিত চক্রান্তে যখন দ্বিতীয় বার বঙ্গবিভাগ হলো তখন কবির কণ্ঠ বহুদিন নীরব হয়েছে। তখন প্রতিবাদ করার লোক ছিল না কেননা পাপের ভাগী আমরা সকলে। কিন্তু এপারের বাঙলার লোক যখন রবীন্দ্রনাথকে করেছে

ব্যবসার পণ্য, সুলভ বিশ্বকবি লেবেল এঁটে তাঁর নামকে করেছে বিড়ম্বিত, তখন ওপারের বাঙলার লোক, যাদের বাস বিরাহিমপুর, সাজাদপুর, কালীগ্রাম পরগনা ও তার আশেপাশে পদ্মা যমুনা গোরাই আত্রাই নাগর ও ইচ্ছামতীর দুই তীরে, তারাই তো অর্জন করেছে রবীন্দ্রনাথের যথার্থ উত্তরাধিকার। উদ্ধত শাসকদের তারা বাধ্য করেছে সাজাদপুর ও শিলাইদাকে প্রাপ্য মর্যাদা দিতে, বেতারে রবীন্দ্রসংগীত প্রচার বন্ধের চক্রান্ত তারা সফল হতে দেয় নি, পকিস্তানের একচ্ছত্র শাসক জিন্নার মুখে তুড়ি মেরে তারা জানিয়েছে মাতৃভাষার দাবি আর এই দাবিকে প্রতিষ্ঠা করেছে রক্ত দিয়ে।

আজ আবার বইছে রক্তের স্রোত বাঙলার মাটি বাঙলার জলকে লাল রঙে রাঙিয়ে। আজ বাঙলাদেশ সংগ্রাম করছে জাতীয় সত্তা রক্ষার জন্যে। আত্মবিস্মৃত জাতি বলে ধিক্কৃত বাঙালি জাতির এক কবি জাতীয় সত্তার সন্ধান পেয়েছিলেন বাঙলাদেশের যে-অঞ্চলে নদনদী পল্লীতে—তারই প্রাণকেন্দ্র ছিল শিলাইদার কুঠিবাড়ি।

হারামজাদির উপাখ্যান

নফর কুণ্ডু

ছেলেটা গেল কই! যে দিনকাল পড়িয়াছে তাহাতে যে আসিবার সে যদি আসিতে এক প্রহরও বিলম্ব করে তবেই ভাবনা হয়। দুশ্চিন্তার তো কোনো মাথামুণ্ডু নাই, শুধু একবার আরম্ভ হইলেই হইল। হয়তো কাল খবরের কাগজ খুলিয়াই দেখিব পুলিশের গুলিতে নিহত তরুণ অথবা কলোনির মাঠের মধ্যে গলাকাটা মৃতদেহ প্রাপ্তির নিয়মিত সংবাদের পাতায় ছেলেটার নাম। সত্যিই, ছেলেটা গেল কোথায়! তিনদিন আগেই উহার ফিরিয়া আসার কথা। কিন্তু আজও পর্যন্ত পাত্তা নাই।

বাঙলাদেশ শরণার্থীদের জন্য রিলিফের মাল লইয়া দিনকয়েক হইল সে কৃষ্ণনগরের পথে সীমান্তের দিকে গিয়াছে। একাজ সে নতুন করিতেছে না। গত দুই মাস ধরিয়া ছেলেটাকে আমি এই কাজই করিতে দেখিতেছি। আজ আগরতলা, কাল বনগাঁ, পরশু কৃষ্ণনগর—কখনও সে শরণার্থী শিবিরে বাঁশের মাথায় ত্রিপল বাঁধিতেছে, কখনও কলেরার ইনজেকশন দিতেছে, কখনও বা চিঁড়া গুড় লইয়া ছুটাছুটি করিতেছে। এমন অনায়াসে, এমন অনুত্তেজ চোখে মুখে ছেলেটা এই কাজ করে যে দেখিলে মনে হইবে আবহমানকাল ধরিয়া ও এই কাজই করিয়া চলিয়াছে। মনে হইবে রিলিফের কাজের জন্যই ও জন্মিয়াছে আর ভবিষ্যতে ও রিলিফ দিয়াই যাইবে।

আসলে মাসকয়েক আগেও ছেলেটা ছিল কেরানি। ওর দশটা পাঁচটা অফিসের জীবনে ভূমিকম্প আনিয়া দিল বাঙলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ। কিছু একটা করা দরকার এইরকম একটা মানসিক তাগিদে কিছুদিন ও কখনও থ্রি নট থ্রি বুলেটের ব্যর্থ সন্ধানে, কখনও পেটি পেটি ডিনামাইট সংগ্রহের স্বপ্নে ছুঁচা-বাজির মতো ছটফট করিয়া শেষপর্যন্ত ক্লান্ত, হতাশ হইয়া দিনকয়েক গুম হইয়া বাড়িতে বসিয়া রহিল। তারপর যখন প্রতিদিন হাজারে হাজারে শরণার্থী সীমান্ত পার হইয়া আসিতে শুরু করিল তখন একদিন হঠাৎ 'দূর শালা! লোকগুলো মরে গেলে ফিরে গিয়ে লড়বে কে'—বলিয়া ছেলেটা সোজা

আসিয়া উঠিল সহায়ক সমিতির অফিসে! সেই যে কাজে হাত লাগাইল আর আসে নাই। কিন্তু বাহাত্তর ঘণ্টা পার হইয়া গেল সীমান্ত হইতে ফিরিয়া আবার মাল লইয়া অন্যত্র যাইবার কথা অথচ ছেলেটা এখনও ফিরিল না। আশ্চর্য!

*　　*　　*　　*

চতুর্থদিন সন্ধ্যায় সে ফিরিল। পান চিবাইতে চিবাইতে, গুনগুন করিয়া স্বর ভাঁজিতে ভাঁজিতে সে ফিরিয়া আসিল। চোখে মুখে তিলমাত্র লজ্জা বা সঙ্কোচের চিহ্ন নাই। যেন এইরকমই কথা ছিল। দেখিয়া আমার হাড়পিত্তি জ্বলিয়া গেল। বেশ রুষ্ট স্বরেই জিজ্ঞাসা করিলাম—'এতদিন কোথায় ছিলে?' পা নাচাইতে নাচাইতে ছেলেটা জবাব দিল—'শ্বশুরবাড়িতে।'

যতদূর খবর রাখি ছেলেটার স্ত্রী ও কন্যা রানাঘাটে উহার শ্বশুরবাড়িতে আছে। ছেলেটার দাঁত বাহির করা দায়িত্বজ্ঞানের বহর দেখিয়া জ্বলিয়া উঠিলাম—'এটা কি শ্বশুরবাড়ি যাবার সময়?'

হঠাৎ ও দপ করিয়া নিভিয়া গেল। কাতর কণ্ঠে বলিল—'মাইরি বিশ্বাস্ করুন দাদা মেয়েটাকে একটু দেখতে গিয়েছিলাম। অমন দৃশ্য চোখের সামনে দেখলে আপনিও নিশ্চিন্ত থাকতে পারবেন না। আপনিও ছুটে গিয়ে আপনার মেয়ের নাকের কাছে হাত নিয়ে দেখতেন তার নিশ্বাস পড়ে কিনা, গায়ে হাত দিয়ে আপনিও নিশ্চিত হতে চাইতেন তার ধমনীতে প্রাণস্রোতের প্রমাণ পেয়ে।'

নিশ্চিত প্রাণস্রোত ও ধমনী—ছেলেটার মুখে এই অস্বাভাবিক সাধু শব্দের উচ্চারণে চমকিয়া উঠিলাম। বুঝিলাম ও যাহা বলিতেছে তাহার মধ্যে সত্য ছাড়া একবর্ণ মিথ্যা নাই। মানুষের প্রকৃতিই এই। দারুণ বেদনায় নিষ্ঠুর সত্যের মুখোমুখি দাঁড়াইলে সে সাধু ভাষায় কথা বলে। মরণকে বলে 'স্বর্গারোহণ', বাবাকে বলে 'পিতা' মাকে 'জননী'। সে ভাষা তাহাকে আয়ত্ত করিতে হয় না, সে পায়। মনকে ভারমুক্ত করিবার তাগিদ সেই দুর্লভ ভাষা তাহার কণ্ঠে জুটাইয়া দেয়।

বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—'তার মানে?'

অতঃপর ছেলেটা যে কাহিনী বলিল তাহাই হারামজাদির উপাখ্যান।

*　　*　　*　　*

বিশ্বাস করুন ক্যাম্পে মালপত্তর নামিয়ে দিয়ে এক মুহূর্তও দেরি করিনি। হেঁটেই ফিরছিলাম। বাজারের কাছে এসে বাস ধরব। ক্যাম্প থেকে কিছু দূরে

গাছ তলায় একটা চায়ের দোকানে এক গেলাস চা খেয়ে আবার হাঁটতে শুরু করলাম। পথ দিয়ে দলেদলে শরণার্থী চলেছে কৃষ্ণনগরের দিকে। কাঁধের উপর বাঁকের দুধারে ডালায় সংসার নিয়ে বাবা; বগলে হোগলার মাদুরে জড়ানো শেষ সম্বল, মাথায় ভাতের হাঁড়ি পেটে ভবিষ্যৎ এবং দুই হাতে বর্তমান বংশধরদের টেনে টেনে চলেছে মা। উঁচু সড়কের দুই পাশে তিল ধারণের জায়গা নেই। অতএব চল কেষ্টনগর।

আমার পাশেপাশে হেঁটে যাচ্ছিল এক বুড়ো চাষী। বলিষ্ঠ বুকের উপর এক হাতে আঁকড়ে ধরে আছে একটি শিশুকন্যাকে। মেয়েটা বাবার কাঁধে মাথা রেখে ঘুমুচ্ছে। অন্য হাত দিয়ে বাবা মাঝেমাঝে মেয়েটার পিঠে ঘুমপাড়ানী চাপড় মারছে আর অস্পষ্ট স্বরে সান্ত্বনা দিয়ে যাচ্ছে—। হুই বাজারে গিয়া তরে চিড়া ভিজাইয়া দিমু। এলে এট্টু চুপ যা। চলতে চলতে বার বার লোকটাকে দেখছিলাম। চওড়া কপাল, মাথার চুল শাদা। প্রায় ছ-ফুট লম্বা দীর্ঘ দেহে বৃষ্টি ভেজা, স্যাঁতসেতে অন্ধকার পানের বোরজের—কালো সবুজ ঢলঢলে পানের পাতার মত চওড়া বুক। বয়স হয়তো তিন কুড়ি পার হয়ে গেছে। প্রাচীন পাণ্ডুলিপির মতো শরীরের কোঁচকানো চামড়া, ঘোলাটে চোখ আর শ্লথপেশীর দিকে তাকিয়ে ওর যৌবনের অবলুপ্ত ইতিহাসের অনেকখানি পাঠোদ্ধার করা যায়। বোঝা যায় ওর যৌবন কি সুঠাম ও দুর্দান্ত ছিল সে পাণ্ডুলিপি দুর্বোধ্য নয়। মেরুদণ্ড ওর এখনও একটুও বাঁকেনি।

মেয়েটা সম্ভবত খাওয়ার জন্য কান্নাকাটি করছিল। বাবা তাকে সান্ত্বনা দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে ফেলেছে। বাজারে পৌছে গাছতলায় বসে বাপবেটিতে চিঁড়ে ভিজিয়ে খাবে। অল্প পয়সা তাই যত দেরি করে খাওয়া যায় ততই লাভ।

বাজারে পৌছে আমাকেও কিছু খেতে হবে। তারপর বাস ধরব। অনেকক্ষণ হাঁটছি। শরণার্থী বাবা তখনও কন্যাকে সেইরকম বিড়বিড় করে সান্ত্বনা দিতে দিতে আমার পাশেপাশে হেঁটে চলেছে।

বাজারের কাছাকাছি এসে শুনতে পেলাম বাবা বলছে—ওই বাজার আইয়া গেল—ওঠ এ্যাখন। মেয়েটার কিন্তু উঠবার কোনো ইচ্ছা দেখা গেল না। বাপের কাঁধে মাথা রেখে তেমনি ঘুমুচ্ছে।

সামনের বাঁকটা পার হলেই বাজার। বাজারে দরজির দোকানের সেলাই-এর কলের একটানা আওয়াজ কানে আসছে। মেয়েটার পিঠে একটা মৃদু চাঁটি মেরে বাপ বলল—এই! ওঠ। আর ঘুমাইতে হইব না। মেয়েটা তখনও

ঘুমুচ্ছে। আরও দুকদম এগিয়ে বাবা হঠাৎ অগ্নিশর্মা হয়ে উঠল। শেষপ্রহর বেলায় মাঠ থেকে ফেরা অভুক্ত চাষীর রক্তে যে আগুন জ্বলে, নিদ্রাকাতর অবাধ্য কন্যার নিদ্রাবিলাস ওর মাথায় যেন সেই আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে গেল। কাঁধে ঘুমন্ত কন্যার কোঁকড়ান চুলের মুঠিতে সজোরে ঝাঁকুনি দিয়ে ফ্যাসফেসে ফাটা গলায় বাবা চিৎকার করে উঠল—হারামজাদি! কথা কানে যায় না? মাইয়া মাইনষের এত ঘুম কিসের লো? ওঠ!

বজ্রমুঠির হ্যাঁচকা টানে মাথা বাপের স্কন্ধচ্যুত হয়ে নেতিয়ে পড়ল। হারামজাদির উলঙ্গ পাছায় সবল হাতের একটা উদ্যত চাঁটি সজোরে নেমে এসে হঠাৎ শূন্যে থেমে গেল। তারপর সেই হারামজাদির মুখের দিকে তাকিয়ে দুপুরের চিলের মতো তীক্ষ্ণ স্বরে বাবা চিৎকার করে উঠল—ওরে আমার আমিনারে!

অনেকক্ষণ আগেই মেয়েটা মরে গিয়েছিল। মরে গিয়েও এতক্ষণ বাপের কাঁধে ঘাপটি মেরে ঘুমের ভান করে পড়েছিল। হারামজাদিই বটে।

* * * *

হারামজাদির উপাখ্যান শেষ হইয়াছে। বহুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া অবশেষে অস্বাভাবিক নিম্ন স্বরে ছেলেটাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—'মেয়ে কেমন আছে?' বেহায়া ছেলেটা হাসিয়া জবাব দিল—'সে হারামজাদির কথা আর বলবেন না দাদা। এখন হাঁটতে শিখে গেছে।'

০

ষাটের শেষ ঃ সত্তরের শুরু

'বাঙলাদেশ'-এর ছোটগল্প

সুব্রত বড়ুয়া

ষাট-দশকের শুরুতে যে তরুণ স্কুলের শেষ ক্লাসের ছাত্র, দশকের শেষে সেই তরুণটিই একজন উৎসাহী গল্প-লেখক। এমন ঘটনা আজকের বাঙলাদেশে বিরল নয়। পঞ্চাশের দশকে যাঁরা বাঙলাদেশে সবচেয়ে প্রতিভাবান গল্পকার ছিলেন—পরের দশকে তাঁদের অনেকেই গল্প আর লিখলেন না, কিংবা এমন গল্প লিখলেন যা নতুন পাঠকের কাছে সাড়া তুলতে অক্ষম হলো।

প্রতি দশকেই নতুন একদল গল্পকার সাহিত্য ক্ষেত্রে আবির্ভূত হবেন অথবা গত দশকের গল্পকাররা ম্লান হয়ে যাবেন অবিসংবাদিত নিয়মে—এমন আশা অবাস্তব। 'কাল তার এ্যালবামে কিছুতে রাখেনা সব ফোটো'—এ নিয়মে সময়ের পরিবর্তনে সাহিত্যের আঙ্গিকেরও হয় রূপান্তর। বিশ-শতকের শেষার্ধে জীবন বড় বেশি অস্থির এবং দ্রুত পরিবর্তনের রূপরেখা তার ছাপ রাখছে আমাদের জীবন ও সৃষ্টিতে।

উনিশশো সাতচল্লিশের পর বাঙলা সাহিত্যের একটি বিশেষ ধারা আবর্তিত হয়েছে ঢাকার সাহিত্য আন্দোলনকে ঘিরে। সাতচল্লিশের আগেও ঢাকার একটি বিশেষ সাহিত্য আন্দোলন অব্যাহত ছিলো, কিন্তু পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর এ আন্দোলন রাজনৈতিক চিন্তাধারার সাথে জড়িত হয়ে পড়েছিল। সদ্য পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার উচ্ছ্বাস কবিতা ও অন্যান্য ক্ষেত্রে স্পষ্ট ছাপ রেখেছে এবং নিঃসন্দেহে বলা যায় এর পেছনে চেতনা ও বিবেকের চেয়ে বেশি কাজ করেছে ভাবালুতা। কিন্তু এই ভাবালুতার তীব্রতা বেশিদিন টিকলো না। বাহান্নোর ভাষা আন্দোলনের পর বাঙালিরা স্বদেশপ্রত্যাবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আপন স্বরূপ চিনতে শুরু করল। সাহিত্যের মাধ্যমে এ আন্দোলন আরও সংহত হয়ে উঠল। এবং একদল প্রতিভাবান তরুণ গল্প-কবিতা-উপন্যাস ও অন্যান্য সৃষ্টিশীল রচনায় জীবনবাদের স্পষ্ট স্বাক্ষর রাখার প্রয়াসে নামলেন।

সাহিত্য বিতর্কাতীত নয়। জীবনকে বাদ দিয়ে সাহিত্য হতে পারেনা।

কিন্তু, জীবন কি ? স্পষ্ট প্রত্যক্ষ গোচরীভূত সবই জীবন এবং অন্যকিছু জীবন নয়, এমন প্রশ্ন নিয়ে চিরকাল তর্ক হয়েছে। গল্প-কবিতা কিংবা সকল সৃষ্টিধর্মী শিল্প জীবনাতীত নয় বলেই রাজনৈতিক আন্দোলন এবং সাম্প্রতিক চেতনা কবি ও কথাশিল্পীর সৃষ্টিতে বিশেষ একটি স্থান অধিকার করে থাকে। বাহান্নোর ভাষা আন্দোলনও তাই বাঙলাদেশের সাহিত্যে একটি উজ্জ্বল আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। কবিতা ফেব্রুয়ারির ফসলকে ধারণ করেছে সবচেয়ে বেশি, অথচ গল্প কিংবা উপন্যাসে সুপ্রচুর ফলন সম্ভব হয়নি।

কিন্তু জীবন কোন বিশেষ ঘটনা নয়, নয় কোনো বিশেষ দিন। পঞ্চাশের দশকে গল্পকাররা জীবনকে উপলব্ধি করতে চেয়েছিলেন। তাঁরা তাঁদের সেই পরম উপলব্ধির ফসল থেকে বীজ বোনার চেষ্টাও করেছিলেন। এবং সবচেয়ে বড় কথা, পঞ্চাশ-দশকের গল্পকাররা অতীতের গুহা থেকে বেরিয়ে এসে নতুন সৃষ্টির সন্ধানে নেমেছিলেন।

এই দশকে যাঁরা গল্প লিখেছিলেন—তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য আলাউদ্দিন আল আজাদ, শওকত আলী, আবদুল গফ্ফার চৌধুরী, সৈয়দ সামসুল হক, সাইয়িদ আতিকুল্লাহ, হাসান হাফিজুর রহমান, জহির রায়হান, বোরহানউদ্দীন খান জাহাঙ্গীর, সুচরিত চৌধুরী, ফজল শাহাবুদ্দিন এবং আরো অনেকে।

সাতচল্লিশের আগে থেকেই এঁদের পূর্বসূরীরা সাহিত্য-আন্দোলন অব্যাহত রেখেছিলেন। আবুল ফজল, শওকত ওসমান, আবু রুশদ, আবু জাফর শামসুদ্দিন, আকবর হোসেন, শাহেদ আলী এবং আরো কয়েকজন ছিলেন এঁদের পুরোধা। এঁদের অনেকেই এখনো সক্রিয়। কেউ কেউ সাম্প্রতিক কালেও নতুন গল্পের নিরীক্ষাধর্মী প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছেন।

পঞ্চাশ-দশকের গল্পকাররা জীবনবোধের সঙ্গে শিল্প-বোধের সমন্বয় সাধনের দুরূহ প্রচেষ্টায় ব্রতী ছিলেন। তাঁদের রচনায় সে স্বাক্ষর স্পষ্ট।

আলাউদ্দীন আল আজাদ তাঁর প্রথম দিক্‌কার গল্পে গ্রাম-বাঙলার জীবন ও সংগ্রাম এবং মানব চরিত্রের নিগূঢ় বিশেষত্বের উপর চমৎকার গল্প লিখেছেন। কিন্তু তাঁর সাম্প্রতিক বিরল-প্রসূ গল্প-সমূহে সে উজ্জ্বলতা আর নেই। বরং পড়তে পড়তে তাঁকে ভীষণ নিষ্প্রভ মনে হয়। সম্ভবতঃ আধুনিক জীবনের চেতনা ও যন্ত্রণাবোধের সঙ্গে মানব-চরিত্রের স্থূলতার অপরিণত মিশ্রণ ঘটাতে গিয়েই তিনি এ সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন। তাঁর গল্পগ্রন্থ 'ধানকন্যা' অথবা 'জেগে আছি' কিংবা 'অন্ধকার সিঁড়ির' পাশে 'যখন সৈকত' বইটি রাখলেই

এই অমোঘ বৈপরীত্য চোখে পড়ে।

গল্পকার শওকত আলীর প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ গল্পের নয়, ক্ষুদ্র উপন্যাস,—'পিঙ্গল আকাশ'। শওকত আলী উত্তরবঙ্গের জীবন নিয়ে গল্প লিখেছেন বেশি। তিনি তাঁর আপন-ভূগোলে নরনারীর জীবনবেদ-প্রেম-ভালোবাসা-ঘৃণা ও তীব্র আকাঙ্ক্ষার অপরূপ ছবি আঁকার দক্ষ চিত্রকর। আধুনিক নগরজীবনের যন্ত্রণা তিতিক্ষা, প্রেম ও স্বপ্নের খোঁজে তাঁর যাত্রা মামুলি, কিন্তু মিষ্টি। শওকত আলীর প্রথম গল্পগ্রন্থ 'উন্মূল বাসনা'। এ গ্রন্থে তিনি গ্রাম-বাঙলা এবং আঞ্চলিক জীবন নিয়ে গল্প লিখেছেন। তাঁর চরিত্রেরা সাধারণ। জীবনের প্রেম-প্রীতি-ভালোবাসা আর জীবনধারণের তিতিক্ষার দক্ষ চিত্রকর তিনি। এ মুহূর্তে তাঁর একটি গল্পের কথা মনে পড়ছে—নাম 'ব্রতযাত্রা'। ব্রতযাত্রার মানুষেরা সাধারণ। বিশ্বাসের নিগূঢ় সম্পদ নিয়ে কোনো এক তীর্থে একদল যাত্রী যাচ্ছেন—তাঁদের মাঝে আছেন এক মহিলা। ব্রত উদ্‌যাপনের নিবিড় আনন্দে কম্পিত হৃদয়। পথের কষ্ট অপরিসীম। তবু চলেছেন সেই মহিলা। সূর্যজ্বালার নিচে পথশ্রমে ক্লান্ত—তবু চলতে তাঁকে হয়। গল্পটি পড়তে পড়তে মনে হয়—মানুষের জীবনও যেন এমনি একটি দুরূহ ব্রতযাত্রা। একটি পরম বিশ্বাসের অবলম্বন নিয়ে চলেছে মানুষ। পথের অসহ্য যন্ত্রণা, দুঃখ-কষ্ট-ক্লান্তি কখনো কখনো একটি পরম প্রাপ্তির স্বপ্ন ও আনন্দে কোথায় যেন ডুবে যায়।

শওকত আলী শক্তিশালী গল্পকার। তিনি চেনাভুবনের ছবি আঁকেন। সেখানে আমরা মানুষের কাছাকাছি পৌঁছে যাই।

সৈয়দ সামসুল হক তীক্ষ্ণধী, ক্ষুরধার শিল্পী। তাঁর রচনায় আধুনিক জীবন যন্ত্রণার কাতরধ্বনি ক্ষীণ শব্দের মতো কানে এসে বাজে। তাঁর গল্পের মানুষেরা আপন-ভুবনে বন্দী পরাজিত নায়ক। জীবনকে তারা বিদ্ধ করতে চায় জীবনের সত্যে। জিজ্ঞাসা তাদের অবলম্বন। ব্যক্তি-মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা-আনন্দ ও হতাশার জিজ্ঞাসা তাঁর গল্পে উচ্চকিত। তাঁর নায়ক-নায়িকারা যন্ত্রণা-বিধ্বস্ত যুগের প্রতিভূ। তাই কালো কফির পেয়ালায় জনকের ছবি কেমন যেন ব্যতিক্রম সত্তার মতো।

চরিত্রের দিক থেকে সৈয়দ সামসুল হক রোমান্টিক। তাঁর রোমান্টিকতা সস্তা হৃদয়াবেগ-জড়িত কোনো প্রাত্যহিক ঘটনা নয়। তাই কখনো কখনো সৈয়দ সামসুল হকের অনুপম ভাষার অন্তর্গতে ডুব দিয়ে প্রশ্ন করি নিজেকে—কি নিয়ে চলেছি আমরা? আমাদের ব্রতযাত্রায় কি এমন পরম বিশ্বাস! আমার

তো জন্ম থেকেই অবিশ্বাসী অস্থির। আমাদের ভূগোলে সূর্য পূর্বদিকে উঠবে, পশ্চিমদিকে অস্ত যাবে—এমন কথা শাশ্বত নয়। আমরা প্রতিনিয়ত আমাদের উপলব্ধি আর আবেগকে ক্ষতবিক্ষত করে চলি।

হাসান হাফিজুর রহমান মূলতঃ কবি। গল্প তিনি কখনো কখনো লিখেছেন। এবং সে গল্পে সাম্প্রতিক সময়ের ছাপ সুস্পষ্ট। কবিতায় হাসান হাফিজুর রহমান যেমন উচ্চকণ্ঠে মানুষের কথা উচ্চারণ করেছেন, গল্পেও ঠিক তেমনি গণমুখী চেতনা তাঁর লেখাকে সমৃদ্ধ করেছে। তাঁর চরিত্রেরা সাধারণ মানুষ। দুঃখ-অভাব-দারিদ্র্য-রাজনৈতিক আন্দোলন এবং সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা তাদের জীবনের সত্য। তারা তাত্ত্বিক নয়, মানুষ। এই মানুষের গল্পই লিখতে চেয়েছেন তিনি। সে গল্প কখনো উজ্জ্বল ছুরির ফলার মতো অন্তর্ভেদী কখনো বিকেলের নরম রোদের মতো স্নিগ্ধ। হাসান হাফিজুর রহমানের গল্প 'আরো দু'টি মৃত্যু' সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার' পটভূমিতে লেখা। আজকের বাঙলাদেশের পশ্চাৎপটে এই দু'টি মৃত্যু হাজার হাজার মানুষের মৃত্যুকে কঠিন আর্তিতে প্রশ্ন করতে পারে—এ মৃত্যু কি মনুষ্যত্বের মৃত্যু ?

বোরহানউদ্দিন খাঁন জাহাঙ্গীর বুদ্ধিদীপ্ত উজ্জ্বল গল্পকার। তাঁর গল্পের মানুষেরা জীবনে প্রতিষ্ঠিত, পরিশিলিত এবং তাদের সমস্যাও বুদ্ধির সীমায় আবদ্ধ। তাঁর গল্প পড়তে পড়তে আমার মনে হয়েছে তুচ্ছ হৃদয়াবেগ-প্রেম-প্রীতি ভালোবাসার বাইরেও আর একজন মানুষ থাকে। সেই মানুষটি চোখের দেখার সঙ্গে হৃদয় মিলাতে নারাজ।

সায়য়িদ আতিকুল্লাহ গল্প লিখেছেন কম। কিন্তু তাঁর প্রতিটি গল্প প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপে ভরা। কোনো বিশেষ চরিত্রকে অবলম্বন করে ধীরে ধীরে এগিয়ে যায় কাহিনী, পরিশেষে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ। 'এক সকালে রাজার লোক রোজ সকালে'—এমনি এক গল্প। আইয়ুব আমলের শ্বাসরুদ্ধ পরিবেশে রূপক ঘটনার উপর একজন ধুদ্ধিজীবীকে নিয়ে লেখা এ গল্পটি অনায়াসে সমাজের সুবিধাবাদী একজন বুদ্ধিজীবীর মসৃণ মুখোস খুলে দিচ্ছে সবার সামনে। পরিশেষে মারাত্মক অবসন্নতায় ক্লান্ত। পরোক্ষ অথচ তীক্ষ্ণ আক্রমণে ক্ষুরধার এ গল্পটি পাঠককে আশ্চর্য দক্ষতায় আত্মজিজ্ঞাসার সম্মুখীন করে দেয়।

ফজল শাহাবুদ্দিন এই দশকের অন্যতম গল্পকার। গল্পে এবং কবিতায় ফজল শাহাবুদ্দিন রোমান্টিকতার ধারক। তিনি তাঁর গল্পে নরনারীর যৌবন ও প্রেমকে বড়ো করে আঁকার চেষ্টা করেছেন।

আবদুল গফ্ফর চৌধুরী সাংবাদিক। তাঁর গল্পের সংখ্যা স্বল্প। কিন্তু তিনি শক্তিশালী গল্পকার। সাধারণ ঘটনা ও সমস্যার উপর আশ্চর্য দক্ষতার সাথে তাঁর আলোকপাত পাঠককে চকিত চমকে আবিষ্ট করে রাখে।

জহির রাহান মূলতঃ চলচ্চিত্রকার। তিনি উপন্যাস লিখেছেন বেশি এবং কখনো কখনো পাঠকদেরকে আশ্চর্য সুন্দর গল্পও উপহার দিয়েছেন তিনি। সুচরিত চৌধুরী পঞ্চাশ দশকেরই গল্পকার। তাঁর প্রথম গল্পগ্রন্থ 'আকাশে অনেক ঘুড়ি' প্রতিশ্রুতির স্বাক্ষর রেখেছিল—দ্বিতীয় গ্রন্থ 'একদিন একরাত' বইটিতে সে স্বাক্ষর সুস্পষ্ট। সুচরিত রোমান্টিক লেখক। কিন্তু ক্লাসিকপন্থী। জীবন থেকে গল্প তুলে নেবার আশ্চর্য দক্ষতায় তাঁর তুলনা নেই।

পঞ্চাশ দশকে আরো অনেকেই গল্পকে সমৃদ্ধ করেছেন। কিন্তু পরবর্তী দশকে তাঁদের অনেকেই ম্রিয়মান, ক্লান্ত এবং নিস্প্রভ।

প্রকৃতপক্ষে পূর্ব-বাঙলায় রাজনৈতিক উত্থান-পতনের সঙ্গে সাহিত্য-আন্দোলনের যোগ নিবিড়। ১৯৫৮ সালে সামরিক শাসনজারি হবার পর স্বাভাবিক কারণেই বক্তব্যের স্বাধীনতা গেল। শিল্পীর স্বাধীনতা বন্দী হলো বিশেষ সীমারেখায়।

ষাট দশকের প্রথমদিকে যাঁরা সাহিত্য-জগতে প্রবেশ করলেন তাঁরা পেলেন নিস্প্রভ বাগান। সেখানে ফুল আছে বটে, কিন্তু বৈচিত্র্য নেই। বায়ু আছে বটে, কিন্তু তাতে নেই উদার ব্যাপ্তি।

একদিকে সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে ধূমায়িত অসন্তোষ—অন্যদিকে মধ্যবিত্ত জীবনধারার ভয়-সংশয় ও নিরাপত্তাবোধের একান্ত প্রয়াস। সত্যিকার অর্থে পঞ্চাশের কিংবা তার আগের লেখকেরা কোন ঐতিহ্যবোধ ধরে রাখলেন না। লোভনীয় চাকরি, সরকারী আনুকূল্য এবং উঠতি বুর্জোয়া চিন্তাধারা মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের মর্মমূলে করেছিল প্রচণ্ড আঘাত। গণতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার অভাবে বিভ্রান্তি ও নৈরাশ্য গ্রাস করল অনেককেই।

ষাট দশকের লেখকেরা সাহিত্যে প্রবেশ করলেন এমনি এক শূন্যতা ও ক্রান্তিকালের মধ্যে। অর্থনৈতিক ধ্বংস বাঙলাদেশের গ্রামে গ্রামে পুরনো ঐতিহ্যবোধ ও মূল্যবোধের ক্ষীণ ধারাটিকে রুদ্ধ করতে তৎপর হলো। তরুণ লেখকেরা সদ্য গড়ে ওঠা নগরকে আঁকড়ে ধরলেন। আধুনিকতার অন্তরালে অবক্ষয় এসে বাসা বাঁধল জীবনে। পরস্পরকে সন্দেহ ও অবিশ্বাস মানবিক চেতনার স্থির নিষ্কম্প শিখাটিকে বৈশাখের রুদ্র হাওয়ার তাণ্ডবে করল দিশাহারা।

ষাট-দশকের তরুণ কবি ও গল্পকাররা আশ্রয় খুঁজলেন শিল্পের নিগূঢ় অঙ্গনে। সাম্প্রতিক সময়, রাজনৈতিক নিরীক্ষা এবং ঐতিহাসিক বিচার বিবেচনায় পলায়নবাদী মনোভাবের বিরুদ্ধে অনেকেই রুখে দাঁড়ালেন। নতুন সমাজ গঠনের দায়িত্বে নিজের লেখনীকে নিয়োগ করতে ভুল করলেন না তাঁরা।

ষাট-দশকের শুরুতে যাঁরা গল্প লিখতে এগিয়ে এলো—তাঁদের মধ্যে আছেন—আবদুল মান্নান সৈয়দ, জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত, শহীদুর রহমান, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, মাহবুব তালুকদার এবং আরো অনেকে।

এই সময়েই 'লিটল ম্যাগাজিন' বা অনিয়মিত সাহিত্য-পত্রিকার আন্দোলন জোরদার হয়ে ওঠে। ঢাকা-বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে বেরুতে শুরু করে 'স্বাক্ষর' এবং 'কণ্ঠস্বর'। 'স্বাক্ষর' তরুণদের কবিতা-পত্রিকা রূপে কয়েক সংখ্যা বেরুবার পর বন্ধ হয়ে যায়। 'কণ্ঠস্বর' নিয়মিত সাহিত্যমাসিক রূপে প্রকাশিত হতে থাকে। অবশ্য তখন মাসিক 'সমকাল'কে ঘিরে ঢাকায় একটি সাহিত্যগোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল। 'কণ্ঠস্বরে'র রাগী তরুণরা সাহিত্যের মুরুব্বিদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন।

এই সময়ের মধ্যিখানে আর একজন গল্পকারের নাম উল্লেখযোগ্য—তিনি হাসান আজিজুল হক। হাসান আজিজুল হক অন্যতম শ্রেষ্ঠ গল্পকার। 'সমুদ্রের স্বপ্ন শীতের অরণ্য'—হাসান আজিজুল হকের প্রথম গল্পগ্রন্থ। তাঁর দ্বিতীয় গল্পগ্রন্থ 'আত্মজা ও একটি করবী গাছ'। বস্তুবাদী জীবন-দর্শনে বিশ্বাসী এই গল্পকার বর্তমান সময়ের নিপীড়িত মানুষের জীবন ও সমস্যা নিয়ে গল্প লিখেছেন। বন্যা, দুর্ভিক্ষ, দাঙ্গা, রাজনৈতিক আন্দোলন এবং অর্থনৈতিক শোষণের বিশেষ দিকগুলো তিনি তুলে ধরেছেন কুশলী শিল্পের মতো। তাঁর গল্প পড়ে অভিভূত হতে হয়। হাসান আজিজুল হক পঞ্চাশের দশকে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন, ষাটের দশকে প্রকাশিত তাঁর গল্প 'আত্মজা ও একটি করবী গাছ' নিঃসন্দেহে বাঙলা সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য গল্প।

'কণ্ঠস্বর' আন্দোলনের সমসাময়িক সময়ে গল্প লিখেও জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত এই আন্দোলনে এগিয়ে আসেননি। জ্যোতিপ্রকাশের প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ 'দুর্বিনীত কাল'। পরে তাঁর 'বহেনা সুবাতাস' এবং 'সীতাংশু তোর সমস্ত কথা' নামে দু'টো গল্পগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে।

জ্যোতিপ্রকাশ গল্পের নতুন ধারার সূত্রপাত করার চেষ্টা করেছেন। কাহিনী,

থেকে সরে গিয়ে এ্যাবসার্ড গল্প লেখার প্রবণতা দেখা যায় তাঁর গল্পে। কিন্তু কখনো কখনো যখন তিনি নির্ভেজাল গল্প লিখেছেন—তখন আশ্চর্য সরলতায় তাঁর গল্প তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে।

'কণ্ঠস্বর'-এর তরুণরা কায়েমী সাহিত্যিকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন। প্রচলিত সাহিত্য-সৃষ্টির প্রথাগত পদ্ধতি থেকে সরে গিয়ে নতুন সাহিত্যপ্রয়াসে এই তরুণরা যখন এগিয়ে এলেন—তখন স্বাভাবিক কারণেই নৈরাশ্য ও বিপরীত বাসনা তাঁদের অনুপম সঙ্গী হলো। সমষ্টিগত রাজনৈতিক চেতনার অভাবে জীবনের অন্ধকারটাই এই তরুণদের সামনে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকেই ব্যক্তিচেতনা প্রবল হয়ে ওঠে। অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ, নিরাপত্তাবোধের অভাব, অর্থনৈতিক শোষণ এবং মধ্যবিত্ত জীবনে ধ্বস—এ সবই এই নৈরাশ্যের কারণ। কিন্তু ষাটদশকের শুরু থেকে যাঁরা গল্প লিখেছেন—তাঁরা নির্দিষ্ট কোনো ঐতিহ্য লাভ করেননি তাঁদের পূর্বসূরীদের কাছ থেকে। নতুন ঐতিহ্য সৃষ্টির কারণেই শুরু হলো অন্বেষণ। ব্যক্তি-মানুষের সম্পর্ক, প্রেম-প্রীতি-ভালোবাসা বন্ধুত্ব এবং মানবিক সম্পর্কের পরম সত্য অন্বেষণের তাগিদে তাঁরা শুধু স্রষ্টা হলেন না, হলেন দ্রষ্টাও। নতুন সময়ের এই তরুণ-গল্পকারদের সম্বল হলো তাই অবিশ্বাস! কিন্তু সে-অবিশ্বাস জীবন থেকে পালিয়ে যাওয়া নয়, বরং অন্ধকার থেকে আলোতে ফিরে আসা।

আবদুল মান্নান সৈয়দ নিরীক্ষাধর্মী গল্পকার। আখতারুজ্জামান ইলিয়াস প্রতিশ্রুতিশীল ছিলেন—কিন্তু তাঁর গল্পের সংখ্যা শোচনীয়রূপে কম। আবদুল মান্নান সৈয়দের একমাত্র গল্পগ্রন্থের নাম—'সত্যের মতো বদমাস'।

এই দশকের গল্পকাররা নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর গল্প লিখেছেন। তাঁরা নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে উপলব্ধি করতে চেয়েছেন জীবনকে। এবং ষাটের শেষে সত্তরের শুরুতে বাঙলাদেশের নতুন রাজনৈতিক চেতনার সঙ্গে সঙ্গে জীবনবাদী গল্প-লেখার দিকে তাঁরা দৃষ্টি ফিরিয়েছিলেন। বর্তমান মুহূর্তে যে-বৈপ্লবিক সংগ্রাম চলছে সারা বাঙলাদেশে—তার সঙ্গে একাত্ম হয়ে আছেন বাঙলাদেশের গল্পলেখকরাও।

আমরা গল্পে জীবনকে তুলে ধরতে চেয়েছিলাম। স্বপ্ন-প্রেম-ভালোবাসা ও মানবিক মূল্যবোধের সঙ্গে মিলিয়ে জীবনকে চিনতে চেয়েছিলাম, চমক সৃষ্টি অথবা আঙ্গিক সাফল্য নয়—বরং আমাদের অনুভব ও চেতনার দৃষ্টিতে স্বপ্নের ভুবন সৃষ্টি করবার জন্যই আমরা গল্প লিখেছিলাম। জীবনকে ভালোবাসি বলেই আমাদের সৃষ্টি জীবনমুখী এ-বিশ্বাস দৃঢ় হচ্ছে আমাদের প্রতিদিনের সংগ্রামে॥

পুস্তক-পরিচয়

সের এক আনা মাত্র। আহ্‌সাবউদ্‌দীন আহ্‌মদ। গণশিক্ষা প্রকাশনী। চট্টগ্রাম, ১৩৭৭। মূল্য দুই টাকা মাত্র।

অধ্যাপক আহ্‌সাবউদ্‌দীন আহ্‌মদ-এর নাম পূর্ববাঙলার বামপন্থী রাজনীতিকদের মহলে শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারিত হয়ে থাকে। অধ্যাপনার নিরুপদ্রব বৃত্তি ছেড়ে গত দশ বছর যাবৎ আহ্‌সাবউদ্‌দীন আহ্‌মদ সাহেব গ্রামাঞ্চলে আত্মগোপন করে, রাজনৈতিক অধ্যাপনায় ব্রতী আছেন। জীবনের দুঃখময় দিকটির সঙ্গে তাঁর পরিচয় গভীর। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে তাঁর এই ঘনিষ্ঠ পরিচয় তাঁকে দুঃখবাদী করে না তুলে দুঃখ বিমোচনের কাজে ব্রতী করেছে। রচনাদিতেও তাঁর সেই কর্মব্রতের সাক্ষ্য বিধৃত।

চতুর পদ্যলেখক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত আনা দরে রসাল আনারসের রসাস্বাদন করে একাধিক কারণে ঐ ফলের গুণমুগ্ধ হয়েছিলেন। তাঁর মনে হয়েছিল এ-হেন স্বল্পমূল্যে আর কোনো সগুণ-বস্তু সর্বসাধারণের লভ্য নয়; আনারসের গুণমুগ্ধ হবার তাঁর অন্যতম কারণ ছিল এই।

জনসাধারণের কল্যাণের জন্য উৎসর্গীকৃত প্রাণ জনাব আহ্‌সাবউদ্‌দীন আহ্‌মদ তাঁর গত বছরে প্রকাশিত 'সের এক আনা মাত্র' রচনায় আনারসের উপর ঈশ্বর গুপ্ত আরোপিত গুণগুলির সমাবেশ ঘটিয়েছেন। ফলে আমরা পাঠকরা তাঁর গুণমুগ্ধ। 'সের এক আনা মাত্র' পড়ে মনে হয়েছে, এত গুরুগম্ভীর জীবন-সমস্যাকে এবং সেসব সমস্যা-সংক্রান্ত তত্ত্বকে এ-হেন রসাল ভাষায় ও হৃদয়গ্রাহী আঙ্গিকে প্রকাশ করতে আর কোনো সমসাময়িক লেখককে দেখিনি। আহ্‌সাবউদ্‌দীন সাহেব চাষীর জীবনের সমস্যার কথা বলেছেন, বাঙালির আত্মনিয়ন্ত্রণের কথা এনেছেন, সাম্প্রদায়িক রাজনীতিতে যাঁদের কায়েমী স্বার্থসিদ্ধ হয় তাঁদের মুখোশ খুলে ধরতে চেয়েছেন, সর্বপ্রকার শোষণ আর শোষকের চেহারার বিশ্লেষণ করেছেন। করেছেন এমন ভাষায় যা সর্বজনবোধ্য, এমন আঙ্গিকে যা রসালভাবে হৃদয়গ্রাহী। এইটাই বোধহয় গণশিক্ষকের চরম সার্থকতা।

রসতত্ত্ব সংস্কৃত ভাষার অলঙ্কার শাস্ত্রের দুরূহতম তত্ত্ব। অবশ্য, সমগ্র অলঙ্কার শাস্ত্র বা নন্দনতত্ত্ব বিষয়টিই দুষ্পাচ্য বস্তু—তা সে-শাস্ত্র যত হৃদয়গ্রাহী ইন্দ্রিয়-

সুখকর বিষয় নিয়েই আলোচনা করুক না কেন। বিপ্লবী সমাজতত্ত্ব, দর্শন এবং অর্থনীতিও তেমনই দুরূহ—তা যতই মানবকল্যাণ বিষয়কই হোক না কেন। অথচ সমাজবিপ্লবীকে সেই বিপ্লবী সমাজতত্ত্ব এবং দর্শনকে সাধারণ্যে পৌঁছে দিতে হবে তাদের সচেতন করে তোলার জন্য, তাদের সঠিক বিপ্লবী কর্মে নিয়োজিত করার জন্য। এ-এক দুরূহ কাজ। আহ্‌সাবউদ্‌দীন আহ্‌মদ সাহেব সে-দুরূহ কাজই সম্পাদন করেছেন তাঁর 'সের এক আনা মাত্র'-তে।

আহ্‌সাবউদ্‌দীন সাহেব বলেছেন 'পর রুচি পহেন্‌না'র মতন লিখ্‌নাও পর রুচি। কবিতা, গল্প, উপন্যাস বা নাটকের ক্ষেত্রে বন্দোবস্তটা বিপদজনক। সৃজনধর্মী লেখা পরের রুচি অনুযায়ী না হওয়াই ভালো। সুশিক্ষাটা যেখানে বেশিরভাগের করায়ত্ত নয় সেখানে বেশিরভাগের রুচিটাও নিম্নমানের। সেই নিম্নমানের রুচির সঙ্গে সমতা রাখার জন্য লেখার মান নামানোর কি কোনো যুক্তি আছে? না পরের রুচিটাকে এমন এক জায়গায় তুলে নিয়ে যাওয়া দরকার যে-জায়গা থেকে লেখকের রুচিকে অনুমোদন করা না-গেলেও অনুধাবন করা যায়। অবশ্য লেখককেও নিজের রুচির অভিব্যক্তিকে সবার অনুধাবনযোগ্য করে তোলার জন্য সচেষ্ট থাকতে হবে। প্রবন্ধাদি রচনার ক্ষেত্রে অবশ্য আহ্‌সাবউদ্‌দীন সাহেবের বন্দোবস্তটা সমর্থনীয়। আর 'সের এক আনা মাত্র' তো আদতে একটি বিশিষ্ট সমালোচনামূলক (ইমানুয়েল কাণ্ট এবং হ্বোলয়াগ্যাঙ্গ হেগেলকে অনুসরণ করে কার্ল মার্কস analytical-এর পরিবর্তে critical কথাটির ব্যবহারই অনুমোদন করতেন। Analytical কথাটিতে একটা নিষ্ক্রিয়তা, একটা নিরপেক্ষতা আছে যেটা কাম্য নয়; critical—analytical তো বটেই, তদুপরি ক্রিয়ানির্দেশক) দৃষ্টিকোণ থেকে লেখা বিদ্রোহপূর্ব পূর্ব-পাকিস্তানী তথা পাকিস্তানী—আর্থিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রিক জীবনের এবং ধ্যান-ধারণ ও মূল্যমান বিষয়ে একটি প্রবন্ধ। সেই প্রবন্ধকে সরস ও হৃদয়গ্রাহী করে তুলে লেখক তাঁর কৃতিত্ব প্রদান করেছেন।

কবিতায়, গল্পে, উপন্যাসে ও নাটকে সমাজ-সমালোচনার্থে ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ ও শ্লেষের প্রয়োগ এবং তদ্‌জনিত অম্ল-মধুর বা তিক্ত-কষায় হাস্যরসপ্রাপ্তি দুর্লভ নয়। কিন্তু প্রবন্ধ অন্তত বাঙলাভাষায়, কথঞ্চিৎ রম্য হলেই 'রম্য রচনা' নামক হালকা রচনায় পর্যবসিত হয় (অথচ এমনটা বঙ্কিমচন্দ্র থেকে অতুলচন্দ্র গুপ্ত-র কাল পর্যন্ত ছিল না)। 'সের এক আনা মাত্র' একটি স্বাগত ব্যতিক্রম। এই আপাতরম্য রস-রচনা কিন্তু কোনো অর্থে হাল্কা নয়। 'সের এক আনা মাত্র'-র

বাহিরেই শুধু হাসির ছটা ভিতরে তার তত্ত্বগভীর সমাজ-সমালোচনা এবং এমন এক সমাজজীবনের সমালোচনা যে-জীবনে চোখের জলটাই প্রবল। তাঁর সমাজ-সমালোচনামূলক বক্তব্যটাকে সর্বজনগ্রাহ্য করার জন্য আহ্‌সাবউদ্‌দীন সাহেব বক্তব্যকে রসসিক্ত করেছেন। নবরসের মধ্যে হাস্য এবং কষায় রসই তাঁর প্রধান উপজীব্য। প্রধানত pun বা ধ্বনি-সাম্য অর্থ-পার্থক্য-ধর্মী শব্দ প্রয়োগ করেই তিনি রসসৃষ্টির প্রয়াস পেয়েছেন। আহ্‌সাবউদ্দীন আহ্‌মদ সাহেবের একজন পূর্বসূরী, শিবরাম চক্রবর্তী, এই ধ্বনি-সাম্য অর্থ-পার্থক্যধর্মী শব্দ ব্যবহারে সিদ্ধহস্ত। কিন্তু pun, অতিপ্রয়োগে ক্লান্তিকর হতে পারে। সে-বিষয়ে আহ্‌সাবউদ্‌দীন সাহেব অনবহিত নন। তাছাড়া, শ্লেষাত্মক বা ব্যঙ্গাত্মক হাস্যরস সৃষ্টির কাজে pun বোধহয় উপযোগী অস্ত্র নয়। তারজন্য দরকার absurd juxtaposition of events অর্থাৎ দুই অসংযুক্ত ঘটনার উদ্‌ভট সংস্থাপন এবং revelation of situational absurdity বা কোনো ঘটনার উদ্‌ভটত্ব দর্শায়ন। আহ্‌সাবউদ্‌দীন সাহেব এ-দুই অস্ত্রও সুচারুভাবে ব্যবহার করেছেন। রসতত্ত্ব এবং কষতত্ত্ব (এটা আহ্‌সাবউদ্‌দীন সাহেবের আবিষ্কার। তবে, উনি যে-রসের প্রকারভেদের তালিকা দিয়েছেন, তাতে এই বিশিষ্ট রসের কোনো উল্লেখ নেই) বিষয়ে তাঁর pun অত্যন্ত উপভোগ্য হয়েছে।

লেখক সাধারণভাবে উত্তমপুরুষ অর্থাৎ নিজেকে গোপন রেখেই স্বীয় বক্তব্য পেশ করেছেন। তিনি গোপন থেকেও নিজেকে অর্থাৎ নিজের চিন্তা-ভাবনাকে প্রকাশ করেছেন। নিজের বিশ্বাসের তত্ত্বকে সর্বজন-সম্ভাব্য অভিজ্ঞতার মোড়ক দিয়ে পেশ করেছেন। শিল্পে তাই তো করণীয়। কিন্তু দু'একটি ক্ষেত্রে এর পীড়াদায়ক ব্যতিক্রম ঘটেছে এবং সে-সব রচনার সৌকর্যহানী করেছে। ২ পৃষ্ঠায়, "আমার মতে সমাজতন্ত্রের…", "কারণ, কার্ল মার্কস বলেছেন অর্থনীতিই…" (পৃষ্ঠা ২৩) এবং "বস্তুবাদী দর্শন বলে…" (পৃষ্ঠা ৫২) ইত্যাদি বাক্য বা বাক্যাংশগুলি লেখকের বিশ্বাসের সরাসরি ঘোষণা। এগুলি যদি ঘোষণাকারে না এসে মানুষের সাধারণ বা সম্ভাব্য অভিজ্ঞতাপ্রসূত বক্তব্য হিসাবে প্রকাশ পেত তাহলে বলবার মতো কিছুই থাকত না। এই বাক্য বা বাক্যাংশগুলি রচনায় খানিকটা anachronistic।

তত্ত্বগত বক্তব্য প্রসঙ্গে লেখকের কয়েকটি ঘোষণার সঙ্গে একমত হওয়া তথ্যগত দিক থেকে দুরূহ। লেখক বলেছেন কার্ল মার্কস নাকি বলেছেন অর্থ-নীতিই রাজনীতি, সমাজনীতি ইত্যাকার সকল নীতির মূল ভিত্তি। আমার তো

মনে হয় মার্কস এবং এঙ্গেলস বলতে চেয়েছিলেন যে কোনো সমাজের বৈষয়িক কাঠামো (অর্থনীতি নয়) তার সামাজিক, রাষ্ট্রিক, আইনগত, নীতিগত, আদর্শ-গত ক্রিয়াকাণ্ডের এবং ধ্যানধারণার অন্তিম নিয়ামক। ৫২ পৃষ্ঠায় লেখক বলেছেন, "বস্তুবাদী দর্শন বলে, সব সম্পত্তিই চুরি।" আশাকরি বস্তুবাদী দর্শন বলতে লেখক এখানে মার্কস-এঙ্গেলস-এর ঐতিহাসিক ও দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের কথাই বলেছেন, তা যদি হয় তবে লেখকের এ-অনবধান দুঃখকর। "সম্পত্তিই চুরি" কথাটি মার্কস বা এঙ্গেলস-এর নয়, ফরাসী সমাজসংস্কারক অর্থনীতিবিদ্ প্রুধোঁ-র (Proudhon) এবং মার্কস তাঁর Poverty of Philosophy গ্রন্থে প্রুধোঁর এই বক্তব্যকে অনৈতিহাসিক বলে সমালোচনা করেছিলেন।

কথা প্রসঙ্গে ৫২ পৃষ্ঠায় আহ্সাবউদ্দীন সাহেব 'খাইর-উল্-উমুর'-এর মধ্যম পন্থার স্বপক্ষে একটি বক্তব্যকে তুলে ধরে সমালোচনা করেছেন। বৌদ্ধদের 'বিনয় পীটক'-এ 'মঝিম পন্থা'র এবং এ্যারিস্টটলের 'পলিটিকস'-এ 'গোল্ডেন মীন'-(golden mean)-এর স্বপক্ষে ওকালতি আছে। সমাজে শিক্ষিত মধ্যবিত্তের নিজেদের ভূমিকাকে বড়ো করে তুলে ধরা ছাড়াও, মধ্যম পন্থার কোনো সুনীতিগত স্বার্থকতা আছে কিনা তা ভেবে দেখার ব্যাপার!

একজন বিপ্লবী সমাজতন্ত্রীর কাছে মানবেতিহাসের জ্ঞান-কাণ্ডের কোনো ফলই পরিত্যক্ত নয়, অস্পৃশ্য নয়। স্টোইক দর্শনের প্রতিধ্বনি করে মার্কস বলতেন "nothing humane is alien to me." "প্রলেটকালটে"র প্রবক্তাদের বক্তব্যের প্রতিবাদে লেনিন বলেছিলেন, সংস্কৃতিক্ষেত্রে বুর্জোয়াদের অবদান শ্রমিকশ্রেণীর উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া ঐতিহ্যস্বরূপ। আহ্সাবউদ্দীন সাহেবের লেখাতেও সেই মনোভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। হিন্দু-মুসলমানের যুগ্ম-প্রচেষ্টায় যে বাঙলা ভাষা ও সাহিত্য গড়ে উঠেছে তার কোনো ফসলই আহ্সাবউদ্দীন সাহেবের কাছে অস্পৃশ্য নয়। তাই তাঁর লেখায় ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, রবীন্দ্রনাথ, সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শিবরাম চক্রবর্তী, সৈয়দ মুজতবা আলী সমানভাবে ছায়া ফেলেন। অবশ্য সেসব ছায়ার কায়া লেখক স্বয়ং দিয়েছেন। এমনকি লেখক উপনিষদের বচনও কাজে লাগাতে দ্বিধাবোধ করেননি (১৬ পৃষ্ঠায় "আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে"বচনটির একটি বাঙলা ভাবানুবাদ দিয়েছেন)। এটা বুর্জোয়া ঔদার্য নয়। এটা আসে সর্বপ্রকার মানবিক অভিজ্ঞতাকে আপন অভিজ্ঞতায় পরিণত করে নেবার প্রবণতা থেকে। এই ঐতিহাসিক প্রক্রিয়াকে স্বীকার না করে মার্কসবাদী হওয়া যায় না।

এই ঐতিহাসিক প্রক্রিয়াকে স্বীকার করে নেবার পরে মার্কসবাদীর স্কন্ধে আর একটি ঐতিহাসিক দায়িত্ব বর্তায়। সে দায়িত্ব হলো, প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতাকে গ্রহণ করে অপ্রয়োজনীয়কে মৃত শবের ওজন বিবেচনায় বাদ দেওয়া। ভাষাতেও সমানে এ-প্রক্রিয়া চলছে। বাঙলা ভাষার যখন প্রয়োজন ছিল তখন আরবি, ফারসি, পর্তুগীজ সব শব্দসম্ভার কথ্য উপভাষায় এসেছে, কথ্য সাধারণ ভাষায় এসেছে, এসেছে লিখিত সাধারণ ভাষায়। এখন সাধারণ কথ্য ও লিখিত ভাষার প্রয়োজনে বাঙলায় ইংরাজি, ফরাসি, জর্মন, রুশ শব্দ আসছে এবং আসবে। এখন তার উপরে আরবি, ফারসি, হিন্দুস্তানি-উর্দু শব্দের অপ্রয়োজনীয় বোঝা চাপিয়ে দিলে ভাষার ধর্মান্তর হবে না, তা হবে জীবন্ত ভাষার কাঁধে মৃত শবের বোঝা। পূর্ববঙ্গের standard বা সাধারণ বাঙলা যদি কলকাতা কেন্দ্রিক পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ বাঙলা থেকে আলাদা হয়, তা হবে তার নিজস্ব নিয়মে, লোকের মুখে, লেখকের ভাষা ব্যবহারের মারফৎ। কারো নির্দেশে নয়। নিজস্ব নিয়মে পূর্ববঙ্গের সাধারণ বাঙলা পশ্চিমবঙ্গের থেকে এখনই একটু আলাদা হয়ে গেছে। সে-পার্থক্য শুধু কতিপয় শব্দ ব্যবহারের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, আরো একটু গভীর। ক্রিয়াপদ যে-কোনো ভাষার প্রাণ। একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে যে পূর্ববঙ্গের সাধারণ বাঙলা ভাষায় কিছু ক্রিয়াপদের ব্যবহার এবং ধ্বনি পশ্চিমবঙ্গের ভাষার থেকে আলাদা। লিখিত ভাষাতেও তার স্বীকৃতি দেখি। 'লেখা' ক্রিয়ার present indefinite পূর্ববঙ্গে "লিখা" পশ্চিমবঙ্গে "লেখা", পূর্ববঙ্গে "মুছা" পশ্চিমবঙ্গে "মোছা", পূর্ববঙ্গে "মিলা" (to get) পশ্চিমবঙ্গে "মেলা", পূর্ববঙ্গে "বিধা" (to pierce) পশ্চিমবঙ্গে "বেঁধা" 'বসা' ক্রিয়ার imperative পূর্ববঙ্গে "বসেন" পশ্চিমবঙ্গে "বসুন", আসা ক্রিয়ার imperative পূর্ববঙ্গে "আসেন" পশ্চিমবঙ্গে "আসুন"। এ-সব উদাহরণ আমি আলোচ্য বইটি থেকে সংগ্রহ করেছি। মনে রাখা দরকার এই উদাহরণগুলি উপভাষার নয়, সাধারণ কথ্য ও লিখিত ভাষার এবং কয়েকটির কোনো উপভাষাভিত্তি নেই।

সংশোধন তালিকা দিয়েও কিন্তু বইটির মুদ্রণ প্রমাদ দূরীভূত হয়নি। আশা করি স্বাধীন বাঙলাদেশে বইটির দ্বিতীয় সংস্করণের ছাপার কাজ আর একটু ভালো হবে এবং লেখক তাঁর অজ্ঞাতবাস থেকে বেরিয়ে এসে নিজেই সে-কাজের তদারকি করতে পারবেন। শ্রদ্ধেয়া বেগম সুফিয়া কামালের সঙ্গে আমি একমত —অম্লমধুর রস রচনায় আমাদের সমাজ-জীবনধারার আলেখ্য কদাচিৎ বিধৃত এবং আহ্সাবউদ্দীন সাহেব তাঁর 'সের এক আনা মাত্র' বইতে আমাদের সে-অভাব অনেকাংশে মিটিয়েছেন। তাঁর কাছে এরকম অনেক লেখা আমরা আশা করি।

সংবরণ রায়

সয়ুজ-১১-এর মহান মানবসন্তান লেফটেনান্ট কর্নেল জর্জি দ্রেব্রোভলস্কি, ফ্লাইট এঞ্জিনিয়ার ভ্লাদিস্লাভ ভলকভ, টেস্ট এঞ্জিনিয়ার ভিক্তর পাতসায়েভ

মৃত্যু, রক্তপাত, হত্যা, হানাদারকীর্ণ আজো আমাদের বসুমতী, দস্তুর ভয়াল,
আমাদেরো অগোচরে তবু কবে ফুটে ওঠে—করোটি বিথারে চষাক্ষেতে—
মেঠো পথে ঝুঁকে দেখা আল ভাঙতে অনামা ফুলের পুঞ্জ, যেমন অনামা
থাকি এমন-কি আমরাও
ঋতুচক্র ঘুরে আনে জন্ম-জরা-মৃত্যু, যেন স্বয়ংক্রিয় প্রাণ ধারণের ফাঁসজাল,

দূর অতিদূর শূন্যে আমাদের রক্তাক্ত ভূ-ভাগ দেখে তোমাদের মনে
হয়েছিল শান্তি ?
সবুজ গ্রহটি মনে হয়েছিল মহাশূন্যে উধাও উধাও ?

আমাদের জন্মদাত্রী বড়ই নির্মম, তাকে জানা গেলে মুক্তি, যেন
নিয়ন্ত্রিত মৃত্যু, বন্যা টার্বাইনে বিদ্যুৎস্ফূরণ, ক্ষেতি শ্যামল সোহাগ
মানুষের প্রব্রজ্যার মুক্তি চেয়ে তোমরা স্বাধীন শিশু, নন্দিত, স্পন্দিত, অনশ্বর
তোমরা লেনিন ছিলে, তোমাদের মাতৃভূমি সারাবিশ্ব, মহাশূন্যে দেখেছিলে
—মুছে গেছে মানুষের সঙ্কীর্ণ মনের ছবি মানচিত্রে আঁকিবুকি দাগ
মাটিতে পা রেখে ঊর্ধ্বে আকাশে উত্তীর্ণ মাথা,
তোমরা গর্কির মতো স্থির জানতে 'মানুষ' শব্দের ঠিক মানের খবর।

ঘুম যাও, শবাধারে ফুল দিতে তোমাদের নেতার দু-চোখ ভরা জল,
ঘুম যাও, দুঃখীদেশে যৌবনের হাতে ছুরি নেতার বিকৃত নামে দীর্ণ করে
উদ্ভিন্ন যৌবন,
মাটির বিস্তৃত শূন্যযানে ঘুরে যেতে যেতে সূর্যের চৌদিকে অবিরল
ঝরা পাতাদের গান শুনে পুনর্জাগরণে প্রস্তুতি বৃক্ষের তলে হয়ো রসায়ন
মৃত্যু তোমাদের কাছে যে জীবন, সে জীবনে মলিন মাটির স্তনচূড়া
হয়ে ওঠে শস্যবতী ভরে দেয় প্রীত স্বর্ণক্ষেত
আদমের সন্ততিকে অন্নদিতে, প্রাণ দিতে, হাসি ও জীবন দিতে
বাঁচা স্বাদু করে দিতে, ক্রমে তিলোত্তমা, মুক্ত
শ্রম ও শান্তির সোভিয়েত ॥

তরুণ সান্যাল

নরেন্দ্র দেব (১৮৮৮-১৯৭১)

নরেন্দ্র দেব গত ১৯এ এপ্রিল মারা গেছেন। মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ৮৩ বছর। সাহিত্য-জগতের সঙ্গে তাঁর শেষ দিন পর্যন্ত যোগাযোগ ছিল, কিন্তু তাঁর যুগ শেষ হয়েছিল অনেকদিন আগে। যে-কোনো মৃত্যুই দুঃখের, বিশেষত এমন মানুষের, যাঁর কাছ থেকে আমরা নিত্য স্নেহ ও ভালোবাসা পেয়েছি। বাঙলা সাহিত্যের দিক থেকেও ঘটনাটি তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ নরেন্দ্র দেবের মৃত্যু বাঙলা সাহিত্যে একটি যুগের অবসান। বর্তমান শতাব্দীর প্রথম দুই দশকের সাহিত্যপত্রিকাগুলিতে নূতনত্ব এসেছিল বক্তব্যে ও প্রকাশরীতিতে—'মানসী', 'যমুনা', 'ভারতী' পত্রিকা নানা কারণেই আজকের দিনেও স্মরণীয়। নরেন্দ্র দেব সে-যুগের আধুনিক লেখক। বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস থেকে তাই তাঁর নাম বাদ পড়বে না। রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্য পেয়েছিলেন, শরৎচন্দ্র স্নেহ করতেন; সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, যতীন্দ্র মোহন বাগচী প্রভৃতি ছিলেন তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু। এবং সৌভাগ্যক্রমে পরবর্তীযুগের সঙ্গেও তাঁর যোগাযোগ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়নি, তিরিশের দশকের তরুণ লেখকেরাও 'নরেনদা'কে শ্রদ্ধা করতেন। মানুষ হিসাবে তিনি ছিলেন উদার, স্নেহপরায়ণ, রসগ্রাহী। ফলে অন্যযুগের মানুষ হয়েও এ-যুগের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়নি।

যখন স্কুলে পড়ি তখন 'পাঠশালা' পত্রিকার মধ্য দিয়েই নরেন্দ্র দেবের নামের সঙ্গে প্রথম পরিচয়। লেখা পাঠিয়েছি, ফেরৎ এসেছে, কদাচিৎ ছাপাও হয়েছে। তারপর স্কুলের শেষ ধাপে 'ভালোবাসা'র সঙ্গে প্রথম পরিচয়। নরেন্দ্র দেবের বাড়ির নাম 'ভালোবাসা'। আর অন্য পত্রিকায় লেখা পাঠানো নয়, এবার নিজেই পত্রিকা বার করা যাক। এবং পত্রিকার জন্য চাই নরেন্দ্র দেবের লেখা। লেখা পেলুম, সেই সঙ্গে পেলুম তরুণ সম্পাদকের অকিঞ্চিৎকর প্রয়াসের সোৎসাহ সমর্থন। তারপর অনেকবার গেছি। চিঠিও পেয়েছি নানা ব্যাপারে, পোস্টকার্ডে কোনাকুনি লেখা কবিতার মতো, সুন্দর হাতের লেখা। এইতো সেদিন, যতীন্দ্রমোহন বাগচীর জীবনী লেখার জন্য যখন তথ্য সংগ্রহ করছিলুম, তখন বারবার নরেন্দ্র দেবের কাছে গেছি, শুনেছি 'ভারতী যুগ'-এর অনেক গল্প, রবীন্দ্রনাথ, মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ ও যতীন্দ্রমোহন সম্বন্ধে অনেক অন্তরঙ্গ স্মৃতিকাহিনী।

কাছের মানুষ হিসাবে তিনি আমাদের আকর্ষণ করতেন। কিন্তু তাঁর সাহিত্যকর্মের প্রতি ততখানি আকর্ষণ বোধ করিনি। নরেন্দ্র দেবের উপন্যাস পড়িনি। তাঁর ভ্রমণকাহিনীগুলি পড়তে ভালো লাগত। ওমর খৈয়াম, হাফিজ ও মেঘদূতের অনুবাদ পড়েছি, খুব ভালো লাগেনি। সত্যেন্দ্রনাথের ওমর খৈয়ামের অনুবাদও তেমন ভালো লাগে না। আসলে 'ভারতী যুগ' থেকে আমরা অনেক দূরে সরে এসেছি। একই গ্রন্থ একই শতাব্দীতে বারবার অনুবাদ হওয়া প্রয়োজন। অবশ্যই পুরনো অনুবাদেরও সাহিত্যিক মূল্য আছে, ঐতিহাসিক গুরুত্ব তো আছেই। তুলনায় ছোটদের জন্য লেখা গল্প-কবিতা অনেকদিন জনপ্রিয়তা অক্ষুণ্ণ রাখে। 'গল্প বলি গল্প শোনো' আজও ভালো লাগে।

আজকে আমরা পড়ি না, অনেক সময় হাতে পাই না বলেই পড়ি না, এমন অনেক বই হয়তো হঠাৎ পড়লে লেখকের শক্তিমত্তায় বিস্মিত হতে হয়। নরেন্দ্র দেব তেমন একজন লেখক। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁকে আমরা ভুলে যাইনি। হাতের কাছে বই পাইনি, পেয়েছি লেখককে। এবং প্রায়শ মনে হয়েছে, আমি কি ভাগ্যবান্! লেখার মধ্যে তিনি থাকবেন, ইতিহাসে তাঁর নাম লেখা হবে, কিন্তু আমরা যাঁরা তাঁর ব্যক্তিগত সান্নিধ্য পেয়েছি, তাদের কাছে এই মুহূর্তে নরেন্দ্র দেবের মৃত্যু অপূরণীয় অভাব বলে মনে হচ্ছে।

গ্রন্থপঞ্জী। বসুধারা (কাব্য)। রোবাইয়াৎ ই ওমর খৈয়াম ১৩৩৩। দিওয়ান ই হাফিজ। মেঘদূত। বোঝাপড়া (গল্প) ১৯২০। সুহাসিনী (গল্প) ১৯৩৮। রকমারি গল্প (গল্প) ১৯৫৮। সিনেমা ১৯৩৪। সাহিত্যাচার্য শরৎচন্দ্র ১৯৩৮। সাহেব বিবির দেশে ১৯৫৬। রাজপুতের দেশে ১৯৫০। কবিতীর্থ ১৩৭৩। গরমিল (উপন্যাস) ১৯২৫। খেলার পুতুল (উপন্যাস) ১৩৩৬। যাদুঘর (উপন্যাস) ১৩৬৭। আকাশকুসুম (উপন্যাস) ১৩৪৪। ভালোবেসেছিল যারা (উপন্যাস) ১৩৭২। মানুষের মন (উপন্যাস) ১৩৭৩। পরাগ ও রেণু (উপন্যাস) ১৯৪৪। গৌতমের গতজন্ম। অনেক দিনের অনেক কথা ১৯৫৪। আনন্দমেলা। জন্ম-জন্মান্তরের কাহিনী ১৯৫৮। কিশোর গ্রন্থাবলী ১৩৭৫। গল্প বলি গল্প শোনো ১৩৭৫। সম্পাদিত গ্রন্থ—শরৎ বন্দনা ১৯৩২। কাব্যদীপালি ১৯২৭। কথাশিল্প ১৩৫৩। সোনার কাঠি ১৩৪৪।

অলোক রায়

১৯৫৬ সালে সংবাদপত্র রেজিসট্রেশন (কেন্দ্রীয়) আইনের
৮ধারা অনুযায়ী বিজ্ঞপ্তি

১। প্রকাশের স্থান—৮৯, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭

২। প্রকাশের সময়-ব্যবধান—মাসিক

৩। মুদ্রক—অচিন্ত্য সেনগুপ্ত, ভারতীয় ; ৪০, রাধামাধব সাহা লেন, কলকাতা-৭

৪। প্রকাশক— ঐ ঐ ঐ

৫। সম্পাদক—দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ভারতীয় ; ১৬৫, পি ব্লক, নিউ আলিপুর, কলকাতা-৫৩
তরুণ সান্যাল, ভারতীয় ; ৩১।২, হরিতকী বাগান লেন, কলকাতা-৬

৬। পরিচয় প্রাইভেট লিমিটেড-এর যে-সকল অংশীদার মূলধনের একশতাংশের অধিকারী, তাঁদের নাম ও ঠিকানা ঃ

১। গোপাল হালদার, ফ্ল্যাট ১৯ ; ব্লক এইচ ; সি. আই. টি. বিলডিংস, ক্রিস্টোফার রোড, কলকাতা-১৪ ॥ ২। সুনীলকুমার বসু, ৭৩ এল, মনোহরপুকুর রোড, কলকাতা-৯ ॥ ৩। অশোক মুখোপাধ্যায়, ৭, ওল্ড বালিগঞ্জ রোড, কলকাতা-১৯ ॥ ৪। হিরণকুমার সান্যাল, ৮, একডালিয়া রোড, কলকাতা-১৯ ॥ ৫। সাধনচন্দ্র গুপ্ত, ২৩, সার্কাস এভিনিউ, কলকাতা-১৭ ॥ ৬। স্নেহাংশুকান্ত আচার্য, ২৭, বেকার রোড, কলকাতা-২৭ ॥ ৭। সুপ্রিয়া আচার্য, ২৭, বেকার রোড, কলকাতা-২৭ ॥ ৮। সুভাষ মুখোপাধ্যায়, ৫বি, ডঃ শরৎ ব্যানার্জি রোড, কলকাতা-২৯ ॥ ৯। সতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, ১।৩, ফার্ন রোড, কলকাতা-১৯ ॥ ১০। শীতাংশু মৈত্র, ১।১।১, নীলমণি দত্ত লেন, কলকাতা-২২ ॥ ১১। বিনয় ঘোষ, ৪৭।৪, যাদবপুর সেনট্রাল রোড, কলকাতা-১২ ॥ ১২। সত্যজিৎ রায়, ৩, লেক টেম্পল রোড, কলকাতা-২৯ ॥ ১৩। নীরেন্দ্রনাথ রায় (মৃত), ৪২।৭এ, বালিগঞ্জ প্লেস, কলকাতা-১৯ ॥ ১৪। হরিদাস নন্দী, ২৯এ, কবির রোড, কলকাতা-২৬ ॥ ১৫। ধ্রুব মিত্র, ২২বি, সাদার্ন এভিনিউ, কলকাতা-২৯ ॥ ১৬। শান্তিময় রায়, 'কুসুমিকা', গরফা মেন রোড, কলকাতা-৩২ ॥ ১৭। শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ, ভুবনেশ্বর, ওড়িশা ॥ ১৮। স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য (মৃত), ৯।১, কর্নফিল্ড রোড, কলকাতা-১৯ ॥ ১৯। নিবেদিতা দাশ, ৫৩বি, গরচা রোড, কলকাতা-১৯ ॥ ২০। নারায়ণ

গঙ্গোপাধ্যায়, (মৃত) ৩সি, পঞ্চাননতলা রোড, কলকাতা-১৯ ॥ ২১। দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, ৩, শম্ভুনাথ পণ্ডিত স্ট্রীট, কলকাতা-২০ ॥ ২২। শান্তা বসু, ১৩।১এ, বলরাম ঘোষ স্ট্রীট, কলকাতা-৬ ॥ ২৩। বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৬২, ডঃ শরৎ ব্যানার্জি রোড, কলকাতা-২৯ ॥ ২৪। ধীরেন রায়, ১০।৬, নীলরতন মুখার্জি রোড, হাওড়া ॥ ২৫। বিমলচন্দ্র মিত্র, ৬৩, ধর্মতলা স্ট্রীট, কলকাতা-১৩ ॥ ২৬। দ্বিজেন্দ্র নন্দী, ১৩ডি, ফিরোজ শাহ্ রোড, নয়াদিল্লী ॥ ২৭। সলিলকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, ৫০, রামতনু বসু লেন, কলকাতা-৬ ॥ ২৮। সুনীল সেন, ২৪, রসা রোড সাউথ (থার্ড লেন), কলকাতা-৩৩ ॥ ২৯। দিলীপ বসু, ২০০ এল, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রোড, কলকাতা-২৬ ॥ ৩০। সুনীল মুন্সী, ১।৩, গরচা ফার্স্ট লেন, কলকাতা-১৯ ॥ ৩১। গৌতম চট্টোপাধ্যায়, ২, পাম প্লেস, কলকাতা-১৯ ॥ ৩২। হিমাদ্রিশেখর বসু, ৯এ, বালিগঞ্জ স্টেশন রোড, কলকাতা-১৯ ॥ ৩৩। শিপ্রা সরকার, ২৩৮এ নেতাজী সুভাষ রোড, কলকাতা-৪৭ ॥ ৩৪। অচিন্ত্যেশ ঘোষ, ৯, সামবানদম রোড, টি. নগর, মাদ্রাজ-৭ ॥ ৩৫। চিন্মোহন সেহানবীশ, ১৯, ডঃ শরৎ ব্যানার্জি রোড, কলকাতা-২৯ ॥ ৩৬। রণজিৎ মুখার্জি, পি ২৬, গ্রেহামস লেন, কলকাতা-৪০ ॥ ৩৭। সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, ফ্ল্যাট ২; 'সী গাল', কার্মিচেল রোড, বম্বে-২৬ ॥ ৩৮। অমল দাশগুপ্ত, ৮৬, আশুতোষ মুখার্জি রোড, কলকাতা-২৫ ॥ ৩৯। প্রদ্যোৎ গুহ, ১এ, মহীশূর রোড, কলকাতা-২৬ ॥ ৪০। অচিন্ত্য সেনগুপ্ত, ৪০, রাধামাধব সাহা লেন, কলকাতা-৭ ॥ ৪১। শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়, ৫৫বি, হিন্দুস্থান পার্ক, কলকাতা-২৯ ॥ ৪২। দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৭৬৫, পি ব্লক, নিউ আলিপুর, কলকাতা-৫৩ ॥ ৪৩। গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, ২০৮, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলকাতা-১২ ॥ ৪৪। নির্মাল্য বাগচি, ফ্লাট নং বি সি ৩; পিকনিক পার্ক, পিকনিক গার্ডেন রোড, কলকাতা-৬ ॥ ৪৫। তরুণ সান্যাল, ৩১।২, হরিতকী বাগান লেন, কলকাতা-৬ ॥ ৪৬। বিদ্যা মুন্সী, ১।৩, গরচা ফার্স্ট লেন, কলকাতা-১৯ ॥ ৪৭। বেদুইন চক্রবর্তী, ফ্ল্যাট ২, ১০ রাজা রাজকৃষ্ণ স্টীট, কলকাতা-৬ ॥ ৪৮। অমিয় দাশগুপ্ত, ২, যদুনাথ সেন লেন, কলকাতা-৬ ॥ ৪৯। অজয় দাশগুপ্ত, ২০৮, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলকাতা-১২ ॥ ৫০। সুরেন ধরচৌধুরী, (মৃত) ২০৮, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলকাতা-১২ ॥

আমি অচিন্ত্য সেনগুপ্ত এতদ্বারা ঘোষণা করছি যে উপরে প্রদত্ত তথ্য আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস অনুসারে সত্য।

(স্বাঃ) অচিন্ত্য সেনগুপ্ত
১০. ৩. ৭১

আনন্দের...
বাটা সিতারা
হালকা আর হাওয়া
খেলানো...বাটার এই স্যান্ডাল
পায়ে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই
এক আশ্চর্য পরিতৃপ্তি
বাটা সিতারার ছিমছাম ও
কোমল গড়ন দেখে বোঝা
যায়, এদের নির্মাণ ও
নকশার প্রধান লক্ষ্য :
সারাদিনের স্নিগ্ধ আরাম।
লাবণ্যময় সিতারা সব
সাজেই মানানসই! এখানে
তারই কয়েকটি নকশা
যেগুলি এখন বাটার দোকানে
পাওয়া যাচ্ছে। আজই
আসুন পছন্দমতো
একজোড়া বেছে নিন।
সিতারা
সাইজ ২-৭
৮.৯৫, ৯.৯৫,
১২.৯৫
Bata

পরিচয়
বর্ষ ৪০ । সংখ্যা ১
শ্রাবণ । ১৩৭৮

সূচিপত্র

উপদেশকমণ্ডলী
গিরিজাপতি ভট্টাচার্য । হিরণকুমার সান্যাল । সুশোভন সরকার ।
অমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র । গোপাল হালদার । বিষ্ণু দে । চিন্মোহন সেহানবীশ ।
সুভাষ মুখোপাধ্যায় । গোলাম কুদ্দুস ।

সম্পাদক : দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় । তরুণ সান্যাল

প্রচ্ছদ : ধ্রুব রায়

পরিচয় প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে অচিন্ত্য সেনগুপ্ত কর্তৃক নাথ ব্রাদার্স প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ৬ চালতাবাগান লেন, কলিকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত ও ৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড কলিকাতা-৭ থেকে প্রকাশিত ।

পরিচয়

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

এই নূতন ত্রৈমাসিক পত্রিকাটি হাতে পাইয়াই সর্বপ্রথম মনে যে ভাবের উদয় হইয়াছিল,—একটি ছোট্ট কথায় তাহা সুন্দরভাবে প্রকাশ করা যাইতে পারে—'বাঃ!' এন্টিক কাগজে পরিষ্কার মুদ্রিত ১৫৪ পৃষ্ঠা ব্যাপী প্রথম সংখ্যার মলাটের উপর তাকাইলেই,—এক নজরে জানিতে পারা যায় সংখ্যাটিতে কোন্ কোন্ বিষয় কোন্ কোন্ লেখক কর্তৃক আলোচিত হইয়াছে। এ যেন একটা উচ্চ অঙ্গের বিলাতী সাহিত্য পত্রিকার মত, যাহার সম্পাদকেরা অনাড়ম্বরে অথচ সগৌরবে মাসের পর মাস সাময়িক শ্রেষ্ঠ সাহিত্য পাঠকদিগের নিকট বিতরণ করিয়া থাকেন। ভিতরে উল্টাইয়া দেখিলে,—এই রকম মনের ভাবটি অক্ষুণ্ণ থাকে এমন কথা বলিলে অবশ্য একটু অতিরঞ্জন দোষ আসিয়া পড়ে, কিন্তু তাহার জন্য পরিচয়ের সম্পাদক ও পরিচালকমণ্ডলী দায়ী নহেন। আমাদের জাতীয় সাহিত্যের বর্তমান অবস্থায় কোনো সাময়িক পত্রিকাকে যতখানি উৎকর্ষ দান করা সম্ভব,—'পরিচয়ে'র পরিচালকমণ্ডলী তাহা দিতে সমর্থ হইয়াছেন বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। এই দিক দিয়া 'পরিচয়'কে মাসিক না করিয়া ত্রৈমাসিক পত্রিকা করিয়া পরিচালকেরা সুবিবেচনার কাজ করিয়াছেন।

কোন নূতন পত্রিকা বাহির করিলেই জনসাধারণের নিকট একটা কৈফিয়ৎ দাখিল করাটা একটা রেওয়াজ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যেন সাধারণভাবে সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করাটা একটা যথেষ্ট সদুদ্দেশ্য নয় যাহার জন্য একটা নূতন পত্রিকা বাহির করা চলিতে পারে। 'পরিচয়ে'র সম্পাদক মহাশয়ও সাধারণের নিকট এই কৈফিয়তের ঋণ শোধ করিয়াছেন, বলিয়াছেন,—সাহিত্যক্ষেত্রেই পৃথিবীর

'পরিচয়'-এর প্রথম সংখ্যাটি বেরোবার পর বিচিত্রায় পত্রিকাটির সমালোচনা করা হয়। বিচিত্রায় (ভাদ্র ১৩৩৮) 'নানা কথা' বিভাগে লেখাটি প্রকাশিত হয়। লেখাটি অস্বাক্ষরিত, তাই অনুমান করা যায় যে এর লেখক সম্পাদক স্বয়ং, অর্থাৎ উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। সম্পাদক

বিভিন্ন জাতি পরস্পরের মধ্যে জানাজানির ভিতর দিয়া এক মানবতা সূত্রে আবদ্ধ হইতে পারে, 'পরিচয়ে'র উদ্দেশ্য, এই শুভদিনের আবির্ভাবকে যথাশীঘ্র সংঘটন করা ; 'বাংলাদেশে পরিচয় আজ এই ভারই লইতে চাহে। তাহার প্রধান উদ্দেশ্য, প্রাচীন ও আধুনিক সমস্ত ভাবগঙ্গার ধারা বাংলা ভাষার ক্ষেত্রের ভিতর দিয়া বহাইয়া দেওয়া, প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের বিভিন্ন ভাষার বিশিষ্ট দানগুলিকে 'পরিচয়' বাঙ্গালী পাঠককে উপহার দিতে অভিলাষী, কখনো মূল ভাষার অনুসরণে আলোচনা করিয়া, কখনো বা ভাষান্তরের সাহায্য লইয়া ; কখনো সংক্ষিপ্ত মন্তব্য করিয়া কখনো বা মূলানুগ অনুবাদ করিয়া। এই সঙ্গে মাতৃভাষার সর্বাঙ্গীন উন্নতির দিকেও 'পরিচয়' তাহার দৃষ্টি সদাজাগ্রত করিয়া রাখিবে।' বলা বাহুল্য এই উদ্দেশ্য যেমনই সাধু তেমনি ব্যাপক ; ইহার ব্যাপকতার মধ্যে ইহার বিশিষ্টতা চাপা পড়িয়া গিয়াছে ;—আমাদের দেশের উচ্চ অঙ্গের সাময়িক পত্রিকা মাত্রেই সাধ্যানুসারে এই উদ্দেশ্য-সাধনের চেষ্টা করিয়া থাকে। কিন্তু হায়, 'সাধ যত সাধ্য তার বহু পশ্চাতে' !

কিন্তু 'সাধ্য বহু পশ্চাতে' হইলেও একথা স্বীকার করিব, এবং এই জন্যই 'পরিচয়ে'র সম্পাদককে আমাদের সাদর অভিনন্দন জানাইতেছি,—যে 'পরিচয়ে'র মধ্যে এই চেষ্টা যেমন সুস্পষ্ট, অন্য পত্রিকাগুলির মধ্যে তেমন নয়। 'পরিচয়' অপাঠকের মন পাতার পর পাতা ছবিতে ঠেসিয়া ভুলাইবার চেষ্টা করে নাই,—কিংবা অসাহিত্য দিয়া কু-পাঠকের মনোরঞ্জন করিবার চেষ্টাও করে নাই ; কেবলমাত্র আমাদের দেশে যে কয়জন পরিমিত-সংখ্যক সু-পাঠক আছেন, তাঁহাদেরই উৎসাহের উপর নির্ভর করিয়া এই দুরূহ কার্যে অবতীর্ণ হইয়াছে। এমন সৎসাহসের তারিফ না করিয়া থাকা যায় না। আমরা যে 'পরিচয়ে'র সর্বাঙ্গীন সিদ্ধি কামনা করিতেছি, সে কথাটা বিশেষ করিয়া বলাটাই অতিরিক্ত।

'পরিচয়ে'র প্রথম সংখ্যাটির মধ্যে বিশেষ করিয়া যাহা চোখে লাগিল, তাহা, ইহার 'পুস্তক-পরিচয়' বিভাগ। ১১৪ পৃষ্ঠা হইতে ১৪৯ পৃষ্ঠা পর্যন্ত দেশী ও বিদেশী অনেক আধুনিক গ্রন্থের সুদক্ষ আলোচনা। আমাদের মনে হয়, এই সমস্ত আলোচনার পরিপূর্ণ সার্থকতালাভের পথে আমাদের দেশে একটা প্রকাণ্ড অন্তরায় আছে, তাহা এই যে, এই সমস্ত আলোচনা পাঠ করিয়া আলোচিত গ্রন্থগুলি পাঠ করিবার বাসনা যাঁহাদের প্রাণে জাগে, তাঁহাদের অনেকেরই সে বাসনা মিটাইবার উপায় নাই ; কেন-না কোন সাধারণ গ্রন্থাগারে সে বইগুলি

পাওয়া যায় না, কিনিবার অবস্থাও অনেকের নাই। আমাদের দেশের বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থায় বাংলা ভাষায় যে অল্পসংখ্যক সদ্‌গ্রন্থ মাঝে মাঝে প্রকাশিত হয়, তাহারই কাটতি হইতে অনেক বিলম্ব হয়; কাজেই যথেষ্ট অর্থসংস্থান না থাকিলে বিদেশী বই কেনা অনেকেরই সাধ্যাতীত। অতএব মাসিক ২।৩ টাকা আন্দাজ একটা কিছু চাঁদা ধার্য করিয়া যদি 'পরিচয়ে'র সহিত সংশ্লিষ্ট একটি আধুনিক দেশী ও বিদেশী সাহিত্যের গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত করিতে পারা যায় তবে 'পরিচয়ে'র যে বিশেষ উদ্দেশ্য যাহা দ্রুততর সিদ্ধির পথে অগ্রসর হইতে পারে, যে পরিমিতসংখ্যক পাঠকমণ্ডলীর উৎসাহের উপর নির্ভর করিয়া 'পরিচয়' কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছে, আধুনিক দেশী ও বিদেশী সাহিত্যের সহিত পরিপূর্ণ পরিচয়লাভের সুযোগ পাইলে, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই মাসে ২ টাকা আন্দাজ চাঁদা দিতে স্বীকৃত হইতে পারেন। যাঁহাদের মধ্যে যথার্থ পাঠানুরাগ আছে অথচ উপযুক্ত অবকাশের অভাবে এই অনুরাগ তৃপ্ত করিতে পারেন না তাঁহারা নিশ্চয়ই মাসে ২ টাকার পরিববর্তে একটা আধুনিক সাহিত্যের গ্রন্থাগারের যথেচ্ছ ব্যবহারের সুযোগ-লাভ এবং বিনামূল্যে 'পরিচয়' পত্রিকা-লাভ করাটা যথেষ্টের চেয়েও অনেক অধিক মনে করিবেন। শিক্ষিত বাঙ্গালী-দের মধ্যে এমন দু'হাজার লোক কি নাই? আমাদের বিশ্বাস অনেক বেশী আছে—তবে হয় ত কলিকাতা সহরের মধ্যে নাই,—সারা বাংলা এবং বাংলার বাহিরে ছড়াইয়া আছে। যাঁহারা কলিকাতার বাহিরে থাকেন, সামান্য কিছু ডাকখরচা বহন করিলেই তাঁহারা ইচ্ছামত ডাকযোগে বই আনাইয়া লইতে এবং পড়া হইয়া গেলে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তাহা ফিরাইয়া দিতে পারিবেন।

যাঁহাদের উৎসাহের উপর উচ্চ অঙ্গের সাহিত্য-পত্রিকার শ্রীবৃদ্ধি নির্ভর করিতেছে, কোনো রকমে সঙ্ঘবদ্ধ করিতে পারিলে, তাঁহাদের দলবৃদ্ধিও হইতে পারে। এই দলবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই জাতীয় সাহিত্যের উন্নতি সম্ভব। এবং এই উন্নতির অবস্থায় উচ্চ অঙ্গের সাহিত্য-পত্রিকা একখানি কেন দশ-খানিও বেশ চলিতে পারে, কেন-না সু-পাঠকের সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সু-লেখকের সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইবে। কিন্তু বর্তমান অবস্থায় একখানিও চলা শক্ত। দুঃখের বিষয় আমাদের সংসার-জ্ঞানী মন বর্তমান অবস্থাকে চরম বলিয়া স্বীকার করিয়া সাহিত্যের আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রেও প্রতিযোগিতার ভাবকে অনেক সময় ঠেলিয়া রাখিতে পারে না; ভুলিয়া যায়, যে আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রের মূলমন্ত্র প্রতিযোগিতা নয়, সহযোগিতা; এখানে কাহারও স্থানাভাব নাই, মিলিতে

পারিলেই হইল। বাঁচিয়া থাকিবার জন্য যিনি লড়াই করেন,—তিনি হয় ত অন্যত্র বাঁচিয়া থাকেন, কিন্তু এখানে তিনিই মরেন; 'প্রাকৃতিক বাছাই-কাজে'র প্রণালী এখানে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। বর্তমানের নানাবিধ অসম্পূর্ণতার উপর অন্তরস্থিত আদর্শের আলোক সম্পাত করিতে না পারিলেই যে মনোভাবের উদয় হয়,—সেটি বিশেষ আশঙ্কাজনক,—ইংরাজীতে তাকে বলে 'সিনিসিজম',—সকলপ্রকার উন্নতি ও অগ্রসরের তাহা অন্তরায়। আমাদের শিক্ষিত সমাজে এই সিনিসিজম্ কিঞ্চিৎপরিমাণে প্রবেশ করিয়াছে বলিয়া মনে হয়, এবং ইহাতে আমরা শঙ্কান্বিত হইয়া উঠিয়াছি। কিন্তু এখানে এ বিষয়ের আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হইবে,—বারান্তরে করিবার ইচ্ছা রহিল। আমরা 'পরিচয়ে'র সর্বাঙ্গীন উন্নতি কামনা করি। যে সাধু উদ্দেশ্য লইয়া 'পরিচয়' সহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছে, সে উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথে অগ্রসর হইতে থাকিলে,—দেশের অন্যান্য সাহিত্য-পত্রিকাগুলিরও উন্নতি হইবে আশা করা যায়। বস্তুতঃ জাতীয় সাহিত্যের উন্নতির পরিমাপ, দেশে কতগুলি উচ্চ-অঙ্গের সাহিত্য-পত্রিকা চলিতেছে,—তাহার দ্বারা যদি করা হয় ত বিশেষ অন্যায় হয় না।*

* চিত্তরঞ্জন ঘোষের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

মহাত্মা গান্ধীর রাজনৈতিক দর্শনের ক্রমবিকাশ

সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার

মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গি থেকে গবেষণার জন্য উপরোক্ত বিষয়টি নির্বাচনের দ্বারা ডঃ বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য একদিকে যেমন যথেষ্ট সাহসের পরিচয় দিয়েছেন তেমনি আমাদের দেশের মার্কসবাদীদের পক্ষে একটি অতি প্রয়োজনীয় কর্তব্য সম্পাদনের কাজে মূল্যবান অবদান রেখেছেন।

আমাদের দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে গান্ধীবাদ তার পরস্পরবিরোধী দিকগুলি অর্থাৎ ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয় দিকগুলি সহ যে-ভূমিকা পূরণ করেছে তার একটা মার্কসীয় ইতিহাস-বিজ্ঞানসম্মত বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণ আজও হয়নি। অথচ এই কাজকে উপেক্ষা করে এদেশের সাম্প্রতিক অতীত সম্বন্ধে সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ ধারণা করা যে সম্ভব নয় সে-কথা আশা করি চিন্তাশীল ও যুক্তিবাদী মার্কসবাদীরা সকলেই স্বীকার করবেন। দ্বিতীয়ত সেই সাম্প্রতিক অতীত মোটেই নিছক পুঁথিগত গবেষণার বিষয় নয়। বর্তমানের মধ্যে তার প্রভাব যথেষ্ট শক্তিশালী এবং বর্তমানকে ভবিষ্যতের দিকে সচেতনভাবে এগিয়ে নিতে হলে তাকে সঠিকভাবে বোঝা একান্ত প্রয়োজন।

বর্তমান পরিস্থিতিতে আমাদের দেশে গান্ধীজীর ব্যক্তিত্ব, কর্ম ও চিন্তাধারার প্রভাব কাজ করছে দুইভাবে। একদিকে দেখা যায় যে দেশের শাসকশ্রেণী সুদীর্ঘ তেইশ বছর ধরে গান্ধীজীর নাম ভাঙিয়ে এবং গান্ধীজীর মতবাদকে পছন্দসই রূপ দিয়ে জনগণকে মোহগ্রস্ত করে রাখার অস্ত্ররূপে ব্যবহার করে এসেছে। আবার অন্যদিকে দেখা যায় যে গান্ধীবাদে বিশ্বাসী বহু সৎ গণতন্ত্রপ্রিয় দেশপ্রেমিক মানুষ নিজেদের অমোঘ অভিজ্ঞতার দ্বারা পরিচালিত হয়ে প্রতিক্রিয়াশীল একচেটিয়া পুঁজি এবং সামন্তযুগীয় শক্তিগুলির বিরুদ্ধে সংগ্রামে বামপন্থীদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ মোর্চায় অংশগ্রহণ করছেন। তাঁরা এই পথে এগিয়ে এসেছেন গান্ধী দর্শনের ইতিবাচক দিকগুলিকে সম্বল করে। কিন্তু ভারতের

Evolution of the Political Philosophy of Gandhi by Buddhadeva Bhattacharya—Calcutta Book House, Calcutta—12

বর্তমান সংঘাতসঙ্কুল দ্রুত পরিবর্তনশীল জটিল পরিস্থিতিতে বহু প্রশ্নে তাঁদের মনে অস্পষ্ট ধারণা, পিছুটান ও বিভ্রান্তি রয়ে গিয়েছে। তাঁরা যাতে সেইসব পিছুটান ও বিভ্রান্তি কাটিয়ে এগিয়ে চলতে পারেন সেজন্য সহিষ্ণু আলোচনা ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে তাঁদের সাহায্য করাই হবে আমাদের কর্তব্য। আর সেজন্য গান্ধীদর্শনের একটা সামগ্রিক ও বস্তুনিষ্ঠ মূল্যায়ন অপরিহার্য।

গান্ধীবাদের সামগ্রিক বিচারের জন্য তাকে বোঝার চেষ্টা করতে হবে গান্ধীজীর সমকালীন ভারতবর্ষের সামাজিক-অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক-মনস্তাত্ত্বিক পরিবেশের পরস্পরবিরোধী ও দ্রুত পরিবর্তনশীল পটভূমিতে। তিনি যে শ্রেণীর মতাদর্শের প্রতিনিধিত্ব করেছেন এবং যে-শ্রেণী তাঁর মতবাদকে নিজের মতাদর্শগত হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করেছে তার বিকাশের ঐতিহাসিক পটভূমি ও দ্বৈতচরিত্র তথা রাজনৈতিক ভূমিকার সমগ্র প্রক্রিয়াটিকে এই অধ্যয়নের পশ্চাৎপট হিসাবে গ্রহণ করা আবশ্যিক কর্তব্য। কিন্তু এই ধরনের ইতিহাস-বিজ্ঞানসম্মত অধ্যয়ন তথা বিশ্লেষণের চেষ্টা আমাদের দেশের মার্কস-বাদীদের তরফ থেকে এযাবৎ বড় একটা হয়নি বলাটা সম্ভবত অত্যুক্তি হবে না। উপরন্তু শ্রেণী-প্রতিনিধিত্বের মার্কসীয় সূত্রটিকে যথার্থভাবে উপলব্ধি ও প্রয়োগের প্রচেষ্টার বদলে তার এক অতি-সরলীকৃত যান্ত্রিক ধারণার দ্বারা চালিত হয়ে অনেকে গান্ধীজীর মতবাদে বুর্জোয়াশ্রেণীর স্বার্থের প্রতিফলনটাকেই একপেশেভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। কোনো ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব এবং তাঁর মতবাদ ও কর্ম কিভাবে কিঅর্থে বিশেষ ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে বিশেষ কোনো সামাজিক শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব করে সে-বিষয়টি মার্কস-এঙ্গেলস তাঁদের রচনাবলীতে বিষয়গত বিশ্লেষণের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করেছেন। সুনির্দিষ্ট সামাজিক ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে বিচার বিশ্লেষণের সেই পদ্ধতি অনুসরণের বদলে উপরোক্ত সমালোচকেরা বিষয়মুখীনতার দ্বারাই পরিচালিত হয়েছেন। অন্যদিকে আবার সাম্প্রতিককালে কিছুসংখ্যক মার্কসবাদী লেখকের মধ্যে দেখা দিয়েছে ঠিক বিপরীত ঝোঁকটি অর্থাৎ গান্ধীজীর ভূমিকা ও মতবাদের শুধু ইতিবাচক দিকগুলিকেই দেখার ও দেখাবার একপেশে প্রচেষ্টা। বলা বাহুল্য যে উপরোক্ত উভয় ধরনের ঝোঁকেই বস্তুনিষ্ঠ বিষয়গত বিশ্লেষণের পরিবর্তে বিষয়মুখীনতাই প্রাধান্য লাভ করেছে।

এদিক থেকে ডঃ বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের বইখানিকে নিঃসন্দেহে বলা চলে একটি উজ্জ্বল ব্যতিক্রম। বইখানির মুখ্য আলোচ্য বিষয় হলো মহাত্মা গান্ধীর রাজ-

নৈতিক দর্শনের ক্রমবিকাশ, তাঁর তত্ত্বগত ধারণা, আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গি, নৈতিক মূল্যবোধ, সমাজতাত্ত্বিক মতামত, মানব-প্রকৃতি সম্বন্ধে ধারণা, ইতিহাসের দর্শন, সত্যাগ্রহের ভিত্তি, মৌল তত্ত্বগত ধারণা সমূহ এবং অর্থনৈতিক চিন্তা ইত্যাদি। মুখবন্ধে গ্রন্থকার বলে নিয়েছেন যে গান্ধীজীর তত্ত্ব ও কর্মের সর্বাঙ্গীন আলোচনার বা ভারতের রাজনীতিতে তাঁর ভূমিকার মূল্যায়নের প্রচেষ্টা এখানে করা হয়নি। আলোচনাকে সীমিত রাখা হয়েছে উপরে উল্লিখিত বিষয়গুলির মধ্যে। আমার মতে তা সঙ্গতভাবেই করা হয়েছে। কেননা গ্রন্থকার আলোচনার জন্য যে-পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন তাতে একটিমাত্র বইতে উপরোক্ত সর্বাঙ্গীন পর্যালোচনা সম্ভব নয়। দ্বিতীয়ত গান্ধীবাদ তথা গান্ধীজীর রাজনৈতিক ভূমিকার যথার্থ মূল্যায়নের পক্ষে তাঁর রাজনৈতিক দর্শন তথা জীবনদর্শনের সঠিক অধ্যয়ন আবশ্যিক অর্থে একটি অপরিহার্য করণীয়।

বইখানির শেষ অংশে গ্রন্থকার গান্ধীজীর রাজনৈতিক দর্শনের মূল্য বিচার করে নিজস্ব মতামত দিয়েছেন। তার সবকিছুর সঙ্গে সকলে হয়তো একমত নাও হতে পারেন। কিন্তু সেটা বড় কথা নয়। বইখানি যেজন্য অভিনন্দনযোগ্য তা হলো লেখকের বস্তুনিষ্ঠা ও বিচারপদ্ধতি। তিনি কোনো পূর্বকল্পিত মনগড়া ধারণা নিয়ে অগ্রসর হননি, গান্ধীজীর চিন্তাধারার পর্যালোচনা করেছেন ঐতিহাসিক পটভূমিতে এবং বিকাশমানভাবে। যে-সামাজিক-অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক-মনস্তাত্ত্বিক-দার্শনিক পরিবেশে গান্ধীজীর কর্মজীবন শুরু হয়, তাঁর মানসিকতার উপরে সেই পরিবেশের প্রভাবের কথা যেমন আলোচনা করেছেন তেমনি দেখিয়েছেন যে রাজনৈতিক নেতা হিসাবে পরিবর্তনশীল পরিস্থিতির প্রভাবে ও তার সঙ্গে সামঞ্জস্যবিধানের তাগিদে কিভাবে গান্ধীজীর চিন্তাধারায় পরিবর্তন ঘটেছে। অন্যান্য রাজনৈতিক দর্শনের মতোই গান্ধীদর্শনেও কতকগুলি জিনিস আছে যা তৎসাময়িক, আবার এমন কতকগুলি জিনিস আছে যা তৎসাময়িকতার গণ্ডীকে অতিক্রম করে প্রবহমান। কোনো ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বের চিন্তাধারাকে শুধুমাত্র ঐতিহাসিক পটভূমিতে উপস্থাপনাই যথেষ্ট নয়। সেই চিন্তাধারাকে প্রবহমান হিসাবে অধ্যয়নের দ্বারা বিচার করা প্রয়োজন যে কোন উপাদানগুলি মৌল এবং কোনগুলি দীর্ঘস্থায়ী। এই গুরুভার কর্তব্য সম্পাদনের জন্য গ্রন্থকার অসীম ধৈর্য ও শ্রমের সঙ্গে গান্ধীজীর রচনাবলী ও মতামতকে ধারাবাহিকভাবে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অধ্যয়ন করেছেন। গান্ধীজীর নিজের রচনা ছাড়াও বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ব্যক্তির সঙ্গে আলোচনা

প্রসঙ্গে অভিব্যক্ত তাঁর মতামতের সারও বইটিতে সঙ্কলিত হয়েছে। গান্ধী ও গান্ধীবাদ সম্বন্ধে লিখিত ভারতীয় এবং অ-ভারতীয় বিভিন্ন চিন্তাবিদের মতামতও বিস্তৃতভাবে উদ্ধৃত করা হয়েছে। একাদশটি অধ্যায়ে সম্পূর্ণ ৬১০ পৃষ্ঠার এই তথ্যবহুল বইটিতে অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে যথা, ধনতন্ত্র, সাম্রাজ্যবাদ, ফ্যাসিবাদ, বিশ্বযুদ্ধ, সমাজতন্ত্র, শ্রেণীদ্বন্দ্ব ইত্যাদি সম্বন্ধে গান্ধীজীর শেষজীবনে অভিব্যক্ত যেসব মতামত উদ্ধৃত করা হয়েছে তার সম্বন্ধে সাধারণভাবে গান্ধী-সমালোচকদের ধারণা হয় অত্যন্ত ভাসাভাসা নতুবা একেবারেই অজানা। গান্ধী-সমালোচক মহলে একটা ধারণা সাধারণভাবে প্রচলিত আছে যে ধনতন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে গান্ধীজী কখনও বলিষ্ঠভাবে প্রতিবাদ করেননি। কিন্তু আলোচ্য গ্রন্থের লেখক প্রচুর উদ্ধৃতির সাহায্যে দেখিয়েছেন যে গান্ধীজী তাঁর নিজস্ব ধরনে ও নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি থেকে হলেও ধনতন্ত্র, সাম্রাজ্যবাদ, ফ্যাসিবাদ এবং শোষণ-ভিত্তিক সমাজব্যবস্থার যে-সমালোচনা করেছেন তার মধ্যে বলিষ্ঠতার অভাব ছিল না। মার্কসবাদী হিসাবে লেখক গান্ধীদর্শনের সীমাবদ্ধতা, দুর্বলতা ও অসঙ্গতি সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন এবং সেগুলির প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করতে কুণ্ঠিত হননি। কিন্তু সীমাবদ্ধতা, দুর্বলতা, অসঙ্গতি সত্ত্বেও ভারতের জাতীয় জাগরণের ইতিহাসে গান্ধীজীর বিরাট অবদানের দিকটিকে বলিষ্ঠভাবে তুলে ধরতেও তিনি কার্পণ্য করেননি।

গান্ধীজীর রাজনৈতিক দর্শনের ক্রমবিকাশের প্রক্রিয়া অধ্যয়ন প্রসঙ্গে লেখক গান্ধী-ব্যক্তিত্বের দ্বৈতচরিত্র সম্বন্ধেও আলোচনা করেছেন। গান্ধী একদিকে একটি বিশিষ্ট জীবনদর্শনে বিশ্বাসী ও নিজস্ব বিশুদ্ধ আদর্শের প্রচারক হিসাবে অনেক অভিমত ব্যক্ত করেছেন। অন্যদিকে বাস্তববাদী রাজনৈতিক নেতা হিসাবে সহকর্মীদের মতামত, জনগণের চিন্তা ও বাস্তব পরিস্থিতির তাগিদকেও কিছু-না-কিছু পরিমাণে স্বীকৃতি দিয়েছেন। আবার অনেক মৌল প্রশ্নে বাস্তব অভিজ্ঞতার প্রভাবে তাঁর মতামতের পরিবর্তনও ঘটেছে। সেইজন্যই বিভিন্ন সময়ে অভিব্যক্ত তাঁর মতামতে ও কর্মে যে-অসঙ্গতি দেখা যায় তা গান্ধীজীর বিশ্বস্ত অনুগামীদের কাছেও, তাঁকে অনেক সময় হেঁয়ালিতে পরিণত করেছে। গান্ধী ছিলেন কর্মে ও চিন্তায় প্রয়োগবাদী। তিনি নিজে কখনও তাঁর চিন্তাধারার বিকাশের প্রক্রিয়াকে সুবিন্যস্ত রূপ দেওয়ার বা ঐসব অসঙ্গতির যথাযথ ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করেননি। আলোচ্য গ্রন্থের লেখক যে বিচার-বিশ্লেষণ পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন তা স্বাভাবিকভাবেই তাঁকে এই দুরূহ কাজে নিযুক্ত করেছে।

রবীন্দ্ররচনার পাঠভেদ

অশ্রুকুমার সিকদার

বাংলা সমালোচনা কেন দুর্বল তার কারণ খুঁজতে গিয়ে বছরকয় আগে অন্য কাগজে লিখেছিলাম "সমালোচনা যে-তথ্যের ভিত্তির উপরে দাঁড়ালে সবল ও সার্থক হয় সেই তথ্যের ভিত্তিনির্মাণে আমাদের আলস্য" এর প্রধান কারণ। তথ্যের অভাবে আমাদের "সমালোচনা হয় আন্দাজি, অনুমানাত্মক"। আরো বলেছিলাম, "ইয়েটসের কবিতার ভেরিয়োরাম এডিশন যখন দেখি তখন বুঝি রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রেও এইরকম একটা সংস্করণ" কত জরুরি। আর আশা করেছিলাম "যদি মনে রাখি রবীন্দ্রনাথই আমাদের আধুনিককালের সবচেয়ে বড় সাংস্কৃতিক সম্পদ তাহলে এই কারণে অর্থব্যয় বৃথা বলে মনে হবে না"।

আজ 'সন্ধ্যাসঙ্গীত' ও 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী'র পাঠভেদ সংবলিত সংস্করণ হাতে নিয়ে সেই পুরোনো লেখার কথা স্মরণ করছি, যদিও নিজের লেখা থেকে এমন উদ্ধৃতি শোভন দেখায় না। কোনো আশাই যেখানে সফল হয় না, সেখানে একটা বড় আশা যে ফলতে চলেছে, সে পরম কৃতজ্ঞতার বিষয়। ভিতরে-ভিতরে অনেকেই তথ্যের ভিত্তিনির্মাণের কথা ভাবছিলেন, ১৯৬১ সালে রবীন্দ্রজন্মশত-বর্ষের সময় অনুকূল অবস্থা এলে একটা ব্যাপক পরিকল্পনা নেওয়া হয়। তারই একটা শাখা রবীন্দ্ররচনার পাঠান্তর-সংবলিত সংস্করণ প্রকাশ। সন্ধ্যাসঙ্গীতের এই সংস্করণের মুখবন্ধে বলা হয়েছে "রবীন্দ্র-রচনায় কবিকৃত পাঠসংস্কারের আনুপূর্বিক ইতিহাস প্রত্যক্ষ করিবার জন্য গত কয়েক বৎসরে পাঠকসমাজে যে-আগ্রহ পরিলক্ষিত হইয়াছে তাহা পূরণের উদ্দেশ্যে বিশ্বভারতী রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন গ্রন্থের যাবতীয় পাঠভেদ-সংবলিত সংস্করণ ক্রমশ প্রকাশে উদ্‌যোগী হইয়াছেন।" বিশ্বভারতীর প্রাক্তন উপাচার্য অধ্যাপক কালিদাস ভট্টাচার্যের আনুকূল্যে প্রতিষ্ঠিত বিশেষ রবীন্দ্রচর্চাপ্রকল্প এই কাজের দায়িত্ব নিয়েছেন। এই প্রকল্পের নেতৃত্ব, যোগ্যজনের, শ্রীপুলিনবিহারী সেনের হাতে ন্যস্ত হয়েছে। অথচ বিনীত ধৈর্যে

সন্ধ্যাসঙ্গীত, পাঠান্তর সংবলিত সংস্করণ, ১৯৬৯, বিশ্বভারতী। সাত টাকা

ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী, পাঠান্তর সংবলিত সংস্করণ, আশ্বিন ১৩৭৬, বিশ্বভারতী। ছ'টাকা

এমন মহৎ কাজ যে হচ্ছে দুর্ভাগ্য এই এখনো অনেকে তার খবর রাখেন না। দু-এক সংখ্যা আগের 'পরিচয়ে' প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে বলা হয়েছে, "রবীন্দ্র-রচনার ভেরিয়োরাম প্রকাশের উদ্যোগও কেউ নেননি। নেবেন, এমন সম্ভাবনাও দেখা যাচ্ছে না"। অথচ সন্ধ্যাসঙ্গীতের পাঠান্তর সংবলিত সংস্করণ বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ প্রকাশ করেছেন দুবছর আগে এবং তারো পাঁচ বছর আগে এই গ্রন্থের পাঠভেদ 'সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা'র রবীন্দ্রসংখ্যায় (১৩৭১) 'রবীন্দ্রকাব্যে পাঠভেদ॥ সন্ধ্যাসঙ্গীত' নামে প্রকাশিত হয়। আর এক বছরের বেশি হলো ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলীর পাঠান্তর সংস্করণ বেরিয়েছে।

যাঁরা রবীন্দ্রচর্চা করেন তাঁরাও এই উল্লেখযোগ্য প্রকাশনের খবর রাখেন না, এই বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতাই হয়তো এই প্রকল্পের মূলোচ্ছেদের কারণ হবে। যা কেউ পড়ে না, যার খবরই কেউ রাখে না, সে বালাই ছাপিয়ে কী কাজ? অথচ আজ উল্টো ব্যাপারই হওয়া উচিত। সামূহিক বিনাশের দিনে বিমূঢ় এই নৈরাজ্যে বিদ্যাপ্রতিষ্ঠান বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রচলিত অস্তিত্ব নিরর্থক হয়ে গেছে। অন্য পাঁচটা বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো বিশ্বভারতীও যতক্ষণ বিশ্ববিদ্যালয় ততক্ষণ তার অস্তিত্বেরও কী-ই বা যুক্তি আছে! কিন্তু নিজের অস্তিত্বের অন্য এক অসামান্য অর্থ বিশ্বভারতীর আছে, সে রবীন্দ্রচর্চার কেন্দ্র হিসাবে। তাই কেউ জানুক-না-জানুক, নিজের অস্তিত্বভূমিকে অর্থময় করে তোলার জন্যই মনে হয় বিশ্বভারতীর সমস্ত মনোযোগ আজ সংহত হওয়া উচিত রবীন্দ্রচর্চায়। রবীন্দ্রনাথের সর্বোত্তম কীর্তি তাঁর সাহিত্য। তাই রক্ত জল করে যে-প্রতিষ্ঠান তিনি গড়ে তুলেছিলেন সেই প্রতিষ্ঠানের প্রধান, এবং বর্তমান অবেলায় সম্ভবত একমাত্র কাজ হওয়া উচিত সেই সাহিত্যকে সমস্তভাবে বোঝার জানার পথ প্রশস্ত ও সুগম করা। আর এইভাবে ভুল ও আন্দাজি সমালোচনার হাত থেকে তাকে রক্ষা করা। তা হতে পারে এইরকম পাঠান্তর সঙ্কলনের সাহায্যে ও অন্যান্য প্রাসঙ্গিক তথ্যের শ্রেণীবদ্ধ সুশৃঙ্খল প্রকাশে। শ্রদ্ধাবান ধৈর্যশীল বিনীত গবেষণাকর্মীদের বিশ্বভারতীই প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা দিতে পারে। এই দুইখানি বই দিয়ে যে-কাজ শুরু নিশ্চয়ই সেই কাজ আরো ব্যাপক হবে, নইলে দুইবঙ্গের ভবিষ্যৎ বাঙালি আজকের বাঙালিকে দুষবেন। সেইসঙ্গে বিশ্বভারতীকে।

বর্তমান পাঠভেদ সঙ্কলনের প্রথমটি সন্ধ্যাসঙ্গীত যৌথভাবে সঙ্কলন ও সম্পাদন করেছেন শ্রীপুলিনবিহারী সেন ও শ্রীশুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায়, দ্বিতীয়টি ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী একা শুভেন্দুশেখর কর্তৃক সঙ্কলিত ও

সম্পাদিত। প্রথমেই দেখি পাঠান্তর সঙ্কলনে খানিকটা সীমাবদ্ধতা সম্পাদকেরা নিরুপায় হয়ে মেনে নিয়েছেন। ইয়েটসের ভেরিয়োরামে যেমন হরফের ভুল বা যতিচিহ্নের পরিবর্তন দেখানো হয়েছে এখানে তেমন নয়। তেমন যান্ত্রিক বা সাংগঠনিক সাহায্য আমাদের দেশে মেলে না যার আনুকূল্যেই এমন পুঙ্খানুপুঙ্খ কাজ সম্ভব। অবশ্য যতিচিহ্নের পরিবর্তন না দেখানোর অন্য কারণ "বিভিন্ন সংস্করণে যতিচিহ্নের এই পরিবর্তন যে কবিকৃত তাহাও নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না"। পুরানো বানানরীতি অর্দ্ধ, চোলে, হ'তে, হোতে ইত্যাদির জায়গায় কোথায় নতুন বানানরীতি অর্ধ, চলে, হতে. এলো তাও নির্দেশ করা যায়নি। খুব বিরলক্ষেত্রে পাণ্ডুলিপির পাঠ মিলিয়ে নেবার সুযোগ পাওয়া গেছে। সন্ধ্যা-সঙ্গীতের 'দুদিন' কবিতার পাণ্ডুলিপি আছে, আর আছে ঐ বইয়ের বর্জিত কবিতা 'বিষ ও সুধা' এবং ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলীর বারো সংখ্যক পদের। যতই আমরা কাছের সময়ের দিকে এগিয়ে আসব ততই হয়ত পাণ্ডুলিপির সঙ্গে মুদ্রিত পাঠকে মিলিয়ে নেবার সুযোগ সম্পাদকেরা বেশি করে পাবেন।

টীকার দিকে এক ঝলক তাকালেই বোঝা যায়, সন্ধ্যাসঙ্গীতের অধিকাংশ পরিবর্তনের কারণ এই কাব্যের তরল অতিশয়তা কবির অসহ্য হয়েছিল। 'কাঁচা ও দুর্বল' সন্ধ্যাসঙ্গীত অনেকবারই কবির 'লজ্জার কারণ' হয়েছে। "যুবা আপনার শৈশবের হামাগুড়িকে জমাইয়া রাখে না"। সঞ্চয়িতায় তাই তিনি বলেছেন "ইতিহাস রক্ষার খাতিরে" তিনি সন্ধ্যাসঙ্গীতকে খানিকটা জায়গা দিয়েছেন বটে কিন্তু মাত্র 'উপহার' কবিতার ষোলটি ছত্রকে ছাড়া আর কিছুই তিনি 'স্বীকার করতে' রাজি নন। রবীন্দ্ররচনাবলীর প্রুফ দেখার সময় "এ কবিতাটি অসহ্য পুনরাবৃত্তি সংশোধনের অতীত এটা পরিত্যজ্য" মন্তব্য লিখে 'সন্ধ্যা' কবিতাকে বর্জন করেছিলেন। কৌতূহলী এই সংস্করণে সেই প্রুফ-এর প্রতিলিপি দেখবেন। সন্ধ্যাসঙ্গীতের আরো তিনটে এবং ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলীর মোট দুটো কবিতা এইভাবে একেবারে বর্জিত হয়েছিল। সেই কবিতাগুলি অবশ্য এখানে পুনর্মুদ্রিত হয়েছে।

সন্ধ্যাসঙ্গীতের অন্য কবিতাতেও কবি নির্মমভাবে কলম চালিয়ে তাঁর অনর্গল উচ্ছ্বাস শোধরাতে চেয়েছেন। রাশি-রাশি লাইন নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছেন। 'গান আরম্ভ' কবিতার পুরনো পাঠের এক জায়গা থেকেই তেতাল্লিশ ছত্র বাদ গেছে, 'দুঃখ আবাহন' কবিতার এক জায়গায় বাহান্ন ছত্র। এইরকম বড়-বড় অংশ বর্জনের অজস্র উদাহরণ আছে সন্ধ্যাসঙ্গীতে। আবার কোনো-কোনো সময়

একটিমাত্র শব্দ বা বাক্যাংশের বদলে চরণ নতুন আলোয় জ্বলে উঠেছে। যেমন একটা কবিতার 'ভারতী'-তে প্রকাশকালীন পাঠ ছিল "অর্ধমৃত পৃথিবীর মুখের উপরে", তার শোধিত বর্তমান পাঠ "মৃতপ্রায় পৃথিবীর মুখের উপরে"। ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলীতে লম্বা-লম্বা অংশ বর্জনের পরিমাণ অনেক কম। বৈষ্ণব পদাবলীর স্বাভাবিক আয়তনের অনুযায়ী এগুলো লেখা হওয়ায়, আদি-রূপেই সন্ধ্যাসঙ্গীতের মতো তরল অনর্গলতা প্রশ্রয় পায়নি বলেই হয়তো। এখানে অনেক সময় শুদ্ধতর ব্রজবুলিরূপ দেবার চেষ্টায় সংস্কার করা হয়েছে। যেমন "ঘোরা রজনী কৈস গোঁয়ায়সি" থেকে বর্তমান পাঠ "রয়ন নিদারুণ কৈসন যাপসি"। যেমন "প্রিয় সো মরণসেঁ" থেকে "প্রিয় স মরণসেঁ" এবং সবশেষে "পিয় স মরণসেঁ"। একটা-আধটা শব্দ গ্রহণে-বর্জনে-স্থানান্তরে কেমন দীপ্ত হয় কবিতা তার প্রমাণ এই পদাবলীতে আছে। একটা তুলে দিচ্ছি—

(১) আঁধার রজনী ঘোর ঘনঘটা / চমকত দামিনী রে (ভারতী)

(২) শাঙন গগনে ঘোর ঘনঘটা / আঁধার যামিনী রে (প্রথম সং)

(৩) শাঙন গগনে ঘোর ঘনঘটা / আঁধার যামিনী রে (কড়ি ও কোমল ২য় সং)

(৪) শাঙন গগনে ঘোর ঘনঘটা / নিশীথ যামিনী রে (বর্তমান পাঠ)।

এই বই দুটো পড়তে গেলে আরো একটা কৌতূহলপ্রদ বিষয় নজরে আসে। ছোটখাট অনেক হস্তক্ষেপ, কিছু অসাবধানতা রবীন্দ্ররচনার পাঠপ্রস্তুতিতে চ্যুতি ঘটিয়েছে। যে-পাঠ আজ আমরা পাচ্ছি সেই পাঠ কোনো-কোনো জায়গায়, তা নাও হতে পারত। সন্ধ্যাসঙ্গীতের 'অনুগ্রহ' কবিতার এক জায়গায় প্রথম ও অন্যান্য সংস্করণে আছে 'সম্মুখে' রচনাবলীতে ছাপা হয়েছে 'সমুখে'। সম্পাদকীয় মন্তব্য, "এই পরিবর্তন কবি-কৃত কিনা জানা যায় না"। ঐ কবিতারই "করিতে করিতে খেলা" প্রথম সংস্করণের এই ছত্র দ্বিতীয় ও পরবর্তী সংস্করণগুলোয় বাদ পড়েছিল। "রচনাবলীতে পুনর্গৃহীত। এই পুনরাবর্তন কবি-কৃত বলিয়া জানা যায় না।" ভানুসিংহেরও সব পরিবর্তন কবি-কৃত নয়। "ভানুসিংহের ভাষা অপরিচিত হওয়ায় স্বভাবতই মুদ্রণকালে কিছু-কিছু মুদ্রণ-চ্যুতি ঘটিয়াছে।" কিছু পরে ধরা পড়েছে, কিছু পাঠের অঙ্গ হয়ে গেছে। আর একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটেছে এলাহাবাদের ইণ্ডিয়ান প্রেস প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ সংস্করণের ক্ষেত্রে, যাকে টীকায় কাব্যগ্রন্থ ৩ বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। এই সংস্করণ প্রকাশের সময় রবীন্দ্রনাথ অনেক পাঠসংস্কার করেছিলেন, কিন্তু সেগুলো পরবর্তী সংস্করণসমূহে গ্রহণ করা হলো না। যেমন সন্ধ্যাসঙ্গীতে

'তারকার আত্মহত্যা'র 'জলন্ত অঙ্গার খণ্ড ঢাকিতে আঁধার', ঐ সংস্করণে হয়েছিল 'জলন্ত অঙ্গার যেন লুকাতে কালিমা তার'; কিন্তু পরে কবি আবার পূর্বপাঠে ফিরে গেলেন। ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলীর এক জায়গায় মূল পাঠ ছিল 'সখি রে উছসত প্রেমভরে অব ঢল ঢল বিহ্বল প্রাণ'; ইণ্ডিয়ান প্রেস সংস্করণে হলো 'সখি রে উচ্ছল প্রেমভরে অব ঢল ঢল বিহ্বল প্রাণ'; পরে কিন্তু মধ্যবর্তী সংস্কার উপেক্ষা করে কবি পূর্বপাঠে ফিরে গেলেন। কিন্তু জেনেশুনে ফিরে গেলেন কি? সম্পাদকীয় মন্তব্যে এ-জিজ্ঞাসার জবাব আছে—'কবির ইচ্ছানুযায়ী কাব্যগ্রন্থসংস্করণের পাঠপরিবর্তনগুলি পরিত্যাগ করা হইল, নিশ্চিত ভাবে এইরূপ মনে করিবার কারণ নাই।…সে পরিবর্তনগুলির প্রতি তাঁহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় নাই। সে পরিবর্তনগুলি সম্বন্ধে অবহিত থাকিয়াও যদি তিনি পূর্বতন পাঠগুলির পুনরুদ্ধার করিতেন তবে অবশ্যই স্বতন্ত্র কথা হইত। প্রবীণ-বয়সে কাব্যগ্রন্থ সংস্করণে তিনি যে-সকল পাঠপরিবর্তন করিয়াছিলেন, রবীন্দ্ররচনাবলী প্রকাশকালে যদি সেগুলি তাঁহার দৃষ্টি বহির্ভূত না থাকিত তাহা হইলে, হয় তিনি সেগুলি রক্ষা করিতেন, কিংবা আরো সংশোধন করিতেন, পূর্বতন পাঠে ফিরিয়া যাইতেন না, এই রকম মনে করা অসঙ্গত হইবে না।' আজ শুধু অনুমান করতে পারি কী হতে পারত।

আশা করছি এই পাঠান্তর সঙ্কলনের পর অন্তত বর্তমানে প্রচলিত পাঠের উপর নির্ভর করে রবীন্দ্রমানসের বিবর্তন বিষয়ে দীর্ঘ দীর্ঘ প্রবন্ধ ও গবেষণাপুস্তক প্রকাশ বন্ধ হবে। একুশ বছর বয়সে প্রকাশিত সন্ধ্যাসঙ্গীত আটাত্তর বছর বয়সে নির্মম ভাবে সংশোধিত—তাই বর্তমান পাঠে কুড়ি বছরের মানসও নেই, বৃদ্ধবয়সের মানসও নেই; তার মধ্যে আছে দুই বয়সের এক রসায়ন। পরিণতিক্রমের ছাপ মুছে যায় বলে অনেকে—সাহিত্যের গবেষকেরা ঐতিহাসিকেরা বিশেষ করে—এইরকম পাঠসংস্কারকে অপছন্দ করেন। বলেন, এইভাবে নিজেকে 'remake' করা কি ভালো, বুড়ো বয়সের মন নিয়ে কৈশোর-যৌবনের সন্তপ্ত রচনাকে কি বদলানো উচিত? ইয়েটসের সম্বন্ধে এই অভিযোগ অনেকেই করেছেন। এই সংস্কারে না থাকে তরুণতাপ, না থাকে ripeness—এই হলো অভিযোগ। কিন্তু যিনি কবি, যিনি সুধীন্দ্রনাথ কথিত রূপকারী বিবেকের দ্বারা তাড়িত তিনি ইতিহাস রক্ষার খাতিরকে বেশি খাতির করতে রাজি নন, তিনি ভাষাকে দিতে চান অমর ভঙ্গিমা। যতক্ষণ মনোগত আদর্শের চরমে না পৌঁছোয় ততক্ষণ অসন্তোষ, ততক্ষণ সংস্কারেচ্ছার হাত থেকে

তাঁর রেহাই নেই। শুধু রবীন্দ্রনাথের মতো কবি কেন, বিদ্যাসাগর-বঙ্কিমের মতো গদ্যশিল্পীও এই বিবেকের তাড়না এড়াতে পারেন না। পাঠভেদ সংবলিত সংস্করণের সুবিধা এই, এখানে দুটোই একত্রে পেয়ে যাচ্ছি—বিবর্তন ইতিহাস এবং চরম কুসুম। শীর্ষজয়ের পিছনে যে শ্রমসাধ্য নেপথ্য ইতিহাস তা পাঠকের গোচরে এনে সম্পাদকেরা আমাদের অশেষ ধন্যবাদের পাত্র হয়েছেন।

সবশেষে একটা কৌতুকের ব্যাপার উল্লেখ করি। শব্দতত্ত্ব সম্বন্ধে স্বাভাবিক ঔৎসুক্য আর পরিহাসপ্রবণতা থেকে ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলীর জন্ম। 'মা সরস্বতীর এই চোরাই মাল' মৈথিলি ব্রজবুলি ভাষায় লেখা পদাবলীর অনুকরণে রচিত হয়েছিল। এই 'জালিয়াতি'র পিছনে আছে মজা করার আনন্দ। তাই পদসঙ্কলন প্রকাশের সমস্ত সম্পাদকীয় গুরুভারকে এখানে ঠাট্টা করেছেন কবি—তাই আছে শব্দার্থসূচী, কাল্পনিক ভানুসিংহ ঠাকুরের জীবনী। গম্ভীর গবেষণাপ্রবন্ধে প্রাচীন কবির স্থানকাল নির্ণয়ের চেষ্টাকে এই 'জীবনী'-তে উদ্বেল হাস্যে ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছে। কৌতুক আরো জমে ওঠে যখন পাই, 'আবার কোনো কোনো মূর্খ নির্বোধ গোপনে আত্মীয় বন্ধুবান্ধবদের নিকট প্রচার করিয়া বেড়ায় যে ভানুসিংহ ১৮৬১ খৃস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়া ধরাধাম উজ্জ্বল করেন। ইহা আর কোনো বুদ্ধিমান পাঠককে বলিতে হইবে না, যে এ কথা নিতান্তই অশ্রদ্ধেয়।·· তিনি (অপ্রকাশচন্দ্র বাবু) ভানুসিংহের স্বহস্তে লিখিত পাণ্ডুলিপির এক পার্শ্বে কলিকাতা শহরের নাম দেখিয়াছেন।···শব্দশাস্ত্র অনুসারে কাটমুণ্ডু ও ত্রিনকমলীর অপভ্রংশে কলিকাতা লিখিত হওয়ারও সম্পূর্ণ সম্ভাবনা আছে। যাহা হউক ভানুসিংহ যে নিজ বাসস্থানের সম্বন্ধে ভ্রমে পড়িয়াছিলেন তাহাতে আর ভ্রম রহিল না।' কৌতুকবোধ থেকে যে কাব্যের জন্ম সেই কাব্যের পরিশিষ্টে এই মজার জীবনীটি যোগ করে সম্পাদক রসবোধের পরিচয় দিয়েছেন। পাঠভেদ সঙ্কলন করার সময়ে রসবোধ বিসর্জন দিতে হবে এমন কি কথা আছে!

এত পরিচ্ছন্নভাবে মুদ্রিত, দামেও সস্তা মূল্যবান সংস্করণগুলি প্রকাশ করে বিশ্বভারতী আমাদের অভিনন্দনের পাত্র হয়েছে। আরো এই রকম সংস্করণ তাড়াতাড়ি প্রকাশিত হবে এই আশায়, বর্তমান দুটিকে সানন্দ অভ্যর্থনা জানাই।

এক অঙ্কে শেষ

কুমার রায়

নাট্য-সাহিত্যের অন্তর্গত একাঙ্ক নাট্যের ফর্ম বিচিত্র বর্ণসমারোহ নিয়ে অস্তিত্ববান। ছোটগল্পের মতোই বিন্দুতে সিন্ধুর স্বাদ। অথচ একদিন বিশ্বনাট্য সাহিত্যের ইতিহাসে 'কার্টেন রেইজার' হিসেবে বড় নাটকের সঙ্গে ফাউ হিসেবে পরিবেশনায় এই ফর্মের সার্থকতা সীমাবদ্ধ ছিল। ফাউ দেওয়ার সেই প্রথা উঠে যেতেই একাঙ্ক নাট্য রচনার তাগিদও তিরোহিত হলো। আমাদের এখানেও পালা-পার্বণে 'সারা-রাত্রিব্যাপী' অভিনয় আসরের সঙ্গে প্রহসন জাতীয় একাঙ্ক নাটক জুড়ে দেওয়া হতো। সে-প্রথাও উঠে গেছে। ভাগ্য ভালো যে চেখভ, গোগল, সাডারম্যান, সিঞ্জ, পিরানদেল্লো, লেডী গ্রেগরী প্রমুখ শক্তিশালী শিল্পীবৃন্দ একাঙ্ক রচনায় মনোযোগ দিয়ে এবং সর্বাঙ্গসুন্দর অনেক রচনার স্বাক্ষর রেখে এই শিল্পকর্মের স্বতন্ত্র সত্তা নিরূপণ করে দিয়ে গেলেন। এঁরা নাট্যরচনার ক্ষেত্রে ঘড়ি-ঘণ্টার নিয়ন্ত্রণকে অস্বীকার করলেন।

পূর্ণাঙ্গ নাটকের তুলনায় একাঙ্ক নাটক নিরেস এমন মনে করবার কোনোও কারণ নেই। কবেই বা কোনো শিল্পকর্ম তার আয়তন দিয়ে বিচার্য হয়েছে! বরং 'ইউনিটি' এবং 'ইকনমি'র বিচারে এই ফর্ম যে দুরূহ তা স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। দুরূহ বলেই উল্লিখিত নাট্যশিল্পীরা এই ফর্মের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করেছেন। আয়তনের স্বল্পতা এবং স্বল্প আয়তনে পূর্ণতা আনতে পারা নাট্যকারের কাছে একটা চ্যালেঞ্জ।

একাঙ্ক নাটককে বৈচিত্র্যপূর্ণ প্রকাশমাধ্যম ধরে তার মধ্যে টুকরো টুকরো ঘটনায় জড়িত মানুষ, তার হাসিকান্না, স্বল্প পরিসরে সেইসব মানুষদের সমাজে অবস্থান ইত্যাদি নিরূপিত হয়। নাটকীয় সংলাপে, নাটকীয় সিচ্যুয়েশনের কল্পনায় নাট্যকার তাঁর সৃষ্টিকর্মে নিয়োজিত হন।

বাঙলা নাটকের ক্ষেত্রে একাঙ্কের প্রসার ঘটেছে বিগত পঁচিশ বছরে। তার

একাঙ্ক সংগ্রহ—চিত্তরঞ্জন ঘোষ। গ্রন্থনিলয়। কলিকাতা-৯।

আগেও একাঙ্ক লেখা হয়েছে—মুস্তাফী সাহেবের তামাসা ইত্যাদি ছেড়ে দিলেও রবীন্দ্রনাথের 'হাস্যকৌতুক, ব্যঙ্গকৌতুক আছে। মন্মথ রায়, বনফুল, অচিন্ত্য সেনগুপ্তের লেখা একাঙ্ক নাটক ছিল। কিন্তু যাকে বলে নাটক হিসেবে পপ্যুলারিটি তা এই বিশ-পঁচিশ বছরেই ঘটেছে। আজ তো দেখি, নানা উপলক্ষে, একাঙ্ক নাট্য-প্রতিযোগিতা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের বিশিষ্ঠ অঙ্গ। কর্মচারীদের দ্বারা (সরকারী এবং বেসরকারী) পরিচালিত একাঙ্ক নাট্যের প্রতিযোগিতায় নানান বৈচিত্র্য পরিলক্ষিত। যদিচ সে ফসলের অনেকাংশই আশু প্রয়োজনের তাগিদে ফলানো চলে বা জোর করে বিদেশী ঘটনায় দিশী পোষাকের আবরণ দিতে গিয়ে অবশ্যম্ভাবী পরিণামে ঔজ্জ্বল্য যায় কমে। যুগ-চেতনা বা সমাজ সম্পর্কে আগ্রহ শিল্পীর কাছে সুপরিচিত দাবি। নাট্য শিল্পীর কাছেও এ-দাবি থেকেই যায়। কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এঁরা একটা সরলীকৃত ফর্মুলায় বাঁধা পড়েন। সেখানে দ্বন্দ্ব এবং সংঘাতের একটাই চেহারা। পরিণতি একই ধরনের। কম্পোজিশনের কিছু হেরফের করে একটা শ্লোগানে শেষ। এ-অভিজ্ঞতা অবশ্যই স্বোপার্জিত। বেশ কয়েক বছর এক নাগাড়ে কয়েকটি অফিসে একাঙ্ক নাট্য প্রতিযোগিতার আসরে উপস্থিত থাকার সৌভাগ্য হয়েছিল। তার থেকেই এ-অভিজ্ঞতা। যুক্তি এবং বুদ্ধির সমন্বয় ঘটিয়ে রচিত কিছু সার্থক রচনাও প্রত্যক্ষ করেছি নিশ্চয়ই।

গত পঁচিশ বছরে নাট্যসংস্কৃতির ক্ষেত্রে,—যেমন শিল্প-সাহিত্যের অন্যান্য বিভাগেও এক-একটা ঢেউ এসেছে। সেই ঢেউএ আমরা গা ভাসিয়েছি, গা ভিজিয়েছি আবার কেউ কেউ ডুবেও গেছি। এর বাইরেও কিছু শিল্পী ছিলেন নিশ্চয়ই যারা এসব কিছু প্রত্যক্ষ করেই নিজের কাজ করে গেছেন। কিন্তু সে স্বতন্ত্র আলোচনা। গা যাঁরা ভাসিয়েছেন তাঁরা ফ্যাশানেবল, ভঙ্গি দিয়ে ভোলাতে চেয়েছেন, আর যাঁরা গা ভিজিয়েছেন তাঁরা অনেকেই সেই ভিজে জামা-কাপড়ে থাকাটাই পছন্দ করেছেন এবং স্বাভাবতই অসুস্থ হয়ে পরে জ্বরের বিকারে আজও হাত-পা ছুঁড়ছেন। সেই অসুস্থ আবহাওয়ায় একঝলক হাসির হাওয়া মনে হয় মিথ্যে! হাসার মতো মানসিক অবস্থা আমাদের অবশিষ্ট আছে তো? তাই আজ হাতে যদি কোনোও একাঙ্ক নাট্য-সঙ্কলন আসে যার অধিকাংশ নাটকই হাসির, যার মধ্যে হয়তো কোনোও যুগসত্য জীবনযন্ত্রণা, সংগ্রাম বা বাণী অনুপস্থিত তখন প্রশ্ন ওঠে সদা-শঙ্কিত, যন্ত্রণাবিদ্ধ মানুষ রস ভোগ করবে তো? কিংবা সেই অসুস্থ মানসিকতা এ-নাট্যগুচ্ছকে প্রথম দর্শনেই লেখকের জার্ত-

চরিত্র নিরূপণ করে দিয়ে বাতিল করে দেবে না তো ?

এই প্রশ্নকে সামনে রেখেই শ্রীচিত্তরঞ্জন ঘোষের 'একাঙ্ক সংগ্রহ' সন্নিহিত এগারটি নাটকের সমালোচনা করতে বসেছি। সমালোচনা কথাটায় অবশ্যই একটা গুরুদায়িত্ব থেকে যায়। সে-দায়িত্ব পালনের যোগ্যতা আমার নেই এবং গ্রীক নায়ক পেরিক্লিসের অভয় বাণী সত্ত্বেও ('সকলেরই অধিকার আছে সমালোচনার') নেই। মঞ্চের ওপর সামান্য অভিনেতা হিসেবে এবং প্রযোজনার সঙ্গে দীর্ঘ দিন যুক্ত থাকার দরুন এবং থিয়েটারের দর্শক হিসেবে নাটক দেখার অভ্যাসের অভিজ্ঞতায় একটা আলোচনা করতে পারি মাত্র।

যখন মঞ্চের ওপর দাঁড়িয়ে নাটকের কোনোও ক্রিয়ায়, কৌতুককর সংলাপ উচ্চারণে, কিংবা কোনোও হাস্যকর পরিস্থিতির উদ্ভবে নিজেকে বা সহ-অভিনেতাকে জড়িয়ে পড়তে দেখি এবং ফলস্বরূপ পাদপ্রদীপের ওপারের অন্ধকার গৃহ থেকে উচ্চকিত হাসির আওয়াজ শুনি—তখন তো খুশিই হই। আবার নাটকের দর্শক হিসেবে সেই অন্ধকার গৃহে বসে অনুরূপ কোনোও নাট্যক্রিয়ায় আরও পাঁচজনের সঙ্গে আমিও প্রাণ খুলে হাসি। তাই হাসাতে পারার ও হাসতে পারার মূল্য অস্বীকার করি কি করে!

এক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের হাস্য-কৌতুক এবং ব্যঙ্গ-কৌতুকের নাটিকাগুলি বা চেখভের একাঙ্ক নাটক 'প্রপোজাল,' 'ওয়েডিং', 'এ্যানিভারসারি'র প্রহসনের রূপ স্মরণ করছি। চেখভের কথাটা বিশেষ করে মনে আসছে তার কারণ শ্রীচিত্তরঞ্জন ঘোষের অনেকগুলি প্রহসনের গঠনে, চরিত্র সৃষ্টিতে, সিচুয়েশনের ধরনে চেখভের প্রভাব সুস্পষ্ট। দুটি প্রহসন : 'কিছু বলব বলে' এবং 'আনন্দময়ীর আগমনে' চেখভের অনুসরণে লেখা সেটা নাট্যকার-স্বীকৃত। সঙ্কলনটিকে নানা রসের নাটক দিয়ে সাজান হলেও—মুখ্যত হাসির নাটকের সঙ্কলন হয়েছে—কেননা এগারটি নাটিকার মধ্যে নয়টি-ই কৌতুক-রসাশ্রিত। বাকি দুটি ভিন্ন রসের। একটি মনস্তত্ত্বমূলক অপরটি গ্রাম্যজীবনের পটভূমিকায় এক ভূমিহীন চাষী, যে চৌর্যবৃত্তি অবলম্বন করে বাঁচতে চেষ্টা করেছে তার কাহিনী। সম্পূর্ণ ভিন্ন স্বাদের নাটক এবং এই সঙ্কলনে এ-নাটিকার অন্তর্ভুক্তি একটু বেমানান। বিশেষ করে সঙ্কলনের প্রথম নাটক হিসেবে মুদ্রিত হওয়ায় পরবর্তী নাটকগুলির সুর ধরতে অসুবিধে হয়; বাকিগুলিতো প্রায় একই সুরের। তাই লেখকের লেখা একটা ভূমিকা থাকলে সুবিধে হতো—সেইসঙ্গে আরও একটা কথা উল্লেখ্য—নাটকগুলির রচনাকালের উল্লেখ থাকলে ভালো হতো।

প্রহসনগুলি দুভাগে ভাগ করা যায়, এক—নিছক হাসি, দুই—ব্যঙ্গ নক্সা। নিছক হাসির নাটকে মুখ্য উপজীব্য প্রেম এবং তা বিবাহঘটিত। এই পর্যায়ে তিনটি নাটিকা—'কন্যকা', 'ত্রাহি' ও 'প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে'। অন্য চারটি নাটকও হাসির অবশ্য ভিন্নভিন্ন ঘটনাশ্রয়ী 'কিছু বলব বলে' 'আনন্দময়ীর আগমনে', 'বাড়ী' এবং 'টঙ্কাতঙ্ক'।' ব্যঙ্গ নক্সা অন্তর্গত দুটি নাটিকা 'দেবরাজের মৃত্যু' ও 'দাও ফিরে সে অরণ্য' রূপকের আড়ালে সমসাময়িক রাজনৈতিক ঘটনাবলীর ওপর কটাক্ষপাত।

'কন্যকা', 'ত্রাহি' ও 'প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে'র মধ্যে প্রথম দুটি গঠন বিন্যাসে, পরিস্থিতির উদ্ভবে, নাটকীয়তায় সুন্দর কৌতুকনাট্যের স্বাদ বহন করে। বলা ভালো এই সঙ্কলনের এই দুটিই শ্রেষ্ঠ ফসল। দুটি নাটকই কন্যার বিবাহঘটিত। 'কন্যকা'য় কৌতুক সৃষ্টির মূল সূত্র ভ্রান্তি। সেই ভ্রান্তির পরিণতিতে অবশ্য কন্যা তার বাঞ্ছিত ফল লাভ করে।

গাছ-কোমর বাঁধা বড় মেয়ে নিভার ঝুল ঝাড়ার দৃশ্যে, বিপর্যস্ত কন্যাদায়গ্রস্ত প্রিয়নাথবাবুর ভূমিকায়. ছোটভাই প্রণবের বরপক্ষ সম্পর্কে কটাক্ষ মন্তব্যে, দুপ্রস্থ পাত্রপক্ষ, এসবই অভিনেতা এবং প্রযোজকদের খুশি করবে নিশ্চিত করেই। বুনোনের কেরামতিও লক্ষণীয়। চূড়ান্ত কৌতুক জমে ওঠে যখন দুপ্রস্থ বেয়াই-বেয়ান—তারাপদবাবু আর কামিনী দেবী মেয়েকে নিয়ে 'রুই মাছের' মতো মধ্যিখানে রেখে জেদের বশে দরাদরি করতে আরম্ভ করেন। অকস্মাৎ একটা সামাজিক কুপ্রথার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করেই কিন্তু চিত্তবাবু কাহিনীর মূল সুরে ফিরে গেছেন। নাটকের প্রায় শেষে দুপ্রস্থ বেয়াই-বেয়ান অপমানিত বোধ করে যখন 'আমরা দুজনে ঐক্যবদ্ধ হব' বলে বেরিয়ে যায় তখন অভাবিত এক মুহূর্ত তৈরি হয়। দুই ভিন্ন মেরুর মানুষও স্বার্থের ভেল্কিতে এক হয়ে গেল।

'ত্রাহি'ও মিলনান্তক। তবে ত্রাহির সঙ্কট আলাদা। পরিবারের প্রত্যেকেই চাচ্ছে বাড়ির বিবাহযোগ্য মেয়েটি সবদিক দিয়ে উপযুক্ত হয়ে উঠুক। এবং এই উপযুক্ততার নিরিখ বাবা, কাকা, দাদা, বৌদি এবং মায়ের আপন-আপন চিন্তাধারার মতো করেই নির্ধারিত হয়। একটি মেয়ের কাছে সেটা যে দুঃসহ হবে তাতে আর আশ্চর্য কি! হাসির পরিস্থিতি তৈরি করতে ঘটনার বিন্যাসটাই আসল। এক্ষেত্রে বিন্যাসচাতুর্যে চিত্তবাবু সফল হয়েছেন। 'সুবৃহৎ পরম ধর্মপুরাণ', 'Existentialism and Humanism', 'Hygine for lay man', তানপুরা, টনিকের শিশি, দুধের বাটি—এরই মধ্যে একটি মেয়ে

সকলকে মান্য করে সকলের মন জুগিয়ে চলবার চেষ্টা করে চলেছে। কিন্তু সেই সঙ্গে নিজের মনটাকে বাঁচাতে গিয়ে বিবাহ নামক পরমাগতিকে স্মরণ করছে। সে-ক্ষেত্রেও আর এক সঙ্কট। স্বামী নামক গার্জেনের খবরদারীতে গিয়ে পড়তে হবে তো। তাই রফা হয় স্বাধীনতা আর প্রভুত্বের মধ্যে মুনাফার হিসেবের মতো চুলচেরা শতাংশে। তাই শেষপর্যন্ত নরেন কাকার বিশ্বজগতের ফাণ্ডামেণ্টাল ল'র কার্যকারণ সম্পর্ক নির্ধারণের জটিল সমস্যাটা অনায়াসে সমাধান করে ফেলে স্থলতা, সকলের মন রাখা রুটিনটা ছিঁড়ে কুচিকুচি করে হাওয়ায় উড়িয়ে দিয়ে।

তুলনায় 'প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে' নাট্যক্রিয়ায় দুর্বল। চমৎকারিত্বের অভাব এবং সাজানো সংলাপের অস্বাভাবিকত্বই এর কারণ। দুটি চরিত্রের সামাজিক অবস্থান সম্পর্কে উল্লেখ এবং তাদের সাজপোষাকের নির্দেশে যাই বলা হোক-না-কেন কথোপোকথনে সে-ঔজ্জ্বল্য নেই। যে-সঙ্কট সৃষ্টির চেষ্টা করা হয়েছে তাতে পুরুষ চরিত্রটি হাস্যকর হয়ে ওঠে সন্দেহ নেই কিন্তু অভিনেতা হিসেবে তার অভিব্যক্তি পৌনঃপুনিকতায় দোষে দুষ্ট হতে বাধ্য। মেয়েটির নাছোড়বান্দা ন্যাকামিপনা চেখভকে মনে করিয়ে দেওয়া সত্ত্বেও অতি দীর্ঘ। নাট্যকার হয়তো উঁচু সমাজের ফাঁপা মানুষদের প্রেম-ভালোবাসার ন্যাখানেপনাতে এবং নির্বুদ্ধিতাকে উপজীব্য করে হাসাতে চেয়েছেন। দর্শক হয়তো হাসবেও—কিন্তু···। নাটক হিসেবে এই কিন্তুটা থেকেই যাচ্ছে।

'কিছু বলব বলে' ও 'আনন্দময়ীর আগমনে' চেখভ অনুসরণে লেখা। সাধারণ মানুষের মধ্যে যে-কমিক্ আস্পেক্ট্ আছে তার প্রতি চেখভের একটা প্রকাশ্য হাসি ছিল। 'কিছু বলব বলে' এক আধপাগলা মানুষ, যে তার স্ত্রীকে ভয় পায়, তার বক্তৃতা। এক নাগাড়ে সাত পৃষ্ঠার বক্তৃতা। শিক্ষার্থী অভিনেতার কাছে এই বক্তৃতা অনুশীলনযোগ্য। 'আনন্দময়ীর আগমনে' রমেন চরিত্রের অস্বাভাবিক পরিস্থিতি এবং বিবরণের অতিকৃতি উপভোগ্য। সে আর পাঁচজনের মতোই সাধারণ মানুষ—বেচারি মানুষ। আমাদের ব্যাবহারগত যে ত্রুটি—যা স্বার্থপরতা থেকে উদ্ভূত তাই এখানে হাসির খোরাক। উপসংহারে তার ধৈর্যচ্যুতি ও উন্মত্ততা আমাদের অনেকেরেই সুপ্ত ইচ্ছা—তাই দর্শক হিসেবে রমেনের সঙ্গে একাত্ম হতে অসুবিধে হবে না।

'বাড়ী', যার কাহিনীর জন্য নাট্যকার বিদেশী সূত্রের কাছে ঋণ স্বীকার করেছেন তা একটি সুগঠিত একাঙ্ক। কাহিনীর আকস্মিক এবং একাধিক মোড়

ফেরান নাট্যচমকের সৃষ্টি করেছে। চিরতার জল আর চা নিয়ে যে-পরিস্থিতি বা বাড়ির অশিক্ষিত ঝি মানদার উল্টো করে প্ল্যাকার্ড বসান নিয়ে যে-কৌতুক সৃষ্টি করা হয়েছে তা প্রহসনে অপরিচিত নয় তবু এ-নাটকে তা সুষ্ঠুভাবেই খাপ খেয়ে গেছে, নাট্যকৌতূহলও জাগ্রত থাকে।

টঙ্কাতঙ্কে উদ্ভটত্ব আছে। সেই উদ্ভটত্বটাই নতুন। অভিনয়ের দিক থেকে এ-নাটক জমবে বলে মনে হয় না—কেন-না এ-নাটকে অভিনেতার পক্ষে একই রকম অভিব্যক্তিতে রসসৃষ্টির অন্তরায় হবার সম্ভাবনাই বেশি। নাট্যকার অবশ্যই তাঁর ধারণা অনুযায়ী অনেকগুলি ব্যবসা সম্পর্কে বক্র মন্তব্য করব-না করেও সুস্পষ্ট করে বলেছেন। অনেকেই তাঁর সঙ্গে একমত হয়ে উপভোগ করবেন।

নক্সা জাতীয় দুটি লেখা 'দেবরাজের মৃত্যু' এবং 'দাও ফিরে সে অরণ্য'। স্বর্গলোকে দেবরাজ ইন্দ্রের মৃত্যু উপলক্ষে ক্ষমতা দখলের লড়াই। তৈমুর, নাদির এবং ক্লাইভের অন্তর্ভুক্তি মজার। কিন্তু এর উপভোগ্যতা নাটকীয়তায় নয় বা সংলাপের চাতুর্যেও নয়। নাটক হিসেবে এইখানেই এর দুর্বলতা। ক্ষমতা দখলের চক্রান্ত আমাদের জীবনে আজ এমন সত্য যে হয়তো এ-নাটিকার অভিনয় কালে আমরা, স্বর্গের নয়, এই মর্তের, অনেক পরিচিতের ছায়া দেখতে পেয়ে খুশি হব মাত্র।

'দাও ফিরে সে অরণ্য'ও রূপকাশ্রয়ী। সমসাময়িক ঘটনারাজি তৎকালিক ও তৎস্থানিক হয়েই সার্থক। বনমহোৎসব নিয়ে বক্রোক্তি এবং ব্যঙ্গের ধার অধুনা লুপ্ত। হয়তো এমন হতে পারে সমসাময়িক কালে এর অভিনয়, অভিনেতা এবং দর্শকের মনে উদ্দীপন-বিভাব রচনা করল কিন্তু ভবিষ্যৎকালে দর্শকমনে তার কোনোও প্রত্যক্ষ প্রভাব থাকে কিনা সন্দেহ। সরকারী পরিকল্পনার ফাঁকি এবং অপব্যয় ব্যঙ্গের যোগ্য। এবং ব্যঙ্গ নাটকে ঘটনার অতিরঞ্জনও মেনে নেওয়া হয়। কেন-না সে অতিরঞ্জনের লাইসেন্স নিয়ে একটা সত্যকে ছোঁবার চেষ্টা করা হয়। সেখানেই সে সার্থক। কিন্তু এক্ষেত্রে গাধার টুপি পরিয়ে যাকে রাজা এবং পরিকল্পক হিসেবে দেখান হয়েছে এবং তাকে যে-পরিমাণ নির্বোধ, মূর্খ এবং অক্ষম হিসেবে আঁকা হয়েছে তা সত্যের বহু দূরবর্তী। তাছাড়া ভিতরের বা বাইরের কোনোও সঙ্কটও এ-নাট্যে অনুপস্থিত।

ভিন্নধর্মী দুটি নাটকের উল্লেখ পূর্বেই করেছি। 'দ্বৈত' একটি মনস্তাত্ত্বিক নাটক। তবে 'দ্বৈত'কে নাটক না বলে একটি সুন্দর সুগঠিত ছোটগল্প বলা ভালো। পরস্পরের সুদীর্ঘ কথোপকথনের মধ্যে দিয়ে একটি জটিল গল্পের মেজাজ।

তবু এর অভিনয় নিশ্চয়ই সুন্দর—তবে পাঁচটি চরিত্রের জন্য পাঁচজন শক্তিশালী অভিনেতার প্রয়োজন। শেষ লাইনে বন্ধুপত্নীর আকস্মিক অথচ ছোট একটি সান্ত্বনা বাক্যে চমক আছে সে-চমক আগের অনেক চমকের চেয়ে বেশি তীব্র।

এই সংগ্রহের প্রথম নাটক সম্পর্কে আলোচনার সূত্রপাত ইতিপূর্বেই করেছি। উপসংহারে তার জের টানছি। 'নিশি'র নাট্যকাহিনী গ্রামের এক চোরের পারিবারিক জীবনের করুণ কাহিনী। নাটকের চরিত্রগুলি চল্লিশের দশকের এবং পঞ্চাশের দশকের অনেক নাট্যচরিত্রের মাধ্যমে আমাদের পরিচিত। প্রসঙ্গত স্বর্ণকমল ভট্টাচার্যের লেখা (পরিচয়ে প্রকাশিত, সম্ভবত) ছোট-গল্প 'মন্ত্রশক্তি'র কাহিনীর সঙ্গে এর কাহিনীর চরিত্রগত একটা মিল আছে অবশ্য সে-কাহিনীর পরিণতি সম্পূর্ণ আলাদা কিন্তু পরিবেশ এক। এ-নাটিকার সংলাপের গঠন ও ভাষা পরিবেশ-উপযোগী। একাঙ্ক হিসেবেও স্বয়ংসম্পূর্ণ। শিশুপুত্রের অসুস্থতা এবং মৃত্যুর মুহূর্তে যথেষ্ট নাটকীয় এবং আবেগমথিত। তবু বলব এ-নাটক ফর্মুলা অনুযায়ী। যে-ফর্মুলায় অনেক নাটক, অনেক গল্প ইতিপূর্বে রচিত হয়েছে। তাই দেখি চৌকিদার আর চোর লতিফ শ্রেণী সত্যের রূপক। তাই দেখি দারোগা-চরিত্র ফর্মুলার মধ্যে ফেলা। এ-নাটকে তাকে অত্যাচারী হিসেবে একবারও উল্লেখ করা নেই, এবং বস্তুত তেমন ঘটনা এ-কাহিনীতে নেইও। এ-নাটকে সে গ্রামের চোর ধরতে এসেই লতিফকে বামাল ধরে ফেলেছে। অর্থাৎ সে তার কর্তব্য কর্মই সম্পাদন করেছে—তবু, তদসত্ত্বেও 'নীলদর্পণ' বা 'জমিদার দর্পণ' থেকে সে যেন উঠে এসেছে।

লতিফের স্ত্রী হাজুবিবির যন্ত্রণা, বেদনা, দ্বন্দ্ব এ-নাটকে সবচেয়ে সত্য।

সবশেষে একটি কথা বলা বিশেষ করেই প্রয়োজন। চিত্তবাবু তাঁর বিষয় নির্বাচনে, নাটকীয়তা সৃষ্টি করতে এ-একাঙ্ক সংগ্রহের কোনোও নাটকেই অহেতুক জটিল পথ ধরেননি। তার সহজ কাহিনী, সরল ভঙ্গি ভালো লাগে। কেননা এ-সঙ্কলনের বেশির ভাগ নাটক মাথা ধরায় না—হাসায়।

চোখের আলোয়

চিত্তরঞ্জন ঘোষ

সত্যেন সেন বাঙলাদেশের মানচিত্রকে সম্পূর্ণ করবার দায়িত্ব নিয়েছেন। নদীর আঁকাবাঁকা রেখা, নাগরিক বিন্দু ও পার্বত্য শোঁয়াপোকা দেশের প্রাথমিক পরিচয় মাত্র। পূর্ণ পরিচয়—সেই দেশের মানুষে। গ্রামে গ্রামে ঘুরে লেখক মানুষগুলিকে খুঁজে বার করেছেন, এবং যথাস্থানে সেই উজ্জ্বল প্রাণবিন্দুগুলিকে বসিয়েছেন।

রংপুর, দিনাজপুর, যশোর, খুলনার সেই গ্রামগুলি, মানচিত্রে যাদের হদিস খুঁজে মেলা ভার, সেখানকার মাটি, জলা, গাছ, ক্ষেত, খামার, এবং সর্বোপরি মানুষ অতি জীবন্তভাবে ছড়িয়ে আছে বইটির পাতায় পাতায়। কাদা-মাটি-ঘামমাখা মানুষ—মাঠে, ঘরে, সংগ্রামে, দুঃখে, সুখে, প্রতিরোধে। সেই মানুষকে তিনি বেশি দেখেছেন, যে-মানুষ জাগ্রত, যে-মানুষের মন অচেতনতার অন্ধকার সরিয়ে সচেতন, সক্ষম, সক্রিয়, অত্যাচারের বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত, যে-মানুষ অন্ধকারের হাত ছাড়িয়ে ক্রমেই উজ্জ্বলতর।

অধিকাংশ কাহিনীর পটভূমি—ছেচল্লিশের তেভাগা আন্দোলন। পাত্রপাত্রী—চাষী, আধিয়ার, ক্ষেতমজুর। গ্রাম-বাঙলার দুঃসহ অর্থনীতির চাপে মরতে মরতেও লোকগুলো রুখে দাঁড়িয়েছে। সেই রুখে-দাঁড়ানো মানুষের মিছিলে আছেন তন্নারায়ণ, চাটি মোহাম্মদ, স্পষ্টরাম, জয়মণি, কম্পরাম, জাল মোহাম্মদ, হীরালাল বাইন, হাবিবুল্লাহ, সরলাদি। লেখক এদের ছেচল্লিশের বীরত্ব-গাথায় জোর দিয়েছেন, কিন্তু সেখানেই এঁদের ছেড়ে দেননি। দেশ-ভাগ হওয়ার পরেও এদের অনুসরণ করেছেন লেখক। একদিকে জমিদার-জোতদার, অন্যদিকে ধর্মের মারাত্মক গোঁড়ামি, এই দুয়ের মধ্য দিয়ে পথ কেটে এগিয়ে গিয়েছেন এই সুধন্বা বাঙালিরা। অস্ত্রবিদ্যা শেখবার জন্যে, প্রেরণার অঞ্জলি পূর্ণ করার জন্যে এইসব উত্তম ধনুর্ধরদের কাছে আমাদের বারবার আসতে হবে।

এ-বইয়ের এক-একটি চরিত্রকে নিয়ে এক-একটা উপন্যাস লেখা সম্ভব।

গ্রাম বাংলার পথে পথে, সত্যেন সেন। বিশ্ববাণী প্রকাশনী। দাম ছয় টাকা

সরল এবং সবল। বিনয়ী কিন্তু সাহসী। মার খেতে খেতেও আশাবাদী। মার দেবার লোক কম নয়—জোতদার, মহাজন, পুলিশ।

লেখক উপন্যাস লেখেননি। একটু রঙ-ও চড়াননি। লিখেছেন শাদা-মাটা সত্য ঘটনা এবং প্রমাণ করেছেন যে সত্য উপন্যাসের চেয়ে চমকপ্রদ।

মানুষগুলো উঠে এসেছে নিতান্ত সাধারণ জায়গা থেকে। মাঠ-ঘাট থেকে, খড়ের কুঁড়ে থেকে। ত্যানা জড়ানো। কিন্তু এক-একটি সংঘাতের মুখে লোহার মতো দাঁড়িয়ে গেছে এই মাটি-দিয়ে-গড়া মানুষগুলো। লেখক এদের তুলে এনেছেন বইয়ের পাতায়, গেঁথেছেন পল্লী-বাঙলার বীরত্ব-গাথা। গদ্যে চারণের কাজ করেছেন লেখক।

ভাষা কেমন, কেমন লেখার ভঙ্গি—এসব চিন্তা অবান্তর হয়ে যায় এই মানুষগুলির সামনে দাঁড়ালে। বিষয় এখানে প্রধান। চরিত্র প্রধান। আর প্রধান চোখ খোলা রেখে চলা, আন্তরিকতা দিয়ে দেখা। সেই গুণেই মানুষগুলি জীবন্ত, ঘটনাগুলি বিদ্যুৎরেখায় অঙ্কিত।

শুধু পূর্ণাঙ্গ মানচিত্র নয়, ইতিহাসও সঞ্চিত হয়ে আছে মানুষগুলোর কাজের ফাঁকেফাঁকে। তেভাগা আন্দোলন ও তার পরের এত প্রত্যক্ষ ইতিহাস আর কোথায় পাওয়া যাবে জানি না।

দু-একটি জায়গা না তুলে স্বস্তি পাচ্ছি না। ভাষার কারিকুরি নেই, তবু ভোলা অসম্ভব একটি মিছিলের বর্ণনা, তন্নারায়ণের হত্যার প্রতিবাদে মিছিল। যাত্রাপথ আটাশ মাইল, মধ্যে দশমাইলের মাথায় একবার রাতের জন্যে থামা।

"এ তো মিছিল নয়, এ যেন পার্বত্য নদী, সমস্ত বাধাবন্ধ ভেঙেচুরে উদ্দাম বেগে ছুটে চলেছে।···মিছিল ছুটে চলেছে। কেউ জানে না কেন, কেউ হাঁটছে না, সবাই ছুটছে, যেমন করে যুদ্ধের বিউগ্‌লের ডাকে সৈনিকরা প্রাণ দেওয়া-নেওয়ার খেলায় উন্মত্ত হয়ে ছুটে চলে।···মিছিলে যারা শরিক হয়েছে, তাদের প্রত্যেকের হাতে লাঠি। খালি হাত কারু নেই। আমারও না। আমরা এগিয়ে চলেছি, আর দু'পাশের গ্রাম থেকে দলে দলে লোক এসে মিছিলে যোগ দিচ্ছে। লোকের পর লোক আসছে, বুড়ো থেকে কিশোর পর্যন্ত সব বয়সের লোকই আছে। নিরীহ, শান্তশিষ্ট, গোবেচারী মানুষগুলি, যাদের কথা ভাবতেও পারিনি, তারাও চলে আসছে। প্রতিদিনের অতি পরিচিত মানুষগুলি, তাদের চোখমুখের ভাব কেমন যেন বদলে গেছে। তাই চেনা লোককে নতুন করে চিনে নিতে হচ্ছে।···পিছন থেকে প্রবল চাপ পড়ছে।

এগিয়ে চলেছে জনস্রোত, ঠেলে নিয়ে চলেছে আমাকে, দাঁড়িয়ে থাকার উপায় নেই। সবাই ছুটছে, আমিও ছুটছি।"

ডোমার নামে জায়গায় রাতের বিশ্রাম। তারপর যাবে আঠারো মাইল। এদিকে সৈয়দপুরে হিন্দু-মুসলমানে দাঙ্গা বেধে গেছে। ফলে সর্বত্র আতঙ্ক। এমন সময় দূরে শোনা গেল বহু লোকের আসার শব্দ। ঝড়ের মতো আসছে অগণ্য লোক। উত্তেজিত তারা, ক্রুদ্ধ। হাতে লাঠি। আতঙ্কিত হিন্দুরা বলল, 'মুসলমানরা আসছে'। ভয়ার্ত মুসলমানরা বলল, 'হিন্দুরা আসছে'। সত্যি তারপর তারা এসে পড়ল, দেখা গেল, হিন্দুও এসেছে, মুসলমানও এসেছে। দলে দলে, কাতারে কাতারে। তন্নারায়ণের হত্যার প্রতিবাদ-মিছিল দাঙ্গা-বিরোধী মিছিলে রূপান্তরিত হয়ে গেছে।

অথবা নমশূদ্র চাষীর বৌ সরলাদি! দীর্ঘ সুগঠিত-দেহ নববধূ একা লগি ঠেলে নৌকো বার করে এনেছিল। পরের জীবনে অনেক দুর্গম পথের মধ্য দিয়ে চাষীদের তিনি বার করে এনেছিলেন। এই সবল গ্রামীণ নারীর অগণ্য বীরত্বের কাহিনী এখানে লিপিবদ্ধ রয়েছে। 'ভাইডি' অমল সেন সরলাদিকে বলেছিল, "আমরা এমন দিন নিয়ে আসব যে দিন সমাজে ধনী আর গরীব এই দুটো ভাগ থাকবে না। সবাই সমান হবে, সবাই সুখে থাকবে।"

কিন্তু ধরা পড়ে গেল "সকলের নয়নের মণি" ভাইডি অমল সেন। "রাজশাহী সেন্ট্রাল জেলে পচে মরছে, সে কি আর ফিরে আসবে কোনোদিন ?"

আন্দোলন ভয়ঙ্কর চোট খেয়েছে। চোখের সামনে সব ভেঙে যাচ্ছে। সরলাদির যক্ষ্মা হয়েছে। "ভাইডি যদি ফিরে এসে জিজ্ঞাসা করে, কি করেছ তোমরা এতকাল ? এ প্রশ্নের কি উত্তর দেবেন তিনি ? নাই, নাই, উত্তর দেবার মত কোন কথাই যে নাই।"

মৃত্যুর আগে সরলাদি রসিক ঘোষকে বললেন, "বেয়াই, আমি তো চললাম। কিন্তু যাওয়ার আগে অনেকের সঙ্গেই দেখা হ'ল না। অণিমা, করুণা ওরা রইল ওপারে, আর ভাইডি সেও তো ফিরে এল না।...বেয়াই, একটা কথা বলে যাই। আমরা যে গরীবের রাজত্ব আনতে চেয়েছিলাম, আমি তা দেখে যেতে পারলাম না। তোমরাও হয়তো পারবে না, কিন্তু আমরা দেখি আর নাই দেখি, সেদিন একদিন আসবেই। মরবার আগে এ কথাটা আমার আরো বেশি করে মনে হচ্ছে। বেয়াই তোমরা বিশ্বাস ছেড়ো না। ভাইডি আমার মিছে কথা বলে নি।"

সেকালের দেবতা একালের দানব

দিলীপ মুখোপাধ্যায়

তিপান্নর মার্চ থেকে পঞ্চান্নর মার্চ। দুবছর মুক্ত কম্বোডিয়ার রাজা ছিলেন নরোদম সিহানুক। স্বেচ্ছায় রাজসিংহাসন ত্যাগ করার নজির ইতিহাসে বিরল। রাজা দ্বিতীয় নরোদম স্বেচ্ছায় রাজপুত্র হলেন পঞ্চান্ন সালের দোসরা মার্চ। রাজপুত্র নেতা হলেন। জনগণের রায়ে জাতীয় সভার সবকটি আসনে জয়লাভ করে তিনি হলেন নতুন রাষ্ট্রপ্রধান। পনেরো বছর রাজপুত্র রাষ্ট্রপ্রধান থাকার পর সত্তর সালের মার্চে রাষ্ট্রদ্রোহী বলে ঘোষিত হলেন সিহানুক। রাজপুত্র হলেন গেরিলা। উনিশশ চল্লিশ থেকে সত্তর পর্যন্ত তিরিশ বছর নিরবচ্ছিন্নভাবে রাজা কিংবা রাজপুত্র সিহানুক ছিলেন কম্বোডিয়ার প্রধান। শুধু কাগজে-কলমে নয়, মানুষের মনেও।

কালকের রাজপুত্র সিহানুক। আজকের কম্বোডিয়ার মুক্তিযুদ্ধের নায়ক, গেরিলাবাহিনীর প্রধান। কম্বোডিয়ার সাম্প্রতিকতম দক্ষিণপন্থী চক্রান্ত ও তার বিরুদ্ধে জনজাগরণের ইতিহাসকে আশ্রয় করে জ্যোতিপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায়-এর বই 'কালকের রাজপুত্র আজকের গেরিলা'। এক নিঃশ্বাসে পড়ার মতো বই। পড়ে মনে হলো দেবতা কালের হাওয়ায় দানব হন রাজপুত্র হন গেরিলা।

এক-একটা শব্দ কোনো কোনো সময়ে মন্ত্রের মতো কাজ করে, যদিও শব্দের কোনো যাদুমন্ত্র আছে কিনা জানি না। এরকমই একটা শব্দ মুক্তিযুদ্ধ। বিশেষ করে বাঙলা ভাষায় গেরিলা কথাটা তেমন কোনো আবেগ বহন করে না— অন্তত আমার মনে তো নয়ই। তাই মলাটের গেরিলা পেরিয়ে যখন দেখি মুক্তিযোদ্ধারাই এই বই লিখতে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে, নাম-না-জানা দক্ষিণ-ভিয়েতনামিনী আর নাম জানা রোশেনারা এরাই মনের মধ্যে আনাগোনা করছে, তখন এই এলোমেলো পুবের হাওয়ার যশোরের-খুলনার ছড়ানো-ছিটানো মুক্তিযুদ্ধের সংবাদে আমারই মন আন্‌চান্‌ করে ওঠে। এক নিঃশ্বাসে আমারই

কালকের রাজপুত্র আজকের গেরিলা, জ্যোতিপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায়। মডেল পাবলিশিং। মূল্য দশ টাকা

কতজন্মের সোদর জ্ঞাতিবর্গের দেশ কম্বোজের মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাস পড়ি।

উনিশটি অংশে ভাগ করে লেখা বইটির প্রথম এবং শেষপর্ব দুটি নিতান্তই শুরু এবং শেষ। বাকি সতেরোটিই ইতিহাস কিংবা কাহিনী। কোথাও ইতিহাস ক্লান্তিকর নয় আবার কখনোই কাহিনী ইতিহাসকে ছড়িয়ে নয়। কম্বোডিয়ার ইতিহাস। চারশো বছরের আক্রমণ, পরাধীনতা ও মুক্তিসংগ্রামের কাহিনী। দুহাজার বছরের সংস্কৃতির সংবাদের ছোঁয়া। গল্পের ফাঁকেফাঁকে সে দেশের মানুষজন, রাস্তাঘাট, শহর-বন্দর, সভ্যতা-সংস্কৃতির ঐতিহ্যের মোটা দাগের ফলকগুলির সঙ্গে আমাদের পরিচিত করার প্রয়াস সব সময়েই করেছেন। অনেকটা পুরনো স্মৃতিচারণের কায়দায় লেখা। পতুর্গীজ বেলোসার আক্রমণের কাল থেকে মার্কিনী নিকসনের সৈন্য পাঠানোর আদেশ পর্যন্ত সবটাই বর্তমানের ঘটনার সূত্র ধরে পিছু হটা। আবার পিছন থেকে ধীরেধীরে সামনে ফিরে আসা। লেখার এই কায়দার ফলে কখনোই পড়ার ক্লান্তি আসে না। বস্তুত শুধুমাত্র গল্পের জোরে এই বই একনিঃশ্বাসে পড়িনি। ইতিহাস, কাহিনী, কিংবা অনুসন্ধিৎসা কোনোটাই যদি এই বই পড়ার আগ্রহ না-জন্মাতে পারে, নিতান্ত লেখার গুণেই বইটি শুরু করলে শেষ করতে ইচ্ছে যাবে।

প্রায় তিনশো পৃষ্ঠার এই বই বর্তমান ঘটনার সূত্রে কম্বোডিয়ার অতীতের ইতিহাস, রাজা-রাজড়া আর সাম্রাজ্যবাদীদের আক্রমণের কাহিনী, রাজা-রাজপুত্র সিহানুকের জীবনের কয়েকটি রাজনৈতিক মুহূর্ত, বর্তমান লড়াইয়ের রোজনামচার কয়েকটি দীর্ঘপত্র, পৃথিবীর অন্যান্য দেশে তার প্রতিক্রিয়া সমস্তই সুরেলা কাহিনীর সূত্রে ঠাসা।

কিন্তু ইতিহাস পড়ানোই বোধহয় এই বইয়ের উদ্দেশ্য নয়। স্থির দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে চলার ফলেই, তার থেকে ঢের বেশি নাড়া দিয়েছে "ভিয়েতনামের হাঙ্গামা, ইজরায়েলের গোলমাল, লাওসের ঝামেলা, ভিয়েনায় রুশদের সঙ্গে পাঞ্জা কষা··· কম্বোডিয়া পেকে উঠেছে" (পৃষ্ঠা ১৬২) এইসব। এবং এর মূলে একবার দৃষ্টি পড়লে আর চুপ করে থাকা যায় না। আর চুপ করে থাকা যায় না "যখন পৃথিবীর দেশে দেশে আলোকপূজারী মানুষ লেনিন-জন্মশতবার্ষিকী উৎসব করছিলেন, যখন পৃথিবীর দেশে দেশে তিমিরবিনাশী মানুষ ফ্যাসিবাদের ঐতিহাসিক পরাজয়ের পঞ্চবিংশতিতম বার্ষিকী উদযাপন করছিলেন, তখন হিটলারকেও লজ্জা দিয়ে, অপ্রস্তুত আর শান্ত কম্বোডিয়ায় মার্কিন ঘাতকদের বন্দুক গর্জন করে উঠল।" (কম্বোডিয়ায় মার্কিন আগ্রাসনের প্রতিবাদে পশ্চিম-

বঙ্গের শিল্পী-সাহিত্যিকদের বিবৃতি, (ঐ পৃষ্ঠা ২৫১)।

মার্কিন ঘাতকদের বন্দুক অবশ্য এই প্রথম নিরস্ত্র, অপ্রস্তুত, শান্ত মানুষের ওপরে অঘোষিতভাবে গর্জন করে ওঠেনি। এটা কোনো ব্যতিক্রম নয়, বরং অধুনা এটাই নিয়ম। যে-আমেরিকার গণতন্ত্রের প্রতি দুনিয়ার সকলেরই অপরিসীম শ্রদ্ধাভক্তি ছিল এবং সঙ্গত কারণেই ছিল, স্বাধীনতা আর গণতন্ত্রের প্রতীক যে-দেশ, পৃথিবীর মধ্যে একমাত্র দেশ যেখানে মুক্তির মূর্তি, স্বাধীনতার প্রতীমা—স্ট্যাচু অব লিবার্টি আছে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে আজ পর্যন্ত সেই 'মহত্তম গণতন্ত্রে'র ধারক-বাহকরা যে স্তূপীকৃত পাপের বোঝার ওপর বসে আমেরিকার গণতন্ত্রের পরিবর্তে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ চালাচ্ছেন তাতে শান্ত, নিরস্ত্র, নিতান্তই ভিনদেশি নিরীহ লোকেদের ওপর মাঝেমধ্যে গোলাগুলি ও বিষবাষ্প না ছুঁড়লে আমরাই অস্বস্তি বোধ করি আর লজ্জায় মাথা হেঁট করে ফেলি! আর যে-দেবতা দানবে পরিণত হয়েছে, সেই দানবের সাময়িক ক্লান্তিতে দম নেওয়ার অবকাশে আমরা অনেকেই সব ভুলে গিয়ে (হিরোশিমা থেকে মাই-লাই পর্যন্ত) বলতে শুরু করি 'আহা রাজা কি মহান'। আমাদের একশ'পঞ্চান্ন কোটি টাকা ঋণ দিয়েছেন। অথচ সমস্ত মুক্তির লড়াইয়ের ক্ষেত্রেই দুনিয়াটা যে দুটো ভাগ হয়ে গেছে এতো আর মিথ্যে নয়। কিংবা কোনো সময় ভুলে যাওয়ার কথা নয়। এমনকি বাঙলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময়েও নয়। যদিও অনেকেরই মনে সাধ ছিল বাঙলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ব্যাপারে মার্কিনীরা অন্তত নিরপেক্ষ থাকে। কিন্তু অনেকেরই সেই সাধ রাজকন্যা লাভ করার সাধের মতোই থেকে যাবে।

দুনিয়ার সমস্ত মুক্তিযুদ্ধকেই দমন করার জন্য কোটি কোটি টাকা ব্যয় করে চলেছে যে মার্কিন সরকার, সরাসরি কিংবা চক্রান্ত করে, তারই একটি ঘটনা কম্বোডিয়া। এই কথাটা আলোচ্য বইয়ের অনেকখানি জুড়ে আছে। আর এটাও ইতিহাস। আরেক ইতিহাস। আমাদের দেখাশোনা পৃথিবীর ইতিহাস। শ্রেণীসংগ্রামের ইতিহাস। মুক্তিযুদ্ধ স্তব্ধ করার হীন সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তের ইতিহাস। জাতীয় মুক্তির শক্তির সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদের বিরোধ। তার হাত থেকে তো আমরা এখনও মুক্ত নই। আর শোষিত মানুষ নিজের ইচ্ছেয় অস্ত্র ধরে না, ধরে শুধুমাত্র বাধ্য হলেই। রাজপুত্র সিহানুক চা-বাগিচা শ্রমিকের শ্রেণীমিত্র নয়। এমনকি মিত্রও নয়। শোষক। তথাপি মার্কিনী হত্যাকারীর দল আর তার তাঁবেদার নোল-মাতাকের চেয়ে সহস্রগুণে ভালো। রাজপুত্র সিহানুক,

যাঁর চরিত্র থেকে চালচলন পর্যন্ত অনেক কিছুই আন্তর্জাতিক কেচ্ছার বিষয়বস্তু, মানুষের মনে ভয়ের সঞ্চার করে না। কিন্তু নোল-মাতাক চক্র মানুষের মনে নিতান্ত কায়িক বাঁচা-মরার প্রশ্নও প্রধান করে তুলেছে। তারই মধ্য দিয়ে সাধারণ মানুষ প্রত্যক্ষ লড়াইয়ে নামছে। আর তারই মধ্য দিয়ে সেদিনের রাজপুত্র আজকে ভবঘুরেতে পরিণত হয়েছেন—হয়তো সাধারণ মানুষের মধ্যে আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে আসতে পারবেন বলে।

আর এইসব চক্র ও চক্রান্তের মধ্য দিয়ে যে যুদ্ধ শুরু 'সে যুদ্ধ শেষ পর্যন্ত এসে হাজির রাজধানী ওয়াশিংটনে। একেবারে হোয়াইট হাউসের সদর দরজায়।" (ঐ পৃষ্ঠা ২১৭)। অর্থাৎ ছাত্র-যুব বিক্ষোভ। খোদ মার্কিন মুল্লুকে প্রেসিডেণ্ট নিকসনের নাকের ডগায়। কেণ্ট্ থেকে উইস্কিন্সন্ পর্যন্ত সর্বত্র বিশ্ববিদ্যালয় দখল এবং টিচ্ ইন্ আন্দোলন। মার্কিন মুল্লুকের ন্যাশনাল গার্ডের সঙ্গে সম্মুখ সমর। ঘণ্টার পর ঘণ্টা লড়াইয়ের পর···সংগ্রামের নেতা অ্যাবি হফ্ম্যান্ প্রেসিডেণ্ট নিকসনের একখানা ছবির দিকে আঙুল দেখিয়ে ঘোষণা করলেন : "মার্কিন দেশ ভিয়েতনামে হারিয়েছে তার মর্যাদাবোধকে। এবারে, কম্বোডিয়ায় হারাবে তার গর্দভকে।" (ঐ পৃষ্ঠা ২১৯)। "মহান মার্কিন দেশের যৌবন যুদ্ধ ঘোষণা করল প্রেসিডেণ্ট নিকসন আর তার সরকারের বিরুদ্ধে। দেশময় বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসগুলিতে জ্বলে উঠল সে যুদ্ধের আগুন।" (ঐ পৃষ্ঠা ২১৮)। পৃথিবীর যুবশক্তিই নড়েচড়ে উঠল সমস্ত ঘটনায়। "সভ্যতার অভিশাপ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের পাপের ঋণ শোধ করতে সমস্ত পৃথিবীর যুবসমাজ এখন মরিয়া।" (ঐ পৃষ্ঠা ২৩৩)

এইসব রক্তে নেশা ধরানো ঘটনার আশ্রয়ে উপন্যাস বেশ জমে। কম্বোডিয়ার ওপরও লেখা হয়েছে। এমনকি বাঙলাদেশের ঘটনাবলিকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই বেশ কিছু রোমাঞ্চ-সিরিজ লেখার প্রয়াস চলছে। এই বাজারে জ্যোতিপ্রকাশ যে সমস্ত গোছগাছ করেও (নাম থেকে নায়ক পর্যন্ত) শেষ তক্ একটা রহস্য-রোমাঞ্চ কাহিনী লেখেননি কিংবা নিজেই নম্পেনের রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াননি তার জন্য ধন্যবাদ। এবং শেষ পর্যন্ত কাহিনী, গল্প, কবিতার মতো শেষ কটি লাইন, সব মিলিয়েও মুক্তিযুদ্ধের মূল বিরোধ, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নষ্টামির কথা ছত্রেছত্রে তুলে ধরতে ভোলেননি। এবং কম্বোডিয়ার মুক্তিযোদ্ধার পক্ষে যেমন সহানুভূতি, মার্কিনী যুদ্ধবাজদের বিরুদ্ধেও তেমনি ঘৃণা জাগাতে চেষ্টার ত্রুটি করেননি। এসব কিছুর জন্যই তাঁর

যে কোনো পাঠকের কাছে অকুণ্ঠ অভিনন্দন প্রাপ্য।

কিন্তু এতসব সত্ত্বেও বইটির কিছু গুরুতর ত্রুটি উল্লেখ না-করে পারা যাবে না। আমি অবশ্য ধরেই নিচ্ছি এ-বই সাধারণ পাঠকের জন্য লেখা। এবং যিনি পড়েই ধরে ফেলতে পারবেন না কোন্ কোন্ "দেশী-বিদেশী পত্র-পত্রিকা কিংবা বই থেকে দু'হাতে সাহায্য" নেওয়া হয়েছে। কারণ যিনি তেমন বুঝতে পারবেন তার কাছে এই বইয়ের ততটুকুই মূল্য যতটুকু জ্যোতিপ্রকাশের গল্প বলার কায়দা। সুতরাং দরিদ্র পাঠক যিনি দেশী-বিদেশী বইপত্র পড়েন না বা পড়লেও সহজে মনে রাখতে পারেন না, তাঁকে একটু সাহায্য করার জন্য বইটিতে কয়েকটি জিনিষ থাকা দরকার ছিল। তার প্রথম নম্বরে একটি ম্যাপ। নিতান্ত শাদা-মাটা সহজেই বোঝা যায় এমন হলেও চলবে। যে-ম্যাপের সাহায্যে কষ্টকর উচ্চারণের জায়গাগুলি সহজেই চেনা যাবে। কমপংচ্যাম আর মেকং ; টন্‌লে স্যাপ আর কার্দামোম সবই তো বেচারি বাঙালির কাছে হিব্রু। দ্বিতীয় নম্বরে একটি চরিত্র চিত্র। অজস্র চরিত্র। আমি রাজনৈতিক চরিত্রের কথাই বলছি। চরিত্রের ভিড়ে যে-কোনো একটা লোক হারিয়ে যেতে পারে। এর মধ্যে মূল রাজনৈতিক চরিত্রগুলিকে বেছে নিয়ে যাঁদের সম্পর্কে বইয়ে যথেষ্ট পরিচয় নেই, একটি পরিচয়লিপি পরিশিষ্টে যুক্ত করতে পারলে ভালো হয়। যেমন ভালো হতো যে-ইতিহাস গল্পের মধ্যে দিয়ে খুঁজে নিতে হচ্ছে তার একটি কালানুপঞ্জী শেষে দিতে পারলে। দুটো কাজই সময় এবং পরিশ্রমসাধ্য। তথাপি পাঠক সাধারণের ভাণ্ডারে বইটি সেক্ষেত্রে মূল্যবান সংযোজন বলে গণ্য হওয়ার যোগ্য হতো।

বইয়ের ঘটনা গতবছরের জুনমাসে থেমে গেছে। প্রকাশকাল তার প্রায় একবছর পর। ইতিমধ্যে মেকং-এর বুকে অনেক জল ঢলেছে। আর মেকং-এর সব জলই যেহেতু কম্বোজের ওপর দিয়েই সাগরে যায়, সাধারণ পাঠকের সুবিধার্থে এই জলে কত রক্ত তা যদি ক্ষুদ্র সংযোজনের আকারেও জানাতে পারতেন. তাহলে 'শেষ হয়ে না হইল শেষ' গোছের মনে হতো না। যদিও এরকম ঘটনার ওপর বই লিখলে এই বিপত্তিটা সবসময়ই থেকে যায়।

পাঠক অবলীলাক্রমে মেকং এর জলে আর দক্ষিণ গিরিচূড়ায় বাতাসে যে ঔদার্যের আহ্বান পাবেন তাতে মন বদলে নিতে পারেন। কারণ মেকং-এর জলে অনেক প্রাণ। রাজপুত্র গেরিলা হয়, দেবতা হয় দানব।

গদ্যপদ্যের আন্দোলনের দলিল

দেবেশ রায়

চল্লিশ সালের পরের বাঙলাসাহিত্যের কথা জানা যাবে, এমন কোনো আলোচনা গ্রন্থ আছে কি-না, অধ্যাপক বন্ধুর এই প্রশ্নের জবাবে নিঃসংশয়ে 'না' বলে বাড়ি ফিরে দেখি সত্য গুহের 'একালের গদ্যপদ্য আন্দোলনের দলিল' বইটি, যেন আমাকে অপ্রস্তুতে ফেলতে, আমারই দেওয়া পেজমার্কটুকুসহ। সত্য গুহের বইয়ের পরিশিষ্টে ৩৫০ জন লেখকের গ্রন্থতালিকার বা তাঁর মূল বইয়ে বিভিন্ন লেখকের অধুনা গরঠিকানি রচনার উদ্ধৃতির সাহায্য এর ভেতরই বারকয়েক আমাকে নিতে হয়েছে। হাতের কাছে এমন প্রসঙ্গসূত্র তৈরি থাকলে সাহায্য নিতেই হবে—অনেকে মিলে যে-কাজ করার কথা ছিল, সত্য গুহ একা, সম্পূর্ণ একা সেই কাজ করে ফেলেছেন, তারজন্য ভেতরে ভেতরে যতোই দগ্ধাই।

চল্লিশপরে কবিতা নিয়ে বেশ কিছু বই বেরিয়েছে, দুটি একটি গবেষণাগ্রন্থ তো বিশ্ববিদ্যালয়ের শিলমোহরও পেয়ে গেছে। সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের 'বাঙলা উপন্যাসের কালান্তর' গ্রন্থে এই সময়ের ঔপন্যাসিকরাও কিছু কিছু আলোচিত। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের ছোটগল্পের ওপর দুটি বইয়ে এই সময়ের ছোটগল্প নিয়ে কিছু কথা আছে। কিন্তু সত্য গুহ গল্প উপন্যাস কবিতা তিনটিকেই নিয়েছেন, তাকে স্থাপন করেছেন সমাজ-ইতিহাসের পরিবেশে, কখনো বা বিশ্লেষণ করেছেন, শুধু চরিত্র রচনা বা কাহিনী বুননই নয়, শব্দ নির্মাণ, শব্দ ধ্বংস, বাক্‌রীতি বা হয়তো নির্বাকরীতিও। বক্তব্যের সমর্থনে প্রাসঙ্গিক রচনা থেকে প্রচুর উদ্ধৃতি দিয়েছেন—এত, যে-সাক্ষ্যের অভাবে মামলা খারিজ করে দেবার হাকিমি মুখ মারা। এ-বইয়ের সিদ্ধান্তসমূহের ভিত্তি রচে যে-রচনাবলি তার অনেকগুলোই তো আমাকে পড়তে হচ্ছে সত্য গুহ আহৃত উদাহরণে, উদ্ধৃতিতে। তাই এমন মুখ মুছে 'না' করি কেমন করে।

সাহিত্যের ইতিহাসে বছরওয়ারি বা দশকওয়ারি হিশেব চলে না, তেমন হিশেব কষতে গেলে ঠিকেতেও গোলমাল, আখেরেও গরমিল। কিন্তু উনিশ শ

একালের গদ্যপদ্য আন্দেলনেয় দলিল, সত্য গুহ। অধুনা। দাম পনের টাকা

চল্লিশ থেকে সত্তর, মাত্র তিরিশ বছর সময় হলেও, বাঙলাসাহিত্যে একটি অতি-নির্দিষ্ট পর্ব—সমান ইতিহাসের সংজ্ঞাতেই। এই পর্বের গোড়া রবীন্দ্রনাথের শেষতম রচনায়, ফ্যাসিবিরোধী যুদ্ধের নতুন শক্তি সমন্বয়ে। এই পর্বের আপাতত আগা পশ্চিম-বাঙলার গণতন্ত্রী ও সমাজবিপ্লবী দলগুলির আত্মহত্যার সমবায়ে, অসংখ্য ছোট ছোট পত্রিকায় সাহিত্যের নানা বিচ্ছিন্ন আয়াসে-প্রয়াসে, সংখ্যায় বাড়তিমুখো পাঠকসমাজের হাতের নাগালে নানা সাপ্তাহিক, মাসিক পত্র, নানা উপন্যাস বা সাংবাদিকরচনায়।

সুতরাং ভবিষ্যতে এই নির্দিষ্ট পর্বের সাহিত্যের খোঁজ খবরের জন্য সত্য গুহের বইটি দরকার হবে—তিনি এমনি একটি কাজ করে বসেছেন।

সত্য গুহ যেভাবে এই পর্বটিকে সাজিয়েছেন তাতে মনে হতে পারে গল্প-কবিতা-উপন্যাসের বিষয়, গঠন, লেখকের সমস্যা, বাস্তবতার সঙ্কট, ইত্যাদির চাইতে তাঁর মনোযোগ সাহিত্য-সংস্কৃতির সংগঠনের দিকে বেশি—কোন্ কোন্ পত্র বা প্রকাশক 'একচেটিয়া' হয়েছে, কারা সেই পত্রে লেখেন বা লেখেন না ইত্যাদি। সাহিত্যের ইতিহাসে এই সাংগঠনিক আলোচনা তখনই আসতে পারে যখন এই সংগঠনের দ্বারা লেখকের লেখার বিষয় প্রভাবিত হচ্ছে। 'একচেটিয়া' পত্র বা প্রকাশক লেখককে হুকুমমাফিক লেখান—এটা তো চলতি কথা মাত্র। সাহিত্যের ইতিহাসে এই কথা তখনই আসতে পারে যখন ঐতিহাসিক প্রমাণ করবেন, গল্প-কবিতা-উপন্যাসের পাঠগত আলোচনা করে প্রমাণ করবেন, কোথায় কোথায় লেখক নিয়ন্ত্রিত। "একচেটিয়া পত্র ও প্রকাশকের" আর ছোট ছোট পত্রিকার—বাঙলাসাহিত্যে এই দুই জাতের লেখক আছেন, সত্য গুহের বইটি পড়বার পর এমন ধারণা করে বসা পাঠককে খুব একটা দোষ দেয়া যাবে না। কিন্তু এ-রকম ধারণা করার সুযোগ রেখে দেওয়া সত্য গুহের পক্ষে ভালো হয়নি।

তেমনি হয়তো ভালো হয়নি এই পর্বকে উনিশ শতকি রেনাসাঁয় স্থিতিকামনা আর পরিবর্তন আগ্রহের বিরোধের ঠিক প্রতিবিম্ব হিশেবে দেখা (৬৪ পৃষ্ঠা)। প্রতিবিম্ব শব্দটাকে বদলে "সমতুল্য", এমন কি "প্রতিতুল্য" ব্যবহার করলেও আপত্তিটা থেকে যায়। এ-ধরনের প্রতিতুলনা অনৈতিহাসিক। সত্য গুহ "এসটাবলিশমেন্ট"কে সুযোগ পেলেই একহাত নিয়েছেন। কিন্তু তিনি নিজেই, নিশ্চয়ই অজ্ঞাতে "এসটাবলিশমেন্টে"র প্যাঁচে পড়ে গেছেন। সাহিত্য-সংস্কৃতি বদলাক, ছড়াক—এটা চাওয়া যে-স্বার্থের পরিপন্থী,—মিছিলে 'কায়েমি',

সত্যবাবুর বইয়ে "এসটাবলিশমেণ্ট" সেই স্বার্থই-সমাজ-সংস্কৃতির ইতিহাসকে অতীত কোনো পর্বের সমতুল্য দেখাতে চান। যেন মাথা খাটিয়ে কাঁধ লাগিয়ে মানুষ বদলে দিতে পারে, ইতিহাস তেমন কমনীয় নয়, যেন নিজেকে ঘোরানো চাকার মতো, জলঘূর্ণির মতো, ইতিহাসের গতি।

এমন প্রতিতুলনার আনুষঙ্গিক বিপদে সত্য গুহ তাই সহজেই পড়েন। উনিশ শতকি, ইয়ং বেঙ্গলদের সঙ্গে তিনি তুলনা করে বসেছেন "তরুণ সাহিত্যিকদের" (৩০ পৃষ্ঠা)। মধুসূদনই তো বোধকরি একমাত্র 'ইয়ং বেঙ্গলি' যিনি সাহিত্যে যুগান্তর এনেছিলেন কিন্তু তখন তো তাঁর কণ্ঠে "তাই মা তোমার দ্বারে এসেছি আবার" এই প্রায়শ্চিত্তের আকাঙ্ক্ষা। আবার বইয়ের দোকান করার পেছনেও তিনি বিদ্যাসাগরের 'হিউম্যানিস্টের কর্মপ্রেরণা' খুঁজে পান (৪৬ পৃষ্ঠা)। কোন্ 'হিউম্যানিজমের' প্রেরণা? যদি রেনার্সাঁরই, "ব্যবসায়ী মনোবৃত্তির" সঙ্গে তো তাহলে বিরোধ বাধবার কথা নয়। ব্যবসা মানেই তো আর বেনিয়াগিরি নয়। বিদ্যাসাগরের ব্যবসায় বুদ্ধি বাঙলার রেনার্সাঁর কয়েকটি মূল্যবান উপাদানের একটি।

বর্তমান সমাজে টাকার অঙ্কে সমস্ত হিশেব-নিকেশে সত্য গুহ এতো চটেছেন যে এমন কথাও তিনি লিখে ফেলেন "ফিউডাল এসটাবলিশমেণ্টের মধ্যে একটা গ্রামীণ-রূপ, সহজ সরলতা এবং উদারতার ব্যাপার ছিলো। অন্যান্য দিকে সামন্ত প্রভুর শোষণের সঙ্গে যেমন কিছুটা দরদও ছিলো, তেমনি সাহিত্যের ব্যাপারেও ছিলো একটা সাধারণ রসবোধ।" (৫১ পৃষ্ঠা)। "কিন্তু আধুনিক এসটাবলিশ-মেণ্টের সে-বালাই নেই। এখানে লেখক পাঠকের সঙ্গে এসটাবলিশমেণ্টের সম্পর্ক কেবলমাত্র ব্যবসায়ীর সম্পর্ক" (৫১ পৃষ্ঠা)। কিন্তু ব্যবসাটা যে সাহিত্য নিয়ে, ব্যবসার প্রয়োজনেই সাহিত্য ছড়িয়ে পড়ছে, সাহিত্যের পাঠক ছড়িয়ে আসছে, লেখক পাঠকের অভিজ্ঞতা বাড়ছে, এটা নিশ্চয়ই সাহিত্যের পক্ষে ভালো। পুরোন শব্দের প্রতি আয়াসহীন আনুগত্য, শব্দগুলির পুরোন গুণের প্রতি শিথিল বাধ্যতা, চরিত্রের চেহারা হাবভাব কাজ-কারবারে পাঠক বা লেখকের অভিজ্ঞতাকে তৃপ্তিকর সম্পূর্ণতাবোধ—এসবই সাহিত্যের পক্ষে খারাপ। বেশি পাঠক, বেশি লেখক, মানেই বেশি বই বিক্রি হওয়া। বেশি বই বিক্রি হওয়াতে সত্য গুহের নিশ্চয়ই আপত্তি নেই। কিন্তু সাহিত্যে মুনাফার বাজার এসে গেলেও সাহিত্যরচনায় যদি পুরোন সঙ্কীর্ণতা ভেঙে না গিয়ে থাকে—তার দোষ সত্য গুহ ব্যবসায়ীর ওপর চাপালে কি ঠিক হবে? বরং

সঙ্কীর্ণতা যে ভাঙছে তাতো সত্য গুহ নিজেই প্রতিপন্ন করেছেন। যে "যৌথ সাহিত্যের" সার্থকতাই প্রধানত তিনি প্রমাণ করেছেন তা কি জাগতে পারত "ফিউডাল এসটাবলিশমেন্টের…সহজ সরলতা এবং উদারতার" এবং "সাধারণ রসবোধের সঙ্কীর্ণতায়"?

অথচ এই সব তিনি নাম দিয়েছেন "যৌথসাহিত্য", সত্য গুহ তার মর্ম অনেক সময়ই উদ্ধার করতে পেরেছেন, তাকে সামাজিক ইতিহাসের অব্যবহিত পরিস্থিতিতে স্থাপনও করেছেন (৬৬-৬৮ পৃষ্ঠা)। শক্তি "প্রসন্নতাপিয়াসী ভিখারী"-র পরিচয়কে অস্বীকার করতে "ভালোবাসা" থেকে "চোয়ালে থাপ্পড়" আর "পোঁদে লাথি মারা"-তে বদলে যান বা সন্দীপন রোজ দাড়ি কামানো, দামি স্যুট পরা মুখসের অনুসঙ্গে বহন করে আনেন "বিস্মৃতির পবিত্রতা"-র কলঙ্ক, মনে করা বিলাস আর "প্রকৃত বিলাসের" বিরোধ অথবা মিছিলের পায়ে পায়ে সিদ্ধেশ্বরের বৈদিক মন্ত্রের আবাহন—তাঁর দৃষ্টি এড়ায়নি। কিন্তু 'দেশকালক্রমের' যে-হেতুবিন্যাস তিনি করেছেন তাতে এই সাহিত্য, সত্য গুহের নামকরণে যা "যৌথসাহিত্য", তার উপযুক্ত পরিবেশ পরিস্থিতিতে সম্পূর্ণ উপস্থাপিত হতে পারেনি।

তার কারণ আমাদের এই পুঁজিপ্রাণ সমাজের ইতিহাসতো বিশেষ পরিবেশে পুঁজিঅর্থনীতির অন্তরঙ্গ, আর সমাজের স্বভাব সঙ্কটকে সত্য গুহ শুধুই সাহিত্যের সঙ্কট মনে করেছেন—যা কখনো কখনো "এসটাবলিশমেন্টের সাহিত্য আর এসটাবলিশমেন্ট-বিরোধী সাহিত্যের বিরোধিতার" সঙ্কটের চেহারা নিয়েও তার কাছে ধরা পড়েছে। সত্য গুহের বইতো 'একালের গল্পপদ্য' নিয়ে। একালের সাহিত্যের অব্যবহিততো রাজামহারাজা জমিদারদের সভা নয়—তাই মনে হয় সামন্ত পৃষ্ঠপোষণ আর সাম্প্রতিক প্রতিষ্ঠানের তুলনামূলক আলোচনাটা বাদ দেয়া যেত। প্রথম চারটি পরিচ্ছেদ (দেশকালক্রম : ১, দেশকালক্রম : ২, বিশ্বভারতী, দিকদর্শন) খুব পরিষ্কারভাবে উৎপাদনের সঙ্কট, সমাজের সঙ্কট, সাহিত্যের সঙ্কট—এই তিনভাগে সাজানো হলে তার যুক্তি-পরম্পরা সহজবোধ্য হতো ও পরবর্তী আলোচনার শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণ করতে পারত। চার পরিচ্ছেদ জুড়েই তিনি এই সঙ্কটকাল নিয়ে আলোচনা করেছেন, কিন্তু বড় হাতড়ে বেড়াতে হয়। হাতড়ে বেড়ানোটা খুব শ্রমসাধ্য মনে হয় বলে আপত্তি করছি না। আসলেতো এই চার পরিচ্ছেদ পরবর্তী পাঁচ পরিচ্ছেদের "পটভূমি", বা, আমার কাছে "বুনিয়াদ" পদটি যোগ্যতর ঠেকে। পটভূমি-ই

হোক আর বুনিয়াদই হোক্, হয় চোখের সামনে টানটান মেলা, নয়, পায়ের নিচে খটখটে শক্ত থাকবে। সত্য গুহের প্রস্তাবিত তত্ত্বের সংগঠনের জন্যই প্রথম চার পরিচ্ছেদের বিন্যাস বদলানো দরকার।

ইতিহাসের ব্যাপারটাতেই সত্য গুহকে একটু সতর্ক হতে হবে। বাঙলা রেনেসাঁসের সঙ্গে সাম্প্রতিক সাহিত্য আন্দোলনের তুলনার কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। এমনি আরো কয়েকটি তথ্য বা ভঙ্গি নির্দেশ করা যায়। (১) ১০০ পৃষ্ঠায় বলা হচ্ছে "রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর দিন থেকে স্বাধীনতা লাভের দিনটি পর্যন্ত···সময়টুকুতে বাঙলাসাহিত্যের বন্ধ্যা সময় বললেই চলে।" এতোদিন তো জেনে বসে আছি বাঙলা কথা ও কাব্যসংসারে এর চাইতে ফলপ্রসূ সময় আর আসেনি। যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ আর জাতীয়-আন্দোলনের চূড়ান্ত স্তরে দেশবাসীর আকাঙ্ক্ষা ও কর্মের গৌরবময় ঔদ্ধত্য আর নেতাদের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব-সঙ্কীর্ণতার সংঘাত —সাহিত্যের এক মহৎ সন্ধিকাল উপস্থিত করেছিল। (২) ১০৪ পৃষ্ঠায় "দেশের বৃহত্তর অংশের" মানুষের জীবনযাত্রা যে পাল্টায়নি তা বোঝাতে ছউ নাচ ঢপকীর্তন, কাঠবাসি সঙ্গম, আকাশবাণীর বিবিধ ভারতী ও মহাজনের গোলার উল্লেখ করেছেন। শেষের তিনটি বিষয় যে গোটা জীবনযাত্রার ধরনটাকেই গুণগত পালটে দেয়। তারপর "দেশের বৃহত্তর অংশের" উৎপাদনের ক্রেতা এখন মহাজন-ই নয়,—ফুড কর্পোরেশন অফ ইণ্ডিয়াও। আর এই অনড়-অচল কিছু বোঝাতে গেলেই "ছেলেপুলে বিয়োচ্ছে" কথাটা যেন দিতেই হবে। যেন ছেলেপুলে বিয়োনোটা খুবই একঘেয়ে, থেকে থেকেই ঘটে যাওয়ার ব্যাপার। গ্রাম, সমাজ, মানুষ সম্পর্কে অচলতার এই বাঁধা প্রতীক, আমরা ভুলে যাই—ভুলে থাকি, "এসটাবলিশমেণ্ট"-ই আমাদের হাতে তুলে দেয়। এখন হাটের মুদির দোকানে নিরোধ বিক্রি হয়, হেলথ সেণ্টারে গ্রামের মেয়েরা পরামর্শ নিতে আসেন। বেশি ফলনের ধানের বীজের জন্য চাষির লোভ, ভাবনা, খাটনি আছে। আর কিছু করার নেই বলেই ছেলেপুলে বিয়োচ্ছে—ব্যাপারটা তেমন নয় নিশ্চয়ই। কিন্তু প্রচলিত ধারণাকে আঁকড়ে থেকে সত্য গুহ বলে বসেন "হাজারকরা ন'শো নিরানব্বই জনের কোনো উন্নতি হয়নি—বঙ্কিমচন্দ্রের একশো বছর বাদেও হয়নি।" তাহলে গত একশ বছরের উৎপাদনের ইতিহাসটা কি? কোনো কোনো বামপন্থী রাজনীতি যেমন সাম্রাজ্যচালানো বিদেশি মালিকদের সঙ্গে বড় বড় কলকারখানা চালানো দেশি মালিকদের বা পরশাসন আর স্বশাসন বা নির্বাচন বা একনায়কতায় কোনো

ফারাক পায় না, সত্য গুহ কি সেরকম কোনো সরল ইতিহাসের শরণ নিচ্ছেন ?

সামাজিক ইতিহাসের এই সরলীকরণের ঝোঁক সত্য গুহ সাহিত্যের ইতিহাসেও, সর্বত্র, বিশেষত ২১২ পৃষ্ঠার আগে, সাম্প্রতিক গদ্যপদ্যের আলোচনার আগে পর্যন্ত, ছাড়তে পারেননি। 'সবুজপত্র' নামধেয় ৩৪ পৃষ্ঠার একটি পরিচ্ছেদে পরপর তিনি অবনীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী, শরৎচন্দ্র, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বুদ্ধদেব বসু, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, গোপাল হালদার, অন্নদাশঙ্কর রায়, প্রমথনাথ বিশী, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, প্রগতি লেখক-শিল্পী সঙ্ঘ, মনোজ বসু, সুবোধ ঘোষ, নবেন্দু ঘোষ, সন্তোষকুমার ঘোষ, সমরেশ বসু, বিমল কর, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, অমরেন্দ্র ঘোষ, অমিয়ভূষণ মজুমদার, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, অসীম রায়, শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, কমলকুমার মজুমদার —এই ২৮টি বিষয় নিয়ে আলোচনা সেরে ফেলেছেন। আবার এর পরবর্তী পরিচ্ছেদ 'কবিতা'-য় তিনি ৪৭ পৃষ্ঠার ভেতর শেষপর্বের রবীন্দ্রনাথ থেকে বুদ্ধদেব বসু, জীবনানন্দ দাশ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, সমর সেন, বিষ্ণু দে, কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, মণীন্দ্র রায়, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, নজরুল ইসলাম, অজিত দত্ত, অমিয় চক্রবর্তী, অন্নদাশঙ্কর রায়, অরুণ মিত্র, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, সুকান্ত ভট্টাচার্য, জগন্নাথ চক্রবর্তী, রাম বসু, মণীশ ঘটক, বিমলচন্দ্র ঘোষ, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সতীন্দ্রনাথ মৈত্র, ধনঞ্জয় দাশ, নীরেন্দ্র চক্রবর্তী, নরেশ গুহ—এই ২৮টি প্রসঙ্গ নিয়ে তাঁর কথাগুলি বলে ফেলেছেন। সাহিত্যের ইতিহাস রচনার নিশ্চয়ই নানা পদ্ধতি থাকতে পারে। কে কবে কী লিখেছেন তার বিস্তারিত বিবরণও একটা পদ্ধতি—খুব দরকারিও বটে। সামাজিক ইতিহাসের পটভূমিও আর একটি পদ্ধতি—এটাও খুব জরুরি। রচনার পাঠগত আলোচনা—অন্যতম পদ্ধতি—নিশ্চয়ই উপকারীও। ঐতিহাসিককে ঠিক করে নিতে হবে তাঁর পদ্ধতি কোনটি। সত্য গুহ প্রথম পাঁচ পরিচ্ছেদে দ্বিতীয় পদ্ধতি, তারপরের দুটি পরিচ্ছেদে প্রথম পদ্ধতি আর শেষের চার পরিচ্ছেদে প্রথম আর তৃতীয় পদ্ধতির মিশ্রণ ব্যবহার করেছেন। তার ফলে তাঁর বইটিতে একটি পদ্ধতিগত অভাব ঘটে গেছে। অথচ স্বতন্ত্র দেখলে পরিষ্কার তিনটি পদ্ধতিতেই তাঁর অধিকার প্রায় বিশেষজ্ঞের।

আসলে হয়তো, সত্য গুহ যার নামকরণ করেছেন "যৌথসাহিত্য" বা কোথাও "এস্টাবলিশমেণ্ট বিরোধী সাহিত্য", কেউ কেউ হয়তো তরুণ বা

তরুণতর বলে যে-সাহিত্যকে নির্দেশ করতে চান, সময়ের হিশেবে আরো নির্দিষ্ট হতে গেলে, ৫৫ সালের পর রচিত সেই সাহিত্যে সত্য গুহের টানটা একটু বেশি বলেই, তিনি অন্যান্য 'পর্বের' আলোচনা একটু সংক্ষেপে সেরেছেন, তাড়াহুড়োয় পড়েছেন। ফলে হয়তো গত পনর-বিশ বছরের সাহিত্যের আলোচনাও অনেকক্ষেত্রে বাধ্যত সঙ্কুচিত হয়ে পড়েছে।

কিন্তু সত্য গুহের নজর, এই সময়ের সাহিত্যে, খুব তীক্ষ্ণ। ৯৭ ও ৯৮ পৃষ্ঠায় সত্য গুহ এই সময়ের সাহিত্যের কিছু লক্ষণ নির্দেশ করার চেষ্টা করেছেন। কী ধরনের শব্দ ব্যবহার করেন, গল্প-উপন্যাসিক ও কবিগণ তার একটা তালিকা দিয়েও তিনি আমাদের সাবধান করে দিয়েছেন "এই সব বাহ্য লক্ষণ দিয়ে স্বাধীনতা-পূর্ব সময়ের সাহিত্য বিচার যতটা সহজ স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ের লেখালেখির আধুনিকত্ব প্রমাণ ততোটা সহজ নয়।...এ-সময়ের সাহিত্য আধুনিক হয়েছে লেখকের বিশিষ্ট অ্যাটিচিউডের জন্য।" তাহলে এমন কিছু 'বিশিষ্ট' উপগতি আছে যার ফলে আধুনিক হওয়া যায়। সত্য গুহের বইটি পড়ে এইটি আমার কাছে পরিষ্কার হয়নি। গত পনর-বিশ বছরের সাহিত্যিকদের কাছে কোন বাস্তবকে ভাষা দেয়ার দায়িত্ব ছিল, তাঁদের চেষ্টায় সেই বাস্তবের প্রতি কোন 'বিশিষ্ট' উপগতি তাঁরা গ্রহণ করেছেন, তার প্রতিফলন ভাষায় রচনায় কীভাবে ঘটেছে—এই তিনটি প্রশ্নের উত্তর মেলে এমন একটি সাধারণ আলোচনার দরকার ছিল। সত্য গুহের বইটিতে এ-বিষয়ে আলোচনা আছে, অনেকখানিই আছে। কিন্তু সেটা হয় বিশেষ-বিশেষ সাহিত্যিকের রচনা-বিশ্লেষণে অথবা কিছুটা সাধারণ আলোচনায়। —যেমন ৯৮ পৃষ্ঠার প্রথম অনুচ্ছেদ।—এ-ধরনের বর্ণনায় আমাদের আশা মেটে না। বরং, তর্ক করার ঝোঁকে বলা যায় "অসহায়তা ও বিপন্নতার বেদনাবহ প্রকাশ"-এ তো সব পর্বের সাহিত্যিকেরই কাজ। অথচ এটাই কিন্তু সত্য গুহের কাছে আমরা সবচেয়ে বেশি চাইছি।

সত্য গুহের মতো উদ্যোগী সাহিত্যিক ঐতিহাসিক নানা তথ্যের সমাবেশে সঠিক জবাবটি আমাদের যোগাবেন—এই ভরসা রাখি বলেই বলছি স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ের সামাজিক বিন্যাসের পরিবর্তনের প্রধান লক্ষণ ও তার সাহিত্যিক প্রতিক্রিয়া—এই বিষয়টির একটি সূত্র চাই।

চাই। কারণ, এই বই পড়ে আশা জন্মায় সত্য গুহ উত্তরটি বের করার ও আমাদের জানাবার ক্ষমতা ধরেন। "ফসল" শীর্ষক পরিচ্ছেদে সত্য গুহকে

অনেকটা আলোচনা করতে হয় শ্লীলতা বা বিদেশি প্রভাব সম্পর্কে। কিন্তু সে আলোচনা, বিচ্ছিন্নতায় মূল্যবান হলেও, সামগ্রিকতার কাঠামো পায় না উত্থাপিত প্রশ্নটির উত্তরের অভাবে। ২৪৩ থেকে ২৫১ পাতা সত্য গুহ শ্রদ্ধেয় মেহনতে লুপ্ত, অর্ধলুপ্ত বা প্রায় অজ্ঞাত পত্র থেকে অধিকাংশেরই অজ্ঞাত নানা রচনার উদ্ধৃতি সহযোগে 'বিবর' উপন্যাসটির মৌলিকতা, নূতনতা, বাঙলা কথা-সাহিত্যে নতুন সূচনার দাবি কচুকাটা করতে চেয়েছেন। প্রসঙ্গত বুদ্ধদেব বসুও এসেছেন। এ-আলোচনার একটা বিশেষ মূল্য নিশ্চয়ই থাকতে পারে—কিন্তু সামগ্রিকতার কাঠামোতে সংলগ্ন নয় বলে-ই কারো এমন ঠাট্টা করতে ইচ্ছে হতে পারে, সত্য গুহ উদ্ধৃত রচনাবলি যদি জীবনঅন্বেষণ হয় তাহলে বিবর উপন্যাসটির ওপর তাঁর এতো রাগ কেন? পূজো সংখ্যায় বেরিয়েছিল বলে? তাই চাইছিলাম—স্বাধীনতাপর সময়ের সামাজিক বিন্যাসের পরিবর্তনের প্রধান লক্ষণ ও তার সাহিত্যিক প্রতিক্রিয়া,—এই বিষয়টির একটি সূত্র।

ব্যাপারটা তো এই নয় যে কখনো স্বগতোক্তি কখনো ভাবনাচিন্তায় ('চেতনাস্রোত' বলতে বোধহয় উপন্যাসের ফর্মের ইতিহাসে, আর কিছু বোঝায়,) কিছু খিস্তি বলিয়ে ভাবিয়ে, একটা দৈহিক মিলনের বর্ণনা সেরে একজনকে দিয়ে অপরকে খুন করিয়ে বা খুন ভাবিয়ে দিলেই—"নতুন রীতি" বা "এস্টাবলিশমেণ্ট বিরোধী যৌথ সাহিত্য" বা "ল্যাণ্ডমার্ক" হয়ে যায়। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর বাঙলা ভাষায় সাহিত্যিকেরা নতুন সমাজবিন্যাসকে ধরতে পারছিলেন না—না কবিতায়, না গল্পে। সন তারিখ দেখলে বোধহয় মিলে যাবে ১৯৪৯ থেকে প্রায় বছর পাঁচ-ছয় বাঙলাসাহিত্যের পুরোন কবি ও কথা-সাহিত্যিকরা লেখা কমিয়ে দিয়েছিলেন অবিশ্বাস্যরকম, অনেকে সেই যে লেখা ছেড়ে চলে গিয়েছেন আর ফেরেননি। স্বাধীনতা নতুনতর উদ্দীপনায় আমাদের আলোকিত করে তুলতে পারল না। অথচ স্বাধীনতার জন্য শেষ পাঁচ-সাত বছরের উত্তাল আন্দোলিত রক্তে তো তখনো জোয়ার, অথচ দেশ ভাগ হয়ে যাওয়ার সত্যের নির্মম কাঠিন্যের অভিজ্ঞতা, অথচ পাঁচসালা পরিকল্পনার খঞ্জ গতিতে পুঁজির অভিযান তখনো শুরু হয়নি, অথচ অবস্থার ব্যাখ্যার সূত্র যাদের হাতে অমোঘ, সেই কমিউনিস্টরা তখন 'ইয়ে আজাদি ঝুটা হায়' শ্লোগান তুলে প্রেসিডেন্সি আর আলিপুর জেলের দেয়ালের ভেতর দেয়ালের ভেতর দেয়ালের ভেতর সম্মুখযুদ্ধ শুরু করে নিজেদের কুরে কুরে খাচ্ছে। গুণগত এমন নতুন অবস্থা এসে পড়ল যে সাহিত্যিকরা তাঁদের অভ্যস্ত ভাবনাচিন্তা নির্মিতি কৌশল

দিয়ে ধরতে পারছিলেন না যেন। পরাধীনতার শেষতম মুহূর্তে যিনি 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা'কে নসুবালার নাচগানের লোকায়ত আঙ্গিকে রেল-ইষ্টিশানের নতুনতম ইতিহাসে এনে মেলালেন, তিনি পরের উপন্যাসেই, স্বাধীনতার পরে বোধহয় প্রথম উপন্যাসেই মৃত্যুতত্ত্বের ভারতীয়তায় চোখ-কান ডোবালেন। তারাশঙ্কর পরাধীনকালে শেষ লিখেছেন 'হাঁসুলীবাঁকের উপকথা' আর স্বাধীন-কালে প্রথম লিখেছেন 'আরোগ্যনিকেতন'—সাহিত্যিকের দ্বন্দ্বের আর কোনো প্রমাণের বোধহয় দরকার নেই।

এ-অবস্থার পরিত্রাণ ছিল একটি মাত্র পথে—যদি কোনোরকমে নতুন কোনো অভিঘাত সৃষ্টি করা যায়। কথাসাহিত্যে সতীনাথ ভাদুড়ী, অসীম রায় আর সমরেশ বসু তিনজনই স্বাধীনতার পরের লেখক। কোনো অভ্যাস তাঁদের তখনো বেঁধে দেয়নি। কোনো লেখক-অভিজ্ঞতাও তাঁদের গতিবিধিকে তখনো জড় করেনি। তিরিশ সালের আন্দোলন আর দুনিয়া বিস্তৃত পুঁজির বাজারের মন্দার অভিঘাত, ভারতবর্ষের সমাজবিন্যাস থেকে বাঙলাসাহিত্যের মানসক্ষেত্রে সম্প্রসারণে, শুধু কথাসাহিত্যেই, (ক) তারাশঙ্করের সরল অথচ সুবিস্তৃত গ্রামের পুরাণ-আশ্রিত ইতিহাসে, (খ) বিভূতিভূষণের আঞ্চলিকতা উত্তরিত মানব-আশ্রিত প্রাকৃতিকতায়, (গ) অঞ্চল আর স্বভাবে বাঁধা মানুষের ওপর মানিকের অভিমানী অবিশ্বাসের অস্তিতত্ত্বে, (ঘ) ধূর্জটিপ্রসাদ গোপাল হালদারের কর্ষিত চেতনার দার্শনিকতায় আমরা অভিজ্ঞ হয়ে পড়ি মাত্র বারো থেকে পনর বছরে। স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে এঁরা কথাসাহিত্যের রূপে ধরতে পারছিলেন না সেই দ্রুতগামী ধ্বস্ত সময়কে বরং অভিজ্ঞতা আর স্বঅর্জিত ঐতিহ্যে টানই ধরেছিল বোধহয়। অথচ সতীনাথ ভাদুড়ী কেমন অনায়াসে যেন জয় করে নিলেন আমাদের এক 'জাগরী'তে'ই,—'জাগরী' কী একটা স্বস্তি এনে দিয়েছিল বোধহয় প্রথম পাঠকদের স্মৃতিতে তা আজও অম্লান। কিন্তু বিশ্লেষণে হয়তো দেখা দিতে পারে উপন্যাসে ইতিহাস, চেতনার কর্ষণ আর প্রাকৃতিকতার রিক্‌থকে দুহাতে গ্রহণে নির্দ্বিধ ছিলেন সতীনাথ। তেমনি হয়তো অসীম রায়কে অন্বিত করা যায় (ঘ) ধারার সঙ্গে।

সমরেশ বসুর ব্যাপারটি একটু জটিল। ছোটগল্পে তেতাল্লিশ-পঁয়তাল্লিশের যুদ্ধ-দুর্ভিক্ষে বাঙলাসাহিত্যে ছোটগল্পের তীব্রতম সময়টির সঙ্গে তিনি হয়তো যোগসূত্রে ছিলেন কিন্তু অভিজ্ঞতায় নতুনতর হয়ে উঠেছিল শহরতলির শিল্প এলাকার আধাশ্রমিক নিম্নমধ্যবিত্ত।

সাহিত্যের ইতিহাসে এ-ব্যাপার হামেশা—তাঁর ঐতিহাসিক পর্বের শেষে সেই ধারার লেখকের নতুন পর্বে প্রয়োগযোগ্য নতুনত্ব, মৌলিকতা, উপগতি বা কুশলতা নতুন লেখক নিয়ে নিলেন।

বাঙলা কথাসাহিত্যে সতীনাথ ভাদুড়ী, সমরেশ বসু ও অসীম রায় স্বাধীনতার পরে নতুন পর্বের নতুন লেখক। শেষ দুজন এখনো সক্রিয়। তাঁদের রচনাতে এই সময় সম্পর্কে নানা প্রতিক্রিয়া তো ঘটবেই। সমরেশ বসুর লেখার সঙ্গে যদি সত্য গুহের "যৌথ সাহিত্যিকদের" মিল খুঁজে পাওয়া যায় তাতে কি প্রমাণ হয় না যে সমরেশ বসু এখনো এই সময়টাকেই ধরতে চাইছেন। তাঁর উপন্যাস বেশি বিক্রি বা খুব চালু কাগজে ধারাবাহিক—এতে তো তাঁর অন্বেষণটা মিথ্যে হয়ে যায় না। প্রচলিত ধরন থেকে সম্পূর্ণ আলাদা হলেও অসীম রায়ের জায়গা যেমন স্বাধীনতা-পরবর্তীকালেই সুনির্দিষ্ট। ইতিহাসের এই বিন্যাসে সত্য গুহের "যৌথ সাহিত্যিকদের"-ও স্থান কোথাও বোধহয় আছে।

প্রথম পাঁচশালা পরিকল্পনার মাঝামাঝি দেশের ভেতরের অর্থনীতির গূঢ় গতিও ধরা পড়ে যায় আর গ্রাম থেকে শহরের বাঙালি জীবনের সমাজবিন্যাস বদলে যায় অবধারিত। গ্রামে কলেজ শিক্ষার আগ্রহ, কৃষিপণ্য মজুতদারি আর সমবায় সমিতির টাউটগিরির লোভ একসঙ্গেই জেগে যায়। দেখতে দেখতে হিন্দু কোডবিলে ধর্ম থেকে আইনে বদলে যায় বিবাহের বন্ধন। কোরিয়ার যুদ্ধের অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে ভারতের নিরপেক্ষতার বিশ্বনীতি চীনদেশের সঙ্গে বন্ধুতার সূত্রে এশিয়া-আফ্রিকার নতুন নীতির তাৎপর্য পেয়ে যায়। ইস্পাত কারখানার বিশালতা কন্ট্রাকটারি-লাইসেন্স বিক্রির টাউটারি আর নগদা লাভের ভোগ্যপণ্যে দেশি পুঁজির বাজিমাৎ—চেতনা জগতের অভ্যস্ত ন্যায়কে (লজিককে) বিপর্যস্ত করে দেয়। সমাজতাত্ত্বিকতার ভাষায় বলা যায় যে-পর্বে ইতিহাসের চাবিকাঠি সমাজতন্ত্রের হাতে চিরতরে চলে গেছে, এখন সাবেকি পুঁজিবিকাশের চেষ্টায় সামাজিক চৈতন্যের বিশৃঙ্খলা দেখতে দেখতে সাহিত্যের প্রতিক্রিয়ায় বোধহয় ১৯৫৬-৫৭ থেকে বাঙলা কথাসাহিত্যের আধুনিকতার নানা প্রকাশে পৌঁছে যায়, যে-প্রকাশকে কেউ বলেন "নতুন রীতি", কেউ বলেন "যৌথ সাহিত্য", কেউ হয়তো দশকের হিশেব দেন,—কিন্তু আধুনিকতার আন্দোলন বলাই বোধহয় শ্রেয়।

সামাজিক চৈতন্যের বিশৃঙ্খলার অভিঘাতে এই সময়ের লেখকগণ বাঙলা গল্প-উপন্যাসে কতকগুলি নতুন ব্যবহারযোগ্য উপকরণ এনে ফেলেছিলেন।

সে-উপকরণগুলির তালিকা সত্য গুহ দিয়েছেন। এই উপকরণগুলির একটি ঐতিহাসিকতা ছিল বলেই দেখতে-না-দেখতে, সেই বয়স্ক লেখকগণও, যাঁরা সময়ের পরিবর্তনকে স্ব স্ব বিবেচনায় হয়তো বুঝতে পারছিলেন কিন্তু অভ্যাসের জড়তায় হয়তো ভাঙতে পারছিলেন না নির্মিতির প্রাচীন দেয়াল বা গল্প বলার প্রতিশ্রুতি বা গড়নের প্রাচীন কাঠামো বা বাক্যের গড়ন বা শব্দের ব্যবহার বা গড়ন বা সাহিত্যের নানারূপের ভেতরকার পার্থক্যের কৃত্রিমতা—তাঁরাও এই আধুনিকতার আন্দোলনের উপার্জনকে নিজেদের রচনায় স্বীকার করে নেন। এঁদের পুরনো রচনার সঙ্গে ৫৬-৫৭ সালের পরবর্তী লেখার তুলনা করলেই তা দেখা যাবে স্পষ্ট—যা নিয়ে কোনো তর্কেরও অবকাশ নেই।

প্রতিষ্ঠিত সমাজরীতির প্রচলিত শিল্পরূপ আর ব্যক্তির অভিজ্ঞতার সচেতন নূতনতা—এই দুইয়ের ভেতর, অভিজ্ঞতার নূতনতা ৫৫-৫৬সালের বাঙলা গল্পের আধুনিকতার আন্দোলনের লেখকগণকে প্রণোদিত করেছিল শিল্পটির প্রচলিত রূপকে ভেঙে দিতে। কিন্তু প্রতিষ্ঠিত সমাজরীতির প্রচলিত শিল্পরূপের লেখকরা ব্যক্তি-অভিজ্ঞতায় সচেতন নূতনতাকে পাননি। তাই তাঁদের হাতে ভাষার কারিগরি, গল্প-উপন্যাসের কায়দা-কানুনই—নিজস্ব একটা উদ্দেশ্য হয়ে বসে। অপরদিকে প্রচলিত ব্যবস্থার প্রতিবাদে মুখর কমলকুমার মজুমদার প্রচলিত ভাষাবিন্যাস থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন রাগে, ঘৃণায়, আপাত-বিষয়ও বাছেন যেন সতীদাহ বা গঙ্গাযাত্রার মতো সাবেকি কিন্তু এই আধেয় এক পরোক্ষ তৎপরতায় আমাদের এই সময়তেই আকার দেয় বা দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'নরকের প্রহরী' বা 'জটায়ু'র মতো গল্পে লোকায়তজীবন আর পরিবর্তমান সামাজিক অভিজ্ঞতাকে নতুন ভাষাবিন্যাসে আশ্রয় দেন বিশ্বনন্দনের যোগ্য বা সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় কী অমোঘ ভেঙে যান বাক্যের গিঁট—যা হয়তো বাঙলা বাক্যবন্ধের ইতিহাস পালটে দিচ্ছে। তবু এতো কম, এতো কম এঁদের রচনা যে বাঙলা কথাসাহিত্যের আধুনিকতার আন্দোলন বলতে প্রাধান্য পেয়ে যায় এঁদের রচনা নয়, এঁদের অনুসরণে ভাষার বা গড়নের কারিগরি, যা চতুর কৌশল মাত্র। সুতরাং দোষটা সমরেশ বসু-র নয় যে তিনি বাঙলা গল্পের আহৃত উপকরণ-গুলিকে কাজে লাগিয়েছেন। দোষটা বাঙলা কথাসাহিত্যের আধুনিকতার লেখকদের ব্যক্তি-অভিজ্ঞতায় সচেতন নূতনতা কেন তৈরি করছে না সত্যি-কারের আধুনিক গল্প-উপন্যাস। নাকি দূরতাৎপর্যে গভীর, অধ্যবসায়ী প্রয়াসে আমাদের জাতীয় অনীহায় এঁরাও আক্রান্ত অবশ ?

সত্য গুহ এই ঐতিহাসিক পরিস্থিতির বিশ্লেষণে আমাদের আরো উপকার করবেন—এই ভরসাতেই এ-সব বলা। কারণ এই ৬০৮ পাতার বইটি লিখে তিনি প্রমাণ করে ফেলেছেন ঐতিহাসিক শক্তির বিকাশকে তিনি চিহ্নিত করতে পারেন। শুধু এটুকুর জন্যই যে-কোনো সমালোচকের কৃতি পরবর্তীকালে নন্দিত হয়। আমার সৌভাগ্য যে আমি তারকালের পাঠক হিশাবেই তাঁকে শুধোতে পারছি আমাদের আরো কী কী জানার আছে। উত্তরের ভরসা যাঁর কাছে আছে, তাঁকেই তো মানুষ প্রশ্ন করে।

সবশেষে, একটি কথা অবশ্যই উল্লেখ করা দরকার, প্রকাশসংস্থা হিশেবে 'অধুনা'—একটি আদর্শ স্থাপন করলেন, নতুন গবেষক ও নতুন গবেষণাকে নিজেদের বিষয় হিশেবে গ্রহণ করে।

কবিতা, সংস্কার ও পুনর্বিবেচনা

অমিতাভ দাশগুপ্ত

নিছক মিথ হয়ে থাকা একজন কবির পক্ষে সুখকর নয়। তিরিশোত্তর বা চল্লিশ ছুঁই-ছুঁই কবিদের মুখে যখন স্মৃতিকণ্ডুয়নের মতো ঘোরে পঞ্চাশোর্ধ বয়সের কোনো কোনো নাম এবং অপঠিত, বিস্মৃতপ্রায়, কদাচ উচ্চারিত সেই নাম যখন হঠাৎ শুনে ফেলেন নতুন প্রজন্মের পাঠক ও কবি, তখন বস্তুত তাঁরা উপহার পান একটি শূন্য শিশি, যাতে আতর নেই, আতরের ক্ষীণ গন্ধ আছে। এক কথায়, এই হলো কবিতার দুর্মর কিংবদন্তী।

কঠোরতর আরও কিছু আছে। ঠোঁটের প্রান্ত সবুজ হয়ে আসার প্রথম বয়সে অনেকের লেখা বেহিসেবি, আবেগউষ্ণ মনকে বেশ খানিকটা টেনে ধরত। বয়স বাড়ার পর কখনো সেই এককালীন বহুপ্রশংসিত লেখাগুলিই হাতে এসেছে। এবং যেভাবে ষোল বছরে দেখা দেবদাস ফিলম ও পঁয়ত্রিশ বছরে পুনরায় হঠাৎ দেখে ফেলা ঐ একই ছবির মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাৎ ঘটে গেছে, উক্ত রচনাগুলির পুনর্বিবেচনায় সেই একই পরিণাম অর্শেছে। তাই ভয় ছিল। দুজন প্রায় কিংবদন্তী ও বর্তমান তরুণদের কাছে প্রায় অপঠিত কবির কোন দৈববলে এতকাল বাদে প্রকাশিত দু'খানি কাব্যগ্রন্থ হাতে নিয়ে। আমাদের এক সময়ের দুজন অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য কবি আর কতোখানি নির্ভর করার মতো কবিতা এতদিন বাদে উপহার দিতে পারবেন, ভেবে।

যে অরুণ মিত্র একদিন আমাদের পাঠক-মনের 'ঘনিষ্ঠ তাপ'-এ জড়িয়ে ছিলেন। তাঁরই হৈমন্তিক অনুভূতির কাব্য 'মঞ্চের বাইরে মাটিতে'। বছর দুয়েক আগে ঢাকুরিয়া ব্রিজের পাশে একটি বাড়িতে এলাহাবাদবাসী এই প্রবীণ কবির সঙ্গে হঠাৎ সাক্ষাৎ হয়েছিল হাস্য ও ঘরোয়া পরিবেশে একটি কবিতা-পাঠের আসরে। শীর্ণ শরীরটিকে একটু সামনের দিয়ে ঝুঁকিয়ে নম্র অথচ দৃঢ়কণ্ঠে তিনি তাঁর অনেকগুলি নতুন কবিতা শুনিয়েছিলেন। বেশ

মঞ্চের বাইরে মাটিতে। অরুণ মিত্র। সারস্বত লাইব্রেরী, কলকাতা ৬। চার টাকা পঞ্চাশ পয়সা

বৈরী মন। মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়। সারস্বত লাইব্রেরী, কলকাতা ৬। চার টাকা পঞ্চাশ পয়সা

খানিকটা নতুন স্বাদের ও গন্ধের ছোট ছোট, রীতিমত মাপা, অপরিচিত ঢঙের কবিতা। অমন ধরনের লেখা পড়া বা শোনার অভিজ্ঞতা সংস্কারে নেই বলে অল্পবিস্তর অস্বস্তি হচ্ছিল, আবার, একটা চ্যালেঞ্জেরও সম্মুখীন হওয়ার মতো মৃদু, চাপা উত্তেজনাও বোধ করছিলাম ভিতরে ভিতরে। বর্তমান গ্রন্থটি পাঠ করার পর সেই উত্তেজনা আবার উপলব্ধিতে রীতিমতো চারিয়ে গেল।

প্রথমেই আমি ঠিক করে নিয়েছি, আলোচনার ক্ষেত্রে একজন বয়স্ক কবির পূর্বাপর রচনা বিচার করার যে প্রচলিত রীতি আছে, তা' গ্রহণ না করে নিছক এখন তাঁর অনুভবের চেহারা কী, সেটাকেই সাধ্যমতো দেখার ও দেখানোর চেষ্টা করব। কারণ নতুন অরুণ মিত্রকেই নতুন পাঠকরা বিবেচনা করবেন। তাছাড়া এখানেই হয়তো আছে কবির বিবর্তনের অদৃশ্য সিঁড়িগুলো, আছে সেই সংবরণীয় দ্যুতি, যা প্রবীণতার কোলাজের ভেতর থেকে চাপা আভায় উলকে ওঠে। থাকে প্রৌঢ়তার কোরকের মধ্যে বসন্ত-বয়সের ডাক, "এক কণ্ঠস্বরের আলো / এই উঠোন থেকে সরু পথ ধ'রে / আমাকে বহুদূরের বিস্তারে নিয়ে গিয়েছিল" এবং একই সঙ্গে পরিণাম, "লোকজন সওদা নামিয়ে সরে গেছে, / নানান বেসাতি এখানে ছায়া হ'য়ে প'ড়ে রইল / আমি চললাম মোহনায়।"

অরুণ মিত্র কবি-চরিত্রে বরাবর অভিজাত। তার অর্থ এই নয় যে মানুষের প্রাণধারণের নিয়ত প্রয়াস তাঁর বিষয় বহির্ভূত। জীবনের কঠিন চাপে অস্তিত্ব যে বিচিত্র বক্রতা পায় তাকে স্ফুট করে তোলা তাঁর সাধের ও অনেকটাই সাধ্যের মধ্যে। কিন্তু জীবন ও ঘটনা-সম্ভারের ভেতর দিয়ে তাঁর যাত্রা শকটে, পায়ে পায়ে নয়। ফলে উচ্চকিত সরাসরি ও দৃশ্যত প্রত্যক্ষ নয় তাঁর কবিতা। বাস্তব তাঁর কবিতায় স্বতন্ত্র বিভায় প্রোক্রিয়েটেড হয়, কোদালটা ঠিক কোদালের মতো দেখতে হয় না কোন একটি সাময়িক গণ-আন্দোলনের মুখে দাঁড়িয়ে তার নিজের মতো করে এভাবেই আভাসে বলতে পারেন, "যত সূর্য তারই বুকে / প্রত্যেক আকাশের নক্ষত্রই তার / তিমিরের মুহূর্ত থেকে আমি তার কাছাকাছি, / যখন বিদ্যুৎ চমকেছে / বৃষ্টি পড়েছে তখন / যখন আগুন ঝরেছে তখনও। / তার সঙ্গে সংলগ্ন হবার জন্যে আমি নিজেকে প্রস্তুত করে-ছিলাম" (এবং সবাই শুনল)। ফলে সমাজমনস্ক কবি হয়েও কেন তিনি কমবেশি বরাবরের সুভাষ মুখোপাধ্যায় বা তেতে ওঠা প্রথম চল্লিশের মঙ্গলাচরণ

চট্টোপাধ্যায় ন'ন, এ-নিয়ে আপশোষ করার কোনো কাঠামো-মাফিক মর্জি আমার নেই। জাম ফল থেকে জামের স্বাদ, অর্থাৎ তা' কতটা জাম, তাই চাইতে হবে—আমের স্বাদ নয়।

এক প্রখর সৌহার্দ্যের অবয়ব আছে অরুণ মিত্র-র কবিতায়। সেই অবয়বের চেহারা ক্রমে কোমল, আতুর হয়ে আসছে। মঞ্চ থেকে নয়, মাটিতে নেমে ঘনবুনোট একাত্মতার তন্ময় ডাক তাঁর গলায়, মনে হয়, প্রথম শুনছি যেন, "প্রাজ্ঞের মতো নয়, অন্ধের ছুঁয়ে দেখার মতো ক'রে বলো। আমার স্নায়ুতন্তু-ধমনী নিয়ে আমি এক অভিন্ন সমতলে আছি। অক্ষরগুলো কাগজে বন্ধ ক'রে এসে তুমি যদি গোধূলিতে নিজেকে আচ্ছন্ন করো এবং অন্তত একটা কুড়োনো পাপড়িও আমার ত্বকমুখের অন্ধকারে রাখো তাহলে আমি তোমাকে ঠিক শুনতে পাব।...যদি ছাখো বহতা নেই সবুজ নেই তবে অপেক্ষা কোরো না, আমার নিকটে এসো...(প্রাজ্ঞের মতো নয়)।" লক্ষ্য করুন, প্রতিটি শব্দকে কবি কি অপার মমতায় স্পর্শ ক'রে ক'রে উচ্চারণ করছেন, প্রতিটি পাপড়ির মাথায় শিশিরবিন্দুগুলি কেমন অম্লান।

সূর্যের একটানা দাক্ষিণ্যে ছাতিফাটা মাঠের ওপর দাঁড়িয়ে আবহমানের ভারতীয় কৃষক যেমন সর্ব অন্তর দিয়ে ফলদ বৃষ্টির প্রত্যাশা করে, ডিজেল, ধোঁয়া-ক্লিষ্ট রুক্ষ নাগরিক অস্তিত্বের ভেতরে অনিবার্যভাবে থেকে যায় তেমনই বর্ষা-মঙ্গলের আহ্বান-গান, মরুর দেশে জরুরি বৃক্ষরোপণের প্রয়োজন-বোধ। ক্রোশের পর ক্রোশ পথ ভেঙে নগরবাসীরা যায় ইস্পাতের গলন্ত লাল নদী দেখতে। তার কোনো প্রয়োজন থাকে কি? কারণ সে জ্বালা তো শহরময় অস্তিত্বের বাতাসে হাল্কা হয়ে ছড়িয়ে আছে। এইসব কিছুর পর, মন্তব্যের পরোয়া না রেখেই শোনা যাক অরুণ মিত্র-র কথা, "তুমি বৃষ্টির দেশ থেকে এলে। এই এতগুলো পাতা আমি জড়ো করেছি, এত ডালপালা। ছাখো তো এরা তোমাকে আগুন ছাড়া অন্য কথা বলে কিনা।...তুমি মৌসুমকে জানো, ফলনকে জানো; এই মাটিকে একবার তুমি আদর ক'রে ছাখো (বৃষ্টির দেশ থেকে এলে)।"

শ্রদ্ধেয় বিষ্ণু দে যেভাবে শিশুর নিশ্চিতির সঙ্গে বয়স্কের প্রবীণ মননকে মেলানোর কথা ভেবেছিলেন, বক্ষ্যমান গ্রন্থের কবিও কি সেই একটি ভাবনায় পরিণতি খুঁজেছেন? ঠিক বলা দুষ্কর, তবে এ-কথা অরুণ মিত্রই প্রথম কবিতায় বললেন যে, বয়স বা তথাকথিত অভিজ্ঞতা মানুষকে সব শেখায় না। কয়েকদিন আগে এক চলমান বাসে দুটি অল্পবয়সী যুবা যে কথাবার্তা বলছিল, তার সারমর্ম

হলো এই—বুড়োরা কিচ্ছু বোঝে না। কিন্তু সবসময় বড় বড় কথা বলে। হঠকারী উক্তি নিঃসন্দেহে। তবু এই অসহিষ্ণুতার ভেতর থেকে উচিয়ে ওঠে এক-ধরনের সত্য। বয়স্ক মানুষ কি সত্যিই একটা পূর্ণ ছবি দেখতে পায়—সঙ্গতিপূর্ণ পূর্বাপর? না কি ক্রমাগত বাসাবদলের মতো সে একজায়গা থেকে আর এক জায়গায়, এক অনুভূতি, এক জীবন থেকে আর এক অনুভূতি, আর এক জীবনে স্থান পরিবর্তন করে? যখন সে যেখানে থাকে তখন কেবল সেটুকুই তার কাছে প্রকৃত, ফেলে আসা পর্যায়গুলো ধূসর, বোধের বাইরে বা নষ্ট। সমকাল যদি সীসের মতো হয়, তবু কি বহুবছর স্রেফ্ বেঁচে থাকার পুণ্যে কেউ চেতনা বা অস্তিত্বকে পদ্মের মতো বিকশিত করতে পারেন? এইসব প্রশ্নের টানা-পোড়েনে আমার বরং স্বাভাবিক মনে হয় অরুণ মিত্রের সঙ্কট-জর্জর বক্তব্য, "পোল পার হওয়ার সময় আমার এক ধরনের ভাবনা হয়। পায়ের নিচে থিলেনটা ভেঙে পড়বে, তা নয়। বা লোহার মুঠোয় আমার নিঃশ্বাস আটকে যাবে, তা নয়, আমার ভাবনা হয়, আমি কিভাবে আবার নিজেকে মানিয়ে নেব। যে-কয়টা স্থির বিন্দু ছিল ছাড়িয়ে এসেছি। এখন নতুন চিহ্ন তৈরি করতে হবে, যা দেখলে নিজের বুকের ধুকপুক প্রিয় শোনাবে (পোল পার হওয়ার সময়)।"

অরুণ মিত্র তাই অক্ষয় বট নয়; স্রোতের কথা শুনতে চান। হঠাৎ যখন তিনি বলে ওঠেন "উজ্জ্বলতার মধ্যে আমাদের যাত্রা", আমার পাঠক-মন সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করে ওঠে; না তা নয়। অরুণবাবু, আপনি সারা বইটিতে এমন সিদ্ধ, প্রাজ্ঞ কথা বলতে চাননি, বলেননি—আপনি তো জানাতে চেয়েছেন, আমাদের যাত্রা উজ্জ্বলতার মধ্যে নয়, উজ্জ্বলতার জন্য। তাই আপনি যখন কাব্যগ্রন্থটির বহতা স্রোত ছেড়ে সিদ্ধান্তবাগীশভাবে বলে ওঠেন, "পৃথিবীর সব রেণুর কথোপকথন সমাপ্ত হয়েছে, / স্পষ্ট দেখার এই জনপদ আমার সামনে", তখন যদি মনে হয়, আপনি খানিকটা বিরোধী হয়ে উঠলেন আপনার কবি-স্বভাবের, বেশি বলা হয়ে যাবে কি? কারণ আপনি তো অমোঘভাবে জানেন, "কথার মাঝখানে কুয়াশা নামে, / গুটিকয়েক ভঙ্গি তীব্র হতে গিয়ে প্রতিবিম্বে ছড়িয়ে যায়" অথবা স্বর্গে বড়জোর এইটুকু নিশ্চিতি আপনার, "শার্শিটার গায়ে একটু নিঃশ্বাস লেগে আছে / মনে হয় আমারই নিঃশ্বাস, / আমার রক্ত যেন কথা বলতে চেয়েছিল / কিন্তু জিজ্ঞাসায় নয় / ফসল যেমন ফলে তেমনি করে বলবার জন্যে।"

প্রত্ন-পাথরের মতো অরুণ মিত্র-র কবিতার শরীর অজস্র রেখ। তার পরতে পরতে দহন, বৃষ্টি, সময়ের জটিল আঁকি-বুকি। তবু মনে হয় যতদূর সম্ভব, ততদূর তিনি আধুনিক। সাম্প্রতিকতা ও আধুনিকতা যে এক জিনিস নয়, কবিতার নামে প্রগাঢ় দার্শনিক উচ্চারণবিহীন এক আশ্চর্য আন্তরিকতায় ঐ অমোঘ সত্যটিকে ফুটিয়ে তুলেছেন 'মঞ্চের বাইরে মাটিতে'-র কবি। জীবনের সবটুকুই জলের গর্জন নয়, মরুভূমিও নয়, আছে একটি মন্থর প্রবাহ। কবি বলেছেন, "সূর্য তাকে অনেকখানি শুষে নেয়। কিন্তু না একেবারে মরে না। আঁজলা করে তৃষ্ণা জুড়োবার জল আমি যে-কোনো সময়ে পাই"। এই নিরাভরণ, সহজ সত্যই জাল-জালিয়াতি বা খুব উঁচু থেকে কথা বলার প্রলোভন ছেড়ে অরুণ মিত্রে-র কলমে বহু-ঈপ্সিত হয়ে টাটকা, নির্মল জলের মতো আমার কাছে নেমে এলো। সবচেয়ে বড় কথা, তাঁর কবিতা আমাকে দিশেহারা করে না অথচ তীব্রতম প্রতীক্ষায় রাখে। তাঁর কবিতা আপ্তবাক্য নয়। তাই ঝড়-ঝাপ্‌টা মাথায় নিয়ে টাল-মাটাল ঠিক-বেঠিকের মধ্য দিয়েও যে একটি লক্ষ্যের কেন্দ্রে পৌঁছতে হবে, একটি চূড়ান্ত অটলতার সামীপ্যে—এ-বক্তব্য যখন তিনি রাখেন, তাঁর অক্লান্ত সততা আমাদের একটি জায়গায় নিয়ে দাঁড় করিয়ে দেয় হয়তো বাঁচায়। দীর্ঘ রোগশেষে অবগাহনের পুণ্যে শুচি হয়ে ওঠে, "একটু ঘন করে নিশ্বাস নিলে / অভূতপূর্ব স্বস্তিতে আমি পড়তাম, / যে-সব ডানা আমার দেখা নেই / তারা আমাকে নিয়ে যেত / চন্দনের বনে, শিশিরে। / কিন্তু কোনো সৌরভে আমি ভিড়লাম না / কোনো কুয়াশা আমাকে স্তিমিত করল না, / কারণ আমার বিশ্বাস ন্যস্ত ছিল পাথরে / এক অনমনীয় পাথরে (নির্ভর)"।

গ্রন্থটি পাঠান্তে আমি একই সঙ্গে বিপন্ন ও কৃতার্থবোধ করছি। বিপন্ন, বিষ্ণু দে ও জীবনানন্দ দাশ ছাড়া অরুণ মিত্র-র কবিতার তুলনায় অন্যান্য বহু-বিজ্ঞাপিত কবিদের স্বল্প-ক্ষমতার কথা ভেবে। কৃতার্থ, বর্তমানের কাছে প্রায়-বিস্মৃত কবির কবিতা আমার কাব্যপাঠকে আশাতীতভাবে পুরস্কৃত করেছে বলে।

দুই

আজ থেকে দুবছর আগে লেখা একটি প্রবন্ধে মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়কে অভিহিত করেছিলাম 'স্বেচ্ছানির্বাসিত কবি' বলে। যাঁরা তাঁর 'মেঘ

বৃষ্টি ঝড়' এবং 'একলব্য ও অন্যান্ন কবিতা' পাঠ করেছেন, তাঁরা জানেন, কাব্যলোক থেকে তাঁর দীর্ঘকালীন নির্বাসন পাঠককুলের ক্ষোভের অযোগ্য ছিল না। সেই ক্ষুব্ধ পাঠকদের ধারাবাহিক অনুযোগ শুনতে শুনতে ক্লান্ত হয়ে মঙ্গলাচরণ সম্ভবত দ্বিতীয়বার বাঙলা কবিতায় এসেছেন। অতঃপর হয়তো নিজের তাগিদেই লেখা ব্যাপারটাকে কিছুটা নিয়মিত করার দিকে তাঁকে ঝুঁকতে হয়েছে।

'বৈরী মন' একালের কবিতায় মঙ্গলাচরণের পুনর্বাসন। গ্রন্থের ভূমিকায় কবি বলেছেন, "গত তেরো বছর ধরে একটু একটু করে জমা হয়েছে এ বইয়ের রচনাসঞ্চয়।...এই তেরো বছর ব্যক্তিক জাগতিক নানা সমস্যায় দুশ্চিন্তিত থাকা সত্ত্বেও, আদৌ আর লিখতে পারব কিনা বারে বারে এই আতঙ্কের মুখোমুখি হয়েও, মন বিদ্রোহ জানিয়েছে, আবার নিজেকে ছাড়িয়ে উঠতে চেয়েছে আমার মন"। লিখেছেন, "আমার কবিতার নায়ক সময় হলেও সরাসরি সময় নয়, মনের ত্রিশির কাচে ব্যক্তিক সময়"।

কাব্যগ্রন্থে ভূমিকা লেখায় একটা দায়িত্ব কবির ওপর বর্তায়। সেটি হচ্ছে গৌরচন্দ্রিকায় সূত্রগুলিতে কবিতার ভেতর দিয়ে প্রমাণ করা। আঙ্গিক নিয়মে না হলেও অন্তত আভাষেই ব্যঞ্জনায়। কমবেশি সম্পর্ক একটা না থাকলেই নয়।

গ্রন্থটি পাঠ করতে করতে প্রথমেই মনে হয়, সময় বা কাল মঙ্গলাচরণের এককালীন উচ্ছ্বসিত, উদ্দাম কবি-ব্যক্তিত্বের ওপর প্রখর অস্ত্রচিহ্ন রেখে গেছে। পঞ্চাশোর্ধ বয়ক্রম তাঁকে বিষণ্ণতায় অভিজ্ঞ করে তুলেছে। চল্লিশের জ্বালাভরা গণগণে আঁচের দিন, যুদ্ধ, বেকারি, মন্বন্তর, সাম্যবাদী চেতনার অভ্যুত্থান, দেশপ্রেম—অর্থাৎ এককথায় প্রাক্-স্বাধীনতা পর্বের শেষ দশকের দুরন্ত দুপুর এখন তাঁর অস্তিত্বে সংশয়, সঙ্কট, দ্বিধা, আত্মমুখীনতা ও পুনর্মূল্যায়নে জটিল হয়ে এসেছে। এতদিন কিসের জন্য অনেক কিছু করা দেয়া ও খোয়ানো হলো এবং তার ফল কী—সেই হিসেব-নিকেশের প্রয়াস কিছুটা ধরা পড়েছে 'বৈরী মন'-এ।

ফলতঃ দুশ্চিন্তা ও নির্ভরহীনতা বেশ কিছু কবিতাকে ছেয়ে ফেলেছে। "ঘুরে ঘুরে ঘুরে / দুই পায়ে পণ্ডশ্রম টেনে টেনে ফিরে দিনশেষে / এবার পাখির তীর আকাশের বুকে বিঁধে রেখে / চৌদিকে দেয়াল দেয় রাত্রি" জাতীয় উক্তি ক্রমশ আশাহীন ও মর্মান্তিক হয়ে ওঠে, "স্মৃতি ছুরি হাতে / চিরে চিরে কথার

কোমল ত্বক, নেপথ্যে কথার হাস্য / শুভ্র / ত্বকনিম্ন মেদ দ্বিধা শিরার সাপেরা স্নায়ুর তড়িৎ তীব্র / ঝিল্লী গূঢ় অন্তরাল অন্তর্দাহ, কর্মের পেশল দেহস্তরে /' টানটান ধমনী ও লসিকাগ্রন্থির অবকাশ, অল্প নিচে / মহাধমনীর উৎসে কেন্দ্রে কোষে আমূল বিঁধিয়ে দিল ছুরি ঃ / মনে হল জানা সব জানা সব জানা হয়ে গেল" ইত্যাদি পংক্তিতে। 'বৈরী মন'-এর কবিতার মুখ বারবার বুকের দিয়ে নুয়ে পড়েছে।

কিন্তু আশার কথা তা ভেঙে পড়েনি। নৈরাজ্যে বা অন্তহীন পরিণামে মঙ্গলাচরণের প্রথম পর্যায়ের কবিতার সবল বিদ্রোহ নতজানু হয়ে বসেনি বা সেই ভয়াবহ পরিণতির হাতে কবির আত্মার ক্রয়মূল্য তুলে দেয়নি। যে কবিতায় তিনি বলেছেন, "চৌদিকে চলকায় মন,আমি দ্বীপ আমি দূরে থাকা" সে কবিতাতেই তাঁর প্রাণদ কামনা, "আলো অলৌকিক আভা অন্ধকারে আচমকা ফোটাও / হাসো—হও জীবনের বনস্পতি হাসিধারা জলে / শাখায় পল্লবে লোভমদমৃত্যু, হাসো ফুলে ফলে / যন্ত্রণাভূস্তর ভাঙো অশ্রুরস শিকড়ে ওঠাও"। মনে হয়, মঙ্গলাচরণ বেহিসাবি আবেগ ও শীতল আত্মহননের মাঝখানে 'সুস্থ মতিগতি' ও বিবেচক অস্তিত্বের সন্ধানী হয়ে উঠছেন ক্রমে।

ঝড়ের গভীরে কেন্দ্রকে খুঁজে পাওয়া সহজ নয়। সমীকরণও ঠিক সরলীকরণের ব্যাপার নয়। 'বৈরীমন'-এ এই দুঃসাধ্য প্রচেষ্টার ব্যর্থতা চরিতার্থতা দুটোই পরস্পর জড়িয়ে আছে।

দেখা যাচ্ছে, মঙ্গলাচরণ এই কাব্যে চিরায়ত সত্য—যা টলে না এবং তা যত নির্মম বা উজ্জ্বল হোক না কেন—তাকে খুঁজে পাওয়ার জন্য বেশ একটু অধীর হয়ে পড়েছেন। এমন উক্তি গ্রন্থটিতে দুর্লক্ষ্য নয়, "ওকি মুখ, ওকি সুখদুঃখের দেহলি দেহভূমি / পঙ্কিল প্রলয়ে ও কি জীবন নোঙর, ও কি তুমি", অথবা, "যেদিন থাকবে না চূর্ণ চাঁদ চিহ্ন গোলাপগজল/উৎকণ্ঠা সময় মন দ্রুত স্তব্ধ দ্রুত স্তব্ধ দ্রুত / হতে হতে স্থির হবে, স্থিরতর চেষ্টা দোলাচল / সেদিন কি আসবে তুমি পেরিয়ে বিচ্ছেদ উপক্রত ?" অথচ, আমার আশঙ্কা, ধ্রুবতার প্রতি তাঁর সন্ধান কোনো নির্দিষ্ট চরিত্র লক্ষণাক্রান্ত বা লক্ষ্য অভিমুখী নয়। তাঁর সিদ্ধান্ত-গুলির তলে তলে অভিজ্ঞতার সিঁড়ি বা নানা বাঁকের চেহারা খুব একটা চোখে পড়ে না। মাঝে মাঝে আচম্বিতে কাব্যাকারে তিনি যে বক্তব্য উপস্থিত করেন, পাঠকের কাছে তা প্রমাণসিদ্ধ মনে নাও হতে পারে। একে একে যুযুধান যৌবনের রাজবেশ খুলে রেখে কপালে শুধু তীব্র রেখা ও চোখে কালি নিয়ে কবি

যখন বিনাভূমিকায় 'তুমি এলে' বা 'এখন সত্যের সঙ্গে মুখোমুখি' বলে ওঠেন, তখন এই 'তুমি' ও 'সত্য' ঠিক কি জিনিস, তা ঠাহর করতে আমার কষ্ট হয়। কোনো আলোড়িত মুহূর্তে দর্শকদের মধ্যে যে-উত্তেজনা দেখা যায়, তেমন তপ্ত বারুদ সবসময়ই মঙ্গলাচরণের কবিতায় প্রচুর মজুদ থাকত। একসময় তিনি ছিলেন যৌবনের দিগ্বিজয়ের কবিতা-প্রণেতা। স্বাভাবিকভাবেই তা এখন অনেক স্থিত হয়ে এসেছে, কিন্তু একটু কান পাতলেই তাঁর কবিতায় প্রাক্তনের সেই মাথা নাড়ার আন্দোলন প্রত্যক্ষ হয়। ধ্বন্যাত্মক শব্দে, অনিবার্য শব্দ-দ্বিত্ব প্রয়োগে, সাবলীল টানের একটি রেখায় ছবি ফুটিয়ে তুলতে তিনি এখনও আরও বেশি পারঙ্গম। অস্থির অনুভবকে কত সহজে কলম থেকে পাঠকের বুকে সঞ্চারিত করে দিতে মঙ্গলাচরণ আজও সিদ্ধহস্ত,'"—চিনি নি কে। ভেসে গেছি স্রোতে স্রোতের শিকড়ে একরোখে / আলোয় আঁধার নিঃশব্দ চিৎকার ঘূর্ণিস্রোত সত্তা মুখোমুখি / অকস্মাৎ চূর্ণ চূর্ণ বর্ণগন্ধশব্দস্বাদ চূর্ণ বস্তুকণা / লক্ষ লক্ষ অলক্ষ্য আকাশ কীর্ণ দীর্ণ ক'রে : ও কে, ও কে, ও কে" কিংবা, "বাজি পুড়ছে বাজি পুড়ছে আলোর আগুন মুখ ছুটিয়ে কলকাতা / জলন্ত দেশালাই কাঠি / শিস্ দিয়ে ডানা মেলল হাউই / ফুলের ফুল্‌কির ঝরণাতলায় মাথা পেতে তুবড়ি / বোমা ফাটছে লাউডস্পীকার গলা-চড়িয়ে ঢাকের বাদ্যি / জলন্ত দেশালাই-কাঠি / বাজি পুড়ছে আলোর মদে মাতাল কলকাতা।" এই গ্রন্থে বেশ কয়েকটি আনুষ্ঠানিক কবিতা আছে। এ-ধরনের কবিতা সাধারণত উদ্দীপনার মুখেই লেখা হয়, লেখা না উৎরোলে আবেদন কিছুটা তাৎক্ষণিক থেকে যায়। দুটি কবিতা 'হো চি মিন্‌-কে দেখি নাই কখনো' এবং মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্মৃতিতে রচিত 'আশ্চর্য সে' স্মরণীয় আবেগের নিপুণ সমাহারে পরিণত হয়েছে।

নানা ধরনের ও গড়নের কবিতায় 'বৈরী মন' জমজমাট। এর ফলে পাঠকের মনে যেমন একদিকে বৈচিত্র্যের আস্বাদ আসে, তেমনই একটি নির্দিষ্ট ধারণা তৈরির পথে প্রাথমিক বন্ধকতা সৃষ্টি হয়। গ্রন্থটির একটি শ্রেষ্ঠ কবিতা 'মেকঙ নদীতে মৃতদেহ।' কবিতাটির একপ্রান্তে কলকাতা অন্যপ্রান্তে ভিয়েতনাম। সমীকরণ নয়, উভয়ের পার্থক্যের চেহারাটিকেই আশ্চর্য পারঙ্গমতায় ফুটিয়ে তুলেছেন মঙ্গলাচরণ, "ভেসে যায় স্মৃতি স্মৃতিহীনতা ও গ্লানি / আত্মকলহ অন্তর্দাহ ভেসে / দিনের তিক্ত রাত জাগে অনুতাপে / আশা বিশ্বাসঘাতক ছুরির ফলা / ভাষা ভেসে নৈঃশব্দ রক্ত—আর / গ্রীষ্ম দারুণ চমকে থমকে দাঁড়ায় / ভাসে মৃতদেহ মেকঙ্ নদীর পাড়ায়।"

জটিলতার দুপুর এবং রাত্রি

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়

তেরোশো বাহাত্তর বঙ্গাব্দে দেবেশ রায় ছিলেন তরুণ প্রতিশ্রুতিগুলির অন্যতম। প্রায় ততদিনেই তাঁর উজ্জ্বল গল্পগুলির অনেক কটিই ছেপে বেরিয়েছে। সেদিন অন্য অনেকের গল্পই 'গল্প' না 'লেখা' এ-নিয়ে যে-বিচিত্র বিতণ্ডা সৃষ্ট হয়েছিল, দেবেশের গল্প সে-বিতণ্ডার বিষয় ছিল না। সেই গল্পগুলির কয়েকটি মাত্র একত্র হয়ে—আজ এতদিন বাদে 'দেবেশ রায়ের গল্প' নামে বই হিশেবে প্রকাশিত হলো। সেই তেরোশো বাহাত্তর বঙ্গাব্দেই দেবেশ রায় সম্বন্ধে এক বিস্তৃত আলোচনা আমরা পেয়েছিলাম তরুণতর সমালোচক শ্রী পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছ থেকে। আজ 'পরিচয়' সমালোচনা সংখ্যায় দেবেশ রায়ের গল্প আলোচনাকালে সেই সমালোচনার একটি বক্তব্য বিশেষ ভাবে মনে পড়ছে : "এঁর (দেবেশ রায়ের) গল্পের ফর্ম কেবল বিষয় নিয়ন্ত্রিত নয়, এঁর গল্পে পরীক্ষাই বিষয়কে নিয়ে"। এবং ভাবলে আশ্চর্য হতে হয় যে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে বাঙলা ছোটগল্পের সুনির্দিষ্ট সন্ধিলগ্নে দেবেশ রায় এবং দু-একজন একথা গভীরভাবে বিশ্বাস করেছিলেন টেকনিকের সৎ সাধনা শিল্পীকে নিয়ে যায় জীবনেরই গহনে। সেদিনের দেবেশ রায় এবং দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখায় ছিল জীবনের জটিলতার চ্যালেঞ্জ গ্রহণের সঙ্কল্প। দেবেশ এবং দীপেন্দ্র বর্তমানে প্রায় নীরব। সেদিনের নবপথিকদের মধ্যে শীর্ষেন্দু-বরেন-সন্দীপন-দিব্যেন্দু এখনো আগ্রহোদ্দীপক। দীপেন্দ্র এবং দেবেশের অন্যমনস্কতায় পাঠকের অনুযোগের যথেষ্ট কারণ আছে। জীবন এবং শিল্প এখনো তো একের জটিলতায় অপর সাধনাকে সমান দুরূহ করে রেখেছে।

এই শতাব্দীর পাঁচের ও ছয়ের দশকে বাঙলা ছোটগল্পের ধারা একটা নতুন বাঁকের মুখে এসে দাঁড়াল। কাহিনী-মুখ্য চরিত্র-বিকাশী ছোটগল্পের পরিবর্তে দেখা দিল ব্যক্তিস্বরূপের উন্মোচনের, তার অস্তিত্বের সঙ্কটের, সঙ্কটের অন্তর্লগ্ন উত্তরণের সঙ্কল্পের ছবি। মধ্যবিত্তের জীবনের প্রথাবিন্যস্ত রূপ, তার ইতিহাসের

দেবেশ রায়ের গল্প। সারস্বত লাইব্রেরী। ছ টাকা

হাতে গড়া ছক ইতিহাসের হাতেই একদিন অমোঘ ভাঙনের বশবর্তী হয়েছে। কাহিনীর বা প্লট নির্মাণের প্রয়াসও সেদিন থেকেই ভাঙতে থেকেছে। নিটোল জীবনবৃত্তের ব্যতিক্রমেই গড়ে উঠেছিল গল্প। কিন্তু স্বীকার করেই তো ব্যতিক্রমের কথা উঠতে পারে। যেদিন, নিটোল জীবনবৃত্ত যেসব কিছুর উপাদানে গড়ে উঠেছে সে-উপাদানের অনেক কিছুই ভেসে গেল, যেদিন প্রযুক্তিবিদ্যার চরম চূড়ায় পৌঁছে অথবা বৃহৎ শহরের উদাসীন নৈর্ব্যক্তিকতায়, নিঃসম্পর্ক মানুষের নিটোল জীবনবৃত্ত বলতে আর কিছু থাকল না, সেদিনই কাহিনীমুখ্য চরিত্রবিকাশী কথাসাহিত্যের পরিবর্তে দেখা দিল সেই গল্প যাতে গল্পকর্তা কম, আত্মিকতা বেশি, যে-গল্পে সংবৃত সমাপ্তি নেই, আছে বিবৃত অশেষত্ব। আধুনিক জীবনের অধিগত যে-অভিজ্ঞতা সে যেন এই কথাই জানিয়ে দিল যে এক অসহায় ঘেরাও অবস্থাই বর্তমানে বিধিকল্প হয়ে দেখা দিয়েছে। ঠিকভাবে কিছু শুরু হয় না, ঠিকভাবে কিছু শেষ হয় না। আদি অন্ত বলে কিছু নেই—আছে শুধু এক নিরুপায় মধ্যবর্তীতা। সুতরাং কথাসাহিত্যেও এসেছে অভিজ্ঞতার এই openness বা উন্মুক্ততাকে মূর্ত করার প্রয়াস। তাই বলা যায় রীতি শুধু রীতি নয়—তা আসলে জীবনের নবতরঙ্গকে, তরঙ্গভঙ্গকে অন্বেষা। এই অর্থেই দেবেশ রায়ের এ-আপত্তি স্বাভাবিক বলে মনে হয়ঃ নতুন রীতি "অভিধা আমি স্বীকার করি না"। আর সত্যিই তো একই রীতিতে যেমন সবাই গল্প লেখেননি, তেমনি একজন লেখকেরও কোনো দুটি গল্পও তো একই রীতিতে লেখা নয়। 'পা' এবং 'নিরস্ত্রীকরণ কেন ?' এই গল্প দুটির গূঢ়ৈষণা এবং টেন্‌শন যেমন এক নয়, এদের প্রকাশরীতিও তেমনি পৃথক পথের।

টেকনিকের সাধনা তখনই বিচ্ছিন্নতার সাধনা যখন তা বিষয়ার্থকে উপেক্ষা করে হয়ে উঠতে চায় চূড়ান্ত বা চরম। আর যেখানে লেখক টেকনিককে ঠিক ভাবে খুঁজতে যান বিষয়েরই টানে. সেখানে বিষয়ার্থের নির্দেশেই নিয়ন্ত্রিত হয় টেকনিক। আবার টেকনিকের সীমাবদ্ধতারও সূত্রেই লেখকের নজরে পড়ে তাঁর অন্বিষ্ট বিষয়ার্থে কোনো অসঙ্গতি আছে কিনা। এই দ্বৈতকে নিয়েই শিল্পীর সাধনা। দেবেশ রায় এবং তাঁর সমকালীনেরা যেদিন বাঙলা ছোটগল্পে নতুন প্রয়াস শুরু করেছিলেন সেদিন এই দ্বৈতের ভিতর দিয়েই তাঁরা খুঁজতে গিয়েছিলেন শৈল্পিক অন্বয়কে। সেদিন তাঁরা জেনেছিলেন যে কোনো বিষয় নিয়ে কেউ গল্প বলে না। বিষয়ের তাৎপর্যই তাঁকে আকর্ষণ করে। গত মহাযুদ্ধের পর থেকে বাঙালি লেখকের নিজস্ব অভিজ্ঞতাতেই সেই নতুন বিষয়ার্থ বা

তাৎপর্যের সন্ধান তাঁকে রীতি-নিরীক্ষায় প্রেরণা দিয়েছে।

কিন্তু দেবেশ রায় বা দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রেণীদ্বন্দ্বে বিশ্বাসী। আশা রাখেন তাঁরা মানুষের ভবিষ্যতে। সুতরাং এ-কথাও স্বাভাবিক যে অস্তিত্বের নিরুপায় সাম্প্রতিকতা তাঁদের মেনে নেবার কথা ছিল না। তাহলে কেন তাঁরা 'কলকাতা ও গোপাল' অথবা 'চর্যাপদের হরিণী'র মতো গল্প লিখেছেন? এ-প্রশ্ন আমার নয়, কিন্তু এ-প্রশ্ন সেদিন উঠেছিল। এ-কথা ঠিকই যে দেবেশ রায় বা দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মধ্যবিত্ত জীবনকে—একান্তভাবেই নাগরিক মধ্যবিত্তের জীবন নিয়েই গল্প লিখেছেন। সংঘবদ্ধ শ্রমিক বা সমিতিবদ্ধ কৃষককে নিয়ে গল্প লেখায় এঁদের কোনো ঘোষিত বিমুখতার কথা আমার শোনা নেই। বরঞ্চ দুই লেখকেরই নিজ নিজ অভিজ্ঞান জীবনে সমাজের সর্বস্তরের মানুষেরই ঘোরা-ফেরার ছায়া দেখা যায়। তথাপি মধ্যবিত্ত—নাগরিক মধ্যবিত্তকেই এঁরা এঁদের অভিনিবেশের বিষয় বলে মনে করেছেন। তার ফলে এঁরা এঁদের স্বধর্ম থেকে বা মতাদর্শ স্খলিত হয়েছেন এমন বলা চলে না। বরঞ্চ যে-অনন্বয় বা বিবিক্ততা ধনতন্ত্রের সহজাত বিকারের দান, সেই অনন্বয় বা বিবিক্ততা একজন সমাজবাদীর কাছে উপেক্ষণীয় বিষয় নয় বলেই এঁদের কাছে প্রতিভাত হয়েছে। সচেতন সমাজবাদী সেই অনন্বিত বা বিবিক্ত ব্যক্তিস্বরূপের তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণের ভিতর দিয়ে ধনতন্ত্রের ব্যক্তিত্ববিলোপী নগরজীবনকে. ব্যক্তির বিবর্ণ যন্ত্রণাকে সভ্যতার সঙ্কটের প্রেক্ষাপটেই ধারণ করতে চান। যে-জীবন মানে হারিয়ে ফেলল, আর নতুন মানে খুঁজে পাওয়া যেখানে দুঃসম্ভব বলে গণিত হলো, সেই দুঃসহ শূন্যতার মধ্যে দাঁড়িয়ে খুঁজতে হবে উত্তরণের ইঙ্গিত। বড় বড় নগরীর বিবর্ণ গুরুভার যান্ত্রিকতায় যে unauthentic existence-এর দুর্দমনীয় আধিপত্য, তার মোকাবেলা করলে ধনতন্ত্রেরই বিকারের মোকাবেলা করা হয়। দেবেশ রায় যে-কোনো সৎশিল্পীর মতোই জানেন জীবনকে জীবনের জটিলতার মধ্যেই খুঁজতে হবে। জটিলতাকে আড়ালে রাখলে জীবনকেও আড়ালে রাখা হবে।

দুই

"আমরা না-এসে যদি আমি আসতাম, আমি গোপাল, তবে কলকাতার সঙ্গে আমার শত্রুতা হ'ত না"। গোপাল নিজের এই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞানকে কোনো ক্ষেত্রে, কোথাও খুঁজে পেল না, সে প্রতিষ্ঠিত করতে পারল না তার নিজস্ব authenticityকে। গোপাল সেই ব্যক্তি, যার কাছে জীবনের পুরনো মানেটা

বিনষ্ট হয়েছে, কিন্তু কলকাতা তথা এ-দেশের নবজীবন যার কাছে থেকে গেল একটা চোখে দেখা জনশ্রুতি মাত্র। দীপেন্দ্রনাথ ঠিকই বলেন যে এ-কলকাতা তবু আমাদের টানবে, ইতিহাসের পিছুটানের মধ্যে কোনো বিকল্প নেই বলেই টানবে। তাই 'কলকাতা ও গোপাল' গল্পে গোপালের আত্মহত্যা কলকাতাকে খুঁজে না পেয়ে। তবু একটা প্রশ্ন থেকেই যায় 'আমি' খুঁজতে গিয়ে গোপাল কি শেষপর্যন্ত 'আমরা'কে হারিয়ে ফেলল না? সার্বিক সম্পর্কের যে-হাওয়ায় জলে ব্যক্তিত্বর পরম জিজীবিষা খুঁজে পায় তাকে গোপাল খুঁজে পেল না। সে কারণেই গোপালের মৃত্যু ও জীবন দুইই সমালোচনার যোগ্য। গোপালের স্রষ্টাও সে-কথা জানতেন না তা নয়। "আমার মরার কোনো মানেই হয় না"—গোপালের অন্তিম ভাবনাদীপ্ত মুহূর্তটি তার সমগ্র অস্তিত্বের ব্যাখ্যাতা। সে এই প্রধান উপলব্ধিতে বঞ্চিত ছিল যে তার নিজের বাস্তবতাবোধ ও সাধারণ বাস্তবতাবোধের মধ্যে যে কম্পমান ব্যবধান, লড়াইটা হওয়া উচিত ছিল তারই সঙ্গে। সে-লড়াই সে ফতে করতে পারেনি, এটা বড় কথা নয়। সে ঐ লড়াইটা লড়তেই চাইল না। অথচ যে স্বাভিজ্ঞানের জন্য গোপাল ছিল এত উদ্বেগ-প্রহত, মথিত, পীড়িত, সে-স্বাভিজ্ঞানে না চিহ্নিত হলে তার জীবন এবং মৃত্যু দুইই হয়ে যায় নিরর্থক। গোপালের মৃত্যুকালীন ভাবনা পুরোপুরি উচ্চারিত হতেও পারেনি। এই আধুনিক predicament বুর্জোয়া সমাজের ক্ষয়ের যুগেরই predicament। আমাদের সঙ্কল্প এবং রূপায়নের মধ্যে, আবেগ এবং সাড়ার মধ্যে কেবলই বাধা পড়ে, সব স্পষ্টতাই আসি-আসি করেও আসে না, তার আগেই যবনিকা কম্পমান—falls the shadow. গোপালের জীবন আর মৃত্যুতেও তাই ঘটেছে। তবু আমরা যেন গোপালকে দিয়ে দেবেশ রায়কে বুঝতে না যাই। গোপাল এক হিশেবে মধ্যবিত্তের শ্রেণীবিহ্বলতার প্রতিনিধি। সে যতই 'আমিত্ব' খুঁজে বেড়াক-না-কেন সে স্বর্ণযুগ হারানো বাঙালি মধ্যবিত্তেরই একজন। দেবেশ রায় তাই নাট্যকারের নির্লিপ্তি ও নিরাসক্তি নিয়ে গোপালকে মূর্ত করেছেন। বলা যায় আলেখ্যায়িত চরিত্র-চিত্রের সঙ্গে শিল্পীর যোগ যতটা, গোপালের সঙ্গে গোপালের স্রষ্টার যোগ তার বেশি নয়। কোনো সুবিধাবাদী আত্ম-প্রক্ষেপকে তিনি স্থান দেননি।

তিন

'কলকাতা ও গোপাল' গল্প দেবেশ রায়ের এমন একটি গল্প যেখান থেকে তাঁর দুপুর-কল্পনা প্রায় বিদায় নিল। আমরা, এই লেখকের গল্পপাঠকেরা জানি যে

শুধু 'দুপুর' গল্পেই নয়, তাঁর অনেক গল্পেই দুপুর একটা বিচিত্র মুহূর্ত সৃষ্টি করে। 'আহ্নিকগতি ও মাঝখানের দরজা' গল্পের সেই দুপুরটিই তো আর কোথাও ছায়ার অস্পষ্টতা থাকতে দিল না :—

"শিশির সাড়া দেয় না। ও শোনে কিনা কে জানে। যেমন ছিল তেমনি থাকে। বাইরে ঝাঁ ঝাঁ, অলস তীব্র তৃষিত দুপুর।

তটিনী চুপ হয়ে যায়। কী বলে ও নিজেই শোনে নি, স্বপ্নে নিজের সঙ্গে কথা বলার মতো। যেমন ছিল তেমনি থাকে। বাইরে ঝাঁ ঝাঁ অলস তীব্র তৃষিত দুপুর।"

শ্রীমান পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায় দেবেশের 'স্মৃতিজীবী' গল্পের দুপুর প্রসঙ্গের উল্লেখ করেছেন। 'স্মৃতিজীবী' বর্তমান সঙ্কলনের অন্তর্গত নয় বলে এ বিষয়ে পৃথক আলোচনা করলাম না। কিন্তু 'পা' গল্পটি প্রসঙ্গে আবার লেখকের দুপুর-কল্পনার দেখা পাই। দুপুরের খর আলোয় কোনো ভুল দেখানোর ইচ্ছে থাকে না পৃথিবীর। দুপুরের জানালায় বসেই "ছোট বৌ দেখল মানুষ নানাভাবে হাঁটে। একটা হাঁটার সঙ্গে আর একটা হাঁটার কোন মিল নেই। হাঁটাটা যেন কেবল হাঁটা নয়, পুরো মানুষটাই।" আত্মহত্যায় ব্যর্থ এক-পা-হারানো ছোট বৌয়ের নিজের সব অপূর্ণতা এই দুপুরেই ফুটে উঠল নিবিড় হয়ে। 'দুপুর' গল্পের থীমই হলো এক দুপুরের আলোয় কতকগুলি চরিত্রকে দেখা। দুপুর যে-সমস্ত উপমান আকর্ষণ করেছে তাদের ভাষাতেই রয়েছে চরিত্রগুলির গভীরে যাবার কুঞ্চিকা। একে অপরের থেকে বিচ্ছিন্ন এই চরিত্রগুলির জীবনে এমন দুপুর আসবে এবং যাবে। নিস্তরঙ্গ দূরত্বে দ্বীপগুলি দুপুর পোহাবে।

এই দুপুরেই 'কলকাতা ও গোলাপ' গল্পে গোপাল সেই অপ্রতিরোধ্য সিদ্ধান্ত প্রণোদিত প্রশ্নটি উচ্চারণ করেছিল, "ঠিক তখন বারোটা বাজে, পথঘাট প্রায় নির্জন, গাড়ির চাকার নিচে গলিত পিচের শব্দ, জামা ভিজে গায়ের সঙ্গে লেপ্টানো, কপাল থেকে গড়িয়ে পড়া ঘামে চোখের সামনে পর্দা, কপালের শিরা দুটো দবদবে, আর দুই ঠোঁট ও গাল দাঁতের সঙ্গে লাগা, টাকরায় লেগে-থাকা মৌরির চিবুনো ছিবড়ে শুকিয়ে কড়কড়ে —রেলিঙের ওপর থেকে হাত সরিয়ে নিল সে, পেছন ফিরল, ওষুধের দোকানের সিঁড়ি ভেঙ্গে ভেতরে ঢুকল, কাউন্টারের ভদ্রলোকের চোখে চোখ রেখে সোজাসুজি জিজ্ঞাসা করল—কোনো বিষ আছে?"—দেখা যায় বেশ কতকগুলি গল্পেই লেখক এই দুপুরকে

ব্যবহার করেছেন টেনশনের চরম সীমা নির্দেশের জন্য। দুপুর বিচ্ছিন্নের বিচ্ছিন্নতাকে তীব্র করে তোলে। কিন্তু এই লেখকের দুপুর-কল্পনার বৈশিষ্ট্য এখানে যে এ শুধু যে বিচ্ছিন্নতার কথাই বলে না, সঙ্গে সঙ্গে কী থেকে বিচ্ছিন্নতার কথাও বলে। এবং এই সবটা বলতে গিয়েই আসে কর্মময় জীবনের পূর্ণতার ইঙ্গিত। বিচ্ছিন্নতার দুই প্রান্তকে স্পর্শ করা হয়েছে বলেই দেবেশ রায়ের গল্প জীবনের গল্প, টেকনিকের বৃথা বিলাস নয়।

'কলকাতা ও গোপাল' গল্পের পরে দেখা যায় এ দুপুর-কল্পনা কিছু স্তিমিত। লেখক তখন ঘনায়মান সঙ্কটের অন্ধকারে নিমজ্জমান অস্তিত্বের কথা বলতে চাইছেন। 'নিরস্ত্রীকরণ কেন?' গল্পের মধ্যরাত্রি বিষয়ধৃত টেনশনের উপযুক্ত আধার। এই গল্প প্রায় দশ বছর আগে লেখা। সেদিনও, আজও এ-গল্প কুলহারা, দিশাহারা মানবগোষ্ঠির গল্প। এ-গল্পের ট্রেন এ-যুগের মানুষের দম্ভের বিষয় আত্যন্তিক প্রযুক্তিসিদ্ধির প্রতীক। কিন্তু এ-যুগের মানুষ এও বুঝেছে যে এই প্রযুক্তিবিদ্যা তার সিদ্ধির মুহূর্তেই সৃষ্টি করেছে চরম সঙ্কট। সে-সঙ্কটের মূল কথা হলো মানুষের সৃষ্ট এই যন্ত্র, এই প্রযুক্তিবিদ্যা, এইসব নানা সংজ্ঞা, নানা মত মানব-নিরপেক্ষ, স্রষ্টা-নিরপেক্ষ স্বাধীনতা পেতে চায়। 'নিরস্ত্রীকরণ কেন?' গল্পে দুপুর নেই, আছে মানুষের অন্ধতার সমতুল্য একরাত্রি। আর "কামরায় বসে ট্রেনের গর্জন, দুলুনি, আর মাঝে মাঝে কাঁপা বাঁশি শুনে মনে হয়—ছুটো লোহার লাইনের ওপর বাষ্প চালিত ইঞ্জিন নয়, যার কর্তৃত্ব অন্ধ নিয়তির হাতে —তেমনি কোনো যন্ত্রের ওপর নিজেদের জীবনরক্ষার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।" একদিন মানুষের সৃষ্ট শিল্প-বিপ্লব, তারও আগে মানুষের জড়বিশ্বের রহস্যভেদের সাধনা মানুষকে দিয়েছিল মধ্যযুগীয় অন্ধকার থেকে মুক্তি। এই ট্রেনের ইঞ্জিন সম্বন্ধেও লেখক বলেন, "অথচ এই ইঞ্জিন মাত্র কয়েকঘণ্টা আগে অন্ধকার থেকে এই কামরাটাকে উদ্ধার করে এনেছিল। তখন এই ইঞ্জিনকেই মনে হয়েছিল জীবন বিধাতা।" তারপর সে যেখানে আমাদের নিয়ে গেল সেখানে আমাদের জন্য অপেক্ষা করে আছে এক অমোচনীয় অমীমাংসা। আর্ত এবং ঘাতক, বিপন্ন এবং প্রতারক কে কোন কোটিতে এও যেমন দুর্বোধ্য, মানুষের আত্মপরিচয়ও তেমনি জট পাকানো এবং দুর্জ্ঞেয়। নিজ নিজ ঠুনকো সন্তুষ্টির জগতে থেকেও প্রত্যেক মানুষই দায়ী, একে অপরের কাছে, সকলে সবকিছুর জন্য। তাই স্বকৃত অপরাধের গ্লানি তাদের স্পর্শ করবে। যে ছুটন্ত ট্রেনের বাইরে ফুটবোর্ডে ঝুলতে ঝুলতে করাঘাত করছিল সেই কি আমাদেরই বিবেক? তাকে রক্ষায় বিপদ

আছে বটে, কিন্তু সে যদি আমাদের সাড়া না পেয়ে মাঝ পথের অন্ধকারে কোথাও পড়ে গিয়ে থাকে চিরকালের মতো, তা হলে আমাদের গন্তব্য বলেও আর কিছু থাকবে না। এই ভয়াবহ ভবিতব্যকে এই গল্প ফুটিয়ে তুলেছে দৃঢ় নিবিড় কতকগুলি রেখায়। সমালোচকের ব্যক্তিগত কথা ব্যক্তিগত সুরে বলার অধিকার না থাকাই ভালো। তবু যদি সে-অধিকার আমাকে ক্ষণকালের জন্যও মঞ্জুর করা হয় তাহলে আমি বলতে চাইব 'নিরস্ত্রীকরণ কেন' গত দশ বছরের বাঙলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ ছোটগল্পের তালিকার শিরোদেশে স্থান পাবার যোগ্য। অনুরূপ আততিতীব্র গল্প আর একটিই আমি স্মরণ করতে পারি—তা হলো শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়-এর 'নীলুর দুঃখ'।

চার

পূর্ণমান কবে যেন হারিয়ে গেছে। নিজেরই ভগ্নাংশের পরিকীর্ণতার মাঝে মানুষ নিজের স্বাভাভিজ্ঞানকে খুঁজে বেড়ায়, কিন্তু এমন করে আর কতদিন খুঁজে বেড়াবে! দুর্বহ অচরিতার্থতাই কি তাহলে অমোঘ নিয়তির হাতে মানুষের সর্বস্ব নিলামের শেষ ফল? দেবেশ রায় দুবার মানুষের সামগ্রিক সার্থকতা-সন্ধান-বিষয়ক গল্পে বন্ধ্যা বর্তমানে শেষ ভরসা নির্দেশ করছেন সন্ততির ভবিষ্যবাহী ধারায়। 'পা' গল্পে হারানো পা ছোটবৌয়ের বিচ্ছিন্নতাকে, তার ব্যর্থতাকে মূর্তি দিয়েছে। ব্যক্তিস্বরূপের পূর্ণতা হারিয়েই ছোটবৌ হারিয়ে ফেলেছে জীবনের স্বাভাবিক ছন্দ। সেই হারানো ছন্দ ছোটবৌয়ের পক্ষে খুঁজে পাওয়া অসম্ভব। অথচ ছোটবৌয়ের গর্ভ থেকেই জাত হলো একটি দুই পাওয়ালা ছেলে। ঐ ভাবীকালই ছোটবৌকে দিতে পারে পূর্ণতার এবং চরিতার্থতার আশ্বাস। 'উদ্বাস্তু' গল্পেও বলা হয়েছে কাললগ্ন মানুষের অবলুপ্ত মৌল অভিজ্ঞানের যন্ত্রণার কথা। আজকের মানুষের সব থেকে বড় প্রয়োজন বুঝি নিজের প্রামাণিকতাকে রক্ষা করা। অথচ বহু সীমান্তের ভাঙা-গড়ার দায়ভাগ বহন করে করে ক্লান্ত মানুষ সকল ক্ষেত্রেই যেন হারিয়ে ফেলেছে নিজেকে প্রমাণ করার উপাদান। কিন্তু প্রমাণ নিরপেক্ষভাবেও সে-মানুষ আপন ব্যক্তিস্বরূপকে বুঝে নিতে চায় মানুষেরই ভাষায়। 'উদ্বাস্তু' গল্পে দেশ-বিভাগের নানা কাটাকুটির রূপকে ঠিকানা-হারা, বাসা-ছাড়া মানুষের অনেক কালের উদ্বেগ আর্ত হয়ে উঠেছে। এই বাসাছাড়া, প্রামাণিকতাহারা মানুষের কথা পড়তে পড়তে স্মরণে আসে নিউটেস্টামেন্টের এই গভীর উক্তি :—

Foxes have holes, and birds of the air have nests; but the son of man hath not where to lay his head. St, Luke/9-58

তার জন্মমুহূর্ত থেকেই বোধহয় মানবচেতনা এই নীড়হারা জীবনের দুর্দশা সম্বন্ধে সচেতন। কিন্তু দেবেশ রায় কোনো লোকোত্তর সত্তায় আস্থা স্থাপন করে মানুষের স্বরূপ-সন্ধানের সার্থকতা খোঁজেননি। এ-গল্পেও দেখা গেল অন্য সব প্রামাণিকতা কালবৈগুণ্যে হারালেও, মানুষ হারায়নি আপন সন্ততির মধ্যে নিজেদের সন্তপ্ত ব্যর্থতার চূড়ান্ত গ্লানি মোচনের আশ্বাস! এইখানেই লেখকের নৈতিক সচেতনতার শৈল্পিক উদ্ভাসন।

পাঁচ

সেই শৈল্পিক উদ্ভাসনের মূলে লেখক যে আবেগ-তাড়না বা impulse অনুভব করেছেন তার মূল কথা হলো বর্তমানকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে যেন সময়ের দুর্বোধ্য বিশৃঙ্খলার রূপালেখ্যটি অবহেলিত না হয়। তাহলে শুধু রূপ নয়, সময়ের ভাবপ্রতিমাও ধর্ষিত হবে লেখকের সরলীকরণের আগ্রহে। তাই দেবেশ রায়ের গল্পে আঙ্গিকরীতি তাঁর নিজের বক্তব্যের সহায়ক। যে-নিকষ তিনি ব্যবহার করেন তাহলো তাঁর বিশ্ববীক্ষা। এই বিশ্ববীক্ষাই তাঁকে দিয়েছে এক জীবননিষ্ঠ আবেগ। তাই তাঁর ব্যবহৃত চিত্রকল্পে কবিতার গূঢ় ভাষা। "মাটির বেহালাটা নিজের ছোট্ট দেহটিতে পাগলের মতো ঝোড়ো সুরের আওয়াজ এনে যেন বিদীর্ণ হয়ে যাবার আয়োজন করছে। যেন ঝড়ের সঙ্গে লড়ছে চড়ুই পাখি।"—(দুপুর), "খুব ছোট ছোট পা ফেলে লোকটা, চলনে যেন খই ফোটে।"—(পা), "সঙ্গমরত দুই সাপের মতো বিচিত্র জটিল বন্ধনীতে আশ্লিষ্ট এই দুই প্রশ্নের আলাদা দেহ চেনা যায় না।"—(নিরস্ত্রীকরণ কেন ?)—এইসব বর্ণনার চকিত আলোয় গল্পগুলির অন্তর্লোক পর্যন্ত আলোকিত হয়। ব্যক্তির অন্তর বাহিরের সব বিশৃঙ্খলাকে তিনি ভাষা দিতে চেয়েছেন। 'পশ্চাৎভূমি' গল্পের রীতি তাই আপাত স্বেচ্ছাচারী। কিন্তু পরস্পরবিরোধী ঢেউগুলির ঘাত-প্রতিঘাতের ফেনার মধ্যেও গোটা পুকুরটা কখনোই হারিয়ে যায় না।

তাঁর নীরবতাই দুঃখাবহ। আর কিছু নয়।

ভারতীয় জাতীয়তাবাদের সূত্রপাত

অসিত সেন

উনবিংশ শতকের জাতীয়-আন্দোলনের সঙ্গে ভারতের তৎকালীন সমাজ-ব্যবস্থা ও সামাজিক পরিস্থিতির অঙ্গাঙ্গী যোগসূত্র সম্পর্কে শ্রী অনিল শীল তথ্যসমৃদ্ধ বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। শ্রীশীল প্রধানত প্রাক-কংগ্রেসের জাতীয়-আন্দোলনের সামাজিক ভিত্তি সম্পর্কে তাঁর বিবরণকে সীমিত রেখেছেন। এই সূত্রে শ্রী অনিল শীল বাঙলা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে প্রমাণ করেছেন যে পাশ্চাত্য-শিক্ষিত মধ্যবিত্ত মানুষেরা সমগ্র ভারতে ঐক্যবদ্ধ জাতীয়-আন্দোলনের ধারক ও বাহক হিসাবে উনবিংশ শতকের পাদপীঠে উপস্থিত হয়েছিলেন। মধ্যবিত্তশ্রেণীর মধ্যে সে-দুর্বলতা ছিল তার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে শ্রীশীল উচ্চবর্ণের হিন্দুদের মধ্যে জাতিবৈষম্যের প্রভাব এবং ইংরাজ সরকারের অধীনে উচ্চপদ লাভ করবার প্রতিদ্বন্দ্বীতা সম্পর্কে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

কেবলমাত্র ভাইসরয় ও আমলাতন্ত্রের কার্যকলাপ সম্পর্কে তাঁর আলোচনাকে সীমিত না রেখে শ্রীশীল জাতীয়-আন্দোলনের ফলে ইংরাজ সরকারের ভারতে অনুসৃত নীতি কিভাবে প্রভাবান্বিত হয়েছিল সেই সম্পর্কে মনগ্রাহী আলোচনার অবতারণা করেছেন। সাম্রাজ্যবাদী শাসন এই দেশে সুদৃঢ় করার জন্য মধ্যবিত্ত পাশ্চাত্য শিক্ষিতের সহযোগিতা ইংরাজ সরকারের জরুরি ছিল। ভারতে নবজাগ্রত জাতীয়তাবাদের শক্তি সম্পর্কে এই দেশের ভাইসরয়রা, লিটন, রিপন ও ডাফরিন ক্রমেই সচেতন হয়ে উঠেছিলেন। তাঁরা তাঁদের নিজস্ব পদ্ধতিতে নব্যভারতের শিক্ষিত শ্রেণীর দাবি সম্পর্কে সুচিন্তিত নীতি গ্রহণ করার প্রচেষ্টা করেছেন। এই নীতি কখনও সহযোগিতার পথ গ্রহণ করেছে, কখনও দমনমূলক ব্যবস্থার আশ্রয় গ্রহণ করেছে। কিন্তু বিভিন্ন প্রতিকূল পরিস্থিতিতে প্রচেষ্টা ফলপ্রসূ হয়নি।

The Emergence of Indian Nationalism, Competition and Collaboration in the later Nineteenth century, Anil Seal, Cambridge University Press—70s.

উনবিংশ শতকের জাতীয়তার উন্মেষের আরেকটি বিশেষ লক্ষণ হলো সর্বভারতীয় ভিত্তিতে সংগঠন সৃষ্টির প্রচেষ্টা। শ্রীশীলের ভাষায় বলা যায় যে, "Associations brought nineteenth century India accross the the threshold of modern politics sometimes religious zeal, sometimes caste solidarity encourged the propensity towards associations, but during the course of the century more of the associations in India were brought into being by groups of men united by secular interests." এইসব সংগঠনের মারফতে ভারতে বর্তমান যুগের রাজনীতির আবির্ভাব হয়। প্রাথমিক যুগে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোশিয়েশনের ন্যায় সংগঠন কেবলমাত্র জমিদারদের স্বার্থে সক্রিয় ছিল। কিন্তু ক্রমেই এইসব সংগঠনের স্থলে ইণ্ডিয়ান এসোশিয়েশনের মতো তুলনামূলকভাবে গণতান্ত্রিক সংগঠনের সৃষ্টি হয়। ১৮৭৫ সালে ইণ্ডিয়ার এসোশিয়েশনের একটি ছাত্রশাখাও গঠিত হয়েছিল। কলকাতার তুলনায় ইংরাজ শাসকদের মতে বোম্বাই অনেক বেশি রাজভক্ত ছিল (নর্থব্রুকের ভাষায় Really loyal and well-affected)। বোম্বাইয়ের পার্শী সম্প্রদায় ছিল বিত্তবান ও প্রভাবশালী। ১৮৮৫ সালে বোম্বাইতে প্রেসিডেন্সি এসোশিয়েশন তায়েবজী ফিরোজশাহ মেটা প্রভৃতির প্রচেষ্টায় গঠিত হয়েছিল। কিন্তু বোম্বাইয়ের তুলনায় পুণা রাজনীতিতে অগ্রসর ছিল এবং এইখানে 'সার্বজনিক' সভা মহারাষ্ট্রের মুখপাত্ররূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। উনবিংশ শতকের শেষার্ধে গঠিত এইসব ও অন্যান্য সংস্থার জনসাধারণের সঙ্গে যোগসূত্র নিবিড় হয়নি। বহুক্ষেত্রে এইসব সংগঠনে উচ্চবর্ণের প্রাধান্য ছিল। আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে জাতিরাও গোবিন্দরাও ফুলের ন্যায় তপশীলি নেতারা ব্রাহ্মণ ও উচ্চবর্ণের বিরুদ্ধে সত্য শোধক সমাজের ন্যায় প্রতিষ্ঠান গঠন করেছেন। এই সব সংগঠনের মারফত ধীরেধীরে সর্বভারতীয় ঐক্যচিন্তার জন্ম। উনবিংশ শতকের চিন্তা ও কর্মের মধ্যে জাতীয় ঐক্যের ভাবধারার ফল হিসাবে জাতীয় কংগ্রেসের সৃষ্টি হয়েছিল। শ্রী অনিল শীলের মতে এই সর্বভারতীয় ঐক্যসাধনা ইংরাজ শাসকের পক্ষে আশঙ্কার কারণ হয়েছিল। কিন্তু শিক্ষিত ভারতীয়দের মধ্যে জাতিবর্ণ বৈষম্য, হিন্দু-মুসলমান ও পার্শীদের মধ্যে প্রতিযোগিতা জাতীয়-আন্দোলনে দুর্বলতার কারণ হয়। শ্রীশীল বলেছেন যে "The political arithmatic of India during the 1870's and 1880's when the

movement was taking shape shows that it was not found through the promptings of any class demand or as a consequence of any sharp change in the structure of economy."

শ্রীশীলের অভিমতের সঙ্গে সর্বক্ষেত্রে একমত হওয়া সম্ভবপর নয়। ভারতের জাতীয়-মুক্তি-আন্দোলনে রক্ষণশীল সামাজিক প্রথা বহুক্ষেত্রে দুরাতিক্রম্য বাধার সৃষ্টি করেছে। সাম্রাজ্যবাদ ভারতের জরাজীর্ণ ও পশ্চাদমুখী শক্তিগুলির সাহায্য গ্রহণ করেছে। সুবিধাবাদ অনেক সময় সহযোগিতার পথে অগ্রসর হয়েছে। কিন্তু ইংরাজ শাসন ও শোষণ ভারতকে কাঁচামাল সরবরাহের কেন্দ্রে পরিণত করে ও স্থানীয় গ্রামীণ অর্থনীতি ও শিল্পের ধ্বংস সাধন করে ভারতের আর্থিক সঙ্কট ও অসন্তোষের সৃষ্টি করে। সামন্ততান্ত্রিক শক্তিগুলির সহযোগিতায় ইংরাজ তার শাসন কায়েম করার প্রচেষ্টায় লিপ্ত ছিল। ভারতের ইংরাজের আর্থিক লুণ্ঠন উনবিংশ শতকের শেষপর্যন্ত অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে হতাশা সৃষ্টি করেছিল। (আজিকার ভারতে, ২য় সংস্করণ, পৃষ্ঠা ১৭)।

কিন্তু এই যুগের আরেকটি বিশিষ্ট্যও লক্ষণীয়। উনবিংশ শতক ভারতে বুর্জোয়া ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির বিকাশের প্রাথমিক স্তর। যদিও বৈদেশিক মূলধনীরাই প্রধানত এতে লাভবান হয় তৎসত্ত্বেও বলা যায় যে ধীরে ধীরে ভারতীয় মুলধনীরাও শিল্প ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে প্রতিযোগী হয়ে উঠেছিল। ভারত প্রধানত কৃষিনির্ভরশীল হলেও শিল্পের ক্ষেত্রে পরিবর্তনের সূত্রপাত এই যুগে শুরু হয়। [Trends in the Growth of Manufacturing Industry by Dr. S. Sen (Simla, 1969)]

এই পরিপ্রেক্ষিতে যে জাতীয়-আন্দোলন শুরু হয়—তার মধ্যে প্রাথমিক স্তরে দুর্বলতা ছিল। ইংরাজ জাতীয়-কংগ্রেসকে নরমপন্থী পথে সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থে নিযুক্ত করতে চেয়েছিল। সাম্রাজ্যবাদী শোষণ জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর স্বার্থবিরোধী। অতএব জাতীয়-আন্দোলনকে দ্বিধা-বিভক্ত ও দুর্বল করতে সক্ষম না হলে সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থরক্ষা হয় না। বিভেদ ও শাসনের কৌশল কার্যকরী করার জন্য। এইজন্য সংখ্যালঘু মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রতি ইংরাজ সাম্রাজ্যবাদের ছিল অত্যধিক প্রীতি।

শ্রী অনিল শীলের মতে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে পার্থক্য ছিল সুদূরপ্রসারী। শ্রীশীলের ভাষায় বলা যায় যে, "Admittedly, difference

of principle greatly separated most Hindus from most Muslims." উনবিংশ ও বিংশশতকে ইংরাজ সাম্রাজ্যবাদ ঠিক একই ধরনের যুক্তির দ্বারা জাতীয়-আন্দোলনকে দ্বিধাবিভক্ত করেছে এবং পাকিস্তান সৃষ্টির পথকে সুপ্রশস্ত করেছে। এখন বাঙলাদেশের সাম্প্রতিক স্বাধীনতা-সংগ্রাম এই ভ্রান্ত মতামতের রক্তক্ষয়ী প্রায়শ্চিত্ত আমাদের সকলের হয়ে করছে। কিন্তু প্রাক-ইংরাজ আমলে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে যে-নিবিড় যোগসূত্র ছিল তার ফল হিসাবে জাতীয়-মুক্তি-আন্দোলন হিন্দু-মুসলমান ঐক্য ও সম্প্রীতির মাধ্যমে জোরদার করা সম্ভব ছিল। ১৮৫৭ সালের অভ্যুত্থানে এই দেশের হিন্দু ও মুসলমান মিলিতভাবে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামে সামিল হয়। এই দৃষ্টান্তে সচকিত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ পরবর্তী অধ্যায়ে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধের বীজ উপ্ত করে। কতকগুলি বিশেষ কারণে সাম্রাজ্যবাদের সুবিধা হয়েছিল। এই সব কারণের উল্লেখ করে Y. V. Gankovsky ও L. R. Polenskaya তাঁদের History of Pakistan (Moscow, 1964 পৃষ্ঠা 9) গ্রন্থে বলেছেন যে, "Many of the features in the formation of the Indian bourgeoisie helped the British in their design. Trade and money-lending, the main sources of primitive accumulation for the Indian bourgeoisie were chiefly in Hindu hands. It was not until much later that Muslim merchant capital was channelled into capitalist enterprise. The Muslim bourgeoisie appeared half a century later than the Hindu bourgeoisie."

ব্রিটিশ ভারতের ইতিহাসে উনবিংশ শতকের মধ্যভাগে সৈয়দ আহমদ খাঁই প্রথম মুসলমান বুর্জোয়া শিক্ষাবিদ। শ্রীশীল সৈয়দ আহমদ ও আলিগড় শিক্ষায়তনের ইংরাজ অধ্যক্ষ থিওডর বেকের কংগ্রেসবিরোধী মনোভাবের সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন। বাঙলাদেশের দরিদ্র মুসলমান কৃষক ও বাঙলা, উত্তরপ্রদেশ এবং পাঞ্জাবের ধনী জমিদারশ্রেণীর স্বার্থের মধ্যে যে কোনো প্রকার যোগসূত্র ছিল না সে-সম্পর্কেও শ্রীশীল সচেতন। অথচ শিক্ষিত ও বিত্তবান মুসলমানরা স্বসম্প্রদায়ের সকল ব্যক্তিকে কংগ্রেস থেকে দূরে রাখার প্রচেষ্টায় লিপ্ত ছিলেন। এই ধরনের মনোভাবের কোনো যুক্তিসংগত কারণ শ্রীশীলের বিশ্লেষণে ধরা পড়েনি। শ্রীশীল বলেছেন যে—"But the decision of some of their leaders to hold aloof from the congress

was of great political importance. It gave them an incentive not to hold aloof from each other but to move towards genuine inter-regional alliance ; and on certain assumptions it could justify them in working to find a solution for themselves alone—" (Emergence of Nationalism পৃষ্ঠা ৩৪০)।

পাঞ্জাব ও উত্তরপ্রদেশ এবং অন্যান্য স্থানের মুসলমান বুর্জোয়ারা ধর্মের বিভেদের নবউদ্ভূত সুযোগ গ্রহণ করে প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে সুবিধা আদায়ের প্রচেষ্টায় লিপ্ত ছিল। এই বিষয়ে সাম্রাজ্যবাদ তাদের সাহায্য করে। কিন্তু বিভেদের রাজনীতিতে সাম্রাজ্যবাদের এই ভূমিকা সম্পর্কে শ্রীশীল গুরুত্ব দান করেননি। অথচ এই বিষয়ে সাম্রাজ্যবাদ নিঃসন্দেহে সক্রিয় ছিল। History of Pakistanএ সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তি বিশ্লেষণ করিয়া গ্রন্থকারদ্বয় উপসংহার করেছেন যে, "The many feudal survivals in colonial India, chiefly the caste and communal system, helped the British authorities to import a religious context to the competitive struggle of the various groups of the Indian borgeoisie. That was the ground on which the Muslim Communal movement arose."

শ্রী অনিল শীলের গ্রন্থে সাম্রাজ্যবাদী শোষণের নগ্ন অর্থনৈতিক লুণ্ঠন, সাম্রাজ্যবাদ ও জাতীয়-আন্দোলনের সংঘাত ও সংঘর্ষের আর্থিক ভিত্তি, জাতীয়-আন্দোলনের অন্তর্দ্বন্দ্বের বাস্তবরূপ প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচনা করা হয়নি।

অথচ আজ কে না-জানে, এ-বিষয়গুলির যথাযোগ্য বিশ্লেষণ না হলে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের উদ্ভবের ইতিহাস ব্যাখ্যা একেবারেই অসম্ভব।

রেনেসাঁসের কণ্ঠস্বর

বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য

একটা দেশ ও জাতি যখন জেগে ওঠে তখন সেই জাগরণের গান সর্বাগ্রে ধ্বনিত হয় তাদের সাহিত্যে। আসন্ন বিপ্লবের স্পষ্ট পদধ্বনি শোনা যায় জাগরণকালের রচনায়। কিছু একটা হতে যাচ্ছে, কিছু একটা হবে এই সম্ভাবনায় সমস্ত সাহিত্য যেন মুখরিত হয়ে ওঠে। আলোচ্য সঙ্কলনের রচনাগুলি সেই যুগসন্ধিক্ষণের বার্তাবহ হিসেবেই আমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছে। গ্রন্থটির নাম ইতিমধ্যে সামগ্রিক অর্থেই পাল্টে গেছে। যেহেতু পূর্ব-পাকিস্তান ইতিহাসের অমোঘ নির্দেশে বাঙলাদেশ হয়ে গেছে তাই এই সঙ্কলন আসলে মুক্তিযুদ্ধপূর্ব বাঙলাদেশের প্রবন্ধ সংগ্রহ। তথাপি ইতিহাসের খাতিরেই আবার বর্তমান নাম থাকা বাঞ্ছনীয়। কারণ এই প্রবন্ধগুলি প্রমাণ করবে কেন এবং কীভাবে পূর্ব-পাকিস্তান ধীরে ধীরে বাঙলাদেশে রূপান্তরিত হলো।

একথা ঠিক জন্মলগ্নে পাকিস্তান ধর্মীয়-রাষ্ট্র হিসেবেই আত্মপরিচয় দিয়েছিল। আমরাও দীর্ঘকাল ধরে পাকিস্তানকে ধর্মীয়-দৃষ্টিতেই বিচার করে আসছি। হয়তো মাঝে মাঝে ওদেশের কিছু খবর কিছু ঘটনা আমাদের মনকে প্রভাবিত করেছে, কিন্তু ইতিমধ্যে অন্তত পূর্ব-পাকিস্তানে যে-বরফ গলতে শুরু করেছিল সে-খবর আমরা যথাসময়ে পাইনি। ভাষা-আন্দোলন, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা প্রতিরোধে সেখানকার সংবাদপত্র, বুদ্ধিজীবী ও ছাত্রদের বলিষ্ঠ ভূমিকা মাঝেমাঝে আমাদের সচকিত করছিল বটে কিন্তু তখনও পর্যন্ত আমরা যেন বেশ খানিকটা আত্মগরিমায় বিভোর ছিলাম। অমরা ঘোরতর অসাম্প্রদায়িক, প্রগতিশীল, ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি-সচেতন ইত্যাদি ভেবে।

কিন্তু ইতিমধ্যে যেন বিনামেঘে বজ্র নেমে এল। বাঙলাদেশের হৃদয় থেকে সাড়ে-সাত কোটি মানুষ যেদিন ভাষা ও সংস্কৃতির আন্দোলনকে সাম্রাজ্যবাদ ও ঔপনিবেশবাদ-বিরোধী সশস্ত্র সংগ্রামে রূপায়িত করলেন সেদিন আমাদের সমস্ত

পূর্ব-পাকিস্তানের প্রবন্ধ সংগ্রহ। সম্পাদনাঃ মৈত্রেয়ী দেবী। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি পরিষদ। মূল্যঃ আট টাকা।

গর্ব ধূলিসাৎ হলো আমরা বিস্মিত-আনন্দে বলিষ্ঠ প্রত্যাশায় ওপারের দিকে তাকিয়ে রইলাম। এই বিস্ময়ের কারণ, 'ধর্মরাষ্ট্রের মধ্যে কখন ধীরে ধীরে সেকুলার চরিত্র গড়ে উঠল, এদেশে বসে আমরা তার কিছুই সংবাদ রাখি নি' (ভূমিকা)। যেদিন এই সেকুলার চরিত্রগঠন সম্পূর্ণ হলো সেদিন মুক্ত ও স্বচ্ছ দৃষ্টিতে পূর্ব-পাকিস্তানের বুদ্ধিজীবী চারদিকে তাকাবার অবকাশ পেলেন। পেলেন নিজেদের মনের ভিতরে তাকাবার অবসরও। এবং তারই ফলে তাঁরা অনিবার্য সিদ্ধান্তে পৌছোলেন—"হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃষ্টান যে কোন ধর্মাবলম্বী লোকই যদি বাংলাদেশে বসবাস করে, বাংলায় কথা বলে, বাংলার আর্থিক জীবনে অংশ গ্রহণ করে এবং বাংলার ঐতিহ্যকে সাধারণভাবে নিজেদের ঐতিহ্য বলে মনে করে তাহলে তাকে বাঙালী বলার অথবা তার নিজের পক্ষ থেকে বাঙালী হিসাবে পরিচিত হওয়ার কোন অসুবিধা হয় না" (বাঙালী সংস্কৃতির সঙ্কট : বদরুদ্দিন অমর)। সঙ্গে সঙ্গেই আত্ম-সমালোচনাও তীব্র হয়ে উঠল—"কিন্তু একথাও আবার অস্বীকার করার উপায় নেই যে বাংলাদেশের মুসলমানেরা অনেকক্ষেত্রে নিজেদের বাঙালী বলে পরিচয় দিতে দ্বিধা এবং সঙ্কোচ বোধ করেন। দ্বিধা এবং সঙ্কোচের উৎপত্তি সাম্প্রদায়িকতায়। সাম্প্রদায়িকতার জন্যই বাংলার সাধারণ সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যকে মুসলমানরা নিজেদের সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্য বলে স্বীকার করতে সহজে প্রস্তুত হন না"। উক্ত ঐতিহাসিক প্রবন্ধেই বদরুদ্দিন উমর যেন রেনেসাঁসের পথনির্দেশ করলেন, "বাঙালী, মুসলমান এবং পাকিস্তানীর মধ্যে কোন অন্তর্নিহিত বিরোধ অথবা দ্বন্দ্ব নেই অর্থাৎ একই ব্যক্তি পাকিস্তানী বাঙালী মুসলমান হিসাবে নিজের পরিচয় স্বচ্ছন্দে এবং অর্থপূর্ণভাবে দিতে পারেন। এটা পারেন বলেই 'আমরা বাঙালী' 'না মুসলমান, না পাকিস্তানী ?' এ-প্রশ্ন অর্থহীন যেমন অর্থহীন 'আমরা কি বাঙালী, না মৎস-ভোজী, না সঙ্গীতামোদী, না বিশ্বশান্তিকামী ?' এ-প্রশ্ন।

দুই

বাঙালী মুসলমান যেদিন স্বদেশীয় ভাষা ও সংস্কৃতিকে আত্মস্থ করলেন সেদিন তার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরাধীনতার দিনও সীমিত হয়ে এল। সবচেয়ে লক্ষণীয় ব্যাপার এই যে পূর্ব-পাকিস্তানের সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন তার মুক্তির লড়াইকে শুধু পুষ্টই করেনি এ-লড়াইয়ের মূল তত্ত্বই অনেকাংশে এই আন্দোলনের উপর প্রতিষ্ঠিত। সম্পাদিকা ভূমিকায় ঠিকই

মন্তব্য করেছেন, "পূর্ব-পাকিস্তানের নব রাজনৈতিক চেতনা ভাষা ও সাহিত্যকে অবলম্বন করেই স্ফূর্ত হয়েছে। তাই সাহিত্য তাঁদের অবসর বিনোদনের বস্তু নয় বা সাহিত্যিকের আর্থিক উন্নতির উপায় মাত্র নয়। সাহিত্যের দ্বারাই তাঁরা যুগবাণীকে জীবনে উপলব্ধি করছেন।" এই উপলব্ধির যথার্থ উদাহরণ দেওয়ার জন্যই বোধহয় আলোচ্য সঙ্কলনে তথাকথিত রাজনৈতিক প্রবন্ধ একেবারেই নেই। পাকিস্তানের উভয় অংশের অর্থনৈতিক বৈষম্য এবং শোষণের চেহারা কোনো প্রবন্ধেই পাওয়া গেল না। বোধহয় তার দরকারও ছিল না। কারণ 'প্রত্যেকটি প্রবন্ধেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে অসাম্প্রদায়িক, যুক্তিবহ মুক্ত চিন্তার প্রকাশ' আর এই 'বুদ্ধিকে মুক্তি'র পথ ধরেই যে ক্রমশ শোষণ ও লুণ্ঠনের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা সোচ্চার হয়ে উঠবে এটা বুঝতেও আমাদের কোনো অসুবিধে হয় না। তাই সঙ্কলনের ১৬টি প্রবন্ধই মূলত ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক।

সংস্কৃতি বিষয়ক প্রবন্ধগুলিকেই প্রথমে ধরা যাক। এই পর্যায়ের তিনটি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ সঙ্কলনে রয়েছে—'বাঙালী সংস্কৃতির সঙ্কট' বদরুদ্দিন উমর, 'সংস্কৃতি আমাদের উত্তরাধিকার' আবুল ফজল এবং 'সাম্প্রদায়িকতা ও সংস্কৃতি' আবু আহসান। প্রবন্ধ তিনটির মধ্যেই এক জায়গায় মিল আছে। সংস্কৃতিকে সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিতে কেউই দেখেননি। বরং, ধর্ম ও সংস্কৃতি যে সম্পূর্ণ আলাদা বস্তু প্রত্যেকেই সেটা প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছেন। সাম্প্রদায়িকতা যখন সাংস্কৃতিক নামে বাজারে চলে তখন যে রাজনীতিবিদদেরই কেবলমাত্র সুবিধে হয় এটা বুঝতে এঁদের কারোরই অসুবিধে হয়নি। সংস্কৃতির সংজ্ঞা নির্ধারণের ক্ষেত্রেও এদের দৃষ্টিভঙ্গি রীতিমতো স্বচ্ছ। "মনুষ্যত্ব তথা মানব-ধর্মের সাধনাই সংস্কৃতি এবং একমাত্র এ-সাধনাই জীবনকে করতে পারে সুন্দর ও সুস্থ।… ব্যক্তি নয়, জাতি নয়—জীবন। এই জীবনসাধকই হতে পারেন প্রকৃত সংস্কৃতিবান বা cultured, তাই সমঝদার ঐতিহাসিক হজরত মহম্মদকে বলেছেন জীবনসাধক, আর রসগ্রাহী সমালোচক রবীন্দ্রনাথের পরিচয় দিয়েছেন জীবন-শিল্পী বলে" (সংস্কৃতি ও আমাদের উত্তরাধিকার : আবুল ফজল)। ধর্মগুরু হজরত মহম্মদ ও কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ এই দুজনকে যথার্থ সংস্কৃতিবান অর্থাৎ জীবন-প্রেমিক হিসেবে ঘোষণা করবার মধ্যে যে বলিষ্ঠ স্বচ্ছতা ও প্রগতিশীলতা রয়েছে তা আয়ত্ত করা এখনও আমাদের পক্ষে সাধ্যাতীত। শুধু এই নয়। আবুল ফজল আরও জানেন যে ধর্ম বিভিন্ন-মানুষের মধ্যে ঐক্য আনে না, ঐক্য আনে তাদের জীবিকা অর্থাৎ আর্থনীতিক অবস্থা। "জীবিকার চেহারা বদলের সঙ্গে

সঙ্গে সংস্কৃতির চেহারাও বদলে যাচ্ছে, যেতে বাধ্য। ধর্ম আর শাস্ত্রের যত দোহাই দিই-না-কেন মুসলমান কৃষক আর মুসলমান ব্যারিস্টারের সংস্কৃতি কখনো এক নয়।" অথচ এই ধর্মীয় ঐক্যের শ্লোগান দিয়েই পাকিস্তানের সৃষ্টি হয়েছিল। এই ধর্মীয় ঐক্যের বন্ধন ক্রমশ শিথিল হতে হতে আজ সম্পূর্ণ ছিন্ন। আর এরই পরিণতিতে আর্থনীতিক স্বাধীনতা অর্জনের সংগ্রামের সূচনা।

আবু আহসানের বক্তব্য আরও ঝাঁঝালো, আক্রমণ আরও মর্মঘাতী। "স্বসম্প্রদায়ের হিত যদি হতো সাম্প্রদায়িকতার প্রধান লক্ষ্য, সম্প্রদায়ের প্রতি প্রীতি হতো তার প্রধান প্রেরণা, তাহলে এতদিনে স্বর্ণযুগ আসতো ভারতের হিন্দুসমাজে এবং পাকিস্তানের মুসলিম সমাজেও। অন্ততঃ স্বাধীনতার আমলে তার কাছাকাছি যাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তা সম্ভব হয়েছে কি? বরং এটাই কি আমাদের অভিজ্ঞতা নয় যে সাম্প্রদায়িকতাবাদী অনেক সময় তাঁর আহার সংগ্রহ করেন অপর সম্প্রদায়ের শরীর থেকে নয় শুধু, নিজের সম্প্রদায়ের শরীর থেকেও" (সাম্প্রদায়িকতা ও সংস্কৃতি)। এ-জাতীয় মন্তব্যেই বোঝা যায় যে পূর্ব-পাকিস্তানের বুদ্ধিজীবীদের সংস্কৃতি চেতনা ধর্মনিরপেক্ষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কেমন রাজনীতি-সচেতন হয়ে উঠেছে। লক্ষ্য করার বিষয় যে সংস্কৃতির স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য বিচার করতে গিয়ে এরা প্রত্যেকেই শেষপর্যন্ত অর্থনৈতিক শোষণের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন আর স্বভাবতই সকলের দৃষ্টি অনিবার্য ভাবে পড়েছে পশ্চিম-পাকিস্তানের শাসক-গোষ্ঠীর প্রতি। এইজন্যই আগে বলেছি যে এই সঙ্কলনে রাজনীতি-বিষয়ক প্রবন্ধ না থাকলেও বিশেষ কোনো ক্ষতি হয়নি। কারণ, অধিকাংশ প্রবন্ধই রাজনৈতিক এবং আর্থনীতিক সমস্যা ও বৈষম্য থেকে উদ্ভূত। কেবল সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চা করবার জন্যই প্রবন্ধকারেরা এ-সমস্ত লেখা লেখেননি।

বদরুদ্দিন উমরের প্রবন্ধটি ইতিমধ্যেই ঐতিহাসিক গুরুত্ব অর্জন করেছে। বদরুদ্দিন সাহেব রাজনীতি-সচেতন লোক। বাঙালি মুসলমানের সংস্কৃতির সংশয়ের ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক সূত্রটি তিনি তাই অনায়াসে আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছেন। "ইংরেজ বিদ্বেষের ফলে তারা পাশ্চাত্য শিক্ষাদীক্ষার প্রতি অনেক ক্ষেত্রে হয় বিরূপ মনোভাব সম্পন্ন। আবার হিন্দুবিদ্বেষের ফলে তারা ভারতীয় সংস্কৃতি এবং বাংলার সংস্কৃতি থেকেও নিজেদেরকে বিচ্ছিন্ন করবার চেষ্টা করে।" (বাঙালী সংস্কৃতির সংকট)

বদরুদ্দিন ঠিকই লক্ষ্য করেছেন, "অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক কারণে

হিন্দুদের থেকে নিজেদেরকে পৃথক করে দেখার চেষ্টার মধ্যেই 'আমরা বাঙালি না মুসলমান?' এ প্রশ্নের উদ্ভব এবং সাম্প্রদায়িক আবহাওয়ার মধ্যেই এ চিন্তাধারার বিকাশ।" (ঐ) বদরুদ্দিন যুক্তি ও তথ্য সহকারে দেখিয়েছেন যে এই সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গির জন্যই বাঙালি মুসলমানদের সাংস্কৃতিক চেতনার ভারসাম্যের অভাব আর "এই অভাবই তাদের দৃষ্টিহীনতার জন্যে অনেকাংশে দায়ী। এই কারণেই তারা সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে হতবুদ্ধিতা উত্তীর্ণ হয়ে দিক নির্ণয় করতে আজ পর্যন্ত সমর্থ হয় নি।" এই 'সৃষ্টিহীনতা ও হতবুদ্ধিতা'র হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার উপায় নির্দেশ করতেও লেখকের কোন অসুবিধে হয় নি। বাঙালি মুসলমানকে বাঙালি সংস্কৃতির ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারিত্ব অর্জন করতেই হবে। নইলে তার কোনও ভবিষ্যৎ নেই। "যতদিন না আমরা চণ্ডীদাস, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, মাইকেল মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, অতুলপ্রসাদ, অবনীন্দ্রনাথ প্রভৃতিকে নিজেদের সাহিত্য সংস্কৃতির ঐতিহ্যের ধারক এবং বাহক হিসাবে গণ্য এবং স্বীকার করতে শিখবো ততদিন পর্যন্ত আমাদের সংস্কৃতির মধ্যে সৃষ্টির গতিবেগ সঞ্চার করতে আমরা সমর্থ হবো না। আমাদের চারিধারে নানারকম কৃত্রিম বাধার দেওয়াল তুলে আমরা নিশ্চল ডোবার পানিতেই শুধু অবগাহন করবো।"

তিন

সংস্কৃতির পরে ভাষা। একদিক দিয়ে বিচার করলে ভাষারই স্থান পাওয়া উচিত ছিল সবার আগে। ১৯৫২ সালের ২১এ ফেব্রুয়ারি ভাষা সংগ্রামের যথার্থ সূচনা। কিন্তু ভাষা আন্দোলন তো বৃহত্তর অর্থে সাংস্কৃতিক চেতনারই অঙ্গ। প্রকৃত সংস্কৃতিবান হলে পরেই মাতৃভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে অংশগ্রহণ সম্ভব। তাই সংস্কৃতির পরে ভাষার উল্লেখ করা হলে পূর্ব-পাকিস্তানের ভাষা আন্দোলনকে যথাযোগ্য স্বীকৃতিই দেওয়া হয়। ভাষা বিষয়ক প্রবন্ধ এখানে তিনটি। 'আমাদের বাংলা উচ্চারণ', মুহম্মদ আবদুল হাই; 'আমাদের ভাষা সমস্যা', ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ এবং 'ইংরেজীর ভবিষ্যৎ', জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী। প্রথমোক্ত দুজনই প্রখ্যাত ভাষাবিদ্ এবং শেষোক্তজন তরুণ শিক্ষাব্রতী। প্রত্যেকের প্রবন্ধেই সেই এক কথা বাঙালির সবচেয়ে গৌরবের বস্তু ভাষা ও সাহিত্যের ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারিত্বকে প্রত্যেকেই আঁকড়ে ধরতে চেয়েছেন। এক "চলতি উচ্চারণকে যাঁরা কলকাতা, শান্তিনিকেতন তথা

পশ্চিমবাঙলাভিত্তিক বলে বর্জন করতে চান, আমি তাঁদের সঙ্গে একমত নই। এ-উচ্চারণ পশ্চিমবাঙলাভিত্তিক হলেও প্রাক্ আজাদি যুগের বহু জিনিসের মতো আমরা এর উত্তরাধিকারী।" (আবদুল হাই)। দুই, "আমরা, বাঙালি মুসলমানেরা, গত দেড়শ বছরে কোন ভাষাই আয়ত্ব করতে পারি নি। দু'চার জন উজ্জ্বল ব্যতিক্রম এ সিদ্ধান্তকে খণ্ডায় না প্রমাণ করে।...এখন, স্বাধীনদেশে আমরা নতুনভাবে বাংলাভাষার স্বাধিকারে প্রতিষ্ঠিত হতে চাই। স্বচ্ছ ও সংস্কারমুক্ত মনে আমাদের এই কর্মে নিবিষ্ট হতে হবে।...দেড়শ বছরের উত্তরাধিকারকে অস্বীকার করে নয়, আত্মস্থ করেই আমাদের এই সাধনা চলবে।" (জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী) মুহম্মদ শহীদুল্লাহে্র নাম শুধু ওপার বাঙলাতেই নয়, এপার বাঙলাতেও কিংবদন্তীর মতো। এই জ্ঞানতপস্বী ভাষাচার্যের মত দুই বাঙলার লোকই শ্রদ্ধার সঙ্গে মেনে নিত। তাঁরও একই মত 'বাংলা ভাষা চাই-ই', ভাষার শুদ্ধি বা খতনার তিনি ঘোরতর বিরোধী। সংস্কৃতপণ্ডিত এবং মৌলভী-মৌলানাদের গোঁড়ামির বিরুদ্ধে তিনি খড়গহস্ত। তাঁর মতে ভাষা হবে স্বচ্ছ এবং সাবলীল। মুসলমানি বাঙলা বলে আলাদা কোন ভাষার অস্তিত্ব তিনি স্বীকার করতেও রাজি নন। বরং তিনি উদাহরণ দিয়ে দেখিয়েছেন যে গোঁড়া বাঙালি মুসলমান যে সমস্ত শব্দ ব্যবহার পছন্দ করেন তার অধিকাংশই পারসী, হিন্দুস্থানী বা রাজপুতানী ভাষা। তাঁর একটি আকর্ষণীয় উদাহরণের উদ্ধৃতি দেবার লোভ সংবরণ করতে পারছি না—"মুসলমানী বাংলার কটমট বুলি বাংলার হিন্দুর কানে স্থান পাইবে না, অন্তরে তো নয়ই। খোদা, পয়গাম্বর, বেহেশত, দোযক, ফেরেশ্‌তা, নামায, রোযা প্রভৃতি পারসী শব্দ ব্যবহার করিতে যদি আপত্তি না থাকে তবে ঈশ্বর, স্বর্গ, নরক, উপাসনা, উপবাস প্রভৃতি শব্দ ব্যবহারে আপত্তি কেন? পানি, চাচা, নানা, দাদা, ফুফু প্রভৃতি শব্দগুলি ত হিন্দী বা রাজপুতানী। ইহাদের জন্য এত মারামারি কেন?" (আমাদের ভাষা সমস্যা)।

চার

পূর্ব-পাকিস্তানের সাম্প্রতিক সাহিত্য সম্পর্কিত কোনো রচনা এই সঙ্কলনে নেই। এটা একটা বড় অভাব একথা স্বীকার করতেই হবে। তবে এই অভাব পূরণ করা হয়েছে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে তিনটি রচনা দিয়ে। এটা আজ ঐতিহাসিক সত্য যে পূর্ব-পাকিস্তানে রেনেসাঁসের অন্যতম পুরোধা স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ।

সীমান্তের এপারে আমরা যখন রবীন্দ্রনাথকে সার্থকভাবে বর্জন করতে পেরেছি তখনই ওপারে রবীন্দ্রনাথ নতুন করে জন্ম নিলেন। রবীন্দ্রনাথের কবিতায়, গানে, চিন্তায় ওপারের মানুষ ধর্মীয় শাসনের বন্ধন থেকে মুক্তির উপায় খুঁজে পেলেন। হিন্দু সাহিত্য ও সংস্কৃতির দ্বারা প্রভাবিত হবার ভয় যেদিন তাদের চলে গেল সেদিনই তারা নিজেদের ঐতিহ্যকে খুঁজতে বের হলেন। আর এর ফলে অনিবার্যভাবেই তাদের রবীন্দ্রনাথের কাছেই ফিরে যেতে হলো। তাই "উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে বাঙালির জীবনে রামমোহনের যে স্থান, ধর্মরাষ্ট্র পাকিস্তানে মোল্লাতন্ত্রের বদলে রবীন্দ্রনাথ সেই স্থান নিলেন।"

এই কারণেই রবীন্দ্রনাথের উপর তিনটি কেন আরও দু-একটি প্রবন্ধ থাকলেও অন্যায় হতো না। কারণ "পাক-ভারতে ইতিপূর্বে মানবাত্মার এত বিচিত্র খাদ্য আর কেউ রচনা করেন নি। পৃথিবীর ইতিহাসেও এমন রকমারি ফসলের স্রষ্টা সুদুর্লভ। এত বড়ো মানবতাবাদীও ঘরে ঘরে জন্মায় না। পৃথিবীর আত্মীয়-সমাজে রবীন্দ্রনাথ আমাদের পরমাত্মীয়। কেননা, যে-ভাষা আমাদের জীবনানুভূতির ও জীবনোপভোগের বাহন, যে-ভাষা আমাদের জীবনস্বরূপ, সেই আত্মার ভাষাতেই আমাদের আত্মার উপজীব্য দিয়ে গেছেন তিনি। এত বড়ো সুযোগ ও সৌভাগ্যকে হেলা করার মতো নির্বোধ হই কি করে।" (পঁচিশে বৈশাখে : ডঃ আহমদ শরীফ)।

পূর্ব-পাকিস্তানের প্রশাসকগোষ্ঠী এবং এক শ্রেণীর রক্ষণশীল বুদ্ধিজীবী রবীন্দ্রনাথকে ইসলাম-বিরোধী প্রতিপন্ন করে দূরে সরিয়ে রাখতে চেষ্টা করেছিলেন। তিনি হিন্দু ও ভারতীয় সংস্কৃতির সাধক। অতএব, ইসলামী রাষ্ট্রে তাঁর স্থান নেই। আর একদল রবীন্দ্র সাহিত্যে যে ইসলাম বা পাকিস্তানের কথাবার্তা আছে তা প্রমাণ করতে ব্যস্ত। "রবীন্দ্রনাথ বাংলা ভাষাকে মধ্যযুগের অন্ধকার হইতে একালে আনিয়াছেন, সঙ্গীত নাটকাদির আদর্শ এখনও রবীন্দ্রনাথ, নবশিল্পান্দোলনের তিনিই হোতা, রাজনীতি ও দর্শনের ব্যাপারে দামী দামী কথা বলিয়াছেন, তবু রবীন্দ্রনাথে ইসলামের কথাবার্তা খুঁজিতে হইবে (তিনি হিন্দু হইলেও মাফ করিব না); পাকিস্তানের কথাবার্তা আছে কিনা তাহাও বাহির করিতে হইবে (পাকিস্তান নাই বা হইল লাহোর রেজুলেশন তো হইয়া গিয়াছে)।" (রবীন্দ্রনাথ ও মুসলমান সমাজ : আসাদ চৌধুরী)। এতে যে আসলে রবীন্দ্রনাথকে তথা গোটা বাঙালি ঐতিহ্যকে অপমান করা হয় সেটা বুঝতে পূর্বপাকিস্তানের চিন্তাশীল মানুষের অসুবিধে হয়নি।

তাঁকে নির্দোষ প্রমাণ করতে গিয়ে আসলে তাঁরই অপমান করা হচ্ছে এটা এঁরা বারবার সকলকে বোঝাবার চেষ্টা করেছেন। বরং, এঁদের থেকে রবীন্দ্র-বিরোধীরা একদিক দিয়ে ভালো। "তাঁরা সূর্যের প্রচণ্ডতাপ স্বীকার করেন বলেই অন্ধকারের প্রাণীর মতো আত্মরক্ষার ভাবনায় বিচলিত।" (ডঃ আহ্‌মদ শরীফ)

রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার জন্যই পূর্বপাকিস্তানে রবীন্দ্রনাথের প্রবেশ নিষিদ্ধ হওয়া উচিত এ যুক্তিতেও এদের কাবু করা যায়নি। বরং উল্টে তাঁরা অভিযোগ-কারীদের স্বাজাত্যবোধ বা দেশপ্রেম সম্পর্কেই প্রশ্ন তুলেছেন। "আমরা কি এতই পাপাত্মা যে দেশের স্বার্থ বুঝব না।" তারপরেই তাঁরা নিশ্চিত বিশ্বাসে ঘোষণা করেছেন "আমাদের গরজেই আমরা রবীন্দ্রসাহিত্যের পাঠক।"

সঙ্কলনে আরও কয়েকটি বিশিষ্ট প্রবন্ধ আছে। বিষয়বস্তু ভিন্ন হলেও সেগুলি সবই একসুরে বাঁধা। যেমন মুখলেসুর রহমানের 'প্রাচীন বরেন্দ্রীর মা ও শিশুমূর্তি'। মূর্তি সম্পর্কে স্পর্শকাতর মুসলমান লেখকের হাত দিয়ে যে প্রবন্ধ বেরিয়েছে মূর্তি-পূজারী তেমন লেখকের সংখ্যা এদেশে এখনও বেশি নয়। 'বুদ্ধির মুক্তি' আন্দোলনের অন্যতম নেতা কাজী মোতাহার হোসেনের 'সাহিত্যে ব্যক্তিত্ব' একটি আকর্ষণীয় প্রবন্ধ, অথবা সারওয়ার মুরশিদের দীর্ঘ গবেষণাধর্মী রচনা 'ইয়েটস ও রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গ' সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। কিন্তু, বিষয় ধরে আলাদা আলাদা প্রবন্ধগুলির বিচার করা স্বল্প পরিসরে সম্ভব নয়, বোধহয় তার যৌক্তিকতাও নেই, সমস্ত রচনার মধ্যেই নতুন জাগরণের সুর, আর জাগরণের পরেই আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রাম। অন্নদাশঙ্কর রায় তাঁর চমৎকার ভূমিকায় বলেছেন যে এই রেনেসাঁসের পরেই আসবে রিফরমেশন। সবিনয়ে নিবেদন করি পূর্বপাকিস্তান কিন্তু রেনেসাঁসের পর সশস্ত্র জাতীয়-মুক্তি আন্দোলনের দিকেই পা বাড়িয়েছে।

বরং রিফরমেশন নামক শুদ্ধিব্যাপারটা আজকের ইতিহাসের বিচারে নিতান্তই কালৌচিত্যহীনতার দোষে দুষ্ট, আর একদেশের ইতিহাস অন্যদেশের ইতিহাসের সঙ্গে খাপেখাপে মিলিয়ে দেওয়াও যায়না। এখন তাই বাঙলাদেশে চলেছে যে জাতীয়-মুক্তির আপ্রাণ সাধনা সে-সাধনার চরিতার্থতা আসবে সমাজতন্ত্রের লক্ষ্যে পৌছনোয়। এ-যুগে সে-বোধটাই রেনেসাঁসের নতুন ও গুণগতভাবে পরিবর্তিত মানবাদর্শ।

যুক্তফ্রণ্টের তত্ত্ব ও রাজনীতি

দিলীপ বসু

'ইউনাইটেড ফ্রন্ট' বা যুক্তফ্রণ্টের নীতি রণকৌশল (ট্যাকটিকস) অবশ্য কমিউনিস্ট আন্দোলনের ও কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের একেবারে গোড়ার জিনিস। ১৮৪৮ সালে 'কমিউনিস্ট ইশতেহার' লিখে মার্কস-এঙ্গেলস যেমন কমিউনিজমের মতাদর্শগত ভাবধারা প্রচার করলেন, তেমনি ঐ ঐতিহাসিক দলিলেরই দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে প্রলেতারিয়েতের সঙ্গে কমিউনিস্টদের কী সম্পর্ক হবে, এবং একেবারে অন্তে চতুর্থ পরিচ্ছেদে বিভিন্ন দেশের বিরোধী পার্টিদের সম্পর্কে কমিউনিস্টদের 'অবস্থান'গত ('position') রণকৌশলের সম্পর্কের কথা, ফ্রান্স, সুইজারল্যাণ্ড, পোল্যাণ্ড এবং জার্মান বুর্জোয়াদের সঙ্গে যুক্তফ্রণ্টের পলিসির প্রয়োজনীয়তার কথা বলা হয়েছে।

১৯১৭-এর ৭ই নভেম্বর রুশিয়ার বল্‌শেভিক পার্টিও একলা ক্ষমতা দখল করেনি, বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশনারীদের সঙ্গে যুক্তফ্রন্ট গঠন করে (বিশেষ করে তাদের ভূমিসমস্যা সম্পর্কে প্রোগ্রাম খানিকটা গ্রহণ করে) ক্ষমতা দখল এবং ইতিহাসে প্রথম সোশ্যালিস্ট তথা প্রলেতারিয়ান বিপ্লব সফল করে।

তারপর ১৯২০ সাল থেকে ইউরোপের দেশেদেশে, আমেরিকা এবং এশিয়াতেও যখন কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে উঠতে লাগল, শ্রমিকশ্রেণীর ঐক্য, শ্রমিক-কৃষকের ঐক্য, সাম্রাজ্যবাদী দেশের জঙ্গী কমিউনিস্ট শ্রমিক-আন্দোলনের সঙ্গে পরাধীন দেশের জাতীয়-মুক্তি-স্বাধীনতা আন্দোলনের মিতালি ও ঐক্যবদ্ধ ফ্রন্ট গঠনের প্রশ্ন কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক (তৃতীয়, বা কমিন্‌টার্ন) এর সামনে দেখা দিতে থাকল।

কমিনটার্নের দ্বিতীয় বিশ্ব-অধিবেশনে (১৯২০ সালে) লেনিনের প্রস্তাবিত জাতীয় ও উপনিবেশের মুক্তি-স্বাধীনতা আন্দোলনের থিসিস প্রথম পরাধীন ঔপনিবেশিক দেশগুলিতে (বিশেষ করে ভারতে) কমিউনিস্ট আন্দোলনের

Dimitrov on "United Front"—প্রকাশনা: People's Publishing House (P) Ltd, New Delhi—দাম: লাইব্রেরী সংস্করণ—আট টাকা, সুলভ সংস্করণ—চার টাকা।

গোড়াপত্তন করলেও, মানবেন্দ্রনাথ রায়ের সংশোধনী প্রস্তাবে খানিকটা সঙ্কীর্ণতাবাদী ঝোঁক থেকে গেল। ইউরোপেও শিশু কমিউনিস্ট আন্দোলনের অতি-বামপন্থী সঙ্কীর্ণতাবাদী ঝোঁক থাকা বিচিত্র নয়। আর আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রে লাভষ্টোনের নেতৃত্বে 'আমেরিকান বৈশিষ্ট্যতাবাদ' (American Enceptionalism) নামে এক ঝোঁক দেখা গেল—যার প্রধান উপপাদ্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এমনই এক সৃষ্টিছাড়া আলাদা দেশ, যেখানে যেন ধনতন্ত্রের সাধারণ নিয়মগুলি একেবারেই অচল, যেখানে ধনতন্ত্রের অবাধ বৃদ্ধির সুযোগ থাকাতে এবং হেনরি ফোর্ডের মতো 'দূরদৃষ্টিসম্পন্ন' পুঁজিবাদী থাকাতে' নাকি 'জনসাধারণের ধনতন্ত্র' গড়ে তোলা সম্ভব। এই ধরনের বক্তব্য আজকের দিনে অবান্তর তো নয়ই, বরঞ্চ আজকের আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রে প্রফেসার গ্যালব্রেথ থেকে শুরু করে অনেকেই 'জনগণের পুঁজিবাদ' (people's capitalism) এর কথা বলতে আরম্ভ করেছেন।

১৯২৮-এর ষষ্ঠ কংগ্রেস

১৯২৮ সালে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক-এর ষষ্ঠ বিশ্ব-অধিবেশনে যে-প্রোগ্রাম গৃহীত হয়েছিল, তাতে বিশ্ব-ধনতন্ত্রের সাধারণ সঙ্কট এবং প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের উদ্ভবের পটভূমিতে বিশ্ব-কমিউনিস্ট আন্দোলনের পূর্ণতর বিকাশ ও সমাজ-বিপ্লবের ভবিষ্যতের দিকনির্দেশ যেভাবে করা হয়েছে, তা সত্যিই বিস্ময়কর। তাতে ধনতন্ত্রের সাধারণ সঙ্কটের ফলে উৎপাদনজনিত মন্দা বাজারের সমস্যার সম্ভাবনার প্রশ্ন এমনভাবে উত্থাপিত হয়েছিল যে, যখন ১৯২৯ সালে সত্যসত্যই সমগ্র ধনতান্ত্রিক জগতে সঙ্কট দেখা দিল, নিউইয়র্কের ওয়াল ষ্ট্রিটের শেয়ার-বাজারে প্রচণ্ড মন্দার ধাক্কা যখন সারা দুনিয়াতে ছড়িয়ে পড়ল, তখন ত্রস্ত ধনিক-সম্প্রদায়ের দু-একজন কুশলী 'চিন্তাবিদ' প্রায় গুপ্ত তথ্য আবিষ্কার করে বসলেন যে, এসবই কমিউনিস্টদের চক্রান্ত; কারণ তা নাহলে এক বছর পূর্বেই, ১৯২৮ সালে, তাদের ষষ্ঠ বিশ্ব-কংগ্রেসে কী করে তারা এই সঙ্কটের সম্ভাবনার কথা পরিষ্কার দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ব্যক্ত করতে চেয়েছিলেন!

তথাপি কমিনটার্নের ষষ্ঠ-কংগ্রেসে অতি-বামপন্থী সঙ্কীর্ণতাবাদের ঝোঁক ভালোভাবেই দেখা দিয়েছিল। একদিকে তখনকার ভারতের মতো ঔপনিবেশিক দেশের জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ভূমিকা সম্পর্কে বিশ্লেষণে, যেমন তাদের সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আপোষের মনোভাবের দিকটাতে বেশি জোর

পড়েছিল, কৃষি-প্রোগ্রামে কৃষকের হাতে জমি তুলে দেবার প্রস্তাব না করে যেমন জমি জাতীয়করণের প্রস্তাবনা ছিল, তেমনি ইউরোপের সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলিতে সোশ্যাল-ডেমোক্রেটিক পার্টিদের (সংস্কারপন্থী শ্রমিক পার্টিগুলি, যেমন ব্রিটিশ লেবার পার্টি) সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের মারফৎ শ্রমিক-ঐক্য গড়ে তোলার অপেক্ষা তাদের বিভেদপন্থী ও একচেটিয়া পুঁজিবাদ (তথা সাম্রাজ্যবাদ) এর সঙ্গে আপোসের মনোভাবের ঝোঁকের 'মুখোস খুলে দেওয়ার' (expose) দিকে কমিউনিস্ট আন্দোলনের দৃষ্টি বেশি পড়েছিল।

অবশ্যই ১৯১৮তে জার্মানির সর্বহারা বিপ্লবকে হীনবল ও পরাস্ত করেছিল এই সোশ্যাল ডেমোক্রেসিই, শ্রমিকশ্রেণীর প্রতিভূ হিসাবে ক্ষমতা হাতে পেয়েও তারা সেদিন সেটি তুলে দিয়েছিল জার্মান পুঁজিপতি, বিশেষ করে একচেটিয়া পুঁজিপতিদের হাতে। আর ১৯১৮তে জার্মানিতে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সফল হলে অবশ্য সারা ইউরোপেই সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হতো। পরিষ্কার বোঝা দরকার যে, ধনতন্ত্রের সাধারণ সঙ্কট ঘনীভূত হয়েছে ১৯১৪তে, যার প্রকাশ প্রথম মহাযুদ্ধ ও রুশিয়াতে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব, কিন্তু ইউরোপের অন্যান্য দেশেও বিপ্লবের অনুকূলে বিষয়মুখী (objective) অবস্থার সৃষ্টি হয়ে থাকলেও আত্মমুখি (subjective) অবস্থা পরিপক্কতা না-লাভ করাতে বিপ্লব সফল হয়নি, অথবা বিপ্লব সাধিত হলেও (জার্মানি ১৯১৮) ক্ষমতা দখল করে তাকে সংবদ্ধ করে সমাজতন্ত্র কায়েম করা সম্ভব হয়নি।

শ্রমিক আন্দোলনের সমাজতান্ত্রিক আদর্শের প্রতি সোশ্যাল ডেমোক্রেসির এই বিশ্বাসঘাতকতার চিত্রটি মনে রাখলে আমরা বুঝতে পারব, ইউরোপের বিশদশকে, প্রথমে ইতালিতে, পরে ত্রিশদশকে মধ্যইউরোপ এবং ১৯৩৩ সালে, জার্মানিতে ফ্যাসিবাদ বা নাৎসীবাদ কী করে ক্ষমতা দখল করল।

সপ্তম বিশ্ব-কংগ্রেস ও যুক্তফ্রণ্ট

কমিনটার্নের সপ্তম-কংগ্রেসের অধিবেশন মস্কোতে শুরু হলো ২রা আগস্ট, ১৯৩৫। কমিনটার্নের অধিবেশন হিসাবে এটাই শেষ-কংগ্রেস (দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মধ্যে ১৯৪৩ সালে কমিনটার্নকে তুলে দেওয়া হয়); আবার বিশ্ব-কমিউনিস্ট আন্দোলনের যে পরিণত রূপটি এতে পাওয়া যায়, শ্রমিকশ্রেণীর যুক্তফ্রণ্ট, তা থেকে ফ্যাসিবিরোধী পিপল্স (বা জনগণের) ফ্রণ্ট, উপনিবেশে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ন্যাশনাল বা জাতীয়-ফ্রণ্ট, আগামী দিনের সম্ভাব্য দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের

বিরুদ্ধে শান্তি-ফ্রন্ট সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতান্ত্রিক সমাজ গড়ে তোলার আন্তর্জাতিক তাৎপর্য—তখনকার দিনের প্রধান প্রধান প্রত্যেকটি প্রশ্নেই কমিনটার্নের এক-একজন বিশিষ্ট নেতা, যেমন তোগ্লিয়াত্তি, ওয়াঙ্গ মিঙ্গ, ম্যান্থুলিস্কি আলাদা আলাদা রিপোর্ট পেশ করেন।

প্রধান রিপোর্ট প্রথমেই পেশ করেন, কমিনটার্নের প্রধান সম্পাদক, কমরেড জর্জি ডিমিট্রভ। ফ্যাসিবাদের স্বরূপ বিশ্লেষণ করে, প্রধান রণকৌশল, যুক্তফ্রণ্টের পলিসি উপস্থিত করেন কমরেড ডিমিট্রভ এই রিপোর্টে।

ফ্যাসিবাদ হচ্ছে লগ্নি পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের সর্বাপেক্ষা প্রতিক্রিয়াশীল পীড়নমূলক চেহারা। মোটেই একথা ঠিক নয় যে, ফ্যাসিবাদ, শ্রমিক ও বুর্জোয়া উভয়শ্রেণীর উর্ধে একমাত্র শোষিত মধ্যবিত্তশ্রেণীর সমর্থনে এক নতুন ধরনের রাষ্ট্র। এটা কেবল ডিমিট্রভের রিপোর্টে নয় আজও জোর দিয়ে নতুন করে বলার প্রয়োজন আছে, কারণ এরকম ভুল ধারণা আজও আমাদের দেশেও বহুল প্রচারিত।

বিশেষভাবে লক্ষ্য করার বিষয় যে, ফ্যাসিস্ট রাষ্ট্র ও তাঁর প্রচারযন্ত্র অনেক সময়ই ওপরে ওপরে ধনতন্ত্রের 'বিরুদ্ধে' গালভরা বুলি (ডেমাগগি) প্রয়োগ করে। প্রসঙ্গত, হিটলারের নাৎসী পার্টির পুরো নামটি হচ্ছে 'জাতীয় সোশ্যালিস্ট জার্মান লেবার পার্টি' এবং মজার কথা হচ্ছে, তারাও তাদের পতাকাতে লাল রঙ ব্যবহার করে তারপর 'স্বস্তিকা'র চিহ্ন বসিয়ে দিয়েছিল। তেমনি তারা 'মে-দিবস' পালন করত, যাতে অবশ্য 'জাতীয় সমাজতন্ত্র'-এর কথা বলা হতো। আসলে এই তথাকথিত 'সমাজতন্ত্র'-এর সঙ্গে 'জাতীয়' বিশ্লেষণ প্রয়োগ করে, একটা কাঁঠালের আমসত্ত্ব গোছের ধোঁয়াটে বস্তুর আড়ালে তারা জার্মানির সর্বাপেক্ষা প্রতিক্রিয়াশীল লগ্নি পুঁজিবাদীদেরই সেবা করত।

১৯৩৩ সালে ফেব্রুয়ারি মাসে একদিকে জার্মানির বার্লিনস্থ পার্লামেণ্ট-গৃহ রাইখস্ট্যাগ পুড়িয়ে এবং সে পোড়াবার দায়িত্ব কমিউনিস্টদের ঘাড়ে চাপিয়ে কমিউনিস্ট নিধন-যজ্ঞ শুরু করা হলো। ডিমিট্রভকে ঐ পোড়ানোর 'অপরাধে' গ্রেপ্তার করে, তারপর লিপজিগের আদালতে তাঁর অপূর্ব জেরায় এবং অভিযুক্তই অভিযোগকারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে তিনি কমিউনিস্ট মতবাদ প্রচারে শাসকশ্রেণীকে ত্রস্ত করে শেষ অবধি নাৎসীদের তাঁকে মুক্ত করতে বাধ্য করেন। ঐ ফেব্রুয়ারি মাসেই নাৎসী দলে যে-আহাম্মকরা জাতীয় সমাজতন্ত্র-এর বুলিতে সত্যিসত্যিই আস্থা স্থাপন করে আশা করছিল এবারে জার্মান

একচেটিয়া পুঁজিপতিদের খতম করা হবে; সেই নাৎসী পার্টির তথাকথিত 'বামপন্থী' অংশকেও একই সঙ্গে সেইসময়ে খতম করা হয়।

'জাতীয় সমাজতন্ত্র'-এর মতো আজকাল কথায় কথায় আমাদের দেশে 'হিন্দু সমাজতন্ত্র', পাকিস্তানে 'ইসলামিয় সমাজতন্ত্র' এবং এমনকি কংগ্রেস মহলে 'গান্ধীবাদী সমাজতন্ত্র'-এর বুকনি শুনতে পাওয়া যায়। প্রথমোক্ত দুটির মধ্যে ফ্যাসিবাদের গন্ধ যে প্রকট, সেবিষয়ে সন্দেহ নাই। 'গান্ধীবাদী সমাজতন্ত্র' এর কথা যাঁরা বলেন তাঁদের আসল বক্তব্য, শ্রেণীসংগ্রাম বাদ দিয়ে সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা, অর্থাৎ সমাজতন্ত্র বলতে এমন একটা মনগড়া কল্পস্বর্গ খাড়া করা হয়, যেখানে পুঁজিবাদীরা এবং জমিদাররা তাদের দ্বারা শোষিত শ্রমিক ও কৃষকের পক্ষে অছিগিরি (ট্রাস্টি) করবে। পণ্ডিত নেহরুর জীবদ্দশায় ১৯৫৫ সালে যখন ভারতে বামপন্থী সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন বেশ জোরদার হয়ে উঠতে শুরু করেছে, ওদিকে যুদ্ধের বিপদের বিরুদ্ধে নেহরুজী যথার্থভাবেই দাঁড়িয়ে শান্তির স্বপক্ষে জোট-নিরপেক্ষ নীতি প্রচার করছেন, তখন, দেশের আভ্যন্তরীণ বামপন্থী আন্দোলনকে ঠেকাবার জন্য নেহরুজীকেও 'আবাদী সমাজতন্ত্র' বা 'কংগ্রেস সমাজতন্ত্র' (১৯৫৫ সালের কংগ্রেসের 'আবাদী' অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাব অনুযায়ী এই নামকরণ হয়েছিল) এর কথা প্রচার করতে হয়েছিল, 'আবাদী সমাজতন্ত্র'তে টাটা-বিড়লাজী যে ভীষণ কিছু কেন, একেবারেই ঘাবড়াননি, তার প্রমাণ তাঁদের একাধিক ঘোষণা থেকে এবং আজকের ভারতে একচেটিয়া পুঁজির উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্তি থেকে বোঝা যায়।

ফ্যাসিবাদের জয় কি অবশ্যম্ভাবী ?

ইতালীতে ফ্যাসিবাদ প্রথম ক্ষমতা দখল করে বিশদশকের গোড়ার দিকে। তেমনি দূর-প্রাচ্যে, ১৯৩১ সালে জাপান মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ করার সঙ্গে সঙ্গেই জাপানী ফ্যাসিবাদের রূপ যেমন নগ্নভাবে প্রকাশিত হয়, তেমনি বোঝা যায় যে, একদিকে (ক) ফ্যাসিবাদ তার অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্বের নিরসন করতে যেমন ক্রমাগত যুদ্ধের আশ্রয় নেবে, অর্থাৎ ফ্যাসিবাদ মানেই যুদ্ধ, তেমনি (খ) তথাকথিত 'গণতান্ত্রিক' সাম্রাজ্যবাদী শক্তিরা, যেমন ব্রিটেন, ফ্রান্স, ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে না দাঁড়িয়ে ফ্যাসিবাদকে 'তোষণ' করে যাবে—তাদের আশা ফ্যাসিবাদের ক্রমাগত আগ্রাসী ক্ষুধাকে মেটাবার জন্য শেষ অবধি তাকে সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে লড়তে হবে। আর তাহলে

ব্যাপারটা দাঁড়াল, যেন দুধ-কলা দিয়ে সাপ পুষে, এমন এক অবস্থার সৃষ্টি করা যেখানে শেষ অবধি সাপও মরবে কিন্তু লাঠিও ভাঙবে না! ইঙ্গ-ফরাসী সাম্রাজ্যবাদী শক্তিরা নিশ্চয়ই জার্মান-ইতালি জাপানি ফ্যাসিবাদের প্রভুত্ব চায় না; তাদের আশা ও হিসাবমতো সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হলে ফ্যাসিবাদ ও সমাজতন্ত্র, দুই-ই দুর্বল হয়ে দুনিয়াতে ইঙ্গ-ফরাসী ও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের প্রভুত্ব বিস্তারের সুযোগ করে দেবে।

জার্মানিতে ফ্যাসিবাদের জয় হবে না, এরকম আত্মসন্তুষ্টির ভাব অনেকের মনেই, এমনকি জার্মান শ্রমিক-আন্দোলনের মধ্যেও ছিল। কারণ, জার্মান শ্রমিকআন্দোলন ছিল প্রভুত শক্তিশালী ও ধনতান্ত্রিক ইউরোপের দেশগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা অগ্রসর। কার্যক্ষেত্রে, জার্মান শ্রমিক-আন্দোলনের মধ্যে বিভেদ-নীতি দারুণভাবে কাজ করে এবং বিশেষভাবে জার্মান সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক নেতারা ছিলেন তার প্রধান ধারক। আত্মসমালোচনার জন্য নিশ্চয়ই স্বীকার করতে হয় যে, জার্মান কমিউনিস্ট পার্টিও সময়ে সময়ে সঙ্কীর্ণতাবাদে দুষ্ট ছিল। তবে এটাও ঠিক যে, ১৯১৮ থেকে ১৯৩২ অবধি ওয়েমার রিপাবলিকে (প্রথম মহাযুদ্ধের পরবর্তী জার্মান গভর্ণমেণ্ট এই নামেই পরিচিত ছিল) জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাসি রাষ্ট্রক্ষমতার অংশীদার হিসাবে গভর্ণমেণ্টে ছিল এবং জঙ্গী শ্রমিক-দমনের কাজটা বেশির ভাগ সময় তাদের দিয়েই করা হতো।

তাছাড়া, এপ্রিল ১৯৩২এ প্রথম, তারপর জুলাই মাসে, তারপর হিটলার চ্যান্সেলার হিসাবে অধিষ্ঠিত হবার পরে ৩০এ জানুয়ারি ১৯৩৩ সালে, জার্মান কমিউনিস্ট পার্টি যুক্তফ্রন্ট গঠনের জন্য জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টির কাছে বারবার আবেদন করতে থাকে। প্রথম দুটি আবেদন সরাসরি প্রত্যাখ্যাত হয়, তৃতীয়টিতে তলাকার সাধারণ শ্রমিকদের সাড়া এত পাওয়া যায় যে, শেষ অবধি জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাসির কাছ থেকে প্রস্তাব আসে পারস্পরিক দোষারোপ, মারামারি ও খুনোখুনি বন্ধ করার জন্য যেন 'নিরস্ত্রিকরণ চুক্তি' করা হোক। প্রসঙ্গত, আমরা অবশ্য এখানে জার্মানিতে হিটলারের ও ফ্যাসিবাদের ক্ষমতা দখলের একেবারে গোড়ার দিকের কথা বলছি, আজকের পশ্চিম বাঙলার রাজনৈতিক সমস্যার কথা নয়।

চতুর্থ আবেদন আসে জার্মান কমিউনিস্ট পার্টির কাছ থেকে ১৯৩৩এর ১লা মার্চ, তখন অবশ্য খেল খতম, হিটলার ক্ষমতায় পুরোপুরি অধিষ্ঠিত হয়ে

নিরঙ্কুশ দমননীতি চালিয়ে যাচ্ছে, এবং সেটা শুধু কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে নয়, সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের বিরুদ্ধেও বটে। যুক্তফ্রণ্টের এই আবেদনেও সোশ্যাল ডেমোক্রাটরা সাড়া দেয়নি, কারণ তারা তখন আপ্রাণ চেষ্টা করছে জার্মান নাৎসীদের সঙ্গে একটা আপোষ করে বৈধভাবে কাজকর্ম চালিয়ে যেতে। সে আশায় অবশ্য ছাই পড়েছিল। জার্মান নাৎসীরা ভুল করেনি। তাদের নিরঙ্কুশ আঘাত কমিউনিস্ট ও সোশ্যাল-ডেমোক্রাট, দুয়ের বিরুদ্ধেই সমানে চলেছিল।

শ্রমিকশ্রেণীর যে যুক্তফ্রণ্ট গড়ে উঠলে জার্মানিতে ফ্যাসিবাদকে রুখে দেওয়া যেতে পারত, সেই যুক্তফ্রণ্ট শেষ অবধি গড়ে উঠল জেলখানা ও কনসেনট্রেশন ক্যাম্পের প্রাচীরের অন্তরালে। জার্মান কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক, কমরেড থেল্‌ম্যান ও সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক নেতা ব্রেট্‌সাইডের প্রথম দেখা-সাক্ষাৎ আলাপ-আলোচনা হয় জার্মানির বুখেন্‌ওয়াল্ড কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে—যে যুক্তফ্রণ্ট তাঁদের মধ্যে সেখানে গড়ে উঠে, তারই প্রায় প্রতীক হিসাবে ১৯৪৪ সালের ১৮ই আগস্ট একই দিনে তাঁদের গুলি করে মারা হয়। আর আজকের 'জার্মান গণতান্ত্রিক রিপাবলিকে'র 'সোশ্যালিস্ট ইউনিটি পার্টি'র কেন্দ্রীয় কমিটি ও অন্যান্য নেতৃস্থানীয় কমিটির মধ্যে পূর্বতন জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক ও কমিউনিস্ট পার্টির নেতারা সমানভাবেই রয়েছেন, এবং বলা বাহুল্য, ফ্যাসিবাদের ভাবধারার, রাষ্ট্রযন্ত্রের তো বটেই, কবর খোঁড়া হয়েছে আজকের জার্মান গণতান্ত্রিক রিপাবলিকে। সেদিক থেকে কমরেড ডিমিট্রভের ঐতিহাসিক 'যুক্তফ্রণ্ট' রিপোর্টের মূর্ত প্রতীক হচ্ছে আজকের সোশ্যালিস্ট পূর্ব-জার্মানি বা জার্মান গণতান্ত্রিক রিপাবলিক।

পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে শ্রমিকশ্রেণী যদি বিভেদপন্থার শিকার হয়ে পড়ে এবং শ্রমিক-আন্দোলন যদি জনগণের অন্যান্য অংশ থেকেও বিচ্ছিন্ন হয়, তথা মধ্যবিত্ত আন্দোলন ও মনোভাবকে যদি শ্রমিক-আন্দোলনের বিরুদ্ধে নিয়োগ করা সম্ভব হয়, তাহলেই, একমাত্র তাহলেই, দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়া মাথা চাড়া দেবে এবং বিশেষ অবস্থায় ক্ষমতা দখলও করতে পারে। কাজেই ফ্যাসিবাদকে রুখে দেওয়ার প্রথম এবং একেবারে প্রাথমিক কর্তব্য হচ্ছে শ্রমিক-আন্দোলনের বিভক্তিকে শেষ করে শ্রমিক-ঐক্য গড়ে তোলা। ত্রিশ দশকের জার্মানিতে শ্রমিক-ঐক্যের প্রধান অভিব্যক্তি ছিল কমিউনিস্ট ও সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের মধ্যে ঐক্য, যা তখন সম্ভব হয়নি।

১৯৩৩এর জার্মানিতে ফ্যাসিবাদের ক্ষমতা দখলের চরম ও তিক্ত-

অভিজ্ঞতার ফলে ১৯৩৪এ ফেব্রুয়ারি মাসে ফরাসি দেশে ফ্যাসিস্টরা যখন ক্ষমতা দখলের চেষ্টা করল, তখন দেখা গেল, সেখানে কমিউনিস্ট ও সোশ্যালিস্টদের (সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের, শ্রমিকশ্রেণীরই বড় একটা অংশ) ঐক্য এবং প্যারিস, লিল্ প্রভৃতি শহরের ব্যারিকেডে তাঁদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই ফরাসি দেশে ফ্যাসিবাদের অভ্যুদয়কে রুখে দিল।

স্পেনের গৃহযুদ্ধে গোড়াতে যুক্তফ্রন্ট স্থাপিত হয়নি—১৯৩৬ থেকে ক্রমশ গৃহযুদ্ধের আগুনে পুড়ে যে-যুক্তফ্রন্ট তথা পপুলার ফ্রন্ট সেখানে তৈরি হয়েছিল সেটাই সম্ভব করেছিল পরবর্তী তিনবছর ধরে স্পেনে সফল গৃহযুদ্ধ চালিয়ে যেতে। স্পেনের গৃহযুদ্ধে শুধু কমিউনিস্ট-সোশ্যালিস্ট ঐক্য নয়। একটা বিশেষ অবস্থায়, সেখানে এক ট্রটস্কিপন্থীদের বাদ দিয়ে, এমনকি নৈরাজ্যবাদীদের (এনারকিস্টদের) একটা অংশ থেকে বিভিন্ন মধ্যবর্তী পার্টিও স্পেনের 'পপুলার ফ্রন্ট' গভর্ণমেণ্টে সামিল হয়েছিল। প্রসঙ্গত, আজকের বাঙলাদেশে (পূর্ব-বাঙলাতে) সেখানকার কমিউনিস্ট পার্টি স্পেনের কায়দায় আওয়ামী লীগ, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির দুই অংশ—প্রফেসার মুজফ্‌ফর আহমেদের ও মৌলানা ভাসানীর এবং কমিউনিস্ট পার্টির যুক্তফ্রন্টের ডাক দিয়েছে। অবশ্যই বিভেদপন্থা এখনও সেখানে তীব্র, যাইহোক বাঙলাদেশের সাম্প্রতিক সমস্যার আলোচনার স্থান স্বতন্ত্র।

সাম্রাজ্যবাদীদের সাহায্য বা তোষণ

শ্রমিকশ্রেণীর অনৈক্যের সুযোগ নিয়ে যেমন জার্মানিতে নাৎসীরা বা ফ্যাসিবাদ ক্ষমতা দখল করল, তেমনি এটাও ঠিক যে, ইঙ্গ-ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীদের (মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের ; পরোক্ষ সাহায্য ছিল) প্রত্যক্ষ তোষণনীতির সাহায্য না পেলে জার্মানিতে হিটলারের নাৎসীবাদ দীর্ঘ বারোবছর ধরে শাসন ও অত্যাচার করতে পারত না।

কারণ কি ? ফ্যাসিবাদকে ক্ষমতায় থাকতে গেলে তাকে নিরঙ্কুশ আগ্রাসী নীতি চালিয়ে যেতে হবেই। দেশের অভ্যন্তরে যখন মাত্র জনাকয়েক, কয়েকটি পরিবার মাত্র, জার্মানির ক্ষেত্রে রূঢ় অঞ্চলের শিল্পপতিরা এবং আই. জি. সারবেন শিল্পগোষ্ঠি, ক্রুপস্, থাইসেন, হুগেনবার্গ প্রমুখ অস্ত্র তৈরি করবার শিল্পের মালিকরা জনগণের বাকি সকল অংশকে, কেবল শ্রমিক বা কৃষক নয়, এমনকি মধ্যবিত্ত ও ছোট ধনিকদেরও শোষণ করে নিশ্চিহ্ন করে দিতে বসে, ফলে

জীবিকা অর্জনের উপায় থেকে বঞ্চিত হয়ে মধ্যবিত্তের মধ্যে একটা ছোট অংশ নাৎসী পার্টির 'ঝটিকা বাহিনী' ইত্যাদিতে নাম লিখিয়ে বেঁচে থাকার চেষ্টা করে, তখন ফ্যাসিস্ট রাষ্ট্রের অন্তর্দ্বন্দ্ব তীব্রতর হয়ে উঠে। এ-অবস্থায় ফ্যাসিবাদের বাঁচবার একমাত্র পথ হচ্ছে ক্রমাগত পররাজ্য গ্রাসের আগ্রাসী নীতি চালিয়ে আভ্যন্তরীণ অন্তর্দ্বন্দ্ব থেকে জনগণের দৃষ্টিকে ঘুরিয়ে রাখা ; বিশেষ করে নিত্যনতুন পররাজ্য গ্রাস করতে পারলে জার্মানির 'গৌরব' বেড়েছে বলে ক্রমাগত প্রচার বা প্রোপাগাণ্ডা চালান যায়।

কাজেই, পররাজ্য গ্রাসের আগ্রাসী নীতি যদি অন্যান্য শক্তিবর্গের দ্বারা বাধা প্রাপ্ত হয়, তাহলে ফ্যাসিবাদের অন্তর্দ্বন্দ্ব তীব্রতর হয়ে ভেঙে পড়বে ; আর উল্টে পররাজ্য গ্রাসের নীতি যদি তোষিত হতেই থাকে তাহলে ফ্যাসিবাদ কেবলমাত্র তার অন্তর্দ্বন্দ্ব যে ঠেকিয়ে রাখতে পারবে তাই নয়, নিজের জনগণ ও দুনিয়ার সামনে তার 'মতবাদের' প্রচার করে আরও 'ডেমাগগি' করতে পারবে যে, ফ্যাসিবাদের পথেই সমাজের সঙ্কট সমাধান সম্ভব, অর্থাৎ ফ্যাসিবাদ যেন সাম্যবাদের পাল্টা আর এক মতবাদ, এক নতুন জীবনদর্শন। আসলে ফ্যাসিবাদ কোনো আলাদা মতাদর্শ নয়, সেটা কতক বস্তাপচা প্রতিক্রিয়াশীল ধারণা ও বুলির একটা রাঙতা-মোড়া চকচকে সংস্করণ। আমরা একটু পরে এ-সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করব।

পশ্চিমী তথাকথিত 'গণতান্ত্রিক' সাম্রাজ্যবাদের একেবারে সরাসরি সাহায্য ও তোষণ ছাড়া ফ্যাসিবাদ যে বেশিদিন টিকতে পারত না, একথা আজ আবার বিশেষ করে বলার প্রয়োজন আছে। সম্প্রতি ফ্যাসিবাদের সম্পর্কে যে নতুন বইগুলি (studies) বেরিয়েছে ; যেমন 'Three Faces of Fascism', 'European Fascism' ও 'Nature of Fascism' (পশ্চিমী দেশে কয়েকটি সেমিনারের রিপোর্ট) প্রভৃতি বইগুলিতে ফ্যাসিবাদের উৎপত্তি ও প্রতিপত্তির নানারকম ব্যাখ্যা উপস্থিত করা হয়েছে ; কিন্তু আসল কথাটা প্রায় সকলেই এড়িয়ে গেছেন যে, পশ্চিমী 'গণতান্ত্রিক' সাম্রাজ্যবাদী শক্তিদের তোষণনীতি ছাড়া হিটলারের নিরঙ্কুশ দমননীতি (মুসোলিনীর কথা বাদই দিলুম আর স্পেনে জেনারেল ফ্র্যাঙ্কো তো হিটলার-মুসোলিনীর প্রত্যক্ষ এবং ইঙ্গ-ফরাসী শক্তির পরোক্ষ সাহায্য ছাড়া কোনরকমেই স্পেনীয় গৃহযুদ্ধে জয়ী হতে পারতেন না) ও মানবতা-বিরোধী, একেবারে আগ্রাসী যুদ্ধের নীতি চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হতো না।

ফ্যাসিবাদের 'মতাদর্শ'

ফ্যাসিবাদ যেন কমিউনিজম বা সাম্যবাদের পাল্টা ও প্রতিদ্বন্দ্বী মতাদর্শ—সাম্যবাদী দর্শন যেমন একটা বিশ্ববীক্ষা (Weltauschauung) ফ্যাসিবাদও তাই—এরকম একটা বহুল প্রচারিত ধারণা আজও চালু আছে। আসলে এটা বিভ্রান্তিকরও বটে এবং পরিষ্কার বোঝা দরকার, তথাকথিত 'ফ্যাসিস্ট মতবাদ' বা 'দর্শন' বা 'বিশ্ববীক্ষা'র-আড়ালে লুকিয়ে রয়েছে লগ্নি-পুঁজিবাদী (বা সাম্রাজ্যবাদী)-দের পররাজ্য দমনের জন্য আগ্রাসী এবং যুদ্ধবাদী মনোভাব ও প্রস্তুতি, আর সেটাকে কাজে পরিণত করার জন্য তারা নিযুক্ত করে একদল গুণ্ডা ঠ্যাঙাড়েবাহিনী (বেকারীর জন্য ব্যর্থ হতাশ মনোভাবাপন্ন শ্রমিক বা লুম্পেন-শ্রমিকদের বা নিম্ন-মধ্যবিত্তদের নিয়ে গঠিত) আর তাদের ফ্যাসিস্ট নেতারা অনেক সময়েই জনবিরোধী নীতি চালু করতে করতে প্রায় অ-মানুষে পরিণত হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে হিটলারের বুকেন্‌ওয়াল্ড, অস্‌উইচিম, মাইডানেক প্রভৃতি কনসেনট্রেশন ক্যাম্পের বাসিন্দাদের যখন মুক্ত করা সম্ভব হলো, তখন দেখা গেল তাদের জীর্ণ কঙ্কালসার দেহে জীবনের লক্ষণ অল্পই অবশিষ্ট আছে, (বহু বছর লেগেছে তাদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় ফিরিয়ে আনতে, তাও সবক্ষেত্রে সম্ভব হয়নি)। সেখানে রয়েছে গ্যাস চেম্বার যেখানে লক্ষ লক্ষ লোককে নিশ্চিহ্ন করা হয়েছে, তাদের হত্যা করবার পূর্বে তাদের কারুর দাঁত সোনা দিয়ে বাঁধানো থাকলে তাকে সযত্নে আলাদা করে ব্যাংকে জমা দিয়েছে, আর মৃত্যুর পরে তাদের গায়ের চামড়া দিয়ে টেবিলল্যাম্প প্রভৃতি বানানো হয়েছে। ২৫।২৬ বছরের ব্যবধানে এটা অনেকের মনে না থাকতে পারে কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অন্তে ১৯৪৫-৪৬এর নুরেমবুর্গ বিচারের বিবরণীতে এর পূর্ণ বিবরণ পাওয়া যাবে।

অবশ্য আজকের ১৯৭১ সালের মাঝামাঝি আমরা যখন দেখি, বাঙলা দেশে (পূর্ব-বাঙলাতে) পাকিস্তানের ইয়াহিয়া-বর্বরবাহিনী ব্যাপক হারে খুন, লুঠ-তরাজ, ও কেবল নারী-ধর্ষণ নয় তাঁদের ধরে পশ্চিম-পাকিস্তানে ও কয়েকটি সামন্ততান্ত্রিক আরবদেশে ক্রীতদাসীর ব্যবসা চালাচ্ছে, ছেলেদের গায়ের রক্ত একেবারে শুষে নিয়ে ব্লাডব্যাংকে জমা করছে, তখন বুঝতে পারি যে, 'অগ্রসর' 'বৈজ্ঞানিক' 'মার্জিত' ফ্যাসিবাদের এটা হলো আধা-উপনিবেশিক দেশের 'পশ্চাদপদ' 'বর্বর' 'অমার্জিত' রূপ মাত্র। রোমের ক্রীতদাস প্রথাতে বা মধ্যযুগের সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থাতেও এর নজীর অনেক পাওয়া যাবে।

তবু 'মতবাদ'-এর যে-ঘোষণা ফ্যাসিবাদ সদম্ভে করে থাকে আমরা সেই তথাকথিত 'মতবাদ'-এর দিকটা সামান্য আলোচনা করে দেখব।

কমরেড রজনীপাম দত্ত তাঁর বিখ্যাত বই 'Fascism and Social Revolution'এ 'ফেডারেশন ও জার্মান ইণ্ডাষ্ট্রি'র গোপন দলিল "Fuhrev briefe' (নেতাদের কাছে চিঠি) থেকে নাতিদীর্ঘ উদ্ধৃতি দিয়ে দেখিয়েছেন (পুস্তকটির ভারতীয় সংস্করণ, পৃষ্ঠা ১৯৯-২০৩) যে, (ক) ফ্যাসিস্ট শাসন ও শোষণ (চিঠিতে লেখা আছে ধনতান্ত্রিক শাসন) একমাত্র শ্রমিকশ্রেণীর বিভেদ ও বিভক্তিতে নির্ভর করেই চলতে পারে; (খ) 'বুর্জোয়া শাসন' (আসলে ফ্যাসিস্টদের শাসন) শ্রমিকদের কমিউনিস্ট ভাবধারা থেকে রক্ষা করতে সোশ্যাল ডেমোক্রাসির সাহায্য নিতেই হবে; (গ) তারজন্য 'ট্রেড ইউনিয়ন বুরোক্র্যাসি'কে সোশ্যাল-ডেমোক্রাসি পার্টি-যন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত করতে হবে। এ-তিনটি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সোশ্যাল-ডেমোক্রাসি শ্রমিকশ্রেণীকে হীনবল করে দিলে (রজনীপাম দত্তের ভাষায় 'শ্রমিক সিংহকে বেঁধে ফেললে') তারপর ফ্যাসিস্ট শাসন বা 'শেয়াল' সেই শ্রমিকশ্রেণীকে মাটিতে পেড়ে ফেলে তার তথাকথিত 'বীর্য' দেখিয়ে শাসন ও শোষণ চালিয়ে যেতে পারে।

অর্থাৎ, শ্রমিকশ্রেণীর বৈপ্লবিক শক্তি যখন অমিত তেজে আগুয়ান এবং তার আঘাতে বুর্জোয়াদের নগ্ন শাসন ও শোষণের স্তম্ভগুলি ভেঙে পড়ছে এবং শ্রমিকদের হাতের মুঠোয় ক্ষমতা এসে যাচ্ছে, তখনই শিখণ্ডীর মতো বুর্জোয়ারা (লগ্নি পুঁজিবাদীরা) খাড়া করে সোশ্যাল-ডেমোক্রাসিকে, যারা শ্রমিকদের বৈপ্লবিক শ্রেণী-চেতনায় অপেক্ষাকৃত দুর্বল থাকলে শ্রমিকশ্রেণীকে বিভক্ত করে, তারপর নগ্ন ফ্যাসিস্ট শাসন ও শোষণের নিরঙ্কুশ দমননীতির পথ পরিষ্কার করে দেয়। কাজেই 'শ্রমিক বিপ্লবের গর্ভস্রাব হলো ফ্যাসিস্ট শাসন' বলেছেন মহিয়সী জার্মান শ্রমিক ও কমিউনিস্ট নেত্রী, ক্লারা জেট্‌কিন।

এর ক্লাসিক উদাহরণ হলো জার্মানি, ১৯১৮-৩৩, সোশ্যাল ডেমোক্রেসির অধীনে ওয়েমার রিপাবলিক, তারপর হিটলার ফ্যাসিস্ট বা নাৎসী শাসন। এর পাশাপাশি উজ্জ্বল সফল শ্রমিক-বিপ্লবের উদাহরণ হচ্ছে নিশ্চয়ই লেনিন ও রুশ কমিউনিস্টদের নেতৃত্বে, অক্টোবর বিপ্লব।

ফ্যাসিবাদ ক্ষমতায় আসার পরে খোঁজ পড়ে তার একটা থিওরি, মতবাদ বা মতাদর্শ। ১৯২১ সালে মুসোলিনী ক্ষমতায় আসার প্রাক্কালে বললেন:

"Italian Fascism now requires, under pain of death, or

worse, of suicide, to provide itself with a 'body of doctrines'. 'The expression is a rather strong one, but I would desire that within the two months between now and the National Congress the Philosophy of Fascism must be created." (বিয়াঙ্কিকে লেখা মুসোলিনীর চিঠি, আগস্ট ২৭, ১৯২১)

উপরের উদ্ধৃতি বা হিটলারের 'আত্মজীবনী' (Mein Kampf) থেকে বহু অংশ তুলে. কমরেড রজনীপাম দত্ত তার উল্লিখিত পুস্তকে ফ্যাসিবাদের তথা দর্শনের অসারতা প্রমাণ করেছেন।

আসলে ফ্যাসিবাদ হলো সেই পুরনো সাম্রাজ্যবাদী চিন্তাধারারই একটু রাঙতা মারা রঙচঙে, আরো মারমুখি যুদ্ধবাদী রূপ। তথাকথিত গণতান্ত্রিক সাম্রাজ্যবাদী শাসনের নগ্ন মারমুখি রূপটা আমরা ভালো করেই তখনকার উপনিবেশিক ভারতবর্ষে (ব্রিটিশ লেবার পার্টি সমর্থিত ন্যাশনাল গভর্ণমেণ্টের আমলেই ত্রিশদশকের একেবারে গোড়াতে ১৯৩০-৩৪ ভারতে দমননীতি ও মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা) দেখেছি। যদিও তাদের দেশে চালু ছিল পার্লামেণ্টারি গণতন্ত্র।

যুক্তফ্রণ্টের নীতিগত ও কৌশলগত প্রশ্নাবলী

ফ্যাসিবাদকে রুখতে শ্রমিকশ্রেণীর ঐক্য, তখনকার ইউরোপে কমিউনিস্ট ও সোশ্যালিস্ট (বা সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের) ঐক্য দরকার। এই ঐক্যের জোয়ারে নিপীড়িত মধ্যবিত্তশ্রেণী বা একচেটিয়া লগ্নি-পুঁজিপতিদের দ্বারা শোষিত ও উৎখাত ছোট বুর্জোয়াশ্রেণীও যোগ দিয়ে 'জনগণের বা পপুলার ফ্রণ্ট সরকার' গঠন করবে। কমরেড ডিমিট্রভ তাঁর রিপোর্টে পরিষ্কার করে দিয়েছিলেন যে, কমিউনিস্টরা শুধু 'পপুলার ফ্রণ্ট' গঠন করেই ক্ষান্ত হবে না, প্রয়োজন মতো এ-অবস্থা অনুকূলে থাকলে তারা সরকারের পূর্ণ দায়িত্ব নিয়ে কোয়ালিশন পপুলার ফ্রণ্ট গভর্ণমেণ্ট তৈরি করতেও রাজী আছে। স্পেনের গৃহযুদ্ধে এইভাবেই তিনবছরব্যাপী সংগ্রামের শেষের দিকে 'পপুলার ফ্রণ্ট' তৈরি করা সম্ভব হয়েছিল।

তিনি এটাও পরিষ্কার করেছিলেন যে, এই যুক্তফ্রণ্ট গভর্ণমেণ্ট প্রলেতারিয়ান, বিপ্লব হবার পূর্বে গঠিত হবে। এর সঙ্গে রুশিয়ার প্রলেতারিয়ান

(অক্টোবর, ১৯১৭) বিপ্লবে যে-যুক্তফ্রন্ট (বল্‌শেভিক ও বাম-সোশ্যালিস্ট-রেভুলিউশনারিদের) ক্ষমতা দখল করেছিল, তার গুণগত প্রভেদ আছে। কমরেড ডিমিট্রভ যুক্তফ্রন্টের যে-রণকৌশল উপস্থাপন করলেন, সেটার প্রোগ্রাম ফ্যাসিস্ট-বিরোধী গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট, তবে সেই গণতন্ত্রের চেহারা নিশ্চয়ই অতীতের ইতিহাসের বুর্জোয়া গণতন্ত্রের নয় (ফরাসী বিপ্লব, ১৭৮৯)— যে জনপ্রিয় বা পপুলার গণতান্ত্রিক গভর্ণমেণ্টে শ্রমিক-কৃষকের একটা প্রধান ভূমিকা থাকে বা তারা গভর্ণমেণ্টের একটা চালিকাশক্তি রূপে দেখা দেয়— তার চরিত্র বদলে দিতে পারে। স্পেনের গৃহযুদ্ধের একটা বিশেষ অবস্থায় যখন এই ধরনের 'পপুলার ফ্রন্ট' গভর্ণমেণ্ট গড়ে উঠে, এবং কমিউনিস্টরা সোশ্যালিস্ট ও অন্যান্য গণতান্ত্রিক শক্তিদের সঙ্গে গভর্ণমেণ্টের অংশীদার হয়, তখন প্রশ্ন উঠেছিল যে, স্পেনের গৃহযুদ্ধ ফ্যাসিস্ট বিরোধী গণতান্ত্রিক শক্তিরা জয়ী হলে তার পরের অবস্থা কী হবে? অর্থাৎ ভবিষ্যতের প্রলেতারিয়ান বিপ্লবে রূপান্তর কেমনভাবে হবে? তখনই আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের পক্ষ থেকে বলা হয়, ফ্যাসিস্ট-বিরোধী 'পপুলার ফ্রন্ট' গভর্ণমেণ্টের পরের স্তরে প্রলেতারিয়ান বিপ্লবে রূপান্তর ঘটবে **শান্তিপূর্ণ পথে**। স্পেনের মহীয়সী কমিউনিস্ট নেত্রী, দোলোরস ইবারুরি ('লা পাসিওনারিয়া-র সম্প্রতি প্রকাশিত আত্মজীবনী 'They Shall Not Pass' বইতে এর উল্লেখ পাওয়া যাবে।

কী অবস্থায় এই ধরনের যুক্তফ্রণ্ট গভর্ণমেণ্ট গঠিত হতে পারে তার বিশদ আলোচনা আলোচ্য পুস্তকের ৫৮-৬৫ পৃষ্ঠায় পাওয়া যাবে। মোদ্দা কথাটা হলো যে একটা রাজনৈতিক সঙ্কট দেখা দিলেই এই ধরনের যুক্তফ্রণ্ট গভর্ণমেণ্ট গঠন করা সম্ভব; এবং এই প্রসঙ্গে এর পূর্বের চতুর্থ ও পঞ্চম কমিন্টার্ন অধিবেশনের আত্মসমালোচনা করা হয়েছে।

ইউরোপে যেমন 'পপুলার ফ্রণ্ট' গভর্ণমেণ্টের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল ফ্যাসিস্ট-বিরোধী সংগ্রামে, তেমনি সাম্রাজ্যবাদী শাসনের কুক্ষিগত ঔপনিবেশিক দেশগুলিতে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী জাতীয়-স্বাধীনতা আন্দোলনে জাতীয় কংগ্রেসের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ভূমিকা সম্পর্কে, বিশেষ করে ষষ্ঠ কমিন্টার্ন কংগ্রেসের 'ঔপনিবেশিক থিসিস'-এ জাতীয় বুর্জোয়াদের সাম্রাজ্যবাদের প্রতি আপোষী মনোভাবের দিকটার প্রতি জোর বেশি পড়েছিল। ফলে ভারতের বেআইনী কমিউনিস্ট পার্টি ত্রিশ দশকের গোড়ার দিকে জাতীয় কংগ্রেসের প্রায়-বিরোধী ভূমিকাই নিয়েছিল।

সপ্তম কমিন্‌টার্নের ডিমিট্রভের রিপোর্টের পরে ১৯৩৬ সালে, কমরেড রজনী পাম দত্ত ও মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা থেকে সভ্যমুক্ত কমরেড বেন্ ব্রাড্‌লী যুক্তভাবে একটি থিসিস উপস্থিত করেন। এই দত্ত-ব্রাড্‌লী থিসিসের প্রথম অংশে ভারতীয় কমিউনিস্টদের জাতীয় কংগ্রেসকে 'সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী জাতীয় ফ্রণ্ট'-এর প্রধান সংগঠন হিসাবে গড়ে তোলার আহ্বান জানানো হয়। সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় কংগ্রেসের মধ্যে জনগণের অন্যান্য সংগ্রামী অংশ, বিশেষ করে শ্রমিক, ও কৃষকশ্রেণী এবং মহিলা আন্দোলনকে তাদের নিজনিজ সংগঠন মারফৎ "Collective affiliation" (সমষ্টিগতভাবে ভাগীদার) নিতে বলা হয়। থিসিসের দ্বিতীয় অংশে, বিশেষ করে ট্রেড্ ইউনিয়ন ঐক্যের উপর জোর দেওয়া হয়। ১৯৩৫এ কয়েকটি ট্রেড্ ইউনিয়ন সংগঠন ছিল, যেগুলি ১৯৩৮এ ঐক্যবদ্ধ হয়ে আবার নতুন করে একটি অল-ইণ্ডিয়া ট্রেড্ ইউনিয়ন কংগ্রেস (যার প্রতিষ্ঠা হয়েছিল ১৯২০ সালে) গড়ে উঠে।

ফ্যাসিস্ট দেশগুলিতে, বিশেষ করে জার্মানি ও ইতালিতে, কমিউনিস্টদের বলা হয়, ফ্যাসিবাদী গণ-সংগঠনগুলিতে ঢুকে তাদের মধ্যে কাজ করে, জনগণকে ফ্যাসিবাদের প্রভাব থেকে মুক্ত করতে। কমরেড ডিমিট্রভ ঘোষণা করেন যে, ফ্যাসিস্ট দেশগুলিতে কমিউনিস্টরা যে-বীরত্ব দেখিয়েছেন তার তুলনা হয় না; কিন্তু কেবল বীরত্ব হলেই হবে না। বুঝতে হবে, যে-কোনো কারণেই হোক, ফ্যাসিবাদ যখন ঐ সমস্ত জনসাধারণের আস্থা অর্জন করতে পেরেছে, যখন ফ্যাসিস্ট গণ-সংগঠনেই জনগণকে পাওয়া যাবে, তখন কমিউনিস্টদের ঐ ফ্যাসিস্ট গণ-সংগঠনের মধ্যেই কাজ করে জনসাধারণকে ফ্যাসিবাদ থেকে মোহমুক্ত করতে হবে। ব্যাপারটা মোটেই সোজা নয়। ফ্যাসিস্টরা জঘন্য, অমানুষ, অতএব হিটলারের নাৎসী বা ফ্যাসিস্ট জার্মানিতে স্বভাবতই কমিউনিস্টদের ঝোঁক হবে নিজেদের শুচিতা বাঁচিয়ে নিজেদের মধ্যেই আবদ্ধ থাকা। তাতে হয়তো 'কমিউনিস্ট শুচিতা' বাঁচতে পারে কিন্তু জার্মান ও ইতালিয়ান কমিউনিস্টরা একেবারে সংকীর্ণতাবাদে আচ্ছন্ন হয়ে যাবে।

এই সিদ্ধান্ত অনুসারেই ১৯৩৭এর ব্রাসেলসে ও ১৯৩৯ বার্ন-শহরে বে-আইনী গুপ্ত জার্মান কমিউনিস্ট পার্টি গুটিকয়েক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, যার অন্যতম সিদ্ধান্ত ছিল ফ্যাসিস্ট গণ-সংগঠন, যেমন হিটলারের 'লেবারফ্রণ্ট' বা 'যুব-সংগঠনে' কমিউনিস্টরা কীভাবে কাজ করবে।

ডিমিট্রভের প্রধান রিপোর্টটি পেশ করা হয় ২রা আগস্ট, ১৯৩৫। দীর্ঘ ও

বিস্তৃত কয়েকদিন ব্যাপী আলোচনার পর এবং আরো কয়েকটি আলাদা বিষয়ের উপর বিশেষ রিপোর্টের পর ১৩ই আগস্ট কমরেড ডিমিট্রভ জবাব দিতে উঠে তাঁর নাতিদীর্ঘ বক্তৃতাতে যে কয়েকটি বিষয়ের উপর বিশেষ জোর দেন, সেগুলি হলো (ক) ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে কমিউনিস্টদের প্রচার সাধারণ ফর্মুলার বা নিবন্ধের রূপ না নিয়ে যেন বাস্তবধর্মী হয়; (খ) মনে রাখা দরকার যে, ফ্যাসিস্টরা অনেক সময়ই জাতীয় ঐতিহ্যের অপব্যবহার করে নিজেদের প্রোপাগাণ্ডা বা মতবাদ প্রচারের কাজে লাগাতে চায়। কমিউনিস্টরা এ সম্পর্কে নিরপেক্ষ দর্শকের ভূমিকা তো নিতেই পারে না, উল্টে জাতীয় ঐতিহ্যের সুস্থ মানবিক গণতান্ত্রিক রূপটি তুলে ধরতে হবে, যাতে জনসাধারণ বুঝতে পারে যে, কমিউনিজম বা সাম্যবাদ কোনো সৃষ্টিছাড়া বা নিরালম্ব বস্তু নয়; এই মতবাদের শেকড় প্রত্যেক দেশের মাটিতেই গাঁথা আছে। কারণ কমিউনিজমের উদ্ভব হয়েছে জনজীবন ও জনগণের সংগ্রাম তথা শ্রেণীসংগ্রাম থেকে। আজকের ১৯৭১ সালের কমিউনিস্ট আন্দোলনে কমিউনিস্টরা এ সম্পর্কে হয়তো অল্পবিস্তর অবহিত থাকলেও ১৯৩৫এর অপেক্ষাকৃত অপরিণত কমিউনিস্ট আন্দোলনের সামনে এটা জোর দিয়েই বলার দরকার ছিল।

তারপর কমরেড ডিমিট্রভ সাংগঠনিক ক্ষেত্রে অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন, সমস্যা ও তার সমাধান উপস্থিত করেন। ষষ্ঠ কমিনটার্ন কংগ্রেসে যেমন দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদের বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়, সপ্তমে তেমনি বামপন্থী সংকীর্ণতাবাদের বিরুদ্ধে। লেনিন বামপন্থী সংকীর্ণতাবাদকে বলেছিলেন "শিশুসুলভ রোগ" কমরেড ডিমিট্রভ তার উল্লেখ করে বলছেন:

> এটা প্রায়শই আর 'শিশুসুলভ রোগ' নয়; আমাদের সময়ে এটা একটা বহুদিনের ঘুণ-ধরা পাপ বা রোগ (deeply rooted vice) এবং যাকে ঝেড়ে না ফেলতে পারলে প্রলেতারিয়েতের যুক্তফ্রণ্ট তৈরি করার সমস্যার সমাধান করা যাবে না এবং জনসাধারণকে সংস্কারবাদের পথ থেকে বিপ্লবের পথে নিয়ে আসা যাবে না।
>
> আজকের অবস্থাতে আমরা প্রস্তাবে যেভাবে বর্ণনা করেছি, সেই আত্ম-সন্তুষ্ট সংকীর্ণতাবাদ (Self-satisfied sectarianism) আর যে-কোনো ব্যাপারের চেয়ে সর্বাপেক্ষা ব্যাপক ফ্রণ্ট গঠনের সম্ভাবনাকে ব্যাহত করে। তাত্ত্বিক সংকীর্ণমনাতে (doctrinairism narrowness) সন্তুষ্ট হয়ে সংকীর্ণতাবাদ (sectarianism) জনজীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, শ্রমিক

আন্দোলনের কতকগুলি বিশেষ জটিল সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা করে বাঁধাধরা ছক খাড়া করে ; সংকীর্ণতাবাদীরা মনে করে সবই তাদের জানা আছে, অতএব জনসাধারণের কাছ থেকে অথবা শ্রমিক আন্দোলন থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা বাহুল্য মাত্র ; এককথায় সংকীর্ণতাবাদীদের ভাবটা যেন 'হেলায় তাহারা সাগর করিতে পারে জয়'। আত্মসন্তুষ্ট সংকীর্ণতাবাদীরা কিছুতেই বুঝতে পারে না বা চাইদে না যে, শ্রমিকশ্রেণীর উপর কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্ব আপনা-আপনি প্রতিষ্ঠিত হয় না। শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বকে লড়াই করে অর্জন করতে হয়। এর জন্য প্রয়োজন, কমিউনিস্টদের নেতৃত্ব নিয়ে চিল্লাচিল্লি করা নয়, এর জন্য রোজানা গণ-সংগঠনের কাজ (mass work) ও সঠিক নীতির ভিত্তিতে খেটে খাওয়া জনসাধারণের আস্থা অর্জন করে তাদের জিতে নিতে বা স্বপক্ষে নিতে হবে। আর এটা তখনই সম্ভব হবে যখন রাজনৈতিক কাজকর্মে জনসাধারণের শ্রেণীচেতনা কোন স্তরে আছে এবং তারা কতদূর বৈপ্লবিক ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ (revolutionised) হয়েছে, সেটা আমরা, কমিউনিস্টরা হিসাবের মধ্যে ধরতে পারব এবং যখন আমরা আমাদের ইচ্ছার উপর নয়, আসল অবস্থা কি, সেটা বাস্তবমুখী বিশ্লেষণের ভিত্তিতে বুঝতে পারব। ধৈর্যের সঙ্গে, ধাপেধাপে, আমরা বৃহৎ জনসাধারণকে কমিউনিস্টদের বক্তব্য বুঝতে সাহায্য করবে। আমাদের লেনিনের সেই কথাগুলি যেন কখনও না ভুলি ; তিনি যতখানি সম্ভব জোর দিয়ে আমাদের বলেছিলেন,

'...আমাদের পক্ষে যেটা বাতিল হয়ে গেছে সেটা জনসাধারণের বা শ্রেণীর কাছে বাতিল বলে গণ্য নাও হতে পারে।' (বামপন্থী কমিউনিজম, একটি শিশুসুলভ বিশৃংখলতা।' (আলোচ্য পুস্তকের পৃষ্ঠা ৭২, বঙ্গানুবাদ—সমালোচকের)।

ডিমিট্রভের 'যুক্তফ্রন্ট' রিপোর্ট থেকে উপরের উদ্ধৃতিটি দীর্ঘ সন্দেহ নেই। কিন্তু কেউই দ্বিমত হবেন না যে, কমরেড ডিমিট্রভের এই বক্তব্যটি আজকের কমিউনিস্ট আন্দোলনের পক্ষেও পুরোপুরি প্রযোজ্য, এবং সেদিক থেকে এই উদ্ধৃতিটিকে রোজানা আন্দোলনের অভিজ্ঞতার ভুলভ্রান্তি ও সাফল্যের ভিত্তিতে বারবার বিচার করে দেখে নতুন করে বোঝার প্রয়োজন আছে।

ডিমিট্রভের ঐতিহাসিক রিপোর্টের আরো অনেক দিক আছে, যেমন

পার্টির ক্যাডার বা কর্মীদের সম্পর্কে, শ্রমিকশ্রেণীর ঐক্য ও যুক্তফ্রণ্টের ভিত্তিতে শেষ অবধি একটি শ্রমিকশ্রেণীর পার্টি হতে পারে কী, না? দ্বিতীয়টি সম্পর্কে ডিমিট্রভ যা বলেছিলেন, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধান্তে পূর্ব-ইউরোপের দেশেদেশে এবং খোদ পূর্ব-জার্মানি (আজকের জার্মান গণতান্ত্রিক রিপাবলিক)-তে যুক্ত ঐক্যবদ্ধ কমিউনিস্ট ও সোশ্যালিস্ট পার্টিদের সংগঠন গড়ে উঠে তার যথার্থ প্রমাণিত হয়েছে।

পরিশেষে সততার খাতিরে বলতে হয়, পিপলস পাবলিসিং হাউস (নয়াদিল্লী) প্রকাশিত এই সংস্করণে কমরেড ডিমিট্রভের ঐতিহাসিক রিপোর্ট থেকে বহু জায়গায় কমরেড স্তালিনের প্রতি ডিমিট্রভের সপ্রশংস ও সশ্রদ্ধ উল্লেখ কেটে বাদ দেওয়া হয়েছে। যতগুলি আমাদের চোখে পড়েছে, নিচে তার একটা তালিকা দেওয়া হলো। জর্জি ডিমিট্রভের ঐতিহাসিক রিপোর্টটি ইন্টার-ন্যাশানাল পাবলিশার্স, নিউ ইয়র্ক, ১৯৩৮ সংস্করণ, (আমেরিকান কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মাকর্সীয় সাহিত্য প্রকাশনী) থেকেও তুলনা করছি।

১। প্রথমত, যেখানেই কমরেড স্তালিনের নাম হয় লেনিনের সঙ্গে, অথবা মার্কস এঙ্গেলস ও লেনিনের সঙ্গে যুক্ত আছে, সেখানে কেবলমাত্র স্তালিনের নামটি বাদ গেছে। উদাহরণ স্বরূপ পিপলস পাবলিসিং হাউসের আলোচিত সংস্করণের পৃষ্ঠা ৭৭, ৭৮, ৯৯ (তৃতীয় প্যারা, চতুর্থ নয়), পৃষ্ঠা ১১০, পৃষ্ঠা ১১৪ (শেষ লাইন থেকে দু'লাইন উচ্চে)-এর সঙ্গে ইন্টারন্যাশানাল পাবলিশার্স, নিউইয়র্ক, (প্রকাশনের তারিখ ১৯৩৮) যথাক্রমে পৃষ্ঠা ৯০, ৯১, ১১৩, ১২৪, ১২৯ তুলনা করলেই ব্যাপারটা ধরা পড়বে।

২। কমরেড স্তালিনের এমন গুটিকয়েক উক্তি এই ঐতিহাসিক রিপোর্ট থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে, যেগুলি একমাত্র কমরেড স্তালিন সম্পর্কেই সপ্রসংশ বা সশ্রদ্ধ উক্তি; যেমন—

পিপলস পাবলিসিং হাউসের পৃষ্ঠা ৮০, (শেষ থেকে তিন লাইন উচ্চে)— বাদ দেওয়া হয়েছে:

(ক) "and possessed of so great and wise a pilot as our leader Comrade Stalin (ইণ্টারন্যাশানাল পাবলিশার্স, পৃষ্ঠা ৯৩)।

(খ) "without Bolshevik, Leninist Stalinist cadres…; (ইণ্টারন্যাশানাল পাবলিশার্স; পৃষ্ঠা ৯৫) থেকে Stalinist

কথাটি বাদ দেওয়া হয়েছে পৃষ্ঠা ৮২, পিপলস্ পাবলিসিং হাউস।

(গ) "as Stalin that greatest maker of revolutionary action" has taught us…(ইণ্টারন্যাশানাল পাবলিশার্স, পৃষ্ঠা ১২৪ এর সঙ্গে পিপলস পাবলিশিং হাউসের সংস্করণের পৃষ্ঠা ১০৯ দ্রষ্টব্য)—

মজার কথা হচ্ছে যে, স্তালিনের উল্লেখ বাদ দেওয়া হলেও তাঁর বক্তব্য যেটার উদ্ধৃতি কমরেড ডিমিট্রভ দিচ্ছেন, সেটা বাদ দেওয়া হয়নি।

(ঘ) …We must be able to combine the great teaching of Marx, Engels, Lenin and Stalin with **Stalinist firmness** at work and in Struggle, with **Stalinist irreconciliability on matters of principle** forward the class enemy and deviators from the Bolshevik line, with **Stalinist fearlessness in face of difficulties, with Stalinist revolutionary realism.**

[মূলে বড় হরফ, ইণ্টারন্যাশানাল পাবলিশার্স পৃষ্ঠা ১২৬ এর সঙ্গে পিপলস পাবলিসিং হাউসের পৃষ্ঠা ১১১ দ্রষ্টব্য]

এই বক্তব্যে উৎসাহের আতিশয্যে 'স্তালিনের মতন' বা স্তালিনীয় (Stalinist) কথার ওপর বেশি জোর পড়লেও আসল যেটা বক্তব্য, অর্থাৎ "firmness at work and in struggle" (সংগ্রামে ও কাজে নিষ্ঠা) ইত্যাদিও বাদ দেওয়া হয়েছে।

৩। মূল রিপোর্টে কমরেড স্তালিনের লেখার উদ্ধৃতিগুলির মধ্যে মাত্র কয়েকটি রাখা হয়েছে; যেগুলি বাদ দেওয়া হয়েছে. সেগুলি বাদ দেওয়ার কোনো যুক্তি আছে বলে আমরা মনে করি না। শেষ প্যারা পিপ্‌লস পাবলিশিং হাউসের পৃষ্ঠা ৯৮ এর "Comrade Stalin said"-এবং পৃষ্ঠা ৯৯ শেষ প্যারা "Comrade Stalin pointed out—" ইত্যাদি রয়েছে। তেমনি বইটি শেষ করা হয়েছে কমরেড স্তালিনের একটি উক্তি দিয়ে। অথচ আলোচ্য পুস্তকের পৃষ্ঠা ১১২-তে শেষ প্যারার আগের প্যারাতে যেখানে কমরেড ডিমিট্রভ বলেছেন : "People, Cadres, decide everything," তারপরে কমরেড ডিমিট্রভ বলছেন

(ক) They are unable to do what Comrade Stalin is

teaching us to do, namely, to cultivate cadres "as a gardener cultivates his favorite fruit tree" "to appreciate people, to appreciate cadres, to appreciate every worker who can be of use to our common cause."— (ইণ্টারন্যাশানাল পাবলিশার্স, পৃষ্ঠা ১১৬)।

(খ) তেমনি নিম্নলিখিত পুরো প্যারা এবং কমরেড স্তালিনের উক্তি :
Yes, we are for a single mass political party of the working class, But this party must be, in the words of Comrade Stalin,
...a militant party, a revolutionary party, bold enough to lead the proletariat to the struggle for power, with sufficient experience to be able to orientate itself in the complicated problems that arise in a revolutionary situation, and sufficiently flexible to steer clear of any submerged rocks on the way to its goal." (ইণ্টারন্যাশনাল পাব্‌লিশার্স, পৃষ্ঠা ৯০)।

—এটি পিপ্‌লস পাবলিসিং সংস্করণের পৃষ্ঠা ৭৭-এ ৪র্থ প্যারার পরে বাদ দেওয়া হয়েছে।

প্রসঙ্গত কলকাতার 'Culture Publishers'-এর পুস্তকে এসব কিছুই বাদ পড়েনি। সমালোচকের মতে, পিপলস পাবলিসিং হাউসের উপরিউক্ত মন্তব্যগুলি (সবগুলিই কমরেড স্তালিন সংক্রান্ত) বাদ দেবার কোনো অধিকার নেই। কমরেড ডিমট্রভের ৭ম কমিণ্টার্ন কংগ্রেসের রিপোর্টটি ঐতিহাসিক। কমরেড ডিমিট্রভ আজ জীবিত নাই এবং থাকলেও তাঁর রিপোর্টকে তিনি নিশ্চয়ই বদলাতে পারতেন না।

সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির ২০তম কংগ্রেসে কমরেড স্তালিনের ব্যক্তি-পূজার যে নিন্দা করা হয়েছিল, সেটা নিশ্চয়ই সঠিক। অতএব বুঝতে পারি যে, আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের (কমিন্টার্ন না থাকলেও) স্তালিন সম্পর্কে নানারকম উক্তিতে হয়তো আপত্তি থাকতে পারে; কিন্তু সেক্ষেত্রে মূল কোনো ঐতিহাসিক দলিলের বয়ান নিশ্চয়ই বদলানো যেতে পারে না। পরবর্তী অবস্থায় মতানুসারে একটি ভূমিকা লিখে নিশ্চয়ই মতভেদ ব্যক্ত করা

যেতে পারে।

যেমন করেছিলেন মার্কস ও এঙ্গেলস তাঁদের ঐতিহাসিক 'কমিউনিস্ট ইশতেহারে' ১৮৭২ সালে প্যারিস কমিউনের অভিজ্ঞতার পরে নতুন সংস্করণের ভূমিকাতে 'বুর্জোয়া রাষ্ট্রযন্ত্রকে কেবল দখল করলেই চলবে না, ভেঙে চুরমার করতে হবে' বলেছিলেন তাঁরা। আবার ১৮৯০ সালে এঙ্গেলস আর এক ভূমিকাতে লিখছেন যে, শ্রমশক্তি, শ্রম নয়, পণ্য (commodity) হয়ে দাঁড়ায়। কোনো কারণেই তাঁরা 'কমিউনিস্ট ইশ্‌তেহার'-এর ঐতিহাসিক দলিলের মূল বয়ানকে পরিবর্তন করেননি। সম্প্রতি পুনঃপ্রকাশিত কমরেড রজনী পাম দত্তের 'ইণ্ডিয়া টুডে'র লেখা কমরেড দত্ত বদল করেননি, যদিও নতুন ১৯৭০ সালের ভূমিকাতে গান্ধীজি সম্পর্কে এবং অন্যান্য বিষয়ে মূল্যায়নের উল্লেখ করে তিনি বলেছেন, তার কতোখানি আজকের দিনে প্রযোজ্য, কতোখানি নয় বা সংশোধনের প্রয়োজন।

অবশ্য এক্ষেত্রেও মতামত দিচ্ছেন স্বয়ং গ্রন্থকার—কোনো পুস্তক প্রতিষ্ঠান নয়, সম্পাদকও নয়। ইতিহাসে যে দলিলের বা গ্রন্থের স্থানলাভ ঘটে গেছে তার পরবর্তীকালে সম্পাদনার ব্যাপারে সম্পাদক ও পুস্তক প্রতিষ্ঠানের কাছেই গ্রন্থবিষয়ে বিনয় থাকা আবশ্যিক অর্থে বিশেষ প্রয়োজনীয় শর্ত।

ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে মার্কসীয় গবেষণা

অরবিন্দ বসু

দীর্ঘকাল ধরে বুর্জোয়া ও মার্কসবাদী দার্শনিকদের মধ্যে মানবতাবাদ ও ব্যক্তিত্ব নিয়ে তীব্র বিতর্ক চলছে। এই বিষয়ে ফরাসি মার্কসবাদী দার্শনিক লুসিয়েঁ সেভে একটি বই লিখেছেন সম্প্রতি। বইটির নাম: মার্কসিজম এণ্ড দি থিয়োরি অফ্ পার্সনালিটি। বইটি নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনাও করেছেন জি. কুর্সানভ, 'পীস, ফ্রীডম এ্যাণ্ড সোসালিজম' পত্রিকার ১৯৬৯ সালের ডিসেম্বর সংখ্যায়।

সেভে দীর্ঘকাল ধরে বিষয়টি নিয়ে পড়াশুনা করেছেন। লেনিনের লেখা পড়ে প্রভাবিত হয়েছেন তিনি। এবং এর ফলেই তিনি বাস্তব, ঐতিহাসিক এবং বিপ্লবী মনোবিদ্যার মূলনীতি বুঝতে ও উদ্ঘাটন করতে সক্ষম হয়েছেন যাতে ব্যক্তির জীবন রাজনৈতিক সম্পর্কের প্রকাশ বলে মনে করা হয়।

সেভে বলেছেন ফরাসিদেশে মার্কসীয় মনোবিদ্যার বিকাশ পলিৎসারের লেখার দ্বারা প্রভাবিত। পলিৎসার ছিলেন একজন কমিউনিস্ট যিনি ৪০ বছর আগে বস্তুবাদের উপর ভিত্তি করে "বাস্তব মনোবিদ্যা" বা "concrete psychology"-র প্রসার ঘটাতে সচেষ্ট হন। পলিৎসার ছাড়া ফরাসি মার্কসীয় মনোবিদ্যা আর একজনের লেখার দ্বারা প্রভাবিত। তিনি হলেন ফরাসি বস্তুবদী মনোবিদ এ. ওয়ালন।

সেভের গবেষণার মূল বিষয় মানবতা ও ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে মার্কসীয় মতবাদের বৈজ্ঞানিক প্রকৃতি ব্যাখ্যা করা এবং সকল প্রকার বুর্জোয়া মতবাদের বিরুদ্ধে এই মতবাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করা। বুর্জোয়ারা প্রচার করে থাকে মার্কসবাদ "ব্যক্তিকে অবহেলা করে", "ব্যক্তিত্ব ধ্বংস করে" ইত্যাদি। সেভে এইসব বুর্জোয়া প্রচারের স্বরূপ উদ্ঘাটন করেছেন। সেভে দেখিয়েছেন মার্কসবাদ ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে প্রকৃত বৈজ্ঞানিক মতবাদ উপস্থিত করে। অন্যান্য বিষয়ের মতো এই বিষয়েও মার্কসবাদ বিশ্বসংস্কৃতির সুন্দরতম মানবিক ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক।

Lucien Seve. Marxisme et theorie de lo personnalite, Editions Sociales Paris, 1969, 509 pp.

সেভে ব্যক্তিত্ব ও মানবতা বিষয়ে বিভিন্ন বুর্জোয়া ধারণা খণ্ডনের জন্য বিশ্লেষণী পদ্ধতি (analytical method) গ্রহণ করেছেন। বিশেষভাবে তিনি metaphysical essentialism-এর দেউলিয়া অবস্থা প্রমাণ করেছেন। এই মতবাদ মানব প্রকৃতির অপরিবর্তনীয় সত্তায় বিশ্বাসী। এই মতবাদের কোনো প্রকৃত মর্মবস্তু (real content) নেই। বাস্তব রক্তমাংসের মানুষের সঙ্গে সম্পূর্ণ সম্পর্কহীন এই মতবাদ। সেভে লিখেছেন বিমূর্ত মানবপ্রকৃতি বলে কিছু নেই কারণ মানুষের সত্যিকারের প্রকৃতি হলো মূর্ত, তার স্থান সামাজিক সম্পর্কের দ্বারা নির্ধারিত, তার জীবন, কর্ম ও সংগ্রামকে সম্পূর্ণভাবে দেখতে হবে, কোনো পূর্ব নির্ধারিত ছকে ফেলে দেখলে চলবে না।

Metaphysical Essentialism-এর বিরুদ্ধ মত হলো Existentialism যাকে অনেকে 'নব মানবতাবাদ' হিসেবেও উপস্থিত করতে চান।

নিরীশ্বর অস্তিবাদ শৃঙ্খলিত ও বিমূর্ত 'মানবিক মূল্য' অস্বীকার করে এবং মানবপ্রকৃতি নির্ধারণে ধর্মীয় মানদণ্ড সরাসরি নাকচ করে। পরিবর্তে মানুষের 'মুক্তি' ঘোষণা করে এবং বাধাহীন স্বাধীনতা ও কর্মের অধিকার চায়।

কিন্তু অস্তিবাদী মানবতাবাদ বিজ্ঞান-ভিত্তিক নয়। এই মতবাদ মানুষ ও তার স্বার্থের প্রকৃত চিত্র উপস্থিত করে না। সেভে তথ্যসহ প্রমাণ করেছেন যে অস্তিবাদ মানুষের 'স্থিতিশীল' অপরিবর্তনীয় প্রকৃতির উপর নির্ভর করে, সমাজের মধ্যে মানুষের প্রকৃত জীবনের সঙ্গে সম্পর্কহীন বিমূর্ত স্বাধীনতার ওকালতি করে এবং তা করে সমাজবিকাশের ঐতিহাসিক প্রয়োজনীয়তার সঙ্গে সম্পর্কহীনভাবে। বাস্তবপক্ষে এই মতবাদের মূলবিষয় হলো ব্যক্তিগত স্বাধীনতা এবং ব্যক্তিগত লক্ষ্য ও স্বার্থযুক্ত বিচ্ছিন্ন ব্যক্তি (isolated individual)। এই বিষয়ে ব্যক্তি তার ব্যবহারিক ক্রিয়াকর্মে জীবনের বিষয়-গত নিয়মের বিরুদ্ধে দাঁড়ায় এবং ফলে বাস্তবের মুখোমুখি অবস্থায় অনিবার্যভাবে শক্তিহীন হয়ে পড়ে। এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে যে সার্ত্রে নিজে "আমাদের সম্পূর্ণ শক্তিহীনতা' স্বীকার করে নিয়েছেন।

ষাটের দশকে ফরাসি দেশে কিছু নূতন ভাবধারার আবির্ভাব ঘটে। এর একটা হলো structuralism বা অবয়ববাদ। এই মতবাদ অস্তিবাদকে স্থানচ্যুত করে তার স্থান অধিকার করতে চেয়েছে। অবয়ববাদের লক্ষ্য হলো বিবিধ সামাজিক ব্যবস্থা ও তাদের উপাদানগুলিকে পরীক্ষা করা এই বিশ্বাসে যে এটাই হলো সামাজিক ঘটনাকে অনুসন্ধান করার নির্ভুল বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি।

লেখক নির্দেশ করেছেন একই সঙ্গে অবয়ববাদ একটি 'positive concept of man' দেবার দাবি করে। এই, বিষয়ে অবয়ববাদ অস্তিবাদের একেবারে বিপরীত মতবাদের, কারণ এই মতবাদ ইতিহাস, সংস্কৃতি, ভাষাতত্ত্ব, ভূগোল ও অর্থনীতি ইত্যাদির ক্ষেত্রে বাস্তব বিষয়ের ('positive facts') বিষয়গত, নির্ব্যক্তিকৃত ('de-individualised') অবয়ব ও সম্পর্কের বিশ্লেষণে মনোযোগ নিবদ্ধ করে। তৎসত্ত্বেও, এইসব সমস্যার আলোচনা বৈজ্ঞানিক নয়। কারণ অন্যান্য বিষয় ছাড়াও এই মতবাদের বিশ্লেষণপদ্ধতি ভ্রান্ত, কেননা এই মতবাদ সমাজজীবনে মানুষের ভূমিকা অবহেলা করে, সমস্ত সামাজিক ঘটনার বিকাশে বস্তুগত উৎপাদন, শ্রমের নির্ধারক ভূমিকা এবং মানুষের সৃষ্টিশীল ক্ষমতার গুরুত্ব অস্বীকার করে। বাস্তবিক পক্ষে, ইতিহাস সৃষ্টির প্রক্রিয়ায় মানুষ অন্তর্হিত হচ্ছে এই হলো অবয়ববাদী যুক্তির শেষ অনুমান।

লেনিন অনুসৃত দর্শনে partisanship-এর নীতি সেভে দৃঢ়ভাবে অনুসরণ করেছেন। কেবলমাত্র বিভিন্ন ধরনের বুর্জোয়া মতাদর্শের বিরুদ্ধে সংগ্রামেই নয় (যার মধ্যে উপরে উল্লিখিত Metaphysical essentialism, Existentialism, Structuralism মতবাদগুলিও অন্তর্গত), আজকের দিনের পক্ষে যা কালোপযোগী সেই ব্যক্তিত্ব ও মানবতাবাদ সম্পর্কে মার্কসীয় তত্ত্বের সামাজিক রাজনৈতিক তাৎপর্যের ব্যাখ্যাতেও একই নীতির দ্বারা পরিচালিত হয়েছেন। বিশেষভাবে তিনি ব্যাপক জনগণের রাজনৈতিক সংগ্রামে মার্কসবাদের তাৎপর্য পরীক্ষা করেছেন যাতে 'মানুষ কি', 'মানব সম্পর্ক' ইত্যাদি সমস্যা, জীবনের লক্ষ্য ও অর্থ, চৈতন্য, বিবেক, ব্যক্তির ইচ্ছা ও মেজাজ বর্তমান কালে এত তীক্ষ্ণভাবে তুলে ধরা হয়েছে। সেভে লিখেছেন—'মানব জীবনের এইসব উপাদানকে বোঝা ছাড়া মানুষকে বোঝা সম্ভব নয় (without understanding these elements of psychological life there can be no understanding of man)'।

সেভে বলেন আধুনিক পাশ্চাত্য মনোবৈজ্ঞানিক গবেষণা বৈজ্ঞানিক দিক থেকে অপরিণত, মানব মনোবিদ্যা সম্পর্কে ধারণা অস্পষ্ট, মানস ঘটনার ব্যাখ্যা বিবিধ এবং প্রায়ই বিরোধযুক্ত। এর কারণ কি? সেভে লক্ষ্য করেছেন এইসব মনোবৈজ্ঞানিক গবেষণার বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে দৃঢ়তার অভাব, সমাজে ব্যক্তিত্ব বিকাশের সাধারণ নিয়মের বিশ্লেষণ অনুপস্থিত যদিও যে-কোনো মতবাদে এগুলো প্রয়োজনীয়। এসব থেকে লেখক সিদ্ধান্ত করেছেন গবেষক মানুষ ও

মনুষ্যসমাজের আলোচনায় মার্কসবাদ-লেনিনবাদের দৃঢ়ভিত্তির উপর নির্ভর করবেন। এবং এখানে নির্ধারক বিষয় হচ্ছে ঐতিহাসিক বস্তুবাদ। ঐতিহাসিক বস্তুবাদ হচ্ছে সামাজিক সম্পর্ক বিশ্লেষণের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি এবং সকল সামাজিক বিজ্ঞানের পদ্ধতিগত ভিত্তি। স্থতরাং ঐতিহাসিক বস্তুবাদ হলো 'the basic science of man', এবং মানুষ সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক ধারণার সাধারণ তত্ত্ব।

মানবপ্রকৃতি বুঝতে ঐতিহাসিক বস্তুবাদের গুরুত্ব এঙ্গেলস তাঁর সময়েই সূত্রায়িত করেছিলেন। তিনি ঐতিহাসিক বস্তুবাদের সংজ্ঞা দিয়েছিলেন এইভাবে যে ঐতিহাসিক বস্তুবাদ হলো 'বাস্তবমানুষ এবং তাদের ঐতিহাসিক বিকাশের' বিজ্ঞান। মার্কসবাদের এই দিকের প্রতি লেখকের যথোচিত গুরুত্বপ্রদান ও বিকাশসাধন বুর্জোয়া মতাদর্শের বিরুদ্ধে সংগ্রামে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এর দ্বারা মার্কসবাদে ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্বের সমস্যার কোনো স্থান নেই এই বুর্জোয়া বক্তব্যের অসারতা প্রমাণিত হয়।

সেভের পুস্তকের আর একটি গুণ এই যে সুন্দরভাবে ও দক্ষতার সঙ্গে তিনি মার্কসীয় মানবতাবাদ উপস্থিত করেছেন, মার্কসীয় ধারণার গভীর মানবিক তাৎপর্য ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করেছেন।

সেভে তাঁর পাঠকদের মার্কস-এর ১৮৪৪ সালে লিখিত Philosophical and Economic Manuscripts-এ বিধৃত চিন্তা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। এই সূত্রে তিনি বেছে নিয়েছেন সামাজিক সম্পর্কের মর্মবস্তু (human essence), বস্তুগত উৎপাদনে যেসব সম্পর্কের উৎপত্তি হয় তা, মানুষের অবস্থা ও বিকাশের সামাজিক ঐতিহাসিক চরিত্র, শোষণমুক্ত সমাজে মানুষের বিযুক্তির প্রকৃতি (nature of alienation), পুঁজিবাদী ব্যক্তিমালিকানার বর্জনে মানুষের মুক্তি ইত্যাদি মার্কসের চিন্তা। এই পাণ্ডুলিপিগুলিতেই মার্কস আমাদের সেই ক্লাসিকাল সূত্র দিয়েছেন:—'Communism is real humanism'।

ব্যক্তি ও মানবতার সমস্যার উপর তীব্র মতাদর্শগত সংগ্রাম বিচার করে মার্কসবাদের মানবিক প্রকৃতি উদ্‌ঘাটন করা গুরুত্বপূর্ণ ও কালোপযোগী। সেভে বিশ্বাসযোগ্য যুক্তি উপস্থাপিত করে 'দুই মার্কস'-এর কল্পনার স্বরূপ উন্‌ঘাটন করেছেন, বিশেষ করে ব্যক্তি ও মানবতা বিষয়ে দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে। কারণ পরবর্তীকালের মার্কসবাদের সমালোচকগণ পিপে পিপে কালি খরচ করেছেন এটা প্রমাণ করার জন্য যে তরুণ মার্কস ছিলেন মানবতাবাদী এবং

পরিণত মার্কস তা নন, এবং এই মিথ্যা ভিত্তির উপর মার্কসবাদের মানবতা অস্বীকার করার জন্য।

মানুষকে প্রকৃত মানুষ হিসেবে বুঝতে মার্কসবাদ নতুন মাত্রার প্রবেশ ঘটিয়েছে (injected a new dimention into the understanding of man)। লেখক বুর্জোয়া বিমূর্ত মানবতাবাদের ত্রুটি নির্দেশ করেছেন কারণ তা মানুষ সম্পর্কে কল্পনামূলক ভাববাদী ধারণার উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে যাতে মানুষকে তার শ্রেণীসম্পর্ক থেকে বিচ্যুত করে দেখা হয়। এই ধরনের ধারণা কেবল যে বিগত শতাব্দীর হেগেলপন্থীদের মধ্যেই দেখতে পাওয়া যাবে তাই নয়—বর্তমান কালে 'Philosophical anthropology' এবং 'Religious humanism'-এর সমর্থকদের মধ্যেও দেখতে পাওয়া যাবে।

মার্কসের একাধিক পুস্তক, বিশেষ করে Capital-কে যাত্রাস্থান ধরে সেভে মার্কসবাদের মানবিক তাৎপর্য বিশ্লেষণ করেছেন। বুর্জোয়া সমালোচকগণ মনে করেন মানুষকে 'বর্জন' করেছে, তাকে অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রবাদের যূপকাষ্ঠে বলি দিয়েছে, সেই উৎপাদন দৈত্য (Production Moloch) ব্যক্তিত্বকে চূর্ণ করেছে। কিন্তু তাঁরা যত্নের সঙ্গে যে-ঘটনা অবহেলা করেন তা হলো মার্কস সামাজিক অর্থনৈতিক সম্পর্ককে বিভিন্ন শ্রেণী, গোষ্ঠী ও ব্যক্তির মধ্যে সম্পর্ক বলে মনে করতেন। সেভে যথার্থই মন্তব্য করেছেন Capital-এ মার্কস এক ধারণা-ব্যবস্থা (system of concepts) বিস্তারিত করেছেন—প্রয়োজন-সমূহ, ভোগ, শ্রম, স্বাধীনতা ইত্যাদি—যা অর্থনৈতিক সম্পর্ক ও ব্যক্তির সম্পর্ক এই উভয় সম্পর্কের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। বৃহত্তর তাৎপর্যের দিক থেকে দেখলে সমস্ত সামাজিক-অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সম্পর্কই মানবিক সম্পর্ক কারণ মানুষই ইতিহাসের স্রষ্টা ও ইতিহাসেরই ফল। সামাজিক সত্তার সকল ক্ষেত্রে যার মধ্যে বিপ্লব ও শ্রেণীসংগ্রামও অন্তর্ভুক্ত, মানুষের সক্রিয় সৃষ্টিই হলো তার, জীবনের মূল দিক। ফলে মানব সম্পর্কের সামাজিক-অর্থনৈতিক বিষয়ের কেবলমাত্র বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণই ব্যক্তি, ব্যক্তিত্ব ও মনোবিদ্যা সম্পর্কে প্রকৃত ধারণা দিতে পারে এবং মার্কসবাদ তাই দিয়ে থাকে।

গবেষণার শেষ অংশে সেভে ব্যক্তিত্ব-মনোবিদ্যার বিষয়বস্তুর সংজ্ঞা দিয়েছেন ও ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক মতবাদের মৌল বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন। বিশেষ করে বিকৃত বস্তুবাদী ধারণার বিরুদ্ধে তিনি দেখিয়েছেন যে মার্কসবাদ ব্যক্তিত্বকে সামাজিক ও উৎপাদন সম্পর্কে পরিণত করে না

বরং মনে করে যে এইসব সম্পর্ক নির্দিষ্ট সামাজিক-ঐতিহাসিক প্রলক্ষণযুক্ত বাস্তব ব্যক্তিতেই বিদ্যমান।

সুতরাং ব্যক্তিত্ব হলো নির্দিষ্ট প্রলক্ষণ, বৈশিষ্ট্য ও বিশেষত্ব সমূহের এক সম্মিলন। ব্যক্তিত্বের স্বরূপ বোঝা যেতে পারে নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক যুগের পশ্চাৎপটে ব্যক্তির জীবন ও কর্মের অবস্থা পরীক্ষা করে। এই পরিপ্রেক্ষিতে দেখলে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব একটি বিশেষ বিজ্ঞান Personality Psychologyর বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়ায়।

এই বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদী ও দ্বন্দ্ববাদী দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা পরিচালিত হলে ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে জৈব কারণের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা Naturalistic বা স্বভাববাদী এবং ফ্রয়েডীয় ধারণার ভ্রান্তি নির্দেশ করা যায়। স্বভাববাদীরা সামাজিক ঐতিহাসিক অবস্থার নির্ধারক ভূমিকা ও বাস্তব ব্যক্তি হিসেবে মানুষের সক্রিয় ভূমিকা ও বিকাশ সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করে।

এবার সেভে বেশ কিছুকিছু ব্যক্তব্যের অবতারণা করেছেন যার দ্বারা ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে পূর্ণ মতবাদ গঠন করা যায়। এর ভিত্তি হলো বাস্তব ব্যক্তির ধারণা এবং নির্দিষ্ট সামাজিক অবস্থায় তার বিকাশ। সেভে দেখিয়েছেন যে ব্যক্তির নানারূপ ক্রিয়াকলাপের মধ্যে বিশেষ করে নির্ধারণক্ষম মৌলিক কর্ম ও তার গঠনের মধ্যে ব্যক্তিত্ব প্রকাশিত হয়। লেখক একে 'infrastructure of the personality" বলে সংজ্ঞায়িত করেছেন।

সেভে নির্দেশ করেছেন ব্যক্তির সামর্থ্য, প্রয়োজন, পারিবেশিক ঘটনাকে প্রত্যক্ষ ও ব্যাখ্যা করার বিবিধরূপ, জীবনের অবস্থা, জীবনের গঠন ও বিবর্তনের পরিচালক নিয়ম ব্যক্তিত্বের মতবাদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হওয়া প্রয়োজন। যেমন সুসংহত ব্যক্তিত্বতত্ত্বের বিস্তারণায় তেমনি এখানে মূলনীতি হচ্ছে মানুষের ব্যক্তিত্ব বিকাশের নিয়ামক সাধারণ নিয়ম ও ব্যক্তির ক্রিয়াকলাপের বিবিধরূপ ও বিশেষ বৈশিষ্ট্যের দ্বান্দ্বিক ঐক্য।

সর্বশেষে, আধুনিক সমাজে ব্যক্তিত্ব বিকাশের পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে সেভে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে সমাজতান্ত্রিক ও সাম্যবাদী ব্যবস্থা ব্যক্তিত্বের পূর্ণবিকাশের সীমাহীন সুযোগ উপস্থিত করে কারণ সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন সম্পর্ক ও গণতন্ত্র সমস্ত শ্রেণীগত বাধার অবসান ঘটায়। সমাজতান্ত্রিক ও সাম্যবাদী সমাজব্যবস্থা যে-কোনো শোষণযুক্ত সমাজব্যবস্থার চাইতে গুণগত-ভাবে তফাৎ। এই ধরনের সমাজব্যবস্থাই ব্যক্তির মধ্যে অন্তর্নিহিত সমস্ত সামর্থ্য বিকশিত করতে সক্ষম হয় এবং এর ফলেই ব্যক্তি হয় সমস্তরকমের বিযুক্তিমুক্ত স্বাধীন সত্তা।

মার্কসবাদ ও নতুন যুগ

সতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

১৯৬৯ সালে রোজার গারোদির আত্মজিজ্ঞাসার ফসল হিসাবে 'The turning point of socialism'-এর প্রকাশ। "আমি সংগ্রামী কমিউনিস্ট। আমি স্থির নিশ্চয়, বিজ্ঞান ও টেকনোলজি যে বিপুল পরিবর্তন এনেছে তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে 'সামাজিক সম্পর্ক' তৈরি করতে পারে শুধু স্তোসালিজম। শুধু তাই নয়। স্তোসালিজমই শুধু পারে এইসব পরিবর্তনকে এমনভাবে কাজে লাগাতে যাতে সকল মানুষের স্বাধীনতা নিশ্চিত হয়। এই দুটি কারণে আমি দ্বিধাহীন কণ্ঠে সোভিয়েত নেতৃবর্গকে বলতে চাই: আমরা ফরাসি দেশে যে স্তোসালিজম গড়ে তুলতে চাই তা আপনারা চেকভূমিতে যে স্তোসালিজম চাপাচ্ছেন তার থেকে আলাদা।"

পার্টিভাষ্যকারেরা ভক্তবৃন্দের প্রতি দয়াবশংবদ হয়ে প্রচার করেছেন: আমাদের যুগ পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের যুগ, সারা বিশ্বব্যাপী সমাজতন্ত্রবাদ ও কমিউনিজমের জয়যাত্রার যুগ। অথচ এ-যুগে চীন-সোভিয়েট সম্পর্কে ফাটল ধরেছে, চেকভূমি আক্রান্ত হয়েছে, ফরাসি দেশে ১৯৬৮ সালে ছাত্র-বিদ্রোহ ঘটেছে কমিউনিস্ট পার্টিকে বাদ দিয়ে; আর কমিউনিস্ট নেতারা মার্কসীয় তত্ত্বের চর্বিতচর্বন করে গেছেন নিরন্তর। সমাজতন্ত্র আজ মোড় ঘুরছে, অথচ নেতারা পুরাতন প্রত্যয়ের বাঁধনে বন্দী করতে চেয়েছেন ২০ শতকের অচিন্তনীয় পরিবর্তনকে।

'The turning point of socialism'-এ মূঢ়বিশ্বাসের অন্ধগলি ছেড়ে গারোদির যাত্রা শুরু জিজ্ঞাসার প্রশস্ত রাজপথে। এরজন্যে তাঁকে মূল্য দিতে হয়েছে। ফরাসি দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, সোরবোঁর ডি, লিট্. সোভিয়েট বিজ্ঞান পরিষদের ডি, এস-সি, ফরাসি কমিউনিস্ট পার্টির পলিট ব্যুরোর একদা বহুমানভাজন সদস্য এবং মার্কসীয় পাঠমালা ও গবেষণা কেন্দ্রের

The Turning point of Socialism, Roger Garaudy : Fontana 7s
Marxism in the Twentieth Century ; Roger Garaudy : Collins 36s

অধিনায়ক, রোজার গারোদি বিতাড়িত হলেন ফরাসি কমিউনিস্ট পার্টি থেকে। ফরাসি কমিউনিস্ট পার্টির ১৯তম কংগ্রেসে অভিযোগ এল যে, গারোদি মার্কসবাদ-লেনিনবাদ হতে পশ্চাদপসরণ করে এমন এক টেকনোক্রেসির তত্ত্বে মজেছেন, যে-তত্ত্বে শ্রেণীসংগ্রামের ও "দুই বিরোধী সমাজব্যবস্থার মধ্যে সংঘাতের তত্ত্ব"কে গৌণস্থান দেওয়া হয়েছে। বলা হলো, গারোদির সমাজতত্ত্ব 'মার্কসবাদ-বিরোধী'। তাঁর 'নতুন' রণকৌশল ও রণনীতিও সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। অগ্রসর পুঁজিবাদী দেশে শ্রমিকশ্রেণীর গঠন (Composition) সম্পর্কে কিংবা বিপ্লবী রূপান্তর প্রক্রিয়ায় এযুগের শ্রমিকশ্রেণীর ভূমিকা সম্পর্কে তাঁর বিচারও অশেষ দোষযুক্ত। বৈজ্ঞানিক ও টেকনোলজিক্যাল বিপ্লবের ফলে ফরাসি সমাজে যেসব পরিবর্তন এসেছে গারোদি তার বিশ্লেষণ করেছেন। এই বিপ্লবের ফলে বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের মধ্যে বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি কর্মীদের সংখ্যা ও গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে তিনি নাকি শ্রমিকশ্রেণীর ভূমিকাকে খাটো করে দেখে কায়িক ও মানসিক শ্রমজীবী মানুষের "নতুন ঐতিহাসিক ব্লক"-এর কথা বলেছেন।

গারোদির মহা অপরাধ এই যে তিনি বলেছেন, 'গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা'র নীতি পার্টি গঠনের যান্ত্রিক মডেলের সঙ্গে খাপ খায়। এযুগটা সাইবারনেটিক্‌সের। নতুন যুগের দায়দায়িত্ব যেহেতু স্বতঃই স্বতন্ত্র, সেজন্যে লেনিন যে পার্টি গড়ে তুলেছিলেন, ফরাসি কমিউনিস্ট পার্টির সংগঠন তা থেকে আলাদা হওয়া প্রয়োজন। সোভিয়েট সমালোচকেরা বলেছেন যে, গারোদি নতুন পরিভাষা ও নতুন প্রত্যয়ের ভেল্কি দেখিয়ে আসলে অবাধ আন্তঃপার্টি গণতন্ত্রের উমেদারি করেছেন। এই অবাধ গণতন্ত্রের ধারণার পিতা ট্রট্স্কি এবং একবার এই গণতন্ত্র চালু হলে উপদল ও চক্র গঠনের পথটি প্রশস্ত হয়।

ফরাসি কমিউনিস্ট পার্টির কংগ্রেসও গারোদির মতামতকে 'শোধনবাদী', ও 'দেউলিয়াবাদী' (liquidationist) এবং 'পার্টি-বিরোধী' আখ্যা দেয়। গারোদি এই অসম্মান মাথা পেতে নেন, কিন্তু তাঁর মতামতে অটল থাকেন। ফলে ১৯৭০ সালের মে মাসে তিনি পার্টি থেকে বিতাড়িত হন।

'Marxsim in the twentieth century' নামক গ্রন্থটিতে গারোদি প্রধানত দর্শনের রাজ্যে পদচারণা করেছেন। 'The turning point of Socialism'-এ গারোদি বুঝতে চেয়েছিলেন, এযুগের বৈজ্ঞানিক ও টেকনোলজিক্যাল বিপ্লবে নতুন উপাদানটি কি। কুবেরের দেশ আমেরিকা এই বিপ্লবে

কিভাবে প্রভাবিত হবে, ঐ দেশে বিপ্লবী আন্দোলনের পূর্বশর্ত কি, ধার-করা মডেল দিয়ে আমেরিকায় বিপ্লব হবে কিনা এবং পরিবর্তনকামী শক্তির ওখানে করণীয়ই বা কি। এসব প্রশ্নের বুদ্ধিদীপ্ত আলোচনা আছে ঐ পুস্তকে। গারোদির নাস্তিক্যধর্মী বিচারে আস্তিক্যধর্মী কমিউনিস্ট পাণ্ডাপুরোহিতদের রুষ্ট হবারই কথা। কেননা তিনি বলেছেন, আমেরিকা যে সরলরেখায়, একই পথ বেয়ে, সমাজতন্ত্রে পৌছবে, এমন আশা প্রায় দুরাশারই সামিল। প্রগতিশীল শক্তিগুলি যদি ঐক্যবদ্ধ হয়, তবে আমেরিকায় চালু হবে উদ্দেশ্যানুগ পুঁজিবাদ (purposeful capitalism)। এবং এই পথেই বোধহয় আমেরিকার নবজন্ম হবে, আমেরিকা এবং নিখিলবিশ্বের সামনে অবারিত হবে সৃষ্টিশীল ভবিষ্যতের ঋজুকুটিল পথ।

"সোভিয়েট ইউনিয়ন—সমাজতন্ত্রের একটি মডেলের জন্ম,"—এ শিরোনামায় গারোদি কমিউনিস্ট আন্দোলনের উত্থান-পতন, সাফল্য-অসাফল্যের খতিয়ান করেছেন। স্তালিনবাদের আমলে মার্কসবাদের বিকৃতিরই শুধু আলোচনা নয়, বিংশ কংগ্রেসের ব্যক্তি-পূজাবিরোধী আন্দোলনের সীমাবদ্ধতা প্রসঙ্গেও গারোদি তত্ত্ব-আলোচনার গভীরে প্রবেশ করেছেন। পিছিয়ে পড়া রুশদেশে উন্নতির শর্ত হিসাবে গোড়ার দিকে যেসব উপায় নিতে হয়েছিল, স্তালিন আমলে সেই উপায়গুলি শেষপর্যন্ত সমাজতন্ত্রের লক্ষ্য এবং আদর্শের স্থলাভিষিক্ত হলো। বলা হলো, সমাজতন্ত্রের লক্ষ্য অর্থনৈতিক ও টেকনোলজিক্যাল উন্নতি, যেন সমাজতন্ত্র আর পুঁজিবাদের পার্থক্য শুধু শাদামাঠা পরিমাণের। সমাজতান্ত্রিকদের ধারণা হলো যে সমাজতন্ত্রের মূল্যায়ন হবে কত রেফ্রিজারেটর কিম্বা টেলিভিশন যন্ত্র তৈরি হলো তা দিয়ে। সমাজতন্ত্রের উৎকর্ষের প্রকাশ যে ভিন্ন খাতে হবার কথা, টেকনোলজিক্যাল বিষয়েও সে সমাজতন্ত্র স্বতন্ত্র প্রয়োজন (need) সৃষ্টি করে, ঐ প্রয়োজন মিটিয়ে মানুষের পূর্ণতম বিকাশের সুযোগ করে দেয়, এসব কথা গেল হারিয়ে। অথচ মার্কস স্থূল সমাজতন্ত্রের সমালোচনা করে বলেছিলেন—একদা সে আরাম, বিলাস অথবা কলাবিদ্যা সুবিধাভোগী শ্রেণীদের করায়ত্ত ছিল সেগুলি আপামর সাধারণের লভ্য হলেই সমাজতন্ত্র সৃষ্টি হবে না। সমাজতন্ত্র সৃষ্টি করবে নব নব প্রয়োজন,-এবং ঐ প্রয়োজন মেটাবার উপায়। এবং এইভাবে সৃষ্টি হবে অভূতপূর্ব সুখের আস্বাদ, সুন্দরের নানা অভিব্যক্তি, জীবনের অনির্বচনীয় স্ফূরণ।

গারোদি বিচার বিশ্লেষণ করে বলেছেন, সোভিয়েট দেশে একদিকে

রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত 'সুপারস্ট্রাকচার' অন্যদিকে সোভিয়েট অর্থনৈতিক কাঠামো এবং অর্থ নৈতিক সংস্কারের অন্তর্লীন লজিকের মধ্যে অসঙ্গতি ক্রমশঃ প্রত্যক্ষ হচ্ছে। 'সুপারস্ট্রাকচার' আজ বিকাশের পথ রুদ্ধ করেছে। ফলে সে দেশের সামনে বিকল্প দুটি। হয় আমলাতান্ত্রিক-সামরিক কমপ্লেক্স জিইয়ে রাখার চেষ্টা হবে। যার ফলে প্রতিক্রিয়াশীল নব্য বোনাপার্টবাদ এবং সেনা-বাহিনীর ডিক্টেটরশিপ দেখা দেবার সম্ভাবনা। অথবা সুগভীর গণতান্ত্রিক নবরূপায়ণ হবে, যার ফলে সমাজতন্ত্রের সুন্দর আসনের পুনঃসংস্থাপন হবে। শ্রম এবং মানুষের মুক্তি ঘটবে সকল প্রকার অ্যালিয়েনেশন থেকে।

সমাজতন্ত্রের কোনো মডেলের কি সর্বজনীন প্রয়োগ যোগ্যতা আছে? গারোদি বলতে চান, যুগোশ্লাভিয়ার মডেল-এর কথা এইপ্রসঙ্গে ভাবা যেতে পারে। যেদেশের অর্থনীতি ও টেকনোলজি বিকাশ লাভ করেছে, যে-দেশের কৃষ্টির মানও উন্নত, যেদেশে আছে দক্ষ ও শিক্ষিত শ্রমিকশ্রেণী এবং গণতান্ত্রিক বুর্জোয়া ঐতিহ্য, সেদেশে ঐ মডেলে বোধহয় কাজ হতে পারে। বর্তমান যুগে সমাজতান্ত্রিক রূপায়নের ক্ষেত্রও প্রশস্ত হতে পারে ঐ মডেলে। ফরাসি দেশের সমাজতান্ত্রিক ভবিষ্যত গড়বার পথ কি এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে নতুন বৈজ্ঞানিক ও টেকনলোজিক্যাল বিপ্লবের ফলশ্রুতি কেমন হবে, এসব প্রশ্ন নিয়েও গারোদি আলোচনা করেছেন। সমস্যাগুলিই এতই জরুরি যে কোনো বিবেকবান ব্যক্তিই মনের দুয়ার বন্ধ করে থাকতে পারেন না। গারোদি তাই 'The Turning point' আরম্ভ করেছেন একথা বলে 'It is no longer possible to remain silent,' আর শেষ করেছেন, ঐ একই লাইনের পুনরাবৃত্তি করে।

বিশ শতকের মার্কসবাদ 'Marxism in the Twentieth Century'-এ গারোদি মার্কসবাদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন আধুনিক বিজ্ঞান, সমাজতত্ত্ব এবং কলাবিদ্যার উপাদানকে। যে মার্কসবাদ দীর্ঘকাল ইতিহাস দেবতার পায়ে মাথা কুটে মরেছে, মানুষকে রেখেছে নেপথ্যে, সেই মার্কসবাদকে নতুনযুগে নতুনভাবে বুঝতে চেয়েছেন গারোদি। আস্তিক্যধর্মী মার্কসবাদীরা বলেছেন যে গারোদি, 'মার্কসবাদ-বিরোধী'। কথাটা অনৃতভাষণেরই নামান্তর। গারোদি বলেছেন: "অসংখ্য ব্যবহারিক ক্ষেত্র মার্কসবাদ-এর সার্থকতা ও সৃষ্টিশীল কার্যকারিতার প্রমাণ দিয়েছে। বিরাট বিরাট দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনে পরিবর্তন এসেছে মার্কসবাদেরই দৌলতে। হাজার হাজার বছর ধরে

দাসত্ববন্ধনে আবদ্ধ লক্ষ লক্ষ মানুষ মার্কসবাদের সাহায্যে জীবনধারণের এমন অবস্থায় পৌছেছে যা অন্ততঃ মানবিক, সংস্কৃতির অন্দরমহলে প্রবেশাধিকার পেয়েছে। তবে একটা প্রশ্ন থাকে। ২০ শতকের সংক্ষুব্ধ পৃথিবীতে গত ২৫ বছর ধরে ফরাসি দেশে রাজকন্যার মতো মার্কসীয় দর্শন সুষুপ্তিতে মগ্ন রইল কেন?

আরম্ভে মার্কসবাদ যেন উড়ে চলেছিল। মার্কস এবং এঙ্গেলস মানুষকে সচেতন করে তুলেছিলেন তার সৃষ্টিশীল, সুপ্ত ক্ষমতা সম্পর্কে। শ্রমিকশ্রেণীকে নতুন সমাজ গড়বার কর্মসূচি দিয়েছিলেন যে সমাজে মানুষের উন্নতি চরিতার্থতা লাভ করবার কথা। সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা দিয়েছিলেন এমন এক রণকৌশল যা একাধারে সংগ্রামী ও বৈজ্ঞানিক। পতন অভ্যুদয় ক্ষুব্ধ পথ পরিক্রমায় মার্কসবাদে কখনো দেখা গেছে প্রাণবন্যা কখনো বা নির্বিচার মূঢ় বিশ্বাসের মরু বালিরাশিতে মার্কসবাদের সৃষ্টিশীল ধারা পথ হারিয়েছে।

লেনিনের নেতৃত্বে অক্টোবর বিপ্লব যখন হলো সেদিন সারা পৃথিবীর নিপীড়িত, বঞ্চিত মানুষ দেখতে পেল উজ্জ্বল ভবিষ্যতকে, এমন একটি আধ্যাত্মিক ঘটনাকে যার তুলনা বিশ শতকের উষাকালে আর পাওয়া সম্ভব নয়। এই বিপ্লবের ফলশ্রুতিতে বিস্ময়কর সাংস্কৃতিক ফসলের সমারোহও দেখা গেল ব্লক ও মায়াকোভ্স্কির কবিতায়, ক্যানডিন্স্কি ও ম্যালোভিচ্-এর আলেখ্য, গর্কি ও অ্যালেক্সি টলস্টয়ের উপন্যাসে এবং আইজেনস্টাইনের ছায়াছবিতে। ১৯২০ থেকে ১৯৪০ সালের মধ্যে যারা বড় হলো তারা যেন বেঁচে ছিল এক উদ্দীপনাময় আবহাওয়ায়। স্তালিনগ্রাডের যুদ্ধ, যুদ্ধ বিধ্বস্ত সোভিয়েট দেশের পুনর্গঠন, আকাশে মানুষের দুঃসাহসিক যাত্রা, এসব গল্পের যেন শেষ নেই। গারোদি এসব স্থায়ী কৃতিত্বের কথা মানেন।

তবে মার্কসবাদে 'ডগম্যাটিজম'-এর ভেজাল এল কেমন করে? "আমরা মনে করেছি যে আমরা পরম অকল্যাণের বিরুদ্ধে লড়াই করছি। তাই স্বতঃই আমরা ভেবেছি যে আমাদের লড়াই পরম কল্যাণের জন্যে। জগতকে আমরা দুভাগে ভাগ করেছি। একদিকে শুধুই অকল্যাণের জমাট অন্ধকার অন্যদিকে শুভ্রনিরঞ্জন কল্যাণের স্নিগ্ধ আলো। পার্টিয়তার নামে আমরা বিচারনিষ্ঠ প্রেক্ষিত হারিয়ে ফেলে ভেবেছি, হয় 'ভালো' নয় 'মন্দ' এর মাঝে বেছে নিতেই হবে। আর অবক্ষয়ের এক বিশ্বব্যাপী ধারণা তখন আমাদের মগজে। ফলে ভেবেছি, সমাজতন্ত্রের বহির্ভূত দুনিয়া তো পচনশীল, এ-দুনিয়ায় কোনো মানবিক মূল্য, এমনকি আর্টের ক্ষেত্রেও, জন্মলাভ করতে পারে না। এই

মানসিকতার পরিণত ফল হিসাবেই আমরা সাদরে গ্রহণ করেছি স্তালিনবাদকে যদিও কেউ-ই এই মতবাদ জোর করে আমাদের উপর চাপিয়ে দেয়নি।"

মার্কসবাদের গুরুত্বপূর্ণ অবদানকে গারোদি অস্বীকার করেছেন একথা বলা সত্যের অপলাপই। একদা গারোদি স্বয়ং স্তালিনবাদী মূঢ়তাকে মেনে নিয়ে সংস্কৃতির রাজ্যে কিঞ্চিৎ দিঙ্‌নাগপনাও করেছেন; সাহিত্য বিচারে হয় 'সাদা' নয় 'কালো' এই অতিসরলীকৃত ফরমুলা চালু করেছেন। এই মানুষটিই আজ বলেছেন যে, মার্কসবাদকে সর্বরোগহর দাওয়াই হিসাবে দাঁড় করালে, মনে জাগতিক এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিভ্রান্তিরই সম্ভাবনা। একথা অস্বীকার করা চলে না যে, যুগে যুগে যেসব 'তন্ত্র' মানুষ খাড়া করেছে মার্কসবাদের স্থান তার মধ্যে খুবই উঁচুতে এবং একে অতিক্রম করে যাওয়া শক্ত। বিশেষ করে এর দৌলতে আমরা পেয়েছি মানুষ এবং সমাজ সম্পর্কে এক নতুন দিগ্‌দর্শন। মার্কসবাদ আমাদের শিখিয়েছে ঐতিহাসিকভাবে চিন্তা করতে।

এর ফলে আর অনাদি-অনন্ত শূন্যে মানুষ ও তার ধ্যানধারণার বিচার সম্ভব নয়। স্থানকালের সীমায়, ইতিহাসের পটভূমিতে, মানুষকে দেখেছে মার্কসবাদ। চিন্তার রাজ্যে মার্কসবাদ এনেছে গতিশীলতা, স্তালিনীয় ডায়ালেকটিকসের ঝাড়ফুক সত্ত্বেও। মার্কসের দৌলতে আমাদের উপলব্ধি হয়েছে যে সমাজ একরকম নয়। সমাজের আছে প্রকারভেদ এবং ইতিহাসের ধারাপথে সমাজের রূপান্তর হয়। সব চাইতে বড় কথা, মার্কসবাদ আমাদের দিয়েছে পদ্ধতিবিজ্ঞান, মেথডোলজি।

ভক্তির সাপ্লুত চিত্তে অনেকেই মার্কসবাদকে গ্রহণ করেছে 'ভবিষ্যতের দর্শন' হিসাবে অন্যদিকে নিন্দুকেরা বলেছে "মার্কসবাদ হলো অর্থহীন তালগোল পাকান পিণ্ড"। কমিউনিজমের দৌলতে মার্কসবাদের সঙ্গে এসে মিশেছে ডগম্যাটিজম্ ত্রাণকর্তাবাদ (messianism) এবং মেটাফিজিকসের দৌরাত্ম্য। গারোদি বলেছেন; ঘুমন্ত রাজকন্যাকে যদি জাগাতে হয় তবে আজ প্রয়োজন যুগধর্মের গভীর উপলব্ধি, আর ডগমা ও ছেঁদোকথার দৌরাত্ম্য হতে মুক্তি। আজ প্রয়োজন যুক্তি ও মানুষে বিশ্বাস স্থাপন। তাহলে অবারিত হবে সমাজতান্ত্রিক মানবতার আলোকোজ্জ্বল পথ। এবং সেটা সম্ভব যদি আমরা যাত্রা আরম্ভ করি ২০ শতকের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে।

"Marxisim in the 20th Century" পুস্তকটি এই কয়টি অধ্যায়ে বিভক্ত। 1. The terms of the problems in the last third of the

Twentieth Century. 2. From dogmatism to Twentieth Century Thought. 3. Marxism and Ethics. 4. Marxism and Religion. 5. Marxism and Art. শেষের তিনটি অধ্যায়ে গারোদি ইউরোপীয় দর্শনেতিহাসের পটভূমিকায় নীতিশাস্ত্র, ধর্ম ও আর্টকে বুঝতে চেয়েছেন মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে। ফরাসি দেশের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের কথা মনে রেখেই গারোদির আলোচনা।

গারোদি বলেছেন, মার্কসবাদী নীতির প্রতিষ্ঠা এই সত্যের উপর যে মানুষ পশুদের থেকে আলাদা। মানুষের সামনে সর্বদাই এ-সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত যখন সে বলতে পারে "আমি বেঁচে থাকতে চাই এবং পরের জন্য প্রাণোৎসর্গ করতে চাই"। স্বাধীন ইচ্ছা আছে বলেই মানুষ 'স্ব'-এর খাঁচায় শুধু আবদ্ধ নয়, এবং সেই ইচ্ছা আছে বলেই মানুষ দেশকালের সীমা অতিক্রম করতে সক্ষম, অতিক্রম করতে সক্ষম জান্তবতা ও অ্যালিয়েনেশনকে। নীতির আলোচনায় নিঃসঙ্গ বিষয়ী মার্কসবাদের যাত্রাবিন্দু নয়। মার্কসবাদের শুরু প্র্যাকটিস হতে। মার্কসবাদী স্বীকার করে যে মানুষ আরম্ভ করে শ্রম থেকে এবং এই শ্রম সর্বদা সামাজিক। শ্রম সামাজিক এই কারণে যে মানুষে মানুষে মিলিয়ে শ্রমই অন্যের সঙ্গে আদান প্রদানের সেতু হিসাবে কাজ করে। শ্রমই শেখায় যে মানুষ আত্মচৈতন্য মগ্ন, জানালাহীন মোনাড্ নয়, সমাজবদ্ধ জীব। সমাজবদ্ধ জীব হলেও মানুষের চৈতন্যের স্বকীয়তা আছে কেননা মানুষ স্রষ্টা। মানুষ নিজেকে সৃষ্টি করে, সৃষ্টির বিপরীত যে অ্যালিয়েনশন তাকে অতিক্রম করে চলে। সকল মানুষের অ্যালিয়েনেশন মুক্তিই মার্কসবাদী নীতিশাস্ত্রের গোড়ার কথা—"an ethic whose ultimate end creates the conditions which will make it possible for every men to become effectively a man, that is to say a creator."

ইউরোপে খ্রীষ্টধর্মবিশ্বাসী ও মার্কসবাদীদের মধ্যে ডায়ালোগের কথা শোনা গেছে; বিশেষত রোমান ক্যাথলিক দেশে। গারোদিও ঐ ডায়ালোগের যৌক্তিকতা স্বীকার করেছেন। তিনি বলছেন "আমরা একে অপরকে বুঝতে পারব না যদি না আমাদের স্বভাব পালটাই।" মার্কসবাদের নিরীশ্বরতার আবির্ভাব দুটি কারণে। মানবিকতা হতে এই নিরীশ্বরতার উদ্ভব। এবং নিরীশ্বরতা ধর্মীয় গোঁড়ামির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের অন্যতম দিক। খ্রীস্টান মহলে বলা হয়, মার্কসবাদ বস্তুবাদী, ঐতিহাসিক নিয়তিবাদী, হয়তো বিমূর্ত

মানবিকতাবাদীও। খ্রীস্টধর্মে মানুষের ব্যক্তিসত্তার যে চরম মূল্য স্বীকৃত মার্কসবাদে তার স্থান নেই। গারোদি এই প্রশ্ন নিয়ে সবিস্তার আলোচনা করেছেন। গারোদি দেখাচ্ছেন মার্কস কুত্রাপি 'পরমজ্ঞান' স্বীকার করেননি, ইতিহাসের অন্ত আছে এটাও তাঁর বক্তব্য নয়। নয় বলেই মার্কস বদ্ধব্যবস্থার (closed system) বিপক্ষে অন্তহীন সৃষ্টি প্রক্রিয়ার কথা বলেছেন।

পোল্যাণ্ডের অ্যাডাম সাফ-এর মতো গারোদিও দেখাতে চান যে মার্কস-বাদ মূলত 'মানুষের দর্শনই'।

"No greater mistake, again, to believe that man does not exist for Marxism, that what does exist is a sum of social relations; that men are not the subject of history but only the effects and the props of a sum of social relations···. Marx explicitly rules out this explanation."

গারোদি বলেছেন যে সৌন্দর্যতত্ত্বের ক্ষেত্রে মার্কসবাদী মহলে তিনটি বিভ্রান্তি দেখা গেছে এবং এদের উদ্ভব ঐতিহাসিক বস্তুবাদের যান্ত্রিক বিকৃতি থেকে। প্রথমত, মার্কসবাদী সমালোচনায় দেখা গেছে অবক্ষয়ের এক বিশ্বব্যাপী ধারণা। ১৮ শতকের ফরাসি বস্তুবাদীরা, যান্ত্রিক বস্তুবাদের ভিত্তিতে যুক্তি দিতেন, "প্রাচীন গ্রীকদের তুলনায় আমরা টেকনোলজি এবং অর্থনীতিতে অনেক উন্নত; অতএব আমাদের আর্ট গ্রীসের আর্টের অপেক্ষা অনেক উৎকৃষ্ট।" যদিও মার্কস এহেন অতিদাম্ভিক মূর্খামি নিয়ে ঠাট্টা করেছেন তবুও এ-মূর্খামি কমিউনিস্ট সৌন্দর্যতত্ত্বে দেখা গেছে। এর ফলে সুপারস্ট্রাকচারের আপেক্ষিক স্বাতন্ত্র্যের গুরুত্ব অস্বীকৃত হয়েছে এবং এমন যুক্তি শোনা গেছে যে, "অবক্ষয়ী সামাজিক-অর্থনীতির ব্যবস্থায় শুধু অবক্ষয়ী সৃষ্টিই সম্ভব"। অথচ একথা দর্শনের ক্ষেত্রেও খাটে না। সাম্রাজ্যবাদের অবক্ষয় এবং ভাঙনের যুগেও এমন সৃষ্টি দেখা গেছে যা থেকে সমাজতান্ত্রিকদেরও শেখবার অনেক কিছুই আছে। গারোদি বলছেন: "আমরা যদি এখনও মনে করি যে হুসারেল এবং হাইডেগার, ফ্রয়েড এবং ব্যাচেলার্ড অথবা লেভি-ষ্ট্রস্‌রা কিছুই নন তবে আমাদের মার্কসবাদের দুঃস্থতাই উদ্‌ঘাটিত হবে।" দর্শনের বেলায় একথা সত্য হলে আর্টের বেলায় তো আরও সত্য। যেযুগে পুঁজিবাদের অবক্ষয় শুরু হয়েছে এবং সাম্রাজ্যবাদ গেছে ভেঙে, সেই যুগে দেখা গেছে ইম্‌প্রেশনিজমের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন, সীজান ও ভ্যান্ গঁর শিল্পকৃতি। কিউবিস্ট ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের সৃষ্টি-

কর্মের কালও এটা। আর সাহিত্যে তো কাফ্‌কা থেকে ক্লডেল পর্যন্ত বহু প্রতিভাবান সাহিত্যিকের সৃষ্টিলীলাও তো এই যুগে।

দ্বিতীয়ত: প্রথম বিভ্রান্তিটি আরও ব্যাপক বিভ্রান্তিরই একটি বিশিষ্ট রূপ। কমিউনিস্টরা বলেছে: আর্ট শুধুই সুপারস্ট্রাকচার; যথাস্থিত বাস্তবের শুধুই 'প্রতিফলন'। গারোদি বলেছেন: এই যান্ত্রিক ধারণা (প্রতিফলনের) আর্টের তো বটেই বিজ্ঞানের দিক থেকেও মারাত্মক।

অবশ্য কোনো মার্কসবাদীই বলবে না যে, আর্ট সুপারস্ট্রাকচারের অংশ নয়; এবং অংশ বলেই শ্রেণীস্বার্থের সঙ্গে এর যোগাযোগ আছে। তবুও শিল্পকর্মকে এর মতাদর্শগত উপাদানে রূপান্তরিত করা (reduce) মানেই হলো 'বিশেষতা'কে উপেক্ষা করা। শুধু তাই নয়। এর ফলে শিল্পকর্ম যে আপেক্ষিকভাবে স্বয়ংশাসিত (autonomous) এ-সত্যও উপেক্ষিত হয় এবং শিল্পকর্ম ও সমাজের বিকাশ যে সমতালে ঘটে না, এ-বিষয়েও বিভ্রম দেখা দেয়। গ্রীক ট্রাজেডির বিচারে তাই দেখা যায় যে, মার্কস সমাজকে দেবতার আসনে বসিয়ে ভাবলোককে শুধু সমাজ-আশ্রিত আকাশকুসুম হিসাবে বিচার করেননি। বরং তিনি বলেছেন যে, সমকালীন সমাজজীবনের গতিপ্রকৃতির সঙ্গে শিল্পসাহিত্যের কোনো প্রত্যক্ষ, একান্ত সংযোগ যদি দেখা না যায়, তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই।

তৃতীয়ত: তৃতীয় বিভ্রমটির উদয় হয় এই কারণে: শ্রেণীশাসন-নিরপেক্ষভাবে, শিল্পকর্মের স্থায়ী মূল্যকে বিচারের বেলায় এই ধারণা কাজ করে যে শিল্পকর্ম শুধুই জ্ঞানাত্মিকাই বোধহয় (form of knowledge), মার্কস অবশ্যই বলেছেন যে মহৎ শিল্পসৃষ্টিতে জ্ঞানাত্মিকা উপাদান নিশ্চয়ই আছে, যেমন ছিল ব্যালজাকের সৃষ্টিতে। কিন্তু শিল্পকর্মকে শুধু "জ্ঞানাত্মিকা উপাদান হতে জাত বললে এর বৈশিষ্ট্য চাপা পড়ে। 'আর্ট জ্ঞানাত্মিকা' হেগেলীয় এই বক্তব্যে আংশিক সত্য বিধৃত। কেননা একথা ঠিক নয় যে দর্শন ও ইতিহাস প্রত্যয়ের (concepts) সাহায্যে যে বিষয়ে 'জ্ঞান' দিতে চায়, আর্ট সেই বিষয়েই 'জ্ঞান' দেয় চিত্রকল্পের মাধ্যমে। হ্যামলেট্ অথবা কোনো কবিতা অথবা ছবি অথবা গানের কথাই ধরা যাক। এদের প্রত্যয়ের (concepts) বাঁধনে আনা যায় না। তার কারণ এদের আছে 'বিশেষ ধর্ম' যা বিষয়বস্তুর দিক থেকে এবং ভাষার দিক থেকে অপরিমেয়।

গারোদি বলেছেন, মার্কসবাদীর কাছে আর্ট শুধু আত্মসচেতনাই নয়, আত্মসৃষ্টিরও ইতিহাস। শিল্পকর্মের আছে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য যাকে অস্বীকার করা চলে

না। তত্ত্বের সংজ্ঞা যদি এমনভাবে বেঁধে দেওয়া হয় যা বিচারলেশহীন এবং চূড়ান্ত, তাহলে আমরা পাব বিবর্ণ এক 'রিয়ালিজম'। এই 'রিয়ালিজম'-এ নতুনের স্থান হবে না। আমাদের মগজে এই ধারণা জন্মাবে: "আমরা তো তত্ত্বের সংজ্ঞা ও নীতির সংজ্ঞা ঠিক করেই দিয়েছি শুরুতে এবং সে সংজ্ঞা তো চিরকালের জন্য সত্য।

গারোদি মার্কসবাদী সৌন্দর্যতত্ত্বকে স্থাপন করেছেন ইউরোপেই বিরাট ইস্‌থেটিক আন্দোলনের পটভূমিতে। আহ্বান জানিয়েছেন শিল্পীদের: আপনাদের কাজ স্বল্প মেয়াদি শ্লোগানের ব্যাখ্যা দেওয়া নয়, মানুষের ভবিষ্যৎ নির্মাণের মহৎ কর্মযজ্ঞে অংশ নেওয়া।

'Marxism in the Twentieth Century' সৃষ্টিশীল মার্কসবাদের অমর গ্রন্থ। নিন্দুকের মুখর ভাষণ সত্ত্বেও সব দেশের বুদ্ধিজীবী মহলে গ্রন্থটি সমাদৃত হবে।

অধ্যাপক সতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর এই মূল্যবান সমালোচনা-প্রবন্ধটির বহু মন্তব্য বিষয়ে আমরা একমত নই। এই বিশিষ্ট আলোচনাটি প্রসঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ রচনা জিজ্ঞাসু পাঠকদের নিকটে আহ্বান করছি।

সম্পাদক

একটি নাটক

অরুণ মিত্র

ইদানীং কাব্যনাট্য সম্বন্ধে প্রচুর উৎসাহ এখানে দেখা গেছে এবং রচনার বেশ কিছু নির্দেশও পাওয়া গেছে। তবু সসঙ্কোচে স্বীকার করি কাব্যনাট্য বলতে ঠিক কি বোঝায় তা আমার কাছে পরিষ্কার নয়, দেশী-বিদেশী কোনোভাবেই। কাব্যের প্রকরণ দিয়ে লিখিত নাটক, ছন্দ মিল বা ঐ ধরনের কোনো পদ্ধতির ব্যবহার? কিন্তু সে-রকম নাটক তো বাঙলায় অনেককাল ধরেই লেখা হচ্ছে। বড়-ছোট-মাঝারি অনেক লেখকের মঞ্চ-সফল নাটক। নাকি কাব্যনাট্য মানে সেই নাটক যাতে কাব্যগুণ প্রধান? কিন্তু কোন্ জাতের কাব্য এবং কি তার বৈশিষ্ট্য সেও এক প্রশ্ন। ধরে নেওয়া যাক, বহিরঙ্গ কোনো লক্ষণ নয়, অন্তর্নিহিত এমন কোনো গুণ যা পাঠক বা শ্রোতার অনুভূতিকে এবং প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে বুদ্ধিকেও আলোড়িত করে। এমন এক গুণ যা তার নিগূঢ় সত্তায় অনুরণন তোলে। কিন্তু এই বা নতুন ও বিশিষ্ট কি? সেক্সপীয়ার কি তেমন নাটক লেখেননি? এবং বর্তমানকালে ব্রেখ্‌ট্ ও অন্যান্যেরা? এ-চেষ্টা তো বরাবরই চলে আসছে। বস্তুত উপন্যাস নাটক কবিতা সব সার্থক সৃষ্টিরই এ-এক সাধারণ লক্ষণ, এই ভিতর থেকে নাড়িয়ে দেওয়া। তবে কি আধুনিক কাব্যনাট্য বলতে এই বুঝব যে, যাঁরা কবি বলে পরিচিত তাঁরা বিভিন্ন পাত্রপাত্রীর মুখ দিয়ে কবিতায় কথা বলাবেন নিজেরা সরাসরি কিছু না বলে? কিন্তু নাটকের দিক থেকে তাতে কি লাভ? শ্রোতারা কেন ধৈর্য ধরে শুনবে যদি তারা আগেই কবিতায় আগ্রহী না হয়ে থাকে? বরং গায়ে পড়ে কবিতা হচ্ছে বলে তাদের দ্রুত অদৃশ্য হবারই সম্ভাবনা। সেই যেমন মাস্টারমশায়ের মার্বেল খেলায় অংশ গ্রহণকে অঙ্ক কষানোর চেষ্টা মনে করে বালকেরা পালিয়েছিল।

অতএব জাত হিসেবে কাব্যনাট্য কথাটি আমায় কাছে গোলমেলে। আমার বুদ্ধিতে আমি বুঝি, আসল হলো নাটক। তাকে যে-কোনো রকমের

নাটকের নাম ভীষ্ম—মণীন্দ্র রায়। প্রকাশক—লিপিকা, ৩০।১, কলেজ রো, কলিকাতা—৯। মূল্য—তিন টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

গদ্যে বা যে-কোনো রকমের পদ্যে লেখা যেতে পারে। মাধ্যম হিসেবে কোথায় কি ব্যবহার করা হবে তা নির্ভর করে একযোগে অনেক কিছুর উপর। যথা—বিষয়বস্তু, বক্তব্য, লেখকের কল্পনাদক্ষতা ইত্যাদি। কিন্তু প্রথম শর্ত নাটক হওয়ার। এবং সংঘাত ছাড়া নাটক হতে পারে বলে মনে হয় না। দর্শকের পক্ষে সেই সংঘাত নিছক দর্শনীয় নয়, অনুভবনীয়। তা কখনো প্রত্যক্ষ ঘটনাবলীর মধ্যে, কখনো বা বিভিন্ন মানসিকতার মধ্যে। ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিত্ব যে-বাস্তবেরই প্রতিফলন হোক-না-কেন তা নাটকে ফুটে না উঠলে চলে না। অর্থাৎ আমাদের স্পষ্ট বা অস্পষ্ট অভিজ্ঞতাকে যদি না তোলপাড় করে, যদি না তাকে ভালো করে চেনায়, তা হলে নাটক ব্যর্থ। জীবন নিরপেক্ষভাবে কতকগুলো কথা বানিয়ে বলালে তা কোনো দর্শক ও শ্রোতাকে স্পর্শ করে না।

শ্রীমণীন্দ্র রায়ের লেখা 'নাটকের নাম ভীষ্ম' পেয়ে প্রথমেই এইসব সাত পাঁচ ভেবেছিলাম। মণীন্দ্র রায় প্রখ্যাত কবি, তাঁর নাটকও কাব্যের আকারে কাজেই একটু আশঙ্কা হয়েছিল হয়তো বিভিন্ন চরিত্রের মুখ দিয়ে কোনো অখণ্ড স্বগতোক্তি শুনতে হবে। হয়তো এমনি ব্যক্তিগত বক্তব্য যা আমি ঠিকমতো উপলব্ধি করতে পারব না যেহেতু সে-বক্তব্যের সঙ্গে আমার সংযোগ নেই। কিন্তু পড়তে গিয়েই টের পেলাম আমার আশঙ্কা সম্পূর্ণ অমূলক। চমকিত ও আনন্দিত হলাম যখন দেখলাম নাটকের নাটকীয়তা সম্বন্ধে লেখক নিজেই সুস্পষ্টভাবে সচেতন। আমার সন্দেহকে বিধ্বস্ত করে তিনি নাটকের চরিত্র অজয়কে দিয়েই বলিয়েছেন ঃ

"কিন্তু ব্যক্তিগত / বোধ-স্বপ্ন যা আমার, সে যদি নাটকে / সময়ের সংঘর্ষের রূপের আদলে / জীবন্ত না হয়, তবে যারা দেখবে তারা / নিজেরাই ছুঁড়ে দেবে, ভয় কি আপনার!"

এ-নাটকের পরিকল্পনায় যথেষ্ট অভিনবত্ব আছে। এক নাটকের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী জড়িত আর এক নাটক। ভীষ্ম নাটকের অভিনয় বর্তমানের এক জীবননাট্যের পাশাপাশি এবং ভিতরে। একটা সরে যায়, অন্যটা আসে। সমসাময়িক তাৎপর্য আরোপ করে পৌরাণিক নাটক রচনার দৃষ্টান্ত অনেক আছে। কিন্তু একই বৃত্তের মধ্যে দুই কালের বিন্যাস বাঙলা নাটকে আর দেখেছি বলে মনে পড়ে না। আধুনিক সমাজের কয়েকটি চরিত্র অভিনয়ে পৌরাণিক চরিত্র গ্রহণ করে, আবার নিজেদের বাস্তবে ফিরে আসে। সর্বক্ষণ পারস্পরিক পটভূমিতে যেমন মনের ও আচরণের চেহারা স্পষ্ট হয়ে ওঠে, তেমন একটা

ঐক্য ও সমতার সৃষ্টি হতে থাকে। শেষপর্যন্ত এতদূর যে, পৌরাণিকে আর আধুনিকে ভেদ রাখার দরকার হয় না। মহাভারতের সঞ্জয় বর্তমানের অজয়ের সঙ্গে তর্ক করে ভীষ্ম চরিত্রের ভাষ্য নিয়ে এবং তার বিচারের দায় বর্তায় দর্শকদের উপর, অর্থাৎ আমাদের উপর।

অন্য কয়েকটি চরিত্রসহ ভীষ্মকে এবং তাঁর ভূমিকাকে লেখক "সময়ের সংঘর্ষের রূপের আদলে" দেখিয়েছেন। সে-সংঘর্ষ তো আমাদের সময়েরও। অতন্দ্র প্রতিজ্ঞা নিয়ে স্বদেশকে ধরে আছেন ভীষ্ম। তিনি সত্যবতীর সস্নেহ আবেদন শোনেন না। কারণ তিনি নায়ক, সত্য তাঁর দুচোখের মণি। তিনি অম্বার প্রেম নিবেদনে অটল, কারণ তিনি সত্যে সমর্পিত মন। কিন্তু সত্য কি বাস্তবনিরপেক্ষ অনড় কোনো বস্তু? ব্যক্তিগত দিক থেকে সত্যবতী হৃদয়হীন নীতির খোলসের কথা বলেছেন, অম্বা বলেছে প্রবহমান পরিবর্তমান সময়ের কথা। আর এরই পাশে অজয় বিস্তৃতভাবে নির্দেশ করে সত্যের স্বরূপ: "যে সত্য প্রত্যহ জীবনের। অগ্নিকুণ্ডে পোড়ে, তাই শুধু খাঁটি হয় / মানুষের এ সংসারে মানুষের চেয়ে / দামী আর কিছু নেই।—জ্যান্ত সময়ের / বোঁটা থেকে খসে পড়লে তাই, এও জানি / সত্য বাসী হয়ে যায়।" তথাকথিত সত্যধর্মী আত্মত্যাগী ভীষ্মের নায়কত্ব যখন অন্যায় ও অনাচারের সমর্থন হয়ে দাঁড়ায় তখন তার সম্বন্ধে মোহ ভাঙতে আরম্ভ করে, বিদ্রোহের সূত্রপাত হয়। বিকর্ণের ঘোষণায় আমরাও আমাদের বিদ্রোহের অধিকার স্মরণ করি। ঘরে বাইরে পর্যুদস্ত বিচ্ছিন্নতায় পীড়িত আমাদের অজয় হিতেনরাও "এই আর্তযুগের কুরুক্ষেত্রে" ধ্বংসের অনিবার্যতাকে স্বীকার করে, যাতে নতুন নির্মাণ হতে পারে। যেমন নদীর এক পাড় ভাঙে আর অন্য পাড় মানুষকে লালনের জন্যে বুক পেতে দেয়। কিন্তু আমাদের কোনো নায়কের মধ্যে কি ভীষ্মের মতো বিবেকের কোনো অবশেষ থেকে যার তাড়নায় ভীষ্ম নিজের মৃত্যুর পথ অর্জুনকে দেখিয়ে দেন, কথা ও কাজের ভেদ ভেঙে দিতে নিজের অতীতের তথা হস্তিনার ধ্বংস ডেকে আনেন? পাঁচিলের দুই দিকে দুই নিয়মের কথা বলেও এ-ভীষ্ম স্বস্তি পাননি, অন্তরের রক্তাক্ত সংগ্রামকে থামাতে পারেননি, মর্মস্পর্শীভাবে বলেছেন: "অরণ্যের বিভীষিকা বুকে হৃদপিণ্ডে গভীর / শকুনি নখের মতো বেঁধানো শিকড়—/ প্রতিদিন উপড়ে ফেলি, তবু প্রতিদিন / বাঁচে সে দুর্মর / আর আমি রক্তপাতহীন জখমে ম'রে কোন্ স্বপ্নে বাঁচি?...ত্যাখোনি দারুণ গ্রীষ্মে, ফুটিফাটা মাঠে / নিদারুণ পিপাসায় বিদীর্ণ জটিল / আমার সে মুখ?"

মণীন্দ্র রায় নিশ্চয় জানেন তাঁর বিধৃত এই ভীষ্ম-বিবেক আমাদের পরিচিত কোনো নায়কের মধ্যে নেই। সুতরাং ভীষ্মের সূত্রে ধ্বংস সাধনের ঔচিত্য সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত দর্শকসাধারণের উপর ছেড়ে দিয়ে তিনি ভালোই করেন। সব দিক থেকে তাঁর নাটক বাস্তব হয়ে ওঠে।

সর্বজনের স্মৃতিতে গ্রথিত পুরাণকাহিনীর নাট্যরূপায়নে কাব্য ব্যবহার করার মধ্যে একটা স্বাভাবিকতা থাকে। সেই স্বাভাবিকতাকেও নাট্যকার আধুনিক সংলাপেও প্রসারিত করেছেন। এটা কৃতিত্বের বিষয়। মনে হয় দুই উপায়ে তিনি এ-ব্যাপারে সফল হয়েছেন। প্রথমত, আধুনিক কাহিনীকে নিরন্তর পুরাণকাহিনীর সঙ্গে সম্পৃক্ত রেখে; দ্বিতীয়ত, 'কাব্যি' না করে, সংলাপকে সহজ রেখে। তবে কোনো কোনো জায়গায় যে তিনি বিচ্যুত হননি তা নয়। যেমন ক্রুদ্ধ উমার মুখে বিদ্রূপাত্মক 'ন খলু ন খলু বাণ'। কিংবা অজয়ের বলা "শুধু মনের গোড়ায় সার দিচ্ছিলাম—। যাতে বেশ ভালো করে উৎসাহের ফুল / ফুটে ওঠে।"অথচ এর একটু আগেই যখন প্রচণ্ড সঙ্কল্পে অজয় স্বগত বলে "আমি চোখ খোলা রাখব—আমি / দেখো দেখো এই শূন্যতাকে দু'হাতে কুপিয়ে কাদাজলে / ফলার সোনার শস্য," তখন তার আবেগ আমাদের অনায়াসে উদ্দীপ্ত করে তোলে। কিছু যান্ত্রিকতাও লেখক এড়াতে পারেননি বলে আমার মনে হয়েছে। যেমন, পরশুরামের আবির্ভাব। এই অংশটির কোনো প্রয়োজন আছে/ এমন বোধ হয়নি। পরশুরামের উক্তি এ-নাটকে যেন বেসুরো বেজেছে।

এ-নাটকের এক বড় নির্ভর লেখকের কল্পনা ও ভাষার স্বাচ্ছন্দ্য। প্রাচীন ও আধুনিক কাহিনী উভয়ত্রই। শব্দযোজনার ধাঁচ বদল সত্ত্বেও তার চলিষ্ণুতা কোথাও ক্ষুণ্ণ হয়নি। এ-এক বিশেষ গুণ যা নাটককে ঝিমিয়ে পড়তে দেয় না। কোনো কোনো অংশে সাধারণের বোধের এমন প্রতিধ্বনি যে বেশ আবিষ্ট হতে হয়। নাটকের বিন্যাসে যে-অভিনবত্ব আছে তার উল্লেখ আগেই করেছি। পৌরাণিকের ও আধুনিকের এই সহাবস্থান মঞ্চরূপায়নে অত্যন্ত আকর্ষক হতে পারে। এবং আরও আগ্রহের বিষয় সর্বক্ষণ নাট্যক্রিয়ার সঙ্গে দর্শকদের সংযোগ। কারণ সব অদল-বদলই তাদের বলেকয়ে করা এবং অনেক বক্তব্য সোজাসুজি তাদের উদ্দেশ্যেই বলা। মঞ্চ-উপস্থাপনার দিক থেকে শরশয্যার দৃশ্যে দুই ভীষ্মের পরিকল্পনা আমার অপূর্ব লেগেছে। মনশ্চক্ষে দৃশ্যটি দেখে আমি রোমাঞ্চিত হয়েছি।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা

সতীন্দ্রনাথ মৈত্র

তিরিশের দশকের লক্ষ্যহীন বিদ্রোহ, তাঁদের অপার দেহবিলাস সর্বপ্রথম ক্লান্ত করে ঐ দশকেরই দু'জন মুখ্য কবিকে। তাঁরা হলেন যথাক্রমে, সমর সেন ও বিষ্ণু দে। 'জগতের শূন্য অন্ধকার শরীরের রূপরেখা' সম্বল করে বাঁচবার যে ক্লান্তিকর প্রয়াস তারই উদ্দেশ্যে বর্ষিত হলো তাঁদের শাণিত ব্যঙ্গ। প্রচলিত অবস্থা বিচলিত করেছিল তাঁদের। বুকের ভেতরে ক্ষয়রোগের বীজাণু নিয়ে জৈবিক হৈ-হুল্লোড়ে মত্ত হওয়া তাঁদের কাছে সঙ্গত মনে হয় নি—তাই সেই অমানুষিকতার বিরুদ্ধে প্রথম 'নোট অব ডিসেণ্ট' লিপিবদ্ধ করেছিলেন তাঁরা। সুভাষ মুখোপাধ্যায় ও বাঙলা কবিতার ক্ষেত্রে এসেছেন মুখ্যত প্রতিবাদের নিশান তুলে ধরেই যদিও তাঁর প্রতিবাদ তাঁর পূর্বসূরীদের তুলনায় গুণে ও ধর্মে আলাদা।

কিন্তু মজার কথা হলো এটাই যে, সুভাষের প্রথম আবির্ভাবকে স্বাগত জানালেন তিরিশের দশকের এমন এক প্রতিনিধিস্থানীয় কবি যিনি 'বন্দীর বন্দনায়' রতিবিলাসে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয়েছিলেন কিংবা 'ছোট দুটি মুঠি ভরা স্তনের' স্বপ্ন যাঁকে উদ্দীপিত করত। ঘটনাটি অনেকের কাছেই কবি-সমালোচক বুদ্ধদেব বসুর উদারতা হিসেবে প্রতিভাত হলেও, আমার কাছে এটা কিন্তু যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ মনে হয়েছে। এবং আমার ধারণা সুভাষের কবিপ্রতিভার বিশিষ্টতার চাবিকাঠিটিও এরই উত্তরের মধ্যে নিহিত!

তিরিশের কবিদের যাত্রা সুরু হয়েছিল দুই মহাযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে। একটি রক্তের সমুদ্র সাঁতরে রুক্ষ তীরভূমিতে উঠে দাঁড়িয়ে তাঁর দেখেছেন আরেকটি অনিবার্য ধ্বংসের হাতছানি। অথচ দুনিয়া জুড়ে যে সব যুগান্তকারী ঘটনা ঘটে গিয়েছে তার অভিঘাতে ব্যাপ্তি ঘটেছে তাঁদের চৈতন্যের। ঘটেছে রুশ বিপ্লব, ১৯২৯-এর বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক বিপর্যয়, স্পেনের গৃহযুদ্ধ, মিউনিক, ফ্যাসিবাদের অভ্যুত্থান। সবই তাঁরা দেখেছিলেন এবং বুঝতে পেরেছিলেন কিন্তু

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা। ভারবি। দাম ছয় টাকা।

মৃত্যুর সমুদ্র ঘেরা দ্বীপ থেকে পরিত্রাণের বীজমন্ত্র তাঁদের জানা ছিলনা বলেই একেবারে মুখ ঘুরিয়ে বামাচারী ভৈরবের মত স্পর্ধিত ঘোষণা করেছিলেন :

স্থষ্টি মুলে আছে, কাম, সেই কাম দুর্জয় দুর্বার।
যুপবদ্ধ পশু আমি ? ভরিতেছি মৃত্যুর খর্পর
তপ্ত শোণিতের ধারে ?—না না সে যে মধুর উৎসার !

[মোহিতলাল মজুমদার]

স্বভাবতই এই তাৎক্ষনিক আনন্দ-মাদকের পরিণামের মতোই ক্লান্ত করেছিল তাদের ; 'গঙ্গা তীরে নিরানন্দ ন্নারীদল' দেখা কিংবা 'দুপুরে কাঁচা ডিম খেয়ে ঘুম' ও বৃদ্ধ বয়সে 'আরেকটি কিশোরী উপভোগের' বিকৃত বাসনাকে শাণিত ব্যঙ্গে টুকরো টুকরো করে দিলেও কোন সদর্থক প্রত্যয়ভূমি তাঁদের চোখ পড়ে নি। তাই সুভাষ যখন এসেই ঘোষণা করলেন :

প্রিয় ফুল খেলবার দিন নয় অন্ত
ধ্বংসের মুখোমুখি আমরা [যে দিনের কবিতা]

অথবা

আমাদের থাক মিলিত অগ্রগতি
একাকী চলতে চাই না এরোপ্লেনে ;
আপাতত চোখ থাক পৃথিবীর প্রতি
শেষে নেওয়া যাবে শেষকার পথ জেনে। [সকলের গান]

তখন এই নিশ্চিত বিশ্বাস; সকলকে সঙ্গে নিয়ে একটি লক্ষ্যের দিকে পা বাড়ানোর দুর্জয় সাহস স্বভাবতই সকলকে মুগ্ধ করেছিল। অসুস্থ, রুগ্ন, শ্বাসরুদ্ধ পটভূমিতে নির্মল বসন্ত বাতাসের মতো তাঁর আবির্ভাব তাই সকলকেই খুশি করে তুলেছিল ও এমন কি জীবন-দর্শনের আসমান-জমিন ফারাক সত্ত্বেও বুদ্ধদেব বসুকেও।

২

আজ থেকে তিরিশ বছরেরও কিছু বেশি দিন আগে সুভাষ মুখোপাধ্যায় কবিতা রচনা সুরু করেছেম। তাঁর প্রথম গ্রন্থ 'পদাতিক'-এর প্রকাশ কালই ১৯৪০। এই দীর্ঘ সময় সুভাষের রচনারীতি, তাঁর দৃষ্টিকোণ এবং অনুভব যেমন পালটেছে তেমনি আমাদের কাব্যরুচির বদলও কম হয় নি। এক সময়ে যে কবিতা সব সময় মুখে গুন্ গুন্ করত, আজ তা নেহাতই কথার কথা বলে মনে

হয়। এই পরিবর্তিত রুচি নিয়ে পদাতিকের কবিতাগুলি আজ যখন পড়ি, তখন অনেকটাই যেন বনফুলের সেই বিখ্যাত পাঠকের মতো অবস্থা হয়। আজ যেন আমাদের সমগ্র মনোযোগ কবিতার বহিরঙ্গ চটকেই আটকে থাকে। দেখি কেমন অনিবার্য মিল ছ'টি চরণকে মিলিয়ে দিচ্ছে, সতেজ প্রাণবান শব্দ সমষ্টি ঝলমল করছে কবিতার শরীরে কিন্তু সব মিলিয়ে যা পাই তাতে মন ভরে না। এগুলি পড়ে অনেকটাই যেন পদ্যপড়ার আনন্দ পাওয়া যায়। বোধহয় এই কারণেই কবিতা-প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে একজন কবি পদাতিকের কবিতাগুলিকে 'নেহাত উপরিতলের বস্তু' বলেছিলেন।

সমালোচকের এই দুঃসাহসী মন্তব্য তখন যে বিশেষ আলোড়ন তুলেছিল তার স্বাক্ষর তৎকালীন 'সীমান্ত' পত্রিকায় বিধৃত হয়ে আছে। এবং সমালোচককে এর জন্য জবাবদিহি করতে হয়েছিল। কিন্তু প্রশ্নটা কি? প্রশ্নটা কি এই নয় যে, কবিতার কাছে আমাদের প্রত্যাশা কি, আর পদাতিক-এর কবিতাগুলি সে-প্রত্যাশা কতটা পূরণ করে?

কোথায় যেন দেখেছিলাম, কবিতা হচ্ছে মানুষের সংগ্রামশীল অস্তিত্বের আবেগময় প্রকাশ। মানুষের এ-সংগ্রাম আত্মিক বা সামাজিক-রাজনৈতিকও হতে পারে। কিন্তু তার প্রকাশ এমন হবে যা আমার অর্থাৎ পাঠকের আবেগকে আলোড়িত করবে, প্রাচ্য আলংকারিকদের নির্দেশানুযায়ী সহৃদয় হৃদয়সংবাদী হবে। সঙ্গত কারণেই এই আবেগময় প্রকাশের বাহন হচ্ছে শব্দ। আমাদের প্রতিদিনের পরিচিত শব্দগুলি কবিব্যক্তিত্বের স্পর্শে এমন একটি অতিরিক্ত মাত্রা লাভ করে, যা তার নিজস্ব অর্থকে ছাড়িয়ে অন্য আরেকটি ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়। শব্দের এই জাদুকরী ক্ষমতার কথা জর্জ টমসন সাহেব আলোচনা করেছেন তাঁর 'মার্কসবাদ ও কাব্য' গ্রন্থে। পদাতিকের অধিকাংশ কবিতা শব্দের চাকচিক্যে আমাদের মন কেড়ে নেয়, কিন্তু অন্যকোনো ব্যঞ্জনা ও উপলব্ধির সীমানায় কি এরা পৌঁছে দেয় পাঠককে?

"তবে, যুদ্ধ আজ। / রাজন্যের অনুকম্পা নেই/প্রজাপুঞ্জের স্বপ্ন ভঙ্গ। / বণিক প্রভু চোখ রাঙায় / কারখানায় বন্ধ কাজ।

(ইতিহাস, আমাদের দিক নেয়।) / উদাসীন ঈশ্বর কেঁপে উঠবে নাকি / আমাদের পদাতিক পদক্ষেপে?"　　　[পদাতিক]

অথবা,

"তবে কি নাছোড়বান্দা ফাল্গুন, কমরেড? / বসন্ত বিজ্ঞপ্তি আঁটে ঘুর্ণিফল

গাছে ; / পর্দায় সর্দার হাওয়া কসরৎ দেখায়। / আকাশে অসংখ্য টর্চ, মেঘেরা ফেরার / গোল দীঘির গর্তে চাঁদ ধরা পড়ে গেছে। / বসন্ত সত্যিই আসবে ? কি দরকার এসে / বছর বছর দেখা দিয়েছে সে ক্যাম্বেলের ভীড়ে।" [আলাপ]
স্বভাবতই প্রশ্ন আসে উপরি উদ্ধৃত পংক্তিগুলিতে যা বলা হয়েছে তা কি কবির বিশ্বাসের রসে জারিত, না এগুলি তাঁর পূর্ব নির্ধারিত সিদ্ধান্ত, যা তিনি মনোহারী শব্দে ছন্দে বেঁধে পাঠকদের সামনে উপস্থিত করেছেন ? আমার মনে হয়েছে পদাতিকের যুগে সুভাষ বুদ্ধির দিক থেকে বিশ্বাসের জগতে এসে উপস্থিত হলেও, তখনও পর্যন্ত তিনি তাকে হৃদয় দিয়ে গ্রহণ করতে পারেননি। তাই এ-সময়ের কবিতায় তাঁর ভূমিকা মুখ্যত শিক্ষকের, যিনি অবোধ পাঠক সাধারণকে কর্তব্য-অকর্তব্য বিষয়ে কখনো নির্দেশ দিচ্ছেন, কখনো বা তাদের ব্যর্থতায় বিদ্রূপ করছেন। টমসন বলেছেন কবির কর্তব্য হচ্ছে, "to stimulate in his fellow men the desire for that which is realisable but as yet unrealised." পাঠকের মনে এই 'ডিজায়ার' জাগানো সম্ভব হয় তখনি, যখন কবির স্থান তার হৃদয়ের কাছাকাছি।

৩

কিন্তু পদাতিক কাব্যগ্রন্থের আপাত ব্যর্থতা সত্ত্বেও অন্য আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ সদর্থক দিক যে রয়েছে তা আলোচনার সুরুতেই উল্লেখ করা হয়েছে। সারদা-মঙ্গল কাব্যগ্রন্থের নানা অপূর্ণতা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ বিহারীলালকে 'ভোরের পাখি' অভিধায় অভিহিত করেছিলেন। তার কারণ ঐ কাব্যগ্রন্থটি একটি নতুন ধারার উৎসমুখ খুলে দিয়েছিল। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 'পদাতিক' কাব্যগ্রন্থটির ভূমিকাও বাঙলা কবিতার ক্ষেত্রে প্রায় অনুরূপ। তিরিশের কবিদের আত্ম-হননের রুদ্ধশ্বাস পটভূমিতে তিনি এক বিশ্বাসের বৈজয়ন্তী উড়িয়ে এসেছিলেন যার অনিবার্য প্রভাব চল্লিশের পরবর্তী কবিদের মধ্যে অবশ্যই লক্ষণীয়। বলা চলে সুভাষের আবির্ভাবই পরবর্তী কবিকুলকে প্রগতিশীল ও দক্ষিণপন্থী—এই দুই প্রতিদ্বন্দ্বী শিবিরে খাড়াখাড়িভাবে বিভক্ত করেছিল। এ-বিভাগের ফল বাঙলা কবিতার পক্ষে ভাল কি মন্দ হয়েছিল সে বিতর্কে না গিয়েও একথা অনায়াসে বলা চলে যে এর পর থেকে বাঙলা কবিতা এই দুটি ধারাতেই প্রবাহিত হয়ে এসেছে এবং পরবর্তী প্রায় সব কবির উপরেই কিছু না কিছু প্রভাব বিস্তার করেছে।

'পদাতিক' কাব্যগ্রন্থের যা মূল দুর্বলতা তার আক্রমণ থেকে কবি নিজেও রেহাই পাননি এবং তা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য তাঁকে প্রবলতর সামাজিক-রাজনৈতিক সংগ্রামের সঙ্গে সঙ্গে আত্মিক সংগ্রামেও লিপ্ত হতে হয়েছে। যে প্রত্যয়ের নিশান উড়িয়ে বাঙলা কবিতার ক্ষেত্রে তাঁর আবির্ভাব, তার ভিত যে সুদৃঢ় নয় তা প্রমাণ করে পরবর্তী ইতিহাস। পদাতিকের পরবর্তী গ্রন্থ 'অগ্নিকোণ'। দুই গ্রন্থের প্রকাশকালের ব্যবধান প্রায় দশ বছর। এই দশ বছর কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের অগ্নিশুদ্ধির কাল। পদাতিকে যাদের উপদেশ দিয়েছেন, ব্যঙ্গ করেছেন এই দীর্ঘ সময়ে তাদেরই কাছে তিনি আসতে চেষ্টা করেছেন, নিজের মনকে তাদের মনের দর্পণে প্রক্ষেপ করে নতুন করে নিজেকে চিনতে চেয়েছেন। এই প্রসঙ্গে স্বাধীনতা পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর অবিস্মরণীয় রিপোর্টাজগুলি স্মরণীয়।

'অগ্নিকোণ' আকারে ছোট কিন্তু সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের রূপান্তরের দলিল হিসেবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কবির ভাষণের গাঢ়তা এখানে সহজেই চোখে পড়ে—ছন্দ আর শব্দের কারিগরী এবং সুতীক্ষ্ণ ব্যঙ্গর শায়ক পরিত্যাগ করে নিরাভরণ আন্তরিকতায় কবি উচ্চারণ করেছেন ঃ

"একটি কবিতা লেখা হবে। তার জন্যে / আগুনের নীল শিখার মতন আকাশ / রাগে রী রী করে, সমুদ্রে ডানা ঝাড়ে / দুরন্ত ঝড়, মেঘের ধূম্র জটা / খুলে খুলে পড়ে,……"   [একটি কবিতার জন্য]

কিংবা,

"অন্ধকারে হাতে হাতে তাই গুঁজে দিই আমি / নিষিদ্ধ এক ইস্তাহার / জরাজীর্ণ ইমারতের ভিৎ ধ্বসিয়ে দিতে / ডাক দিই / যাতে উদ্বেলিত মিছিলে একটি মুখ দেহ পায় / আর সমস্ত পৃথিবীর শৃঙ্খল-মুক্ত ভালবাসা / দুটি হৃদয়ের সেতুপথে / পারাপার করতে পারে।"   [মিছিলের মুখ]

সচেতন পাঠক সহজেই লক্ষ্য করবেন, 'অগ্নিকোণে'ই সুভাষ 'দুটি হৃদয়ের সেতুপথে পৃথিবীর শৃঙ্খল-মুক্ত ভালবাসা' পারাপার করাবার প্রয়োজনীয়তার কথা বলছেন। কবিহৃদয়ের রূপান্তর যে ঘটে গিয়েছে তা স্পষ্ট। তিনি আর জনতার থেকে পৃথক হয়ে ফতোয়া দিচ্ছেন না, আত্মকেন্দ্রিকতার খোলস ছিঁড়ে বেরিয়ে এসেছেন এমন একজন কবি যিনি আমাদেরই মতো প্রতিদিনকার জীবন-সংগ্রামে লিপ্ত। রুশ-বিপ্লব কবি মায়াকভস্কির জীবনে যে-রূপান্তর ঘটিয়েছিল, সুভাষের এ-রূপান্তরও প্রায় তারই সমগোত্রীয়। কেননা, পরে

আমরা দেখব লক্ষ্যাভিমুখে চলতে চলতে এই দুই কবির বাসনাই এসে মিলিত হয়েছে একই বিন্দুতে।

৪

'অগ্নিকোণে'র পরবর্তী গ্রন্থ 'চিরকুট'। প্রকাশকালের ব্যবধান প্রায় দু'বছর। প্রকাশের সময় 'অগ্নিকোণে'র সব কবিতাই 'চিরকুট' গ্রন্থে গৃহীত হয়েছিল। 'চিরকুটে'ই প্রথম স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ে যে সুভাষ মুখোপাধ্যায় এক নতুন দিকে পা বাড়াচ্ছেন, একটা নতুন রূপান্তরের দ্বারপ্রান্তে এসে পৌঁছেছেন।

ব্যাপারটা একটু খুলে বলা দরকার। পূর্বেই উল্লেখ করেছি 'পদাতিক' থেকে 'অগ্নিকোণে'র ব্যবধান প্রায় দশ বছর এবং এই দশ বছর সুভাষের কবি জীবনের পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সময়। এ-সময় তিনি গ্রামে গ্রামে ঘুরেছেন, শ্রমিক মহল্লায় গিয়েছেন, তাদের আন্দোলনের সঙ্গে, তাদের জীবন যাত্রার সঙ্গে নিবিড়ভাবে পরিচিত হয়েছেন। এই পরিচয় একদিকে যেমন বদলে দিয়েছে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি অন্যদিকে তেমনি রূপান্তর ঘটিয়েছে তাঁর ভাষারীতি ও প্রকাশভঙ্গির। 'চিরকুটে'ই প্রথম দেখতে পাই আমাদের দৈনন্দিন ব্যবহারের ঘরোয়া শব্দগুলি, গ্রাম্য ইডিয়ম ইত্যাদি আসতে সুরু করেছে কাব্যের আসরে। বলা হয়ে থাকে বিষয় ও বিষয়ীর অন্তরঙ্গতার নিরিখ নাকি শব্দ। তা যদি হয় তবে একথাও মানতে হবে যে সুভাষ এই গ্রন্থেই প্রথম দেশের মানুষ ও তার জলমাটির সঙ্গে অন্তরঙ্গ হওয়ার দিকে অগ্রসর হয়েছেন। অপ্রাসঙ্গিক হলেও স্বতঃই মনে পড়ে যে এমনতর ঘটনা মায়াকভ্স্কির জীবনেও ঘটেছিল। এই প্রধান রুশ কবিও প্রথম জীবনে ছিলেন অতিমাত্রায় আত্মকেন্দ্রিক। রুশ বিপ্লবের প্রচণ্ড অভিঘাত তাঁকেও একাত্ম করে দিয়েছিল জনগণের সঙ্গে। তারপর থেকে মায়াকভ্স্কির কবিতার প্রকাশভঙ্গি, তাঁর শব্দ ব্যবহার সবই আমূল পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছিল। জনগণের মুখের ভাষাকে তিনি দিয়েছিলেন কাব্যের মর্যাদা। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের ক্ষেত্রেও সীমাবদ্ধ ভাবে এমনটিই ঘটেছে বলে আমার ধারণা। চল্লিশের দশকের অস্থির সামাজিক-রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে বাঙলাদেশের গ্রাম-গ্রামান্তরে ব্যাপক পরিভ্রমণ, সেখানকার মানুষের বিচিত্র জীবনযাত্রা তাঁকে এক নতুন জগতের সন্ধান দিয়েছে। নতুন উপলব্ধিতে তিনি উদ্দীপিত হয়ে উঠেছেন। আর সঙ্গত কারণেই তাদের মুখের কথা, তাদের সংস্কার সবই অঙ্গীভূত হয়েছে কবিতায়ঃ

"মাঠে ঘাটে কপাল ফাটে / দৃষ্টি চলে যতদূর, / খাল শুকনো, বিল শুকনো / চোখের জলে সমুদ্দুর।" [চিরকুট]

এ-ব্যাপারে কবি নিজেও সচেতন। তাই সাহিত্যিক সাধনার অভীষ্ট হিসেবে তিনি এই চিরকুটে এসেই বললেন :

"আমরা দেব বোবাকে ধ্বনি / খোঁড়াকে দ্রুত ছন্দ / লক্ষ বুকে রয়েছে খনি কুঁড়ি ঢাকা গন্ধ। / আমরা নই প্রলয় ঝড়ে অন্ধ।" [কাব্য জিজ্ঞাসা]

চিরকুট কাব্যগ্রন্থে সর্বত্র সার্থক না হলেও পরবর্তী গ্রন্থগুলিতে তাঁর লক্ষ্য যে লক্ষ বুকের খনি থেকে সম্পদ আহরণ করা, তা এখানেই যথেষ্ট স্পষ্ট।

৫

'চিরকুটে'র পরেই সুভাষ অনুবাদ করেন তুরস্কের কবি নাজিম হিকমতের কবিতা। মনোধর্মে হিকমত ও সুভাষের নৈকট্য সুবিদিত। হিকমতের কবিতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তাঁর বলার বিশেষ ঢঙটি। মনে হয় কবি যেন তাঁর পাঠকের একান্ত কাছাকাছি বসে অন্তরঙ্গভাবে আলাপ করছেন। এই বিশেষ ঢঙটি সুভাষকে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিল বলে মনে হয়। এর আরেকটি দিকও তাঁর চোখে অবশ্যই ধরা পড়ে থাকবে। যে-মানুষগুলিকে তিনি দেখেছেন, যাদের দুঃখের দিনে তিনি তাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন, শুনেছেন তাদের আনন্দ-বেদনার কথা, তাদের কবিতার বিষয় করতে গেলে, তাদেরই কাছে গিয়ে বসতে হবে। এ দিক থেকে মায়াকভ্স্কির দৃষ্টান্তই আবার মনে পড়ে। মায়াকভ্স্কিকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, দৈনন্দিন জীবনের আটপৌরে শব্দগুলি তিনি কবিতায় ব্যবহার করেন কেন। একটুও না ভেবে উত্তর দিয়েছিলেন কবি, কেননা এগুলি সাধারণ মানুষ ব্যবহার করে থাকেন। সুভাষকে প্রশ্ন করলেও সম্ভবত এই একই উত্তর পাওয়া যাবে। হিকমতের নিচু গলার আলাপচারী গদ্য আর তার সঙ্গে আমাদের ঘরোয়া শব্দগুলি কি অপূর্ব কাব্যভাষা হয়ে উঠতে পারে 'চিরকুটে'র পরবর্তী গ্রন্থগুলি তার প্রমাণ।

"জেলা আপিস রিক্ত হস্ত / কলকাতা থেকে খালি হাতে ফিরে / দাওয়ার উপর মুখ থুবড়ে পড়ে আছে / রেশনের ভাঁজ করা থলি। / এ মাসের শেষাশেষি ; / ও মাসের শেষ কিস্তিও মেলে নি।" [একটি লড়াকু সংসার]

এমনি চলতি, মৌখিক শব্দকে ব্যবহারের একটা সুবিধে এই যে, এই শব্দ গুলি যেকোনো আবেগের বাহন অতি সহজেই হতে পারে। 'চিরকুট'-পরবর্তী

গ্রন্থাবলীতে আরো একটি ব্যাপার সহজেই চোখে পড়বে যে, সুভাষ উত্তরোত্তর গদ্যভাঙ্গর দিকেই ঝুঁকে পড়েছেন। যে ছান্দসিক সিদ্ধির জন্য একদা তিনি বিখ্যাত ছিলেন, সেই ফুলের মালা হেলায় পরিত্যাগ করে তিনি যেন এসে দাঁড়াতে চান সেই জীবনের মাঝখানে যেখানে আমাদের প্রথাগত কবিতা প্রবেশ করতে ব্যর্থ হয়েছে। আর এরপর যদি কোথাও ছন্দ ব্যবহারও করে থাকেন তবে তার চালও লৌকিক :

"ভাই আমাকে বকুক ঝকুক / দিক গে যতই খোঁটা / যমের দুয়োরে কাঁটা দিচ্ছি / ভাই-এর কপালে ফোঁটা।" [ফোঁটা]

অথবা

"নেমে গেল এক্ষুণি / ট্রেন খালি করে ভোরের শেফালি / নেমে গেল এক্ষুনি।" [কাছে দূরে]

ফুল ফুটুক, যতদূরেই যাই থেকে কাল মধুমাস কিংবা তারপরের কবিতা-বলীতেও সুভাষ ক্রমশই দৈনন্দিন আলাপচারিতার কাছাকাছি চলে আসছেন। উনবিংশ শতকের শেষপাদে কবিতার বন্ধন-মুক্তির যে ঐতিহাসিক চেষ্টার সুরু, রবীন্দ্রনাথ থেকে সমর সেন প্রভৃতির হাতে যার প্রতিষ্ঠা, আজ সুভাষের হাতে তারই এক নতুন বিকাশ কিনা কে বলতে পারে? সুভাষ নিজে অবশ্য বলেছেন :

"আমি চাই কথাগুলোকে / পায়ের ওপর দাঁড় করাতে। / আমি চাই যেন চোখ ফোটে / প্রত্যেকটি ছায়ার। / স্থির ছবিকে আমি চাই হাঁটাতে। আমাকে কেউ কবি বলুক / আমি চাই না। কাঁধে কাঁধ লাগিয়ে / জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত / যেন আমি হেঁটে যাই। আমি যেন আমার কলমটা / ট্র্যাক্টরের পাশে / নামিয়ে রেখে বলতে পারি / এই আমার ছুটি / ভাই, আমাকে একটু আগুন দাও।" [আমার কাজ]

উদ্ধৃতিটি দীর্ঘ, কিন্তু সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের শিল্পচিন্তা স্পষ্ট করার পক্ষে অপরিহার্য। আর এও আরেক আশ্চর্য যে, ভিন্ন পরিস্থিতিতে সেই রুশ কবি মায়াকভ্স্কিও এইভাবেই কামনা করেছিলেন, যেন সোভিয়েতের উৎপাদন ব্যবস্থার সঙ্গে তাঁর কবিতা মিলে যায়। দুজনের এ মিল কি নিতান্তই আকস্মিক?

অন্ধকার থেকে আলোয়

সম্প্রতি বিশ্বে নয়া-ঔপনিবেশিক শক্তিগুলি চূড়ান্ত পরাজয়ের সম্মুখীন হয়ে শেষ কামড় দেবার জন্য শক্তি অর্জনের প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। তাদের চাপ বাড়ছে। সঙ্গে তার দোসর হয়েছে অতিবাম সঙ্কীর্ণতাবাদের বিচ্যুতিতে নিমজ্জিত স্বার্থপর সুযোগসন্ধানীরা। আমরা উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করছি—জাতীয় স্বাধীনতা, প্রগতি, শান্তি ও গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণ এখন নানা কূট-চক্রান্তের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ রূপ নিচ্ছে। সদ্য স্বাধীন বা স্বাধীনতা-সংগ্রামে রত দেশ-গুলিতে তারা কেবল কমিউনিস্টদের উপরেই আক্রমণ কেন্দ্রীভূত করছে না, স্বাধীনতা, স্বনির্ভর অর্থনীতি ও গণতান্ত্রিক মুক্ত মানবিক সংস্কৃতির পক্ষাবলম্বী প্রতিটি মানুষের বিরুদ্ধেই তাদের অস্ত্র উদ্যত। আর এই আক্রমণের কাজে পাক-শাসকচক্রের পশ্চাদপদ মানসিকতা ও তাদের অস্ত্রধর রক্ষীদের হাতের পুতুল ও তুরুপের তাস হিসাবে ব্যবহার করছে। বাঙলাদেশের উপরে চলেছে এই পাপচক্রের প্রত্যক্ষ আক্রমণ, বাঙলাদেশের মানুষের অবিসংবাদিত নেতা বাঙলাদেশের রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবর রহমানকে তারা বিচারের প্রহসনের নামে হত্যার চক্রান্ত করেছে। হুমকি দিচ্ছে ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধের।

সম্প্রতি আফ্রিকা মহাদেশের সুদানেও দেখছি সাম্রাজ্যবাদ এবং ঔপনিবেশি-কতার শক্তিগুলি আস্তিনের তলা থেকে শানিত ছুরিকা বের করেছে। হত্যা করছে তারা সে-দেশের শ্রেষ্ঠ দেশপ্রাণ সংগ্রামীদের। সুদানের কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক আবদেল খালেক মাহগুবকে তারা হত্যা করেছে, সুদানের স্বনির্ভর বিকাশকে বাঁধা দিয়েছে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের কাছে। সদ্য স্বাধীন সুদান ও স্বাধীনতা সংগ্রামে লিপ্ত বাঙলাদেশের উপরে নয়া ঔপনিবেশিক শক্তির এই আক্রমণে আমরা উদ্বিগ্ন ও প্রতিবাদমুখর হয়েছি। সুদান ও বাঙলা-দেশের উপরে যে কায়দায় আক্রমণ চালানো হচ্ছে তারই পরিবর্তিত রূপ হিসেবে পাকিস্তানের 'ট্রোজান হর্স'-এর সাহায্য নিয়ে ভারতের স্বনির্ভর অর্থনীতি গড়বার আকাঙ্ক্ষা ও জাতীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামকে দুর্বল ও চূর্ণ করার জন্য মার্কিন চক্রীরা ব্রতী হয়েছে। আমরা বিস্ময় ও ক্ষোভের সঙ্গে লক্ষ্য করছি, সুদানে ব্যাপক কমিউনিস্ট নিধন ও বাঙলাদেশে ব্যাপক গণহত্যার কাজে হন্তারকদের আশীর্বাদ জানিয়েছে বিপ্লবের নামে অতিচীৎকৃত চীন সরকার। পৃথিবীর মানুষকে যে মন্ত্র নবজীবনের দীক্ষা দিয়ে শতাধিক বৎসর মানব-

সভ্যতাকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে, সেই মহান নামকে ব্যবহার করে বিকৃত মস্তিষ্ক রণলিপ্সু সাম্রাজ্যবাদের ক্রীড়ণক শক্তিগুলিকে তারা আজ অস্ত্র, সামর্থ্য ও মন্ত্রণা দান করতেও ইতস্তত করছে না। আমরা এই নব্য বোনাপার্টিবাদ-এর প্রবক্তাদের বিভেদমূলক ও সাম্রাজ্যবাদের সহযোগী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে তীব্র বিতৃষ্ণা প্রকাশ করছি।

আর এই পরিপ্রেক্ষিতে সোভিয়েত ইউনিয়ন আবার তার মহান ভূমিকা প্রদর্শন করলেন। ভারত-সোভিয়েত মৈত্রী চুক্তির মধ্য দিয়ে তাঁরা যেমন ভারতের মানুষের স্বনির্ভর অর্থনীতি গঠনের আকাঙ্ক্ষাকে যথোপযুক্ত মর্যাদা দিলেন, তেমনি প্রমাণ করলেন বিশ্বমুক্তির সংগ্রামে সোভিয়েতই অবিসংবাদিত নেতা, বিশ্বাসী সাথী ও ভারতবাসীর বিশ্বস্ত বন্ধু। বাঙলাদেশের মানুষ এই চুক্তির বলে বলীয়ান হয়েছে, ভারতবাসীর মনে সাহস বেড়েছে, কেবল তাই নয় বিশ্বের রাজনৈতিক শক্তিসমাবেশের গুণগত পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। কেবলমাত্র ভারত উপমহাদেশের শান্তি নয়, এই চুক্তি বিকৃত-সংস্কৃতির আক্রমণের বিরুদ্ধে নতুন মানবিক সংস্কৃতি গড়ে তোলারও সামর্থ্য দান করবে। সুদানের প্রগতিশীল সংগ্রামীদের উপর আক্রমণের বিরুদ্ধে সোভিয়েত যেমন গর্জন করে উঠেছেন, তেমনি মুজিবর রহমানের প্রাণরক্ষা ও মুক্তির সংগ্রামে তাঁরা বিশ্ব-বিবেকের শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধির ভূমিকাও পালন করেছেন। সাম্রাজ্যবাদ ও অতিবাম বিচ্যুতির বিরুদ্ধে লেনিনবাদ শান্তি, স্বাধীনতা ও সমাজতন্ত্রের মানবিক সাধনাকে চরিতার্থ করার জন্য নেতৃত্ব দিচ্ছে। সোভিয়েতের জয় হোক। জয় হোক মানবতার। আমরা তাই ঘোষণা করছি ঃ

শেখ মুজিবর রহমানের নিঃশর্ত মুক্তি চাই।
সুদানে গণহত্যা বন্ধ হোক, নুমেরির শাস্তি চাই।
বাঙলাদেশকে অবিলম্বে স্বীকৃতি দেওয়া হোক।
জয় হোক ভারত-সোভিয়েত মৈত্রীর।

ইকবাল ইমাম

বাঙলার মঞ্চজগতের প্রখ্যাত প্রয়োগবিদ্ ও বিশিষ্ট চলচ্চিত্রকার

সতু সেন-স্মরণে

জননায়ক

হেমন্তকুমার বসু

এ-নির্বাচনে রণধ্বনি

এক। লোকসভার সার্বভৌমত্বের ক্ষমতায় জোর দিয়ে সংবিধানে মৌলিক প্রগতিশীল পরিবর্তন ;

দুই। মৌলিক কৃষি-সংস্কার এবং চাষীর ফসলের ন্যায্য দাম ;

তিন। শক্তহাতে একচেটিয়া বিরোধী কাজ এবং ব্যাঙ্ক জাতীয়-করণের অনুবর্তী কাজ হিসাবে মূল্যবৃদ্ধি ও বেকারীর নিরাকরণ ;

চার। শ্রমিকশ্রেণীর দাবি মেটানো এবং ট্রেড ইউনিয়ন অধিকারের বিস্তৃতি ;

পাঁচ। সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম এবং ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক শক্তিগুলিকে শক্তিশালীকরণ এবং পশ্চাদপদ ও সংখ্যালঘু অংশের গণতান্ত্রিক অধিকার সুরক্ষণ ;

ছয়। সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ও ঔপনিবেশিকতাবিরোধী গোষ্ঠী-নিরপেক্ষতার বলিষ্ঠ বৈদেশিক নীতি ; নয়া ঔপনিবেশিক আক্রমণের বিরুদ্ধে ভারতের জাতীয় স্বার্থরক্ষা।

পঃ বঃ (তথ্য ও জনসংযোগ) বি ৩৭৮২...190

ল্যানোলিন ও ময়েশ্চারাইজার মেশানো
নতুন তুহিনা বিউটি মিল্ক
Tuhina
আরো ভালোভাবে
মুখ ও
গা-হাত-পা ফাটা
বন্ধ করে...
সারা শরীরে
এনে দেয়
স্নিগ্ধ কমনীয়তা!
ক্যালকাটা
কেমিক্যাল-এর তৈরী

Sulekha®
drawing ink
SULEKHA WORKS LTD. CALCUTTA
AVAILABLE IN
EIGHT
DIFFERENT
COLOURS.
SULEKHA
WORKS
LTD.
SULEKHA PARK.
CALCUTTA - 32
ardeeyar

পরিচয়
বর্ষ ৪০ । সংখ্যা ৬
পৌষ । ১৩৭৭

সূচিপত্র

সম্পাদক
দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় । তরুণ সান্যাল
প্রচ্ছদ
দেবব্রত মুখোপাধ্যায়

পরিচয় প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে অচিন্ত্য সেনগুপ্ত কর্তৃক নাথ ব্রাদার্স' প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ৬ চালতাবাগান লেন, কলিকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত ও ৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড কলিকাতা-৭ থেকে প্রকাশিত।

পরিচয়
বর্ষ ৪০ । সংখ্যা ৬
পৌষ । ১৩৭৭

ঐতিহাসিক বস্তুবাদ ও সৃজনাত্মক শিল্পকলা

সরোজকুমার ভৌমিক

বহু নন্দনতাত্ত্বিক পণ্ডিত শিল্পসাহিত্যমূলক সৃষ্টিধর্মী কাজের জন্য কেবলমাত্র স্রষ্টার প্রতিভাকেই দায়ী করেন। পক্ষান্তরে মার্কসবাদী শিল্প-সাহিত্য সমালোচকেরা বলে থাকেন শিল্প-সাহিত্য ও চারুকলা ইত্যাদি সৃষ্টির পেছনে রয়েছে উৎপাদনব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক ক্রমবিকাশ। একাধিক তার্কিক প্রতিবাদে বলেন, শিল্প-সাহিত্য-চারুকলা সৃষ্টির পেছনে উৎপাদনাত্মক অর্থনীতির কোনোরূপ সম্পর্ক নেই, শিল্পসৃষ্টির পেছনে অর্থনীতিবাদ সম্পূর্ণ বাজে কথা। তাঁরা মনে করেন, শিল্প-সাহিত্য-চারুকলা বা কোনও বিশেষ প্রতিভা সম্পূর্ণভাবেই প্রকৃতিদত্ত শক্তির প্রকাশ স্বয়ম্ভু নিরালম্ব আকাশে ফোটা ফুলের মতো। কিন্তু আমরা জানি আকাশে ফুল ফোটে না। তেমনি আকাশ বা শূন্য থেকে শিল্প-সাহিত্য, ধ্যান-ধারণা ও চিন্তন-মননের জন্ম হয় না। শিল্প-সাহিত্য চেতনা, ধ্যান-ধারণা, চিন্তন ও মনন মানুষের মস্তিষ্কপ্রসূত। আর সেগুলির উৎস মানুষের সমাজ-জীবন ও প্রকৃতিলোক। কোনো একটি স্তম্ভ যেমন শূন্যে অবস্থান করতে পারে না, তার অবস্থানের জন্যে প্রয়োজনীয় ভিত্তি একান্তই অপরিহার্য; তেমনি শিল্প-সাহিত্য চেতনা, ধ্যান-ধারণা, চিন্তন ও মনন প্রয়োজনীয় ভিত্তিসাপেক্ষ। সেই অপরিহার্য ভিত্তি হলো শ্রমশীল মানুষের মূর্ত সমাজ-জীবন। মানুষের শিল্প-সাহিত্য প্রতিভা, ধ্যান-ধারণা, চিন্তন ও মননকে এইভাবে বোঝবার চেষ্টাকে বলা হয়েছে ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যা। নানাজনে নানাভাবে ইতিহাসের এই বস্তুবাদী ব্যাখ্যাকে ভ্রান্ত প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেছেন।

বিপক্ষ তার্কিকদের কথা হলো—প্রতিভা, শিল্প-সাহিত্য চেতনা, শিল্প-

সাহিত্য, ধ্যান-ধারণা, চিন্তন ও মনন উৎপাদনাত্মক অর্থনৈতিক প্রভাব নিরপেক্ষ; দৃষ্টান্ত, শেক্স্পিয়ার বা রবীন্দ্রনাথের মতো প্রতিভার আবির্ভাব আজকাল আর হচ্ছে না। কারণ শিল্প-সাহিত্য-প্রতিভা, ধ্যান-ধারণা, চিন্তন ও মননের জন্ম সম্পূর্ণভাবেই মানুষের মগজের গঠনে। কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞান অনুযায়ী বিগত তিন-চার হাজার বছরের মধ্যে মানুষের মগজের মাপ বা গড়নে কোনো দিক থেকেই মানুষের স্নায়ুতন্ত্রের উল্লেখযোগ্য কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। তথাপি মানুষের চিন্তন-মনন, ধ্যান-ধারণায় দুস্তর পার্থক্য লক্ষ্য করা গেছে। কেন এমন হলো? উত্তরে বলা যায়—যদিও মানুষের চিন্তা-চেতনা চিন্তন-মনন ধ্যান-ধারণা তার স্নায়ুতন্ত্রের উপর নির্ভরশীল, তথাপি এই স্নায়ুতন্ত্রের উপরই সামাজিক পারিপার্শ্বিকের অবিশ্রান্ত ঘাত-প্রতিঘাত চলছে। তার কথা বাদ দিয়ে স্নায়ুতন্ত্রের স্বরূপটাই অনুধাবন করা সম্ভব নয়। এই মতের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি সম্পর্কে যাঁরা সন্দেহ পোষণ করেন, তাঁদের কাছে অনুরোধ তাঁরা যেন পাভলভের রচনাবলী পড়ে দেখেন।

বিষয়টির সম্যক আলোচনার জন্য মানব সমাজের বিকাশের কাহিনীটি সংক্ষেপে আলোচনা করা আবশ্যক। মানব সমাজের বিকাশের ধারাকে তিনটি পর্বে ভাগ করা যায়ঃ প্রথম পর্ব—আদিম প্রাক-বিভক্ত সমাজ, দ্বিতীয় পর্ব—বর্তমান শ্রেণী-বিভক্ত সমাজ, তৃতীয় পর্ব—আগামী কালের শ্রেণীহীন সমাজ। প্রাক-বিভক্ত সমাজে, অর্থাৎ যাকে আমরা বলি আদিম সমাজ, কোনো ব্যক্তিগত সম্পত্তির অস্তিত্ব ছিল না, ছিল না কোনোরূপ রাষ্ট্রব্যবস্থা। শোষক-শোষিত, শাসক-শাসিত বলে সেখানে কিছু ছিল না। সকলেই স্বাধীন ও সমান। হয়তো অনেকেই প্রশ্ন তুলবেন—এরকম সমাজ যে ছিল, এ যে একেবারে কল্পনাপ্রসূত নয়, তার সত্যতার প্রমাণ কোথায়? তার উত্তরে বলা যায়, দ্বন্দ্ব-সমন্বয়ের পদ্ধতির মধ্যে প্রবেশ না করেও, একেবারে জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত হিসাবে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে এরকম সমাজ শ্রেণীবিভক্ত সমাজের সভ্যতার আওতার বাইরে এখনও বিরাজ করছে। লুইস হেনরি মর্গান জীবনের অধিকাংশ সময়ই এ-ধরনের সমাজে গবেষণার কাজে অতিবাহিত করে বিচিত্র বৈজ্ঞানিক তথ্য ও অভিজ্ঞতা আহরণ করেছেন। শুধু জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ই নয়, তিনি প্রমাণ করেছেন যে পৃথিবীর সমগ্র মানুষ—যেখানেই তারা থাকুক এবং সভ্যতার যত উচ্চস্তরেই আরোহণ করে থাকুক না কেন—কোনো সুদূর অতীতে এইরূপ সমাজেই তারা একদা সবাই বাস করেছিল।

এই প্রাক-বিভক্ত সমাজ অর্থাৎ প্রাচীন আদিম সমাজ সাম্যের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। কিন্তু কেন? কারণ সমাজ বিবর্তনের ঐ পর্যায়ে সামাজিক মানুষের উৎপাদন-শক্তি অত্যন্ত অনুন্নত অবস্থায় ছিল, ফলে সকলে সমবেতভাবে প্রাণপাত পরিশ্রম করে গোষ্ঠীর অন্তর্গত সকল মানুষের জন্য কোনোক্রমে নেহাৎ প্রাণধারণের পক্ষে একান্ত অপরিহার্য উৎপাদনগুলি প্রকৃতির ভাণ্ডার থেকে আহরণ করতে পারত। পরবর্তীকালের অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে উৎপাদনের যন্ত্র যদি উন্নত হয় তবে মানুষের পক্ষে অল্প সময়ে অধিক পরিমাণ দ্রব্য-সামগ্রী উৎপাদন করা সম্ভব। আর যদি উৎপাদনের যন্ত্র অনুন্নত বা স্থূল হয় প্রত্যেক ব্যক্তি প্রাণপণ পরিশ্রম করে যে পরিমাণ দ্রব্য-সামগ্রী উৎপন্ন করতে সক্ষম হয় তার সাহায্যে অতি কায়ক্লেশে কেবলমাত্র নিজের জীবন বাঁচানো সম্ভব। প্রাক-বিভক্ত সমাজের এই অবস্থায় মানুষের শ্রম প্রয়োজনের অতিরিক্ত উদ্বৃত্ত উপাদান উৎপাদনে সক্ষম হয়নি। ফলে ঐ সমাজে অপরের দ্বারা উৎপাদিত উদ্বৃত্তের উপর নির্ভর করে পরান্নজীবী বা উদ্বৃত্তিজীবী পরগাছা কোনো শ্রেণীর উদ্ভব সম্ভব হয়নি। মানুষে মানুষে সম্পর্কে অসাম্য ছিল না। আবার পক্ষান্তরে এই আদিম সাম্য সমাজে কোনো মানুষের পক্ষেই এককভাবে বেঁচে থাকার চেষ্টাও আদৌ সম্ভব ছিল না। বৈজ্ঞানিক জেমস জিনস্-এর গবেষণা থেকে আমরা অবগত হই যে প্রকৃতি জীবনের প্রতি বিরূপ ("nature is hostile to life")। জীবনে প্রতি মুহূর্তে প্রতি পদক্ষেপে নানা বিপর্যয় ও বহুবিধ বিঘ্ন অপেক্ষমান। উৎপাদনে অপটু এবং আত্মরক্ষার সম্বল-হীন দুর্বল মানুষের একমাত্র অবলম্বন হলো সংখ্যা। সুতরাং সমাজ-বিকাশের ঐ পর্যায়ে মনুষ্য-চেতনার ঝোঁকটা ব্যক্তিমানুষ বা ব্যষ্টির উপরে নয় বরং সমষ্টির উপরে ছিল। সমবেত মানুষের যৌথ প্রচেষ্টায়ই এ-অবস্থায় বেঁচে থাকা সম্ভব। সেই কারণেই উৎপাদনাত্মক শ্রমে অংশ গ্রহণ ও শ্রমজনিত উৎপাদন বণ্টনেও সমতা প্রয়োজন। কিন্তু প্রকৃতির প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে মানুষের অবিরাম সংগ্রামের ফলে উৎপাদনের যন্ত্র অনুন্নত ও স্থূল অবস্থা থেকে ক্রমশই উন্নত হতে থাকল। প্রকৃতি ও মানুষের এই দ্বান্দ্বিক সম্পর্কের ফলে উৎপাদন যন্ত্রের এই ক্রমোন্নতি এমন একটা পর্যায়ে উপনীত হলো যে মানুষ বেঁচে থাকার পক্ষে অপরিহার্য ন্যূনতম উপকরণের অতিরিক্তও কিছু উপকরণ উৎপাদনে সক্ষম হলো। উৎপাদনের এই অবস্থায় পৌঁছে মানুষ শ্রমবিভাগের প্রয়োজনীয়তার কথা উপলব্ধি করে। এলো শ্রম-বিভাগ। বেঁচে থাকার প্রয়োজনে অপরিহার্য খাদ্যোৎপাদনের জন্যে প্রত্যক্ষ দায়িত্ব আর সকল

মানুষকে বহন করতে হলো না। এই অবস্থায় পৌঁছে মানুষ উপলব্ধি করল খাদ্যবস্তু ছাড়াও বেঁচে থাকার পক্ষে প্রয়োজনীয় অন্যান্য উপাদানের আবশ্যকতা; এলো বিভিন্ন কারিগরি শিল্পের উৎপাদনের তাগিদ। দেখা দিল ক্রমে ক্রমে সমস্ত উৎপাদনব্যবস্থাকে যথাযথ পরিচালনার জন্য সাংগঠনিক প্রয়োজনীয়তা। শ্রম ও উৎপাদনব্যবস্থায় ক্রমোন্নতির এই পর্যায়ে উৎপাদন-প্রক্রিয়া ও শ্রম-বিভাগে এলো মৌলিক গুণগত পরিবর্তন। উৎপাদনের যন্ত্র, প্রক্রিয়া ও উৎপাদনব্যবস্থার উন্নততর পর্যায়ে উত্তরণ ও পূর্বোক্ত মৌলিক গুণগত পরিবর্তনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত রয়েছে মানুষের ভাষা, সঙ্গীত ও নৃত্য-কলার বিকাশ।

জন্তু-জানোয়ার একান্তভাবেই জন্তু-জানোয়ার। তারা তাদের জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ উৎপাদনে সক্ষম নয়, কারণ তারা উৎপাদনের যন্ত্র তৈরি করতে পারে না। প্রাকৃতিক উপকরণকে শ্রম-যন্ত্র ও শ্রমের সাহায্যে মানুষের ব্যবহার্য সামগ্রীতে রূপান্তরণকে আমরা উৎপাদন বলব। এ-উৎপাদনে কায়িক শ্রম ও মানসিক শ্রম উভয়ই প্রয়োজন। সামাজিকভাবে বিমূর্ত বা abstract শ্রম ঐ সামগ্রী উৎপাদনে কংক্রিট রূপ ধারণ করে। পৃথিবীতে একমাত্র মানুষই উৎপাদনের নিমিত্ত শ্রম-যন্ত্র তৈরি করতে পারে এবং জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ সেই যন্ত্রের সাহায্যে উৎপাদন করতে পারে। এই উৎপাদন শ্রমসাধ্য। শ্রমশীল এই মানুষের সত্তা আরিস্টটলের মত অনুসারে "man is social animal" আজ আর গ্রহণযোগ্য নয়। মার্কসের ভাষায় সহজাত ও অর্জিত বহুবিধ গুণাবলী সমন্বিত মানুষ হলো সামাজিক মনুষ্যসত্তা—'social being'। তাঁর মতে সচেতন সামাজিক মানুষের ভিত্তি তার জীবনবিকাশের কর্মধারায়, যা মানুষ নিজে উৎপন্ন করে এবং যেভাবে উৎপন্ন করে তা-ই নির্ধারণ করে তার স্বরূপ। প্রথম দিকে কোনো মানুষের পক্ষেই একক ও বিচ্ছিন্নভাবে উৎপাদন ক্রিয়া সম্পন্ন করা আদৌ সম্ভব হয়নি। একই কাজ সকলের সমবেত প্রচেষ্টায় সম্পন্ন হয়েছে। সমবেতভাবে শ্রমদানের মাধ্যমেই প্রত্যেক মানুষকেই চিন্তার বিনিময় করতে হয়েছে। এই চিন্তা ও ভাব বিনিময়ের তাগিদেই মানুষের কণ্ঠস্বরের সঙ্গে সংযোজিত হয়েছে অর্থ এবং এই অর্থেরই বাহন হিসেবে ভাষার সৃষ্টি করেছে মানুষ। তাই উৎপাদনাত্মক কাজের সঙ্গে প্রথম থেকেই ভাষার সম্পর্ক অঙ্গাঙ্গী। অধ্যাপক টমসন বলেছেন—গ্রে, স্মাইথ, রস্ট্রে. ও বুশের প্রভৃতি

বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করেছেন, উৎপাদন যন্ত্র ব্যবহারের ফলে মানুষের পেশীগুলিতে যে-চাপ পড়ে তারই প্রতিবর্তী ক্রিয়া হিসেবে স্বরযন্ত্রের প্রতিক্রিয়াটি থেকেই মানুষের কণ্ঠে ভাষার স্ফূরণ হয়েছিল।

অর্থনৈতিক উৎপাদনাত্মক শ্রমের সঙ্গে ভাষার মতো সঙ্গীতের যোগসূত্রটিও শ্রম-সঙ্গীতের মধ্যে ধরা পড়ে। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে আমার ছোটবেলার কথা। পূর্ববঙ্গের মাঠে মাঠে বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে পাটক্ষেত ও আউস ধানের ক্ষেতে কৃষকদের ঘাস নিড়ানির কাজের সময় সমবেত কণ্ঠে জারিগান। আকাশে তখন প্রচণ্ড খর রোদ। সেই গানের 'কলি' আমার মনে নেই, কিন্তু সেই সুর এখনও আমার কানে বাজে। আবার দেখেছি, নদীপথে নৌকো চলেছে খড় পাট ধান বা আখ বোঝাই করে—কেউ-বা গুণ টেনে, লগি মেরে, আবার কেউ-বা দাঁড় টেনে—সঙ্গে নৌকো বাওয়ার প্রাণ মাতানো ভাটিয়ালী সুরে গান। আবার দেখেছি বিগত ১৯৫৪-৫৫ সালে জলপাইগুড়িতে তিস্তা নদীর বাঁধ তৈরির সময় বাঁধের ভিত্তি স্থাপনের জন্য অপরিহার্য ৩০ থেকে ৪০ ফুট লম্বা শালের খুঁটি মাটিতে পুঁততে গিয়ে শ্রমিকরা সমবেত কণ্ঠে গান ধরেছে। কেন? একটু ভেবে দেখলেই বোঝা যাবে উৎপাদনাত্মক কাজ শুধু হাত ও হাতিয়ার সাপেক্ষই নয়, ভাষা ও সুর সাপেক্ষও বটে; আর সেই ভাষা ও সুর উৎপাদনাত্মক কাজকে সহজ ও স্বাভাবিক করে তোলে। সেক্ষেত্রে শ্রম, উৎপাদন ও শ্রমিকের মধ্যে কোনোরূপ বিরোধ নেই, এবং রয়েছে একাত্মতা ও স্বাধীনতা। প্রাক-বিভক্ত আদিম সাম্য সমাজে শ্রম, শ্রমিক ও উৎপাদনের মধ্যে ছিল একাত্মতা। পরবর্তীকালে দাস-সমাজ, সামন্ত-সমাজ ও পুঁজিবাদী-সমাজের আবির্ভাবের ফলে শ্রম, উৎপাদন, উৎপন্নদ্রব্য ও শ্রমিকের মধ্যে একাত্মতা ও আত্মীয়তার বিলোপ ঘটে। এইভাবে মানুষের ব্যক্তিসত্তা 'Commercial object'-এ পরিণত হয়; ফলে মানুষে মানুষে এমনকি মানুষের স্বীয় স্বাধীন চেতনার সঙ্গে বিযুক্তি ঘটে। সামন্ত সমাজে, পুঁজিবাদী সমাজে শ্রমিক একদিকে যেমন তার স্বাধীন ব্যক্তি সত্তায় উন্নীত হয় না, তেমনি স্বীয় শ্রমজাত উৎপন্ন দ্রব্যের কাছেও পরাধীন হয়ে ওঠে। কারণ অ্যালিয়েনেশনের ফলে শুধু তার ব্যক্তিসত্তার সঙ্গেই বিরোধ ঘটে না, অধিকন্তু নিজের শ্রমের দ্বারা উৎপন্ন বস্তুর উপরও স্বত্ব-স্বামিত্ব নষ্ট হয়। প্রাক-বিভক্ত সমাজে যতদিন মালিক গোষ্ঠীর উদ্ভব ঘটেনি ততদিন পর্যন্ত অ্যালিয়েনেশনের উদ্ভব হয়নি। কাজের সঙ্গে স্বাভাবিকভাবেই ভাষা সংযোজিত হয়েছে, আর ক্রমে সংযোজিত হয়েছে সুর। এভাবেই

সঙ্গীতের জন্ম ; এ-সঙ্গীত অবসর বিনোদন নয় একান্তভাবেই কাজের অপরিহার্য অঙ্গ। সর্দার-শ্রমিক গোটা গানটি করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অঙ্গ-ভঙ্গি সহযোগে, আর সকল শ্রমিক সেই গানে সুর মিলায় ও কাজ করে ; লাঘব হয় শ্রমের, কাজ হয় সহজ'। পণ্ডিতপ্রবর বুশের প্রমাণ করেছেন উৎপাদনাত্মক কাজের মাধ্যমেই ভাষা এবং ক্রমে কাজের তাল থেকেই ভাষার ছন্দ জন্ম নিয়েছে।

আদিম সমাজে পশ্চাদপদ মানুষের মধ্যে কাজের সঙ্গে শুধু গানেরই সম্পর্ক নয়, নাচেরও অতি অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ রয়েছে। বস্তুত আদিম সমাজে নাচ-কাজ-গান পরস্পর অঙ্গাঙ্গীভাবে মিশে একাকার অভিন্ন হয়ে রয়েছে। সেই পর্যায়ে উৎপাদন কাজের পক্ষে গান ও নাচ অনিবার্য কারণেই উদ্দেশ্যমূলক ও একান্ত প্রয়োজনীয় ছিল। প্রকৃতির সঙ্গে অবিরাম সংঘর্ষের ফলে আদিম মানুষের উৎপাদন যন্ত্র হয়েছে ক্রমেই অধিকতর ধারালো, উৎপাদন-পদ্ধতি হয়েছে অধিকতর উন্নত, আর সেই সঙ্গে পরিবর্তিত হয়েছে সামাজিক কাঠামো ; আর সেই পরিবর্তনের বাঁকে বাঁকে ঐতিহাসিক-সামাজিক মানুষের সযত্ন সাধনায় সৃষ্টি হয়েছে শিল্প-সাহিত্য-দর্শন ও বিজ্ঞানের। এ-প্রসঙ্গে এঙ্গেলসের উক্তি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য মনে করি। তিনি বলেছেন :

> "With each generation, labour itself became different, more perfect, more diversified. Agriculture was added to hunting and cattle breeding, then spinning, weaving, metal working, pottery and navigation. Along with trade and industry there appeared finally art and science. From tribes there developed nations and states. Law and politics arose, and with them the fantastic reflection of human things in human mind : religion…"[১]

বংশ-পরম্পরায় শ্রমের রূপান্তর হতে লাগল ; শ্রম আরও নিখুঁত আরও বিচিত্র হতে লাগল। শিকার পশুপালনের সঙ্গে যুক্ত হলো কৃষি ; তারপর সুতো কাটা, কাপড় বোনা, ধাতুর কাজ, মৃৎশিল্প, নৌ-চালনা। বাণিজ্য ও শিল্পের সঙ্গে শেষ পর্যন্ত যোগ হলো শিল্প-চারুকলা ও বিজ্ঞানের। গোষ্ঠী রূপান্তরিত হলো জাতি ও রাষ্ট্রে। আবির্ভাব হলো আইন ও রাজনীতির, আর সেই সঙ্গে জন্ম নিল মানব-মনে মানব-ব্যাপারেরই কাল্পনিক প্রতিবিম্ব— ধর্ম।…

শ্রমের রূপান্তরের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন শিল্পকলা বিকাশের মাধ্যমে উৎপাদন কৌশল অতি দ্রুত উন্নত হতে লাগল ; কারণ একদল লোক খাদ্যোৎপাদনের

প্রত্যক্ষ দায়িত্ব থেকে মুক্তি পেল ; তখন তারা অধিকতর উন্নত উৎপাদন যন্ত্র উদ্ভাবনে এবং অবস্থার পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে উৎপাদনের গুণগত মৌলিক পরিবর্তনের দিকে নজর দিল ; তখনই দেখা দিল উৎপাদনব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনার সাংগঠনিক প্রয়োজনীয়তা। ফলে একদল লোক উৎপাদনের সংগঠন পরিচালনায় মনোনিবেশ করল। এরই ফলে প্রাক-বিভক্ত সমাজের সাম্যের ভিত্তি ভেঙে গেল এবং দেখা দিল শ্রেণী-বিভক্ত সমাজ যেখানে একদল লোক শারীরিক পরিশ্রম করে উৎপাদনের প্রত্যক্ষ দায়িত্ব পালন করবে, অপর একদল লোক মাথা খাটিয়ে প্রয়োজন অনুসারে উৎপাদনব্যবস্থা পরিচালনা করবে। এইভাবেই ক্রমে ক্রমে শ্রম ও কর্মের সঙ্গে চিন্তার সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়। শ্রমের সঙ্গে চিন্তার বিচ্ছেদের মাধ্যমেই ঘটে শারীরিক শ্রমের সঙ্গে মানসিক শ্রমের বিচ্ছেদ। উৎপাদন কৌশল উৎপাদনের যন্ত্র ও উৎপাদনব্যবস্থা যতই উন্নত হতে লাগল কায়িক শ্রম ও মানসিক শ্রমের মধ্যে বিচ্ছেদও ততই বৃদ্ধি পেতে থাকল। যে-অর্থনৈতিক উৎপাদন ব্যবস্থার ক্রমোন্নতির ফলে প্রাক-বিভক্ত সাম্যসমাজ শ্রেণী-বিভক্ত সমাজে রূপান্তরিত হলো সেই উৎপাদনের গুণগত রূপান্তরের অবশ্যম্ভাবী ও অপরিহার্য ফল হিসাবে এল কায়িক ও মানসিক শ্রমের ক্রমিক বিচ্ছেদ। আমরা আগেই আলোচনা করেছি, প্রত্যক্ষ উৎপাদন ক্রিয়ার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে মিশে গেছে ভাষা, নৃত্য ও সঙ্গীতকলার আত্মপ্রকাশ। উৎপাদন প্রক্রিয়া যত উন্নত হয়েছে, তত রূপান্তরিত হয়েছে মানুষের ভাষা, ভাষার প্রকাশক্ষমতা, সঙ্গে সঙ্গে নৃত্য-গানও উন্নততর রূপ পরিগ্রহ করেছে। এই উন্নততর রূপান্তরের ফলে মানুষের ভাষা-সাহিত্য-সঙ্গীত নৃত্যকলা এমন একটা পর্যায়ে উপনীত হয়েছে যখন স্বাভাবিকভাবেই মনে হয় যে ভাষা-সাহিত্য-সঙ্গীত-নৃত্যকলার উন্নততর বিকাশের সঙ্গে অর্থনৈতিক উৎপাদনব্যবস্থার কোনোরূপ সম্পর্ক নেই। কিন্তু সত্যিই কি তাই? বিষয়টি একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে আলোচনা করা যাক। মাটি থেকে প্রাণরস আহরণ করে গাছ বড় হয় ; সেই গাছে ফল ধরে, ফল পাকে ; তারপর গাছের সঙ্গে তার বিচ্ছেদ ঘটে। মাটি, প্রাণরস, গাছ—কোনো কিছুই অলৌকিক বা অতিপ্রাকৃত কিছু নয়। এই সবকিছুকে বাদ দিয়ে ফলের কোনো স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে কি? মাটি, মাটির অন্তর্নিহিত প্রাণরস যা বস্তুর বিশেষ গুণ বস্তুর মধ্যেই একাত্ম হয়ে আছে—তারই প্রকাশ গাছে, যার পরিণতি ফলে। অতএব ফলের কোনো স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই। ফলের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আপাতদৃষ্টিতে আছে মনে হয়।

তেমনি ভাষা-সাহিত্য-শিল্প-কলাও অর্থনৈতিক উৎপাদনব্যবস্থা প্রসূত। এবং এইসব শিল্পকলার ঐতিহাসিক সামাজিক মানুষের সমাজ-জীবন নিরপেক্ষ কোনো স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই। সাহিত্য, শিল্পকলা, সঙ্গীতকলা গড়ে ওঠে ঐতিহাসিক মানুষের সামাজিক পটভূমিকার যোগে এবং কোনো সংস্কৃতির অঙ্গ রূপে এবং সেই সামাজিক পটভূমি ও সাংস্কৃতিক অঙ্গ অর্থনৈতিক উৎপাদন ব্যবস্থারই অবশ্যম্ভাবী ও অপরিহার্য ফল মাত্র। যাঁরা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী তাঁরা শিল্প-সাহিত্যের সামাজিক ভিত্তি স্বীকার করেও তার উৎপাদনব্যবস্থা-প্রসূত সমাজ নিরপেক্ষতা প্রতিপন্ন করতে চেষ্টা করেছেন। এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য-বাদীদের মধ্যে অন্যতম টোমার্জ। তিনি বলেছেন—"সারস্বত বিধি সামাজিক বিধির উপর নির্ভরশীল নয়, তারা সামাজিক বিধির অংশ পর্যন্ত নয়।" এসব নেহাতই কূটতর্ক যার মধ্যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির একান্তই অসদ্‌ভাব। শিল্প-সাহিত্য বিচারের এক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণের সন্ধান দিয়েছে মার্কসবাদ। মার্কসবাদই প্রথম সামাজিক মানুষের শিল্প-কর্মকে স্থান, কাল এবং ইতিহাসের প্রাণকেন্দ্রে স্থাপন করেছে। উৎপাদনাত্মক অর্থনীতি-প্রসূত রাজনৈতিক ও সামাজিক পারম্পর্যে মানুষের শিল্পকর্মের প্রতিষ্ঠায় মার্কসীয় দর্শন আমাদের নতুন দিগন্তের সন্ধান দিয়েছে। বিগত শতকে ১৮৪৪ সালে মার্কস ও এঙ্গেলসের সাক্ষাৎকারে এবং 'দ্য জার্মান ইডিওলজি' রচনার মধ্য দিয়েই প্রথম মার্কসীয় শিল্প-সাহিত্য-দর্শনের সূত্রপাত ঘটে।

গতিশীল জীবন-প্রবাহের বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মধ্যে অর্থনৈতিক উৎপাদন-ব্যবস্থার মুখ্য ভূমিকা মার্কস ও এঙ্গেলসের দার্শনিক চিন্তার একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিশেষত্ব। আবার এঙ্গেলস বলেছেন—"চূড়ান্ত বিচারে ইতিহাসে নিয়ামক শক্তি বাস্তব জীবনের উৎপাদন ও পুনরুৎপাদন। মার্কস বা আমি এর অধিক কিছু বলিনি। অতএব কেউ যদি আমাদের কথাকে বিকৃত করেন, বলেন যে অর্থনৈতিক উৎপাদনই একমাত্র নিয়ন্ত্রণী শক্তি, তখন তিনি আমাদের সিদ্ধান্তকে এক অর্থহীন বস্তুবিচ্ছিন্ন নির্বোধ উক্তিতে পর্যবসিত করেন। অর্থনৈতিক পরিস্থিতিই মূল ভিত্তি, কিন্তু তদুপরি নির্মিত সৌধের যাবতীয় বিচিত্র উপকরণ সমূহও…ঐতিহাসিক সংঘাতের ইতিহাসে তাদের প্রভাব প্রয়োগ করে এবং অনেক ক্ষেত্রে তাদের রূপ নির্ধারণে মুখ্য ভূমিকা পালন করে। এই যাবতীয় উপাদানেরই মিথস্ক্রিয়া (inter action) ঘটে। এই মিথস্ক্রিয়ার কথা মার্কস পুনঃপুনঃ বলেছেন।"[২]

মার্কসীয় শিল্প-সাহিত্য-দর্শনের ভিত্তি বাস্তব জীবন ও মানুষের মনের কর্মকাণ্ডের মধ্যে দ্বান্দ্বিক সম্বন্ধ। মার্কস বলেছেন—"ভাব, ধারণা ও চেতনার উপাদান প্রথমত মানুষের বস্তুগত ক্রিয়াকর্ম ও বস্তুগত ক্রিয়াসম্পর্কের সঙ্গে, বাস্তব জীবনের ভাষার সঙ্গে প্রত্যক্ষত আশ্লিষ্ট। ধারণা গঠন, চিন্তন, মানুষের মনোবিনিময় এখানে মানুষের বস্তুগত আচরণের ক্ষরণরূপে প্রতীয়মান।··· মানুষেরাই ঐ সব ধারণা, ভাব ইত্যাদির উৎপাদক—উৎপাদিকা শক্তি সমূহের বিকাশের বিশেষ পর্যায় এবং এই শক্তিবর্গের সঙ্গে উচ্চতম স্তরে সঙ্গত ক্রিয়া-কর্মের দ্বারা নিরূপিত বাস্তব ক্রিয়াশীল মানুষ।"[৩] মার্কসের এই উক্তিতে জীবন ও মানুষের মনন ক্রিয়ার মধ্যে জৈব সংযোগের স্বাক্ষর স্পষ্ট প্রতীয়মান এবং এখানে স্বভাবতই গতিশীল জীবনের চলমান প্রক্রিয়া ও মিথষ্ক্রিয়ার ধারণা অনুস্যূত। 'দ্য জার্মান ইডিওলজি'র প্রথম খণ্ডের প্রথমাংশে জীবন্ত সামাজিক মানুষের অস্তিত্ব থেকে জীবন বিচার আরম্ভ হয়েছে মার্কসের। জীবন্ত, সজীব মানুষের অস্তিত্বের প্রকৃত রূপটি বোঝা যায় ব্যক্তি মানুষের শারীর সংগঠন এবং ফলস্বরূপ অবশিষ্ট প্রকৃতিলোকের সঙ্গে তার সম্বন্ধ থেকে। আগেই বলেছি, মানুষ জন্তুজগত থেকে নিজের স্বাতন্ত্র্যকে নির্দিষ্ট করে তার বেঁচে থাকার অবলম্বনকে স্বীয় প্রচেষ্টায় উৎপাদন করতে গিয়ে। যদিও মৌমাছি, পিঁপড়ে নিজেদের প্রচেষ্টায় জীবনধারণের উপকরণ উৎপাদন করে তথাপি একথা স্বীকার করতেই হবে, পশুদের জীবনধারণ একান্তভাবেই প্রকৃতিনির্ভর। কিন্তু মানুষ আপন সাধনায় ঐ প্রকৃতিনির্ভরতা জয় করে, সক্রিয় শ্রমসাধ্য সৃষ্টিশীল ভূমিকা পালন করে ; প্রকৃতিকে জয় করে স্বমহিমায় আপন পরিচয়কে প্রতিষ্ঠিত করেছে। এই সক্রিয়, শ্রমসাধ্য ও সৃষ্টিশীল ভূমিকা পালনে যে বিশেষ একটি জীবন প্রক্রিয়ার উন্মেষ ঘটেছে, সেই জীবন প্রক্রিয়ার অবশ্যম্ভাবী ফল হিসাবেই জন্মলাভ করেছে ও বিকশিত হয়েছে মানব-চেতনা। বস্তুবাদী চিন্তায় চেতনা বস্তুও জীবনসম্ভূত ; অতএব সাহিত্য, শিল্প-কলা, নীতিবোধ, দর্শন, কোনো কিছুই আকাশে ফোটা ফুলের মতো নিরালম্ব স্বয়ম্ভূ অস্তিত্বের অধিকারী হতে পারে না, তাদের কোনোও স্বতন্ত্র অস্তিত্বের ইতিহাস থাকা সম্ভব নয়। "মানুষ তাদের বস্তুগত উৎপাদন ও বস্তুগত ক্রিয়াকর্মের বিকাশ ঘটাবার সঙ্গে সঙ্গেই, তাদের বাস্তব অস্তিত্ব পরিবর্তন করার সঙ্গে সঙ্গেই তাদের চিন্তন ও চিন্তনজাত সম্পদকে পরিবর্তন করে। চেতনা দ্বারা জীবন নিরূপিত হয় না। চেতনাই জীবন দ্বারা নিরূপিত হয়।"[৪] ১৮৫৯ সালে 'ক্রিটিক অব পোলিটিকাল ইকনমি'র

ভূমিকায় এই প্রাথমিক সিদ্ধান্তই মার্কস স্পষ্ট করে বলেছেন, "জীবনের সমাজগত উৎপাদনের প্রক্রিয়ায় মানুষ তাদের ইচ্ছার পরিধির বাইরেই নির্দিষ্ট ও আবশ্যক এমন সম্পর্কে, এমন উৎপাদন সম্পর্কে প্রবেশ করে, যা তাদের উৎপাদনের বস্তুগত উপায়ের বিকাশের বিশেষ স্তরের সঙ্গে সঙ্গত। এই উৎপাদনী সম্পর্কের সমগ্রতাই সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামো, যার আসল ভিত্তির উপর গড়ে ওঠে আইনগত ও রাজনৈতিক এক সৌধ, এবং এরই সঙ্গে সঙ্গত হয় চেতনার বিশেষ রূপসমূহ।...অর্থনৈতিক ভিত্তির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই সমগ্র বিশাল সৌধটিও রূপান্তরিত হয়, অল্পাধিক দ্রুততায়।"[৫]

ইতিহাসের মানুষ শ্রমশীল। এই শ্রমশীল মানুষের সমাজ-সভ্যতা-সংস্কৃতি কোনো দৈবশক্তির ইঙ্গিতে তৈরি হয়নি। মানুষ নিজেই নিজেকে সৃষ্টি করেছে। এই সৃষ্টির কাহিনীই তার ইতিহাস। এই ইতিহাস বলতে বোঝায় মানুষের সমাজ, সভ্যতা ও সংস্কৃতি যার মধ্যে তার গোষ্ঠী ও ব্যষ্টিজীবন ওতপ্রোতভাবে জড়িত। মানুষের শ্রমই আছে তার সৃষ্টিশক্তির মূলে। এই শ্রমের মাধ্যমেই সে লাভ করেছে তার দুটি হাত যা তার উৎপাদনাত্মক কর্মের মূল হাতিয়ার।[৬] এই শ্রমশীল মানুষের যে-সকল গুণাবলী রয়েছে সেগুলোকে দু-ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথমত, প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই কতকগুলি সাধারণ গুণ বর্তমান, যেগুলিকে বলা যায় সহজাত মানবপ্রকৃতি, যেমন যৌনবোধ, ক্ষুধা। এগুলিকে মার্কস বলেছেন স্থায়ী 'নোদনা' বা 'fixed drives', এবং এই সকল গুণ যে-কোনো অবস্থায় বর্তমান থাকে। সামাজিক অবস্থার পরিবর্তনের দ্বারা এদের যেটুকু পরিবর্তন ঘটে তা কেবলমাত্র রূপ (form) ও রীতির (direction) ক্ষেত্রে। দ্বিতীয়ত, কতকগুলি গুণ আছে যেগুলি বিশেষ ধরনের সামাজিক অবস্থার ফলে গড়ে ওঠে। এই গুণগুলি সামাজিক অবস্থার মধ্য দিয়ে অর্জিত হয়। এই অর্জিত গুণগুলিকে মার্কস নাম দিয়েছেন 'আপেক্ষিক নোদনা' বা 'relative drives'।[৭] এই দ্বিবিধ গুণের সমন্বয়ে গড়ে ওঠা মানুষ হলো সামাজিক মানুষ। পূর্বেই বলেছি মার্কসের এই সামাজিক মানুষ অ্যারিস্টটলের 'social animal' নয়। সচেতন ও উৎপাদনক্ষম সামাজিক মানুষের ভিত্তি তার জীবন-বিকাশের কর্মধারায়। অর্থাৎ সচেতন উৎপাদনক্ষম সামাজিক মানুষ যা উৎপন্ন করে এবং যেভাবে সে উৎপন্ন করে তা-ই স্বরূপ নির্ধারণ করে। ব্যক্তিমানুষের প্রকৃতিকে মার্কস এভাবেই বিশ্লেষণ করেছেন; উৎপাদন-ক্রিয়া নির্ধারণকারী বাস্তব অবস্থার উপরই মানুষের প্রকৃতি নির্ভর করে।[৮] তারই ফলে আমরা প্রত্যক্ষ করি

ইতিহাসের বিভিন্ন স্তরে সাধারণ মানবপ্রকৃতি বিভিন্ন রূপ নিয়েছে। এ-প্রসঙ্গে সৃষ্টিশীল সামাজিক মানুষের মানবপ্রকৃতি সম্পর্কে মার্কসের উক্তিটি বিশেষভাবে প্রনিধানযোগ্য: "The whole of what is called world history is nothing but the creation of man by human labour and emergence of nature of man; he therefore has the evident and irrefutable proof of his self creation, of his own origins."[৯] ইতিহাসের স্রষ্টা সামাজিক মানুষ মূলত স্বাধীন, আত্মবশ। এই স্বাধীন, আত্মবশ মানুষ পারস্পরিক অবিচ্ছিন্নতায় সামাজিক জীবনে ব্যক্তিমানুষ হিসেবে অবস্থিত। গোষ্ঠী-জীবন থেকে মানুষের ব্যক্তি-জীবন পৃথক নয়। মানুষ তার সমাজ-জীবনকে মূর্ত করে তুলেছে তার গোষ্ঠী-চেতনা দ্বারাই। অতএব কোনো মানুষ যদি এককভাবেও কিছু করে তখনও সে তার সমাজ-চেতনা ও গোষ্ঠী-চেতনার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে জড়িত। কারণ ভাষা, ভাব, কর্মক্রিয়া পদ্ধতি ইত্যাদি প্রতিটি বিষয়ের অপরিহার্য উপাদান সে সংগ্রহ করেছে সমাজ জীবন থেকে। তাই ভারতীয় 'চিরন্তন মানবতা'র আত্মচর্চার ধারণার সঙ্গে মার্কসের স্বাধীন, আত্মবশ সামাজিক মানুষের কোনোরূপ সামঞ্জস্য খুঁজে পাওয়া যায় না। ভাববাদীরা যে-ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের মহিমা-গান করেন, ইতিহাস সৃষ্টিকারী সচেতন সামাজিক মানুষ সে-ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য কামনা করেনি। মানব-সম্পর্ক-বন্ধন জড়িত আপন ক্রিয়া-কর্মের মাধ্যমে ইতিহাসের মানুষ আবিষ্কার করেছে নিজেকে, সৃষ্টি করেছে সভ্যতার বিচিত্র উপকরণ। মানব-সম্পর্ক-বন্ধন জড়িত আপন ক্রিয়া-কর্মের সঙ্গে মানুষের আত্মোপলব্ধি নিবিড় অঙ্গাঙ্গী বন্ধনে বদ্ধ। মানুষের আপন কর্মের সঙ্গে আত্মোপলব্ধির যখন বিচ্ছেদ ঘটে তখনই মানুষ তার গোষ্ঠী-চেতনা থেকেও বিযুক্ত হয়; শুধু তাই নয়, তখন সে-মানুষ হারায়। আত্মোপলব্ধির সঙ্গে যে-মানুষের বিচ্ছেদ ঘটেছে সে-মানুষ মানবসত্তায় খণ্ডিত, সে অপরিপূর্ণ, সৃষ্টির আনন্দযজ্ঞে সে-মানুষ আপন অস্তিত্বের স্বাক্ষর থেকে বঞ্চিত; সে-মানুষ অশান্ত, কারণ ক্ষয়িষ্ণু ভাবনাগুলি অহরহ তার খণ্ডিত সত্তাকে তাড়না দিচ্ছে। তাই সে কখনও অস্থির, আবার কখনও অলস বা বিষণ্ণ। মানুষের জীবনের এই অবস্থাটাকেই মার্কস বলেছেন 'অ্যালিয়েনেশন' (alienation)। এই অ্যালিয়েনেশনের ফলে কিভাবে মানুষের আপন সৃষ্টবস্তুর সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটে, বিচ্ছেদ ঘটে কর্মীর সঙ্গে কর্মপদ্ধতির এবং বিচ্ছেদ ঘটে সচেতন মানুষের বিশ্বানুগ গোষ্ঠী-চেতনার সঙ্গে, মার্কস তার

ঐতিহাসিক বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন।[১০] শ্রেণী-বিভক্ত দাস-যুগে, সামন্ত-যুগে এবং বর্তমান পুঁজিবাদী সমাজে এই অ্যালিয়েনেশনের ক্রমবর্ধমান প্রভাবে মানব সম্পর্কের ক্ষেত্রে এবং মানবিক সত্তায় দারুণ বিপর্যয় নেমে আসছে। ভাববাদীরা রাষ্ট্রের মহিমা, নাগরিক অধিকার মূলক নানাবিধ সামন্তযুগীয় এবং বুর্জোয়া চিন্তা এবং তথাকথিত ব্যক্তি স্বাধীনতার পক্ষে ওকালতিতে পঞ্চমুখ। অর্থাৎ বাস্তব অবস্থাকে চেপে রাখার একটা প্রাণপণ প্রচেষ্টা চলছে। ফলে মানুষের আত্মিক জগতে এমনকি শিল্পীর শিল্প-চেতনায় অ্যালিয়েনেশনের প্রতিচ্ছবি মূর্ত হয়ে ওঠে। এ-অবস্থায় মানুষের মধ্যে বস্তুজগত থেকে পলায়নের মনোবৃত্তি জাগে, শিল্প-চেতনা বাস্তবতা বর্জিত কল্পনালোকে বিহার করে। শিল্পে, সাহিত্যেও জীবনযাপনের সমুদয় রীতিতে অ্যালিয়েনেশনের সুদূরপ্রসারী ছায়া প্রকটিত। ঔপন্যাসিক কাফকার একটি উক্তিতে প্রমাণিত যে কিভাবে শিল্পী-সাহিত্যিকের চেতনাকে অ্যালিয়েনেশন প্রভাবিত করছে, "I am separated from all things by a hollow space, and I do not even reach to its boundaries." অতএব আমরা বলতে পারি, আজকের শিল্পী-সাহিত্যিক আত্মবশ নয়, পরাধীন। বস্তুত, সত্যিকার সৃষ্টি মহৎ সৃষ্টি তখনই সম্ভব যখন মানুষ স্বাধীনভাবে সৃষ্টি করে—আপন সৃষ্টির মুখোমুখী স্বাধীনভাবে দাঁড়াতে পারে। আজকের মানুষের সে-স্বাধীনতা নেই, শিল্পী-সাহিত্যিক হারিয়েছে তার স্বাধীনতা, তাই আজ মহৎ বা যথার্থ সৃষ্টির সম্ভাবনা কম।

বিরুদ্ধবাদীরা আরও একটি প্রশ্ন তুলেছেন। রামায়ণ-মহাভারতের মতো মহৎ কাব্য-সাহিত্য আজ আর সম্ভব হচ্ছে না কেন? উত্তরে বলা যায়, যে-অর্থনৈতিক ও সামাজিক পটভূমিকায় রামায়ণ-মহাভারতের সৃষ্টি হয়েছিল সেই সামাজিক অর্থনৈতিক পটভূমি পরিবর্তিত হয়েছে। তাই আজকে যদি কেউ রামায়ণ-মহাভারতের অনুরূপ মহাকাব্য রচনার চেষ্টা করেন তবে তা হবে এ-যুগের সমাজ-চেতনা ও গোষ্ঠী-চেতনা থেকে বিচ্ছিন্ন এক কাল্পনিক পদার্থ। মার্কস তাঁর 'দ্য জর্মন ইডিওলজি'র ৩৮ পৃষ্ঠায় বলেছেন,—"মানুষ তাদের বস্তুগত উৎপাদন ও বস্তুগত ক্রিয়া-কর্মের বিকাশ ঘটাবার সঙ্গে সঙ্গেই, তার বাস্তব অস্তিত্ব পরিবর্তন করার সঙ্গে সঙ্গেই, তার চিন্তন ও তার চিন্তন-জাত সম্পদকে পরিবর্তন করে।…"[১১] রামায়ণ-মহাভারতের যুগে মানুষের বস্তুগত উৎপাদন ও বস্তুগত ক্রিয়াকর্মের বিকাশ যে-পর্যায়ে ছিল আজ এই বিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বস্তুগত উৎপাদন ও ক্রিয়াকর্ম বিকাশের সে-পর্যায় নেই,

ফলে বস্তুগত উৎপাদন ও ক্রিয়াকর্মের মৌলিক গুণগত পরিবর্তনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত মানুষের চিন্তন ও চিন্তনজাত সম্পদেরও রূপ, রীতি ও গুণগত শৈল্পিক রূপান্তর অবশ্যম্ভাবী। বিরুদ্ধবাদীরা নিশ্চয়ই উপলব্ধি করতে পারবেন যে রূপ, রীতি, গুণগত রূপান্তর ও শৈল্পিক উৎকর্ষ ও অপকর্ষের মান-দণ্ডের বিচারে আজকের কাব্য-নাটক-শিল্পকর্মের রূপ, রীতি ও শৈল্পিক গুণগত রূপান্তর রামায়ণ-মহাভারত, ইলিয়াড-ওডিসীর ভাষা, রূপ, রীতি অপেক্ষা অধিকতর উন্নত। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় রবীন্দ্রনাথের 'রক্তকরবী'র কথা। রামায়ণে কৃষিসভ্যতা ও যান্ত্রিক সভ্যতার যে-দ্বন্দ্বচিত্র অঙ্কন করেছেন বাল্মীকি, সেই কৃষি ও যান্ত্রিক সভ্যতার দ্বন্দ্ব চিত্রটিই রবীন্দ্রনাথ তাঁর অতি ক্ষুদ্রপরিসর সাঙ্কেতিক নাটক 'রক্তকরবী'তে অতিশয় নিপুণভাবে চিত্রিত করেছেন। একই কাহিনীকে রূপায়িত করতে গিয়ে হাজার হাজার বছর আগে বাল্মীকি যে-রূপ ও রীতির আশ্রয় নিয়েছিলেন, হাজার হাজার বছর পরে রবীন্দ্রনাথ সেই একটি কাহিনীকে রূপায়িত করতে সম্পূর্ণ ভিন্ন শিল্পরূপ ও শিল্পরীতির আশ্রয় নিয়েছেন। বলা বাহুল্য বাল্মীকি ও রবীন্দ্রনাথ উভয়েরই রূপ, রীতি নিজ নিজ যুগের উৎপাদন-ব্যবস্থা ও সামাজিক অবস্থার সঙ্গে সম্পূর্ণ সঙ্গতিযুক্ত। তথাপি এ-কথা অবশ্যই স্বীকার্য যে 'রক্তকরবী'র আঙ্গিক, রূপ, রীতি রামায়ণের আঙ্গিক, রূপ, রীতি অপেক্ষা অধিকতর শৈল্পিক ব্যঞ্জনার অধিকারী। মোট কথা শিল্পকর্মের বিকাশে রূপ, রীতি ও গুণগত রূপান্তরকে শিল্পগত উন্নতি-অবনতি বা উৎকর্ষ-অপকর্ষের মান-বিচারে ঠেলে না দিলেই অসঙ্গতি এড়ানো যায়। রামায়ণ-মহাভারতে এবং গ্রীক মহাকাব্যে কল্পনার যে-প্রবল প্রাণময়তা দেখা যায়, তার উৎস সন্ধান করা আবশ্যক। বাস্তব জীবনকে বদলাবার আবেগই সেই কল্পনার প্রবল প্রাণময়তার উৎস। মহাকাব্যের সেই যুগে বাস্তব জীবনে উপকরণের যে-স্বল্পতা ও দীনতা ছিল, তাকে কল্পনায় ছাপিয়ে যাবার প্রবণতা বাস্তব জীবন ও কল্পনার দ্বন্দ্ব থেকে জাত। বাস্তব জীবনে উপকরণের যে-দীনতা সেই যুগে লক্ষ্য করা যায়, আজকে সেই দীনতা নেই। বরং উৎপাদনব্যবস্থা ও উৎপাদনকৌশল ও উৎপাদন-যন্ত্রের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে জীবনের উপকরণও সংগৃহীত ও সঞ্চিত হয়েছে বিপুল পরিমাণে; তবে সে-সম্পদ মুষ্টিমেয় মানুষের কুক্ষিগত। তাই আজকের মানুষ, আজকের শিল্পী-সাহিত্যিকের প্রবণতা জীবনের উপকরণের দীনতাকে কল্পনায় ছাপিয়ে যাওয়া নয় বরং মুষ্টিমেয় মানুষের কবলে কুক্ষিগত বিপুল জীবনোপ-করণকে সমগ্র মানবগোষ্ঠীর ভোগ্য পণ্যে পরিণত করা। এই প্রবণতাই এ-যুগে

শিল্পী-সাহিত্যিকের শিল্প-কর্মের রূপ-রীতির নিয়ামক। এই প্রসঙ্গে মার্কসের একটি উক্তি উল্লেখযোগ্য : "পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতির সঙ্গে সঙ্গত মনন-জাত উৎপাদনের প্রকৃতি মধ্যযুগীয় উৎপাদন পদ্ধতির সঙ্গে সঙ্গত মননজাত উৎপাদনের প্রকৃতি থেকে ভিন্ন। বস্তুগত উৎপাদনের চরিত্র তার নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক আধারে উপলব্ধি না করলে, তার সঙ্গে সঙ্গত মননজাত উৎপাদনের বাস্তব প্রকৃতি এবং উভয়ের পারস্পরিক ক্রিয়া অনুধাবন করাও অসম্ভব।"[১২]

অতএব পুঁজিবাদী সমাজে অনিবার্য অর্থনৈতিক কারণে ও জীবনযাত্রার মৌলিক গুণগত রূপান্তরের ফলে রামায়ণ-মহাভারতের মতো মহাকাব্যের সৃষ্টি সম্ভব নয়। সম্ভব নয় শেক্স্‌পীরিয় ঢঙের নাটক রচনাও। এর জন্যে কোনোরূপ আক্ষেপের কারণ আছে বলে মনে হয় না। পূর্বোক্ত উদ্ধৃতিতে এ-কথা সুস্পষ্ট যে অর্থনৈতিক উৎপাদন সম্পর্কের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের চিন্তাধারার পরিবর্তন হয় এবং সেই পরিবর্তনের ফলে মানুষের চিন্তন-জাত সৃষ্টির রূপ-রীতির মৌলিক পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী।

গ্রন্থপঞ্জী

১. F. Engels DN. 288-89
২. F.Engels, জে ব্লককে লেখা চিঠি, ২১এ সেপ্টম্বর, ১৮৯০
৩. Marx ও Engels, 'The German Ideology' (উদ্ধৃতি Literature and Art by Marx and Engels, সিডনি, ১৯৪৯, পৃষ্ঠা ১৪) মস্কো, ১৯৬৪, পৃষ্ঠা ৩৭
৪. Marx, 'Preface to the Critique of Political Economy', Selected Works, vol. I, মস্কো, ১৯৪৬, পৃষ্ঠা ৩০০-৩০১
৫. Marx, Economic and Philosophic Manuscripts of 1844
৬. F. Engels, The Part played by labour in the Transition from Ape to Man
৭. Marx, Economic and Philosophic Manuscripts of 1844
৮. Marx, the German Ideology
৯. Marx, Economic and Philosophic Manuscripts of 1844
১০. Roger Garaudy, Karl Marx : The Evolution of His Thought
১১. Marx ও Engels, The German Ideology (১৮৪৫-৪৬) মস্কো, ১৯৬৪, পৃষ্ঠা ৩৮
১২. Marx, Theorien ueber den Mehrwert, Vol. I, পৃষ্ঠা ৩৮০-৮৫ (উদ্ধৃতি Literature and Art, পৃষ্ঠা ২৫)

উল্লিখিত গ্রন্থাবলী এবং দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের 'লোকায়ত দর্শন'-এর নিকট ঋণ অবশ্যস্বীকার্য।

নাটকের রবীন্দ্রনাথ

দেবেশ রায়

শঙ্খ ঘোষের সিদ্ধান্ত হচ্ছে১—রবীন্দ্রনাথ তাঁর নাটকে নতুন 'পুরাণ'-এর জন্ম দিয়েছেন ; লোকস্মৃতি, যাত্রার ধরনধারণ আর সংস্কৃত নাটকের আঙ্গিক ও আরো অনেক কিছুই এই 'পুরাণ' নির্মাণের উপাদান ; ফলে শেষ পর্যন্ত "রবীন্দ্রনাথের নাটকও জন্মায় এই ত্রিলোকে। একটি অনতিনির্দেশিত স্থানকালে বিন্যস্ত তার ঘটনাজগৎ, কিন্তু সে পৌঁছে দেয় নিবিড় কোনো আত্মিক চেতনায়। আত্মভূমি বস্তুভূমি এইভাবে দুই প্রান্ত টান করে ধরে, তার মধ্যবর্তী যোগের পথ তৈরি রাখে লোকস্মৃতি।"

রবীন্দ্রনাথের নাটকের চরিত্র সম্পর্কে এই সিদ্ধান্তের পক্ষে দরকারি প্রতিজ্ঞা-বাক্য গঠন করেছে অন্যান্য প্রবন্ধগুলি। এই মুখবন্ধে এবং নাটক অভিনয় ও পরিশিষ্ট এই তিন ভাগে যথাক্রমে ছ, তিন ও দুটি রচনায় শঙ্খ ঘোষ নানা প্রচলিত ধারণা ভেঙেচুরে, দেশীয় ও বিশ্ব নাটকের নানা ধারার নানা কথা বলে শেষ পর্যন্ত প্রমাণ করেছেন রবীন্দ্রনাথই একমাত্র আধুনিক নাট্যকার।

আমার অন্তত জানা নেই, রবীন্দ্রনাথের নাটক সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে এই সিদ্ধান্তে এর আগে কেউ লিখিতভাবে পৌঁছেছেন। অত্যন্ত কৃশকায়, মাত্র ১৬৯ পাতার, এই গ্রন্থটিতে শঙ্খ ঘোষ প্রায় আতশকাঁচ লাগিয়ে পাঠগত (textual) আলোচনায় লেগেছেন। এমন বিশদ পাঠগত আলোচনা রবীন্দ্র-নাট্যসমীক্ষার ধারায় সম্পূর্ণতই নতুন। রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি কবিতা বিষয়ে মোহিতলাল মজুমদার যে পাঠগত সমীক্ষা একসময় করেছিলেন, শঙ্খ ঘোষের প্রয়াস একমাত্র তারই তুলনীয়। বরং রবীন্দ্রনাথের নাটকের ব্যাপারে সমালোচকের নিজের ব্যাখ্যার সমর্থনে প্রয়োজনমতো রবীন্দ্রনাথের উদ্ধৃতি তুলে আর দরকার মতো অংশ চেপে একটা তত্ত্ব খাড়া করে দেয়াটাই তো এতোদিন চলে এসেছে। শঙ্খ ঘোষ সেই ধারা থেকে সরে এসেই নিজের মৌলিকতা প্রমাণ করলেন।

---

১ কালের মাত্রা ও রবীন্দ্রনাটক। শঙ্খ ঘোষ। সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার। সাড়ে ছ-টাকা

রবীন্দ্রনাথের নাটকের অভিনয়, অভিনয়-যোগ্যতা এবং সমস্যাও ইতিপূর্বে নাট্য-আলোচনার বিষয় হয় নি। রবীন্দ্রনাথের পদ্য, গদ্য, গীতি ও নৃত্য নাট্যকে নাট্য আলোচনা ও রবীন্দ্রনাথের সূত্রে এর আগে কেউ গাঁথেন নি।

অথচ বাঙলা সমালোচনা সাহিত্যে এতগুলো প্রথম কাজ শঙ্খ ঘোষ সেরেছেন এমন অনায়াস ভঙ্গিতে, এমন ফুটনোটবিহীনতায়, অথচ নানা প্রসঙ্গে নানা রচনার এমন চকিত উল্লেখে, রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্র স্মৃতিকথা ও সংলাপের প্রসঙ্গের এমন ব্যবহারে, সামগ্রিকতার তত্ত্বের সঙ্গে প্রায় কোণায় কোণায় মিলিয়ে পাঠগত সমালোচনাকেও এমন একটা পালিশ দিয়েছেন যে, এ-কথা আর না বলে উপায় নেই অজিত কুমার চক্রবর্তীর রবীন্দ্রনাথ বিষয়ক দুটি গ্রন্থের পর রবীন্দ্রনাথের রচনা বিষয়ে এমন মৌলিক বই আর বের হয়নি। সঙ্গে সঙ্গে এমন একটা ভবিষ্যৎবাণী করতেও সাধ যায় বিষ্ণু দে-র 'আধুনিকতার সমস্যা ও রবীন্দ্রনাথ' আর শঙ্খ ঘোষের 'কালের মাত্রা ও রবীন্দ্রনাটক'— বাঙলাসাহিত্যে রবীন্দ্র প্রতিভা ও রবীন্দ্র রচনা আলোচনার নতুন ধারা সৃষ্টি করবে।

এ-প্রবন্ধের লক্ষ্য গ্রন্থটিতে উত্থাপিত সব প্রসঙ্গের আলোচনা নয়, কয়েকটি বিষয় সম্পর্কে সামান্য প্রতিবেদনমাত্র—যা সর্বত্রই প্রশ্ন, কচিৎ পাদপূরণের দুর্বিনয়ও হয়তো বা।

১। রবীন্দ্রনাটকের গড়নের ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করতে শঙ্খ ঘোষ এতো বেশি ব্যস্ত যে বিষয়টিকে বাঙলা নাটকের প্রচলিত ধারার ঐতিহাসিক বিকাশের মাঝখানে দেখাবার জন্য বেশি শব্দ খরচ করতেও চান নি। মুখ-বন্ধের প্রবন্ধটির প্রথম অনুচ্ছেদটুকুতে এটুকু বলেই তিনি ক্ষান্তি দিয়েছেন যে উনিশ শতকের বাঙালি নাট্যকাররা "নতুন পাওয়া বিদেশী আঙ্গিককেই ধরতে চাইছিলেন সবলে। কেবল উপকরণবিন্যাসের জন্য, বৈচিত্র্যইচ্ছায় অথবা কখনো নিছক আত্মরক্ষার প্রয়োজনে তাঁরা হাত বাড়াচ্ছিলেন দেশীয় ঐতিহ্যের দিকে।" এ-বইয়ের পক্ষে এটা যেন একটু বেশি সরলীকরণ হয়ে গেল। নাটকই বোধহয় সাহিত্যের একমাত্র ফর্ম যার উপর জনসাধারণ খুব সরাসরি হাত চালাতে পারে। বাঙলাদেশে নাটকের রূপ বদলেছিল জনরুচির তাগিদে খানিকটা। বিষয়ের সামাজিক আচারের পরিবর্তনের ফলে নয়। ইংরেজি সাহিত্য-সংস্কৃতির সঙ্গে যোগাযোগ শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে একটা নতুন দৃষ্টি দিয়েছিল। তারা তাই পুরনো বিষয়কে

নতুন দৃষ্টিতে দেখছিলেন। এ-ক্ষেত্রে বিষয়টা আগে জন্মায়নি, অথচ শেক্স্পীয়রের ট্রাজেডির ফর্মটা হাতের মধ্যেই পাওয়া গেল। ফলে পুরনো বিষয়ের পাত্রপাত্রীকে নতুন ফর্মে চলাবলা করতে হয়। অথচ যে দর্শকের সামনে নাটকটাকে উপস্থিত করা হচ্ছে বিষয়ের পুরনো সামাজিকতায় সে অভ্যস্ত তো বটেই হয়তো অনেকখানি বিশ্বাসীও। তাই জনা যতই না ম্যাকবেথ বা কোরিওলেনাসের মতো হয়ে উঠুক শেষতর দৃশ্যে তাকে বৈকুণ্ঠে দেখাতেই হয়। কিন্তু এটা শুধু দর্শকের তাগিদে, শঙ্খ ঘোষের ভাষায় "জনরুচিকে কিছু যৌতুক" দেয়া নয়। নাট্যকারও যে বিষয়ের সামাজিকতার অংশ। এলিজাবেথের যুগে নতুন দুনিয়ার দিকে ছুটে যাওয়া বাণিজ্যতরণীর বাতাসে বাঁচা শেক্স্পীয়রের বাঙালি চেলা যে শেষে দক্ষিণেশ্বরে মাথা মোড়ান।

অর্থাৎ উনিশ শতকের বাঙালির নাট্যচেষ্টার ধরনটাই ছিল ইংরেজি নাটকের, ভেতরটা ছিল যাত্রার। এই দ্বিধা বাঙালি নাট্য আন্দোলনের জন্ম লক্ষণ। আর এই দুই উপাদানের দ্বন্দ্ব থেকেই রবীন্দ্রনাটকের জন্ম। তাই রবীন্দ্রনাথের নাটকের ধরনটায় দিশি ভাব আর ভেতরটা আন্তর্জাতিক—উনিশ শতকি বাঙালি নাট্যকারদের একেবারে বিপরীত ব্যাপার। শঙ্খ ঘোষ এই সিদ্ধান্তেই এসেছেন। কিন্তু এই সিদ্ধান্তের পেছনের ঐতিহাসিক শক্তিগুলির দ্বন্দ্ব, বিকাশ, পরিণতি আলোচনা করেন নি।

২। ফলে যে-কোনো বিষয় সম্পর্কেই তিনি যেমন খুঁতখুতে, এই খুব জরুরি ব্যাপারে তাঁর তেমনি যেন তাড়াহুড়ো। ফলে এমন মন্তব্যে আমার মতো হীনবল পাঠককে হোঁচট খেতে হয়—"যাত্রা আর নাটক একটা সময়ে এসে দাঁড়াচ্ছিল প্রতিরোধী প্রতিদ্বন্দ্বী সম্পর্কে।" কোন সময়ের কথা বলছেন তিনি। আঠারো শতকের শেষ ভাগ, নাকি উনিশ শতকের শেষভাগ। নাকি আমাদের সময়ের অভিজ্ঞতাই স্মৃতি হিসেবে প্রক্ষিপ্ত হলো। সময়টা জানা গেলে বোঝা যেত যাত্রা বা নাটক বলতে তিনি কি বোঝাতে চাইছেন। আঠারো শতকের শেষে পুরনো গানসম্বল কৃষ্ণ আর কালী যাত্রার গড়ন বদলানো শুরু হয়। মাত্র ৫০ বছরের মধ্যে ভেঙেচুরে নানা বৈঠকি গানের নাটকের অস্থায়ী সব ধরন তৈরি হয়ে গিয়েছিল। পরে উনিশ শতকের শেষদিকে ইংরেজি কায়দায় বাঙলা নাটকের কাছ থেকে পদ্যসংলাপ, আরো পরে গদ্যসংলাপ নিয়ে নিল। তখন, মানে এখনকারও, যাত্রা আর উনিশ শতকের বাঙালি নাটকের চলনে-বলনে কিন্তু খুব একটা পার্থক্য নেই।

৩। কিন্তু গাননির্ভর কৃষ্ণযাত্রা আর কালীযাত্রার নানা বৈঠকি গানের নাটকের সঙ্গে মিশে যাওয়ার একটা যে ধারা তৈরি হলো তার মধ্যে বিলিতি অপেরাও ছিল। 'নাচ গান নাটক' ও 'নাটকে গান' প্রবন্ধ দুটিতে রবীন্দ্রনাটকের সঙ্গে সেই ধারার সম্পর্ক নিয়ে শঙ্খ ঘোষ যে বিশ্লেষণ করেছেন তার ফলে এই বিষয়গুলি এতদিনে ক্যাটালগি থেকে আলোচনার উপাদানে উন্নীত হলো। সেই বিশ্লেষণ থেকে বেরিয়ে এসেছে রবীন্দ্রনাথের নাটকের মূল কাঠামোটা "সাংগীতিক কাঠামো" আর জীবনের শুরুতে যে গানকে তিনি নাটকের ভাষা হিসেবে খুঁজছিলেন, জীবনের শেষেও সেই গানকেই তিনি নাটকের ভাষা হিসেবে ব্যবহার করলেন। গীতি, গদ্য, পদ্য, নৃত্যনাট্যের নানা ধরনের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাটকের নাট্যমুহূর্ত ও ভাষার সন্ধানের ব্যাপারটা এই প্রথম জানা গেল। শঙ্খ ঘোষ সমগ্রভাবেই নাট্যকার রবীন্দ্রনাথকে উদ্ধার করলেন। কিন্তু এই বিস্তৃত আলোচনাতেও রবীন্দ্রনাথের একেবারে আদিকালের কাব্যনাট্যগুলি সম্পর্কে তিনি কিছু বলেন নি বা রবীন্দ্র নাটকের বিকাশের ধারার সঙ্গে এগুলিকে মেলান নি। শঙ্খ ঘোষ তাঁর আলোচ্যবিষয়ের কোনো প্রসঙ্গই যেখানে বাদ দিতে চান না, সেখানে এই রচনাগুলিকে বাদ দেয়ায় এ-অনুমান হয়তো অসঙ্গত হবে না তিনি এগুলিকে নাটক হিসেবে মেনে নিতে ততটা প্রস্তুত নন।

কিন্তু এগুলিকে নাটকের আলোচনার মধ্যে টেনে না আনলে নাট্যকার হিসেবে রবীন্দ্রনাথের গড়নটা কি ঠিক ধরা পড়বে বা এই প্রশ্নের সদুত্তরই কি মিলবে কেন রবীন্দ্রনাথ সাঙ্গীতিক কাঠামোকেই তাঁর নাটকে বেছে নিলেন।

৪। রবীন্দ্রনাথের নাটক রচনার ক্রম শঙ্খ ঘোষ দেখছেন এইভাবে "গীতিনাটক থেকে মুক্ত হবার প্রাথমিক পদ্ধতি হিসেবে পুরনো প্রথাকেই তিনি বরণ করলেন নাটকে।" পদ্যভাষা কেন গ্রহণ করলেন রবীন্দ্রনাথ, সে-বিষয়ে কতকগুলি ইঙ্গিত দিয়ে শঙ্খ ঘোষ ভাষাব্যবহারের পাঠগত আলোচনায় ঢুকেছেন।

এই আলোচনার বিশদ ও গভীর শেষার্ধের তুলনায় প্রথমার্ধ যে খানিকটা অনুমান নির্ভর ঠেকে তার প্রধান কারণ আদিযুগের এই কাব্যনাট্যগুলিকে প্রসঙ্গে টেনে না-আনা।

শঙ্খ ঘোষের মতো আমারও ধারণা ছিল শেকস্পীয়রীয় ধরনের বাঙলা নাটকের রীতি ('রাজা ও রাণী', 'বিসর্জন') থেকে পদ্য নাটিকা ('চিত্রাঙ্গদা', 'মালিনী'), কাব্যনাট্য ('কাহিনী'), ও দশ বৎসরের নীরবতা পেরিয়ে রবীন্দ্রনাথ

গদ্যনাটককে খুঁজে পেয়েছিলেন। শঙ্খ ঘোষ ধরিয়ে দেবার পর এখন থেকে গীতি ও নৃত্য নাট্যগুলিকেও এই ধারাবাহিকতাতে ভাবব। কিন্তু এখন আমার মনে হয় যে প্রথম ক্রমটি থেকে প্রথমযুগের কাব্যনাট্যগুলি বাদ দেয়া যেতে পারে না। কেন, তা একটু বলছি।

৫। 'ভগ্নহৃদয়', 'রুদ্রচণ্ড', 'প্রকৃতির প্রতিশোধ', 'নলিনী'—এই চারটি রচনার দিকে তাকালে বোঝা যায় সেই ১৮৮১ সাল। রবীন্দ্রনাথের কুড়ি বছর বয়স থেকে হিমালয়-আহ্মদাবাদ-বিলাত-মুসৌরি-চন্দননগর, মাতৃশোক-নতুন বৌঠান-আন্না তড়খর—এই সব অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে একটা এমন লিরিকে তিনি সমাচ্ছন্ন ছিলেন যাকে কোনো এক ধরনের নাট্যআঙ্গিকে ছাড়া আকার দেয়া যাচ্ছিল না। যখন একটা পূর্বনির্দিষ্ট আকার পূর্বনির্দিষ্ট কাহিনী তিনি পেয়ে যাচ্ছিলেন তখন 'বাল্মীকিপ্রতিভা', 'কালমৃগয়া', 'ভানুসিংহের পদাবলী'র মতো সার্থকতা তিনি অনায়াসে আয়ত্ত করে ফেলছিলেন। বিষয়ে তাঁর অভিজ্ঞতা এতটা পরিণত। কিন্তু যখনই গঠন করতে হয়েছে শিল্পের আধার তখনই 'ভগ্নহৃদয়', 'রুদ্রচণ্ড', 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'-এর কাব্যনাট্যে বা 'কবিকাহিনী', 'বনফুল'-এর আখ্যানকাব্যে বা এমন-কি 'নলিনী' গদ্যনাট্যেও তাঁকে মাথা ঠুকতে হয়েছে।

লিরিকের সেই অগ্নিবাষ্পের আলোড়ন নাটকীয়তা চাইছিল তার একটি কারণ নিশ্চয়ই তাঁর নবযৌবনের ভেতরের ব্যাপারটা।

কোনো প্রভাব বা তত্ত্ব তাঁর লিরিক-আবেগকে ঘিরতে পারেনি যখন-ও, প্রিয়তমার আত্মহত্যা আর নতুন বিবাহ জীবন, ব্রাহ্মসমাজ আর জমিদারি—এই দ্বন্দ্ব থেকে উৎসারিত আবেগমুক্তির মাত্র তিরিশ-একতিরিশ বয়স থেকেও যখন তিনি প্রায় একদশক দূরে—তখন, বিহারীলালের সাগরেদি সত্ত্বেও, নাটকীয়তা ছাড়া তাঁর আলোড়িত আবেগ নিশ্চিত হচ্ছিল না, সে আখ্যানকাব্যই হোক আর নাট্যকাব্যই হোক আর গদ্যনাট্যই হোক। (রবীন্দ্রনাথের লিরিকের এই অন্তরশায়ী নাটকীয়তাই তাঁর কবিতাগুলিকে আখ্যান বা চরিত্রের, পরিস্থিতির বা সংলাপের, ক্ষীণতম হলেও, একটা আশ্রয় দেয়।)

এ-কথাটা মনে রেখে যদি তাঁর নাটকের তালিকার দিকে তাকাই তাহলে দেখা যাবে ১৮৮১ থেকে ১৮৯৭ পর্যন্ত এই প্রথম পর্যায়ে 'রাজা ও রাণী' আর 'বিসর্জন' এই তিনি শুধু মাত্র দুবার তখনকার প্রচলিত শেকস্পীয়রীয় ধরনের বাঙলা নাটকের ফর্মকে ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন, তা-ও, এ-দুটির মাঝখানেও,

'চিত্রাঙ্গদা'র নাট্যকাব্যের প্রয়াস ছিল, এ-ছাড়া প্রায় সম্পূর্ণ এই ১৬ বছর ধরে তিনি কাব্যনাট্য আর নাট্যকাব্যের ধরনটাকেই নানাভাবে পরীক্ষা করছিলেন। এটা যদি সত্য হয়, তাহলে শেকস্পীয়রীর ধরণের বাঙলা নাটকের ঢঙে 'রাজা ও রাণী' আর 'বিসর্জন'-এর পর তিনি নাট্যকাব্যের ধরনটাকে ধরেছিলেন এ-সিদ্ধান্ত আর টেঁকে না। তাহলে এই সিদ্ধান্তে আসতেই হবে যে শেক্সপীয়রীয় ধরনের বাঙলা নাটকটাই ছিল এই ১৬ বছর ব্যাপী নাট্যপ্রয়াসে মাত্র দু-বারের একটা ঘটনা। 'রাজা ও রাণী' আর 'বিসর্জন'-এর তথাকথিত মঞ্চসাফল্য ও জনপ্রিয়তাই কি এই রচনা দুটিকে একটু বেশি স্পষ্ট করে তুলেছে।

৬। প্রথম যুগের এই রচনাগুলিকে বিচারে আনার দ্বিতীয় একটি যুক্তি আছে। 'কালের মাত্রা' রচনাটিতে অভিজিৎ প্রসঙ্গে শঙ্খ ঘোষের মনে এসেছে "জয়সিংহের আতুরতা"। নাটকের চরিত্র-সংলাপ-ঘটনার ভেতর থেকে চোখ তুলে একটু ওপর থেকে সবগুলো নাটকের দিকে যদি একসঙ্গে তাকাবার একটা চেষ্টা করা যায় তাহলে দেখা যাবে ১৯০৭ সাল থেকে রচিত নাটকগুলির প্রধান পাত্রপাত্রীরা যে আগে থেকেই অনেকখানি পরিমাণে আবেগগ্রস্ত হয়ে নাটকে প্রবেশ করছে তার মূল নিহিত আছে এই প্রথম যুগের আবেগবিহ্বল গদ্য, পদ্য বা গীতি নাট্যগুলিতে। প্রথম যুগের চরিত্রগুলি প্রেম আর আবেগকে পরিপ্রেক্ষিত থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়েছে, আর ১৯০৭ সালের পরবর্তী নাটকগুলিতে আবেগগ্রস্ততা পরিপ্রেক্ষিতের সঙ্গে অন্বিত হয়েছে। তবু এটা ধরা পড়ে লক্ষেশ্বর, পঞ্চক, অমল, অভিজিৎ, নন্দিনী প্রত্যেকেই নাটক শুরু হবার আগে থেকেই একটা নিজস্ব আবেগের জগতের বাসিন্দে হয়ে আছে। সেই জগতের সঙ্গে পরিপ্রেক্ষিতের অন্বয়ের দ্বন্দ্বটাই নাটকগুলির অন্তরগত দ্বন্দ্ব। —আমার মতো পাঠকের পক্ষে এ-টুকু অনুমান করাটাই দুঃসাহস। তবু শঙ্খ ঘোষের বিচারশক্তি আর দৃষ্টিশক্তি পেলে এটা একটা প্রমাণিত সত্য হয়ে যেতে পারে—এই ভরসা।

৭। প্রথম যুগের এই নাটকগুলিকে আলোচনার অন্তর্গত করার আরো একটি তৃতীয় কারণ আছে। 'নাট্যমুহূর্ত ও ভাষার সন্ধান' রচনাটিতে শঙ্খ ঘোষ এই তথ্য সম্পর্কে আমাদের কৌতূহলী করেছেন যে ইবসেন থেকে শ, সিঙ্গ, মেটারলিঙ্ক পর্যন্ত নাট্যাদর্শের বৈপরীত্য সত্ত্বেও গদ্যই এ-যুগের নাট্যভাষা। "কিন্তু এই সব রচনার প্রায় সমকালে নাট্যভাষা হিসেবে রবীন্দ্রনাথ নির্বাচন করে নিলেন পদ্য।" আবার "গদ্যকে যখন নির্ভরযোগ্য ভাবলেন রবীন্দ্রনাথ,

ইয়োরোপে তখন কাব্যনাট্যের পুনর্জাগরণ।"

উনিশ শতকের শেষ দশক থেকে ইয়োরোপের নাট্যভাষা কি গদ্যই? রূপকথা আর অতীত আখ্যানের ব্যবহারে শঙ্খ ঘোষ কথিত নতুন পুরাণ সৃষ্টির প্রয়াসে যিনি রবীন্দ্রনাথকে মনে এনে দেন সেই হাউপ্টমান তো পদ্যকে আশ্রয় করেছিলেন। আবার বিশ শতকের প্রথম দিকে যখন নাট্যকাব্যের প্রয়াস শুরু হলো তখনো তো চেহভ বা ওনিল গদ্যভাষা ছাড়েন নি।

আসলে ১৮৯০ সালের পর, ইবসেনের তৃতীয় পর্যায়ের নাট্যাবলীর পরবর্তী কালে আর চতুর্থ পর্যায়ের রচনাকালেই, নতুন ধারায় নাট্য আন্দোলন শুরু হয়ে যায়। প্রতীকের ব্যবহারে, নাট্যভাষাকে ত্বরান্বিত করার মধ্য দিয়ে সেই নাট্য আন্দোলন তার ভাষা খুঁজে ফিরছিল।

শঙ্খ ঘোষ যদি ১৮৮১ সাল থেকে রবীন্দ্রনাথকে অনুসরণ করতেন তাহলে হয়তো এই সিদ্ধান্তে পৌছতেন যে চলিত বাঙলা নাটকের ভাষা ছেড়ে এক আবেগে অন্তর্সত্বা নাট্যভাষা তিনি বিশ বছর বয়স থেকেই হাতড়াচ্ছিলেন। 'পথ : প্রতীক ও পটভূমি' বিষয়ক আলোচনায় শঙ্খ ঘোষ 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'-এর প্রসঙ্গ এনে সেই সূত্রে 'বিসর্জন' 'অচলায়তন' আর 'রক্তকরবী' পর্যন্ত পৌছেছেন। সেখানেই তিনি দেখতে পেতেন 'ভগ্নহৃদয়' থেকে 'রক্তকরবী' পর্যন্ত ভাষারও পরিণতির সাধনা চলছে। সেই পরিণতির সাধনায় গদ্য আর পদ্য ব্যাপারটার একটা মূল্য আছে নিশ্চয়ই কিন্তু শুধুমাত্র "গদ্য" আর "পদ্য" বলে উল্লেখ করলে নাট্যভাষার জটিলতাটুকু অনাবশ্যক সরল হয়ে পড়ে।

অর্থাৎ আমি আরো একটা অনুমান করার দুঃসাহস করছি : রবীন্দ্রনাথও এই সময়ে আন্তর্জাতিক নাট্য আন্দোলনের শরিক হিসেবে সেই নাট্যভাষার সন্ধান করছিলেন যা ইবসেনের শেষপর্যায়কে প্রতীকের কাছে এনে দিয়ে বা দৈনন্দিন কথ্যভাষার নিকটতম হওয়া সত্ত্বেও চেহভের নাটককে কাব্য করে তুলে ইয়োরোপের নাটকের উনিশশতকি দায়-দায়িত্ব অস্বীকার করছিল আর বাঙলা নাটককে কৃত্রিম নাট্যভাষা ও নাট্য-সিকোয়েন্সের হাত থেকে বাঁচাচ্ছিল।

শঙ্খ ঘোষের অভিনিবেশ যদি এই অনুমানের উপর পড়ে তাহলে ১৮৮১ থেকে ১৮৯৭ পর্যন্ত রচিত রবীন্দ্রনাটকগুলি নতুন মর্যাদা পেতে পারে ও সেগুলির সঙ্গে ১৯০৭ সালের পর রচিত নাটকগুলির সম্পর্কও প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।

৮। 'বৈকুণ্ঠের খাতা' বা 'হাস্যকৌতুক'র কথা মনে রেখেও শঙ্খ ঘোষ বলেছেন "পরিহাসিকতার নিরাপদভূমি ছেড়ে গদ্যকে এখনো" অর্থাৎ উনিশ শতকের শেষ কাল পর্যন্ত, "রবীন্দ্রনাথ আনতে পারছেন না গূঢ়তর নাট্য প্রয়োজনে।" —এ-সিদ্ধান্তে আমিও একমত। কিন্তু এই প্রহসনগুলি সম্পর্কে আরো একটু বলবার আছে।

উনিশ শতকের পঞ্চাশের দশকে সংস্কৃত আর ইংরেজি আদর্শের মধ্যে বাঙলা নাটক দুলছিল. অথচ তখন থেকেই প্রহসনের ধারায় খাঁটি বাঙালি নাট্যবিষয় তার নাট্য ভাষা নিয়ে তৈরি হচ্ছিল। মধুসূদনের হস্তক্ষেপে ইংরেজি আদর্শ যদি জিতে না যেত আর তারপরই যদি প্রায় সব বাঙালি নাট্যকাররাই রোমান্টিক ট্রাজেডি রচনায় লেগে না যেতেন তাহলে এই প্রহসনের ধারা থেকে সামাজিক বাঙলা নাটকের একটা ধারা যে তৈরি হতে পারত দীনবন্ধুর সাফল্য অন্তত সেই ইঙ্গিতই করছে। একমাত্র প্রহসনগুলোই খাঁটি বাঙালি বিষয় বলেই কি রবীন্দ্রনাথ সেই সময় 'গোড়ায় গলদ', 'বৈকুণ্ঠের খাতা' লিখেছিলেন ও পরবর্তীকালে 'চিরকুমার সভা' 'বাঁশরী'কে তাহলে কি এই ধারাতেই বিচার করা উচিত। রবীন্দ্রনাথের সব নাটকেই যে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ-প্রহসনের একটা অংশ আছে তার কারণ কি এখানেই নিহিত? তাহলে রবীন্দ্রনাট্যভাষায় খাঁটি বাঙালি অন্যান্য উপাদানের মতো এই প্রহসনের ভাষারও কি একটা ভূমিকা আছে?

৯। রবীন্দ্রনাথের নাট্যভাষা বিশ্লেষণ করার সময়ে শঙ্খ ঘোষ "অতি-অলঙ্কৃত" ধরনের ঊর্ধ্বগামিতা, "চাপহীন গদ্যের শিথিলতা", "বিপরীতক্রমে তুচ্ছতা-তুঙ্গতা" ও "ত্বরান্বিত গদ্যের" ছবি এঁকে বলেছেন "সার্থকতার চাবি লুকোনো আছে" শেষতম পথে। এই অতিপ্রয়োজনীয় অথচ এতোকাল উপেক্ষিত বিষয়টিকে আরো একটু বিস্তৃত করার সুযোগ নিয়ে শঙ্খ ঘোষ যদি চেহভের নাটক প্রসঙ্গে স্তানিসলাভস্কি কথিত সাবটেক্স্ট বা উপপাঠের সূত্রটিকে এক্ষেত্রে ব্যবহার করতেন তাহলে রবীন্দ্রনাথের প্রায় সব নাটকেই প্রকৃতিপুঞ্জের যে একটি মুখর অংশ আছে তার ব্যাখ্যা মিলত। সেই সংলাপগুলোতেই তাঁর নাটক চরিত্র বা কাহিনীর বাইরে, মঞ্চের বাইরে একটা বিস্তৃতি পায়। শুধুমাত্র ত্বরান্বিত গদ্যের মানে তারা উতরোবে না অথচ নাটকে গতিসঞ্চারে তাদের ধাক্কাটা নেহাতই প্রয়োজনীয়।

১০। 'কালের যাত্রা' প্রবন্ধটিতে শঙ্খ ঘোষ রবীন্দ্রনাটকে সময়ের ব্যবহার

নিয়ে আলোচনা করেছেন। এ-আলোচনার মূল্য যে কতো বেশি তা মূল প্রবন্ধটি না পড়লে বোঝা যাবে না। কিন্তু নাট্যকালের মুক্তি প্রসঙ্গে আধুনিক নাট্যকারদের বিষয় আলোচনা করতে গিয়ে তিনি সার্ত্রের 'কন্‌ডেমড্ অব আলতোনা' নাটকটিকে একটু ব্যাখ্যা করেই যখন বলেন—"সময়ের দুই চলন একত্র জড়িয়ে সৃষ্টি হয়েছে এক জটিল বিন্যাস...এর মধ্য দিয়ে সার্ত্র বুঝে নিতে চাইছিলেন ব্যক্তি ও তার পরিবেশের ডায়ালেকটিক্‌স—তখন কেমন যেন একটু সন্দেহ হয় নাটকের আঙ্গিকের এই আলোচনায় নাৎসীবাদের শিকার ফ্রান্‌ৎসের কাছে সময়ের অচলতা আর স্বাভাবিক বহতা সময়ের বৈপরীত্যকে কোনো ইতিহাস-নিরপেক্ষতায় নিয়ে যেতে চাইছেন কি তিনি। সার্ত্রর নাটকে সময়ের সমস্যাটা রবীন্দ্রনাটক থেকে একটু ভিন্ন ধরনের নয় কি। প্রিস্ট্‌লের বিখ্যাত 'টাইম-প্লেজ'-এর একবার নামোল্লেখও যে করলেন না শঙ্খ ঘোষ তার কারণ নিশ্চয়ই প্রিস্ট্‌লের সময়ের ব্যবহার নিয়ে নাটুকে পরীক্ষা রবীন্দ্রনাথের নাটকের বিষয়কে বিশেষ দেশকালের গণ্ডি ছাড়িয়ে নিয়ে যাবার মানসিক অভিযানের সঙ্গে তুলনীয় নয়।

মনের দিক থেকে তো রবীন্দ্রনাথ চিরকালই আন্তর্জাতিক আন্দোলনের শরিক, অভিজ্ঞতার দিক থেকে এই সময়ের বিদেশভ্রমণ তাঁকে ইয়োরোপীয় নাট্য আন্দোলনের ঘনিষ্ট করে তুলেছিল। ফলে ১৯২০ সালের পর বিশেষত জার্মানিতেই, নাৎসীবাদের অভ্যুত্থানের আগে, যন্ত্র-যান্ত্রিকতা-সর্বস্ব ধনিক-সভ্যতার বিরুদ্ধে ক্ষোভ নাটকে এক্সপ্রেশনিজম ইম্প্রেশনিজম ইত্যাদি নানা আন্দোলনের জন্ম দিয়েছে—স্বীকৃত সমালোচকদের মতেই তার সামান্য লক্ষণ ন্যাচারালিজমের বিরুদ্ধে "a profound view of life" আর "a different medium of expression". রবীন্দ্রনাথের 'ফাল্গুনী', 'মুক্তধারা', 'রক্তকরবী'র পেছনে এই বিশেষ সময়ের তাগিদটাই ছিল প্রবল। 'কালের যাত্রা' আলোচনা-টির অতুলনীয় ঐশ্বর্য সত্ত্বেও তাই আবার দুঃখ থেকে যায় এমন দুর্লভ সুযোগেও আমার জানা হলো না "যাতে সৃষ্টির সীমা নির্দেশ করে দেয়" সেই দেশ আর কালের কোন অপ্রতিরোধ্য চাপে রবীন্দ্রনাট্য সৃষ্টির সীমা নির্দিষ্ট হলো 'শারদোৎসব' থেকে 'রক্তকরবী'তে।

এই দেশ আর কালে কিভাবে যে একটি বিশেষ সময়ে তাঁর সৃষ্টির সীমা নির্দেশ করেছিল তার পক্ষে সামান্য একটি অনুমান নিবেদন করছি।

'ফাল্গুনী' নাটক কবি রচনা করেন ১৯১৫তে। ১৯১৬ সালের মে মাসে তিনি

জাপান ভ্রমণে রওনা হন। রবীন্দ্রনাথের নাট্যআঙ্গিকের উপর এই ভ্রমণের প্রভাব সম্পর্কে শঙ্খ ঘোষ সিদ্ধান্ত করেছেন, "জাপানের অভিজ্ঞতা রবীন্দ্র-সাহিত্যে উদ্দীপক" "পরবর্তী নাট্যাবলিতে" ('মুক্তধারা', 'রক্তকরবী') "শিল্পীর সচেতন দৃঢ়মনস্কতায় গড়ে নিলেন সংহতি।"

আমি এই সিদ্ধান্তের সঙ্গে একমত। একমত নই জাপানের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে শঙ্খ ঘোষের অভিমত সম্পর্কে। শঙ্খ ঘোষ্ বলছেন জাপানের "জীবন-যাত্রা ও শিল্পনির্মাণের পরিমিত সংযমে" রবীন্দ্রনাথ "গভীর অভিভূত ছিলেন।" আমি অনুমান করি জাপানের সাম্রাজ্যবাদী লোভ, চীনের প্রতি তার ব্যবহার, বর্বর জাতীয়তাবাদ আর তারই বিপরীতে জাপানের "জীবনযাত্রা ও শিল্প-নির্মাণের পরিমিত সংযম" যে-ঐতিহাসিক দ্বন্দ্ব উপস্থিত করেছিল, সেই যাত্রাতেই আমেরিকা সফর জাপানের সেই অভিজ্ঞতাকেই সমর্থন যুগিয়েছিল। দেশের ভেতরেও ১৯১৫ সনে পাওয়া স্যর উপাধি রবীন্দ্রনাথ ১৯১৯ সনেই ফিরিয়ে দিলেন।

অর্থাৎ জঙ্গি জাতীয়তাবাদের লোভের ভিতে দাঁড়ানো দুনিয়া জোড়া একটা যুদ্ধ যে দেড়শ বছর ধরে দেশকালের ক্রমঘনিষ্ঠতার সুযোগে সেই দেশকালকেই হাতের মুঠোয় রাখবার ষড়যন্ত্র আঁটছে আর তা যে ষড়যন্ত্রকে আরো বাড়িয়েই দিচ্ছে, ষড়যন্ত্রকেই মানবনীতির মর্যাদা দিচ্ছে—জাপান আর আমেরিকা ভ্রমণের এই অভিজ্ঞতাই, সনাতন জীবনাদর্শ যা মানবনীতিরই আর এক নাম, জঙ্গি জাতীয়তাবাদী জীবনাদর্শের সঙ্গে দ্বন্দ্বে মেতেছে এই বোধই ১৯১৬ সালের 'ফাল্গুনী'র পথ-ঘাট মাঠ-গুহার চতুর্বিধ দৃশ্যকে ১৯২২-এর 'মুক্তধারা'র পথে বা তারপর 'রক্তকরবী'র জালের বাইরে মিলিয়ে দেয়।

নইলে ব্যাখ্যা করা যাবে না মৌলিক নাট্যরচনায় ১৯১৬ থেকে ২২ এই দ্বিতীয় বিরতিকে—যে-বিরতির উল্লেখ শঙ্খ ঘোষ করেন নি। আমার অনুমানটি শঙ্খ ঘোষের আলোচনার পরিপূরণ হতে পারে মাত্র—এ-কথাটি বাহুল্য হলেও বলে রাখা নিরাপদ। কারণ রবীন্দ্রনাথের মতো শিল্পীর ক্ষেত্রে চর্চিত শিল্পরূপের ফর্ম শিল্পগত ভাবে বিকাশের ব্যাপারটা (যে-ভাবে শঙ্খ ঘোষ দেখেছেন) ও ইতিহাসগত কালের স্বধর্মের দাবি পরস্পর সাপেক্ষ।

'অভিনয়' অংশটিতে শঙ্খ ঘোষ যে-আলোচনা করেছেন সে সম্পর্কে কোনো কথা বলবার বা তুলবার অধিকার আমার নেই। মফঃস্বল বাসের অন্যতম

দুর্ভাগ্যে এই প্রযোজনাগুলি উপযুক্তভাবে দেখতে পাইনি। শঙ্খ ঘোষ নাটকের এ্যাকাডেমিক আলোচনায় অভিনয়কে যে মর্যাদা দিয়েছেন, কোনো যোগ্য সমালোচক সে-বিষয়ে তাঁকে যথার্থ স্বীকৃতি নিশ্চয়ই দেবেন।

শঙ্খ ঘোষ এমন একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন যা আমার মতো দুর্বল ও হীনশক্তি পাঠককেও উত্তেজিত করে ফেলতে পারে। আমরা তো শুধু আশাই করতে পারি শঙ্খ ঘোষ রচনাসংখ্যায় আরো অকৃপণ হন। তাঁর অকৃপণতা আমাদের পক্ষে যেমন আশীর্বাদস্বরূপ, বাঙলা সমালোচনা সাহিত্যের পক্ষেও তেমনি গৌরবজনক।

দুই

শ্রীঅশ্রুকুমার সিকদার রবীন্দ্রনাথের নাটকের বিভিন্ন পরিবর্তনের তুলনামূলক আলোচনার ভিত্তিতে 'রবীন্দ্রনাট্যে রূপান্তর ও ঐক্য' গ্রন্থটি লিখেছেন। রবীন্দ্রনাথের নাটকের নানা রূপান্তর সম্পর্কে এতোদিন আমাদের একমাত্র ভরসা ছিল বিশ্বভারতী প্রকাশিত রচনাবলীর বা বিশেষ সংস্করণের গ্রন্থ-পরিচয় অংশ। অথচ রূপান্তরের ধরন সময় ও বিষয়বিশ্লেষণ ব্যতীত আমাদের পক্ষে ধারণা করাই অসম্ভব তিনি কোন অভিপ্রায় দ্বারা চালিত হচ্ছিলেন. কোন ইষ্ট তাঁর উদ্দিষ্ট ছিল। রবীন্দ্ররচনার ভেরিয়োরাম সংস্করণ প্রকাশের উদ্যোগও কেউ নেন নি। নেবেন, এমন সম্ভাবনাও দেখা যাচ্ছে না। কর্তাদের এমন সমবেত অকর্ম-কে অশ্রুকুমার সিকদার তাঁর নিজের চেষ্টায় শোধরাতে চেয়েছেন। তিনি আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন।

গ্রন্থটিতে দুটি অংশ আছে। ২০৪ পাতা জুড়ে রবীন্দ্রনাটকের নানা রূপান্তরের পরিচ্ছেদে ভাগ করা আলোচনা আর ৫০ পাতার একটু বেশি জুড়ে রবীন্দ্র-নাট্যের ঐক্যসূত্রের অন্বেষণ।

সূচিপত্রের এই বিন্যাস থেকেই বোঝা যাবে রবীন্দ্রনাট্য আলোচকদের কাছে ভবিষ্যতে বইটি কতো জরুরি।

জরুরি এই কারণে যে পাঠান্তরের এমন সঙ্কলন ইতিপূর্বে আর হয় নি। কিন্তু আমার একটু সন্দেহ হচ্ছে লেখক শুধু এই প্রয়োজনীয়তাটুকুই সাধন করতে চান নি। রূপান্তরের কারণও ব্যাখ্যা দেবার অতিরিক্ত দায়িত্বও তিনি স্বীকার করে নিয়েছেন। ফলে বইটিতে একই সঙ্গে রূপান্তরের উদাহরণ ও বিশ্লেষণ

রবীন্দ্রনাট্যে রূপান্তর ও ঐক্য। অশ্রুকুমার সিকদার। গ্রন্থনিলয়। দশ টাকা

জায়গা পেয়েছে। তার ফল সব সময় ভালো হয় নি। দুটোর একটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। লেখক যদি রূপান্তরের উদাহরণ ও পদ্ধতিটুকুই আলোচনা করতেন তাহলে সেই আলোচনা থেকেই রূপান্তরের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের জন্য জরুরি সূত্রটা বেরিয়ে আসত। কিন্তু বর্তমান আলোচনার কোথাও কোথাও তিনি ব্যাখ্যা করে আমাদের সাহায্য করলেও কোনো সামান্যসূত্র তা থেকে বের হয় নি। (চতুর্দশ অধ্যায়েও হয় নি।)

ব্যাখ্যার সূত্র ছাড়া বিশ্লেষণ করতে গেলে ব্যাপারটা কি দাঁড়ায় এর একটা উদাহরণ দিচ্ছি। 'শেষের রাত্রি' গল্প আর 'গৃহপ্রবেশ' নাটকের সংলাপের তুলনীয় অংশ উদ্ধার করে অশ্রুকুমার সিকদার "একটি দুটি বাক্যে"র বর্জন বা "উচ্চারণ সৌকর্য" বা "কবিত্বের স্পর্শ" বা "মূল রচনার সংলাপ অংশের বিস্তার" ইত্যাদি দেখিয়েছেন। ফলে তাঁর নজর এড়িয়ে গেছে নাটকে ডাক্তারের মতো তৃতীয় ব্যক্তির উল্লেখমাত্র নেই আর মাসি তাঁর দ্বিতীয় সংলাপেই একটা আয়রনি সঞ্চার করে দিতে পেরেছেন—যার জোরে মণির "নিজের অধিকার সম্বন্ধে" সচেতনতা ও "মাসির মিনতি"ও নাটকীয় সংঘাতের বিষয় হয়ে গেছে।

রূপান্তরের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে অশ্রুকুমার সিকদার যখন বলেন "মুক্তধারার রণজিৎ ও বিভূতি একত্রে প্রায়শ্চিত্তের প্রতাপ" তখন বাক্যটির গঠন অন্যরকম হলেই মানাত ভালো ('প্রায়শ্চিত্ত'-এর প্রতাপ 'মুক্তধারা'য় রণজিৎ ও বিভূতি — এ-কথা ভেবেও চমকিত হই এই ইশারায় যে আসলে কি সাম্রাজ্যবাদের বেয়নেটের মাথায় উড্ডীন শিল্পবিপ্লবের গৌরব পতাকা— ভারতের ব্রিটিশ শাসনের এই চেহারাটা বোঝাবার চেষ্টাই চরিত্রকে ভাঙছে আর জুড়ছে আর ভাঙছে আর জুড়ছে। ঠিক তেমনি মনে হয়, 'প্রায়শ্চিত্ত'-এ যার পূর্বাভাসও ছিল না সেই শিক্ষার দৃশ্যটি 'মুক্তধারা'য় জুড়ে দেবার পেছনে অশ্রুকুমার সিকদার কথিত কারণগুলির সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদী শিক্ষার আসল অভিজ্ঞতার তাড়া ছিল। ইতিহাসকে অশ্রুকুমার সিকদার রূপান্তর ব্যাখ্যার সূত্র হিসেবে ব্যবহার করেন নি বলেই 'প্রায়শ্চিত্ত' ও 'মুক্তধারা'র একটি বিশেষ অংশের সংলাপ তাঁর কাছে মনে হয়েছে "প্রায় অপরিবর্তিত", "মুক্তধারার এই সংলাপ প্রায়শ্চিত্তের সংলাপেরই প্রায় অবিকৃত রূপ" (পৃঃ ৫৩-৫৪)। অথচ এই অংশেই বৈরাগী 'প্রায়শ্চিত্ত'-এ বলছে "আমাদের ক্ষুধার অন্ন তোমার নয়" আর 'মুক্তধারা'য় তার সঙ্গে যোগ করছে "আমার উদ্বৃত্ত অন্ন তোমার, ক্ষুধার অন্ন তোমার নয়।" প্রথম মহাযুদ্ধের অভিজ্ঞতা, উদ্বৃত্ত অন্নের

অধিকার নিয়ে ব্যক্তি আর সমাজের নব কুরুক্ষেত্রের লোকশ্রুতি ছাড়া বৈরাগীর মুখ দিয়ে 'মুক্তধারা'য় কি অবধারিত ঐ অংশটি বেরতে পারত।

'রাজা' থেকে 'অরূপরতনে'-র পেছনে অশ্রুকুমার সিকদার একটি কারণের উল্লেখ করেছেন — "সংক্ষিপ্ত অভিনয়যোগ্য রূপ" (৬১ পৃষ্ঠা)-এর প্রয়োজন। 'রাজা'র দৃশ্যগুলি কি ভাবে 'অরূপরতন'-এর দৃশ্যে পরিণত হয়েছে তারও একটা তালিকা তিনি দিয়েছেন। এই "পুনর্বিন্যাস কি শুধুমাত্রই অধিকতর রূপকপ্রবণতার দিকে নজর রেখে" করা? একটা কারণ এটা তো বটেই। আরো একটা কারণ বোধহয় এই যে রাজা সর্বাতিশায়ী ও সর্বব্যাপ্ত ছিলেন, 'অরূপরতন'-এ সুদর্শনার সঙ্গে সম্পর্কটাই তার প্রধান কেন্দ্র। তাই জনতার বা গানের দলের বা মেয়েদের কথাবার্তায় 'রাজা'তে যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হতে পেরেছে 'অরূপরতন'-এ তা পুষিয়ে দিতেই ভাষার স্পন্দন দ্রুততর।

এই প্রসঙ্গেই বলে রাখা ভালো 'রাজা' নাটকের পরবর্তী রূপান্তর 'শাপমোচন' গদ্যকবিতা ও 'কথিকা'র ভাষাগত যে-আলোচনা (৬৭ পৃষ্ঠা) অশ্রুকুমার সিকদার করেছেন তা আমি ভালো বুঝে উঠতে পারি নি। 'শাপমোচন' গদ্যকবিতার পর্ব যেমন করে তাঁর কানে ধরা পড়েছে তেমনি করে 'কথিকা'র গদ্যের পর্বভাগও কি ধরা পড়তে পারে না, বা রবীন্দ্রনাথের প্রায় যে-কোনো গদ্যরচনার। মনে হয় ঠিক এভাবে বুঝি কবিতা ও 'কথিকাটি'র পার্থক্য ধরা যাবে না। যেমন এই একই প্রসঙ্গে ৬৮ পৃষ্ঠায় একটি স্তবকের তুলনামূলক আলোচনা করতে গিয়ে লেখক উত্তম ও প্রথম পুরুষের ব্যবহার পর্যন্ত উল্লেখ করেছেন, "দেখা যায়" ক্রিয়াপদটির ধ্বনিসাম্য কী ভাবে রক্ষিত হয়েছে তাও বলেছেন — কিন্তু দৃষ্টান্ত-অলঙ্কারের আড়াল দেয়া কবিতার দুটি স্বতন্ত্র বাক্য 'কথিকা'য় কী অবলীলায় একবাক্যে ক্ষিপ্র নিদর্শনা হয়ে ওঠে আর শেষে উৎপ্রেক্ষার চমক আনে সেটি তিনি ব্যাখ্যা করেন নি।

তার কারণ আলোচনার মেথডটা আগে ঠিক হয়নি। তাই রূপান্তরের উদাহরণ আছে কিন্তু রূপান্তরের ফলে সামগ্রিক আঙ্গিকের কী পরিবর্তনটা ঘটল তা সমালোচক আলোচনা করেন নি। তাতে আমাদের কতকগুলি জিজ্ঞাসার উত্তর পাব আশা সৃষ্টি হয়, কিন্তু উত্তর মেলে না।

চতুর্দশ অধ্যায়ে লেখক রূপান্তরের সূত্রের সন্ধান করেছেন বটে কিন্তু সেখানে নাটকের সমগ্রতা নিয়ে আলোচনা করে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন বলেই স্বতন্ত্র নাটকগুলির বিশ্লেষণের ওপর তার একটা গভীর প্রভাব পড়ে নি।

বিভিন্ন আলোচনা থেকে পৌছানো সিদ্ধান্তের বদলে ওখানে আমরা অন্ত্য পরিচ্ছেদগুলির সংক্ষিপ্তসার পাই। রূপান্তরের ফলে "পরবর্তীরূপে আকারগত পুনর্বিন্যাস এবং সংক্ষিপ্তির ফলে এসেছে ঘনত্ব এবং সংহতি, ফলে পরবর্তী রূপে আঙ্গিকগত উন্নতি ঘটেছে নিঃসন্দেহে।" বা "রবীন্দ্রনাট্যের রূপান্তরের অর্থ, পরবর্তীরূপে রূপক বা প্রতীকধর্মের, তাত্ত্বিকতার, বিমূর্ততার প্রাধান্য লাভ" — এই ধরনের সিদ্ধান্ত অশ্রুকুমার সিকদারের এতো তথ্য ও ব্যাখ্যা সমৃদ্ধ বইয়ের পক্ষে একটু সরল। আমরা বরং চাইছিলাম প্রতিটি নাটকের প্রতিটি রূপান্তরের বিষয় ও আঙ্গিক ব্যবহারের পার্থক্যের বিশ্লেষণ থেকে কোনো সিদ্ধান্তের দিকে আমাদের তিনি উন্মুখ করে দেবেন।

তাঁর গ্রন্থটি পাঠ করে অশেষ উপকৃত আমি আজ নিঃসন্দেহ হয়েছি ছাত্র-পাঠ্যতার চৌহদ্দি পেরিয়ে রবীন্দ্র সাহিত্য আলোচনা তাঁদেরই হাতে সাবালকতা পাবে। পাবেই।

সার্থক জনম মাগো

নবারুণ ভট্টাচার্য

অনেকক্ষণ সিগারেট না খেলে মুখটা কেমন টক টক লাগে। কাঠের পুল পার হয়েই বাস স্টপের কাছের পানের দোকান থেকে সে একটা চারমিনার কিনল। তারপর দড়িটা থেকে ধরাল। দুটো ফুলকি উড়ে যেতে দেখল আর মুখটা তুলে ধোঁয়া ছাড়তেই চোখ পড়ল বিরাট কৃষ্ণচূড়ার আকাশ ঢাকা মাথায়। এই গাছটাকে সে অনেকবার দেখেছে। বৃষ্টি পড়লেই কেন জানিনা গাছটার কথা মনে পড়ে। রুক্ষ লালচে একমাথা চুল ভিজছে। গত রাত্তিরে ভালো ঘুম হয়নি। কারণ একই ঘরে অন্য বিছানায় দাদা সারারাত কেশেছে। গত বছর নিউমোনিয়া হয়েছিল। জ্বর কমে যাবার পর দেখা গেল দুটো হাত উঠছে না, গেলাস ধরতে পারছে না। হাতদুটো দিন দিন সরু হয়ে যাচ্ছে। গত দু-মাস ধরে দাদাকে রোজ সকালবেলা হাসপাতালে নিয়ে যেতে হয়। ওখানে ওরা ইলেকট্রিক শক দেয়। দিনচারেক যাওয়া হয়নি। অল্প অল্প জ্বর আর কাশি। তার ওপর শহরতলীর যা অবস্থা।

রায়দের ইঁট-সুরকির দোকানের সামনে বাঁশের ওপর দরমার গায়ে পার্টির কাগজ লাগানো আছে। একবার দাঁড়িয়ে দেখল। ফুলের মালা গলায় একটা লোকের ছবি। তার পাশে আরো কয়েকজনের মুখ। লোকটা হাসছে। জেল থেকে ছাড়া পেয়েছে। নিচে আর একটা ছবি, মিছিলের। ছাপার কালি কম-বেশি হয়ে গেছে। ধ্যাবড়া ধ্যাবড়া মুখ। ফেস্টুনটার ওপরে কি লেখা তাও পড়া যাচ্ছে না। আর পড়তে ভালো লাগল না। সামনের দিকে হাঁটতে লাগল। ছায়াটা সামনে রাস্তায় লুটোচ্ছে। ইস্কুলের গলির মোড়ে একটা ভ্যান দাঁড়িয়ে। ফুটবল মাঠে গত পরশুদিন সকালে বিনয়বাবুর ছেলে যতীনের লাশ পাওয়া গেছে। স্ট্যাব করে রাত্তিরে ফেলে দিয়ে গেছে। হিমে পড়ে থাকার জন্যে জামাটা নাকি সপসপে ভিজে ছিল। সে ভাবল, যতীনকে সে কতটা চিনত? বন্ধুকে লোকে যতটা চেনে। কারা মেরেছে কিছুতেই ভেবে পায় না। নিজের পার্টি মারলে ও জানতে পারত। নিজের পার্টির সব খবরই ওর জানা। পয়সা

তোলার ক-টা টিন থেকে ক-খানা পাইপগান—সবকিছু। যতীনকে কারা মারল তবে ? কেন ?

পুলিশভ্যানটা একদম চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। ভ্যানটার সামনে বাঁদিকের দরজাটা খোলা। বাইরে পা-দানির ওপর বুট পরা পা বার করে একটা সার্জেন্ট খবরের কাগজ পড়ছে। বেল্টের সঙ্গে ঝোলানো রিভলভার। পেছনের জানালা দিয়ে একটা বন্দুকের নল আকাশের দিকে বেরিয়ে আছে। কয়েকটা শুকনো মেঘ। রাস্তায় শুকনো ধুলো। দু-একটা মাছি বসে আছে রোদ্দুরে, ওর পা দুটো এগিয়ে যেতে উড়ে গেল। সিগারেটের শেষের দিকে তামাকটা হু হু করে জ্বলে যায়। কৃষ্ণচূড়া গাছের উল্টোদিকে যতীনদের পার্টি অফিস। তালা লাগানো। এখানেও একটা দরজার ওপর ওদের কাগজ লাগানো আছে। ভালো করে আঠা লাগায়নি বলে ওপরের কোণটা খুলে লটকে রয়েছে। ওর একটু মজা লাগল। রাস্তাটা বড় খালি খালি। ধারে সাইকেল-রিক্সাগুলো দাঁড় করানো আছে। কৃষ্ণচূড়ার নিচে চায়ের দোকানের গায়ে একটা সাইকেল দেখল। অজয়দার সাইকেল। অজয়দা ওকে ডাকল।

—"খোকন, তর দাদায় কেমন আছে রে ?"

—"ভালই।"

—"আইজ একবার সন্ধ্যাকালে পার্টি অফিসে আসিস, কাম আছে।"

অজয়দা সাইকেল চালাতে শুরু করেই হঠাৎ পা বাড়িয়ে সাইকেল থামিয়ে দেন।

—"আর শোন, যতীনের বদলা হিসাবে অরাও একটা ধান্দায় আছে। সাবধানে থাকিস।"

অজয়দার সাইকেল তর তর করে চলে গেল। ফাঁকা রাস্তায় বেল বাজাবার দরকার হয় না। কলোনির দিক থেকে বেলের শব্দ ভেসে এল।

বদলা ? রেশন অফিসের দেওয়াল জুড়ে বিরাট পোস্টার "কমরেড যতীন সরকারের হত্যার বদলা আমরা নেবোই।" ও একবার তাকাল। ওদের পার্টির কাউকেই সকাল থেকে চোখে পড়েনি। যতীন তারও বন্ধু ছিল। এই তো সেদিন দাদাকে দেখতে এসেছিল। যাবার সময় বলে গেল হাসিমুখে—"তগো পার্টিতে এইবার টাটা-বিড়লা জয়েন দিব রে খোকন।"

—"কেন ? তগো পোলিটবুরোতে আর রাখবি না ?"

সেই শেষ দেখা। যতীনের নামে এখন কত পোস্টার, কত ভয়। যারা

চিনত না তারাও জেনে গেল। নিজেই দেখে যেতে পারল না।

রাস্তায় শুকনো কাদার ওপর জিপের চাকার খোবলানো দাগ। আজকাল খুব পুলিশ যাতায়াত করছে। গতকাল বাজারের মোড়ে পুলিশ পিকেটের ওপর বোমা পড়ে, পুলিশ দু-রাউণ্ড গুলিও চালিয়েছে। বড় অস্থির সময়। রোজ শালা একটা না একটা কিছু লেগেই আছে। দোকান-পত্তর খোলার কোনো ঠিক নেই। একবার ভাবল মিঠুদের বাড়িটা ঘুরে যাবে, বলে যাবে পড়াতে আসবে না। আবার মনে হলো, থাকুক। মিঠুকে দেখতে ওর একটু ইচ্ছে করল, আর সেই সঙ্গে একটু লজ্জাও লাগল। না গেলেই বুঝতে পারবে কোন কারণে আসেনি। মিঠুর মা দাদার কথা রোজ জিজ্ঞেস করে! দাদাই তো আগে মিঠুকে পড়াত। দাদাটার কথা ভাবলেই বুকের মধ্যে ভারী ভারী ঠেকে। হাতদুটো পড়ে যাবার পর থেকে কথা বলাও কেমন থামিয়ে দিয়েছে। সারাক্ষণ ছাতের বা দেওয়ালের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। সকালবেলা হাসপাতালে যাবার সময় হাতদুটো বুকের কাছে জড়ো করে একটা চাদর দিয়ে জড়িয়ে ঝুলিয়ে বেঁধে দেয়। দাদাকে সবাই ভালোবাসত। মা বলে—"ভাল যে, হে-ই শুইয়া থাকলো। আর এইডার মুখখান একবার দেখ—কি? না পার্টি করে! পার্টি করে! উড়নবাইড়্যা ছাওয়াল, তরে দিয়া পার্টির কি হইব?" ডাক্তার বলে ভালো ভালো জিনিস খেতে দিতে। কোথা থেকে আনবে ভালো ভালো জিনিস? অথচ বাজারে, দোকানে, থরে থরে সাজানো আছে। স্টেশনে, বাসে, ট্রামে সব জায়গায় বিজ্ঞাপন। পাঁউরুটি, মাখন, দুধ, ওষুধ—কত রকমের ছবি! বুক ভরা শুকনো ধোঁয়া। নিজের হাতদুটো দাদার মতো সরু সরু না হলেও কেমন পিছমোড়া করে বাঁধা আছে। একটা বিরাট আগুন জ্বলে উঠতে পারে না? বাতাসে ছাই উড়ছে। চিতাভস্ম। মনে পড়ে অনেক দিন আগে স্বচক্ষে দেখা একটা ঘটনা। কলোনিতে একটা লোক তিনমাস ছাঁটাই হয়ে থাকার পর নিজের দুটো বাচ্চাকে বিষ দিয়েছিল। বৌটা আগেই পালিয়ে গিয়েছিল। বাচ্চা দুটোকে আবছা দেখা যায়। মুখের কষ বেয়ে নীলচে ফেনা, আর শক্ত হয়ে গিয়েছিল। লোকটাকে যখন পুলিশ ঘর থেকে টেনে বার করল তখন সে হা হা করে হাসছিল। এক বুড়ো স্টেশনে লেভেল ক্রসিং-এর কাছে ইঁদুর-আরশোলা মারা বিষ বিক্রি করে। খিনখিনে গলায় একটানা চেঁচিয়ে যায়—"খাবে মরবে, খাবে মরবে, খাবে মরবে···।" চিৎকারটা শুনলেই বাচ্চা দুটো ভেসে ওঠে। লোকটার জেল হয়ে গিয়েছিল। অন্ধকার

গরাদের আড়ালে বোধহয় এখনো সে বীভৎস গলায় হাসছে। স্পষ্ট শোনা যায়।

মাথা নিচু করে চলতে চলতে দোকানটা ও ভুল করে ছাড়িয়ে যাচ্ছিল। দোকানটা বন্ধ। দোকানের রকে ডুটো লোক ঘুমোচ্ছে। বড় গরম। ড্রেন দিয়ে কালো জল ভেসে যাচ্ছে, আর জমাট কালো শ্যাওলা। সেই দিকে কিছুক্ষণ চুপ করে তাকিয়ে থাকল। নিশ্বাস থমকে থাকে কিছুক্ষণ। যতীনটা···

সন্ধ্যেবেলা পার্টি অফিসে যাবার সময় বাজারের বড় ওষুধের দোকানে একবার খোঁজ নেবে ঠিক করল। কি কাজ জানা নেই, তাড়াতাড়ি শেষ হলে মিঠুদের বাড়িটাও একবার ঘুরে যাওয়া যাবে। খুব ক্ষিদে পেয়েছে। তবু একটু ভালো লাগছে। ফিরে যেতে ভালো লাগছে। সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে।

উঃ কি রোদ্দুর! ঘামে শার্টটা ভিজে পিঠে আটকে যাচ্ছে। পুজোর আগে যে করে হোক একটা চটি কিনতে হবে। জিভটা শুকনো। পাশ দিয়ে একটা সাইকেল গেল। লোকটা সাদা জামা পরা। সন্ধ্যেবেলা মিঠুকে দেখলেই সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে। কেমন করে?

কাঠের পুলে উঠতে নিজের পায়ের শব্দটা জোরে বাজে। জলে স্রোত আছে, খুব কম। ঘোলা জলে রোদ্দুর চিকমিক করছে। কানা খাল।

এত রোদ্দুরে লোহার রেলিং-এ হেলান দিয়ে কারা দাঁড়িয়ে? এগিয়ে যেতেই রাস্তা আড়াল করে তিনটে ছেলে দাঁড়ায়। রোদ্দুর আছড়াচ্ছে মাথার ওপর। কাঠের পুলটা দুলছে। তিনজন একটু এগিয়ে আসে। মুখোমুখি। তিনজন পকেটে হাত দেওয়া, আর ও একা। দাঁত দিয়ে অসম্ভব ভয়টাকে আটকে রাখা যায় না।

—"যাইতে দে লক্ষ্মণ, ভাল হইব না"

—"যতীনরে একা পাইয়া খুব মারলি"

—"আমি মারি নাই"

—"তুই না মারস, তর পার্টি মারছে"

পার্টি? সামনের রোদ্দুরের মধ্যে একটা ঝিলিক দেখা যায়। হাতদুটো নিজের অজান্তেই খালি পকেটের দিকে ছিটকে যায়। হাতদুটো সরু সরু আর পিছমোড়া করে বাঁধা।

আ —া —া —া —

পেটের এ-পাশ থেকে ও-পাশ একবারে টেনে দিয়েছে। সমস্ত শরীরে ধাতব মৃত্যুর স্বাদ। রক্তমাখা একটা চিৎকার আকাশে লাফিয়ে ওঠে। দেহটাকে

রেলিং টপকে কারা জলের মধ্যে ছুঁড়ে দেয়। দৌড়বার শব্দ অস্পষ্ট হয়ে যায়। কাঠের পুলটা দুলছে। ঘোলাজল বিচিত্র লাল হয়ে যায়। অনেক তরঙ্গ বৃত্ত আলোগুলোকে ছুঁতে ছুঁতে মিলিয়ে গেল।

একটি মানুষের দেহে পাঁচ লিটারের কিছু বেশি রক্ত থাকে। বিকেলের আগে তারই কিছু চিহ্ন লোকে কাঠের পুলের ওপর দেখেছিল। একটু ক্ষণের মধ্যেই দেখা গেল নিচের জলে উপুড় হয়ে ভাসছে। কচুরিপানা আর পঞ্চাননের মন্দিরের ভেসে আসা ফুলের মধ্যে। বাঁশ দিয়ে ঠেলে ঠেলে লাশটাকে ধারে আনে পুলিশ। কাঠের পুল, খালপাড় ভেঙে পড়ল লোকে।

পরদিন সকাল বেলাই সবাই দেখল রেশন অফিস, ইস্কুলের পাঁচিল, বাজার সব পোস্টারে পোস্টারে ছেয়ে গেছে।

"কমরেড খোকন দাসের হত্যার জবাব নয়, বদলা চাই"।

যারা চিনত না, তারাও জেনে গেল! নিজেই শুধু দেখে গেল না।

ভারতে কৃষি-অর্থনীতির বিবর্তনের সমস্যা প্রসঙ্গে

রণজিৎ দাশগুপ্ত

শারদীয় 'পরিচয়'-এ শ্রীকল্যাণ দত্তর 'ভারতে কৃষি-অর্থনীতির বিবর্তনের সমস্যা' শীর্ষক নিবন্ধটি পড়লাম। তিনি যে আমার 'অর্থনৈতিক বিবর্তনের সমস্যাবলী : ভারত-বিষয়ক আলোচনা' বইটি মনোযোগের সঙ্গে পড়ে তার অন্যতম একটি দিক নিয়ে বিশদ আলোচনা করেছেন এজন্য আমি তাঁর কাছে ব্যক্তিগতভাবে কৃতজ্ঞ।

তবে কল্যাণবাবু শুধু আমার নয়, ভারতের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতিতে যাঁরা আগ্রহান্বিত তাঁদের সকলেরই বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র। স্বাধীনতা-উত্তর ভারতে সামাজিক-রাজনৈতিক পরিবর্তনের প্রকৃতি বিচারে এবং বিপ্লবী সংগ্রামের পরিপ্রেক্ষিত নির্ণয়ে মার্কসবাদী মহলে গুরুতর রকমের মতভেদ, বিতর্ক ও বিভ্রান্তি রয়েছে। এই অবস্থায় কল্যাণবাবু মার্কসীয় দৃষ্টিকোণ থেকে কৃষি-অর্থনীতির প্রসঙ্গে এমন কতকগুলি বিষয়ের অবতারণা করেছেন যা শুধু কৃষি-অর্থনীতির নয়, সমগ্রভাবে ভারতীয় অর্থনীতিরই সুষ্ঠু মূল্যায়নের প্রসঙ্গে খুবই মূল্যবান। আর এই-জাতীয় আলোচনায় মার্কসীয় চিন্তাধারা ও বিশ্লেষণ-পদ্ধতিকে ব্যবহার ও প্রয়োগ করলে আমরা যে খুবই লাভবান হতে পারি সেটাও তাঁর রচনা থেকে স্পষ্ট।

আমি নিজের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সজাগ থেকেও বইটি লেখার কাজে হাত দিতে সাহসী হয়েছিলাম এই কথা ভেবে যে এটি এ-বিষয়ে আলোচনা, আরও চর্চা, অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ, তর্ক-বিতর্ক ও মতামত বিনিময়কে উদ্দীপিত করবে। এরকম আশা করাটা যে অযৌক্তিক হয়নি শ্রীকল্যাণ দত্তর লেখা তার প্রমাণ। এই সঙ্গে একথাও নিশ্চিতভাবে আশা করা যায় যে, এই সব আলোচনা আমাদের চিন্তা-ভাবনার ক্ষেত্রে আরও নির্দিষ্টতা ও স্বচ্ছতা এনে দেওয়ার ব্যাপারে খুবই সহায়ক হবে।

২। বাস্তবিকপক্ষে কল্যাণবাবু আমার কাজের কয়েকটি ত্রুটিকে খুব যুক্তিসঙ্গতভাবেই দেখিয়ে দিয়েছেন। এক, আমার বইতে Otrabotki প্রথার বিষয়ে

লেনিন যা বলেছেন তার কোনো উল্লেখ নেই এবং হাল-বলদ ও চাষের অন্যান্য উপকরণের মালিক এমন বর্গাদার ও কোনো উৎপাদন-উপকরণেরই মালিক নয় এমন বর্গাদার—এ-দুয়ের মধ্যে তাৎপর্যপূর্ণ পার্থক্যকে না দেখিয়ে একাকার করে দেখানো হয়েছে।

দুই, খাদ্যশস্য দাদন দেওয়ার ফলে বাজার সঙ্কুচিত হচ্ছে—আমার এই বক্তব্য সম্পর্কেও কল্যাণবাবুর সমালোচনা ন্যায়সঙ্গত।

তিন, লেনিনের বক্তব্য উদ্ধৃত করে তিনি ভোগের পরিমাণ আর ক্রয়ের পরিমাণের মধ্যে যে-পার্থক্যের কথা বলেছেন, তাও আমার কাছে গ্রহণযোগ্য।

চার, তাঁর মূল বক্তব্যের সঙ্গে সম্পূর্ণ দ্বিমত পোষণ করা সত্ত্বেও আমার পক্ষ থেকে একথা অবশ্যস্বীকার্য যে, ভারতীয় কৃষিতে ধনতান্ত্রিক বিকাশের মাত্রা ও গুরুত্ব আমার লেখায় যথোপযুক্ত স্বীকৃতি পায়নি।

৩। কিন্তু কল্যাণ দত্ত তাঁর প্রবন্ধে যে মূল অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বক্তব্য উপস্থিত করেছেন তার সঙ্গে আমার মতভেদ মূলগত প্রকৃতির। তিনি মার্কস ও লেনিনের উদ্ধৃতির সাহায্যে ও নানা তথ্য সংগ্রহ করে যে-সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন তার সারকথা হলো, এদেশের কৃষি-অর্থনীতিতে ধনতান্ত্রিক বিকাশ শুধু যে ঘটছে তা নয়, সে-বিকাশ কার্যত ঘটে গেছে। প্রবন্ধটির গোড়ার দিকে তিনি অবশ্য সতর্কতার সঙ্গে বলেছেন "...এখনও বলার সময় হয়নি যে ভারত পুরোপুরি একটা পুঁজিতান্ত্রিক দেশে পরিণত হয়েছে।" কিন্তু তিনি আসলে যে-কথা প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন তা হলো এর বিপরীত অর্থাৎ ধন-তান্ত্রিক বিকাশ মূলত সম্পূর্ণ হয়েছে। বাস্তবিকপক্ষে তাঁর বাইশ পৃষ্ঠার প্রবন্ধে প্রাক-ধনতান্ত্রিক শোষণের অর্থাৎ সামন্ততান্ত্রিক ও আধা-সামন্ততান্ত্রিক ব্যাপারী ও মহাজনী শোষণের অবশেষগুলির কোনো তাৎপর্যের স্বীকৃতি তো দূরের কথা **এরকম অবশেষ যে আদৌ রয়েছে তার সামান্যতম উল্লেখও নেই।** বস্তুতপক্ষে এঙ্গেলসের অনুসরণ করে বলা যেতে পারে, কল্যাণবাবুর ভুল হচ্ছে এই যে, তিনি 'historical tendency' অর্থাৎ এক্ষেত্রে ধনতান্ত্রিক বিকাশের প্রবণতা আর 'accomplished fact' অর্থাৎ এই প্রবণতার সম্পূর্ণ পরিণতিলাভ —এ-দুয়ের মধ্যে যে গুরুত্বপূর্ণ সীমারেখা রয়েছে তা লক্ষ্য না করে এদের গুলিয়ে ফেলেছেন। ভারতের কৃষি-অর্থনীতি যে বর্তমানে একটি পরিবর্তনশীল বা transitional পর্যায়ে রয়েছে তারও কোনো পরিচয় তাঁর লেখায় নেই।

৪। শুধু তাই নয়, কল্যাণবাবু যে-বক্তব্যটিকে খণ্ডন করতে চেয়েছেন তা

হলো, ভারতের কৃষিতে ধনতন্ত্রের কোনো বিকাশ ঘটছে না; এখানে প্রাক্-ধনতান্ত্রিক সম্পর্ক, বিশেষত সামন্ততান্ত্রিক শোষণ অক্ষুন্ন রয়েছে, এমন কি তা শক্তিশালী হচ্ছে। কিন্তু সুস্পষ্টভাবেই আমি বলতে চাই যে, এটি অন্য কারুর বক্তব্য হতে পারে, তবে অন্তত আমার নয়। আমি সবিনয়ে উল্লেখ করতে চাই যে, কল্যাণবাবু আমার বক্তব্যকে যথাযথভাবে উপস্থিত করেননি। এ-কারণেই আমার মূল ব্যক্তব্যটিকে সংক্ষিপ্ত আকারে 'পরিচয়'-এর পাঠকদের কাছে পেশ করার প্রয়োজন আমি বিশেষভাবে বোধ করছি।

আমার মূল বক্তব্যটি তাহলে কি? ভারতের সামাজিক-অর্থনৈতিক পরিস্থিতি একটি পরিবর্তন প্রক্রিয়ার বা Transition-এর মধ্যে দিয়ে চলেছে। স্পষ্ট করে বলা যেতে পারে যে, আধা-ঔপনিবেশিক, প্রাক-ধনতান্ত্রিক অর্থনীতি থেকে ধনতান্ত্রিক অর্থনীতিতে উত্তরণের স্তরে ভারত রয়েছে এবং এই উত্তরণ প্রক্রিয়া এখনও তার পরিণতি লাভ করতে পারেনি। সমগ্রভাবে ভারতীয় অর্থনীতির ক্ষেত্রে মজুরী-শ্রম শোষণের ভিত্তিতে ধনতান্ত্রিক উৎপাদন বন্দোবস্ত এখনও তার সম্পূর্ণ আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়নি। সে-কারণেই ভারতীয় অর্থনীতির বর্তমান অসুবিধা ও সঙ্কটকে ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-বন্দোবস্তের সঙ্কট বলে অভিহিত করা যায় না। বাস্তবিকপক্ষে যে-সঙ্কট আমরা প্রত্যক্ষ করছি তা হলো পশ্চাৎপদতা থেকে উত্তরণ প্রক্রিয়াজাত সঙ্কট, তবে এই উত্তরণ ঘটছে ধনতান্ত্রিক বিকাশের পথে।

তবে, ধনতান্ত্রিক বিকাশ ঘটছে শুধু এইটুকু বলা যথেষ্ট নয়। কল্যাণবাবু অবশ্য কেবলমাত্র এইটুকুই বলেছেন। কিন্তু ভারতে ধনতন্ত্রের বিকাশ প্রাক-ধনতান্ত্রিক সম্পর্ক ও সামন্ততন্ত্রকে কি আংশিকভাবে ক্ষুণ্ন করছে, না, পুরোপুরি ভেঙে ফেলছে? ধনতন্ত্রের বিকাশ কি যথেষ্ট প্রবল, দ্রুত ও সতেজভাবে চলছে? এখানে ধনতান্ত্রিক বিকাশের নিজস্ব কোনো বৈশিষ্ট্য রয়েছে কি? ধনতান্ত্রিক সম্পর্কের বিকাশের পাশাপাশি প্রাক-ধনতান্ত্রিক সম্পর্ক বা তার অবশেষ টিকে থাকছে না তো, এবং তা টিকে থাকলে ধনতান্ত্রিক বিকাশকে কতটা ও কিভাবে প্রভাবিত করছে? এসব প্রশ্নের জবাব দেওয়ার ব্যাপারে মার্কস কথিত ধনতান্ত্রিক বিকাশের 'দুই পথ' সংক্রান্ত তত্ত্ব বিশেষ সহায়ক। মার্কসের তত্ত্বটি কি? ব্রিটেনে ধনতন্ত্রের বিকাশ আলোচনা প্রসঙ্গে মার্কস 'ক্যাপিটাল'-এর তৃতীয় ভল্যুমে সিদ্ধান্ত করেছেন: "The transition from feudal mode of production is two fold. The producer becomes merchant

and capitalist·· .This is the really revolutionary way. Or else, the merchant establishes direct sway over production....This system presents everywhere an obstacle to the real capitalist mode of production...without revolutionizing the mode of production, it only worsens the condition of the direct producers, turns them into the wage-workers and proletarians under conditions worse than those under the immediate control of capital, and appropriates their surplus labour on the basis of the old mode of production".

প্রথম পথের অর্থ হচ্ছে প্রাক-ধনতান্ত্রিক সামাজিক-অর্থনৈতিক রূপগুলির forms) ও বণিক্রী অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণের সম্পূর্ণ অবসান কিংবা চূড়ান্ত ধ্বংস সাধন এবং শিল্প-পুঁজি কর্তৃক মজুরি-শ্রম শোষণের ভিত্তিতে ধনতান্ত্রিক উৎপাদন বন্দোবস্তের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা।

আর দ্বিতীয় পথের সারকথা হচ্ছে শোষণের অর্থাৎ উদ্বৃত্ত শ্রম আত্মসাৎ করার একাধিক রূপ ও পদ্ধতির সংমিশ্রণ। এগুলি হলো: (ক) অর্থনীতি বহির্ভূত অর্থাৎ সামাজিক-রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতা ও জবরদস্তি প্রয়োগ করে absolute rent আদায়ের সামন্ততান্ত্রিক পদ্ধতি, (খ) profit-on-alienation অর্থাৎ উৎপাদন প্রক্রিয়ার বাইরে, পণ্য ও অর্থ সঞ্চালন প্রক্রিয়ার ভিতরে বাজার, দাম ও ঋণদান ব্যবস্থার নানা মারপ্যাঁচ কষে বণিকী (mercantile) ও মহাজনী (usurious) শোষণ, এবং (গ) উদ্বৃত্ত মূল্য আত্মসাৎ করার ধনতান্ত্রিক রূপ। এই দ্বিতীয় পথে ধনতান্ত্রিক বিকাশের অন্তর্বস্তু হলো উদ্বৃত্ত শ্রম আহরণের এই তিনটি রূপের সঙ্গে জড়িত স্বার্থসমূহের প্রতিক্রিয়াশীল মৈত্রীবন্ধন।

প্রথম পথের, নিচের থেকে উৎপাদক-মালিকদের উদ্যোগে প্রাক ধনতান্ত্রিক সম্পর্ক ও একচেটিয়া বণিকদের আধিপত্যের বিরুদ্ধে একেবারে গোড়া ঘেঁষে বুর্জোয়া বিপ্লব এবং এরই সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত রাজনৈতিক গণতন্ত্রের বিকাশের দৃষ্টান্ত ব্রিটেন, ফ্রান্স ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। আর প্রাক-ধনতান্ত্রিক সম্পর্ককে অংশত বজায় রেখে, তার সঙ্গে আপস করে, উপর থেকে একচেটিয়া বণিকদের উদ্যোগে শিল্পের বিস্তার ও সামন্ত-জমিদারদের ধনতান্ত্রিক জমিদারে রূপান্তরের এবং প্রথম পথের তুলনায় অনেক বেশি মন্থর, যন্ত্রণাদায়ক, স্বৈরাচারী ও প্রতিক্রিয়াশীল এই দ্বিতীয় পথে ধনতান্ত্রিক বিকাশের দৃষ্টান্ত মেইজি বিপ্লব

পরবর্তী জাপান, বিসমার্কের জার্মানি ও স্টালিনের রাশিয়া। আমাদের দেশের ধনতান্ত্রিক বিকাশের ক্ষেত্রেও এই দ্বিতীয় পথের অনেক লক্ষণ ও উপাদান প্রবলভাবেই বর্তমান।

৬। অবশ্য এই দ্বিতীয় পথের লক্ষণ ও বৈশিষ্ট্য সব দেশে হুবহু এক নয়—কেননা এগুলি নির্ভর করে সে-দেশের নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক পরিস্থিতির উপর। তাই ভারতের ক্ষেত্রে যা লক্ষণীয় তা হলো যে উপরে উল্লিখিত তিনটি শোষণ-রূপের সঙ্গে চতুর্থ আর একটি রূপ—পরিণত ধনতান্ত্রিক অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদী বা নয়া ঔপনিবেশিক শোষণ যুক্ত হয়েছে। এই দৃষ্টিকোণ থেকেই ভারতের বর্তমান সামাজিক-অর্থনৈতিক পরিস্থিতির সামান্যীকরণ করে আমার বইতে বলা হয়েছে, "The socio-economic situation contains an amalgam of pre-capitalist—semi-feudal and mercantile-usurious—, capitalist, and mature or highest stage of capitalist (i.e.imperialist) methods of exploitation. At the same time, the interests and forces corresponding to the pre-capitalist and mature capitalist methods of exploitation on the one hand and the capitalist on the other are struggling to establish their respective supremacy over the socio-economic life of the country. Planning has strengthened some of these forces, given birth to new types of privileged interests and intensified the clash of interests . In the process new alliances are being forged and wider social conflicts are arising. The resultant is the collapse of the capitalist path of development leading to acute tension and cleavages as well as political instability within the Indian society." (পৃষ্ঠা ১১৩)। অর্থনৈতিক বিকাশের এই জটিল প্রক্রিয়াটির বিশদ আলোচনা ও নানা দিক থেকে বিশ্লেষণের চেষ্টা করা হয়েছে আমার বইতে।

৭। উপরে উল্লিখিত এই দৃষ্টিভঙ্গী থেকে ভারতে কৃষি-অর্থনীতিরও বিবর্তনের প্রকৃতিকে বোঝার ও বিশ্লেষণের চেষ্টা করা হয়েছে। কল্যাণবাবুর লেখাতে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে যে আমি কৃষিতে ধনতান্ত্রিক বিকাশ যে ঘটছে তা সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছি। কিন্তু এ-রকম অস্বীকৃতির প্রশ্ন আদপেই

ওঠে না এই কারণে যে আমার বিবেচনায় কৃষিতেও প্রধানত 'দ্বিতীয় পথে' বা লেনিন কথিত 'প্রুশীয় পথে' অর্থনৈতিক বিবর্তন ঘটছে। কিন্তু 'দ্বিতীয় পথ' বা 'প্রুশীয় পথ' তো ধনতান্ত্রিক বিকাশেরই পথ, এই পথের অর্থ তো কখনোই প্রাক-ধনতান্ত্রিক ও সামন্ততান্ত্রিক সম্পর্কের প্রাধান্য অক্ষুন্ন থাকা কিংবা সাধারণভাবে আরও শক্তিশালী হওয়া নয়। তবে ভারতের বিশিষ্ট পরিস্থিতিতে **এই 'দ্বিতীয় পথে' ধনতান্ত্রিক বিকাশের অন্তর্বস্তু হলো প্রাক-ধনতান্ত্রিক সম্পর্কের নানা অবশেষে—সামন্ততান্ত্রিক ভূমি-সম্পর্কের ব্যাপক ও শক্তিশালী অবশেষ এবং ব্যাপারী ও মহাজনী শোষণ পদ্ধতি—এবং প্রসারমান ধনতান্ত্রিক সম্পর্কের সংমিশ্রণ**। কল্যাণবাবু মনে হয় 'দ্বিতীয় পথ'-এর এই অর্থটিই ধরতে পারেন নি। আর তার ফলেই তিনি কৃষির ক্ষেত্রে পরিবর্তন সম্পর্কে আমার বক্তব্যকে বুঝতে পারেননি।

কংগ্রেস সরকার কর্তৃক অনুসৃত কৃষিনীতি ও তার পরিণাম সম্পর্কে আমার বইতে আসলে কি বলা হয়েছে? বিভ্রান্তি নিরসনের জন্য উদ্ধৃতি দেওয়াই ভালো। "It turned out to be a programme for capitalist evolution on the basis of utmost preservation of landlord economies, tenant farming and rackrenting—a reactionary, conservative programme resembling, to an extent, the Stolypin programme. The result has been the retardation of the development of the productive forces and multiplication of misery for the bulk of rural population" (পৃষ্ঠা ১২৫)। কল্যাণবাবু আমার বক্তব্যকে যেভাবে উপস্থিত করেছেন ও তার যে-ধরনের ব্যাখ্যা পেশ করেছেন একেবারে সেই বিষয়েই সতর্কতা জানিয়ে বইতে লেখা হয়েছে, "The preceding analysis may convey the idea that during the post-independence period only the pre-capitalist relations have extended and been strengthened. But that would be a wrong understanding. In the specific Indian situation while the pre-capitalist mode of production persists widely and powerfully, capitalist mode of production employing hired labour is also emerging and expanding" (পৃঃ ১৪৭)। দ্ব্যর্থহীন ভাষায় আমার এই বক্তব্যের পটভূমিতে কল্যাণবাবুর কাছে আমি বিনীতভাবে এই

প্রশ্ন করতে চাই যে, তিনি যে-বক্তব্যটিকে আমার বলে খাড়া করেছেন ও খণ্ডন করেছেন সেটি কি অন্য কারুর নয় বা তাঁর মনগড়া নয়?

বাস্তবিক পক্ষে একথাও আমার বইতে উল্লিখিত হয়েছে যে স্বাধীনতাপূর্ব কালেই গ্রামাঞ্চলে ধনতান্ত্রিক সম্পর্কের বিকাশ ঘটতে শুরু করে। তবে সে-বিকাশ ছিল খুবই ধীরগতিতে এবং মাত্র কয়েকটি অঞ্চলে সীমাবদ্ধ (পৃষ্ঠা ১৪৭)। কিন্তু স্বাধীনতা পরবর্তী কালে, বিশেষত পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা শুরুর সময় থেকে, সরকারী নীতির দৌলতে এবং বাস্তব সামাজিক-অর্থ নৈতিক শক্তির চাপে এই ধনতান্ত্রিক বিকাশ নানা সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও ব্যাপকতর হয়েছে, দ্রুততর হয়েছে (পৃষ্ঠা ১৪৮)। সপ্তম অধ্যায়ের চতুর্থ অংশের (পৃষ্ঠা ১৪৬-১৫৯) শিরোনামাই হলো 'A Modern Evil: Capitalist Farming'। গত কয়েক বছরে অনুসৃত নয়া কৃষি-রণনীতি বা 'সবুজ বিপ্লব' কৃষি-ধনতন্ত্রের এই বিকাশকেই সাহায্য করছে (পৃষ্ঠা ১৫৭-১৫৯)।

৮। কিন্তু গ্রামাঞ্চলে অর্থনৈতিক পরিবর্তনের direction বা ঝোঁকটা ধনতান্ত্রিক বিকাশের দিকে—শুধু এইটুকু বলা মোটেই যথেষ্ট নয় এবং সঠিকও নয়। এই ধরনের সিদ্ধান্ত আমাদের দেশের গ্রামাঞ্চলের বিচিত্র ও জটিল শ্রেণী-সম্পর্ককে ও শ্রেণীসংগ্রামের বিকাশকে যথাযথভাবে বুঝতে একেবারেই সাহায্য করে না। বরং তাতে একপেশে ও স্বভাবতই ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হয়।

কল্যাণবাবু অবশ্য তাঁর একপেশে অভিমতের সমর্থনে বলেছেন যে "natural economy এ দেশে নেই" এবং অন্য অর্থনীতির ব্যাপক প্রসার ঘটেছে। কিন্তু এই বক্তব্যের প্রাসঙ্গিকতা কোথায় তা আমি বুঝতে পারছি না। ভারতে natural economy অটুট রয়েছে এটা কারুর বক্তব্য বলে আমার জানা নেই। আমার বইতে তো একাধিক জায়গায় "monetisation and commercialisation of agriculture"-এর কথা উল্লেখ করা হয়েছে (পৃষ্ঠা ৩৬, ১৪৭, ১৫৯-১৬০ ইত্যাদি)।

অবশ্য কল্যাণবাবুর বিচারে natural economyর ভাঙন ও মুদ্রা ও পণ্য অর্থনীতির বিস্তৃতি এবং ধনতন্ত্রের বিকাশ সমার্থক। কিন্তু সব ক্ষেত্রে এই দুটি প্রক্রিয়া যে একই সঙ্গে চলে না এবং ক্ষেত্রবিশেষে মুদ্রা-অর্থনীতি ও বাজারের জন্য উৎপাদনের প্রসার যে প্রাক-ধনতান্ত্রিক সম্পর্ককে শক্তিশালী করতেও সাহায্য করে এমন কথা মার্কস ও এঙ্গেলস একাধিক জায়গায় বলেছেন (Capital, Vol. III, পৃঃ ৩২২)। এ-বিষয়ে সব থেকে উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত হলো

পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষদিকে পূর্ব-ইয়োরোপে বাজারের জন্য উৎপাদনের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গেই সামন্ততন্ত্রের পুনরুজ্জীবন—এঙ্গেলস একে অভিহিত করেছিলেন 'second serfdom' বা 'দ্বিতীয় ভূমিদাসপ্রথা' হিসেবে (The Peasant War in Germany গ্রন্থে On the History of the Russian Peasantry শীর্ষক রচনা, পৃঃ ১৮৩-১৮৫ ; মার্কসের নিকট এঙ্গেলস কর্তৃক লিখিত পত্র, ডিসেম্বর ১৫ ও ১৬, ১৮৮২, পৃষ্ঠা ২০৩-২০৫ ; এ-বিষয়ে আরও দ্রষ্টব্য মরিস ডবের Studies in the Development of Capitalism, পৃষ্ঠা ৩৮-৪২। আমার বইতেও এ-বিষয়ে কিছু সাক্ষ্য পেশ করা হয়েছে—পৃষ্ঠা ৭-৮)।

৯। তবে কল্যাণবাবুর প্রশ্ন হলো, natural economy ভেঙে গিয়ে থাকলে প্রাক-ধনতান্ত্রিক ও সামন্ততান্ত্রিক শোষণ কেমন করে ঘটতে পারে ? কিন্তু একথা তো তিনি জানেন যে, সামন্তশোষণ যে ঘটে তার শুধু অর্থনৈতিক কারণ নেই **—এটা ঘটতে পারে মার্কস-এঙ্গেলস-লেনিনের বিশ্লেষণ অনুসারে জমির ওপর ব্যক্তিগত একচেটিয়া মালিকানার সুযোগে extra-economic coercion বা অর্থনীতি-বহির্ভূত বাধ্যবাধকতার জোরে।** কল্যাণবাবুর মতে "ভারতে এই ধরণের উৎপীড়ন বহুলাংশে…কমে গেছে। এই অবস্থায় জমির মালিক ও ধনী কৃষকদের শোষণ চালানোর কেবলমাত্র একটি উপায়ঃ তা হলো কৃষকদের জমি ও উৎপাদনের উপকরণ থেকে বঞ্চিত করে তাদের শ্রমক্ষমতা বিক্রি করতে বাধ্য করা। Extra economic coercion নেই…" (শারদীয় 'পরিচয়', পৃষ্ঠা ৮৯)।

কল্যাণবাবুর এবম্বিধ মতামত পড়ে বিস্মিত হচ্ছি। উপরোক্ত উদ্ধৃতিটুকুর মধ্যেই পরস্পর বিরোধিতা লক্ষণীয়। একবার তিনি বলছেন, সামাজিক-রাজনৈতিক উৎপীড়ন কমে গেছে। পরমুহূর্তেই বলছেন, এরকম উৎপীড়ন নেই এবং সুতরাং শোষণ চালানোর একটিমাত্র উপায়—ধনতান্ত্রিক উপায়—রয়েছে। আমার বক্তব্য হলঃ

(ক) আনুষ্ঠানিকভাবে আইনের চোখে শ্রমজীবী কৃষক রাজনৈতিক-সামাজিক অধিকার থেকে বঞ্চিত নয়।

(খ) সামাজিক-রাজনৈতিক উৎপীড়ন বা extra-economic coercion অনেক পরিমাণে কমে গেলেও এখনও দেশের অনেক অঞ্চলে ব্যাপকভাবে রয়ে গেছে।

(গ) এই extra-economic coercion বা অর্থনীতি বহির্ভূত জবরদস্তি

প্রধানত তিনটি কারণে সম্ভবপর হচ্ছে। (১) কৃষিসংস্কার সংক্রান্ত নানা আইনকানুন সত্ত্বেও ভূস্বামী বা জমিদার ও জমির বড় বড় মালিকদের **কৃষি উৎপাদনের অন্যতম প্রধান উপকরণ জমির ওপর একচেটিয়া মালিকানা এখনও বর্তমান।** (২) **ভারতের কৃষি-অর্থনীতি হচ্ছে labour surplus economy** এবং ফলস্বরূপ গ্রামাঞ্চলের গরিব জনসাধারণ ব্যাপক বেকারীতে জর্জরিত। স্বভাবতই প্রতিযোগিতামূলক ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির, যা হচ্ছে 'ক্যাপিটাল'-এর প্রথম ভল্যুমের মডেল, অর্থনৈতিক নিয়মগুলি এখানে যথাযথভাবে কাজ করতে পারে না। বাস্তবিকপক্ষে এমন অর্থনীতিতে শ্রমজীবি কৃষকদের আয় ধনতন্ত্রের অর্থনৈতিক নিয়মের দ্বারা পুরোপুরি নির্ধারিত হয় না। এমন কি কৃষি-শ্রমিক বা গ্রামীণ সর্বহারার মজুরীও পুরোপুরি এই নিয়ম অনুসারে স্থির হয় না। বহু বছর ধরে চলে আসা প্রথা বা custom, ভূস্বামী ও জমির বড় বড় মালিকদের খেয়াল-খুশি ও সামাজিক-রাজনৈতিক চাপ ইত্যাদির দ্বারা শ্রমজীবী কৃষকদের আয় এবং ক্ষেত মজুরদের মজুরী বেশ কিছু পরিমাণে নির্ধারিত হয়। অবশ্য ভুল ধারণা এড়ানোর জন্য একথাও বলা প্রয়োজন যে, এই labour surplus economy এবং ব্যাপক গ্রামীণ বেকারী ধনতান্ত্রিক সম্পর্ক বিকাশেরও ভিত্তি। **গ্রামীণ জনসাধারণের, বিশেষত শ্রমজীবী কৃষকদের ও কৃষি-শ্রমিকদের একটা বিরাট অংশই নাগরিক অধিকার থেকে বঞ্চিত।** গ্রামাঞ্চলের সামাজিক পরিস্থিতির এটা তো একটা বিশেষ উল্লেখযোগ্য দিক যে, একদিকে জমির বৃহৎ মালিক ও কায়েমী স্বার্থগোষ্ঠীর অধিকাংশই হলো তথাকথিত উচ্চবর্ণভুক্ত, আর অন্যদিকে ভাগচাষী, গরিব চাষী, inferior tenant বা স্বত্বহীন প্রজা ও ক্ষেতমজুরদের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ হচ্ছে তফশীলী জাতি ও উপজাতি গোষ্ঠীগুলির অন্তর্ভুক্ত (এ প্রসঙ্গে আমার বইয়ের ১৪৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। আইনের চোখে এদের formal বা আনুষ্ঠানিক অবস্থান যাই হোক না কেন কার্যত ও সারবস্তুর দিক দিয়ে এরা এখনও সম্পূর্ণ না হলেও যথেষ্ট পরিমাণে সামাজিক-রাজনৈতিক অধিকার থেকে বঞ্চিত। বর্বরতম পন্থার অস্পৃশ্যতা, নিষ্ঠুর নির্যাতন এমন কি সরাসরি হত্যার নানা কাহিনী খবরের কাগজের পাতায় হামেশাই চোখে পড়ে। **এদের এই নিম্ন সামাজিক অবস্থাই extra-economic coercion বা অর্থনীতি-বহির্ভূত বাধ্যবাধকতার জোরে শোষণকে সম্ভবপর করে তুলছে।**

এইসব কারণের ফলে সামন্ততান্ত্রিক ও আধা-সামন্ততান্ত্রিক শোষণের দিন এখনও শেষ হয়ে যায়নি, তার নানা অবশেষ এখনও বর্তমান। জমিদার ও জমির বৃহৎ মালিকেরা জমির ওপর একচেটিয়া মালিকানার সুযোগে ছোট ছোট চাষীদের নিজস্ব যন্ত্রপাতি দিয়ে নানা পদ্ধতিতে জমি চাষ করিয়ে নিচ্ছে এবং বাড়তি শ্রম নিংড়ে নিচ্ছে। ঋণের দায়ে বাঁধা থাকা বা ঋণ-দাসত্ব, বাধ্যতামূলক মজুরি খাটা, বেগার প্রথা, ভাগচাষী ও অন্যান্য স্বত্বহীন প্রজা ও স্বেচ্ছাধীন প্রজাদের (tanants-at-will) নিজেদের যন্ত্রপাতি দিয়ে জমি চাষ ইত্যাদি সবই হলো প্রাক-ধনতান্ত্রিক শোষণের — শ্রম খাজনা, ফসলে খাজনা ও টাকায় খাজনা আত্মসাৎ করার — ভগ্নাবশেষের নানা রূপ। ভাগচাষী ও অন্যান্য স্বত্বহীন চাষীরা অবশ্য আইনগত দিক দিয়ে জমির সঙ্গে বাঁধা নয়। কিন্তু জমির ওপর একচেটিয়া মালিকানা, প্রচণ্ড বেকারী এবং নিম্ন সামাজিক অবস্থানের দরুন এরা ইচ্ছামত জমি ছেড়ে যেতে পারে না, বা বলা যেতে পারে, কার্যত এরা জমির সঙ্গেই বাঁধা।

উপরে উল্লিখিত পরিস্থিতির পটভূমিতে আমি মোটের উপরে যা বলতে চাই তা হচ্ছেঃ কল্যাণবাবু উল্লিখিত শোষণের উপায় অর্থাৎ ধনতান্ত্রিক শোষণ পদ্ধতি বর্তমানে কৃষিক্ষেত্রের অন্যতম শোষণ পদ্ধতি এবং এই পদ্ধতিতে শোষণ প্রসারমান। কিন্তু শোষণের 'কেবলমাত্র একটি উপায়' রয়েছে—এ-কথা সম্পূর্ণ ভুল। **ধনতান্ত্রিক শোষণের পাশাপাশি সামন্ততান্ত্রিক ও আধা-সামন্ততান্ত্রিক শোষণ চলছে এবং তা ধনতন্ত্রের বিকাশকে ব্যাহতও করছে।**

কল্যাণবাবু যথার্থই বলেছেন যে, খাজনায় জমি বিলি করা মাত্রই সামন্ত শোষণের নিদর্শন নয়। কিন্তু এ-কথাটি আমার বইতেও কোনো অস্পষ্টতার আভাস না রেখেই বলা হয়েছে (পৃষ্ঠা ১৩৯)। শুধু তাই নয়, বাস্তবে ধনতান্ত্রিক অর্থেও জমি লীজে বিলি করা হচ্ছে। কিন্তু তাই বলে ভারতে সামন্ততান্ত্রিক অর্থে খাজনায় জমি বিলি-বন্দোবস্তের যে অতি শক্তিশালী ও ব্যাপক অবশেষ রয়ে গেছে তা কেমন করে অস্বীকার করা চলে? (এ-বিষয়ে আমার বই-এর সপ্তম অধ্যায়ে ১৩৫-১৪৬ পৃষ্ঠায়, বিশেষত 'Tenant Farming ; Feudal and Capitalist Categories' ও 'Prevalence of Rack-renting of Feudal Variety' শীর্ষক অংশগুলিতে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে)। কল্যাণবাবু ঠিকই দেখিয়েছেন যে, যারা খাজনায় জমির বন্দোবস্ত বা লীজ নিচ্ছে তারা অনেকেই বেশি জমির মালিক এবং নিজেদের operational area বাড়ানোটা

এদের উদ্দেশ্য। কিন্তু লীজ নিচ্ছে এমন কৃষকদের মধ্যে এদের অনুপাত কতটুকু? ১৯৬১ সেন্সাস রিপোর্ট অনুসারে মোট tenancyর শতকরা ৮২ ভাগই হলো এমন প্রজা যাদের গণ্য করা হয় inferior tenant হিসেবে—ভাগচাষী উঠ্‌বন্দী প্রজা ইত্যাদি হরেক রকমের স্বত্বহীন প্রজা হিসেবে। এদের যে capitalist tenant হিসেবে গণ্য করা যায় না তা খুবই স্পষ্ট।

কিন্তু এদের সবাইকে কি গ্রামীণ সর্বহারার অংশ বলে গণ্য করা যায়? এই সব বর্গাদার ও স্বত্বহীন প্রজাদের একাংশ সব রকমের উৎপাদন-উপকরণের মালিকানা থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত এবং এদের সঙ্গে গ্রামীণ সর্বহারার সারবস্তুগত পার্থক্য কম। কিন্তু এই সঙ্গে এ-কথাও অনস্বীকার্য যে, দেশের অনেক অঞ্চলেই বর্গাদার ও স্বত্বহীন প্রজাদের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ কিছু-না-কিছু উৎপাদন-উপকরণের—চাষের যন্ত্রপাতি, লাঙ্গল, বলদ ইত্যাদির মালিক। আর otrabotki প্রথা সম্পর্কে লেনিনের রচনা থেকে কল্যাণবাবু যে-অংশটুকু তুলে দিয়েছেন সেই উদ্ধৃতি অনুসারে এ-কথা কি অস্বীকার করা চলে যে শেষোক্ত ধরনের ব্যবস্থা সামন্ততান্ত্রিক শোষণেরই অঙ্গ? বস্তুতপক্ষে, 'প্রচ্ছন্ন প্রজাস্বত্ব'কে হিসেবের মধ্যে নিলে এমন অনুমান করার মতো তথ্য রয়েছে যে এখনও সমস্ত চাষযোগ্য জমির শতকরা ৩৫-৪০ ভাগ কোনো-না-কোনো ধরনের আধা-সামন্ততান্ত্রিক ভূমি-সম্পর্কের আওতায় রয়ে গেছে (পৃষ্ঠা ১৩৫-১৩৭)।

১০। উপরে যা বলা হলো তার অর্থ এই নয় যে, গ্রামীণ অর্থনীতি অপরিবর্তিত রয়ে যাচ্ছে। আগেই বলা হয়েছে, ধনতান্ত্রিক সম্পর্কের বিকাশ সন্দেহাতীতভাবে ঘটছে, প্রাক্‌স্বাধীনতা পর্বের তুলনায় অনেক দ্রুত তালে। এই বিকাশের প্রকৃতি সম্পর্কে ইতিপূর্বে যা বলা হয়েছে তার সঙ্গে আরও একটি তাৎপর্যপূর্ণ বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা দরকার।

সেটি হলো যে **কৃষি-অর্থনীতিতে যে-সব ধনতান্ত্রিক উপাদান ও অংশ নজরে পড়ে তাদের সকলে একই গোত্রভুক্ত নয়**। এদের মধ্যে একটি অংশ হলো ধনতান্ত্রিক জমিদারে রূপান্তরিত পূর্বতন সামন্ততান্ত্রিক ও আধা-সামন্ততান্ত্রিক জমিদার। ধনী চাষীদের অনেকেও এই ধনতান্ত্রিক জমিদারের স্তরে উন্নীত হয়েছে। বিরাট বিরাট খামারের মালিক এইসব ধনতান্ত্রিক জমিদার মজুর লাগিয়ে, ট্রাক্টর দিয়ে চাষ করে, পুঁজি খাটায়, তদারকি করে—কিন্তু নিজেরা কখনোই ব্যক্তিগতভাবে সরাসরি বা প্রত্যক্ষভাবে চাষবাসের কাজে অংশ নেয় না। এদেরই নিকট গোত্রের হলো বিড়লাদের মতো একচেটিয়া ধনিক যারা

কৃষি-অর্থনীতিতে অনুপ্রবেশ করছে। বীজ খামার, ফলের বাগান, আঙুরের ক্ষেত—এইসব হলো এদের অনুপ্রবেশের বিশেষ রূপ। আর এইসব জমিদার (সামন্ততান্ত্রিক ও ধনতান্ত্রিক উভয়বিধই) এবং একচেটিয়া ও বৃহৎ ধনিকদের মধ্যে এক মৈত্রী গড়ে উঠেছে। বলা যেতে পারে যে এরা সকলে মিলে লেনিন উল্লিখিত প্রুশীয় বা য়ুঙ্কার পথের প্রতিনিধি (পৃষ্ঠা ১৪৮)।

এই সঙ্গেই লক্ষণীয় হলো যে একটা ধনী চাষীর স্তরও বিকাশ লাভ করেছে ও করছে। সম্পন্ন চাষী, স্বত্ববান রায়তী চাষী, এমন কি মধ্য-চাষীদেরও মধ্যে থেকে এদের উদ্ভব। কংগ্রেস সরকারের ভূমি-সংস্কারের ফলে এই অংশ বিশেষ-ভাবে লাভবান হয়েছে—এদের জমির একটা বড় অংশই এসেছে প্রাক্তন মধ্য-স্বত্বাধিকারীদের কাছ থেকে। এই ধনী চাষীগোষ্ঠী পুঁজি লগ্নী করে, উৎপাদনের দায়িত্ব ও ঝুঁকি বহন করে, চাষের জন্য মজুরীভিত্তিক শ্রমের উপর বহুল পরিমাণে নির্ভর করে, আবার নিজেরাও প্রত্যক্ষভাবে কৃষিশ্রমে বা চাষের কাজে অংশ নেয়। উৎপন্ন ফসলে এদের সারা বৎসর শুধু চলে যায় তাই নয়, বিক্রয়যোগ্য উদ্বৃত্ত ফসলের একটা বড় অংশ এদের কাছ থেকেই আসে। এ-কথা বললে বোধহয় ভুল হবে না, এই ধনী চাষীগোষ্ঠীর বিকাশ মার্কস কথিত প্রথম পথে ধনতান্ত্রিক বিকাশের নিদর্শন। স্পষ্টতই আমাদের দেশের গ্রামাঞ্চলে একই সঙ্গে দুই ধনতান্ত্রিক সম্পর্কের বিকাশ ঘটছে।

১১। এইসব ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ভিন্ন রয়েছে নানা অংশে বিভক্ত অধন-তান্ত্রিক শ্রমজীবী কৃষক সমাজ। এরই একটি স্তর হচ্ছে বহুবিস্তৃত বৃহৎকলেবর মধ্যচাষী গোষ্ঠী। এরা এদের জমি চাষের জন্য মজুরীভিত্তিক শ্রমের উপর কিছু পরিমাণে নির্ভর করলেও প্রধানত নিজস্ব যন্ত্রপাতি দিয়ে নিজ শ্রমেই এরা চাষ-বাস করে থাকে। বাজারে বিক্রির উদ্দেশ্যে এরা উৎপাদন করে, কিন্তু এরা স্বচ্ছল নয়, পুঁজি বিনিয়োগের উপযোগী যথেষ্ট উদ্বৃত্ত এদের থাকে না। এই মধ্য-কৃষকদের অর্থনীতি নিঃসন্দেহেই সঙ্কটগ্রস্ত। কিন্তু তার মানে এই নয় যে এই মধ্য-কৃষক অর্থনীতি বিলুপ্তির পথে। এখন পর্যন্ত এই মধ্য-কৃষকরা গ্রামীণ সমাজের একটি বড় অংশ। গোটা দেশের হিসেবে মোটামুটিভাবে ৫ একরের বেশি কিন্তু ১০ একরের কম জমির মালিক পরিবারগুলিকে মাঝারি চাষী পরিবার হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে। আর এ-তথ্যটি যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ যে জাতীয় নমুনা সমীক্ষার সপ্তদশ পর্যায়ের সমীক্ষা (১৯৫৯-৬১) অনুসারে এই ধরনের পরিবার হলো জমির মালিক পরিবারগুলির ১৯·৮০ শতাংশ।

এ-ছাড়া রয়েছে ৫ একরের কম জমির মালিক যাদের গরিব চাষী হিসেবে গণ্য করা যায়। এরা নিজস্ব যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামের সাহায্যে পুরোপুরি নিজস্ব শ্রমে চাষ করে। চাষবাসের উপকরণ, গৃহস্থালির সরঞ্জাম ও অন্যান্য নানা সামগ্রী কেনার তাগিদে উৎপাদনের একটা বড় অংশ এরা পণ্য হিসেবে বিক্রি করে, আবার নিজেদের খাদ্যের প্রয়োজনের একটা অংশ কিনে মেটায়। এই গরিব চাষীরা হলো জমির মালিক পরিবারগুলির ৬১.৬৯ শতাংশ।

কল্যাণবাবু যথার্থই বলেছেন যে মাঝারি ও গরিব চাষীদের অর্থাৎ ক্ষুদে অন্য উৎপাদকদের অর্থনীতি সঙ্কটগ্রস্ত। কৃষিতে ধনতান্ত্রিক বিকাশের অঙ্গ হিসেবে কৃষক সমাজের মধ্যে পার্থক্যীকরণ প্রক্রিয়া কাজ করছে, উচ্ছেদ ও নিঃস্বতা-বৃদ্ধির ফলে মধ্য ও গরিব কৃষকেরা জমি হারাচ্ছে। কিন্তু তিনি এ-বিষয়টিকে বিবেচনার যোগ্য বলেই গণ্য করেননি যে এ-সবটাই ঘটছে এ-রকম একটা দেশে যেখানে অন্যান্য সব ক্ষেত্রের মতো কৃষিতেও ধনতন্ত্রের বিকাশ ঘটছে মন্থর গতিতে এবং মাঝারি ও গরিব কৃষকদের মধ্যে বাস্তব সম্ভাবনা ও প্রয়োজনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে না হলেও গণতান্ত্রিক চেতনা ও সংগঠিত গণতান্ত্রিক আন্দোলন দানা বেঁধে উঠেছে। ফল দাঁড়িয়েছে এই যে আঠারো শতকের শেষ দিকে ও উনিশ শতকের গোড়ায় সাধারণভাবে ইউরোপে কিংবা উনিশ শতকের শেষ দিকে ও বিশ শতকের প্রথম দশকে রাশিয়ায় পার্থক্যীকরণ প্রক্রিয়া যে মাত্রা ও ব্যাপকতার সঙ্গে কাজ করেছে ভারতে তা করতে পারছে না। তাই স্বাধীনতা প্রাপ্তির দুই দশক পরেও ক্ষুদে পণ্য উৎপাদকেরা বেশ ব্যাপকভাবেই টিকে রয়েছে ও থাকছে। **সাধারণত ক্লাসিকাল ধনতান্ত্রিক বিকাশ যে ধরনের polarisation বা মেরু-বিভাজন ঘটায় তা ভারতবর্ষে হয়নি। আর এই বৈশিষ্ট্য ভারতে কৃষি-বিপ্লবের পরিপ্রেক্ষিত, কর্মসূচি ও কৌশল নির্ধারণের পক্ষে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।**

১২। বহুবিধ বৈশিষ্ট্য সম্বলিত এই ধনতান্ত্রিক বিকাশের পথে সামন্ততান্ত্রিক সম্পর্কের ব্যাপক অবশেষ ভিন্ন অন্য প্রধান বাধা হলো প্রাক্-ধনতান্ত্রিক ব্যাপারী (mercantile) ও মহাজনী শোষণ। এই দু-রকম শোষণের তিনটি প্রধান শর্ত হলো অর্থপুঁজির concentration বা কেন্দ্রীকরণ, বিক্রয়যোগ্য ফসলের কেন্দ্রীকরণ এবং ব্যাপারী ও মহাজনী পুঁজির আধিপত্য প্রতিরোধে অক্ষম একটি বিস্তৃত petty production বা ক্ষুদে উৎপাদন ব্যবস্থা। আর তিনটি শর্তই ভারতে বিদ্যমান। বিস্তারিত আলোচনার মধ্যে প্রবেশ না করেও এটুকু

বলা যায় যে, যে-ধরনের মজুতদারী, ফাটকাবাজী, কালোবাজারী কার্যকলাপ গ্রামাঞ্চলের ফড়ে থেকে শুরু করে একচেটিয়া কারবারী পর্যন্ত সকলেই লিপ্ত এবং যে-কার্যকলাপ শুধু কৃষি-অর্থনীতিকে নয়, গোটা ভারতীয় অর্থনীতিকেই সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত করে দিচ্ছে সেসব কিছু, আর যাইহোক, প্রতিযোগিতামূলক ধনতন্ত্রের নিয়মকে প্রতিফলিত করে না (পৃষ্ঠা ১৫৯-১৬৯)।

১৩। কল্যাণবাবু তাঁর আলোচনায় এটা প্রায় স্বতঃসিদ্ধের মতো ধরে নিয়েছেন যে, জমি ও অর্থপুঁজির মালিক চাষের জন্য পুঁজি লগ্নী করবে, কৃষি-শ্রমিক নিয়োগের উপর বেশি বেশি নির্ভর করবে, উৎপাদনের উত্তরোত্তর অধিকতর দায়-দায়িত্ব নিচ্ছে ও নেবে, চাষের পদ্ধতির উন্নতির বিষয়ে বেশি বেশি মনোযোগী হচ্ছে ও হবে। কিন্তু এমনটা কেন যে ঘটবে তা কল্যাণবাবু বলেননি। বাস্তব অর্থনীতির কোন্ নিয়ম অনুসারে এ-রকম হবে তা তিনি ব্যাখ্যা করেন নি। কৃষি-অর্থনীতির এ-রকম বিকাশ অর্থনৈতিক বিবর্তনের কোন্ logic অনুসারে দেখা দেবে যে-বিষয়ে তিনি কোনো বক্তব্য হাজির করেননি।

কল্যাণবাবু কৃষি-অর্থনীতির বিকাশের বিষয়ে যে ছকটিকে উপস্থিত করেছেন বাস্তবে কিন্তু ঐ রকম বিকাশের বিরুদ্ধে নানা শক্তি কাজ করছে। আসলে অবস্থাটা কি? অর্থ পুঁজি বা money capital-এর যে মালিক তার সামনে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ পুঁজিকে একাধিকভাবে ব্যবহারের, বিকল্প নানা কাজে নিয়োগ করার সুযোগ খোলা রয়েছে। এই অর্থকে ব্যবহার করা যায় বেশি বেশি জমি, যে-জমির দাম মুদ্রাস্ফীতির চাপে পীড়িত অর্থনীতিতে ঊর্ধ্বমুখী এবং যে-জমির থেকে অতি চড়া হারে খাজনা আদায় সম্ভব (অনেক ক্ষেত্রে তো চাষের জন্য এক পয়সাও খরচা না করে খাজনা আদায় ঘটছে), হস্তগত করার উদ্দেশ্যে। বিকল্পে, খাদ্যশস্য ও অন্যান্য দুষ্প্রাপ্য পণ্য ও সম্পদ কুক্ষিগত করার জন্যও নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থকে কাজে লাগানো যেতে পারে—আর এর থেকে return বা প্রতিদানের হারও রীতিমতো চড়া। এই অর্থকে আবার তেজারতি কারবারেও নিয়োগ করা চলে—এতে সুদের হার শতকরা ২৫ থেকে শতকরা ২০০ পর্যন্ত। কিন্তু এসব অনুৎপাদক কাজের পরিবর্তে কৃষির উৎপাদন প্রসারের উদ্দেশ্যে উন্নত বীজ, রাসায়নিক সার ও অন্যান্য উপকরণ ক্রয়, জলসেচের প্রসার এবং বিনিয়োগের কাজেও এই পুঁজির ব্যবহার সম্ভবপর। তবে বাস্তব অভিজ্ঞতায় দেখা যাচ্ছে যে, লীজে জমি বিলি করা, ফসলের কেনা-বেচা এবং নগদ অর্থ ও ফসলে কর্জ দেওয়ার থেকে পাওয়া

খাজনা, ব্যাপারী-মুনাফা ও স্বদরূপী প্রতিদান বা return-এর হার জমিতে পুঁজি বিনিয়োগ ও ক্ষেতমজুর নিয়োগ থেকে পাওয়া ধনতান্ত্রিক মুনাফার হারের থেকে অনেক বেশি. অনেক নিশ্চিত, অনেক নিরাপদ। স্পষ্টতই, সামন্ততান্ত্রিক খাজনা, মহাজনী স্বদ ও ব্যাপারী মুনাফার এই বৈশিষ্ট্য বা, অন্য কথায়, অনুৎপাদক কার্যকলাপ থেকে পাওয়া প্রতিদানের এই কাঠামো উৎপাদনমূলক পুঁজি বিনিয়োগ ও উৎপাদনী স্বযোগ সমূহের প্রসারের পথে প্রবল অন্তরায় (পৃষ্ঠা ১৭৬-১৭৭)। এই পরিস্থিতিতে কৃষিতে ধনতন্ত্রের অবাধ বিকাশের যে-চিত্রটি কল্যাণবাবু তুলে ধরেছেন সে-রকম বিকাশ কেন ও কেমন করে ঘটছে ও ঘটবে সে-সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণ নীরব।

বাস্তবিকপক্ষে গ্রামীণ অর্থনীতির অন্যতম মুখ্য বৈশিষ্ট্য হলো সামন্ততান্ত্রিক এবং ব্যাপারী-মহাজনী—এই দুই প্রাক্-ধনতান্ত্রিক শোষণপদ্ধতির সঙ্গে ধনতান্ত্রিক শোষণপদ্ধতির মিশ্রণ। উদ্বৃত্ত শ্রম আত্মসাৎ করার এই যে তিনটি পদ্ধতি এদের গ্রন্থি-বন্ধন ও সংমিশ্রণের ভিত্তিতে একটি নতুন ধরনের স্ববিধাভোগী স্বার্থ—গ্রামীণ conglomerate-এর উদ্ভব হয়েছে। এই conglomerate গোষ্ঠীভুক্তরা একই সঙ্গে বড় জোতের মালিক, ফসলের একচেটিয়া কারবারী, প্রধান মহাজন, ধান-ভাঙা কলের মালিক, সরকারী ঠিকাদার, রেশন দোকানের মালিক, মুখ্য সমবায়কর্মী ও গ্রাম্য কর্মচারী। জমির বড় মালিক হিসেবে এরা অনেক ক্ষেত্রে জমির কিছুটা খাজনায় বন্দোবস্ত দিচ্ছে, আবার কৃষি-শ্রমিক নিয়োগ করে বাকি জমিটুকু নিজেদের তদারকিতে চাষ করছে। এরা অর্থ ও বাজারের উপর আধিপত্যকে কাজে লাগাচ্ছে যোগান ও ফসলের দরব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত করে দিয়ে মুনাফা লোটার জন্য। এরাই আবার মহাজনী কারবারে লিপ্ত।

এদের প্রসঙ্গে আমার বইতে বলা হয়েছে, "· [these conglomerates] utilize their grip over the life of the working peasantry and the landless labourers to squeeze out surplus through the simultaneous wielding of the mode of extraction of feudal absolute rent, the mode of exploitation through profit on alienation and the mode of exploitation through profit on production of surplus value" (পৃষ্ঠা ১১১)।

১৪। এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে আমাদের দেশের গ্রামীণ জীবন

প্রবল বিরোধে বিদীর্ণ। কিন্তু এ-বিরোধ শুধুমাত্র ধনতান্ত্রিক জোতের মালিক আর গরিব চাষী গ্রামীণ সর্বহারার মধ্যে নয়। শ্রী কল্যাণ দত্ত-র অতি সরলীকৃত বিশ্লেষণ অনুসারে bipolar division বা দুই বিপরীত মেরুতে বিভাগ এখানে অনুপস্থিত। বাস্তব পরিস্থিতি হলো অনেক বেশি বিচিত্র ও জটিল।

অবশ্য ভূমি-সংস্কারের নানা আইন-কানুন সত্ত্বেও এ-দেশের গ্রামাঞ্চলে বিরোধের কেন্দ্রীয় বিষয় হলো উৎপাদনের প্রধান উপকরণ জমির ওপর জমিদারদের—সামন্ততান্ত্রিক ও ধনতান্ত্রিক এই দুই ধরনের জমিদারদেরই প্রায় একচেটিয়া মালিকানা। এই একচেটিয়া মালিকানা ভেঙে ফেলা এবং উদ্বৃত্ত জমি গরিব চাষী, ভূমিহীন চাষী, স্বত্বহীন প্রজা ও ক্ষেতমজুরদের মধ্যে বণ্টন করা হচ্ছে গ্রামাঞ্চলে গণতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রথম ও সবথেকে জরুরী ধাপ। শুধুমাত্র এই কাজ কোনো সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা না, কিন্তু এই কাজ সম্পূর্ণ না করে সমাজতন্ত্রের পথে এগুনো যায় না।

স্বভাবতই এ-ক্ষেত্রে কৃষি-বিপ্লবের আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু হলো একই সঙ্গে সামন্ততান্ত্রিক জমিদার এবং ধনতান্ত্রিক জমিদার। উপরন্তু ফসল, বাজার, ঋণ-ব্যবস্থা, সারের বণ্টন, সেচের সুযোগ-সুবিধাদি, কৃষিখাতে সরকারী খরচ ইত্যাদির উপর প্রাক্-ধনতান্ত্রিক ও ধনতান্ত্রিক শোষণ পদ্ধতির সংমিশ্রণের ভিত্তিতে উদ্ভুত গ্রামীণ conglomerateদের একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ ও আধিপত্য চূর্ণ করার কাজও খুবই গুরুত্বপূর্ণ। **স্পষ্টতই ভারতে কৃষি-বিপ্লব হচ্ছে সামন্ততন্ত্র-বিরোধী, প্রাক্-ধনতন্ত্র-বিরোধী গণতান্ত্রিক বিপ্লব।**

কিন্তু এ-বিপ্লব যে কেবলমাত্র সামন্ততন্ত্র-বিরোধী তা নয়। সাধারণভাবে ধনী চাষী সমেত সমস্ত ধনতান্ত্রিক উপাদানের সম্পূর্ণ উৎসাদন এ-বিপ্লবের লক্ষ্য নয়। কিন্তু ধনতান্ত্রিক ভূস্বামীদের ও কৃষিতে একচেটিয়া পুঁজির অনুপ্রবেশের সঙ্কোচন সাধন ও পুরোপুরি উচ্ছেদ সাধন এই বিপ্লবের অন্যতম লক্ষ্য। আর সে-কারণেই, কল্যাণবাবু যে-অর্থে বলেছেন সেই অর্থে না হলেও, একটি **বিশেষ অর্থে এই বিপ্লব ধনতন্ত্র-বিরোধী বিপ্লব।**

বিস্তারিত আলোচনার মধ্যে প্রবেশ না করেও বলা যেতে পারে যে বিশ শতকের শেষভাগে ভারতের নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক ও সামাজিক অর্থ-নৈতিক পরিস্থিতিতে কৃষি ও গ্রামীণ অর্থনীতির অগ্রগতির জন্য ধন-তান্ত্রিক বিকাশের দুটি পথই—'প্রতিক্রিয়াশীল' ও 'বিপ্লবী' পথ—সম্পূর্ণ অচল। **সচেতনভাবে বেছে নেওয়া যেতে পারে এবং কৃষি-অর্থনীতির দ্রুত,**

সর্বাঙ্গীন, সঙ্কটমুক্ত বিকাশ নিশ্চিত করতে পারে এই অর্থে একটিমাত্র বিকল্পই রয়েছে সেটি হলো অ-ধনতান্ত্রিক বিকাশের পথ।

অবশ্য এখানে আপত্তি উঠতে পারে এই কথা বলে যে, যে-দেশের কৃষিঅর্থনীতিতে ইতিমধ্যেই ধনতান্ত্রিক সম্পর্কের বেশ কিছুটা বিকাশ ঘটেছে সে-দেশে অ-ধনতান্ত্রিক বিকাশ কেমন করে সম্ভব? কিন্তু এই প্রসঙ্গে এটি বোঝা দরকার যে ভারতের মতো ক্ষেত্রে অ-ধনতান্ত্রিক বিকাশের অর্থ ধনতান্ত্রিক বিকাশকে সম্পূর্ণ পাশ কাটিয়ে যাওয়া নয়। আবার, এ-কথাটিও উপলব্ধি করা দরকার যে অ-ধনতান্ত্রিক বিকাশ একটি স্বতন্ত্র সামাজিক-অর্থনৈতিক বন্দোবস্তও নয়। এটি হলো সমাজতন্ত্রে উত্তরণের জন্য একটি transitional বা পরিবর্তমান অর্থনীতি। জোতের সর্বোচ্চ সীমা হ্রাস করে ভূমি-বণ্টনের বর্তমান কাঠামোটির আমূল পরিবর্তন এবং ভূমিহীন কৃষক ও ক্ষেতমজুরদের জমির ওপর অধিকার দান এই নতুন কৃষি-বিপ্লবের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। জমির ব্যবহার, উৎপন্ন ফসল বিক্রয় ও চাষের নানা উপকরণ ক্রয়, সার ও বীজ বণ্টন, কৃষি-ঋণের সরবরাহ ইত্যাদি চাষবাস সংক্রান্ত নানা কার্যকলাপের ক্ষেত্রে সমবায়মূলক প্রয়াস ও তৎপরতার প্রসার, রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্য ব্যবস্থার বিস্তার এবং ক্ষেতমজুরদের জন্য উপযুক্ত মজুরীর নিশ্চয়তা সৃষ্টি করাও এই কৃষি-বিপ্লবের বিশেষ উল্লেখযোগ্য দিক। সংক্ষেপে বলা যায়, আমাদের দেশের গ্রামাঞ্চলের বিশেষ পরিস্থিতিতে অ-ধনতান্ত্রিক রূপান্তরের মর্মকথা হলো সামন্ততন্ত্র-বিরোধী ও ব্যাপারী শোষণ—সুদখোরি মহাজনী শোষণ-বিরোধী কর্তব্যগুলি সম্পাদনের সঙ্গে সঙ্গে ধনতান্ত্রিক শোষণের যেসব দিক গ্রামীণ সামাজিক-অর্থনৈতিক জীবনের উপর চেপে বসে আছে (যেমন, ধনতান্ত্রিক ভূস্বামীদের আধিপত্য ও একচেটিয়া পুঁজির চাষবাসে ও কৃষিজাত পণ্যের বাজারে বর্ধমান অনুপ্রবেশ) সেইসব কিছুর একেবারে সম্পূর্ণ ধ্বংস সাধন এবং সমবায়মূলক নানা তৎপরতার প্রসার, রাষ্ট্রের সক্রিয় হস্তক্ষেপ ও ক্ষেতমজুরদের স্বার্থ রক্ষার উপযোগী ব্যবস্থা গ্রহণ ইত্যাদির মাধ্যমে ধনতান্ত্রিক শোষণের অন্যান্য দিকের ক্রমসঙ্কোচন সাধন।

১৫। এই নতুন কৃষি-বিপ্লব সম্পাদনের জন্য গ্রামাঞ্চলের কোন কোন শক্তিকে পাওয়া যাবে? কল্যাণবাবুর অভিমত হলো: "শহরের শ্রমিক ও গ্রামের **গরিব কৃষক (সব-কৃষক নয়)** এদেরই মিলিত হয়ে গ্রাম ও শহর থেকে পুঁজিবাদের উচ্ছেদ ঘটাতে হবে" (বড় হরফ বর্তমান লেখকের)। কিন্তু আমার বক্তব্য হলো যে, **সামন্ত-ব্যাপারী-মহাজনী-শোষণ-বিরোধী ও উপরে**

উল্লিখিত সীমাবদ্ধ অর্থে ধনতন্ত্র-বিরোধী কৃষি-বিপ্লবে ভাগচাষী, নানা ধরনের স্বত্বহীন প্রজা, গরিব চাষী ও মাঝারি চাষী সমেত সকল অ-ধনতান্ত্রিক শ্রমজীবী কৃষকদের এবং ক্ষেতমজুর বা গ্রামীণ সর্বহারাদের ঘনিষ্ঠ ও গুরুত্বপূর্ণ স্বার্থ। সেই কারণে এরা সকলেই হচ্ছে এ-দেশের কৃষি-বিপ্লবের মূল চালিকা শক্তি। অবশ্য এদের সকলের মধ্যে ভূমিহীন ও গরিব চাষী ও গ্রামীণ সর্বহারারা হচ্ছে কৃষি-বিপ্লবের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ও বৃহত্তম চালিকা শক্তি এবং কৃষি-বিপ্লবী শক্তিসমূহের প্রধান বাহিনী।

এ-বিষয়ে অবশ্য সচেতন থাকা প্রয়োজন যে ক্ষেতমজুর ও গরিব কৃষকের সঙ্গে মধ্য-কৃষকের স্বার্থ ও দৃষ্টিভঙ্গিগত বেশ কিছু পার্থক্য রয়েছে। মধ্য-কৃষক বিশেষ বিশেষ সময়ে ক্ষেতমজুর নিয়োগ করে, তার সব সময়েই নজরও হচ্ছে ধনী কৃষকের স্তরে উন্নীত হওয়া। কিন্তু এই পার্থক্য ও বৈশিষ্ট্যকে মাত্রাতিরিক্ত গুরুত্ব দেওয়াটা হবে ভুল। গ্রামীণ অর্থনীতিতে তার অবস্থান ও কার্যকলাপের বিচারে **মধ্য-কৃষকের চরিত্র মূলত, শোষকের নয়, ভূস্বামী, একচেটিয়া পুঁজি, ফাটকাবাজ ব্যাপারী ও সুদখোর মহাজন কর্তৃক শোষিত শ্রমজীবী কৃষকের।** ধনতান্ত্রিক বিকাশের বর্তমান পথ অনুসরণের পরিণামে তার স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হচ্ছে, মধ্য-কৃষক অর্থনীতি নানাভাবে বিপর্যস্ত হচ্ছে। উপরন্তু, মধ্য-কৃষক হলো গ্রামীণ জনসাধারণের একটি রীতিমত বৃহৎ, যথেষ্ট বিস্তৃত, খুবই প্রভাবশালী অংশ। ভারতে বিপ্লবের বর্তমান স্তরে এরা হলো শ্রমিকশ্রেণীর অতি নির্ভরযোগ্য মিত্র এবং অ-ধনতান্ত্রিক বিকাশের পথকে গ্রহণ করাটাও হচ্ছে এদের পক্ষে খুব স্বাভাবিক।

এই বিপ্লবে ধনী কৃষকের অবস্থান ও ভূমিকা কি? **ধনতান্ত্রিক বিকাশের 'প্রথম পথ'-এর প্রতিনিধি, শ্রমজীবী কৃষকদের মধ্যে থেকেই উদ্ভূত ধনী কৃষককে ভারতীয় বিপ্লবের বর্তমান পর্যায়ে গণতান্ত্রিক কর্তব্যগুলি সম্পাদন করার পর্যায়ে সম্ভাব্য মিত্র হিসেবে গণ্য করা যায়।** উপরন্তু, ধনী কৃষকের সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক প্রভাব গরিব কৃষক সমেত গোটা শ্রমজীবী কৃষক সমাজের মধ্যে বিদ্যমান।

অবশ্য ধনী কৃষক হচ্ছে পল্লী অঞ্চলের ধনতান্ত্রিক উপাদানগুলির একটি বড় অংশ এবং তার শোষক চরিত্র তর্কাতীত। তদুপরি, ধনিকশ্রেণীর একটি অংশ হিসেবে ধনী কৃষক রাষ্ট্রক্ষমতারও অংশীদার। এই ধনী কৃষকের শোষণের

বিরুদ্ধে অবশ্যই সংগ্রাম করতে হবে। কিন্তু তাহলে ধনী কৃষককে কেমন করে বিপ্লবের সম্ভাব্য মিত্র হিসেবে বিবেচনা করা যায়? এই প্রশ্ন নিঃসন্দেহেই গুরুত্বপূর্ণ। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে জমির মালিকানা, ফসলের কেনা-বেচা, কৃষি-ঋণ ব্যবস্থা, সেচসংক্রান্ত সুযোগাদির ব্যবহার, সার ও অন্যান্য কৃষি উপকরণের বণ্টন, কৃষিখাতে রাষ্ট্রীয় ব্যয়, সমবায়ের পরিচালনা ইত্যাদি গ্রামীণ জীবনের নানাদিকের উপর প্রাক্-ধনতান্ত্রিক ও ধনতান্ত্রিক শোষণ পদ্ধতির সংমিশ্রণের ভিত্তিতে উদ্ভূত ভূস্বামী-ব্যাপারী-মহাজন জোটের প্রায় একচেটে নিয়ন্ত্রণ ও কর্তৃত্ব। স্বভাবতই এ-সব বিষয়কে কেন্দ্র করে এই জোটের সঙ্গে ধনী কৃষকদের গুরুতর বিরোধ বর্তমান। ধনী কৃষক রাষ্ট্রক্ষমতার অংশীদার। কিন্তু রাষ্ট্র-ক্ষমতাকে কে কতটা ব্যবহার করবে সেই প্রশ্নে শাসক জোটের অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য শক্তির সঙ্গে—বিশেষত একচেটিয়া পুঁজিপতি ও গ্রামাঞ্চলের ত্রিমূর্তির জোটের সঙ্গে ধনী কৃষককে সর্বদাই সংগ্রাম করতে হচ্ছে। বাস্তবিকপক্ষে ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের মতো তাৎপর্যপূর্ণ ব্যবস্থা অথবা কংগ্রেসের ভাঙনের মতো সুদূরপ্রসারী ঘটনার পিছনে এই দ্বন্দ্ব বিরোধের তীব্রতাবৃদ্ধি যে কাজ করছে তা অনস্বীকার্য। এই পরিস্থিতিতে গ্রামাঞ্চলের প্রতি-বিপ্লবী জোটটির বিরুদ্ধে বিপ্লবী সংগ্রামকে পরিচালিত ও কেন্দ্রীভূত করণে ধনী কৃষককে নিরপেক্ষ করে দেওয়া অথবা এমন কি গণতান্ত্রিক বিপ্লবের মিত্র রূপে পাওয়া সম্ভবপর।

কৃষি-বিপ্লব সম্পর্কে কল্যাণবাবুর প্রস্তাবিত কর্মসূচী ও রণনীতি একান্তই একপেশে, সঙ্কীর্ণতা দোষে দুষ্ট ও হঠকারী প্রকৃতির। ঐ নীতির অনুসরণ গ্রামাঞ্চলে বিপ্লবের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ বুনিয়াদী শক্তি গরিব চাষী ও ক্ষেত-মজুরদের তাদের মিত্রদের থেকে বিচ্ছিন্ন করবে, শুধু ধনী চাষী নয়, মধ্য-চাষীকেও শত্রু শিবিরে ঠেলে দেবে এবং প্রতিক্রিয়াশীল জোটটির সামাজিক ভিত্তি ও সমর্থনকে ব্যাপকতর করবে।

এই পরিস্থিতিতে সবদিক বিবেচনা করে আমাদের বক্তব্য হলো, ভূস্বামী বৃহৎ ব্যাপারী-সুদখোর মহাজনদের জোটটির বিরুদ্ধে প্রধান আঘাত হানতে হবে, আক্রমণকে কেন্দ্রীভূত করতে হবে। এই জোটটির বিরুদ্ধে কৃষি-বিপ্লবের মূল চালিকা শক্তিগুলিকে—মাঝারি কৃষক সমেত সমগ্র শ্রমজীবী কৃষক সমাজ ও ক্ষেতমজুরদের সংহত করতে হবে এবং ব্যাপকতম সমাবেশ ঘটাতে হবে। এই লক্ষ্যকে সফল করে তোলার জন্য একই সঙ্গে ধনী কৃষক কর্তৃক শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হবে এবং ধনী কৃষকের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ কাজ ও তৎপরতার সব রকম সুযোগকে কাজে লাগাতে হবে। উপরে উল্লিখিত ত্রিমূর্তির জোটটির সঙ্গে ধনী কৃষকের এখন পর্যন্ত যে আঁতাত রয়েছে এই নীতির সুষ্ঠু ও উপযুক্ত প্রয়োগের ফলে তা ভেঙে দেওয়া যাবে, ঐ জোটটিকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ও চূর্ণ করা যাবে এবং কৃষি-বিপ্লবকে জয়যুক্ত করা সম্ভবপর হবে।

কিছুই ভুলিনি, তবু

অনন্ত দাশ

কিছুই ভুলিনি, তবু মনে হয় বহু কিছু ভুলে যাচ্ছি
হাতে হাত রেখে কথা, স্মিতহাসি, মনুষ্যত্ব প্রেম—
সূর্যের রক্তিম মুখে প্রাণের ফসল
সবকিছু জলমগ্ন সিঁড়ি যেন
নেমে যাচ্ছে
পাতালের দিকে
শিমূলের হাওয়া আর জ্বালে নাকো আকাশে আগুন

কোন খুনে অপরাধী নই
তবু প্রতিটি খুনের রক্ত এই হাতে, এই মুখে
সন্ত্রস্ত ব্যাধের ছায়া ওঠানামা করে
বিবেকদংশনে যেন প্রতিরাত্রে নির্বাসন হয়।

বিদীর্ণ পথের মোড়ে এত ঘৃণা স্তূপীকৃত!
রক্তে ভেজা চোখে কোন দূর ট্রাফিকের আলো
কার বুকে ভেসে উঠছে ডুবন্ত পাহাড়
আমার চোয়াল ভেঙে শ্রাবণের শুষ্ক নদী
দূরের সমুদ্র খুঁজে ফেরে।

কিছুই ভুলিনি, তবু
মনে হয় বহু কিছু ভুলে যাচ্ছি
স্মিতহাসি, মনুষ্যত্ব, প্রেম
পাহাড়ের গুহাগুলি ফেটে যায়
আদিম রক্ত ও হাওয়া আকাশের রঙ
জিঘাংসায় লাল হয়ে ওঠে।

অথচ আশ্চর্য এই

সত্য গুহ

আবহসঙ্গীত নেই নেপথ্যেও সাড়াশব্দ নেই
নিভুনিভু মোম আগলে সমস্ত অস্তিত্ব দিয়ে মর্মান্তিক ম্লান আলোরেখ
ঘরের ভেতরে এই,—বুকের ভেতরে
অন্ন লইয়া আশা, আর কিছু নয়, শুধু বেঁচেবত্তে থাকা
উৎপন্ন মুখের গন্ধ শুঁকে সন্তানের, না, আর কিছু নয়

কিভাবে যে রাতগুলো দিনগুলো আসে চলে যায়
প্রকৃত প্রস্তাবে নেই বোধের ভেতরে তার ছাপ
ন্যাড়া ঝোগড়া কুয়াশায় গাছের নিকটে গাছ, কোথাও সবুজে
বাসাভরা পাখি আর আছে কিনা বোঝা যায় না, অথচ সবাই
এখনো বিশ্বাস করে রোদ্দুর করেছিল ; পাখিরা ভুবন ভরে গান বেঁধেছিল

সমস্ত কেমন যেন হয়ে গেছে পোড়া দেশগাঁয়ে
নাট্যকারের সঙ্গে ছটি চরিত্রের কারো ক্বচিৎ কখনো দেখা হলে
মুকাভিনয়েও থাকে যে-টুকু-যা অভিব্যক্তি তাও নেই—উত্তেজনা জোনাকীতে শুধু
তার শীতল আলোয় চোখে ভেসে যায়, ও চাঁদ, জোয়ারে
লাশ লাশ লাশ এবং লাশ আর কিছু নয়

আবহসঙ্গীত নেই নেপথ্যেও জীবনের সাড়াশব্দ নেই
নারী দুই বাহুমূলে পুরুষের সেরকম শঙ্খ তার শঙ্খিনীর সত্তার ভেতরে
পৌঁছোনোর আপ্রাণ প্রয়াসে খোঁজে দোর আর পত্রপতনের শব্দে ফিরে চলে আসে
বিবর্ণ ইচ্ছার মতো আপন বিবরে যেন বারবেলা লেগেছে
ঘনজনবসতিতে মড়া জেলে হাত সেঁকছে মুখোমুখি সন্ন্যাসী ও ডোমে
সাংঘাতিক কান্নাকালবেলা, কাঁদে চব্বিশঘণ্টাময় রাতে
ঘাস মা নিজেরই লাশ বুকে করে 'কার বাছা, আহা,
কোন বকুলের ফুল সন্ন্যাসী বসন্তে ভাঙল তরু তছনচ্ ক'রে এরকম ভাবে'
নেপথ্যে সারসার জমা বাদ্যযন্ত্রে প্রতিধ্বনি তেমন পুরোনো বাড়ি ভরে
ধূলোর হিমক্ষীণ শব্দ সারাক্ষণ বাজে আহা—হায়, মানুষের দিন চলে যায়

অথচ আশ্চর্য এই বিয়োবার বেলা বাড়ছে রমলার ঠিকঠিক ভাবে।

জ্বলে উঠতে চাই

রেখা দত্ত

পৃথিবীতে কোনোখানে যেন কেউ নেই, কিছু নেই।
মাথার ওপরে কিছু নক্ষত্রের বিচ্ছিন্ন নিবাস ;
হাওয়া ছুটে আসে বুকে মুখে—
এ-হাওয়ায় অপমৃত আত্মার বিলাপ ;
আত্মার বিলাপ শুনে, আত্মার বিলাপ শুনে শুনে
দিন প্রায় শেষ।

মাথার ওপরে কিছু নক্ষত্রের বিচ্ছিন্ন নিবাস—
ষড়যন্ত্র মূলক মিট্‌মিট্‌—
আমি যা বুঝি না, আমি একা।
অথচ সবাই ছিল পাশে, এই পৃথিবীর ঘাসে
পায়ের গভীর চিহ্ন আজো আছে ইতস্তত। ওহে, মহাকাল—
বুকের কপাট খোলো, আগুনের তীব্রতায় জ্বলে উঠতে চাই।

প্রবাসেও স্বস্তি নেই

অরুণাভ দাশগুপ্ত

প্রবাসেও স্বস্তি নেই, দৃষ্টিতে নিয়ত ভাসে
অনিদ্র শহরতলী
        পোড়াঘর
                পড়োশির রক্তাক্ত চাতাল!

অথচ নিজেই এসব এড়াতে আসি
দোমোহানী—যেখানে গরখাই
সুবর্ণরেখার বুকে বুক রাখে,
                ঝিরঝির ঝিরঝির শব্দে

বিচূর্ণ উপলখণ্ডে আবহময়তা······
টিলার আড়ালে কি সুন্দর দেহ ধুয়ে
নিতে জানে ওঁরাও রমণী,
ইস্পাতনগরী থেকে ভেসে আসা লোহাচুরে গৈরিকসুষমা···
প্রেক্ষাপট জুড়ে
পাহাড়তলীর শান্ত শালবন ছুঁয়ে যায়
সূর্যাস্তের প্রলম্বিত রেশ···
এই অতুলন চিত্রকল্প,
শান্ত পায়ে ঘরে ফেরা মহুয়ায় আচ্ছন্ন মানুষ
তোমাদের এত কাছে এসে
কেন যে আবার ফিরি—
অনিদ্র শহরতলী পোড়াঘর রক্তাক্ত চাতালে!

ফুল-ফসলে ক্ষুধার সন্তান

শিশির মজুমদার

আমার হাত উঠল আকাশে
সেখানে ফুলের সমারোহ
আমার নিশ্বাস পড়ল বাতাসে
সেখানে ফসলের আঘ্রাণ
বন্যায় মহামারী শ্মশান শ্মশান।

আমাদের ফুল ফসলে ঈপ্সিত ক্ষুধার মিছিল
পৃথিবী এসো, আমরা ফসল আর ফুলে
ক্ষুধার সন্তান গড়ে তুলি।

প্রকৃত পুরুষ

অজয় সেন

এখন অনেক কিছু ছেড়ে দিয়ে নিতান্ত অবহেলায়
চলে যাব নির্জন গভীর অরণ্যে,
দিনের সূর্য যেখানে খঞ্জ
সেখানে প্রকৃত পুরুষ নিঃসঙ্গ অথচ আত্মস্থ।
আমি তার কাছে নতজানু হবো
একান্ত বিশ্বাসে ভূমিস্পর্শ;
ব্রোঞ্জ কপালে অদৃশ্য রেখা
পুলকিত ধূপের গন্ধে আলোড়িত চতুর্দিক
গম্ভীর মন্ত্রোচ্চারণে থমথমে, নিবিড়।

নিশুতি রাতে প্রাচীন দেবতাগণ যখন অতন্দ্র প্রহরী
প্রকৃত পুরুষ ধীর পদক্ষেপে হেঁটে যান নদী
অথবা সবুজ শস্যক্ষেতের দিকে।
প্রত্যূষে দুই তীরে সোনালী শস্য
উচ্ছল নদীর কলধ্বনি, অরণ্য জুড়ে উৎসব উৎসব।

প্রকৃত আত্মস্থ অথবা বোধ কি হতে পারে?
অনায়াস করায়ত্ব বিবিধ কৌশল, জানা আছে
প্রকৃত পুরুষের।

আমি সেই প্রকৃত পুরুষের কাছে যেতে চাই
যেখানে বল্কলের পোষাক পরিহিত অদৃশ্য পুরুষ
কবির আশে পাশে প্রদক্ষিণ করে প্রত্যেক প্রহরে
সে-সময় কবির চিবুক পর্যন্ত ধ্যানস্থ
গাঁথা থাকে চিবুক প্রাচীরে।

প্রতিদিন, প্রতিদিন কলকাতায়

বিপ্লব মাজী

প্রতিদিন, প্রতিদিন কলকাতায় লাঞ্ছিত যৌবন মারা যায়।
চতুর্দিকে হায় হায় দগ্ধ কারবালায় তীব্র নিশীথ ফাটায়।

প্রতিদিন, প্রতিদিন কলকাতায় সন্ত্রস্ত যৌবন জাগে, চোখে চূর্ণ ঘুম
প্রতিদিন পাড়ায় পাড়ায় উষ্ণ রঙের কুঙ্কুম, হিংস্র পুলিশ জুলুম।

প্রতিদিন, প্রতিদিন কলকাতায় জায়া-জননীর অশ্রুপাত
গারদে, কুটিল কালো ভ্যানে মৃত্যুপ্লাবিত তরঙ্গে করাঘাত

প্রতিদিন, প্রতিদিন কলকাতায় যৌবনের মৃত্যু আসে যায়
লোনা বাতাসের উষ্ণ রক্তগন্ধী যন্ত্রণায় যৌবন হারায়।

ইচ্ছার অঞ্জলি চিতাগ্নিতে

তরুণ সান্যাল

আর কোনো ইচ্ছা নেই, সাধ নেই, শোনো ইচ্ছামতী, ইচ্ছাবতী,
ঢের হলো কথা চালাচালি বজ্রে, ফালাফালা মেঘ চিরে ছুরি
বিপ্লব কেবলই রক্ত? চুলের কাঁটার মতো পথসন্ধিবাঁকে হত্যাব্রতী
আততায়ী? না আদর্শপূত? মৃত্যু ফুলসাজে রক্তপদ্মে ঢলোঢলো আপাত-চাতুরি ?

মাঠ ছিঁড়ে দেয় খরা, আ জল, হে বৃষ্টি এসো আনন্দবিপ্লব শুদ্ধিস্নানে,
নদীর ঘোলায় পলি, হাড় মাংস চূর্ণভস্ম, হিমানীপ্রবাহে চূর্ণ উপল প্রস্তর
আমি সেই মাঠে চেপে বসা ফাল লাঙলের, মনে হতো, আমি সে নিড়ানে
স্তূপ আগাছার পুঞ্জ, শোলা-ধঞ্চে, সার হয়ে রসসেচনের দায়ে মৃত্তিকার স্তর।

কেবল পায়ের তলে পথের ঘূর্ণিত ফিতা, খোয়া তোলা এবড়ো খেবড়ো পিচ,
কেবল হাতের তলে খাদ্য ও পানীয়, শব্দ, ইশতেহার, মসৃণতা, অথবা বাতাস
এই প্রাণযাপনের এই প্রাণধারণের অস্তিত্বচারণে কোন জীবনের বীজ
মাঠে না পাথরে ফেলে চলে যাই

হায় হাতে লেগেছিল শিশুর ত্বকের মতো কোমল কেশরে মাঠে কাশ
শিশিরে প্রসন্ন ঠোঁট উদ্ভিন্ন গাঁদার,
যেন যন্ত্রণার চাপে হীরা হয়ে উঠেছিল অঙ্গার খনিজ
মানুষের বেদনায়, মানুষীর প্রেরণায়
কবিতায় ফুটেছিল নীলমণি রেনুফুলে পায়ে দলা ঘাস

ইচ্ছাগুলি অঞ্জলিতে
হে হব্যবাহন অগ্নি, প্রজ্জ্বলন
হে তীব্র ইস্পাতনীল
সে ইচ্ছা এখন যেন
অঙ্গারমালিকা হয়ে ঘিরে থাকে তীক্ষ্ণ জিহ্বা শিখার কিরিচ

এখন সমস্ত সাধ চোখ ফেটে অশ্রু খোঁজে, আয় বৃষ্টি,
অশ্রুবিন্দুগুলি এই খরা মাঠে ঘোচায় সন্ত্রাস ?

বিধি কি হৈল রে···

অমিতাভ দাশগুপ্ত

বিধি কি হৈল রে বিধি কি হৈল রে

আইস আইস কামার ভাইরে
খাওরে বাটা পান
ভাল কইর‍্যা বাইন্ধ্যা দিও
ছ্যাশের কপাল খান
বিধি কি হৈল রে···

সোনার থালায় পান অরে
রূপার থালায় চূণ
ভাঙা বাঙলার ললাটলিখন
অতি নিদারুণ
বিধি কি হৈল রে…

লড়াইয়্যা ছাওয়ালগুলি
কি ক'মু বিধাতা
এ উয়ারে খতম কইর্যা
মাটি কৈল রাতা
বিধি কি হৈল রে…

উঠ উঠ বিপুলারে
কত নিদ্রা যাও
বেবাক কাটল হিংসা-নাগে
চক্ষু মেইল্যা চাও
বিধি কি হৈল রে…

পঞ্চ কোটি পুত তোমার
না গুনান যায় নাতি
মরণ-আন্ধারে ঢুঁড়ে
জিয়নের বাতি
বিধি কি হৈল রে…

চিরাগে রোশনাই ঢাইল্যা
উজলা খাড়াও
বেবাক খাইল কালনাগে
চক্ষু মেইল্যা চাও
বিধি কি হৈল রে…

ছড়া

তরুণ সেন

পাহারাদার

হাত তুলেছেন বাঁয়ে তিনি
চোখটি রেখে ডাইনে
সাবাস্ দাদা কুত্তা রোখো
আর পাহারা চাইনে।

ডাইনে-বাঁয়ে

বাঁয়ের জল ডাইনে গড়ায়
ডাইনে বাজে বাঁয়া,
হুজুর-ভজা মজুর সাজেন
বুঝলে কিছু ভায়া ?

নইলে

ভাবছে গরু গোয়াল ছুট
বাক্সে যদি গজায় শিং
ধরবে কেনারামের খুট
নইলে পাবে ঘোড়ার ডিম।

এখন কেন

ষাঁড়ের ঘাড়ে লটকে লাল
আমায় কেন দিচ্ছ গাল
পাঁচটি পিঁপড়ে বানিয়ে পাখি
আধ-পাকা ধান কোথায় রাখি
বাক্সে জ্বালিয়ে নরককুণ্ড
রাখবে কোথায় নিজের মুণ্ড ?

দোষ দিওনা

দোষ দিওনা খুনীকে
ভোট দিও তার মুনিকে
খেপিয়ো নাক' গাধা
কামড়াবে তার দাদা
বাধলো জবর খুট
দেখছ খালি লুট ?

নির্বাচনী ছড়া

ধনঞ্জয় দাশ

১

যতই তুমি দেয়াল লেখো
শেষের লিখন লিখবে যে
খুন-জখমের দেয়াল ভেঙে
এই ফাগুনে আসছে সে।

২

শীত চলে যায় বসন্ত বায়
ভোটের গরম আসে
'বিপ্লবী'দের বোম্‌-ছুরিতে
রক্ত গড়ায় ঘাসে।
কিসের রক্ত, কার রক্ত?
মুখ কোরোনা চুন
রঙীন ফাগুন যায় চলে যায়
মনের মানুষ খুন।
আগুন-জ্বলা শিমূল ডালে
শানায় কারা তূণ
খুনীর কালো হাত মুচড়ে
হাসেন নবারুণ।

মেঘের আড়ালে সূর্য

(একাঙ্ক নাটক)

দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

চরিত্র

ভবেশ···অধ্যাপক, বয়স পঞ্চাশের কোঠায়

সুচেতা···ভবেশের স্ত্রী, বয়স চল্লিশের কাছাকাছি

সুখেন···ভবেশের পুত্র, বয়স পঁচিশ

জনার্দন···প্রধান শিক্ষক, ভবেশের সমবয়স

অরবিন্দ
সোমেন
কমলেশ
শেখর
অনুপম
সুনীত এবং ·········সুখেনের সমবয়সী বন্ধু

একদল যুবক

[সকালবেলা। মধ্যবিত্ত পরিবারের শয়ন ঘর। সুচেতা বিছানা তুলছে। বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। পেছনের দিকে একটা জানালা। তা দিয়ে দূরের কয়েকটা গাছপালা দেখা যায়। বাঁদিকে অন্যঘরে যাবার দরজা। তাতে একটা পর্দা ঝুলছে]

সুচেতা। না, ভালো লাগে না। ভোর না হতেই কোথায় চলে গেছে! বাড়ির সংগে শুধু খাওয়া আর শোওয়ার সম্পর্ক। দু-দণ্ড যদি বাড়িতে থাকে! কিছু বলার উপায় নেই। বলতে গেলেই লম্বা লেকচার দিয়ে আমার মুখ বন্ধ করে দেবে। ঝামেলা আমার আর ভালো লাগে না। কার জন্মদিন করবো! দুটো পেটে ধরেছিলাম—একটা তো গেছেই, এটাও কবে যাবে ঠিক কি? আমার হয়েছে মরণ।

ভবেশ। [পাশের ঘর থেকে] সকালবেলা আপন মনে কি বকছ?

সুচেতা। [গলা চড়িয়ে] নিজের সপিণ্ডকরণের মন্ত্র আওড়াচ্ছি।

ভবেশ। তা ভালো—পরকাল ঝরঝরে হবে।

[বাঁদিকের পর্দা সরিয়ে প্রবেশ করে ভবেশবাবু। বয়স পঞ্চাশের কোঠায়। চুল কাঁচাপাকা ও এলোমেলো। পরণে ধুতি ও গায়ে গেঞ্জি। ঘুম থেকে উঠে এসেছে।]

সুচেতা। ইহকালে যা সুখ পেলাম! ভাবগতিক দেখে পিত্তি জ্বলে যায়।

ভবেশ। বাষ্প বেশি জমলেই ঢাকনা ঠক্‌ঠক্ করে।

সুচেতা। একজনের দর্শন, আর একজনের বিপ্লব।

ভবেশ। ভারসাম্যের প্রয়োজন আছে বৈকি। জিনিসের ওজন করতে গেলে বিপরীত পাল্লায় বাটখারা চাপাতেই হয়।

সুচেতা। কলেজে পড়িয়ে পড়িয়ে তোমার এমন অভ্যেস হয়ে গেছে যে সবাইকে মনে করো ছাত্র।

ভবেশ। [একটা চেয়ারে বসে] ছাত্র পেলাম কোথায়? মনে হয় সবই ব্যর্থ।

সুচেতা। হাজার দিন বলেছি ছেলেটার সঙ্গে রাজনীতি নিয়ে অত আলোচনা করো না।

ভবেশ। মনে প্রশ্ন জাগলে তার উত্তর দিতে হবে না?

সুচেতা। [ঘরের এলোমেলো জিনিস গুছোতে গুছোতে] কই, আমার মনের প্রশ্নের উত্তর তো কখনও দাও না।

ভবেশ। যেহেতু তোমার প্রশ্নের উত্তর তুমি নিজেই খুঁজে পাও। তুমি যে স্বয়ং সম্পূর্ণা।

সুচেতা। হেঁয়ালী।

ভবেশ। না, হেঁয়ালী নয়। তোমার মায়া মমতার কাছে কে না বশ?

সুচেতা। ওগুলোর এখন কোনো দামই নেই।

ভবেশ। কে বললে তোমাকে।

সুচেতা দেখতেই পাচ্ছি। কাল শুকুটাকে অত করে বললাম, আজ তার জন্মদিন, বাড়িতেই যেন থাকে। ঘুম থেকে উঠে দেখা পাওয়া গেল তার? চারদিকে খুনোখুনি। আমার কিছু ভাল লাগে না। এত করে বলি ওসবের মধ্যে যাসনে, শত্রু বাড়িয়ে লাভ কী?

ভবেশ। শত্রু-মিত্র জ্ঞানই নেই।

সুচেতা। ও যা বুঝবে তাই ঠিক। ওর কথায় সায় না দিলেই মাথা গরম।
ভবেশ। কিছু বোঝে নি বলেই মাথা গরম।
সুচেতা। না বুঝে অত লাফালাফি কেন?
ভবেশ। তপ্ত বালুতে পা ফেললেই ছট্‌ফট্‌ না করে উপায় আছে?
সুচেতা। তোমার কাছে আশকারা পেয়েই…
ভবেশ। যুক্তি দিয়ে বোঝানোকে যদি বল আশকারা…
সুচেতা। তোমার কথা শোনে কই?
ভবেশ। মন্ত্রণায় ওদের স্নায়ুগুলো সর্বদাই উত্তেজিত। তাই কারো যুক্তিই মাথায় ঢোকে না।
সুচেতা। নিজেকে শেষ করা।
ভবেশ। সূর্যের মধ্যে প্রতি নিয়ত চলেছে ধ্বংস আর সৃষ্টির খেলা। যে ধ্বংসে সৃষ্টি নেই তা ব্যর্থ, নিষ্ফল আত্মহনন।
সুচেতা। দার্শনিক কচকচি থাক। সংসারটা যেন শুধু আমারই তিনি কখন আসবেন তার তো ঠিক নেই। যাদের খেতে বলা হয়েছে তাদের পাতে যাই হোক কিছু দিতে হবে তো।
ভবেশ। বাজার করার কথা বলছ?
সুচেতা। লজ্জার কথা!
ভবেশ। বাজার তো আমিই করি। তাতে আর লজ্জার কী আছে?
সুচেতা। দশবারো জনকে খেতে বলেছি। এতটা বাজার তো তোমাকেই বয়ে আনতে হবে।
ভবেশ। ছেলে জানে তার বাবার বোঝা বইবার সামর্থ্য এখনও আছে। বলো কী কী আনতে হবে?
সুচেতা। বাসী মুখে এখনও জল দিলে না। চা খেয়ে যাবে তো?
ভবেশ। বেলায় গেলে কিছু পাবো না। বাজারটা সেরে এসেই চা খাবো। তুমি একটা ফর্দ করে রাখো।

[পর্দা সরিয়ে ভবেশের প্রস্থান। একটা কলম নিয়ে সুচেতা ফর্দ লিখতে বসে। খানিকক্ষণ বাদে ভবেশ তোয়ালে দিয়ে হাত মুছতে মুছতে প্রবেশ করে।]

সুচেতা। শুকু যা যা খেতে ভালবাসে সেগুলোই লিখে দিলাম। কোন্‌টা কত আনলে হবে তুমি নিজেই আন্দাজ করে এনো।

ভবেশ। পুরো ফর্দ করে দিও—আবার যেন বাজারে যেতে না হয়।

[পর্দা সরিয়ে ভেতরে প্রস্থান। সোমেন নামক একটি যুবকের প্রবেশ]

সোমেন। স্থখেন কই, মাসিমা ?

স্থচেতা। কী করে বলবো! বাড়ির সংগে সম্পর্ক তো শুধু থাকা আর খাওয়ার।

সোমেন। রাগ করে লাভ নেই, মাসিমা। আমাদের অনেক কাজ।

স্থচেতা। তা বই কী। মিটিং, মিছিল, পোষ্টার—কত কাজ! আমরা সারাদিন নিষ্কর্মা বসে থাকি তো!

সোমেন। আমাদের কাজেও তো আপনারা কতভাবে সাহায্য করে থাকেন!

স্থচেতা। তা হলে আমাদের কাজেও তোদের সাহায্য করা উচিত।

সোমেন। তা বলতে পারেন। কিন্তু মাসীমা, ছোট কাজে ডুবে থাকলে বড় কাজে মন যায় না।

স্থচেতা। তোরা তবে চাস নে সংসারগুলো স্থন্দর হয়ে উঠুক ?

সোমেন। কটা সংসার স্থন্দর বলুন তো ? চেষ্টা করেও কেউ স্থন্দর করতে পারছে কি ?

[পাঞ্জাবী গায়ে ভবেশের প্রবেশ]

ভবেশ। অতএব আরো অ-স্থন্দর করে দাও। [স্থচেতাকে] দাও, ফর্দটা দাও। [স্থচেতা ফর্দ দেয়। তাতে চোখ বুলিয়ে] দু-কেজি মাংসেই তো যাবে চোদ্দ টাকা।

স্থচেতা। তার কমে হবে কেন ?

ভবেশ। হুঁ! থলে দুটো এনে দাও।

[স্থচেতা পাশের ঘরে চলে যায়।]

সোমেন। বুর্জোয়া অভ্যেস ছাড়তে সময় লাগে।

ভবেশ। কি বললে ?

সোমেন। এত ঘটা করে জন্মদিন করার কি দরকার ?

ভবেশ। খালি পেটে উৎসব হয় না, সোমেন।

সোমেন। জন্ম-মৃত্যু প্রকৃতির নিয়ম। তা নিয়ে উৎসব করার কী আছে!

ভবেশ। তবু মানুষ জীবনের পূজোই করে থাকে চিরদিন। সন্তানের দীর্ঘজীবন কামনা মা-বাপ করবে না ?

সোমেন। আমি কি তা অস্বীকার করছি!

ভবেশ। তবে জন্মদিনের　হবে তোমার আপত্তি কেন?

সোমেন। উৎসবে আপত্তি　ই, আপত্তি অপব্যয়ে। কত গরিব আছে যাদের দু-বেলা দু-মুঠো জোটে না।

ভবেশ। বটে! ইলেকশনে জয়ী হয়ে মুহুর্মুহু বোমা ফাটালে বুঝি অপব্যয় হয় না?

সোমেন। জনতার জয়ে জয়োল্লাশ হবেই।

ভবেশ। মানুষের মনে ত্রাস সৃষ্টি করে?

সোমেন। জনতার জয়ে দালালরা তো ভয় পাবেই। সাধারণ মানুষ কী বলে জানেন?

ভবেশ। কী বলে জানিনে, তবে কী ভাবে তা জানি। ভয়ে কেউ মুখ খোলেনা।

সোমেন। বলেন কী! এত শক্তি আমাদের?

ভবেশ। শক্তি কম বলেই ভয় দেখিয়ে মানুষকে স্তব্ধ রাখতে চাও। কিন্তু জানো অনেক সময় মুখর না হয়ে মৌন মুখই বেশি কথা বলে?

সোমেন। তাই যদি হবে তবে লোকে আমাদের সমর্থন করে কেন? বন্ধের একটা ডাক দিলে···

ভবেশ। সব অচল হয়ে যায়? জন-জীবন অচল করা সহজ, কিন্তু সচল করা বড়ো কঠিন। তোমরা চাও অচলকে আরো অচল করে দিতে—তাই কথায় কথায় বন্ধের ডাক ·····

সুচেতা। আজ আবার বন্ধ নাকি? [বলতে বলতে সুচেতার প্রবেশ। হাতে দুটো থলে]

সোমেন। না মাসিমা, মেসোমশাইর সঙ্গে একটা accademic discussion হচ্ছিল।

সুচেতা। আর পারি নে, বাবা। তোর মেসোমশাইর দর্শন আর তোদের শ্রেণীসংগ্রাম শুনে শুনে কান পচে গেল। আমরা যে কোন্ শ্রেণীর মানুষ বুঝতেই পারি নে।

ভবেশ। তোমরা? তোমরা গয়া প্যাসেঞ্জারের তৃতীয় শ্রেণী।

সুচেতা। তার মানে যত আবর্জনা······

(সোমেন হো হো করে হেসে উঠে)

ভবেশ। কিন্তু যাত্রীর ভীড় সেখানেই বেশি।

সুচেতা। বাজারটা হবে, না কী?

(সোমেন আবার হাসে)

ভবেশ। Yes Madam. Don't mind Somen. I am a Non-partisan. I try to understand all.

[ফর্দটা পকেটে ফেলে থলে দুটো হাতে নিয়ে বাইরে প্রস্থান]

সোমেন। মেসোমশাই ভারী মজার মানুষ। যখন তর্ক করেন তখন মনে হয় আমাদের তিনি সহ্যই করতে পারেন না। কিন্তু মনে মনে আমাদের তিনি সত্যিই ভালোবাসেন।

সুচেতা। আমি কিন্তু তোদের ঘৃণা করি।

সোমেন। তাই আদরের মাত্রা বেশি আর আমাদের আবদারও অশেষ।

সুচেতা। [মৃদু হেসে।] খুব হয়েছে, ভাগ। আমার কাজ আছে।

সোমেন। সুখেনকে আগেই ছেড়ে দেব। ওকে বেশিক্ষণ আটকে রাখবো না।

সুচেতা। আর তুই?

সোমেন। আসব বই কি।

সুচেতা। বেলা চারটে, না পাঁচটায়?

সোমেন। না না মাসিমা, বেশি দেরী করবো না। আপনার হাতের রান্না খাবার লোভ আমার ষোল-আনার জায়গায় আঠারো-আনা।

[সোমেনের প্রস্থান]

সুচেতা। লক্ষ্মীছাড়ার দল। এগুলোকে দেখলে গা-জ্বালা করে, আবার না দেখলেও পুড়ে মরি।

[ভবেশের বন্ধু জনার্দনের প্রবেশ]

জনার্দন। ভবেশবাবু আছেন তো?

সুচেতা। না, তিনি বাজারে গেছেন। বসুন।

[জনার্দনের চেয়ারে উপবেশন।]

জনার্দন। কী ব্যাপার সুখেনের মা? আজ আবার নিমন্ত্রণ কিসের?

সুচেতা। সুখেনের আজ জন্মদিন।

জনার্দন। ও। তার বন্ধুদের বললেই তো হতো।

সুচেতা। সুখেনের বাবার ইচ্ছে আপনার সঙ্গে বসে আমোদ করে খাবেন।

জনার্দন। ভবেশবাবু আগুনের মধ্যে দাঁড়িয়েও হাসতে পারেন। সেদিন ওনার কলেজে দক্ষযজ্ঞ হয়ে গেল পথে আমার সংগে দেখা। হাসতে হাসতে নির্বিকার চিত্তে সব বলে গেলেন, যেন কিছুই হয় নি।

সুচেতা। ওনার কথা ছেড়ে দিন।

জনার্দন। বললেন কি জানেন? বললেন মানুষ যেদিন প্রথম আগুন পেলে সেদিনও বুঝি উল্লাসে এমনি আত্মহারা হয়ে পড়েছিল। আগুনে যে পুড়ে মরতে পারে সে হুঁশও হয়তো তাদের ছিল না।

সুচেতা। ওনার সব কথাই সৃষ্টিছাড়া। বলেন হাসি কান্নায় তফাৎ নেই।—কেঁদে ও মানুষ হালকা হয় হেসেও মানুষ হৃদয়ের ভার লাঘব করে। থাক গে, বসুন। চা করে দিচ্ছি।

[সুচেতার পাশের ঘরে প্রস্থান। টেবিল থেকে একখানা বই টেনে জনার্দন পড়তে থাকে। প্রবেশ করে সুখেন, কমলেশ, অনুপম, শেখর ও অরবিন্দ।]

সুখেন। জনার্দন-কাকার স্কুলের খবর কি?

জনার্দন। আর বলো কেন বাবা! যা অবস্থা……

সুখেন। নতুন কিছু হলো নাকি?

জনার্দন। যে কোনোদিনই হতে পারে। মাষ্টার মশাইদের মধ্যেও তিনটে দল, ছাত্রদের মধ্যেও তিনটে। আমি হেডমাষ্টার কোন দলে যাই?

কমলেশ। যে-দল শিক্ষাকে বাঁচিয়ে রাখতে চায় সে-দলেই থাকবেন।

জনার্দন। তা হলে তো কথাই ছিল না। কোনো দলই চায় না স্কুলটা ঠিক মতো চলুক। তিন দলেরই চলেছে শক্তিপরীক্ষা। ত্রিশূলের ঘায়ে পড়াশুনো বন্ধ। আমি সাক্ষীগোপাল হয়ে সব দেখছি।

অনুপম। আপনি একটু শক্ত হলে।……

জনার্দন। ওরে বাবা! শৈব শাক্তের লড়াই- নিরামিষ নয়, আমিষ। এর মধ্যে শক্ত হতে গেলেই জানবার টানাদেবে। তাই অফিস ঘরটা এসে যখন তছনছ করছিল আমি তখন শুধু বসে বসে হাসছিলাম। বিজ্ঞ জনের মতো সংযমের বরফ চাপা দিয়ে স্নায়ুগুলোকে ঠাণ্ডা করে রাখলাম। কিছু বললেই তো অমনি বোম—ভোলানাথ। [সবাই হেসে উঠে] হাসবারই কথা বটে! বোমারুদের যুগে একটা বোমা ফাটলে রাজ্যিশুদ্ধ তোলপাড় হতো। এখন হাজার হাজার বোমা ফাটছে, কিন্তু কেউ গ্রাহ্যও করছে না। বুকের পাটা কি আমাদের কম। বৈপ্লবিক গতিবেগে আমরা মহাকাশযানও হার মানাতে চলেছি।

[চায়ের কাপ নিয়ে স্বচেতার প্রবেশ]

স্বচেতা। মিষ্টিতো আনা হয়নি যে, মিষ্টি মুখ করাবো। শুধু চাই দিতে হলো। [জনার্দনকে চা দেয়]

জনার্দন। আচমনটা গংগা জলেই হোক। মধ্যাহ্ন ভোজনে ষোড়শোপচার তো আছেই।

স্বচেতা। দেখুন আপনার বন্ধুবর কি আনতে কি এনে হাজির করেন।

জনার্দন। দ্রোপদীর হেঁসেলে এলে বিষও অমৃত হয়ে উঠবে।

স্বচেতা। ছেলেপিলেদের সামনে কি-যে বলেন।

জনার্দন। আমাদের নিয়ম নাস্তি। উপমায় দোষ নেই। তবে আজকাল হাস্য পরিহাসও করতে হয় সাবধানে। কখন কোন্ কথা বেফাঁস মুখ দিয়ে পড়বে আর অমনি শুনতে হবে—বুর্জোয়ার দালাল, চরম প্রতিক্রিয়াশীল। তাই Expression of Truthএর চেয়ে Suppression of Truthই ভালো।

স্বচেতা। না যাই, কাজ আছে। আপনার গল্প শোনার সময় এখন নেই।

জনার্দন। হ্যাঁ, হ্যাঁ, যান। নারী রন্ধনে আর বন্ধনেই।

স্বচেতা। রন্ধন না পেলে তো একবেলাও চলে না আপনাদের। শুকু, শুনে যা। তোমরা বসো বাবারা।

[স্বচেতা ও স্বখেনের প্রস্থান। যুবকদের চৌকিতে উপবেশন]

শেখর। আচ্ছা মাষ্টারমশাই, আপনার স্কুলে সেদিন যাঁরা হামলা করলো তারা কি বাইরের ছেলে?

জনার্দন। না, না, সবাই চেনা।

শেখর। তাদের নাম জানেন?

জনার্দন। জানি। (একটু থেমে) তবে জানলেও বলার উপায় নেই।

অরবিন্দ। ভয়ে?

জনার্দন। যাই বলো। তবে স্নেহ-মমতাও তো একেবারে খোয়াইনি।

অরবিন্দ। এসব সমাজবিরোধীদের প্রতিও আপনার স্নেহ-মমতা আছে।

জনার্দন। তা থাকবে না। জানি, ভুল করছে। এ-ভুল একদিন ভাঙবেই। শিক্ষার মাথায় কুড়োল মারলে, মনীষীদের মূর্তি ভাঙলেই শাসন-ব্যবস্থাটাও ভেঙে পড়বে এটা ওদের মাথায় কারা ঢুকিয়ে দিয়েছে। তাই স্নানের টবের ময়লা জলে ফেলতে গিয়ে বাচ্চাটাকেও ছুড়ে

ফেলে দিচ্ছে। ভুল সেদিন ভাঙবে যেদিন লক্ষ্য স্থির করতে ওদের কষ্ট হবে না।

অরবিন্দ। আপনাদের সহানুভূতি আছে বলেই ওদের সাহস বাড়ছে।

জনার্দন। কি করতে বলো? পুলিশে ধরিয়ে দেব?

কমলেশ। দরকার হলে তাও করতে হবে।

জনার্দন। তোমরা পারো, আমি পারিনে।

কমলেশ। সমাজবিরোধীদের প্রশ্রয় দেয়া চলে না।

জনার্দন। তা যদি বলো তাহলে তো অনেককেই ধরিয়ে দিতে হয়।

অনুপম। দেন না কেন?

জনার্দন। দিই নে কেন? থাক, উত্তরটা না দেয়াই ভালো।

শেখর। উত্তর থাকলে তো দেবেন।

জনার্দন। Do you want to provoke me?

কমলেশ। [শ্লেষ দিয়ে] চেপে যা শেখর। দুর্বল স্থানে ঘা দিতে নেই। মাষ্টার-মশাই রেগে যাচ্ছেন।

জনার্দন। [ক্ষুব্ধ কণ্ঠে] It's nothing but witch hunting. মতের অমিল হলেই কারো ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে দেয়া, যেভাবেই হোক তাকে জব্দ করা এখনকার একটা রোগ। এ-রোগ না সারলে আমরা শেষ হয়ে যাব, শেষ হয়ে যাবো।

[চায়ের কাপ হাতে নিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল হঠাৎ মনে হতে ফিরে এসে টেবিলের ওপর রাখলেন ও কারো দিকে না তাকিয়েই প্রস্থান করলেন।]

কমলেশ। বড্ড রেগে গেছেন।

অরবিন্দ। ভালোই হয়েছে। তা না হলে উঠতেন কি? বসে বসে শুধু জ্ঞান দিতেন।

শেখর। পুরোনো কমিটিটা ভেঙে দেবার পর থেকেই আমাদের ওপর হাড়ে-হাড়ে চটা।

অনুপম। ঘুঘুর বাসা না ভাঙলে ওই স্কুলে নাকগলাবার উপায় ছিল?

অরবিন্দ। অ্যাডমিনিষ্ট্রেটরের সঙ্গে কোনোভাবে কোওপারেশনই করলেন না উনি।

অনুপম। নতুন স্কুল কমিটির সঙ্গেও প্রায় ননকোওপারেশন।

কমলেশ। টিচার্স কাউন্সিলে ওরাই মেজরিটি।

শেখর। আর একটু চাপ দিতে পারলেই সব সোজা হয়ে আসবে।

কমলেশ। জনার্দনবাবু ধুরন্ধর। মুখে বলেন তিনি কোনো দলেই নেই, তলে তলে আমাদের বিরুদ্ধে শিক্ষক ও ছাত্রদের উস্কানি দিয়ে গণ্ডগোল পাকান।

অরবিন্দ। বেশি বাড়াবাড়ি করেন তো তাঁকে স্কুল ছাড়া করব।

[সুখেনের প্রবেশ]

সুখেন। তোরা একটু বোস্, আমি ঘুরে আসছি।

শেখর। কোথায় যাবি ?

সুখেন। তোদের মিষ্টিমুখ করাতে হবে না!

কমলেশ। এখন কিরে!

অনুপম। ডবল ডেকার।

অরবিন্দ। বাড়াবাড়ি করিসনে সুখেন।

সুখেন। আমার ইচ্ছেয় তো হবে না। মা চান···

শেখর। আর সুবোধ বালকের মতো অমনি চললি মিষ্টির দোকানে!

কমলেশ। মাসিমার ইচ্ছে পূরণ করতেই হবে।

অরবিন্দ। কমলেশ, তুই এমন পেটুক!

কমলেশ। দ্যাখ অরবিন্দ, তুইও কিছু কম যাসনে পেটে ভুখ মুখে লাজ।

অনুপম। বাড়াবাড়ি অবশ্য কিছুতেই ভালো নয়। তবে যদি মাসিমার ইচ্ছে হয়ে থাকে।—

শেখর। খাসা, অনুপম, খাসা। সত্যি তোর তুলনা নেই।

অনুপম। বেশি বকিস নে শেখর। পাতা চেটে খাওয়া অভ্যাস তার আবার অত কথা।

কমলেশ। [স্লোগানের ভঙ্গিতে] তবে মাসিমার ইচ্ছে পূরণ হোক, তাই হোক।

শেখর। যা সুখেন, নিয়ে আয়। আজ তোর জন্মদিনে খাইয়ে আমাদের একে- বারে ফ্ল্যাট করে দে।

[সবাই হেসে উঠে সুখেন বেরিয়ে যাই।]

কমলেশ। চল্ আজ সন্ধ্যার শো-য় সুখেনকে নিয়ে সবাই সিনেমায় যাই।

অনুপম। প্রস্তাবটা মন্দ নয়।

শিখর। মৃণাল সেনের ছবিটা ফার্স্ট প্রাইজ পেল!

অরবিন্দ। বুর্জোয়া গল্প, পাবেই।

কমলেশ। উৎপল দত্ত অভিনয় করেছে সত্যি চমৎকার!

অরবিন্দ। অতিবিপ্লবীর অবক্ষয়ী বাহার।

অনুপম। মাধবী তবে উর্বশী হলো?

শেখর। সিনেমার স্টাররা সবাই উর্বশী।

কমলেশ। এ-বছরের ফুটবল খেলাটা মাঠে মারা গেল।

অরবিন্দ। শোধনবাদীদের ভূমি দখল আন্দোলনটাও।

শেখর। ওটা স্রেফ ভাঁওতা।

কমলেশ। রাজন্য ভাতা দিয়ে বেশ চাল চেলেছে।

অনুপম। আরব ইসরাল বিরোধটা মিটবে বলে মনে হয় না।

অরবিন্দ। আরে আসলে ওটা ডলার-রুবলের ঝগড়া।

শেখর। মস্কো-বন আঁতাত হয়ে গেল।

অরবিন্দ। শোধনবাদের ওটাই চরিত্র।

কমলেশ। এই, সোনালীর বিয়েতে কি দিবিরে?

শেখন। আজই তা ভাবতে হবে!

কমলেশ। তবু?

অনুপম। সবাই মিলে যা হয় একটা কিছু কিনে দেওয়া যাবে।

[একবাক্স সন্দেশ নিয়ে সুখেনের প্রবেশ]

সুখেন। একটু দেরী হয়ে গেল। দোকানে যা ভিড়।

শেখর। কেন? বিয়ের মতো জন্মদিনেরও লগনশা নাকি?

সুখেন। অন্তত মিষ্টিমুখের লগন যে এক তাতো দেখতেই পাচ্ছিস।

[সুখেনের কক্ষান্তরে প্রস্থান।]

অনুপম। সুখেনের মনটা খুব সরল।

অরবিন্দ। ভয় তো সেখানেই। কখন যে কিসে ওর সেন্টিমেন্টে লাগবে।

সুখেন। [নেপথ্য থেকে] না মা, ও ফোঁটা আমি পরতে পারব না। [বলতে বলতে সুখেন ঢোকে, পিছনে একটা চন্দনবাটি, ধান, দূর্বা ও সন্দেশের বাক্স নিয়ে সুচেতার প্রবেশ]

সুচেতা। জন্মদিনে মায়ের হাতে একটা ফোঁটা নিলে তোর বিপ্লব পেছিয়ে যাবে না শুকু।

সুখেন। না-না, হাতে মিষ্টি দেবে নাকি দাও। ওসব রাখো।

শেখর। লজ্জা করে নাকি সুখেন? আমরা না হয় চোখ বুজি।

সুচেতা। ফাজলামো রাখ্।

কমলেশ। বটে! দেখি তুমি কেমন করে ফোঁটা না নিয়ে পার। ধর তো সবাই ওকে।

[সবাই মিলে সুখেনকে জাপটে ধরে]

সুখেন। কি হচ্ছে এসব?

শেখর। দিন তো মাসিমা ওর কপালে চন্দনের ফোঁটা।

[সুচেতা প্রথমে চন্দনের ফোঁটা ও পরে ধান-দূর্বা দিয়ে আশীর্বাদ করে। সবাই মুখে আঙুল দিয়ে নকল জোকার দেয়। সুচেতা হাসে।]

সুখেন। ফাজিলের দল!

শেখর। শুভদিনের শুভ কাজ।

[সুখেনকে সবাই ছেড়ে দেয়।]

অনুপম। কই মাসিমা, আমাদের ফোঁটা দিলেন না?

শেখর। (অনুপমকে পেছনে সরিয়ে) অনুপম পরে, আমি আগে ফোঁটা নেব

অরবিন্দ। শেখরের আহ্লাদ বেশি। (এগিয়ে গিয়ে) আমাকে আগে ফোঁটা দিন মাসিমা।

কমলেশ। অরবিন্দ গবানন্দ সরো। মাসিমা আমাকে বেশি ভালোবাসেন। আমার দাবি আগে।

সুচেতা। (মৃদু হেসে) তোদের সবাইকে আমি ভালোবাসি। লাইন করে দাঁড়া

[সবাই লাইন করে দাঁড়ায়। সুচেতা সবাইকে ফোঁটা দেয়।]

কমলেশ। কই মাসিমা, আশীর্বাদ করলেন না?

সুচেতা। সবাই দীর্ঘজীবী হ, আর তোদের সুমতি হোক। [সবাইকে সন্দেশ দেয়। দেবতার প্রসাদ নেবার মতো ভঙ্গি করে জোড় হাতে তারা সন্দেশ নেয়। সুখেন তা করে না]

সুচেতা। সুখেন ওদের জল এনে দে।

[সুখেন কক্ষান্তরে যায়।]

কমলেশ। এইরে, মাসিমাকে প্রণামই করা হয়নি।

শেখর। তাই তো, সন্দেশের লোভে ভুলে গেছি।

[সবাই সুচেতাকে প্রণাম করে। সুখেন একটা কাঁচের গ্লাস ও কেটলিতে করে জল নিয়ে আসে]

অনুপম। এই সুখেন, মাকে প্রণাম কর। খালি মায়ের আদর নেয়া, প্রণাম করার নাম নেই।

[সুখেন মাকে প্রণাম করে। বন্ধুরা একগ্লাসে জল ভরে খেতে থাকে।]

সুচেতা। বোস। তোদের চা করে দিচ্ছি।

[সুচেতার কক্ষান্তরে প্রস্থান]

অরবিন্দ। জন্মদিনের প্রথম পর্ব তো হলো। আসল কাজের কথা হোক এবার।

শেখর। কাজ তো ঠিক হয়েই আছে। আজকের মিছিলটা জোর হওয়া চাই।

সুচেতা। (নেপথ্য থেকে) শুধু কেটলিটা দিয়ে যা বাবা।

[কেটলি নিয়ে সুখেনের প্রস্থান]

কমলেশ। কাল মিছিল করে ওরা চ্যালেঞ্জও করেছে। তার উচিত জবাব আমাদের দিতেই হবে।

অনুপম। স্লোগানগুলো বেশ কড়া হওয়া দরকার।

শেখর। কী কী স্লোগান হবে?

অরবিন্দ। এখানে নয় পার্টি অফিসে গিয়ে ঠিক হবে।

[সুখেনের প্রবেশ]

কমলেশ। সুখেন, মিছিলে যাবি তো? না ঘরে বসে শুধু জন্মদিনই করবি?

সুখেন। পার্টির ডাকে যাইনি এমন হয়েছে কোনোদিন।

কমলেশ। না, বলছিলাম, মাসিমার আপত্তি থাকতে পারে তো?

সুখেন। মা কখনো আমাকে বাধা দেন না।

অরবিন্দ। এগারোটায় মিছিল বেরুবে। আর দেরি করা ঠিক হবে না। বেরুবার আগে মিটিং-এ সব ঠিক করে নিতে হবে।

কমলেশ। ভালোভাবে তৈরি হয়ে বেরুতে হবে। (হাত মুঠ করে দেখিয়ে) মাল-মশলা সব ঠিক আছে তো?

অরবিন্দ। চুপ কর। এমন মুখ পাতলা তুই।

[সুচেতা ট্রে-তে করে চা নিয়ে আসে। সবাই চা নেয়।]

সুচেতা। গত সনে এমন দিনে সুনীতি তোদের মধ্যে ছিল। সারাদিন থেকে কত আনন্দ করল।

অরবিন্দ। আমাদের সঙ্গে তার পোষাল না। আমরা নাকি নয়া-শোধনবাদী।

শেখর। বন্দুকের নলে শক্তি খুঁজে বেড়াচ্ছে সে এখন।

কমলেশ। পার্লামেন্ট শুয়োরের খোঁয়াড়।

অনুপম। জোতদার খুন করো।

শেখর। বোমা মেরে সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান উড়িয়ে দাও।

সুচেতা। মরণবুদ্ধিতে পেয়েছে ওদের। যেমন মারছে তেমন নিজেরাও মরছে।

অরবিন্দ। এসব ছেলেমানুষি করে বিপ্লব হয়না, মাসিমা। বিপ্লবের একমাত্র পথ শ্রেণীসংগ্রাম। অন্ধকারে গুপ্তহত্যা বা ব্যক্তিগত খুনের নীতিতে আমরা বিশ্বাসী নই।

সুখেন। এসব আলোচনা এখানে না করলে হয় না তোদের?

সুচেতা। (বিরক্তভাবে) এসব অলোচনা ছাড়া অন্য কথা তোরা বলিস কখন? সর্বদাই তো কানে আসে—হঠকারীদের খতম করো,—খুনকা বদলা খুন হ্যায়…… [দ্রুতপদে প্রস্থান]

অরবিন্দ। মাসিমাকে কেউ ভুল বুঝিয়েছে।

শেখর। শ্রেণীসংগ্রাম সম্পর্কে ধারণা এখনো পরিষ্কার হয়নি।

কমলেশ। আরো পড়াশুনো করা দরকার।

অনুপম। সুখেন পার্টিলিটারেচার বাড়িতে আনা দরকারই মনে করে না।

সুখেন। মোটেই তা নয়। মাকে পড়তে বললেই বলেন…ঢের পড়েছি। তোরা তো এক তরফা কথা বলিস।

অরবিন্দ। বিপ্লবীরা যে এককথাই বলে সেটা বুঝিয়ে দেয়া তো আমাদের কাজ।

সুখেন। সুনীতি আমাদের এ-কথাটায়ই আপত্তি করতো। সে বলতো—বিপ্লবীরা তো যন্ত্র নয় যে তাদের মনে প্রশ্ন থাকবে না।

অরবিন্দ। আমরা বিপ্লবের সৈনিক। পদে পদে প্রশ্ন তুললে সৈনিক সংগ্রাম করতে পারে না। সেনাপতির আদেশ মেনে চলাই তার কাজ। পার্টি ডিসিপ্লিন না মানলে বিপ্লবী পার্টির সভ্য থাকা চলে না।

অনুপম। ব্যক্তিগত জীবনেও?

অরবিন্দ। বিপ্লবীর কোনো ব্যক্তিগত জীবন থাকতে নেই।

সুখেন। ভুল করি আমরা সেখানেই যেখানে মনে করি দরদীরাও পার্টি সভ্যেরই মতো।

অরবিন্দ। সুখেন।

সুখেন। হ্যাঁ তাই। আমরা আমাদের মতটাকে সবাইর ওপর জোর করে চাপিয়ে দিতে চাইনে কি?

অরবিন্দ। কথ্‌খনো না।

সুখেন। তা হলে কারো মনে প্রশ্ন জাগলে আমরা তা চাপা দিতে চাই কেন?

অরবিন্দ। সুখেন, তোকেও কি সুনীতের রোগে পেল নাকি?

সুখেন। হাজার মনে হাজার প্রশ্ন উঠবে। তার উত্তর আমাদের দিতে হবে।

অরবিন্দ। শ্রেণীসংগ্রামের শত্রুরাই হাজার প্রশ্ন তুলছে।

সুখেন। লক্ষ মনে যদি লক্ষ প্রশ্ন থাকে তবে তা দাবিয়ে দেবার সাধ্য আমাদের নেই।

অরবিন্দ। লক্ষ জনের কথা ছেড়ে দে। বল তোর মনে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে।

সুখেন। সে প্রশ্নেরও উত্তর দিতে হবে। কারণ আমি যখন পার্টির একজন সভ্য তখন সেটা আমার একার প্রশ্ন নয়। নিশ্চই য়বহুজনের প্রশ্ন।

অরবিন্দ। নেতৃত্বকে প্রশ্ন করিস—সেখান থেকেই উত্তর পাবি।

সুখেন। না। আমরা এখানে একসঙ্গে কাজ করি। নিজেদের মধ্যে আলোচনা করেই উত্তর খুঁজে পেতে হবে।

অরবিন্দ। কেন্দ্রীয় নেতৃত্বকে অস্বীকার করে?

সুখেন। আমার মাকে কেন্দ্রীয় নেতারা চেনেন?

অরবিন্দ। তা কি করে সম্ভব।

সুখেন। আমার মায়ের মতো যদি আরো অনেক মায়ের প্রশ্ন থাকে?

অরবিন্দ। সব প্রশ্নের উত্তর দেয়া সম্ভব নয়।

সুখেন। এই করেই সুনীতের মতো সাচ্চা কমরেড কে আমরা হারিয়েছি।

অনুপম। তাকে রাখতে হলে তো তার মতবাদটা মেনে নিতে হতো?

কমলেশ। তার অর্থ জনারণ্য ছেড়ে অরণ্যে গিয়ে বিপ্লব করা।

সুখেন। না। তাকে আমরা প্রকৃত রাজনীতি দিতে পারিনি।

অরবিন্দ। তুই দিলেই পরতিস।

সুখেন। পারিনি, কারণ আমার রাজনৈতিক জ্ঞান তোদের কারো চাইতে বেশি নয়।

শেখর। এখন তো খুব জ্ঞান দিচ্ছিস।

সুখেন। শেখর, বিদ্রূপ করে লাভ নেই। সুনীতির কথা শুনেও তোরা এভাবেই বিদ্রূপ করতিস। প্রশ্ন তাকে পাগল করে তুলেছিল, পথ চেয়েছিল সে তার সততার অভাব ছিল না। পথ না পেয়ে সেই বৈপ্লবিক প্রেরণাই তাকে ভুলপথে নিয়ে গেল।

কমলেশ। অরবিন্দ, এখন থেকে পার্টির কাজকর্ম শিকেয় তুলে রেখে মার্কস-বাদের একটা টোল খুলে দে।

অনুপম। আমরা ব্রহ্মচারী হয়ে সেখানে জ্ঞান অর্জন করবো।

সুখেন। পরিহাস! প্রশ্নকে পরিহাস করলে তোরা নিজেরাই একদিন পরিহাসের পাত্র হয়ে উঠবি।

অরবিন্দ। (সুখেনকে) তুই তাহলে মিছিলে যাচ্ছিস নে?

সুখেন। কেন যাবো না। প্রশ্ন থাকলেও পার্টির প্রতি আনুগত্য তোদের কারো চাইতে আমার কম নয়।

অরবিন্দ। That's like a comrade. চল্, আর দেরি নয়।

শেখর। চল, চল্, উত্তর যারা চেয়েছে তাদের উত্তর দিয়ে আসি। সুনীতের দল আজ উচিত জবাব পাবে।

[একে একে সবাই বেরিয়ে যায়। সুখেন বেরুতে যাবে এমন সময় সুচেতা প্রবেশ করে]

সুচেতা। শুকু।

সুখেন। (থমকে দাঁড়িয়ে) বলো মা।

সুচেতা। এখন না বেরুলেই নয়।

সুখেন। দেরী হবে না। যাব আর আসব।

সুচেতা। মনে হয় আজ তোরা একটা কিছু করবি।

সুখেন। কিছু না। মিছিল তো আমার ফি-রোববারই বার করি।

সুচেতা। কি একটা আলোচনা হচ্ছিল তোদের। আমি থাকায় চেপে গেলি।

সুখেন। এত ভয় কেন মা তোমার!

সুচেতা। কোন্ মা আজ ভয়ে ভয়ে না আছেরে? সবাইকে ভয় দেখানই তো আজ রাজনীতি। ভালোবাসা দিয়ে কেউ কাছে টানতে চায় না, চায় ভয় দেখিয়ে জয় করতে।

সুখেন। সবাইকে ভালোবাসা যায় না, মা। শত্রুকে ঘৃণা করতেই হবে। গান্ধীবাদের যুগ আর নেই।

[সুখেনের প্রস্থান। সুচেতা বিস্মিত হয়ে খানিকক্ষণ চেয়ে থাকে ও পরে কাপ-ডিসগুলো ও কাঁচের গ্লাসটা ট্রেতে তোলে। বাজার নিয়ে ভবেশের প্রবেশ]

সুচেতা। এত দেরি করলে! কখন রেঁধে নামাব?

ভবেশ। কি করব। আধ ঘণ্টা লাইনে দাঁড়িয়ে তবে মাংস পেলাম। মনে হচ্ছিল এর চেয়ে নিজের গায়ের মাংস কেটে খাওয়া ভালো।

সুচেতা। ভেব না। দু-দিন বাদে হয়ত মানুষ মানুষের মাংসই খাবে।

[ট্রে টা রেখে দিয়ে বাজার নিয়ে সুচেতা কক্ষান্তরে যায়। ভবেশ একটা চেয়ারে বসে ক্লান্তি দূর করে।]

ভবেশ। [স্বগত] সুচেতা মিথ্যে বলেনি। সময় সময় মনে হয় আদিম মানুষের হিংস্রতা মরেনি শুধু ভব্যতার আবরু পড়ে আছে। প্রতি-হিংসার ব্যারোমিটার চড়লেই আবরুটা ফেলে দিয়ে সেটা ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে।

[জনার্দনের প্রবেশ]

জনার্দন। ভবেশবাবু আছেন, ভালোই হলো।

ভবেশ। বসুন।

জনার্দন। [চৌকির ধারে বসে] দেখুন, দুপুরে আমার আসা সম্ভব হবে না। রাত্রের দিকে এসে আমি যা হয় চারটি মুখে দিয়ে যাব।

ভবেশ। কেন দুপুরে অসুবিধা কি? আজ রোববার আপনার স্কুল নেই।

জনার্দন। স্কুল থাকলেও আটকাতো না। ক্লাশ আর হচ্ছে কই! ঘণ্টা পড়ে, মাস্টার মশাইরা হাজিরা খাতায় সই করেন, তারপরে চলে যান। এসে একদল ছাত্র বললে, আজ আমাদের অমুক কারণে স্কুল বন্ধ। পরদিনই বিরুদ্ধ পক্ষের অন্যদল এসে শ্লোগান দিতে শুরু করল।— অমুকের প্রতিবাদে ছাত্র ধর্মঘট। কোনোদিন বেঞ্চি ও চেয়ার টেবিল ভাঙলো, কোনোদিন বা হাতাহাতি ঘুষোঘুষি হয়ে গেল। তারপর দপ্তরীকে বলি ছুটির ঘণ্টা বাজিয়ে দিতে। যাত্রার আসর ফাঁকা হয়ে যায়। তখন একা বসে থেকে স্কুল পাহারা দেবার তো মানে হয় না। আমিও চলে আসি।

ভবেশ। স্কুল-কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় কোথায়ই বা লেখা পড়া হচ্ছে বলুন? ছাত্রদের খাতায় নাম রাখতে হয় তাই রাখে। মাইনে পাই বলে যেতে হয়, আমরা যাই। ক্লাশের বেঞ্চগুলোর যদি চোখ কান ও মস্তিষ্ক থাকত ক্লাস করা চলতো। তা যাই হোক, এ-বেলাই আসছেন তো?

জনার্দন। না, দেখুন, বলছিলাম কি··· [ইতস্তত করে] বলল?

ভবেশ। বলুন না। অত কিন্তু কিন্তু কচ্ছেন কেন?

জনার্দন। বলছিলাম, এ-বেলা তো সুখেনের বন্ধুরা আমোদ আহ্লাদ করে খাবে…

ভবেশ। তা খাবে ওরা। আর সব পাড়ারই তো ছেলে। আপনার কিছু অসুবিধা হবে না।

জনার্দন। না, না, অসুবিধে হবে কেন, অসুবিধে হবে কেন। তবে ওদেরই বাধো বাধো ঠেকবে। প্রাণখুলে আমোদ করতে পারবে না।

ভবেশ। আপনার জন্যে না হয় আলাদা ঘরে ব্যবস্থা করা হবে।

জনার্দন। না, না, সেটাও ভাল দেখাবে না। এক বাড়িতে খেতে এসে একটা আলাদা আলাদা ভাব ভালো কি? তার চেয়ে বরং…

ভবেশ। আপনার আটকাচ্ছে কোথায় বলুন তো জনার্দনবাবু?

জনার্দন। তবে খুলেই বলি। [সুচেতা এসে ট্রে নিয়ে যায়] দেখুন ভবেশবাবু এক জায়গায় যদি পাঁচটা বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়, একেবারে মুখ বুজে থাকা যায় না।

ভবেশ। মুখ বুজে থাকার দরকারই বা কি?

জনার্দন। আপনি যদি সব কথায়ই সায় দিয়ে যান তবে সেটা খোশামোদের মতো শোনায় না কি?

ভবেশ। তা তো বটেই।

জনার্দন। কোনো অসঙ্গত কথা শুনে প্রতিবাদ না করাটাও সত্যকে চাপা দেয়ারই সামিল।

ভবেশ। ভীরুতাও বলতে পারেন।

জনার্দন। সত্য প্রকাশে সাহস দেখালে আপনি হয়তো অপমানিত হবেন। [সুচেতা ঢুকে দুটো করে সন্দেশ দু-জনকে দেয়। দু-কাপ চা ও দু-গ্লাস জল রেখে প্রস্থানোদ্যত হয়]

জনার্দন। আবার সন্দেশ কেন?

সুচেতা। খুকুর জন্মদিনে মিষ্টিমুখ করবেন না। [সুচেতার প্রস্থান]

ভবেশ। সুখেন আপনাকে কোনো অপমানজনক কথা বলেছে নাকি?

জনার্দন। [খেতে খেতে] না, না, সুখেন করতে পারে না। সে তেমন ছেলেই নয়। কিন্তু সবারই মুখে তো লাগাম নেই। আকার-ইঙ্গিতে এমন একটা তাচ্ছিল্যের ভাব দেখায় সেটা চুপ করে বসে থেকে সহ্য করা

মুশকিল। আমাদের ভেতরের আগুন নাকি শেষ হয়ে গেছে। আমরা এখন উনুনের বাসী ছাইয়ের মতো আবর্জনা মাত্র। ওদের শ্রেণীসংগ্রামের তত্ত্বটা তাই আমাদের মাথায় ঢোকে না। আমরা নাকি এখন চতুষ্পদ জন্তুর মত গলিত চর্বন করি।

ভবেশ। শক্তির দাপাদাপি যেখানে, অপচয় সেখানেই জনার্দনবাবু।

জনার্দন। [খেতে খেতে] শেক্সপীয়র সেজন্যেই তাঁর fool-এর মুখ দিয়ে বলিয়েছেন: Speak less have more than thou showest than thou knowest.

ভবেশ। শেক্সপীয়র মানব চরিত্রের খবর ভালো রাখতেন কিনা। ...

[দু-জনে চায়ের কাপ হাতে নেয়। দূরে একটা উত্তেজিত জনতার কোলাহল শোনা যায়। দু-জনেই উৎকর্ণ হয়ে ওঠেন। অকস্মাৎ অনতিদূরে একটা বোমার আওয়াজ হয়। রাস্তা দিয়ে লোকজনকে ছুটোছুটি করতে দেখা যায়। কোলাহল বাড়ে। সুচেতা উদ্বিগ্ন হয়ে প্রবেশ করে। রাস্তার দিকে তাকায়।]

সুচেতা। কি হলো! বুঝতে পারছি নে। [সোমেন ছুটতে ছুটতে দোর গোড়ায় এসে দাঁড়ায়। তার হাতে একটা লম্বা লাঠি।]

সুচেতা। কি হলো সোমেন?

সোমেন। সুখেনকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

তিনজন। [এক সঙ্গে] খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না!

সোমেন। হ্যাঁ, আমাদের সঙ্গেই ছিল। বোমা ফাটার পর আমরা ছিটকে পড়ি। তারপর থেকে সুখেনকে আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

সুচেতা। আমি জানতাম, আমি জানতাম আমার এমন সর্বনাশ হবে। আমি খুঁজে বার করবো, যেখান থেকেই হোক আমার গুকুকে খুঁজে বার করবো।

[হঠাৎ সুখেনের প্রবেশ]

সুখেন। মা!

সুচেতা। এসেছিস বাবা, এসেছিস। হাজার দিন তোকে বারণ করেছি...।

সুখেন। সেসব কথা এখন থাক, মা। সোমেন তোরা কেন রটিয়েছিস আমাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না?

সোমেন। কোথায় ছিলি এতক্ষণ?

সুখেন। যেখানেই থাকি, আমি যে মরিনি তা তো দেখতেই পাচ্ছিস। এখন যা।

সোমেন। তুই যাবিনে?

সুখেন। পরে যাব।

সোমেন। মায়ের আঁচল ধরে থাকবি? You are a coward.

[রাগতভাবে সোমেনের প্রস্থান]

ভবেশ। [চা শেষ করে] Sometimes cowardice is better than bravery.

জনার্দন। [কাপ রেখে] আমি এখন উঠি।

ভবেশ। একটু দেখে যান। Stray dogs are about.

জনার্দন। এখানেও তো বিপদ হতে পারে।

ভবেশ। বিপদের সময় সাহস করে দাঁড়াতে হবে। এড়িয়ে নিরাপদ হতে পারবেন না। [আবার কোলাহল]

সুচেতা। শুকু, কি হয়েছে বল?

সুখেন। বুঝতেই পারছো।

সুচেতা। বোমা ফাটালো কারা?

সুখেন। সে কথা পরে বলবো। সুনীতকে বোধহয় বাঁচানো গেল না, মা।

সুচেতা। কেন, কি হয়েছে তার?

সুখেন। ধরা পড়েছে।

সুচেতা। পুলিশের হাতে?

সুখেন। না।

সুচেতা। ও বুঝেছি। খুব মারছে বুঝি?

সুখেন। মা, সুনীত এখন আমাদের শত্রু। আমি দেখলাম ঘোষ বাড়ির পেছনের গলি দিয়ে হেঁটে চলেছে। ওকে দেখে কেমন মায়া হলো। বললাম, সুনীত, শত্রু হলেও আমি চাইনে তুই খুন হোস। বাঁ দিক দিয়ে পালিয়ে যা। ডানদিকে গেলে ধরা পড়বি। শুনে সে বললে, আত্মরক্ষা কি করে করতে হয় আমি জানি। আমি তোকে সহ্য করতে পারিনে। যদি বাঁচতে চাস এই মুহূর্তে আমার চোখের সামনে থেকে দূর হ।

সুচেতা। তারপর ?

সুখেন। তারপর আর বলতে পারব না, মা। এতক্ষণ সে বেঁচে আছে কি নেই…

সুচেতা। তাকে বাঁচাতেই হবে। আমি তাকে বাঁচাবো…আমি যে মা…।

[গমনোদ্যত হয়]

ভবেশ। আমিও যাব।

সুচেতা। না, তুমি শুকুকে আগলাও।

সুখেন। আমি কোথাও যাব না, মা।

সুচেতা। না—না, আমি তোদের কাউকে বিশ্বাস করিনে, কাউকে বিশ্বাস করিনে। একাই যাবো আমি, একা—আমি যে মা।

[কোলাহল স্পষ্টতর হয়। সুখেন জানলার ধারে দাঁড়ায় ও বাহিরের দিকে তাকিয়ে থাকে।]

জনার্দন। কেমন হলো !

ভবেশ। অনেকক্ষণ মেঘের আড়ালে ঢাকা থাকার পর আকাশে সূর্যটা হঠাৎ দেখা দিলে আলোটা প্রথমে খানিকটা চোখ ধাঁধিয়ে দেয়, জনার্দন বাবু।

জনার্দন। আপনি আলো দেখতে পাচ্ছেন—আমি তো দেখছি শুধু অন্ধকার।

ভবেশ। উষার আলো দেখা দিবার আগে অন্ধকার বেশি হয় জানেন তো ?

জনার্দন। যা অবস্থা তাতে আর সূক্ষ্ম কথা মাথায় ঢোকে না মশাই।

ভবেশ। সূক্ষ্ম অনুভূতি ছাড়া তো আপনি স্থুলত্বকে আঘাত করতে পারবেন না।

জনার্দন। তার মূল্য দেয় কে।

ভবেশ। দেবে-দেবে, একদিন দেবে। তাৎক্ষণিক বিপর্যয়ে মানুষের উপর বিশ্বাস হারাবেন না।

জনার্দন। আমার ভালো লাগছে না। সুখেনের মা একা গেলেন……

ভবেশ। আপনি ভাববেন না। সুচেতা একাই একশো।

সুখেন। [ব্যাকুল কণ্ঠে] সুনীতকে ওরা মারতে মারতে নিয়ে যাচ্ছে……

[ভবেশ, জনার্দন জানালার কাছে যায়।]

জনার্দন। কি ভয়ঙ্কর। একজন থান ইট তুলেছে ওকে মারতে। এ-দৃশ্য আর আমি দেখতে পারছিনে। চোখের সামনে খুন হয়ে যাবে অথচ কিছু করার নেই। কি অসহায় আমরা। [জনার্দন একটা

চেয়ারে বসে মাথা হেট করে ভাবতে থাকে। কোলাহল বাড়ে। ভবেশ এসে জনার্দনকে সুস্থ করার চেষ্টা করে।]

সুখেন। [উল্লাসে] মা ছুটে গিয়ে সুনীতকে জড়িয়ে ধরেছে। না ওরা কিছুতেই ছাড়বে না। মা সুনীতকে বুকের নিচে রেখে নিজের মাথাটা ওদের দিকে বাড়িয়ে দিয়েছে।

জনার্দন। [দুর্বল কণ্ঠে] ওরা মারছে না তো ?

সুখেন। না মারতে পারছে না। মার সঙ্গে তর্ক করছে।

ভবেশ। ওরা হার মানবেই, মানতেই হবে। হাজার মুষ্টির চেয়ে একটা মায়ের প্রাণে শক্তি বেশি।

জনার্দন। তাই হোক্ ভবেশবাবু, তাই হোক।

সুখেন। সুনীতকে মা নিয়ে আসছে।······ওরাও আসছে পিছনে পিছনে।

জনার্দন। [বিচলিত কণ্ঠে] এখানে এসে হামলা করবে না তো ?

ভবেশ। আগুনে জল ঢালতে গেলে নিজের গায়ে খানিকটা তাপ লাগে বৈকি। তা-বলে আগুনকে তো আর বাড়তে দেয়া যায় না। অত বিচলিত হবেন না। যত ভয় পাবেন ততই ওদের ভয় দেখাবার সাহস বাড়বে। [সুনীতকে নিয়ে সুচেতার প্রবেশ। সুনীতের কপালে দু-এক জায়গা দিয়ে রক্ত ঝরছে। সুখেনের চোখে চোখ পড়তেই চোখ নামিয়ে নেয়। সুখেনকে বিষণ্ণ দেখায়। বাইরে চিৎকার—খুনীকে আমরা ছাড়বো না—ওর বিচার হবে। কাউকে রেহাই দেব না—খুনীকে যারা আশ্রয় দেয় তারাও খুনী—খুনের বদলে খুন চাই—হঠকারীর রক্ত চাই—ইত্যাদি]

সুচেতা। [ভবেশকে] ওকে পাশের ঘরে নিয়ে যাও। আলমারিতে ডেটল আছে ক্ষতস্থানে লাগিয়ে দাও। দরকার হলে ব্যাণ্ডেজ করে দিয়ো।

[ভবেশ ও সুনীতের প্রস্থান]

সুখেন। আমিও ওর কাছে যাই।

সুচেতা। না, তোর বাবা একাই পারবে।

জনার্দন। [ভয়ে কাঁপছে] আমি কি করবো ?

সুচেতা। এখানেই চুপ করে বসে থাকুন। আপনি কোনো কথা বলবেন না।

[সুচেতা উদ্বিগ্ন হয়ে পায়চারি করতে থাকে। অরবিন্দ, কমলেশ,

শেখর, অনুপম, সোমেন ও তাদের সঙ্গে আরো তিন-চার-জন যুবক ঘরের মধ্যে ঢোকে]

সুচেতা। কি চাই তোদের ?

সোমেন। সুনীতকে চাই।

সুচেতা। পাবিনে।

অরবিন্দ। আপনি তাকে আটকিয়ে রাখতে পারবেন না।

সুচেতা। আমার দেহে প্রাণ থাকতে তোরা তাকে নিয়ে যেতে পারবি নে।

জনৈক যুবক। বোমা মেরে বাড়ি উড়িয়ে দেব।

সুচেতা। [এগিয়ে গিয়ে ক্রুদ্ধ কণ্ঠে] মার না—এখনই মার না।

দ্বিতীয় যুবক। মারবোই তো ?

অরবিন্দ। [ধমক দিয়ে] এই, চুপ কর। মাসিমা, আপনি আমাদের লোক। আপনি যদি শত্রুকে প্রশ্রয় দেন পরিণাম খারাপ হবে।

সুচেতা। তোদের লোক বলেই তো সুনীতকে বাঁচাবো। এ-সর্বনাশা পথ তোরা ছাড়। এমন তো তোরা ছিলিনে। এ খুনের নেশা তোদের মাথায় কে ঢোকালো। ভাইয়ের বুকে ভাই ছুরি বসাবে, ধারালো অস্ত্র দিয়ে ধড় থেকে মুণ্ডু খসাবে, অন্ধকারে খুন করবে—বন্ধু বন্ধুকে চিনবে না, ভাই ভাইকে বিশ্বাস করতে পারবে না।······

অরবিন্দ। শ্রেণীসংগ্রামে তাই হয়, মাসিমা। সমস্ত সম্পর্ক বদলে যায়।

সুচেতা। হাঁ, মা-ছেলে, ভাই-বন্ধু, প্রতিবেশী, সবাইর সম্পর্ক বদলে যায় ! শ্রেণীসংগ্রাম ! প্রতিদিন খবরের কাগজ খুলি আর মন বিষাদে ভরে যায়। খালি খুন আর খুন। শ্রমিক শ্রমিককে খুন করছে। কৃষক কৃষককে খুন করছে, বন্ধুর বুকে বন্ধু ছুরি বসাচ্ছে। এই কি তোদের বিপ্লব ? যাদের তোরা শত্রু বলিস সেই টাটা-বিড়লাদের কতটুকু ক্ষতি হচ্ছে এতে ? প্রাণভয়ে মানুষ অস্থির। একদিকে পুলিশের দাপট, আরেক দিকে বিপ্লবের নামে নিজেদের মধ্যে খুনোখুনি। কোন দিকে যাবে মানুষ।

সোমেন। আপনাকে রাজনৈতিক জ্ঞান দিতে হবে না।

সুচেতা। জ্ঞান তো তোরাই দিস। শুনতে ভালো না লাগে চলে যা।

শেখর। সুনীতকে দিন। আমরা চলে যাচ্ছি।

সুচেতা। কি করবি তাকে নিয়ে ?

কমলেশ। তার বিচার হবে।

সুচেতা। কি করেছে সে?

সোমেন। সে বোমা মেরেছে।

জনার্দন। বোমা মেরেছে, তাকে পুলিশের হাতে দিলেই হয়।

সোমেন। চুপ করুন আপনি। ভেজা বেড়ালটি হয়ে বসে আছেন। আপনাদের প্রশ্রয় পেয়েই তো ওরা···

অনুপম। মাসিমা, ঝামেলা বাড়াবেন না। এরপর জনতা যদি আপনার বাড়িতে এসে হামলা করে আমরা ঠেকাতে পারব না।

সুচেতা। [দৃপ্তকণ্ঠে] জনতা! আসুক-না জনতা। সেই জনতার মুখগুলোকে ভালো করে চিনে নেওয়া যাবে।

অরবিন্দ। সুনীতকে ছেড়ে দিন। আমরা ওর কিছু করব না।

সুচেতা। ওকে মারা হলো কেন?

অরবিন্দ। ছেলেরা উত্তেজিত হয়ে মেরেছে।

সুচেতা। তোরা তো ছিলি, ঠেকালিনে কেন?

অরবিন্দ। ও ঠেকানো যায় না।

সুচেতা। তবে সুনীতকে তোদের হাতে ছেড়ে দেব কোন্ ভরসায়।

সোমেন। রাখতেও পারবেন না। তাকে ছিনিয়ে নিয়ে যাব। গণ-আদালতে তার বিচার হবে।

সুচেতা। বিচার। আগে নিজেদের বিচার কর—তার পর করবি অন্যের বিচার।

অরবিন্দ। সুনীত বোমা মেরেছে এটাতো সত্য।

সুখেন। না সুনীত বোমা মারেনি।

অরবিন্দ। তবে কে মেরেছে?

সুখেন। কে মেরেছে তুইও জানিস অরবিন্দ।

দলবদ্ধ ভাবে—[কয়েকজন] বিশ্বাসঘাতক, তোকেও শেষ করব। [সুখেনের দিকে এগিয়ে যায়। সুচেতা রুখে দাঁড়ায়।]

সুচেতা। সাবধান! আমি শুধু সুখেনের মা নই, তোদেরও মা। সাহস থাকে আমার গায়ে হাত তোল্। [সবাই থমকে দাঁড়ায়।] কই মার, মার আমাকে?

[এক-পা দু-পা করে সবাই পেছনে সরে যায়।]

অরবিন্দ। চল্, এর বিচার পরে হবে।

সোমেন। সুখেনের মা বলে রেহাই পাবেন না। এর সমুচিত জবাব দিতেই হবে।

[একে একে সরাইর প্রস্থান। সুচেতা স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। নেপথ্যে শ্লোগান…খুনীকে আশ্রয় দেয়া চলবে না—চলবে না…বিশ্বাসঘাতকের শাস্তি চাই—শাস্তি চাই…হঠকারীদের খতম করো…খতম করো ইত্যাদি।]

জনার্দন। [ভীতকণ্ঠে] আবার যদি ওরা আসে।

সুচেতা। [আর্দ্রকণ্ঠে] আসুক। আমি পারবো না, পারব না। মা হয়ে প্রাণ থাকতে একটা জলজ্যান্ত ছেলেকে আমি হাড়িকাঠের দিকে ঠেলে দিতে পারবো না।

[ভবেশের প্রবেশ]

ভবেশ। কোন মা-ই তা পারে না

জনার্দন। ভবেশবাবু, আপনাদের বোধহয় এখানে আর থাকা চলবে না।

ভবেশ। কোথায় যাবো ভাই? রক্তের হোলি খেলাতো আজ সর্বত্র। [সুচেতাকে] দাঁড়িয়ে রইলে কেন? আজ শুকুর জন্মদিন, উৎসব করতে হবে তো?

সুচেতা। [কান্নায় ভেঙে পড়ে] ভালো লাগে না, আমার কিছু ভালো লাগে না।

ভবেশ। কাঁদবে না, কাঁদবে না। আজই তো সবচেয়ে শুভদিন গো। মরণকে হটিয়ে জীবনের উৎসব। [পাশের ঘরে গিয়ে সুনীতকে নিয়ে আসে। সুনীতের মাথায় ব্যাণ্ডেজ] নাও, নাও, ওকে আশীর্বাদ করো। তোমার আশীর্বাদে ওর উত্তপ্ত মস্তিষ্ক শীতল হবে। সুনীত মাসিমাকে প্রণাম কর। [সুনীত প্রণাম করে। সুচেতা তার মাথায় আশীর্বাদ করার পর তাকে বুকে চেপে ধরে কেঁদে ওঠে] মেঘে শুধু বজ্রবিদ্যুৎই থাকে না, বুকভরা তার বর্ষণের জলও থাকে। [এগিয়ে গিয়ে সুনীতের মাথায় হাত বুলোতে থাকে।] সুনীত, তোদের জেনারেশনের অস্থিরতার কথা আমি বুঝি। এখন একটা অন্ধকারে কেউ স্থির থাকতে পারে না। সবাই চায় আলো। কিন্তু অসহিষ্ণুতায় অন্ধকার আরও বাড়ে। বিপ্লবীর বীজ অঙ্কুর মেলে লক্ষ-লক্ষ, কোটি-কোটি মানুষের মনে। তাকে বাড়িয়ে দেয়ার, সতেজ করাই বিপ্লবীর কাজ। শক্তির উৎস বন্দুকের নল নয়, মানুষ। মানুষকে ভয় দেখিয়ে কি সঙ্গে পাবি?

বিপ্লব তো অঙ্কুর মেলেছে মাঠে খামারে, কলে কারখানায় গরিবের ভাঙা ঘরে। একদিন দেখবি ধানের ক্ষেতের লক্ষ কোটি শীষের মতো তারা একসঙ্গে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। সেদিন বিপ্লবের ফসল তুলতে হবে ঘরে। আর আমরা সবাই মিলে সেই শুভদিনটিতে করব বিজয়োৎসব—শুরু হবে সৃষ্টির মহাপর্ব। [সুচেতাকে] যাও, যাও, সুনীতকে মিষ্টিমুখ করাও। শুকুর জন্মদিনের উৎসব সার্থক হোক।

[সবার মুখে হাসি ফুটে ওঠে।]

[ধীরে ধীরে পর্দা নেমে আসে]

পুস্তক-পরিচয়

কোয়াণ্টাম বলবিদ্যা। ভি. রিডনিক। মনীষা গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড। ছ-টাকা

বিংশ শতাব্দীতে quantum mechanics বা কোয়াণ্টাম বলবিদ্যা পরমাণু বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে একটি মৌলিক ও অপরিহার্য মতবাদ রূপে পরিগণিত হয়েছে। মানুষের সাধারণ অনুভূতির বাইরে বিজ্ঞান জগতের এমন বহু ঘটনা রয়েছে, যার ব্যাখ্যা কোয়াণ্টাম বলবিদ্যা ছাড়া সম্ভব নয়। কিন্তু সাধারণ পাঠকের পক্ষে অসুবিধা এই যে, গণিতের দুর্গম পথ এড়িয়ে এই বিষয়টি বোধগম্য নয়—তবে যাঁরা বিজ্ঞানের ক্রমবিবর্তনের সাথে কিছুটা পরিচিত হয়েছেন তাঁদের পক্ষে কোয়াণ্টাম বলবিদ্যা যে দুর্বোধ্য নয় তা সম্প্রতি প্রকাশিত ঐ-সংক্রান্ত কয়েকটি বিদেশী পুস্তকের জনপ্রিয়তা থেকে অনুমান করা যায়।

১৮৯৭ খৃঃ টমসন্ যখন ইলেক্ট্রন্ আবিষ্কার করেন, তখন এই কণিকাগুলিও যে নিউটনীয় বলবিদ্যা মেনে চলবে এরকম ধারণা ছিল। ১৮০৩ খৃঃ ইয়ং-এর আলোর সমবর্তন বা diffraction পরীক্ষায় আলোর যে তরঙ্গ-রূপটি দৃঢ়ভাবে সমর্থিত হয়েছিল, ১৮৬৪ খৃঃ ম্যাক্সওয়েল্ আলো ও বৈদ্যুতিক ক্রিয়ার সমন্বয় সাধন করে আলোর সেই তরঙ্গবাদ দৃঢ়প্রতিষ্ঠ করলেন।

বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে পরমাণুর গঠনবিন্যাস, এক্স-রশ্মি ও পদার্থের তেজস্ক্রিয়ার সমস্যাগুলি পুরাতন মতবাদগুলির মূলে আঘাত হানল। ১৯০০ খৃঃ প্ল্যাঙ্ক কৃষ্ণবস্তুর বিকিরণ বর্ণালীর বিশ্লেষণ (যা পুরাতন মতবাদ দিয়ে ব্যাখ্যা করা যাচ্ছিল না) করতে গিয়ে বিকিরণের কোয়াণ্টা বা কণিকারূপের প্রতিষ্ঠা করলেন। আলো বা যে-কোনো শক্তির বিকিরণ কখনো তরঙ্গাকার আবার কখনো কণিকার মতো এই দ্বৈতবাদ থেকে জন্মলাভ করল কোয়াণ্টাম বলবিদ্যা। ক্রমশ দেখা গেল শুধু বিকিরণ নয়, পদার্থের বিভিন্ন ভৌত ধর্মেও (যেমন কার্বন্ পদার্থের আপেক্ষিক তাপ, পরমাণুর চুম্বকীয় ভ্রামক ইত্যাদি) পরিমাপিত মানগুলি নিরবচ্ছিন্ন নয়। ১৯২৪ খৃঃ ডি. ব্রগ্‌লী জড়পদার্থ কণা ইলেক্ট্রন্ ইত্যাদির তরঙ্গরূপ প্রমাণ করলেন—ফলে জড়পদার্থের ক্ষেত্রে কণা ও তরঙ্গরূপ এই দ্বৈতবাদের প্রতিষ্ঠা হলো। প্ল্যাঙ্ক ও ডি. ব্রগ্‌লী শক্তি ও জড়ের ক্ষেত্রে দ্বৈতবাদ দিয়ে যে-সমন্বয় সাধন করলেন তাতে বৈজ্ঞানিক

পরীক্ষার যে-ফলগুলি ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয়নি, তা এখন সম্ভব হলো। জড় বা শক্তির কণাকে তরঙ্গগুচ্ছ বা wave packet আকার ধরে নিয়ে তাদের অবস্থিতির সম্ভাবনা কোথায় এবং কতটুকু তা বলা সম্ভব হলো। অবশ্য এই সমস্ত প্রচেষ্টা যথেষ্ট গণিত-নির্ভর সন্দেহ নাই। তবে ১৯০০ খৃঃ থেকে বিজ্ঞানজগতে কোয়াণ্টাম বলবিদ্যার ক্রমবিবর্তনের মাধ্যমে বিজ্ঞানের যে-অগ্রগতি সম্ভব হয়েছে তার পরিপ্রেক্ষিতে কোয়াণ্টাম বলবিদ্যা সম্পর্কে সাধারণ পাঠকও যে গণিতের সাহায্য ছাড়াই কিছু জ্ঞানলাভ করতে পারেন ভি. রিড্‌নিক্‌ লিখিত বর্তমান পুস্তকখানি তার একটি উদাহরণ। বর্তমান কোয়াণ্টাম বলবিদ্যার পরিধি শুধু পরমাণুজগতে আবদ্ধ নয়, রসায়ন, কঠিন পদার্থতত্ত্ব বা solid state physics প্রভৃতিতেও এর প্রয়োগ অপরিহার্য। রিড্‌নিক্‌ সাধারণ পাঠককে আকৃষ্ট করবার মতো একটি চমৎকার আঙ্গিক দিয়ে বইটি আগাগোড়া লিখেছেন। বইটি পড়ে কোয়াণ্টাম বলবিদ্যার সাথে আধুনিক বিজ্ঞানের অনেক-কিছুই জানা সম্ভব হবে। এর প্রথম অধ্যায়ে নিউটনীয় বলবিদ্যার সীমারেখা কোথায় এবং কোয়াণ্টাম বলবিদ্যার সূত্রপাত আলোচিত হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে প্ল্যাঙ্কের আবিষ্কারের ভিত্তিতে এবং তৃতীয় অধ্যায়ে ডি. ব্রগ্‌লীর কণার দ্বৈতবাদের পরিপ্রেক্ষিতে যথাক্রমে "নূতন তত্ত্বের পদক্ষেপ" ও "বোরের তত্ত্ব থেকে কোয়াণ্টাম বলবিদ্যা," এই দুটি অধ্যায়ে কোয়াণ্টাম বলবিদ্যার তাত্ত্বিক প্রকরণ-গুলির ব্যাখ্যা রয়েছে। চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধ্যায়ে যথাক্রমে (১) ক্রিষ্টাল, পরমাণু ও অণুজগতে, (২) পরমাণুকেন্দ্রে, (৩) মৌলিক কণার ক্ষেত্রে কিভাবে কোয়াণ্টাম বলবিদ্যার প্রয়োগ হয় ও ফলে যেসব রহস্যের সমাধান সম্ভব হয়েছে তার চমৎকার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। প্রধানত এই তিনটি অধ্যায় থেকে পদার্থ বিজ্ঞানের জানা ও অজানা বহু রহস্যের সন্ধান পাওয়া যাবে। এমন কি ইলেকট্রনের ভগ্নাংশ বিদ্যুৎ-আধান-বিশিষ্ট কোয়ার্ক (যার বাস্তব আবিষ্কারের চেষ্টায় এখন বিজ্ঞান-জগত তোলপাড় হচ্ছে) সম্পর্কেও পাঠকেরা কিছুটা ধারণা পাবেন।

রিডনিকের বইখানির ইংরেজি সংস্করণের বর্তমান বাঙলা অনুবাদ করেছেন শ্রীশঙ্কর চক্রবর্তী, শ্রীসুস্মিত চক্রবর্তী, শ্রীসনৎ বসু ও ডঃ জয়ন্ত বসু; সম্পাদনা করেছেন ডঃ জয়ন্ত বসু ও অধ্যাপক অমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র। বইটির ভূমিকা লিখেছেন জাতীয় অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু। বইটির অনুবাদ যথেষ্ট মূলানুগ হয়েছে। কিন্তু এই সমস্ত বইয়ে এতটা মূলানুগ হওয়ার প্রয়োজন আছে বলে

মনে হয় না—কারণ তাতে অনেক সময় বিষয়বস্তুতে কিছুটা আড়ষ্টতা আসে। তবে এক্ষেত্রে মূলানুগ হওয়া সত্ত্বেও অনুবাদকগণ সহজ ভাষা ব্যবহার করে বইটি আকর্ষণীয় করার সার্থক চেষ্টা করেছেন। অনুবাদের মাধ্যমে বইটিতে অনেকগুলি নূতন পারিভাষিক শব্দও যোগ করতে হয়েছে—যা বাঙলার বিজ্ঞান সাহিত্যে নূতন সংযোজন বলে গণ্য হবে। অবশ্য কয়েকটি পরিভাষা সম্পর্কে পরিবর্তনের হয়ত অবকাশ আছে।

সে যাহোক, বাঙালি পাঠক-পাঠিকাদের কাছে বইটি যথেষ্ট আদৃত হবে সন্দেহ নেই। বিদেশী ভাষায় এই বিষয়ে বিস্তৃত জ্ঞানলাভের আগে এই বইটি মাতৃভাষায় ছাত্রদের মনে একটি সুন্দর পটভূমিকা তৈরি করতে পারবে—তাই বিজ্ঞানের ছাত্রদের কাছেও বইটি আদরণীয় হবে।

সূর্যেন্দুবিকাশ রায়

মৃত্যুহীন (সঙ্কলন)। প্রকাশক—বিপ্লবী নিকেতন, ১২ চৌরঙ্গী ম্যানসন, ৩০ চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা ১৬। তিন টাকা

বিপ্লবী নিকেতনের পক্ষ থেকে স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য দ্রুতপাঠ্যরূপে 'মৃত্যুহীন' রচিত,—২৩টি প্রস্তাবে, ৩০এরও অধিক স্বাধীনতা সংগ্রামের বিপ্লবপন্থী শহীদদের সংক্ষিপ্ত জীবনকথা, বিভিন্ন লেখকের লেখা, সযত্নে সংগৃহীত তথ্য ও চিত্রসহিত সঙ্কলিত।

এই ২৩০ পৃষ্ঠার বইখানাকে আমরা সাদরে অভিনন্দন জানাই।

এই শহীদদের মধ্যে ভারতের নানা প্রান্তের শহীদদের দর্শন লাভ করি। তাতে করে বুঝতে পারি—স্বাধীনতার আদর্শেই শুধু সর্ব-ভারত উদ্বুদ্ধ হয়নি, তার বিপ্লবপন্থায়ও ভারতের সর্বপ্রান্তের মানুষই আকৃষ্ট হয়েছে, তাও একটা জাতীয় আকার লাভ করেছিল। মহারাষ্ট্রীয় তিন-ভ্রাতা দামোদর, বালকৃষ্ণ ও বাসুদেও তাঁদের সহকর্মী বিনায়ক রানাডে—এই চারজনই (১৮৯৮-৯৯) এই পন্থায় একালের প্রথম শহীদ। তারপরে শহীদ আমাদের প্রফুল্ল চাকী ও ক্ষুদিরাম এবং কানাইলাল ও সত্যেন্দ্রনাথ বসু। তারপরে (১৯১০) বাঙলার বাইরে আবার দেখতে পাই আরও তিনজন মহারাষ্ট্রীয় বীর। কানহেরে, কার্ভে ও দেশপাণ্ডে। ক্রমে ক্রমে আমরা পাই তামিল ওয়াঞ্চি আয়ার (কেরল-

বাসী), অন্ধ্রে সীতারাম রাজুর, কাকোরী মামলার 'বিসমিল' আসফাক উল্লা, রৌশন সিং, রাজেন্দ্র লাহিড়ী (উত্তর প্রদেশ), চন্দ্রশেখর আজাদ (উঃ প্রঃ), সর্দার ভগৎ সিং, রাজগুরু, শুকদেব (পাঞ্জাব), আর বিলাতে ধিংড়া (১৯০৯) ও উধম সিং (১৯৪০) এর। বাঙলার বাইরেকার এই শহীদদের কথা বাঙালি-দের অনেকের হয়তো বিশেষ জানা নেই। সত্যকথা বলতে কি, বাঙালি শহীদদের নামই কি আমরা ভালো করে স্মরণ করতে পারি? সব নাম তো দূরের কথা, এই সেদিনের অনেকের কথাও মনে করিয়ে দিলে তবেই মনে পড়ে। একদিক থেকে এটাই কালের নিয়ম।

এইভাবেই সত্য হয়ে থাকেন মহা-মহাবিপ্লবের উদ্‌যাপিত সাফল্যের মধ্যে নামহারা অজস্র শহীদেরা ও সাধকেরা। সেই সাফল্যের মধ্যেই তাঁদেরও সাফল্য, তাঁদেরও পরিচয়।

এইখানেই অবশ্য কঠিন প্রশ্ন মনে জেগে ওঠে—আমাদের স্বাধীনতার কী সাফল্য আমরা দেখছি? হয়তো সে সাফল্য এখনো বাকি যদিও রাজনৈতিক পরাধীনতা যে শেষ হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই।

এই প্রশ্নের বিচার এ-পুস্তকের আলোচনায় অবান্তর। পুস্তকখানির প্রধান উদ্দেশ্য একালের ছেলেদের সামনে সুস্থির আদর্শের ও আত্মত্যাগী সাধকদের কথা সংক্ষেপে, অথচ সরল প্রাণবন্ত ভাষায় তুলে ধরা—যাতে বলতে পারলে সেই আড়ম্বরহীন সামান্য জীবন-কথাগুলি সত্যই প্রাণস্পর্শী হয়ে ওঠে। অথচ যাতে তা একালের ছিন্নমস্তা রাজনীতিরই আরেকটি পূর্বসংস্করণ বলে ভ্রান্তি উৎপাদন না করে, এবং না হয়ে ওঠে একালের শিশুত্ববিলাসী প্রাপ্ত-বয়স্কদের জলো রোমান্সের খেলো উপকরণ।

এসব সংক্ষিপ্ত লেখায় অবশ্য কথা ফেনিয়ে তুলবার সে-অবকাশ ছিল না। এবং বিশেষ করে, লেখকরা প্রায় সকলেই দায়িত্ব নিয়ে তাঁদের কর্তব্য প্রতিপালন করেছেন—চমক জাগানোর অপেক্ষা নিজেদের সততায় তাঁরা প্রাণসঞ্চার করেছেন, বিষয়মাহাত্ম্যে চেয়েছেন বালকমনে একটি গভীর আদর্শের জন্য গম্ভীর বোধ সঞ্চারের। এইজন্য এই ছোট বইটি এতো অভিনন্দন যোগ্য। আশা করি, লেখকদের ও প্রকাশকদের চেষ্টা সার্থক হবে।

গোপাল হালদার

কর্ণফুলী। আলাউদ্দিন আল আজাদ। প্রকাশক—কারাভাঁ, ৭৫ রামকৃষ্ণ মিশন রোড, ঢাকা-৩। তিন টাকা পঞ্চাশ পয়সা

পূর্ব-পাকিস্তানে প্রকাশিত গল্প-উপন্যাস কদাচিৎ আমাদের হাতে এসে পৌছয়। সুতরাং আমাদের বাঙলা গল্প-উপন্যাসের আলোচনাও অসম্পূর্ণ ও সীমাবদ্ধ হতে বাধ্য। পূর্ব-পাকিস্তানের সাহিত্যের ইতিহাস যে-সব চোখে পড়েছে তাতে অসংখ্য আধুনিক গল্প-উপন্যাসের নাম পেয়েছি, কিন্তু পড়বার সুযোগ না পাওয়ায় আমরা তার আলোচনা করতে পারি না। যখন ভাগ্যক্রমে কোনো বই হাতে পাই, তখন তাকে আর 'সম্প্রতিকালের' রচনা বলা যায় না, বইটি প্রকাশের পাঁচ-সাত বছর পরে সেটি তখন পূর্ব-পাকিস্তানে 'পুরানো' হতে চলেছে। তবু আমাদের কাছে 'নতুন', আর মনকে সান্ত্বনা দিই, ইয়োরোপের অনেক বই-ই তো এইভাবে অনুবাদের মধ্য দিয়ে অনেকদিন পর আমাদের হাতে এসে পৌছয়। অবশ্যই পূর্ব-পাকিস্তানের বাঙলা বই আর বিদেশী গ্রন্থের অনুবাদ তুল্য-মূল্য নয়, এবং এর ফলে বাঙলা সাহিত্যের অপূরণীয় ক্ষতির দিকটি বিচার্য। আলাউদ্দিন আল আজাদ-এর (জন্ম ১৯৩৪) অনেকগুলি গল্প-উপন্যাস গ্রন্থের নাম এর আগে শুনেছি, যেমন, 'ধানকন্যা'(১৯৫১), 'জেগে আছি' (১৯৫৫), 'মৃগনাভি', 'অন্যমুখ', 'ক্ষুধা ও আশা' (১৯৬৪) প্রভৃতি। 'কর্ণফুলী' (১৯৬২) উপন্যাসটির নাম আগে শুনলেও পড়বার সুযোগ পেলুম সম্প্রতি, এবং বহুবিলম্বিত হলেও নানা কারণেই উপন্যাসটির আলোচনা হওয়া প্রয়োজন আছে মনে করি।

বাঙলা উপন্যাসে প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির সঙ্গতি সাধন ঘটে না। তাই প্রায়শই উপন্যাসপাঠে নৈরাশ্য এবং কখনো বিরক্তিবোধ অনিবার্য হয়। 'কর্ণফুলী' কোনো অসামান্য উপন্যাস নয়, বক্তব্যের দিক থেকে বা শিল্পনৈপুণ্যেও উপন্যাসটি অবিস্মরণীয়তা দাবি করতে পারে না। তবু সচরাচর যেসব বাঙলা উপন্যাস আমরা পড়ি, তার সঙ্গে 'কর্ণফুলী'র পার্থক্যও স্বীকার্য। আলাউদ্দিন আল আজাদ উপন্যাসের পটভূমি রচনায় ও চরিত্র নির্বাচনে স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করেছেন, এবং আমাদের অপরিচিত অথচ আমাদের খুব কাছেরই বাস্তব জগৎকে আশ্চর্য জীবন্ত করে তুলেছেন। কর্ণফুলী নদীর তীরে চট্টগ্রামের পটভূমিতে উপন্যাসটি লেখা, শহর ও পাহাড়তলী অঞ্চলে কাহিনী ছড়িয়ে আছে। নায়ক ইসমাইল পকেটমার, প্রয়োজনবোধে খুন-জখমও করে থাকে, কিন্তু তার "স্বপ্ন ছিল সারেঙ হবে, খুব বড় সারেঙ, সাতদরিয়া যে চড়ে বেড়ায় সেই বড় জাহাজের সারেঙ; অনেক

বড় স্বপ্ন, ছোটবেলাকার স্বপ্ন, কৈশোরের স্বপ্ন এবং যৌবনের স্বপ্ন। কিন্তু কোথায়? বুকের ঘাম, চোখের পানি এক করেও, এত বছরে একটা নলিও জোগাড় করতে পারেনি, বোম্বাই করাচি এডেন লণ্ডন টোকিও হংকং ঘুরে বেড়ানোর কথা বাদ। হ্যাঁ, অলীক স্বপ্ন। এতো দুঃস্বপ্ন। তা সে জানে না এমন নয়। তবু, চট করে সোঁতের শেওলার মতো ভেসেও যেতে পারবে না।" তাই সে যুদ্ধ করে প্রতিবেশের সঙ্গে, দারিদ্র্যের সঙ্গে,—জাহাজের সারেঙ হওয়ার 'নলি'র জন্য একশ টাকা ঘুষ দিতে হবে, সেই টাকা সংগ্রহের জন্য মরিয়া হয়ে রমযানের রহস্যময় অভিযানে যোগ দিয়েছে। বাইরে সে নির্মম, কঠোর, তিক্ত, কিন্তু ভিতরে লুকিয়ে আছে সারেঙ হওয়ার স্বপ্নের সঙ্গে জুলায়খাকে নিয়ে ঘর বাঁধার বিপরীত কিন্তু অনিবারণীয় আকাঙ্ক্ষা। মাঝখানে রাঙামিলার প্রতিও আকর্ষণবোধ করে, এবং নীতিবোধের প্রশ্ন না থাকলেও শেষ পর্যন্ত রাঙামিলাকে ছেড়ে দেয়, তাকে ও তার প্রণয়ীকে রমযানের গুণ্ডাদের হাত থেকে উদ্ধার করে। কিন্তু পরে মনে হয় "যে ছিল শত্রু, প্রতিদ্বন্দ্বী, সেই বন্ধু হয়ে গেল! এতো সে চায়নি? এত মহৎ সে কখনো নয়।" আসলে ইসমাইল নিজের অন্তরের দুর্বলতা শেষ পর্যন্ত বুঝতে পেরেছে। সেইখানেই তার মনুষ্যত্ব। হয়তো আমার দ্রুত কাহিনী-সংক্ষেপে কিছুটা ভুল বোঝার সম্ভাবনা থেকে গেল, 'মন্দের মধ্যে ভালো' দেখানোর সদুদ্দেশ্য থেকে ইসমাইলকে আঁকা হয়নি। আসলে ইসমাইলের প্রচণ্ড আবেগ ও উত্তেজনাই তাকে ছন্নছাড়ার মতো উড়িয়ে নিয়ে চলে, জুলায়খাকে বিয়ে করাও সেই আকস্মিক উন্মাদনা থেকে। কিন্তু ভালোবাসা ধীরে ধীরে তার মনে শান্তি আনে, যদিও সেই সঙ্গে রয়েছে সারেঙ হওয়ার স্বপ্ন। ইসমাইলের সেই দ্বন্দ্ব বারকয়েক তাকে কাতর করেছে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তার কৈশোর-যৌবনের স্বপ্নেরই জয় হয়েছে। "ভিতরটা ওর এখন শান্ত স্নিগ্ধ। যেন বুঝেছে পাওয়ার জিনিসকে ছাড়তে পারলেই তাকে বেশি করে পাওয়া যায়। এই উপলব্ধি সহজ নয়, এর সঙ্গে মিশে আছে অনেক অশ্রু, দীর্ঘশ্বাস। কিন্তু তারও হয়তো প্রয়োজন ছিল।"

জুলায়খা—জুলি, তাকেও আশ্চর্যভাবে চিত্রিত করেছেন ঔপন্যাসিক। বালিকা থেকে জননী—রূপান্তরটি মনে দাগ কেটে যায়। বিদায়ের মুহূর্তে ইসমাইলকে জড়িয়ে ধরে বলে ওঠে, "ভুলি ন যাইও। সপ্তায় সপ্তায় পত্র লেইক্‌খো। বিদেশ বিপ্যাচ—হুনি মেম দেখি মানুষ পাগল হয়। তুঁই আবার যেন বিয়া গরি ন ফেল। জবাবের সময় দেবে না, জুলি আবোল-তাবোল বকে যাচ্ছে, একটানা

মাঝে একটু ঢোক গেলে শুধু, কিন্তু থামলো না। আর যদি বিয়া গরই তইলে এ্যান চাই গরিবা যেন্ আঁইও থাইৎ পারি।"—নারী হৃদয়ের পূর্ণ উন্মোচন ঘটে উক্তিটিতে।

উপন্যাসের কাহিনী এবং চরিত্র বাদ দিলে থাকে ভাষা। ভাষার সার্থকতা —বর্ণনায়, আবহসৃষ্টিতে, সর্বোপরি সংলাপে। আলাউদ্দীন আল আজাদ উপন্যাসের সূচনায় 'লেখকের কথা'য় জানিয়েছেন, "চরিত্রকে 'স্বাভাবিক' করার চেষ্টায় আমি এ-বইয়ে আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহার করিনি। চিত্রী যেমন বিভিন্ন রং দিয়ে একটি সৃষ্টি সম্পূর্ণ করেন, তেমনিভাবে আমি বিভিন্ন ভাষার রং ব্যবহার করেছি মাত্র; কর্ণফুলীর জীবনধারা, সবুজ প্রকৃতি, শ্যামল পাহাড় ও সাগরসঙ্গমে বয়ে চলা প্রবাহের মতোই এই ভাষা অবিভাজ্য। শিল্পসিদ্ধির জন্য এর অবলম্বন আমার কাছে অপরিহার্যরূপে গণ্য হয়েছে। সকল পাঠককে এই সংলাপের প্রত্যেকটি কথা বুঝতে হবে এমন কোনো কথা নেই; মোটামুটি আবহটুকুন অধিকাংশের মনে এলেই যথেষ্ট।" বাঙলা উপন্যাসে আঞ্চলিক ভাষার প্রয়োগ এর আগেও দেখা গেছে, কিন্তু উপন্যাসে তার ভূমিকা ছিল নিতান্ত নগণ্য, কারণ উপন্যাসের সবগুলি চরিত্র সেখানে আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলে না, এবং আঞ্চলিক হলেও সে-ভাষা অনেক সময়েই আমাদের বোধগম্য। কিন্তু 'কর্ণফুলী' উপন্যাসের সবগুলি চরিত্রই চট্টগ্রামের মুসলমান এবং কয়েকটি চাকমা (পাহাড়ী) নরনারী—ফলে আঞ্চলিক ভাষাই এখানে স্বরাট্। অন্যদিকে চট্টগ্রামী ভাষা, এবং বিশেষত চাকমা ভাষা পশ্চিমবঙ্গে কেন পূর্ববঙ্গেও অধিকাংশ অঞ্চলে দুর্বোধ্য। কিন্তু তা সত্ত্বেও উপন্যাসটি কোথাও পাঠযোগ্যতা হারায়নি, বরং প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পাঠককে আকর্ষণ করে রাখে; এবং আবহসৃষ্টিতে আঞ্চলিক ভাষা বিশেষ সাহায্য করেছে। আলাউদ্দিন আল আজাদ শক্তিমান লেখক তার প্রমাণ 'কর্ণফুলী' উপন্যাস।

আজ থেকে প্রায় একশো বছর আগে (ভাদ্র ১২৮০) মীর মশাররফ হোসেনের 'জমিদার দর্পণ' নাটকের সমালোচনা করতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শন'-এ মন্তব্য করেছিলেন, "জনৈক কৃতবিদ্য মুসলমান কর্তৃক এই নাটকখানি বিশুদ্ধ বাঙ্গালা ভাষায় প্রণীত হইয়াছে। মুসলমানি বাঙ্গালার চিহ্নমাত্র ইহাতে নাই। বরং অনেক হিন্দুর প্রণীত বাঙ্গালার অপেক্ষা এই মুসলমান লেখকের বাঙ্গালা পরিশুদ্ধ।" বলা বাহুল্য, 'মুসলমানি বাঙ্গালা' সম্বন্ধে একদা বাঙালি, বিশেষত হিন্দু পাঠকের এক ধরনের বিশেষ অস্বস্তি ও আপত্তিবোধ

ছিল। কিন্তু নাটক বা উপন্যাসের প্রয়োজনেই ভাষায় 'মুসলমানি' অর্থাৎ ফার্সী এবং কদাচিৎ আরবী শব্দের প্রয়োগ ঘটে। যেখানে অধিকাংশ বা সবগুলি চরিত্রই মুসলমান, সেখানে এই জাতীয় শব্দ ব্যবহার অনিবার্য বিবেচনা করি। 'কর্ণফুলী' উপন্যাসেও তাই বেশ কিছু ফারসী আরবী শব্দের ব্যবহার ঘটেছে, এগুলির সঙ্গে আঞ্চলিকতার যোগ সামান্য, যেমন, আমাদের খুব পরিচিত—চেরাগ, দরিয়া, আসমান, কিস্‌সা, নাস্‌তা এবং কিছুটা অপরিচিত—কাবিন, জেওর, খায়েশ প্রভৃতি।

চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ভাষার সঙ্গে বর্তমান লেখকের সামান্যতম প্রত্যক্ষ পরিচয়ও নেই, কিন্তু তা সত্ত্বেও উপন্যাসের সংলাপ অনুসরণ করতে খুব কষ্ট হয়নি। সাধারণভাবে বাঙলা ভাষার সঙ্গে যেটুকু পরিচয় আছে, তার সাহায্যে অধিকাংশ শব্দের অর্থোদ্ধার করা যায়। আসলে ধ্বনিগত পরিবর্তনই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। বাঙলা ভাষাতত্ত্ব নিয়ে এখনও সে-রকম আলোচনা হয়নি, অন্তত বাঙলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের ভাষার বিশিষ্টতা নির্দেশে ভাষাবিজ্ঞানীরা এগিয়ে আসেননি। ডঃ সুকুমার সেন 'ভাষার ইতিবৃত্ত' (১৯৬৮) গ্রন্থে 'আধুনিক-বাঙ্গালা উপভাষা ও বিভাষা' নিয়ে আলোচনাকালে পাঁচটি উপভাষা-গুচ্ছের উল্লেখ করেছেন, তার মধ্যে পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ববঙ্গের উপভাষার নাম দিয়েছেন 'বঙ্গালী'। বলা বাহুল্য, পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ববঙ্গ একটি বিরাট অঞ্চল, এবং সেখানেও অঞ্চলভেদে ভাষার ধ্বনিগত ও রূপগত বৈশিষ্ট্য স্বতন্ত্র। 'বঙ্গালী' বলতে অল্প যে-কয়েকটি লক্ষণ নির্দেশ করা হয়েছে, তাও নিতান্ত অসম্পূর্ণ। ডঃ সেন 'বঙ্গালী'র প্রধান বিভাষারূপে 'চাটিগ্রামী'র উল্লেখ করেছেন, এবং তার একটিমাত্র বৈশিষ্ট্যের কথা বলেছেন, "ইহাতে স্পৃষ্ট ব্যঞ্জনে ব্যাপক উষ্মীভবন লক্ষণীয়।" তুলনায় ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্-এর 'বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত' (১৯৬৫) গ্রন্থে বাঙ্গালা উপভাষার আলোচনা অনেক তৃপ্তিদায়ক। ডঃ শহীদুল্লাহ্ পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গের ভাষাকে স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করেছেন, এবং যদিও তিনি কাছাড় থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত সমস্ত স্থানের ভাষাকে 'পূর্বপ্রান্তিক উপভাষা' নামে অভিহিত করেছেন, তবু মোটের উপর তাঁর আলোচনা থেকে চট্টগ্রামের ভাষার কিছু লক্ষণ স্বতন্ত্রভাবে চিহ্নিত করা যায়। কিন্তু 'কর্ণফুলী' উপন্যাসটি পড়তে পড়তে মনে হয়েছে, বাঙলাদেশের প্রতিটি জেলার ভাষার বিশিষ্টতা নিয়ে পূর্ণাঙ্গ আলোচনার প্রয়োজন এখনও রয়ে গেছে, এবং সেদিক থেকে এই জাতীয় আঞ্চলিক ভাষায় রচিত সাহিত্যকর্ম ভাষাবিজ্ঞানীদের বিশেষ সাহায্য করবে।

'কর্ণফুলী' উপন্যাস থেকে যথেচ্ছভাবে কয়েকটি উক্তি উদ্ধার করি,—

'কেয়া ?' 'গম্ ন লাগের্। বিয়াল্য যাইত পারজুম।'

'তুই বড় উজর করর। হে তো আর গুরা পুয়া ন ? নিশ্চয় কোন কামে গেইয়ে, শেষ হইলে ফিরি আইব।'

'ন বাজী, তুঁই বুঝিৎ ন পারর। বিপদ-আপদ ন অইলে আঁই কালিয়া তারে খোয়াবে দেখ্থি ?'

এখানে ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে কতকগুলি জিনিস লক্ষণীয়। প্রথমত কয়েকটি অপরিচিত শব্দ, যেমন, কেয়া, গম্, গুরা। হাতের কাছে ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ সম্পাদিত 'পূর্বপাকিস্তানী আঞ্চলিক ভাষার অভিধান' থাকায় শব্দগুলির অর্থ জানতে পারলুম। কেয়া<কেঅ<কেন। ['কেয়া' শব্দটি 'কেহ' অর্থেও চট্টগ্রামে ব্যবহৃত হয়]। গম্<গহাম (বোড়ো ভাষার শব্দ), অর্থ 'ভালো'। [ঔপন্যাসিকের 'গম্' শব্দটি সম্ভবত খুব ভালো লেগেছে, তাই উপন্যাসের মধ্যে বারবার শব্দটির প্রয়োগ]। গুরা<গুঁড়া, অর্থ 'ছোট'। 'খোয়াব' শব্দটি আমাদের একেবারে অপরিচিত নয়, এসেছে ফার্সী 'খ্বাব' থেকে, অর্থ 'স্বপ্ন'।

ধ্বনিগত বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে এখানে বিশেষভাবে লক্ষ্য করেছি বিকেলে (বৈকালে)>বিয়াল্য; সে>হে; দেখি>দেখ্থি। অন্যত্র আরও কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য চোখে পড়েছে, যেমন, কারণ আছে>হারণ আগে; কিন্তু>হিন্তু; কি হল>হি অল; একটুখানি>ইক্কানি; এখনই>ইত্তরি; মেরেছ, ঠিকই করেছ>মাইর্গো ঠিকই গইর্গো। চট্টগ্রামী আঞ্চলিক ভাষায় আনুনাসিকের ব্যবহার কিছু বেশি বলেই মনে হলো, তবে সাধারণত এগুলি নাসিক্যীভবনেরই দৃষ্টান্ত, বিশেষত সর্বনামের ক্ষেত্রে; আমি>আঁই, তুমি>তুঁই, আমার>আঁর, তোমাদের (কে)>তোঁয়ারারে। তবে 'টাকা' সর্বদা 'টেঁয়া' স্বতোনাসিক্যীভবনের দৃষ্টান্ত; এ-জাতীয় আনুনাসিকের আতিশয্য সব সময়ে আঞ্চলিকতার লক্ষণ কিনা জানি না।

রূপগত বৈশিষ্ট্যের মধ্যে, ভবিষ্যৎ কালে উত্তম পুরুষে 'জুম' এবং 'যুম' বিভক্তির ব্যবহার লক্ষণীয়; পারব>পারজুম, ফেলব>ফ্যালাযুম, দিব>দিইযুম; ভবিষ্যৎকালে মধ্যম পুরুষে পারবে>পারিবা, ভবিষ্যৎকালে প্রথম পুরুষে আসবে>আইব। তুমর্থে (infinitive) ও অধিকরণে দিতে>দিৎ, ঘরেতে> ঘরৎ, হাতে>হাতৎ, বুঝতে>বুঝিৎ।

মধ্যবাঙলায় সমাপিকা বা অসমাপিকা ক্রিয়াপদের আগে নঞর্থক (না) বসিয়ে বাক্য গঠনের যে রীতি ছিল পূর্ববাঙলার কোনো কোনো আঞ্চলিক ভাষায় এখনও তা বিদ্যমান। চট্টগ্রামী উপভাষায় তার বহুল প্রয়োগ—আই তো মরি ন যাই। জুলিরে তো কই ন পাইর্। আঁই আর একটু বাধা নইদ্দম।

চাকমা ভাষার অর্থোদ্ধার তুলনায় অনেক কঠিন, ভাষাতাত্ত্বিকেরাও এ-ব্যাপারে আমাদের বিশেষ সাহায্য করেন না। একটা দৃষ্টান্ত দিই—"স্থান·ইত্তুন প্রায় কুড়ি-পোজোস মেল দূরৎ। গধা হাই এক্কান্ শহর আঁয়া। দিনে রেতে হাম গওন—হদক মানুষ! মস্ত দেবেদা পাপা হল—হালখানা। পানি বেশ অলে ছাড়িবেত্তেই দাঙর দাঙর দুয়ার জুগলদন। দিবা মস্তমস্ত সুড়ং গস্তন। সিন্দিপানি হুব হিজি যেব। স্থানি চাক্কাৎ যেই পড়িব গৈ। চাক্কা ব্য 'ঘুরেব্ সত্তুন লেত্রিক তৈয়ার অব। সে লেত্রিক্কই ভালক্কানি, হল হারথানা চলিব্য।" প্রসঙ্গ অনুসরণ করে অর্থ কিছুটা বোঝা যায় ঠিকই, তবু চাকমা শব্দভাণ্ডার ও ভাষায় ধ্বনিগত বৈশিষ্ট্য জানা থাকলে আরও উপভোগ করতে পারতুম।

অলোক রায়

ঘরে দূরে দিগন্তরেখায়। শিবশম্ভু পাল। সাহিত্যপত্র গ্রন্থ। তিন টাকা

"এই নাও এলিয়ট কাফকা টমাসমান জয়েস বিষ্ণু দে/মননের ঝাঁজালো ওষুধে/কাজ হয় না আজকাল। রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে ক্ষয়ে যায় চটি।/সব নাও রেখে দিও শুধু গীতবিতানের দ্বিতীয় খণ্ডটি॥" 'ঘরে দূরে দিগন্তরেখায়' কাব্যের সুপরিচিত কবি শিবশম্ভু পাল তাঁর চারপাশের পুতুল-পরিবেশের ওপর খুব বেশি রুষ্ট হলে বড়জোর এটুকু উঁচু গ্রামেই কথা বলতে পারেন। বিপরীতভাবে বলা যায় কাব্যিক উচ্চারণে যে-কোনো ধরনের অতিরেকের তিনি বিরোধী। তাই সারারাত নির্ঘুম থেকে, সামনে "অনুর্বর শাদা" পৃষ্ঠা ও "ব্যর্থকাম কলম" নিয়েও "একচ্ছত্র আগ্নেয় কবিতা" লিখতে না পারার বেদনা তাঁর মনে সব কিছু লণ্ডভণ্ড করে দেয়ার হিংস্র অধীরতা জাগায় না। আসলে শিবশম্ভু অন্তরঙ্গ, ঘরোয়া মেজাজে কবিতা লিখতে ভালোবাসেন, কবিতা তাঁর কাছে দৈনন্দিন জীবন-যাপনের অন্যতম সহজ সর্ত। ফলে, প্রকাশরীতিতে নাটুকেপনা তো দূরের কথা, নাটকীয়তা থেকেই তাঁর সসম্ভ্রম প্রস্থান। কবিতা নিয়ত স্রোতের মতো তাঁর অনুভূতিতে ঘুরেঘুরে কাজ করে। সেই বহতা মানসিকতার প্রকাশে হার্দ্য

হয়ে উঠে এ-জাতীয় পংক্তিনিচয় "ঘরের ভিতরে বিছানায়/যখন আকাশ ভেঙে বৃষ্টি হয়, বজ্রপাত, পথঘাট জলে জলাকার/যখন বৃষ্টির শব্দে বিরহ শব্দের ধ্বনি মেশে/বজ্রপাতে মর্মলোক পুড়ে যায়, ক্লান্ত ক্লান্ত বলে/হাহাকার করে ওঠে সর্বাঙ্গ আমার/তখনো রয়েছো পাশে তুমি" '(পাঁচ বছর পর-সত্যি কথা) অথবা, "তুমি যে আমায় দিয়ে কবিতা লিখিয়ে নিলে একাধিক, আমি/স্বীকার করেছি বাহাদুরি।" (কবিতা লিখিয়ে নিলে)।

কবিতা রচনার বিভিন্ন কলাকৌশল ও চাতুর্য শিবশম্ভুর কলমের একান্ত অধীন। আঙ্গিক সৃষ্টির ক্ষেত্রে তিনি পটু ও পরিশ্রমী। মাঝে মাঝে অপ্রত্যাশিত মিল দিয়ে বিস্ময় সৃষ্টি করতে তিনি পারঙ্গম। উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা যায় এ-জাতীয় কাব্যাংশের, "আত্মগোপন করেছি অনেক দিন/মুখরিত জনপদে।/যেন ভালোবাসি আমি আগ্রাসী চীন/...রাজদ্রোহিতা নিরীহ পরিচ্ছদে"(আত্মগোপন), অথবা, "তা হলে কি থাকে, মিছিলের কলকাতা/বর্ষার টালাপার্ক/ এবং হয়তো ডায়েরি কয়েক পাতা,/...ডানাভাঙা স্কাইলার্ক" (অবশেষে)।

রাজনৈতিক বিষয়ের সঙ্গে রাজনীতির সঙ্গে সম্পর্কহীন বিষয়কে যুক্ত করে কবিতায় এক নতুন মেজাজ আনার কৌতুহলোদ্দীপক নজির সৃষ্টি করেছেন শিবশম্ভু। বেশ আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে তাঁর কাব্যগ্রন্থের এ-জাতীয় কিছু পংক্তি। "অফিস ফেরৎ বাসে বিসদৃশ যুক্তফ্রন্ট মেনে নিয়ে ফুটবোর্ডে ঝুলি", "কেউ... জানবে না/আমাদের ষড়যন্ত্র ভূমণ্ডলে অলৌকিক সাম্রাজ্য বিস্তারে গভীর ব্যস্ততাময় শীর্ষসম্মেলন", "দমননীতির প্রতিবাদে/চড়াদামে দ্বিপ্রহরে কিনে নিয়ে আমি", অথবা "ইউলিসিস, কর্ণ থেকে জওয়াহরলাল/সকলেই অনাত্মীয় অভিজাত প্রতিবেশী আলোকিত উৎসবের বাড়ি/ওখানে আমার নিমন্ত্রণ নেই"।

শিবশম্ভু পাল দীর্ঘকাল কবিতা রচনা করেছেন। তাঁর কবিতা সহজ, কিয়দংশে সফল, কিন্তু তাঁর কাব্যিক প্রচেষ্টায় দুর্মদ উচ্চাকাঙ্ক্ষা নেই। পঞ্চাশের কবিকুলের নানা ধাচের নানা চরিত্রের যে সতেজ, জোরালো কাব্য আন্দোলন বাঙলা কবিতায় প্রশ্নচিহ্নময় উদ্দামতা এনেছিল, তিনি তার দুরন্ত উত্তাপ থেকে নিজেকে সন্তর্পিত করে একটি নিজস্ব কাব্যালোক নির্মাণ করতে প্রয়াসী। 'ঘরে দূরে দিগন্তরেখায়' কাব্যটি এই প্রয়াসেরই স্বাক্ষরবহ।

অমিতাভ দাশগুপ্ত

নান্দীকার-এর 'তিন পয়সার পালা'

১৯২৮ সালে ইংরেজি নাটক 'বেগার্স্ অপেরা'র অনুসরণে ব্রেখ্ট্ যখন তাঁর 'থ্রি পেনি অপেরা' নাটকটি রচনা ক'রে প্রখ্যাত কম্পোজার্ কুর্ট্ ভেইলের সঙ্গীতসমেত মঞ্চস্থ করেন, তখন থেকেই ব্রেখ্টীয় থিয়েটারের যথার্থ আরম্ভ বলে অনেকেই মনে করেন। এই সময় থেকে ব্রেখ্টের থিয়েটারে যে-ফর্মের ব্যবহারকে লক্ষ্য করা যায়, তার মধ্যে এ্যারিস্টটেলীয় ক্যাথার্সিস্কে পরিহার ক'রে নাটকে এক ধরনের বৌদ্ধিক তীক্ষ্ণতা সম্পাদনের চেষ্টা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তন্ময়ীভবনকে পরিহার ক'রে ব্রেখ্ট্ যেন দর্শককে সর্বদাই সচেতন রাখতে চেয়েছিলেন যে তাঁরা একটি থিয়েটারই প্রত্যক্ষ করছেন। বিভিন্ন ধরনের দর্শনীয় কৌশলের প্রয়োগে এবং সর্বোপরি বিশিষ্টতাসূচক (স্টাইলাইজড) অভিনয়কলার দ্বারা ব্রেখ্ট্ এমন একটি আবহ সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন, যার দ্বারা দর্শক কেবল থিয়েটারের আনন্দেই মগ্ন হবেন না, পরন্তু তাঁর বিচারবুদ্ধির প্রয়োগে শেষ পর্যন্ত একটি সিদ্ধান্তেও উপনীত হতে পারেন। ব্রেখ্টের নাটকের ফর্মের-এই অভিনবত্ব অবশ্য তাঁর পরবর্তী নাটক-গুলিতে আরো সুষ্ঠুভাবে প্রযুক্ত হয়েছে। 'থ্রি পেনি অপেরা'তে ফর্মের এই অভিনবত্ব হয়ত কিছুটা সোচ্চার। ফলত এখানে যেন থিয়েটারী আবহের মোহ সৃষ্টিতেই ব্রেখ্ট্ অধিকতর আগ্রহী হয়েছেন। কিন্তু নাটকীয় বক্তব্য উপস্থাপনায় ব্রেখ্ট্ এ-নাটকে অসাধারণ শক্তির পরিচয় দিতে পেরেছেন। নায়ক ম্যাকহীথ্ গুণ্ডা ও ডাকাত, কিন্তু নিজেকে সে 'বিজনেসম্যান' বলেই অভিহিত করে এবং লুঠপাট করতে গিয়ে রক্তপাতে তার প্রচণ্ড অনিচ্ছা। এমনকি তার ব্যবসার খাতা আর ব্যাঙ্কের এ্যাকাউণ্টও রয়েছে। কিন্তু এই ম্যাকহীথ্ই তার ফাঁসির পূর্ব মুহূর্তে দর্শকদের জানায় যে এবার তার মতো নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ডাকাতদের যুগ শেষ, এখন আরম্ভ হচ্ছে বড় বড় ব্যাঙ্কার, শিল্পপতি ও পুঁজিপতিদের যুগ। অর্থাৎ বুর্জোয়া সমাজ-ব্যবস্থার মূল সত্তাটিকেই এ-নাটকে ব্রেখ্ট্ ব্যঙ্গের কশাঘাতে জর্জরিত করতে চেয়েছেন ম্যাকহীথের মতো প্রবৃত্তি-নির্ভর ছোটখাটো গুণ্ডাদের করুণ পরিণতির কাহিনী বর্ণনা করে। নাটকের অপর দুটি প্রধান চরিত্র 'টাইগার ব্রাউন্' এবং পীচামের

মধ্যেও এই বুর্জোয়া সমাজের ক্ষয়িষ্ণু মূল্যবোধের দুটি পরিচয় চিহ্ন লক্ষ্য করা যায়। ব্রাউনের অর্থ-লালসাই শেষ পর্যন্ত জয়ী হয়েছে বন্ধুত্বের ওপর, আর পীচাম্ মানুষের মানবিক দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে তার উপার্জনের পথটি আবিষ্কার করে নিয়েছে। এমনকি এই বুর্জোয়া সমাজে 'প্রেম' নামক ব্যাপারটিও যে কতখানি ভঙ্গুর, ম্যাকহীথের সঙ্গে পলির বিবাহদৃশ্য ও পরবর্তী ঘটনায় ব্রেখ্‌ট্ তা দেখিয়েছেন। পতিতালয়ের দৃশ্যাবতারণায় ব্রেখ্‌ট্ বুর্জোয়া সমাজের মানবিক মূল্যবোধের অধোগতির পরিচয়কেই তুলে ধরেছেন। কিন্তু সেই অধোগতির পিছনের করুণ ইতিহাসটিকেও 'দ্য ব্যালাড্ অব্ দ্য ফ্যান্সি ম্যান্'এ ম্যাক্ এবং জেনির অতীত প্রেমের চিত্রের উপস্থাপনায় লক্ষ্য করা যায়। ব্রেখ্‌ট্ আসলে নিম্নবিত্ত সমাজের প্রবৃত্তি-নির্ভর মানুষগুলির প্রতি তাঁর অন্তরের ভালোবাসাকে গোপন রাখতে পারেননি। মানবপ্রেমিক ব্রেখ্‌ট্ তাই শেষ পর্যন্ত ম্যাক্‌হীথ্‌কে ফাঁসির দড়িতে ঝোলাতে পারেননি, একটি প্রচণ্ড ঠাট্টায় তাকে শেষ পর্যন্ত রাণীর অনুগ্রহে রাজকীয় সম্মানে ভূষিত করে সমাজের একজন গণ্যমান্য ব্যক্তিতে রূপান্তরিত করেছেন। বস্তুত পক্ষে, 'থ্রি পেনি অপেরা'তে ব্রেখ্‌ট্ বুর্জোয়া সমাজের ব্যবসায়িক লেনদেন ও বিবাহ, রোমান্টিক প্রেম, বন্ধুত্ব প্রভৃতি যাবতীয় নৈতিক মূল্যবোধের ভাঙনের রূপটিকেই তুলে ধরতে চেয়েছিলেন।

ব্রেখ্‌টের এই 'থ্রি পেনি অপেরা'কেই নান্দীকার গোষ্ঠী নিবেদন করেছেন 'তিন পয়সার পালা' নামে। ব্রেখ্‌টের নাটকের ইংরেজি অনুবাদ থেকে বাঙলায় রূপান্তরিত করেছেন অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় ('তিন পয়সার পালা' জাতীয় সাহিত্য পরিষদের নান্দীকার-এর 'ত্রয়ী' নাট্য-সঙ্কলনে প্রকাশিত হয়েছে)। মূল নাটকের চরিত্র-পরিচয় এবং পরিবেশকে অজিতেশবাবু কলকাতার উনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদের 'বাবু' সংস্কৃতির কালে স্থানান্তরিত করেছেন। ঐতিহাসিক স্থান ও কালের এই পার্থক্য সত্ত্বেও 'তিন পয়সার পালা' কিন্তু আশ্চর্যভাবে উৎরে গেছে। মূল নাটকের ম্যাক্‌হীথ্, টাইগার ব্রাউন্ আর পীচাম এখানে যথাক্রমে দস্যু মহীন্দ্র, পুলিশের বড় কর্তা 'বাঘা কেষ্ট' এবং ধনী ভিক্ষুক-ব্যবসায়ী যতীন্দ্রনাথ পাল-এ রূপান্তরিত। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দের কলকাতায় এইসব ব্যক্তিরা খুবই সঙ্গতভাবে খাপ খেয়ে গেছেন। এমনকি পারুলবালা, প্রীতিলতা ও জোছনাও বেমানান নন। এক কথায় বাবু কালচারের পীঠভূমি কলকাতায় তখন এ-জাতীয় ঘটনা একান্ত অস্বাভাবিক ছিল না। ফলত 'থ্রি পেনি অপেরা'র বাঙলা রূপান্তর

রূপে 'তিন পয়সার পালা'কে তাই প্রায় মৌলিক নাটক বলেই মনে হয়। মঞ্চ পরিবেশ ও সাজসজ্জা রচনার দিকেও নান্দীকার গোষ্ঠী উনবিংশ শতকের এই কলকাতাকেই বিশেষভাবে স্পষ্ট করে তুলতে পেরেছেন। তবে প্রধান গায়কের পোষাক এবং হাতের ঘড়িতে এ-পরিবেশ বিচ্যুত হয়েছে। কিন্তু সমগ্র নাটকের প্রয়োগনৈপুণ্যে তা ঢাকা পড়ে গেছে। ব্রেথ্‌টের নির্দেশমতো ঘটনাপ্রবাহের ইঙ্গিতবাহী প্ল্যাকার্ডের ব্যবহার, দর্শকদের সামনেই কোনো সময়ে মঞ্চসজ্জার প্রস্তুতি ও অভিনেতাদের বিচিত্র ও নানা রঙ-বেরঙের জমকালো পোষাকে ও হালকা চালের নাচের ভঙ্গিতে সমস্ত ব্যাপারটাই দর্শকদের উপভোগ্য রূপে উপস্থিত করা হয়েছে। মাঝে মাঝে যাত্রার আবহও দেখা গেছে। ব্রেথ্‌টের থিয়েটারে অভিনয় অনেকাংশে স্টাইলাইজড, তথাপি তা যথেষ্ট কঠিনও বটে। নান্দীকার গোষ্ঠী দলগত অভিনয়ের গুণপনায় তাকে অনেকখানিই আয়ত্ত করতে পেরেছেন। বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায় অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত, কেয়া চক্রবর্তী, অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়, সীমন্তিনী দাস ও লতিকা বসু-র কথা। সঙ্গীত এ-নাটকের ফর্মেরই একটি অঙ্গ। সেদিক থেকে সঙ্গীতের সুষ্ঠু প্রয়োগের জন্যও প্রধান গায়ক রূপে পরিতোষ পাল প্রশংসার যোগ্য। সবশেষে 'তিন পয়সার পালা'-র জন্য নান্দীকার গোষ্ঠীকে আমাদের অভিনন্দন জানাই।

অজিত বন্দ্যোপধ্যায়

চন্দ্রশেখর বেঙ্কট রমন

ভারতের বৈজ্ঞানিক গবেষণার ক্ষেত্রে এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক ছিলেন চন্দ্রশেখর ভেঙ্কট রমন। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত বিজ্ঞানের অনুসন্ধান কাজে ব্রতী এই মানুষটি বরাবর নিজেকে প্রচারযন্ত্রের নাগালের বাইরে সরিয়ে রেখেছেন। ভারতের বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যে-রাজনীতির খেলা শুরু হয়েছিল, তা থেকেও তিনি ছিলেন অনেক দূরে। সাধারণ মানুষের কাছে তাই তাঁর পরিচয়টা বরাবরই ছিল খুব অস্পষ্ট, বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর বহু উক্তিকেও অনেকে তাই ভুল বুঝেছেন। কেউ তাঁকে বলেছেন দাম্ভিক, কেউ বলেছেন কটুভাষী—সঠিক মূল্যায়নটা আর হয়ে ওঠেনি।

রমন ছিলেন বিজ্ঞানী—মনেপ্রাণে খাঁটি বিজ্ঞানসাধক। বিজ্ঞানের গবেষণাই ছিল তাঁর জীবনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। যে 'রমন এফেক্ট' আবিষ্কারের জন্যে ১৯৩০ সালে তিনি পদার্থবিদ্যায় নোবেল পুরস্কার লাভ করেন, সেই আবিষ্কারের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে যখন তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, তার এই বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার পদার্থবিদ্যা ও রসায়নবিদ্যার ক্ষেত্রে কি অসাধারণ সম্ভাবনার দিগন্তকে খুলে দেবে, তখনো কিন্তু কেউ তাঁকে এতটুকু বিচলিত বা উত্তেজিত হতে দেখে নি। ভবিষ্যতে নতুন কাজের পরিকল্পনার কথা তখন তিনি ভাবছেন। খাঁটি কর্মসাধকের এরচেয়ে বড় পরিচয় আর কিছু হতে পারে না।

রমন ১৮৮৮ সালের ৭ই নভেম্বর দক্ষিণ ভারতের ত্রিচিনাপল্লীতে জন্মগ্রহণ করেন। ছোটবেলা থেকেই পদার্থবিদ্যা বিষয়ে তাঁর গভীর আগ্রহ জন্মে। একটি ছোট ঘটনা থেকে এই আগ্রহের আন্তরিকতার পরিচয় পাওয়া যাবে। রমনের বয়েস যখন সাত, তখন তিনি একবার খুব অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং ভুল বকতে শুরু করেন। তার সেই কথা থেকে বোঝা গেল তিনি আসলে লিডেন জারের মধ্যে বৈদ্যুতিক ডিসচার্জের পরীক্ষাটি দেখতে চাইছেন। পরীক্ষাটি দেখানোর পরে রোগীর অবস্থাও শান্ত হয়ে এল।

রমন মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পদার্থবিদ্যায় অত্যন্ত কৃতিত্বের সঙ্গে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী লাভ করেন। স্নাতক হবার পূর্বেই রমন বিজ্ঞানের মৌলিক গবেষণায় কৃতিত্বের পরিচয় দেন। ১৯০৬ সালে আলোক-বিজ্ঞানে তাঁর একটি

মৌলিক গবেষণাকাজ লণ্ডনের ফিলসফিক্যাল ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হয়েছিল।

রমনের আন্তরিক ইচ্ছা, পদার্থবিদ্যার উচ্চতর গবেষণার জন্যে বিদেশে যান, কিন্তু তাঁর দুর্বল স্বাস্থ্য অন্তরায় হয়ে দাঁড়াল। বাড়ির দিক থেকে অবশ্য চাপটা ছিল, যাতে তিনি সরকারের প্রশাসনিক ক্ষেত্রে কোনো চাকুরী গ্রহণ করেন। মাত্র ১৯ বছর বয়সে এক সরকারী প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করে রমন ভারতীয় ফিনান্স ডিপার্টমেণ্টে ডেপুটি অ্যাকাউণ্টেণ্ট জেনারেল পদে অধিষ্ঠিত হয়ে কলকাতায় এলেন। ভবিষ্যতের মহান বৈজ্ঞানিকের এক বিচিত্র কর্মজীবন শুরু হলো।

'ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দি কালটিভেসন অফ সায়েন্স'-এর কর্মকেন্দ্র তখন বৌবাজার স্ট্রীটে প্রতিষ্ঠিত ছিল। ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার ছিলেন তার প্রতিষ্ঠাতা। রমন তাঁর কাছে গিয়ে অনুমতি চাইলেন যাতে তার অবসর সময়ে অ্যাসোসিয়েশনের গবেষণাগারের সাহায্য নিয়ে তিনি কিছু কিছু বৈজ্ঞানিক গবেষণার কাজ করতে পারেন। অনুমতি সহজেই পাওয়া গেল এবং রমন তাঁর অবসর সময়ের প্রতিটি মুহূর্ত গবেষণাগারে কাটাতে শুরু করলেন।

দশ বছর বিভিন্ন জায়গায় সরকারী চাকুরী করার পর রমন ১৯১৭ সালে আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের অনুরোধে বিজ্ঞান কলেজে পদার্থবিদ্যা বিভাগে পালিত অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করলেন। ইতিমধ্যেই নেচার, ফিলসফিক্যাল ম্যাগাজিন, ফিজিক্যাল রিভিউ প্রভৃতি পত্রিকায় তাঁর মৌলিক গবেষণা সংক্রান্ত বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে।

রমন ষোল বছর বিজ্ঞান কলেজে অধ্যাপনার পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৯২৪ সালে রমন লণ্ডনের রয়েল সোসাইটির ফেলো নির্বাচিত হন। বিদেশের বিভিন্ন বিজ্ঞান সম্মেলনে তাঁকে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করতে হয়। ১৯২৫ সালে মস্কো ও লেনিনগ্রাড বিজ্ঞান অ্যাকাডেমীর দ্বি-শতবার্ষিকী উৎসবে যোগদানের জন্যে তিনি আমন্ত্রিত হন।

১৯৩০ সালে প্রকাশিত হলো রমনের নোবেলপুরস্কারজয়ী যুগান্তকারী আবিষ্কার 'রমন এফেক্ট'। আলোকবিজ্ঞানে এই আবিষ্কার এক নতুন বিস্ময়রাজ্যের দ্বার উন্মুক্ত করেছে। এর সন্ধানী-আলোকের পরীক্ষায় জানা গেছে অসংখ্য প্রশ্নের উত্তর—তরঙ্গতত্ত্বে, অনু-পরমাণু রাজ্যে, বিকিরণ-ধর্মে, তাপ-গতিবিদ্যায়, রসায়নে। এই আবিষ্কারের পরবর্তী দশ-পনেরো বছরের মধ্যে রমন-প্রদর্শন সংক্রান্ত অন্তত দু-হাজার মৌলিক গবেষণা নিবন্ধ বিশ্বের নানাজাতির

বিজ্ঞান-পত্রিকায় স্থান অধিকার করেছে—বিজ্ঞান গবেষণার ইতিহাসে যা অভূতপূর্ব। এই গবেষণাকাজটি এতখানি সর্বজাগতিক আগ্রহ জাগাতে পেরেছিল শুধু নতুন বলে নয়—কেননা বিজ্ঞানের অন্যক্ষেত্রে ঐ সময়ের মধ্যেই আরো নতুন আবিষ্কার হয়েছে—এর প্রকৃত কারণ, একাধারে পদার্থ-বিদ্যা ও রসায়নের লক্ষ্যস্থলস্বরূপ দুর্গম অণুরাজ্যের পথ খুলে গিয়েছিল আলোকবিকিরণের এই নব-পরীক্ষায়। রমনের এই আবিষ্কার সম্বন্ধে মোটামুটি একটা পরিচয় আমরা গ্রহণ করার চেষ্টা করব।

'রমন এফেক্টের' মূলে আলোক বিকিরণের যে-পরীক্ষা, তার প্রেরণার মূলস্বরূপ রমন একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করেছিলেন। ১৯২১ সালে গ্রীষ্মাবকাশে যখন তিনি ইয়োরোপযাত্রী তখন শান্ত ভূমধ্যসাগরের আশ্চর্য নীলোচ্ছ্বাস তাঁর প্রত্যক্ষ করার সুযোগ ঘটে। ঐ রূপ দর্শনের ফলে তাঁর ধারণা হয়, আকাশের বর্ণশোভার মূলে রয়েছে যেমন সূর্যকিরণে বায়ুকণার দীপ্তি, সেইরূপ রবিদীপ্ত বারিকণারাই সমুদ্রবক্ষের নীলোচ্ছ্বাসের মূল কারণ। পর্যটন শেষে কলকাতায় ফিরে এসে ঐ ধারণার বশবর্তী হয়ে রমন অনুরূপ গবেষণায়, অর্থাৎ তরল বস্তু সমূহের অনুদ্বারা আলোকরশ্মির বিক্রিরণ ধর্ম নির্ধারণে প্রবৃত্ত হলেন।

আলোকরশ্মির সঙ্গে বস্তুর অণুর সংঘর্ষ ঘটলে কখনো কখনো আলোর প্রকৃতি বদলে যায়, এইটাই রমন এফেক্ট বা রমন-প্রদর্শনের মূল কথা। ব্যাপারটা কিভাবে ঘটছে দেখা যাক।

আলোকরশ্মি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বস্তুকণায় বাধা পেলে চতুর্দিকে বিকীর্ণ হয়ে পড়ে, যদিও তার বেগ থাকে একই। এই বিকীর্ণ আলোকধারা কতরকমের নিয়ম মেনে চলে, টিণ্ড্যাল থেকে শুরু করে বহু বিজ্ঞানী সেসব অনুসন্ধান করেছেন। যে-ক্ষেত্রে বিকিরক কণা হলো বস্তুর অণু, তার গবেষণায় হাত দেন লর্ড র‍্যালে, যে-কারণে আগে অণুর বিকীরণকে অনেক সময় র‍্যালে বিকিরণ (Rayleigh scattering) বলা হতো। এই আণবিক বিকিরণকে আমরা লক্ষ্যপথে আনতে পারি, তার দীপ্তি বিচার করতে পারি এবং বিকীর্ণ আলোকতরঙ্গের তরঙ্গদৈর্ঘ্য বা কম্পনসংখ্যা মাপতে পারি।

যে-কোনো বস্তুর অণুকে কোনো এক বর্ণের (monochromatic) অর্থাৎ শুদ্ধ এক তরঙ্গদৈর্ঘ্যের স্থির আলো দিয়ে উদ্ভাসিত করা হলো। ফলে অণু থেকে যে-আলো বিকীর্ণ হলো, র‍্যালে দেখালেন সেই আলোর জ্যোতি বর্ণে বা তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যে অর্থাৎ কম্পনসংখ্যার বিচারে দীপক আলোর সঙ্গে অভিন্ন, যদিও সেই

আলো তুলনায় অত্যন্ত ম্লান, দীপক আলোর শতাংশের মতো তার দীপ্তি। একে বলে র‍্যালে-বিকিরণজ্যোতি, ১৮৯৯ সাল থেকে এর ধর্ম নিয়ে বহু গবেষণা হয়েছে।

আশ্চর্য ব্যাপারটা হলো এই, র‍্যালের আবিষ্কারের পর ত্রিশ বছর ধরে কারো লক্ষ্য হয়নি যে বিকীর্ণজ্যোতির সবটুকুই অবিকৃত ও অভিন্ন নয়। তাতে র‍্যালের অভিন্ন জ্যোতির সঙ্গে মিশে আছে আরো ক্ষীণ কিছু নতুন আলো, যা উদ্ভাসী আলোর মধ্যে কখনো ছিল না। তার রঙ আলাদা, অর্থাৎ তরঙ্গদৈর্ঘ বা কম্পনসংখ্যাও পৃথক। এ অতিক্ষীণ র‍্যালে-বিকিরণের ক্ষীণ দীপ্তিরও শতাংশের মতো, তাই হয়তো কারো নজরে পড়েনি। ১৯২৮ সালে রমন এই আলো এবং তার মর্ম ও মূল্যের কথা প্রথম প্রচার করেন, যা তিনি দীর্ঘকালব্যাপী গবেষণার মধ্য দিয়ে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন।

র‍্যালে-বিকিরণের পাশাপাশি এই নতুন ভিন্ন তরঙ্গদৈর্ঘ আলোকতরঙ্গমালাকে রমন-রশ্মি বলে। এরা আবার অনেক সময় একবর্ণের না হয়ে, ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের ম্লান, ম্লানতর নতুন আলোর সমষ্টিরূপে দেখা দেয়।

বস্তুর অণুর সঙ্গে আলোকতরঙ্গের সংঘাতের ফলে দু-রকম ফল ঘটতে পারে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে যা ঘটে, তাকে আমরা বলতে পারি নিষ্ফল সংঘাত। আলোর অণুতে কোনো শক্তিপরীক্ষা হলো না, অবিকৃত আলোকণা যেমন এসেছিল তেমনি ঠিকরে পড়ল, অর্থাৎ বিকীর্ণ হলো অভিন্নজ্যোতি—র‍্যালে যা দেখিয়েছিলেন।

কিন্তু সংঘাত যখন সফল হলো, তখন আলোকণার খানিক শক্তি অণু গ্রাস করে নিল। অতিদ্রুত কাঁপনের একএকটি আলোকণা থেকে অণু যেন নিজের মধ্যেকার স্থির কাঁপনটা কেটে নিল। যেটা বাকি রইল, বিকীর্ণ হলো ভিন্ন জ্যোতির রূপ নিল—তাই হলো রমন-রশ্মি। বস্তুর অণুর মধ্যে আলোর যে-কাঁপনটুকু খোয়া গেল তা অণুর নিজেরই কোনো একটা স্বাভাবিক কাঁপন। উদ্ভাসী আলোর কাঁপন থেকে অণুর স্বাভাবিক কাঁপন বা কাঁপনগুলো একে একে বাদ দিয়ে রমন-রশ্মিরূপ নতুন আলোকমালার সৃষ্টি হলো। যন্ত্রপাতির সাহায্য নিয়ে এই রমন-রশ্মিদের ফটো তোলা যায়, তাদের কম্পনসংখ্যা মাপা যায়।

রমন-পরীক্ষায় উদ্ভাসী আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ বা কম্পনসংখ্যা নিয়ে খুব বাছাবাছি নেই। সেটা আগে থেকে জানা একটা মাসের এবং বিকিরণের

সুবিধার জন্যে নীল-ঘেঁষা হলেই হলো। আসলে মূল্যবান যেটা তাহলো, উদ্ভাসী আলোর কম্পনসংখ্যা থেকে রমন-রশ্মির কম্পনসংখ্যার অন্তরফলটা, কেন-না সেটুকুর মধ্যেই নিহিত রয়েছে অণুর কৃতিত্ব, তার নিত্যধর্ম, তাকে জানার চাবিকাঠি। এটাই অণুনিহিত স্বতঃস্পন্দন। অণুর এই সমস্ত আভ্যন্তরীণ কারণ আগে জানা প্রায় অসাধ্য ছিল, অথচ এদের না মাপতে পারলে অণুর নানা সূক্ষ্ম গঠনকৌশল জানার কোনো উপায় নেই।

পদার্থ ও রসায়নবিদ্যার সমবেত বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে রমনের আবিষ্কারের বহুমুখী প্রয়োগ ঘটেছে—বিশ্বের গবেষণা-পত্রিকাসমূহে এ-বিষয়ে তিন হাজারের ওপর মৌলিক প্রবন্ধ প্রকাশের মধ্য দিয়েই আমরা তার পরিচয় লাভ করি। ১৯৫৫ সালে এ-বিষয়ের ওপর এক আন্তর্জাতিক সম্মেলনও অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

রমন তাঁর নোবেল পুরস্কারের অর্থের বেশিরভাগ অংশ ক্রিষ্টালোগ্রাফী সংক্রান্ত গবেষণার জন্যে হীরক কেনার ব্যাপারে খরচ করেন। তিনি সারা জীবনে বিভিন্ন আকারের ৭০০এর বেশি হীরকখণ্ড সংগ্রহ করেন। আসল বা নকল হীরে চেনার ব্যাপারেও তিনি ছিলেন এক নিপুণ ব্যক্তি।

রমন ১৯৩৩ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে বাঙ্গালোরের ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ সায়েন্সের ডিরেক্টর রূপে যোগদান করেন। ১৯৪৩ সালে তিনি বাঙ্গালোরে রমন রিসার্চ ইনষ্টিটিউট স্থাপন করেন এবং পরবর্তীকালে এখানেই তাঁর সমগ্র বৈজ্ঞানিক গবেষণা কাজ পরিচালিত হয়। রমন বিদেশের বহু আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানের দ্বারা সম্মানিত হয়েছিলেন। ১৯৪৯ সালে রমন ভারতের জাতীয় অধ্যাপক নির্বাচিত হন এবং ১৯৫৪ সালে তাঁকে ভারতরত্ন উপাধি দিয়ে সম্মানিত করা হয়। তিনি সোভিয়েট ইউনিয়নের বিজ্ঞান অ্যাকাডেমির করেস্পণ্ডিং মেম্বার নির্বাচিত হয়েছিলেন এবং ১৯৫৭ সালে আন্তর্জাতিক লেনিন পুরস্কার লাভ করেন।

নীরস পদার্থবিদ্যার গবেষণায় ব্যাপৃত থেকেও রমনের সৌন্দর্যস্পৃহা এবং রসবোধ ছিল অপরিসীম। বিভিন্ন সঙ্গীতযন্ত্র, আলোক-তরঙ্গের বিচিত্র অভিব্যক্তি সমুদ্রের রঙ, পাখির পালকের বর্ণবৈচিত্র্য, শামুক-ঝিনুকের খোলায় রামধনুর কম্পন, হীরকের গঠন, আণবিক সংস্থান ও সৌসাদৃশ্য বিষয়ে বিভিন্ন গবেষণার মধ্যেও তাঁর সূক্ষ্ম সৌন্দর্যবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। রঞ্জন-রশ্মির diffraction বা অবচ্যুতি এবং ফুলের রঙ সম্বন্ধেও তিনি উল্লেখযোগ্য গবেষণা করেছেন। গবেষণার মূলে ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার এবং আশুতোষ মুখোপাধ্যায়-এর কাছে তিনি কৃতজ্ঞতার কথা আজীবন স্বীকার করেছেন।

শঙ্কর চক্রবর্তী

আচার্য আলাউদ্দিন খাঁ

ভারতীয় ক্লাসিক্যাল সঙ্গীতের মহর্ষি আচার্য আলাউদ্দিন খাঁ সাহেব পূর্বেই পদ্মভূষিত হয়েছিলেন, এবারে পদ্মবিভূষিত হলেন। অবশ্যই আচার্য খাঁ-সাহেব এমনই বৃদ্ধ হয়েছেন যে, ভূষণ বা বিভূষণের তিনি বাইরে, এমনকি 'রত্ন' লাভ করলেও মহর্ষির কাছে সেটা বিভূতি মাত্র ; তবে 'ভারতরত্ন'-টা নিশ্চয়ই ভারত সরকারের মন্ত্রীবর্গের বা উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীদের জন্যই তোলা আছে। এবং আচার্য খাঁ-সাহেবকে পদ্মবিভূষিত করে ভারত সরকার যে বিশেষ সম্মানিত হয়েছেন সে-বিষয়ে আমাদের কোনো সন্দেহ নেই।

পুরাণে পড়ি মহর্ষি ভগীরথ ষাট সহস্র বছর কঠোর তপশ্চর্যা করে মর্তভূমিতে স্বর্গ মন্দাকিনী এনে সগরবংশকে উদ্ধার করেছিলেন, আর তাতে ভারতভূমি গঙ্গার স্রোতে হয়ে উঠেছে সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা।

সঙ্গীতের জন্য আচার্য খাঁ-সাহেবের সাধনাকে তুলনা করতে পারি মহর্ষি ভগীরথের সঙ্গে, সেই দুরূহ শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের রসধারায় ভারতভূমি আজ উর্বর। লক্ষ্য করার বিষয়, আজীবন সাধনালব্ধ শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের কঠোর বন্ধনী ভেঙে আচার্য খাঁ-সাহেব তাতে এনেছেন লোকসঙ্গীতের, বিশেষ করে, পূর্বরাঙলার লোকসঙ্গীতের মিষ্টি রস। একদিকে তিনি ধ্রুপদীর ধ্রুপদী, অপরদিকে তাঁরই হাতে, ইদানীং তাঁর মহারথ পুত্র আলি আকবর খাঁ বা জামাতা রবিশঙ্করের হাতে হয়তো ভোর রাত্রের শেষ আসরের ভৈরবী মনে করিয়ে দেয় বাঙলা দেশের একেবারে ঘরোয়া লোকসঙ্গীতের জলে-ভেজা মিষ্টি শ্যামল রূপটিকে, যদিও যে-কোনো সময়েই তাতে তাঁদের ঘরের স্বকীয় তন্ত্রবাজের কাঠামোটি থাকে অক্ষুণ্ণ।

তাঁর জীবনকথা

পুরো তথ্যসমৃদ্ধ জীবনী হয়তো একদিন প্রকাশিত হবে, উপস্থিত বিশিষ্ট কয়েকটি ঘটনার মাত্র উল্লেখ করেই ক্ষান্ত হতে হবে স্থানাভাবে।

কুমিল্লার শিবপুরের গ্রামে ওঁদের হলো ডাকাতের বংশ—পরে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে সাধক সম্প্রদায়ী এই বংশটিতে ইসলাম ও হিন্দুধর্মের প্রভাব প্রায় সমান সমান। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের প্রভাবান্বিত এই পুরুষটি উদয়শঙ্করের

সঙ্গে ইউরোপ ভ্রমনান্তে হজ্ করে এসেছেন। আবার মাইহারে তাঁর একান্ত নিজস্ব ছোট কামরাতে বহু দেবদেবীর সঙ্গে যীশুখৃষ্টের ছবিও দেখেছি।

বড়ো ভাই ফকির আফতাবউদ্দিন বাঁশি বাজাতেন। দরবারী ছিলেন না কোনোদিনই, তবে তাঁর বাঁশির নাম ছিল তখনকার বাঙলাদেশে।

ছোট ভাই, আলাউদ্দীন, লোকে তাকে ডাকতো 'আলাম' বলে (মাথাটা বড়ো) বছর দশেক বয়সে বাড়ি থেকে পালিয়ে কলকাতার পথে পথে ঘুরে, ভিখারির নঙ্গরখানায় খেয়ে শেষ অবধি রাজা সৌরেন্দ্রমোহন ঠাকুরের সভাগায়ক গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য (নুলো গোপাল নামে সাময়িক পরিচিত) এর কাছে এক নাগাড়ে সাত বছর কেবলমাত্র সারগাম অভ্যাস করেন। বলা বাহুল্য, নুলো গোপালের মায়া পড়ে যায়, বাড়ি-ছাড়া এই ছোট ছেলেটিকে একেবারে গোড়ার ধ্রুপদী স্বরসাধনার তালিম দিতে তিনি কার্পণ্য করেননি।

যে-কলকাতার পথে পথে একদিন তিনি ঘুরে বেড়িয়েছিলেন, সেই কলকাতার পৌরসভা যখন ১৯৫৮ সালের আগষ্ট মাসে তাঁকে পৌর সম্বর্ধনা দান করে তখন সে-কথা আচার্য খাঁ-সাহেব সজল চোখে ধন্যবাদার্থে বলেছিলেন।

নুলো গোপাল হঠাৎ মারা যান কলকাতার বিখ্যাত প্লেগে, আলাউদ্দিনের বয়স তখন বছর কুড়ি। কলকাতার প্লেগ হয়েছিল ১৮৯৮ সালে।

নুলো গোপালের মৃত্যুর পর আবার কিছুদিন পথে পথে ঘুরে শেষ অবধি বিবেকানন্দের খুল্লতাত হাবু দত্তের আসরে বেশ কয়েকটি বাজনা এমনকি বিলাতি শেখার তাঁর সৌভাগ্য হয় এবং গিরীশ ঘোষের কৃপায় তাঁর সামান্য একটা চাকরিও বোধহয় মিনার্ভা থিয়েটারে জুটে যায়। ইতিমধ্যে বাড়ির লোক খোঁজ পেয়ে তাঁকে জোর করে বাড়ি ফেরত নিয়ে গিয়ে বিয়ে দেয়।

কিন্তু বিয়ের রাত্রেই তিনি আবার কলকাতা চলে আসেন এবং অনেক চেষ্টাচরিত্র করে আমির খাঁ-সাহেবের কাছে সরোদ শিক্ষার সুযোগ পান। গুরু সেবার নামে শিষ্যকে অনেক কিছুই কষ্ট করতে হয়, শিক্ষার কাজটাও বেশির ভাগ মুখে মুখে। আসলে, আমাদের আজকের দিনের কলেজ বা স্কুল ধরনের স্বরলিপি মারফৎ শিক্ষার ব্যবস্থাও ছিল না, আবার আলাউদ্দীনের মতো অজ্ঞাতকুলশীল ছাত্রের মতো গুণপনাই থাক না কেন, গুরুর কাছে ব্যক্তিগত তালিমের ব্যবস্থাও ছিল না।

অথচ আলাউদ্দীন ছিলেন শ্রুতিধর এবং শুনে শুনে যা শিখেছিলেন তাই বাজাতে গিয়ে একদিন গুরুর কাছে, যাকে বলে, ধরা পড়ে গেলেন। শেষ

অবধি আমির খাঁ তাঁকে বললেন 'সরোদ শিখতে চাও তো রামপুরে উজীর খাঁকে ধরো'।

রামপুরের নবাবের সঙ্গীতের সভাটি বিশেষ জাঁকালো, ভারতবিখ্যাত বহু জ্ঞানীগুনীর সমাগম হয়ে থাকে, আর মিয়া তানসেনের দৌহিত্র বংশের উত্তরাধিকারী উজীর খাঁ ধ্রুপদী ও বীণকারও বটে তার মধ্যমণি, তাঁর নাগাল পাওয়া সহজ নয়। সুদূর বাঙলাদেশের মলিন বস্ত্র পরিহিত গোত্রহীন আলাউদ্দীনের স্থান কোথায় সেখানে? যুবক আলাউদ্দিন কিন্তু দৃঢ়প্রতিজ্ঞ—ইট খোলায় সামান্ত বেতনে চাকরি করে কোনোরকমে দিনযাপন করেন আর ঘুরঘুর করেন যদি উজীর খাঁর সাক্ষাৎ মেলে। শেষ অবধি তিনি একদিন রামপুরের নবাবের গাড়ি রুখে দিলেন, হাতে আফিমের ছোটো কৌটো, সামান্ত দাবি—উজীর খাঁর কাছে না শিখতে পারলে প্রাণ রাখবো না।

রামপুরে বাঙলাদেশের ছেলেদের একটু ভয় করতো—তারাই না বোমা পিস্তল নিয়ে ইংরেজ হুকুমতকে তাড়াবার সঙ্কল্প নিয়েছে। আলাউদ্দীনের প্রতিজ্ঞার সামনে নবাব প্রথম তাঁর বাজনা শুনলেন, প্রীত হয়ে উজীর খাঁর কাছে শেখার ব্যবস্থা করে দিলেন।

আলাউদ্দীন উজীর খাঁর বাড়িতে ঢুকবার অনুমতি মাত্র পেলেন বলা চলে। সকালে যান, গড়গড়ার জল ফিরানো থেকে কাপড়-কাচা ইত্যাদি সবরকমের গুরুসেবাই করেন, বদলে উজীর খাঁর বড়ো ছেলে সগীর খাঁর (আজকের বহুপরিচিত দবীর খাঁর পিতা) -কাছে কিছু কিছু তালিম মেলে। অবশ্য আগেই বলেছি, আলাউদ্দীন ছিলেন শ্রুতিধর; কোনো আসরে বা উজীর খাঁ যখন নিজের মনে বাজাতেন তখন শুনতে পেলেই তাঁর যথেষ্ট। পরে তিনি বাড়ি ফিরে তা তুলে নেবেন।

ঠিক কত বছর এ-ধরনের শিক্ষা তিনি পেয়েছিলেন বলা শক্ত--মনে হয়, অন্তত দশ থেকে বারো বছর। তারপর একদিন উজীর খাঁ তাঁর শিক্ষার সমাপ্তি ঘোষণা করে বিদায় দিলেন। কলকাতা ফিরে দলাদলি ভালো লাগলো না, ছোট মাইহার স্টেটের রাজার কাছে হাজির হলেন। রাজা বাজনা শুনতে চাইলেন—সময়টা বিকাল, আলাউদ্দিন সন্ধিপ্রকাশ রাগ 'শ্রী'তে আলাপ করবেন বলে যন্ত্র বেঁধে যেই সামান্ত বাজিয়েছেন, রাজা তাঁকে আসতে বল্লেন। মনটা খারাপ হয়ে গেল, 'শ্রী'র মতো রাগ, এ-কোন্ বেরসিক বেসুর আদমি যে সেটা শুনতে চায় না।

পরদিন রাজা তলব করে আলাউদ্দীনকে গুরুপদে বরণ করলেন, বললেন, 'তোমার ঐ রাগে আমার যে অপূর্ব রোমাঞ্চ ও অনুভূতি হয়েছে, তাতে তোমাকেই আমার সঙ্গীতগুরু করলুম।'

সালটা যতদূর অনুমান করতে পারি, প্রথম মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পরে, ১৯১৮-১৯। এই সময়েই তাঁর বড়ো মেয়ের জন্ম হয়, কিছুদিন পরে ১৯২১-২২এ আলি আকবরের। মাইহারে শান্তিতে দিন কাটে, অনাড়ম্বর জীবন, প্রাচুর্য না থাকলেও মোটামুটি স্বচ্ছল, আর মাইহারেই দু-একটি ছাত্র জোটে, তিমিরবরণ অবশ্য এরপরে।

এমন সময়ে খবর পেলেন, গুরু উজীর খাঁর বড়ো ছেলে, সগীর খাঁ, যাঁর কাছে আলাউদ্দিনের প্রধান শিক্ষা, তিনি মারা গেছেন। সবকিছু থেকে ছুটি নিয়ে তিনি গেলেন উজীর খাঁর সঙ্গে দেখা করতে। গুরু এবার ভেঙে পড়লেন —'আলাউদ্দিন, তোমাকে অনেক কষ্ট দিয়েছি, অন্যায় করেছি, আসল শিক্ষা তোমাকে দিইনি; এখন থেকে যাও, দোবো।'

সত্যই, এরপরের দু-তিন বছর যে-শিক্ষা আলাউদ্দিন উজীর খাঁর কাছে পেলেন, সেটাই তাঁকে একদিন রামপুরের উজীর খাঁর ঘরের প্রধান উত্তরসাধক করে তুললো। পরে এখান থেকেই তাঁর নিজের অর্থাৎ আলাউদ্দিনের ঘরানার সৃষ্টি। অবশ্যই আলাউদ্দিনকেও একদিক থেকে ছাড়িয়ে গেছেন তাঁর পুত্র, আলি আকবর খাঁ—তবে সঙ্গীতের বহুল প্রচারের সুযোগে তথা লং-প্লেয়িং রেকর্ড প্রভৃতির কল্যাণে ঘরানার গোঁড়ামি আজ প্রায় ভেঙে গেছে। তাছাড়া আলি আকবর খাঁ সাহেবকে দেখেছি, স্বরলিপির ব্যবস্থা প্রচলনে বিশেষ উৎসাহী, এবং এমনকি কখনও নিজেকে লিখে দিতে বা ছাত্রদের স্বরলিপি সংশোধন করতেও দেখেছি।

গুরুর শিক্ষা সমাপ্ত করে ১৯২৪এর এলাহাবাদ সঙ্গীত কনফারেনসে আলাউদ্দীন উপস্থিত। ভাতখণ্ডে প্রমুখ বড়ো বড়ো সমজদার আর ভারত বিখ্যাত বহু গায়ক বাদকের সমাবেশ হয়েছে। আলাউদ্দিন বাজাতে চান, কিন্তু বিশেষ পাত্তা মেলে না। কারণ গুরুর নাম উল্লেখ করেননি, পাছে খারাপ বাজান। এটা আমার তাঁর নিজের মুখেই শোনা। শেষ অবধি দুই প্রোগ্রামের মাঝের দশ-পনের মিনিটের ব্যবধানে তাঁকে বাজাতে অনুমতি দেওয়া হলো।

আলাউদ্দিন খাঁ সাহেবের ভাষায়, 'ইষ্টদেবতা ও গুরুর নাম স্মরণ করে বাজাতে বসে কখন দশ-মিনিট গড়িয়ে দেড়-ঘণ্টা হয়ে গেছে, কি বাদক কি

শ্রোতা কোনো আপত্তি করেনি (তখনকার সঙ্গীত কন্‌ফারেনসে এতো অক্ষর বাঁধাবাঁধির ব্যবস্থা ছিল না—অবশ্যই এর দুটো দিক আছে)। আলাপ-জোড়-ঝালার কাজ শেষ হলো, কুণ্ঠিত আলাউদ্দিন, শ্রোতৃবর্গ চমকিত—সঙ্গীত রসিকদের ভাষায়—'এ-কোন্ বনের বাঘ, এ-কোথায় বাড়ছিল?' অবশ্যই জানাজানি হলো।

এবারে তখনকার অন্যতম শ্রেষ্ঠ তবলাবাদক, খলিফা আবেদ হুসেন খাঁ সাহেবের সঙ্গে সঙ্গত—তখনকার দিনের দু-চারজনের মুখে শুনেছি, বহু লয়কারী, আড়ি-কুয়াড়ির নানারকমের জোট ছাড়িয়ে শেষ অবধি দু-জনে জলদে এসে জমে গেলেন প্রায় দু-ঘণ্টা। কেউই কাউকে ছাড়বে না। এ-রকম লড়ালড়ি তখনকার দিনে হতো—আজকাল সঙ্গতের দ্বন্দ্বটা একান্তই চুক্তি করে বন্ধুত্বপূর্ণভাবে। হয়তো ভালোই। শেষ অবধি পণ্ডিত ভাতখণ্ডে দু-জনেরই মান রাখবার জন্য থামিয়ে দিলেন। এরপর থেকে আলাউদ্দিন খাঁ-সাহেব উত্তর ভারতীয় ক্ল্যাসিক্যাল সঙ্গীতের অন্যতম সম্রাট।

আলাউদ্দিনের ঘরানা

আমাদের সঙ্গীত প্রধানত কণ্ঠনির্ভর। অবশ্যই যন্ত্রের স্বকীয় স্বাধীন অস্তিত্ব যন্ত্রের উন্নতি সাধন না হলে হয় না, সেটা প্রাচীন যুগে সম্ভব ছিল না। অতএব যন্ত্রসঙ্গীত ছিল অনুগত—accompanient—যেমন চালু কথা, নারদ বীণা বাজিয়ে গান করছেন।

উজীর খাঁ ছিলেন বীণকার, আসলে বড়ো ধ্রুপদী, ইচ্ছে ছিল বড়ো ছেলে সগীর খাঁকে সেইভাবেই তৈরি করবেন। খানিকটা ঘটনাচক্রে, কিন্তু অপরিসীম সাধনার বলে আলাউদ্দিন খাঁ যখন প্রধান শিষ্যত্ব লাভ করলেন (সগীর খাঁর মৃত্যুর পর) উজীর খাঁ গোড়াতেই বলে নিলেন যে, তাঁর পুত্রবংশীয় ছাড়া আর কাউকে তিনি বীণ শেখাবেন না, তবে তাঁকে সুরোদ শেখাবেন এমন ভাবে যাতে বীণ, রবাব, সুরশৃঙ্গরের বাজ ধরা পড়বে, —এককথায় পুরো ধ্রুপদী আলাপ, এবং মীড় অঙ্গ বা তারপরণের কাজ সবই সরোদের মাধ্যমেই প্রতিভাত হবে।

ভারতীয় যন্ত্রসঙ্গীতের পক্ষে মহা শুভদিন ছিল এটি বলা যেতে পারে। সরোদ পূর্বে ছিল প্রখর দু-তারার লোকসঙ্গীতের মতো একটা যন্ত্র, যার প্রায় একমাত্র বাজ্ ছিল বোল্ অঙ্গ। এরপর থেকে আচার্য আলাউদ্দিন এবং তাঁর

ঘরানার আলি আকবর রবিশঙ্কর বা নিখিল ব্যানার্জীর হাতে আমরা সরোদ বা সেতারের মাধ্যমেই পুরো ধ্রুপদী আলাপ বা জোড়ের কাজ পাই, নিশ্চয়ই রাগমূর্তির রূপায়ণেও সেটা বিশেষ সাহায্য করে। এ-নিয়ে বিস্তৃত কিন্তু হয়তো খানিকটা টেকনিক্যাল আলোচনা করার নিশ্চয়ই আরো অবকাশ আছে। আমরা সাধারণ দু-একটি কথা পেশ করবো।

দশ বছর বয়স থেকে সংগ্রাম করে পঞ্চাশোর্ধে আলাউদ্দিন তাঁর সাঙ্গীতিক প্রতিভার স্বীকৃতি পেয়েছিলেন। এই চল্লিশ বছরের তপশ্চর্যার প্রভাব আলা-উদ্দিনের সঙ্গীতে পড়েছে এমনভাবে, যাতে মনে হয় মাঝে মাঝে তাঁর বাদন যেন খানিকটা নিষ্করুণ, কিছুটা রুক্ষ তবে আসল দরবারী সঙ্গীতের চেহারা নিয়েছে। অথচ এই দরবারী মেজাজের সঙ্গে মিশেছে বাঙলার লোকসঙ্গীতের বহু কলি, ফলে একাধারে তাঁর বাদন যেমন ব্যাকরণশুদ্ধ, তেমনি মিষ্টত্বের দাবি করতে পারে।

সঙ্গীত জগতে আলাউদ্দিন খাঁ-সাহেব মহর্ষি এবং দার্শনিক, আর তাঁর পুত্র আলি আকবর এক কথায় কবি। আলি আকবরের প্রথম যৌবন অবধি কেটেছে কঠোর সাধনার মধ্যে, আর সেটা ঘটেছে মাইহারের ধূসর দিগন্তে, তার পাহাড়ের কোলে আলাউদ্দিনের ছোট্ট 'শান্তি কুটিরে'। আলাউদ্দিনের মতো তাঁকে পথে পথে ঘুরতে হয়নি, তাঁর পিতার তৈরি ঘরের উপর যে ইমারত আলি আকবর গড়ে তুলতে পেরেছেন, সেখানে অবশ্য তিনি একক। ধ্রুপদী অতলস্পর্শী গভীরতার সঙ্গে শ্যামল বাঙলার লোকসঙ্গীতের এমন কবিত্বময় সম্মেলন আর কখনও ঘটেনি। রবিশঙ্কর এখানে একটু আলাদা, প্রজাপতির চঞ্চলতা এসেছে ধ্রুপদী কাঠামোতে, প্রধানত তাঁর বিচিত্র চোখের মাধ্যমে। দু-জনেই সঙ্গীতের রাজা আর জুড়িতে যেন প্রয়াগ-সঙ্গম।

রবীন্দ্র-কল্যাণ

১৯৬১ সালে পার্ক সার্কাস রবীন্দ্র-শতবার্ষিকী উৎসবের ৯ই নভেম্বর আচার্য খাঁ-সাহেবকে সম্মেলনে নিয়ে যাবার সৌভাগ্য হয়েছিল লেখকের। আর মাঠের-মধ্যে তাঁকে যখন পাথুরিয়াঘাটার মন্মথ ঘোষের বিচিত্র চিত্তাকর্ষক সঙ্গীত-প্রদর্শনীতে নিয়ে যাচ্ছি, তখন জাতীয় অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসুর সঙ্গে দেখা। তাঁর আসার কথা ছিল পরের দিন, কিন্তু ভাগ্যক্রমে একদিন পূর্বেই এসে-ছিলেন।

দু-জনে পরম বন্ধু, আলিঙ্গন কুশল এবং সঙ্গীত প্রদর্শনী দেখার পরে যখন

তাঁদের ভেতরের মধ্যে নিয়ে আসা হলো অভ্যর্থনার জন্য তখন প্রায় দুই হাজার লোক। সেখানে আচার্য খাঁ-সাহেব স্বকণ্ঠে মুলুহা-কেদারা ও কল্যাণ মিশিয়ে একটি নতুন রাগের কাঠামো মাত্র পেশ করেন, নাম দেন তাঁর ভাষায় 'গুরু-কল্যাণ'—কারণ রবীন্দ্রনাথকে তিনি গুরু বলেই ডাকেন। আরো প্রায় বছর দুয়েক পরে পুত্র আলি আকবর খাঁ এই কল্যাণের (বলা যেতে পারে রবীন্দ্র-কল্যাণ) পুরো রূপ দিয়েছেন। আর গৎয়ের বন্দেশ করেছেন সাড়েসাত মাত্রায়—রূপকের শেষ তিন মাত্রাকে ডবল করে বাজালে দাঁড়াবে ১ ২ ৩। ৪। ৫ ৬ ৭—অর্থাৎ ৫ মাত্রা।

আচার্য খাঁ-সাহেব অবশ্য রবীন্দ্রনাথের কোনো কোনো গানকে গৎয়ের বন্দেশে ফেলেছেন, বিশেষ করে, রবীন্দ্রনাথের "মহারাজ, একি তোমার সাজ" বেহাগের দ্রুত গতে বাঁধাতে রেখাবের তীব্রতা সত্ত্বেও বেহাগ ক্ষুন্ন হয়নি।

তাঁর দীর্ঘ জীবন কামনা করে ও অপরিসীম শ্রদ্ধা জানিয়ে স্মরণ করি, কলকাতায় তাঁর শেষ বাদন—১৯৫৮এর ১৫ই আগস্টের সকালে—শ্রীঅরবিন্দের জন্মদিনে। সকালের প্রথম প্রহরের দেওগিরি-বিলাবলের বিষণ্ণ সুন্দর করুণ, একান্ত আত্মনিবেদনের ভক্তিমূলক রূপটি কোনোদিন ভুলবার নয়।

দিলীপ বসু

পল এনটনি স্যামুয়েলসন

গতবারের মতো এ-বছরেও সুইডিশ একাডেমির নোবেল প্রাইজ কমিটি সমাজ বিজ্ঞানের প্রতি তাঁদের গুণগ্রাহিতা দেখিয়েছেন, এবং এ-কথা স্বীকার করেছেন যে পদার্থতত্ত্ববিদ, শরীরতত্ত্ববিদ অথবা সাহিত্যিকের মতো সমাজবিজ্ঞানীরাও নিজের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান করতে পারেন। গতবছর এই পুরস্কার পেয়েছিলেন রাগনার ফ্রিশ এবং জান টিনবারজেন। সুইডিশ-একাডেমি অব সায়ান্স এবছর পল এণ্টনি স্যামুয়েলসনকে পুরস্কৃত করতে গিয়ে তাঁদের বিচার পত্রে বলেছেন যে পঞ্চান্ন বছর বয়স্ক এই অধ্যাপক অর্থনৈতিক সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণস্তরকে যে-কোনো অর্থশাস্ত্রবিদের চেয়ে উন্নততর করেছেন।

স্যামুয়েলসন অর্থনীতির ভাষাকে নতুন রূপ দিয়েছেন। তাঁর মতে গণিত ঘেঁষা ভাষা সমস্ত অর্থশাস্ত্রকে এক অপূর্ব ঐক্য প্রদান করবে এবং এই শাস্ত্রের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা, যথা উৎপাদন, ভোক্তা ব্যবহার, ব্যবসায়-চক্র, আন্তর্জাতিক

বাণিজ্য প্রভৃতি একতার সূত্রে আবদ্ধ হবে। তাই তিনি গণিতের মাধ্যমে অর্থশাস্ত্রকে পরিবেশন করেছেন। গণিতের পরিভাষায় গড়ে উঠেছে অর্থশাস্ত্রের মৌলিক সিদ্ধান্তগুলি। এবং যাঁরা গণিত-প্রধান উক্তিই পছন্দ করেন, তাঁদের সুবিধার জন্য তিনি তাঁর গবেষণাগ্রন্থ (হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৪৭) Foundations of Economic Analysis গ্রন্থের শেষ দুই পরিশিষ্টে গণিতের জটিল বিশ্লেষণ সমাবিষ্ট করেছেন।

সামুয়েলসন জন্মগ্রহণ করেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইনডিয়ানা রাজ্যের গ্যারি শহরে ১৯১৫ সালের পনেরোই মে তারিখে। পড়েছেন চিকাগো ও হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে। প্রখ্যাত মার্কিন অর্থনীতিবিদ অ্যালভিন হ্যানসেন ছিলেন হারভার্ডে তাঁর শিক্ষাগুরু। ১৯৪১ সালে হারভার্ড থেকেই তিনি পি. এইচ. ডি. ডিগ্রি লাভ করলেন। তাঁর গবেষণা সন্দর্ভ Foundations of Economic Analysis সামুয়েলসনের অন্তর্নিহিত শক্তির নির্দেশ দেয় এবং তিনি এ-গ্রন্থ প্রকাশের ফলে অর্থশাস্ত্রীয় মহলে বিশেষ মর্যাদা লাভ করেন।

১৯৬০ সালে তিনি টাস্ক্ ফোর্স-এর অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হন। এই টাস্ক্ ফোর্স-এর কাজ ছিল, কি করে মন্দাকে প্রতিরোধ করা যায় সে সম্বন্ধে নির্দেশ দেওয়া। জন মেনার্ড কেইন্স পুঁজিবাদী দেশের মোট আয়কে মোট ভোগ ব্যয় ও মোট লগ্নি ব্যয়ে ভাগ করে দেখিয়েছিলেন। বড়লোকদের বর্ধমান আয় থেকে বেশি বেশি অংশ সঞ্চয় হয়ে যায়। অন্যদিকে মূলধনলগ্নিকারীরা যে শতাংশ আয় প্রত্যাশা করেন, তার চেয়ে বেশি বা প্রায় সমান সুদের হার হলে, লগ্নির হার কমে যায়। এই হ্রাসমান লগ্নিকে ভরতুকি দিতে পারে সরকারী ব্যয়। এ-সরকারী ব্যয় অনেকখানিই কর আরোপ বা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নিয়ে করা যেতে পারে। তাঁর বিবরণীতে সামুয়েলসন বললেন যে জড়ত্বের বা অবনয়নের সম্মুখীন মার্কিনী অর্থনীতি ব্যবস্থাকে বাঁচাতে এবং অর্থনৈতিক বিকাশের নীতিকে কার্যকরী করতে হলে করভার তিন বা চার শতাংশ কমিয়ে দেওয়া প্রয়োজন হতে পারে। মুহ্যমান ও পরিশ্রান্ত অর্থ-ব্যবস্থাকে জীবিত করে তোলার জন্য তিনি অনুমোদিত সরকারী খরচপত্রের সমর্থন করেন। তবে এর জন্য বিশেষ জরুরী এবং বৃহত্তর সরকারী খরচপত্রের সমর্থন করেন না। পরে সামুয়েলসন ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন যে ১৯৬৫ সালের দ্বিতীয় অর্ধাংশে মার্কিন অর্থব্যবস্থার গতি স্তব্ধ হয়ে যেতে পারে এবং সেই ক্ষেত্রে অধিকতর সরকারী প্রোৎসাহের প্রয়োজন হতে পারে। তার

জন্য তিনি যে-নীতি অনুমোদন করেন তাতে রয়েছে করনীতি ও ব্যয়নীতি সম্বন্ধে জাতীয় মনোভাব এবং সুদের হার ও টাকা পয়সার সরবরাহ সম্বন্ধে জাতীয় নীতি। স্বাধীন অর্থব্যবস্থায় মূল্য-যন্ত্র যে সকল অবস্থাতেই অর্থব্যবস্থার মানকে অব্যাহত রাখবে এ যুক্তি তিনি জোর দিয়ে খণ্ডন করেন।

তাঁর সমধিক পরিচিত আলোচনা হলো—Ecanomics-An Introductory Analysis। এই গ্রন্থের দশ লক্ষেরও বেশি কপি শুধু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেই বিক্রি হয়েছে। এ-ছাড়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে যে-সব দেশে ইংরাজির মাধ্যমে শিক্ষার ব্যবস্থা আছে সেখানেও সামুয়েলসনের এই পুস্তকটি জনপ্রিয় পাঠ্যপুস্তকের মর্যাদা পেয়েছে। অর্থনীতির এই প্রাথমিক পুস্তকে গণিতবিধির ব্যাপক প্রয়োগই এর সমাদরের মূল কারণ। আদি সংস্করণগুলিতে সামুয়েলসন তাঁর পুস্তকে মুদ্রাস্ফীতি এবং মন্দাবিষয়ক আর্থিক ঘটনাবলীর জটিল বিশ্লেষণ করেন। পরবর্তী সংস্করণগুলিতে তিনি অর্থশাস্ত্রের পুরোনো এবং নতুন সিদ্ধান্তগুলির মধ্যে একটা নিও-ক্লাসিক্যাল্ সমন্বয়ের চেষ্টা করেন। সংক্ষেপে তাঁর সমন্বয় হলো এই যে অ-সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি বাণিজ্যের মন্দা বা তেজী অবস্থাকে রাজস্ব এবং মুদ্রানীতির সাহায্যে সফলভাবে নিয়ন্ত্রন করতে সক্ষম।

সামুয়েলসনই সর্বপ্রথম নির্দেশ করেন যে স্থিতিস্থাপক অবস্থার ব্যতিক্রমে অর্থব্যবস্থায় কিভাবে প্রতিক্রিয়া হয় এটা না জানলে অর্থব্যবস্থার স্থিতি বজায় রাখা যায় না। এইরূপে তিনিই সর্বপ্রথম গতিশীল ধারার (Dynamic Schema) ব্যবহার করেন। স্থিতিশীল ধারার (Static Equilibrium) প্রবর্তন করেছিলেন ভালরাস এবং পরে এই ধারা পারেতোর হাতে পূর্ণরূপ প্রাপ্ত হয়। পারেতোই তুলনামূলক স্ট্যাটিক্সের ব্যবহার করেন কিন্তু তাঁর গাণিতিক বিশ্লেষণে কিছু দুর্বলতা ছিল। সামুয়েলসন করেসপণ্ডেন্স পদ্ধতির (Correspondence Principle) উদ্ভাবন করে এই বিশ্লেষণকে এগিয়ে দিলেন। এরপরেই তিনি এতে জুড়ে দিলেন Dynamics বা গতিশীলতা। এতেও তিনি সন্তুষ্ট থাকতে পারলেন না। শেষ পর্যন্ত তিনি উদ্ভাবন করলেন তুলনামূলক গতিশীলতা (Comparative Dynamics) যেমন গত শতাব্দীতে ভালরাস করেছিলেন তুলনামূলক স্থিতিশীলতা (Comparative Statics)। তুলনামূলক স্থিতিশীলতার সারতত্ত্ব হলো এই যে আমরা কোনো কিছুর পরিবর্তন করছি এবং সমগ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ওপর একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য তার ফলাফল পর্যবেক্ষণ করছি। স্থিতিশীল অবস্থায় কিন্তু প্রাথমিক অবস্থার পরি-

বর্তনে অর্থব্যবস্থার ব্যবহারে শেষ পর্যন্ত কোনো পরিবর্তন হয় না। কিন্তু এই বিশ্লেষণে বাস্তবের পূর্ণ ব্যাখ্যাও হয় না বলে সামুয়েলসন তুলনামূলক গতিশীলতার প্রবর্তন করেছিলেন।

কল্যাণের অর্থশাস্ত্রের (Welfare) ক্ষেত্রে সামুয়েলসান হলেন ordinal utility সিদ্ধান্তের একজন প্রাথমিক প্রবর্তক। এই সিদ্ধান্ত যাঁরা প্রস্তুত করেছেন তাঁরা বলেন যে প্রান্তিক উপযোগিতার সিদ্ধান্তকে গ্রহণ করার বিরুদ্ধে পরিমাপ্যতাই যখন প্রধান অন্তরায় তখন একে অপরিমাপ্য করাই হলো এই সিদ্ধান্তকে উৎকর্ষের পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। মনে করা যাক, একজন ব্যক্তি ক বস্তুসমূহের চেয়ে খ বস্তুসমূহকে বেশি পছন্দ করে, এবং খ এর চেয়ে গ বস্তুসমূহকে আরো বেশি পছন্দ করে। তাহলে এ-কথা বলা চলে যে সে গ বস্তুসমূহকে ক বস্তুসমূহের চেয়েও বেশি পছন্দ করে। সামুয়েলসন বললেন যে এই প্রকাশ্য পছন্দ সিদ্ধান্ত (Revealed preference theory) সম্পূর্ণ অবাস্তব, কেননা এর আধার হল ব্যক্তির ব্যবহারের যৌক্তিকতা এবং সঙ্গতি সম্বন্ধে ধারণা, যে ধারণা বাস্তবিক পক্ষে ঠিক নয়। এ-ছাড়া প্রকাশ্য পছন্দ সিদ্ধান্ত আমাদের ভোগ ব্যবহার বিষয়েও যথোচিত সমাধানের পথ নির্দেশ করে না। একইভাবে সামুয়েলসন দেখিয়েছেন যে সামূহিক নিরপেক্ষতার রেখার Community Indifference curve-এর ধারণাটিও ভ্রান্ত।

নিও ক্লাসিকাল বণ্টন সিদ্ধান্তের সমালোচনা করতে গিয়ে সামুয়েলসন বলেছেন যে এই সিদ্ধান্তের মূলে রয়েছে মানুষের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিখুঁত ধারণা যা সত্যিকারের সঞ্চয় এবং সত্যিকারের পুঁজিনিয়োগকে সমান করে রাখবে। বাস্তবিক পক্ষে এই ধরনের পরিস্থিতি তখনই হতে পারে যখন পূর্ণনিয়োগের সঙ্গে সঙ্গে মুদ্রাস্ফীতি বিদ্যমান রয়েছে। কিন্তু ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে এই ধরনের পরিস্থিতি খুব কমই হয়ে থাকে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় অ-পূর্ণনিয়োগ (Underemployment)। তখন সঞ্চয়ের চেষ্টা করা সত্ত্বেও সঞ্চয়ের পরিমাণ কমই হয়, বেশি নয়। ভোগব্যবহার কম করার চেষ্টার ফলে আয় কমে যায় এবং শেষ পর্যন্ত সবাই নিজেকে সঞ্চয় করার ব্যাপারে অসমর্থ মনে করে। এমনি করে বিকশিত পুঁজিবাদী দেশে মিতব্যয়িতার ফলে পুঁজিনিয়োগ প্রকৃত-পক্ষে কম হয়ে পড়ে।

ডর্ফমান এবং সোলো-এর সঙ্গে সামুয়েলসনের যৌথ রচনা Linear Programming and Economic Analysis গ্রন্থটি এক নতুন পথনির্দেশ

করেছে। এই গ্রন্থটিতে Linear Programming এবং Input-Output-এর বিশ্লেষণ সুসম্বদ্ধভাবে সর্বপ্রথম প্রকাশিত করা হয়েছে। যদিও এই দুইটি বিষয়ে সোভিয়েত অর্থনীতিবিদ্ কেনতারোভিচতো বটেই, আমেরিকায় দান্‌ৎসীগ এবং লিয়োনতিয়েফ্ ইতিপূর্বেই কিছু কাজ করেছিলেন। বিশেষ করে লিয়োনতিয়েফ্ কাজের অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিমানবহরের বহুমুখী কাজকর্মের ভেতরে কিভাবে সর্বোচ্চ উপযোগিতার প্রবর্তন করা যায়, এই প্রসঙ্গ বিচারে কিন্তু এদের উপযোগিতা সম্বন্ধে কোনো পরিষ্কার ধারণা ছিল না। এই সব সিদ্ধান্তের অন্তরালে প্রধান যুক্তি হলো এই যে যেখানে উৎপাদন সহযোগী সংখ্যায় অনেক এবং তাদের ব্যবহারও নানাভাবে হতে পারে সেখানে সর্বোচ্চ ফল পাওয়ার জন্য অর্থব্যবস্থায় এদের কাম্য প্রয়োগ প্রয়োজন। Input-Output বিশ্লেষণের প্রাথমিক স্তরের লক্ষ্য ছিল একটা বদ্ধ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যেখানে ভোগ সামগ্রীকে ধরে নেওয়া হয়েছিল অন্তর্বর্তী সামগ্রী হিসেবে, এবং এদেরই পক্ষান্তরে ব্যবহার করা হতো ব্যক্তিগত সেবারূপে। পরবর্তীকালে এই বিশ্লেষণের উৎকর্ষ করতে গিয়ে চরম চাহিদাকে স্বতন্ত্রভাবে নির্ধারিত বলে নেওয়া হয়েছে। এবং Input-Output বিশ্লেষণকে অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের এমন একটা স্তর আবিস্কার করতে হবে যা স্বতন্ত্রভাবে নির্ধারিত এই চরম চাহিদার সঙ্গে সঙ্গতি রাখতে পারে। পোলিশ অর্থনীতিবিদ্ অসকার্ লাঙ্গে এই Input-Output বিশ্লেষণের উপযোগিতা সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে ব্যাখ্যা করেছেন। বলা বাহুল্য, সোভিয়েত অর্থনীতি ঢের আগে থেকেই ব্যাপ্ত পরিকল্পনার প্রয়োজনে এ-বিশ্লেষণ কার্যকর করেছিল। মার্কসের উৎপাদনের সূত্রের মধ্যেই Input-Output বিশ্লেষণের বৈজ্ঞানিক সূত্রপাত ছিল।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ক্ষেত্রে সামুয়েলসন লিখেছেন যে 'প্রতিবেশীকে ভিক্ষুক করে দেওয়া'র সংরক্ষণ নীতির ফলে শেষ পর্যন্ত নিজেকেই ভিক্ষুকে পরিণত হতে হয়। অপরপক্ষে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ফলে উভয় দেশেই উৎপাদন সহযোগীদের মূল্যের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য হয়ে থাকে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে Heckscher-Ohlin সিদ্ধান্তে বলা হয়েছে যে অবাধ বাণিজ্যের ফলে জাতীয় আয়ের যে অংশ অপ্রচুর উৎপাদন-সহযোগী পেয়ে থাকে তা আপেক্ষিকভাবে কমে যায়। সামুয়েলসন প্রমাণ করেছেন যে অবাধ বাণিজ্যের ফলে এই অংশ শুধু আপেক্ষিকভাবেই নয়, নিরঙ্কুশভাবেও কমে যাবে।

সামুয়েলসনের রাজনৈতিক চিন্তাধারা অবাধ রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে সমর্থন করে। তিনি বিভিন্ন রাজনৈতিক মতবাদের মধ্যে তুলনামূলক অধ্যয়ন করে এই কথাই প্রতিপাদিত করেছেন যে—কি, কেমন করে এবং কার জন্য উৎপাদন হবে—এই সব চূড়ান্ত প্রশ্নগুলির একমাত্র সহজ লাভ-লোকসান কেন্দ্রিক অর্থব্যবস্থাতেই সঠিকভাবে সমাধান হতে পারে। অপরপক্ষে কেন্দ্রীভূত অর্থব্যবস্থায় এই সব প্রশ্নের সমাধান অবশ্যই হয়ে থাকে, কিন্তু সেই সব সমাধান যে কতখানি নিখুঁত তা বিচারসাপেক্ষ, তবে একটা কথা তিনি স্বীকার করেছেন যে সাম্যবাদী দেশগুলোয় পুঁজিনিয়োগ বিষয়ক সিদ্ধান্ত সরাসরি রাষ্ট্রকেই নিতে হয় বলে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বাণিজ্যিক অস্থিরতাকে এড়িয়ে যেতে পারে। তাই ব্যবসা চক্রের উৎপাত পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে যেভাবে আঘাত করে থাকে, সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে তা স্পর্শও করতে পারে না।

সামুয়েলসন অনেক গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা ও রাষ্ট্রীয় কাজকর্মের সঙ্গে সংযুক্ত থাকা সত্ত্বেও সাধারণ পরিহাসপ্রিয়তা ও বাক্‌পটুতা হারিয়ে ফেলেননি। মূলধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় অসম ঝোঁকের ব্যাপারে তাঁর সরস মন্তব্যগুলি লক্ষণীয়। যখন স্টক বাজার ফেঁপে উঠল তখন তিনি সংবাদপত্রে লিখলেন যে এর জন্য তাঁর বাজারের মূল্য তালিকা দেখার প্রয়োজন হয় না—অর্থনীতির অধ্যাপক বলে তাঁর প্রতি প্রতিবেশীদের আগ্রহ দেখেই তিনি তা বুঝতে পারেন। যখন মহাকাশযাত্রা শুরু হয় তখন তিনি বলেন যে এবার তাঁর পদার্থবিদ্যাবিদ্‌ ও জ্যোতিষশাস্ত্রী বন্ধুদের দরকার হবে। আবার যখন স্টক বাজার ফেঁপে উঠল তখন তিনি সোচ্চার হয়ে বলেন—এবার আমার পালা।

গীতা লালওয়ানী

সারাভারত সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী সম্মেলন

ভারতের রাজনীতিতে সাম্রাজ্যবাদের ট্রোজান হর্স সাম্প্রদায়িকতার ভূমিকা ভারতবাসীর কাছে অজানা নয়। একদা এই অশুভ শক্তিকে কাজে লাগিয়ে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ দ্বিজাতি তত্ত্বকে মূলধন করে ডিভাইড এ্যাণ্ড রুলের কূটকৌশল চালিয়েছে ভারতবাসী তা মর্মে মর্মে জানে। সাম্রাজ্যবাদের দুধকলায় পুষ্ট, দেশী সামন্ততান্ত্রিক ও ধুরন্ধর আমলাতন্ত্রী কেষ্টবিষ্টুদের আশীর্বাদ সিঞ্চিত সাম্প্রদায়িকতার বিষধর স্বাধীনতার পর বারবারই ভারতে এখানে ওখানে ছোবল

মেরেছে। অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদী প্রভাবের জের টেনে আনা এই দুর্লক্ষণ এখন নয়া ঔপনিবেশিকপন্থীদের হাতে তুরুপের তাস হয়ে ওঠার লক্ষণাক্রান্ত।

নয়া ঔপনিবেশিকতার কয়েকটি উল্লেখযোগ্য লক্ষণ আছে। পরাধীন দেশের বিপুল ও ব্যাপক আন্দোলনের ফলে সাম্রাজ্যবাদীরা প্রত্যক্ষত দেশ ছেড়ে গেলেও, মূলধনের রপ্তানি অব্যাহত রাখার জন্য, দেশের কাঁচামাল ও শ্রম শোষণের জন্য এবং সমাজতন্ত্রবিরোধী লড়াইয়ে স্থান, সেনাবাহিনী এবং পরিপোষকতার প্রয়োজনে নয়া ঔপনিবেশিকতার পত্তন ঘটাতে চায়। কার্যত দেশে একটি স্বাধীন সরকার নামে থাকা সত্ত্বেও, নয়া ঔপনিবেশিকতার ফলে সেই সরকার আসলে সাম্রাজ্যবাদীদেরই বশংবদ থাকে। দেশের সবচেয়ে পশ্চাদপদ ও রক্ষণশীল এবং গণতন্ত্রবিরোধী গোষ্ঠীগুলির সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদ আঁতাত করে। কোন সামরিক চুক্তির সঙ্গে সরকারকে সংযুক্ত করে সামগ্রিক সাব-ভার্সনের ব্যবস্থা কব্জা করার প্রচেষ্টা চালায়। এশিয়া-আফ্রিকা-লাটিন আমেরিকার দেশে দেশে সাম্রাজ্যবাদীরা এই নয়া ঔপনিবেশিকতার চক্রান্তজাল বিস্তার করে চলেছে।

বলাবাহুল্য, ভারতের স্বাধীনতার পরিধি ক্রমাগত সঙ্কুচিত করে, আর্থনীতিক-সামাজিক বিকাশ বিনষ্ট করে, যাতে পরিপূর্ণ নয়া ঔপনিবেশিক শোষণ ও শাসন ব্যবস্থা চালু করতে পারা যায়, সে জন্য সাম্রাজ্যবাদীদের পালের গোদা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের চক্রান্তের অন্ত নেই। জাতীয় ও গণতান্ত্রিক বিপ্লবের পরিপন্থী শক্তিগুলিকে বলশালী করে তোলার মধ্যেই নয়া ঔপনিবেশিক চক্রান্ত জয়ী হবার পথ। এজন্য ভারতের দিকে দিকে সাম্প্রদায়িকতা, দুর্বোধ্যতাবাদ, ভাষান্ধতা, উগ্র জাত্যন্ধতার অন্ধকারের শক্তিগুলিকে তারা লালন করছে। সাম্প্রদায়িকতা সেই নয়া ঔপনিবেশিক চক্রান্তের একটি অমূল্য অস্ত্র। আর ভারতের যারা স্বাধীনতার সাচ্চা সৈনিক, যারা গণতন্ত্রের পরিধি বিস্তার করতে উন্মুখ, যারা স্বাধীন ও স্বনির্ভর আর্থনীতিক-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশ কামনা করেন, তাঁদের কাছে সাম্প্রদায়িকতার চেয়ে জঘন্য—অন্ধ আচার, সংস্কৃতি ও পশ্চাদপদতাবিধৃত কুৎসীত বীভৎস আভ্যন্তরীন শত্রু আর নেই। স্বদেশের স্বনির্ভরতার প্রয়োজনে এবং শ্রমিকশ্রেণীর রাজনীতিতে ক্ষমতা পরিগ্রহণের সাপেক্ষতার বিচারে সাচ্চা প্রগতিশীলদের কাছে সাম্প্রদায়িকতার গণতন্ত্রঘাতী ভূমিকা আজ দিনের পর দিন ভারতে স্পষ্ট হয়ে উঠছে। বিশেষভাবে, ভারতে দক্ষিণপন্থী মহা-জোটের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার দলটির প্রাধান্য, সাম্রাজ্য

বাদের পরিপোষকদের শেষ লড়াইয়ের দুর্লক্ষণকে স্পষ্টতর করে তুলছে। আধাসামরিক ধর্মান্ধতাভিত্তিক যুবরক্ষীবাহিনী, শিক্ষাব্যবস্থায় সাম্প্রদায়িকতার প্রচার, অনৈতিহাসিক কাহিনী ও দর্শনপ্রস্থান সাম্প্রদায়িকতাকে একটি অব্যর্থ 'ভারতীয় সত্য' রূপে চিহ্নিত করতে চাইছে। আর এই পরিস্থিতিতেই সারাভারত সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী সম্মেলন সম্প্রতি দিল্লীতে অনুষ্ঠিত হলো। এর আগে আরও তিনবার এ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতবারের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়েছিল এলাহাবাদে।

এ-সম্মেলনের গুরুত্ব আরও কয়েকটি দিক থেকে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। যে সব অঞ্চলে সাম্প্রদায়িকতার জবরদস্তি গত ক-বছরে খুবই দৃশ্যমান ছিল, যেমন পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, অন্ধ্র, মহারাষ্ট্র, বোম্বাই, গুজরাট, জম্মু ও কাশ্মীর, হরিয়ানা, উত্তরপ্রদেশ ও দিল্লী, সে সমস্ত জায়গা থেকে বহু প্রতিনিধি এ সম্মেলনে যোগ দেন। সর্বমোট প্রায় সাতশো সত্তর জন প্রতিনিধি এসেছিলেন। জনসংঘ প্রভাবিত দিল্লী থেকেই এসেছিলেন তিনশোরও বেশি। দিল্লীর মহিলা, বুদ্ধিজীবী প্রভৃতির অকাতরে এই সম্মেলনকে সফল করার জন্য ভূমিকা, দিল্লীতে যে গুণগত রূপান্তর চলেছে সেটাই ঠিক চোখে পড়িয়ে দেয়। দ্বিতীয়ত, প্রতিনিধিদের মধ্যে ছিলেন রাজনীতি ও গণআন্দোলনের বহু বিশিষ্ট নেতা, ছাত্রযুবকর্মী, শ্রমিক ও কৃষক নেতা, সমাজসেবী, সাংবাদিক, শিক্ষাবিদ প্রভৃতি। রাজনৈতিক ও সমাজসেবী সংস্থার মধ্যে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি, মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি (গুজরাট), সংযুক্ত সমাজতন্ত্রী দল (যোশীপন্থী), ফরওয়ার্ড ব্লক, জামিয়াত উলেমা প্রভৃতির প্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। নির্দলীয় কর্মীদের সংখ্যাও কম ছিল না। তৃতীয়ত, একই মঞ্চ থেকে তিনজন জননেতা বিশিষ্ট ভাষণ দেন। প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী বলেন 'সরকারী ও বেসরকারী প্রচেষ্টা সত্ত্বেও সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে সংগ্রামে সাফল্যের অগ্রগতি যৎসামান্য।' তিনি সমস্ত প্রগতিশীল মানুষকে এই সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করতে আহ্বান জানান। তিনি বলেন "এই সংগ্রাম গণতন্ত্র রক্ষায় সংগ্রাম এবং গণতন্ত্র রক্ষার সংগ্রামে আমি জীবনদানে প্রস্তুত।" তাঁর সঙ্গে সুর মিলিয়ে অপর একজন জননেতা শ্রীএস এম যোশী শ্রমিক ও কিষাণ আন্দোলন শক্তিশালী করে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে সংগ্রামে সামিল হতে বলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি এই সমস্যা যে শ্রমিক-কিষাণ আন্দোলনকেও পঙ্গু করে দিচ্ছে তাও উল্লেখ করেন। কিন্তু এই সম্মিলনের সব চেয়ে তাৎপর্য

পূর্ণ ভাষণ দেন কমিউনিস্টনেতা এস জি সরদেশাই। তিনি সাম্প্রদায়িকতাকে ১৯৭০ সালে ফ্যাসিবাদের সঙ্গে সমপর্যায়ভুক্ত করে বলেন—যে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে ইউরোপে প্রত্যেকটি গণতান্ত্রিক দল তাদের সমস্তরকম মতপার্থক্য নিয়েও যেভাবে 'ঐক্যবদ্ধভাবে সংগ্রামে নেমেছিল আজকের ভারতবর্ষের সেই ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম ছাড়া এই ফ্যাসীবাদের অভ্যুদয়কে প্রতিরোধ করা সম্ভব হবে না। ভারতের ফ্যাসীবাদের কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেন জার্মানীতে ইহুদী-বিদ্বেষের মতো ভারতের মুসলিমবিদ্বেষ প্রচারের মধ্য দিয়ে এই ফ্যাসীবাদ সাম্যবাদী, সমাজবাদী ও প্রত্যেকটি মুক্ত চিন্তার আদর্শে বিশ্বাসী গণতান্ত্রিক মানুষকে বিলুপ্ত করতে বদ্ধপরিকর। দেশী, বিদেশী একচেটিয়া পুঁজি এদের প্রতিনিয়ত রসদ যোগাচ্ছে। প্রাক্তন দেশীয় রাজ্যাধিপতিরা; প্রাক্তন সেনাপতি, বৃদ্ধ ও ঝানু আমলারা এদের পশ্চাতে সুযোগের অপেক্ষায় আছে। এই বিপদের লাল সঙ্কেত জানিয়ে তিনি প্রধানমন্ত্রীর মতো সমস্ত গণতান্ত্রিক দল ও মানুষকে এক দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামে অগ্রসর হতে আহ্বান জানান। শ্রীসরদেশাই এই সর্বপ্রথম না হলেও বিশেষ অবস্থার মধ্যে অত্যন্ত জোরালোভাবে সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী আন্দোলনের রাজনৈতিক চরিত্র দেশের গণতন্ত্রানুরাগী মানুষের সম্মুখে স্পষ্টভাবে তুলে ধরেন।

চতুর্থত—এই সম্মেলনের কার্যসূচী হিসেবে তিনটি সেমিনারের আয়োজন করা হয়। এই সেমিনারগুলি যথাক্রমে যুব, মহিলা, ও বুদ্ধিজীবীদের সেমিনার ছিল। এক মহিলা সেমিনার ছাড়া প্রায় সবকয়টি সেমিনার নেহাৎ মামুলী ধরনের হয়েছে। এবং সবচেয়ে নিকৃষ্ট হয়েছে বুদ্ধিজীবীদের আলোচনা। অথচ এই আলোচনায় ডাঃ সতীশচন্দ্র ও দিলীপ মুখার্জি রচিত দুইটি অসাধারণ ভালো নিবন্ধ আলোচনার ভিত্তি হিসাবে পঠিতও হয়েছিল কিন্তু বুদ্ধিজীবীদের স্বভাবজাত অহমিকা ও আত্মপ্রচার উন্মুখতায় এই আলোচনা চক্র এক সুদীর্ঘ ক্লান্তিকর মেঠো বক্তৃতার আসরে পরিণত হয়েছিল। একমাত্র মহিলাদের আলোচনার মধ্যে সাম্প্রদায়িক সমস্যার বিপদ সম্পর্কে গাম্ভীর্যপূর্ণ বাস্তবানুগ আলোচনা ও কর্মসূচীর কথা বলা হয়। এই দিক থেকে এই আলোচনা সার্থক। মহিলা আলোচনার প্রধান নিবন্ধরচয়িতা ছিলেন শ্রীমতী রাজ থাপর। অন্যান্য অংশগ্রহণকারিণীদের মধ্যে ছিলেন শ্রীমতী কমলা কাজি, বিমলা ফারুকি, সুভদ্রা যোশী ও মৈত্রেয়ী দেবী। এই আলোচনা চক্রের উদ্বোধন করেন রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীমতী নন্দিনী সতপথী।

যুব সেমিনার গতানুগতিক ও এলোমেলো হলেও এর উদ্বোধক শ্রীগুজরাল তাঁর উদ্বোধনী ভাষণে বলেন 'আজকাল সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা ইতিহাস, সমাজ, বিজ্ঞান ও দর্শনের আশ্রয় নিচ্ছে আর আশ্রয় নিচ্ছে সাহিত্য ও ললিতকলার। তারা তাদের মারাত্মক সাম্প্রদায়িক আদর্শকে যুক্তি আশ্রয়ী করতে চাইছে। ইতিমধ্যে বেশকিছু বুদ্ধিজীবী, শিক্ষক, অধ্যাপক ও ছাত্র তাদের যুক্তিতে বিভ্রান্তও হচ্ছে।"

পঞ্চমত—এই সম্মেলনে যে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় তার মধ্যে ছিল—(১) জাতীয় সংহতি ব্যর্থতার কারণ নির্ণয় প্রসঙ্গে ; (২) সাম্প্রদায়িক প্রচার ও আধাসামরিক বাহিনী বেআইনী ঘোষণা প্রসঙ্গে ; (৩) সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ন্যায্য অভিযোগগুলির দূরীকরণ প্রসঙ্গে ; (৪) শিক্ষা ব্যবস্থা, পাঠ্যসূচী ও পুস্তক প্রণয়ন প্রসঙ্গে ; ও (৫) মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাবাদের অভ্যুদয় প্রসঙ্গে।—এই প্রস্তাবগুলি আলোচনা তেমন প্রাণবন্ত হয়ে উঠেনি। কারণ সময় খুবই সংক্ষিপ্ত ছিল। তবুও- এর মধ্যে যে সব প্রতিনিধি তাঁদের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বক্তব্যকে জোরালো করতে সক্ষম হন তাঁরা হলেন অধ্যাপক হরিহর তেওয়ারী (পশ্চিমবঙ্গ) শ্রীডি. গোয়েল ; হারদানিয়া (মধ্যপ্রদেশ) পি, ডি, গান্ধী (গুজরাট), অধ্যাপক মৃন্ময় ভট্টাচার্য (পশ্চিমবঙ্গ) ও এম আগরওয়াল (রাজস্থান)।

অপর একটি প্রস্তাবে বিভিন্ন রাজ্য থেকে তিনজন করে প্রতিনিধি নির্বাচিত করে একটি জাতীয় কমিটি গঠন করার কথা ঘোষণা করা হয়। এই কমিটির সভানেত্রী নির্ব্বাচিত হন—শ্রীমতী সুভদ্রা যোশী। পশ্চিমবঙ্গ থেকে এই জাতীয় কমিটিতে আবদুল হালিম, মৈত্রেয়ী দেবী ও শান্তিময় রায় আছেন।

উদ্যোক্তারা বিভিন্ন রাজ্যের অভিজ্ঞতা বিনিময়ের কোন সুযোগ রাখেন নি। কয়েকটা 'গুরুত্বপূর্ণ' প্রশ্নের নিরাকরণ অতীব প্রয়োজন। প্রশ্নগুলি হলো: ১। এই আন্দোলনের সার্থকতা আছে কি? সাম্প্রদায়িকতা কোথাও আছে কি? ২। সমাজবিপ্লব না হলে এর সমাধান হওয়া সম্ভব কি? ৩। সাম্প্রদায়িকতাবাদের সঙ্গে নয়া ঔপনিবেশিকবাদের সম্পর্ক আছে কি? ৪। ১৯৭০-৭১ সালে সাম্প্রদায়িকতাবাদের বিশেষ কোন রাজনৈতিক চরিত্র আছে কি? ৫। একমাত্র শাসনব্যবস্থার মাধ্যমেই এই ব্যাধি দূর করা সম্ভব কি? ৬। শ্রমিক, কৃষক—কেন আন্দোলনে এগিয়ে আসছে না? ৭। এই আন্দোলনে শিক্ষকসমাজের ভূমিকা কার্যকরী হতে পারছে না কেন? এই সব প্রশ্নের আলোচনার মধ্যেই সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী আন্দোলনের ভবিষ্যৎ প্রগতি নির্ধারিত হবে।

শান্তিময় রায়

অধ্যাপক তারকনাথ সেন

কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজের শেষ কিংবদন্তী, ক্যাপ্‌টিন্‌ ডেভিড্‌ লেস্টর্‌ রিচার্ডসন, চার্লজ্‌ হেনরি টনি, হ্যারিংটন্‌ হিউ, মেল্‌ভিল্‌ প্যার্সিভ্যাল, মনোমোহন ঘোষ, হেন্‌রি রোশ্বর্‌ জেমজ্‌, রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ প্রমুখ দিক্‌পাল অধ্যাপকদের সার্থক উত্তরসূরী, তারকনাথ সেনের অমূল্য জীবনের আকস্মিক অবসানে (১১ জানুয়ারি ১৯৭১) উপর্যুক্ত কুলীন কলেজের গৌরবময় ঐতিহ্যের পরিসমাপ্তি ঘটল। এই প্রতিভাবান্‌ অধ্যাপকের পাণ্ডিত্য ও জীবনচর্চার বিস্ময়কর বিবরণী এমতো সংক্ষিপ্ত পরিসরে পেশ করা আমার সাধ্যাতীত; সর্বোপরি মহামতিত্বের সঙ্গে মহানুভবতার এমনতর সার্থক মিলন যে-কোনও দেশকালেই বিরল।

১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের ১১ জানুয়ারি তারকনাথ জন্মগ্রহণ করেন; ষোল বছর বয়সে কলকাতার সেন্ট্রাল্‌ ক্যালিজিয়েট্‌ স্কুল থেকে তিনি ম্যাট্রিকুলেশন্‌ পরীক্ষায় (১৯১৫) উত্তীর্ণ হন। ম্যাট্রিকুলেশন্‌ থেকে এম্‌. এ. (১৯২১) পর্যন্ত প্রত্যেকটি পরীক্ষাতে তাঁর স্থান ছিল সর্বোচ্চ; আর যেসব পদক, পুরস্কার ও বৃত্তি তিনি লাভ করেছিলেন সেগুলির যথাযথ উল্লেখনে প্রয়োজন এক দীর্ঘ তালিকা প্রণয়নের—যতীন্দ্রচন্দ্র পদক (১৯২৫) থেকে ক্ষেত্রমোহন চট্টোপাধ্যায় স্বর্ণ পদক (১৯৩১) পর্যন্ত ন্যূনপক্ষে দশটি সম্মান অর্জনের অধিকারী হন তিনি। এবং এমতো আশ্চর্য বিশ্ববিদ্যালয়গত সাফল্যে আদৌ তারকনাথের বিদ্যাবত্তা শান্ত হয়নি; জীবনের শেষ সচেতন মুহূর্ত পর্যন্ত জ্ঞানবিজ্ঞানের বহুধাবিচিত্র শাখায় তাঁর নিরন্ত পরিক্রমণ ছিল শ্বাসপ্রশ্বাসের মতো অনিবার্য। বস্তুত প্রকাশিত ডজনখানেক গবেষণাপত্রে তারকনাথের পাণ্ডিত্য, চিন্তন ও মৌলিকতার স্বাক্ষর সুস্পষ্ট।

প্রেসিডেন্সি কলেজে তারকনাথের যোগদান (১৯৩৪) করার পূর্বে প্যার্সিভ্যাল্‌ সাহেব অবসরগ্রহণ করেছেন (১২ এপ্রিল ১৯১১) এবং কবি-অধ্যাপক মনোমোহন ঘোষের বিয়োগান্ত মৃত্যু (৪ জানুয়ারি ১৯২৪) সঙ্ঘটিত হলেও জনশ্রুতির অন্যতম নায়ক প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ তখন অপ্রতিহত, অনতিপরে যাঁকে ছায়ার মতো ঘিরে থাকতেন সেই সহৃদয় হ্যাম্‌ফ্রি হাউস্‌ আর যাঁর পরম সাধ ছিল অধ্যাপক ঘোষকে একবার অক্সফোর্ড-কেম্‌ব্রিজের স্বনামখ্যাত অধ্যাপকদের সামনে উপস্থিত করার যাতে বাঙলাদেশ নাম্নীয় ভারতের এক প্রদেশে ইংরেজি চর্চার প্রকৃত মহিমা অনুধাবন করতে পারেন বিদেশী বিদ্বজ্জন। এমনতর কোনও

বিত্তাবান্ অধ্যাপক সেনকে ইংলণ্ডে নিয়ে গিয়ে ভারতবর্ষে ইংরেজি পঠনপাঠনের শেষ মাহাত্ম্য প্রচারে উৎসুক হয়েছিলেন কিনা জানি না; তবে অধ্যাপক তারকনাথ যে নিঃসন্দেহে পৃথিবীর যে-কোনও সম্ভ্রান্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি সাহিত্যের অত্যুজ্জ্বল অধ্যাপক হিসেবে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পারতেন একথা সর্বজনবিদিত।

ছাত্রজীবনেই তারকনাথ জ্ঞানচর্চায় তাঁর প্রবেশের যথার্থ নজির দেখিয়েছিলেন—'*Things Essential and Things Circumstancial*' (*The Presidency College Magazine. Vol. XVI, Nos. 1, 2 and 3.*) প্রবন্ধ প্রণয়নে এবং পরিণত বয়সে তাঁর বিশাল বিত্তাবত্তার বিদ্যুৎগতি বিস্তার দেখালেন *Shakespeare's Short Lines* (*Shakespeare Commemoration Volume. Calcutta 1966.*) রচনায়; বলা বাহুল্য একজন তারকনাথ ব্যতিরেকে অপর কোনও ভারতীয় পণ্ডিতের পক্ষে এমতো মহার্ঘ পরিকল্পনা ছিল বস্তুত অসাধ্য। আর তাঁর সুবিখ্যাত *Hamlet's Treatment of Ophelia in the Nunnery Scene* (*The Modern Language Review. Vol. XXXV, No. 2*) গবেষণাপত্রটির কথা বিদ্বৎসমাজের অজানা নয় যা *Readings on the Character of Hamlet.* (*London 1950.*) গ্রন্থে পুনর্মুদ্রিত হয়েছে। ইংরেজিচর্চার সঙ্গে সমানে তারকনাথ যত্নবান ছিলেন ইয়োরোপের প্রধান ভাষাগুলির পরিশীলনে,—লাটিন, গ্রীক, ফরাসী, ইতালীয়, গের্মনীয় প্রভৃতি ভাষা ও সাহিত্যে তাঁর প্রবেশ ছিল সুগভীর। সর্বোপরি শুধুমাত্র সাহিত্য ও দর্শনশাস্ত্রের অনুশীলন নয়; চিত্রকলা ভাস্কর্য, স্থাপত্য, পুরাতত্ত্ব, ইতিহাস এমন কি বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় তাঁর অবাধ পরিক্রমণ ছিল আমরণ।

মনীষা ও মনস্বিতার সার্থক সমন্বয়ের অধিকারী হয়ে স্বল্প মানুষই তারকনাথের মতো জীবন সম্পন্ন করতে পেরেছেন; এবং সেই দুর্লভ বস্তুসমষ্টি বস্তুতঃ মূল্যবান্ বিবেচিত হবে তাঁদের কাছে যাঁরা অন্তরঙ্গভাবে তাঁকে জানতেন। তারকনাথের উৎসর্গিত জীবন তাঁর অসংখ্য গুণমুগ্ধদের প্রাণিত করবে অনেক অনেককাল; তাঁদের অক্ষয় স্মৃতির পারম্পর্যে এই প্রতিভাধর অধ্যাপক সজীব হয়ে থাকবেন ভাবীকালের বিদ্যোৎসাহী মানুষের অমর আত্মায়।

সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়

নিয়মাবলী

পরিচয়ে লেখা ফুলস্কেপ কাগজের একদিকে লিখে
উপযুক্ত ডাকটিকিটসহ পরিচয় সম্পাদকের নামে পাঠাতে হবে।
অমনোনীত কবিতা ফেরৎ পাঠানো হয় না।

যে-কোনো মাস থেকেই গ্রাহক হওয়া যায়।
বাৎসরিক গ্রাহক চাঁদা দশ টাকা
ষান্মাসিক সাড়ে-পাঁচ টাকা।

ম্যানেজার

পরিচয়

৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড,

কলকাতা-৭

পশ্চিম পাকিস্তানের ফ্যাসিস্ত সামরিক-চক্রের
নিষ্ঠুর বর্বরতায়
স্বাধীন বাঙলা দেশের মুক্তিযুদ্ধে আত্মদানকারী
অগণিত শহীদদের উদ্দেশে
পরিচয় জানায় শ্রদ্ধাঞ্জলি
জয় বাঙলা

পরিচয়
বর্ষ ৪০ । সংখ্যা ৭-৮
মাঘ-ফাল্গুন । ১৩৭৭
ফেব্রুয়ারি-মার্চ । ১৯৭১

সূচিপত্র

পরিচয় প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে অচিন্ত্য সেনগুপ্ত কর্তৃক নাথ ব্রাদার্স প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ৬ চালতাবাগান লেন, কলিকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত ও ৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড কলিকাতা-৭ থেকে প্রকাশিত ।

বাঁকুড়া জেলার পুরাকীর্তি

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পূর্ত বিভাগ এ-রাজ্যের প্রতিটি জেলার যাবতীয় পুরাকীর্তি বিষয়ে বাঙলা ভাষায় যে সুলভ গ্রন্থাদি (Archaeological Encyclopaedia of West Bengal) প্রকাশের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, 'বাঁকুড়া জেলার পুরাকীর্তি' সে-প্রকল্পের প্রথম পুস্তক। প্রখ্যাত বিশেষজ্ঞদের নিয়ে গঠিত পূর্ত বিভাগের প্রকাশন কমিটির সভাপতি ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার এ-বই-এর ভূমিকায় লিখেছেন—"এ-পুস্তকের লেখক শ্রীঅমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় পশ্চিমবঙ্গের মন্দিরাদি বিষয়ে বাঙলা ভাষায় রচিত প্রথম, তথ্যবহুল, প্রামাণিক গ্রন্থ 'বাঁকুড়ার মন্দির'-এর প্রণেতা হিসাবেই সমধিক খ্যাত।... এ-গ্রন্থ পাঠে বাঁকুড়া জেলার প্রাচীন কীর্তি ও কাহিনী সম্বন্ধে সকলের মনেই একটি স্পষ্ট ধারণা জন্মিবে।...বহুদিন পর্যন্ত ভবিষ্যৎ গবেষকদের পথনির্দেশ করিতে পারিবে তাহাতে আমার কোনো সন্দেহ নাই।"

পুরু, দীর্ঘস্থায়ী 'ক্রীমওভ' কাগজে ছাপানো পাঠ্যাংশ (২৪৬ পৃষ্ঠা), ভালো আর্ট কাগজে মুদ্রিত ৬৫টি উৎকৃষ্ট ফোটোগ্রাফ (৪৮ পৃষ্ঠা), দু'রঙের প্রচ্ছদচিত্র-শোভিত শক্ত বোর্ডের সুদৃশ্য 'লিম্প'-বাঁধাই এই অসামান্য বইটির মূল্য মাত্র ৩·৭৫ টাকা। পুস্তক-বিক্রেতারা পশ্চিমবঙ্গ সরকারী প্রেসের (৩৮ গোপালনগর রোড, কলকাতা-২৭) সুপারিটেনডেণ্টের সঙ্গে যোগাযোগ করলে নিউ সেক্রেটারিয়েট ভবনের বিক্রয়কেন্দ্র থেকে ২০% কমিশনে দ্রুত সরবরাহ পাবেন।
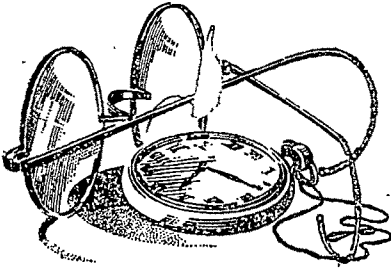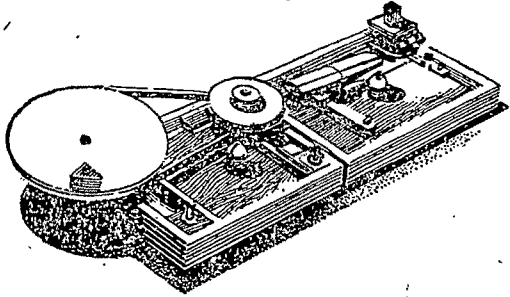
এল.আই.সি. আপনার প্রিমিয়ামের টাকা সারা দেশে নানারকম উদ্যোগে ও আর্থিক ক্রিয়াকলাপে বিনিয়োগ করে। আবাদ হল এমনতর একটি।

এল.আই.সি. আবাদী বাগানের ক্ষেত্রে ২.৮২ কোটি-টাকা বিনিয়োগ করেছে। আপনার দেওয়া প্রিমিয়ামের টাকা এল.আই.সি. বিনিয়োগ করে দেশের উন্নয়নমূলক প্রকল্পে, যেমন, বৃহৎ ও ক্ষুদ্র শিল্পোদ্যোগ, নিত্য ব্যবহার্য্য পণ্য, ব্যাঙ্ক, পরিবহন। ৩১শে মার্চ ১৯৭০ অবধি এল. আই. সি.-র মোট বিনিয়োগের পরিমাণ ১৫২৮.৬৬ কোটি টাকারও বেশি। এই টাকার অঙ্ক বছরের পর বছর বেড়ে চলেছে। এল. আই. সি. শুধু যে নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে, তা নয়। আপনার এবং দেশের কল্যাণে এর রয়েছে অনন্য ভূমিকা। ভারতে এল.আই.সি. হ'ল বৃহত্তম একক বিনিয়োজক সংস্থা।

এক নজরে এল.আই.সি.-র কয়েকটি বিনিয়োগ :

	কোটি টাকা
গৃহনির্মাণ প্রকল্প	২৮৫.৬৭
বিদ্যুৎ	২১৫.৭৩
জল সরবরাহ ও জলনিষ্কাশন	২৮.৪৯
ইঞ্জিনিয়ারিং	৪৩.২৫
সূতীবস্ত্র ও পাট	৩০.৭৪
লৌহ ও ইস্পাত	১৭.৩৫

ASP/LIC/Z-70A BEN

এল.আই.সি.-প্রগতির পথে আপনার সাথী

পরিচয়
বর্ষ ৪০। সংখ্যা ৭
মাঘ। ১৩৭৭

আধুনিক নন্দনতত্ত্ব প্রসঙ্গে

বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য

সমাজতন্ত্রের সঙ্গে নন্দনতত্ত্বের প্রায় অহি নকুলের সম্পর্ক—এজাতীয় ধারণা অদ্যাবধি অনেকে পোষণ করেন। তাঁদের যুক্তিটা এইরকম, সমাজতন্ত্র যেহেতু বাস্তবজীবনের মঙ্গল ও কল্যাণের মধ্যেই অনেকাংশে সীমিত, যেহেতু তা সাধারণ মানুষের কেবলমাত্র দৈনন্দিন সুখ-দুঃখের অংশীদার অতএব সমাজতন্ত্রে সৃষ্ট সাহিত্যেও কেবলমাত্র এই রূঢ় বাস্তবেরই প্রতিফলন ঘটবে। এই ভ্রান্ত ধারণা দূরীকরণের যথাসাধ্য চেষ্টা দীর্ঘকাল ধরেই করা হয়েছে। এই প্রচেষ্টার আর একটি উল্লেখযোগ্য নিদর্শন আলোচ্য গ্রন্থখানি। ৩৫৮ পৃষ্ঠার এই সুদীর্ঘ গ্রন্থে তেরোটি প্রবন্ধের ছত্রেছত্রে সোভিয়েত লেখকদের সৌন্দর্যতত্ত্বের স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণের অনবদ্য প্রয়াস ধরা পড়বে। প্রায় প্রতিটি প্রবন্ধেই মার্কসীয় দৃষ্টিতে সৌন্দর্যতত্ত্বের মূল উৎসের সন্ধান করা হয়েছে, সমাজতন্ত্রে সৌন্দর্যতত্ত্বের উদ্ভব ও বিকাশ সম্ভব কিনা তা সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণের চেষ্টা করা হয়েছে এবং সর্বশেষে যে-সিদ্ধান্তে পৌঁছনো হয়েছে তাতে গোঁড়ামি এবং সঙ্কীর্ণতার কোনো চিহ্নই নেই। আধুনিক নন্দনতত্ত্বের এমন কোনো সমস্যা নেই যার প্রতি প্রবন্ধগুলির রচয়িতা সোভিয়েত বিশেষজ্ঞদের মোটামুটিভাবে দৃষ্টি পড়েনি। বিষয়বস্তু বিচারকালে তেরোটি প্রবন্ধকে এইভাবে ভাগ করা যায়, সোভিয়েত শিল্পসাহিত্যে নন্দনতত্ত্ব সম্পর্কিত মূলনীতি, শিল্পে আদর্শ ও নায়কবিচার, নন্দনতত্ত্বের অনুভূতির উৎসস্থল হিসেবে শ্রমের ভূমিকা, নন্দনতত্ত্বের সঙ্গে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের সম্পর্ক, বস্তুবাদের ঐতিহাসিক বিবর্তন, বস্তুবাদের লক্ষ্য ও তার সীমাবদ্ধতা, শিল্পের ঐতিহ্য ও

Problems of Modern Aesthetics, Collection of Articles, Progress Publishers, Mscoow.

পুনর্গঠন ইত্যাদি। আধুনিক শিল্প-সাহিত্য থেকে অজস্র উদাহরণ দিয়ে সোভিয়েত বিশেষজ্ঞের দল এই চিরায়ত অনুভূতিটির সংজ্ঞা ও স্বরূপ নির্ধারণের চেষ্টা করেছেন। এইজন্য তাঁরা নিজেদের দেশের বাইরেও পা বাড়াতে দ্বিধা বোধ করেননি। অ্যালবেয়ার কামু, বের্টোল্ট ব্রেখট, বেকেট, অয়নেস্কো, সার্ত্র প্রভৃতি হুবিতর্কিত ও বিখ্যাত লেখকদের নেওয়া হয়েছে। এছাড়া অন্তত দুটি প্রবন্ধ আছে যেখানে নন্দনতত্ত্বের অনুভূতি সম্পর্কে সোভিয়েত নন্দনতাত্ত্বিকদের ধারণা ও আলোচনা বিস্তৃতভাবে প্রকাশিত।

২

১৯০৫ সালে লেনিন 'পার্টিসংগঠন ও পার্টি সাহিত্য' নামক প্রবন্ধ লিখলেন। এই ছোট প্রবন্ধটিতেই সর্বপ্রথম শিল্প ও সাহিত্যের সঙ্গে পার্টির আদর্শ ও মতবাদের সম্পর্ক কি জাতীয় হবে সে সম্পর্কে বিস্তৃত নির্দেশ দেওয়া হলো। লেনিনের মূল বক্তব্য ছিল 'সাহিত্যকে প্রত্যক্ষভাবে সর্বহারার স্বার্থের সঙ্গে যুক্ত হতে হবে'।[১] অথচ কেবল যান্ত্রিক বা ছকবাঁধা পদ্ধতিতে এই যোগসাধন সম্ভব নয়। কাউট্স্কি যেমন anarchy in intellectual production-এর কথা বলেছিলেন, লেনিন কোনোদিন তাতে সম্মতি দেননি। একদিকে যান্ত্রিক তাত্ত্বিক প্রয়োগ ও অপরদিকে শিল্পীর তথাকথিত নির্ভেজাল স্বাধীনতা—লেনিন এই দুইয়েরই ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। তিনি শিল্পসাহিত্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে কোনো বিশেষ পদ্ধতি প্রয়োগ করতে চাননি। বরং তিনি বলেছিলেন যে "greater scope must undoubtedly be allowed for personal initiative, individual inclination, thought and fantasy, form and content"[২] অর্থাৎ শিল্প ও সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে ব্যক্তির ভূমিকা এবং গুরুত্ব লেনিন কখনও অস্বীকার করেননি। আবার সঠিকভাবে এর সঙ্গে সঙ্গে তিনি শিল্পী বা সাহিত্যিকদের স্বেচ্ছাচারকে গুরুত্ব দিতেন না, কারণ, তাতে নৈরাজ্য দেখা যায় এবং সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাবোধ ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

লেনিন প্রদর্শিত এই পথই বিপ্লবোত্তর সোভিয়েত ইউনিয়নে শিল্প ও সাহিত্য সৃষ্টির পথ। অ্যালেক্সি মেত্চেঙ্কো তাঁর ৩৫ পৃষ্ঠাব্যাপী প্রবন্ধে সোভিয়েত

১। 'Literature openly linked with the proletariat' লেনিনের সংগৃহীত রচনাবলী, দশম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪৮।

২। লেনিনের সংগৃহীত রচনাবলী, দশম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪৬

সাহিত্যের মূল নীতিগুলি আলোচনা প্রসঙ্গে লেনিনের মতবাদকেই আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেছেন। পাশ্চাত্য পাঠক ও সমালোচকেরা অনেক সময় সোভিয়েত রাশিয়ার মুষ্টিমেয় লেখকদের কোনো তথাকথিত 'ব্যতিক্রম'ধর্মী গ্রন্থ পড়লেই সেগুলির মধ্যে 'আধুনিকতা', লেখকের 'স্বাধীনতাস্পৃহা'—এই সমস্ত খুঁজে পান। তাঁদের বক্তব্য ; আধুনিক নন্দনতত্ত্বের সঙ্গে সোভিয়েত শিল্প-সাহিত্যের কোনো সম্পর্ক সাধারণভাবে নেই। কেবল দু-একজন বিদ্রোহী-লেখক প্রকৃত সৌন্দর্যতত্ত্বটি তাঁদের রচনায় প্রকাশ করার চেষ্টা করে চলেছেন।

এই ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। প্রচলিত বুর্জোয়া দৃষ্টিভঙ্গীতে আধুনিক সোভিয়েত শিল্পসাহিত্যে নন্দনতত্ত্বের উপস্থিতি অনুভব করা যাবে না। সোভিয়েত শিল্প-সাহিত্য মার্কসবাদসম্মত নন্দনতত্ত্বের ধারক ও বাহক, শিল্পসাহিত্য সর্বহারার স্বার্থের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। কোনো সাহিত্যস্রষ্টাই নিরপেক্ষ বা স্বাধীন নন, সমাজ ও সাধারণের প্রতি তাঁর একটা দায়িত্ব আছে। যে শিল্পী যত একাকী, তিনি ততটা বিচ্ছিন্ন। এই দৃষ্টিতে অবিচল থেকে সোভিয়েত শিল্পী তার শিল্পে সৌন্দর্য সৃষ্টি করেন। যে শিল্পীর সঙ্গে জনগণের কোনো যোগাযোগ নেই তাঁর ভবিষ্যৎ ভয়াবহ। লেনিনের ভাষায়, "the silence of the people is particularly terrifying since it threatens the writer with loss of identity. আর সেই সমস্ত শিল্পীরাই সাফল্যমণ্ডিত হবেন যাদের সঙ্গে জনসাধারণের যোগাযোগ আছে, জনগণের প্রতি যাদের বিশ্বাস আছে, "victory will belong only to those who have faith in the people, those who are immersed in the life-giving spring of popular creativity."[৩] মেত্‌চেঙ্কো উদাহরণ দিয়ে বলেছেন যে জারের আমলে রাশিয়ার মানুষ কেবল অশিক্ষার জন্য পুশকিন এবং তলস্তয়ের রচনার আস্বাদ থেকে বঞ্চিত হতো। আর বিপ্লবোত্তর রাশিয়ার পরিস্থিতি ভিন্ন। ক্লাসিক শিল্প ও সাহিত্য এখন জনগণের সম্পত্তি।

এই মতবাদ বিপ্লবোত্তর রাশিয়ার প্রথম পর্যায়েই ব্রুইসভ, ব্লক, মায়াকভস্কি, ইয়েসেনিন, গরোদেৎস্কি, সেলভিনস্কি, লাভরেনিওভ, ফেদিন প্রমুখ সাহিত্য-স্রষ্টাদের বুর্জোয়া নন্দনতত্ত্বের পথ থেকে সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার পথে নিয়ে এল। এদের মুখপাত্র হিসেবেই সেলভিন্‌স্কি একদা বলেছিলেন "এরা জনগণের কথা ভাবেন না, এবং নিজেদের কবিতায় নিজেদের কথা ছাড়া অন্য কারও কথা বলায় এরা উৎসাহী নন। শক্‌লোভ্‌স্কি ১৯১৯ সালে লিখেছিলেন "শিল্প জীবনকে

৩। লেনিনের সংগৃহীত রচনাবলী, ২৬তম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৯২

অস্বীকার করে, আর সহরের দুর্গে উড্ডীয়মান পতাকার রঙ এতে প্রতিফলিত হয় না।" আবার এই শক্‌লোভ্‌স্কিই পরে লিখেছিলেন যে "পতাকার রঙই কবিতার আসল কথা। কারণ এর মধ্যে হৃদয়ের রঙ মিশ্রিত আছে, আর এই হৃদয়ের সঙ্গেই শিল্প ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত।" এইসব স্বীকৃতিই প্রমাণ করে যে বিপ্লবোত্তর রাশিয়ার প্রথম স্তরে শিল্প-সাহিত্যের ক্ষেত্রে সাঙ্কেতিকতা, দুর্বোধ্যতার অস্তিত্ব ছিল এবং সেগুলিকে রাষ্ট্রীয় শক্তির দ্বারা দূর করা হয়নি। সেই সমস্ত শিল্পী সাহিত্যিকেরা নিজেরাই পাল্টে গেছেন।

তাসত্ত্বেও কোনো স্তরেই সোভিয়েত শিল্প-সাহিত্য নন্দনতত্ত্বের সঙ্গে সম্পর্কবিহীন ছিল না। যারা জনগণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে থেকে সাহিত্যসৃষ্টির পক্ষপাতী ছিলেন তাঁরাও 'অনুপ্রেরণা' বা 'হৃদয়'কে বিস্মৃত হননি। মায়াকভ্‌স্কির মতো কট্টর বাস্তববাদীও সর্বদাই হৃদয়ের কাছে আবেদন করতেন, গোর্কী 'আন্তরিকতা এবং অনুপ্রেরণা'কে সর্বাধিক গুরুত্ব দিতেন আর শলোকভ অনেক ক্ষেত্রেই লেখকের পার্টির প্রতি দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে হৃদয়ের প্রাধান্য স্বীকার করেছেন।

৩

সংস্কৃত অলঙ্কারিক থেকে শুরু করে অ্যারিস্টটল পর্যন্ত প্রায় সমস্ত নন্দনতাত্ত্বিকেরাই সাহিত্যে নায়ক-বিচার প্রসঙ্গে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করেছেন। তাঁদের বক্তব্যের মধ্যে ভিন্ন সুর থাকলেও মূল বক্তব্য সম্পর্কে সকলেই একমত। কাব্যে বা মহাকাব্যে নায়কের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তিনি সদ্বংশজাত, উদারপ্রাণ ও বীর হলেই ভালো হয়। ভারতীয় মহাকাব্যে তো দেবতা না হলে নায়ক বলে কাউকে স্বীকারই করা হতো না। অ্যানাতলি দ্রেমভ তাঁর—'শিল্পে আদর্শবাদ ও নায়কবিচার' নামক প্রবন্ধে সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার দৃষ্টিতে নায়ক-চরিত্রের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করেছেন। সমাজতান্ত্রিক সাহিত্যে নায়ক কোনো অতিমানব নয়, সে সাধারণ ঘরের মানুষ। কিন্তু শৌর্যে পরাক্রমে ও ত্যাগে সে সকলকে ছাড়িয়ে নায়ক পদবাচ্য হয়। লেনিন তাঁর একটি বিখ্যাত উক্তিতে বলেছিলেন, "Man needs an ideal, but a human ideal corresponding to nature and not a supernatural ideal."[৪] সোভিয়েত রাশিয়ায় তাই আজকের নায়ক হচ্ছেন যথার্থ

৪। লেনিনের সংগৃহীত রচনাবলী, ৩৮ তম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৭৫

সোভিয়েত শ্রমিক, কর্মী অথবা সৈনিকেরা। এই কারণেই ইস্পাতকর্মী মিখাইল প্রিভালভ, কৃষক মিখাইল ডোভ্ঝিক এবং সাধারণ নাগরিক য়ুরি গাগারিন আজ সোভিয়েত রাশিয়ায় মহানায়ক। অলঙ্কারশাস্ত্রের নায়কের সংজ্ঞা ও পরিচয়কে এ-ক্ষেত্রে তাঁরা অস্বীকারই করেছেন।

ভিক্টর রোমানেঙ্কো তাঁর 'প্রাকৃতিক সৌন্দর্য' বিষয়ক প্রবন্ধটি শুরু করেছেন চেকভের একটি উদ্ধৃতি দিয়ে—"The sense of beauty in man knows no bounds or limits." উদ্ধৃতিটি নানা কারণেই উল্লেখযোগ্য। এই উদ্ধৃতিটি ব্যবহার করে রোমানেঙ্কো সৌন্দর্য সম্পর্কে মার্কসবাদীদের দৃষ্টিভঙ্গী পরিস্ফুট করেছেন। সৌন্দর্যবোধ মানুষের অন্তরের একটি চিরন্তন অনুভূতি। একে কোনো তত্ত্ব বা নিয়মশৃঙ্খলার বাঁধনে বাঁধা যায় না। সুতরাং যাঁরা এতাবৎকাল বলে এসেছেন যে মার্কসবাদীরা তাদের শিল্প-সাহিত্য থেকে প্রকৃতি এবং সৌন্দর্যকে নির্বাসিত করতে চায় এ-প্রবন্ধটি তাঁদের পক্ষে শিক্ষাপ্রদ। রোমানেঙ্কো তাঁর প্রবন্ধের প্রথমেই স্বীকার করে নিয়েছেন যে প্রকৃতির সৌন্দর্য যে দীর্ঘকাল ধরে শিল্প-সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে অনুপ্রেরণা যুগিয়ে আসছে এ-ব্যাপারে সন্দেহ করবার কোনো কারণই নেই। কিন্তু মার্কসবাদীরা বস্তুতান্ত্রিক দৃষ্টিতে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করে। প্রকৃতি তাদের কাছে 'কেবল সৌন্দর্যের মন্দির নয়, এ-হচ্ছে মানবের কর্মক্ষেত্র'। আইনস্টাইন রুশবিজ্ঞানী পিয়োতর্ লেবেদফকে বিংশশতাব্দীর শ্রেষ্ঠতম কবি আখ্যা দিয়েছিলেন, কারণ তিনি সূর্যের রশ্মিকে আটকে ফেলে আলোর চাল নির্ধারণ করেছিলেন। এইভাবে যাঁরা প্রকৃতির কোনো-না-কোনো রহস্যের আবিষ্কার করেছেন তাঁরাই প্রকৃতির সৌন্দর্যের প্রকৃত উপাসক। অনেকে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে সমাজ ও বাস্তবজগৎ নিরপেক্ষ অতিপ্রিয় ও বিশুদ্ধ সৌন্দর্য বলে মনে করেন। কিন্তু মনে রাখতে হবে প্রকৃতি কোনো বিশেষ ধরনের 'সৌন্দর্য উৎপন্ন' করে না। মানুষ যে-দৃষ্টিতে তাকে দেখে প্রকৃতি সেইরূপেই উদ্ভাসিত হয়। তাই মানুষ এবং প্রকৃতি একাত্ম। এঙ্গেলস এই কারণেই বলেছিলেন, "man by his very flesh, blood and brain belongs to nature and is within her and it is in man alone that nature becomes aware of herself. Man commands nature, but how ? By accepting her own laws and correctly applying them." রোমানেঙ্কো বলছেন তুর্গেনিভ, তলস্তয় প্রিশাভিন এবং পাউস্তোভ্স্কির রচনায় অনেকটা প্রকৃতি সম্পর্কে এই জাতীয়

দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যায়।

গ্রন্থটির সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য রচনা হলো নিকোলাই সিলায়েভের 'নন্দনতত্ত্বের অনুভূতির উৎস হিসেবে শ্রমের ভূমিকা।' বিষয়বস্তুর অভিনবত্বে এবং বিশ্লেষণের নৈপুণ্যে এটি সত্যি একটি স্মরণীয় প্রবন্ধ। আধুনিক ও সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিতে বিচার করে তিনি 'শ্রম'কে মানুষের প্রায় সমস্ত সৌন্দর্যানুভূতির স্রষ্টা বলে ঘোষণা করেছেন। এর আগে পর্যন্ত, এমনকি সোভিয়েত রাশিয়াতেও প্রকৃতি এবং মানবজীবনের মধ্যেই সৌন্দর্যের অস্তিত্ব স্বীকৃত হতো। কিন্তু বর্তমানে দৈনন্দিন জীবনের কার্যকলাপ, শ্রম এবং উৎপাদনকেও নন্দনতত্ত্ব সম্পর্কিত আলোচনায় গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। 'শ্রমের নান্দনিক আবেদন' অথবা 'শ্রমের সৌন্দর্য' এ-জাতীয় কথা আমরা প্রায়ই বলে থাকি। কিন্তু এগুলির দ্বারা যথার্থই কি বোঝায়?

ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় উৎপাদনের পরিবেশ এমনই যে যেখানে কাজের আনন্দ বলতে কিছুই থাকে না। শ্রমিক সেখানে শোষণের জাঁতাকলে বন্দী। তার নিজস্বতা বা উৎপাদনে দক্ষতার কোনো মূল্যই সেখানে স্বীকৃত নয়। মার্কস্ তাঁর ক্যাপিট্যাল গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে এক জায়গায় বলেছিলেন যে কাপড়ের কলের শ্রমিকদের এমনই এক অসহনীয় পরিবেশে কাজ করতে হয় যাতে তাদের সৌন্দর্যের অনুভূতি বর্ধিত হওয়া দূরে থাকুক তাঁদের সমস্ত অনুভূতিই সেখানে শোষিত হচ্ছে। অথচ, সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত হবার পর অবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটে। তখন শ্রমের মাধ্যমে শ্রমিকের মর্যাদা বাড়ে, সৌন্দর্যচেতনা বিকশিত হয়। অর্থাৎ শ্রমে আকর্ষণীয়তার দ্বারা 'ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব অনুভব' সম্ভবপর হয়। তাই শ্রমিক যখন কাপড়ের উপর সুন্দর একটি নক্সার সৃষ্টি করে, রাজমিস্ত্রী যখন একটি চমৎকার বাড়ি তৈরি করে, দাবাখেলোয়াড় যখন অপূর্ব কৌশলী একটি চাল দিয়ে প্রতিপক্ষকে মাত করে দেয়, ফুটবলের সেণ্টার ফরওয়ার্ড যখন নয়নভিরাম গোল করে তখন মনে যে সৌন্দর্যের অনুভূতি জাগে তা প্রকৃতপক্ষে 'শ্রমের সৌন্দর্য'। যে-শ্রমে আনন্দ নেই তা দাসত্ব মাত্র। অতএব, আধুনিক নন্দনতত্ত্ব সম্পর্কিত আলোচনায় 'শ্রমের নান্দনিক আবেদন'কেও যথার্থ স্বীকৃতি দেওয়া একান্ত কর্তব্য। কাজের আনন্দ এমন একটা জিনিষ যা মন ও দেহকে জাগিয়ে তোলে। মার্কস-এর ভাষায়, "as something which gives play to bodily and mental powers" (ক্যাপিটাল, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৭৮)।

বস্তুবাদ সম্পর্কিত বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী নন্দনতত্ত্বের ক্ষেত্রে সমাজতন্ত্রের আ একটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান। নিকোলাই লেজিরভ তাঁর 'বস্তুবাদের উদ্দেশ্য ও সীম. বদ্ধতা' প্রবন্ধে এই অবদানের গুরুত্ব চমৎকারভাবে আলোচনা করেছেন সন্দেহ নেই বস্তুবাদ ব্যাপারটি কিছুটা জটিলও বটে। বস্তুবাদ একটি শৈল্পিক আঙ্গিক হিসেবে স্বীকৃত হবার বহু আগেই অ্যারিস্টটল শিল্প-সাহিত্যে বস্তুবাদের প্রয়োগপদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে একজন শিল্পী "must represent things…either as they were or are, or as they are said or thought to be or to have been, or as they ought to be" (on the Art of Poetry, পৃষ্ঠা ৮৬)। কিন্তু, সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা ঠিক এই জিনিষ নয়। মার্গারেট হার্কনেসকে লেখা চিঠিতে এঙ্গেলস বাস্তবতার সংজ্ঞা নির্দেশ করতে গিয়ে বলেছিলেন যে বাস্তবতা হচ্ছে 'বিশেষ পরিবেশে বিশেষ চরিত্রের যথাযথ রূপায়ন'। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে সমাজ-তান্ত্রিক বস্তুবাদের অন্যতম প্রবর্তক নিজে কখনও বস্তুজগতের নিখুঁত প্রতি-ফলনের তত্ত্বে বিশ্বাসী ছিলেন না। জীবনকে ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃতভাবে বিকৃত করে আঁকলে বস্তুবাদী সাহিত্য হয় না। বলজাক তাঁর বিখ্যাত গল্প-গুলিতে সমকালীন সমাজের দোষ ও গুণ যথাযথভাবে চিত্রিত করেছেন তাই তাঁর রচনা বাস্তববাদী সাহিত্য, কিন্তু অ্যালবেয়ার কামুর 'দি স্ট্রেঞ্জার' গ্রন্থে মানবচরিত্রকে বিকৃত করে আঁকা হয়েছে তাই সমাজতান্ত্রিক বস্তুবাদের বিচারে তা ব্যর্থ রচনা। রাশিয়ান বস্তুবাদের অন্যতম তাত্ত্বিক ভি. বেলিনস্কি তাই প্রশ্ন তুলেছিলেন, 'আজকের দিনে যথার্থ শিল্প কি?' তিনি নিজেই এই প্রশ্নের জবাব দিয়েছিলেন, 'এ-হচ্ছে সমাজের বিচার ও বিশ্লেষণ, যথাক্রমে সমালোচনা' অ্যালেকসি তলস্তয়ের মতে বাস্তবতা হলো একটি 'সামাজিক বিষয়বস্তু' আর ব্রেখট-এর মতে শৈল্পিক পদ্ধতিতে জীবনের সত্য প্রতিফলনই হলো বাস্তবতা। অতএব, মার্কসবাদীরা বস্তুবাদকে কখনই জীবন ও সমাজ-বিচ্ছিন্ন যান্ত্রিক তত্ত্ব হিসেবে দেখেন না। বরং তাঁরা স্বীকার করেন যে বস্তুবাদের কোনো ধরাবাঁধা প্রয়োগপদ্ধতি নেই। শিল্পী ও সাহিত্যিকদের প্রতিভার, ক্ষমতার ও বৈচিত্র্যের উপরই তাদের রচনার উৎকর্ষতা নির্ভরশীল। গোর্কীর 'মা' ও ব্রেখ্ট-এর 'মা' দুটি গ্রন্থই প্রমাণ করে যে সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা হলো জীবন সম্পর্কে লেখকদের নিজস্ব ও নির্দিষ্ট ধারণা, আর এই দু-খানি গ্রন্থের দ্বারা আরও প্রমাণিত হলো যে মহৎ শিল্পীরা একই বিষয়বস্তু অবলম্বনে কত বিচিত্র অথচ জীবনধর্মী শিল্প সৃষ্টি করতে পারেন।

৫৬১

ডাক্তার তারকেশ্বর এবং মানুষের ব্রেন

অজিত মুখোপাধ্যায়

অন্ধকার হাঁটু গেড়ে বসেছে গ্রামটার বুকে। শ্বাসরোধ করে দিচ্ছে। কোথায় একটা কালপেঁচা ককিয়ে উঠছে মাঝে মাঝে…ক্রমাগত ঝিঁঝিঁর অসহ্য আর্তস্বর। বাইরে কে ডাকছে। তন্দ্রাচ্ছন্ন চোখে মশারির ভিতর থেকে হাত বাড়িয়ে লণ্ঠনের পলতে উস্কে দিল ডাক্তার তারকেশ্বর। বিছানায় উঠে বসে আগন্তুকের কণ্ঠস্বর চেনার চেষ্টা করল। এবং ডানদিকে ঝুঁকে দেখল একটি অপরিচিত ছায়ামূর্তি, পরণে হাফ-শার্ট। এ-পোশাক গ্রামে বিরল।

পূর্ণাকে ডাকল চাপা কণ্ঠে। পূর্ণা হঠাৎ উঠে বসে তারকের গলা জড়িয়ে ধরল। আতঙ্কে গোঙাতে লাগল, কে…কে…

বিরক্তি মিশ্রিত স্বরে তারক অস্ফুট উচ্চারণ করল, আঃ। কল এসেছে।

কল।

হ্যাঁ…

কোত্থেকে…

বিছানা ছেড়ে নামতে নামতে ডাক্তার ঈষৎ উচ্চকণ্ঠে প্রশ্ন করল, কোত্থেকে আসছেন ?

দরজা খুলুন বলছি…তাড়াতাড়ি খুলুন…

ডাক্তারেরা রাত-বিরাত নেই, ডাকের বাছ-বিচার নেই। কিন্তু যা দিনকাল ডাক না চিনে হুট করে মাঝ-রাত্তিরে দরজা খোলাও যায় না।

পূর্ণা চাপা স্বরে বলল, নাম-ধাম বলতে চায় না কেন !

নাই বলুক। আমার কাছে সব রোগীই সমান।

যদি আদৌ রোগী না হয় ?

আলনা থেকে ধুতি ও হাফ-শার্ট টেনে নিয়ে জানলার কাছে এসে মুখ বাড়িয়ে তারক প্রশ্ন করল, কাদের বাড়ি ভাই ?

বাবুদের বাড়ি।

রায়চৌধুরীদের বাড়ি ?

হ্যাঁ...

গ্রামের শেষ অংশে রায়চৌধুরীদের বিশাল বাড়ি। আসলে ওটা অন্য গ্রাম...দুটি গ্রাম ক্রমশ বাড়তে বাড়তে পরস্পরের সীমা স্পর্শ করেছে।

পাশের ঘর থেকে সাইকেল বের করতে গেল তারক। পূর্ণা নিঃশব্দে তাকে অনুসরণ করল এবং তারকের কাঁধে হাত রেখে বলল, কাউকে সঙ্গে নিয়ে যাও।

কয়েকদিন আগে পাশের বাড়িতে ডাকাত পড়েছিল। এবং গ্রামে 'ছোট' লোকদের সঙ্গে রায়চৌধুরীর সংঘর্ষটা ক্রমশ তীব্র রূপ ধারণ করছিল আর রায়চৌধুরী নিশ্চয় ডাক্তারের সম্বন্ধে খবর রাখেন। ডাকাতের চিন্তা করে তারক বললে, ভয় করছে? যত শীগগীর পারি চলে আসব।

আমার জন্যে বলছি না ... সে আমি ঠিক থাকতে পারব। কী আছে আমাদের! বলছিলাম, ওদের বাড়ি যাবে এত রাত্রে! সঙ্গে কাউকে নিয়ে যাও।

হেসে উঠল তারক, না না ওরা আমার কিছু করবে না।

কেন জানি আমার মনে বড় অশুভ চিন্তা জাগছে!...বেশ কাতরভাবে বলল পূর্ণা।

জাগুক...ডাক্তারের কাছে সবাই সমান...সকলের সেবা করতে হবে নিরপেক্ষভাবে।

যা ভাল বোঝ কর।

পূর্ণার মুখ বিষণ্ণ হয়ে গেল। সে সিগারেটের প্যাকেট দেশলাই রুমাল ইত্যাদি এগিয়ে দিল। তারক হাতব্যাগটা সাইকেলের হ্যাণ্ডেলে নিয়ে প্রস্তুত। উত্তর-দিগন্ত থেকে মুহুর্মুহু বোমা বিস্ফোরণের শব্দ ভেসে এল পরপর পাঁচবার, কোনো বাড়িতে নিশ্চয় ডাকাতি হচ্ছে।

বহির্বারান্দায় আগন্তুক নালঠোকা জুতো পায়ে সন্ত্রস্তভাবে এদিকে-ওদিকে ছোটাছুটি করতে করতে প্রশ্ন করল...কোন দিকে...কোন দিকে বলতে পারেন!

ততক্ষণে কপাট খুলে তারক সাইকেলের একটি চাকা বের করেছে। বললে, বাবুদের বাড়ির দিকে নয়...বাবুদের বাড়ি তো দক্ষিণে...

আগন্তুক দ্রুত কণ্ঠে বললে, সাইকেল রাখুন, সাইকেল রাখুন! গাড়ি আছে। ছুটে গেল গাড়ির দিকে।

এতক্ষণ কেউ লক্ষ্য করেনি। বাড়ির সামনে কলাগাছের ঝোপের আড়ালে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছে রায়চৌধুরীদের জিপগাড়ি।

কোনো ভয় নেই, দরজায় খিল দিয়ে ঘুমোও।

পূর্ণার গালে সাদরে হাত বুলিয়ে দিল তারক।

সারাদিন আজ আকাশটা শ্বাপদের মতো মেঘের থাবা মেলে ধরেছিল। আড়ষ্টতায় হাঁসফাঁস করছিল মানুষ। গ্রামের ভিতরে বাঁশবন আমবাগান এবং নানান বুনো ঝোপ-ঝাড়ে অন্ধকার জটিলাকার ধারণ করেছিল···আকাশে ক্বচিৎ কয়েকটি তারা ফুটে উঠেই নিভে যাচ্ছিল দলভ্রষ্ট জোনাকির মতো। গাড়ির শব্দ পেয়েই চুপ করে যাচ্ছিল গর্জনরত ভেকের দল, এবং গাড়িটা তাদের আশঙ্কার পরিধি থেকে দূরে চলে যেতেই পুনরায় তারা অপেক্ষাকৃত উচ্চগ্রামে গর্জন করে উঠছিল।

হাটতলার মাঠে থামল জিপগাড়ি। তারপর পোড়ো রাসমঞ্চ। তারপর উঁচু প্রাচীর ঘেরা বাড়ি। বাড়িতে কত বড় বড় ঘর, বন্ধ এবং অন্ধকার। কোনো কোনো ঘরে মানুষ বাস করে···নিচ-তলায় দুটি ঘরে বাতি জ্বলছে।

রায়চৌধুরীদের বাড়ির ভিতরে কোনোদিন পদার্পণ করেনি তারক। আজ এই প্রথম···ওরা রোজই কলকাতা যাতায়াত করে···কলকাতা এখান থেকে মাইল চল্লিশ দূর···গ্রামের ডাক্তার ডাকার প্রয়োজন পড়ে না, রোগীকে গাড়ি চাপিয়ে কলকাতা নিয়ে চলে যায়। ওদের বাড়ি তারক বরাবরই দেখেছে দূর থেকে। পনের বিঘে জমির ওপর বিরাট বাড়ি···প্রায় তিনশো মেম্বার···এখনো একান্নবর্তী, সাত-আটশো বিঘে জমি আছে···দুটো কলের লাঙল ছাড়াও কুড়িটা গরুর লাঙল আছে। চাষ আছে বাড়িতে। এই পরিবার থেকে দুজন আই-এ-এস পাঁচজন ব্যারিস্টার বেরিয়েছে। পাঁচ মাইল দূর থেকে দেখতে পাওয়া যায় গেরি-মাটি রঙের সুউচ্চ বাড়িটা।

প্রাচীন আমলের বাড়িটা আগাপাশতলা সংস্কার করা হয়েছে। রায়চৌধুরীরা নিজেদের ক্ষমতায় দু-মাইল দূরে ডি-ভি-সির লাইন থেকে টেনে এনেছেন বিদ্যুত।

গাড়ির শব্দ শুনে মোহিনীমোহন তিনতলার একবুক উঁচু রেলিঙ দেওয়া বারান্দায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিলেন। মুখে উদ্বেগের স্পষ্ট ছাপ। প্রায় চল্লিশ বছর বয়স মোহিনীমোহনের কিন্তু যুবকের মতো দৃপ্ত ও সপ্রতিভ। কেবল দেহের মধ্যভাগ একটু স্ফীত। ঠোঁট দুটি ফোলা ফোলা এবং চোখ দুটি

গোলাকার। কপাল ও টাক মিশে গিয়েছে একসঙ্গে। গায়ের রঙ বেশ ফর্সা। সদ্য পাটভাঙা শান্তিপুরি ধুতি ও গায়ে সিল্কের গেঞ্জি, গলায় ঝুলছে স্বর্ণখচিত কবচ, কাঁধে একটি ধবধবে তোয়ালে। মাঝে মাঝে তোয়ালে দিয়ে বর্তুল স্কন্ধ ও মুখ মুছছেন।

আসুন, আপনি যে গ্রামে আছেন ভুলেই গেছলাম। আমি তো ওয়াইফকে বলছিলাম, চল, এখুনি কলকাতা নিয়ে চলে যাই, ওখানে একবার পৌঁছে গেলে—

গ্রামাঞ্চলে ডাক্তারের অস্তিত্ব ভুলে যেতে পারে এমন লোক অদৃষ্টপূর্ব। স্বভাবতই তারক আকস্মিক অপমানে বিদ্ধ হলো। হাতুড়ে ডাক্তার হলে হয় তো তারক রাগ করত না···কিন্তু সে এম. বি. বি. এস. পাশ করা রীতিমতো ডাক্তার।

রোগীর ঘরে পা দিয়ে তারক বললে, এসে যখন পড়েছি, তখন একবার দেখে নিই, কলকাতা নিয়ে যাওয়া উচিত কিনা ···

না না ··আপনি দেখুন···সবিনয়ে বললেন মোহিনীমোহন।

মৃতপ্রায় একটি সুদর্শন কিশোরের মাথা কোলে নিয়ে মেহগিনি পালঙ্কের উপর বসে আছেন সুন্দরী এক ভদ্রমহিলা। শিয়রের দিকে টিপয়ের উপর স্থাপিত টেবিল-ফ্যানটি ঘূর্ণায়মান। একজন কর্মচারী কিশোরটির কালো কুচকচে এবং কোঁকড়ানো চুলের ভিতর জল ঢেলে চলেছে·· পাশে পড়ে আছে একটি আইসব্যাগ। মোহিনীমোহন বললেন, ফ্রিজটা খারাপ করে রেখেছে···ভূতের রাজত্ব চলছে আজকাল···সকলের সব কিছুতে হাত লাগানো চাই তো···

ঘরে চার-পাঁচজন কর্মচারী···ওদের লক্ষ্য করে বললেন মোহিনীমোহন সকলের মুখে বিরস কাঠিন্য জেগে উঠল।

তারক রোগী পরীক্ষা করতে করতে হেসে বলল, মানুষের কৌতুহল বাড়ছে ···ভালোই তো···Everyone should know the truth and carry on accordingly.

তারকের ঠোঁটে হাসিটা লেগে রইল।

হাতব্যাগ থেকে একটা ছোট প্যাড বের করে তাতে খসখস করে একটা ইঞ্জেকশনের নাম লিখে দিয়ে বললে, এটা এখুনি চাই···আমার কাছে এটা নেই। জামালপুর থেকে এক্ষুনি নিয়ে আসুক। কলকাতা না গিয়ে ভালোই করেছেন। কলকাতা নিয়ে যাবার আগেই এই রোগী মারা যেত।

মোহিনীমোহনের স্ত্রী ধরা গলায় প্রশ্ন করলেন, কী অসুখ।

ম্যানেঞ্জাইটিস ম্যালেরিয়া। শহরের লোক জানে, বাঙলাদেশ থেকে ম্যালেরিয়া মুছে দিতে পেরেছে! শুধু ম্যালেরিয়া কেন, মানুষের যে-কোনো বিপদ একেবারে মুছে দেওয়া খুবই কঠিন। আবার হাসল তারক। ভদ্রমহিলা কাঁদতে লাগলেন।—না না, কান্নার কিছু নেই। আপনি শুধু শুধু এত ভয় পাচ্ছেন। মোহিনীমোহন তারককে পাশের ঘরে নিয়ে এলেন।

চারটি বড় বড় আলমারী মোটামোটা বইয়ে ঠাসা। দুটি টেবিল···পাশে খান পাঁচেক কাঠের চেয়ার। ঘরের মাঝখানে আধুনিক কায়দায় বসার সরঞ্জাম ···সোফা সেট সেণ্টার টেবিল ইত্যাদি। এ-বাড়িতে মা লক্ষ্মী ও সরস্বতীর যুগ্ম পীঠস্থান।

বসুন·· মোহিনীমোহন সৌজন্য প্রদর্শন করলেন।···পূর্ণা তো এখানেই আছে?

হ্যাঁ···সোফায় বসতে বসতে বললে তারক।

এখানেই কি বরাবর বাস করবেন?

ভাবছি তো···কিন্তু শেষ পর্যন্ত কি হয় জানি না···

হ্যাঁ···এখানে বরাবর বাস করা অসম্ভব। মানুষ বড় হিংসুটে হয়ে গেছে।

কোথায় আর হিংসুটে মানুষ নেই! এখানে লোকের নিজেদেরই বাঁচার সামর্থ্য নেই, ডাক্তারকে বাঁচাবে কেমন করে। আর যাদের সামর্থ্য আছে, তারা বলে, বাবা তুমি আমাদের ঘরের লোক, তোমাকে আর কী ফি দেব। তারক জোরে হেসে উঠল।

মোহিনীমোহন অন্যমনস্কভাবে বললেন, পূর্ণা আমাদের বড় প্রিয়পাত্রী ছিল।

শুনেছি।

ও আজকাল আর বেড়াতে আসে না কেন?

যা ঝামেলা...

ছেলেটা বাঁচবে?

নিশ্চয়। ওটি কি আপনার ছেলে!

একমাত্র ছেলে।

পাশের ঘর থেকে ছেলেটির আর্তনাদ ভেসে এল। মোহিনীমোহন উৎকণ্ঠা নিয়ে দ্রুত পায়ে ছুটে গেলেন এবং ফিরে এলেন কয়েক মিনিট পরে। চার-দেয়ালে আঁটা চারটি নিয়ন বাতি। জ্বলছে একটি মাত্র। তারক ছাইদানিটা

কাছে টেনে এনে সিগারেট ধরাতে উদ্যত হতেই মোহিনীমোহন বলে উঠলেন, উঁহুঁ হুঁ। আছে···

দামী সিগারেটের টিন এগিয়ে দিলেন।

ছেলেটা বেঘোরে ধুঁকছে...

কোনো ভয় নেই···জামালপুরে ইঞ্জেকশন পেয়ে যাবে···কোনো ভয় নেই। ঠিক এ-রকম একটা কেস ইঞ্জেকশনের অভাবে আমি বাঁচাতে পারিনি। আপনার গাড়ি আছে···আনতে চলে গেল। গত বছর, সরকারদের নন্দবাবু ম্যানেঞ্জাইটিসে আক্রান্ত হয়েছিলেন। ঠিক এমনি সময়ে আমাকে ডেকে নিয়ে গেল···রাত দেড়টার সময়···ইঞ্জেকশন আনতে লোক পাঠালে ওপারে। ভরা নদী···নৌকো ছিল আবার ওপারে··এপার থেকে হেঁকে ওপারে বলাইকে ডেকে তুলতেই চলে গেল অনেক সময়···ভেবে দেখুন, আধ মাইল চওড়া নদী···অবশ্য নদীর বাঁধের গায়েই বলাইয়ের বাড়ি। ইঞ্জেকশন নিয়ে এসে পৌছানোর আগেই মারা গেলেন নন্দবাবু···উঃ বিধবা স্ত্রীটির সে কী আকুল কান্না। মারা যাবার দেড়ঘণ্টা পর পৌছল ইঞ্জেকশন।

হঠাৎ তারকের চোখে পড়ল ঘরের কোণে একটি টেবিলের পরে পড়ে আছে দো-নলা রাইফেল।—ওটা কি টোটা ভরা?

হ্যাঁ···চিন্তিতভাবে বললেন মোহিনীমোহন।

বোমার শব্দে বোধহয় রায়চৌধুরী বাড়ির সব রাইফেল এবং বন্দুকগুলিতে টোটা ভরা হয়ে গেছে ···

কিছুদিন থেকেই আপনার কথা ভাবছিলাম।

বিস্ময়োত্থিত কণ্ঠে তারক বলে উঠল, আমার কথা!

বেশ হালকা স্বরে মোহিনীমোহন বললেন, 'ওদের' সঙ্গে নিজেকে জড়াচ্ছেন কেন?

'ওদের' কথাটার গূঢ় অর্থ আছে। অর্থটা বুঝেছে, স্বীকার করবে কিনা তারক ভাবল কয়েক মুহূর্ত। ওরা মানে যারা বর্তমানের প্রতি বীতশ্রদ্ধ, এই বর্তমানের বুক থেকে সমস্তরকম অবিচার ও অন্যায় যথাসম্ভব মুছে দিতে চাইছে, যারা চাইছে নতুন ধরনের জীবনের পুনর্বিন্যাস। তারক 'ওদের' প্রতি আকর্ষণ বোধ করে···কারণ তার গবেষণার বিষয়বস্তুও 'ওদের' চিন্তাধারার সদৃশ ও সমতুল্য। মেডিকেল জার্নালে মানুষের ব্রেন সম্পর্কিত তারক যে আলোচনা করছে, তার প্রতিপাদ্য বিষয়, ব্রেনের এবং মনুষ্যজাতির ক্রমবিকাশ। বিকাশ

ক্রিয়াটাই গতিশীল। বর্তমান থেকে ক্রমমুক্তির পথও বলা যায় বিকাশের ধারাকে। তারকের চিন্তার সঙ্গে ওদের কাজ ও চিন্তায় দৃষ্টিভঙ্গীর বড় মিল। কেন তাদের সমর্থন করবে না তারক। কেন সে ও-নিয়ে প্রকাশ্যে আলোচনাই বা করবে না।

আমি তো নিজেকে জড়াইনি। আমি কোনো দলে নেই।

একটা নতুন সিগারেট ধরাল তারক।

আপনার নাম কেন শুনতে পাচ্ছি! এমনও শুনছি, ছোটলোকদের আপনি নাকি উস্কাচ্ছেন!

আমি? হো হো করে তারক হেসে উঠল…উস্কাচ্ছি! মিস্টার রায়চৌধুরী, চিকিৎসা চালিয়ে নিজের খাওয়া-দাওয়া করার সময়ই জোটে না…লোকে পয়সা দিতে পারুক আর নাই পারুক·· তারা আমাকে ডাকতে ইতস্তত করে না, কারণ আমার বলা আছে, যখনই জানবে অসুখ, ডাকবে তখুনি…বাড়াবাড়ি অবস্থায় ডাক, রোগী মেরে, তার দোষ আমার ঘাড়ে চাপাতে পারবে না।

আপনি ওদের পরামর্শ দেন—রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করেন।

যারা আমার ওপর বিশ্বাস করে কিছু সত্য জানতে চায়, আমার কর্তব্য নয় কি, কী সত্য তাদের জানানো? যতটুকু বুঝি যতটুকু জানি, সে তো চিরকালই বলব—আপনিও বলবেন। নয় কি? হা হা হা—সে তো মশাই সবাই বলবে—

সত্যটা কী? কী তারা জানতে চায়? সামান্য ঝাঁঝ প্রকাশ পেল মোহিনী মোহনের কণ্ঠে।

তারা জানতে চায় বর্তমানটা বদলাবে কি না। মানুষের শুভদিন আসবে কি না? এ-ভাবেই মানুষ চিরকাল বাঁচবে কি না—এই সব—

আপনি কি বলেন—

বলি? বলি বদলাবে।

ধ্বংসের দিকে, না স্বষ্টির দিকে?

স্বষ্টির দিকে—মহত্তর জীবনের দিকে। কেউ এই গতির তীব্রতাকে পুরোপুরি নষ্ট করে দিতে পারে না। বাধা দিতে পারে, এই গতির রাস্তা ভেঙেচুরে দিতে পারে—কোথাও পর্বতপ্রমাণ প্রাচীর খাড়া করে দীর্ঘকাল স্তব্ধ করতে পারে—কিন্তু চৈতন্যের বিকাশ কেউ সম্পূর্ণ রুদ্ধ করে দিতে পারে না—

মোহিনীমোহন ক্রমশ রেগে উঠছেন, তারক লক্ষ্য করেনি— তাঁর মুখ ক্রমশই লাল হয়ে যাচ্ছে। বললেন, এগুলো কি বিকাশের লক্ষণ? বিশৃঙ্খলা স্বেচ্ছাচারিতা, রাহাজানি, খুনোখুনি—এইগুলো বিকাশের পথ?

পতন ছাড়া উত্থান নেই মিস্টার রায়চৌধুরী। ওঠা-পড়া নিয়ে একটা ঢেউ। শুধু পড়া দেখে যদি সেটাকেই চূড়ান্ত ভাবি, তাহলে ভুল করব।

ওইসব উপমা দিয়ে জীবন-বিচার চলে না···তীব্র তাচ্ছিল্য ফুটে উঠল মোহিনীমোহনের কণ্ঠে।···প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের জীবনের কোনো মিল নেই···

আছে, নিশ্চয় আছে। মানুষ প্রকৃতির সন্তান। এবং কোটি কোটি বছরের প্রাকৃত ক্রিয়ার ফলে মানুষের ব্রেনের সৃষ্টি হয়েছে। এটা একটা অপরিহার্য ব্যাপার। অবশ্যম্ভাবীও। কিন্তু মজার কথা ব্রেনের আগে কোনো জীব বা বস্তু প্রকৃতিকে কাজে, মানে নিজের কাজে লাগাতে পারেনি···একমাত্র মানুষের ব্রেন তা পেরেছে। একটা পশু বা পাখি স্বেচ্ছায় একটা গাছের চারা এক মাটি থেকে উপড়ে অন্য মাটিতে রোপণ করতে পারে না, পারে মানুষ। মানুষ একদিন, একটা নক্ষত্রকে আরেকটা নক্ষত্রের পাশে বসিয়ে নিজের ইচ্ছাপূরণ করবে···জানেন?

এইবার মোহিনীমোহন টেনে টেনে হাসলেন, অসম্ভব! আপনি একজন ডাক্তার, আপনার মুখে এমন অসম্ভব কথা কি শোভা পায়?

গুহার মানুষ বর্তমান সভ্যতার কথা কল্পনা করতে পারত কি?

কিন্তু মানুষ আজ ধ্বংসের মুখে, সেটাও বোধহয় তারা কল্পনা করতে পারেনি···

কেন ধ্বংসের মুখে?

মোহিনীমোহন উত্তর না দিয়ে সিগারেট ধরালেন, কিছু চিন্তা করলেন, এবং উঠে গিয়ে অকারণে রাইফেলটা নিয়ে নাড়াচাড়া করলেন, কোনো ধ্বংস সংঘর্ষ এবং প্রচণ্ড দ্বন্দ্বের ছবি তাঁর মাথায় ফুটে উঠছে এবং মিলিয়ে যাচ্ছে···

Co-operation was the path of civilization. আজ তার দিকে বিরুদ্ধাচরণ করাটাই মানুষ বেছে নিয়েছে···ধ্বংস ছাড়া অন্য কোনো গতি নেই।

এই এলাকার অন্যতম শ্রেষ্ঠ ও বলিষ্ঠ পুরুষ মোহিনীমোহন···যাঁর ইচ্ছাপূরণের জন্যে মানুষ ঠেলাঠেলি করেছে···আগে কেবা প্রাণ করিবেক দান,

তারি লাগি কাড়াকাড়ি পড়ে গেছে। যিনি কথায় কথায় বলতেন, ও আমার কথা ঠিক শুনবে···আমার ব্যাপার সুতরাং কোনো চিন্তা নেই···ওরে আমার নাম করে বলিস—হয়ে যাবে। সেই মোহিনীমোহন আজ চিন্তান্বিত··· সভ্যতার প্রথম ও শেষ কথা বিরুদ্ধাচারণ। কোনো নতুনের জন্ম ও প্রতিষ্ঠার প্রথম পথ বিরুদ্ধাচারণ···

তা বলে সর্বদা আপনি বিরুদ্ধাচারণ করবেন? ভালো মন্দ সব কিছুর? যা প্রাচীন তারই?

না। যা আমাকে শক্তিশালী করে আমি তার বিরুদ্ধাচারণ করি না, কারণ সেটা আমি অর্জন করেছি···কিন্তু যা আমাকে হীন করছে দুর্বল করছে, সঙ্কীর্ণ করছে, তার বিরুদ্ধাচারণ আমি সর্বদাই করব।

কী করে বুঝবেন, কার বিরুদ্ধাচারণ করা উচিত?

বুঝব না? আপনি বুঝতে পারছেন না, কে আপনার বিরুদ্ধাচারণ করছে! কার বিরুদ্ধাচারণ করা আপনার উচিত?

রাইফেলটা রেখে দিয়ে অস্থিরভাবে পায়চারী করতে করতে মোহিনীমোহন সেণ্টার টেবিল থেকে সিগারেট তুলে ঠোঁটে চেপে ধরলেন···অগ্নিসংযোগ করলেন।

কই, ঠিক বুঝতে পারছি কোথায়? একবার ভাবছি এর, একবার ভাবছি তার বিরুদ্ধাচারণ করি! ঠিক ডিসিশন নিতে পারছি না···

I know my decision. ঝপ করে বলে বসল তারক।

আপনি বাড়িয়ে বলছেন···

বাড়িয়ে?

হ্যাঁ বাড়িয়ে। কেউ কোনোদিন ডিসিশন নিতে পারে না···

তা পার···সব ব্যাপারগুলোই জটিল···জড়াজড়ি করে সংঘর্ষ করে এগোচ্ছে ···তার মাঝখান থেকে রাস্তা বেছে নিতে হবে···রাস্তাটা বেছে নেবার ব্যাপারটাকেই আমি ডিসিশন বলছি।

রাস্তা কি বেছে নেওয়া যায়? এবং সবসময় ঠিক রাস্তাটা?

ভুল ও শুদ্ধ মিলিয়েই গতি···শুদ্ধ পদ্ধতিটা বেছে নিতে হবে···এবং সেটা মানুষের ব্রেন বেছে নিতে পারে।

না পারে না। ভগবানের ওপর ছেড়ে দিতে হয় শেষ পর্যন্ত।

ভগবান বলে কিছু নেই। আছে প্রকৃতি এবং তার অনিবার্য গতি। যাকে

বলা চলে অনিবার্যতা। প্রকৃতির অনিবার্যতার সঙ্গে চৈতন্যের চিরকাল টোক্কর। কোথাও প্রকৃতির অনিবার্যতার সঙ্গে চৈতন্য আপস করেছে, কোথাও বিরুদ্ধাচারণ করে সংশোধন ও আয়ত্ব করেছে। এবং এইভাবে চৈতন্য প্রকৃতির উপর ক্রমশ প্রভাব বিস্তার করবে···ধরুন আপনার ছেলের অসুখ···অসুখটা প্রকৃতির অনিবার্যতা···মানুষ ইঞ্জেকশন সৃষ্টি করে তার বিরুদ্ধাচারণ করেছে···অনিবার্যতাকে আয়ত্ব করেছে···কারণ অসুখের ফল যে মৃত্যু তাকে পেছিয়ে দিচ্ছে।

মানুষ যত পারে লড়াই করুক না প্রকৃতির সঙ্গে, তাতে আমার আপত্তি নেই···কিন্তু মানুষ যে মানুষের প্রতি হিংস্র আচরণ করছে, বিদেশের প্ররোচনায়? নিজের দেশের ঐতিহ্য নষ্ট করতে চাইছে···অবশ্য বিদেশের কোনো তত্ত্ব আমাদের দেশের ঐতিহ্য নষ্ট করতে পারবে না বলেই আমার বিশ্বাস! এগুলো সব সাময়িক···এসব একদিন নিজেরাই মারামারি করে ধ্বংস হবে।

ইঞ্জেকশানটা এক সাহেব আবিষ্কার করেছেন। তাতে আমাদের দেশের লোকের রক্তে কাজ করছে না? অনেক ওষুধ ও ইঞ্জেকশন বিদেশের আবিষ্কার। সত্যের দেশ-বিদেশ নেই মিস্টার রায়চৌধুরী···তত্ত্ব যদি খাঁটি হয়···তাহলে যে-কোনো দেশের ঐতিহ্যে তার ফল পাওয়া যাবে। কোথাও আগে, কোথাও পরে···এই যা তফাৎ।

কখ্‌খনো না···আমাদের দেশের ঐতিহ্যের সঙ্গে কোনো দেশের ঐতিহ্যের মিল নেই।

বিজ্ঞানের কোনো দেশ-বিদেশ নেই মিস্টার রায়চৌধুরী। শৈত্য তাপ ইত্যাদি কারণে আবহাওয়ার তারতম্যে তার প্রয়োগের তারতম্য ঘটতে পারে, কিন্তু মূল নীতি এক···বিজ্ঞানই শ্রেষ্ঠ ধর্ম।

এই সময়ে ইঞ্জেকশনের প্রসঙ্গ আসার পর থেকে মোহিনীমোহনের কান পড়েছিল পাশের ঘরের দিকে···তিনি হঠাৎ অস্থির পদক্ষেপে বেরিয়ে গেলেন এবং একটু পরেই ফিরে এসে বললেন, ডাক্তারবাবু, একবার আসুন···

তারক জানে এখন তার কিছু করার নেই, এখন তাকে প্রকৃতির অনিবার্যতা সয়ে যেতে হবে···এখন প্রকৃতির বিরুদ্ধাচরণ করার মতো অস্ত্র তার হাতে নেই, রোগীর মাথায় জল ঢালতে বারন করে দিয়ে তারক বারান্দায় এসে দাঁড়াল··· অন্ধকার ক্রমশ যেন বেড়েই চলেছে···অদৃশ্য বৃষ্টিপতনের শব্দ···আর্দ্র বাতাস বয়ে আনছে···তারক সিগারেট ধরাল···আর সিগারেটের ধোঁয়া সহ্য হচ্ছে

না···ভোঁতা লাগছে···হাই তুলল তারক···। একজন কর্মচারী এসে জানাল কফি দেওয়া হয়েছে।

কে, পাঁচু ঠাকুর মনে হচ্ছে? আবছা অন্ধকারে প্রশ্ন করল তারক।

হাঁ ডাকতর বাবু···আমি গো···

কেমন আছে তোমার স্ত্রী?

ভালো আছে গো···

বেশ···

কিছুদিন আগে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়েছে তারক। তারক নিজে কি বাঁচিয়েছে? না। তার জ্ঞান ও বুদ্ধি, যা অন্য মানুষের কাছ থেকে প্রাপ্ত বা অর্জিত। কিন্তু জ্ঞান প্রয়োগের পর সুফলের অধিকারী তারক··· গৌরবেরও।

মোহিনীমোহন ইতিমধ্যেই কখন এসে সোফায় বসে ধূমপান করছিলেন চিন্তামগ্নভাবে···তারকের প্রবেশে কোনো কথা বললেন না। দুজনেই কফির পেয়ালা চুমুক দিতে লাগল। দীর্ঘকাল পরে কফি পান করছে তারক। কলেজ জীবনের দুরন্ত মুহূর্তগুলি স্মরণে ভেসে উঠে গোপন বেদনার সৃষ্টি করল।

আপনি তো কোনো দলের মেম্বার নন, বললেন?

হ্যাঁ···নই···

আপনার কী দরকার ওদের সঙ্গে মেলামেশা করার?

ডাক্তার রোগীর সঙ্গে মিশবে না? এ-কেমন কথা বলছেন!

সোজা হয়ে বসলেন মোহিনীমোহন, যেন তিনি এবারে কিছু অমোঘ আদেশ ঘোষণা করবেন।

চিকিৎসা করবে, চলে যাবে। চলে যাবেন, চিকিৎসা করেই চলে আসবেন···আপনার সঙ্গে চিকিৎসা ভিন্ন আর কী প্রয়োজন তাদের?

আপনার ছেলেকে দেখতে এসে কি কেবল চিকিৎসার কথাই হচ্ছে? মৃদু হেসে বাঁকা চোখে তাকিয়ে অতি সহজ স্বরে বললে তারক।

আমাদের কথা আলাদা···ঘাড় শক্ত করে থুতনি নামিয়ে বললেন মোহিনীমোহন।

কেন আলাদা! প্রত্যেক লোকের সত্য জানার এবং সত্য অবলম্বন করার অধিকার আছে! তারকের কণ্ঠে প্রচুর বিস্ময় ঝরে পড়ল।

ছোটলোকরা সত্যের মর্ম কী বুঝবে, ওরা তো মশাই পশুশক্তি।

মানুষের ব্রেন নেই ওদের ? আপনার আমার মত একই ব্রেন ?

মোহিনীমোহনের মুখ অধীরতায় লাল হয়ে উঠল…তারক তাঁকে আঘাত দেবার জন্য বলেনি…সে বলেছে ডাক্তার সুলভ সহজ ভঙ্গিতে।

ওরা নতুন কিছু শোনার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বাস করে না, তারক বলে চলল, আমার কাছে এসে যাচিয়ে নেয়। তার মানে ওরা আমাকে অগাধ বিশ্বাস করে আমি কি ওদের মিথ্যে বলতে পারি। সত্য জানানোর অধিকার কি আমার নেই বলতে চান ?

কথায় কথায় তারক উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল, সে চেয়ারের হাতলে চাপড় মেরে বসল।

আত্মগত স্বরে বললেন. মোহিনীমোহন, আপনি তাহলে সত্যের ভক্ত. গোঁড়া ভক্ত ?

ভক্ত কি না জানি না…কিন্তু আমি সত্যকে ভালোবাসি…সত্য উন্মোচিত করতে আনন্দ পাই…সত্য প্রচার করতে পারলে খুশীতে আত্মহারা হই।

ব্যঙ্গাত্মক স্বরে মোহিনীমোহন বললেন, সত্যের কোনো নির্দিষ্ট ব্যাখ্যা আছে ? বলুন দেখি, সত্য কী…

এমন তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বললেন যেন এবারে তারক চিট হয়ে যাবে।

সলজ্জভাবে তারক হাসল। বলল, মস্ত প্রশ্ন করলেন, এর উত্তর দিতে পারব কিনা জানি না…

তাহলে এত সত্য-সত্য করে নাচানাচি করছেন কেন ?

কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধ থেকে তারক মনে মনে কথা গুছিয়ে বলল, শুনুন, ক্র[illegible]ত বৃহত্তর সংখ্যায় মানব জাতির উৎকর্ষ বিস্তারের যা উপযোগী তাই সত্য…

মোহিনীমোহন সহসা তাঁর নিজের চিন্তায় ডুবে গিয়েছিলেন, তারকের কথায় মনোযোগ দিতে পারেননি।

বললেন, আবার বলুন…

বারবার তিনবার তারক সত্যর সংজ্ঞা উচ্চারণ করল।

বললে, নিজের রোগের চিকিৎসার জন্য বৈজ্ঞানিক বা ডাক্তাররা ওষুধ ও ইঞ্জেকশন আবিষ্কার করেননি… হয়তো তাঁদের সদ্য আবিষ্কৃত ওষুধ বা ইঞ্জেকশন তাঁদের চিকিৎসার কাজে লেগেছে কিন্তু আবিষ্কারের উদ্দেশ্য ছিল মানবজাতি…ব্যক্তির বিস্তার ও মানবজাতির বিস্তার পরস্পর বিরুদ্ধাচরণ করেছে। ব্যক্তির বিস্তারের ফললাভ থেকে যখন মানুষ জাতটা বঞ্চিত

থেকেছে তখনই লেগেছে সংঘর্ষ...আর তার ফলে ব্যক্তিমানুষ হেরে গেছে... জিতেছে বৃহত্তর মানবজাতি...আর যেখানে ব্যক্তির বিস্তার মানবজাতির বিস্তারের অঙ্গ, সেখানে ব্যক্তির বিস্তারকে মানবজাতি বুকে টেনে নিয়েছে...

দূরাগত মোটরের শব্দ দুজনের মনোযোগ ছিন্ন করে দিল ক্ষণিকের জন্য। মোহিনীমোহন সোজা হয়ে বসলেন, তাঁর চোখ দুটি এখনো গভীর অন্তর্মুখী।

তিনি বললেন, আপনার কথাগুলোর সঙ্গে বর্তমানের সম্পর্ক কোথায় বুঝতে পারছি না···অসংলগ্ন মনে হচ্ছে না?

মোটেই না. মানবজাতির বিস্তারের জন্য সংঘর্ষ, বিশৃঙ্খলতা স্বেচ্ছাচারিতা। এগুলোর কোনোটাই আকস্মিক নয়। এর অনিবার্য অতীত আছে···শান্তি শৃঙ্খলা ও পরার্থপরতার দিকে যাত্রার জন্যে এইগুলো···চৈতন্যর জয়যাত্রায় এ-রকম বিপর্যয় সংঘর্ষ অনেক হয়েছে, হবে আরও অনেক···

সংঘর্ষের ফল কী হবে? ধ্বংস? জানেন, কত সভ্যতা পৃথিবীর বুক থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে!

গোটা মানবজাতি লোপ পায়নি। প্রকৃতি এবং মানবপ্রকৃতি দুই-ই চৈতন্যের জয়যাত্রার বিরুদ্ধতা করেছে, কিন্তু চৈতন্যের কাছে ক্রমশই তারা পরাজিত হচ্ছে। ধরুন, একদিন ভূকম্পনে পৃথিবীটা চৌচির হয়ে গেল, তখন কোনো গ্রহে বা তারায় তারা উদ্বাস্তু হয়ে চলে যাবে···বন্যা বা ভূকম্পনে অনেক মানুষ ধ্বংস করেছে কিন্তু মানব জাতিকে ধ্বংস করতে পারেনি।

আপনার চৈতন্যের জয়যাত্রার পদ্ধতিটা কী? একজন মানুষ যা অর্জন করছে, পাঁচজনে তা কেড়ে নেওয়া?

রাগে উঠে দাঁড়ালেন মোহিনীমোহন। তিনি এবারে ধৈর্যের সীমান্তে এসে পড়েছেন। এই লোকটা তাঁর ছেলের চিকিৎসা করতে না এলে, কখন একে তিনি গলাধাক্কা দিয়ে বিতাড়িত করতেন।

ডাক্তার বললেন, কেউ দরজা-জানালা বন্ধ করে গান গাইলে, প্রথমে কিন্তু শ্রোতা বাইরে থেকে শুনবে, কিছু উঁকি মারবে···এবং যদি ভালোভাবে শুনতে না পায় তাহলে কেউ কেউ দরজা ভেঙে ভেতরে ঢুকে পড়বে···জানেন না, জলসাগুলোতে কী হয়···প্যাণ্ডেলের বেড়া ভেঙে ভেতরে ঢুকে পড়ে?

রাস্কেল সব!

ড্রাইভার ইঞ্জেকশন হাতে গর্বিত পদক্ষেপে ঘরে প্রবেশ করতেই উঠে দাঁড়াল দুজনে।

মোহিনীমোহনের স্ত্রী ছেলের মাথা কোলে নিয়ে চোখের জল মুছছিলেন... অন্যান্য কর্মচারীরা যে যেখানে পেরেছে ঠেস দিয়ে ঢুলছিল।

তারক অ্যাম্পুল কেটে দ্রুত হস্তে সযত্নে ইঞ্জেকশন করে দিয়েই পা বাড়াল বাড়ি যাবার জন্যে। বললে, কোনো ভয় নেই...এবারে আমি আপনাদের পুরোপুরি ভরসা দিতে পারি...

কিছুক্ষণ দেখে গেলে ভালো হতো না?

হাসতে হাসতে তারক বললে, দরকার হবে না বলেই মনে হচ্ছে...

সগর্ব হাসি। একজন ইঞ্জেকশন আবিষ্কার করে প্রকৃতির বিরুদ্ধাচারণ করার যে-গর্ব উপভোগ করেছিলেন, সেই গর্ব তারক আবার নতুন করে উপভোগ করতে করতে হাসতে হাসতে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেল। মোহিনীমোহন হঠাৎ হিংস্র হয়ে উঠলেন, তাঁর বিনীতভাব উবে গেল, তাঁর মুখমণ্ডল ভারী হয়ে গেল। বললেন, আমার কথাগুলো ভেবে দেখবেন।

কোন কথাগুলো? তারক তো নিজেই প্রায় এক তরফা বকে গেছে।

সে বলল বিস্মিতভাবে, কোন কথা?

ছোটলোকদের সঙ্গে বেশি বেশি কেন, মেলামেশাই করবেন না। স্বরে আদেশের স্পষ্ট আভাস।

কেন বলুন তো?...সিঁড়ির কয়েক ধাপ নামতে নামতে হঠাৎ থেমে মুখ ফিরিয়ে বলল।

বাগদি পাড়ার লোক হাবা দত্তকে মেরেছে...আপনি জানেন, হাবা আমার কত বাধ্য ছিল...

সবাই জানে, হাবা দত্ত দিনের পর দিন বছরের পর বছর গরিবদের কাছে চড়া ও চক্রবৃদ্ধিহারে সুদ নিয়ে উপকার করার ছলে বিরাট সম্পত্তি করেছে—ওর একটা ঘর বন্ধকী ঘটি-বাটি-কলসী ইত্যাদি বাসন-কোসনে ভর্তি—জালিয়াতি তঞ্চকতা ইত্যাদি নানান কৌশলে হাবা-দত্ত সরেস ব্যক্তি—ওর বাড়তি জমি দখল করতে গিয়েছিল একদল লোক—হাবা এক ঝোপের আড়াল থেকে গুলি করে ফেলে দিয়েছে এক দখলকারীর লাশ। দখলকারীরা ছুটে গিয়ে হাবার হাত থেকে বন্দুক কেড়ে নিয়ে পাইকারী মার দিয়েছে। হাবাও ঐখানে ইহলীলা ত্যাগ করেছে।

বাগদি পাড়ার লোকেরা সংখ্যায় বেশি ছিল দখলকারীর দলে।

সহসা তারকের মুখে কোনো কথা জোগাল না। হাতব্যাগটা বগলে চেপে ধরে দাঁড়িয়ে থাকল—

মোহিনীমোহন তোয়ালে দিয়ে কাঁধ গাল ও কপাল মুছলেন। আমি ডিসিশান নিয়েছি—হয় মুছে যেতে হবে, নয় মুছে দিতে হবে—বিরুদ্ধতা আর আমি সহ্য করব না।

পিতৃসুলভ উৎকণ্ঠা কখন সরে গিয়েছে মোহিনীমোহনের চোখ থেকে, তার জায়গায় ঝরছে কর্তৃত্বের নিষ্ঠুরতা।

মাটি ছাড়া কি গাছ বাঁচে মিস্টার রায়চৌধুরী? রোগী ছাড়া ডাক্তার?

সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসার পর অন্ধকার বাগানে এসে তারকের গা ছমছম করতে লাগল। হঠাৎ তারকের মনে পড়ল রাইফেলটার কথা। মোহিনীমোহন কি ডাকাতের ভয়ে রাইফেলে টোটা ভরে রেখেছেন, নাকি ডাক্তারের ভয়ে? তারক ঠিক বুঝতে পারল না।

২

বাড়ির সামনে গাড়ি থামার শব্দে পূর্ণা আঁচলে হাত মুছতে মুছতে সদরের দিকে এগিয়ে গেল। গুমট গরম, গায়ে জামা রাখতে কষ্ট হচ্ছে। রোদ ও ছায়ার ক্রমাগত লড়াই চলছে আকাশে।

গাড়ি থেকে নামলেন মোহিনীমোহন। গিলেকরা পাঞ্জাবী শান্তিপুরী ধুতি। পায়ে পাম্পসু হাতে গজদন্তখচিত ছড়ি। জুতোয় মচমচ শব্দ করতে করতে এসে উঠলেন বারান্দায়। কয়েকজন রোগী বসে বসে ঝিমোচ্ছিল, ওরা সন্ত্রস্তভাবে উঠে এসে নমস্কার করল মোহিনীমোহনকে।

ডিস্পেন্সারিতে ঢুকে মোহিনীমোহন ভ্রূ কুঁচকে নিরীক্ষণ করতে লাগলেন। কাদার গাঁথনি দিয়ে ইটের চার দেয়াল। তার উপর খড়ের চাল। করোটির দন্তপংক্তির মতো ইটগুলো বেয়াড়াভাবে প্রকাশিত। দুটো পাল্লাহীন আলমারীতে ওষুধ-ইঞ্জেকশন-তুলো ইত্যাদি বস্তুতে বোঝাই। একটি কাঁঠাল-কাঠের বৃহৎ টেবিলের উপর মোটামোটা ডাক্তারী বই পলিথিনের চাদরে ঢাকা...দেয়ালে ঝুলন্ত সেলফ তিনটিতেও বহু সরঞ্জাম, একটি চেয়ার একটি লম্বা বেঞ্চ...। প্রাণপণে পূর্ণা মুখে হাসির কষ্টসাধ্য উচ্ছ্বাস ছড়িয়ে বুকের ভয় চাপা দেবার চেষ্টা করতে লাগল।

তারক নেই? গম্ভীর গলায় প্রশ্ন করলেন মোহিনীমোহন।

বসুন। চেয়ারটি আঁচলে মুছে এগিয়ে দিল পূর্ণা। মাঝপথে মোহিনীমোহন নিজেই চেয়ারটি টেনে নিলেন, কেড়ে নেবার মতো। কলে গেছেন।

কলে? বলতে বলতে মোহিনীমোহন চিন্তায় তলিয়ে গেলেন।

একটু বসুন আমি আসছি···

না না, আসতে হবে না আমি কিছু খাব না...

সে হয় নাকি! আপনি কি আর রোজ আসবেন। আপনার পায়ের ধুলোর আজ কত দাম?

বটে? যদি রোজ আসি?

তাহলে কিন্তু রোজ খাতির করতে পারব না...

লোকটির ছলনাগুলি স্পষ্ট ঝলসে উঠল স্মৃতিপটে এবং পূর্ণার দ্বিধায় আচ্ছন্ন দৃষ্টিও স্বচ্ছ হয়ে গেল।

একদিন যাকে ডেঁয়োপিঁপড়ের মতো গা থেকে ঝেড়ে ফেলেছিলেন, সেদিন ভাবতে পেরেছিলেন মোহিনীমোহন যে, কোনোদিন তার বাড়িতে গায়ে পড়ে ছুটে যেতে হবে!

তোর কাছে এসেছি বলে এই অপমান করছিস।

মোহিনীমোহনের মুখ থমথম করতে লাগল।

অপমান? কই না তো···

হঠাৎ মোহিনীমোহনের শরীর ডিঙিয়ে এক ঝলক বাতাস এসে পূর্ণার নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করতেই, তার গা গুলিয়ে উঠল। মদের গন্ধ চিনতে ভুল করল না সে। বেশ দামী এবং সুগন্ধি হলেও মদের গন্ধ যে। তার মনে হলো আজ মোহিনীমোহনকে চূড়ান্ত অপমান করতে পারলে সে খুব খুশী হতো।

বসুন···বসুন না...

চেয়ার ধরে তখনো মোহিনীমোহন দাঁড়িয়ে।

পূর্ণা বাপীকে ডাকতে বারান্দায় এলো। একপাল ছেলে বারবার ড্রাইভারের তাড়া খেয়েও কচুরিপানার মতো গাড়ির মোহ ত্যাগ করতে পারছে না। বেশ কয়েকবার ডাকার পর বাপী এলো। তার কানে কানে কী বললে পূর্ণা। সে দৌড়ে চলে গেল কলাবনের আড়ালে।

মোহিনীমোহন পূর্ণার শিরে হাত রেখে বললেন, তেমি আছিস তুই।

মোটেই না তখন কত বোকা ছিলাম—নইলে আপনার ছলনায় ভুল করি।

ভুল?

হ্যাঁ, ভুল বৈকি। যে ভুল সারা জীবন আমাকে দগ্ধাচ্ছে—

কেন। স্বামীকে বলতে পারিসনি বুঝি—খোঁচা মারলেন মোহিনীমোহন।

ও-সব আবার বলা যায় কোনোদিন! বলতে পারলে কি আর কষ্ট হতো। চেপে চেপেই তো কষ্ট পাচ্ছি।

আমি তোর স্বামীকে বলে দেব—তোর কষ্ট লাঘব হবে—কী বলিস?

মৃদুমৃদু হাসতে লাগলেন মোহিনীমোহন—এবং এক কোণের ছোট্ট টেবিলে রাখা মাইক্রোস্কোপে চোখ পড়তে, সেদিকে হেঁটে গেলেন।

আপনার বিনা সাহায্যেই কষ্ট সহ্য করতে পেরেছি এতদিন—বাকি জীবনটাও পারব আশা করি—

ধুলোয় লুটোনো কোঁচা ঝাড়তে ঝাড়তে মোহিনীমোহন বললেন, কিন্তু আমি বোধহয় যেকোনো মুহূর্তে তোকে খুব কষ্ট দিতে পারি।

দেশের ভাগ্যনিয়ন্তার স্পষ্ট স্বর ফুটে উঠল তাঁর কণ্ঠে—দাম্ভিকতা ঝরে পড়ল তাঁর সমস্ত ভঙ্গি থেকে—

সেজন্যেই কি বাড়ি বয়ে সুসংবাদটা দেবার জন্যে ছুটে এসেছেন? সেটা বোধহয় না জানালেও চলত—আপনি যে এ-তল্লাটের হর্ত-কর্তা-বিধাতা—আপনার খুশীতে যে আমরা সবাই বেঁচে আছি, এ-খবর কে না জানে? আপনি যাঁর প্রতি বিরূপ তাঁর যে আর ইহজীবনে পরিত্রাণ নেই, সেটাও ভালোভাবে জানা আছে।

হেসে উঠলেন মোহিনীমোহন, অহঙ্কার বাজতে লাগল হাসিতে। বললেন, শহর ছেড়ে হঠাৎ গাঁয়ে এলি কেন, আমার পেছনে লাগতে?

সে ক্ষমতা আমাদের আছে নাকি মোহিনীদা?

না না—ঠাট্টা নয়—সত্যি বল।

ওঁর রিসার্চের জন্য।

রিসার্চ? এখানে তার কী সুবিধে?

জানেন না? এখানে খুব অশিক্ষিত মানুষের ব্রেন পাওয়ার সুবিধে আছে যে! শিক্ষিত মানুষের ব্রেন নিয়ে অনেক গবেষণা হয়েছে, অশিক্ষিত, একেবারে পশুর মত জীবন-যাপন করছে যে মানুষ তাদের মস্তিষ্ক সহজে মেলে না যে—

ওসব বাজে রিসার্চ আর করতে হবে না—শহরে উঠে যা—তোর বর ডাক্তার হিসেবে মন্দ না। আমার ছেলেটাকে একেবারে সুস্থ করতে পেরেছে—অবশ্য আমার গাড়ি ছিল বলেই সম্ভব হয়েছে। গাড়ি ছিল লোক ছিল—

সে তো বটেই আপনার ছেলে বেঁচেছে আপনার নিজের গৌরবে।

গৌরব আজ আর কোথায় আমার? লোক তো আমার উপকার ভুলতে বসেছে, আমি নাকি কিছুই করিনি কারুর।

কে বলছে। করেছেন অনেক। আপনার মত উদারচেতা আর কে আছে!

উদারতার কোনো দাম নেই আজ। ভাগাড়ে সদ্য আনা মড়ার মতো উদারতা…হাজার হাজার শকুনিতে ছিঁড়ে খেতে ছুটে আসবে…উদারতার খুবই অভাব আজ। আমাকে সবাই ছিঁড়ে-খুঁড়ে খাবার জন্যে তাই সবাই উদগ্রীব।

বাপী এমন সময় পূর্ণাকে ডাকতেই পূর্ণা মোহিনীমোহনকে দু-দণ্ড বসতে বলে ভিতরে চলে গেল। এবং কয়েক মিনিট পরেই এক প্লেট মিষ্টি নিয়ে ফিরে এল আবার। মোহিনীমোহন চমকে উঠে বললেন, না না…আমি ওসব খাব না।

ভয় করছে নাকি? হাজার হোক আপনাকে আমি বিষ দেব না। মিষ্টি অথচ ব্যাঙ্গাত্মক হাসি হাসতে লাগল পূর্ণা।

মোহিনীমোহন দেয়ালে হেলান দেওয়া ছড়িটা তুলে নিলেন, বললেন, যখন-তখন আমি খাই না পূর্ণা—শোন্ তোর বরকে বলিস একটু। বুঝিয়ে বলিস। ডাক্তারি করছে ডাক্তারিই করুক। ফিলসপি বা রাজনীতি নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি যেন না করে। শেষকালে একূল ওকূল দুকূল যাবে।

আপনি খাবেন কি না বলুন। এ-বাড়িতে আপনি কতদিন সেধে খেয়ে গেছেন মনে আছে!

সেদিন তুই আমার কত প্রিয় ছিলি, আজ যে তুই আমার শত্রুতা করছিস—

আমি!

হ্যাঁ। তুই, তোর স্বামী দুজনেই—সব আমার কানে আসে। স্বামী পেয়ে আমার কথা তুই ভুলে গেছিস দেখছি—তা ভালোই হয়েছে। আমাকে ভুলে তুই নতুন সুখ পেয়েছিস—তোর অনেক ঝঞ্ঝাট দেখতে পাচ্ছি, লোক নেই জন নেই—বোধহয় সংসারও খুব সচ্ছল নয়—কিন্তু তোর চোখে মুখে সুখের স্পষ্ট আভাস বারবার টের পাচ্ছি—আর এই সুখের গর্বে তুই আমার শত্রুতায় যোগ দিয়েছিস। কিন্তু ভুলে যাস না, তোর এই সুখের সংসার আমি এক নিমেষে নষ্ট করে দিতে পারি।

পূর্ণার মনে হলো যে যদি সত্যি সত্যি খাবারে বিষ মিশিয়ে নিয়ে এসে মোহিনীমোহনের ঠোঁটে গুঁজে দেবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হতো, তাহলেও তার

সান্ত্বনা ছিল। সে অত্যন্ত কাতর স্বরে প্রশ্ন করল, কেন আপনি আমার সুখ নষ্ট করবেন—কী দেখেছেন, কী তার প্রমাণ ?

ছোটলোকরা আমার ভাই চন্দ্রমোহনকে মারার জন্য শাসাচ্ছে। আর ছোটলোকদের আড্ডা তোদের এই ডিস্পেনসারিতে। আমি বললাম না, তুই তেম্নি আছিস, তেমনি বোকা। তুই ভুলে গেলি কী করে যে, তোর সেই ছবিটা আজও আমার কাছে রয়েছে! বোকা নইলে আবার কেউ ভুলে যায়। সে-ছবিটা যদি একবার তোর বরকে দেখাই ?

৩

কখনো কখনো মনে হলো মোহিনীমোহন ফাঁকা শাসিয়ে গেলেন। দশ-বারো বছর আগেকার ছবি এত যত্ন করে কেউ তুলে রাখে? সব মিথ্যে তর্জন। আর, যদি সে-ছবি আজ অবধি তুলেই রেখে থাকে, সে কি আজ আর স্পষ্ট আছে। সে কবে ঝাপসা হয়ে গেছে। যদি ঝাপসা না হয় ? যদি সে-ছবি মোহিনীমোহন সযত্নে সঞ্চয় করে রেখে থাকেন ? যত ভাবতে লাগল পূর্ণার ততই নতুন নতুন আতঙ্ক জন্মাতে লাগল। সব চাইতে শ্রেয় রাস্তা, নিজ মুখে স্বামীকে সব বলা। কিছু-কিছু পূর্ণা ইতিমধ্যেই বলে দিয়েছে। কিন্তু আর কিছু-কিছু নয়, সবটাই খুলে বলা। কিন্তু তারক সব শোনার পর যদি অসহ্য আঘাত পায়—যদি তারক আর কোনোদিন পূর্ণাকে শ্রদ্ধা করতে না পারে ? বার তিনেক চেষ্টা করল পূর্ণা খুলে বলার। তিনবারই কোনো না কোনো বাধা। দুপুরে যখন একটা-দুটো পাপিয়া আর ঘুঘু ডাকছিল, তখন বিশ্রান্ত তারক পড়ছিল খবরের কাগজ—শুয়ে শুয়ে—পূর্ণা বলল, শোনো—কাগজ রাখ—তোমাকে কাগজের চাইতে চমকপ্রদ খবর শোনাব।

বাইরে থেকে কে ডাক দিল, ডাক্তরবাবু গো—

রাত্রে তারা দুজনে অনেকক্ষণ বিছানায় গল্প করল—একেক দিন দুজনকেই কথায় পেয়ে বসে, ঘুম আসতে চায় না—একটা করে আলোচনা শুরু হয়, শেষ হয় অনেক পার হয়ে।

এবারে ঘুমোও, আর বকবক কোরো না কাল আমার অনেক কাজ অনেক খাটুনি—

পূর্ণাও তারকের কথাগুলি তোতাপাখির মতো আউড়ে গেল।

তুমি আগে ঘুমোও—

আগে তুমি—

আমার ঘুম আসছে না—

শোনো—

বোস বাড়ির ও-দিক থেকে কলরব ভেসে এল—কয়েকটা আলো জ্বলে উঠল, দেখা যাচ্ছে পায়ের দিককার জানলা দিয়ে আলোগুলো চঞ্চলভাবে ইতস্তত সঞ্চালিত হচ্ছে—একটা আলো তাদের দিকে ছুটে এল এবং সঙ্গে সঙ্গে, ডাক্তার, ও ডাক্তার—

কে, হরগোবিন্দ দা ?

হ্যাঁ ভাই—ওঠ—রিঙ্কুকে সাপে কেটেছে।

কোথায় ?

হাতে।

বাঁধন দিয়েছেন ?

দিয়েছি—

চলুন, এখখুনি যাচ্ছি—

আর সে-রাত ডাক্তার বা পূর্ণা কারুর ঘুম নেই। বাপীর কমবয়সী রিঙ্কু··· সাত-আট। তারক ও পূর্ণার কোলে চেপে বসে কোন জন্ম-জন্মান্তরের দাবিতে। মেয়েটি বড়ই নাছোড়। গায়ে পড়ে আদর আদায় করতে কোনো লজ্জা হায়া নেই। রক্তপরীক্ষা ইঞ্জেকশন—এ সব করতেই রাত্রি পার হয়ে গেল। পরদিন দক্ষিণ মাঠে লাগল প্রবল সংঘর্ষ। চন্দ্রমোহন ও একজন ক্ষেতমজুর—জাতে খয়রা, মারা গেল। শান্ত স্তব্ধ গ্রাম অশান্ত ও বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠল। সর্বত্রই কী-হয় কী-হয় আতঙ্ক। কেউ কাউকে বিশ্বাস করতে পারছে না···ছোট ছোট জটলা ···ফিসফিস চলছে। হঠাৎ কেউ সেখানে গিয়ে পড়লে ফিসফিস থেমে যাচ্ছে, মানুষ মানুষের চোখে তাকাচ্ছে নতুন দৃষ্টিতে···যেন লোকটার ভিতরে কোনো বিপজ্জনক নতুন আস্থানা গেড়েছে। চন্দ্রমোহন ও হাসাকে চিকিৎসা করার জন্য তারকের কাটল সারাদিন. অভুক্ত অবস্থায়। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় কাউকে বাঁচান গেল না। একজনের কাঁধে তীর বিঁধেছে আর একজনের বুকে গুলি। বিকেলে স্নানাহার করে তারক আরাম-কেদারায় বসে সিগারেট ধরিয়ে সংঘর্ষের কথা চিন্তা করছিল। মানুষে মানুষে সংঘর্ষ কবে শেষ হবে···যতদিন এ-সংঘর্ষ শেষ না হচ্ছে ততদিন সব ব্রেনগুলি একসঙ্গে কাজে লাগবে না···সমস্ত ব্রেনগুলি সুশৃঙ্খলভাবে কাজে লাগলে চৈতন্যশক্তির বিস্তার নতুন আকার

পরিগ্রহ করবে। তখনই শুরু হবে সত্যকার সভ্যতার নবতর পদক্ষেপ।

পূর্ণা নিজেকে প্রসারিত করছিল—আলুথালু চুলগুলি বিন্যস্ত করতে করতে দাঁতে চিরুনী চেপে এসে দাঁড়াল। অন্তরে বাহিরে উন্মত্ততা তলিয়ে যাচ্ছিল—ক্রমশঃ পাতাল থেকে জেগে উঠছিল বিস্তারিত শান্তি ও স্তব্ধতা—আর আকাশ থেকে ডানা ঝাপটানোর শব্দ ক্রমশ মিলিয়ে যাচ্ছিল।

তুমি ভীষণ বোকা —

উঁ—কথা কানে ঢোকেনি তারকের।

ভীষণ বোকা তুমি—কী করে যে নিজেকে এত বুদ্ধিমান ভাব জানি না—

কেন—

কী বলেছ মোহিনীমোহনকে ?

কই, কিছু বলিনি তো—ঘাড় কাত করে তাকাল তারক বিস্ময়ান্বিত নজরে, কই কিছু না।

বলনি বৈকি—

আমি তো গোপন খবর কিছুই জানাইনি —

দর্শন তত্ত্ব, রাজনীতি—আরও কত কী শুনিয়ে এসেছ!

ওসব ওকে শুনিয়ে কী লাভ। তোমার কথা ওরা শুনবে ? তীক্ষ্ণ তিরস্কার পূর্ণার কণ্ঠস্বরে।

ওঃ হো—এই কথা—হাসল তারক—তা শুনিয়েছি। কেমন যেন মা সরস্বতী হঠাৎ আমার জিবে ভর করেছিলেন, কিছুতে আমি সামলাতে পারলাম না। বুঝিয়ে দিলাম পৃথিবীর ইতিহাস কোন খাতে বয়ে চলেছে —

মোটেই ভালো করনি —

কেন বল তো ? উৎকণ্ঠিত স্বরে তারক সোজা হয়ে বসল সেদিন কি কিছু বলে গেছে ?

অনেক কিছু বলেছে।

কী, কী বলেছে!

কী দরকার ছিল তোমার পণ্ডিতি করার। আজকাল কাউকে পেলেই দেখেছি, অমনি হড়বড় করে সব বলে দেবে—

বলব না ? এতদিন যা পড়লাম, দেখলাম, শিখলাম বলব না ? আর কবে বলব পূর্ণা ?

বেনা বনে মুক্তো ছড়িয়ে কোনো ফল আছে ?

বেনা বন কাকে বলছ পূর্ণা। আর মুক্তোই বা কী। হয়তো আমি যা জানি, সেটা এখানে মুক্তাফল হয়ে উঠতে পারেনি? যদি আমার চিন্তা আমার ধারণা গ্রহণ করে, সত্যি সত্যি কেউ কোনোদিন মুক্তো সৃষ্টি করতে পারে—আর কে যে এগুলো কাজে লাগাবে কে জানে, কে আজ তাকে চেনে। আমার উচিত আমার চিন্তার প্রচার করে যাওয়া—কেবল প্রচার। আদৌ কোনো শ্রোতার বুকে স্বরলহরী বেজে উঠবে না ভেবে কি ওস্তাদ গান গাওয়া বন্ধ করে দিতে পারেন?

তা বলে পাত্র-অপাত্র ভেদ নেই?

না নেই। আমি একটা জিনিস দেখতে পাচ্ছি, আমি একটা জিনিস বুঝতে পারছি, হয়তো সেটা আর পাঁচজনে অনুভব করছে, কিন্তু ধরতে পারছে না। তখন আমার উচিত সেটা ধরিয়ে দেওয়া। তাতে যে আমি সুখ পাব পূর্ণা!

দুঃখও পাবে···

হয় তো পাব। কিন্তু সে দুঃখও আমার সুখ হয়ে দেখা দেবে। ধর আমি দেখতে পাচ্ছি, ঈশ্বর বলে কোনো সর্বশক্তিমান নেই। মানুষ ওঁকে সৃষ্টি করেছে নিজেদের স্বার্থে। মানুষের ব্রেন ক্রমশই বিকশিত হচ্ছে···এবং একদিন এমন সময় আসবে, যখন মানুষ তার ব্রেনের সাহায্যে প্রায় ঈশ্বরের মতো শক্তিশালী হয়ে যাবে···অনেকেই এ-কথা ভেবেছেন···প্রকাশ করেছেন···আমি তাকে নতুনভাবে দেখতে পাচ্ছি, আমি এত বড় সত্যটা মনের মধ্যে চেপে রাখতে পারি?

তুমি তো এ-নিয়ে প্রবন্ধ লিখেছ···মেডিক্যাল জার্নালে। আবার তা নিয়ে তোমাকে বলে বেড়াতে হবে কেন? থাম, সন্ধ্যে দিয়ে আসি···

পশ্চিমাকাশ ক্রমশ উজ্জ্বল হয়ে চলেছে···এবং কিছুক্ষণ পরে ফিঙ্গে রঙের গোল চাঁদ বাঁশগাছের শীর্ষগুলির পাশে উঠে দাঁড়াল···পরনে তার রাজকীয় ময়ূরকণ্ঠী পোশাক, শিরে চামর দোলাচ্ছে সদ্যধৌত নারকেল গাছের পাতাগুলি। আকাশে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত মিহি সাদা মেঘে ছড়িয়ে পড়ল চন্দ্রোদয়ের ঘোষণা। তারা কমলারঙের টুপি পরেছে আনন্দে।

ডাকতর বাবু···

কে...

বাইরে এসে দেখল তারক, পাঁচু ঠাকুর।

তোমাকে বাবু একবারটি ডেকেছেন গো···

আবার ছেলেটার কিছু হল নাকি, বা অন্য কারুর ?

না গো।

তবে ?

সে আমি বলতে পারনু না…

কে, কে ডাকছে। বলতে বলতে সান্ধ্যপ্রদীপ জ্বেলে বেরিয়ে আসে পূর্ণা। পাঁচুদা…কী…

বাবু ডাকছেন উনাকে।

না, উনি যাবেন না…বাবুকে এখানে আসতে বলবে।

পূর্ণার কণ্ঠস্বরে রূঢ়তা চাপা রইল না।

ভয়ের কিছু নেই গো…দিদিমণি।

তোমার মনিবকে এখানে আসতে বলে দিও। যাঁর দরকার তিনি আসবেন।

পাঁচু ঠাকুর চলে যেতে তারক সিগারেট ধরিয়ে প্রশ্ন করল, হঠাৎ তুমি অমন খেপে গেলে কেন ?

কারণ আছে।

প্রায় সর্বস্ব দিয়ে তৈরি তারকের ছোটখাট ল্যাবরেটরিতে এবং ল্যাবরেটরি সংলগ্ন ডিসপেন্সারিতে আলো দিল পূর্ণা…ঝকঝকে লণ্ঠন…ভিতর বারান্দায় বাপী ও বুবুকে পড়তে বসাল—বাহির বারান্দায় পায়চারী করতে লাগল তারক…ল্যাবরেটরিতে গেল…জীর্ণ চেয়ারে বসে মেডিক্যাল জার্নালের পাতা ওলটাতে লাগল। চারটি কিস্তি প্রকাশিত হয়েছে…সেইগুলিতে চোখ বুলোতে বুলোতে, কোনো কোনো লাইনের নিচে লাল-পেন্সিল দিয়ে আঁচড় টানতে লাগল…এইগুলি সংশোধন অথবা পরিমার্জন করতে হবে। পঞ্চম কিস্তিতেই প্রবন্ধ শেষ...পঞ্চম কিস্তিটা এতদিন ছাপা হয়ে গেছে...কেন যে সৌজন্য সংখ্যা আসতে দেরী হচ্ছে…। কলাবনের অন্ধকারে জ্যোৎস্নার ঠেলাঠেলি। সেদিকে দৃষ্টিনিবদ্ধ করে থুতনি চেপে ধরল তারক। কিছুদিন আগে এক বিজ্ঞানীর উক্তি পাঠ করে, সে নতুন চিন্তা করছে। বিজ্ঞানী বলছেন: আশী কোটি কোষ সম্বলিত মানুষের ব্রেনের পক্ষে সম্ভব এযাবৎ পৃথিবীর সমস্ত মুদ্রিত পুস্তক মুখস্ত করা।

তাহলে গাছপালা নদী সমুদ্র পৃথিবী এমন কি মহাকাশের উপরে কর্তৃত্ব বিস্তারের শক্তি এই ব্রেনের মধ্যে নিহিত থাকা এমন কিছু অসম্ভব নয়। তারক দেখতে পাচ্ছে: ক্রমশই দিগন্তবিস্তৃত বিশাল অনিশ্চিত অনিবার্যতাকে মানুষ

তার করায়ত্ত করতে করতে ঈশ্বরের কাছাকাছি চলে যাচ্ছে। কী প্রচণ্ড শক্তি এই কয়েক ইঞ্চি পরিমাণ ক্ষুদ্রবস্তু ব্রেনটির। চুড়ির শব্দে তারক পাশ ফিরে তাকাল চেয়ারে বসেই। কিছুক্ষণ আগে তুমি আমাকে রায়চৌধুরীর সঙ্গে আপস করে চলার জন্যে যেন বলতে চেয়েছিলে, অথচ তুমি নিজেই সরাসরি জেহাদ ঘোষণা করে দিলে!

পূর্ণা তার দেহের গন্ধ ছড়িয়ে চেয়ারের পেছনে এসে দাঁড়াল।

ওর সঙ্গে ঝগড়া করে কী লাভ?

পাঁচু ঠাকুরকে তবে তাড়ালে কেন।

তাড়াইনি তো। মোহিনীদাকে তো আমি আসতেই বলে দিলাম।

ওইভাবে!

আমি বলেছি, মোহিনীদা কিছু মনে করবে না।

তোমার বক্তব্য আমি বুঝতে পারছি না পূর্ণা। কয়েকদিন থেকে তোমাকে আমার নতুন প্রবলেম মনে হচ্ছে।

আমাকে? কই না তো! খিলখিলিয়ে হেসে উঠল পূর্ণা…

যাক সে…তোমাকে রায়চৌধুরী কী বলে গেল?

বলবে আর কী। শাসিয়ে গেল।

শাসিয়ে! কেন! কী বলে শাসালে?

বললে, ওর বিরুদ্ধে কোনো কথা বললে, আমাদের সংসারের শান্তি নষ্ট করে দেবে। পূর্ণার স্বরে নকল বিদ্রূপ।

কী করে?

সে তার হাতে একটি মারাত্মক অস্ত্র আছে! মোহনীয় ভঙ্গিতে হাসতে লাগল পূর্ণা।

কী অস্ত্র।

হঠাৎ পূর্ণার কলহাস্য শুদ্ধ হয়ে গেল। যত সহজে তারককে সে সব কথা খুলে বলবে ভেবেছিল, তত সহজে সে বলতে পারল না। সে ধীরে ধীরে তারকের পেছনে এসে দাঁড়াল এবং চমকিতভাবে তারকের মাথাটা আকর্ষণ করল তার বুকের মধ্যে। তারক মুখ তুলে পূর্ণার চোখের দিকে চেয়ে দেখল পূর্ণার চোখে-মুখে ক্ষিপ্র বিচিত্র বর্ণান্তর খেলা করে চলেছে। বাঁ-হাতে তারক পূর্ণার হাত ধরে টেনে আনল পাশের দিকে। সারাদিনের পরিশ্রমে তার শরীর হালকা বোধ হচ্ছে…সে আজ জীবনের পাকেপাকে বিজড়িত…যতই সে

জীবনের পাকেপাকে নিজেকে জড়িয়ে চলেছে ততই স্পষ্টতরভাবে অমৃতের স্বাদ অনুভব করতে পারছে…আর সে অনুভবের মূলে ক্রমশই পূর্ণার ভূমিকা ব্যাপক পরিসরে ছড়িয়ে পড়ছে… অমোঘ অপরিহার্য সে ভূমিকা… তাদের নিত্য দ্বন্দ্ব নিয়ত কলহ…কিন্তু সমস্ত দ্বন্দ্ব-কলহের প্রান্তে তাদের অননুভূত মিল অবিচ্ছিন্ন ঐক্য—পাপ-পবিত্রতা দুঃখ-সুখ ঝঞ্ঝা ও শান্তির—যাবতীয় বিরুদ্ধ সংঘর্ষে তারা দুজনে সহযোগী যোদ্ধা। তারক যা জানে না শেখে পূর্ণার কাছে, পূর্ণার ত্রুটি সংশোধন করে দেয় তারক। আজ হঠাৎ তারক পূর্ণার এমন করুণ অসহায়তা দেখে, বুকে সন্দেহের প্রচণ্ড ধাক্কা খেল, বলল, তুমি …তুমি কেন চুপ করে গেলে পূর্ণা…আমার যে ভয় করছে।

ধর, তুমি এক নির্মম সত্য জানতে পারলে, তা এককালে সত্য ছিল, আজ মিথ্যে হয়ে গেছে…তা নিয়ে তুমি কী করবে?

হেসে উঠল তারক হো হো শব্দে, সত্য যতই নির্মম হোক, তাকে আমি ভয় করি না। আর, সত্য কখনো মিথ্যে হয় না…তার পরিমার্জনা হয়। মিথ্যা হয়ে যায় না।[৩]

ধর, তুমি জানলে, মূলেই মানুষ স্বার্থপর হীন কুটিল তাহলে কী করবে, মানুষের প্রতি তোমার যে অগাধ শ্রদ্ধা তা ধুলোয় লুটিয়ে পড়বে না?

না। মানুষ স্বার্থপর হীন জটিল, সে তো পদে পদেই দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু তার ভিতরে পরার্থপরতা মহত্ত্ব সরলতার সম্ভাবনা রয়েছে। তাকে টেনে বার করতে হবে…তাকে টেনে বার করতে হবে…তাকে অস্বীকার করি কী ভাবে?

সত্যকে জানতেই হবে? আকুলতায় পূর্ণার চোখে জল এসে গেল।

নিশ্চয়। বিষ এবং অমৃত দুই সত্য। দুটিকেই সমান জানতে হবে। এবং তাদের ব্যবহার করবে মানুষ নিজের ইচ্ছায়।

কী প্রয়োজন আমাদের সব জেনে…মানুষ তো কত কিছু জানে না, আর না-জানার পরিমাণটাই তো বেশি…

তা বলে যা জানি সেটা বাজে হয়ে যেতে পারে না। যা জানি তা দিয়ে না-জানার দুর্গম রাজত্বে বীরের মতো অভিযান চালাব।

জানার পর তুমি দুর্বল হয়ে যেতে পারো তো?

জ্ঞান মানুষকে বীর্যবান করে, দুর্বল করে না কোনোদিন।

ধর, তুমি রায়চৌধুরীদের বাড়ি গেলে আর…

সহসা মাঝখানে পূর্ণার বাক রুদ্ধ হয়ে গেল।

আর, আর কী পূর্ণা?

উঠে দাঁড়ালো তারক। তার বুকে অচিন্ত্য এক অস্বস্তির সৃষ্টি হলো, আর সেই অস্বস্তিটা ক্রমশই ঝোড়ো মেঘের মতো জ্যোৎস্নাচ্ছাদিত আকাশকে কবর দিতে লাগল. কঠোর স্বরে বলল, কী বলতে চাও···বল স্পষ্ট করে।

পূর্ণার শরীরে কাঁপুনি শুরু হয়েছে···তার কাঁধে হাত দিয়ে টের পেল তারক।

তার আগে একটা কথা বলি···তুমি···মানে তুমি আমার ভালোবাসায় কোনো সন্দেহ কর?

অর্থাৎ?

মানে আমি তোমাকে সত্যিই ভালোবাসি কিনা, এ-নিয়ে কোনোদিন তোমার মনে কোনো প্রশ্ন জাগে?

হালকা হাসির সঙ্গে তারক বলল, সে তো সর্বদাই জাগে?

পূর্ণার চোখের ভাব বদলাতে দেখে তারক দ্রুত বলে উঠল, না না গো··· আমি জানি তুমি আমাকে কত ভালোবাসো।

বিশ্বাসে গাঢ় হয়ে গেল তারকেশ্বর।

তুমি জান, তোমাকে বলেছি, বিয়ের আগে মোহিনীদা আমাকে ভালোবাসত।

সে শুনে শুনে তো কানে কড়া পড়ে গেছে। মোহিনীদা ভালোবাসত, কিন্তু তুমি ভালোবাসতে না।

আমি ভালোবাসতাম কিনা জানি না···

তার মানে একটু একটু কেন যদি পুরোপুরিও ভালবেসে থাক, তাতে কী! তা নিয়ে আজ হঠাৎ এই সুন্দর ঝুলন পূর্ণিমায় সেই পচা অতীতকে টেনে এনে রাত্রিটাকে নষ্ট করছ কেন।

আছে, কারণ আছে, বলছি। রাগ করছ? তাহলে আর বলব না।

রাগ? আবার মুক্তভাবে হাসল তারক···না না···বল। তুমি বলে যাও।

মোহিনীদার কাছে প্রায়ই যেতাম···সে-ও এ-বাড়িতে সময়ে-অসময়ে আসত। কম বয়স আমার। ওর কাছে আমি যেন কেমন হয়ে যেতাম। হিপ-নটিজম বলে কিছু আছে কি না জানি না···কিন্তু মনে হতো ও যেন আমাকে সম্মোহিত করতে পারত···আমি যেন ওর হাতের পুতুল হয়ে গিয়েছিলাম।

ভগবান তোমাকে বাঁচিয়েছে।

বাঁচিয়েছেন কি মেরেছেন জানি না···

আমার হাতে না পড়ে ওর হাতে পড়লে হয়তো তুমি মেরেছেন এ-কথা বলার সুযোগ পেতে না।

আমি তখন কেমন হয়ে যেতাম। আমাকে দিয়ে মোহিনীদা যা ইচ্ছে তাই করিয়ে নিতে পারত···একদিন আমার কাছে খুব খারাপ প্রস্তাব করলে, আমি রাজি কেন যে হলাম···

তারকের বুকের শব্দ গর্জন করে উঠল। সে নিশ্বাস বন্ধ করে পূর্ণার দুই কাঁধে দুই হাত স্থাপন করে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তার চোখ দুটি জ্বলছে···

না, তুমি বলেছ, সত্য তোমাকে বিচলিত করতে পারে না···সত্য তোমাকে আনন্দিত করে···তোমাকে সত্য শুনতে হবে

তারকের বুকের ভিতর থেকে কে বলে উঠল অতি ক্ষীণ স্বরে, বল···বল··· শুনছি···

একটা ছবি তুললে আমার।

নির্বাক পাহাড়ের মতো তারক পূর্ণার চোখের দিকে আর চাইতে পারছে না ···তার দৃষ্টি চেতনা সব যেন ক্রমশই নিভে আসছে···আলোকিত বিশ্ব ক্রমাগত দূরে সরে যাচ্ছে···

হ্যাঁ···ন্যুড ছবি

তারকের গলা জড়িয়ে অসংখ্য চুম্বন দিতে লাগল পূর্ণা, বলতে লাগল, তুমি আমাকে ঘৃণা করছ না তো? বিশ্বাস কর, ওকে আমি এখন আর ভালোবাসি না। ও কবে আমার মন থেকে মুছে গেছে···তুমি যদি বল, আমি এখুনি ছুটে গিয়ে ওকে খুন করতে পারি···সত্যি বলছি···বিশ্বাস কর···বিশ্বাস কর, সত্যি বলছি···

কাঁদতে লাগল পূর্ণা···অনেক্ষণ ধরে কাঁদল। তারক স্থির।

ভিতর বারান্দা থেকে বাপী ও বুবুর মারামারি শোনা গেল। কাঁদতে কাঁদতে ছুটে এল বুবু, পাঁচ বছরের মেয়ে। চেঁচাতে লাগল, বাবা বাবা দেখ আমাকে মারছে···আমি কিছু করিনি বাবা···

নেপথ্যে বাপীর গলার স্বর, আমার ভূগোল বইয়ের পাতা ছিঁড়ে দিয়েছে বাবা···

চোখের জল মুছতে মুছতে চলে গেল পূর্ণা বাপীকে শাসন করতে।

বুবু তারকের জানু জড়িয়ে ধরে কাঁদছে, তলপেটে কচি মুখ ঘষছে বারবার। ওকে কোলে তুলে নিয়ে তারক বুবুর ভেজা গাল নিজের গালে চেপে ধরল কিছুক্ষণ, তারপর কান্না থেমে গেলে ওকে নামিয়ে দিয়ে রাস্তার দিকে পা বাড়াল।

যার সঙ্গে বর্তমানের কোনো সম্পর্ক নেই সেই অতীত কখন কোথায় ভয়ঙ্করভাবে টর্পেডোর মতো বিস্ফোরিত হয়···আবার অতীত কোথাও সমতলে নদীর মতো অসংখ্য শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে জনপদ লোকালয় আলিঙ্গন করে ঢেলে দেয় অমৃত-নির্ঝর?

নদীর বাঁধ আমবাগান বাঁশবন পার হয়ে তারক এসে পড়ল ধূ ধূ বালিয়াড়িতে। আকন্দের ঝাড়ে বসল নিজেকে আড়াল করে।

প্রকৃতি তারককে যত সুখ এবং অমৃত দান করেছিল, সে-সব বর্তমানে তার কাছে বড় অপরিচিত ঠেকছে। সে যেন সুখামৃতের সন্ধান কোনোদিন জানত না···কোন্ কোন্ মৌলিক ও যৌগিক পদার্থ মিশ্রণে সুখামৃতের সৃষ্টি, কী তার ফরমুলা···এই নদী ও চন্দ্রালোকিত বৃক্ষরাজি বালিয়াড়ি সবুজ বলয়ের মতো দিগন্ত নক্ষত্রমণ্ডলী এবং মহাকাশের সন্তান যে মানুষ, সমস্ত কিছুর আস্বাদ গ্রহণের ইন্দ্রিয়াবলীতে যে বিভূষিত, সেই মানুষ যেন বিন্দুর মতো অজানার বিস্ফোরণে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে। পদে পদে সংখ্যাতীত বাধা-বিপদ জীবানু-নিয়তি ভয়-দুর্ঘটনা পার হয়ে কোটি কোটি বছরের জ্ঞান-অভিজ্ঞতা অর্জন করে এসে সমস্ত প্রকার বিরুদ্ধতা চূর্ণ করার সাহস ও শক্তির অধিকারী মানুষ কি একদিন সামান্যতম কারণে প্রকৃতিতে লয় প্রাপ্ত হবে?

কে গো···ঝুঝকি আঁধারে কে?

পারাপারের এক যাত্রী দেখতে পেয়েছে বেড়াল-নজরে।

শ্মশানের উপর ক্যানে বসে গো?

শ্মশান?

সে কী শ্মশান-মশান হদিশ নেই?

পাঁচু ঠাকুর নাকি?

হ্যাঁ গো চলুন উঠুন ইথ্যানে ক্যানে? দিদিমনির সঙ্গে ঠোকাঠুকি হয়েছে নাকি? তা আজ্ঞে দুখান কাঁসার বাসন পাশাপাশি রইলে ঠোকাঠুকি নাগেই··· চলুন, দিনকাল বড় খারাপ আজ্ঞে ··

চল···

তারক বালি ঝেড়ে উঠে পা চালাবার আগেই পাঁচু ঠাকুর দূরের আবছা আলোয় মিলিয়ে গেল···রায়চৌধুরীর ভাঙা রাসমঞ্চে ঘণ্টা বাজছে···ঘণ্টার শব্দের সঙ্গে কিছু শিশু কিশোরের উচ্চ কণ্ঠ ভেসে আসছে···তারক বাপী ও বুবুর চিন্তা করতে করতে বালির উপর একটার পর একটা গভীর পদচিহ্ন আঁকতে লাগল। ইদানিং সে একটু মোটা হয়ে গেছে।

৪

পরদিন যখন দশটা গ্রামের 'ছোট লোক' সমুদ্রের মতো ক্রোধে উত্তাল হয়ে উঠল, তারা ডাক্তারের খুনের বদলা নেবে, তখন হারু পিওন কাঁধে খাকি ঝোলা নিয়ে ফিরে গেল নিজের বাড়ি। আজ এ-অঞ্চলে শোকপালন, সে কী করে ডিউটিতে বেরোয়। হায়ার সেকেণ্ডারি পাশ করা তার ছেলে নিমাই বাবার কাঁধের ঝোলা থেকে বের করে মেডিক্যাল জার্নালটা খুলে পড়তে লাগল। তারকের প্রবন্ধর শেষাংশ প্রকাশিত হয়েছে, যাতে সে বলেছে: ব্রেনের প্রধান বৈশিষ্ট্য, ব্রেন নিত্য নতুন সত্য গ্রহণ করতে এবং সে-সত্যকে নিত্য নতুনভাবে মানবজীবনে নিজ নিজ চিন্তানুযায়ী প্রয়োগ করতে পারে। এইভাবে এক ব্রেণ অন্য ব্রেণকে গর্ভবতী করছে এবং নতুন চিন্তার জন্ম দিচ্ছে। শরীরের নির্দিষ্ট মা বাপ আছে। কিন্তু চিন্তার নির্দিষ্ট মা-বাপ নেই। সে সর্বদাই সংকর। চির সংকর।

ক্যাপিটাল-এর আরেক গ্রন্থকার

আলেকজান্দার ম্যালিশ

নিচে উদ্ধৃত কথাগুলি দুনিয়ার লক্ষ লক্ষ মানুষের কাছে আজ জানা। ১৮৬৭ সালের ১৬ই আগস্ট রাত্রি দুটোর সময় 'ক্যাপিটাল' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের শেষ পৃষ্ঠার প্রুফ দেখা সাঙ্গ করে মার্কস এঙ্গেলসকে চিঠি লিখতে বসলেন। লিখলেন, "অবশেষে প্রথম খণ্ড ছাপার জন্যে তৈরি। আমার পক্ষে এ-কাজ করা যে সম্ভব হলো সে একমাত্র তোমার জন্যেই! আমার কারণে তোমার আত্মত্যাগ ছাড়া তিন খণ্ডের এই বৃহৎ কাজ পুরোপুরি শেষ করা আমার পক্ষে অসম্ভব হতো। আমার সকৃতজ্ঞ আলিঙ্গন জানাই"।

এইভাবে তাঁর অমর গ্রন্থ রচনায় এঙ্গেলসের অবদানের মূল্যায়ন করেছিলেন মার্কস।

বস্তুত, এই অবদানের মাত্রা অপরিমেয়। মার্কসের জীবদ্দশায় তাঁর প্রতিভার পথ প্রশস্ত করতে এবং 'ক্যাপিটাল' গ্রন্থ রচনায় এঙ্গেলস সাধ্যমতো সর্বপ্রকার সাহায্যই করেছিলেন। অকাতরে অর্থ-সাহায্য তো করেই ছিলেন, উপরন্তু প্রধান প্রধান তত্ত্বগত সমস্যার সমাধানে পরামর্শ দিয়েও সহায়তা করেছিলেন। অর্থনীতি-শাস্ত্রে এঙ্গেলস ছিলেন সুপণ্ডিত, তাই অর্থনীতির নানা বাস্তব সমস্যার সমাধানের জন্যে মার্কস প্রায়ই বন্ধুর শরণ নিতেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে রাষ্ট্রনৈতিক অর্থনীতিতে মার্কসের অগ্রণী ভূমিকার কথা স্মরণ রেখেও এঙ্গেলসকে ঐ শাস্ত্রের প্রথম পথিকৃৎ বলা যেতে পারে। ১৮৪৪ সালে প্রকাশিত তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধে 'রাষ্ট্রনৈতিক অর্থনীতি-বিষয়ক বিশ্লেষণ-মূলক সূত্রাবলী' ইতিহাসে বুর্জোয়া সমাজের মৌল অর্থনৈতিক স্তরগুলির মার্কসবাদী বিশ্লেষণের প্রথম চেষ্টা বলে গণ্য। প্রবন্ধটি তৎকালে মার্কসের মনে গভীর প্রভাব বিস্তার করে। মার্কস এটিকে জনৈক প্রতিভাবানের সৃষ্টি বলে গণ্য করতেন।

'ক্যাপিটাল'-এর দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ডের মতো শক্তিশালী বিপ্লবী হাতিয়ার হাতে পাওয়ার জন্যে বিশ্বের নির্বিত্ত জনগণ এঙ্গেলসের কাছে ঋণী। লেনিনও তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ধরনে এঙ্গেলসের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন এই

বলেন, "বাস্তবিক, 'ক্যাপিটাল' গ্রন্থের এই দুই খণ্ড আসলে মার্কস ও এঙ্গেলস এই দুজন ব্যক্তির যৌথ সৃষ্টিকর্ম"।

'ক্যাপিটাল' গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের প্রকাশ

১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই মার্চ মার্কস শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার পরে তাঁর প্রতিপক্ষীয়রা এই মর্মে দুষ্টবুদ্ধি-প্রণোদিত গুজব ছড়াতে শুরু করে যে মার্কস নাকি 'ক্যাপিটাল' গ্রন্থের প্রথম খণ্ড লেখার পর আর অগ্রসর হননি এবং দ্বিতীয় খণ্ড লেখার কথা নাকি "তাঁর মাথাতেই ছিল না"। বিরোধীরা বলতে থাকে, মার্কসের এই দ্বিতীয় খণ্ড বই লেখার ব্যাপারটা তাঁর প্রথম খণ্ডে আলোচিত মূল্য ও উদ্বৃত্ত মূল্য বিষয়ক তত্ত্বের সমালোচকদের সঙ্গে বিতর্ক এড়ানোর একটা "কূট কৌশল" ছাড়া কিছু নয়। কিন্তু সবরকম গুজব ও আন্দাজের অবসান ঘটিয়ে এঙ্গেলস স্থির প্রত্যয়ের সঙ্গে ঘোষণা করলেন যে লেখক-কৃত 'ক্যাপিটাল'-এর পরবর্তী খণ্ডগুলির পাণ্ডুলিপি প্রকাশিত হতে চলেছে। মৃত বন্ধুর ইচ্ছা-অনুযায়ী এঙ্গেলস আর কাল বিলম্ব না করে উপরোক্ত পাণ্ডুলিপিগুলিকে ছাপাখানায় দেবার উপযোগী করতে ঘসামাজায় লেগে গেলেন।

'ক্যাপিটাল'-এর দ্বিতীয় খণ্ডটিকে ভেঙে দুটি বইয়ের আকারে প্রকাশ করার কথা মার্কস ভেবেছিলেন। একটি বই মূলধনের সঞ্চালন বিষয়ে, এবং অপরটি সমগ্রভাবে মূলধনতান্ত্রিক উৎপাদনের ধরন সম্পর্কে। কিন্তু লেখার মালমশলা হাতে এত জমে যায় এবং বই দুটির আয়তন এত স্ফীত হয়ে ওঠে যে এঙ্গেলস কাজের সুবিধের জন্যে পরবর্তী সংস্করণগুলিতে ও-দুটিকে পরস্পর নিরপেক্ষ দুটি বই হিসেবে প্রকাশ করতে মনস্থ করেন।

মার্কসের রচনার অসমাপ্ত খসড়াগুলি একত্র করে এঙ্গেলস প্রতিটি বাক্য ধরে ধরে তুলনামূলক বিচার করেন এবং শেষ খসড়ার পরিবর্তনগুলির উপর ভিত্তি করেও যেখানে-যেখানে তা অসম্পূর্ণ থেকে গেছে, সে জায়গাগুলি পূর্ববর্তী পাঠের সাহায্যে পূরণ করে নিয়ে তিনি বইয়ের সর্বশেষ পাঠ প্রস্তুত করেন।

প্রথম খণ্ড 'ক্যাপিটাল'-এর দ্বিতীয় ও তার পরবর্তী সংস্করণগুলির পাঠ-বিন্যাসের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এঙ্গেলস এই বই দুটির বিন্যাসও নির্ধারণ করেন। ব্যাপারটা আর কিছুই নয়, কেবল প্রথম খণ্ডের প্রথম সংস্করণের মতো মার্কস এই দ্বিতীয় খণ্ডটিকেও শুধু বিভিন্ন পরিচ্ছেদ ও ক্ষুদ্রতর অংশে ভাগ করেছিলেন, আর এঙ্গেলস মার্কসের প্রতিটি পরিচ্ছেদকে বইয়ের এক-একটি অংশ বা খণ্ডে

পরিণত করে প্রতিটি অংশকে আবার বিষয়বস্তুর দিক থেকে পূর্ণাঙ্গ ও সংহত কয়েকটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত করলেন। এছাড়া বই দুটির প্রতিটি অংশ, পরিচ্ছেদ ও পরিচ্ছেদাংশের মাথায় এঙ্গেলস সুস্পষ্ট ও যথাযথ সব শিরোনাম বসালেন। এ-ব্যাপারে কিছুটা মূল পাণ্ডুলিপিতে মার্কসের দেওয়া শিরোনাম এবং অন্যত্র নিজের বিচার-বিবেচনা তাঁকে সাহায্য করেছিল।

এইভাবে এঙ্গেলসের সম্পাদনায় 'ক্যাপিটাল'-এর দ্বিতীয় খণ্ড ১৮৮৫ সালের জুলাই মাসে প্রথম প্রকাশিত হলো।

তৃতীয় খণ্ড প্রকাশের প্রস্তুতি

এঙ্গেলস প্রথমে যতটা ভেবেছিলেন তৃতীয় খণ্ডের পাণ্ডুলিপি ছাপাখানার জন্যে তৈরি করতে গিয়ে দেখলেন জটিলতা ও ঝঞ্ঝাট তার চেয়ে ঢের বেশি। সম্পাদনার এই কাজটি শেষ করতে তাঁর প্রায় দশ বছর লেগেছিল। পল লাফার্গ একটি চিঠিতে এঙ্গেলসের এই অসুবিধের কথা লিখছেন এইভাবে: "উইলিয়মসের (মার্কসের গুপ্ত ছদ্মনাম—লেখক) খুদে-খুদে গোল-গোল হাতের লেখার কথা তো জানেনই। তাঁর খসড়ায় সে-হাতের লেখা আরও অপাঠ্য। সূত্রাকার সংক্ষিপ্ত সব শব্দ পাঠককে বুঝে নিতে হয়, সংশোধন আর সংশোধনের ওপর সংশোধনের কাটাকুটির পাঠোদ্ধারে মাথা ঘামাতে হয়। দু-তিনটে অক্ষর একসঙ্গে জড়ানো এবং একবার লেখা মুছে আবার লেখা। গ্রীক পাণ্ডুলিপি পড়া যত শক্ত, এ-লেখা পড়া তার চেয়ে কিছু কম কঠিন নয়···

"এঙ্গেলসের বয়স এখন উনসত্তর। তিনি আমাকে লিখছেন, ইংরেজি '69 সংখ্যাটিকে যতভাবেই উলটেপালটে সাজাও না কেন তা 69ই থাকবে'··· ভাবতে অবাক লাগে, উইলিয়মসের রচনাবলী প্রকাশের ব্যবস্থা করার সঙ্গে সঙ্গে ইয়োরোপ ও আমেরিকার প্রায় সকল দেশের সঙ্গে বিস্তারিতভাবে চিঠি-পত্রের আদানপ্রদান তিনি করছেন কিভাবে···এঙ্গেলস সত্যিই একজন বহুভাষা-বিশারদ। তিনি শুধু বহু বিভিন্ন লিখিত ভাষাই জানেন না, আইসল্যাণ্ডিক ভাষার মতো কথ্যবুলি এবং প্রোভেন্স ও কাতালোনিয়া অঞ্চলের প্রাচীন ভাষাও জানেন।···ওঁর ভাষাজ্ঞান ভাসাভাসা নয় মোটেই···এঙ্গেলস এক আশ্চর্য লোক। এমন তরতাজা ও যুক্তির কাছে নমনীয় মন, এমন বিশ্বকোষতুল্য জ্ঞানের পরিধি আর কখনও দেখিনি"।

এঙ্গেলসকে 'ক্যাপিটাল'-এর তৃতীয় খণ্ডের যাবতীয় উপাদান নতুন করে

সাজাতে হয়, সমস্ত তথ্যগত উপায় আবার পরীক্ষা করে দেখতে হয় এবং সমস্ত সারণীর হিসাবগুলিও ফিরে-ফিরতি দেখে দিতে হয়। মার্কসের বেশ কিছু অসংলগ্ন ও টুকরো টুকরো মন্তব্য ইত্যাদির উপর ভিত্তি করে তিনি কয়েকটি পৃথক অনুচ্ছেদ ও এমনকি অধ্যায়ও সঙ্কলিত করেন। এইভাবেই বইটিতে 'পুঁজিবাদী উৎপাদন-ব্যবস্থায় ঋণ গ্রহণের ভূমিকা' নামে অধ্যায়টির উদ্ভব হয়। মার্কসের পূর্বোক্ত মন্তব্যগুলি ছিল 'মূলধনের স্টক-শেয়ার ধাঁচের বিকাশ' 'মূলধনকে উৎপাদকদের সম্পত্তিতে পুনরায় পরিণত করার পথে' এক প্রয়োজনীয় মধ্যবর্তী স্তর গণ্য করে যে পরিচ্ছেদটি লেখা হয়েছিল তার অংশবিশেষ। মার্কসের ঐ রচনার পরে উপরোক্ত যুগটির অবসান ঘটে। এঙ্গেলসের সামান্যীকরণসূচক সূত্রগুলিও ওই বিশেষ যুগের পক্ষে প্রযোজ্য ছিল। এই প্রসঙ্গে এঙ্গেলস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হন। সিদ্ধান্তটি এই, "প্রতিযোগিতার স্থান গ্রহণ করেছে একচেটিয়া পুঁজি এবং ভবিষ্যতে সমগ্র সমাজ, সমগ্র জাতির পক্ষে সম্পত্তি অধিকারের পরম আনন্দ-দায়ক পথটি পরিষ্কার হচ্ছে"।

মার্কসের পাণ্ডুলিপিতে ছিল কেবলমাত্র বইয়ের চতুর্থ পরিচ্ছেদের শিরোনামটি 'মুনাফার হারের উপর মোট লগ্নী টাকার প্রভাবের ফলাফল' এইরকম একটা ইঙ্গিত যে বইয়ের শেষের দিকে তিনি যেন উক্ত সমস্যার অন্তঃসারটি উপস্থাপিত করতে যাচ্ছেন। কিন্তু তার সময় পেলেন না তিনি। এঙ্গেলসকেই এই গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়টি পুরো লিখতে হয়। এ-পরিচ্ছেদে পরি-বর্ধিত পুনরোৎপাদনের কয়েকটি সাধারণ নিয়ম উদ্ভাবিত ও লিপিবদ্ধ রয়েছে। "মুনাফার হার ও উদ্বৃত্ত মূল্যের হারের পারস্পরিক সম্পর্ক" শীর্ষক তৃতীয় পরিচ্ছেদের পাঠ্যাংশে পূর্বোক্ত চতুর্থ পরিচ্ছেদের মতো এঙ্গেলসের সম্পাদনার কলম চলতে ও তাঁর নামের আদ্য অক্ষরের প্রাদুর্ভাব ঘটতে দেখা যায় না। তৎসত্ত্বেও, এই পরিচ্ছেদটিও প্রধানত এঙ্গেলসের লেখা।

এঙ্গেলস 'ক্যাপিটাল'-এর তৃতীয় খণ্ডের জন্য এক বিস্তারিত ভূমিকা লিখলেন এবং বইটিকে ছাপাখানায় দেয়ার উপযোগী করে তুললেন। ওই মুখবন্ধে তিনি মূল পাণ্ডুলিপির অবস্থা এবং পাণ্ডুলিপিটি অবলম্বনে তাঁর সম্পাদনার কাজের বর্ণনা দিয়েছেন। এছাড়া মুখবন্ধে এঙ্গেলস মূল্যমানের বিধিবদ্ধ নিয়মের ভিত্তিতে কীভাবে একই ধরনের মুনাফার হার নির্ধারিত হতে পারে এবং তা হয়েও থাকে এই সমস্যা সমাধানের কিছু কিছু উপায়ের গুণাগুণ

বিশ্লেষণ করে দেখান। 'ক্যাপিটাল'-এর দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশের পর অধ্যাপক ভি, লেকসিস, ডঃ সি. স্মিডট এবং পি. ফায়ারম্যান উপরোক্ত উপায় আবিষ্কারের চেষ্টা করেন। এঙ্গেলস দেখান, এঁদের কারো প্রচেষ্টাই সফল হয়নি।

প্রসঙ্গত এঙ্গেলস মূল্যমানের বিধিবদ্ধ নিয়মের ভূমিকা সম্পর্কে নিম্নোক্ত বিশেষ উল্লেখ্য বক্তব্যটি সূত্রাকারে উপস্থাপিত করেন: "...মূল্যমানের বিধিবদ্ধ নিয়ম প্রথম থেকেই পুঁজিবাদী চিন্তা পদ্ধতি থেকে উদ্ভূত এই ধারণাটির বিরোধী যে অতীতের পুঞ্জীভূত শ্রম, পুঁজিও যার অন্তর্ভুক্ত, তা উৎপাদিত তৈরি মূল্যের নিছক একটা মুদ্রার অঙ্ক মাত্র নয়, বরং তা নিজেই মূল্য উৎপাদন করছে এবং ফলে নিজস্ব মূল্য ছাড়াও তা আরও বেশি মূল্যের আকর। এই ধারণার বিরুদ্ধে মূল্যমানের নিয়ম এই সত্যটিকেই প্রতিষ্ঠা করছে যে বর্তমানের জীবন্ত শ্রমই একমাত্র উপরোক্ত ক্ষমতার অধিকারী।"

মার্কস "যেখানে কেবল অনুসন্ধানের কাজ চালান সেখানেও সংজ্ঞা বেঁধে দিতে চাই" বলে যে অভিযোগ উঠেছিল উল্লিখিত ভূমিকায় এঙ্গেলস তাকে খণ্ডন করেন। তিনি বলেন, মার্কস কখনও অনড়, ইচ্ছেমতো বানানো এবং চিরকাল প্রয়োগ করা চলতে পারে এমন কোনো সংজ্ঞা নির্দেশ করেননি। অতঃপর তিনি নিম্নোক্ত প্রধান পদ্ধতিগত নীতিটি বিবৃত করেন: "যেখানে বস্তুসমূহ ও তাদের পরস্পর-সম্পর্ককে অনড় বিবেচনা না করে পরিবর্তনশীল বলে গণ্য করা হয়, সেখানে তাদের মানসিক প্রতিচিত্রণ, বোধ ও ধারণা যে একইরকমভাবে পরিবর্তন ও রূপান্তরের বশবর্তী হবে এ তো স্বতঃসিদ্ধ। আর এই ধারণা ইত্যাদিকে তাই অনড় অটল সংজ্ঞার খোলসে আবদ্ধ করা হয়নি, বরং তাদের নিজ ঐতিহাসিক ও যুক্তিসিদ্ধ গঠনের পদ্ধতিতেই বিকশিত করে তোলা হয়েছে"।

মুখবন্ধের শেষাংশে মার্কসবাদের—মার্কস-উদ্ভাবিত ইতিহাসের বস্তুবাদী ধারণা ও অর্থনৈতিক তত্ত্বের বিরুদ্ধে বুর্জোয়া সমালোচকদের যুক্তি-তর্কের অশোভন কলাকৌশলের স্বরূপ উদ্ঘাটন করেন এঙ্গেলস। অবশ্য এ-সব সত্ত্বেও, 'ক্যাপিটাল'-এর তৃতীয় খণ্ড প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কিন্তু মার্কস রচিত রাজনীতি-সংক্রান্ত অর্থনীতির সৌধ ধূলিসাৎ করার উদ্দেশ্যে উপরোক্ত আজগুবি সব আক্রমণের অবসান ঘটল না। বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদ্ ও তাদের পোঁ-ধরা ব্যক্তিরা 'ক্যাপিটাল'-এর প্রথম ও তৃতীয় খণ্ডের মধ্যে কাল্পনিক পরস্পর বিরোধী বক্তব্য আবিষ্কার করে ফেলল। তারা বলল, প্রথম খণ্ডে যুক্তি-তর্ক দিয়ে

বোঝানো হয়েছে যে পণ্যদ্রব্য তাদের মূল্য অনুযায়ী বিকোয়, আর তৃতীয় খণ্ডে বলা হলো পণ্যদ্রব্য বিক্রি হয় তাদের মূল্য অনুযায়ী নয়, 'তাদের উৎপাদনের খরচ ও গড়পড়তা মুনাফা হিসেবের মধ্যে ধরে যে উৎপাদনের দাম নির্ধারিত হয় সেই দামে। এই তথাকথিত 'সমালোচকদের' অন্যতম এ. লোরিয়া মূল্য সম্বন্ধে মার্কসবাদী মতকে সর্বদাই অদ্ভুত, অর্থহীন, ধোঁকাবাজি বলে অভিহিত করত।

শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও মার্কসের তত্ত্বকে আরও একবার ব্যাখ্যা করার জন্যে এঙ্গেলসকে আবার কলম ধরতে হলো। উদ্দেশ্য, "১৮৬৫ সালে লেখা রচনা যাতে ১৮৯৫ সালের অবস্থার সঙ্গে খাপ খায় তার জন্যে মূল রচনায় যে-সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ দিকের উপর যথেষ্ট জোর পড়েনি সেই দিকগুলিকে চোখের সামনে তুলে ধরা এবং রচনায় কিছু কিছু গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন ঘটানো"। ১৮৯৫ সালের মে-জুন মাসে তিনি 'ক্যাপিটাল'-এর তৃতীয় খণ্ডের প্রস্তাবিত দুটি অনুপূরক অংশের প্রথমটি, 'মূল্যমানের বিধিবদ্ধ নিয়ম ও মুনাফার হার' নামের প্রবন্ধটি লেখেন। এতে প্রথম কয়েক পৃষ্ঠায় লোরিয়াকে "স্থূল রাজনীতি-সংক্রান্ত অর্থনীতির এক হাস্যকর জীব" প্রতিপন্ন করে এবং ঔদ্ধত্য ও অজ্ঞতার জন্যে তাকে ব্যঙ্গবিদ্রূপ করে এঙ্গেলস মূল্যমানের নিয়ম-সম্পর্কিত যে-সমস্ত দিক বোঝা বিশেষ দুরূহ তাদের ব্যাখ্যায় মনোনিবেশ করেন। এই প্রবন্ধটি এঙ্গেলসের মৃত্যুর পর সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক পত্রিকা 'ডাই নিউ জাইত'-এ প্রকাশিত হয়।

এঙ্গেলসের মতে, 'ক্যাপিটাল'-এর তৃতীয় খণ্ডের মূল পাণ্ডুলিপি তৈরি হওয়ার তিন দশকের মধ্যে স্টক-এক্সচেঞ্জ পুঁজিবাদী উৎপাদনের সবচেয়ে উল্লেখ্য প্রতিনিধিস্থানীয় হয়ে উঠতে থাকে। এঙ্গেলস ভেবেছিলেন, 'স্টক-এক্সচেঞ্জ' নামে তৃতীয় খণ্ডের দ্বিতীয় অনুপূরক প্রবন্ধটিতে তিনি স্টক-এক্সচেঞ্জের পরিবর্তিত ভূমিকা, শ্রমশিল্প ও বাণিজ্যক্ষেত্রে শেয়ার স্টকের কর্মতৎপরতার ক্রমবিকাশ, কৃষিক্ষেত্রে প্রযুক্তিবিজ্ঞানগত পরিবর্তন ও কৃষিতে ব্যাঙ্ক ও স্টক এক্সচেঞ্জের বৃহত্তর ভূমিকা, শেয়ারের আকারে পুঁজির রপ্তানি, এবং একই স্টক এক্সচেঞ্জের সুবিধার্থে উপনিবেশগুলিকে ইয়োরোপীয় শক্তিবর্গের মধ্যে বণ্টন, প্রভৃতি বিষয় ব্যাখ্যা করবেন। পুঁজিবাদী উৎপাদন-পদ্ধতিতে যেসব নিগূঢ় ক্রিয়াকর্ম চলে তারই অন্যতম সূচক এই স্টক-এক্সচেঞ্জ প্রতিষ্ঠান। এঙ্গেলস একে বৃহৎ পুঁজির অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক আধিপত্যের সঙ্গে এক করে দেখতেন। কিন্তু, দুর্ভাগ্যবশত, তিনি 'ক্যাপিটাল'-এর তৃতীয় খণ্ডের এই অনুপূরক অংশটির একটি বিস্তারিত খসড়া-পরিকল্পনামাত্র ছকে যেতে সক্ষম হয়েছিলেন।

গভীর অনুধ্যান

পুঁজিবাদ বিকাশের উচ্চতম পর্যায়ে উন্নীত হওয়ার সময় পর্যন্ত এঙ্গেলস জীবিত ছিলেন না। এ-কারণে, স্বাভাবিকভাবেই, তাঁর পক্ষে ওই পর্যায়ের বহুমুখী তত্ত্বগত বিশ্লেষণ উপস্থিত করা সম্ভব ছিল না। তৎসত্ত্বেও অর্থনৈতিক বিকাশের নিয়মগুলি সম্পর্কে তাঁর গভীর অনুধ্যান, বিশ্বের অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে বহুমুখ জ্ঞান এবং প্রতিভার ফলস্বরূপ তাঁর দূরদৃষ্টি জায়মান নতুন যুগের কতগুলি মূল বৈশিষ্ট্য ধরতে সক্ষম হয়েছিল। ট্রাস্টগুলির একেক ধরনের, সমস্ত শ্রমশিল্প-প্রতিষ্ঠানের উপর একচেটিয়া আধিপত্য সম্পর্কে এঙ্গেলসের মতের উদ্ধৃতি দিয়ে এবং "ব্যক্তিগত উৎপাদনই যে কেবল বন্ধ হচ্ছে তাই নয়, পরিকল্পনার অভাবেরও অবসান ঘটছে" তাঁর এই কথাগুলির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে লেনিন লিখেছেন: "পুঁজিবাদের আধুনিকতম পর্যায় বা সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে তত্ত্বগত মূল্যায়নের একেবারে অন্তঃসারটুকু তাঁর লেখায় আমরা পাচ্ছি। আর তা হলো, এই পর্যায়ে পুঁজিবাদ **একচেটিয়া পুঁজিবাদে** পরিণত হয়"। লেনিনের মতে, অর্থনৈতিক সমস্যাবলী সম্পর্কে এঙ্গেলসের এই "অত্যন্ত মূল্যবান উক্তি" "কতখানি মনোযোগ ও ভাবনা নিয়ে আধুনিক পুঁজিবাদের নানা পরিবর্তনকে যে তিনি লক্ষ করেছিলেন এবং এ-কারণে এই বর্তমান, সাম্রাজ্যবাদী যুগে আমাদের করণীয় কি আগে থেকে তাও কিছু পরিমাণে নির্দেশ করতে যে সক্ষম হয়েছিলেন" তার প্রমাণ।

পুঁজিবাদী ব্যবস্থার পরবর্তী বিকাশ, পুঁজিবাদের নতুন নতুন রীতিপদ্ধতি, একচেটিয়া পুঁজি ও বুর্জোয়া রাষ্ট্র কর্তৃক বহুতর উৎপাদনের উপায়ের সামাজিকীকরণ এবং সর্বপ্রকার পুঁজিবাদী দমনপীড়নের ও প্রতিক্রিয়ার প্রচণ্ডতাবৃদ্ধিকে এঙ্গেলস সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রস্তুতির, সমাজতন্ত্রের বস্তুগত সূচনা সৃষ্টির বিষয়মুখ ভিত্তি বলে গণ্য করেছিলেন।

'ক্যাপিটাল'-এর দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ডের সম্পাদনা-সম্পর্কিত কাজ এঙ্গেলসকে একজন বিরাট অর্থনীতিবিদ, দ্বান্দ্বিক তত্ত্ববিদ ও শ্রেষ্ঠ বিপ্লবী হিসেবে প্রতিপন্ন করেছে এবং প্রমাণ করেছে যে মার্কসীয় রাজনীতি-সংক্রান্ত অর্থনীতি এমন একটি সদা-বিকাশমান বিজ্ঞান যার তাত্ত্বিক সূত্রগুলি বিষয়মুখ অর্থনৈতিক বাস্তবতার মর্মবস্তুর সর্বপ্রকার ধরন ও গতিশীলতাকে যথাযথভাবে প্রতিফলিত করতে সমর্থ।

লেনিন লিখেছেন, "...'ক্যাপিটাল'-এর দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড প্রকাশ করে এঙ্গেলস সেই মহৎ প্রতিভা, যিনি তাঁর বন্ধু ছিলেন, তাঁর এক মহিমময় স্মরণস্তম্ভ রচনা করলেন এবং সেই স্মরণস্তম্ভে নিজের অনিচ্ছাসত্ত্বেও স্বীয় নামটি চিরকালের মতো খোদাই করে রাখলেন"।

মায়ের মুখের পুণ্য

সিদ্ধেশ্বর সেন

শিলাইদহের কুঠি, পদ্মায়
বজরায়
ভেসে-চলা ছবি

গল্পগুচ্ছের গুণ
বাঙালির
স্বভাব-আঙিনায়
মানেনিক' ভেদ, সীমা ধুলোবালির, কিম্বা
কোনো ত্রুটি

তাই কি আগুন
হ'য়ে ফের, উনিশ শো পাঁচের, অম্লান
ভ্রূকুটি—ঘেরায় ঘূর্ণী

তোলে প্রাণ
জাতিসত্তা
ভাঙবার আয়োজন ভেঙে, ক'রে চূর্ণ,—সেদিনের
কুটিল কার্জনী

তখনই তো পথে পথে কলকাতায়
হাতে নিয়ে রাখী
স্বদেশাত্মা
হেঁটে যান আমাদের কবি

শতকের এইদিকে প্রতিধ্বনি
বাঁধভাঙা গর্জনই, আবার
ঢাকায়

জয়দেবপুরে গুলি, স্মৃতির সম্বলই নয়, শুধু, শহীদ
ফেব্রুয়ারি

রক্তঋণ
আবাঙলা শুধছে—
তবে এতোদিন

জাগরণে আজ তারই, রাঙারাখী
দু'হাতে পরাতে আসে
পলি-জমা, মজা, বুঝি হুগলীর
বানের উচ্ছাসে
একী রমনার আশা

বাঙলার জল-মাটি
পুণ্য

আমাদের সকলের মুখে মুখে খাঁটি, এই সবার গানের
সংহত-সচল

প্রাণ-পাওয়া, প্রাণ-দেওয়া
বাঙলাদেশ, অমোঘ, অশেষ
মায়ের মুখের পুণ্য—
ভাষা ॥

জলবন্দী

শিবশম্ভু পাল

ভেসে যাচ্ছে সাজানো বাগান
অন্ত্যজ কচুরিপানা, গৃহস্থালী, হতভম্ব মাছের সমাজ
ভেসে যাচ্ছে দেবালয়, অসহায় বিমর্ষ নমাজ
স্রোতে কিম্বা খরস্রোতে ভেসে যাচ্ছে বর্তমান, আহা, বর্তমান।

যেন রবাহূত, যেন অনাহূত ভবিতব্য বসে আছে ভিতর দুয়ারে
চিনেও চিনিনা, শুধু জানলার পর্দা কিনি, দেখেছি দুজন
নৃত্যনাট্যগীতিময় রবীন্দ্রসদন ;
প্লাবন তখনও সূচিভেদ্য অন্ধকারে

নিজেকে মিশিয়ে দিয়ে পড়ে থাকে প্রচ্ছন্ন মাটিতে
আমার আজন্ম সহচর,
বাসুকীর মতো শুধু মাঝেমধ্যে নড়ে ওঠে, ভেসে যায় সাজানো নগর
দৃশ্যমান বিপর্যয়ে আত্মপরিচয়টুকু দিতে…

ফেটে পড়ে অবহেলা বেপরোয়া অজয় নদীতে ॥

সঙ্গ নিঃসঙ্গতার দিনলিপি

পবিত্র মুখোপাধ্যায়

এ কোন জন্ম পেয়েছি
কোন জন্ম চেয়েছিলাম
কোন জন্ম
পেয়েছি তোমারই আনন্দে হে পিতা ! ক্ষণ মুহূর্তের ঐশ্বরিক যাদুকর
পতনশীল সত্তা এই দাহ্য সত্তা তোমারই মরণোত্তর সান্ত্বনা হতে পারে
হতে পারে স্রষ্টার নির্বিকল্প সাধনা
আর আমি বহন করে চলেছি তোমারই বৃষকাষ্ঠ মৃত্যুর আগেই এইভাবে

এইতো জন্ম পেয়েছি
বদ্ধ জলায় সন্তরণ মোহনা নেই যে নদীর যে নদী আদৌ নাব্য নয়
ভাসাই নৌকো তারই আবর্তে তারই অবিরল ঘূর্ণিতে এই আবর্তন
পরিণামহীন এই আবর্তন

জন্ম চেয়েছিলাম চৈতন্যে প্রতিফলিত সূর্য অনেকান্ত প্রয়াস ও প্রজননক্ষম
জ্ঞানময় পুরুষ নিখিলে মেলে দেবে প্রজ্ঞাখচিত চন্দ্রাতপ এক দিগবিজয়ী
সংবেদন আত্মায় প্রোথিত এক বৃক্ষ অনন্তমূল নিরন্তর আত্মদানে
নির্ভার এক মহান বোধিবৃক্ষ
চেয়েছিলাম শব্দ ফিরে পাক চাবি সেই যাদুকরী চাবি যা হারিয়েছে
দীর্ঘ ইতিহাসে অন্ধকার নির্বাক প্রার্থনায় খুলে দেবে ত্রাতা এক নিহিত
বোধ নিহিত দুঃখ স্বচ্ছ একটি ত্রিকোণকাচ প্রতিফলিত হয় সেখানে
বহুকৌণিক পরিচয় আত্মপ্রতিকৃতির সঠিক ও সম্ভাব্য পরিচয়

ফুলের রং আরো উষ্ণবেদনায় গাঢ় হয়ে উঠবে চরিতার্থ জীবন যেন পরিচয়ের
আনন্দে আরো গাঢ় স্পন্দিত কোনো উৎসব যেন
আর আকাশ
ক্রমশ নীল রক্ত ঝরে যাওয়া মুমূর্ষু আকাশ
স্বপ্ন আর সান্ত্বনা ফিরিয়ে দিতে নীল হয়ে ছড়িয়ে পড়বে আকাশে
আরো নীলরক্ত স্পন্দিত হবে অনবয়ব শরীরে
পতন আরো পতনশীল দাহ্য আত্মাগুলি আরো স্বপ্ন আর সান্ত্বনার জন্যে
প্রিয়তম শরীর মেলে দেবে স্বর্ণখচিত পাত্র যেন

সময় থেকে মহাসময়ের দিকে চলমান এই মানুষ এই খণ্ড শীর্ণ মানুষ এই আমি
কেন জন্ম চেয়েছিল জানার আগেই
কোন জন্ম পেয়েছে জানার আগেই
চলে যায় প্রত্নপৃথিবীর দিকে নিমজ্জমান শিশুর মতোই নিষ্ফল আশ্রয় খুঁজে
মানুষে ঈশ্বরে

পেয়েছি এই দেহ প্রাণবহনযোগ্য অক্ষম এই দেহ তোমারই দানে
হে পিতৃত্বলোভি সকরুণ অহংকার।
অনিচ্ছুক ভারবাহক এই স্পন্দমান দেহ
বহন করছে অস্তিত্ব এক পাথর এক প্রত্নশিলালেখ

যার কোনো অর্থ না জেনেই সাড়া দিতে হয় বহন করতে হয় আমরণ
পার নেই জেনেও বৈঠা ফেলা
সার নেই জেনেও বীজ ছড়িয়ে যাওয়া
কোন অলক্ষ্য প্রভুর কুটিল ইঙ্গিতে এই প্রাণধারণ এই প্রাণবহন

নিজের জন্য কিছু নয়
শুধু তারই জন্যে!
শুধু তারই জন্যে!

তিনটি কবিতা

গৌরাঙ্গ ভৌমিক

তুমি আসছ বহুদূর থেকে,
তুমি আসছ, আসবেই জানতাম।
কতদিন পথ চেয়ে আছি, রোদে জলে পুবালি হাওয়ায়।
আমি তো পারিনি আজো যুদ্ধে জয়ী হতে।
আমাকে তোমার সঙ্গে নাও।

২

এখন সময় জানো ? কত রাত ?
সময়েরও অতিরিক্ত নক্ষত্র প্রহরে
কেবল তরঙ্গ গুণছি, ঢেউয়ে ঢেউয়ে অন্তহীন রাত্রির সময়।
তবু তুমি হেসে ওঠ স্রোতের গভীরে।
আমি তীরে রেখে যাই আত্মপরিচয়।

৩

জানি ভোরে কেউ আসবে,
ফসলের শিস দেখতে নদীর কিনারে।
নরম আলোয় কেউ শিখে নেবে বিশ্বাসের পাঠ।
আমি শুধু রেখে গেছি, ভালোবাসা রেখে যাবো
ভোরের শিশিরে।
তবু দরজা বন্ধ দেখলে, খুলে দিও সমস্ত কপাট।

নতজানু প্রার্থনায় শব্দময়

বঙ্কিম মাহাত

আর কোনো আক্রোশ কি অভিমান নয়
উত্তর তিরিশ কাল বড়ো দুঃসময়
কবিতার জন্য অতঃপর
শালীন শব্দের মতো বাজুক নিজের কণ্ঠস্বর

দর্পণে বিম্বিত হোক নিজের পুরনো মুখ নয়
বরং শব্দের মালা শব্দে শব্দে চিত্র শব্দময়
কবিতা আক্রোশে নয় অভিমানে নয়
কান্নায় বা হতাশায় নয়,
কবিতা বাঙ্ময় হয় ক্ষমায়, সুন্দর হয় ক্ষমা প্রার্থনায়
বাঙ্ময় সুন্দর হয় নতজানু নম্র প্রতিমায়।

রক্তে কবিতার রঙ মিশে গেছে কবে
চেতনায় ঢেউ ওঠে কবিতার তুমুল উৎসবে
প্রেম ভালোবাসা সব কবিতায় গাঁথা
জীবন কবিতা কিংবা কবিতা জীবন
যেন সবুজে বনস্থলী পাতা
তাহলে আক্রোশ নয় অভিমান কান্না কিংবা হতাশাও নয়
নতজানু প্রার্থনায় শব্দে চিত্রে কবিতায়
এসো হই কবিতা ও চিত্র শব্দময়॥

পরস্পরের কাছে আমরা

দুলাল ঘোষ

প্রত্যেকের অস্তিত্বে কিছুনা কিছু বিষাক্ত রক্ত
দুঃখ ও সুখের ভাঙা দোলনা ব্রীজ
পাকাপোক্ত কিছু একটা বিকল্প করতে গেলেই
অসম্ভব কাঙাল হয়ে পড়ে…

প্রত্যেকের চেতনায় ছোট না হয় বড়, যে কোন
হিলহিলে সরীসৃপ
মন ভোমরার সন্ধান দিয়ে
হতভম্ব পৃথিবীর মুখ, বাঁয়ে আরো বাঁয়ে ঘোরালেই
ভয়ঙ্কর প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওঠে…

অর্থাৎ শহরতলি কিংবা দূরপাল্লার একান্ত নির্ভরশীল
সমস্ত সহযাত্রী
আমরা পরস্পরের কাছে ভীষণ কুৎসিত—।

জনৈক সৈনিকের প্রতি

অনন্ত রায়

তোমার স্বপ্নালু ঐ হৃদয়ের
ব্রাউন রঙের পেলমেট থেকে
রক্তাভ পর্দাটা খুলে নিয়ে
বেঁধে নাও তোমার লোহার হেলমেটে
হে সৈনিক!
তারপর আকণ্ঠ প্রচণ্ড এই জীবনের
বিষ বুকে নিয়ে
নীলকণ্ঠ হয়ে
ছড়াও অমৃত এই পৃথিবীর
প্রতি ঘরে ঘরে।

তোমরা যেখান থেকে

বীতশোক ভট্টাচার্য

ছেঁড়া-কাগজের ঝুড়ি একদিকে—'তুমিও রক্ষণশীল দলে আছো,'—
ব'লে দ্রুতপদে পথে নেমে যেতে হয়; 'আর, বন্ধু, তুমিও···
বলতে গেলে পথ পেরিয়ে চলে যায় ধার্মিক কুকুর!
ও বুঝি একান্ত যাবে তোমাদের খেলার প্রান্তরে?
ও ঝুড়ি কী শেষ অবধি হয়ে যাবে তোমাদের কমলাবাগানে?
তোমরা যেখান থেকে কোলে-পিঠে শিশু নিয়ে আসো?
ধারণার মধ্যে আছে ডিম ও উলের বল, ও পাপ, ও খেলাচ্ছল,
তোমরা এমন পথে পা দিয়ো না—মাতার ভিতরে বহু মাতাহারি আছে
'তুমিও, তুমিও' ব'লে তাদের নাছোড় গান ছুটে যায় পথ থেকে পথে।

ভূমিরাজস্ব বিষয়ে কিছু চিন্তা

হরশঙ্কর ভট্টাচার্য

১৯৬৭ সালের শুরু থেকে ভারতের কয়েকটি রাজ্যসরকার ভূমিরাজস্ব সম্পূর্ণ বা আংশিক পরিমাণে তুলে দিয়েছেন। কয়েকটি রাজ্যসরকার এ-বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তা করছেন। পশ্চিমবাঙলায় প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকার তার কর্মসূচীতে এ-বিষয়ে লিখেছিলেন: "৫। (খ) তিন একর পর্যন্ত জমির মালিকদের ভূমিরাজস্ব তুলে দেওয়া"। ঐ সময় কংগ্রেস বা অপর কোনো দল কোনো কর্মসূচি দেয়নি, তাই তাদের কথা এ-ধরণের ঘোষিত কর্মসূচির বাইরে অপ্রকাশ্য রয়ে গেছে।

একদিকে রাজনৈতিক দলগুলি এ-বিষয়ে কর্মসূচি গ্রহণ করছেন, অপরদিকে ভারতের অর্থনীতিবিদগণ, পরিকল্পনা রচয়িতাগণ সবাই একযোগে কৃষিক্ষেত্র থেকে আরও বেশি টাকা তোলার প্রয়োজনীয়তা ও সম্ভাবনার উপর জোর দিয়ে চলেছেন। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা রচনার সময়ে পরিকল্পনা কমিশনের দূর-প্রসার বিভাগ (Perspective Division of the Planning Commission) দুটি গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ করেছিলেন: একটি হলো, ভূমি-রাজস্বের উপর অতিরিক্ত আদায় বা সারচার্জ এবং তা ক্রমবর্ধমান হারে (progressive rate) আরোপ করা, ও দ্বিতীয়টি হলো বাণিজ্যিক শস্য (চা, পাট, তুলা, ইক্ষু প্রভৃতি) উৎপাদনের অঞ্চলের ভূমিরাজস্বের উপর অতিরিক্ত আদায় (surcharge)। অনেকে আবার বর্তমানের ভূমিরাজস্ব তুলে দিয়ে তার বদলে ক্রমবর্ধমান হারে কৃষি আয়কর প্রবর্তনের কথাও বলেছেন। পরিকল্পনা কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান গ্যাড্‌গিল কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার কাছে, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের নিয়ে গঠিত জাতীয় উন্নয়ন কাউনসিলের সামনে কৃষিক্ষেত্র থেকে টাকা তোলার জন্য আবেদন করে বিফল হয়েছেন। মনে হচ্ছে (দক্ষিণ বাম উভয় প্রকার) রাজনীতিবিদদের চিন্তার সঙ্গে অর্থনীতিবিদদের চিন্তার কোনো একটা সমতলতা পাওয়া যাচ্ছে না, যেন একটা সমান্তরালিতা দেখা দিচ্ছে। তাই বিষয়টি মোটামুটি স্বচ্ছভাবে সাধারণ ভাষায় আলোচনা করে কোনো সমাধানে পৌঁছান যায় কিনা সে চেষ্টা করা দরকার।

১

আমাদের কারও কারও মনে এ রকম ভুল ধারণা থাকতে পারে যে ভূমি রাজস্বকেই খাজনা বলে। আসলে তা নয়, এ-দুটো পৃথক বিষয়, পৃথক লেন দেন। রাষ্ট্রশক্তি বা সরকার জমির মালিকদের কাছ থেকে বাৎসরিক যে আদায় করেন তারই নাম ভূমিরাজস্ব বা Land Revenue, আর জমির মালিক তার প্রজার কাছ থেকে বৎসরে বা প্রতিবারের উৎপাদন পিছু নগদে বা ফসলে যে আয় আদায় করে তার নাম খাজনা বা Rent; খাজনা আদায় করে জমির মালিক তা থেকে ভূমিরাজস্ব মেটায়। কোনো ক্ষেতমজুর খাজনা দেয় না, মজুরির বিনিময়ে চাষ করে। ভাগচাষী বা আধিয়ার যে ভাগ দেয় তাকে খাজনা বলা চলে। নিজের মালিকানার জমি যে নিজে হাতেই চাষ করে সে খাজনা পায় না, তার আয়ের মধ্যে সেই অংশ থেকেই যায়, সে সরকারকে যা দেয় তা হলো ভূমিরাজস্ব।

মোট কথা রাজ্যসরকারগুলি যা পায় তা হলো ভূমিরাজস্ব, খাজনা নয়। রাষ্ট্রশক্তিকে রাজস্ব দেওয়ার এই প্রথা সবচেয়ে প্রাচীন, চাষীর উদ্বৃত্ত যুগ যুগ ধরে পেয়েছে বলেই রাজার শক্তিসামর্থ্য ঐশ্বর্য ও জাঁকজমক সম্ভব হয়েছে। প্রাচীন কাল থেকে আমাদের দেশে ভূমিরাজস্বের বিবর্তনের কাহিনী পরে হবে। বর্তমানের কথা আগে হোক।

আমাদের সংবিধানে ভূমির উপর কর আরোপ করা ও আদায় করার ভার রাজ্যসরকারগুলির উপর এবং এ-থেকে কোনো ভাগ কেন্দ্রীয় সরকারকে দিতে হয় না। ভূমিরাজস্ব কতটা আরোপ করা হবে তার কোনো নির্দিষ্ট ভিত্তি (base) ভারতের সকল রাজ্যসরকারের ক্ষেত্রে দেখা যায়নি। কোথাও কোথাও সম্পত্তির মোট মূল্যের উপর, আবার কোথাও বা খরচ খরচা বাদ দিয়ে নীট উৎপাদনের মূল্যের উপর। আবার অনেক রাজ্যে কর আরোপকারী অফিসারের বিচারবুদ্ধির উপরই বিষয়টি ছেড়ে দেওয়া আছে।

এখন, এমন একটা সময় ছিল যখন (চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত এলাকায় নয়) এই ভূমিরাজস্ব কয়েক বৎসর অন্তর অন্তর বদলানো হতো। জমি বা সম্পত্তির গুরুত্বে পরিবর্তন বা নীট উৎপন্নের মূল্যে পরিবর্তন মোটামুটি ধরে নিয়ে ভূমি-রাজস্বও পরিবর্তিত হয়েছে। কিন্তু সাম্প্রতিক কালের ইতিহাসে ভূমিরাজস্ব দীর্ঘদিন যাবত অপরিবর্তিত, ফলে সম্পত্তির বা নীট উৎপন্নের মূল্যে পরিবর্তনের সঙ্গে আর তার কোনো যোগাযোগ নেই, এটা এখন নিছক জমির পরিমাণের

উপর অর্থাৎ আয়তনভিত্তিক একটা মোটামুটি আদায়ে পরিণত হয়েছে। ১৯৫১-৫২ সালে সকল রাজ্যসরকারের মিলিতভাবে ভূমিরাজস্ব আদায়ের পরিমাণ ছিল ৫২ কোটি টাকা, ১৯৫৮-৫৯ সালে হলো ৯৬ কোটি টাকা, ১৯৬৭-৬৮ সালে হলো ৯৯.২ কোটি টাকা, ১৯৬৮-৬৯ সালের প্রস্তাবিত বাজেটগুলি যোগ করে ধরা হয়েছে ১০৮.৭ কোটি টাকা। ভূমিরাজস্বের হার সমান রইল, ভূমির পরিমাণও বাড়েনি, তাহলে এই উৎস থেকে আদায়ের পরিমাণ বাড়ল কি করে? এর কারণ হচ্ছে পুরনো মধ্যস্বত্বভোগীদের অধিকারগুলির কিছুটা পরিমাণ রাজ্যসরকারগুলির হাতে এসেছে। ভূমিরাজস্বের পরিমাণ ধীরে ধীরে বাড়লেও রাজ্যসরকারগুলির মোট আয়ের অনুপাত হিসাবে এর গুরুত্ব ক্রমাগত কমে এসেছে। অন্যান্য উৎস থেকে রাজ্যগুলির আয় বেড়ে যাওয়ার ফলেই এ-রকম ঘটেছে। নিচের তালিকা থেকে এই ব্যাপারটা বোঝা যাবে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের বুলেটিনগুলি থেকে তালিকাটি তৈরি করা হয়েছে।

রাজ্যের আয়ের মধ্যে ভূমিরাজস্বের অনুপাত

বৎসর	ভূমিরাজস্ব (কোটি টাকার হিসাবে)	মোট আয়ের অনুপাত
১৯৫১-৫২	৪৮	১২·১
১৯৬০-৬১	৯৭	৯·৬
১৯৬৬-৬৭	৯০	৪·২
১৯৬৭-৬৮	৯৯	৪·০
১৯৬৮-৬৯ (প্রস্তাবিত)	১০৯	৪·২

২

১৯৬৭ সালের সাধারণ নির্বাচনের শুরু থেকেই, প্রধানত প্রতিটি রাজ্য-কংগ্রেস কমিটির উৎসাহে এই প্রচার শুরু হয় যে ভূমিরাজস্ব তুলে দেওয়া হোক। তারই সঙ্গে সুর মিলিয়ে কোনো কোনো বামপন্থী প্রার্থী এবং দলও এই প্রচার শুরু করেন। ১৯৬৬ সালের অক্টোবর মাসে প্রথমে মাদ্রাজ সরকার ভূমিরাজস্ব বিলোপের কথা ঘোষণা করেন। যুক্তি হিসাবে তাঁরা দেখান যে এ-থেকে আয় ৬ কোটি টাকা, কিন্তু আদায়ের খরচা ৩ কোটি টাকা। ভূমিরাজস্বের উপর ২৫ শতাংশ সারচার্জ তাঁরা ইতিমধ্যেই তুলে দিয়েছেন। কয়েকটি রাজ্য আংশিকভাবে হলেও, এর অনুসরণ করেছে, যেমন উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, মহীশূর।

পুরনো পাঞ্জাবের আইনসভার কংগ্রেসী সদস্যগণ পাঞ্জাব, হরিয়ানা ও হিমাচল প্রদেশের নূতন রাজ্যসরকারগুলিকে অনুরোধ জানিয়ে প্রস্তাব গ্রহণ করেন, যেন তাঁরা ভূমিরাজস্ব তুলে দেন। মধ্যপ্রদেশ সরকার ১৯৬৭ সালের ১৫ই জানুয়ারি থেকে সাড়ে সাত একরের কম জোতের বা পাঁচ টাকার কম আদায় বিলোপ করে দিয়েছেন। রাজ্যের আর্থিক ক্ষতি হিসেব করা হয়েছে সাড়ে তিন কোটি টাকা। ১৯৬৭ সালের অক্টোবরে উত্তর প্রদেশ যুক্তফ্রন্ট সরকারের সঙ্কটের কথা স্মরণ করলে দেখা যায় যে এস্. এস্ পি-র পাঁচজন মন্ত্রী পদত্যাগ করলেন কারণ সওয়া ছয় একর পর্যন্ত জোতের ভূমিরাজস্বের অর্ধেক ছাড় দিতে মুখ্যমন্ত্রী প্রস্তুত নন।

রাজনীতিবিদ্‌দের যুক্তি কি তা সুস্পষ্টভাবে বোঝার উপায় নেই। তবে মনে হয় তাঁদের যুক্তিগুলি হলো: ১। রাজ্যসরকারগুলির আয়ের খুব কম অংশ আসে ভূমিরাজস্ব থেকে, ২। আদায়ের খরচা খুব বেশি, আয়ের প্রায় অর্ধেক, ৩। চাষীর উপর করভার লাঘব করা উচিত।

প্রথম বক্তব্যটি বিচার করা যাক। ১৯৫৩-৫৪ সালে কর অনুসন্ধানী কমিশন বলেছিলেন যে ভূমিরাজস্বের কোনো বিকল্প, যোগ্য উৎস নেই, "no real substitute." উন্নয়নমূলক কার্যের চাপ ক্রমশ বাড়ছে, রাজ্য সরকারগুলির বাজেটে টাকার দরকার সর্বদা বেড়ে চলেছে। প্রথম পরিকল্পনার সময়ে ভূমি-রাজস্ব দিয়েছে ৩২৭ কোটি টাকা। তৃতীয় পরিকল্পনা কালে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫৯৫ কোটি টাকা।

চতুর্থ পরিকল্পনাকালে এই উৎস থেকে আরও অতিরিক্ত ৫০ কোটি টাকা (অর্থাৎ মোট ৬০৯ কোটি টাকা) তোলার কথাই কমিশন বলেছেন, উৎসমুখ বন্ধ করে দিতে বলেননি। কমিশনের ভাষায় বলতে গেলে "In the last year or so, some states have imposed additional agricultural taxation by way of surcharges on land revenue higher irrigation charges, surcharges on commercial crops and so forth. Taking all these types of measures together, it is imperative to add to the effort which has been initiated in a modest way, either through revisions in land revenue rates or through adjustment in irrigation charges or by levy of special surcharges on commercial crops, substantial

resources can be mobilized in the remaining years of the plan."

কর থেকে পাওয়া রাজস্বের কত অংশ ভূমিরাজস্ব থেকে আসে? এদের অনুপাত কি? কেরালাতে ৬ শতাংশ, আসাম অন্ধ্রপ্রদেশ ও জম্মু কাশ্মীরে ২০ শতাংশ, উত্তরপ্রদেশে ৩০শতাংশ এবং রাজস্থানে ৩১ শতাংশ। কর রাজস্বের এত বৃহৎ অংশ কোন রাজ্যসরকারের পক্ষেই কমতে দেওয়া চলে না। বিশেষত তাঁরা যখন প্রতিবৎসরই কেন্দ্রীয় সাহায্যের উপর ক্রমশ নির্ভরশীল হয়ে উঠছেন, ১৯৫১ সালের ৩১শে মার্চে কেন্দ্রীয় সাহায্যের পরিমাণ ছিল ১৯১ কোটি টাকা, আর ১৯৬৬ সালে বর্তমানে ৩২০০ কোটি টাকার কাছাকাছি। এই পরনির্ভরশীলতার পরিপ্রেক্ষিতে কোন রাজ্যের নেতাদেরই ভূমিরাজস্ব তুলে দেওয়ার কথা চিন্তা করা চলে না।

আদায়ের খরচ যদি বেশি হয়, তবে তা কমাবার বাস্তব পদ্ধতি খুঁজে বার করা দরকার। প্রশাসনিক যোগ্যতা বাড়ান, আদায়ের পদ্ধতিতে নূতনত্ব এনে ব্যয়সংক্ষেপ করা যায় কিনা তার পরীক্ষা-নিরীক্ষা করাই বাস্তব বুদ্ধি সম্মত। সরকারী কর্মচারীদের মাধ্যমে তোলা যদি ব্যয়বহুল হয় তবে পঞ্চায়েতী সংগঠনের মাধ্যমে বা (যেখানে আছে) সমবায় সমিতির হাতে আদায়ের ভার দিয়ে কিছু অংশ কমিশন হিসাবে দেওয়াও চলে। তাদের অভাব কিছুটা মেটে আদায়ের পরিমাণও বাড়ে, বকেয়া পড়ে না, এবং খরচা কমে। এসব চেষ্টা না করে এই উৎসটি তুলে দেওয়া কোন দিক থেকে যুক্তিযুক্ত তা বোঝা যাচ্ছে না।

৩

তৃতীয় যুক্তিটিই সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় ও আবেগসঞ্চারক, তাই অর্থনীতিবিদ্‌দের কাছে সর্বাধিক বিচারযোগ্য। যুক্তিটি হলো চাষীর উপর করভার কমান উচিত। এবিষয়ে অর্থনীতির শিক্ষা কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ। সেই শিক্ষা অনুযায়ী প্রথমত ভূমিরাজস্বের করভার খুবই কম, নেই বললেই হয়। আর দ্বিতীয়ত, তুলনামূলকভাবে চাষীর উপর এত কম যে সামাজিক ন্যায়বিচারের নীতি অনুসারে অন্যান্য শ্রেণীর উপরই বিষম অবিচার করা হচ্ছে, এই বৈষম্য দূর করার জন্য চাষীর উপর করভার বাড়ান দরকার।

করভার নেই কেন? অর্থনীতির সোজা উত্তর—করের মূলধনীকরণ

(Capitalisation of taxes) হয়ে গেছে। কোনো ব্যক্তি কোনো স্থায়ী সম্পত্তি কেনার সময়ে লক্ষ্য রাখে যে এই সম্পত্তি থেকে আয়ের উপর কোনো ধরণের কর আরোপিত রয়েছে কিনা, এরকম কোনো কর থাকলে ওই সম্পত্তি থেকে নীট আয় কমে যায় ফলে নূতন ক্রেতারা (অর্থাৎ কর আরোপের পরে যারা কিনছে) এই সম্পত্তির জন্য কম দাম দেয়। একেই বলে করের মূলধনীকরণ। করের পরিমাণকে প্রচলিত সুদের হারে মূলধনে রূপান্তরিত করে সে হিসাব অনুযায়ী ক্রেতারা সম্পত্তির জন্য কম দাম দিতে প্রস্তুত হয়। একটা উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি সহজে বোঝানো যাবে। মনে করুন, একখণ্ড জমি থেকে বছরে ১০০টাকা আয় হয়। বাজারে চল্‌তি সুদের হার হল ৫ শতাংশ। এ-অবস্থায় ওই জমিটির দাম হবে ২০০০ টাকা। এখন ধরে নিন, জমির আয়ের উপর ১০ শতাংশ হারে ভূমিরাজস্ব আরোপিত হলো। এই রাজস্ব মেটাবার পরে ঐ জমি থেকে নীট আয় হল ৯০টাকা। বাজারে ৫ শতাংশ সুদের হার অনুযায়ী এই ৯০ টাকাকে মূলধনে পরিণত করলে দেখা যায় যে জমিখণ্ডের বর্তমান দাম হবে ১৮০০ টাকা। জমির ভবিষ্যৎ ক্রেতারা জানে যে ঐ আয়ের উপর ভূমিরাজস্ব আরোপিত আছে। তারা তাই এই করকে মূলধনে রূপান্তরিত করে, কম দামে জমিটি কিনবে, এভাবে ভবিষ্যতে চিরকালের জন্য করভার এড়িয়ে যাবে। জমির মালিক ১০ টাকা ভূমিরাজস্ব দেবে ঠিকই কিন্তু সে যে ২০০ টাকা কম দিয়েছে সেই ২০০ টাকার মূলধন থেকেই ৫ শতাংশ সুদের হারে তার ১০ টাকা আয় হবে। অর্থাৎ কমদামের মাধ্যমে সে করভার এড়াতে পেরেছে। অর্থনীতির ভাষায় তাই বলে যে পুরনো করের কোনো ভার নেই, "an old tax is no tax."

ভূমিরাজস্বের আসল ভার নেই বললেই চলে তার আরও একটি কারণ হলো একদিকে যেমন প্রবল মুদ্রাস্ফীতি অপরদিকে তেমনি ঐ রাজস্বের অপরিবর্তনীয়তা। টাকার আভ্যন্তরীণ মূল্য কমে যাওয়ায় এবং টাকার অঙ্কে ভূমিরাজস্ব সমান থাকার ফলে স্বভাবতই ওর আসল ভার প্রায় শূন্যে এসে দাঁড়িয়েছে, যদিও রাজ্যসরকারের তহবিলে ওর প্রয়োজন মোটেই কমেনি। আরও একটা কথা। একর প্রতি উৎপাদন অনেকটা বেড়ে গিয়েছে; সেচ নূতন ধরনের বীজ ব্যবহার—প্রভৃতির ফলেই একর প্রতি উৎপাদন বেড়েছে। তার পাশাপাশি একর প্রতি ভূমিরাজস্ব সমান থাকায় উৎপন্ন ফসলের পরিমাণের সঙ্গে ভূমিরাজস্বের অনুপাতও স্বভাবতই কমে গিয়েছে। ফলে এর প্রকৃত ভার

অনেকটাই কমে গিয়েছে।

এখন আসা যাক অর্থনীতিবিদ্‌দের দ্বিতীয় বক্তব্যে: তাঁদের কথা হলো চাষীর উপর করভার অন্যান্য শ্রেণীর তুলনাতে অনেক কম। কর দু-রকমের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ। জিনিসপত্র কিনলে বা আমোদপ্রমোদে খরচা করলে পরোক্ষভাবে সকলকেই কর দিতে হয়, চাষীর ছেলে তুলনামূলকভাবে বেশি সিনেমা দেখে তা নয়। বরং বিদেশ থেকে আমদানি করা জিনিসপত্র বা দেশে যাদের উপর উৎপাদনশুল্ক বেশি এ-ধরনের দ্রব্যসামগ্রী শহরের লোকেরাই তুলনামূলকভাবে বেশি ব্যবহার করে। পরোক্ষ কর বাদ দিলে থাকে দুটি প্রধান প্রত্যক্ষ কর ভূমিরাজস্ব ও কৃষি আয়কর।

ভূমিরাজস্ব পূর্বে আলোচিত হয়েছে। কৃষি আয়করের অবস্থা কি? অন্যান্য প্রত্যক্ষ করগুলি চাষীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হলেও (যেমন ব্যয়কর, উপহার কর, সম্পত্তি কর, সম্পদ কর প্রভৃতি) তাদের উপর কোনো চাপই দিতে পারে না। কারণ— ১। ভারতে এখনও এদের গুরুত্ব কম, ২। যে নিম্নতম সীমার ঊর্ধ্বে কর শুরু হয় সেই সীমা এমন উঁচুতে যে কৃষি জমির মালিকেরা করের আওতায় আসেন না, এবং ৩। এই কর আইনগুলিতে এদের ক্ষেত্রে বিশেষ ছাড়ের ব্যবস্থা রয়েছে।

কৃষি আয়কর আরোপ, আদায় ও ব্যয় সবই করবে রাজ্য সরকার— সংবিধানে এরকম লেখা আছে। বিহার প্রথমে এই কর শুরু করে ১৯৩৮ সালে। বর্তমানে যে যে রাজ্যে কৃষি আয়কর রয়েছে তারা হলো আসাম, পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, উড়িষ্যা, মহীশূর, মাদ্রাজ ও কেরল। সাধারণ আয়করের তুলনায় এর হার অনেক কম। ভারতে চিরকালই এই করের ভূমিকা ছিল নগণ্য। নিচের তালিকার দিকে তাকালেই তা বোঝা যাবে।

বৎসর	আদায়ের পরিমাণ কোটি টাকার হিসাবে	রাজ্যসরকারের আয়ের মধ্যে কতটুকু অংশ
১৯৫১—৫২	৪'৩	১'১
১৯৬০—৬১	৯'৫	১'০
১৯৬৬—৬৭	১১'০	০'৫
১৯৬৭—৬৮	১০'৬	০'৪
১৯৬৮—৬৯ প্রস্তাবিত	১১'৩	০'৪

এই তালিকা থেকেই বোঝা যাবে যে কৃষি আয়কর এমন কিছু ভারবহুল হয়ে উঠছে না।

৪

ভারতে কৃষিকরের ভার কতটা তা নিয়ে খুঁটিয়ে আলোচনা করা যাক। কৃষিকরের স্থূল ও নীট ভার উভয়ই দেখাবার চেষ্টা করা চলে। হিসেব করে দেখা গিয়েছে যে ১৯৫৮-৫৯ সালে কৃষিকরের মাথাপিছু স্থূল ভার ছিল ১৪.৫২ টাকা। এই টাকা ছিল কৃষিক্ষেত্রের মাথাপিছু আয়ের শতকরা ৬.৮ ভাগ। অপরপক্ষে, অকৃষিক্ষেত্রে মাথাপিছু স্থূল ভার ছিল ওই বছরে ৪৬ টাকা বা মাথাপিছু আয়ের শতকরা ৯.২ ভাগ। পৃথকভাবে প্রতিটি করের করভার আলোচনা করে আমরা দেখাতে পারি যে মোটের হিসাবে, তুলনামূলক হিসাবে এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনের হিসাবে এই তিনদিক থেকেই ভারতের কৃষিক্ষেত্রের উপর করভার অনেক কম। কৃষিকরগুলির করপাত (incidence) ও করভার (burden) নিয়ে অনেক সুস্পষ্ট আলোচনা করা সম্ভব। নিচের তালিকাটিতে কৃষি ও অকৃষি ক্ষেত্রে মোট করপাতে পার্থক্য দেখান হয়েছে।

বৎসর	কৃষিক্ষেত্র	অকৃষিক্ষেত্র
১৯৫১-৫২	২০০	৪৫১
১৯৬০-৬১	৩৯৯	৯২২
১৯৬২-৬৩	৬১৯	১৭৫০

কৃষির উপর করভার কম বা বেশি এবং বাড়ছে বা কমছে কি না তা আরও ভালোভাবে বোঝা যায় যদি চলতি বাজেটের ব্যয় বরাদ্দ এবং মূলধনী ব্যয়বরাদ্দের করপাত পরস্পর তুলনা করা হয় (by comparing the incidence of current budget expenditure and capital expenditure)।

নিচের তালিকাটি থেকে বিষয়টি (কোটি টাকার হিসাবে) স্পষ্ট হবে।

	কৃষিক্ষেত্র		অকৃষিক্ষেত্র	
বৎসর	এই ক্ষেত্র থেকে আদায়	এই ক্ষেত্রের জন্য সরকারী ব্যয়	এই ক্ষেত্র থেকে আদায়	এই ক্ষেত্রের জন্য সরকারী ব্যয়
১৯৫১-৫২	২০০	৩২৫	৪৫০	৩২৫
১৯৬০-৬১	৩৯৯	৭২১	৯২২	৬০২
১৯৬২-৬৩	৫০২	৮২১	১৩২৬	৬৮৯

অর্থাৎ, ১৯৫০-৫১ সালে কৃষিক্ষেত্র থেকে কেন্দ্র ও রাজ্যসরকারের তহবিলে আদায় হয়েছে ২০০ কোটি টাকা। এইটে হচ্ছে কৃষিক্ষেত্রের স্থূল করভার (gross burden of taxation)। কিন্তু ওই একই বছরে, কৃষিক্ষেত্র সরকারী ব্যয়ের মাধ্যমে পাচ্ছিল ৩২৫ কোটি টাকা। কিছুদিন পরের হিসেব দেখুন। ১৯৬০-৬১ সালে কৃষিক্ষেত্র দিচ্ছিল ৩৯৯ কোটি টাকা, কিন্তু পাচ্ছিল ৭২১ কোটি টাকা। ১৯৬২-৬৩ সালের হিসেব দেখুন, কৃষিক্ষেত্র দিচ্ছে ৫০২ কোটি টাকা, কিন্তু নিচ্ছে ৮২১ কোটি টাকা। অর্থাৎ অন্যান্য উৎস থেকে আয় করা টাকা কৃষিক্ষেত্রে পৌঁছিয়েছে। অপরদিকে অকৃষিগত ক্ষেত্র সরকারী ভাণ্ডারে যা দিয়েছে যার তুলনায় নিয়েছে অনেক কম।

উপরের এই তালিকাতে মূলধনী বাজেটকে (Capital budget) ধরা হয়নি। তাতে আরও মজার ব্যাপার দেখা যায়। ১৯৬২-৬৩ সালে সরকারের মূলধনী বাজেটে কৃষিক্ষেত্র দেয় ৭৫ কোটি টাকা (স্বল্প সঞ্চয়, প্রভিডেণ্ড ফাণ্ড জমা, খোলাবাজারে ঋণদান প্রভৃতি ধরনে) কিন্তু ঐ বছরেই কৃষি উন্নয়ন, সমষ্টি উন্নয়ন, জলসেচ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতির জন্য সরকার খরচ করে ২৫০ কোটি টাকা। অর্থাৎ ওইবছর নীট বহির্গমন (net outflow) হলো ১৭৫ কোটি টাকার। ১৯৬২-৬৩ সালের এই হিসাব প্রতিটি বছরের ক্ষেত্রেই সত্য। তাহলে আমরা নিশ্চয় এই সিদ্ধান্তে আসব যে কৃষিক্ষেত্রে করভার খুবই কম, এবং দেশের শিল্প প্রসার বা অর্থনৈতিক উন্নয়নে কৃষিক্ষেত্রের দান নিতান্ত সামান্য।

আরও একটু গভীরে আলোচনা করার জন্য গড় করহার (Average Tax Rates) এবং প্রান্তিক করহার (Marginal Tax Rates) বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। নিচের তালিকাটি একটু খুঁটিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে।

	কৃষিক্ষেত্র		অকৃষিক্ষেত্র	
বৎসর	মাথা পিছু কর	মাথা পিছু আয়ের মধ্যে করের অনুপাত	মাথা পিছু কর	মাথা পিছু আয়ের মধ্যে করের অনুপাত
১৯৫১-৫২	৮'০	৩'৮	৪১'৮	৯'৫
১৯৫৫-৫৬	৯'৫	৫'৪	৩৮'৪	৮'৯
১৯৬০-৬১	১৩'৪	৫'৬	৬৮'৯	১৩'০

উপরের তালিকা থেকে আমরা দেখতে পাই যে, মাথাপিছু করের পরিমাণ

উভয়ক্ষেত্রে বাড়ছে ঠিকই, কিন্তু কৃষিক্ষেত্রে মাথাপিছু আয়ের মধ্যে করের অনুপাত মাত্র ৫'৬ শতাংশ, আর অকৃষিগত ক্ষেত্রে এই অনুপাত হলো ১৩ শতাংশ।

করের গড়হারের তুলনায় আরও গুরুত্বপূর্ণ হলো করের প্রান্তিক হার (the marginal rates of taxation) হিসেব করে দেখা গিয়েছে যে ১৯৫০-৫১ সাল থেকে ১৯৬০-৬১ সালের মধ্যে কৃষিক্ষেত্রে অতিরিক্ত আয় সৃষ্টি হয়েছে ১৭১৭ কোটি টাকা, কিন্তু অতিরিক্ত কর আদায় হয়েছে ১৯৮ কোটি টাকা—অর্থাৎ করের প্রান্তিক হার হল ১১'৫ শতাংশ। অপরদিকে একই সময়ের মধ্যে অকৃষি-ক্ষেত্রে অতিরিক্ত আয় সৃষ্টি হয়েছে ২৪২০ কোটি টাকা, কিন্তু অতিরিক্ত কর আদায় হয়েছে ৪৯৯ কোটি টাকা প্রায় অর্থাৎ করের প্রান্তিক হার হলো ২০'৬ শতাংশ। দেখা যাচ্ছে কৃষিক্ষেত্রের তুলনায় অকৃষিক্ষেত্রে করের প্রান্তিক হার দ্বিগুণ।

মোট আয়ের শতকরা কত অংশ কর হিসাবে দেওয়া হয়? নিচের তালিকা থেকে বিষয়টি বোঝা যাবে।

পরিবারের বাৎসরিক আয়	১২ টাকা থেকে ৬০০ টাকা	৬১২ টাকা থেকে ১২০০ টাকা	১২১২ টাকা থেকে ১৮০০ টাকা	১৮১২ টাকা থেকে ৩০০০ টাকা	৩০০০ টাকা থেকে ৫০০০ টাকা
গ্রামীণ পরিবার	৩'২	৪'১	৪'৫	৫'০	৬'৬
শহুরে পরিবার	৩'০	৪'৪	৫'১	৫'১	৯'৮

গ্রাম ও শহুরে পরিবারের করপাত (tax incidence) তুলনা করলে আমরা দেখতে পাই যে, বার্ষিক ৩০০০ টাকার নিচে গ্রামীণ পরিবারের উপর কর খুব কম বাড়ান চলে, অন্তত ন্যায়ের দিক থেকে (equity) এটা সঙ্গত। কিন্তু বার্ষিক ৩০০০ টাকা আয়ের উপরের গ্রামীণ পরিবারের উপর কর অনেকটা বাড়ান সম্ভব এবং উচিত। কারণ তারা তাদের স্থূল আয়ের মাত্র শতকরা ৬'৬ অংশ কর দেয়, অপরদিকে শহুরে পরিবারের একই আয়-শ্রেণী বার্ষিক স্থূল আয়ের শতকরা ৯'৮ অংশ কর দিচ্ছে। বার্ষিক আয় ৫০০০ টাকার বেশি এমন গ্রামীণ পরিবারের উপর করপাত সমআয়কারী শহুরে পরিবারের তুলনায় অনেক কম, কারণ (ক) শহুরে পরিবারের উপর ব্যক্তিগত আয়কর খুবই ক্রমবর্ধনশীল (highly progressive) এবং (খ) গ্রামীন পরিবারগুলির উপর

(বাগিচা ব্যতীত কৃষি) আয়কর বেশি আরোপিত হয় না, ঠিকমত হয় না, কৃষি থেকে আয়ের সঠিক হিসেব করাও মুস্কিল। কর আরোপনের ক্ষেত্রে ন্যায়নীতির প্রয়োগ করলে তাই বার্ষিক ৩০০০ টাকার অধিক স্থূল আয়ের পরিবারের উপর অতিরিক্ত কর আরোপ করা খুবই সঙ্গত।

অর্থাৎ, উপরের আলোচনা থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি (ক) সাধারণভাবে বলতে গেলে অকৃষি ক্ষেত্রের তুলনায় কৃষিক্ষেত্রের করভার অনেক কম, (খ) নিম্নশ্রেণীর তুলনায় উচ্চশ্রেণীর উপর করভার কম, এবং (গ) কৃষির উপর বিশেষত অধিক আয়-শ্রেণীর উপর কর বাড়াবার সুযোগ আছে এবং উচিত।

৫

যদি আমরা বলি যে (ক) প্রতি চাষীর হাতে জমি নেই, বেশির ভাগ জমি কেন্দ্রীভূত হয়েছে অকৃষক পরশ্রমভোজী ভদ্রলোকদের হাতে, (খ) তাদের আয় বেড়েছে, বা ভাগচাষী ও ক্ষেতমজুরের পাওনা বৃদ্ধির তুলনায় এই অকৃষক মালিকদের আয় বৃদ্ধি হয়েছে বেশি হারে (অর্থাৎ শোষণের হার বৃদ্ধি পেয়েছে), (গ) এরা কৃষি আয়কর ফাঁকি দিচ্ছে, (ঘ) এদের ঘরের ছেলেরা স্কুল কলেজ, অফিস আদালত দোকান বাজার প্রভৃতি থেকে বাড়তি টাকা রোজগার করে ঘরে আনে এবং সঙ্গে সঙ্গে চাষী খাটিয়ে 'খাজনা' পায়, (ঙ) শিল্পে টাকা খাটায় না, (চ) জাতীয় নমুনা অনুসন্ধানের হিসেব অনুসারে (National Sample Survey) গ্রামীণ পরিবারগুলির ব্যয়ের মধ্যে গড়ে শতকরা ১০·৩৬ ভাগ হলো অপ্রয়োজনীয় ব্যয়, যেমন পূজা-অর্চনা, মদ্যাদি, যাত্রাগান ইত্যাদি। এটা গড়ের হিসেব অর্থাৎ উচ্চ আয়শ্রেণীর পরিবারে এই অনুপাত আরও বেশি, এ-অবস্থায় ভূমিরাজস্ব তুলে দিলে কার লাভ হবে? প্রকৃত চাষীর হবে কি? বরং বলা যায় ভূমিরাজস্ব তুলে দেওয়া খুবই অবিজ্ঞজনোচিত কাজ হবে। লেভি করে ধান সংগ্রহ করায় রীতি যেখানে চালু রাখতেই হচ্ছে, সেখানে রাষ্ট্রের হাতে শস্যের আকারে ভূমিরাজস্ব আদায়ের এই অধিকার সহসা ছেড়ে দেওয়া চলে না। সোভিয়েট ইউনিয়ন ও চীনের ইতিহাস থেকেও এই শিক্ষা আমরা পেয়ে থাকি।

৬

অনেকে বলেন যে ভূমিরাজস্ব তুলে দিয়ে কৃষি আয়কর বসান হোক। এ প্রসঙ্গটি একটু বিশদভাবে বুঝতে হবে। কৃষি আয়করের অর্থনৈতিক ও

প্রশাসনিক দুর্বলতা সকলেরই জানা। (ক) কৃষি আয় ব্যাখ্যা করা ও নির্ধারণ করা খুবই অসুবিধেজনক। আয় বলতে সাধারণত ধরা হয় মোট রেভিনিউ থেকে ঐ রেভিনিউ উপায়ের খরচ খরচা বাদ দিলে যা রইল। কৃষিক্ষেত্রে শস্য বিক্রি করে যে টাকা পাওয়া গেল সেটাই রেভিনিউ। আর খরচ খরচার মধ্যে পড়বে জমি, ভাড়া করা শ্রমিক ও পরিবারের শ্রম, পরিচালনার শ্রম, যন্ত্রপাতির ভাড়া, নিজের যন্ত্রপাতি থাকলে সেটার উপর আন্দাজে আরোপ করা ভাড়া, গরু মহিষের খাদ্য, সার ইত্যাদি। কোন সাধারণ শিক্ষিত চাষীর পক্ষেও এসব হিসেব করা সম্ভব নয়, স্বল্প শিক্ষিত বা অশিক্ষিতদের কথা তো ছেড়েই দিন। তাছাড়া, শহরে শিল্প ব্যবসায়ে নিযুক্ত ব্যক্তিরা বা চাকুরিয়ারা যেরকম হিসেব রাখতে অভ্যস্ত চাষীরা সেভাবে অভ্যস্ত নয়। (খ) বিভিন্ন ফসলের উৎপাদন ও দামে যেরকম উঠানামা হয় তা বিস্ময়কর। এর ফলে ভিন্ন বছরে কৃষি আয়েও বিপুল তারতম্য দেখা দেয়। এইরকম আয়ের উপর আয়কর বসাবার অসুবিধে সহজেই বোঝা যায়। (গ) এখনও আমরা ভূমির মালিকানা ও ভূমি ব্যবহার সংক্রান্ত নিয়ম সুষ্ঠুভাবে রচনা করতে পারিনি। জমি থেকে আয়ের কিছু অংশ পেল মালিক কিছু পেল ভাগচাষী—আয়করের কে কতটা অংশ দেবে? মোট আয় হয়ত আয়করের আওতায় এল, কিন্তু ভাগ হয়ে যাবার পরে প্রত্যেক ভাগ সর্বনিম্ন সীমার নিচেই পড়ে রইল—এটাই তো বেশিরভাগ ক্ষেত্রে হবে। (ঘ) কৃষি আয়কর আদায়ের খরচ হবে খুবই বেশি, এদিক ওদিক ছড়ানো চাষীর কাছ থেকে আদায় করাও শক্ত। যে বিপুল অসন্তোষ সৃষ্টির জন্য যে বিপুল ব্যয়ভার করতে হবে তার তুলনায় নীট আদায় হবে খুব কম।

এবং সর্বোপরি, একটি অর্থনৈতিক আপত্তিও আছে। কৃষি থেকে আয় করলে তবে আয়কর, আয় না হলে কর দিতে হচ্ছে না। ক্রমবর্ধনশীল আয়করের ফলে ভূমি নিস্ফলা করে রাখার দিকে প্রবণতাকে প্রশ্রয় দেওয়া হবে। কিন্তু ভূমিরাজস্ব দিতেই হবে, মালিকানার উপর কর ওটা। ফলে ভূমি থেকে আয় বাড়াবার দিকে ঝোঁক বাড়াবার চাপ থাকছে। এই চাপ তুলে নেওয়া উচিত নয়।

৭

পশ্চিমবাঙলার কথা ধরা যাক্ (ভারতের কোন কোন রাজ্যে ভিন্ন অবস্থা হতে পারে)। ভূমিসংস্কার আইন হলো, উর্ধ্বসীমা হলো, তবু বেশ কিছু পরিমাণ জমি বেনামী হয়ে রইল। বিশ বছর ধরে এই বেনামী চলেছে। এখন অবস্থা

কি ? যে ভাইপো ভাইঝি ভাগ্নেদের নামে জমি বেনামী হয়েছিল, তারা এতদিনে বড় হয়েছে, বাড়ির বড়কর্তা গত হয়েছেন, সে জমির প্রকৃত মালিকানা অনেকক্ষেত্রে এখন এই বেনামদারদের হাতেই বর্তে গেছে। প্রায় বিশটা বছর খেলা কথা নয়, অর্থনীতির নিয়মে সময় বা কালও বাস্তব ভূমিকা গ্রহণ করে। দ্বিতীয়ত, যৌথ পরিবারগুলি ভেঙে যাওয়ায় ভূমিমালিকানা ছোট ছোট হয়ে পড়েছে। এবং সর্বোপরি, আমাদের উত্তরাধিকার আইন। ইংলণ্ড, আমেরিকা তো বটেই, এমন কি জাপানেও একমাত্র জ্যেষ্ঠপুত্র ভূসম্পত্তির উত্তরাধিকারী। আমাদের দেশে দায়ভাগ বলুন বা মিতাক্ষরা বলুন, সব ছেলে তো পাবেই, এখনও মেয়েরাও পাচ্ছে। আর মুসলমান উত্তরাধিকার আইনে সম্পত্তি আরও অনেক ভাগে বিভক্ত হচ্ছে। এখন তাই জমির মালিকানা মাথাপিছু অনেক কমে গেছে, এটাই বাস্তব সত্য কথা। আর দরিদ্র চাষীর হাত থেকে ভূমি হস্তান্তর হয়ে মাত্র কয়েকজনের হাতে শত শত একর জমি কেন্দ্রীভূত হওয়ার কথাটা বাস্তবে বিশেষ দেখা যাচ্ছে না, এরকম বড় জোতদারের সংখ্যা দ্রুত ক্রমক্ষীয়মান। যৌথ পরিবারের ভাঙন এবং দুর্লঙ্ঘ্য উত্তরাধিকার আইনের চাপ তো আছেই। ঋণের দায়ে ভূমি হস্তান্তরের বেগধারা খুবই শ্লথ, যে কোন জমি রেজিষ্ট্রী অফিসের দলিলঘরে খোঁজ নিলেই এটা শুনতে পারা যাবে। এইভাবে কালক্রমে বাস্তবে আমাদের দেশে একপ্রকার ক্ষুদ্র চাষী ভিত্তিক অর্থনৈতিক কাঠামো গড়ে উঠেছে (small peasant economy)। ঠিকই এখনও ৬০ বিঘে ৭০ বিঘের মালিক কিছু আছে, কর্তা মারা যাওয়ার পরে সে মালিকানাও ১৫।২০ বিঘেতে দ্রুত পরিণত হচ্ছে। এই চিত্রই ঘটমান ধারার চলচ্চিত্র, কিছু চা বাগান, মেছোঘেরি ইত্যাদিতে পশ্চিমবঙ্গে ভূমির কেন্দ্রীভবন থাকলেও সামগ্রিক কৃষি অর্থনীতির গতিশীলতার এই হচ্ছে দিক।

আর এই ক্ষুদ্র চাষীর অর্থনীতি ক্রমশঃ প্রসারিত হচ্ছে স্বচাষের নামে, ভাগচাষী সরিয়ে নিজে হাল বলদ ক্রয় করে, অথবা মজুর কবুলিয়ত লিখিয়ে নিয়ে ভাগচাষী উচ্ছেদ করে। এখনকার জমির মালিকরা রীতিমত হিসেব করেন, মজুর দিয়ে চাষ করালে কত মণ ধানের দাম দিতে হবে, ভাগচাষী দিয়ে করালে কত মণ ধান চলে যাচ্ছে ইত্যাদি। নগদ টাকা হাতে থাকলে ধানের দামের স্ফীতির বাজারে ক্ষেতমজুর দিয়ে চাষ করানই তুলনামূলক ভাবে অধিকতর লাভজনক, মালিকেরা তাও বোঝেন। ধানের অতিরিক্ত বাজার দাম অসংখ্য ভাগচাষী উচ্ছেদে প্রেরণা দিয়েছে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ

নেই। এই তুলনামূলক হিসেবের ফলে ভাগচাষীর পাওনা অংশও ধনতান্ত্রিক হিসেব নিকেশ রীতিনীতি ও নিয়মের অন্তর্ভূক্ত হয়ে উঠেছে। সামন্ততান্ত্রিক সম্পর্কের বদলে ধনতান্ত্রিক সম্পর্ক প্রসারিত হয়েছে। দুটো ধরনের সম্পর্ক এখনও অনেক ক্ষেত্রে মিলে মিশে থাকছে, কিন্তু ধনতান্ত্রিক সম্পর্কের প্রসার বেগ দ্রুততর, তাই সেটাই প্রধান ও মুখ্য। ভাগচাষী প্রথা থাকলেই সামন্ততান্ত্রিক শোষণ থাকবে না—বহিঃ আকৃতি এবং অন্তর্নিহিত প্রকৃতি এক কথা নয়। অন্তত মার্কসবাদীদের দ্বান্দ্বিক চিন্তায় এ-পার্থক্য সহজেই ধরা পড়বে।

আমাদের প্রশ্ন হলো চাষীপ্রধান ভূমিব্যবস্থা যদি পশ্চিমবঙ্গে মুখ্যরূপ হয়ে ওঠে, তবে এখানে কৃষি আয়করের গুরুত্ব কোথায়? অপরদিকে এই কাঠামোতে ভূমিরাজস্ব তুলে দেওয়ার যুক্তিই বা কোথায়?

৮

তত্ত্বগত আপত্তিও আছে। ভূমিরাজস্ব তুলে দেওয়া একান্তভাবে পুঁজিতান্ত্রিক স্লোগান, মোটেই সমাজতান্ত্রিক নয়। ইংলণ্ডে যখন ব্যক্তিগত সম্পত্তি সম্বন্ধে ধারণা পুঁজিতান্ত্রিক হয়ে উঠল, তখন থেকে ভূমিরাজস্ব তোলার কথা ওঠে। সহজভাবে বুঝলেই হয়। যদি কেউ কলকারখানাখুলে টাকা রোজগার করে, তাহলে সে রাষ্ট্রকে রাজস্ব দেয় না, কর দেয়। এটাই পুঁজিতান্ত্রিক সম্পর্ক, রাষ্ট্র ও ব্যবসায়ীর মধ্যে। ঠিক সেই রকম, যদি সেই টাকাটা খাটিয়ে মজুর নিয়োগ করে চাষবাস করে টাকা রোজগার করে তবে সেও আয়কর দেবে, কোনও রাজস্ব দেবে না। এটাই জমি সম্পর্কে ধনতান্ত্রিক ধারণা, রাষ্ট্র থেকে স্বাধীনভাবে যে কোনো উপাদান বাজারে বেচাকেনা করা যায় এ-রকম ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ধারণা। সম্পত্তি সম্পর্কে সমাজতান্ত্রিক ধারণা একটু পৃথক নয় কি? সকল সম্পত্তিই সমাজের, কেউ ব্যবহার করুক, মজুরি পাবে, কিন্তু সম্পত্তির মালিকানাজনিত পাওনা সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে দিতে হবে। ভূমিরাজস্ব তুলে দিয়ে সম্পত্তি সম্পর্কে ধনতান্ত্রিক ধারণা চাষীর মনে দৃঢ় করে তোলা তাই তত্ত্বগত দিক থেকেও আপত্তিজনক।

৯

বর্তমানে তাই ভূমিরাজস্ব তোলার পক্ষে তথ্য ও তত্ত্বের দিক থেকে কোনো সমর্থন খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। অন্তত অর্থনীতিবিদ্‌রা পাচ্ছেন না। বরং কতক-

গুলি বিকল্প প্রস্তাব রাখা যেতে পারে। ক্রমবর্ধনশীল আয়কর থাক, কারণ বাগিচা, মেছোঘেরির আয় থেকে একটা অংশ তুলে আনতেই হবে। এরই সঙ্গে ভূমি-রাজস্বের উপর ক্রমবর্ধনশীল হারে সারচার্জ বসান চলে এবং দরকারও। পরিকল্পনা কমিশনের দূরপ্রেক্ষণ বিভাগ (Perspective Planning Division) নিম্নরূপ সুপারিশ করেছেন, পশ্চিমবাঙলার বাস্তব অবস্থায়, (সেচব্যবস্থা, মাথাপিছু গড় জমির পরিমাণ, একফসলী বা দোফসলী জমি প্রভৃতি) এর কিছু হেরফের করা চলে।

ভূমি রাজস্বের স্ল্যাব্		সারচার্জ (শতকরা হিসাবে)
প্রথম	৭ টাকা	শূন্য
পরের	৫ টাকা	৪০
পরের	৫ টাকা	৮০
পরের	৫ টাকা	১২০
পরের	৫ টাকা	১৬০
পরের	৫ টাকা	২০০

একেবারে কম যারা দেয়, ৭ টাকা বা তার কম তাদের বাদ দেওয়া হলো। পরের প্রতি পাঁচ টাকার স্লাবের শতকরা ৪০ ভাগ পর্যন্ত বেশি দিতে হবে। এইভাবে ক্রমবর্ধনশীল হারে ভূমিরাজস্ব বসান যেতে পারে। কিন্তু মনে রাখা দরকার যে এটা কৃষিআয়করের বিকল্প নয়। কারণ যাদের বছরে ৫০০০ টাকার কম আয় তাদের ক্ষেত্রে এই প্রস্তাব ক্রমবর্ধনশীল হলেও, তার ঊর্ধ্বে এটা ক্রমহ্রাসশীল (regressive) হচ্ছে, তাই ওই আয়ের উপরে করের ক্রমবর্ধনশীলতা আনতে হলে কৃষি আয়করও থাকা দরকার।

দ্বিতীয়ত, পশ্চিমবাঙলায় যেসব জমিতে চা, পাট, তামাক প্রভৃতি উৎপন্ন হয় সেসব জমির ভূমিরাজস্বের উপর নিশ্চয় সারচার্জ বসান যেতে পারে। আর এই সঙ্গে যদি পাটের নিম্নতম মূল্য উঁচু স্তরে বেঁধে রাখা যায় সেই উঁচু দামে পাটের সরকারি ক্রয় ও মজুত করা হয় এবং বিদেশ থেকে পাটের আমদানি হ্রাস করে পাটকলগুলিকে সরকারি গুদাম থেকে পাট কিনতে বাধ্য করা যায় তবে চাষীর পক্ষে ভূমিরাজস্বের উপর এই সারচার্জ দিতেও অসুবিধে

হবে না, চাষী ভালো দামও পাবে, পাটের ফাটকাবাজার বন্ধ হবে। এ-প্রস্তাবের সহজ কারণ হলো ধানের তুলনায় ও সব চাষে আয় বেশি। সরকারি সেচের সুবিধায় যেখানে একর প্রতি উৎপাদন বেশি, সেখানে এই সারচার্জও বাড়ান চলে।

তৃতীয়ত, যদি পশ্চিমবঙ্গ মনে করে যে, আমাদের পাট, চা, তামাক প্রভৃতি বাইরে যাচ্ছে অথচ আমাদের তা থেকে আরও কিছু আয় হওয়া দরকার তবে নিশ্চয় ক্রয়কর (Purchase tax) আরোপ করা চলে। পশ্চিমবাঙলার অর্থনীতির যে অবস্থা তাতে এ-রকম ক্রয়কর আরোপ করা বিশেষ যুক্তিসঙ্গত। দাম নিয়ন্ত্রণ ও ক্রয়কর-সাঁড়াশির এই দুই দিক সফলভাবে প্রয়োগ করলে নিশ্চয় আমরা চাষীকে রক্ষা করে ফাটকাবাজদের হাত থেকে শিল্পপতিদের রক্ষা করতে পারব, রাজ্যের রাজস্বও বাড়বে।

ভারতে ভূমি-রাজস্বের প্রশ্নটি জটিল। ভূমি-রাজস্ব তুলে দেবার প্রশ্নটি নিয়েও বিতর্কের অবকাশ আছে। প্রসঙ্গত অর্থনৈতিক জোত ও অ-অর্থনৈতিক জোতের সমস্যাগুলি মুখ্য হয়ে দেখা দেয়। অধ্যাপক ভট্টাচার্যের মতামত তাঁর নিজের। এ-বিষয়ে আলোচনা আহ্বান করছি প্রবন্ধটি ১৯৬৭ সালে রচিত। সম্পাদক

পুস্তক-পরিচয়

কাঁদিদ বা আশাবাদ। ভলত্যার। মূল ফরাসী থেকে অনুবাদ। অরুণ মিত্র। সাহিত্য অকাদেমী। পাঁচ টাকা

অষ্টাদশ শতাব্দীকে মিশেলে বলেছিলেন 'মহান শতাব্দী' আর ফরাসী বিপ্লবের ঐতিহাসিক জর্জ লেফেভর বলেছেন, যে কোনো অর্থেই যথার্থ নবজাগরণের শতাব্দী। এই শতাব্দীতেই আমেরিকা ও ফ্রান্সে দুটি যুগান্তকারী বিপ্লব সম্পন্ন হয়েছে, সামন্ততান্ত্রিক স্থবিরতার বিরুদ্ধে বুর্জোয়াশ্রেণী প্রথম দেখিয়েছে মানুষের কর্মতৎপরতা কী ঘটাতে পারে। 'কমিউনিস্ট ইশ্‌তেহার'-এর পাতায় মার্কস্‌-এঙ্গেল্‌স্ তার বিস্তৃত পরিচয় দিয়েছেন: তারা মিশরের পিরামিড রোমানদের প্রাসাদ ও গথিক গীর্জা অনেক পেছনে ফেলে বহু বিস্ময়কর কার্য সম্পাদন করেছে; এমন সব বিজয়াভিযান চালিয়েছে যা পূর্ববর্তী যুগের গোটা জাতির দেশান্তরী অভিযাত্রা ও ধর্মযুদ্ধকে ম্লান ক'রে দিয়েছে।...উৎপাদনের নিয়ত পরিবর্তন, সমস্ত সামাজিক অবস্থার অবিরাম বিশৃঙ্খলা, চিরস্থায়ী অনিশ্চয়তা এবং আন্দোলন পূর্বের যুগগুলি থেকে বুর্জোয়া যুগকে বিশিষ্টতা দেয়; সুনির্দিষ্ট, সুসংহত সম্পর্কগুলি তাদের সমস্ত প্রাচীন এবং পবিত্র সংস্কার ও বিশ্বাস নিয়ে ভেসে যায়, নবগঠিত সম্পর্কগুলিও দানাবাঁধার পূর্বেই পুরাতনের দলে চলে যায়। যা কিছু কঠিন, গলে হাওয়ায় উড়ে যায়; যা কিছু পবিত্র অপবিত্র হয়, আর মানুষ অবশেষে স্থিরবুদ্ধি নিয়ে তার জীবনের প্রকৃত অবস্থা এবং তার জাতির সঙ্গে তার সম্পর্কের সম্মুখীন হ'তে বাধ্য হয়।

সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে বুর্জোয়া শ্রেণীর এই প্রচণ্ড বৈপ্লবিক ভূমিকার গুরুত্ব অনেক সময়ই আমরা ভুলে যাই—শুধু উৎপাদন শক্তির বিকাশ ঘটানোর জন্যই নয়, তাবৎ কুসংস্কার, জড়ত্ব, সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে বুর্জোয়া দার্শনিক ও চিন্তানায়কদের সংগ্রাম আজকের শ্রমিকশ্রেণীর কাছে অত্যন্ত স্বাভাবিক উত্তরাধিকারসূত্রে এসে পৌছয়। অষ্টাদশ শতাব্দীতে বুর্জোয়াশ্রেণীর এই জাগরণ, চিন্তাজগতে আলোকপ্রাপ্তি বা এনলাইটেনমেণ্টের সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিশেষভাবে বিবেচনা করা প্রয়োজন, কারণ এক দার্শনিক বিপ্লব ফ্রান্সের রাজনৈতিক বিপর্যয় ঘটিয়েছিল (এঙ্গেল্‌স্-ই 'লুডভিগ ফয়ারবাখ'-এ এই মন্তব্য করেছেন), এবং সেই দার্শনিক বিপ্লবের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো চিন্তা-পদ্ধতির সর্বোচ্চ রূপ হিসেবে দ্বান্দ্বিক বা ডায়ালেকটিক্‌স্-এর পুনর্গ্রহণ। আজও

বিশেষত আমাদের মতো দেশে, অষ্টাদশ শতাব্দীর ফ্রান্স শিক্ষার বিশেষ উৎস হতে পারে। সাহিত্য অকাদেমী রুশো ভলত্যার প্রমুখের রচনাবলী বাঙলায় প্রকাশ করে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ও প্রশংসনীয় কাজ করেছেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের জাতীয় আয় দ্বিগুণেরও বেশি বেড়ে যায়। স্বভাবতই উচ্চতম শ্রেণীর হাতেই তার সিংহভাগ গিয়ে পড়ে—বিলাস-বাহুল্য এবং সাজানো-গোছানো বাসস্থানের দিকে নজর পড়তে থাকে। আসবাব পত্রের পুরনো ধরনই পালটে যায়, সরল রেখার জায়গায় বক্ররেখার বিন্যাস আসতে থাকে, পম্পেই আবিষ্কারের পর আলেকজান্দ্রিয় রীতির প্রচলন শুরু হয়। মেহগনীর ব্যবহার বৃদ্ধি পায়। এই সম্পদ চুঁইয়ে চুঁইয়ে পৌছয় কারিগর, দোকানদার এবং ধনী কৃষকের কাছে। চা এবং চিনি, যা আগে কেবল ধনীদেরই ব্যবহার্য ছিল, জনসাধারণের পণ্য হয়ে ওঠে। জনসংখ্যা খুব একটা বেশি হারে বাড়েনি, দুর্ভিক্ষের সংখ্যাও কম ছিল, মৃত্যুহারও হ্রাস পায়। ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা, নতুন ব্যবসা বাণিজ্য, যন্ত্র ও যন্ত্রশক্তি ধীরে ধীরে ইওরোপের চেহারা পাল্টে দিচ্ছিল। পশ্চিম ইওরোপ ক্রমশই সম্পদশালী হয়ে উঠছিল।

এই কাঠামোর ওপরেই গড়ে ওঠে এক আশাবাদের দর্শন। স্যার আইজাক নিউটন এক কার্যকারণ সম্পর্কে গ্রথিত মহাবিশ্বের চিত্র দিয়েছিলেন—যেখানে যান্ত্রিক শৃঙ্খলা সদাবর্তমান। ধরে নেওয়া হলো, বিশ্বচরাচরের তাবৎ প্রাণীও একটি পরম্পরায় সাজানো রয়েছে···কীট থেকে স্বর্গীয় দেবদূত পর্যন্ত ধাপে-ধাপে একটি সিঁড়ি উঠে গেছে, তার মধ্যে একটি ধাপে রয়েছে মানুষ। এই পরম্পরা ঈশ্বরের সৃষ্টি, এবং ঈশ্বর নিজে যেহেতু সু এবং মঙ্গলের অধিষ্ঠাতা সেহেতু তাঁর সৃষ্টিও তারই প্রকাশ। এই পৃথিবী সৃষ্টি এবং এখানে যা কিছু ঘটে তার যাথার্থ্য এবং শ্রেষ্ঠতা তাই প্রশ্নাতীত। অংশত বা খণ্ডত যা খারাপ মনে হয়, সমগ্র জীবের এই মহাগ্রন্থিতে তা আসলে মঙ্গল। একজন স্পিনোজা (omnis existentia est perfectio) বা একজন লাইবনিৎস্-এর আধিবিদ্যক চিন্তায় হয়তো এই সর্বমঙ্গলময় সৃষ্টির মাহাত্ম্য ধরা পড়েছিল, কিন্তু বোলিংব্রুক ও শ্যাফট্‌বেরীর সাহায্যে কবি আলেকজাণ্ডার পোপ দ্বিপদীতে গেঁথে এর যা চেহারা দিয়েছিলেন তার মূল কথা দাঁড়ায় এই ঃ

All partial evil, universal good.

All discord, harmony not understood. (Essay on Man)

এবং

Of systems possible, if'tis contest
That Wisdom infinite must form the best.
Where all must full or not coherent be,
There must be, somewhere, such a rank as man.

পোপ-এর এই দার্শনিক কাব্য প্রকাশের কিছুদিনের মধ্যেই চমৎকার ফরাসীতে অনূদিত হয়েছিল এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর একদল মানুষের প্রিয় দর্শন হয়ে উঠেছিল। এই আশাবাদী দর্শনের ছটায় যুবক ভলত্যারেরও চোখ ধাঁধিয়ে গিয়েছিল। তবে জগতে কোথাও অমঙ্গল নেই, অন্যায় নেই এমন কথা কোনোদিনই তিনি মানতে পারেননি। 'জাদিগ'এ জেসরাদ-এর সঙ্গে কথোপকথনের সময় জাদিগ-এর বাঙ্ময় 'কিন্তু—'ই তার প্রমাণ। অনুরূপভাবে রুশোর 'মানুষের মধ্যে অসাম্যের উৎপত্তি সম্বন্ধে আলোচনা'য় মানবসমাজের বীভৎসতার চিত্র দেখেও ভলত্যার শিউরে উঠলেও "কেবল প্রকৃতিই ভালো" বা "মহৎ বর্বর"-এর কথাও সত্য বলে মানতে পারেননি।

Whatever is, is right, যা কিছু আছে, তা ঠিকই আছে এই যে দর্শন, বেসিল উইলি যার নাম দিয়েছেন 'কসমিক টোরিইজ্‌ম্', তা আসলে স্থিতাবস্থার পক্ষসমর্থন মাত্র। 'আশাবাদ' শুধু এইটুকুই যে এক মঙ্গলময় ঈশ্বর মানুষের স্রষ্টা, এবং যেহেতু এক সর্বাত্মক মঙ্গল থেকে এই বিশ্বচরাচরের সৃষ্টি, সেহেতু অমঙ্গল বলে কিছু নেই। এর নৈয়ায়িক সিদ্ধান্ত দাঁড়ায় এই যে, যেহেতু শ্রেষ্ঠতম জগতে একটি সুশৃঙ্খল বিন্যাসে আমরা রয়েছি, এক অনিবার্য পরম্পরায় সব কিছু সাজানো রয়েছে সেহেতু আর উন্নতির কোনো পথ নেই, সবকিছুই পূর্বনির্দিষ্ট হয়ে আছে এবং ঠিকই আছে। এর উদ্দেশ্যও অত্যন্ত স্পষ্ট: সামাজিক স্তরভেদ রক্ষা করা।

১৭৫৫ সালের ১লা নভেম্বর, পবিত্র সন্ত দিবসে লিসবন শহর এক ভয়ঙ্কর ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল। ত্রিশ থেকে চল্লিশ হাজার লোক সেই এক ভূমিকম্পে নিহত হয়। অধিকাংশ মানুষই তখন গীর্জায় উপাসনারত। এই সংবাদ পেয়ে ভলত্যার কেঁদে উঠেছিলেন। "পোপ যদি লিসবনে থাকতেন, তবে কি তিনি বলতে সাহস পেতেন, সব ঠিক আছে?" এর কিছুদিনের মধ্যেই প্রকাশিত হলো "লিসবন-ভূমিকম্প বিষয়ক কবিতা"। তার ভূমিকায় তিনি লেখেন: "এই নীতিবাক্য, 'যা কিছু আছে, তা ঠিকই আছে' যারা এইসব বিপর্যয়ের প্রত্যক্ষদর্শী তাদের কাছে খানিকটা অস্বাভাবিক মনে হবে। সব জিনিসই

নিঃসন্দেহে বিধাতা কর্তৃক সাজানো রয়েছে এবং শৃঙ্খলাবদ্ধ রয়েছে, কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে এ-কথাও স্পষ্ট যে আমাদের বর্তমান সুখস্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধির জন্য সব কিছু সাজিয়ে রাখা হয়নি।" ঐ কবিতাতে ভলত্যার 'আশাবাদ'কে বিদ্রূপ করেন 'ভ্রান্ত দর্শন ও বৃথা প্রজ্ঞা' বলে :

Grieve not, that others' bliss may oveflow.
Your sumptuous palaces are laid thus low ;
Your toppled towers shall other hands rebuild ;
With multitudes your walls one day be filled ;
Your ruin on the North shall wealth bestow,
For general good from partial ills must flow ;

ভলত্যারের জীবদ্দশায় ৩৬ খণ্ডে তাঁর রচনাবলীর যে ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশিত হয় (১৭৬১-৬৯), তাতে এই কবিতাটির অনুবাদ করেছিলেন ঔপন্যাসিক টবিয়াস স্মলেট (উদ্ধৃতিটি সেই অনুবাদ থেকে)। ভলত্যারের যুক্তি অবশ্য রুশোর পছন্দ হয়নি, একটি লম্বা চিঠিতে তিনি লেখেন, "অধি-বিদ্যার সব মারপ্যাঁচ মিলেও আমাকে আত্মার অমরত্ব ও মঙ্গলময় বিধাতা সম্পর্কে এক মুহূর্তের জন্যও সন্দিগ্ধ করে তুলতে পারবে না। আমি অনুভব করি, আমি বিশ্বাস করি, আমি ইচ্ছা করি, আমি আশা করি আমার শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত একে আমি রক্ষা করে যাব।"

ভলত্যার এর কোনো উত্তর দেবার চেষ্টা করেননি। কিন্তু লিসবন ভূমিকম্প থেকে শুরু করে মানুষের জীবনের বহু অমঙ্গল, অবিচার ও অন্যায় দিক নিয়ে এক তীব্র বিদ্রূপ হিসেবে ১৭৫৯ সালে জনৈক ডক্টর রাল্‌ফ্‌-এর নামে একটি বই প্রকাশিত হলো—"কাঁদিদ বা আশাবাদ"। একটি দার্শনিক মত খণ্ডনের জন্য ভলত্যার আরেকটি গুরুভার প্রবন্ধগ্রন্থ লিখলেন না। বরঞ্চ কাল্পনিক ভ্রমণকাহিনীর মাধ্যমে বিদ্রূপ ও ব্যঙ্গের যে পথ পরিক্রমণ করেছিলেন জোনাথন সুইফট্‌ ('দার্শনিক পত্রাবলী'তে ভলত্যার তাঁর সম্পর্কে সপ্রশংস উল্লেখ করেছেন) সেই পথ ধরে রচনা করলেন একটি 'মরাল ফেব্‌ল্‌'। ডঃ পাঁগ্লস এই কাহিনীতে আশাবাদের প্রবক্তা, হাজার দুঃখকষ্ট সয়েও তিনি লাইবনিৎস-এর অনুগামী থেকেই যান, বিশ্বাস না-করা সত্ত্বেও বলে চলেন যে সবকিছু চমৎকারভাবে চলছে, কারণ দার্শনিক কখনো স্ববিরোধিতা করতে পারেন না। কাঁদিদ অবশ্য সৌভাগ্য-দুর্ভাগ্য সয়ে শেষ পর্যন্ত ভিন্ন সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছয় : আমাদের কর্তব্য

আমাদের বাগান চাষ করা।

ভলত্যারও কি এই মতের পরিপোষক ছিলেন? নিজের বাগান চাষ করা বলতে তিনি ঠিক কী বোঝাতে চান? এ-বিষয়ে অরুণ মিত্র লিখেছেন, "অর্থহীন অসাম্য, অসামঞ্জস্য ও অবিচারপূর্ণ পৃথিবীর এক নৈরাশ্যজনক ছবি তিনি এঁকেছেন, কিন্তু উপসংহারে মানুষের সুখী হবার একটা পথেরও নির্দেশ দিয়েছেন। পথটা হলো: আসল সত্য কি, জীবনের রহস্য কি, এসব নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে যার যার নিজের কাজ করে যাওয়া।" (ভূমিকা: ১৩ পৃষ্ঠা)

কিন্তু ভলত্যার কি সত্যিই তাই বিশ্বাস করতেন? 'একটি সদ্ ব্রাহ্মণের কাহিনী'তে সুখ এবং যুক্তিবুদ্ধি পরস্পরবিরোধী হয়ে দেখা দিয়েছে। কাহিনীর শেষে ভলত্যার লিখেছেন: "কিন্তু বিষয়টি নিয়ে চিন্তা করার পর আমার মনে হলো সুখের তুলনায় যুক্তিবুদ্ধিকে পছন্দ করাটা নিছক পাগলামি। কিন্তু কী করে এই বিরোধ ব্যাখ্যা করা যায়। অন্য সব কিছুর মতোই তার ব্যাপারও অনেক কিছু বলা যেতে পারে।" দার্শনিক অভিধানে 'আদর্শবাদ' সম্পর্কে ভলত্যারের শেষ মত ছিল: "রোমান বিচারকরা কোনো মামলা বুঝতে না-পারলে যে দুটি বর্ণ ব্যবহার করতেন, অধিবিদ্যার প্রতিটি অধ্যায়ের শেষে তাই লিখে রাখা যাক। N. L. (non liquet), এটি পরিষ্কার নয়। বিচার-বিবেচনা ব্যতিরেকে শুধু পেটে খাওয়াই মানুষের চূড়ান্ত সুখ এ-কথা ভলত্যার বা কোনো 'ফিলোসফ'-এর পক্ষে মেনে নেওয়া খুবই শক্ত। এ-বিষয়টি ভলত্যারের কাছেও বোধহয় non liquet হয়েই থেকে গিয়েছিল।

কিন্তু 'কাঁদিদে'র মহত্ত্ব তার সমাধানের জন্য নয়, বাস্তব ঘটনা (লিসবন ভূমিকম্প, তার পরবর্তী "বিশ্বাসের কাজ" অর্থাৎ জীবন্তদাহন, অ্যাডমিরাল বিং-এর হত্যাদণ্ড) এবং কাল্পনিক দেশভ্রমণ (এল দোরাদো) মিলিয়ে ভলত্যার 'আশাবাদে'র সমস্ত তত্ত্বকে যেভাবে ভূমিস্যাৎ করেছেন, সেই বিদ্রূপের অকল্পনীয় ঔজ্জ্বল্য আজও আমাদের মুগ্ধ করে। ডঃ পাঁগ্লস চরিত্রটি অতিরঞ্জিত মনে হতে পারে, কিন্তু তার চরিত্রের এই সমতলত্ব বা ফ্ল্যাটনেস কোথাও অস্বাভাবিক নয়। সোম জেনিন্স (Soame Jenynes) তাঁর Free Enquiry into the Nature and Origin of Evil (১৭৫৭) গ্রন্থে পাঁগ্লসের মতোই 'নাইভ' দৃঢ়তার সঙ্গে এই আশাবাদের বাণী প্রচার করেছিলেন এবং ডঃ জনসন কর্তৃক সমালোচিত হবার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। ভলত্যার সাধারণ-তন্ত্রী ছিলেন না, সাংবিধানিক রাজতন্ত্রের প্রতিই ছিল তাঁর পক্ষপাত।

এল দোরাদো রুশোর স্বর্গরাজ্য হলেও হতে পারে, ভলত্যার সেখানে থাকতে চাননি। ভলত্যারের কোনো ইউটোপিয়া নেই। 'আলোকপ্রাপ্ত স্বৈরতন্ত্রী'দের সম্পর্কে তাঁর আস্থা ফ্রেডেরিককে দেখেশুনে নিশ্চয়ই আর অটুট ছিল না। কিন্তু ফরাসী বিপ্লব তাঁকে সম্মান দিয়েছে, তাঁর দেহ বাইরের সমাধি থেকে নিয়ে এসে প্যারিসে পাঁতেয়ঁতে সমাধিস্থ করেছে। বৃটিশ লোকসভায় এডমণ্ড বার্ক সকলকে এক বন্ধনীর মধ্যে ফেলে ঘোষণা করেছিলেন, "আমরা রুশোর হাতে মতান্তরিত হইনি, আমরা ভলত্যারের শিষ্য নই, হেলভেতিয়াস আমাদের মধ্যে এগোতে পারেননি। নাস্তিকরা আমাদের ধর্মোপদেষ্টা নন; পাগলরা আমাদের আইন প্রণেতা নন। আমরা জানি আমরা কোনো আবিষ্কার করিনি, এবং মনে করি নৈতিকতার ক্ষেত্রে কোনো আবিষ্কারের প্রয়োজন নেই," ইত্যাদি ইত্যাদি। "রুশো", ডঃ জনসনও একবার বলেছিলেন, "খুব খারাপ লোক"। বসওয়েল জিজ্ঞেস করেন, "স্যার আপনি কি তাঁকে ভলত্যারের মতো খারাপ মনে করেন?" জনসন বলেন, "দেখুন, স্যার, ওঁদের মধ্যেকার অধার্মিকতার মাত্রাভেদ স্থির করা কঠিন"। ধর্মের নামে যারা উপনিবেশ গেড়ে বসে, মানুষকে জীবন্ত দহন করে, লোককে ঠকায়—সে ধর্মের বিরুদ্ধে ভলত্যার দিদেরো সকলেই সোচ্চার ছিলেন। ইনকুইজিশনের বিরুদ্ধে রুশো ভলত্যারের জেহাদ, ক্যালভিনিস্টদের গোঁড়ামি সম্পর্কে তাঁর তির্যক মন্তব্য, সর্বোপরি তাঁর প্রিয় কথা—Ecrasons l'infame—এসো জঘন্যকে চূর্ণ করি—মূলত পরিচালিত হয়েছে ধর্মীয় কুসংস্কার, অসহিষ্ণুতা ইত্যাদির বিরুদ্ধে। আজকের দিনে অসহিষ্ণুতার আকার বদলেছে, প্রকার বদলায়নি। ধর্মের জায়গায় শুধু এসেছে রাজনীতি—আর রাজনৈতিক অসহিষ্ণুতা, কুযুক্তি ও কুসংস্কারের জয়যাত্রা দেখে ভলত্যারের মতো কলমের উপযোগিতা আরও বেশি করে অনুভব করা যায়।

ফরাসী না-জেনে, শুধু ইংরেজি অনুবাদে ভলত্যারের কিছু লেখা পড়ে পুস্তক-পরিচয় লেখা খুবই লজ্জার ব্যাপার। কিন্তু ভলত্যার তো ভাষার বেড়ায় আটকে থাকার লোক নন, এবং এ-অনুবাদের ব্যাপারে অরুণবাবুর যোগ্যতাও প্রশ্নাতীত। এর আগে অশোক গুহ, সম্ভবত ইংরেজি অনুবাদ অবলম্বনে, কাঁদিদের তর্জমা করেছিলেন। দেবীপদ ভট্টাচার্য মূল ফরাসী থেকে আর একটি অনুবাদ করেছিলেন, 'পথিকৃৎ' পত্রিকায় ১৯৬৩ সাল থেকে তা ধারাবাহিকভাবে বেরিয়েছিল (তবে শেষ অধ্যায়টি শেষ পর্যন্ত আর বেরোয়

নি)। অরুণবাবু অনুবাদের সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজনীয় বিষয়ে কিছু টীকা যোগ করেছেন, তা অত্যন্ত সুষ্ঠু হয়েছে। তবে আরও কিছু টীকা থাকলে অ-খ্রীস্টান বাঙালি পাঠকের বোধহয় সুবিধা হয়। যেমন খ্রীষ্টবিরোধী বা Anti-Christ প্রসঙ্গে (পৃষ্ঠা ৮)। ভূমিকাটিও যথেষ্ট তথ্যবহুল।

এভ্‌রিম্যান লাইব্রেরী সংস্করণের মতো ভূমিকার শেষে লেখকের একটি কালানুক্রমিক গ্রন্থপঞ্জি থাকলে সাহিত্য অকাদেমী সংস্করণগুলির মূল্য আরও বাড়ে। কর্তৃপক্ষ যদি এই বিষয়টি চিন্তা করেন তো ভালো হয়। আশা করব, রুশো ভলত্যারের পর দিদেরোর রচনা অনুবাদের দিকে সাহিত্য অকাদেমী নজর দেবেন।

রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

British Foreign Policy, During world war II: ভি. ট্রুখাগোভস্কি। প্রোগ্রেস পাবলিশার্স, মস্কো

খোদ ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী তথা সমরনায়ক উইনস্টন চার্চিলের লেখা বারো খণ্ডে অপেক্ষাকৃত স্বলভ মূল্যে পেপারব্যাকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ সম্পর্কিত বৃহৎ পুস্তকে কিছু বিতর্কমূলক প্রশ্নাদি তোলা হয়েছিল, যার একটা অন্য চিত্র এবং খানিকটা জবাব সম্প্রতি প্রকাশিত British Foreign Policy during World War II পুস্তকে পাওয়া যাবে।

কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কালপর্যায় (period) ভাগ নিয়েই তর্ক উঠেছে। চার্চিলের মতে প্রথম ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মধ্যবর্তী কালটিকে (১৯১৮-১৯৩৯) বলা যায় একটা যুদ্ধবিরতির যুগ; তারপর ১৯৪০-৪১-এ ব্রিটেন একা লড়ছে; তৃতীয় পর্যায়, ডিসেম্বর ১৯৪১ থেকে ১৯৪২এর শেষ পর্যন্ত। এই তৃতীয় পর্যায়েই 'Grand Alliance' বা মিত্রশক্তি সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে একজোটে অক্ষশক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালায় এবং সর্বশেষ, ১৯৪৩ থেকে ১৯৪৫-এ একধারে যুদ্ধে জয় অন্যদিকে ট্র্যাজেডি।

আলোচ্য লেখক এই কালপর্যায় ভাগ স্বীকার করেন না,—তাঁর মতে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের তিনটি স্তর বা বিভাগ রয়েছে। প্রথম, সেপ্টেম্বর ১৯৩৯ থেকে এপ্রিল ১৯৪০, যাকে phoney war (ভাঁওতার যুদ্ধ) বলা হয়ে থাকে, অর্থাৎ নামে

ব্রিটেন ও ফ্রান্স জার্মান ফ্যাশিস্ত শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেও আসলে পূর্বতন মিউনিকের আপোষনীতিরই জের টেনে জার্মান সমরশক্তিকে তারা সোভিয়েতের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্ররোচিত করতে চেষ্টিত ছিল। দ্বিতীয় পর্যায়ে, যে ১৯৪০ থেকে ১৯৪২-এর শেষ অবধি, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তি আত্মরক্ষায় নিযুক্ত; ১৯৪২-এর শেষদিকে, নভেম্বরে স্টালিনগ্রাদে জার্মান ফ্যাশিস্ত বাহিনী প্রথম সোভিয়েত লাল ফৌজের হাতে চরম আঘাত ও পরাস্ত হওয়ার পর থেকে যুদ্ধের যেমন ভাগ্য পরিবর্তন হলো, বোঝা গেল যতো দেরীতেই হোক, সোভিয়েত একাই জার্মান ফ্যাশিস্ত শক্তিকে পরাস্ত করতে সক্ষম, তেমনি আবার নতুন করে, কিছুটা চেখে-চেখে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ সোভিয়েত বিরোধী চক্রান্তে লিপ্ত হয়, অর্থাৎ পুরানো মিউনিক আপোষনীতিতে নতুন অবস্থা চালু করতে শুরু করে।

"দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ভাগ্য পরিবর্তনের সূচনা স্টালিনগ্রাদে সোভিয়েতের জয়ে। উইনস্টন চার্চিলের বিশেষ কৃতিত্ব যে, এটা বুঝতে তাঁর এক মুহূর্তও দেরী হয়নি। হিটলারের হাতে পরাজয় থেকে ব্রিটেন বেঁচে গেল। তাতে অবশ্য আনন্দ করার কথা।" কিন্তু তা হয়নি। এ-জয় ব্রিটেনের শাসক শ্রেণীর পক্ষে বিষাদের কথা, কারণ সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সঙ্গে মৈত্রীর ভিত্তিতে যে জয়ের সম্ভাবনা, তাতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদেরই আখেরে ক্ষতি হবার কথা (হলোও তাই)।

কমরেড রজনী পাম দত্ত তাঁর পত্রিকা 'লেবার মান্থলি'র বিখ্যাত মাসিক নোটসে লিখছেন:

"১৯৪৩ সালে (অর্থাৎ, স্টালিনগ্রাদে যুদ্ধে জয়ের পর পশ্চিমী শাসকবর্গ একেবারে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েন···। সোভিয়েত ইউনিয়ন তথা কমিউনিজমের বিরুদ্ধে পশ্চিমী ফ্রন্ট গড়ে তোলা, কুয়িবেক চুক্তি অনুসারে এ্যাটম বোমা তৈরি করবার পরিকল্পনাও এই সময়েই নেওয়া হয়।) এই যুদ্ধাস্ত্র (এ্যাটম বোমা) যে ফ্যাশিজমের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত না হয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রভাব বিস্তারের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হবে, সেটাও তখন পশ্চিমী শাসকবর্গের কাছে পরিষ্কার ছিল।" (লেবার মান্থলি, ১৯৬৩)

প্রসঙ্গত, এ্যাটম বোমার রিসার্চ প্রজেক্টের ('ম্যানহাটান প্রোজেক্ট') ডিরেক্টার জেনারেল গ্রোভস বৈজ্ঞানিক ওপেনহাইমারের বিরুদ্ধে তদন্ত কমিটির সামনে সাক্ষ্য দিতে গিয়ে বলেছিলেন যে, "ম্যানহাটান প্রোজেক্টের

পরিকল্পনার সময়ই আমার কাছে পরিষ্কার ছিল যে এ্যাটম বোমা তৈরি হলে সেটা হয়তো একদিন ব্যবহৃত হবে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে।" (প্রফেসার ব্ল্যাকেটর 'Atomic Energy in East-West Relations' নামক ছোট পুস্তকটি দ্রষ্টব্য)।

আজ অবিসম্বাদিতভাবে প্রমাণ করা যায় যে, জার্মান নাৎসীদের ও ইতালিয়ান ফ্যাশিস্তদের গোড়া থেকেই পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদী ব্যক্তিরা তোষণ করে চলেছিল, দুধ-কলা দিয়ে সাপ পুষছিল এই আশায় যে, জার্মান নাৎসী বা ইতালির ফ্যাশিস্তরা সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে লড়ে যাবে, আর তাহলে 'যা শত্রু পরে-পরে' এই নীতি অনুসারে ইঙ্গ-ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের দুই শত্রু, প্রথম সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত, দ্বিতীয় প্রতিদ্বন্দ্বী জার্মান সাম্রাজ্যবাদ পরস্পরকে ধ্বংস করে পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদের বিশ্বজোড়া আধিপত্যের পথ খুলে দেবে। অবশ্যই এই হিসাবের মধ্যে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের দ্বন্দ্ব ছিল ইঙ্গ-ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে, অন্যদিকে জাপানী সাম্রাজ্যবাদ চীনের জাতীয় মুক্তি-স্বাধীনতা আন্দোলনের বিরুদ্ধে আগ্রাসী নীতি চালিয়ে যাচ্ছিল।

এই বিশ্ব-পরিস্থিতিতে মিউনিকে ইঙ্গ-ফরাসী সাম্রাজ্যবাদী শক্তির (চেম্বারলিন ও দালাদিয়ে) যখন হিটলার-মুসোলিনীর হাতে চেকোস্লোভাকিয়া তুলে দিল এবং বোঝা গেল যে, ইঙ্গ-ফরাসী শক্তিবর্গ কিছুতেই সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ফ্যাশিজমকে ধ্বংস করতে রাজি নয়, কারণ তাঁদের আশা জার্মান সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়নের যুদ্ধ লাগবে, ঠিক তখনই ১৯৩৯ সালের ২৩এ আগস্ট 'সোভিয়েত জার্মান অনাক্রমণ চুক্তি' স্বাক্ষরিত হয়। চেম্বারলিনের তোষণ-নীতির (জার্মানি ফ্যাসিজমকে) সম্পূর্ণ পরাজয় ঘটল। বলা বাহুল্য, আন্তঃসাম্রাজ্যবাদী দ্বন্দ্বের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করেই কমরেড স্টালিনের পক্ষে এই অপূর্ব কূটনৈতিক চালের দ্বারা চেম্বারলিনের তোষণ-নীতির সম্পূর্ণ পরাজয় করা সম্ভব হয়েছিল।

এরপরে ইউরোপে দ্রুত পটপরিবর্তন। ১লা সেপ্টেম্বর পোলাণ্ডের ওপর হিটলারের বর্বর আক্রমণ শুরু হলো, ইঙ্গ-ফরাসী সাম্রাজ্যবাদ পোলাণ্ডের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ থাকলেও দুইদিন সময় নিল। ৩রা সেপ্টেম্বর, ১৯৩৯-এ যুদ্ধ ঘোষণা করল। কার্যত তারা পোলাণ্ডকে আসল সাহায্য কিছুই করল না। ১৯৪০এর মার্চ মাস অবধি এই ভাঁওতার যুদ্ধ বা phoney war চলল, ইঙ্গ-ফরাসীদের আশা পূর্ব-ইউরোপে দ্রুতবেগে (ব্লিৎস্-ক্রিগ) অগ্রসর হতে হতে শেষ অবধি

জার্মান ফ্যাশিজমের সঙ্গে সোভিয়েতের যুদ্ধ লেগে যাবে।

এই যুদ্ধ লাগানোর বহু চেষ্টা হয়েছে, ফিনল্যাণ্ডকে প্ররোচিত করে সোভিয়েতের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেওয়া হয়েছে। ওদিকে বাকু তৈলখনিতে বোমা বর্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। আলোচ্য পুস্তকে এই প্রত্যেকটি ঘটনা সম্পর্কে প্রচুর প্রামাণিক তথ্য ও দলিল এবং পরে প্রকাশিত গুপ্ত রিপোর্ট ইত্যাদি উদ্ধৃত করে প্রমাণ হাজির করা হয়েছে, স্থানাভাবে যার উদ্ধৃতি এখানে দেওয়া সম্ভব হলো না।

'ভাঁওতা যুদ্ধে' আগেকার মিউনিক তোষণ-নীতিরই সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে হিটলার প্রথমে ডেনমার্ক নরওয়ে, পরে ফ্রান্স দখল করলেন। ব্রিটেনের আত্ম-রক্ষার প্রশ্ন বড়ো হয়ে দেখা দিল, ডানকার্ক (ফরাসী উপকূল) থেকে কোনো রকমে ব্রিটিশ ও কিছু ফরাসী সৈন্তকে হটিয়ে আনার পরে শুরু হলো ব্রিটেনের ওপর বিশেষ করে লণ্ডন ও দক্ষিণ ইংলণ্ডের ওপর জার্মানীর বোমা বর্ষণ, ইতিহাসে যেটা 'Battle of Britain' বলে আখ্যাত। ব্রিটিশ বিমানবাহিনী (R. A. F.) অমিত তেজে আক্রমণ প্রতিহত করার চেষ্টা করলেও (লেখক যার অকুণ্ঠ প্রশংসা করেছেন), ধ্বংস এতো বেশি হতে থাকল যে সেপ্টেম্বর ১৯৪০ সালে খোদ ইংলণ্ড আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা প্রায় নিশ্চিত হয়ে দেখা দিল। এমনকি ব্রিটেন অধিকৃত হলে ব্রিটিশ জাতকে প্রায় নিশ্চিহ্ন করে দেবার (সবল মানুষদের ধরে জার্মানীতে জোর করে চালান করে দেওয়া হবে) এবং ব্রিটেনের প্রখ্যাত প্রতিটি বুদ্ধিজীবীদেরই খতম করবার লিস্ট জার্মানী তৈরি করল। এই লিস্টে একদিকে বার্ট্রাণ্ড রাসেল,এইচ. জি. ওয়েলস থেকে শুরু করে প্রফেসার হলডেন, রজনী পাম দত্ত প্রমুখ সকল কমিউনিস্ট নেতারই নাম ছিল।

কিন্তু হিটলার শেষ মুহূর্তে ব্রিটেনের আক্রমণের প্ল্যান স্থগিত রাখলেন। কেন? লেখক বলছেন :

"তিনি (হিটলার) ব্রিটেনের বিরুদ্ধে পুরো সৈন্য নিয়োগ করে আক্রমণ করার ঝুঁকি নিতে সাহস করলেন না, কারণ তাঁর পশ্চাদভাগে (rear) রয়েছে অমিতশক্তিশালী সোভিয়েত ইউনিয়ন।" (পৃষ্ঠা ১১১) বুর্জোয়া ঐতিহাসিক, আমেরিকান ওয়াল্টার এন্‌সেলের উদ্ধৃতি দিয়েও লেখক উক্ত বক্তব্য প্রমাণ করেছেন।

এরপরে একদিকে হিটলার যেমন পূর্ব-ইউরোপে বল্কান অঞ্চলে অগ্রসর হতে লাগলেন, ওদিকে তখন ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী চার্চিল বিশেষ করে আমেরিকাকে

তোয়াজ করে যুদ্ধে নামাবার প্রয়াসী হলেন। ১৯৪১ সালের মার্চ মাসে আমেরিকার সঙ্গে ব্রিটেনের Lend-lease চুক্তি স্বাক্ষরিত হলো।

২

২২শে জুন, ১৯৪১এ জার্মানী সোভিয়েতকে আক্রমণ করার পূর্বে হিটলারের ডেপুটি হেসকে পাঠিয়ে ব্রিটেনকে সোভিয়েত-বিরোধী যুদ্ধে দলে টানবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু ততদিনে জার্মানীর হাতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অস্তিত্বই বিপন্ন প্রায়। জার্মান-ব্রিটিশ আন্তঃসাম্রাজ্যবাদী দ্বন্দ্ব এমন চরমতম অবস্থায় পৌছেছে যে, তখনকার মতো মিউনিক তোষণ-নীতিকে বর্জন করে, সোভিয়েত আক্রান্ত হবার পরে ব্রিটেনকে সোভিয়েতের সঙ্গে একজোটে হিটলারের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হলো।

১২ই জুলাই ১৯৪১-এ এ্যাংলো-সোভিয়েত চুক্তি স্বাক্ষরিত হলেও, পশ্চিম ইউরোপে দ্বিতীয় রণাঙ্গন খুলে সোভিয়েতকে আসল সাহায্য দিয়ে যুদ্ধ তাড়াতাড়ি শেষ করতে ব্রিটেন গড়িমসি করতে লাগল। এর সম্পর্কে ভূরি ভূরি প্রমাণ আলোচ্য পুস্তকে ও স্বয়ং চার্চিলের ১২ খণ্ডের 'স্মৃতিকথা'তে প্রচুর পাওয়া যাবে।

পার্ল বন্দরে জাপান আক্রমণ-যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার পরে আমেরিকাও যুদ্ধে নামল, একদিকে তিন মিত্রশক্তি—ব্রিটেন আমেরিকা ও সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েতইউনিয়ন, অন্যদিকে ফ্যাশিস্ত জার্মানী, ইতালী ও জাপান বা অক্ষশক্তি। এবারে সত্যই প্রায় সারা দুনিয়া জুড়ে, অতলান্তিক, প্রশান্ত ও ভারত মহাসাগর, এশিয়া ও ইউরোপের ভূখণ্ড ব্যেপে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হলো।

আমরা প্রবন্ধের গোড়াতেই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের স্তরভাগ বা কালপর্যায় আলোচনা করতে গিয়ে বলেছি—স্টালিনগ্রাদের যুদ্ধে হিটলার বাহিনী পর্যুদস্ত ও পরাজিত হওয়ার পরে ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ যখন বুঝল যে, সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়ন একাই সারা ইউরোপকে ফ্যাশিজমের নাগপাশ থেকে মুক্ত করতে সক্ষম, এবং তাহলে সারা ইউরোপে সমাজতন্ত্র বা কম্যুনিজম প্রতিষ্ঠিত হবে; বিশেষ করে ফ্যাশিস্ত পদানত ইউরোপের দেশে দেশে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে জাতীয় মুক্তিফ্রণ্ট গড়ে উঠছে এবং তারা অস্ত্র হাতে গেরিলা যুদ্ধের কায়দায় ফ্যাশিজমের বিরুদ্ধে লড়ে চলছে (ফ্রান্স, মুসোলিনীর খোদ ইতালীতেই দ্রুত ও সংগঠিত পার্টিজান-বাহিনী গড়ে উঠছিল); তখনই ৬ই জুন, ১৯৪৪-এ পশ্চিম ইউরোপে দ্বিতীয় রণাঙ্গন খোলা হলো।

নিছক সামরিক দিক থেকে দ্বিতীয় রণাঙ্গন খোলা বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় এবং স্টালিনও সেকথা বারবার চার্চিলকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেছেন। অবশ্যই সঙ্গে সঙ্গে সোভিয়েত লাল ফৌজও তখন সোভিয়েত ভূমিকে ফ্যাশিস্ত শৃঙ্খলমুক্ত করে অমিততেজে পূর্ব-ইউরোপকে মুক্ত করতে করতে বার্লিনের দিকে ধাবমান।

মনে রাখা দরকার লাল ফৌজের দ্রুত অগ্রগতিতে গোঁড়া সাম্রাজ্যবাদী চার্চিল যে খুসী হতে পারেন না, সেকথা বলাই বাহুল্য। প্রথমত, পশ্চিম ইউরোপে দ্বিতীয় রণাঙ্গন খুলতে টালবাহানা করে তিনি দক্ষিণ ইতালী ও বল্কানে ঢুকতে চেয়েছিলেন, গ্রীসের মুক্তি আন্দোলনকে রক্তবন্যায় দমন করে দিয়েছিলেন; তথাপি একদিকে জনগণের চাপে অন্যদিকে বিশেষ করে প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের মত ছিল স্টালিনের দিকে, অর্থাৎ পশ্চিম ইউরোপে দ্বিতীয় রণাঙ্গনের পক্ষে, ফলে বৃটেনকে দ্বিতীয় রণাঙ্গন খোলার ব্যবস্থা করতে হলো। চার্চিল, রুজভেল্ট ও স্টালিনের ১৯৪৩-এ তেহরান কন্‌ফারেন্সের যে বিবরণ আলোচ্য পুস্তকে ও স্বয়ং চার্চিলের স্মৃতিকথাতে পাওয়া যায়, তাতে উপরোক্ত বক্তব্যের পুরো প্রমাণ দেওয়া সম্ভব। এজন্য দীর্ঘ উদ্ধৃতি প্রয়োজন এবং স্থানাভাবে সেটা সম্ভব নয়।

তেহরানে মিত্রশক্তি ঘোষণা করেছিল, যুদ্ধান্তেও তাদের মৈত্রী অটুট থাকবে এবং তাতেই পৃথিবীতে শান্তি রক্ষিত হবে। কার্যক্ষেত্রে যুদ্ধান্তের 'ঠাণ্ডা যুদ্ধ' বা মিত্রশক্তির মৈত্রীর মধ্যে ফাটল দেখা দিল এ্যাটম বোমার বিস্ফোরণ থেকেই। একথা আমরা পূর্বেই বলেছি। সে আর এক ইতিহাস, যার কথাও অন্যত্র বর্ণিত হয়েছে (লেখকের সমালোচিত Flemingএর 'History of the Cold War') 'পরিচয়'-এ কয়েক বছর পূর্বে।

আলোচ্য পুস্তকের অন্তে লেখক বলছেন যে, যুদ্ধোত্তর ইউরোপে ব্রিটেন ক্রমশই মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের উপর বেশি-বেশি নির্ভরশীল হয়ে পড়তে লাগল। চার্চিলের আশা ছিল, যুদ্ধোত্তর দুনিয়াতে আধিপত্য করবে ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ। কার্যক্ষেত্রে ১৯৪৫-এ যুদ্ধান্তের পরে গত ২৫ বছরে একদিকে পৃথিবীর এক-তৃতীয়াংশ জুড়ে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থা কায়েম হয়েছে, অন্য তৃতীয়াংশ জুড়ে জাতীয় স্বাধীন রাষ্ট্র গড়ে উঠছে (ভারতবর্ষ প্রমুখ এশিয়া ভূখণ্ডের প্রায় সবটাই এবং আফ্রিকার কিছু অংশ)। বাকি তৃতীয়াংশেও স্বাধীনতা, বিশ্বশান্তি ও অনেক ক্ষেত্রে সমাজতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম

দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলছে। হিটলারের দম্ভ, চেম্বারলিনের মিউনিক-তোষণ, যুদ্ধোত্তর যুগে ১৯৪৬-এ ফুলটনে চার্চিলের ঠাণ্ডাযুদ্ধ ঘোষণা—ইতিহাসের আবর্জনাস্তূপে নিক্ষিপ্ত। সত্তরের দশকে নতুন সমস্যা, কিন্তু পৃথিবীতে সমাজতন্ত্রের চূড়ান্ত জয় ইতিমধ্যেই ঘোষিত। সাম্রাজ্যবাদ পরাস্ত নয় এখনও, তবে পূর্বাপেক্ষা অনেক দুর্বল—প্রমাণ ক্ষুদ্র ভিয়েতনামের হাতে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী দানবের পরাজয়।

দিলীপ বসু

পদ্মা আমার গঙ্গা আমার : দক্ষিণারঞ্জন বসু। প্রকাশক : মধুরেণ সিণ্ডিকেট, কলিকাতা-৩৭। তিন টাকা

কবি-সাংবাদিক দক্ষিণারঞ্জন বসুর 'পদ্মা আমার গঙ্গা আমার' কাব্যগ্রন্থে বিধৃত হয়েছে ফেলে-আসা আরেক বাঙলার মধুমাখা স্মৃতি-চিত্র। বাঙালির আত্মিকচেতনার আবেগমথিত এই কণ্ঠস্বরে আধুনিক বাঙলা-কাব্যের জটিল-কুটিল আঙ্গিকচর্চা হয়তো নেই, কিন্তু জননী-জন্মভূমিকে কেন্দ্র করে এমন কিছু শুদ্ধ, সহজ-সরল আর্তি আছে যার সম্মুখে বিনম্র হওয়া ছাড়া অন্য কোনো উপায় থাকে না।

সত্যিই তো কোনো কবি যদি তাঁর 'মাতৃভাষা মাতৃভূমি'কে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসার কথা বলেন, গ্রাম-বাঙলার নিসর্গ-শোভার প্রতি মুগ্ধ বিস্ময়ে দৃষ্টি ফেরান, নদ-নদী-জনপদ, মানুষ আর তার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রতি হৃদয়ের টান অনুভব করেন এবং জন্মসূত্রে পাওয়া এইসব কিছুকে হারাবার বেদনায় কাতর হয়ে পূর্ববাঙলার কোনো গ্রাম্য-সজ্জনের মর্মবেদনাকে সহজ ভাষায় ব্যক্ত করে বলে ওঠেন : 'ও মুনসী ও মৌলভী/খবর কিছু রাখনি/এই দ্যাশ ছাইড়া গেছে যারা/আবার ফিরা আইব নি'/কিংবা, 'মাঝে মাঝেই বক্সে যেন ডাকছে শুনি/সেই যোগিনী আমার গাঁয়ের সিদ্ধা নারী/হৃদয় কাঁদে সেই মা-মাটির কোলে যেতে/কি যে হলো, কি যে হলো কি যে হলো!'—তখন কাব্যপাঠকের মনেও তার কিছু অনুরণন পৌঁছে যায়।

কবি-সাংবাদিক দক্ষিণারঞ্জনও তাঁর কাব্যগ্রন্থের বিভিন্ন কবিতায় উপর্যুক্ত কাব্য-ভাবনাকেই মূলতঃ তুলে ধরতে চেয়েছেন। 'মাতৃভাষা মাতৃভূমি'কে

বন্দনা করেই তাঁর এই গ্রন্থের সূচনা। তিনি অনায়াসে উচ্চারণ করেন: 'মাতৃভাষা মাতৃভূমি/এ দুই মায়ের চরণ চুমি/মাটির দেহে জীবন যতদিন।' ভাঙা বাঙলার কথা স্মরণ করে তাঁর মনে হয়: 'দিনে সূর্য, রাতে চাঁদ সহযোগী তারাদের নিয়ে/এখনো তেমনি রয় পাহারায় বঙ্গজননীর'/কিংবা, 'আমরা আবার বন্ধু হবো দু'বাঙলায়'/অথবা, 'মরবো না আমরা মরবো না/টুকরো করার তলোয়ার আর ধরবো না/হলাহলে আর প্রাণ-সমুদ্র ভরবো না/মরবো না আমরা মরবো না।' প্রকৃতপক্ষে একজন বয়স্ক বাঙালির শুদ্ধ আবেগ থেকেই এই কবিতার জন্ম। তাই এর প্রকরণ-পদ্ধতির সরলীকরণের কথা উত্থাপনকরা অবান্তর প্রশ্ন মাত্র।

আমরা জানি, আমাদের বঙ্গভূমি 'গঙ্গা-হৃদি' হয়েও প্রমত্ত পদ্মারও লীলাভূমি। তাই প্রত্যেক বাঙালি কবি বাঙলার এই দুই স্রোতধারায় অবগাহন করতে চেয়েছেন বারংবার। কবি দক্ষিণারঞ্জনও এর ব্যতিক্রম নন। এই গ্রন্থের নামকরণেই তাঁর মানসিকতা স্বয়ং প্রকাশিত। এবং তিনি যখন বলেন: 'পদ্মা আমার প্রাণ, গঙ্গা আমার হৃদযন্ত্র' তখন আমাদের মনের কথাই এর মধ্যে প্রতিধ্বনিত হতে থাকে। কবির 'পদ্মাপারের মেয়ে'-র 'কাজল কালো চোখের মায়া'য় আমরা যেমন স্বপ্নাতুর হয়ে উঠি তেমনি যখন তিনি বলেন: 'ঢাকা আমায় ডাকছে কেবল/ডাকছে এসো এইখানে/কুয়াশা তো গেছেই সরে/তাইতো এমন প্রাণ টানে!'—তখন এই মুহূর্তে, এই পংক্তি-চতুষ্টয় অন্য তাৎপর্যে এ-পারের বাঙালি-মনে তোলপাড় তোলে।

আজ যখন "স্বাধীন বাঙালাদেশ" তার সমগ্র বাঙালি সত্তা নিয়ে পাকিস্তানের বর্বর সামরিক চক্রের বিরুদ্ধে মৃত্যুঞ্জয় সংগ্রামে রত, তখন কবি দক্ষিণারঞ্জন বসুর এই কাব্যগ্রন্থ দুই সংগ্রামী বাঙলার মৈত্রীর সেতুপথ রচনায় সাহায্য করবে বলে আমার বিশ্বাস। এই গ্রন্থের সর্বশেষ কবিতা 'জয়হিন্দ, জয় বাঙলা'-র প্রতিধ্বনি করে পাঠকও মন্ত্রের মতো উচ্চারণ করবেন:

'বক্ষে বক্ষে ঢেউ, যেই শুনি
মধু-নাম বাঙলা
রক্তে জোয়ার খেলে যেই শুনি
সুধা-নাম বাঙলা।'

সুমুদ্রিত এবং সুঅলঙ্কৃত এই কাব্যগ্রন্থখানির আমরা সমাদর কামনা করি।

ধনঞ্জয় দাশ

চন্দ্র-অভিযান

এই নিয়ে তিনবার মানুষ চাঁদে পদার্পণ করল। আর মানুষের প্রেরিত স্বয়ং-চালিত যন্ত্র পূর্বেই চাঁদের বুকে ধীরে অবতরণ করে সেখানকার কিছু খবর বেতার তরঙ্গ-মারফৎ আমাদের কাছে পাঠিয়েছে; সম্প্রতি স্বয়ংচালিত একটি ছোটো ট্র্যাকটরের মতো গাড়ি চাঁদের বুকে ঘুরে বেড়িয়ে সেখানকার কিছু তথ্য আমাদের কাছে পাঠাচ্ছে।

চাঁদে মানুষ পাঠানোর কৃতিত্ব আমেরিকান বিজ্ঞানের বা বিজ্ঞানীদের। স্বয়ং চালিত যন্ত্রগুলি পাঠিয়ে বিশ্ববাসীকে তাক লাগিয়ে দিয়েছে সোভিয়েতের বিজ্ঞান বা বিজ্ঞানীরা।

তর্ক উঠতে পারে, কোনটি ভালো বা কৃতিত্ব কার বেশি ইত্যাদি। সেটা একেবারেই নিরর্থক। "দুয়ো হেরে গেল" এ-মনোভাব নিয়ে মানুষ সশরীরে বা যন্ত্রের সাহায্যে মহাকাশে পাড়ি জমাচ্ছে না। কাল্পনিক বৈজ্ঞানিক কাহিনীতে মাঝে মাঝে যাই লেখা হোক না কেন, এবং সে-গল্প যতোই সরস হোক না কেন, উপস্থিত মহাকাশে রাজ্য জয়ের বাসনা মানুষের নেই। মহাকাশ ভ্রমণটা এখনও এতই বিপদসঙ্কুল, মানুষের জৈবিক দেহ এর জন্য এতই ভঙ্গুর এবং আমাদের এই গ্রহ পৃথিবীতেই সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণ বা চক্রান্ত চালাবার এখনও এত সুযোগ বাকি রয়েছে যে, সাম্রাজ্যবাদের যুদ্ধ লিপ্সাটা উপস্থিত মহাকাশে না নিয়ে গেলেও চলবে। আর মহাকাশ ভ্রমণ যখন কলকাতা-লণ্ডন এরোপ্লেন যাত্রার মতো সাধারণ হয়ে যাবে, হয়তো একশ বছর পরে যখন সাধারণ যাত্রীবাহী ব্যোমযান পৃথিবী চাঁদ বা গ্রহান্তরে পাড়ি জমাবে, তার মধ্যে মানুষের ইতিহাসে সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থার অবসান হয়ে মানুষে মানুষে সাম্য মৈত্রী সহযোগিতার ভিত্তিতে বিশ্বসমাজবাদী অবস্থাই রচিত হবে। পঞ্চাশ দশকের গোড়ার দিকে যখন হলিউড্ 'ডেস্টিনেশান মুন্' (চন্দ্রভ্রমণ) সম্পর্কে ছবি তোলে তখন তাতে দেখানো হয়েছে, আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্র চাঁদকে নিজের জমি বলে দাবি করছে; আর দেখছি ১৯৬৯ সালের জুলাই মাসে চাঁদের জলহীন শুষ্ক পাণ্ডুর মরুক্ষেত্রে আমেরিকার আরমস্ট্রং ও কলিনস্ প্রথম অবতরণ করেই ফলক রেখে আসেন, যাতে লেখা আছে, "জুলাই ১৯৬৯ সালে আমরা পৃথিবী

গ্রহের মানুষ সর্বমানুষের কাছ থেকে শান্তির বাণী নিয়ে চাঁদে এসেছিলুম।" আর চাঁদের বুকে আছে ছজন মহাকাশচারীর নাম—দুজন সোভিয়েত ও চারজন আমেরিকান, যাঁদের মহাকাশের শহীদ বলা যেতে পারে। দুনিয়া জুড়ে শান্তির স্বপক্ষে শক্তির জোর কতো বেড়েছে, সেটার প্রমাণ এটি।

০

উদ্দেশ্য কি ?

স্বল্প পরিসরে চাঁদে অভিযানের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য উপস্থিত কী সে সম্পর্কে আলোচনা করেই ক্ষান্ত হবো। চাঁদে অভিযানের অন্যান্য বহু দিক আছে, পূর্ণাঙ্গ প্রবন্ধে বারান্তরে আলোচনা করা যাবে।

চাঁদের ভর (mass) পৃথিবীর ৮১ ভাগের এক ভাগ, ব্যাস ২,১৬০ মাইল অর্থাৎ চারভাগের এক ভাগ। পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণে বাঁধা চাঁদ যেমন পৃথিবী প্রদক্ষিণ করছে প্রায় ২৯ দিনে একবার, তেমনি আবার চাঁদের মাধ্যাকর্ষণে পৃথিবীর সমুদ্রে জোয়ার ভাঁটা খেলছে।

সৌরজগতের আর কোনো গ্রহেরই এতো বড়ো উপগ্রহ নেই, এমনকি বৃহস্পতি গ্রহের বারোটি চাঁদের ভরকে একত্র করলেও আনুপাতিকভাবে পৃথিবীর চাঁদের মতো এতো বড়ো উপগ্রহ দাঁড়াবে না। আসলে পৃথিবী-চাঁদ ব্যবস্থাটা গ্রহ-উপগ্রহ নয়, যুগ্ম গ্রহ। এর তাৎপর্য সুদূরপ্রসারী। এই যুগ্ম গ্রহের জন্ম হয়েছে একই লগ্নে, অথবা পৃথিবী থেকে চাঁদের জন্ম (প্রশান্ত মহাসাগরের অঞ্চলটা ছিটকে বেরিয়ে চাঁদ হয়েছে) আর না-হয় পৃথিবী চাঁদকে কব্জা (বা capture) করেছে। অর্থাৎ পূর্বে চাঁদ ছিল না, পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের আওতায় এসে উপগ্রহরূপে এখন পৃথিবী প্রদক্ষিণ করছে। এই তিনটি সম্ভাবনা নিয়ে বৈজ্ঞানিক মহলে তর্কের ঝড় উঠেছে।

চাঁদে নেমে প্রথমেই তার শিলা সংগ্রহ করা হয়েছে—প্রথম এপোলো-১১ তার 'নিস্তরঙ্গ সমুদ্র' অঞ্চল (চাঁদে অবশ্য কোনো 'সমুদ্র' নেই) থেকে শিলা এনেছিল ২১.১৫ কিলোগ্রাম, তারপর এপোলো-১২ এনেছে ৩৩.৭৫ কিলোগ্রাম তার 'ঝটিকা সমুদ্র' থেকে—আর লেখার সময়ে অন্য আর এক অঞ্চলে এপোলো-১৪ শিলা আনছে। তাছাড়া সোভিয়েতের স্বয়ংক্রিয় মহাকাশযানের সাহায্যে বেশ খানিকটা শিলাও পাওয়া গেছে।

এপোলো১৪-এর দুজন চন্দ্র-অভিযাত্রী বিশেষ চেষ্টা করেছিলেন, চাঁদের

'ফ্রাই মেরিয়া' অঞ্চলের একটা ছোটো নিবন্ত 'আগ্নেয়গিরির' জ্বালামুখ (crater)-শীর্ষে আরোহণ করে সেখানকার শিলা আনতে—নানারকম শারীরিক অসুবিধার জন্য তাঁদের হৃৎপিণ্ডের গতি বেড়ে ৮০ থেকে ১৫০ হবার পরে, পৃথিবী থেকে নির্দেশ পাঠিয়ে তাঁদের নিরস্ত করা হয়। সেটা আনা সম্ভব হয়নি।

যাইহোক, এ-পর্যন্ত প্রায় দেড় মণ, এপোলো-১৪ নিয়ে দুই মণ, চাঁদের শিলার বিশ্লেষণ চলেছে। একটা ব্যাপারে প্রায় সবাই একমত—চাঁদের শিলা বহু অতীতের—৩০০।৩৫০ কোটি বছরের পুরানো, অর্থাৎ পৃথিবীর কৈশোরের শিলা যেরকম হতে পারে বলে আমরা আন্দাজ করি সেইরকম।

ব্যাপারটা আর একটু বিশদ আলোচনা করে শেষ করি। পৃথিবীর জন্ম আজ থেকে প্রায় ৪৫০ কোটি বছর অতীতে, চাঁদেরও তাই। কিন্তু পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল ও জলরাশির প্রভাবে পৃথিবীর জন্মলগ্নের সমস্ত লক্ষণ ও চেহারাই আজ লুপ্ত, কাজেই একমাত্র আমাদের আন্দাজে নির্ভর করে এগোতে হয়। চাঁদে বায়ুমণ্ডল সুদূর অতীতে থাকলেও সেটা ছিল অত্যন্ত সামান্য এবং ছোট দেহের স্বল্প মাধ্যাকর্ষণের জন্য অতি অল্পদিনেই সে বায়ুমণ্ডল একেবারে চাঁদ ছেড়ে মহাকাশে হারিয়ে গেছে। জলরাশি কোনোদিনই ছিল না। তাহলে চাঁদের জন্মলগ্নের শৈশবের চেহারাটি আজো বর্তমান।

চাঁদ ও পৃথিবীর জন্ম একই সময়ে হয়ে থাকলে, এবং উপাদানও মোটামুটি একই, চাঁদের শিলা বিশ্লেষণ করে আমরা পৃথিবীর শৈশবের অবস্থাকে ধরতে পারব। তা থেকে পৃথিবীর তথা সৌরজগতের উৎপত্তি কী করে হলো তার প্রাথমিক চেহারা কী ধরনের, কী উপাদানে তৈরি ইত্যাদি সব রহস্যেরই হদিশ মিলবে ঐ চাঁদে।

কাজেই চাঁদে আমাদের অভিযান চালানোর উপস্থিত উদ্দেশ্য আমাদের পৃথিবীকেই আরো ভালো করে জানা। অবশ্যই আজ থেকে ১০০ বছর ভবিষ্যতে মানুষ চাঁদে স্থায়ী বসবাসের উপযোগী ছোট বৈজ্ঞানিক কলোনী গড়ে তুলবে, আরো অন্যান্য নানারকমের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার জন্য তার পরিকল্পনার কাজও খানিকটা এগিয়েছে ইতিমধ্যেই।

দিলীপ বসু

রোজা লুকসেমবুর্গ

সাধারণ মানুষের চাঁদা নিয়ে বানানো কামানগুলি হস্তগত করতে এসেছিল, পুঁজিবাদী ও ভূস্বামীদের সরকারের অধিনায়ক থায়র্স-এর হুকুমে ফ্রান্সের সরকারি সৈন্যদল। তারিখ ১৮ই মার্চ, ১৮৭১। সে-জবরদখল আর সম্ভব হলো না। পারীর জনগণ আর শ্রমিক শ্রেণীর প্রবল প্রতিরোধের সামনে সৈন্যবাহিনী হটে গেল। প্রাশীয় আক্রমণকারীদের পায়ের কাছে নতজানু স্বদেশী মানুষের বিরুদ্ধে চক্রান্তকারী বড় লোকদের সরকারের সঙ্গে প্রকাশ্য যুদ্ধ বাধলো পারীর শ্রমজীবী মানুষের। জন্ম নিল পারী কমিউন। সেই একই মার্চ মাসের পাঁচ-তারিখে পোলাণ্ডের জামোস্ক শহরে সম্ভ্রান্ত বুদ্ধিজীবী এক ইহুদি পরিবারে জন্ম-নিলেন রোজা লুকসেমবুর্গ—পরবর্তী জীবনে প্রাশীয় সামরিক দম্ভ, জার্মান পুঁজি-পতি ও ভূম্যধিপতিদের বিরুদ্ধে যিনি হয়েছিলেন অন্যতম প্রধান সারথী, আন্তর্জাতিক শ্রমজীবী মানুষের মুক্তির পতাকাকে যিনি প্রাণ দিয়ে ঊর্ধ্বে তুলে ধরেছিলেন, পারী কমিউনের মহৎ আদর্শ যিনি আমৃত্যু বহন করেছিলেন।

যে-পোলাণ্ডে তিনি জন্মেছিলেন, যে-দেশ ছিল রুশদেশের নিরঙ্কুশ জারতন্ত্রের অন্তর্গত একটি পদানত অঞ্চল। পোলাণ্ডের জাতি বৈশিষ্ট্য মুছে দেবার জন্য জারতন্ত্রের চক্রান্তের অন্ত ছিলনা। এমন-কি পোলদের মুখের ভাষাও তারা কেড়ে নিতে চেয়েছিল। বিদ্যালয়-বিশ্ববিদ্যালয়ে পোল ভাষা পড়ানো ছিল বে-আইনী। জার্মান যুঙ্কার জমিদাররা ছিল জারতন্ত্রের এ-কাজে প্রধান পৃষ্ঠপোষক। রাশিয়া, অষ্ট্রিয়া ও জার্মানী—তিন সাম্রাজ্যবাদী শক্তি মধ্যবর্তী এই দেশটিকে শোষণের মৃগয়াক্ষেত্র বলেই মনে করত। পোলদের মধ্যে ইহুদিদের অবস্থা ছিল আরও ভয়াবহ। ইওরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে পোলাণ্ডেই ছিল আবার তারা অধিক সংখ্যায়। ইহুদি ছেলেমেয়েদের শিক্ষাদীক্ষার প্রতি ছিল সরকারের বিষ নজর। রোজা ছিলেন ছাত্রী হিসাবে খুবই ভালো। ইহুদিদের মধ্যে বাছাই করা ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম। শিক্ষিত, সংস্কৃতিশীল ও বুদ্ধিজীবী পরিবারের মেধাবী সন্তান রোজা ওয়ার্শ-এর এক বিখ্যাত বালিকা বিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ পেলেন। ছাত্র আন্দোলনের হাতেখড়ি হলো তাঁর সেখানেই। কাজান বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদের অধিকার অর্জনের জন্য আন্দোলন করতে গিয়ে

একদা লেনিন বহিস্কৃত হয়েছিলেন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। রোজা তাঁর স্বদেশে মাতৃভাষাকে বাহন করে শিক্ষা পাবার অধিকার অর্জনের দাবিকে তুলে ধরবার দায়ে অভিযুক্ত হয়ে হারালেন মেধার স্বীকৃতি নিদর্শনস্বরূপ প্রাপ্য স্বর্ণপদকটি। ১৮৮৭ সালে তিনি যোগ দিলেন পোলিশ সোসালিস্ট ওয়ার্কারস পার্টিতে। পার্টি তখন আত্মগোপন করে আছে। সপ্তদশী রোজা মার্কসবাদ অধ্যয়ন শুরু করলেন। রোজার যখন আঠারো বছর বয়স পোল্যাণ্ডে জারতন্ত্রের সর্বেসর্বা গুপ্ত পুলিশ তখন তাঁকে হন্যে হয়ে খুঁজছে। গ্রেপ্তার এড়াতে রোজা এলেন সুইটজারল্যাণ্ডের জুরিখে। মে ১৮৭৯।

১৮৯৩ থেকে ১৮৯৭ সাল পর্যন্ত জুরিখ বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি অধ্যয়ন করলেন। পশ্চিম ইওরোপে, বিশেষভাবে ইংলণ্ডে তখন মার্কসবাদী অর্থনীতিকে নস্যাৎ করার প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন বুর্জোয়াদের বশংবদ অ্যাকাডেমিক অর্থনীতি-বিদরা। শ্রমভিত্তিক মূল্যতত্ত্বের বদলে সেখানে আলোচিত হচ্ছে উপযোগভিত্তিক মূল্যতত্ত্ব। বলা হচ্ছে পুঁজিবাদী ব্যবস্থাই শ্রেষ্ঠ সামাজিক-আর্থনীতিক ব্যবস্থা। ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়েও মার্কসবাদের বিরুদ্ধে জেহাদ চলেছে। সুইটজারল্যাণ্ডের লুসানা, জুরিখ বিশ্ববিদ্যালয়ে তখন চলেছে দোটানা। রোজা জুরিখ বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা-চালালেন 'পোলাণ্ডের শিল্প বিকাশ' নিয়ে। গবেষণা চালাবার সময় তিনি দেখালেন পোল্যাণ্ডে সাম্রাজ্যবাদী শোষণ—বিদেশী একচেটিয়া পুঁজির শোষণের সঙ্গে দেশী সামন্ততন্ত্র কেমন গাঁট ছড়ায় বাঁধা আছে। অর্থাৎ বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী শোষণের দাপটে কেমন শিল্পবিকাশ হয় অবহেলিত, শুধু তাই নয়, কেবল মাত্র কাঁচামাল তৈরির শিল্পই কথঞ্চিৎ সুযোগ পায় পরাধীন দেশে। তাঁর গবেষণার জন্য রোজা ডকটর হলেন ১৮৯৭ সালে।

এই জুরিখেই তাঁকে একবার মে-দিবসের ইশ্‌তেহার লিখতে দেওয়া হয়। ইশ্‌তেহারটি লিখলেন কবিতায়। রোজার আজীবন সাহিত্যপ্রেম ছিল অম্লান। ১৮৯৮ সালে রোজা এলেন জার্মানীতে। সদস্য হলেন জার্মান সোস্যাল ডেমো-ক্রেটিক পার্টির। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তাঁর লেখা বেরোতে লাগল। পার্টির কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা, বিবিধ রাজনীতিক কার্যকলাপ, বইলেখা, সংগঠন করা, আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক কংগ্রেসগুলিতে যোগ দেওয়া—নিরন্তর নানা কাজে ডুবে রইলেন তিনি। জার্মান নাগরিককে বিবাহ করলে জার্মান নাগরিকত্ব পাওয়া যায় বলে রোজা তাঁর জনৈক পার্টিনিষ্ঠ সহকর্মীর সঙ্গে নামমাত্র বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হন এবং ফলে ১৮৯৮ সালে তিনি জার্মান নাগরিকত্বও পান।

রোজার বিপ্লবী দায়িত্ববোধ ছিল অসীম। জার্মান সোস্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টি তখন শোধনবাদ-সুবিধাবাদের দিকে ঝুঁকেছে। বার্নস্টাইন বলছেন, মার্কস-এর বহু বক্তব্যই ছিল ভ্রান্ত। মার্কস একেবারে সেকেলে হয়ে গেছেন। এমনকি যে মূল্যতত্ত্বের উপরে ভিত্তি করে উদ্বৃত্তমূল্যের তত্ত্ব দাঁড়িয়ে আছে, সেই মূল্যতত্ত্ব বার্নস্টাইনের ব্যাখ্যায় বিনিময়-অনুপাতের যথাযোগ্য তত্ত্ব হতে পারে না। বার্নস্টাইন বলছিলেন মূল্যের শ্রমভিত্তিক অবজেকটিভ দিক মুখ্য নয়, বরং উপযোগভিত্তিক সাবজেকটিভ দিকটিই মুখ্য। তাঁর মতে তাই প্রান্তিক উপযোগ-তত্ত্ব পুরোটাই নিতে হবে অথবা মার্কসের মূল্যতত্ত্বকে তা দিয়ে পরিপূরণ করতে হবে। কিন্তু মাথায় হেঁটে দেখিয়ে দিলেই উদ্বৃত্ত শ্রমের তত্ত্বতো আর মিথ্যা হয়ে যায় না, অভিজ্ঞতাই বলে কেমন করে একদল পরগাছা মানুষ শ্রমজীবীদের উৎপাদনের ভাগ বসায়। লেনিন তাই চমৎকার ভাবে বলেছিলেন যে সংশোধনবাদীরা "apart from hints and sighs. exceedingly vague" ছাড়া মার্কসীয় মূল্যতত্ত্বে কিছুই যোগ করতে পারেন নি। ঢের পরে যোশেফ স্যুমপিটারও বলেছিলেন, "Most of the creations of the intellect or fancy pass away for good after a time that varies between an after dinner hour and a generation. Some, however, do not. They suffer eclipses but they come back again···These we may call the great ones—it is no disadvantage of this definition that it links greatness to vitality. Taken in this sense, this undoubtedly the word to apply to the message of Marx."

বার্নস্টাইন সমাজবাদী আন্দোলনকে কেবলমাত্র মজুরি আন্দোলনে এবং এখানে ওখানে কিছু সংস্কারের মধ্যে নিমগ্ন রাখার তত্ত্ব দিলেন। উদ্বৃত্তমূল্য তত্ত্বই যদি না রইল তবে আর শ্রেণী সংগ্রামের ভিত্তি থাকে কেমন করে? নিতান্ত অল্পসময়ে মালিকশ্রেণী অকটু আধটু উৎপাত যদি করেও-বা, ন্যায্য যৌথ দর কষাকষি আর পার্লামেন্ট প্রতিনিধি পাঠিয়ে সে উৎপাতের সংস্কার করতে পারা যায়। রোজা ও কার্ল লাইবনেখ্‌ট এ-মতের বিরুদ্ধে দাঁড়ালেন। মার্কসীয় মূল্যতত্ত্বের অভ্রান্ততার প্রমাণে রোজা রচনা করলেন 'মূলধনের সঞ্চয়' গ্রন্থটি। অগাস্ট বেবেলের মতো রোজাও মনে করতেন শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থ ও শোষকশ্রেণীর স্বার্থ সমঝোতা হবার নয়। এতে শ্রমিকশ্রেণীর

ক্ষতি বাড়ে, অন্যদিকে মালিকশ্রেণীর লাভ ও প্রতিপত্তি সে সমঝোতার ফলে বেড়ে চলে। কেবল তত্ত্বের লড়াই নয়, ১৯০৫ সালে রুশ বিপ্লবে রোজা সক্রিয়-ভাবে অংশ গ্রহণ করেন।

১৯০৭এ স্টুটগার্ট-এ আন্তর্জাতিক সমাজবাদী কংগ্রেসের অধিবেশন বসে। ঐ কংগ্রেসের বৃটেন ও ফ্রান্স প্রভৃতি সাম্রাজ্যবাদী দেশের ঝানু 'সমাজতন্ত্রী' প্রতিনিধিরা 'সমাজতান্ত্রিক ঔপনিবেশিক নীতি'র প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন। লেনিন, রোজা লুকসেমবুর্গ প্রভৃতি তৎক্ষণাৎ সমাজতন্ত্রী আলখাল্লার আড়ালে সাম্রাজ্যবাদী নেকড়ের এই ভোলবদলানো রূপ চিনে ফেলে 'ঔপনিবেশিক নীতি' প্রসঙ্গটির বিরুদ্ধেই তীব্র মত প্রকাশ করলেন। সমাজতন্ত্রী দেশের আবার উপনিবেশ কি? যার উপনিবেশই নেই, তার আবার 'ঔপনিবেশিক নীতি' কী?

ঐ কংগ্রেসে রোজা—লেনিন ও মার্তভের সঙ্গে অগাষ্ট বেবেলের বিখ্যাত প্রস্তাবকে বিশেষিত রূপ দিলেন। সেই প্রস্তাবে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ প্রচেষ্টার প্রতিবাদে আন্তর্জাতিক শ্রমিকশ্রেণীর জবাব রচনা করা হলো। প্রস্তাবে বলা হলো, মহাযুদ্ধকে ঠেকাতে হবে; যদি সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থান্বেষীরা মহাযুদ্ধ বাধায়, তাহলে তার আশু সমাপ্তির জন্য দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক লড়বে; আর ঐ মহাযুদ্ধের সুযোগ নিয়ে সমাজতন্ত্রী দলগুলি অভূতপূর্ব জনজাগরণ ঘটিয়ে পুঁজিবাদকে চিরকালের মত খতম করে দেবে। ১৯১২ সালে ব্যাসল কংগ্রেসে এই একই প্রস্তাবের মোটামুটি প্রতিধ্বনি হলো।

অবশ্য জাতীয় মুক্তি আন্দোলন সম্পর্কে রোজার দৃষ্টিভঙ্গি খুব স্পষ্ট ছিল না। সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলিতে কেবল সমাজবাদী বিপ্লব নয়, পরাধীন দেশগুলি থেকেও সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলিকে আঘাত করতে হবে। রোজা লুকসেমবুর্গের সংশয় ছিল যে জাতীয় মুক্তির অর্থ জাতীয় পুঁজিপতিদেরই রাষ্ট্রক্ষমতা লাভ, সমাজতন্ত্রী বিপ্লবের জয় নয়। লেনিন ১৯১৪ সালে 'জাতিসমূহের আত্ম নিয়ন্ত্রণের অধিকার' পুস্তিকায় রোজার এ-দৃষ্টিভঙ্গির সমালোচনা করেন। লেনিন দেখিয়ে দেন যে, পরাধীন দেশগুলির জাতীয় মুক্তির সংগ্রাম সাম্রাজ্যবাদ বা পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ বিকাশকেই ধ্বসিয়ে দেয়। রোজাকে লেনিন বহুবার সমালোচনা করেছেন বটে কিন্তু তাঁর মার্কসবাদী নিষ্ঠার প্রতি কখনও সন্দেহ প্রকাশ করেননি।

১৯১৪ সালে মহাযুদ্ধ শুরু হলো। দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের বাঘা বাঘা নেতারা জার্মানীতে সমর্থন করলেন সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ-ঋণ। ধ্বনি তুললেন 'পিতৃভূমিকে

বাঁচাও'। সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক দলের বামপন্থী নেতৃবৃন্দ পার্লামেন্টের ভেতরে ও বাইরে, যথাক্রমে কার্ল লাইবনেখট্ ও রোজা লুকসেমবুর্গ, ঐ দক্ষিণপন্থীদের স্টুটগার্ট সম্মেলনের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে বেইমানী করার অভিযোগে অভিযুক্ত করে প্রতিবাদ জানালেন। ১৯১৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে রোজা গ্রেপ্তার হলেন। ১৯১৫ সালে জেলখানায় বসে রোজা লিখলেন তাঁর 'জুনিয়াস' প্যাম্ফ্লেট, 'সোশ্যাল ডেমোক্রাসির সঙ্কট' নাম দিয়ে, লেনিনের এ বইখানি খুবই ভালো লেগেছিল। "লেনিনের প্রোলেটরিয়েট রেভলুশন এ্যাণ্ড রেনিগেড কাউট্স্কি' এবং 'কোলাপ্স অব দি সেকেণ্ড ইন্টারন্যাশনাল" এর সঙ্গে সমসূত্রে গ্রথিত এ বইখানি। বইখানিতে তিনি দক্ষিণপন্থী 'সমাজতন্ত্রী'দের শোষকশ্রেণীর পদলেহন করার দিকটি যেমন দেখিয়ে দেন, সঙ্গে সঙ্গে সাচ্চা সমাজতন্ত্রীদল কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তোলার কথাও বলেন। প্রথম মহাযুদ্ধের সাম্রাজ্যবাদী ভূমিকা তিনি স্পষ্টভাবে এ-পুস্তিকাটিতে দেখিয়ে দিলেন। লিখলেন যুদ্ধই নানা রঙ-বেরঙের পোষাকে মোড়া বুর্জোয়া-সমাজের আসল রূপটি দেখিয়ে দেয়। আজ যেমন চোখে পড়ছে ভিয়েতনামে, 'বাঙলা দেশে'। "ravished, dishonoured, wading through blood, soaked in filth···Not when dressed up and respectably parading as the custodian of culture, philosophy, ethics, law and order, peace and constitutional rights, but as a marauding beast, a witches' sabbath of anarchy, as pestilential stench for all culture and humanity, does it reveal itself in its true nakedness"

১৯১৭ সালে রুশ দেশে মহান অক্টোবর বিপ্লব বিজয়ী হলো। ১৯১৮-এর নভেম্বরে হলো জার্মানীতে বিপ্লব। বিপ্লবী শ্রমিকশ্রেণী রোজাকে কারামুক্ত করে আনেন। ঐ সময়ে তিনি কার্ল লাইবনেখ্ট-এর সঙ্গে গড়ে তুললেন জার্মান কমিউনিস্ট পার্টি এবং রোটে ফানে (লাল ঝাণ্ডা) দৈনিক পত্রিকাটি প্রকাশ শুরু করেন। পার্টি গঠনের সম্মেলনে রোজা বললেন, "Well comrades, now we are witnessing the moment where we may say : we are again with Marx, under his banner. When today we declare in our programme that the foremost aim of the proletariat cannot be anything other···than making socialism a reality and rooting out capitalism, then we take up the position on

which Marx and Engels stood in 1848 and from which they never fundamentally deviated."

প্রথম মহাযুদ্ধের আয়ুষ্কাল ছিল একান্ন মাস। তার মধ্যে চল্লিশ মাস ধরে রোজা ছিলেন জেলখানায় এক নির্জন প্রকোষ্ঠে বন্দিনী। জেলখানাতেই তাঁর কানে আসে ভাঙাভাঙা ভাবে সোভিয়েত বিপ্লবের খবর। জেলখানা থেকে মুক্ত হয়ে তিনি আট সপ্তাহ মাত্র জীবিত ছিলেন। ১৯১৯ সালের ১৫ই জানুয়ারি তিনি ও কার্ল লাইবনেখট সরকারি খুনীবাহিনীর হাতে নিহত হন। ঘাতকের অস্ত্রাঘাতে মাটিতে টলে পড়ার সময় রোজার হাত-ব্যাগের মধ্য থেকে ছিটকে বেরিয়ে পড়ল একখানি বই। গ্যেটের মহানাট্যকাব্য ফাউস্ট। যার প্রথম পংক্তিটি জ্বল জ্বল করছিল, "At the beginning there was action."

তরুণ সান্যাল

লোককৃতি ও বাঙলাদেশ

প্রাকৃতিক শক্তিকে যেদিন থেকে মনুষ্যসমাজের কল্যাণকর্মে মানুষ নিয়োজিত করতে সক্ষম হলো সেদিন থেকেই মানুষের-কৃতি বা 'কালচার' সৃষ্টি হলো। সমাজজাত মনুষ্য-কৃতি হলো প্রকৃতপক্ষে বস্তুবিশ্বের মানবায়িত প্রতিভাস, তার সমষ্টিগত শ্রম, বুদ্ধি এবং কল্পনাজাত সৃষ্টির ইতিহাস।

মনুষ্যকৃতির প্রাগৈতিহাসিক স্তরের মধ্যে বন্যাবস্থার যুগ ছিল। বন্যাবস্থার পর বর্বরতার যুগ আসে। বর্বরতার যুগ থেকে পর্যায়ক্রমে সভ্যতার যুগের উৎক্রমণের কৃতিকেই লোক-কৃতি বলা উচিত। এই যুগে সমষ্টিগত শ্রমশক্তি, বুদ্ধি ও কল্পনার সহায়তায় প্রকৃতিকে আয়ত্ব করে তাকে সর্বজনের কল্যাণ ও সামগ্রিক অগ্রগতির জন্য নিয়োজিত করবার সচেতন ও যৌথ প্রয়াস সূচিত হয়। জীবনধারণের ও জীবনীশক্তিকে বরণের এই প্রয়াসের উপসৌধে সহজ, সরল, স্বাভাবিক এবং বলিষ্ঠভাবে ও সংহতরূপে যা প্রকাশ পেয়েছিল তাকেই লোক-কৃতি বলা চলতে পারে।

লোক-কৃতির মধ্যে জীবন ও প্রকৃতির কয়েকটি মৌলিক উপাদান বিদ্যমান—জীবনধারণ এবং তার সম্প্রসারণ, বিরুদ্ধ শক্তির সঙ্গে সংগ্রামের সরল বাসনা, মানবিক শক্তিকে প্রতিষ্ঠিত করবার বলিষ্ঠ কামনা ইত্যাদি। এই উপাদান সচল ও কালজয়ী। তা সভ্যতার অগ্রগতির বহু বিচিত্র কর্মযজ্ঞের প্রতিভাসরূপে

মনুষ্য-কৃতির রত্নভাণ্ডারে সঞ্চিত রয়েছে। তাই লোক-কৃতির মধ্যে সেই যুগের পশুপালন, প্রজনন, কৃষিকাজ, রাখালিয়া জীবন, শিকারী জীবন, মৃৎশিল্প, গৃহকাজ, কাঠের কাজ, নৌকার ব্যবহার, স্থাপত্য, শিল্প ইত্যাদি রয়েছে। এরই প্রতিভাস ফুটে উঠেছে নৃত্য-সঙ্গীতে, গল্পে ইত্যাদিতে। লোক-কৃতি যৌথ জীবন নির্ভর। লোক-কৃতির মৌলিক উপাদান সমূহ জীবনপ্রক্রিয়ার মধ্যদিয়ে উত্তরাধিকার সূত্রেই সভ্যতার যুগে চলে এসেছে। ঐতিহ্য মৌলিক উপাদানে সমৃদ্ধ। মৌলিক উপাদানের বিনাশ নেই, রূপান্তর আছে। সচেতন, সক্রিয়, সর্বদেশদর্শী এবং সংগ্রামী।

সভ্যতার যুগে প্রকৃতির সম্পদকে আয়ত্বে এনে মানুষ উন্নত প্রক্রিয়ার সূচনা করেছে, শ্রমশিল্প সৃষ্টি হয়েছে, শ্রম-বিভাগ আবির্ভূত হয়েছে, শ্রেণীবিভাগ সৃষ্টি করেছে। কৃতির মধ্যেও বিভক্তি হয়েছে। কিন্তু লোক-কৃতির সম্ভারসমূহ প্রধানত শ্রমনির্ভরতা দ্বারা জীবন-অতিবাহিত মানুষেরাই বহন করে চলেছেন। তাঁদের জীবনের কথা লোক-কৃতির মধ্যেই প্রকাশ পেয়েছে। তাই লোক-কৃতির মূল্যায়ন প্রধানত কৃষিনির্ভর শ্রমজীবী মানুষের শ্রমজাত কর্মের উপসৌধেরই প্রধানত মূল্যায়নরূপেই বিবেচিত হওয়া প্রয়োজন।

মানুষের শ্রম, বুদ্ধি এবং কল্পনাকে প্রধানত রূপায়িত করেছে মানুষের হাত। মুক্ত হাত শ্রমের বাহন। এই শ্রমকে বাদ দিয়ে মনুষ্যকৃতির কোনো মূল্যায়ন সম্ভব নয়। শ্রমকে মর্যাদা দিলেই শ্রমজীবী মানুষের গৌরব যথার্থভাবে এসে পড়ে। কোনো অংশের প্রতি এটা কোনো অনুকম্পা নয়, কোনো দয়া নয়; এটাই পরমসত্য—সে সত্য অলঙ্ঘনীয়। মানুষের শ্রমের উপর সমাজ দাঁড়িয়ে আছে, শ্রমের টানেই সমাজ চলেছে। এই শ্রম যাঁরা দান করে বিশ্বকর্মা হয়েছেন তাঁদের মধ্যেই আজও লোক-কৃতির ধারা কোনো না কোনো ভাবে টিকে আছে। লোক-কৃতির চর্চা অর্থেই শ্রমশীল মানুষের জীবনচর্চার অনুশীলন। এটা কোনো বিলাসিতা নয়, বা রোমান্টিক কৌতূহলও নয়। সৃষ্টির প্রতি শ্রদ্ধা এবং স্রষ্টার প্রতি প্রগাঢ় ভালোবাসা থাকা প্রয়োজন।

'ফোকলোর' নিয়ে পশ্চিমের কয়েকটি ধনতান্ত্রিক এবং সমাজতান্ত্রিক দেশ-গুলিতে একটা আন্দোলন দানা বেঁধে উঠছে। বাঙলাদেশে 'ফোকলোর'-এর প্রতিশব্দ নিয়ে বিতর্ক চলছে। ইতিমধ্যে প্রতিশব্দ হিসাব 'লোকযান' (ডঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়) 'লোক-বিজ্ঞান' (ডঃ শহীদুল্লাহ্), 'লোকশ্রুতি' (ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য), 'ফোকলোর' (ঢাকা একাডেমী), 'লোক-বিদ্যা'

(রমাপ্রসাদ চন্দ), লোকচর্যা (ডঃ সুকুমার সেন), 'জন সাহিত্য' (ডঃ প্রফুল্ল দত্ত গোস্বামী), লোক-সংস্কৃতি (ডঃ বিরিঞ্চিকুমার বড়ুয়া, শ্রীকৃষ্ণ দেব উপাধ্যায়), লোক বাঙময় (কেশরী নারায়ণ শুক্ল), লোক-বৃত্ত (শ্রী শঙ্কর সেনগুপ্ত), লোকায়ন (শ্রী অরুণকুমার রায়) ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করেছেন।

উপযুক্ত প্রতিশব্দ বের করার বিষয়ে কোনো আপত্তি থাকতে পারে না। কিন্তু প্রতিশব্দের ধাঁধার মধ্যে পড়ে গিয়ে মূল বিষয় থেকে সরে আসার মধ্যে কোনো সার্থকতা নেই। ঝগড়াটা প্রতিশব্দ নিয়ে নয়, সংজ্ঞা ও রূপ-রেখা নিয়ে। প্রতিদেশের মনুষ্য সমাজের অগ্রগতির যাত্রাপথে একটি স্তরে লোক-কৃতির একটি পর্ব ছিল। সমগ্র মনুষ্য-কৃতির মধ্যেই তার অবস্থান। বর্বরতার যুগ থেকে পর্যায়ক্রমে সভ্যতার যুগে উৎক্রমণে লোক-কৃতির আবির্ভাব ঘটে।

'লোক' অর্থে একটি নির্দিষ্ট ভূমিখণ্ডে বসবাসকারী সমভাবাপন্ন একটি সামাজিক ও প্রাকৃতিক, ভৌগোলিক পরিবেশে গড়ে ওঠা এবং মোটামুটিভাবে একই ধরনের জীবন চারণে অবিভাজ্য সমগ্র জনগণকে বোঝায়। এই জনগণের জীবনপ্রক্রিয়ার উপসৌধে শ্রমলব্ধ যে-কৃতি তাই-ই মূলত লোক-কৃতি। লোক-কৃতি সমস্ত সমাজ কর্তৃক রক্ষিত হয়েছিল। লোক-পরম্পরায় এই কৃতি সঞ্চারিত হয়েছিল। ঐতিহ্যের সূত্র ধরে সাঙ্গীকরণের বৈশিষ্ট্য মেনে চলে তা আজও সমাজে কোনো না কোনো ভাবে চলে আসছে। লোক-কৃতিতে অতীতের কাহিনীর স্মৃতি এবং বর্তমানের সমাজজাত মানুষের চিন্তা-ভাবনা সহজভাবেই স্থান পায়।

'ফোক্-লোর' নিয়ে বিশ্ব জোড়া এই আন্দোলনে দুটি ধারা বিদ্যমান। একটি ধারায় নিষ্ক্রিয় রোমান্টিকতা আর একটি ধারায় বস্তুতান্ত্রিক বাস্তবতাবোধ সুস্পষ্ট। প্রথম ধারাটিতে লোক-কৃতির সংগ্রহ, সংরক্ষণ আছে, আছে তার ভাববাদী মূল্যায়ন অর্থাৎ বস্তুনিরপেক্ষ মূল্যায়ন। মূলত এঁরা ফুলকে দেখেন; কিন্তু ফুলের নিচে যে-বৃক্ষ আছে, শিকড় আছে, মাটি আছে, আছে আলো বাতাস, তার কোনো খোঁজ নিতে প্রগাঢ় উৎসাহবোধ করেন না। তাই এঁরা অনেক সময় মাঝপথে থেমে যান, মনগড়া ব্যাখ্যা উপস্থিত করেন।

দ্বিতীয় ধারা প্রথম ধারা অপেক্ষা বয়সে নবীন হলেও সজীব, সচল দৃষ্টিভঙ্গিতে সঞ্জীবিত। সংগ্রহ এবং সংরক্ষণের সঙ্গে সঙ্গে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুনির্ভর মূল্যায়নের এঁরা পক্ষপাতী। এঁরা মনে করেন মাটির উপরে গাছ, গাছের শাখায় ফুল। তাই লোক-কৃতির মূল্যায়নেও এঁদের কাছে মানুষের স্থান প্রধান

হয়ে ওঠে। এঁদের ধ্যান ধারণার পরিধি ক্রমপ্রসারিত হচ্ছে, এঁদের মূল্যায়ন ব্যাপকতর ভিত্তিতে স্থান গ্রহণ করছে। মনুষ্য-কৃতির পূর্ণাঙ্গতার সমাজনির্ভর সাধনা এঁদের কর্মযজ্ঞে রয়েছে।

বাঙলা দেশের লোক-কৃতি চর্চ্চায় এ দুটি ধারা অস্পষ্ট হলেও একেবারে অজ্ঞাত নয়। সংগ্রহ এবং সংরক্ষণে উভয় ধারার মধ্যে কোনো বিরোধ নেই; বিরোধ মূল্যায়নের গভীরে। অবশ্য বাঙলা দেশে সংগ্রহ এবং সংরক্ষণের প্রাথমিক কাজের সম্পূর্ণতা আসেনি। আজও লোক-কৃতির একটি জাতীয় মিউজিয়াম গড়ে ওঠেনি। অথচ ভারতবর্ষ লোক-কৃতিতে সমৃদ্ধশালী একটি দেশ, এ বিষয়ে বাঙলা দেশও সমৃদ্ধ।

বাঙালি মনীষীদের সাধনায়, ব্যক্তিগত কর্মপ্রচেষ্টায় বাঙলা দেশে লোক-কৃতির চর্চ্চা প্রসারিত হয়েছে। এই চর্চ্চা কেরালা, মহারাষ্ট্র, কাশ্মীর, হরিয়ানা প্রভৃতি রাজ্যেও শুরু হয়েছে। এ সবই চলেছে প্রধানতঃ ব্যক্তিউদ্যোগে। সমবেত কাজ যে কিছুই হচ্ছে না তা নয়, কিন্তু তা প্রয়োজনের তুলনায় কম; এক্ষেত্রে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পীড়াদায়ক বিরোধ আছে।

সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকার তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ রাজ্যস্তরে বাঙলা লোক-কৃতির একটি আলোচনা চক্রের আয়োজন করেছিলেন। ব্যাপক ধরনের লোক-কৃতির আলোচনা-চক্র বাঙলা দেশে এই প্রথম হলো, সম্ভবতঃ ভারতবর্ষের মধ্যেও প্রথম। বাঙলা লোক-কৃতির উনিশটি শাখার উপর উনিশটি প্রবন্ধ এখানে পেশ করা হয়; তার উপর আলোচনাও হয়।

বাঙলা লোক-কৃতির একটি পূর্ণাঙ্গ কাঠামো তুলে ধরবার এই প্রয়াস অভিনন্দনযোগ্য। লোক-সাহিত্য, লোক-কৃতি, লোক-দেবদেবী, লোক-ধর্ম, লোক উৎসব-লোক-শিল্প, লোক-ভাষ্য, লোক-বিশ্বাস, লোক-সঙ্গীত, লোক-নৃত্য, লোক-নাট্য, লোক-সাহিত্য ও সাম্প্রদায়িক ঐক্য ইত্যাদি লোক-কৃতির বিভিন্ন শাখা বাঙলা দেশে কিভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে, পরিপুষ্ট হয়েছে এবং বর্তমান সমাজ-জীবনে কিভাবে অবস্থান করছে তার উপর এই প্রথম সমবেত আলোচনা ও মূল্যায়নের সূচনা হলো। এই প্রয়াস ও সূচনাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া প্রয়োজন।

বাঙলা লোক-কৃতির পূর্ণাঙ্গ মূল্যায়নে বাধা আছে। যে ভূমিখণ্ডে, যে জনজীবনকে ও সামাজিক পরিবেশকে আশ্রয় করে বাঙলার লোক-কৃতি আবির্ভূত ও বিকশিত হয়েছিল রাষ্ট্রীয় কারণে তা এখন বহু খণ্ডিত। বৃহৎ

বাঙলা আজ নেই। বাঙলা লোক-কৃতির চর্চা করতে হলে বৃহৎ বাঙলায় এবং সেই বাঙলায় বসবাসকারী জনসাধারণের মধ্যে বিচরণ করতে হয়। কিন্তু তা কি এখন সম্ভব? শ্রী রাধাকমল মুখোপাধ্যায় 'বিশাল বাঙলা' পুস্তিকায় সেই বাঙলার একটি চিত্র তুলে ধরেছিলেন "দক্ষিণ পশ্চিমে ছোটনাগপুরের লোহিত, বন্ধুর উপত্যকা ও তালীবনবেষ্টিত সাগরকূলের বালেশ্বর, উত্তর পশ্চিমে হিমালয়ের সানুদেশে ভাগলপুর ও পূর্ণিয়া এবং পূর্বদিকে আসামের সুরমা নদী ও ব্রহ্মপুত্র নদের বিপুল বারিধারা প্লাবিত সমতল উদ্যান ও স্নিগ্ধ বনানী বাঙলার সীমানা। বাঙলার ইহাই প্রাকৃতিক পূর্ণাবয়ব।"

তবু ষষ্ঠ অধিবেশনে রাজ্যসরকারের এই প্রয়াসকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য শ্রী গোপাল হালদার মহাশয় অভিনন্দন জানিয়ে কয়েকটি সুপারিশ আলোচনা-চক্রে পেশ করেন। তার মধ্যে ছিল (১) প্রতিটি শাখার উপর আরও গভীর অনুশীলন; (২) এই আলোচনা চক্রের প্রবন্ধ এবং আলোচনাগুলি সুলভ মূল্যে গ্রন্থাকারে প্রকাশ; (৩) আঞ্চলিক ভিত্তিতে আলোচনা চক্রের আয়োজন, (৪) লোক-কৃতির সংরক্ষণ ও চলচ্চিত্রের মাধ্যমে তা জনপ্রিয় করবার আয়োজন এবং (৫) লোক-কৃতি চর্চায় কর্মরত কর্মীদের সরকারি অনুদান ইত্যাদি।

তথ্য ও জনসংযোগ অধিকর্তা শ্রী প্রকাশ স্বরূপ মাথুর মহাশয় সমাপ্তি ভাষণে প্রায় অধিকাংশ সুপারিশ গ্রহণ করে বলেন, লোক-সংস্কৃতি আলোচনা চক্রের সমাপ্তি আমাদের নতুন করে যাত্রার সূচনা করছে। তিনি বিশেষজ্ঞদের সাহায্য কামনা করেন।

বাঙলা লোক-কৃতি চর্চার পূর্ণাঙ্গ রূপরেখার এই সূচনা সমবেত উদ্যোগ ও কর্মের মধ্যে দিয়েই সার্থক হতে পারে এবং এই কাজে লোক-কৃতি চর্চায় যাঁরা নিযুক্ত আছেন তাঁদের অগ্রণী ভূমিকা পালন করা প্রয়োজন।

মানিক সরকার

ভেরা নভিকোভা

এ-বছর রবীন্দ্রপুরস্কার পেলেন প্রখ্যাত রুশ গবেষক শ্রীযুক্তা ভেরা নভিকোভা। গত ১৩ই ফেব্রুয়ারি কলকাতায় এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে তিনি রাজ্যপাল শ্রীশান্তিস্বরূপ ধাওয়ানের কাছ থেকে পুরস্কার গ্রহণ করলেন। শ্রীযুক্তা

নভিকোভাকে এ-পুরস্কার দেওয়া হলো বঙ্কিমচন্দ্রের উপর তার গবেষণাগ্রন্থ "বঙ্কিমচন্দ্র—জীবন ও সৃষ্টির" জন্য।

এই প্রথম একজন রবীন্দ্রপুরস্কার পেলেন যিনি জন্মসূত্রে ভারতীয় নন। সেদিক দিয়ে তো বটেই, তাছাড়া ভারত-সোভিয়েত সাংস্কৃতিক যোগাযোগের ভিত্তি দৃঢ়তর করবার ব্যাপারেও এ-পুরস্কার অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য।

খুব অল্প বয়স থেকেই শ্রীযুক্তা নভিকোভার বাঙলা ভাষার উপর অনুরাগ জন্মায়। তিনি যখন খুবই ছোট, তখন তাঁর শহর লেনিনগ্রাদে একজন বাঙালি ভদ্রলোক তাঁকে কিছু বাঙলা শব্দ শেখান। ব্যাপারটা শুরু হয়েছিল নিতান্তই শখ হিসেবে। কিন্তু এই শখই পরবর্তীকালে গভীর অনুরক্তিতে পরিবর্তিত হয়। ফলতঃ তিনি এখন লেনিনগ্রাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় ভাষাসমূহের বিভাগীয় প্রধান।

বিপ্লবের কিছুদিন পরে সোভিয়েত জনগণের সঙ্গে পৃথিবীর ঐশ্বর্যময় সংস্কৃতিগুলির পরিচয় ঘটিয়ে দেবার প্রয়াসে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত ভাষা বিভাগের পত্তন হয়। দায়িত্ব নেন সেকালের বিখ্যাত সংস্কৃত পণ্ডিত ও বৌদ্ধ দর্শনে বিশারদ একাদেমিশিয়ান শ্চেরবিৎস্কি। আর নভিকোভা ছিলেন তাঁর প্রথম দলের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে অন্যতম। আরো পরে, ১৯৩৫ সালে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে আধুনিক ভারতীয় ভাষাসমূহের শিক্ষাদান শুরু হলে তিনি বাঙলাকেই তাঁর শিক্ষণীয় বিষয় হিসেবে বেছে নেন।

বাঙলাভাষায় অধ্যাপিকার প্রথম গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো ১৯শ শতকের বাঙলা গদ্যের সংকলন, যাতে প্রত্যেক লেখক সম্পর্কে পরিচয় দিয়ে ছোটখাট নোটও ছিল। এছাড়া ছাত্রছাত্রীদের প্রয়োজনার্থে তিনি নির্বাচিত বাঙলা শব্দের একটি অভিধানও রচনা করেন। অবশ্য, তাঁর পুরস্কারপ্রাপ্ত গ্রন্থ "বঙ্কিমচন্দ্র—জীবন ও সৃষ্টি'ই তাঁর জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা।

স্বভাবতই শ্রীযুক্তা নভিকোভা বাঙলাদেশকে ভালোবাসেন। এটি তাঁর তৃতীয়বার বাঙলায় আসা। এর আগে, ১৯৬১ সালে এসেছিলেন দিন-দশেকের জন্য। কিন্তু ১৯৫৪ সালে যখন তিনি এখানে আসেন তখন প্রায় বছরখানেক ছিলেন। সে-সময়ই তিনি তাঁর গবেষণাগ্রন্থের জন্য উপাদান সংগ্রহের কাজ করেন।

বহুকাল ধরেই ভারতবর্ষের তথা বাঙলার সংস্কৃতি ভারতপ্রেমিক বিদেশীদের দানের কাছে বিভিন্নভাবে ঋণী। উইলিয়ম জোনস,ম্যাক্সমুলার, এমনকি রবীন্দ্র-

সন্নিধানে দীনবন্ধু এণ্ড্রুজ থেকে শুরু করে অনেক মনীষীই তাঁদের ভালোবাসার দানে সমৃদ্ধ করে গেছেন ভারতের ভাষা ও সংস্কৃতিকে। এইতো কিছুদিন আগেও দুশাল জবাভিতেল ময়মনসিংহ গীতিকার মতো গ্রন্থের গবেষণার জন্য সকলের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়ে রইলেন।

নভিকোভাকে পুরস্কৃত করে সে ঋণস্বীকারের দায়িত্ব গ্রহণ করায় পুরস্কার কর্তৃপক্ষ আমাদের ধন্যবাদার্হ। আর এই সূত্রে অন্বয়ের আলোয় আমরা যদি আমাদের সংকীর্ণ অস্তিত্বের দুরপণেয় দুস্থতাকে কিছু পরিমাণে কাটাতে পারি তবে তা হবে আমাদের উপরিপাওনা।

শুভ বসু

মৃত্যুহীন কমিউন

এ-বছর ১৮ই মার্চ তারিখে বিশ্বের দেশে দেশে 'পারী কমিউন-এর শতবার্ষিকী স্মরণদিবস পালিত হয়েছে। একশো বছর আগে, ফ্রান্সের রাজধানী পারীতে শ্রমজীবী মানুষ যে মুক্ত ও স্বাধীন রাষ্ট্রব্যবস্থার ইঙ্গিত দিয়েছিলেন, আজও তা দেশে দেশে নির্বিত্ত শ্রেণীর কাছে আদর্শ হয়ে আছে। পারীর নির্বিত্ত-শ্রেণীর পরীক্ষিত সত্যগুলি বৈজ্ঞানিক ভাবে নানা সমাজতান্ত্রিক দেশে কার্যকরী হয়েছে। আজকের সমাজতান্ত্রিক দুনিয়া এক অর্থে পারী কমিউনের উজ্জ্বল দিকগুলিরই বিশিষ্ট বিকাশ।

ফ্রান্সের আধুনিক ইতিহাসে, বিশেষভাবে প্রথম ফরাসী বিপ্লবের সময় থেকে, শ্রমজীবী মানুষের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা আছে। ফরাসী বিপ্লবের পর থেকে তো অবধারিতভাবে নতুন আর্থনীতিক ও রাজনীতিক পরিপ্রেক্ষিতের দাক্ষিণ্যে কোনো বিপ্লবই ফরাসী দেশে নির্বিত্ত বা প্রোলেটারিয়ান চরিত্র না দিয়ে পারেনি। অর্থাৎ প্রতিটি বিপ্লবেই নির্বিত্তশ্রেণী যেমন প্রচুর রক্ত দিয়েছেন, সঙ্গে সঙ্গে বিপ্লবের বিজয়ের অব্যবহিত পরেই শ্রমজীবী মানুষ তাদের দাবিগুলিকে অগ্রাধিকার দেবার জন্য সংগ্রাম চালিয়েছেন। সব সময় যে দাবিগুলি খুব পরিষ্কার ছিল, এমন কথা বলা যায় না। কিন্তু পুঁজিপতি ও শ্রমজীবী শ্রেণীর পরস্পর বৈরিতার নিরাকরণের দিকে সেগুলির স্পষ্টত বৈপ্লবিক ঝোঁক ছিল। ফলে পুজিবাদী সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার বিরুদ্ধেই আসলে ছিল সেই প্রতিবাদ ও দাবিগুলির লক্ষ্য। আর সে দাবি জানাত সশস্ত্র শ্রমিকশ্রেণী।

বিপ্লবের অব্যবহিত পরে যেমন নির্বিত্তদের অধিকার সম্প্রসারণের দাবি উঠত, সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রের অধিপতি শ্রেণী অর্থাৎ পুঁজিপতি শ্রেণী বারবার তাদের নিরস্ত্র করার প্রচেষ্টা চালাত। বিপ্লবের বিজয়ে যারা সবচেয়ে সক্রিয় অংশ নিত, বিপ্লবের বিজয়ের পর পুঁজিপতিদের আক্রমণে পুনর্বার বহু রক্তদান করে সেই নির্বিত্তদের পরাজয় বরণ করে নিতে হতো। এই ছিল উনবিংশ শতাব্দীর ফরাসীদেশে বিপ্লবগুলির গুরুত্বপূর্ণ দিক।

এঙ্গেলস দেখিয়েছেন, এমন ব্যাপার প্রথম ঘটে ১৮৪৮ সালে। পার্লামেন্টের উদারপন্থী বুর্জোয়ারা তখন বিরোধী দলে ছিল। ভোটাধিকার সংস্কারের জন্য তারা লড়ছিল। দলকে সর্বেসর্বা করাই ছিল তাদের লক্ষ্য। সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রামে ক্রমশ তাদের সংগে যোগ দিল বামপন্থী ও লোকতন্ত্রী স্তরের বুর্জোয়ারা এবং পেটি বুর্জোয়ারা। এদের পেছনে ছিল শ্রমিকশ্রেণী। ১৮৩০ সাল থেকে শ্রমিক শ্রেণী অনেক বেশি সংগঠন ও উদ্দেশ্য বিষয়ে সচেতনও ছিল। সরকার ও বিরোধী দলের মধ্যে যখন সঙ্কট তীব্র হলো, শ্রমিকশ্রেণী রাস্তায় ব্যারিকেড গড়ে তুলল। চলল লড়াই। লুই ফিলিপ্পির রাজত্ব শেষ হলো, ভোটাধিকারের সংস্কার হলো, প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠীত হলো, শ্রমিকশ্রেণী খুশি হয়ে এ-প্রজাতন্ত্রের নাম দিল 'সমাজ' প্রজাতন্ত্র! কিন্তু 'সমাজ' প্রজাতন্ত্র যে কি জিনিষ শ্রমিকরাই কি তা জানতেন? বরং তাদের মধ্যে ধারণা জন্মেছিল, বড় বড় গালভরা গণতান্ত্রিক বুলি যারা বলছিলেন, সেই বামপন্থী বুর্জোয়ারা বোধহয় শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষাই করবেন। কিন্তু ফ্রান্সে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ছিল তখন বুর্জোয়ারা ও শ্রমিকেরা। সামন্ততন্ত্র মৃতপ্রায়, পুঁজিবাদ রাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠিত, সুতরাং স্বাধীন বুর্জোয়ারাষ্ট্রে বুর্জোয়াদের গণতান্ত্রিক ভূমিকা তখন শেষ হয়ে গেছে। ফলে যে শ্রমিকদের সাহায্যে প্রজাতন্ত্রী বুর্জোয়ারা ক্ষমতা দখল করল, নিজেদের প্রশাসনিক, আর্থনীতিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতা যখন দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল, তারা আক্রমণ চালাল সশস্ত্র শ্রমিকদের উপরে। শ্রমিকদের আত্মসমর্পণ করতে হবে বলে তারা দাবি জানাল। শ্রমিকশ্রেণীর উপরে সশস্ত্র আক্রমণ শেষ পর্যন্ত তাদের সশস্ত্র অভ্যুত্থানের দিকে ঠেলে দেয়। সরকার ঢের দিন ধরে প্রস্তুতি করেছে এই আক্রমণের জন্য। ফলে পাঁচদিন ধরে পারীর রাস্তায় রাস্তায় চলল শ্রমিক-খুন! শ্রমিকরা পরাস্ত হলেন। তারপর নিরস্ত্র বন্দীদের বধ করা হলো। পারীর রাস্তা শ্রমিকের রক্তে কর্দমাক্ত হলো। ক্ষমতা লোলুপ বুর্জোয়ারা যে কত নিষ্ঠুর হতে পারে, তা প্রমাণ হলো প্রথম। তবে এঙ্গেলস বলছেন, ১৮৭১এর

পারী কমিউনের প্রতিষ্ঠাতা ও রক্ষক শ্রমজীবী মানুষকে বুর্জোয়ারা যেমনভাবে হত্যা করে, তার কাছে ১৮৪৮ সালের হত্যাকাণ্ডকে শিশু বলা চলে।

যাইহোক বুর্জোয়ারা ক্ষমতা দখলের জন্য যে শক্তির মদমদত্তা দেখাল তার ফল ফলতে দেরি হলো না। গৃহযুদ্ধের পরিস্থিতি তখনও বর্তমান। কে ফ্রান্সকে শাসন করবে? অন্তত ঐ সময়ে নির্বিত্তরাও শাসন করার মতো ক্ষমতাধারী নয়, বুর্জোয়ারাও নয়। তার উপরে বুর্জোয়াদের হরেক দলের মতামত হরেক রকম। বুর্জোয়াদের অধিকাংশ তখনো মনে-প্রাণে রাজতন্ত্রী। তিনটি রাজতন্ত্রী পার্টিতে তারা বিভক্ত। চতুর্থটি প্রজাতন্ত্রী ঘরানার। রাজতন্ত্রীদের সাধ, প্রথম নেপোলিয়নের মতো জবরদস্ত কেউ সম্রাট হোন। তাঁর একনায়কতার ছত্রছায়ায় বসে শোষণের মুনাফা কুড়ানো যাবে। সঙ্গে সঙ্গে উগ্র জাতীয়তাবাদী রণবাদ্যের আওয়াজে শ্রমজীবী মানুষদেরও বিভ্রান্ত করা যাবে। বুর্জোয়াদের কোনো কোনো অংশ নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের স্বপ্নও দেখছিল। বুর্জোয়াদের সেই আত্মকলহের মধ্য দিয়ে 'গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল' ধরনের এক উচ্চাভিলাসী ব্যক্তি প্রথমে প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি (১৮৪৮) এবং পরে সম্রাট হয়ে বসলেন। নাম লুই বোনাপার্ট। এই উচ্চাভিলাসী ব্যক্তিটির গুণের ঘাটতি ছিল না। ১৮৪০ সালে দু-দুবার ফ্রান্সে বোনাপার্টিস্ট অভ্যুত্থান করার চেষ্টা করেছিলেন, লুই ফিলিপ্পির জুলাই রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে। ১৮৪৮এর এপ্রিল মাসে ইংলণ্ডে চার্টিস্টদের শোভাযাত্রা আক্রমণ করার জন্য যে ঠেঙাড়ে বাহিনী গড়া হয়, লুই নেপোলিয়ন বোনাপার্ট তাতে স্পেশাল কনস্টেবল হয়েছিলেন। ১৮৪৮ সালে ফ্রান্সের বিপ্লবকে রক্তগঙ্গায় ভাসিয়ে শ্রমিকদের ঠেঙাবার জন্য বুর্জোয়ারা লুই-এর চেয়ে এমন ধুরন্ধর আর কাকে পাবে? লুই বোনাপার্ট সামরিক বাহিনী, পুলিশ, প্রশাসনিক যন্ত্র আগেই হাত করেছিলেন, তারপর তাদের যুগপৎ সহায়তায়, ২রা ডিসেম্বর ১৮৫১ ক্যু দে তার মধ্য দিয়ে সম্রাটের ক্ষমতায় আসীন হলেন। নেপোলিয়ন উপাধী ধারণ করে সম্রাট হলেন তিনি। শুরু হলো 'দ্বিতীয় সাম্রাজ্য'। একঝাঁক রাজনীতিক ও অর্থগত উচ্চাভিলাসীর মৃগয়াক্ষেত্র হলো ফ্রান্সে। লুই বোনাপার্ট ক্ষমতা দখল করেছিলেন করার ভেলকিতে। বলেছিলেন, তিনি বুর্জোয়াদের রক্ষা করবেন শ্রমিকদের হাত থেকে, শ্রমিকদের বুঝিয়েছিলেন বুর্জোয়াদের হাত থেকে শ্রমিকদের রক্ষা করার জন্য তিনিই একমাত্র পরিত্রাতা। যাই হোক বৃহৎ পুঁজিপতিদের রবরবা হলো। ফাটকাবাজি ও শিল্পবিকাশ বেড়ে চলল। পুরো বুর্জোয়াশ্রেণীই লাভবান হলো।

তাতে। দেশময় রাজকীয় মাপের জাল-জুয়াচ্চুরি বেড়ে চলল রাজসভার ভেতর-বাইরে।

ওদিকে ১৮৬৬ সালে অষ্ট্রিয়া আর প্রাসিয়ার মধ্যে লড়াইয়ে প্রাসিয়া জিতল। জার্মানীর একীকরণ শুরু হলো। বিসমার্ক জার্মানীর বুর্জোয়া ও বৃহৎ ভূম্যাধিকারীদের পরিত্রাতা হিসাবে দেখা দিলেন।

ফ্রান্সে চলেছে তখন ফরাসী সঙ্কীর্ণ জাতীয়তাবাদের জিগির।

ফরাসী রাজতন্ত্রী বুর্জোয়ারা সীমান্তের বিস্তার চায়। চায় প্রথম নেপোলিয়নের আমলের ফরাসী সাম্রাজ্যের স্বপ্ন দেখতে। চায় বিকশিত বাজার, বিস্তৃত কাঁচামালের উৎস-অঞ্চল এবং ব্যাপ্ত শোষণের সাম্রাজ্য। ইতিমধ্যে ক্রিমিয়ার যুদ্ধে লুই বৃটেনকে সাহায্য করে পারীর শান্তি কংগ্রেস এর (১৮৫৬) নায়ক হয়েছেন। মেক্সিকোয় ফরাসী প্রভাবাধীন 'সাম্রাজ্য' প্রয়াসী হয়েছেন সেখানকার বিস্তারে প্রজাতন্ত্রকে অস্বীকার করে। রাইন নদীর পূর্বতীরও তাঁর দরকার। চাইলেই তো আর পাওয়া যায় না। ওপারে মুখিয়ে আছে প্রাসিয়ার সৈন্য। তাদের প্রভুদের লক্ষ্যও তো একই। ১৮৬৬ সালের প্রাসিয়া-অষ্ট্রিয়ার যুদ্ধের ফলাফলের দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলেন লুই। প্রাসিয়া তখনও তাঁর বন্ধু। কিন্তু যুদ্ধের ফলস্বরূপ অর্জিত অঞ্চল প্রাসিয়া নিজেই গ্রাস করল। এবার আর হতাশ ফরাসী বুর্জোয়াদের ঠেকান গেল না। ১৮৭০ সালে ফ্রাঙ্কো-প্রাসিয়ার যুদ্ধ বাধল। সেপ্টেম্বর ২, ১৮৭০ সেডানের যুদ্ধে ফরাসী সৈন্য পরাস্ত হলো। বন্দী হলেন লুই। ১৮৭০এর সেপ্টেম্বরের পাঁচ তারিখ থেকে ১৯শে মার্চ, ১৮৭১ পর্যন্ত বেচারা বন্দী রইলেন কামেল-এর কাছে ভিলহেলম শোহে-এর প্রাসিয়ান রাজদুর্গে।

২রা সেপ্টেম্বর সেডানের যুদ্ধ শেষ। সাম্রাজ্য ভেঙে পড়ল যেন তাসের ঘর। পারীতে বিপ্লব দেখা দিল ৪ঠা সেপ্টেম্বর, ১৮৭০। আবার প্রজাতন্ত্র ঘোষিত হলো। কিন্তু পারীর দেউড়িতে তখন প্রাসিয়ার বাহিনী। 'সাম্রাজ্যের বাহিনী' বিধ্বস্ত, পলায়নপর, মেৎস-এ হয় তারা চতুর্দিকে ঘেরা, অথবা জার্মানীতে বন্দী। তখন সেই সঙ্কটের যুগে পারীর প্রতিরক্ষার জন্য আগেকার বিধানসভার পারীর প্রতিনিধিদের নিয়ে 'জাতীয় প্রতিরক্ষা সরকার' গঠন করার সুযোগ দিল জনগণ। যারাই অস্ত্রধারণ করতে সক্ষম, সবাইকেই 'ন্যাশনাল গার্ড' বাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত করা হলো। আর সেখানে সংখ্যাধিক্য হলো স্বাভাবিক-ভাবেই শ্রমজীবীদের।

কিন্তু বেশিদিন গেল না। হোটেল দ্য ভিল-এ (টাউনহল) অবস্থিত বুর্জোয়া প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত সরকার আর অধিক সংখ্যায় শ্রমজীবীদের নিয়ে গঠিত সশস্ত্র ন্যাশনাল গার্ডের মধ্যে শান্তি বজায় রইল না। আসলে যারা 'জাতীয় প্রতিরক্ষার সরকারে'র কর্ণধার হলেন, তাঁদের সবাই ছিলেন সুযোগসন্ধানী। ঝানু ব্যারিস্টার থায়ার্স হলেন তাঁদের নেতা, ত্রচু তাঁদের সেনানায়ক, ফাভরে তাঁদের পররাষ্ট্র মন্ত্রী। অথচ যে শ্রমজীবী মানুষকে তাঁরা আহ্বান জানালেন পারীর রক্ষায়, সেই শ্রমিকদের নেতারা তখনও জেলখানায়। সরকারের নায়কেরা জানতেন, শ্রমিকদের সশস্ত্র করা ছাড়া পারীর প্রতিরক্ষা অসম্ভব। অথচ ছিল দোটানা। তাঁরা জানতেন, সশস্ত্র পারী মানেই সশস্ত্র বিপ্লব। আর সেই বিপ্লবী বাহিনীর হাতে প্রাসিয়ান সৈন্যদের পরাজয়ের অর্থই হলো ফ্রান্সের বুর্জোয়াদেরও পরাজয়, তাদের পরগাছা রাষ্ট্রের পরাজয়। এই দোটানায় পড়ে মার্কসের ভাষায় বলতে গেলে বলতে হয় 'Government of National Defence, এক মুহূর্তও দেরী না করে একেবারে 'Government of National Defection' হয়ে পড়ল। জাতীয় কর্তব্য ও শ্রেণীস্বার্থ এ-দুটির মূল্যায়নে বুর্জোয়ারা শ্রেণীস্বার্থকেই অগ্রাধিকার দিল।

ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য সুযোগসন্ধানী ও বুর্জোয়াদের প্রতিনিধি এই সরকারের কর্ণধাররা যতটুকু পারে ততটুকু গুছিয়ে নিতে চাইল।—থায়ার্সকে প্রথমে ইউরোপের রাজসভাগুলিতে ঘোরানো হলো, "There to beg mediation by offering the barter of the Republic for a king." চারমাস অবরোধের পর, তাঁরা সুযোগ বুঝে প্রাসিয়ানদের পায়ে আত্মসমর্পণের কথা ভাবলেন। পারীর পৌরপিতাদের সামনে জুলে ফাভরের উপস্থিতিতে ত্রচু বললেন, "the attempt of Paris to hold out a siege by the Prussian army would be a folly"—এ-কথা তিনি চৌঠা সেপ্টেম্বরই তাঁর সহকর্মীদের কাছে বলেছিলেন। হায় এই ত্রচুই ছিলেন 'জাতীয় প্রতিরক্ষা' সরকারের সেনাপতি!

তাহলে থায়ার্স, ত্রচু, ফাভরে এঁরা কি করছিলেন? যদি তাঁরা প্রথম থেকেই জানতেন পারীর প্রতিরক্ষা সম্ভব নয়, তবে ৫ই সেপ্টেম্বরই তাঁরা পদত্যাগ করলেন না কেন? ২৮-এ জানুয়ারি ১৮৭১, মুখোস খসে পড়ল। বিসমার্কের বাহিনীর পায়ের ধূলোয় মাথা নুইয়ে বিসমার্কের 'বন্দী ফ্রান্সের সরকার' রূপে চিহ্নিত হলেন তারা। এ-সব কিছুর গন্ধ পেয়েই ৩১-এ অক্টোবর

১৮৭০, শ্রমিকদের বাহিনী টাউন হল আক্রমণ করে। এবং সরকারের কয়েকজন সদস্যকে গ্রেপ্তার করে। সরকারের ভুয়া প্রতিশ্রুতি এবং 'বাবু'দের নিয়ে গঠিত সৈন্যবাহিনীর চাপ ঐ সদস্যদের মুক্ত করে। আর অবরুদ্ধ নগরে এ-মুহূর্তেই গৃহযুদ্ধ অবাঞ্ছিত মনে করে শ্রমিকেরা ঐ সরকারকেই কাজ চালাবার সুযোগ দিয়ে ফিরে আসে।

২৮এ জানুয়ারি অনাহারে জর্জরিত পারী আত্মসমর্পণ করল। কিন্তু যুদ্ধের ইতিহাস এক অভূতপূর্ব ব্যাপার ঘটাল। দুর্গগুলি হস্তান্তরিত হলো, নগরের প্রাচীর থেকে কামানগুলি খুলে নেওয়া হলো, মোবাইল গার্ড আত্মসমর্পণ করল, তারা নিজেদের যুদ্ধবন্দী বলে মনে করল। কিন্তু পারীর শ্রমিকবাহিনী? না, তারা অস্ত্রসমর্পণ করল না। তারা আলাদাভাবে প্রাসিয়ানদের সঙ্গে 'সন্ধি' করল। ন্যাশনাল গার্ড-এর হাতে রইল তার কামান, বন্দুক, অস্ত্রশস্ত্র। বিজয়ী প্রাসিয়ান সৈন্যরা পারীতে প্রবেশ করতে সাহস পেল না। পারীর একাংশে, যেখানে বড়লোকদের বাড়ি ঘর, সে অঞ্চলে কয়েকটি সর্বসাধারণের জন্য ব্যবহার্য পার্কে তারা শিবির গেড়ে রইল। তাও মাত্র কদিনের জন্য। তারা অবরোধ করতে এসেছিল পারী। তাদের ঘিরে সশস্ত্রভাবে তৈরি রইল ন্যাশনাল গার্ড। ফ্রান্সের রাজকীয়বাহিনীকে হারিয়ে এসেছে যে প্রাসিয়ান সৈন্যরা, জমিদার-য়ুঙ্কারদের বাহিনী হিসাবে যারা বিপ্লবের সূতিকাগৃহে প্রতিবিপ্লবী হিসাবে প্রতিশোধ নিতে এসেছিল, তারাও সশ্রদ্ধভাবে বিপ্লবী ফ্রান্সের সন্তানদের সম্ভ্রম দেখাল।

ক্ষুধার্ত পারীতে শান্তি নামল। কিন্তু থায়ার্সদের চোখে ঘুম নেই। যতদিন সশস্ত্র শ্রমিক টহল দিচ্ছে, ততদিন বুর্জোয়ারা ঘুমায় কি করে? ১৮ই মার্চ তিনি ন্যাশনাল গার্ডদের হাত থেকে মমারত্রের কামান ছিনিয়ে আনতে সৈন্য পাঠালেন। কামানগুলি পারী অবরোধের সময় বানানো হয়েছিল। দরিদ্র পারীবাসীদের চাঁদায় তৈরি সে কামান। পারীবাসীরা তাদের সে কামান ছিনিয়ে নিতে দিল না। শুরু হলো প্রতিরোধের লড়াই। পারীর জনগণ আর ভের্সাই প্রাসাদে অবস্থিত বুর্জোয়া ও ভু-স্বামীদের সরকারের মধ্যে যুদ্ধ ঘোষিত হলো। প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে ২৬এ মার্চ পারী কমিউন গঠিত হলো। পারী কমিউনের নেতৃত্বে ছিলেন মুখ্যত ব্ল্যাঙ্কিপন্থী ও প্রুঁধপন্থীরা। মার্কসবাদীদের কমিউনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল না। এবং ২৮এ মার্চ পারী কমিউনের শাসন প্রবর্তিত হলো। এতদিন

পর্যন্ত ন্যাশনাল গার্ড-এর কেন্দ্রীয় কমিটিই সরকারের কাজ চালাচ্ছিলেন। তাঁরা পারী কমিউনের নেতৃত্বের কাছে দায়িত্ব হস্তান্তর করলেন। ইতিমধ্যে কমিউন পারীর কুখ্যাত 'নৈতিকতা-রক্ষী পুলিশ' বাহিনী তুলে দিয়েছেন।

পারীর কমিউন এরপর যেসব ঘোষণা ও কর্মসূচি গ্রহণ করে, তা বিশ্বের শ্রমজীবী মানুষের কাছে স্মরণীয় হয়ে আছে। ৩০এ মার্চ কমিউন বাধ্যতামূলক-ভাবে সৈন্যদলে যোগদান বা কনসক্রিপসন বাতিল করে। সদা সসজ্জ সামরিক বাহিনীকে ভেঙে দেওয়া হল। ঘোষণা করা হয় অস্ত্রবহনযোগ্য প্রতিটি নাগরিকই ন্যাশনাল গার্ডে যোগ দিতে পারবে। সশস্ত্র জনগণের বাহিনী ন্যাশনাল গার্ড একমাত্র সামরিক বাহিনী বলে ঘোষিত হলো। রাষ্ট্রের পীড়নমূলক শক্তি বলতে আমরা যে পুলিশ ও হুকুমপ্রত্যাশী সদাসসজ্জ সেনাবাহিনী বুঝে থাকি, কমিউন তাকে একেবারে বাতিল করে দিল। শ্রমিকশ্রেণীই যে-রাষ্ট্রের নায়ক, সে রাষ্ট্রশক্তির শত্রুশ্রেণীকে দমন করার শক্তি হলো সশস্ত্র জনগণ। এমনকি ঐ কমিউন আন্তর্জাতিকতার পরাকাষ্ঠা দেখাল বিদেশীদেরও কমিউনের নায়কতায় নির্বাচিত করে। বলা হলো কমিউনের পতাকা বিশ্বপ্রজাতন্ত্রের পতাকা। অক্টোবর ১৮৭০ থেকে এপ্রিল ১৮৭১ পর্যন্ত বাড়িভাড়া দেওয়া বাতিল করে দেওয়া হলো। ঐ ক-মাসের অধিকাংশ সময়ই ছিল অবরুদ্ধ পারীর দুর্ভিক্ষখিন্ন সময়। আর, যদি কেউ ঐ সময়ে বাড়িভাড়া দিয়েও থাকে, তাহলে ভবিষ্যতের ভাড়া মেটাবার খাতে সে টাকা জমা থাকবে ঠিক হলো। পৌরসভার ঋণ-দাতা বিভাগে বন্ধকী জিনিসপত্র ঋণ অপরিশোধের দায়ে বিক্রি করা বাতিল করা হলো।

প্রশাসনগত ব্যাপারে নতুন নিয়ম হলো। ১লা এপ্রিল ঘোষণা করা হলো, কমিউনের সবচেয়ে উচ্চপদস্থ ব্যক্তির বেতন কোনোক্রমেই ৬০০০ ফ্রাঁর চেয়ে বেশি হবে না। ৬০০০ ফ্রাঁ ছিল শ্রমিকদের সাধারণ মজুরির হার। তারপর দিনই কমিউন ঘোষণা করে ধর্ম (গীর্জা) ও রাষ্ট্রের মধ্যেকার সম্পর্ক ছিন্ন করা হলো। গীর্জার ধর্মমূলক কাজের জন্য সরকারী ব্যয়বরাদ্দ বন্ধ করা হলো। ফলে ৮ই এপ্রিল থেকে বিদ্যালয়গুলি থেকে ধর্মীয় চিহ্ন ইত্যাদিও অপসারিত হলো।

দিনের পর দিন ভার্সাই সরকার কমিউনের সৈন্যদের গ্রেপ্তার করে খুন করছিল। ৫ই এপ্রিল, ঘোষণা করা হলো, এরপর এ-ব্যাপার ঘটলে বিরুদ্ধ-পক্ষের লোকজনকে বন্দী করে জামিন হিসাবে রাখা হবে। কিন্তু এ ঘোষণা কার্যকর করা হয়নি। ৬ই এপ্রিল। গিলোটিন পুড়িয়ে দেওয়া হলো। ১২ই এপ্রিল

কমিউন ঘোষণা করে, ১৮০৯ সালে নেপোলিয়ন নানা দেশ দখল করে কামান এনে সেগুলি দিয়ে যে বিজয় স্তম্ভ তৈরি করেছিলেন তা গুঁড়িয়ে দেওয়া হোক। সঙ্কীর্ণ জাতীয়তার স্মরণ ও দম্ভচিহ্ন ঐ স্তম্ভ। ১৬ই মে তা কার্যকর হলো। মালিকরা যে-সব কলকারখানা বন্ধ রেখেছে সেগুলির সংখ্যা হিসাব করে, পুরনো শ্রমিকদের দিয়ে সমবায়মূলকভাবে চালানোর ব্যবস্থা করার জন্য ১৬ই এপ্রিল হুকুম বেরোল। ঠিক হলো, ঐ সমবায়মূলক কারখানাগুলিকে একটি কেন্দ্রীয় বৃহৎ সংগঠনে পরিণত করা। ২০এ এপ্রিল রুটি শ্রমিকদের রাতের কাজ রদ করা হয়। পুলিশকর্তৃক নিযুক্ত ব্যক্তিদের কর্মসংস্থানকেন্দ্রগুলির তত্ত্বাবধান থেকে সরিয়ে নিয়ে পারীর পৌরসভার কুড়িটি আঞ্চলিক পৌরপ্রতিষ্ঠানের হাতে সেগুলি ন্যস্ত করা হলো। ৩০এ এপ্রিল বন্ধকী দোকানপত্র বন্ধ করে দেওয়া হলো। বলা হলো, বাঁধা দেওয়ার নিয়ম শ্রমিকের উপরে ব্যক্তিগত শোষণকেই চালু করে, শ্রমিকের উৎপাদনের যন্ত্রপাতির অধিকার ও ঋণ পাবার অধিকার তা খর্ব করে। ফরাসী বিপ্লবকালে ষোড়শ লুই-এর শিরচ্ছেদের 'প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ' যে গীর্জা তৈরি হয়েছিল ৫ই মে তা মাটিতে মিশিয়ে দেওয়ার হুকুম হলো।

ওপরের যে হুকুমগুলির কথা উল্লেখ করা আছে, তার সবগুলিই লক্ষ্য করার মতো। পুরনো সমাজব্যবস্থার তা গোড়া ধরে নাড়া দেয়। কমিউনের এসব ডিক্রি নিয়ে ভালোমন্দের দিকগুলি চমৎকারভাবে ব্যাখ্যা করেছেন মার্কস, এঙ্গেলস ও লেনিন।

লেনিন বলেছেন যে শ্রমিকশ্রেণী পুরনো শাসনের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হয়ে পালন করছিল দুটি দায়িত্ব, প্রথমটি জাতীয়, অপরটি তাদের নিজেদের শ্রেণীর। বুর্জোয়াদের তথাকথিত 'দেশপ্রেমিক' শ্লোগানে সমাজতন্ত্রীরাও ধুয়া ধরেছিলেন। ১৭৮৯ সালের বিপ্লবের পর বুর্জোয়া ও শ্রমিকের এক শ্লোগানে মেলা অসম্ভব ছিল। ফ্রাঙ্কো-প্রাসিয়ান যুদ্ধের ঐ স্তরে, বুর্জোয়া শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহটাই একমাত্র ও অনন্যপথ খোলা ছিল। কিন্তু পারীর শ্রমজীবী মানুষ 'জাতীয় প্রতিরক্ষা সরকার' গড়ার সুযোগ দেয় বুর্জোয়াদের।

তবু যখন নির্বিত্তরা ক্ষমতা দখল করল। তারা দুটি গুরুত্বপূর্ণ ভুল করে। এক, তারা বিপ্লবের মাঝপথেই থেমে যায়, "অপহারকদের নিকট থেকে অপহরণ" না করে, উচ্চতর ন্যায়ের আদর্শ দেখাবার জন্য তারা ব্যাঙ্ক অব ফ্রান্স অধিকার করেনি। প্রুধঁপন্থীদের 'ন্যায়ানুগ বিনিময়' ভিত্তিক মনোভাব তখনও চালু ছিল। তাই পুঁজিপতিদের মূল হৃদযন্ত্র রয়েছে যে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক, সেখানে

হাত না দিয়ে কমিউন ভ্রান্তির পরাকাষ্ঠা দেখায়। দ্বিতীয় ভুল ছিল, শত্রুদের ধ্বংস না করে তাদের হৃদয় জয় করার মনোভাব। অর্থাৎ যখন ভার্সাই সরকারকে ধুলোয় লুটিয়ে দেওয়া যেত, তখন অনাবশ্যকভাবে কমিউন কালহরণ করেছে। গৃহযুদ্ধের সময়কার সামরিক তৎপরতাকে অনেকখানি খাটো করে দেখেছিল কমিউন।

কমিউন অনেকটা প্রায় স্বতস্ফূর্তভাবে গড়ে উঠেছিল। প্রথম দিকে বহু ব্যক্তি একে সমর্থন করেন। তথাকথিত দেশপ্রেমিকরা ভেবেছিলেন যে, কমিউন জার্মানদের যুদ্ধে হারিয়ে দেবে। ছোট দোকানদাররা ঋণমুক্তির জন্য সাহায্য পেতে কমিউনকে সমর্থন করে। এমনকি প্রজাতন্ত্রী বুর্জোয়ারাও অনেকে কমিউনকে সমর্থন করে, তাদের ভয় ছিল পাছে রাজতন্ত্র পুনপ্রতিষ্ঠিত হয়। বুর্জোয়া রিপাব্লিকানরা শ্রমিক রাষ্ট্রের প্রোলেটারিয়ান চরিত্র দেখে সরে যায়। পেটি বুর্জোয়ারা কমিউনের পরাজয় সুনিশ্চিত দেখে ভেগে যায়, শুধু রইল শ্রমজীবীরা। কেন? কমিউন যে তাদেরই সরকার। শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তিই যে কমিউনের লক্ষ্য ছিল। শ্রমিকশ্রেণী-যে নিজেদের মুক্তির সংগ্রামে অন্যান্য শোষিত শ্রেণীকেও মুক্ত করে।

পুরোনো বন্ধুদের দ্বারা পরিত্যক্ত পারীর শ্রমিকশ্রেণীর সরকার কমিউনের তখন অনেক শত্রু। ফ্রান্সের সমস্ত বুর্জোয়া, ভূ-স্বামী, ফাটকাবাজ, কারখানার মালিক, ছোটবড় সব ডাকাত-গুণ্ডা-বদমাস শোষকেরা সবাই তখন এক জোট। এই বুর্জোয়া কোয়ালিশনকে সাহায্য দেন বিসমার্ক। বন্দী একলক্ষ রাজকীয় সৈন্যকে তিনি মুক্তি দিলেন। এই প্রতিক্রিয়াশীল চমূ গ্রামে গ্রামে অশিক্ষিত চাষীদের ও মফঃস্বলের পেটি বুর্জোয়াদের কমিউনের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলে। মার্সাই, লির্ঁও, সাঁ এতিএ়্গে, দিয়োঁ প্রভৃতি নগরের শ্রমিকেরা অবশ্য কমিউন গঠন করে, কিন্তু সেগুলি অচিরেই ধ্বংস হয়ে যায়। পারীর চতুর্দিকে ঘিরে এলো প্রতিক্রিয়ার লৌহবেষ্টনী। এক অর্ধবৃত্তে প্রাসীয় বাহিনী, আরেক অর্ধবৃত্তে ফ্রান্সের প্রতিক্রিয়াশীল কোয়ালিশন।

লেনিন ব্যাখ্যা করেছেন, কেন পারী কমিউন পরাস্ত হলো। তাঁর মতে সমাজবিপ্লবে জয়ী হতে হলে দুটি পূর্বশর্ত প্রয়োজন। উচ্চতর উৎপাদন শক্তি এবং তার যোগ্য নির্বিত্ত শ্রেণী। ১৮৭১ সালে, এ-দুটিই ছিল ফ্রান্সে অনুপস্থিত। ফ্রান্সের পুঁজিবাদ তখনও ছিল অনগ্রসর। দেশটায় ছিল মূলত পেটি বুর্জোয়া আধিপত্য (কারিগর, চাষী, দোকানদার ··ইত্যাকার)। এ

যেমন এক দিকের ছবি, অন্যদিকে ছিল যথাযোগ্য শ্রমিক পার্টির অভাব। দীর্ঘ অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে ফ্রান্সের শ্রমিকশ্রেণী তখনও উত্তীর্ণ হয়নি। তাঁরা প্রস্তুতও ততখানি ছিলেন না। নির্বিত্তদের গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক সংগঠন, বা শক্তিশালী ট্রেড ইউনিয়ন কিংবা সমবায় প্রতিষ্ঠান তখন তেমন ফ্রান্সে ছিল না। এমনকি কি-কাজ তাঁরা করতে চলেছেন, কেমনভাবেই-বা কর্মসূচি রূপায়ন করবেন—সেসব বিষয় শ্রমিকদের স্পষ্ট ধারণা ছিল না।

অবশ্য লেনিন বলছেন, এ-সব দুর্বলতা থাকা সত্ত্বেও, এক কথায় বলা যায়, কমিউন সময় পায়নি তার কর্মসূচি কার্যকর করতে। কেননা, প্রথমাবধি তাকে সমস্ত সময়ই আত্মরক্ষার জন্য লড়াই করতে হয়েছে। কমিউনের শেষদিন পর্যন্ত, সেই ২১-২৮ মে, কমিউনকে একটা ভাবনাকেই গুরুত্ব দিতে হয়েছে সবচেয়ে বেশি। তা হলো আত্মরক্ষা। অথচ এরই মধ্যে, শোষণহীন স্বাধীন শ্রমজীবী মানুষের রাষ্ট্রের নকশাটিও তাঁরা করে দিয়ে গেছেন। এক, শোষক শ্রেণীর দমন-পীড়নের অন্ধ হাতিয়ার সদা সশস্ত্র সৈন্যবাহিনী ভেঙে দিয়ে কমিউন সমগ্র জনগণকে অস্ত্র সজ্জিত করে। দুই রাষ্ট্র ও ধর্মের মধ্যে স্পষ্ট সীমারেখা টানে ও শিক্ষাকে ধর্মনিরপেক্ষ করে। তিন, বন্ধ কারখানাগুলি শ্রমজীবীদের প্রতিনিধিদের দ্বারা পরিচালনার ব্যবস্থা করে এবং কেন্দ্রীয়ভাবে আর্থনীতিক সংস্কার মনোভাব ব্যক্ত করে। চতুর্থত, যে কোনো পদাধিকারী সরকারী কর্মচারীদের বেতন কোনো অবস্থাতেই শ্রমিকদের স্বাভাবিক মজুরির চেয়ে বেশি ধার্য না করার নীতি গ্রহণ করে। সামাজিক কাজকর্ম কমিউন খুব বেশি করে উঠতে পারেনি, কিন্তু তার সে বিষয়ে ডিক্রিগুলিও কম উল্লেখযোগ্য নয়। এঙ্গেলস এই ক্ষমতাকেই বলেছেন, 'নির্বিত্ত শ্রেণীর একনায়কত্ব"।

কমিউনার্ডদের উপর অত্যাচারের কাহিনী বলা এ নিবন্ধের লক্ষ্য নয়। কিন্তু ক্ষমতালোলুপ, শ্রেণীস্বার্থসজ্ঞান পুঁজিপতিরা কমিউনের পরাজয়ে যে প্রতিহিংসা নেয়, সে বড় ভয়াবহ। মৃত্যু ও যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে কমিউন শেষ হলো। পারীর রাস্তায় মৃতদেহের স্তূপ জমল। শেষ লড়াই হলো পেরে লাগাইজ গোরস্থানে। শ্রমজীবী মানুষের রক্তের পাঁকে পা ডুবিয়ে পুঁজিপতিরা ক্ষমতায় আসীন হলো আবার। কিন্তু কমিউনের আদর্শের মৃত্যু নেই। তার আদর্শে এখন উজ্জীবিত এক তৃতীয়াংশ দুনিয়া। বাকি দুনিয়ায় চলেছে কমিউনের আদর্শকে কার্যকর করার সংগ্রাম।

তরুণ সান্যাল

'বাঙলাদেশে'র পাশে দাঁড়ান

'বাঙলাদেশে'র জনগণের ন্যায্য সংগ্রামের সমর্থনে, 'বাঙলাদেশ'কে অবিলম্বে স্বীকৃতি ও সর্বাধিক সহায়তা দানের দাবিতে এবং পাকিস্তানের জঙ্গী চক্রের অমানুষতা ও আক্রমণের বিরুদ্ধে ধিক্কার জানাবার জন্য তিরিশে মার্চ স্টুডেন্ট্‌স্ হলে পশ্চিমবঙ্গের শিল্পী-সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীদের একটি সভা হয়। আহ্বায়ক ছিলেন, পশ্চিম বঙ্গের শান্তি সংসদ, আফ্রো-এশিয় সংহতি সমিতি, 'পরিচয়' ও 'আন্তর্জাতিক' পত্রিকা। শ্রীযুক্ত তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় অসুস্থতার জন্য সভায় উপস্থিত হতে না পারায় লিখিতভাবে তাঁর বক্তব্য প্রেরণ করেন। সভাপতি কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী তা পাঠ করে শোনান। ঐ সভায় সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। সমর্থনে বক্তৃতা করেন অধ্যাপক বাসব সরকার ও তরুণ সান্যাল। প্রখ্যাত কথাশিল্পী মনোজ বসু ভাষণ দেন। কবিতা আবৃত্তি ও পাঠ করেন দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, নীলাদ্রি-শেখর বসু, অমিতাভ দাশগুপ্ত ও সুধীর বসু। ঐ সভায় একটি সহায়তা সমিতি প্রস্তাবিত হয়। নিচে আমরা সভার প্রস্তাব, শ্রীযুক্ত তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের পত্র, এবং সহায়তা সমিতির বিবৃতি প্রকাশ করলাম। সম্পাদক

প্রস্তাব

পৃথিবীর মানচিত্রে আরও একটি নক্ষত্রের আবির্ভাব ঘটল। সীমান্তের ওপারে 'বাঙলাদেশ' জন্ম নিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের শিল্পী-সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীদের এই সভা ইতিহাসের নবজাতককে আজ স্বাগত জানাচ্ছে।

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট ধর্মের ভিত্তিতে পাকিস্তান রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়। কিন্তু পূর্বপাকিস্তানে মানুষ অচির কালে মাতৃভাষা, জাতীয় সংস্কৃতি, গণতান্ত্রিক অধিকার ও সমৃদ্ধ জীবনের জন্য ধর্মনিরপেক্ষভাবে আন্দোলন শুরু করে। আর, সে-সংগ্রামের প্রতিটি পদক্ষেপই ছিল রক্তাক্ত। কারণ, কেন্দ্রীয় পাক সরকার তথা পশ্চিমী একচেটিয়া পুঁজি এই রাষ্ট্রের বৃহত্তম ভূখণ্ড ও জনসংখ্যার প্রতিটি মানবিক আবেগ ও আন্দোলনকে পাশব অত্যাচারের রথচক্রে চূর্ণ করতে চায়।

আমরা ভুলিনি ১৯৫২ সালের ২১-এ ফেব্রুয়ারির কথা। আমরা ভুলিনি ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে মুসলিম লীগকে প্রায় নিশ্চিহ্ন করে যুক্তফ্রণ্টের ঐতিহাসিক বিজয় ও জনপ্রিয় মন্ত্রিসভা গঠন, তারপর গণতন্ত্রের পতাকাকে

ধুলোয় লুটিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানে নির্লজ্জ হস্তক্ষেপ ও পূর্ব-পাকিস্তানে তাদের অন্ধকার বে-আইনী শাসন প্রতিষ্ঠা। আমরা ভুলিনি তারপর গোটা পাকিস্তানেই সাংবিধানিক গণতন্ত্রকে পদদলিত করে মিলিটারি দুঃশাসন কায়েম করার ইতিহাস।

তারপর অনেকগুলি বছর কেটেছে। পূর্ব-পাকিস্তানের মানুষ সমগ্র পাকিস্তানের ঐক্যকে অক্ষুণ্ণ রেখেই তার জাতীয় স্বাধিকার ও বিকাশ চেয়েছিল। সে জানত পশ্চিম পাকিস্তানের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রতিও তার দায়িত্ব কম নয়। আগেই বিচ্ছিন্ন হতে চাইলে পূর্ব-বাঙলার মানুষদের সংগ্রাম অনেক সোজা আর সরল হতে পারত। দীর্ঘকাল ধরে রক্ত আর অশ্রুর এত মূল্য তাকে হয়তো দিতে হতো না। কিন্তু পাকিস্তানের ঐক্যকে রক্ষা করাই ছিল পূর্ব-বাঙলার মরণপণ সংগ্রামের অন্যতম প্রধান শর্ত।

বছরের পর বছর তারা সেই দুঃসাধ্য পথেই এগিয়েছে। অবশেষে অভীষ্টও প্রায় করায়ত্ত হয়েছিল। মাত্র সেদিন আওয়ামী লীগ পূর্ব-বাঙলার শতকরা আটানব্বইটি আসনে জনগণের ভোট পেয়ে পাকিস্তানের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ দলে পরিণত হলো। 'বঙ্গবন্ধু' মুজিবর রহমান এগিয়ে এলেন গোটা পাকিস্তানের শাসনভার গ্রহণ করতে।

কিন্তু পশ্চিমী একচেটিয়া পুঁজি ও মিলিটারি জুন্টা পৃথিবীতে নীতিহীনতা ও বিশ্বাসঘাতকতার অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করল। ঢাকা শহরে আওয়ামী লীগের সঙ্গে এগারো দিন ধরে রাজনৈতিক আলোচনা চালাবার অবসরে তারা পূর্ব-পাকিস্তানে সামরিক শক্তিকে নতুনভাবে প্রস্তুত করল। তারপর রাত্রির অন্ধকারে শুরু হলো অতর্কিত আক্রমণ।

সমস্ত পৃথিবী দেখল ষড়যন্ত্র ও আকস্মিক অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে যারা একটা রাষ্ট্রের শাসনভার দখল করেছে, সঙ্গীনের ডগার ওপর যাদের সিংহাসন—সেই তারা বলছে: মুজিবর দেশদ্রোহী, বলছে: আওয়ামী লীগকে বেআইনী করা হলো।

সমস্ত পৃথিবী রুদ্ধ নিঃশ্বাসে লক্ষ্য করল কিভাবে বর্বর সামরিক শক্তি গণতন্ত্রের রায়কে উপেক্ষা করে, মিলিটারি লেলিয়ে আর সন্ত্রাসের বন্যা বইয়ে পূর্ব-পাকিস্তানকে পাকিস্তান থেকে আপাতত বিচ্ছিন্ন হতে বাধ্য করল।

পশ্চিম পাকিস্তানের গণতান্ত্রিক শক্তির সঙ্গে এবং পাকিস্তান রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক কি হবে—তা 'বাঙলাদেশ'এর মানুষ স্থির করবে। হয়তো আবার

ফেডারেশনের প্রশ্ন উঠবে। হয়তো পাকিস্তানে সামরিক একনায়কত্বের অবসানে 'বাঙলাদেশ'ই অমোঘ ভূমিকা পালন করবে।

কিন্তু পৃথিবী দেখছে এখন, এই মুহূর্তে, অনেক রক্ত অনেক অশ্রুর মধ্য দিয়ে, এইভাবে 'বাঙলাদেশ' জন্ম নিল। পৃথিবীর ইতিহাসে এমন নজির কদাচিৎ দেখা যায়। জন্মমুহূর্ত থেকে এই ভূখণ্ড ও তার সাড়ে সাত কোটি মানুষ যেন একটিই অস্তিত্ব। সে লড়ছে।

লড়ছে সমরবাদের বিরুদ্ধে। লড়ছে পশ্চিমী বণিকস্বার্থের বিরুদ্ধে। লড়ছে গণতন্ত্র ও স্বাধিকারের জন্য। আর সে-সংগ্রামও কম রক্তাক্ত নয়। প্রতিদিন শত-সহস্র মানুষ মরছেন। মাটিতে ট্যাঙ্ক নেমেছে। আকাশ থেকে বোমারু বিমান মৃত্যুবর্ষণ করছে। বিশ্ববিদ্যালয়, হাসপাতাল, উপাসনা গৃহ—কিছুই দানবদের আক্রমণ থেকে অব্যাহতি পাচ্ছে না।

কিন্তু বাঙলাদেশের মানুষ অপরাজেয়। সে তার শক্ত মুঠিতে গণতন্ত্র ও স্বাধিকারের পতাকাকে উড্ডীন রেখেছে। সে প্রতিরোধ করছে পশুশক্তিকে।

আমরা আমাদের সমস্ত অস্তিত্ব দিয়ে বাঙলাদেশের এই মৃত্যুঞ্জয়ী সংগ্রামকে সমর্থন করছি। স্পেন বা ভিয়েতনামের ইতিহাস আমরা ভুলিনি। ভারতবর্ষ এবং রবীন্দ্রনাথের মহান ঐতিহ্য আমরা বিস্মৃত হইনি।

পৃথিবীর যে-কোনো দেশেই মানুষ যখন গণতন্ত্র ও মানবিক অধিকারের জন্য সংগ্রাম করে, আমরা তখন তার সমর্থনে এগিয়ে আসি। বাঙলাদেশের ক্ষেত্রে আরও একটু আত্মীয়তার আবেগ আমরা বোধ করি। ওপারের মানুষও রবীন্দ্রনাথের ভাষায়ই কথা বলেন—কি উৎসবে কি সংগ্রামক্ষেত্রে। আমরা পৃথক রাষ্ট্রের অধিবাসী, তথাপি এ-কথা আমরা ভুলতে চাই না।

বাঙলাদেশের সংগ্রাম পৃথিবীর শুভবুদ্ধিসম্পন্ন প্রতিটি মানুষের সংগ্রাম। শিল্পী-সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবী হিসেবে এই মৃত্যুঞ্জয় সংগ্রামের সহায়তা করার জন্য আমরা সর্বতোভাবে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।

নতুন তারার আবির্ভাব হয়েছে। সমস্ত পৃথিবীর সঙ্গে আমরাও তাকে স্বাগত জানাচ্ছি। 'বাঙলাদেশ'এর সরকারকে অবিলম্বে স্বীকৃতি জানানো হোক। তার সমর্থনে পৃথিবীর গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক শক্তি প্রত্যক্ষভাবে এগিয়ে আসুন—এই সভা দৃঢ়ভাবে এই মত ঘোষণা করছে।

আমরা তোমাদের সঙ্গে আছি

এই সভায় কোনো বাক্য উচ্চারণের পূর্বে, সর্বাগ্রে প্রণাম নিবেদন করি আমাদের সেই ভ্রাতাদের যাঁরা ওপার বাঙলায় তাঁদের ন্যায়সঙ্গত স্বাধিকার প্রতিষ্ঠায় রক্তদান করেছেন, জীবনদান করেছেন, মহামহিম বীরের মতো প্রায় শূন্য হাতে অস্ত্র-আয়ুধ-ধারী, অত্যাচারী পরদেশী শাসকের বিরুদ্ধে অকুতোভয় সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছেন। তাঁদের পরিপূর্ণ জয় কামনা করি, তাঁদের জয়োচ্চারণ করি।

যে জননী এপার বাঙলা ওপার বাঙলায় ভাষা ও সংস্কৃতির মূর্তিতে, প্রীতি ও ভ্রাতৃত্ববন্ধনের মূর্তিতে, উভয় বাঙলার মানুষের হৃদয়ে চিন্ময়ী মূর্তিতে অবস্থিত আমরা আজ সেই জননী, সেই মায়ের ডাকে এখানে সমবেত হয়েছি।

আজ যে মন নিয়ে আমরা এখানে সমবেত হয়েছি তেমন মনোভাবের অভিজ্ঞতা আমাদের ইতিপূর্বে কখনও হয়নি। অন্তত আমার সত্তর বৎসরের অধিককাল দীর্ঘ জীবনে কখনও অনুভব করিনি। একদিকে চিত্ত স্বজনের সহোদরের অতি বৃহৎ ও ব্যাপক অকল্যাণ, ক্ষতি ও বিনষ্টির আশঙ্কায় মারাত্মকরূপে শঙ্কিত, অন্যদিকে অত্যাচারী, নীতিজ্ঞানহীন, মিথ্যাচারী, দম্ভী শাসকের মূঢ় ও পাশব অত্যাচারে মর্মান্তিকভাবে ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ। আবার সেই সঙ্গে প্রায় নিরস্ত্র সমগ্র জাতির একযোগে শঙ্কাহীন অটুট প্রতিরোধের মহিমময় বীর্যে চিত্ত একান্তভাবে স্ফীত।

অসুস্থ অবস্থায় গৃহের প্রাচীরের অন্তরালে আবদ্ধ থেকে এই বার্তা পাঠাচ্ছি। সভায় উপস্থিত না হতে পারার জন্য সভাস্থ সকলের কাছে মার্জনা ভিক্ষা করছি। তা সত্ত্বেও মনে করি, আজ সভায় উপস্থিত থাকাটাই বড় কথা নয়। আজকের সবচেয়ে প্রথম ও প্রধান কথা হলো এই সঙ্কল্প সোচ্চারে ঘোষণা করা যে—আমাদের ওপার বাঙলার, 'বাঙলাদেশে'র ভ্রাতা ও ভগ্নীগণ, আমরা তোমাদের সঙ্গে আছি, এবং যে-কোনো পরিণামে আমরা তোমাদের সঙ্গে থাকব। গৃহের অভ্যন্তরে থাকি কি গৃহের বাইরে থাকি, আমরা তোমাদের সঙ্গে আছি। পথে-প্রান্তরে, হাটে-ঘাটে-মাঠে, আমরা যে যেখানে আছি আমরা তোমাদের সঙ্গে আছি। স্কুলে-কলেজে, অফিসে-আদালতে, ক্ষেতে খামারে, কলে-কারখানায় আমরা যে যেখানে আছি, আমরা তোমাদের সঙ্গে

আছি। আমরা সাড়ে চার কোটি তোমাদের সাড়ে সাত কোটির পাশে আছি। তোমাদের বিপদে আছি, তোমাদের সম্পদে আছি। তোমরা তোমাদের মহিমময় বীর্যের দ্বারা তোমাদের অবস্থিতির যে দীর্ঘছায়া প্রক্ষেপ করেছ, আমরা সেই কায়ার অনুগামিনী ছায়ার সঙ্গে মিশে তোমাদের সঙ্গে এক হয়ে আছি।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

২৯শে মার্চ, ১৯৭১

বাঙলাদেশ-সহায়ক শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবী সমিতির আবেদন

ইয়াহিয়া খাঁ ও তার বর্বর সামরিক চক্র বাঙলাদেশের গণতান্ত্রিক চেতনা, স্বাধিকার বোধ ও মানবিক মর্যাদার পবিত্র অনুভবকে ট্যাঙ্কের চাকায় পিষে ফেলতে চাইছে। প্রকৃতির আশীর্বাদ, কবির স্বপ্ন, নদী-মেখলা-শোভিতা এই শ্যামল ভূখণ্ড ও তার সাড়ে সাত কোটি মানবসন্তানকে আধুনিকতম মারণাস্ত্রের সাহায্যে একদল নরপিশাচ ঝলসে মারতে চায়।

নাপাম বোমার আগুনে তারা সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রাচীন নিদর্শনগুলি, বহু স্মৃতিঘেরা জনবসতি অঞ্চল, এমনকি গাঁয়ের সবুজ মাটিকে পর্যন্ত পুড়িয়ে দিচ্ছে। গোটা জাতির স্বপ্ন শ্রম আর সম্পদে নির্মিত সেতু, বাঁধ ও প্রকল্প-গুলিকে তারা বেছে বেছে ধ্বংস করছে। সারস্বত-সাধনার পীঠস্থান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে এই জঙ্গীচক্র কামান দেগে মাটিতে মিশিয়ে দিয়েছে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রঙপুরের বিখ্যাত কারমাইকেল কলেজ এবং বিভিন্ন অঞ্চলের অনেকগুলি মূল্যবান গ্রন্থাগার ও গবেষণাগার ঘাতকরা ধ্বংস করেছে। সংবাদপত্রের কার্যালয়কে নিশ্চিহ্ন করা হয়েছে। বোমা ফেলে মর্টার ছুঁড়ে তারা হাসপাতাল-ভবনে জেলেছে নরকের ভয়াবহ আগুন। মন্দির-মসজিদ-চার্চের পবিত্রতাটুকুও ঐ যুদ্ধোন্মাদ রাক্ষসদের নখ এবং দাঁতের কামড় থেকে রক্ষা পায়নি।

হত্যা ও রক্তের নেশায় জঙ্গী ইয়াহিয়া চক্র উন্মাদ হয়ে গেছে। খবর এসেছে কয়েক লক্ষ লোক মারা গিয়েছে—নিজের দেশে মানুষের অধিকারে মায়ের ভাষায় কথা ব'লে যারা শান্তিতে বাঁচতে চেয়েছিল। অতর্কিত আক্রমণের শিকার, কামানের খোরাক, কয়েক লক্ষ অমৃতের সন্তান পচা গলা

শবদেহ হয়ে শহরে বন্দরে গ্রামে শকুনির খাদ্য হচ্ছে। তাদের কবর দেবার, দাহ করবার কোনো ব্যবস্থা হয়নি। ইয়াহিয়ার উদ্যত সঙীন কয়েক লক্ষ শবদেহকে নিয়ত পাহারা দিচ্ছে—দেশবাসী যাতে শহীদদের প্রাপ্য মর্যাদাটুকু দিতে না পারে।

নর-নারী শিশু-বৃদ্ধ···কে মরেনি? শ্রমিক-কৃষক বুদ্ধিজীবী-চাকুরে-ব্যবসায়ী ···কে মরেনি? শিল্পী-সাহিত্যিক-সাংবাদিক অধ্যাপক···কে মরেনি?

মায়ের দুই স্তন কর্তন ক'রে দানবরা রক্তের উচ্ছ্বসিত ফোয়ারার মধ্যে অবোধ শিশুর মুখ চেপে ধরেছে। আড়াই বছরের বাচ্চাকে কামানের সামনে দাঁড় করিয়ে গোলা ছুঁড়েছে। ইজ্জত লুঠ ক'রে তারপর বাঙলাদেশের মা ও বোনদের সঙীন দিয়ে খুঁচিয়ে মেরেছে। কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের মহান আচার্যদের সারিবন্দী দাঁড় করিয়ে গুলি ছুঁড়েছে। হাসপাতালের প্রত্যেকটি রোগীকে গুনে গুনে খুন করেছে।

কিন্তু নতুন মর্যাদাবোধে উদ্বুদ্ধ সত্য ও সুন্দরের উপাসক বাঙলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষ মৃত্যুঞ্জয় প্রতিরোধে রুখে দাঁড়িয়েছে। বীর রোশেনারা বেগম বুকে মাইন বেঁধে জল্লাদদের ট্যাঙ্কের ওপর ঝাপিয়ে প'ড়ে নিজের কিশোরী দেহের সঙ্গে একটা আস্ত প্যাটন ট্যাঙ্ককেই ছিন্ন ভিন্ন ক'রে দিয়েছে। মুক্তিযোদ্ধারা ফৌজীদের হাত থেকে একের পর এক ঘাঁটি কেড়ে নিচ্ছে। গোটা বাঙলাদেশ আজ একটিই অস্তিত্ব হয়ে মুক্তিযুদ্ধ করছে। বাঙলাদেশ জিতছে।

পশ্চিমবঙ্গের শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবী আমরা, রবীন্দ্রনাথের উত্তরপুরুষ আমরা,এই ঐতিহাসিক মুহূর্তে নীরব বা নিষ্ক্রিয় থাকতে পারি না। আমরা ভুলিনি স্পেনের গৃহযুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ এবং ভারতবর্ষের ভূমিকা। আমাদের মহান ঐতিহ্যকে আমরা কিছুতেই ভুলতে পারি না।

তাই আমরা 'বাঙলাদেশ সহায়ক শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবী সমিতি' গঠন করেছি।

আমাদের নিজ নিজ ক্ষেত্র ও নিজ নিজ সৃষ্টির মধ্য দিয়ে আমরা এক ভাবগত আন্দোলন গ'ড়ে তুলতে চাই। আমরা চাই শুধু পশ্চিমবঙ্গ নয়, শুধু ভারতবর্ষ নয়, গোটা পৃথিবীর গণতান্ত্রিক চেতনা ও মানবিক শুভবুদ্ধি বাঙলাদেশের নবজাত সরকারকে অবিলম্বে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য এবং সর্ববিধ সাহায্য নিয়ে তার পাশে এসে দাঁড়ানোর উদ্দেশ্যে এক ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম শুরু করুক।

সেই সঙ্গে আমরা বিপন্ন মানবতার পক্ষে বাস্তব আর প্রত্যক্ষ সাহায্যও

সংগ্রহ করতে চাই। সীমান্তের ওপারে এই মুহূর্তে দরকার ওষুধ, চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, গুঁড়ো দুধ ও বিস্কুটজাতীয় শুকনো খাদ্য। আর তা কেনার জন্য টাকাপয়সা।

পশ্চিমবঙ্গের মানুষ। রাজপথ, বস্তি, কুটির অথবা অট্টালিকা—যেখানেই আপনি বাস করুন, অবিলম্বে আপনার যতখানি সামর্থ তার থেকেও বেশি সাহায্য নিয়ে এগিয়ে আসুন। ১৪৪ লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩ (টেলিফোন: ২৪-৩৯৩০)—এই ঠিকানায় সমিতির কার্যালয়ে প্রতিদিন সন্ধ্যা ৬টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত উপযুক্ত রসিদের বিনিময়ে আপনার সাহায্য ধন্যবাদের সঙ্গে গৃহীত হবে।

সীমান্তের ওপারে এই মুহূর্তে দরকার রক্ত। পশ্চিমবঙ্গের মানুষ! রাজপথ বস্তি, কুটির অথবা অট্টালিকা—যেখানই আপনি বাস করুন, অবিলম্বে ইণ্ডিয়ান মেডিকেল এ্যাসোসিয়েশনের কার্যালয়ে (৬৭ লেনিন সরণি, কলকাতা ১৩। সময়: বেলা ২টো থেকে সন্ধ্যে ৬টা) গিয়ে রক্তদান করুন। আপনার এই ভালোবাসা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে গৃহীত হবে।

পশ্চিমবঙ্গের মানুষ—বাঙলাদেশের আহ্বানে সাড়া দিন। সেই শিশুটিকে স্মরণ করুন—মায়ের বুকের রক্তের ফোয়ারায় যার মুখ গুঁজে ধরা হয়েছিল। ওর খাদ্য দরকার। সেই জননীকে স্মরণ করুন—পশুরা যার অঙ্গচ্ছেদ ঘটিয়েছে মা-র চিকিৎসা দরকার। সেই কিশোরটির কথা স্মরণ করুন—ফ্রণ্টে আহত যে-বীর দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে ক্যাম্পে শুয়ে আছে, দুই চোখে অধীর প্রত্যাশা নিয়ে যে তাকিয়ে আছে আপনার দিকে, পশ্চিমবঙ্গের দিকে। ওর রক্ত দরকার। পশ্চিমবঙ্গের মানুষ! আপনি যে-ই হোন, যেখানেই থাকুন, একবার বিপন্ন বাঙলাদেশের কথা ভাবুন। তার দরকার টাকা। কারণ ওষুধ আর খাদ্য কিনতে হবে। মনুষ্যত্ব জাগ্রত হোক: আমাদের বিবেক শুভবুদ্ধির আহ্বানে সাড়া দিক। যেন ভুলে না যাই ইতিহাসের অগ্নিপরীক্ষায় আমাদেরও উত্তীর্ণ হতে হবে।

নিবেদক

বাঙলাদেশ-সহায়ক শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবী সমিতি

সভাপতি

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

পরিচয়
বর্ষ ৪১ । সংখ্যা ৪
কার্তিক ১৩৭৮

সূচিপত্র

উপদেশকমণ্ডলী
গিরিজাপতি ভট্টাচার্য । হিরণকুমার সান্যাল । সুশোভন সরকার । অমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র । গোপাল হালদার । বিষ্ণু দে । চিন্মোহন সেহানবীশ । সুভাষ মুখোপাধ্যায় । গোলাম কুদ্দুস ।

সম্পাদক
দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় । তরুণ সান্যাল

প্রচ্ছদ : ধ্রুব রায়

পরিচয় প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে অচিন্ত্য সেনগুপ্ত কর্তৃক নাথ ব্রাদার্স প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ৬ চালতাবাগান লেন, কলিকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত ও ৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড কলিকাতা-৭ থেকে প্রকাশিত ।

পরিচয়
বর্ষ ৪১ । সংখ্যা ৪
কার্তিক।১৩৭৮

প্রাক্-বৃটিশ ভারত ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি

অসিত সেন

সুদীর্ঘকাল বিস্তৃত ভারতের ইতিহাস নানা জাতি, নানা মত, নানা ধর্মের সংঘাত ও পরিণতিতে সহাবস্থানের কাহিনী। ধর্মের ক্ষেত্রে সুপ্রাচীন বৈদিক ও অনার্য ধর্ম, হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন ধর্ম এবং সর্বশেষে ইসলাম ভারতীয় জনস্রোতে কল্লোলের সৃষ্টি করেছে। এই সব কাহিনীর মধ্যে বিংশ শতকের কৌতূহল অধিকাংশ ক্ষেত্রে হিন্দু ও মুসলমানের সম্পর্কের ক্ষেত্রে নিবদ্ধ। কারণ এই উপমহাদেশে যখন সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রাম দানা বেঁধে উঠছিল তখন থেকে এই দুই সম্প্রদায়ের পার্থক্যকে ইংরাজ সাম্রাজ্যবাদ ও তার সমর্থকরা অত্যধিক গুরুত্ব দিয়ে প্রচার করতে থাকেন। তার ফলশ্রুতি পাকিস্তান—যাতে লাভবান হয়েছে কেবলমাত্র মুষ্টিমেয় সামন্ততান্ত্রিক প্রভু ও মুনাফাখোরেরা এবং যার শিকার বর্তমানে বাঙলার কোটি-কোটি মানুষ। ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র যে অসার আজকের বাঙলাদেশ তার উজ্জ্বল উদাহরণ।

এই দেশের এবং বিদেশের বহুল প্রচারিত অধিকাংশ ইতিহাস গ্রন্থে হিন্দু ও মুসলমানের বিরোধ ও সংঘাতের কাহিনীকে অনেক সময় সত্যনিষ্ঠ ইতিবৃত্ত বলে দাবি করা হয়। এই দাবি এত সূক্ষ্মভাবে ও সুকৌশলে সাধারণের মধ্যে প্রচারিত যে অনেক সময় শিক্ষিত মনেও বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়।

ভারতে আরব, তুর্কী ও মুঘলরা আক্রমণকারী হিসাবে এসেছিল, যেমন এসেছিল বৈদিক আর্য, কুষাণ, শক-হূণ ও অন্যান্য অনেক জাতি। আরব বিজয়ীরা ও তাদের পরবর্তী আক্রমণকারীরা তাদের পূর্বসূরীদের ন্যায় প্রাথমিক স্তরে যুদ্ধ ও ধ্বংস ডেকে এনেছিল। আরবরা সিন্ধুদেশ জয় করে। তুর্কীরা এদেশে প্রবেশ করেছিল লুটপাট করতে। লুঠের মাল ঘোড়ার পিঠে চাপিয়ে স্বদেশে নিয়ে যেতেই তারা তৎপর ছিল। তুর্কী আক্রমণের প্রথম যুগের এইসব বহিরাগতরা

বিদেশী ও লুঠেরা বলে স্বীকৃত। এই ধরনের লুঠেরাদের কাহিনী সব দেশের ইতিহাস খুঁজলেই অল্পবিস্তর পাওয়া যাবে। এদের কোনো কালে সমর্থন করা যায় না, উচিতও নয়। কিন্তু সাম্প্রদায়িক সম্পর্কের ও জাতীয় সংহতির ঐতিহ্যের কাহিনী-বিচারে মূল প্রশ্ন হলো তুর্কী রাজত্বে ও মুঘল যুগে অর্থাৎ যেসময় থেকে তুর্কী ও মুঘলরা এই দেশে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে শুরু করল সেই সময় জনসাধারণ অর্থাৎ সাধারণ হিন্দু ও মুসলমান ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে সম্পর্ক কিরূপ ছিল।

ইউরোপে মধ্যযুগে ও তৎপরবর্তী কালে রোমান ক্যাথলিক ও প্রটেস্ট্যান্ট বিরোধের ও দাঙ্গার বহু উদাহরণ পাওয়া যাবে। ভারতের মধ্যযুগের ইতিহাস তন্নতন্ন করে খুঁজলেও সেণ্ট বার্থালিমিউ দিবসের (২৪এ আগস্ট, ১৫৭২ খ্রীঃ) ন্যায় কাহিনী পাওয়া যাবে না। অথবা রাজার ধর্ম প্রজাকে গ্রহণ করতে হবে এমনি জবরদস্তির কথাও পাওয়া যাবে না। বরং তুর্কী শাসনের প্রাক্কালেই এই বাঙলাদেশে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের সাধারণ মানুষের মধ্যে বহিরাগত অভিজাত সামন্তপ্রভুর বিরুদ্ধে সংগ্রামী ঐক্যের উদাহরণ পাওয়া যায় মিনহাজউদ্দীন লিখিত ইতিবৃত্তে।

কাহিনীর পটভূমিকা লক্ষণাবতী। ত্রয়োদশ শতকের মধ্যভাগে এখানকার একজন শাসনকর্তা ছিলেন মালিক ইজউদ্দীন বলবন। তাঁর অনুপস্থিতির সুযোগে ১২৫৯ সালে মালিক তাজউদ্দিন আরসেলান খান সসৈন্যে এই শহর দখল করবার জন্য উপস্থিত হলেন। শহরের তখন কোনো সৈন্যবাহিনী ছিল না। মিনহাজ বলেছেন যে এই সময় 'শহর লক্ষণাবতী খালি গুজাস্ত' (তবকত্ ই-নাসিরী পৃষ্ঠা ২৬৭) অর্থাৎ লক্ষণাবতী শহর খালি (অর্থাৎ সৈন্যবিহীন) ছিল। এই পরিস্থিতিতে শহরের অধিবাসীরা আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে শহর রক্ষা করবার জন্য দুর্গ প্রাকারের মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করে। সাধারণের বাধাদানের ফলে তাজউদ্দীনের সুশিক্ষিত সৈন্যবাহিনীর তিনদিন সময় লেগেছিল লক্ষণাবতীকে কবজা করতে। এই ঘটনায় তাজউদ্দীন এতদূর ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন যে তিনি হিন্দু ও মুসলমান উভয়ের সম্পত্তি লুণ্ঠন করবার আদেশ দান করেন। কারণ উভয় সম্প্রদায়ের 'জনসাধারণ তাঁকে বাধা দিয়েছিল'[১]। ধর্মীয় বিরোধ নয় লুঠেরারবিরুদ্ধে লড়াইয়ের ঐতিহ্য বাঙলাদেশে অতীত থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত সমানে চলে আসছে। আজকের মতো সেদিনও খান সেনা হিন্দু-মুসলমানের সম্পত্তি লুণ্ঠন ও জীবন নাশ করেছিল। ধর্ম সেদিন বড় হয়ে উঠেনি স্বার্থের

কাছে। প্রতিরোধ সেদিন হয়েছিল মিলিত। বর্তমান যুগ ও মধ্যযুগে অনেক তফাৎ। কাজেই আজকের প্রতিরোধ আরো সুদৃঢ়। কিন্তু ঐতিহ্য অতীতের। মিলিত হিন্দু-মুসলমান সংগ্রামের অত্যাচারীর বিরুদ্ধে শোষিতের লড়াইয়ের এই ধরনের উদাহরণ সমকালীন ইতিহাসে বিরল। কারণ তৎকালীন ইতিহাস-বেত্তারা ছিলেন উলেমা ও মোল্লা, যারা আজকের প্রতিক্রিয়াশীল ঐতিহাসিকদের মতনই জনসাধারণের কথা সহজে উল্লেখ করতে চাইতেন না। তবুও ইতিহাসের ছেঁড়া পাতার থেকে তৎকালীন সাধারণ মানুষের সংহতি এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির কথা সহজেই উপলব্ধি করা যায়।

ভারতে প্রথমে রাজনৈতিক অধিকার বিস্তারে তৎপর হয়েছিল আরবরা। ৭১২ খ্রীষ্টাব্দে মহম্মদ বিন কাসিম সিন্ধু জয় করেন। কিন্তু তার বহু আগে আরব বণিকদের সঙ্গে ভারতের পরিচয় হয়েছিল। এই যুগে ভারতে আরবদের ধর্ম পালনের অধিকার রক্ষা করিবার জন্য হিন্দু রাজারা সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন। কাম্বের অধিপতি সিদ্ধিরাজ আরবদের মসজিদ নির্মাণের জন্য অর্থ সাহায্য করে-ছিলেন। আরব বণিক ভারতের রাজা-মহারাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় পুষ্ট হয়েছিল। আরবদের সিন্ধুবিজয়ের পর স্বধর্মপালনে হিন্দুদের কোনো বাধা ছিল না। আল বিলদারী লিখিত ইতিহাসে এই সম্পর্কে মহম্মদ বিন কাসেমের নির্দেশ উল্লিখিত হয়েছে। এই নির্দেশে বলা হয়েছে যে, "The temples shall be unto us, like as Churches of Christians, the Synagogues of the Jews, the fire temple of the Magians."[২] আরব অধিকারের যুগে সিন্ধু ও মূলতানে সাম্প্রদায়িক প্রীতি ও সদ্ভাব বজায় ছিল।

আরব অধিকার ভারতের অন্যত্র বিস্তৃত করা সম্ভব হয়নি। কারণ ভারতের শক্তিশালী হিন্দুসম্রাটগণ তৎকালীন যুগে স্বীয় সাম্রাজ্য রক্ষা করার সামর্থ্য রাখতেন। কিন্তু ধীরে ধীরে তিনশতকের মধ্যে এই সকল রাজ্য দুর্বল ও শক্তিহীন হয়ে পড়ে। ফলে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত থেকে তুর্কী আক্রমণকারীরা সমগ্র উত্তর-ভারত এবং পরে দক্ষিণ-ভারতে আধিপত্য বিস্তার করেছিল। এই যুগের ইতিহাস অনুধাবন করলে বোঝা যায় যে ভারতের আভ্যন্তরীণ দুর্বলতাই এই পতনের কারণ। এই দুর্বলতার মূলসূত্র ছিল জনসাধারণের সঙ্গে শাসকশ্রেণীর যোগসূত্রের অভাব, শাসক-গোষ্ঠীর আত্মম্ভরিতা, আত্মকেন্দ্রিকতা ও স্বার্থপরতা। ধর্মের নামে ও জাতিভেদের বঞ্চনায় সাধারণকে বঞ্চিত রাখার প্রচেষ্টা হিন্দু-রাজ্যগুলির পতনের কারণ হয়েছিল। আলবিরুণী[৩]

বলেছেন যে, "হিন্দুরা বিশ্বাস করে যে তাহাদের দেশের ন্যায় দেশ নাই, তাহাদের ন্যায় জাতি নাই, তাহাদের নৃপতির ন্যায় নৃপতি কুত্রাপি নাই, তাহাদের বিজ্ঞানের ন্যায় বিজ্ঞান নাই।" এই ধরনের মনোভাব আত্মসন্তুষ্টির সৃষ্টি করেছিল এবং বিচ্ছিন্নতার নীতিকে পরিপুষ্ট করেছিল। বর্ণবৈষম্য ও জাতিভেদের ফলে নিম্নপর্যায়ের আটটি শ্রেণীর, ডোম, চাঁড়াল প্রভৃতির শহরে প্রবেশের হুকুম ছিল না। কেবলমাত্র ক্ষত্রিয়রা শস্ত্র-বিদ্যার অধিকারী ছিল। সীমান্তে তুর্কী আক্রমণের ঝটিকাভাসে রাজণ্য শ্রেণীর চেতনা উদয় হয়নি। পৃথ্বীরাজের সভাকবি চাঁদ বরদাই[৪] এই সম্পর্কে একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন। প্রথম তরাইয়ের যুদ্ধের পর (১১৯১ খ্রীঃ) পৃথ্বীরাজ বিলাসে মত্ত। রাজধানীর নাগরিকরা পুনরায় বৈদেশিক আক্রমণের আশঙ্কায় কবি চাঁদের নেতৃত্বে রাজসভায় উপস্থিত হলেন। কিন্তু রাজা তখন অন্তঃপুরে। সেখানে রক্ষী অস্ত্রধারী কিঙ্করীরা তাদের প্রবেশের পথ রুদ্ধ করল। কবি চাঁদ কোনোক্রমে রাজসকাশে উপস্থিত হয়ে সীমান্তে বিপদের কথা শুনালেন। কবি চাঁদের এই কাহিনী আক্ষরিকভাবে সত্য কিনা জানা যায় না[৫]। কিন্তু এর মধ্যে সমকালীন রাজা-মহারাজাদের বিলাসিতার এবং দিল্লীর জনসাধারণের রাজনৈতিক সচেতনতার চিত্র পাওয়া যায়। তুর্কী আক্রমণের প্রাক্কালে ভারতের রাজা-মহারাজারা ঐক্যবদ্ধ হননি। জনতার সহযোগিতা গ্রহণ করেননি। বরং আলবেরুণীর ভাষায়, 'পুরোহিতের ছলনায়' জনসাধারণকে পদানত রাখতে তাঁরা ব্যাপৃত। তাঁরা যদি সাধারণ মানুষের সহায়তা গ্রহণ করতেন তাহলে বৈদেশিক আক্রমণকারীকে সহজেই স্বদেশ থেকে বিতাড়িত করতে পারতেন। এই বক্তব্যের একটি জলন্ত উদাহরণ হচ্ছে বঙ্গবিজয়ী বীর মহম্মদ বখতিয়ার খিলজীর শেষজীবনের[৬] দুর্ভাগ্য। লক্ষ্মণসেনের রাজধানী জয়ের পর বখতিয়ার খিলজী তিব্বতের সীমানায় অভিযান করেন। পথে কামরূপের রাজার রাজ্য পার হয়ে করতোয়ার উপর একটি বিশাল সেতু অতিক্রম করে প্রায় ১৬ দিন পরে তিনি শত্রুসৈন্যের সাক্ষাৎ লাভ করেন। প্রাথমিক সংঘর্ষের পর তাঁর বুঝতে বাকি থাকে না যে এই অভিযানে আরো বহু সৈন্যের প্রয়োজন। অতএব তিনি অভিযান পরিত্যাগ করে যে-পথ দিয়ে এসেছিলেন সেই পথে ফিরতে থাকেন। কিন্তু ইতিমধ্যে কামরূপের অধিবাসীরা বিদেশী তুর্কী সৈন্যদের 'ভাতে মারবার' ও 'পানিতে মারবার' সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল। ফলে প্রত্যাবর্তন দুঃসাধ্য হয়ে উঠে। ঘোড়ার দানা বা মানুষের খাদ্য ও পানীয় জলের অভাবে বঙ্গবিজয়ী

বখতিয়ার ও তাঁর সৈন্যবাহিনী বিপর্যস্ত হয়। এই বর্ণনা মিনহাজ লিখিত ইতিহাসের পাতায় পাওয়া যায়। অবশেষে যখন তুর্কী সৈন্য কোনোক্রমে পুরাতন সেতুটির কাছে উপস্থিত হলো তখন দেখা গেল স্থানীয় অধিবাসীরা এই সেতুর দুইটির স্তম্ভ ভেঙে দিয়েছে। তুর্কীরা নিরুপায় হয়ে নদীতীরবর্তী একটি মন্দিরে আশ্রয় গ্রহণ করেছিল। চতুর্দিকে শত্রুপরিবেষ্টিত এই অসহনীয় পরিস্থিতি থেকে বাঁচবার জন্য একদল তুর্কী অশ্বারোহী পারাপারের প্রচেষ্টায় একস্থানে নদীর জল অগভীর মনে করে নদীতে ঝাঁপ দেয়। বখতিয়ারের সৈন্যবাহিনীর বাকি অংশ তাদের অনুসরণ করে এবং তাদের সলিল সমাধি হয়। ফলে হাতে গোনা যায় এরকম কয়জন সঙ্গী নিয়ে বখতিয়ারকে প্রত্যাবর্তন করতে হয়েছিল। বিশাল অভিযাত্রী বাহিনীর বাকিরা যে-পথ দিয়ে এসেছিল সে-পথ দিয়ে আর ফেরে নাই। এই উদাহরণ সমকালীন লেখকদের কাহিনী থেকে জানা যায়। এরকম গণ-সহযোগিতায় আক্রমণকারী তুর্কীদের বাধা দেওয়া যেত। কিন্তু তৎকালীন যুগের ক্ষত্রিয় নৃপতিকুল এই পথ গ্রহণ করেননি এবং তাঁদের একে একে পরাজিত করা তুর্কী বিজয়ীদের পক্ষে সহজ হয়েছিল। তাঁদের মধ্যে কোনো রাজনৈতিক ঐক্য ছিল না। তুর্কী আক্রমণকারী খান ও বাদশাহের দল স্বদেশের সাধারণ মানুষের উপর শোষণ ও নিস্পেষণ করতে কসুর করত না। লুণ্ঠনের জন্য যারা ধর্মের ধ্বজা উড়িয়ে ভারত আক্রমণ করেছিল নিজের রাজ্যে স্বধর্মীয় দরিদ্র জনগণের উপর তারা সদয় ছিল না। মামুদের দরবারী আলউতবী কিতাব-ই-ইয়েমিনি[৭] গ্রন্থে সুলতান মামুদের রাজত্বকালের একটি দুর্ভিক্ষের বর্ণনা দিয়েছেন। এই দুর্ভিক্ষের সময় নিশাপুর শহরে এতদূর খাদ্যাভাব দেখা দিয়েছিল যে সমগ্র এলাকায় একমুঠো ঘাস পর্যন্ত ছিল না। কবরখানা থেকে শবদেহের অস্থি উদ্ধার করে দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত ক্ষুধার্ত মানুষ কাড়াকাড়ি শুরু করে দিয়েছিল। এই পরিস্থিতিতেও এক রুটিওয়ালা একজন উলেমার কাছে ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেছিলেন যে, তার ৩০০ মণ রুটি রয়েছে অথচ খরিদ্দার নাই। এই কাহিনী প্রমাণ করে যে যখন মানুষ অনাহারে মৃত্যুবরণ করছে সেই সময় মামুদের ন্যায় তথাকথিত ইসলামের গাজীর রাজত্বে মুনাফাশিকারী ও মজুতদাররা অতিরিক্ত লাভের লোভে খাদ্য মজুত রেখেছে। উলেমা ও শাসকগোষ্ঠী তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করা দূরে থাক এইসব মজুতদারদের দুঃখে তারা বিচলিত এবং সমকালীন ঐতিহাসিক এই ঘটনাকে উল্লেখ করে মজুতদারের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করেছেন। মধ্যযুগের

ইতিহাসে এ-ধরনের শ্রেণীস্বার্থ রক্ষা প্রয়াসী ঐতিহাসিকই ধার্মিকতার ছাপ দিয়ে লোলুপ নৃপতির জনবিরোধী শোষকরূপ ঢেকে রাখার প্রচেষ্টা করেছেন—আজকের দিনের বড়লোকের স্বার্থরক্ষী নিরপেক্ষ ঐতিহাসিকরা ঐ গুলিকে তুরুপের তাসের মতো ব্যবহার করে থাকেন।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে উপসংহার করা যায় যে ভারতে তুর্কী আক্রমণকারীরা বা স্থানীয় হিন্দু রাজা-মহারাজারা জনস্বার্থের অনুকূলে রাজ্যশাসন করতেন না। তুর্কী আক্রমণকারীরা ইসলামের নামে লুণ্ঠিত সামগ্রী, কর, উপঢৌকন প্রভৃতি অর্জনের জন্য স্বীয় স্বার্থে ভারত আক্রমণ করেছিলেন। কিন্তু ধর্ম অপেক্ষা কাম ও অর্থই ছিল তাঁদের প্রধান লক্ষ্য। মধ্যযুগের বীরত্ব-প্রকাশের এগুলি ছিল নমুনা। অর্থাৎ পরস্ব লুণ্ঠনের, পরদেশের উৎপাদনের বিপুল উদ্বৃত্ত ঘরে তুলে আনার নানা কায়দা-কানুন। পররাজ্যের প্রজাবৃন্দকে আক্রমণের মধ্য দিয়ে জোর জবরদস্তি করে আগুন ও তরোয়ালের মুখে লুণ্ঠন ছিল, প্রকাশ্য শোষণ বা লুণ্ঠন। অপ্রকাশ্য কায়দাটি ছিল পররাজ্যের রাজাকে করদ-রাজায় পরিণত করার মধ্যে। ঐ করদ-রাজা নিজের দেশের জনসাধারণের উপরে চাপ সৃষ্টি করে রাজস্ব বা কর আকারে প্রজাসাধারণের উপরে শোষণমাত্রা বৃদ্ধি করে প্রভুশক্তির খাঁই মেটাতো, এবং নিজের পরগাছা অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতো। শেষপর্যন্ত প্রভু রাজশক্তি শোষণব্যবস্থাকে আরও সুচারুভাবে চালু রাখবার জন্য আপন রাজপুরুষকে পররাষ্ট্র প্রশাসনের মাথায় বসিয়ে, প্রশাসন ও আদায়ব্যবস্থা ঢেলে সাজিয়ে ঐ পররাজ্যকে সাম্রাজ্যের আশভুক্ত করে নিত। করদ রাজায় পরিণত করা বা প্রশাসনের প্রত্যক্ষ পরিচালনার অন্তর্ভুক্ত করার কাজে ধর্মীয় খোলস ব্যবহার করা শোষকরা বা সাম্রাজ্যপতিরা যোগ্য অস্ত্র বলে জেনেছে, সাম্রাজ্যলুণ্ঠনের বিপুল অংশের অংশীদার পুরোহিত বা উলেমা বা বিশপমণ্ডলী এই শোষণ অভিযানে ধর্মীয় আশীর্বাদ জানিয়েছে, মধ্যযুগে রাজশক্তি ও ধর্মমণ্ডলীর অশুভ যোগাযোগ ছিল শোষণের প্রয়োজনে। তবে এই দুই অংশ—রাজশক্তি ও ধর্মমণ্ডলীর মধ্যেও সংঘাত দেখা দিয়েছে। রাজশক্তি ধর্মমণ্ডলীকে সহযোগী বা দ্বিতীয় বেহালার বাদকরূপে দেখতে চাইত, ধর্মমণ্ডলী রাজশক্তিকে অনুরূপভাবে আবার ব্যাখ্যা করত। ভারতের মধ্যযুগের ইতিহাসের শোষকসমাজের এমন দ্বন্দ্বও দেখা গেছে।

ভারতীয় নৃপতিরা ধর্মের নামে শাসন ও শোষণ করতেন। তুর্কী আক্রমণকারীরা স্বধর্মীয়দের শোষণে বিন্দুমাত্র পেছপা ছিলেন না। উন্নততর অস্ত্র, ভারতের

রাজনৈতিক অনৈক্য এবং আক্রমণকারী অশ্বারোহীদের প্রাধান্য যুদ্ধজয়ের মূল কারণ। ধর্মের দোহাই দিয়ে যুদ্ধের যেসব বিবরণ সমকালীন লেখকরা পেশ করেন তার উদ্দেশ্য হলো আক্রমণকারী সুলতান ও বাদশার লুণ্ঠেরা চরিত্রকে ধর্মীয় আপ্তবাক্যের সাহায্যে লোকচক্ষুর অন্তরালে রাখা। স্বর্ণ ও সম্পদের সন্ধানে যেসব আক্রমণকারী তুর্কী সৈন্য এই দেশে এসেছে তাদের ধ্বংসলীলার ফলে বহু শিল্পকীর্তি চিরতরে ধ্বংস হয়ে গেছে। এই ধ্বংসলীলা যুদ্ধের অবশ্যম্ভাবী ফল। এই ধ্বংসলীলাকে বর্তমান যুগের অনেক ইতিহাসবেত্তা হিন্দু-মুসলমান বিরোধের উদাহরণ হিসাবে তুলে ধরেন। কিন্তু স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে এই যুদ্ধ ও ধ্বংস তুর্কী আক্রমণের ফলশ্রুতি। ধর্মের বা সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের নমুনা নয়।

২

এই সংঘর্ষের ফলে সমগ্র হিন্দুস্থানে তুর্কী প্রাধান্য নিরঙ্কুশভাবে স্থাপিত হয়নি। তুর্কী বিজয়ের তিনশত বৎসর পরে বাবর যখন হিন্দুস্থান আক্রমণের জন্য সীমান্ত থেকে হানা দিয়েছিলেন তখন পাণিপথের প্রথম যুদ্ধে জয়। পাণিপথের জয় মুঘলদের ভারতে রাজনৈতিক প্রাধান্য স্থাপন নিশ্চিত করে নাই। মূলত খানুয়ার যুদ্ধে রাণা সংগ্রাম সিংহকে পরাভূত করে বাবর উত্তর ভারতে স্বীয় আধিপত্য স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। কারণ রাণা সংগ্রাম সিংহকে বাবর তৎকালীন যুগে সর্বাধিক শক্তিশালী নৃপতি বলে বর্ণনা করেছেন। বাবরের আত্মজীবনীতে[৮] রাণা সংগ্রাম সিংহের কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে—“Not one of all the exalted sovereigns of this wide realm as the Sultan of Delhi, the Sultan of Gujrat and the Sultan of Mandu could cope with (him and) one and all they cajoled him and temporized with him.” বাবরের বংশধর আকবরকে হৃত-সাম্রাজ্য পুনরুদ্ধারের জন্য পুনরায় সংগ্রামে লিপ্ত হতে হয়েছিল একজন পরাক্রান্ত হিন্দুসেনাপতির বিরুদ্ধে। দ্বিতীয় পাণিপথের যুদ্ধে হিমুর নেতৃত্বে আফগান সৈন্য মুঘলদের বিরোধিতা করে এবং হিমুর চোখে আকস্মিক আঘাতের ফলে পাণিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধে তিনি বন্দী হন। ফলে আকবরের জয়লাভ সহজ হয়।

এই দীর্ঘ তিনশতকের তুর্কী শাসনে হিন্দু সেনাপতি ও সৈনিক ও রাজ-কর্মচারীরা রাজকার্যে গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করেছিলেন। প্রাক মুঘলযুগে সুলতান

মামুদের অধীনে সেনাপতি তিলক, শেরশাহের অন্যতম সেনাপতি ব্রহ্মজিৎ গৌর ও আরো বহু হিন্দু সৈনিক তুর্কী সুলতানদের সাম্রাজ্য রক্ষায় নিযুক্ত ছিলেন। মুঘল অথবা প্রাক্-মুঘল-যুগে এই দেশে যে শাসনব্যবস্থা প্রচলিত ছিল তার সঙ্গে দেশের সকল ধর্মের লোকই বিজড়িত ছিল। কারণ মধ্যযুগীয় শাসনব্যবস্থা তুর্কী, আফগান অথবা মুঘল যে-যুগের কথাই বলা যাক না কেন মূলত ছিল স্বদেশী। প্রাথমিক অবস্থায় এইসব শাসকশ্রেণী বিদেশাগত হলেও পরিস্থিতির চাপে এবং সাম্রাজ্যের স্বার্থে তাঁরা এই দেশের মাটিকে স্বদেশ বলে গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন।

অনেক ক্ষেত্রে ভারতে তুর্কী-আফগান-মুঘল শাসনকে বৈদেশিক শাসনের সঙ্গে তুলনা করবার যে অপচেষ্টা আছে তার উত্তরে অধ্যাপক হাবিব[৯] বলেছেন যে, "Because the English government was a foreign government supported by foreign troops, it has been imagined that the Delhi Sultanate and the Mughal Empire were administrations of the same type and it is conveniently forgotten that the Mussalmans of India had no home government outside India and none of that superiority in machine, industry and armaments, which led inevitably in the establishment of British rule in India. The Delhi Sultanate was no more Muslim than the British Empire had been Christian." মধ্যযুগীয় ব্রিটেনে বিজয়ী নর্মানদের ন্যায় ভারতের তুর্কী বিজয়ীরা ও পরবর্তীকালের মুঘলরা এই মাটিকে স্বদেশ বলে গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিল। তুর্কীশাসন ভারতে স্থায়ী হবার অব্যবহিত পরেই সমগ্র মধ্য-এশিয়া মোংগলদের অধীনস্থ হয়। ত্রয়োদশ শতকে চেংগিজ খাঁর দুর্ধর্ষ মোংগলরা সমরখন্দ, বোখরা, খিভা প্রভৃতি ইসলামিক সংস্কৃতির ও সভ্যতার কেন্দ্রগুলি ধ্বংসে পরিণত করেছিল। দলে-দলে পলাতক বাদশা, উজির ও সাধারণ মানুষ তখন মধ্য-এশিয়া থেকে ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করে। তুর্কীশাসনের অন্যতম অবদান—ভারতকে মোংগল আক্রমণের ধ্বংসলীলা থেকে রক্ষা করার কথা আজ আমরা বিস্মৃত। কিন্তু মোংগলরা যে-নিষ্ঠুর ধ্বংসলীলায় অভ্যস্ত ছিল তার অন্যতম প্রমাণ পাওয়া যাবে বাগদাদের ঘটনা থেকে। ১২৫৮ সালে বাগদাদ দখল করে মোংগলরা এখানকার প্রায় সকল অধিবাসীদের হত্যা করে এবং খালিফ

আলমুসতাসিম বিল্লার প্রাণনাশ করে। এই বর্বর আক্রমণ বারবার ভারতের সীমান্ত পার হয়ে সীমান্ত শহর লাহোর, মূলতান এমনকি দিল্লী পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল। তুর্কী সুলতান ইলতুৎমিস, বলবন, বিশেষত আলাউদ্দিন সেই সময় ভারত রক্ষার দায়িত্ব যেরূপ সুষ্ঠভাবে পালন করেছিলেন তার তুলনা হয় না। এই কর্তব্য পালনের জন্য যে-সকল সার্থক ব্যবস্থা, কর বৃদ্ধি, খাদ্য ও নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি প্রচলিত হয়েছিল তার সমালোচনায় আরামকেদারায় অধিষ্ঠিত ঐতিহাসিকরা মুখর। কিন্তু এর ফলে দেশরক্ষার যে গুরুদায়িত্ব সাফল্যের সঙ্গে প্রতিপালিত হয়েছিল তার প্রশংসা করতে তাদের কার্পণ্য দেখা যায়। বরং তাঁরা বারংবার এই কথাই বোঝাতে চান যে হিন্দুরাই এইসকল আর্থিক সংস্কারে প্রপীড়িত হয়েছিল। তাঁরা বিস্মৃত হন যে এই সকল আর্থিক কর (যা বিশেষত সুলতান আলাউদ্দিনের আমলে জরুরি অবস্থার অবশ্যম্ভাবী ফলশ্রুতি) সর্বশ্রেণীর মানুষের উপর সমভাবে পড়েছিল।

তুর্কীরা এই দেশের মাটিকে ভালোবাসতে শিখেছিল। আমীর খসরুর কাব্যে ও সাহিত্যে তার ভুরি-ভুরি উদাহরণ পাওয়া যাবে। খসরুর কবিতায় দেশাত্মবোধ ভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। খসরুর ভাষায় বলা যায় 'বতনে হিন্দ্ ফিরদৌস অস্ত' অর্থাৎ হিন্দ দেশ হচ্ছে স্বর্গ। খসরুর মতে ভারতের জলবায়ু, ফুল ও ফল অন্যান্য যেকোনো দেশের তুলনায় বেশি আকর্ষণীয়। খসরুর [১০] মতে হিন্দুরা ধর্মমতে মুসলমানদের থেকে পৃথক কিন্তু তারাও একই ঈশ্বরের দয়াতে বিশ্বাস করে। খসরুর হিন্দি ভাষার প্রতি প্রীতি সুবিদিত। রাজধানী দিল্লীকে তিনি হজরত-ই দিল্লী বলে উল্লেখ করেছেন এবং দিল্লীর সঙ্গে নন্দনকাননের তুলনা করেছেন। খসরু তাঁর লেখনীর মারফত হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের প্রীতির কথা উল্লেখ করেছেন।

খসরু সম্পর্কে উল্লেখ করে জনৈক লেখক মন্তব্য করেছেন যে, "খসরু চরিত্র আমাদের কাছে মহান শিক্ষার বিষয়, তিনি ছিলেন এক মহান মুসলমান। স্বীয় ধর্মের প্রতি তাঁর অনুরাগ এখনও সমস্ত প্রকার বিতর্কের উর্ধে, তাঁর আত্মিক জ্ঞান আজও পর্যন্ত প্রগাঢ় শ্রদ্ধার বিষয়। এখনো পর্যন্ত তিনি মহান দেশপ্রেমিক হিসাবে স্বীকৃত। তিনি ছিলেন তাঁর মাতৃভূমির মহান প্রেমিক এবং তাঁর জীবন ও পারিপার্শ্বিকের মহান অনুরাগী। তাঁর ধর্মীয় বিশ্বাসের সামান্যও তিনি বর্জন করেননি আবার তাঁর সমদেশপ্রেমিকদের ধর্মবিশ্বাসের প্রতি সামান্য বিরাগও তাঁর ছিল না। তিনি কোনো ধর্মগত

একীকরণ নিয়ে প্রচার করেননি, তা সত্ত্বেও তিনি হিন্দু-মুসলিম সংস্কৃতির এক অগ্রদূত হবার ভূমিকা গ্রহণে অগ্রণী হয়েছিলেন।”[১১]

আমীর খসরুর বক্তব্যের সঙ্গে যদি আলবেরুণীর মতামত ও বাবরের ভারত সম্পর্কে মন্তব্য তুলনা করা যায় তাহলে দেখা যাবে যে শেষোক্ত দুইজন বিদেশীর চক্ষে এই দেশকে দেখেছেন। বাবর তাঁর আত্মজীবনীতে বলেছেন যে,—

হিন্দুস্থান এমন এক দেশ যার কোনো যাদুকরী আকর্ষণ শক্তি নেই। এ দেশের মানুষজন কুরূপ, সামাজিক যোগাযোগের ব্যাপারে 'ফ্যালো কড়ি মাখো তেল'-এর সম্পর্ক সামাজিকতার দেখাশোনায় সহৃদয়তা নেই; আদবকায়দা জানে না; হস্তশিল্প বা কাজকর্মে কোনো ধরনের সুসামঞ্জস্য নেই, নেই যোগ্য পদ্ধতি বা গুণাগুণ; এ-দেশে নেই সু-অশ্ব, নেই ভালো কুকুর, বাজারে নেই আঙুর, তরমুজ বা ভালোজাতের ফলপাকড়, নেই উষ্ণ স্নানব্যবস্থা, উচ্চ বিদ্যায়তন, মশাল বা মোমবাতি।[১২]

প্রথম যুগের তুর্কী আক্রমণকারীদের ও বাবরের সঙ্গে যথাক্রমে পরবর্তী তুর্কী ও মুঘলদের মনোভাবের মৌলিক পার্থক্য সুস্পষ্ট। কেবলমাত্র আমীর খসরুই নয় সমকালীন লেখকদের অনেকেই ভারত প্রেম ও দেশপ্রেমবোধে অনুপ্রাণিত। সুলতান মহম্মদ বিন তুঘলকের সমসাময়িক লেখক ইসেমী উচ্ছ্বাস ভরে লিখেছেন 'খোসা রোওনকে বতান হিন্দুস্তান' অর্থাৎ হিন্দুস্তান কি সুন্দর দেশ। ইসেমীর[১৩] মতে "হিন্দুস্তানের সৌন্দর্যে স্বর্গের ঈর্ষার উদ্রেক করে। আরব, ইরাক, ইরান ও সিন্ধু থেকে যারা এই নন্দনকাননে একবার পদার্পণ করেছে তারা এই দেশের প্রতি এতদূর অনুরক্ত হয়ে পড়ে যে স্বদেশের কথা তাদের বিস্মরণ হয়ে যায়।" বাবরের বংশধরেরা তাই দিল্লীর লালকেল্লার দেওয়ালে লিখে রেখেছেন—

আগর ফিরদৌস বর রুয়ে জমিন অস্ত—
ও হামিন অস্ত ও হামিন অস্ত ও হামিন অস্ত ॥

৪

তুর্কী শাসকরা যখন এই দেশে রাজত্ব শুরু করেন তখনকার দিনে তাঁদের শাসনপদ্ধতিতে ইসলামের প্রতি ও খলিফার প্রতি আনুগত্যের কথা উল্লেখ করে অনেকে দাবি করেন যে সুলতানী যুগের শাসনব্যবস্থা ধর্মভিত্তিক ছিল। কিন্তু স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে নামে তুর্কী সুলতানরা ইসলামের প্রতি

আনুগত্য প্রদর্শন করলেও কার্যত তাঁরা ধর্মের কোনো অনুশাসন সঠিকভাবে প্রতিপালন করতেন না। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে সুলতান[১৪] নাসিরুদ্দিন মামুদ অনেক মেওয়াটি বিদ্রোহীদের হস্তী-পদতলে নিক্ষেপ করেছিলেন, সুলতান আলাউদ্দীন বিদ্রোহী নয়ামুসলমান অর্থাৎ ইসলামে দীক্ষিত মোঙ্গলদের শিশু পুত্র-কন্যাকে হত্যা করেন, মহম্মদ বিন তুঘলক কারণে-অকারণে বহু লোকের প্রাণদণ্ড দিয়েছিলেন। এইসব নিষ্ঠুরতা ইসলাম সমর্থন করে না। যেমন ইয়াহিয়া আজ ধর্মের নামে যে গণহত্যা করছেন তার কোনো সমর্থন ইসলামে পাওয়া যাবে না। শরিয়তে রাজতন্ত্র বা শাসকশ্রেণী অথবা তাদের বিশেষ সুবিধার কোনো বিধি নাই। উলেমারা শরিয়তের বিধি সম্পর্কে নিজেদের একমাত্র মুখপাত্র বলে দাবি করতেন। কিন্তু তাঁরা একদিকে যেমন সুলতানদের মনোরঞ্জন করতে ব্যগ্র ছিলেন অপর দিকে সুলতানরা তাঁদের মতামত সুবিধামতো গ্রহণ বা বর্জন করতেন এবং রাজনীতিক্ষেত্রে তাঁদের হস্তক্ষেপ পছন্দ করতেন না। এইসব উলেমারা আবার অতি সঙ্কীর্ণমনা ও গোঁড়া ছিলেন। অতএব তাঁদের লিখিত সমকালীন রাজকাহিনীতে বা ইতিহাসে তাঁরা নিজেদের আদর্শের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে অনেক বিদ্বেষমূলক কথা লিখেছেন এবং অন্যান্য ধর্মের প্রতি বিষোদ্গার করেছেন। বর্তমান যুগের ঐতিহাসিকের প্রাথমিক কর্তব্য এইসব সাম্প্রদায়িকতাবাদী লেখকের লেখনী-নিঃসৃত রচনাবলীকে যথার্থ বৈজ্ঞানিক তাৎপর্যে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করা এবং প্রকৃত ইতিহাস উদ্ধার করা।

বর্তমান যুগের সাম্রাজ্যবাদের সমর্থক ইউরোপীয় ও তাঁদের অনুকারী এই দেশীয় অনেক প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক মধ্যযুগীয় ইতিহাসের বিকৃত চিন্তাধারাকে একমাত্র সত্য কাহিনী বলে প্রচার করছেন। এই সূত্রে উল্লেখ করা যায় যে সুলতান আলাউদ্দীনের রাজসভার জনৈক গোঁড়া উলেমা কাজী মুঘিম উদ্দীন ধর্মের অজুহাতে একবার তাঁকে হিন্দুদের প্রতি কঠোর ও নির্দয় আচরণ করবার উপদেশ দিয়েছিলেন। তাঁর উপদেশ অগ্রাহ্য করে সুলতান বলেন যে, "আমি যাহা কিছু করি তাহা জনগণের কল্যাণের জন্য। সেই অনুসারেই আমি হুকুম জারি করি। ইহা ধর্মীয় অনুশাসন অনুসারে সঠিক কিনা তাহা আমার অজ্ঞাত। যাহা কিছু রাষ্ট্রের জন্য মঙ্গলজনক তাহা আমি করি; ঈশ্বর জানেন শেষ বিচারের দিন আমার ভাগ্যে কি আছে।"[১৫] অতএব মৌলভী মোল্লাদের গোঁড়ামি সুলতান অগ্রাহ্য করে স্বীয় মতানুসারে রাজদণ্ড পরিচালনা করেন।

দুই-একজন ছাড়া প্রায় সকল তুর্কী সুলতানই এইভাবে রাজকার্যে উলেমাদের হস্তক্ষেপবিরোধী ছিলেন। বহু সমালোচিত ও বিচিত্র চরিত্র মহম্মদ বিন তুঘলক রাষ্ট্রের নীতি নির্ধারণে উলেমাদের প্রভাব অপচ্ছন্দ করতেন। সমকালীন বহু লেখক যাঁরা শেষোক্ত শ্রেণী থেকে গৃহীত তাঁরা সুলতান মহম্মদ দোষক্রটি সম্বন্ধে অনেক আজগুবি অতিরঞ্জিত কাহিনী প্রচার করেছেন কারণ মহম্মদ তাঁদের বিন্দুমাত্র খাতির করেননি। ইবন বতুতার রচনা[১৬] থেকে জানা যায় যে আফিফউদ্দীন নামক একজন উলেমা মহম্মদের দুর্ভিক্ষ নিবারণের জন্য কূপ খননের নীতিকে বিদ্রূপ করার অপরাধে কারারুদ্ধ হয়েছিলেন। আফিফ উদ্দীনের বিরুদ্ধে সুলতানের অভিযোগ ছিল তিনি রাষ্ট্রের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেছিলেন। এই সকল উলেমাদের প্রভাবমুক্ত হয়ে ধর্মীয় সঙ্কীর্ণতার উর্ধে সর্বসাধারণের জন্য তুর্কী সুলতানদের মধ্যে অনেকে এবং মুঘল বাদশাহ আকবর প্রচেষ্টা করেন। আকবরের প্রচেষ্টার অন্যতম কীর্তি দীন-এ-ইলাহী। ধর্মমত হিসাবে এর প্রভাব স্থায়ী হয়নি। কিন্তু সমকালীন ও পরবর্তী যুগের সাম্প্রদায়িক মৈত্রীর সেতুবন্ধনে আকবরের অবদান অবিস্মরণীয়।

৫

মধ্যযুগীয় সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোর বহিরাবরণে ধর্মের প্রভাব যতই বিদ্যমান থাক-না-কেন মূলত সামন্ততান্ত্রিক যুগের শ্রেণীবিভাগই ছিল এই কালের পরিচালিকা শক্তি। অতএব এই দেশের যে সকল দরিদ্র জনসাধারণ ইসলাম ধর্মগ্রহণ করেছিল তারা শোষণের হাত থেকে রেহাই পায়নি আবার সামন্তদের অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলে বহু হানাহানির ও রক্তপাতের কাহিনী এই যুগের ইতিহাসে যে পাওয়া যায় তারও সঙ্গে সাধারণ মানুষের কোনো সম্পর্ক ছিল না। সাধারণ দরিদ্র হিন্দু ও মুসলমান কৃষক এবং শহরের দীন মজুর উপরতলার আমীর ওমরাহ ও হিন্দু রাজস্ব আদায়কারী, রায়, রাণা, মুকাদ্দাম চৌধুরী এবং রাজাদের দ্বারা উৎপীড়িত হয়েছেন।

শাসকশ্রেণী তুর্কী আমীর ও ওমরাহ নিজেদের ক্ষমতা সযত্নে রক্ষা করতেন। সুলতানের দরবারে ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে যেসকল আমীর ওমরাহ ক্ষমতা দখলের প্রচেষ্টা করেছেন, তুর্কী আমীরের দল তাদের বিরোধিতা করেছেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় সুলতান নাসিরুদ্দিনের সময় ভারতীয় মুসলমান আমীর রিহানের বিরুদ্ধে তুর্কী আমীররা বলবনের নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ

হয়েছিলেন। মধ্যযুগের ইতিহাসে বিদেশাগত আমীরদের সঙ্গে ভারতীয় মুসলমান আমীরদের অন্তর্দ্বন্দ্বের চরমতম নিদর্শন হিসাবে সুলতান নাসিরুদ্দিন্ খসরু শাহের সঙ্গে গিয়াসুদ্দীন তুঘলকের বিরোধের কথা উল্লেখ করা যায়। নাসিরুদ্দিন খসরুশাহ সুলতান আলাউদ্দীনের পুত্র সুলতান মুবারক খিলজীকে হত্যা করে সিংহাসন দখল করেছিলেন। গিয়াসুদ্দীন তুঘলক তাঁর বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেন। সমধর্মীর বিরুদ্ধে জেহাদ[১৭] ঘোষণা সম্ভব নয়, তবুও নাসিরুদ্দীন অমুসলমান এই অজুহাতে তুঘলক বংশের প্রতিষ্ঠাতা জেহাদের আশ্রয় গ্রহণ করেন। অর্থাৎ দলীয় স্বার্থে ধর্মকে ব্যবহার করেন। মুঘলযুগে বাদশাহের দরবারে ইরাণী, তুরাণী, হিন্দুস্থানী প্রভৃতি গোষ্ঠীর প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। হিন্দু রাজা মহারাজারা এই সময় বাদশাহের দরবারে প্রভাবশালী হয়েছিলেন। মধ্যযুগে যে-সকল দলীয় ও গোষ্ঠীগত বিরোধ এবং হানাহানি রক্তপাতের কারণ হয়েছিল তা উপরের স্তরের মানুষের ক্ষমতার লড়াই-এর ফলশ্রুতি। তার সঙ্গে ধর্মের সম্পর্ক ছিল না এবং অধিকাংশক্ষেত্রে আমীর ওমরাহদের দলীয় বা ব্যক্তিস্বার্থের দ্বন্দ্ব এইসকল বিরোধের মূল কারণ ছিল।

কিন্তু উপরের তলার এই দল ও গোষ্ঠীগুলি নিজেদের স্বার্থরক্ষার খাতিরে সবসময় সাধারণ মানুষের উপর শোষণ ও শাসন বজায় রাখতে সচেষ্ট ছিল। কার ভাগে কতখানি শোষণলব্ধ ধন পড়বে এই নিয়ে অন্তর্দ্বন্দ্ব বিদ্যমান ছিল। এইজন্য তুর্কী শাসকরা যখন এই দেশে রাজ্যভার গ্রহণ করেন তখন হিন্দু রায়, রাণা, মুকাদ্দাম প্রভৃতি রাজস্ব-আদায়কারীদের সঙ্গে তাঁদের বারংবার বিরোধ উপস্থিত হয়। এইসব বিরোধীকে মধ্যযুগীয় ইতিবৃত্তকারেরা অনেক সময় ধর্মের আবরণ দিয়েছেন। ভ্রান্ত ব্যাখ্যা ও ইতিহাসের চালিকা শক্তি নির্ধারণ সম্পর্কে অজ্ঞতা প্রভৃতি সহ অবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সমকালীন ইতিহাস পাঠ করলে অনেকে মনে করবেন যে এই সকল ঘটনা উপরের তলার মানুষের স্বার্থের দ্বন্দ্ব নয় মধ্যযুগীয় ধর্মযুদ্ধ।

দিল্লী সুলতানের আমলে ও মুঘলযুগে এই দেশে বহুব্যক্তি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল। কিন্তু এই ধর্মান্তরণের মূল কারণ অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে যে অধিকাংশ সময়ই সামাজিক ও অন্যান্য ক্ষেত্রে উৎপীড়ন থেকে রেহাই পাবার জন্য এই ধর্মপরিবর্তন ঘটেছে। আবার কোনো কোনা সময় নানারকম সুযোগ-সুবিধা লাভের উদ্দেশ্যে অনেকে ধর্ম পরিবর্তন করেছে। জোর জবরদস্তি করে গোটা হিন্দুস্থান ইসলামে দীক্ষিত করার ক্ষমতা কারো ছিল না এবং দুই-একজন

ধর্মান্ধ উলেমা সুলতান বা বাদশাহ ব্যতীত কেউ সে-কথা কল্পনাও করে নাই। মধ্যযুগে উত্তর-প্রদেশে সুলতানা ও মুঘল শাসন সর্বাধিক কাল স্থায়ী হয়েছিল। এতদসত্ত্বেও এখানকার মুসলমানরা সংখ্যায় নগণ্য। কিন্তু সুদূর বাঙলাদেশে তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। মূলত যেসব স্থানে সামাজিক ও রাজনৈতিক কারণে উৎপীড়িত নিচের তলার মানুষ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে হৃত অধিকার অর্জনের সম্ভাবনা দেখেছে তারা স্বেচ্ছায় ধর্ম পরিবর্তন করেছে।

জবরদস্তি ধর্মান্তরণে আর একটি বাধা ছিল। অমুসলমানদের কাছ থেকে সুলতানী আমলে জিজিয়া কর আদায় করা হতো। ধর্মান্তরণের অর্থ রাজস্ব হ্রাস। কিন্তু জিজিয়া মধ্যযুগীয় রাষ্ট্রের ধর্মীয় কর। জিজিয়া আদায়ের উদ্দেশ্য ছিল জিমিদের অর্থাৎ যারা সামরিক কার্য করে না তাদের রক্ষা করার দায়িত্ব রাষ্ট্র বহন করবে। অতএব তাদের কাছ থেকে এই কর আদায় যুক্তিসঙ্গত বলে দাবি করা হয়েছে। এই কর ধনী, স্বল্পবিত্ত ও দরিদ্রদের কাছ থেকে বিভিন্ন হারে আদায় করা হতো। বেকার, বৃদ্ধ, নারী, শিশু ও অপারকদের এই কর দিতে হতো না। অপর পক্ষে বিত্তবান মুসলমানদের কাছ থেকে জাকৎ নামক কর আদায় করা হতো। উভয় করকে ধর্মীয় কর বলা চলে। কাজী মুগিমউদ্দীনের ন্যায় উলেমারা এই কর আদায় করে হিন্দুদের হেয় করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু জিজিয়ার বহিরাবরণ ধর্মীয় হলেও মূলত এই সকল ক্ষেত্রে আর্থিক শোষণটাই ছিল মূলকথা যেসকল ক্ষেত্রে জিজিয়া শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে তার থেকে একথা সহজেই অনুমেয়। সুলতান আলাউদ্দিন খিলজী রাজ্যলাভের পর দক্ষিণ-ভারতে যে-সকল অভিযান প্রেরণ করেছিলেন তার অন্যতম উদ্দেশ্য হিসাবে জিজিয়া আদায়ের কথা উল্লিখি হয়েছে। অর্থাৎ জিজিয়ার নামে অর্থ আদায় ছিল প্রধান উদ্দেশ্য। মধ্যযুগীয় আর্থিক শোষণের অন্যতম অঙ্গ হিসাবে এই করকে গণ্য করা উচিত। আকবর বাদশাহ এই করের অবলুপ্তি করেন। ঔরঙ্গজেব যখন পুনরায় এই জিজিয়া আদায়ের প্রচেষ্টায় লিপ্ত হয়েছিলেন তখনকার হিন্দুস্তানে এর ফলে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। জিজিয়ার পুনঃস্থাপনের প্রতিবাদে শিবাজীর পত্রের কথা উল্লেখ করে সর্দার কে.এম. পানিক্কর বলেছেন যে [১৮] "The letter is important not only as a spirited portest against the Jazia, but as a classic statement of Akbar's national state. It provides the clearest evidence of the depth to which it had premeated the Indian mind during a period of hundred years and

Hindus and Muslims alike understood the imposition of the Jazia as a definite reversal of Akbar's policy."

৬

তুর্কী শাসনের ফলে ভারতে যে-রাজনৈতিক পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল তার দ্বারা অগণিত গ্রামীণ মানুষের জীবনে কোনো বিশেষ পরিবর্তন হয় নাই। পুরাতন হিন্দু রাজস্ব-আদায়কারীরা নূতন শাসকশ্রেণীর দ্বারা পদচ্যুত বা ক্ষমতা-চ্যুত হন নাই। যে-কর তাঁরা কৃষক-সাধারণের কাছ থেকে আদায় করতেন তার একটা অংশ রাজ্যসরকারে দেওয়া এবং সুযোগ-সুবিধা পেলে রাজ্যসরকারে কর বন্ধ করে বিদ্রোহ করা এই ছিল রীতি। রাজস্ব আদায়কারী সুযোগ-সুবিধা পেলে কৃষকের উপর কর বৃদ্ধি করে বা রাজ্যসরকারে কর বন্ধ করে নিজেদের পকেটভারি করতেন। তুর্কী শাসকশ্রেণী অগণিত সাধারণ কৃষক ও গ্রামীণ মানুষের জীবনে ইসলামের প্রভাব বিস্তারের জন্য কোনো জোরজবরদস্তি করেন নি। বরং তাদের এতকাল যারা শোষণ করছিলেন সেই হিন্দু রায়, রাণা ও মুকদ্দাম প্রভৃতির হাতেই তাদের ভাগ্য নির্ধারিত হতে থাকল। এর অর্থ এই নয় যে কৃষকরা নির্বিবাদে সকল প্রকার শোষণ ও করবৃদ্ধিকে মেনে নিয়ে ছিলেন। কৃষক অসন্তোষ ও বিদ্রোহ তুর্কী সুলতানী শাসন ও মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের অন্যতম কারণ হিসাবে দেখা দিয়েছে। বর্তমানকালের অনেক ইতি-বৃত্তকারের লেখনী থেকে সাধারণত ধারণা হয় যে মুঘল সাম্রাজ্য প্রধানত আওরংজিবের হিন্দুবিদ্বেষী নীতির ফলে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়েছিল। এই সকল ঐতিহাসিক মুঘলসাম্রাজ্যের গঠনতান্ত্রিক দুর্বলতা ও জায়গীরপ্রথার কুফলের বিষয় গুরুত্ব আরোপ করেন না। তাঁরা ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় বিস্মৃত হন যে কৃষকবিদ্রোহ ও অসন্তোষ মুঘল ও তুর্কীদের পতনের অন্যতম কারণ।[১৯] এই সকল অসন্তোষ কখনও কখনও মধ্যযুগীয় রীতিতে ধর্মের আবরণে প্রকাশিত হয়েছে কিন্তু তাদের অন্তর্নিহিত কারণ অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কাঠামোর মধ্যে নিবদ্ধ।

এই সকল প্রশ্নের সুমীমাংসার জন্য স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে তুর্কী ও মুঘল আমলে শহরে ও রাজধানীতে শাসকশ্রেণী ও তাদের সৈন্যদের আবাসস্থল ছিল। গ্রামাঞ্চলের মানুষ অনেক সময় তাদের অস্তিত্ব সম্পর্কে ওয়াকিবহালও ছিল না। গ্রামীণ ভারতের অধিকাংশ মানুষ তাদের পুরাতন পদ্ধতিতে হিন্দু

রায়, রাণাদের রাজস্ব দিত। এই রাজস্ব বৃদ্ধি প্রাপ্ত হলে অসন্তোষ দেখা দিত। এই জন্য তুর্কী ও মুঘল আমলের কৃষকবিদ্রোহগুলি দেখা দেয়। এই বিদ্রোহগুলি ধর্মীয় কারণে হয়নি, হয়েছে আর্থিক শোষণের বিরুদ্ধে।

সাধারণতঃ যদি প্রশ্ন করা যায় যে তুর্কী ও মুঘল আমলে দেশের প্রকৃত শাসনকর্তা কারা ছিল তাহলে আমরা সকলেই উত্তর দেব সুলতান, ও আমীররা এবং মুঘল যুগে বাদশাহ ও মনসবদাররা। কিন্তু অগণিত গ্রাম ভারতে এদের উপস্থিতি সরাসরি খুব স্বল্প ক্ষেত্রেই দেখা যাবে। মধ্যযুগীয় সাম্রাজ্য শাসকরা ভারতের কৃষিব্যবস্থায় বা রাজস্ব প্রথায় অথবা জীবনযাত্রায় বিশেষ পরিবর্তন আনতে আগ্রহী ছিলেন না। শহরের অধিবাসী মধ্যযুগীয় আমীর ওমরাহ বা সৈন্যদল কৃষিকর্মে লিপ্ত হয়ে সামরিক বিদ্যা বিস্মৃত হতে রাজি ছিলেন না। অতএব গ্রাম ভারতের কৃষিজীবী মানুষ যাদের দ্বারা চিরকাল শোষিত হয়েছেন সেই মধ্যস্বত্বভোগী রায়, রাণা, মুকদ্দাম, চৌধুরীরদ্বারা তুর্কী ও মুঘল আমলেও উৎপীড়িত হতেন। মধ্যযুগীয় তুর্কী ও মুঘল শাসকরা এঁদের মাধ্যমে রাজস্ব সংগ্রহ করতেন। জিয়াউদ্দীন বারাণী ও অন্যান্য মধ্যযুগীয় ধর্মান্ধ লেখক যখন হিন্দু এই শব্দের ব্যবহার করেন তখন তাঁরা এই সকল উচ্চ- শ্রেণীর হিন্দুদের কথাই বলেন এবং প্রধানত তাঁদের বিরুদ্ধে, এই সকল গোঁড়া লেখকরা বিষোদ্গার করেছেন, সাধারণ কৃষকের বিরুদ্ধে নয়।[২০]

সাধারণভাবে শাসকশ্রেণীর আর রাজস্ব আদায়কারীদের (যাঁদের বেশির ভাগই ছিলেন হিন্দু। সম্পর্ক দুইভাবে তিক্ত হওয়া সম্ভব ছিল। রাজস্ব আদায়কারীদের অতিরিক্ত ক্ষমতাবৃদ্ধির ফলে বা রাজকর্মচারীদের স্বৈরাচারিতার জন্য এই সম্পর্ক হানির সম্ভাবনা ছিল। উভয় ক্ষেত্রেই কৃষকদের উপর আর্থিক চাপ বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভবনা ছিল। রাজস্ব আদায়কারীদের ক্ষমতা হ্রাস করে প্রথমোক্ত কারণ দূর করা সম্ভব ছিল। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে রাজস্ব আদায়কারীরা কৃষকদের সরকারবিরোধী বিদ্রোহে নেতৃত্ব দান করত। এই বক্তব্যের উদাহরণ হিসাবে সুলতান আলাউদ্দীন খিলজী ও সুলতান মহম্মদ বিন্ তুঘলকের দোয়াবে রাজস্ব বৃদ্ধি সম্পর্কে নীতির পার্থক্য উল্লেখ করা যেতে পারে। সুলতান আলাউদ্দীন দোয়াবে কৃষকদের উৎপাদনের শতকরা পঞ্চাশভাগ রাজস্ব ধার্য করেছিলেন এবং কৃষকের উদ্বৃত্ত শস্যের জন্য নির্দিষ্ট মূল্য নির্ধারণ করে তার থেকে লাভের পথ বন্ধ করে দিয়েছিলেন। মহম্মদ বিন তুঘলকও প্রায় এই একই

বারে রাজস্ব বৃদ্ধি করেন, কিন্তু উদ্বৃত্ত শস্যের বিক্রয় মূল্য নির্ধারণ করেননি। কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও তাঁর আমলে দোয়াবে কৃষক-বিদ্রোহ ব্যাপক আকারে দেখা দিয়েছিল, কিন্তু আলাউদ্দীনের নীতি সাফল্য অর্জন করেছিল। উভয়ের রাজত্বের মধ্যে সময়ের ব্যবধান অত্যন্ত অল্প, একজনের আমলে কৃষকরা দোয়াব অঞ্চলে বিদ্রোহী হয়েছিল, অন্যজনের আমলে হয়নি কারণ আলাউদ্দিন রাজস্ব আদায়কারীদের শোষণ বন্ধ করতে সমর্থ হয়েছিলেন, আর মহম্মদের নীতির ফলে রাজকর্মচারীদের অত্যাচার বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং রাজস্ব আদায়কারীরা কৃষকদের সঙ্গে মিলিত হয়ে বিদ্রোহী হয়েছিল। আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে প্রায় এই ঘটনারই পুনারাবৃত্তি দেখা যায়। আওরঙ্গজেবের রাজত্বের শেষভাগে যে-সকল বিদ্রোহ দেখা দিয়েছে তাদের মূল কারণ অনুসন্ধান করে ডক্টর ইরফান হাবিব এই যুগে করভার প্রপীড়িত কৃষকের অবস্থার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।[২১] এই সূত্রে ডক্টর হাবিব বলেছেন যে মুঘলদের পতনের অন্যতম কারণ হচ্ছে সাম্রাজ্যের আর্থিক নীতি! যার ফলে জমিদার ও জায়গীরদের সঙ্গে অনেক ক্ষেত্রে কৃষকদের আঁতাত গড়ে উঠেছে। হাবিবের ভাষায় বলা যায় আমরা যে-সকল সংঘর্ষের কথা জানি তারা প্রধানত আর্থিক শোষণের ফলে অনুষ্ঠিত হয়েছিল ধর্মীয় কারণে নয়। প্রথমত শাসকশ্রেণী ও হিন্দুরাজস্ব আদায়কারীদের মধ্যে দ্বন্দ্ব, দ্বিতীয়ত রাজস্ব আদায়কারী ও কৃষকদের মধ্যে দ্বন্দ্ব এবং তৃতীয়ত শাসকশ্রেণী ও রাজকর্মচারীদের সঙ্গে কৃষকের দ্বন্দ্ব এই তিন দ্বন্দ্বের প্রেক্ষাপটেই ঐ যুগের সংঘর্ষগুলিকে দেখতে হবে। মধ্যযুগীয় ভারতের তুর্কী ও মুঘল শাসকশ্রেণী যে-হাঁসটি সোনার ডিম দেয় তাকে রক্ষা করার কথা চিন্তা করতেন। এইজন্য তারিখ-ই ফকরউদ্দীন মুবারকশাহীর লেখক বলেছেন, সম্পদ ব্যতীত মানুষের অস্তিত্ব থাকে না, চাষী ছাড়া সম্পদ উৎপাদন করা অসম্ভব। সুশাসন ব্যতীত চাষীর সম্পদ বৃদ্ধি পায় না; শান্তি ছাড়া সুশাসন অসম্ভব। মোগল রাজশক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামে কৃষক ও জমিদারেরা প্রায়শই সম্পর্কিত হয়ে সামিল হতো। এভাবে কৃষকের কেবলমাত্র যে-জমিদারের জমিতে ফসল ফলিয়েই জমিদারের সম্পদ বৃদ্ধি করত না, উপরন্তু বহু ক্ষেত্রে তাঁর কার্যনীতিও দলবৃদ্ধি করত। এই পথেই মুঘলদের বিরুদ্ধে দুটি অত্যন্ত শক্তিশালী বিদ্রোহ পরিচালিত হয়, মারাঠা ও জাঠদের এই বিদ্রোহ শেষ পর্যন্ত পুরো সাম্রাজ্যবাদই ভস্মসাৎ করে। লক্ষ্য এবং শাসন ও শোষণের ক্ষেত্রে কৃষকের সঙ্গে তার সম্পর্ক নির্ধারিত হয়েছিল আর্থিক সম্পর্কের

পরিপ্রেক্ষিতে ধর্মীয় অনুশাসন প্রচারের মানদণ্ডে নয়। রাজস্ব আদায়কারী বিত্তবান হিন্দুদের সম্পর্কে যেসব বিষোদ্গার সমকালীন ইতিহাসে শোনা যায় তার মূল কারণ ধর্মের মধ্যে নয় তৎকালীন আর্থিক ও রাজনৈতিক অন্তর্দ্বন্দ্বের মধ্যেই নিহিত ছিল। এইজন্য দেখা যায় যে ফিরুজশাহ তুঘলকের ন্যায় গোঁড়া ধর্মান্ধ স্থলতান কৃষির ও কৃষকের উন্নতির জন্য ব্যগ্র এবং সেচব্যবস্থার মারফতে গ্রামাঞ্চলের চাষাবাদের উন্নয়ন করতে আগ্রহশীল, কিন্তু জায়গীরদার ও রাজস্ব-আদায়কারীরা কৃষক বা কৃষিব্যবস্থার স্বার্থে বিন্দুমাত্র আগ্রহী ছিলেন না। কারণ তাঁরা স্বল্পকালের মধ্যে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করে নিতে ব্যগ্র ছিলেন এবং নির্মমভাবে কৃষককে শোষণ করতেন ও রাষ্ট্রকে প্রাপ্য রাজস্ব থেকে বঞ্চিত করতেন। কাফি খাঁ অভিযোগ করেছেন যে সম্রাট আওরঙ্গজেব যে-সকল কর থেকে সর্বসাধারণকে রেহাই দিয়েছিলেন ফৌজদার ও জমিদারদের জন্য সেই সকল আইনে কার্যত কোনো লাভজনক ফল হয়নি। কিন্তু শাসকশ্রেণী ও রাজস্ব আদায়কারীদের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব থাকলেও উভয়ের শোষণের ফলে কৃষকসমাজ উৎপীড়িত হতেন। এই যুক্ত শোষণের সঙ্গে ধর্মের ভেদাভেদ ছিল না। কৃষকশ্রেণী কিন্তু নীরবে এই শোষণকে সর্বত্র স্বীকার করে নেয়নি। মধ্যযুগের ইতিহাসে এইজন্য কৃষকেরা বিদ্রোহের বহু ইতিবৃত্ত পাওয়া যায় এবং মধ্যযুগীয় সাম্রাজ্যগুলির উত্থান ও পতনের মূল কারণ অনুসন্ধান করতে হলে আর্থিক ও রাজনৈতিক কাঠামোর মধ্যে অনুসন্ধান করতে হবে ধর্ম-বিরোধে নয়।

৭

ভারতে তুর্কী বিজয়ের ফলে এই দেশের শহরের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং সর্বশ্রেণী ও ধর্মের লোক নাগরিক জীবনের আস্বাদ লাভ করে। কোনো-কোনো ঐতিহাসিক এই ঘটনাকে বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন বলে বর্ণনা করেছেন।[২৩] কিন্তু শহরেরজীবনযাত্রার ধনী ও দরিদ্রের পার্থক্য সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান। ধনী আমির ওমরাহরা বিলাস লালসাময় মদির মধুর জীবনযাত্রা নির্বাহ করতেন। আর দরিদ্র সাধারণ চরম কৃচ্ছ্রতার মধ্যে দৈনন্দিন আয়ব্যয়ের সমতা রক্ষায় ব্যাপৃত থাকতেন। শহরের দরিদ্র অধিবাসীদের দৈনন্দিন আয়ের কোনো সঠিক হিসাব পাওয়া যায় না। সামসী সিরাজ আফিফ তারিফ-ই-ফিরোজশাহী নামক গ্রন্থে বলেছেন যে ৫টি রোপ্যজিতল (৪৮ জিতল ১ তংকা, H. N. Wright-Cionage & Metrology of the Sultans of Delhi, পৃঃ ৭৩) ব্যয় করলে

দিল্লী থেকে ফিরোজাবাদে পাঁচক্রোশ পথ যাবার যানবাহন পাওয়া যেত, পাল্কী বাহকরা এই পথের ভাড়া নিত আধ তংকা এবং ঘোড়ার জন্য লাগত ৬ জিতল। আফিকের মতে শহরের রাস্তাঘাটে অজস্র বেকার মজুর পাওয়া যেত।[২৪] একটা সাধারণ হিসাবেই এই সকল দরিদ্র পাল্কী বাহকদের দৈনন্দিন আয়ের একটা ধারণা পাওয়া যায়। কমপক্ষে চারজন পাল্কীবাহক পাঁচক্রোশ পথ অতিক্রম করে ২৪ জিতল আয় করত অর্থাৎ এক-একজন দিনে মাত্র ৬ জিতল লাভ করত। সহজেই বোঝা যায় যেখানে অজস্র বেকার মজুরে শহর ভর্তি সেখানে একজন মজুর পাল্কীবাহকদের চেয়ে বেশি পেত না। এ-কথাও সহজেই অনুমেয় যে পাঁচ ক্রোশ পথ পাল্কী বহন করবার পর কারো পক্ষে একই দিনে অন্য কাজের ভার নেওয়া সম্ভব ছিল না আর কাজের চেষ্টা করলেও পাওয়া সহজ ছিল না। অতএব ধরা যায় যে একজন সাধারণ দরিদ্র খেটে-খাওয়া মানুষের আয় তৎকালীন যুগে ছিল ৬ জিতল। সাধারণ একটি পরিবারে যদি পিতা-মাতা ও দুটি সন্তান থাকে তাহলে মাথা পিছু দৈনন্দিন আয় দাঁড়ায় দেড় জিতল অর্থাৎ মাসে এক তংকার মতো। এই আয়ের উপর ভিত্তি করে কোনোক্রমে সংসার নির্বাহ করতে হতো।[২৫] কে. এম. আশরফ হিসাব করে দেখিয়েছেন যে এক তংকা আয়ে একজন ব্যক্তির সংসার খরচ নির্বাহ সম্ভব ছিল। আশরফের বক্তব্য নিম্নে উদ্ধৃতি হলো মাসালিক উ'ল আবসার-এর গ্রন্থকার তাঁরা সংবাদদাতার বক্তব্য উদ্ধৃত করে জনৈক খোজান্দি নামক ব্যক্তির ঘটনা উল্লেখ করেছেন। তিনজন বন্ধু সহ খোজান্দিকে সেদ্দ গো-মাংস, রুটি ও মাখন সহ খাদ্য দেওয়া হলো। যেন খরচ ১ জিতল। এই খরচাকে ভিত্তি হিসাবে ধরে নিয়ে যদি আমরা হিসাব করি দেখব দৈনিক খাদ্যের দু-বেলার যোগানের জন্য কোনো ব্যক্তির একমাসে গড়খরচা হবে ১৫ জিতল। প্রাতরাশের জন্য আরও পাঁচ জিতল যোগ করলে, খাদ্যের জন্য মাসে গড় খরচা পড়ে ২০ জিতল। বস্ত্র ও অন্যান্য খাতে ব্যয় একসঙ্গে ধরে নিলে বেশি করে ধরলেও প্রতিমাসে এক তংকার বেশি খরচা হতে পারে না।[২৬] সাধারণ অবস্থায় দরিদ্র জনসাধারণের জীবনযাত্রার আয় ও ব্যয়ের কোনোক্রমে সমতা আনা সম্ভব হলেও দুর্ভিক্ষের সময় তাদের দুর্দশা বৃদ্ধি পেত। যে-সকল দরিদ্র ব্যক্তি ইসলামে দীক্ষিত হয়েছিল তাদের অবস্থা দরিদ্র হিন্দুদের অপেক্ষা কোনোক্রমেই ভালো ছিল না। তৎকালীন আমির ওমরাহরা এতদূর বিলাসী ছিলেন যে তাঁরা অনেক সময় একটি পোষাক দিনে একবার পরিধান করেই ত্যাগ করতেন।[২৭] জিয়াউদ্দীন বারাণী অভিযোগ করেছেন যে

ধনী হিন্দুরা কিংখাপ-এর পোষাক, অলঙ্কার ও বাদ্যবাজনা ব্যবহার করে। তাদের বিলাসিতার তুলনায় দরিদ্র মুসলমানদের দুর্দশা বারাণীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। বারাণী এক্ষেত্রে উগ্র ধর্মান্ধ দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে প্রশ্ন বিচার করেছেন। তাঁর অভিযোগ প্রধানত বিত্তবান হিন্দুদের বিরুদ্ধে! মূলত তৎকালীন আর্থিক কাঠামোতে দরিদ্র সাধারণ ধর্মমত নির্বিশেষে শোষিত ছিলেন এবং সকল সম্প্রদায়ের বিত্তবানরা বিলাসী জীবন যাপন করতেন।

শহরে ব্যবসায়ীদের মধ্যে অনেকে ছিলেন বিত্তবান হিন্দু। বণিকশ্রেণী হিন্দু ও মুসলমান উভয়ের সহযোগিতা রাষ্ট্রের পক্ষে প্রয়োজনীয় ছিল। মিনহাজ সিরাজের তারকত-ই নাসিরী থেকে আমরা জানতে পারি যে সুলতান মুইজদ্দীন বহরম শাহের (সুলতান ইলতুতমিসের পুত্র) রাজত্বকালে লাহোর যখন মোঙ্গলদের দ্বারা আক্রান্ত হয় তখন শহরের শাসনকর্তা মালিক কায়াকুম আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে বণিকদের সহযোগিতা লাভে ব্যর্থ হয়েছিলেন। ফলে তাঁকে লাহোর পরিত্যাগ করতে হয়। ২৮ এই কাহিনী থেকে আভাস পাওয়া যায় যে তৎকালীন যুগে বণিকশ্রেণীর সহযোগিতা লাভ দেশের প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে কতদূর গুরুত্ব লাভ করেছিল। লাহোরে বণিকরা মোঙ্গল খানদের অনুমোদন নিয়ে তাঁদের অধিকৃত দেশে বাণিজ্য করতেন। অতএব আর্থিক স্বার্থে বণিক শ্রেণী সুলতানী শাসনের স্বার্থকে অবহেলা করেছিলেন।

আর্থিক স্বার্থের ক্ষেত্রে বণিকশ্রেণী কতদূর ঐক্যবদ্ধ ছিলেন তাহার আরেকটি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় সুলতান ফিরুজ শাহ তুঘলকের রাজত্বকালে। সুলতান ফিরুজশাহের রাজত্বকালে রাজধানী দিল্লীতে দূর-দূরান্তর থেকে যেসব বণিক দিল্লী শহরে পণ্য সরবরাহ করতেন, তাদের আমলাতন্ত্রের অত্যাচারে অনেক নিগ্রহ ভোগ করতে হতো। একবার একজন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী আমলাদের কোপে পড়ে এবং তার তিনমণ তুলা আটক করা হয়। আকস্মিকভাবে এই তুলা অগ্নিদগ্ধ হয়েছিল। ফলে ব্যবসায়ী মহলে এতদূর অসন্তোষ উপস্থিত হয় যে তারা দিল্লী পণ্য আমদানী বন্ধ করে দিয়েছিল। অবস্থা এতদূর গুরুতর আকার ধারণ করে। ফলে এই ঘটনা সুলতানের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল এবং তিনি বেআইনী কর ও উৎকোচ গ্রহণ বন্ধ করবার ব্যবস্থা করেন। ২৯ আর্থিক স্বার্থে বণিকশ্রেণীর ঐক্য সম্পর্কে কাফী খানও উল্লেখ করেছেন। মুসলমান ব্যবসায়ীদের সাহায্য করবার জন্য আওরঙ্গজেব হুকুম জারি করেছিলেন যে ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের পণ্যের উপর মুঘল সাম্রাজ্যে কোনো শুল্ক আদায় করা হবে না।

কিছুকাল পরে এই হুকুমনামা সংশোধন করে ঘোষণা করা হয় যে মুসলমান বণিকেরা পণ্যের পরিমাণ কম হলে রেহাই পাবে। কিন্তু শেষে দেখা গেল যে মুসলমান বণিকই এক-একবারে স্বল্প ওজনের পণ্য আমদানী ও রপ্তানী করছে এবং হিন্দু বণিকদের পণ্য অনেকক্ষেত্রে মুসলমান বণিকদের নামে চালান করা হচ্ছে।[৩০] এইভাবে আর্থিক স্বার্থে ঐক্যবদ্ধ বণিকশ্রেণী ধর্মান্ধ আওরঙ্গজেবের আইনকে ফাঁকি দিতে শুরু করে।

৮

অতএব দেখা যায় মধ্যযুগের ইতিহাসে ফিরুজ তুঘলক বা আওরঙ্গজেবের ন্যায় ধর্মান্ধ শাসকরা যে গোঁড়ামি প্রদর্শন করেছিলেন সাধারণের মধ্যে সেই গোঁড়ামি বিস্তার লাভ করে নাই। মধ্যযুগেও সমাজে রক্ষণশীলতা ও সামাজিক প্রথা সর্বত্র মানুষকে ধর্মের গোঁড়ামির মধ্যে আবদ্ধ রাখতে চায়। ভারতে ইসলাম এর আগমনের পরবর্তী যুগে এই গোঁড়ামি প্রভাব বিস্তার করেছিল এবং সামাজিক ক্ষেত্রে পার্থক্যের সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু এতদসত্ত্বেও উভয় সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে পারস্পরিক লেনদেন মানসজগতে সে ঐক্যের সেতুবন্ধ রচনা করে ফলশ্রুতি হিসাবে সুফী, বৈষ্ণব ও ভক্তি আন্দোলনের সৃষ্টি হয়। সাহিত্য সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এই মিলনের ফলে নূতন সৃজনী প্রতিভার বিকাশ হয় এবং সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে মিলনের পথ প্রস্তুত করে। এইজন্য যেসব লেখক প্রাক ব্রিটিশ হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে বিভেদের চিত্র অঙ্কিত করেন, এবং সাম্রাজ্য-বাদের বিভেদমূলক রাজনীতিকে অস্বীকার করেন তাঁদের বক্তব্য পক্ষপাতদুষ্ট। বিগত কয়েক বৎসর পাকিস্তানের রাজনীতি ও বর্তমানে বাঙলাদেশের ঘটনা প্রমাণ করে যে ধর্মের নামে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিরা মানুষকে শোষণ করে। কিন্তু ধর্ম তাদের কাছে বড় নয়, নিজেদের আধিপত্য বজায় রাখার জন্য তারা ধর্মান্ধ-তার আশ্রয় গ্রহণ করে। ভারতের এক শ্রেণীর বুর্জোয়াদের ও প্রতিক্রিয়াশীল দের ধর্মের নামে বিশেষ সুবিধা আদায়ের প্রচেষ্টার ফলেই সাম্রাজ্যবাদের সহযোগিতায় দেশবিভাগ হয়েছিল।[৩১] পাকিস্তান সৃষ্টির পূর্বে ও পরে এক শ্রেণীর রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির জন্য যেভাবে ভারতের ইতিহাসে উভয় সম্প্রদায়ের বিরোধের চিত্র অঙ্কিত করেছেন তা বিকৃত ও উদ্দেশ্যমূলক। কারণ সামাজিক বিভেদ ও ধর্মীয় মতপার্থক্য সত্ত্বেও এই দেশের মাটিতে হিন্দু মুসলমানের উক্ত সাধনায় ইতিহাস রচিত হয়েছে।

গ্রন্থপঞ্জী

(১) তবকত ই-নাসিরী—পৃষ্ঠা ২৬৭; (২) Elliot and Dowson—History of India as told by her own Historians Vol I—Pp 122-23 (৩) Al-Biruni's India—(Sachau trans)—Vol I Pp 22-23; (৪) চাঁদ বরদাই—পৃথ্বীরাজ রাসো (নাগরী প্রচারণী গ্রন্থমালা) পঞ্চম খণ্ড, শ্লোক ১৪৭-৬২; (৫) চাঁদবরদাই তাঁর লেখনীতে অনেক সময় কবিকল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। কিন্তু তাঁর চিত্রকল্প সময়কালীন পরিস্থিতির আভাস দেয়। এই সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার জন্য ডাঃ বিপিনবিহারী ত্রিবেদীর রেবতট সময় (হিন্দী) নামক গ্রন্থ পৃষ্ঠা ২২২ দ্রষ্টব্য। চাঁদ বরদাই-এর লেখনী থেকে ঐতিহাসিক সারমর্ম (Historical Kernel) পাওয়া যায় (Dynastic History of Northern India Vol II Pp 1085); (৬) তবকত-ই-নাসিরী পৃষ্ঠা ১৫৩-১৫৫ (৭) Al-utbi-Kitab-i Yamini (Reyeolds translation) Pp 365-67; (৮) Memoirs of Babur (Beveridge trans) Pp 483-561-62; (৯) Muhammad Habib, Introduction to the History of India as told by her own Historians by Elliot and Dowson (Aligarh, Cosmopolitan Publisher) Pp 36, (১০) Amir Khasrau—Nuh Siphir edited by M.W.Mirza Pp 153, 181-189; Qiran-usadain (Aligarh) Pp 28; (১১) Patriotism in Amir Khasrau's work by S. Salah-Ud-Din Abdur Rahman (Journal-Indo-Iranica Vol-xv, September, 1962); (১২) Memoires of Babur (Beveridge trans) Vol I Pp. 518; (১৩) Futuh-us-Salatin (Madras Ed) vs 1124-1139; (১৪) Ravetry trans. Tapaqat-i-Nasiri Pp 855; Barani-Tarikhi-i-Firuz Shahi (B.I) Pp 252-53, Rehla of Ibn Battutta trans. M-Hussain Pp 56; (১৫) Barani Pp 295-96; (১৬) Rehla (Eng-trans) Pp 88-89, (১৭) Amir Khasrau—Tugh lug-namah Pp 50; (১৮) K.M. Panikar—A Survey of Indian History Pp 159; (১৯) Irfan M. Habib—The Agrarian Causes of the downfall of the Mughal Empire (Enquiry Vol II 1959 (২০) W. H. Moreland—Agrarian System of Moslem India

Pp 32 ; (২১) Habib—Agrarian Causes of the Downfall of the MughalE mpire ; (২২) Fakhr-Mudabir—Tarike-i-Fakhr-uot-hin Mubarak Shahi (edited by Sir Denison Ross) Pp 36 ; (২৩) Muhammad Habib—Introduction to History of India etc. by Elliot and Dowson (Aligarh Ed) ; (২৪) Shamsi Siraj Afif—Tarikh Firuz Shahi (B.I) Pp 131 , (২৫) A. K. Sen—People and politics in Early Mediaeval India (Indian Book Distributing Co,) Pp 28 (২৬) K,M. Ashraf—Life and conditions of the People of Hindusthan (Jiwan Prakhashan, 1959) Pp 131 ; (২৭) Barani—Trikh-i-Firuz Seahi (B.I) Pp 117-119 ; (২৮) Raverty—Trans-lation—Tabaqat-i-Nasire Pp 655-656n ; (২৯) Shamshi-Siraj-Afif—Tarikh-i-Firuz Shahi (B.I) Pp 376-377. ; (৩০) Khafi Khan—Muntakhab-ul-Lubab Voll II Sushil Gupta reprint Pp229-30 ; (৩১) Y. V. Gankousky, L.R, Gordon-Polonskaya—A History of Pakistan (1947-58) Nauka Publishing House (Moscow, 1964) Pp 96.

সমবেত যুযুৎসব ও কৌশিক একাকী

জ্যোৎস্নাময় ঘোষ

বুকের তলায় বালিশ নিয়ে মাথা ঝুঁকিয়ে লিখতে লিখতেই কৌশিক টের পায় দিদি নিঃশব্দে চৌকির পাশে এসে দাঁড়ালেন। একধরনের ভাবলেশহীন কণ্ঠে কোনো ভূমিকা না করেই তিনি বললেন, ইলেকট্রিক বিলের টাকা জমা দেবার শেষদিন আজই, আমার হাত একেবারেই খালি। কৌশিক হাত বাড়িয়ে লম্বা লম্বা ছাপানো কাগজটা নিলো,কেন নিলো তা সে নিজেও জানে না। দিদি তবু দাঁড়িয়ে রইলেন, ফাইল খুলে তার লেখায় চোখ রেখে কেমন যেন এক বিষণ্ণ গলায় বললেন, এ-সপ্তাহের রেশনটা—বলেই থেমে গেলেন। কৌশিক গল্পের ইচ্ছা পুরণের দেবতার মতো প্রসন্ন ভঙ্গিতে বলল, ঠিক আছে। দিদি প্রায় সাথে-সাথেই ফাইলটা বন্ধ করে ফেললেন, পেছন ফিরে হেঁটেও গেলেন খানিকটা কৌশিক যখন ভেবে নিয়েছে দিদি চলে গেলেন এবং সেজন্যেই পেনের ক্যাপ খুলে যখন সে সামনের দিকে ঝুঁকেও পড়েছে, তখনই দিদির গলা আবার সে শুনতে পেলো, স্কুলে খবর নিয়েছিলি আর? প্রশ্নটার কোনো জবাব দিলো না কৌশিক, সামনের দিকে তাকিয়ে রইল নিঃশব্দে। ঘরের মাঝখান থেকে এবার কিছুটা উত্তপ্ত কণ্ঠ ভেসে এলো, বড় মেসোমণির কাছে গেলে কি তোর প্রেস্টিজ চলে যাবে নাকি। এতো বড় অফিসার একজন, এতো ভালো মানুষ—কৌশিক মুখ ফিরিয়ে দিদির দিকে তাকিয়ে তাড়াতাড়ি বলে, কাল যাবো। দিদি খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে হতাশার সুর তুলে বললেন, আর গেছো। সঙ্গে সঙ্গে বেশ সাবলীল কণ্ঠে ঝগড়া করার মতো করে তিনি চেঁচালেন, যারা সব আসতেন, তারা কোথায় গেলেন আজ! কৌশিক হেসে ফেলল, দিদির মুখে চোখ রেখে হাল্‌কা সুরে বলল, আসতে বলে দেবো সবাইকে। কাল থেকে জোর আড্ডা হবে, তাহলেই তো সব প্রোবলেম সল্‌ভ, কি? দিদিকে বেশ কিছুটা বিব্রত দেখায়, তাড়াতাড়ি দরজা ঠেলে পাশের ঘরে চলে যান তিনি, যেতে যেতে কটু কণ্ঠে মন্তব্যের মতো করে বলেন, লেখা আর আঁকার সাজ-সরঞ্জামগুলো তো দিব্যি আসে দেখি—

কথাগুলো ধাঁ করে বুকের গভীরে কোথাও বসে যায় কৌশিকের, এইসব মুহূর্তে নিজেকে প্রকৃতই বিপন্ন এবং অসহায় মনে হয় তার। কৌশিক বুঝতে পারে তার রক্তচাপ বেড়ে যাচ্ছে, খানিক বাদেই তার শিরা-উপশিরায় প্রবাহিত রক্তস্রোত কোষে-কোষে তন্তুতে-তন্তুতে তীব্র এক জ্বালা ছড়িয়ে দেবে, অন্ধ আক্রোশে এরপরেই দিগবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে যাবে সে। ইদানীং হঠাৎ-হঠাৎ রেগে উঠছে সে, বোধহয় অকারণেই কিংবা তুচ্ছতম প্ররোচনায়। কাল অবলার চায়ের দোকানে যে বিশ্রী কেলেঙ্কারিটা হয়ে গেল তারজন্য নিজের অকারণ উত্তেজনাকেই পরে দায়ি করেছে সে। সাহিত্য রাজনীতি এবং এ-সংক্রান্ত প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলো ছুঁয়ে-ছুঁয়ে তারা যখন ক্লান্ত, আড্ডার এই 'ফেটিগ পয়েন্ট' প্রদোষ ওর স্বভাবসিদ্ধ ঢংয়ে হালকা চালে বলেছিল, তোর গিন্নির খবর কৌশিক?—কিরে শালা, মৌনীবাবা হয়ে গেলি যে! কেটেছে তো—জানতাম এ-ই হবে। প্রেম করবি তোরা, আর শালা বিয়ে করবো আমরা। কারণ আমাদের ইকনমিক পোটেনশিয়ালিটি রয়েছে—কথাটা কতবার যে তোকে বলেছি—এরপরই প্রচণ্ড শব্দ করে একটা গ্লাস ছিটকে পড়েছিল, প্রবল ক্রোধের বন্যায় ভেসে যেতে-যেতে উচ্চকিত কণ্ঠে অনেকক্ষণ ধরে নির্বোধের মতো অনর্গল কি সব যেন সে বলে-বলে গেল, নিজের কণ্ঠস্বর সে নিজেই চিনতে পারছিল না, মনে হচ্ছিল অনেক দূরের কোনো কণ্ঠ থেকে কথাগুলো যেন নিক্ষিপ্ত হচ্ছে, স্থান, কাল কিংবা পাত্র কোনোটার সম্পর্কেই তার মনে কোনো স্পষ্ট ধারণা হচ্ছিল না, কথাগুলো কে কাকে কোথায় কেন বলেছিল কিংবা বলছিল সে-সম্পর্কে সে নিশ্চিত হতে পারেনি, তবু মনের ভেতর এক ধরনের উল্লাস হচ্ছিল তার, প্রচণ্ড জোরে হাততালি বাজিয়ে চিৎকার করে উঠতে চাইছিল সে, চালিয়ে যাও ভাই, পেড়ে ফ্যালো শালাদের, পাইপগান পিস্তল মর্টার স্ট্যাবার, হেই, চালাও···নিজেকে একসময় বাইরে দেখতে পেলো সে, তার দু-কাঁধ ধরে প্রচণ্ড জোরে ঝাঁকুনি দিতে-দিতে সুরথকে ক্ষিপ্ত কণ্ঠে বলতে শুনল সে, ইউ বেটার ডাই, কৌশিক, ডাই—সেই মুহূর্তে চতুর্দিকে প্রবল জলোচ্ছ্বাসের আওয়াজ শুনতে পেলো কৌশিক, তার চতুষ্পার্শ্বস্থ দৃশ্যপট বিসর্জনের প্রতিমার মতো সেই জলোচ্ছ্বাসে তলিয়ে গেল—

এইসব মুহূর্তগুলোতে কৌশিক তাই ভয় পায়, সংযম এবং শোভনতার যে-বলয়টি তার চারপাশে দীর্ঘদিনের পরিচর্যায় সে গড়ে তুলেছিল ইদানীং তা বড় দ্রুত ভেঙ্গে-ভেঙ্গে যাচ্ছে, মন যেন তার বল্গাহীন তেজী ঘোড়ার সওয়ার,

বড় দ্রুত এবং অস্থির তার চলন, আর সে নিজে এই বিপজ্জনক রেসের বিমূঢ় দর্শক মাত্র।

কাগজপত্র ফাইলের ভেতর রেখে সে উঠে পড়ে তাড়াতাড়ি, পাঞ্জাবী গলিয়ে ভেতরের দিকে মুখ বাড়িয়ে ডাকে, মা। মার কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না, কৌশিক ভেতরের ঘর দিয়ে বারান্দায় আসতেই মাকে দেখতে পেলো, থামের ছায়ায় দাঁড়িয়ে দূরের আকাশের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন তিনি, মাকে হঠাৎ ভীষণ শীর্ণ বলে মনে হলো তার, কেমন যেন শুকিয়ে যাওয়া, এইসময়ই মার বুকের ব্যথার কথাটা মনে পড়ে গেল তার, ব্যথাটা হয়তো বেড়েছে, ব্যথাটা বাড়লেই আটাশ কোর্সের একটা ইন্‌জেক্‌শন নিতে হয় মাকে, আটাশটা ইন্‌জেক্‌শন অর্থাৎ তিন টাকা ইন্‌টু আটাশ প্লাস ইন্‌জেক্‌সন দেওয়ার খরচ বাবদ আরো আটাশ টাকা অর্থাৎ একুনে মোট খরচ একশ-চোদ্দ টাকা, সরকারী বয়ান মোতাবেক একশ-চোদ্দ টাকা মাত্র, ভাবা যায় না! অপর্যাপ্ত রোদের উঠোন ছেড়ে থামের প্রগাঢ় ছায়ায় আকাশে মুখ তুলে মাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে কি এক আশঙ্কায় বুকের ভেতরটা কেঁপে-কেঁপে ওঠে তার, মা কি আলো থেকে অন্ধকারেই চলে যেতে চান। কৌশিক দ্রুত পায়ে মার পাশে গিয়ে দাঁড়ায় আস্তে করে ডাকে, মা, ধীরে-ধীরে মুখ ফিরিয়ে তাকান তিনি, তাঁর ঘোলাটে চোখে নিঃসীম ক্লান্তির ছায়া দেখতে পায় কৌশিক, গলায় উদ্‌বেগ নিয়ে সে বলে, তোমার এ ক্যামন চেহারা হয়ে গেছে মা! মলিন হেসে ক্লান্ত কণ্ঠে তিনি বললেন, আমি তো ভালোই আছিরে, তারপর তার কাঁধে হাত রেখে যেন পরিশ্রান্ত হয়েছেন যেন জিরোতে চান এমনিভাবে কিছুক্ষণ দাড়িয়ে রইলেন, উল্টানো কচু পাতার মতো তাঁর মুখে অসংখ্য রেখা ফুটে উঠতে দেখল কৌশিক, খানিকবাদে তাঁর বিষণ্ণ কণ্ঠ শুনতে পেলো সে, তোরা ভালো না থাকলে আমি ভালো থাকি কি করে বল, অভিভূত কৌশিক প্রবল এক আবেগে বলে ওঠে, সব ঠিক হয়ে যাবে মা, আমি বলছি—মার চোখ চিক্‌চিক করে জ্বলে ওঠে, দেখতে-না-দেখতেই চোখের কোলে জল জমে ওঠে তাঁর, তিনি হাসতে গিয়ে কাঁদেন কিংবা কাদতে গিয়ে হাসেন কৌশিক তা বুঝতে পারে না।

বাস স্ট্যাণ্ডে দাঁড়াতেই তাকে পেছন থেকে চিৎকার করে কেউ ডাকতে থাকল, মুখ ফেরাতেই ত্রিদিবকে দেখতে পেলো সে, ত্রিদিব দূরে থেকেই চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলতে লাগল, কৌশিকদা, তুমি নাকি স্কুলে যেতে পারছ না, এ্যা, কি কাণ্ড, বলতে-বলতে ছোটার মতো করে সামনে সে দাঁড়াল, তেমনি গলা

চড়িয়েই বলতে থাকল, আমি সব শুনেছি, দিনে লোকশাসন আর রাতে ওয়াগনশাসন যাদের কাজ তাদেরই কম্মো তো এ্যা, এলেই লাশ পড়ে যাবে, এ্যা—হ্যা-হ্যা, বেশ উৎফুল্ল ভঙ্গিতে টেনে-টেনে হাসতে থাকল সে। নিঃসীম বিরক্তিতে চোখ ফিরিয়ে নেয় কৌশিক, দূরে তাকিয়ে বাস আসছে কিনা দেখে, যেন তা বুঝতে পেরেই ত্রিদিব একই স্বরে কিছুটা ব্যস্তভাবে বলে, আরে এতো তাড়া কিসের, স্কুল নেই কাজকম্মো নেই, তুমি তো দিব্যি আছ, এ্যা—হ্যা-হ্যা। স্কুলটা যে তোমার বাইরে, এখানে হলে দেখিয়ে দিতাম, হ্যা-এ্যা—কৌশিকের দৃষ্টিজোড়া ওর মুখের ওপর স্থির হয়ে রইল কতোক্ষণ, ত্রিদিব মুখখুলতেই গম্ভীর গলায় সে বলল, সন্ধ্যের পর তোমাদের ওদিকটায় আর যাওয়া যায় না আজকাল, ছিনতাই রাহাজানি লেগেই আছে। ত্রিদিবের চোখের তারা নেচে উঠল, কিন্তু কণ্ঠস্বর নিখাদ থেকে খাদে নেমে এলো তার, আর বলো না, মাটি কালো হতেই পথে-পথে ওদের টহলদারি সুরু হয়, সন্ধ্যের পর হাঁটাচলা করা ভীষণ রিস্‌কি—কৌশিক ওকে থামিয়ে দিয়ে গম্ভীর স্বরে প্রশ্নের মতো করে বলে, এদের শায়েস্তা করতে পারছ না! বিস্ময়ের ঘোর লাগা ত্রিদিব প্রায় চেঁচিয়ে ওঠে, কি যে বলো না। ওদের কাছে ফায়ার আর্মস আছে, পোলিটি-ক্যাল পার্টি থানার প্রোটেক্‌শন আছে, এদের ঘাঁটালে রক্ষে আছে! কৌশিক আশ্চর্য ঠাণ্ডা গলায় ওর চোখে চোখ রেখে বলল, বলছিলে কিনা আমার স্কুলটা এখানে হলে ওদের শায়েস্তা করতে পারতে, ওদেরও ফায়ার আর্মস আছে, পোলিটিক্যাল পার্টি থানার প্রোটেক্‌শান আছে—ত্রিদিবের চোখে অস্বস্তির ছায়া ঘনিয়ে আসতে দেখে কৌশিক, মিইয়ে যাওয়া গলায় তবু সাফাই গাওয়ার মতো করে সে কিছু বলতে চায়, কৌশিক তার আগেই বলে ওঠে, বাস আসছে তোমার 'অপারেশন এ্যান্টিসোস্যাল স্কীম' পরে শুনবো কখনো—বাসে উঠতেই স্থানীয় কলেজের অধ্যাপক সুমন্তবাবুর সামনাসামনি পড়ে গেল সে, কলেজের দীর্ঘদিনের অধ্যাপক তিনি, কৌশিক নিজেও তাঁর ছাত্র, বাঁ-হাত দিয়ে রড চেপে ধরার দরুণ ডান হাত তুলে ভাঙাচোরা গোছের একটা নমস্কার করে সে, সুমন্ত পোর্টফোলিও ব্যাগটা ঝপ করে শূন্যে তুলে ধরেন একটু, তারপর প্রশস্ত করে হেসে বলেন, কিরে, কেমন আছিস? কৌশিক বিজয়ের হাসি হেসে শরীরটাকে ডানদিকে বেঁকিয়ে ভারসাম্য রক্ষা করতে-করতে বলে, ভালো। আপনি কেমন আছেন স্যর? সঙ্গে সঙ্গে সুমন্তর মুখখানা করুণ বিষণ্ণ হয়ে উঠল, ম্লান হেসে মেয়াদী রোগীর গলায় বললেন, ভালো নেইরে। দুচোখে জিজ্ঞাসা

নিয়ে কৌশিক তাঁর দিকে তাকাল, সুমন্ত বাইরের চলমান দৃশ্যে চোখ রেখে কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে যান। বাইরে তাকাতেই এ-শহরের শতাব্দী-সঞ্চিত আবর্জনায় পঙ্কিল খানাখাল চলচ্চিত্রের মতো কৌশিকের সামনে চকিতে ভেসে উঠে মিলিয়ে গেল, ভার্নাল ভিলার ওপর দিয়ে তার দৃষ্টি যখন পিছলে কিন্তু ভারসাম্য না হারিয়ে চলে-চলে যাচ্ছে,তখনই সুমন্তর নিষ্প্রভ কণ্ঠ সে শুনতে পেলো, নেমে নিই, তারপর শুনবি, বলবো তোকে—

কৌশিক বাইরেই চেয়ে থাকে, পরিচিত দৃশ্যগুলো তার চোখের সামনে দিয়ে সাঁ-সাঁ করে বেরিয়ে যায়. কিন্তু কিছুই আকৃষ্ট করে না তাকে, এ-পথের দুধারের সবকিছু তার মুখস্থ, চোখ বুজেও সে-সবের বিস্তৃত এবং নিখুঁত বর্ণনা দিতে পারে সে ইচ্ছে করলেই, যেমন একসময় পারত সকাল এগারটা থেকে বিকেল চারটে পর্যন্ত ৮৫ নম্বরের এই রুটের আপ-ডাউন প্রতিটি বাসের নম্বর নির্ভুলভাবেবলে দিতে, স্কুলের দোতলার এক ক্লাস ঘরের পেছনের বেঞ্চে বসে তারা কজন এ-খেলাটা খেলত, মাষ্টারমশায়দের হাতে ধরা পড়তে-পড়তে কতদিন বেঁচে গেছে তারা, পরে অবিশ্যি মনে হয়েছে মেমরি ড্রিলের মতো এই খেলাটা তার স্মৃতি শক্তিকে পরিপুষ্টই করেছে, ইতিহাসের সন তারিখ কিংবা পরিসংখ্যানের নানা তথ্য আশ্চর্যরকমভাবে তার মনে থেকে যায়, অনায়াসেই সে বলে দিতে পারে তাদের শহরের লোক কত লক্ষ গ্যালন পানীয় জল পায় ; মাথা পিছু দৈনিক সে-জলের গড় পরিমাণ কত, চ্যারিটেব্‌ল ডিস্‌পেন্‌সারিতে বছরে কত লোক চিকিৎসার জন্য আসে, শহরের জন্ম-মৃত্যুর হার কত, প্রাথমিক শিক্ষার জন্য পৌরসভা বছরে কত খরচ করে—পরিসংখ্যা দিয়ে মানুষকে জব্দ করে দিতে ভালো লাগে তার, বেশক এ-ধরনের অনাবিল আনন্দ অনুভব করে সে, সেবার তাদের জোনের রেশনিং অফিসারকে নিছক কিছু সংখ্যা দিয়ে অভিভূত এবং বিব্রত করে দিয়েছিল সে। প্রথম যুক্তফ্রন্ট আমলের সময় তখন, নতুন কার্ড আর হবে না বলে সরকার নির্দেশ দিয়েছেন, অথচ ঘুষ দিতে পারলে কার্ড হচ্ছিল ঠিকই, ফলে কার্ড না পাওয়া লোকেদের দীর্ঘ এক মিছিল নিয়ে রেশন অফিস তারা ঘেরাও করল একদিন, রেশনিং অফিসার তাদের কজনকে বেশ আপ্যায়নের ভঙ্গিতে ডেকে নিলেন, সরকারী নির্দেশ দেখিয়ে বললেন, মা' হ্যাণ্ডস আ' টাইট। য়ু হ্যাভ অলরেডি ইস্যুড এইটি এইট থাউজেণ্ড এফ. আই. সি.—নেতারা উত্তেজিত কণ্ঠে বাক-বিতণ্ডা সুরু করলেন, কৌশিক এক ফাঁকে বলল, নিচে কয়েক হাজার লোক দাঁড়িয়ে রয়েছেন, এরা নিশ্চয়ই গোস্ট নন, আপনার কি

মনে হয় ? মা যেমন ছেলেমেয়ের নির্দোষ দুষ্টুমিতে কখনও-কখনও প্রশ্রয়ের হাসি হাসেন অফিসার তেমনি করে হেসে বললেন, এটা কি বলছেন, হেঃ হেঃ···অফিসারের চোয়াল উঁচু মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে কণ্ঠে প্রবীণ হেডমাস্টারের প্রমোশন লিস্ট পড়ার নিরুত্তাপ নিরপেক্ষতা নিয়ে এরপর সে বলেছিল, এবং এদের কারোরই কার্ড নেই। পৌরসভার প্রশাসনিক রিপোর্ট বলছে, পৌর এলাকার জনসংখ্যা প্রায় আশি-হাজার, শব্দটা লক্ষ্য করুন— প্রায়। এই যে রিপোর্ট, আণ্ডারলাইন করা আছে। আপনি বলছেন, আটাশি হাজার কার্ড ইস্যু করেছেন আপনারা। আশিহাজার জনবসতির শহরে আটাশি হাজার কার্ড ইস্যু করা হলো, অথচ কার্ড পেলেন না এমন লোকও থেকে গেলেন বিস্তর, অঙ্কটা কাইগুলি মিলিয়ে দেবেন, মিঃ অফিসার—ভদ্রলোকের মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গিয়েছিল মুহূর্তেই, চোয়াল জোড়া তলার দিকে ঝুলে পড়েছিল, মরা মানুষের মতো ঠোঁট জোড়া ফাঁক হয়ে গিয়েছিল তাঁর, হাত বাড়িয়ে টেবিল থেকে জলের গ্লাস উঠিয়ে নিয়েছিলেন তিনি, গ্লাসটা তাঁর মুঠোর ভেতর ঠক্‌ঠক করে কেঁপে-কেঁপে উঠেছিল, খানিকবাদেই মেঝেতে কাচ ভাঙার শব্দ শুনেছিল তারা—

কি হলো, নামবি নে—সুমন্তর গলা কানে যেতেই সে দেখল স্টেশনে পৌছে গিয়েছে তারা। কুনুইয়ের গুঁতোয় তাকে একপাশে ঠেলে দিয়ে নেমে যেতে-যেতে বিরক্তির স্বরে বলে উঠলেন মাঝবয়েসী এক ভদ্রলোক, নামবেও না গেটের মুখ জ্যাম করে রাখবে, যতোসব—কৌশিক নেমে পড়ল, পেছন পেছন সুমন্তও। স্টেশনের গেটের সিঁড়ি পর্যন্ত চুপচাপ হেঁটে এলো তারা, সিঁড়ির মুখটায় দুজনেই দাঁড়াল, সুমন্ত জিগ্‌গেশ করলেন, তোর স্কুল নেই ? কৌশিক একরকমের মুখভঙ্গি করে যার থেকে স্পষ্ট করে কিছু বোঝা যায় না, সুমন্ত অবিশ্যি সেদিকে নজর করলেন না, প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই বললেন, কলেজের কোনো খবর রাখিস ? কৌশিক মাথা নাড়িয়ে তাঁর দিকে তাকাল, সুমন্তর চোখমুখে বিষণ্ণতার ছাপ দেখতে পায় সে, চোখের তলায় কালি জমেছে তার, মনে হলো ক-রাত যেন তিনি ঘুমোননি। গভীর করে নিশ্বাস ছাড়লেন সুমন্ত, ব্যথিত কণ্ঠে বললেন, আর কাজ করতে ইচ্ছে করে না রে। সুমন্তর মুখের ওপর কৌশিক তার দৃষ্টি জোড়া ধরে রাখে, সুমন্ত, কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে যান, তার চোখ দূরের কোনো দৃশ্যে যেন চলে যায় অথবা দূরে কোনো মনোরম [illegible] খুঁজে বেড়ান, জীবনী লেখকের কাছে কোনো সুঘ্রাণের

স্মৃতিকে যে-মমতা মেশানো কণ্ঠে চরিতকথার নায়কেরা বিবৃত করেন তার কণ্ঠে সেই আমেজ ফুটে ওঠে একসময়, তিরিশ বছর আগে বাড়ির সকলের অমতে শিক্ষকতায় এসেছিলাম। আমার বাবা ছিলেন তখন রাজশাহীর ডিস্ট্রিক্ট জজ, বড়দা ময়মনসিংহের এ. ডি. এম., মেজদা তখন লণ্ডনে বার-এ্যাট-ল পড়ছেন। ওঁরা চাইছিলেন জীবিকার ক্ষেত্রে বাড়ির ট্র্যাডিশন মেনে চলি আমি। কিন্তু ইংরেজের দাসত্ব করবো না, এ-সংকল্প ছাত্রজীবনেই নিয়েছিলাম। আর আইন-সম্মত অসাধুতা ছাড়া যে আইন ব্যবসা চলে না, তা-ও জেনে গিয়েছিলাম। তাই বাড়ির ট্রাডিশন ভেঙে অধ্যাপনায় চলে এলাম। কলেজের কাজে যে-দিন যোগ দিতে যাচ্ছি, বাড়িতে শোকের ছায়া নামল সেদিন। মা ঘর থেকে বেরোলেন না, মেজ-বৌদি ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলেন, তোর মাসীমাকেও খুঁজে পেলাম না কোথাও। মনটা খারাপ হয়ে গেল খুব। কিন্তু তিনটে ক্লাস করে যখন বাড়ি ফিরলাম, মনে হলো শুচিতার ধারাস্নানে স্নিগ্ধ হয়ে গিয়েছি আমি, মনে হলো বাগ্দেবী স্বয়ং যেন হাত ধরে ধরে অনেক বিষাদের সেই আঙিনায় পৌঁছে দিয়ে গেলেন আমাকে—হঠাৎ থেমে গেলেন সুমন্ত, তাঁর চোখে অনেক দিনের পুরনো রোদ তিরতির করে কাঁপতে লাগল, স্পষ্টতই অভিভূত দেখাল তাঁকে, স্মৃতির শরীরে হাত রেখে বেশ কিছুক্ষণ সম্মোহিতের মতো দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি। সুমন্তকে দেখে ঈর্ষা হচ্ছিল কৌশিকের, নিজের স্মৃতির প্রকোষ্ঠে অনেকক্ষণ ধরে ঘুরে বেড়াল সে, কিন্তু এমন একটি পালকও সে খুঁজে পেলো না যা মুকুটের মতো করে মাথায় ধরে সবাইকে ডেকে-ডেকে বলা যায়, ছাখো হে, সময় শুধু নিঃস্ব হাতেই আমার দোরে আসেনি, এই ছাখো, এই তার স্মারকচিহ্ন—সুমন্তর গলা যেন হঠাৎই শুনতে পায় সে, গলাটা এবার ভারভার বেদনার্ত মনে হয়, তিরিশ বছর বাদে আজ মনে হচ্ছে, বোধহয় ভুল করেছি, এ-পথে না এলেই হতো। টাকার কথা বলছিনে, গল্পের ব্রাহ্মণের মতো শিক্ষকের দারিদ্র্যও তো স্বতঃসিদ্ধ ব্যাপার। কিন্তু ওসব কিছু সত্ত্বেও শিক্ষকের একটা সান্ত্বনার জায়গা ছিল, মানুষ তৈরি করছে সে। কিন্তু এ কোন্ কাপালিকদের পড়াচ্ছি আজকাল! নিজের সৃষ্টির দিকে তাকাতেও ভয় হয়। মনে হয়, সম্মানের কৃত্রিম সিংহাসনে বসিয়ে সুচতুর কিছু লোক দীর্ঘ দিন ধরে শুধু ঠকিয়েছে আমাদের, নিজের চারপাশটা নিজেই চিনতে পারিনি, অথবা পারলেও গল্পের রাজার মতো স্থাংটো লোকটাকেই অনেক পোষাকের মানুষ বলে মনে করেছি। বুদ্ধিমান [illegible]

আমরা।—আমার দাদাদের আজ আমি ঈর্ষা করি, কৌশিক। তোদের মাস্টার মশাই অনেকটা নিচে নেমে গিয়েছে রে। বয়স থাকলে জীবিকার পরিবর্তন করতে কোথাও আর আজ বাধতো না আমার।—এই সময়ই সুমন্তর কপালে গভীর একটা বলীরেখা দেখতে পেল কৌশিক, তার দীর্ঘ গৌরবর্ণের চেহারাটাকে গ্রহণের সূর্যের মতো নিস্প্রভ মনে হয়। সুমন্ত তার দিকে চোখ তুলে তাকালেন, চোখদুটো ভেজা-ভেজা সজল দেখাল, মুহূর্তেই চোখ ফিরিয়ে নিয়ে বললেন, চলিরে—বলে দাঁড়ালেন না, সিঁড়িতে পা রেখে-রেখে ওপরে উঠলেন, শরীরের অনেকটাই সামনের দিকে নুয়ে পড়ল তার, মন্থর পায়ে এক নম্বর প্ল্যাটফর্মের গেট দিয়ে ডান দিকে চলে গেলেন তিনি। সেই মুহূর্তে বুকের ভেতরটা কন্‌কন্ করে ওঠে কৌশিকের, হঠাৎ তার মনে হলো মাস্টারমশাইকে হাত ধরে লাইনটা পার করে দেওয়া উচিত ছিল তার, যে-কোনো সময় মুখ থুবড়ে পড়ে যেতে পারেন তিনি, তাড়াতাড়ি সিঁড়িতে পা রাখে সে, কিন্তু ঠিক তখনই বুকের গভীরে বসে তার আজন্মের সেই প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী খিল্‌খিল্ করে হেসে ওঠে, বাতাসে চাবুকের মতো করে তার শব্দগুলো বেজে-বেজে ওঠে, হাত ধরে কাকে কোথায় নিয়ে যাবে, বাপ! চ্চু-চ্চু-চ্চু! পথ হারিয়ে নিজেই তো শালা গোলক ধাঁধায় ঘুরে মরছিস। সুখ চাই যশ চাই অর্থ চাই প্রতিপত্তি চাই, সুন্দরী স্ত্রী চাই এ্যা সব কিছু চাই, শুধু নিজের জন্যে চাই। পৃথিবীর এই ভূখণ্ডে যখন আগুন লেগেছে পরিপাটি ছবির মতো আমার ঘরখানাই শুধু দাঁড়িয়ে থাকবে তখন! ব্রেভো, ব্রেভো! দিক্-দিগন্তের বায়ুস্তর কাঁপিয়ে গম্‌গম করে তার কণ্ঠস্বর বাজতে থাকে, ইউ অল আর ডেড কৌশিক। অগৌরবের মৃত্যুর জন্যে কেউ চোখের জলের অপচয় করে না। নিজেকে নিজে করুণা করতে শেখো কৌশিক, নিজেকে নিজে ··

দুচোখে ব্যাপক অন্ধকার নিয়ে মুহ্যমান কৌশিক স্থির চিত্রের মতো দাঁড়িয়ে থাকে—

ঘুরতে-ঘুরতে নিজেকে সে একসময় ইলেকট্রিক সাপ্লাইর অফিসের সামনে দেখতে পেলো, সূর্য তখন মাঝ আকাশ ছাড়িয়ে পশ্চিমের দিকে ঝুলে পড়েছে; তার পায়ের কাছে পড়ে থাকা ছায়াটা ক্রমশঃ প্রসারিত হচ্ছে, সূর্যের আলোকে ঘোলাটে হলুদ রঙ-এর দোতলা বাড়িটা খুব উজ্জ্বল দেখায়। অফিসের গেটের ছায়ায় কৌশিক দাঁড়াল, রুমাল বের করে মুখ এবং ঘাড় জোরে-জোরে ঘষল, কিন্তু শুকোতে-না-শুকোতেই রোমকূপের ভিতর থেকে আবার বুজবুজ করে

ঘাম বেরতে থাকল, ঘামে চুপসানো রুমালটা এরপর নিঃসীম বিরক্তিতে কাঁধের ওপর এলোমেলো করে রেখে দিল সে। পাশের সিঁড়ি দিয়ে লোকজনের উঠা-নামা নজরে আসে তার প্রায় সকলের হাতেই ইলেকট্রিকের বিল, কেউ জমা দিয়ে ফিরছে কেউ বা দিতে যাচ্ছে। কৌশিক সিঁড়ি বেয়ে-বেয়ে ওপরে ওঠে এলো, কাউনটারের কাছাকাছি দাঁড়ালো। কাউনটারে লোকজন বেশি নেই, জানালার ফাঁক দিয়ে ও-পাশের লোকটির দীর্ঘ আঙুলের ওঠাপড়ার ছন্দ দেখতে পেল সে, যন্ত্রের মতো কাজ করে যাচ্ছেন ভদ্রলোক কিংবা তার আঙুলগুলো, নোট এবং খুচরাগুলো গুনছেন যেন নিতান্ত অবহেলায়, তার সামনেকার আধোখোলা বিরাট টানার গর্ভে সেগুলো ফেলে দিচ্ছেন ঝপ করে, ফেরত টাকা পয়সাগুলো টানার ভেতর হাত ঢুকিয়ে ম্যাজিকের মতো করে বের করছেন, ঝপ করে কাউন্টারের সামনে রাখছেন, পাশ থেকে উট পেন্সিল তুলে নিয়ে সামনের বিশাল ছাপানো কাগজে দ্রুত কিছু লিখেছেন, কৌশিকের মনে হয় যেন কিছুই লিখছেন না। কিছুটা আঁকজোক করছেন মাত্র, তারপর বিলের পেছনে ডেট মেসিনের ছাপ দিয়ে সই করছেন, লোহার স্কেল মতো একটা জিনিস চেপে বিলটাকে ছিঁড়ে ফেলছেন সা করে, একটা অংশ সঙ্গে-সঙ্গেই গেঁথে ফেলছেন মাথা উঁচনো পেতলের শিকে, বাকি অংশটা কাউন্টারের এপাশে ঠেলে দিয়ে পরবর্তী বিলের জন্য হাত বাড়িয়ে রাখছেন—অদ্ভুত দ্রুততায় সমস্ত কাজগুলো করে যাচ্ছেন ভদ্রলোক। দেখতে বেশ ভালো লাগছিল কৌশিকের। কাউন্টার ফাঁকা হতেই সামনে গিয়ে দাঁড়াল সে, ভদ্রলোকের বাড়ানো হাতের বিস্তৃত থাবার দিকে তাকিয়ে বলল, আজ আমার বিল জমা দেওয়ার ডেট, কিন্তু দিতে পারছিনে। কথাটা শুনেই ভদ্রলোক চেয়ারের পিঠে শরীর ভেঙে দিতে দিতে বললেন, এ-কথাটাই জানাতে এসেছেন! গলার স্বরটা খুব ভারী তার, বোধহয় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের চর্চা রাখেন ভদ্রলোক। কৌশিক অপ্রস্তুত কণ্ঠে বলে, না, তা নয় ঠিক। ডিউ ডেটে বিল না দিতে পারলে কি হয়? লাইন কেটে দেবেন আপনারা? নিশ্চিন্ত নির্বিকার ভঙ্গিতে তিনি বলে উঠলেন, বিল দিলেও কিছু হয় না, না দিলেও কিছু হয় না। লাইন থাকলেই বা কি, আর না-থাকলেই বা কি। লাইন থাকলেও পাওয়ার সাপ্লাইয়ের কোনো গ্যারান্টি নেই। লাইন না থাকলে অবিশ্যি গ্যারান্টি দেয়ার শতেক ঝামেলা এড়ানো যায়। বাড়ি চলে যান মশাই, কিস্যু হবে না। আর লাইন যদি কাটতেই যায় কখনো, এবং যদি মনে করেন লাইনটা শো করে আপনার কোনো উদ্দেশ্য সিদ্ধ হচ্ছে, তা হলে দেবেন

মিস্ত্রীদের আচ্ছা করে ঠেঙিয়ে। লাইন থেকে যাবে। 'গণতার' গণরাজ্য এখন, লাইন অমনি কাটলেই হলো! তার কথা শুনে অথবা অন্য যে-কোনো কারণেই হোক, পৃথিবী গ্রহে এই মানুষটিকেই প্রমিথিউসের একমাত্র বংশধর বলে মনে হয় কৌশিকের; স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে সে বলে, চলি। ধন্যবাদ।—সিঁড়ির কাছাকাছি আসতেই মোটা দানার ভরাট কণ্ঠের ডাক শুনতে পেয়ে সে পেছন ফিরল, ইশারায় এবার তিনি ডাকলেন তাকে, কাউন্টারের সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই আগের মতোই নির্বিকারভাবে বললেন, আমার হাতে যদি ক্ষমতা থাকত, জানেন, পুরো সাপ্লাই লাইনটাই বন্ধ করে দিতাম আমি। অন্ধকারই আমাদের উপযুক্ত রঙ। ঘাতকের ছুরি অন্ধকারে ভালো খেলে। সেই গল্পটা জানেন তো। ঘটনাটা বোধহয় অনেক কাল আগের অথবা খুবই সাম্প্রতিক। এক স্বামী-স্ত্রী। ঘটনাক্রমে স্বামী স্ত্রী হয়ে গিয়েছিল তারা যেমন আমরা সবাই যাই কিন্তু স্বামী জানত, কোনো এক রাতে স্ত্রী বাঘিনী হয়ে যাবে, স্ত্রী জানত, কোনো এক রাতে স্বামী তার ধারাল নখের হিংস্র জানোয়ার হয়ে যাবে। শুধু সহাবস্থানের কিছু মনোরম প্রলোভন তাদের এক করে রেখেছিল। পড়শীরা বলত, আহা, কি আদর্শ স্বামী-স্ত্রী গো! কিন্তু প্রতিটি রাত অনিদ্রায় কাটত তাদের, বুকের গভীরে কান পেতে থাকত তারা সমস্ত রক্তস্রোত তোলপাড় করে সে কখন আসবে তারই প্রতীক্ষায়। প্রার্থিত মুহূর্তটি এলেই রক্তের স্বাদ পাবে এই ভাবনায় আজন্মের দুই ঘাতক পরস্পরের শরীরে হাত রেখে ঘুমের ভান করে একই বিছানার উত্তাপ নিত।—আমরা সবাই আজ সেই প্রার্থিত মুহূর্তটির জন্যেই অপেক্ষা করে আছি। জানেন তো, মানুষ যখন জানোয়ার হয়ে যায় সে তখন জানোয়ারের চাইতেও জানোয়ার! পরস্পরকে আঘাত করবে বলে একই বধ্য-ভূমিতে সমবেত হয়েছে সবাই, শুধু সেই মুহূর্তটির অপেক্ষা···কৌশিকের হঠাৎ করে মনে হলো তার যেন দম বন্ধ হয়ে আসছে, বাতাস থেকে অক্সিজেনগুলো ক্রমশই দূরে সরে সরে যাচ্ছে, এই সময়ই সে দেখতে পায় এ-শহরের তাবৎ অক্সিজেন সিলিণ্ডারের মুখ খুলে দিয়ে কারা যেন হা-হা করে হেসে উঠল, অনেক দূর থেকে হিংস্র কণ্ঠে কারা যেন চিৎকার করতে লাগল, ডিমিট্রভ হে, ডিমিট্রভ দুচোখে অন্ধকার নিয়ে প্রাণপণে চেঁচিয়ে উঠতে চায় কৌশিক······

মাথার ওপর অনেক আগুনের আকাশ নিয়ে মিল লাইনের আনুপাতিক নির্জন পরিবেশে অনেকক্ষণ ধরে ঘুরে বেড়ালো কৌশিক, চারপাশের নির্জনতাটুকু ভালো লাগছিল তার, মনে হচ্ছিল তার যেন কিছু করবার নেই, কোথাও যেন যাবার

নেই তার. বাড়ির কথা মাঝে-মাঝে মনে হচ্ছিল তার, কিন্তু মনে হতেই শরীর মন অবশ হয়ে যাচ্ছিল, চোখের সামনে ইলেকট্রিক বিল সপ্তাহের রেশন বাড়ি ভাড়া মার চিকিৎসা এবং আনুসঙ্গিক আরো নানা কিছু ভেসে-ভেসে উঠছিল, বাড়ি যাওয়ার কথা মনে হতেই তাই ভয় হচ্ছিল তার, খর মধ্যাহ্নের এই উত্তাপ তবু সহনীয়, কিন্তু মা দিদির নির্বাক চাহনি কিংবা মুখর সংলাপ দুইই অসহনীয়, নিজেকে সতত অপরাধী মনে হয় তার, ওদের দিকে মুখ তুলে তাকাতেও সঙ্কোচ হয়, তার চাইতে পথে পথে ঘুরে এই কালসংহার করাটা যেন অনেক ভালো। প্রকৃতপক্ষে কঠোর বাস্তব খ্যাপা জানোয়ারের মতো তাড়া করে ফিরছিল তাকে, সে যতই পিছিয়ে যাচ্ছিল উদ্যত শিংএর তাড়নাটা ততোই বাড়ছিল, একদা এ-সত্য কৌশিকের জানা ছিল যে, সমস্যাকে পাশ কাটিয়ে সমস্যার কোনো সমাধান নেই, হাত বাড়িয়ে শিংদুটো চেপে ধরতে না পারলে নিজের অস্তিত্বকেই বিপন্ন করা হয় শুধু, কিন্তু এ-লড়াই-এর কৌশলগুলো আজ ভুলে গিয়েছে কৌশিক, পার্থ সন্নিধানে সে যেন বিব্রত অসহায় কর্ণ।

ঘুরতে-ঘুরতে গৌরীপুর বাজারে চলে এলো সে, মীরাবাগানের বিস্তৃত প্রান্তর প্রায় ফাঁকা, একটি গাছের তলায় গুটিকয়েক লোককে খুব উৎসুক ভঙ্গিতে কোনো কিছু ঘিরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সে, পায়ে-পায়ে সে সেদিকেই এগিয়ে যায়, কাছাকাছি গিয়ে দেখতে পায় অদূরে খাড়াই দেয়ালের মতো একটি ক্যানভাসের গায়ে অসংখ্য বেলুন টানিয়ে দেওয়া হয়েছে, সেই সীমানার বাইরে থেকে একটি লোককে এয়ার রাইফেল হাতে নিয়ে ঝোলান বেলুনের দিকে তাক্ করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল সে, সে সেখানে গিয়ে পৌছনোর আগেই শব্দ করে একটা বেলুন ফেটে যায়, চারপাশের লোকজনের ভেতর থেকে একটা উল্লাসের ধ্বনি উঠে, এয়ার রাইফেলখানা ফেন্সিং-এর ভেতরে কোণ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থাকা রোগা লম্বা মতন লোকটি হাত বাড়িয়ে নিয়ে নেয় লক্ষ্যভেদে বিজয়ীর হাত থেকে, তারপর সামনের দিকে তাকিয়ে বলে, আউর হ্যায় কোন কেউ মরদ্, দুটি ছেলে পাপাপাশি দাঁড়িয়ে উস্‌খুস করে, শেষপর্যন্ত একজন এগিয়ে যায়, লোকটির হাতে পাঁচটি পয়সা দিয়ে রাইফেলখানা নেয়, মাঝখান থেকে ভেঙে সীসের ছোট একটা গুলি পুরে সামনের দিকে তাকায়, চোখের সমান্তরালে নলটা ক্রমশই উঠে যায়, খট করে একটা আওয়াজ হয় একসময়, দুটো বেলুনের মাঝখান দিয়ে ছুটে গিয়ে ক্যানভাসের গায়ে ধাক্কা খায় গুলিটা, ছেলেটিকে ভীষণ অপ্রস্তুত দেখায়। দু-এক করে অনেকেই এগিয়ে

আসে এরপর সাতটি গুলিতে মাত্র দুটি বেলুন ফাটে। লোকটি আবার চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলে, হ্যায় কোই—কেউ আসে না, বেশ কিছুটা সময় কেটে যাওয়ার পর কৌশিকের দিকে সে বলে, কেয়া বাবু, আইয়ে না ট্রাই কর লিজিয়ে আপ্‌কা নিশানা। চারধার থেকে অনেকেই তাকে উৎসাহ দেয়, যাইয়ে না, বাবু, আয় হ্যায় কেয়া ইসমে—কয়েক মুহূর্ত কি যেন ভাবে কৌশিক, তারপর বেশ সাবলীল পায়ে এগিয়ে যায়।

মুখখানা ঈষৎ ডানদিকে ফিরিয়ে ছড়ানো বাঁ হাতের মুঠোয় চেপে ধরা রাইফেলের নলের ঠিক ওপর দিয়ে সে সামনে তাকায়, সামনের আকাশে অনেক রঙ ভেসে উঠে, আলাদা করে কোনো বেলুনই সে দেখতে পায় না, রাইফেল নামিয়ে নেয় সে, ডানহাত দিয়ে চোখ ঘসে, রুমাল বের করে মুখ, দু-কাঁধে বেশ জোর ঝাঁকুনি দিয়ে রাইফেলটা আবার সে তুলে নেয়। বাঁ-চোখের দৃষ্টি ফোকাসের মতো করে সামনে প্রক্ষিপ্ত হতেই সমস্ত শরীর শিহরিত হয়ে ওঠে তার, চোখের সামনে রাশি-রাশি মুখ ভাসতে দেখে সে, পৈশাচিক উল্লাসে সে চিৎকার করে ওঠে, এবার, এবার কোথায় যাবে! জীবনের কোনো অঙ্কটাই তোমাদের জন্যে মেলেনি আমার, নো মারসি, ফাইল ফাইল—তার বুকের ভেতর বসে অনেক শব্দ তুলে কে অথবা কারা যেন ক্রমাগত বলে যায়, ফায়ার, কৌশিক, ফায়ার—এই সময়ই ভারি বুটের আওয়াজ তুলে কারা যেন আসে, মুখগুলোকে আড়াল করে তারা দাঁড়ায়, গাঢ় অলিভ রঙ-এর মাথার হেলমেট অপরাহ্নের রোদে চকচক করে জ্বলে ওঠে, হাতের উদ্যত অস্ত্রের মুখ কৌশিকের দিকে উঁচিয়ে ধরে তারা, পেছন থেকে হা-হা করে কারা যেন হাসতে থাকে, কৌশিকের হাতের অস্ত্র কেঁপে-কেঁপে ওঠে, ভীষণ তেষ্টা পায় তার, তবু প্রাণপণে সে চিৎকার করতে থাকে, কে কোথায় আছ। হে-এ-ই; অনেক দূরে বহু লোকের অস্পষ্ট কণ্ঠ শুনতে পায় সে, শব্দটা যেন এদিকেই এগোচ্ছে, তবু কৌশিকের কেন যেন মনে হয় তারা পৌছনোর আগেই তার এই একক লড়াইটা শেষ হয়ে যাবে, সকলের প্রতি তীব্র এক আক্রোশে দৃঢ়মুষ্টিতে রাইফেলের নল চেপে ধরে সে, দুচোখে জ্বলন্ত অঙ্গার নিয়ে সামনের দীর্ঘ বিস্তারের জলপাই অরণ্যের দিকে তাকায় কৌশিক।

বিবেক

প্রদ্যোৎ গুহ

এইমাত্র প্রকাশকের পিয়ন এসে অশোকের সদ্য প্রকাশিত বইয়ের দুটি কপি দিয়ে গেছে। প্রবন্ধের বই। গত ক'বছরে নানা কাগজে গুটি দশ-বারো প্রবন্ধ লিখেছে অশোক—কিছু সাহিত্য বিষয়ে, কিছু সামাজিক নানা সমস্যা নিয়ে। সেই কটি প্রবন্ধ কুড়িয়ে-বাড়িয়ে এই সঙ্কলন। নামটা বেশ গালভরা—সমাজচিন্তা।

বইটা উল্টে-পাল্টে দেখতে বেশ ভালো লাগছিল অশোকের। দৈনিক কাগজের সমালোচনার ভাষায় বলা চলে ছাপা বাঁধাই ভালো। প্রকাশকের পয়সা আছে এবং সে-পয়সার কিছুটা তিনি এ-বইয়ের পেছনে খরচ করেছেন। দামী কাগজে, লাইনো টাইপে মুক্তোর মতো ছাপা। মলাটটা একটু বেশি রঙচঙে। এটা না হলেই খুশী হতো অশোক।

প্রবন্ধের বইয়ের নাকি প্রকাশক পাওয়া যায় না। কিন্তু তাই বলে অশোক চৌধুরীর মতো ব্যক্তির প্রবন্ধের নয়, প্রকাশক এসে রীতিমতো ধর্না দিয়ে অনুমতি নিয়ে গেছে, রয়ালটির সমস্ত টাকাটা দিয়ে গেছে অগ্রিম—চেকে নয়, নগদ। কাজেই ইচ্ছে করলে ইনকাম ট্যাক্সের হিসাব থেকে এই অঙ্কটা বাদ দিতে পারে অশোক।

টাকাটা অবশ্য বড় কথা নয়, আসল কথা প্রতিষ্ঠা। প্রতিষ্ঠা আছে বলেই প্রকাশক ধর্না দেয়, অগ্রিম টাকা দিয়ে যায়। অশোক ব্যস্ত মানুষ। আজ নিউ ইয়র্ক, কাল দিল্লী, পরশু জেনিভা—ওরই মধ্যে সময় করে দু-একদিনের জন্যে কলকাতায় আসা। পাণ্ডুলিপি খুঁজে নেওয়ার দায়িত্ব তাই প্রকাশকই নিয়েছিল। অর্থাৎ নানা পত্রিকা খুঁজে প্রবন্ধ কটি সংগ্রহ করেছিল সেই। অশোকের এমনকি সব কটি প্রবন্ধের নামও মনে ছিল না, কাগজের নাম তো নয়ই। এ-সব তার বাঁ-হাতের লেখা, উপরোধে গেলা ঢেঁকি।

ছাত্রজীবনে সম্পাদকদের দুয়ারে ধর্না দিতে হতো অশোককে। তখন ঐ বয়সের আর পাঁচজন বাঙালি ছেলের মতোই কবিতা লিখত, সাহিত্যচর্চা করত। এদিকে ছাত্র ছিল অর্থনীতির। সাহিত্য প্রতিষ্ঠা অর্জন করা সম্ভব হয়

নি, হয়তো—(হয়তো কেন, এখন জোর দিয়েই বলতে পারে) অসম্ভব ছিল না কিন্তু সাহিত্যের জন্য বিশেষ সময় সে দিতে পারেনি। এখনও মাঝে-মাঝে ইচ্ছে করে কবিতা লিখতে—দু-একটা লাইন কখনও-কখনও মনের মধ্যে গুনগুনিয়েও ওঠে কিন্তু কাগজ-কলম নিয়ে বসার অবকাশ হয় না। তবে তার এ-বিশ্বাস আছে, কাজের ঠাসাবুনোনি থেকে কোনো রকমে চার-পাঁচটা মাস কেড়ে নিতে পারলে—সাহিত্যের জগতেও সে একটা কেউকেটা হয়ে উঠতে পারবে। সম্পাদকেরাও হয়তো (এবং প্রকাশকেরাও) এখনো সে-কথা বিশ্বাস করে। তাই এখন তারাই অশোকের দুয়ারে ধর্না দিতে শুরু করেছে। তবে তাদের আকর্ষণ হয়তো তার সেলারের স্কচ হুইস্কি কি ফরাসি কনিয়াকের প্রতিও কম নয়। এবং তার বিদুষী এবং সুন্দরী, বাক্‌নিপুণা স্ত্রীও নিশ্চয়ই কাউকে-কাউকে টানে। মদের মুখে অবশ্য যে কোনো মেয়েমানুষই কাম্য!

তবে এটা অশোকের আত্মশ্লাঘা নয়। তার মতে বাঙলাসাহিত্যে কিছু করার জন্যে বিশেষ কোনো এলেমের দরকার হয় না। এখানে, এরগুও দ্রুম। নইলে বিষ্ণু দে কি সুভাষ মুখুজ্জে-কে নিয়ে কেউ মাতামাতি করে! নিতান্তই প্রাদেশিক কবিতা! গিভ মি সিকস্ মান্থস্ আই-ল বিট দেম অল। অবশ্য এসব কথা প্রকাশ্যে কখনও বলে না অশোক। বাঙালিরা যা প্যারোকিয়াল। লিঞ্চ করে ছাড়বে। বাট, ক্যান ইউ ডিসিভ ইয়োরশেলফ।

অবশ্য সম্পাদক জাতীয় অদ্ভুত ডোসাইল এবং লোভী জীবগুলিকে মদ্য বিতরণে কার্পণ্য করে না অশোক। আর সত্যিই আশ্চর্য হতে হয় ওদের ক্যাপাসিটি টু হোল্ড ধারণ করার ক্ষমতা দেখে। ওদের ঘটে বিদ্যে এবং বুদ্ধি ধরুক আর না-ধরুক, মদ ধরে টু দি পাওয়ার ইনফিনিটি। "আই হ্যাড অগলি কন্‌টেমপট ফর দেম।"

মদ অবশ্য খায় অশোক। এখন খায়, আগে খেত না। তবে ঠিক যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু তার বেশি এককোঁটাও নয়। মেয়েমানুষ সম্পর্কেও সেই একই কথা। যতটুকু প্রয়োজন তার বেশি নয়। মেয়েমানুষের পেছনে ছোটার মতো হ্যাংলামি তার নেই। তবে তেমন-তেমন কেউ যদি এসে পড়ে হাতের কাছে—ন্যু ইয়র্কে, কি পারীতে, কি জেনিভায় তাহলে পিছিয়ে যাবে অতটা প্রুড অশোক নয় নিশ্চয়ই। আফটার অল, এও তো একটা অভিজ্ঞতা! মার্কস কি বলেননি, নাথিং হিউম্যান ইজ অ্যালিয়েন টু মি!

তবে কি অশোক তার স্ত্রীর প্রতি আনফেথফুল? নট অ্যাট অল! অবশ্য

একথা মানবে অশোক সুচরিতাকে সে ভালোবেসে বিয়ে করেনি। সুচরিতা নিশ্চয়ই সুন্দরী, বুদ্ধিমতী, বাকপটু—এমনকি বিদুষী বলেও ভ্রম হতে পারে বয়েস এখন তিরিশ ছুঁয়েছে—তবু দেহের প্রতিটি রেখা স্পষ্ট। না, মেডেনফর্মের কারচুপি নয় অন্তত অশোক তা জানে—ওসব ছাড়াই সুচরিতাকে সে দেখতে অভ্যস্ত। না, সুচরিতার বিরুদ্ধে তার কোনো অভিযোগ নেই—সী ইজ আ ইউসফুল উম্যান—সুচরিতা যদি তার প্রতি একটু-আধটু আনফেথফুলও হয় (এমন কোনো সংবাদ অবশ্য সে জানে না, তবে সুচরিতার কতটুকু সংবাদই বা সে জানে) তাহলেও সে গ্রাহ্য করবে না। আফটার অল, সেও তো হানড্রেড পারসেণ্ট ফেথফুল নয়। ভালোবেসে বিয়ে না-করুক এবং বিয়ে করেও ভালো না-বাসুক, সুচরিতাকে সে অ্যাকসেপ্ট করেছে।

জীবনে সে একটি মেয়েকেই ভালোবেসেছিল এবং একবার। কিন্তু তাকে বিয়ে করলেও কি সিচুয়েশন মানে পরিস্থিতিটা অন্যরকম হতো? বুকে হাত দিয়ে এমন কথা অশোক অন্তত বলতে পারবে না। আচ্ছা মনীষার সেই চাবুকের মতো দেহটা কি এখনও আছে? নাকি মেদভারে সেই দেহের রেখাগুলি এখন শিথিল? সত্যি কতকাল পরে মনীষার কথা মনে পড়ল অশোকের। মনীষার মাথায় মেঘবরণ একরাশ চুল ছিল আর চোখ দুটো ছিল অদ্ভুত মাদকতাময়। কিন্তু কি রঙ ছিল চোখের? কালো? না কি একটু নীলচে ধরনের। ওর নাকের নিচে কি একটা তিল ছিল? হাসলে কি গালে টোল খেত? ওর ঠোঁট দুটো কি একটু চাপা ছিল? কী আশ্চর্য—কোনোটা সম্পর্কেই আজ আর সিওর হতে পারছে না। তবে কি মনীষাকেও কখনও ভালোবাসে নি অশোক? কিংবা সেটা হয়তো ছিল নিছকই কাফ লাভ। মনীষাকে বিয়ে করলে হয়তো দুদিনেই সে-ফাঁকি ধরা পড়ে যেত। তবু, মনীষাকেও হয়তো শেষপর্যন্ত অ্যাকসেপ্ট করে নিত। ভালোবাসা-টাসা কিছু নয়, জিওগ্রাফিক্যাল প্রকসিমিটিই হলো আসল কথা।

কথাটা মনে হতে কেমন যেন একটা তৃপ্তি পেল অশোক। নিভে-যাওয়া পাইপে নতুন করে অগ্নিসংযোগ করতে-করতে মনে-মনে বলল, সত্যিই কী ছেলেমানুষ ছিলুম। সামনের আয়নাটার দিকে ধোঁয়া ছাড়তে গিয়ে হঠাৎ চমকে উঠল অশোক। আয়নার মধ্যে একটি ফটোর প্রতিবিম্ব। অশোকেরই ছবি। কলেজ জীবনের। ভীরু লাজুক-লাজুক একটি মুখ। চেয়ার ছেড়ে আয়নার সামনে এসে দাঁড়াল অশোক। সেই অশোক আর এই অশোক। কপালটা

এখন অনেক প্রশস্ত হয়েছে, তাতে কাকের পায়ের মতো দু-একটা কুঞ্চন রেখা। কানের ঠিক উপরে জুলফির কাছে দু-একটি রুপোলি রেখা। সময় তো বটেই, অভিজ্ঞতাও তার ছাপ রেখেছে। এই অশোক প্রৌঢ়, প্রাজ্ঞ। এই প্রৌঢ়, প্রাজ্ঞ অশোক তবু কনগ্রাচুলেট করল সেই অশোককে—অন হিজ ওয়েল নট আউট ম্যাচিয়র ডিসিশন।

ঐ সেন্টিমেন্টাল লাজুক ছেলেটিকে দিয়ে এমন পরিণত সিদ্ধান্ত নেওয়াল কে? তার নাম কি—নিয়তি না অ্যামবিশন? ডেম অ্যামবিশন কিন্তু অনেকবারই সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করেছে অশোককে। কিন্তু মনীষাকে সে ডিসিভ করেনি, মিথ্যা স্তোকবাক্য দেয়নি। ঘড়ার জল আর পুকুরের জলের কথা বলে নি। শেষের কবিতার অমিতও আসলে এই করেছিল—রবীন্দ্রনাথ একেই আইডিয়ালাইজ করেছেন। বলেছিল,এক জজসাহেব আমাকে অনুগ্রহ করেছেন। তাঁর একমাত্র মেয়েকে বিয়ে করতে হবে। মেয়েটি দেখতে-শুনতে ভালো, লেখাপড়া জানে। এ-বিয়ে করলে বিলেতে-গিয়ে পড়াশুনো শেষ করতে পারব। আশা করি, অমত করবে না।

নিরুত্তাপ শান্ত গলায় জবাব দিয়েছিল মনীষা, না অমত করব কেন। আর অমত করলেও তো তুমি শুনবে না।

মেয়েটা কিন্তু সত্যি বুদ্ধিমতী ছিল। সী গট দি পয়েন্ট অলরাইট অ্যাণ্ড মেড নো ফাস। একফোঁটা চোখের জলও না। এবং তারপর থেকে তার চোখের সামনে আর কখনও আসেনি। আর বলতে কি, অশোকেরও আর সাহস হয়নি তার সামনে গিয়ে দাঁড়াতে। এমন একটা ডিসিশনে আসতে তার সত্যিই সেদিন খুব কষ্ট হয়েছিল। তার হৃদয়ে রক্তক্ষরণ হচ্ছিল। কিন্তু মনীষা নিশ্চয়ই তা বুঝতো না। গরিবের ছেলেকে বড় হতে গেলে অনেক কিছু স্যক্রিফাইস করতে হয়। সেই অশোকের মনে সেদিন যাই হয়ে থাকুক আজকের অশোকের মনে কোনো খেদ নেই।

আচ্ছা মনীষা এখন কি করে? কোনো ইস্কুলের মাস্টার? বিয়ে করেছে? ছেলেপুলে হয়েছে? নাকি এখনও সেই রাজনীতি নিয়েই মাতামাতি করছে? এখন সে কোন দলে? সি. পি. আই. নাকি সি. পি. এম. নাকি নকশাল? মনীষা যেমন মেয়ে হয়তো সি. পি. আই-ই হবে।

নকশালদের সে তবু বুঝতে পারে, সি. পি. এমকেও কিন্তু এই সি. পি. আই যে কি বস্তু তা তার আজও বোধগম্য হলো না। জাতীয় বুর্জোয়ার

ভূমিকা কি। বিপ্লবের স্তর কি এসব নিয়ে শুধু চুলচেরা তর্ক। কিন্তু কাজে তারা করে কি—শুধু বুর্জোয়ার লেজুড়বৃত্তি! ইন্দিরা গান্ধী বলতে ইগনোরেণ্ট। অথচ ঐ ইন্দিরা ঠাকরুণকে আমার চেয়ে কে বেশি চেনে? সী সট মী আউট। আমাকে তোষামোদ করে তার প্ল্যানিং কমিশনের মেম্বর করেছে। কিন্তু তাই বলে আমি কি ইন্দির ঠাকরুনের স্তবগান করি। আমি অশোক চৌধুরী আমার বিবেক বলে একটা বস্তু আছে! হাঁ আমি ভারত সরকারের চাকরী করি, অনেক টাকা চাই। আমায় অ্যাডভাইসের দাম আছে বলেই যাই। ভারত সরকার দাম না দিলে 'ইউনেস্কো' দেবে ওয়ার্লড ব্যাঙ্ক দেবে। আমি কি কারো পরোয়া করি! হারভারড ইউনিভার্সিটি আমাকে সাধাসাধি করছে, এম. আই. টি. আমাকে লুফে নেবে। আমি কেন ইন্দির ঠাকরুণের স্তব করতে যাব?

মনীষা নামীয় শেষের কবিতার লাবণ্যমার্কা মেয়েটার আঁচলে বাঁধা থাকলে আমি কি কখনও অশোক চৌধুরী হতে পাড়তাম? কিংবা সেদিন যদি মনীষার কথা শুনে রাজনীতিতে ভিড়ে পরতাম কী হতাম তাহলে? বড়জোর সীতেশের মতো কোনো বেসরকারি কলেজের অধ্যাপক বা অসিতের মতো কোনো দৈনিক কাগজের সম্পাদকীয় লেখক। একে কি কিছু করা বলে?

'সাকসেস' কথাটা শুনলে অবশ্য অশোকের চেহ্ভের গল্পের একটা থসথসে মোটা লোকের কথা মনে পড়ে, যে-বিছানায় শুয়ে-শুয়ে শুধু আঙুর নাকি চেরি ফল খেত। ওঠা একটা সংস্কার মাত্র। অতীতের হ্যাঙ ওভার বলা যেতে পারে। আমি নিশ্চয়ই সাকসেসফুল—তাই বলে কী আমার দেহে মেদ জমেছে কিংবা মনে?

সীতেশ আমার চেয়ে ভালো ছাত্র ছিল এবং অসিতও। ওরা রাজনীতি নিয়ে মেতে না থাকলে—আমার পক্ষে ফার্স্ট হওয়া নিশ্চয়ই কঠিন হতো। ওরা আমাকেও রাজনীতিতে নামাতে চেয়েছিল—মনীষা, সীতেশ, অসিত। আমি নামিনি। আমি সবদিক বিচার-বিবেচনা না করে কোনো কাজ করি না।

রাজনীতি করতে হলেও নিজেকে তৈরি করতে হয়। আমি সস্তা হুজুগে না মেতে নিজেকে তৈরি করেছিলাম। তাই সি. পি, এম.এর সর্বোচ্চ নেতারাও আসেন আমার কাছে অ্যাডভাইস নিতে। আর আমি বিনামূল্যেই তাদের সেই অ্যাডভাইস দিয়ে থাকি। পাঁচ-হাজার টাকা মূল্যের অ্যাডভাইস একেবারে নিঃখরচায়। গ্রাটিস মাঝে-মাঝে দু-এক হাজার টাকাও দি। ইন্টু দি বারগেন।

ইচ্ছে করলে আমি এখুনি নমিনেশন পেতে পারি। ইন্দির ঠাকরুনও দেবে, জ্যোতি বোসরাও দেবে। আর মন্ত্রীও হতে পারি—সেণ্ট্রালেও বটে, স্টেটেও বটে। কিন্তু ও-সব হাজার-পাঁচশো টাকা মাইনের চাকরীর প্রতি আমার কোনো লোভ নেই। আর সত্যি কথা বলতে কি ওটাকায় আমার হাত খরচও হবে না। কেন যে মন্ত্রীর চাকরীর জন্য এত খেয়োখেয়ি, আমি অন্তত তা বুঝতে পারি না। পুয়োর সোলস্।

কিন্তু সীতেশ কিংবা অসিত। এতদিন তো জেল খাটল, পার্টি করল। চাইলে পাবে ওরা নমিনেশন? অসিত তো শুনেছি কিছুই এখন করে না। বাপের সুপুত্র হয়ে চাকরি করছে। বউয়ের শাড়ি-গয়না কিনে দিচ্ছে। আর মালিকের কথামতো সম্পাদকীয় লিখছে। অন্যের হুকুমমতো কী করে যে মানুষ লিখতে পারে!

আর সীতেশ! চিরকালই সে ভুল ঘোড়ায় বাজি ধরে এলো। নইলে এ-বাজারে কেউ সি. পি. আই-এর খাতায় নাম লেখায়! তার চেয়ে ইন্দির ঠাকরুণের দলও ভালো। তাদের অন্তত বিপ্লবের ভড়ং নেই।

সীতেশ এসেছিল সেদিন অশোকের বাড়িতে। আপ্যায়নের ত্রুটি করে নি অশোক, হুইস্কি দিতে চেয়েছিল—চলে না শুনে ক্যাশুনাট আর কফির ব্যবস্থা করেছিল, তারপর তার মস্তো 'রাইট হ্যাণ্ড ড্রাইভ' বুইক গাড়িতে করে বাড়ি পর্যন্ত, অর্থাৎ বাড়ির গলির মোড়-পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে এসেছিল। গলিতে গাড়ি ঢুকবে না, নইলে দরজা পর্যন্তই যেত। কিন্তু তাই বলে উচিত কথা শুনিয়ে দিতে পেছপা হয়নি অশোক!

তোমাদের ঐ সি. পি. আই. পার্টিটা রেখেছ কেন, তুলে দাও। কী রোল তোমাদের শুধুতো একদিকে সোভিয়েত ভজনা আর একদিকে ইন্দিরা বন্দনা।

সীতেশটা এখনও ছেলেমানুষ আছে। তাকে বোঝাতে এসেছিল বিশ্ববিপ্লবে সোভিয়েত-ভূমিকা সদ্য-স্বাধীন দেশে বুর্জোয়াজীর সাম্রাজ্যবাদবিরোধী চরিত্র ইত্যাদি বাঁধা বুলি।

দেখ সীতেশ আমাকে ওসব কথা বোঝাতে এসো না। আমি মার্কসও পড়েছি মার্কুসও পড়েছি এমনকি মারঘিলোও বাদ দেইনি। সোভিয়েত সম্পর্কে ওসব গালভরা কথা তিরিশের যুগে যদি বা মানাতো—এখন আর মানায় না। আমি আমেরিকাকে বুঝি—তারা সাম্রাজ্যবাদী দেশ, বুর্জোয়া দেশগুলিকেই তারা সাহায্য দিয়ে থাকে। কিন্তু তোমাদের সোভিয়েত তো নাকি সমাজতন্ত্রী দেশ.

তারা কেন সাহায্য দেয় বুর্জোয়া দেশগুলিকে এবং তা দেবার জন্যে সমাজতন্ত্রী চীন থেকে সাহায্য প্রত্যাহার করে নেয়?

সীতেশ চটে গিয়েছিল। ও-পার্টিজান, চটবেই। আর তাই আমার সঙ্গে তর্কে কোনোদিনই জিততে পারবে না। তবে কথায় না পারলে কি হবে, কাগজে লিখে আমাকে গালাগালি করতে ছাড়েনি। ও জানে, ওসব ট্রাশ কাগজ আমি পড়ি না—তাই কোনো চান্স নেয়নি। কাগজের কাটিং পাঠিয়ে দিয়েছিল আমার নামে। আমি নাকি আমেরিকার দালাল, কেননা আমি সোভিয়েতের সমালোচনা করি। নিশ্চয়ই করি এবং করব। তোমরাও তো বাপু চীনের সমালোচনা করতে ছাড় না। তোমাদেরই বা তাহলে আমি দালাল বলব না কেন? আর আমিই তো একমাত্র সোভিয়েতের সমালোচক নই, আমেরিকাও না—সোভিয়েতের সবচেয়ে বড় সমালোচক তো চীন, সমাজতান্ত্রিক চীন। চীনও কি আমেরিকার দালাল হয়ে গেছে? অবশ্য তোমাদের হয়তো বক্তব্য তাই। হয়তো কেন, নিকসনের চীন-সফরকে উপলক্ষ করে তাইতো তোমরা বলছ। কিন্তু কে তোমাদের কথা শুনবে। কেনা জানে নানা সূক্ষ্ম যুক্তির জাল বিছিয়ে বিপ্লবকে সাবোতাজ করাই তোমাদের উদ্দেশ্য। আসল কথা অত বাছ-বিচার করে বিপ্লব হয় না। হার-জিতের অত হিসেব-নিকেশ করলে কখনও কিছু হবে না। শুরু করে দাও, তারপর যা হয় হবে। অবশ্য ইন্দোনেশিয়াতে প্রতিবিপ্লবই জয়ী হয়েছে। কিন্তু ক্ষমতা দখলের চেষ্টা না করলেও যে তা হতো না তার কি প্রমাণ আছে?

লুক হিয়ার! আমি অশোক চৌধুরী কিনা সীতেশের মতো একটা আণ্ডারগ্রাজুয়েট কলেজের মাস্টারের কথায় প্রোভোকড হচ্ছি! কিন্তু এই সি. পি. আই-এর লোকগুলিকে দেখলে, ওদের কথা শুনলে আমি কিছুতেই মেজাজ ঠিক রাখতে পারি না। যুক্তির তূণীর ফাঁকা, তাই মানুষকে আঁতে ঘা দিয়ে কথা বলে। ওদের ব্রাণ্ড অব কমিউনিজমই যদি আগ মার্কা কমিউনিজম হয়, তাহলে যে যাই বলুক, আমি ছাদের উপর থেকে চেঁচিয়েই বলব, হেয়েনেভার আই হিয়ার দ ওয়ার্ড কমিউনিজম আই ফিল ফর মাই রিভলবার। ফরচুনেটলি দিস ইজ নট দ ওনলি ব্র্যাণ্ড অব কমিউনিজম। আর আমি ওদের কমিউনিস্ট বলেই ধরি না।

সীতেশ আমাকে কি-না বলে, আমার মুখে বিপ্লবের কথা শোভা পায় না। কেন, বিপ্লবের বুলি কি কারো মনোপলি নাকি। আমার চলন-বলন. ওয়ে অব

লাইফ—এসব নাকি কমিউনিজমের পরিপন্থী। হাঁ আমি পাঁচ-হাজার টাকা মাইনে পাই, আমার বাড়ি আছে, মস্তো গাড়ি আছে, সুন্দরী স্ত্রী আছে—সো হোয়াট। এতো আরও অনেকের আছে। তারা কেউ বলে বিপ্লবের কথা? আমি যে বলি এতেই কি প্রমাণ হয় না আমি বিবেকবান? অর্থ, যশ, পদমর্যাদা আমাকে করাপ্ট করতে পারেনি?

তবে কেউ যেন না-ভাবেন আমি ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির। সে-দাবি আমি করি না। আমার নিশ্চয়ই অনেক দোষ আছে। আমার কথা ও কাজে সব সময় সংগতি থাকে না। তা রাখা কারোর পক্ষেই সম্ভব নয়। আপনি আচরি ধর্ম পরেরে শিখাবে ইত্যাদি সুভাষিত আজকের দিনে অচল। না হলে তো আত্মহত্যার সপক্ষে কিছু লিখতে হলে আগে আত্মহত্যা করতে হয়।

আসল কথা তোমার মনটা কোথায় এবং কেমন। সিনস্ মাই মাইণ্ড ইজ ইন দ রাইট প্লেস আমি কি করি আর না-করি, কোথায় যাই আর না-যাই তাতে কিছু এসে যায় না।

আর আমি কিছু করি না তাও তো ঠিক নয়। এই তো সেদিন ঢনঢনিয়ারা এসেছিল আমার কাছে অ্যাডভাইস নিতে। তাদের একটা ফ্যাক্টরিতে টার্ন ওভার কম হচ্ছে। আমি তাদের অঙ্ক কষে দেখিয়ে দিলাম, দিনে মাত্র পাঁচ মিনিট কাজের সময় বাড়িয়ে দিলে বছরে প্রায় এককোটি টাকা লাভ হবে। ঢনঢনিয়ারা খুশি মনে আমাকে দশ-হাজার টাকা দক্ষিণা দিয়ে চলে গেল। তারা কী বুঝল আসলে আমি বিপ্লবকেই, শ্রেণীসংগ্রামকে সাহায্য করলাম। ঢনঢনিয়াদের ঐ কারখানার ইউনিয়নটা ছিল শোধনবাদীদের হাতে। কাজের সময় বাড়ালেই লেবার ট্রাবল শুরু হবে। আর তাহলেই সি. পি. এম-এর বিপ্লবীরা নিমেষের মধ্যে ইউনিয়নটা দখল করে নিতে পারবে। লেবার ডাইরেক্টরেট তো ওদের লোক দিয়েই ঠাসা।

আর আমার রাজনৈতিক মতামত আমি গোপনও করি না, বিপ্লবের কথা আমি প্রকাশ্যেই বলি। আমার বইয়ে ছাপার শীতল অক্ষরে তা বিধৃতও আছে —পড়ে সন্দেহ ভঞ্জন করতে পারেন। এই তো সেদিন ভিয়েতনাম মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনে বক্তৃতাও দিয়ে এলাম। লোকে বলছিল, আমার বক্তৃতাই নাকি হয়েছিল সবচেয়ে জোরালো। হাততালিও সবচেয়ে বেশি পেরেছিলাম আমিই, কেননা আমেরিকানদের সামাজিকভাবে বয়কট করার কথাটা সবচেয়ে জোর দিয়ে বলতে পেরেছিলাম আমিই। আমি…

হঠাৎ টেলিফোনের ক্রিং ক্রিং শব্দে চটকা ভাঙে অশোকের

...হ্যালো, চাউড্রি স্পিকিং...কে বিল রজার্স...কি ব্যাপার...দুপুরে, মিসেসকে নিয়ে। আচ্ছা ঠিক আছে...দেখা হবে...সো লঙ...

সুচরিতা, তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নাও। রজার্স ফোন করছিল, ওদের ওখানে লাঞ্চে যেতে হবে। হ্যা হ্যা ফোর্ড ফাউণ্ডেশানের বিল রজার্স।

সীতেশ এবং তার দলবল ভাগ্যে এখানে নেই। কথাটা তাদের কানে গেলে তারা খুবই হৈচৈ করত। সাত-কাহন করে চারদিকে বলে বেড়াত। কিন্তু আপনারাই দেখুন, আমার কি দোষ। আমেরিকানদের তো আমি ছেড়ে কথা কই নে। তা সত্ত্বেও তারা যদি আমাকে নিয়ে টানাটানি করে—আই কাণ্ট হেলপ্। আর নিমন্ত্রণ করলে তা রাখতে যাব না—এতটা অভদ্র আমি নই। তাছাড়া, ইটস্ পার্টি অব মাই জব। ফোর্ড ফাউণ্ডেশনের সাহেবদের খুশী না রাখলে তোমাদের ইন্দির ঠাকরুণের সোশ্যালিস্ট প্ল্যানিংয়ের টাকা আসবে কোথা থেকে ?

তুলো না, তুলো না কোন কথা

বিতোষ আচার্য

সে দুর্জয় সংকল্পের কথা
তুলো না, তুলো না
দুদণ্ড সুস্থির হও
না হয় লজ্জিত হোক
দ্বন্দ্বমুগ্ধ ধন্দের পাহাড়
আপাতত :

অবাক রাজপথে ডাইনে বাঁয়ে
কবন্ধ সময় নিশি ডাকে :
কী অদ্ভুত
নিরুদ্বেগ ঘুমের গভীর থেকে
হ্যাঁচকা টানে
মৃত্যু তুলে নিয়ে যায়—
দেয় না ফুরসৎ চোখ কচলাবার
সপ্রশ্ন-দৃষ্টির ছিন্নমুণ্ড
গেণ্ডুয়া, গেণ্ডুয়া
গড়াগড়ি ছাইরঙা ধুলোয়

থাক, থাক, তর্ক থাক—
দুর্ভেদ্য যুক্তির যত অন্ধকার আনাচেকানাচে
ইদানীং নেমন্তন্ন
হাঁড়িচাঁচাদের
বড় ক্লান্ত, সারাদিন থমথমে বাতাসে
হাঁপ ধরে
কপালের রগ

দপদপ দপদপ করে
দীর্ঘশ্বাস, কান্না, সর্বনাশ
দুপায়ের পাতা থেকে দশ আঙুলে
নরম কাদার মতো লেপটে থেকে
হতাশার ঝাঁঝাল রোদ্দুরে
ঝামা হয়ে গেছে

ভুলো না, ভুলো না কোন কথা
আপ্তবাক্য ঃ
দুদণ্ড সুস্থির হও
জানলাদরজা খুলে দিয়ে
দমভোর নিঃশ্বাস নিয়ে
বুকে রাখ হাত ঃ

এই রক্ত নদী কোনদিন, কোনদিন সমুদ্রে যাবে না ॥

দুধের হৃদয়শক্তি শুষে খেল

সত্য গুহ

প্রকারান্তরে শিশু তামাকের দরখস্ত হাঁকায়
দুধের হৃদয়শক্তি এখন আদরণীয় নয়
তেমন মায়ের চেয়ে অলীক মাসীমা প্রীতি বড়
ভালোবাসা ভালোবাসা করে, আহা, দেহের পসরায়

ফুলের নরম সুখ আমরা পেয়েছি যারা ভলে
শিশুর আশ্চর্য হাত, মুখের চুলের ঘ্রাণ লয়ে
আমরা বেসেছি ভালো পৃথিবীরে স্বর্গের অধিক
তাদের ভিত্তির মর্ম দুধের দাঁতের বিষে জ্বলে

এখানে ওখানে মাথা—মেধায় ইঁদুর হাসে—গাঢ়
আমাদের ভাঁড়ারের সমস্ত শস্য ক'রে তুষ
কী গান গাব যে আর—কার লাগি সবুজ অভ্রান
শুদ্ধ প্রকৃতির কষ্টে বিয়োনো আবার অবেলায়

প্রকারান্তরে শিশু তামাকের দরখস্ত হাঁকায়
দুধের হৃদয় শক্তি শুষে খেল নাকি, হে, মার্কস।

কোন্ পাপে ভেঙে যায় ঘর ?

শান্তনু দাস

অকস্মাৎ খড়্গ ঝুলে পড়ে মাথার উপর :
আমার একান্ত প্রেম লব্ধ ঝরে ;
ভেঙে পড়ে খিলান সদর,

জ্বলে যায়—সাজানো চিতার মধ্যে ধিকিধিকি ধিকিধিকি
হাড়মাস,
জতুগৃহে মৃত্যুর আসরে।

কোথায় আমার ঘর ?
মা নামক জন্মদাত্রী তুমি,
এখনো প্রদীপ নিয়ে বসে আছো দোরে,
তোমার দু'চোখ জুড়ে
ঘুম ?
কতোকাল ঘুমুতে পারোনি তুমি মা।

ঘুমোয়, ঘুমোয়, মাগো ঝলসানো, ম্যারাপে
আমাদের জমে থাকা পাপে
শুকোয় প্রহর,

জ্বলে যায় বুক,
আমাদের গোপন অসুখ
উপদংশের মতো ঘুণ ধরে···
ধরে যায়—প্রতি কোষে কোষে।

কোন্ পাপে ভেঙে যায় ঘর ?
কোন্ পাপে আমাদের জন্ম সহোদর
আমার রক্ত নিয়ে খেলা করে প্রকাশ্য রাস্তায়।
কোন্ পাপে খুলি উড়ে যায় ?
কোন্ পাপে রত্নগর্ভা জননী, নামায়
তোমার চোখের মাঝে রক্তনদীধারা।
নিজের বুকের কাছে হৃদপিণ্ড ঝুলে পড়ে মাগো,
দুহাতে আঁকড়ে ধরে দিচ্ছি পাহারা।

সারারাত :
নড়েচড়ে কারা ?
জেগে থাকি
ঘুম নেই দুচোখে পাতায়,
সারারাত প্রিয়তম সোদরের মুখ সরে যায়
কখনো ঝলসে যায়—
চোখের জলের পাশে
সাজানো ইস্পাত।

চৌ'প্রহররাত তুমি জেগে আছো জননী আমার,
প্রদীপ নিভিয়ে দাও গুঁজে থাকো ঘাড়,
তোমার দেহের পাশে আমাদের খুলির পাহাড়
আকাশের মতো উঁচু হয়,

হৃদয় এবং জানি ভোর হয়ে নামবে কোনোদিন
কখনো সকাল হয়ে জ্বলবে সময়।

কাঁটাতারে

মৃণাল বসুচৌধুরী

ইঁদুরের শক্ত দাঁত
পুরনো তোষকে খোঁজে বীজ
বারান্দায় ছিল না মশারি
বিনিময়ে
মেঝে বা দেওয়ালে
পঞ্চবটী
তুলো নয়
বালিশের ভেতরে বারুদ
শব্দ ভাঙা ছুরি
ইঁদুরের নখের আঁচড়ে
লজ্জার বদলে ভিড়
আগুনের পাশাপাশি ধোঁয়া
পৈতৃক উঠোন
অবহেলা
কাঁটাতারে
দীর্ঘায়ু বেড়াল

কানাঘুষো

শুভাশিস্ গোস্বামী

কানাঘুষো চলে
আড়ালে আড়ালে কারা গুছোয় আখের
শত্রুর হাতে রেখে হাত, দাঁতে রেখে হাসি।
আপন অন্তরে পরবাসী—

নির্বোধ,
জানেনা সে প্রতি অনুপলে
নিজেরি গলায় পরে ফাঁসি।
চতুরালি হয়েছে তো ঢের,
নির্মম নিয়তি তবে
প্রকৃতির অমোঘ প্রতিশোধ

ঘরজ্বালানি ওরে সর্বনাশী!
সাঁকো পড়ে আছে একা—
দুই তটে কেবলি গর্জায়
ক্রুদ্ধ জলরাশি॥

রাজদ্রোহ

অরুণাভ দাশগুপ্ত

নীল হাত তুলে উত্তাপ খুঁজেছিলে
মর্মের মাঝখানে,
তোমাকে দিয়েছে যার যা সাধ্য ঢেলে—
এ ঐশ্বর্য কোথায় রাখবে তুমি?
মোহিনী মায়ার পোষাক ভাসায়ে জলে
দাঁড়ায় প্রখর নিষাদ,
শোণিত এবং বিশ্বাস ধুয়ে
তিলে তিলে গড়ো ঘৃণা অভ্রংলিহ
কপট বাতাস বলে যায়…রাজদ্রোহ!

কলস-ভাসানো বিকালের কালো জলে
সারি সারি চলে গোধুলি-মাখানো শব,
শিবা ও শকুন শহরে, মফস্বলে

সমবেত উৎসব,
পাথরের নিচে চাপা-পড়া ফুল
মরেও মরো না তুমি—
সাড়ে সাত কোটি প্রাণের জন্মভূমি।

শববাহকেরা

শুভ বসু

কয়জন লোক এক লাস নিয়ে যায়
তারা
এমন নিঃশব্দে যায়, যেন
নিজেরাই নরকের শব হেঁটে চলে।
তাদের পেছনে পথে চলি, অন্ধকার
আমাদের মাঝখানে অনন্বয় তীব্রতর করে।
এই শবে আজও ছিল জীবনের স্বাদ
অনেক আহ্লাদ
এও করে গেছে পৃথিবীর শ্রাবণে আশ্বিনে
তার
ঋণশোধ করে যায় এখন কয়েকজন
মানুষের কাঁধের ওপরে
এইসব ভেবে ভেবে তাদের পেছনে
শ্মশান চত্বরে এলে, তারা
সেই মৃতদেহটিকে মাটিতে নামায়
দেখি, আমারি দ্বিতীয় মুখ
পড়ে আছে মাচার ওপর, অতঃপর
এক দুই তিন চার শববাহকেরা
আমারি তৃতীয় মুখ অনুভব ক'রে

আমার প্রথম আমি আর্তনাদে ফাটে
ফেটে
যেতে গিয়ে নিজেকে গুছায়, ফের
বেশবাস পরিপাটি করে।

…ভাবনার ভেজানো জানলাটা

সত্য সেন

মাসীমা এক গ্লাস জল…দোতলার সিঁড়ি ভেঙে
উঠে এলো পাড়ার বোনপোরা।

ক্র্যাকার ফাটছে, ওপাড়ার মোড়ে। এ্যাকসনের রেড সিগন্যাল।

এপাড়ায়ও। প্রস্তুতি পর্বের তাই ফাইনাল টাচ্ : মাসীমা-কন্যার হাতে এক গ্লাস আইবুড়ো জলে।

অতঃপর নিচেয় নামার শব্দ সিঁড়ি ভেঙে ভেঙে। তার মাঝে কথাকটা ফুলফোটে যেন শব্দহীন। স্পষ্ট এক অস্পষ্টতা নিয়ে :

: দাঁড়াও সুশান্ত
: সেফ্‌টিফিন-দেতো মা একটা
সার্টটা বোতামখসা। প্যান্টে গোঁজা। পেটের কাছটাউঁকিমারা পিস্তলের বাঁট আড়চোখে চেয়ে আছে যেন যৌবনের বেহিসেবী নির্লজ্জতা নিয়ে।

বিপদই বা বলে কাকে! সবে বেকারত্ব-ঘোচা এ পোড়া সংসারে সবই টানাটানি। টান নেই একমাত্র শুধু অনটনে। অতিরিক্ত সেফ্‌টিপিন্ কোথা! সবেধন নীলমণি আঁটা ব্লাউজেতে।
খোলা দায় চোখ স্পর্শ করে আছে দেহ। বাথ্‌রুমও নিচে, ঘরও নীলমণি। আবছা আড়ালে খোলা সে সেফ্‌টিপিন সার্টটায় গেঁথে দিয়ে উঁকিমারা

বস্তুটিকে অগোচর—কুমারীত্ব দিয়ে
মাসীমার আলগোছা স্নেহে মেশে মৃদু ভর্ৎসনার সুর :

: দিনকাল ভালো নয় ভালো নয় এতটা সাহস।
প্রশ্রয়িত মৃদু হাসি হেসে,
শেষ পদশব্দটাও নিচে নেমে গেল।

নির্জনতা পেয়ে
রুটি-সেঁকা আগুনের মুখোমুখি বসে মাসীমা কখন যেন মা হয়ে গেছেন।
পোড় খাওয়া এ সংসারী মন আরও একটু সেঁকে নিতে চান যেন,
এ যুগের ভাবনার আঁচে :

: পুরোনো মুখেরা আজ নতুন দুঃস্বপ্ন। হাতে হাতে ছোরা, কিম্বা ক্র্যাকার পিস্তল। পাইপ-গান গর্জে ওঠে ওপাড়ার থেকে। গুলি ছোটে সুতীক্ষ্ণ ঘৃণার মতো অব্যর্থ মৃত্যুর গতিতে। এ পাড়ার, একদা বন্ধুর বুক বড় পেয়ারের।

মুখ থুবড়িয়ে পড়ে যায়, পড়ে থাকে প্রায়ই একটা দুটো। আধখোলা জানলাটা দিয়ে সবই দেখা যায়।
মাঝে মাঝে দেখা যায়, নাগালের মধ্যে পেলে ও পাড়ার কোনও বন্ধুকে নিয়ে আসে আপ্যায়ন করে। ভালবাসে বুক চিরে চিরে। পেটে-পিঠে সর্ব-অঙ্গে নিষ্ঠুর ছুরিটা শিল্পীর তুলির মতো কাজ করে চলে। অবশেষে যত্ন সহকারে চোখদুটো তুলে আনে ছুরির ফলায়।
ক্রমে ক্রমে খুলে হাট ভাবনার ভেজানো জানলাটা।
বড় প্রিয়, বড় চেনা মুখ ওরা আজ কিন্তু একান্ত বিদেশী।

অথচ তো একদিন এই মুখগুলো এ পাড়ার, ও পাড়ার আরও কত পাড়ার মুখেরা এই ঘরে বসে অনেক গোপন সভা করে গেছে চা মুড়ি-পেঁয়াজ আর বিষের মতন লঙ্কা চিবোতে চিবোতে। ঝরিয়েছে কত বিষ জিভে। সামনে রেখে একটি শত্রুকে। সমস্বরে যে শত্রুর চেয়েছে নিপাত।

এ ঘরের ছেলে নীলু সেও ছিল ওদের কমরেড। সেদিন বেকার ছিল আজ সে সাকার। অথচ অখুশি, অখুশি সে সকলের চেয়ে। কাজ থেকে ফিরে এসে মাঝে মাঝে তাই ধুয়ো তোলে :

: জীবন তো দুদিনের মোটে, একদিন কেটে গেল, বাকি আর একটি মাত্র দিন।

কত আর সয় পোড়া প্রাণে!

নেকী সেজে, মেকী-স্নেহে সেফ্‌টিপিন গুঁজে শোককে সামাল দেওয়া যায় কতদিন।

আজ-ও ডাকেনি। কাল যদি ডাকে ওরা নাইট্‌ পেট্রোলে, কিম্বা, কোনও এ্যাকসনে নীলুকেও যেতে হবে। না খাওয়াও খাওয়ার সমান।
সবেধন নীলমণি নীলুও বিদেশী হয়ে যাবে।
বাজপড়া ঝড়ের মতন কোথাও ক্র্যাকার একটা ফাটল বোধ হয়। সশব্দে সহসা ভাবনার হাট জানালাটা বন্ধ হয়ে গেল।

শেষ-সেঁকা রুটিখানা পুড়ে ছাই হয়ে যেতো আর একটু হলেই।
বহু জ্ঞান-তপস্বী এবং
অনেক, অনেক মুখ পুড়ে ছাই তীব্র মেকী ঘৃণায় আগুনে।

গন্‌গনে আগুনের আঁচে,
মার-হাতে পোড়ে না কিন্তু একটি রুটিও।

স্বীকারোক্তি

বীরেন্দ্র দত্ত

আমি বাবার বড় ছেলে। আমরা চার ভাই, তিন বোন। যৌবনে আমার মা দেখতে যে বেশ সুন্দরী ছিলেন, এখনো, এই প্রায় পঁয়ষট্টির কাছাকাছি বয়সে মায়ের দিকে তাকালে বোঝা যায়। এখন মা বেশ মোটা হয়ে গেছেন, সেই সঙ্গে বাত আর হার্টের অসুখ। বাইরের চেহারায় আমি নাকি ঠিক মায়ের যৌবন কালের মতো দেখতে ছিলুম, স্কুল কলেজে পড়ার সময়। স্বাস্থ্য আমার দোহারা। রঙ ফর্সা। বয়স এখন চল্লিশে পা দেওয়ার জন্যে তৈরি। এখনো আমি অবিবাহিত।

আমার আর সব ভাই-বোনেরা কেউ মা বা আমার মতন দেখতে নয়। সবাই বাবার মতো হয়েছে। বাবা মোটেই দেখতে ভালো নন। কালো, রোগা, পাকালো চেহারা। ওপরের দাঁতের সারি ঈষৎ উঁচু। আর রোগা হলেই লম্বা দেখতে এই অলিখিত নিয়মে বাবাকে কিছুটা বোধহয় লম্বা দেখায়। ডান হাতে একটি দুরারোগ্য ঘা। বাবার হাঁপানির টান আছে। এই সত্তর বছর বয়সে বছর দশেক আগে রেলের চাকরি থেকে রিটায়ার করার পর থেকে একটু হাঁটা-চলা করতে পারলেও হাঁপানির অসুখে একেবারে কাবু হয়ে আছেন। বাড়িতে সব সময় দু-হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজে হাঁপাতে থাকেন, কখনো বা কাঁপেন জোরে জোরে। আমি যতবার বাবাকে দেখি, কেন কে জানে, ভয়ে আঁতকে উঠি। বাবার কাসির শব্দে কখনো বা ইন্‌সমনিয়া চলে।

বোনেদের মধ্যে বড়র বিয়ে হয়নি। হবে কি করে? পৃথিবীর প্রত্যেকটি পাত্রপক্ষের চোখে সে দেখতে সত্যি খুব খারাপ, কালো। শরীরে এতটুকু মাংস নেই। মেজবোনেরও সেই অবস্থা ছিল। একটু কুঁজো হয়ে হাঁটত, বাবার রিটায়ারের পর ওর বিয়ে হয়। বিয়ের এক বছর পরেই স্বামী ওকে ছেড়ে দেয়। এখন আমাদের বাড়িতেই থাকে। ওর বুকের হাড়-পাঁজরার রেখাটানা অংশেও অসুখ।

অনেকটা ক্যান্সারের মতো। মাস ছয়েক আগে ডাক্তার কেবল আমাকেই জানিয়েছিল, ট্রিট্‌মেণ্ট চলুক। দেখা যাক, রোগটা থেকে সেভ করা যায় কিনা!

সপ্তাহ-দুই আগে হাসপাতালে ভর্তি হবার পর বুকে অপারেশান হয়েছে। ছোট বোনটার চেহারা আর মুখ-চোখে একটু লাবণ্য ছিল বলে, আমি, বাবার সুপারিশে রেলের চাকরিতে ঢোকার পর ওর বিয়ে দিয়েছি ওর বয়স থাকতেই। এখন সে শ্বশুরবাড়ি। ভালোই আছে। আমি এখন প্রথম বড়মামা হতে পেরেছি।

আর ভাইদের কথা কি বলব! তিন বোনের পর বাকি তিন ভাই। পর পর দুটি ভাই বিকলাঙ্গ। কথা বলতে পারে না। বাবার রোগা চেহারার মতোই শরীরে ওরা দুজনেই রিকেটিশ। দুজনের মুখ দিয়েই লালা ঝরে। গায়ের পোষাক ঠিক রাখতে পারে না। একজনের মাঝে-মাঝে ফিটের মতো হয়। বড়বোন টুনু ওদের সেবা করে, সব সময় চোখেচোখে রাখে বলে তবু আমি একটু সংসারের অন্যদিকগুলোয় চোখ দিতে পারি! আমার ছোটভাই-এর ভালো নাম স্নেহাংশু, ডাক নাম ভানু। ও বাবার মতো কালো, কিন্তু মায়ের মতো স্বাস্থ্য পেয়েছে। এখন কলেজে ঢুকেছে। আমাকেই মাইনে-পত্তর দিতে হয়। তারজন্যে আর একটা টিউশনি নিয়েছি। তিন বছর হায়ার সেকেণ্ডারী পরীক্ষায় ফেল করার পর গত বছর সেণ্টার বদলে কোনোরকমে পাশ করেছে। স্কুলে পড়তে-পড়তেই বকাটে হয়ে যেতে থাকে। এখন কলেজে ঢুকে বুঝেছি মেয়েদের নিয়ে খুব আড্ডা দেয়। বাড়ির কেউ জানে না। আমি পাড়ায় শুনেছি। আগে ওর ব্যাপারে ভীষণ রেগে যেতাম, মারধোর করে শাসন করতাম। আজকাল তাও করি না।

এই চার ভাই, আপাতত, দুটি বোন ও মা-বাবার সংসারে আমিই একমাত্র চাকুরে। রেলের অফিসে চাকরি করি। ঢুকেছি বাবার রিটায়ার করার অনেক আগে থেকে। এম. এ. পড়তে ঢুকে এক বছর ক্লাস করার পরেই চাকরি নিতে হয়। কারণ সংসার একেবারে অচল হয়ে পড়েছিল। দুবেলা ভাত জুটছিল না। তারপর প্রাইভেটে এম. এ. দেব ঠিক করেও আর দেওয়া হয়নি। আর বিয়ে? একটা দিনের জন্যেও কোনো মেয়ের কথা ভাববার সময় পাইনি। বাড়ির মা-বাবা অসহায়ের মতো আমার দিকে তাকিয়ে ভাবতে-ভাবতে এখন বোবা হয়ে গেছেন। জানেন, ছেলের বিয়ে দিলে ওরা বাঁচবেন না, ভাইবোন-গুলিও দুটি পেটে খেতে পাবে না। তাই বিয়ের কথা আর ভুল করেও তোলেননি।

যদি বলেন, আপনার তো ইচ্ছে ছিল বা এখনো আছে? হ্যাঁ, সেখানে একটা কথা বলতে হয়, আমি সত্যি কথা বলতে কি, কখন যে মেয়েদের শরীর সম্বন্ধে নিরাসক্ত হয়ে গেছি, বুঝতে পারিনি। ঠিক যে-কারণে এম. এ. পাশ

করার ভয়ঙ্কর আশা, লোভ উদ্যম থাকা সত্ত্বেও কখন যেন এম. এ. পদবীটাই বিস্মৃত হয়ে গেছি, ঠিক তেমনি বিয়ে শুধু নয়, ভালো একটা প্রেম করে একটা মেয়ের আশ্রয়ে থেকে জীবনকে সুন্দর করব এই চাপা আকাঙ্ক্ষা ভুলে গিয়ে মেয়ে, প্রেম, বিবাহ, জীবন, যৌবন এমন সব জীবন্ত শব্দগুলি মন, প্রাণ শুধু নয়, আমার আত্মা থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।

আমি চল্লিশ ছোঁয়ার এই আগের বছরেই একটি বৃদ্ধের মতো হয়ে গেছি। আমার সংসার আমাকে শক্ত তার দিয়ে বোনা মাকড়সার জালের মতো বেঁধে রেখেছে। সকালে বাজার করি অনেক পরিশ্রম করে। সবচেয়ে কত কম পয়সায় আমার বাড়ির আটটি পেট চালানো যায়, বাজারে দাঁড়িয়ে সে-কথা ভাবতে যে পরিশ্রম. নিশ্চয়ই আপনারা তা জানাবেন। তারপর সারাদিনে বাবা মা, মেজবোন মন্নুর শরীরের অসুস্থতার জন্যে কি কি ওষুধ-পত্তর আনতে হবে, তার হিসেব করি টিউশানিতে গিয়ে ছাত্রকে অঙ্ক কষতে দিয়ে। বাড়ি ফিরে নাকে-মুখে গুঁজে অফিস। কিছু ওভার টাইম। আবার টিউশানি। রাত্রে ফিরে বাবার, মায়ের খোঁজ নিতে হয়। মন্নু, মানে আমার মেজবোনের জন্যে ডাক্তারের কাছে বসতাম। আমি মন্নুকে একটু বেশি স্নেহ করি। ওর জন্যে সত্যি আমার খুব কষ্ট হয়। বাবা-মার জন্যেও। আমার বিকলাঙ্গ দুটি ভাই গাবু ও হাবুর জন্যেও।

এই আমার স্বভাব। সাধারণের আহ্লাদেপনা বলা যায় বাড়াবাড়ির দিক। বেশ বাড়াবাড়ি বলছি শুনুন। আমি কারোর কষ্ট দেখতে পারি না। এসব কি আজকালকার দিনে চলে? আমি নিজের জন্য এতটুকু কিছু করলাম না, সারা জীবন ভাই-বোন-মা-বাবার দুঃখ-কষ্টের কথা ভাবলাম, একটা কিছু আপনার যাই বলুন, একেবারে অচল। আমিও সংসার করতে পারতাম। পারিনি। ঐ এক দোষ। আমি বাড়ির কারোর কষ্ট দেখতে পারি না। বাবার যখন হাঁপানির টান হয়, কষ্টে দুচোখে জল পড়ে বাবার, মায়ের যখন হার্টের অসুখে শয্যাশায়ী অবস্থা বা বাতের যন্ত্রণায় পঙ্গু হয়ে যাবার মতো অবস্থা, অথবা মন্নু যখন অপারেশানের জ্বালায় ছটপট করে, আর হাবু, গাবু রাস্তায় বেরিয়ে গিয়ে কখনো হারিয়ে গেলে টুনু মানে বড়বোন তারজন্যে না খেয়ে কান্নাকাটি করে, আমার ভীষণ কষ্ট হয়। আমারই মা, বাবা, ভাই, বোন ওরা। আমাকেও তো মা-বাবা এই জন্ম দিয়েছে, ভাই-বোনেরা ভালোবাসায় বাঁচিয়ে রাখছে। তাই টাকা ফুরালে ধার করেও ডাক্তার ডাকি, এইভাবে অফিসে, নানা সূত্রে ধার

পড়ে আছে, থাকেও। অসুখ না সারার মতো হলেও মন্টুর কাছে বসে যখন মাথায় হাত বুলোই, রাত্রি দশটায় টিউশানি থেকে ফিরে এত ক্লান্তিতেও হারিয়ে-যাওয়া হাবু বা গাবুকে খুঁজতে বেরোই।

এই আমার সংসার, আমার জীবন! আজ বাইশ থেকে উনচল্লিশ বছর বয়সটা অর্থাৎ চাকরিতে ঢোকা থেকে আজকের দিন পর্যন্ত সময়টা এইভাবে বাড়ির সঙ্গে জড়িয়ে গেছে। এরই মধ্যে হঠাৎ একটা ফাটল ধরেছে, এবং আকস্মিকভাবে যে আপনাদের না শুনিয়ে পারছি না। আপনাদের মনে হতে পারে এটা নাটকীয় সস্তা রোমান্টিকতা, বা কোনো মডার্ন শিল্পী সাহিত্যিক কল্পনাগুলোকে বলবেন বোরিং পুরানো—কিন্তু এটা ঘটেছে! কিছুদিন আগে মঞ্জুলার সঙ্গে দেখা।

'আরে! সুধাংশু না?'

চশমার কাচ গরম ঘামের বাষ্পে ঘষা কাচের মতো মনে হতেই খুলে মুছে চোখে দিলাম। তাকালাম সামনের ভদ্রমহিলার দিকে।

'কে বলুন তো? ঠিক চিনতে পারছি না।'

মহিলাটি একভাবে তাকিয়ে রইল। 'আমি কি ভুল করলাম?' একটু থামল। 'তুমি, মানে আপনি সুধাংশু চক্রবর্তী না?'

'হ্যাঁ। আপনি কি মঞ্জুলা?' আমি এবার চিনতে পারলাম।

এক মুখ হাসি নিয়ে মঞ্জুলা বলল, 'চিনেছ তা হলে! উঃ, আমি ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম',

'কি করে চিনলে বল? তুমি বেশ মোটা হয়ে, ভারি হয়ে গেছে চেহারা। মুখের আদলই বদলে গেছে!'

'তা বদলাবে না? কি বল তুমি? সেই আজ থেকে প্রায় আঠারো-উনিশ বছর আগের দেখা!'

'এদিকে কোথায়?'

'একটা দরকারে এসেছিলাম। এবার কলকাতা গিয়ে, একেবারে ইণ্ডিয়ার বাইরে পালাব। তার খোঁজ খবর নিতে গিয়েছিলাম।' একটু থামল মঞ্জুলা। 'তোমার খবর কি?'

'কিছুই না। সংসার করছি।'

'বিয়ে-থা করেছ তাহলে! ছেলে মেয়ে কটি?'

আমি হাসলাম। 'না; ওটার পাট নেই। আপাতত বাবা-মা ভাই-বোন

নিয়ে সংসার।' একটু থেমে বললাম। 'মনে হচ্ছে, তুমিও বিয়ে করনি!'

মঞ্জুলা হাসল। 'না ভালো জোটাতে না পেরে একাই থাকছি।' বলেই মঞ্জুলা হাসতে লাগল। 'কিন্তু তুমি বিয়ে-থা না করে কি চেহারা করেছ। কেমন যেন বুড়ো-বুড়ো হয়ে গেছ।'

'তাই বুঝি? ও ভেটার‍্যান চাকুরেদের হয়।'

'বাজে বোকো না। তুমি কি সুন্দর দেখতে ছিলে! অবশ্য এখনো আছ।' মঞ্জুলা একটু থেমে সোজা আমাকে দেখতে লাগল। হাসতে-হাসতে বলল, 'ইউনিভার্সিটিতে তুমি খুব জীবন্ত ছিলে। পত্যটত্য লিখতে নয়? মনে পড়ছে? আর কি সুন্দর গুছিয়ে মজা করে কথা বলতে।'

'তাই বুঝি?' আমি সকৌতুকে তাকালাম মঞ্জুলার চোখে।

মঞ্জুলা হাসল। একটু অন্যমনস্ক হলো। 'তুমি কেন যে হঠাৎ ইউনিভার্সিটি ছাড়লে তখন, আমরা কেউ বুঝতে পারিনি।'

'সে শুনে লাভ কি?' একটু চুপ করলাম। বললাম, 'তুমি কি একা যাচ্ছ, না দুজনে?'

'পাগল হয়েছ? আর বিয়ে-থা করছি! বাইরে যাওয়াও হবে না। এই শেষ চেষ্টা। তাও আজ যা শুনে এলাম, তাতে হওয়ার কোনো অবস্থা নেই। বাবা তো একটা স্কুলে এবার ঢুকিয়ে দেবে বলছে। পারমানেণ্ট্‌লি থেকে যাবো স্কুলেই।'

আমি মঞ্জুলাকে দেখলাম। মঞ্জুলার চেহারায় বেশ গাম্ভীর্য।

আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে মঞ্জুলা বলল, 'চল সুধাংশু, একটু হাঁটি। ট্রামে, বাসে দুটোতেই তো অসম্ভব ভিড় দেখছি।'

'তুমি কোন্ দিকে যাবে?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'আমার তো পাকপাড়া।'

'কেন? তোমরা বউবাজারে থাকছ না?'

হেসে উঠল মঞ্জুলা। 'কবে ছেড়ে দিয়েছি। আমাদের বাড়ি হয়েছে পাকপাড়ায়। একদিন এসো। তুমি কোথায় আছো? চিৎপুরের কাছে কোথায় যেন থাকতে না?'

'সেখানেই আছি। আবার যাবো কোথায়?'

'আমাকে তো কোনোদিনই নিয়ে গেলে না! আর এমন চালাকি করে পালিয়ে বেড়াতে!' গলা নামিয়ে বলল, 'পালাতে তো পারলে না! আবার

ঠিক দেখা হয়ে গেল !'

আমি চমকে উঠলুম। এখনো ঠিক মনে রেখেছে সে-কথা। এখন যদি বলে, 'চল সুধাংশু, তোমার বাড়ি ঘুরে আসি !' আমি চকিতে চশমার লেন্সে চোখ রেখে মঞ্জুলাকে দেখলাম। না, সেই ফাজিল মুখভঙ্গি মঞ্জুলার নেই। দু-চোখে ঔৎসুক্য নেই।

আমি কথা ঘোরালাম। 'তুমি কোন্ দিকে হাঁটতে চাও ?'

'একটু কার্জন পার্কের দিকে হাঁটি। তাও কার্জন পার্কের তো ছোট হতে হতে যে চেহারা হয়েছে, বসার জায়গাও নেই।'

আমি হাসলাম। আমার আবার ঘাসের বুকে বসার সময় ! মঞ্জুলা জানে না তো, আমার প্রতিদিন কিভাবে কাটে ! নিশ্বাস চেপে বললাম, 'চলো। আমার আবার কাজ আছে। তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে হবে ?'

'সেই তোমার কাজ ! যখন ছাত্র ছিলে, তখনো বলতে কাজ আছে। যখনি বলতাম, চল রেস্টুরেন্টে যাই বা সিনেমা হলে বসি—এও বলতাম আমিই পয়সা খরচ করব, তবু তুমি বলতে কাজ আছে। এখন তো ব্যাচিলার, এখন কি কাজ শুনি ?' 'এই কাজ কাজ শেষ করেই তুমি কুঁজো হয়ে যাচ্ছ, বুঝেছি ?'

মঞ্জুলা অনেক কথা বলে থামল। আমি তাকালাম মঞ্জুলার দিকে। 'এখনো কি যুবক হতে বল ?'

'তা নয় তো কি ? এই তো আমার বয়স হয়েছে। তা, বলতে গেলে তোমার কাছাকাছি তো ! ছত্রিশ-সাঁইত্রিশ হবে। আমি কি বুড়ি হয়ে গেছি ?' বলেই জোরে হেসে উঠল মঞ্জুলা।

আমি তখনো বুড়োর মতো পথের দিকে তাকিয়ে মঞ্জুলার পাশাপাশি হাঁটছি। মঞ্জুলা কি জানে, আমার পিঠের ওপর বিরাট সংসার ? ছোট-বড় কয়েকটা ঋণ শরীরের দুষ্ট ক্ষতের মতো জড়িয়ে আছে বারোমাস ! জানলে একথা বলত না শুধু নয়, আমার সঙ্গে কি এভাবে পাশাপাশি গল্প করতে-করতে যেত ?

মঞ্জুলা চুপ করে হাঁটছে, আমিও। টেলিফোন ভবন পাশে রেখে আমরা ট্রাম রাস্তায় এসপ্ল্যানেডের দিকে এগোতে লাগলাম।

মঞ্জুলা বলল, 'সুধাংশু, একদিন আমার বাড়ি চলে এসো। বসে বেশ জমিয়ে গল্প করা যাবে। কারণ দুজনেরই কোনো ঝামেলা নেই।'

আমার সত্যি কথা বলতে কি, তখন, ওর সঙ্গে পরে দেখা হোক না-হোক মঞ্জুলাকে একটু ভালো লাগছিল। বললাম, 'কবে যাবো বল ? ঠিকানা দাও।'

মঞ্জুলা আমার দিকে তাকাল। 'সত্যি এসো। সামনের রববার। তোমার তো ছুটির দিন। রববার বিকেলে সোজা আমার বাড়ি চলে এসো। ভালো সময় কাটানো যাবে। গল্প করার পর সামনের পার্কে গিয়ে বসব।'

মঞ্জুলা আমায় ঠিকানা দিয়েছিল; অনেক করে বলেছিল। না গেলে আমার অফিসে এসে বিরক্ত করবে বলে শাসিয়েও গিয়েছিল। সেদিন ছিল সোমবার। সেই সোমবার থেকে আজ এই রববারের বিকেল পর্যন্ত আমাদের সংসারের গতানুগতিক জীবনে অনেক বড়-বড় ঢেউ উঠেছে, নেমেছে। বাবার অসুখ ভীষণ বেড়েছিল, প্রায় মর-মর অবস্থা হয়েছিল। গত বুধবার থেকে ডাক্তারের পিছনে প্রচুর পয়সা খরচের পর, বড়বোন টুনুর অক্লান্ত সেবার পর বাবাকে সামলানো গেছে। মায়ের হার্টের অসুখ বাবার অসুখের বাড়াবাড়ির জন্যে ভীষণ বেড়ে গিয়েছিল। মাকেও সামলেছি। গতকাল পর্যন্ত যা হয়েছিল আজ সকাল থেকে অনেক ভালো। মনুকে হাসপাতালে দিয়েছিলাম দিন-পনেরো আগে। অপারেশন হয়েছে, হাসপাতালে প্রায় প্রতিদিনই গিয়ে ছিলাম। খুব ভালো আছে মনু। টাকা যাক, মনু বেঁচে উঠুক, সম্পূর্ণ সুস্থ হোক, এ আমার যে কী আনন্দ তা আপনাদের বোঝাতে পারব না। আজ আর আমি হাসপাতালে যাবো না। টুনু গেছে। ওখান থেকে ছোটবোন রুনু ওর বরকে নিয়ে আসবে। তাই আমি না গেলেও ভাবতে ভালো লাগছে। আমার ছোটভাই ভানুর কথা ভাবি না। ও কোথাও সিনেমায় গেছে হয়তো বন্ধুদের নিয়ে। হাবু-গাবুকে মা ঘরের মধ্যে বন্ধ করে বসিয়ে রেখেছে। ওরাও আজ যেন সুস্থ, বাইরে যেতে চাইছে না।

বাড়ি নিঝুম এই পড়ন্ত বিকেলেও। আমার একটু আগে মনে হয়েছিল মঞ্জুলার কথা। গেলে কেমন হয়? এই কথা ভাবতে-ভাবতে আমি দাড়ি কামিয়েছি, আগামী কাল অফিসে পরে যাওয়ার জন্য টুনুর গুছিয়ে রাখা সদ্য কাচা-ইস্ত্রি-করা প্যান্ট-শার্ট পরেছি, চুল আঁচড়েছি, পায়ে জুতো গলিয়েছি। মা বোধহয় অসহায়ের মতো আমার দিকে তাকালেন। 'যা বাবা, যা, একটুও তো বেরুতে পাস না। ঘুরে আয়। আর এখনি তো টুনু হাসপাতাল থেকে আসবে। বোধহয় রুনু জামাইকে নিয়ে আসতেও পারে।' ওদের ধরে রাখবোখন। তোর সঙ্গে দেখা না করে ওরা যাবেই না।'

আমি এগিয়ে এসে মায়ের কাছে দাঁড়ালাম। মা বিছানায় বসে ছিলেন চুপ করে। 'তোমার কোনো কষ্ট নেই তো মা?'

'না, বাবা, আর কোনো কষ্ট নেই। বেশ আছি। ওর সঙ্গে একটু কথা বলে যা। তোকে এক মুহূর্ত দেখতে না পেলে ও আবার ভয় পায় তো ?'

আমি বাবার কাছে এলাম। বাবা তক্তপোষের ওপর বসে আছেন। মুখ গুঁজে নয়, মুখ তুলে। আজ হাঁপানির টান নেই বললেই হয়। বাবার দু-চোখ ঘোলাটে। গালের দুপাশ তোবড়ানো। মাথা ফাঁকা-ফাঁকা কাঁচা-পাকা চুলের গোছায় ঢাকা।

'তুমি কেমন আছ বাবা ? হাতের ঘাটাও তো অনেক শুকনো হয়ে গেছে !'

'খুব ভালো।' বলেই বাবা ভালো হাতের ঘাটার দিকে তাকালেন।

আমার বেশ ভালো লাগল। বাবা অনেকদিন বাদে এমনভাবে 'খুব ভালো' কথাটা উচ্চারণ করলেন।

'আমি এখনি ফিরব বাবা।'

'না, না, তুই ঘুরে আয়। এখনি তো টুন্টু আসবে মন্টুটা ভালো আছে তো ? ওর খবর পেলে নিশ্চিন্তি হই।'

'মন্টুকে আমি নিজে দেখে এসেছি। অন্য কিছু ভেবে শরীর খারাপ করো না। ও খুব ভালো আছে, দেখো।'

আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বাবা খুশির হাসি হাসলেন। আমি বাইরে পা দিলাম। পাকপাড়ার অনাথ দেব লেনে সুন্দর বাড়ি করেছে যদুনাথবাবু। এত বড় বাড়ি, এত পয়সা, এ-রকম নিশ্চিন্ত হয়েও মঞ্জুলার যে কেন এখনো বিয়ে হলো না, মঞ্জুলা কি এমন প্রেমে ব্যর্থ হয়েছে, নাকি ওর শরীরে কোনো দুরারোগ্য ব্যধি আছে, যার জন্যে বাপ-মা বিয়ে দেননি—এইসব ভাবতে-ভাবতে আমি যখন মঞ্জুলাদের বাড়ি এলাম তখন সন্ধ্যে হয়ে গেছে। মঞ্জুলা সেদিন বিকেলে আমাকে ছেড়ে বাসে ওঠার সময় বলেছিল, 'সুধাংশু, আর যার হোক, এই বয়সে এমন কুঁজো হয়ে হাঁটতে আমার একটুও ভালো লাগে না। তোমার বয়স এমন কিছু বেশি হয়নি।' মঞ্জুলার বাড়ির কলিংবেল টিপে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ মনে হলো কথাটা। সঙ্গে-সঙ্গে শিরদাঁড়া সোজা করে দাঁড়ালাম। আর সত্যি ঠিক এই সময়ে যদি আমার সামনে একটা দর্পণ থাকত বা মঞ্জুলা থাকত, নিশ্চয়ই মঞ্জুলা বুঝত, আমি মঞ্জুলার চাওয়া-মতো কেমন শক্ত-সমর্থ যুবকের মতো ওর কাছে এসেছি। আমি বুঝতে পারছি, মঞ্জুলার সামনে যাবার আগে আমার মুখ কি ভীষণ উদ্ভাসিত, উচ্ছল, যৌবনদীপ্ত।

মঞ্জুলা দরজা খুলে বলল, 'এসে গেছ ! আমি জানি তুমি আসবে।'

'কেন একথা ভাবলে ?'

'আমরা যে সেই এম. এ. পড়ার সময় ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলাম।'

'ও, তুমি পুরনো বন্ধুত্ব ঝালাতে চাইছ ?' ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়ালাম।

'আপত্তি নেই। হলে মজার হবে না !'

এইসব কথা বলতে-বলতে আমি আর মঞ্জুলা ওদের বৈঠকখানায় বসলাম। আমার দুচোখ যেন ধুয়ে-মুছে পরিষ্কার হয়ে গেল। এমন ঝকঝকে ঘর কতদিন দেখিনি। আমার বাড়ির দেওয়াল, মেঝে, রঙ, অন্ধকার, আলো-হাওয়া, ড্যাম্পের গন্ধ—সব কিছু মুহূর্তে বিস্মৃত হয়ে গেলাম।

'বসো। আমি গা-হাত ধুয়ে তৈরি হয়ে তোমার সঙ্গে চা খাব।'

আমি হেলান দিয়ে বসলাম। লম্বা কোচটার ওপাশে মঞ্জুলা বসল। মঞ্জুলা পরিচ্ছন্ন কাপড়-জামা পরেছে। মন্দ লাগছে না।

'আমাকে এভাবে দেখছ কেন ?' মঞ্জুলা হাসল। আগেকার সেই ফাজিল কণ্ঠস্বর নয়, বেশ ভারী অথচ কণ্ঠস্বরে চাপা মাদকতা আছে।

'না, দেখছি, মেয়েরা পঁয়ত্রিশের পরেও যুবতী হয় কেমন করে !'

মঞ্জুলা চোখ ছোট করে তাকাল, 'তোমাকেও তো বেশ যুবক লাগছে সুধাংশু।' হাসল মঞ্জুলা শব্দ করে। 'নাও, চা খাও। সব এইমাত্র সাজিয়ে রেখেছি, আর তুমিও এসে গেলে !' মঞ্জুলা চা ঢালতে লাগল কাপে।

'মঞ্জুলা, তুমি একা কেন ? তোমার বাবা-মা কোথায় ?'

মঞ্জুলার দু-কাপ চা ঢালা হয়ে গেছে। কিছু চিপস্ মুখে দিয়ে বলল, 'পরে বলছি। তুমি আগে খাও। চাটা ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।'

আমি চা নিলাম। চিপ্স্টা পরে খাব ভেবে শুধু চায়ে চুমুক দিয়ে মঞ্জুলার দিকে তাকালাম।

'বাবা-মা বৃহস্পতিবার চেঞ্জে গেছে। সঙ্গে ছোটভাই আর বোনটাও।'

'কেন, হঠাৎ ?'

'না। বাবার তো একটা বাজে কাসির অসুখ আছে। মানে টি-বি ফি-বি ভেবে বোসো না যেন ! এমনি। বাবাকে খুব কষ্ট দেয় কাসিটা। গত সপ্তাহে বেড়েছিল। যা হয়, খুব বড় একজন ডাক্তারকে দেখাতেই একদিনের ওষুধেই কমে গেল। ওষুধের দামও কম না। তারপর ডাক্তারবাবুই বাবাকে তাড়াতাড়ি চেঞ্জে নিয়ে যেতে বললেন বলেই বাবা গেছেন। তা খরচও হাজার দশেক।'

'বুড়ো বাপকে একটু চেঞ্জে নিয়ে যান না মশাই, রেলের তো পাশ পান।'

ডাক্তারবাবু বললেন দেখবেন বাবা বেশ ভালো হয়ে যাবেন। বাবার অন্যান্য অনেক ট্রাব্‌ল্‌ও কমে যাবে।' আমার বাবাকে ফ্রি পাশ পেয়েও নিয়ে যেতে পারিনি। বাবার সেই রোগা চেহারা, সেই সারাজীবন অক্লান্ত পরিশ্রমের পর বৃদ্ধ বয়সের নানান ব্যাধির ভার শরীরকে জর্জরিত করেছে। কাল পর্যন্ত বাবার কি অবস্থা! বাবার যদি কিছু হতো? বাবা যদি মারা যেতেন কাল, বা আজ বিকেলেই, আমি কি এখানে আসতে পারতাম? এখন বাবা কেমন আছেন? বাবার কি এখনি নতুন করে কাসি শুরু হয়েছে?

'আরে! আরে! আমার মুখের দিকে তাকিয়ে কি ভাবছ? হাতের চা যে গায়ে গড়িয়ে পড়ছে।' মঞ্জুলা তাড়াতাড়ি হাত বাড়িয়ে আমার হাতের কাপটা সামলালো।

আমি অপ্রস্তুত হলাম। তাড়াতাড়ি সচেতন হয়ে বললাম, 'না, না। পড়বে না।'

'বাঃ, পড়বে না কি, পড়ছে!, মঞ্জুলা হাসল। 'কি দেখছ এমন করে?'

মঞ্জুলার দুচোখে অদ্ভুত মায়া। মঞ্জুলা কি আমার দুচোখে তা-ই চাইছে? আমি চমকে উঠলাম। ঠাণ্ডা চা নিঃশেষ করে টেবিলে রেখে দিলাম। আমি একটু হাসলাম।

'নাও, চিপস্‌গুলো খাও। আরও খাবার আছে।'

'ইস্ এতো! খাবো কি করে?'

'না খেয়ে-খেয়েই তো এই চেহারা!' মঞ্জুলা হাসল।

'তুমিও নাও।'

'আমি নিচ্ছি।' বলেই মঞ্জুলা ডিশ থেকে চিপস্ তুলল কয়েকটা।

'তোমার হাত দেখে বোঝা যায় সুধাংশু, তুমি কত রোগা! অথচ এত রোগা হওয়ার কোনো মানে হয় না। বিশেষ করে এই বয়সে!'

'বয়সটা কি কমাতে চাও?'

'তা নয় তো কি? এই আমার হাত দেখতো?' মঞ্জুলা নরম মাংসল হাত আমার সামনে মেলে ধরল।

'খুব সুন্দর হাত।'

'অথচ তোমার হাত ঠিক একটা কাঠের মতো। দেখছ তো, তুমি কেমন বুড়ো হয়ে গেছ!' মঞ্জুলা হাত না সরিয়ে হাসছে আমার দিকে চেয়ে।

আমি মঞ্জুলার মুখ-চোখ দেখলাম। হাতটা আমার মুঠির মধ্যে। কিন্তু

মঞ্জুলা এভাবে কি চাইছে? মঞ্জুলার দুচোখে মায়া। হঠাৎ আমি কেঁপে উঠলাম। সাঁইত্রিশ বছর বয়সে মেয়েদের যা থাকার কথা নয়, মঞ্জুলার তাই আছে। মঞ্জুলার এত যৌবন! কিন্তু মঞ্জুলা কি বুঝতে পারছে না, ওর কাপড় সরে গেছে! ওর পোষাক অশালীন! আমার হাত মঞ্জুলার হাতের নরম মাংসের ওপর রাখা; আমার দৃষ্টি অনাহৃত সুন্দর বুকের ওপর নিবদ্ধ। কিন্তু এ কি? আমার হাতে কোনো উত্তাপ নেই কেন? আমি তো মঞ্জুলার হাত চেপে ধরে নেই। মঞ্জুলা টেনে নিচ্ছে না কেন? আমার হাতে কি প্রেম আছে? বাবাকে কতবার এই হাতে ধরে বাথরুমে নিয়ে গেছি, বিছানায় শুইয়েছি, মায়ের মাথায় হাত বুলিয়েছি। ভিজিটিং আওয়ারের পর মনু এখন হাসপাতালে কি ডাক্তারকে ওর অসুখ দেখাচ্ছে?—'দেখুন ডাক্তারবাবু, এ-পাশটায় আবার যন্ত্রণা হচ্ছে। উঃ, আর পারছি না। ডাক্তারবাবু আমায় ভালো করে দিন। দাদা, তুই একটু বোস। তুই কাছে বসলে আমি ভালো হয়ে যাব রে। তুই আমার জন্যে অনেক করেছিস। তুই কেন ওর সঙ্গে ঝগড়া করতে গেলি? ও আমাকে ত্যাগ করেছে, ভালো হয়েছে, ও তো লম্পট। লম্পট স্বামী নিয়ে কি করব আমি? তুই কাছে থাক দাদাভাই, আমি তোর ভালোবাসা পেয়ে বেঁচে থাকব রে।' 'বাবা ভানু, হাতটা আমার ধর তো। এখানে নয়, এখানটায় বড় ঘা হয়েছে। হাতটা এই ঘায়ে বোধহয় পড়ে যাবে রে।' 'ভানু, হাবুর হাতটা একটু মালিশ কর ভালো করে, ক্রমশ যে একেবারেই কাঠি হয়ে যাচ্ছে!'

মঞ্জুলা হঠাৎ হেসে উঠল।

'বাবা, কিভাবে দেখছ তুমি? একসঙ্গে দেখার কি আছে? ওঃ, হাতটা ছাড়!' বলেই মঞ্জুলা অদ্ভুতভাবে হাতটা আমার হাতের মধ্যেই রেখে দিল। বুকের কাপড় অসংবৃত। মঞ্জুলা জেনেও আমার চোখের দিকে তাকিয়ে রইল।

আমি অবাক হলাম। আমার হাত তো মৃতের মতো পড়ে আছে! আমার বিশ্রী লাগছে!

মঞ্জুলা বলল, 'এম-এ পড়ার সময় যেমন পালাতে, আবার সেরকম পালাবে না তো?' হাসল। 'বসো একটু তোমাকে ওপরের ঘরে নিয়ে যাব, বাড়িতে কেউ নেই। দাদা আর মেজভাই আড্ডা দিতে বেরিয়েছে। ফিরবে দেরীতে। আমি আসছি ওপর থেকে।' বলেই মঞ্জুলা হঠাৎ দৌড়ে ওপরে চলে গেল।

ঘরে আমি একা হতেই বুঝতে পারলাম, আমি ভিতরে ভীষণ ঘামছি। আর বেশি ঘামলে আমি কেমন ভয়ংকর ক্লান্তি বোধ করি। সেই ক্লান্তি আমার

রবীন্দ্র সঙ্গীত ও আধুনিক বাঙলা গান

গুণময় মান্না

সুদীর্ঘকালের ভারতীয় সঙ্গীতের প্রবহমান ধারার প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যায়, কালে-কালে যখনই তার প্রাণচেতনা স্তিমিত হয়ে এসেছে, তখনই সে হয় বিভিন্ন লোকসঙ্গীতের রস আত্মসাৎ করে কিংবা রাজদরবার বা দেবমন্দিরের প্রয়োজন-প্রেরণায় নিজেকে সমৃদ্ধ করেছে। এতে শুধু তার শক্তিই বেড়েছে তা নয়, নব-নব বৈচিত্র্যতেও সে সুন্দর হয়েছে; কেননা প্রাণবানের ধর্ম নিজেকে সাজানোও।

এখন, কোনো এক বিশেষ কালে, সঙ্গীত বা সাহিত্য কোন উপাদান গ্রহণ করবে, গ্রহণের রীতি-প্রকৃতি কিরূপ হবে, তার কিরূপ কলাকৌশলই বা সম্ভব—এ-সম্বন্ধে যেমন কোনো বাঁধা-ধরা নিয়ম নেই, তেমনি তা একেবারে আকাশ থেকে পড়াও নয়। প্রত্যেক কালের একটা নিজস্ব দাবি আছে, সাংস্কৃতিক জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো সঙ্গীতেও তা প্রতিফলিত হয়।

প্রতিভার ধর্মই হচ্ছে তা নতুন কিছু গড়ে তোলে, কিন্তু জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে তাকেও যুগের প্রয়োজনীয়তার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতে হয়। বরঞ্চ প্রতিভা যত উন্নততর হয়, কালের নিয়ন্ত্রণ তার ক্ষেত্রে তত গভীরতর প্রবর্তনা হয়েই দেখা দেয়। প্রতিভা সেটিকে স্বীকার করে নিয়ে সৃষ্টিকর্মে অগ্রসর হয় এবং তাকে নতুন রসে সঞ্জীবিত করে তোলে।

উনিশ এবং বিশ শতকে যে রবীন্দ্রনাথের মধ্যে বাঙলাদেশের সঙ্গীত প্রতিভার এক শ্রেষ্ঠ বিকাশ লক্ষ্য করি, সেই রবীন্দ্রনাথকেও যুগের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করতে হয়েছিল। রবীন্দ্রসঙ্গীতের বিকাশমান ধারায় নানা সুরবৈচিত্র্য আছে, কিন্তু তরুণ কবি রবীন্দ্রনাথ সঙ্গীতসৃষ্টির প্রথম প্রয়াসে যা করেছিলেন, তা ছিল একরকম ক্রান্তিকারী। ভারতীয় রাগসঙ্গীতকে ইয়োরোপীয় সঙ্গীতের ধাঁচে নতুন করে গড়ে নিয়েছিলেন তিনি। এর তাৎপর্য নিশ্চিতই অনুধাবনযোগ্য।

আমাদের ভারতীয় সনাতন সমাজব্যবস্থা উনিশ শতকে ইয়োরোপীয় সভ্যতা

ও সংস্কৃতির সঙ্গে সংঘাতে প্রবলভাবে আলোড়িত হয়েছিল। এর ফল ফলেছিল ভালো-মন্দ দুদিকেই। কিন্তু এই আলোড়নের যে-মৌলতম বৈশিষ্ট্যটি দেখা দিয়েছিল, তা হলো চারিত্র্যের স্বীকৃতি। আত্মসচেতনতায়; স্বাধীনতা-পিপাসায়, সংস্কার আন্দোলনে, নারীর মুক্তিপ্রয়াসে এবং প্রাচীন শাস্ত্রালোচনায়—সর্বত্রই এই চারিত্র্য অর্জনের প্রয়াস লক্ষ্য করি। উনিশ শতকের শেষার্ধে বাঙলাদেশে যে-সঙ্গীত আন্দোলন দেখা দিয়েছিল, তাতেও সঙ্গীতকে এই চারিত্র্য দেবার প্রয়াস চলছিল।

রাগরাগিণীবদ্ধ ভারতীয় সঙ্গীত সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের সশ্রদ্ধ অনুরাগ গড়ে উঠেছিল বাল্যকাল থেকেই; এ-সঙ্গীতে তিনি অনায়াস দক্ষতাও অর্জন করেছিলেন। এ-সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন, "বাঙালীর স্বাভাবিক গীতমুগ্ধতা ও গীতমুখরতা কোনো বাধা না পেয়ে আমাদের ঘরে উৎসের মতো উৎসারিত হয়েছিল।...তাই আমার মনে কালোয়াতি গানের একটা ঠাট আপনাআপনি হয়ে উঠেছিল।" কিন্তু এই অনুরাগ সত্ত্বেও যখন তিনি সৃষ্টিকর্মে উদ্‌বুদ্ধ হলেন, তখন সেই কালোয়াতি গান বা রাগরাগিণীবদ্ধ সঙ্গীত সম্বন্ধেই তিনি লিখলেন "আমাদের দেশের সঙ্গীত শাস্ত্রগত, ব্যাকরণগত ও অনুষ্ঠানগত হইয়া পড়িয়াছে ...রাগরাগিণীর ছাঁচ ও কাঠাম অবশিষ্ট রহিয়াছে, সঙ্গীত একটি মৃত্তিকাময়ী প্রতিমা হইয়া পড়িয়াছে। তাহাতে হৃদয় নাই, প্রাণ নাই।" এই উক্তির শেষ বাক্যটি প্রণিধানযোগ্য: মার্গ সঙ্গীতের নিশ্চিতই ভাব আছে, অর্থ আছে, তার নিজস্ব আনন্দ পরিণাম ও প্রাণও আছে; তথাপি তরুণ শিল্পী কেন লিখলেন, "তাহাতে হৃদয় নাই, প্রাণ নাই?" তার কারণ উনিশ শতকীয় যে যুগপ্রবর্তনা ছিল ব্যক্তিত্ব-সাধনা, তার প্রেরণা সাহিত্যশিল্পের অন্যান্য শাখার মতো সঙ্গীতেও অনুভূত হচ্ছিল। নতুনের প্রতি উৎসুক তরুণ শিল্পী তাই পুরাতনকে প্রাণহীন ভাবছিলেন। ভারতীয় রাগসঙ্গীত প্রাচীন সমষ্টিবদ্ধ জীবনচর্যা থেকেই তার বহু অলংকরণ ও আভিজাত্যে উৎসারিত। রবীন্দ্রনাথ আবার ঐ সঙ্গীত সম্বন্ধেই যখন বলেন, "বড়ো বড়ো রাগিণীর মধ্যে যে গাম্ভীর্য এবং কাতরতা আছে সে যেন কোনো ব্যক্তিবিশেষের নয়—সে যেন অকূল অসীমের প্রান্তবর্তী এই সঙ্গীহীন বিশ্বজগতের।"—তখন তার মধ্যে মার্গসঙ্গীতের বৈশিষ্ট্যের যথাযথ বিশ্লেষণ পাওয়া যায়। সে-বৈশিষ্ট্য হলো, নৈর্ব্যক্তিকতা, শান্তি ও সর্বাভিমুখিতা।

এখন রবীন্দ্রনাথ তাঁর সঙ্গীতসাধনার প্রথম স্তরে যা করলেন, তা হচ্ছে

ভারতীয় রাগরাগিণীকে গ্রহণ করে তার চারিত্র্যরূপ বদলে দিলেন। সঙ্গীতে গতি, ক্রিয়া এবং ইমোশন বা আবেগ প্রকাশই তার লক্ষ্য হয়ে দাঁড়াল। এ-ব্যাপারে হার্বার্ট স্পেন্সারের অভিমতই তিনি মান্য করেন। স্পেন্সারের মতে—"music is but an idealisation of the natural language of emotion'; and that consequently music must be good or bad according as it conforms to the laws of this natural language."

বিচ্ছিন্নভাবে সঙ্গীতসৃষ্টির কথা ছেড়ে দিলে, রবীন্দ্রনাথ এই যুগে ব্যাপক ভাবে সঙ্গীতের প্রয়োগ করেন 'বাল্মীকিপ্রতিভা', 'কালমৃগয়া' এবং 'মায়ার খেলা' গীতিনাট্যে—শেষোক্তটিকে অপেরাও বলা যায়। এই তিনটি রচনাতেই তিনি ভারতীয় রাগসঙ্গীতকে স্থিরতার বন্ধনমুক্তি দিয়ে উল্লাস, শোক, ক্রোধ, হর্ষ, উদ্দীপনা প্রভৃতি আবেগ প্রকাশের কাজে নিযুক্ত করেন। 'বাল্মীকি প্রতিভা'র গান সম্বন্ধে তিনি বলছেন, "ইহার সুরগুলি অধিকাংশই দিশি, কিন্তু এই গীতিনাট্য তাহাকে তাহার মর্যাদা হইতে অন্যক্ষেত্রে বাহির করিয়া আনা হইয়াছে। উড়িয়া চলা যাহার ব্যবসায় তাহাকে মাটিতে দৌড় করাইবার কাজে লাগানো গিয়াছে।…সঙ্গীতের এইরূপ বন্ধন মোচন ও তাহাকে নিঃসংকোচে সকল প্রকার কাজে লাগাইবার আনন্দ আমার মনকে বিশেষভাবে অধিকার করিয়াছিল।"

রবীন্দ্রনাথ কোন্ উপায়ে তা করেছিলেন? স্পষ্টত ইয়োরোপীয় সঙ্গীতের রীতি-প্রকরণ কতকটা আমাদের মার্গসঙ্গীতের দেহে অনুপ্রবিষ্ট করিয়ে। ইয়োরোপীয় সঙ্গীতের সঙ্গে ভারতীয় সঙ্গীতের একটা বড় পার্থক্য 'শ্রুতি' নিয়ে। 'শ্রুতি' হচ্ছে সেই অতি সূক্ষ্ম স্বর, যা এক ধ্বনির সঙ্গে অন্য ধ্বনিকে সংযুক্ত রাখে। যদি এই 'শ্রুতি'গুলিকে বর্জন করা যায়, তাহলে, রবীন্দ্রনাথেরই ভাষায়, "রাগরাগিণী যদি বা টেঁকে তাদের ছাঁদটা বদল হয়ে যায়। কিছুকাল পূর্বে যে কনসার্টের প্রচলন ছিল তার গৎগুলি তার প্রমাণ। এই গতের সুরগুলি কাটাকাটা নৃত্য করতে থাকে কিন্তু তাদের মধ্যে সেই বেদনার সম্বন্ধ থাকে না যা নিয়ে সঙ্গীতের গভীরতা। এই সব কাটাকাটা সুরগুলিকে নিয়ে নানা প্রকারে খেলানো যায়—উত্তেজনা বলো, উল্লাস বলো, পরিহাস বলো, মানুষের বিশেষ বিশেষ হৃদয়াবেগ বলো, নানাভাবে তাদের ব্যবহার করা যেতে পারে।"

আমরা একটা উদাহরণ গ্রহণ করছি। 'মায়ার খেলা'র একটি গান, 'আমি

জেনে শুনে বিষ করেছি পান'। আধুনিক কালের ব্যক্তিত্বময় জীবনচর্চায় রয়েছে বৈপরীত্যের অনুভূতি। মায়ার খেলারই নায়ক অশোক প্রেমের যে বিষ পান করেছে তা ঠিক বৈষ্ণবের কথিত বিষামৃত মাখা প্রেমের বিষ নয়, এ-হচ্ছে 'যতই দেখি তারে ততই দহি'—অর্থাৎ বৈপরীত্যের বিষাদ হৃদয়কে বিদীর্ণ করেছে। গানটিতে কোনো এক বিশিষ্ট রাগিণীর ছাঁচ নেই। হয়তো 'দেশ' রাগের সঙ্গে এর দূরবর্তী যোগ আছে। কিন্তু স্বরগুলির অল্পস্ফীত ওঠানামার মধ্যে অন্তরানুভূতির যন্ত্রণা দীর্ণতা প্রকাশিত। বিশেষ করে শুদ্ধ নিখাদের আকস্মিক ব্যবহার সেই ভাবটি ফুটিয়ে তোলার আনুকূল্য করছে। গানটির তেওরা তাল সাহায্য করছে হৃদয়ের দোলা ও ইমোশনের বেগটি ফুটিয়ে তুলতে।

এখন রবীন্দ্রসঙ্গীতের অপর বৈশিষ্ট্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করা যাক। রবীন্দ্রনাথের সুদীর্ঘকালের সঙ্গীতসাধনার প্রধান তিনটি স্তর লক্ষ্য করা যায়। প্রথম স্তরের কথা এই মাত্র আলোচিত হলো। দ্বিতীয় স্তরে দেখা যায়, রবীন্দ্রনাথ গানের কথার সঙ্গে সুরের হরগৌরী মিলন সাধন করেছেন। আর শেষত তাঁর নৃত্যনাট্যপর্বে কথা, সুর ও নৃত্যের মিলন এবং সামঞ্জস্য সাধন করেছেন। কিন্তু তা করেছেন কোন্ নীতিগত ভিত্তিতে? একি শিল্পীর নিছক খেয়াল?

আমরা জানি রবীন্দ্রনাথ এ-যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব সাধক শিল্পী; কিন্তু তিনি বিশ্বমিলনের কথাও বলেছেন। মনে রাখতে পারি, শান্তিনিকেতনকে তিনি বিশ্বভারতীতে পরিণতি দিয়েছেন: ব্যক্তিত্ব ও বিশ্বত্বকে সমন্বিত করে, ভারতবাণীকে বিশ্ববাণীর পটভূমিতে কেন্দ্রীয় স্থানটি দিয়ে। সঙ্গীতের ক্ষেত্রেও ব্যাপারটি তাই ঘটেছে। রাগ-রাগিণীর অন্তর্নিহিত ভাবটি যেমন তাঁর বাণীকে উদ্বোধিত করেছে, তেমনি বাণীর প্রয়োজনে সুরকে তিনি রূপান্তরিত করেছেন। আবার সেখানে তাঁর প্রথম যুগের অর্জিত ইমোশন বা আবেগ জাগানো বৈশিষ্ট্যও রক্ষিত হয়েছে। ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এ-সম্বন্ধে বলেছেন, "কথা ও সুরের মধ্যে সম্বন্ধ প্রকাশ করাই যদি সমস্যা হয় তবে তাদের মধ্যে গোটা কয়েক সন্ধিশর্ত থাকা চাই।…সন্ধি কখনও এক তরফা ডিক্রি নয়, পরস্পরের মধ্যে আদান প্রদানই তার বৈশিষ্ট্য। অর্থাৎ প্রত্যেককেই সন্ধির সময় কিছু না কিছু ছাড়বার সময় পাবার প্রত্যাশা থাকেই থাকে।" এই রীতির মিলনের ও সামঞ্জস্যের একটি অতি সুন্দর উদাহরণ "তিমির অবগুণ্ঠনে বদন তব ঢাকি" এই গানটি। গানটির মূল ভাব বিস্ময় 'কে তুমি'-তে চমৎকার ফুটেছে।

তাছাড়া,

আজি সঘন শর্বরী, মেঘমগন তারা,
নদীর জলে ঝর্ঝরি ঝরিছে জলধারা,

এই অংশে কথার মধ্যে যেমন দমকা বাতাস, প্রচণ্ড বৃষ্টি এবং তারপর শান্ত বর্ষণ পাচ্ছি, সুরের প্যাটার্নেও তাই ফুটে উঠেছে। সুর ধৈবত ও উঁচু ষড়জে দোল খেতে খেতে মধ্যমে এসে বিশ্রাম নিয়েছে; তারপর যেখানে

তমালবন মর্মরি পবন চলে হাঁকি

তখন সুর কেমন দ্রুত লম্ফনে উঁচুতে উঠেছে, তা লক্ষ্য করার মতো। অথচ সব মিলে গানটির সুরের মধ্যে এমন একটি ভাব আছে, যা বর্ষারজনীর গভীরতা এবং কঠিন বাধা লঙ্ঘনের সংকল্পের দৃঢ়তাকে ফুটিয়ে তুলেছে।

রবীন্দ্রসঙ্গীতের তৃতীয় স্তর হচ্ছে নৃত্যনাট্যের দ্বারা প্রভাবিত, যেমন প্রথম স্তর ছিল গীতিনাট্যের দ্বারা। এই যুগে রবীন্দ্রনাথ কথা ও সুরের সঙ্গে নৃত্যকেও মিলিত করেছেন। রবীন্দ্র-জীবন সাধনায় যে বিশ্বানুভূতির পরিচয় পাই তারই আঙ্গিক-প্রতিরূপ হিসেবে নৃত্যনাট্যকে গ্রহণ করা যায়। কিন্তু নৃত্যনাট্যের প্রসঙ্গটি আমরা ছেড়ে যেতে চাই, কতকটা স্থানাভাবের জন্য, কতকটা নৃত্য আমাদের মূল প্রসঙ্গের বহির্ভূত বলেও।

আর একটা কথা এখানে আলোচ্য নয়, কেবল উল্লেখ করতে পারি যে রবীন্দ্রনাথের সমকালে যাঁরা বাঙলা সঙ্গীতকে সৃষ্টির স্বকীয়তায় সমৃদ্ধ করেছেন, সেই দ্বিজেন্দ্রলাল, অতুলপ্রসাদ ও নজরুলও প্রয়োজনে বিদেশী উপাদানকে গ্রহণ করেছেন, কিন্তু আমাদের সঙ্গীতের গৌরবময় ঐতিহ্যকে কখনো বিস্মৃত হননি। এঁরাও রবীন্দ্রনাথের মতোই অথচ নিজেদের রুচি, মানসিকতা ও সাধ্য অনুসারে সঙ্গীত সরস্বতীকে প্রাণৈশ্বর্যে ও বৈচিত্র্যে সঞ্জীবিত করে তুলেছিলেন।

এরপর আমরা চলে আসছি একেবারে সাম্প্রতিকতম কালে। এ-যুগটা সেদিনকার তুলনায় আমূল বদলে গেছে। উনিশ শতকে স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখেছিলাম আমরা, আর এ-যুগে তার অর্থ দাঁড়িয়েছে দলত্যাগে আর বিশ্বাসভঙ্গে। তখন সর্বক্ষেত্রে অনেক-অনেক মহামানবকে পেয়েছিলাম, এখন 'মহামানব'রা হয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। সেকালে সাহিত্যরথীরা ছিলেন সাময়িক পত্রিকার প্রকাশক সম্পাদক। আর এখন সংবাদপত্র মালিকরা হয়েছেন পত্রিকা সম্পাদক, আর লেখকরা তাঁদের ফরমাস তালিম করছেন। আজকাল

রিয়ালিজ্‌ম-এর অর্থ দাঁড়িয়েছে তাবৎ পত্রপত্রিকায় নির্জল সেক্সের ক্লান্তিহীন পুনরাবৃত্তি। বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথের রচনায় সেক্স ছিল কোনো আদর্শ বা আত্মপ্রকাশের মাধ্যম, আজ সেটি উপায় থেকে উপেয়ে উন্নীত হয়েছে! এক কথায়, আদর্শভ্রষ্ট, নীতিচ্যুত, উদ্‌ভ্রান্ত এই যুগ সর্বক্ষেত্রে একেবারে উল্টো পথ পরিক্রমায় নিরত। এই পটভূমিতেই আধুনিক বাঙলা গান বিচার্য।

আধুনিক বাঙলা গানের ক্ষেত্রে কী দেখছি? নজির আছে, রবীন্দ্রনাথ দ্বিজেন্দ্রলাল পাশ্চাত্যসঙ্গীতের উপাদান মিশিয়েছিলেন বাঙলা গানে, অতএব, আমরা তাঁর উত্তরাধিকারীরা, আধুনিক বাঙলা গানে কী জিনিস পরিবেশন করছি? প্রথমত একরাশ বিদেশী বাজনা, উদ্ভট চীৎকার, সুর ছেড়ে স্বরের প্রাধান্য—কণ্ঠের নানা ঢংয়ের কাকু; যেমন, শিষ দেওয়া, বু-ইং করা, হাসি বা কান্নার কাকু, দীর্ঘশ্বাসের বিকৃতি এইসব। আর সর্বোপরি গানের অদ্ভুত কথা। আধুনিক গান চমক লাগায়, তাড়া করে, পীড়া দেয়, অসংলগ্ন বাকজালে বিপর্যস্ত করে—কিন্তু করে না একটি জিনিস, এতদিন গান বলতে আমরা যা বুঝতাম, একটি বিশেষ ভাবরসের উৎসারণ।

এ-যুগেও পাশ্চাত্য সঙ্গীতের অনুকরণ চলছে বাঙলা গানে, কিন্তু আগের থেকে একটুখানি পার্থক্য আছে। আগে পাশ্চাত্য সঙ্গীতের নানা আদর্শ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে, হয়েছে আমাদের রাগরাগিণীর সঙ্গে তাকে মেলাবার চেষ্টা। আধুনিক বাঙলা গান রাগরাগিণীর দূরতম সংস্পর্শবর্জিত। আজকাল সুরস্রষ্টা, সঙ্গীত রচয়িতা ও সঙ্গীত পরিচালক কেউই পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে চান না। বিদেশী ওয়াল্‌জ্‌, টুইস্ট, শেক, স্যাইম, জার্ক, গো-গো প্রভৃতি নাচের তালে ও তারই অনুষঙ্গী-সুরে কথা বসিয়ে দিয়েই তাঁরা অভিনবত্ব সৃষ্টি করতে চান। তাও সেসব অনুকরণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অক্ষম, ফলে তা মূলের দূরতম ক্যারিকেচার হয়ে দাঁড়াবার এই রকম চমকলাগানো প্রয়াসের একটি উদাহরণ হচ্ছে: 'চলো রীণা, ক্যাসুরিনা' এই বহু-শ্রুত গানটি।

এটি কতকটা, ঠিক খাঁটি নয়, পাশ্চাত্য শেক বা সুইপ জাতীয় নাচের সুরের আদর্শে রচিত। এই শেক-জার্ক প্রভৃতি একেবারে আধুনিক কালের নাচ; বীটলদের দ্বারা উপাসিত। আমাদের দেশে এসব এখনো খুব ছড়িয়ে পড়েনি। কিন্তু এসব নাচ যে-মূল আদর্শ থেকে বা তাকে পাশ কাটিয়ে শাখা-প্রশাখার মতো বেরিয়ে এসেছে, সেটি বরঞ্চ আমাদের দেশে এখন বেশ খানিকটা প্রসার লাভ করেছে। তার আদর্শ আমরা অক্লান্তভাবে অনুসরণ করে চলেছি, সিনেমার

পর্দায় আর বিসর্জনের শোভাযাত্রায় দেখছি, স্কুল-কলেজের রুদ্ধ-দ্বার বিশ্রাম কক্ষে ছাত্রছাত্রীরা মহড়া দিচ্ছি—গ্রামোফোন রেকর্ডে, রেস্তোরায়, পূজামণ্ডপে, বেতারে বা বিবাহ-উৎসবের উচ্চকথক যন্ত্রে সর্বত্র শুনছি—বলুন তো সেই নাচ আর সেই সুরের নাম কি? ট্যুইস্ট।

ট্যুইস্ট নাচের মাতৃভূমি হচ্ছে আমেরিকা। কোনো আদিম জাতির নৃত্য-ভঙ্গিমা থেকে এর আদর্শ গৃহীত হয়ে সভ্য সমাজে এ-নাচ সার্বভৌম প্রভাব বিস্তার করেছে। এ-নাচের প্রকরণ এবং তাৎপর্য কতকটা এইভাবে বিবৃত করা যেতে পারে।

ট্যুইস্ট হচ্ছে যৌথ নৃত্য। জোড়ায়-জোড়ায় তরুণ-তরুণীরা মুখোমুখি, পিঠাপিঠি, বা পরস্পরকে আংশিক প্রদক্ষিণ করার ভঙ্গিতে নৃত্য করে, কিন্তু পরস্পরকে স্পর্শ করে না। ছেলেদের পোশাকে তীব্র রঙের সমারোহ চোখকে বিদ্ধ করে, আর মেয়েদের পোশাক সংক্ষিপ্ততম প্রায় নগ্ন। ছেলেদের চুল এমন বাড়ানো যে হঠাৎ মেয়ে-পুরুষের পার্থক্য বোঝা যায় না।

যে-বাজনার তালে-তালে এরা নাচে তা যেমনি তীব্র তেমনি দ্রুত, মুহূর্তে সেই কলরোলে কর্ণেন্দ্রীয় পীড়িত এবং চিত্ত বিপর্যস্ত হয়ে উঠতে থাকে। আর নৃত্য? এতদিন, ভারতবর্ষে তো বটেই, পাশ্চাত্যেও নাচ বলতে বোঝায় প্রধানত হাত ও পায়ের বিশিষ্ট ভঙ্গিমাময় সঞ্চালন অর্থাৎ অর্থভিত্তিক মুদ্রার সৃষ্টি। আর ট্যুইস্ট হচ্ছে পা থেকে আরম্ভ করে ক্রমোবদ্ধ সমস্ত দেহে অতি-দ্রুত আক্ষেপ, আন্দোলন, মনে হয় দেহের মাংসপেশীগুলো স্থানচ্যুত হয়ে পড়বে। কতকটা মৃগীরোগগ্রস্তের দেহের আক্ষেপের মতো। এই যে ছোট ছোট গতির অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিক্ষেপ, এ-যদি একবার শুরু হলো, তারপর একই ঢঙে তার অন্তহীন পুনরাবৃত্তি চলতে থাকে।

এখন, কেন এই নৃত্যের এত জনপ্রিয়তা? একজন আমেরিকান সমাজ-তাত্ত্বিক এই নাচ সম্বন্ধে বলেছেন, "It is a kind of fertility rite, designed to combat the sterility of modern age"।

'Sterility of modern age'—কথাটা খুবই সত্যি। আমরা একটু আগেই উল্লেখ করেছি, আগে মানুষ যা নিয়ে নন্দিত হয়েছিল, সেই আদর্শ, মানবতা, প্রেম, পবিত্রতা—সবকিছু এযুগে ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে। মানুষ এখন ক্লান্ত, বিষণ্ণ, উদ্‌ভ্রান্ত। এই রোগ নির্ণয় ঠিকই হয়েছে, কিন্তু ট্যুইস্ট কি সে-রোগের দাওয়াই?

এ-কথা অবশ্য ঠিক, ট্যুইস্টের আবেদন খুবই তীব্র, মুহূর্তের উন্মাদনায় অস্থির করে তুলতে পারে, উচ্চমাত্রার এ্যন্টিবায়টিকের মতো। কিন্তু অতিদ্রুত তালের ছোট-ছোট অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিক্ষেপের আর দেহকম্পনের আদিমতা ও অন্তহীন পুনরাবৃত্তি মানুষের মনকে মুক্তি দেয় না। এ-নাচ নাচতে-নাচতে বা দেখতে-দেখতেও কেমন ঝিম-ধরা, আচ্ছন্ন অনুভূতির সৃষ্টি হয়। মন্ত্রশক্তিতে যেমন চিত্তকে নিঃসাড় করে তোলে, এ-নাচও তেমনি রিজনকে পর্যুদস্ত করে ফেলে। আবেগকে মুক্ত করে, কিন্তু তাকে খাঁচায় বদ্ধ করার জন্যই। ইণ্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্রী বলেছিলেন যে এই নাচকে তিনি ভালোবাসেন, এই নাচের যুগকেও। তার কারণ; 'They take off my problem, of society itself. You cannot think about anything else while you are lost in them. You exhaust yourself, them you cannot for a few hours without a sleeping pill'। তাহলে এই তরুণীটি ট্যুইস্ট ভালোবাসেন, তার কারণ তাঁরই বিশ্লেষণানুসারে তা 'sleeping pill'-এর সাবষ্টিট্যুট্ তা এমন একটা অবসাদ ও শ্রান্তিতে মানুষকে নিয়ে যায়, যাতে চিন্তা থাকে না. যা চিত্তকে নিঃশেষিত করে তোলে।

তারপর, ট্যুইস্ট সম্বন্ধে সবচেয়ে বড় কথা, তা কি যৌন আবেদনে তীব্র? পূর্বোক্ত সমাজতাত্ত্বিকের ভাষায় এর উত্তর আছে: "It is a sort of sexy in a clean way, all those bodies grinding but never touching."

প্রথমেই বলে রাখি, যৌন আবেদনে আমার কিছুমাত্র আপত্তি নেই, কিন্তু ভীষণ আপত্তি আছে তার প্রকৃতিবিশেষ সম্বন্ধে। দেহপ্রবৃত্তির আবেদন আছে প্রত্যেকটি ভারতীয় ও পাশ্চাত্য ক্লাসিক্যাল নাচের মধ্যে। কীর্তন গানে, রবীন্দ্রনাথের ভক্তিমূলক গানেও তা আছে। কিন্তু এতাবৎকালে তা ছিল প্রেমরূপে, ভক্তিরূপে, আত্মপ্রকাশের মাধ্যমরূপে। আজ আর তার সেই রূপ নেই, আজ তা নগ্ন। সভ্য মানুষের বিকৃত আদিমতা। প্রসঙ্গত স্মর্তব্য, ইংরাজিতে 'love' ও 'sex' দুটি কথা আছে। ট্যুইস্ট যে দেহের আবেদন তা হচ্ছে বিশুদ্ধ 'sex'— 'love' নয়। কারণ, ট্যুইস্ট-প্রেমিকরা কি বলেন জানেন? বলেন, 'Love is surrender, Sex is conquest. Who wants to surrender?'

এখন, একটু আগে ট্যুইস্টের সগোত্র কতকটা শেক নাচের সুরে বসানো যে গানটির উল্লেখ করা হলো, তার কথাগুলো কি? চলো রীণা... প্রথমেই চোখে ভাসে যে-মেয়ে সে হচ্ছে আমাদের, ট্রামে-বাসে, রেস্তোরাঁয়-পার্কে-সিনেমায়

যেসব মিনু-লীনা-ডলি-লিলিরা ভিড় করে রয়েছে, তাদেরই একজন। অর্থাৎ প্রেমের কবিতায় যে মানসীকে আমরা পাই, আর আমাদের সঙ্গিনী মানবীকে যার আলোকে দেখি (তু. 'হেরি কাহার নয়নে রাধিকারে অশ্রুআঁখি পড়েছিল মনে ?') এখানে তাকে পাই না। আচ্ছা স্বীকার করে নেওয়া গেল রীণা রীণাই, সে মানসী নয়—সব মায়া-আবরণ খসিয়ে সে শুধু রীণাই হলো নামটি বিশেষ করে যেখানে মিষ্টি। কিন্তু তারপরে ক্যাম্বরিণা কেন ? এই প্রসঙ্গে ক্যাম্বরিণার অর্থ কি তা বলা মুস্কিল, কিন্তু শব্দটি ব্যবহার করার ফল হচ্ছে রীণার সঙ্গে ক্যাম্বরিণার, একটা স্টাণ্ট দেওয়া মিল ; বিদেশী উদ্ভটের গন্ধও আছে ; কিন্তু অর্থহীন। যদি তর্কের খাতিরে বলা যায়, আধুনিক কবিও তো 'নাটোরের বনলতা সেনের' কথা লিখেছিলেন, তার কি হলো ? কিন্তু মনে করে দেখুন সে মেয়ের 'চুল-তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা, মুখ তার শ্রাবস্তীর কারুকার্য'। কিন্তু এখানে ক্যাম্বরিণা—যেন রীণাকে ব্যঙ্গ করতে উদ্যত। যাই হোক, এই রীণার কাছে নায়কের প্রস্তাব কি ? না,

লাল কাঁকরের পথ ধরে,
একটু একটু করে এগিয়ে যাই...
সোনা রোদ ঝিকমিক
দেখ বালু চিকচিক
ছোট্ট নদী মিষ্টি খোয়াই, পার হয়ে যাই।

এই প্রস্তাবের মধ্যে পাচ্ছেন কোনো প্রেমিক-হৃদয়ের আবেগ ? পুরুষের যে আবেগের সামনে নারীর হৃদয় কপোত-কপোতী হয়ে ওঠে, তার কিছু আছে ? এ-যেন কতকটা পিকনিক করতে যাবার নিমন্ত্রণ, একটু হুল্লোড়, একটু মজা করা ; তারপর,

যেখানে কৃষ্ণচূড়া লালে লাল

ভাবলাম বুঝি নায়ক কৃষ্ণচূড়ার রক্তাভা দেখবেন নায়িকার গণ্ডে বা অধরে—ও হরি, তা নয়,...আচ্ছা, বলতে পারেন, নায়িকাকে সঙ্গে নিয়ে বেড়াতে গেলে তারই তো অনন্যা হয়ে থাকার কথা, সেখানে রীণা পাশে থাকা সত্ত্বেও সাঁওতাল বন্ধুত্বের জন্যে লোভ হয় ? কিন্তু গান তো শুনলেন,

যেখানে কৃষ্ণচূড়া লালে লাল
যেখানে বন্ধু হবে কিছু সাঁওতাল...

Love is surrender, Sex is conquest.' রীণা এবং তার প্রস্তাবক

প্রেমিক-প্রেমিকা নয়, তারা boy-friend এবং girl-friend।

ট্যুইস্টের অর্থহীন পরিণাম-বিহীন আদিম নেশাধরা উন্মাদনার স্রোতে গা ভাসিয়ে দেওয়ার কথা আগেই বলেছি। একটি গান আছে ট্যুইস্টের কাছা-কাছি সুরে বসানো, সেই শৃঙ্খলহীন যৌবনের স্রোতে গা ভাসিয়ে দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন,

জীবনে কি পাব না ভুলেছি সে ভাবনা,
সামনে যা দেখি জানি না সে কি
আসল কি নকল সোনা।

আসল বা নকল তিনি জানেন না। তারপরেও তিনি বলেছেন, ভালো-মন্দের দ্বন্দ্ব তিনি বোঝেন না। কারও জন্যে থমকে দাঁড়াবেন না, কেবল হারাবার খুশিতেই তিনি হারিয়ে যাবেন। এ হচ্ছে বিশুদ্ধ আত্মবিস্মৃতি—একটি sleeping pill।

এ-গানে কি কোনো নায়িকা আছে, আর তাকে লক্ষ্য করে নায়কের কোনো উক্তি আছে? আছে :

কে তুমি নন্দিনী, আগে তো দেখিনি,
চলেছ এই পথে, রূপে যে রঙ্গিনী

এখন, বলুন, যে মুখ দিয়ে এই কথাগুলো বেরুচ্ছে, তার দিকে যদি তাকান, তাহলে মনোহারিণী নায়িকার কাছে প্রেমনিবেদন উৎসুক কোনো পুরুষের মুখের ছবি পাবেন? না। এ-হচ্ছে সেই রোড-সাইড রোমিও, যে-আধুনিক জুলিয়েটদের টীজ করতে পারলে খুশি হয়।

যেমন গানের কথা, তেমনি সুর। আগেই বলেছি, এসব গানে কোনো emotion বা ভাবকে রূপ দিতে চায় না, সুরের মাধ্যমেই কোনো idea-এর প্রকাশ করে না। এ-সুর খুব ঝাঁকুনি দেয়, রসবিগলিত চিত্তের আবেশ আনে না। গানে সুর অপেক্ষা স্বরের প্রাধান্য, হঠাৎ ওঠে, হঠাৎ নামে—ট্যুইস্টের ফ্রগ ড্যান্স, মাঙ্কি ড্যান্সের মতো। কান-ফাটানো চিৎকার, কণ্ঠস্বরের কাকু পর্যন্ত এতে ব্যবহার করেছে। প্রায়ই এর লয় হচ্ছে rock and roll-এর মতো।

রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ শিল্পীরা যে উৎস থেকে উপাদান নিয়ে যা করেছিলেন, আধুনিককালে আমরা সেই উৎস থেকে ভিন্নতর উপাদান নিয়ে কোন্ জিনিস করে তুলছি?*

---

* ১. 'রবীন্দ্রসঙ্গীত'—শান্তিদেব ঘোষ ২. 'রবীন্দ্রসঙ্গীতের ধারা'—শুভ গুহঠাকুরতা
৩. 'কথা ও সুর'—ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ৪. 'ট্যুইস্ট'—অমিতাভ দাশগুপ্ত, ইত্যাদি

পাবলো নেরুদাকে কয়েকটি প্রশ্ন ও তার উত্তর

প্রশ্ন। আপনার রাজনৈতিক কার্যকলাপের মূল কারণ কি?

উত্তর। আমার সাহিত্য সৃষ্টিতে এক অচল অবস্থায় পৌছে আমি বেরোবার একটা ভালো পথ খুঁজে বার করতে চেয়েছিলাম; দুঃখের বিরুদ্ধে সংগ্রামের মধ্যেই আমি সে-পথ খুঁজে পেয়েছি। অধ্যাত্মবাদ বা ধর্মের ভাষায় যাকে দুঃখ বলা হয়ে থাকে এটা তেমন কোনো দুঃখ নয়। যে সামাজিক অন্যায়ের অপরাধে মানুষ নিজেই অপরাধী, এটা হলো তারই ফল। এই পথ এবং সংগ্রামই আমার কাছে সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য বলে মনে হলো। আমি এখন অনুভব করে থাকি যে আমি সত্যই আমার কর্ত্তব্য করছি। লেখক হিসাবে আমি শূন্য রাত্রে প্রাচীর ভেঙে বেরুবার চেষ্টায় ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম। এখন আমি সুখী। আমাদের পথের মাঝখান দিয়ে চলতে হবে—চলতে হবে জীবনের দিকে রাজনীতি থেকে দূরে সরে থাকে যে-লেখক সে হলো কল্পকাহিনীর জীব; সে কল্পকাহিনী আবিষ্কার ও পোষণ করেছে ধনতন্ত্র। দান্তের যুগে এ ধরণের কোন কবি ছিলেন না। শিল্পের জন্যেই শিল্প—বড় ব্যবসায়ীদের তরফ থেকেই এই মতটা প্রচার করা হয়। থিয়োফিল গতিয়ে ধনী ব্যবসায়ী ও শোষকদের আদর্শের গুণকীর্তন করেছেন। লেখকেরাও যে এই মত গ্রহণ করেছিলেন—সেটা হলো উঠতি ধনতন্ত্রের পক্ষে জয়। আর্তুর র‍্যাবর মতো বড় বিদ্রোহীর ইথিওপিয়ার পলায়ন হলো শার্লেভিলের মাংস ব্যবসায়ীদের অবিসংবাদিত জয়। আমাদের একটা আলাদা জগৎ গড়তে হবে…সেটা এত শোক-দুঃখ ভরা থাকবে না—তা হবে সুখের জগৎ। তার জন্যে লেখককে হতে হবে এক বিরাট বাহিনীর সৈনিক। তাকে না থেমে বা এদিক-সেদিক না করে এগিয়ে চলতে হবে।

প্রশ্ন: আপনি কি মনে করেন যে আপনি স্থায়ীভাবে রাজনীতিতে যোগ দিয়েছেন, না সেটা হলো ক্ষণিক ভাবাবেগ অথবা সাময়িক ঘটনাচক্রের তাগিদে।

উত্তর: আমার মনে হয়, আপনারা আমার অনেক দোষ পেতে পারেন—পাবেন না শুধু একনিষ্ঠতার অভাব। চিলির জনসাধারণ যে ভাবে মুরগীর খাঁচার মতো ঠাসাঠাসি ঘরে বাস করে তা দেখলে আপনারা বুঝতে পারতেন যে, এই পথ এবং এই সংগ্রাম বেছে নিয়ে আমি আর পিছু ফিরতে পারি না।

প্রশ্ন : 'পূর্ব' ও 'পশ্চিম' এই দুইভাগে দুনিয়াকে যে বর্তমানে ভাগ করে দেখানো হচ্ছে, সে সম্পর্কে আপনার অভিমত কি? আপনি কি মনে করেন যে একটা তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ আসন্ন?

উত্তর : হিটলার ও গোয়েবল্‌স—এই চতুর জল্লাদেরাই 'পশ্চিমী' সভ্যতার মিথ্যাটা নিজেরা বানিয়ে প্রচার করেছিল। এই ধন্বন্তরিসদৃশ সর্বরোগহর ওষুধটি তৈরি করে বোতলে ভরে বাজারে ছেড়েছিল তারাই; এখন মার্শাল, ফোর্ড মোটরস, কোকা-কোলা এবং ষ্ট্যাণ্ডার্ড অয়েল অথবা ফ্লাইং ফোরট্রেস তৈরি করনেওয়ালাদের উপর নির্ভরশীল নিঃস্বার্থ দার্শনিক প্রবরেরাই এই দাওয়াইটি যথেচ্ছভাবে সরবরাহ করে যাচ্ছেন!…ক্ষুধা এবং অনশন—তা সে ভারতবর্ষ বা পশ্চিমী রাজধানীগুলির শহরতলী যেখানেই থাকুক না কেন—আমার কাছে সমানই পীড়াদায়ক। ব্যবসায়ে মুনাফা সঞ্চয় করাই হলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আইন; তার চেয়ে সোভিয়েতের গবেষণার প্রেরণা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি অবিসংবাদিতভাবে ঢের বেশী প্রগতিশীল ও সার্থক বলে আমি মনে করি। যারা সোভিয়েত অস্ত্র হাতে নিয়ে যুদ্ধে নেমেছিল, যারা মার্কসবাদী বই পড়েছিল, যারা ছিল কমিউনিস্ট পার্টির সার্থক ভাবধারায় অনুপ্রাণিত—তারাই যে মানব সংস্কৃতিকে মারাত্মক বিপদের হাত থেকে রক্ষা করেছিল একথা স্টালিনগ্রাদ প্রমাণ করে দিয়েছে। চায়কোভস্কি, মার্কস, বাখ, শেক্সপীয়র, পুশকিন, গয়া, পাবলভ…এঁদের দৃষ্টি এবং চিন্তা সবই সারা মানবজাতির। সংস্কৃতিতে ভাগ করে ফেল—এই রকমই হলো সাম্রাজ্যবাদীদের কুৎসিত প্রচার।…মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তর সুপরিকল্পিতভাবে এবং দুর্বৃত্তের মতো আমেরিকাকে একটা নতুন যুদ্ধের জন্য তৈরি করছে। কিন্তু আমাদের জনগণ কি অন্য কোনো দেশের জনতা—এদের কেউই যে যুদ্ধ চায়না সে সম্পর্কে কোনো তর্কই উঠতে পারে না। এই পূর্বকল্পিত দুষ্কার্যের বিরুদ্ধে প্রতি মুহূর্তে লড়াই করাই হচ্ছে আমাদের কর্তব্য।।

আর্জেন্টিনার লা হোরা পত্রিকায় প্রকাশিত প্রশ্নোত্তরটি ১৩৫৬ সালের পৌষ [জানুয়ারি ১৯৫০] সংখ্যা পরিচয় থেকে সংক্ষিপ্তাকারে পুনর্মুদ্রিত হলো। সম্পাদক

পুস্তক পরিচয়

Moin Shakir: KHILAFAT TO PARTITION—Kalanakar Prakashan, New Delhi—First Edition: June, 1970—Price Rs. 35·00

ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ইতিহাসে মুসলিম চিন্তাধারা যে ভাবে রেখাপাত করেছে, তার যথার্থ আলোচনার বিশেষ প্রয়োজন। বাঙলাদেশের নব পটভূমিকায় নতুন করে প্রমাণ করল ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্রের ব্যর্থতা অর্থাৎ সেই মুসলমান চিন্তাবিদ্ যাঁরা ঐশ্লামিক স্বাজাত্যবোধের ভিত্তিতে দেশবিভাগ করেছিলেন তাঁদের চিন্তার দৈন্য। ১৯১৯ থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত ভারতবর্ষের মুস্লিম চিন্তাধারার গতিপ্রকৃতির এক বিদগ্ধ বিশ্লেষণ মইন্ শাকিরেরর "খিলাফৎ থেকে দেশ বিভাগ।" "ধর্ম ও রাজনীতিকে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন করে ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি অর্জনে ভারতের মুসলমানদের ব্যর্থতার" ইতিবৃত্ত পর্যালোচনায় লেখক পাঁচজন প্রতিনিধি স্থানীয় মুসলমান নেতৃবৃন্দের চিন্তাধারা ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে ব্যাখ্যা করেছেন।

গ্রন্থের প্রারম্ভে, মুসলমান সমাজের নবজাগরণের প্রেক্ষাপটে লেখক ওয়াহাবী আন্দোলন, আলীগড় সংগ্রাম, দেওবন্দ চিন্তাধারা—প্রভৃতি ভারতীয় মুসলিম ঐতিহ্যবাহী পৃথক চিন্তাদর্শনগুলি উত্থাপন করেছেন। এই প্রসঙ্গে লেখক বিশিষ্ট মুসলমান নেতৃবর্গ যথাক্রমে শাহ আবদুল আজিজ, স্যার সৈয়দ আহমদ, আমীর আলী, আগা খাঁ, মৌলানা শিবলী, ডাঃ আন্সারী, ওবাইদুল্লাহ সিন্ধীর রাজনৈতিক মতদর্শনের রূপরেখাও উপস্থিত করেছেন।

যে পাঁচজন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব গ্রন্থে বিস্তৃতাকারে আলোচিত হয়েছেন তাঁদের মধ্যে মহম্মদ আলীর নামই সর্ব প্রথমে উল্লেখযোগ্য। প্যান-ঐশ্লামিক চেতনায় প্রগাঢ়-ভাবে উদ্বুদ্ধ মহম্মদ আলী প্যান-ঐশ্লামিক মত-দর্শনকেই ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে গণ-ভিত্তি স্থাপনের কাজে ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন। মহম্মদ আলীর ধর্মান্ধতা কিভাবে তাঁর রাজনৈতিক বিচারধারাকে ভিন্নখাতে নিয়ে গিয়ে ধর্মনিরপেক্ষতা-বিরোধী কাঠামোয় রূপ দিয়েছিল সেটা লেখক বিস্তারিত ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। মহম্মদ আলীর মতামত তাঁর নিজস্ব লেখাতেই জাজ্বল্যমান—"রাজনীতিকে ধর্ম থেকে পৃথক করে রাখতে হবে—

এই মতবাদকে আমি অস্বীকার করি, কারণ এর অর্থ হতে পারে এই যে তাঁদের ব্যক্তিগত তথা সামাজিক জীবনের অপরাপর দিকগুলোর মত যে ধর্ম মুসলমান রাজনীতির গতি নির্ধারণ করে মুসলমানরা সেই ধর্ম অনুসরণ করতে পারবেন না অথবা সকল আধ্যাত্মিকতা বর্জিত হয়ে রাজনীতি প্রবঞ্চক ও স্বকীয় স্বার্থান্বেষী প্রতারকদের ক্রীড়নকে পরিণত হবে।" (মহম্মদ আলী, কমরেড, ১৬ অক্টোবর, ১৯২৫, পৃঃ ১৮৬) প্রসঙ্গতঃ মইন শাকির যথার্থই বলেছেন, "মহম্মদ আলী ভাবতেন, ধর্মনিরপেক্ষতা ইসলামের পরিধিকে সঙ্কীর্ণ করে তুলবে এবং আধ্যাত্মিকতাহীন বিষয়াবলীর উপর তার প্রভাব হয়ে উঠবে অকার্যকর। তাঁর মতে সেটা হবে কোরানের মর্মবস্তু ও নির্দেশাবলী এবং হজরত মহম্মদের কার্যক্রমের রীতিবিরুদ্ধ।" (পৃঃ ৬২)

প্যান ঐস্লামিক চিন্তাধারার ধ্বংসাত্মক পরিণতি উপলব্ধি করার দূরদর্শিতার অভাবের দরুন মহম্মদ আলী মুসলমান জনগণের মধ্যে 'প্যান-ইসলাম' এমন গভীর ভাবে প্রোথিত করে তুলেছিলেন। "খোদার বচন অনুযায়ী, 'খিলাফৎ' দুর্বল হওয়ার অর্থ ইসলামধর্ম দুর্বল হওয়া, এবং সেটা হলো পৃথিবীতে মুসলমানদের নিরাপত্তাহীনতার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত" (কে, কামালুদ্দীন India in Balance মহম্মদ আলীর বক্তব্যের উদ্ধৃতি, পৃঃ ৮০)। মইন্ শাকিরের মতে, এই মনোভাবের ফলেই "ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে প্রকৃত জাতীয় চেতনাবোধের উন্মেষ প্রতিহত হলো।" (পৃঃ ৬৮)

মইন্ শাকির স্পষ্টভাবে দেখিয়েছেন, কামাল পাশার নেতৃত্বে তুরস্কে মুসলমানদের ধর্মনিরপেক্ষ সংগ্রাম সম্পর্কে মহম্মদ আলী সম্পূর্ণ অনবহিত ছিলেন। ততদিনে খিলাফৎ প্রশ্নটি অপরাপর ঐস্লামিক দেশে তার যথার্থ উপলব্ধি হারিয়ে ফেলেছে। খিলাফৎ প্রশ্নে মহম্মদ আলীর চিন্তাধারা তাঁর রাজনৈতিক গূঢ় চেতনার অভাবকেই পরিস্ফুট করেছে। খিলাফৎ আন্দোলনের চূড়ান্ত ব্যর্থতায় তিনি ঐস্লামিক জাতীয়তাবাদের চিন্তাজালে জড়িয়ে পড়লেন আর ব্যবহারিক রাজনীতিতে ঐ ঐস্লামিক জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারা মুসলমান সম্প্রদায়ের বিচ্ছিন্নতাবোধকে "পৃথক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ এক সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক অস্তিত্ব"র (পৃঃ ৭১) মাধ্যমে প্রকটতর করে তোলে।

ভারতীয় রাজনীতিতে মুসলমানদের গণভিত্তি স্থাপনে মহম্মদ আলীর ইতিবাচক অবদানের কথা মইন শকির বিস্মৃত হননি যদিচ সেই অবদানের পেছনে কার্যকরী প্রভাব ছিল ঐস্লামিক জাতীয়তাবাদী আদর্শের। মহম্মদ

আলীর শিক্ষা ও কার্যক্রমের ধারা বিচারের পর লেখকের অভিমত "এটা এক দুঃখজনক বাস্তব ঘটনা যে যাঁরা মহম্মদ আলীর কৌশল ও রণনীতি অবলম্বন করেছিলেন তাঁরাই পরবর্তীকালে 'পাকিস্তানের যুদ্ধ লড়েন এবং তাতে জয়ী হন'। (পৃষ্ঠা ৮৮)

আলোচিত দ্বিতীয় ব্যক্তিত্ব হলেন যশস্বী কবি মহম্মদ ইকবাল। মুসলমানদের রাজনৈতিক চিন্তাধারায় অঙ্গাঙ্গিভাবে বিজড়িত বিচ্ছিন্নতাকামী মনোবৃত্তির সার্থক অভিব্যক্তি তাঁর রাজনৈতিক দর্শন ও সৃজনশীল রচনায়। বর্তমান ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি ইকবালের প্যান-ঐস্লামিক চিন্তাদর্শন মুসলিম স্বাজাত্যবোধকে গভীরভাবে নাড়া দেয়।—'আদর্শ সমাজ কেবল পৃথক এক ঐস্লামিক রাষ্ট্রেই সম্ভব'—তাঁর এই বক্তব্য তাঁকে পাকিস্তানের সরকারী মুখপাত্রে পরিণত করে। ইকবালের দর্শনের অসঙ্গতি প্রসঙ্গে লেখক বলেছেন, "ইসলামের ঐতিহ্য ভেঙে বেরিয়ে এসে আধুনিক বিজ্ঞান ও সমাজতন্ত্রকে গ্রহণ করার জন্য প্রয়োজনীয় সাহস তাঁর ছিল না।" (পৃষ্ঠা ১২৩) বস্তুতই ইকবালের অসঙ্গতিগুলি এতই ব্যাপক যে কোনক্রমেই তাঁকে একজন নিয়মানুগ চিন্তাবিদ্ অথবা স্থিরপ্রজ্ঞা দার্শনিক বলা চলে না। "The storp of Iqubal's thought represents the tragedy of a great genius." (পৃষ্ঠা ১২৩)

জাতীয়তাবাদী ভারতীয় মুসলমান সমাজের শ্রেষ্ঠ নেতা মৌলানা আবুল কালাম আজাদের রাজনৈতিক ও ধর্মীয় দর্শনের বিশ্লেষণ রাজনৈতিক ঘটনাবলী ও ভারতীয় জাতীয়তাবাদের তত্ত্বের প্রতি তাঁর দৃষ্টিকোণের পরিবর্তনের এক আশ্চর্য ইতিহাস। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদবিরোধী চেতনা অনেক পরে আজাদের মনে জন্মলাভ করেছিল। প্রথম দিকে তিনি ছিলেন ধর্মভীরু, গোঁড়া মুসলমান। কিন্তু খিলাফৎ আন্দোলনের ব্যর্থতার পৃষ্ঠপটে একটি সত্য আজাদের হৃদয়ে বিশেষ আকারে দোলা দেয়—"ভারতের মুক্তির হাতিয়ার স্বরূপ আধ্যাত্মিকতাভিত্তিক রাজনীতি ও প্যান-ঐস্লামিক চেতনার ব্যর্থতা।" (পৃষ্ঠা ১৪৪) মইন শাকির দেখিয়েছেন কিভাবে "খিলাফৎ প্রতিষ্ঠানের উচ্ছেদ মহম্মদ আলীকে হতবিহ্বল করে তুলে ইকবালের মতো তাঁকে মুসলিম স্বাজাত্য বোধের দিকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল, অথচ আজাদকে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের কাছে এনেছিল।" (পৃষ্ঠা ১৪৫) আজাদের মতে ভারতীয় জাতীয়তাবাদ চরিত্রগত দিক থেকে হিন্দু ও মুসলমান সংস্কৃতির সংমিশ্রণে ধর্মনিরপেক্ষ। অত্যন্ত কঠোর ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি হওয়া সত্ত্বেও আজাদের ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি

তাঁর ধর্মীয় চিন্তাধারাকে অনেকাংশে প্রভাবিত করেছিল এবং তার ফলে ইসলাম সম্পর্কিত তাঁর বক্তব্য যুক্তিনির্ভরশীল হয়ে দাঁড়ায়। তিনি মনে করতেন, "সাম্প্রদায়িক ও জাতিগত বিদ্বেষ পরিহার করে ইসলাম জাতীয়তাবাদকে পুষ্টতনু করে তোলে।" (ডি. এস. মার্গোলিউথ : Muhammedenism পৃষ্ঠা ৭৫)। সাম্প্রদায়িক রাজনীতিতে বীতশ্রদ্ধ আজাদ এ-কথাও বিশ্বাস করতেন যে "হিন্দু-মুসলিম ঐক্য বাস্তবায়িত না হওয়া পর্যন্ত ভারতে জাতীয়তাবাদ অসম্ভব।" (পৃষ্ঠা ১৫২)। তিনি এমন-কি ভবিষ্যদ্বাণীও করেছিলেন যে "ভবিষ্যৎ বিন্যাসের ভিত্তি হবে সম্প্রদায় নয়, শ্রেণী এবং সেই অনুযায়ীই রাজনীতি নির্ধারিত হবে।"

বাঙলাদেশের বর্তমান মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিকায় উদ্ধৃতিটি বিশেষ গুরুত্বের দাবি রাখে।

মহম্মদ আলীর পরেই গ্রন্থে সর্বাধিক আলোচিত ব্যক্তি মহম্মদ আলী জিন্নাহ। মুসলিম চিন্তাধারার ধর্মনিরপেক্ষতা বিরোধী গতিস্রোত অনুধাবন করতে গিয়ে লেখক অভিনিবেশের সঙ্গে জিন্নাহ-র বিচ্ছিন্নতাকামী মুসলিম স্বাজাত্যবোধজাত রাজনৈতিক মত-দর্শনটি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আলোচনা করেছেন। বোম্বাইয়ের আইনজীবী জিন্নাহরও রাজনৈতিক দৃষ্টি পরিবর্তনের ইতিহাস লক্ষ্যণীয়। প্রথম দিকে সকল মুসলমান নেতৃবর্গের মধ্যে সর্বাধিক ধর্মনিরপেক্ষ ছিলেন জিন্নাহ্ স্বয়ং। সত্য ঘটনা হলো, সে-সময় তিনি ইসলামের প্রতি সবচেয়ে কম সময় মনোনিবেশ করতেন। জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও দেশের ঐক্য স্থাপনের আদর্শও তিনি গ্রহণ করেছিলেন মনেপ্রাণে। তাঁর ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গির জন্য তিনি খিলাফৎ আন্দোলনের প্রতিও আকৃষ্ট হয়নি। লেখকের মতে সে-যুগে "জিন্নাহ জাতীয়তাবাদ প্রসঙ্গে উগ্র হিন্দু দৃষ্টিকোণ অথবা মুসলমানদের বিচ্ছিন্নতাকামী বা সাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবাদ কোনটাকেই সমর্থন করতেন না। দেশপ্রমকে ধর্মের স্তরে তুলে আনা বা ধর্মকে দেশপ্রেমে রূপান্তরিত করা উভয় দৃষ্টিকোণের একটাও গ্রহণ করেননি কোনদিন।"

উপরোক্ত চিন্তাধারা কিভাবে পরিবর্তিত হলো, কিভাবে জিন্নাহ বিচ্ছিন্নতাকামী মুসলিম স্বাজাত্যবোধের সঙ্কীর্ণতায় আবদ্ধ হলেন তা দেখাতে গিয়ে লেখক ১৯৩৭ সালের নির্বাচনের কথা বিশেষ ভাবে উল্লেখ করেছেন। ঐ নির্বাচনের পর বহু কংগ্রেস নেতাই মুসলিম লীগের গুরুত্ব স্বীকার করতে প্রস্তুত

ছিলেন না। জিন্নাহ তখন কংগ্রেস নেতৃবর্গের এই মনোভাবকে রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জ স্বরূপ গ্রহণ করলেন, শুরু করলেন প্রচার: কংগ্রেস একটি হিন্দু সংগঠন, স্বরাজের অর্থ হবে হিন্দুরাজ, জাতীয় সরকার হয়ে দাঁড়াবে কার্যত হিন্দু সরকার। কংগ্রেসের কার্য পরিচালনা প্রসঙ্গে জিন্নাহ-র নিম্নোক্ত মন্তব্য ঐতিহাসিক বিচারে নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য—"একটি ফ্যাসিবাদী প্রধান পরিষদ এমন এক ডিক্টেটরের অধীনে যে ডিক্টেটর প্রতিষ্ঠানের চার আনা সদস্যও নন।" (জিন্নাহ-র সাম্প্রতিক ভাষণ ও লেখা, পৃষ্ঠা ৭১)।

পরবর্তী বছরগুলিতে জিন্নাহ সমগ্র শক্তি নিয়োগ করলেন তাঁর প্রিয় দ্বি-জাতিতত্ত্বকে আদর্শগত ও ধর্মীয় কাঠামোয় স্থাপনের উদ্দেশ্যে। রেখাপাত করলেন তথাকথিত এক 'সত্য'-এর উপর—"যেহেতু ভারতে মুসলমানরা একটি জাতি, তাঁদের স্বকীয় সংস্কৃতি ও পরিচয়গত বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণ করতেই হবে।" আজ সেই দ্বি-জাতিতত্ত্ব বাঙলাদেশের রণাঙ্গনে চিরকালের জন্য ধরাশায়ী।

১৯৩৮-এর পরে জিন্নাহ এ-বিষয়ে সুনিশ্চিত হলেন যে হিন্দুরা একটা স্থায়ী বৈরীভাবাপন্ন সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ হিসেবে "তাদের সংখ্যাগত শক্তির সাহায্যে দেশশাসন করবে এবং মুসলমানদের স্থায়ী দাসের পর্যায়ে অবনত করবে।" (পৃষ্ঠা ১৯৩)। সে-কারণেই পৃথক স্বাজাত্যবোধের ভিত্তিতে জিন্নাহ গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করলেন। "গণতন্ত্র প্রসঙ্গে তাঁর সমালোচনা শেষ পর্যন্ত জাতিভিত্তিতে মুসলমানদের জন্য পৃথক রাষ্ট্র গঠনের প্রকাশ্য দাবিতে পর্যবসিত হলো।" (পৃষ্ঠা ১৯৪)।

বর্তমান যুগের জনৈক "হঠকারী ধর্মতাত্ত্বিক" কর্তৃক পরিচালিত ঐশ্লামিক নয়া ধর্ম পুনরভ্যুদয়জাত জাগরণের পর্যালোচনা করা হয়েছে গ্রন্থটির পঞ্চম অধ্যায়ে। এই "হঠকারী ধর্মতাত্ত্বিক"-এর নাম আবুল আলা মওদুদী—বর্তমানে পাকিস্তানের জামাতে ইসলামী দলের প্রধান। ইসলামের বিশিষ্ট ব্যাখ্যাতা, দার্শনিক ও রাজনৈতিক চিন্তাবিদ মওদুদী পাকিস্তানের চরম প্রতিক্রিয়াপন্থীদের অন্যতম, সর্বপ্রধান বললেও বোধহয় অত্যুক্তি হবেনা। প্রতিক্রিয়াশীল দৃষ্টিকোণ থেকে ইসলামকে ব্যাখ্যা করে একসময় তিনি বলেছিলেন, নাৎসী দলের অনুকরণে যদি মুসলমানরা একটি দল গড়ে তোলে তাহলে কেবল ভারতের এক বৃহৎ অংশই নয়, পৃথিবীর এক ব্যাপক অঞ্চল মুস্লিম অধিকৃত হয়ে উঠবে এবং সেখানে সংখ্যাগুরু বা সংখ্যালঘুর কোনো প্রশ্ন থাকবে না (তরজমানুল কোরান,

ডিসেম্বর, ১৯৪৫)। কোরান বা খোদার আকাঙ্ক্ষার অজুহাত তুলে তিনি মুসলমানদের বৃটিশ-বিরোধী সংগ্রামে যোগ না দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছিলেন। তাঁর যুক্তি ছিল এই যে, যদি মুসলমানরা এহেন কোনো সংগ্রামে যোগ দেয় তাহলে ইংরেজরা ইসলাম থেকে দূরে সরে যাবে। ইসলামের ধর্মতত্ত্ব সংক্রান্ত সমস্যাবলীর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মওদুদী কখনও হজরত মহম্মদের সমকালীন সামাজিক, রাজনৈতিক ও আর্থনীতিক প্রতিষ্ঠানের এ-যুগের পটভূমিতে প্রয়োজনীয়তা এবং তাৎপর্যকে প্রশ্ন করেননি। তিনি বিশ্বাস করতেন, "ঐস্লামিক সমাজে কোনো বুর্জোয়া বা প্রলেতারিয়েত নেই এবং এই আর্থনীতিক ব্যাখ্যা মুস্লিম সংহতির পক্ষে আঘাতস্বরূপ।" (মওদুদী "মুসলমান আউর মাউজুদা সিয়াসী কাশমাকাশ", প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৯)। মওদুদীর প্রধানতম উদারনৈতিক সমালোচক মহম্মদ সারওয়ার পাকিস্তানে 'ঐস্লামিক রাজনৈতিক সংগঠন'-এর পুনরভ্যুদয় সম্পর্কে সতর্কবাণী উচ্চারণ করে বলেছেন, কোরান ও হাদিসকে যেভাবে মওদুদী ব্যাখ্যা করেছেন তা ব্যবহারিক দিক থেকে বিভেদ-মূলক এবং আজকের সামাজিক রাজনৈতিক দাবিসমূহের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন। মওদুদী সম্পর্কে মইন শাকির খুবই কঠোর ভাষা ও ধিক্কারমিশ্রিত উক্তি প্রয়োগ করেছেন, "মওদুদীর ব্যক্তিত্বে আত্ম-শ্লাঘা, আধুনিক বিজ্ঞান সম্পর্কে অজ্ঞতা, কুসংস্কার ও সঙ্কীর্ণ ধর্মতত্ত্বের বিষয়ে গোঁড়ামি এবং ক্ষমতালোলুপ রাজনীতিবিদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা সম্মিলিত"—মইন শাকিরের এই বিশ্লেষণ মওদুদীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলি যথার্থভাবে তুলে ধরেছে। তাই এই মুহূর্তে মওদুদী যে বাঙলাদেশে ইয়াহিয়ার গণহত্যার সপক্ষে তাঁর পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছেন তা মোটেও আশ্চর্যের বিষয় নয়।

গ্রন্থের সর্বশেষ অধ্যায়টিতে ১৯১৯ থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত গবেষণার সমগ্র সময়কালের সমীক্ষা এবং পরবর্তী ভারতে মুস্লিম রাজনৈতিক চিন্তাধারা যে-পথে প্রবাহিত হলো তার রূপরেখা দেওয়া হয়েছে। "রাজনৈতিক চিন্তাধারার প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য ইসলামের অনমনীয় এক গোঁড়াপন্থী ব্যাখ্যার মধ্য দিয়েই নির্ণিত হয়েছিল। ফলে রাজনীতির মধ্যে প্রবেশ করল ধর্ম এবং ধর্ম রাজনীতি নির্ভর হয়ে পড়ল। এর পরিণতিতে যা হলো তা আধুনিক বিচারে নিরপেক্ষতাও নয় আবার মূলগত বিচারে ধর্মভীরুতাও নয়।" (কমলা দেবী : At the Cross Roads", পৃষ্ঠা ৭১)। ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গির অভাব পৃথক মুস্লিম রাষ্ট্র কায়েমের আন্দোলনেই সুপরিস্ফুট। ঐ আন্দোলন

ছিল "একাধারে ভারতীয় ও মুসলমান ভারতীয় মুস্লিমের দ্বৈত চরিত্রের দ্বন্দ্ব নিষ্পত্তির ব্যর্থতার স্বীকৃতি" (পৃষ্ঠা ২৭০)।

মুসলমানদের বিচ্ছিন্নতাবোধ খিলাফৎ আন্দোলনেও প্রবল ছিল। লেখকের ভাষায় "যথার্থ অর্থে খিলাফৎ কমিটিগুলি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের শাখা ছিল না। কংগ্রেসের নামে বা কংগ্রেসের সহযোগিতায় কাজ করলেও এই 'শাখা'-গুলি কাজের সময় স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বজায় রাখত। একথা বলতেই হবে যে এসব কিছু পৃথক মুস্লিম রাষ্ট্রের দাবি প্রশস্ত করে দিয়েছিল" (পৃষ্ঠা ২৭১)। লেখক অবশ্য মুসলমান চিন্তাধারায় আমূল সংস্কারের পক্ষপাতী মতাদর্শের উন্মেষ লক্ষ্য না করে পারেননি। ঐ চিন্তাদর্শের মুখ্য ব্যাখ্যাতা ছিলেন মৌলানা সিন্ধী। ভারতের মুসলমানদের বর্তমান সমস্যাবলী বিবৃত করে লেখক বলেছেন "আমাদের আশার উৎস, সম্প্রদায়ের জীবন ও প্রগতি বর্ধনের জন্য এই সকল উগ্র প্রতিক্রিয়া এবং জ্ঞান ও সংস্কার প্রসারে বাধাদানকারী শক্তিকে নিয়ন্ত্রিত করা" (পৃষ্ঠা ২৭৯)।

গ্রন্থ শেষে সমৃদ্ধ গ্রন্থ-তালিকা এবং বিষয়াবলীর বর্ণানুক্রমিক সূচি ছাড়াও, মুস্লিম চিন্তাধারাগত যে সকল প্রশ্ন আজকের পটভূমিতে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সেগুলির সার্থক বিশ্লেষণের জন্য গ্রন্থটি গভীরভাবে আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। লেখক এই আশা প্রকাশ করেছেন, "যাতে জাতি ও ধর্মগত বিভেদগুলি রাজনৈতিকভাবে সময়োপযোগী বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলে" সেজন্য মিলিত নাগরিকত্ববোধের চেতনা গড়ে উঠবেই। বাঙলাদেশে মুক্তি সংগ্রামের পৃষ্ঠপটে ধর্মনিরপেক্ষ জনজাগরণে আজ তারই ইঙ্গিত।

গার্গী চক্রবর্তী

লেনিন শতাব্দী, সম্পাদনা—শ্রীদীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। মনীষা। ২টাকা

শ্রীদীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'লেনিন শতাব্দী' সাম্প্রতিক কালের একটি পরম উপাদেয় কাব্যসঙ্কলন। বিগত রুশ বিপ্লবের পঞ্চাশোত্তর বর্ষ থেকেই লেনিন নামাঙ্কিত অজস্র কবিতা বাঙলা ভাষায় লেখা হতে থাকে। তার আগের কবিতাসংখ্যা অবশ্যই এত বেশি ছিল না। উদাহরণ স্বরূপ উদ্ধৃত

করা যায় কবি শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্যের নাম যিনি সর্বপ্রথম লেনিনের উদ্দেশ্যে তথা সদ্য অনুষ্ঠিত বিপ্লবের উদ্দেশ্যে বাঙলা ভাষায় একটি সুদীর্ঘ কবিতা নিবেদন করেন। (পৃষ্ঠা ১০ লেনিন শতাব্দী) এ-কবিতাটি নিঃসন্দেহে ঐতিহাসিক ক্রমানুসারে সর্বপ্রথম মুদ্রিত হতে পারত। সম্পাদকের বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে নজরুলের কবিতাটি প্রথম ও শ্রীসুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতাটি শেষে যথাক্রমে সংযোজিত করেছেন—তা হয়ত পাঠক সকলে ঠিক এইভাবে গ্রহণ করবেন না। কিন্তু ঐতিহাসিক ক্রমানুসারে সর্বজনগ্রাহ্য হওয়াতে —আমাদের মনে হয় এরূপ গ্রন্থের সম্পাদনা সে-ভাবে হলেই অধিকতর বিজ্ঞানসম্মত নির্বাচন বলে গ্রাহ্য হতো। তা সত্ত্বেও— লেনিন শতাব্দীতে এরূপ একটি সঙ্কলন প্রশংসনীয় উদ্যম বলে নিঃশন্দেহে বলা যায়। এ গ্রন্থের পূর্বগামী আরো দুটি সঙ্কলনের উল্লেখ করে সম্পাদক অগ্রসর হয়েছেন। তাদের একটি শ্রীতরুণ সান্যাল ও শ্রীগণেশ বসু সম্পাদিত 'লেনিনের যুগ' ও অন্যটি হলো শ্রীবীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 'খাড়া পাহাড় বেয়ে'। সম্পাদকের ভূমিকাটি অত্যন্ত সুলিখিত।

সম্পাদকের কথাতেই স্বীকার করা যায় "আমাদের মহিয়সী ভাষায় সম্ভবত রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কোনো ব্যক্তির উদ্দেশ্যে এত কবিতা নিবেদিত হয়নি" কথাটি নানা দিক দিয়ে সত্য। লেনিন ব্যক্তি হলেও তিনি একটি যুগের স্রষ্টা— সে-হিসাবে সেই যুগও তাঁর মধ্যে বিবৃত এবং তার প্রকাশকও। অপর পক্ষে লেনিন একটি পথও। সেদিক দিয়ে সোভিয়েত ভূমিতে নবাঙ্কুরিত সাম্যবাদ ও তার প্রাপক ও পোষক Ethics হিসাবেও লেনিন স্বীকৃত। শুধু স্বীকৃত বললে ঠিক বলা হয় না—অঙ্গীকৃত ও একাত্ম। এই গ্রন্থোক্ত সকল কবিতাই লেনিনকে ছুঁয়ে না গেলেও কোনো-না-কোনোভাবে লেনিন সম্পর্কিত। এছাড়াও লেনিনীয় সত্তা ও তার প্রকাশজ্যোতি বহু দেশে ও প্রবহমান কালের প্রসারে আজও চিরায়িত। সাধারণভাবে যে বিশেষ-বিশেষ ভাব ও ব্যঞ্জনা আমাদের কাব্যাদর্শের মধ্যে গৃহীত হয়—সেরূপ সকল প্রকার রসই লেনিন ও তাঁর সহচারী ভাবনাধারা থেকে আমরা পেতে পারি বা পেয়ে থাকি। এদিক দিয়ে দেখলে লেনিনকে নিয়ে বা তাঁর কার্যকলাপ নিয়ে লেখার প্রবাহধারাকে কাব্যাদর্শের দিক থেকেও অক্ষুণ্ণ। হয়তোবা জনসমাজের জাগ্রত মানসের প্রকাশচেতনা—সেই উৎস থেকে প্রাণরস আহরণ করে বলেই লেনিনসত্তা আমাদের কাছে এত স্পষ্ট প্রতীয়মান।

সর্বশেষে আর একটি কথাও বলার থাকে। লেনিন বিশ্বের এক যুগস্রষ্টা বা মন্ত্রদ্রষ্টা, কেবলমাত্র এ-তথ্য পরিবেশনের দ্বারাই কাব্যের সৃষ্টি হয় না। কাব্য সৃষ্টিধর্মী বলেই তার রসব্যঞ্জনার সার্থকতা। সেদিক দিয়ে দেখলেও আলোচ্য সঙ্কলনের কবিতাগুলি খুব সার্থক। এক একটি কবিতা সোজাসুজি অন্তরে আঘাত করে আর তার স্পন্দন দীর্ঘায়িত হ'তে থাকে (দ্রঃ লেনিন দিবসের গল্প, অরুণ চট্টোপাধ্যায়—পৃষ্ঠা ১১৯)। মানুষের আশার রিক্ততা বেদনার যুগযুগান্ত ব্যাপী স্থায়িত্বের অভিঘাতেও তিক্ত বা রিক্ত হয়ে যায় না, এ-কবিতা সেই সত্যটিই ব্যক্ত করে। তার সঙ্গেসঙ্গে লেনিন দিবসের সমারোহ শুদ্ধ এক নিরক্ষর দরিদ্রতম শ্রমিকের স্বল্পপরিচিত জগতের নিদারুণ শূন্যতা আমাদের কাছে প্রকট হয়ে ওঠে। আর, তারও পরে অভিব্যক্ত হয় নিঃস্ব রিক্ত আশাহীন মানুষের স্নিগ্ধতম অন্তরের একটি উজ্জ্বল শ্রদ্ধানিবেদন, যা সে হয়ত উদ্দিষ্ট যে কে তা না জেনেই করছে। মানুষটিই আমাদের কাছে সত্য হয়ে উঠে। লেনিন দিবসের সমারোহ হয়ে ওঠে, আপেক্ষিকভাবে নিষ্প্রাণ নির্জ্জীব। বহুক্ষণ কবিতাটির নিহিতার্থ পাঠককে আলোড়িত করে রাখে। এমন কবিতা আরও অনেক আছে। সকল কবিতার মূল্যায়ন এ-ক্ষেত্রে স্বল্প পরিসরের মধ্যে সম্ভবপর না।

বাঙলাভাষার পাঠক সমাজের কাছে এ-সঙ্কলনগ্রন্থ বিশেষভাবে সমাদৃত হবে এ-কথা বিনা দ্বিধায় বলা যায়। সম্পাদক এজন্য আমাদের কৃতজ্ঞতা ভাজন।

অরুণা হালদার

বাঙলাদেশ ঃ দুটি চিত্র প্রদর্শনী

বিষয়ভিত্তিক প্রদর্শনী হতে পারে দুভাবে। এক, নামে, যেখানে নামের সঙ্গে চিত্রের যোগাযোগ নেই; দুই, নাম ও বিষয় যেখানে অভেদ। প্রথম ক্ষেত্রের প্রদর্শনী যেহেতু শুধুই নামে তাই শিল্পীকে তেমন ভাবতে হয় না, তিনি নিজস্ব একটি শিল্পকর্ম হস্তান্তর করেই খালাস। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে শিল্পীকে ভাবতে হয়। তার নিজস্ব ধারাকে বজায় রেখে বিষয়কে ফুটিয়ে তুলতে হবে, এই এক বাধা। দ্বিতীয় বাধা, যে বিষয় নির্বাচন করা হয়েছে তা শিল্পীকে যদি না ভাবায় কাজ হবে না, হলেও হবে জোর করে। এ-ব্যাপারে শিল্পীর ভীষণ অনীহা। শিল্পীকে দিয়ে জোর করে কিছু করান যায় না। আর সাধারণভাবে ধরেও নেওয়া হয় জোর করে ভালো শিল্পকর্ম হয় না। এ-ছাড়া প্রদর্শনীর আর একটা খুঁত বেরনোর কারণ ঘটতে পারে, শিল্পী নিজের ডেরায় কাজ করলেও যখন সবার শিল্পকর্ম একত্র করা হলো দেখা যায় প্রায় ক্ষেত্রেই ভীষণ মিল। ফলে প্রদর্শনীতে একঘেঁয়েমি এসে যায়।

বাঙলাদেশে পঁচিশে মার্চের গণহত্যার পর যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে বাঙালি মাত্রকেই তা করেছে ক্ষুব্ধ, ব্যথিত, বিদ্রোহী, সৈনিক। শিল্পী সাধারণ মানুষের চেয়ে সংবেদনশীল, তাই তাকে এই বিষয় স্পর্শ করবে না এমন ধারণা অমূলক। কিভাবে স্পর্শ করেছে তারি প্রকাশ বাঙলাদেশভিত্তিক চিত্রপ্রদর্শনীতে। দুটি প্রদর্শনী পৃথকভাবে হয়েছে। একটি, বাঙলাদেশের চিত্রশিল্পী, যাঁরা ভারতে আশ্রয় নিয়েছেন তাঁদের, দ্বিতীয়টি পশ্চিমবঙ্গের শিল্পীদের।

চিত্রপ্রদর্শনী দুটির বেশ কিছু খুঁত রয়ে গেছে, তবে বিষয়ের ক্ষেত্রে শিল্পীকে কষ্টকল্পিত কিছু করতে হয়নি। বাঙলার ছেলে দেশের যুদ্ধক্ষেত্রে রক্ত ঢালছে, এই প্রদর্শনী সেই যুদ্ধেরই অংশ। শিল্পী-হৃদয়ের উষ্ণতায় অবশ্য সব খুঁত ঢাকা পড়ে যায়।

প্রতিটি সমাজে শিল্পীর অনুপাত ভীষণভাবে কম। শিল্পসৃষ্টির ক্ষমতা নিছক চর্চার ফলে সব সময় অর্জন করা যায় না। এর একটা সত্তা বা ইনটুইটিভ ভিত্তি আছে, যা না থাকলে হাজার চেষ্টাতেও শিল্পী হওয়া যায় না।

শিল্পীমানসের অন্যতম চারিত্র্য তার অতিসংবেদনশীলতা। তাই সমাজে সাধারণ লোককে একটা ঘটনা দেখা যত দোলা দেয় শিল্পীকে দোলা দেয় তার অনেক গুণ বেশি।

শিল্পের জন্মইতিহাস মানুষের বা সমাজের প্রয়োজনে। সমাজের ক্রম উন্নয়নের বিশেষ এক পর্যায়ে এসে শিল্পের সেই তাৎক্ষণিক প্রয়োজন দূরে সরে গেছে, এখন তা ক্রমশ নন্দনতত্ত্বের আওতায় গিয়ে পড়েছে। যান্ত্রিক উন্নয়ন, বিশেষিকরণ ইত্যাদি পরিবেশ, শিল্পীকে করে তুলেছে বিশিষ্ট ও পৃথক। তার পূর্বের সেই সামাজিক দায়-দায়িত্ব এখন সে অতটা পালন করে না। তবু সমাজে এমন একটা সময় আসে, এমন একটা ঝড় ওঠে যা শিল্পীকে গজদন্ত মিনার থেকে যুদ্ধক্ষেত্রে ঠেলে দেয়। যখন শিল্পীর শিল্পচর্চার উপকরণ, পরিবেশ, মানসিকতা সব কিছুর অভাব, তখনতো আর শিল্পী আর দশটা মানুষের মতো না হয়ে পারে না। শান্ত পরিবেশে সবাই যখন সূক্ষ্ম শিল্প উপভোগ করতে চায়, যুদ্ধ ও আপতকালীন সময়ে সেই একই সুকুমার কলা অপাংক্তেয়। পরিবেশ ও প্রেক্ষিতের বদলে একই জিনিষ আদরণীয় ও অপাংক্তেয় হয়ে দাঁড়ায় শিল্পীর দায়িত্বেরও তেমনি হেরফের ঘটে। শিল্পীর শ্রেণীচরিত্র এবং এদেশে বিশেষ করেই যা মধ্যবিত্ত শ্রেণীভুক্ত, সেক্ষেত্রে তার দায়িত্ব আরো বেশি। তার অস্তিত্বের বজায় ও শ্রেণীচরিত্র বজায় রাখার টানাপোড়েন তাকে আরো সজাগ করে তোলে।

প্রায় শিল্পীর ক্ষেত্রেই সামাজিক বাস্তববাদ কাজ করে। এমনকি মার্কিন মুল্লুকেও এর ব্যতিক্রম নেই। বিশেষ করে এ্যাকশন স্কুল এর প্রতিভূ। বেন স্যাহান তাঁর চিত্রে শহর এবং শহুরে জীবনে দেয়াল ও বিভিন্ন যান্ত্রিক কাঠামোর মানুষের বন্দী অবস্থা ফুটিয়ে তুলেছেন। তারি সাথে যোগ করেছেন বাল্যের সেই রূপকথার দেশের অধ্যায়। বৃটিশ শিল্পী বেকনও সমাজবাস্তববাদের অন্যতম ধারক। পিকাসোর নীল এবং গোলাপি-যুগও পড়ে এই পর্যায়ে। এই সব চিত্রে সমাজের বাধাবন্ধন, অবিচার-অত্যাচারের ছবি তুলে ধরা হয়। কিন্তু সে-বন্ধন মুক্ত হয়ে নূতন জীবন গড়ার আন্দোলনকে প্রত্যক্ষভাবে তেমন সাহায্য করে না। তাই চাই সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদ। রাশিয়ান সাহিত্যিক গোর্কি এর প্রবক্তা। তাঁর অভিমত, সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনকে সাহায্য করে এমন শিল্প সৃষ্টি করা শিল্পীর অন্যতম কর্তব্য। গোর্কির বিখ্যাত উপন্যাস 'মা' এর জলন্ত নিদর্শন।

শিল্পী কোনো 'ইজম' করবে, বা কোনো ইজম করবে না কিনা, সেটা ঠিক শিল্পীকে বলে করান যায় না। এ-প্রসঙ্গ ব্যক্তিশিল্পীর নিজস্ব দায়িত্বের উপর ছেড়ে দেওয়া ছাড়া উপায় নেই। তবে একটা জিনিষ বলা যায়, সামাজিক বাস্তববাদ বা সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদ নিয়েও ভালো শিল্পকর্ম করা যায়। মূলকথা, শিল্প হতে হবে।

দুই বাঙলার শিল্পীরা চিত্রশিল্পে কতটা সামাজিক দায়িত্ব পালন করেন সে হিসাব না নিয়ে একটা কথা বলা যায়, কোনো সামাজিক বা রাজনীতিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে শিল্পীরা পেইন্টিং ছেড়ে পোস্টার করে দিয়েছেন। বিশেষ করে বাঙলাদেশ-চিত্রশিল্পীরা প্রতিটি রাজনীতিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে রাতদিন খেটে হাজার-হাজার পোস্টার-ব্যানার-ফেস্টুন এঁকে দিয়েছেন। এ-ভাবে তারা তাঁদের ক্ষমতাকে সমাজের তাৎক্ষণিক প্রয়োজনে কাজে লাগিয়েছেন। পিছিয়ে থাকেননি বা বিরক্তি প্রকাশ করেননি। তাঁদের সুকুমার কলায় সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদের প্রভাব তেমন বিশেষভাবে কাজ না করলেও তাঁরা তাদের গতরের শ্রম দিয়ে আন্দোলনে কাজ করে গেছেন। এখানেই বাঙলাদেশের শিল্পীদের বিশিষ্টতা।

প্রথম প্রদর্শনী : বাঙলাদেশ-শিল্পীদের

বাঙলাদেশ-শিল্পীদের প্রদর্শনীতে সতের জন শিল্পী অংশ গ্রহণ করেন। তার মধ্যে তিনজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ। কামরুল হাসান, দেবদাস চক্রবর্তী ও নিতুন কুণ্ডু বাদে বাকী সবাই হয় ছাত্র, নয় মাত্র শিক্ষাজীবন শেষ করেছেন, আবার কিছু শিল্পী তাঁদের ব্যবহারিক জীবনে সুনাম কিনেছেন, চিত্রশিল্পে তেমন সার্থকতা লাভ করেননি। এই প্রদর্শনী ঠিক বাঙলাদেশের শিল্পীদের মূল অংশকে তুলে ধরে না। তাই গুণগতভাবে এর মান উঁচু না হওয়াই স্বাভাবিক। তবু এর সদর্থক দিকটিকে তুলে ধরা কর্তব্য।

বাঙলাদেশের শিল্পীরা প্রত্যেকে গৃহছাড়া। প্রাণভয়ে এসে আশ্রয় নিয়েছেন ভারতে। তাঁদের আত্মীয় স্বজন রয়ে গেছে দেশে। এই যুদ্ধকালীন মানসিকতায় কতদূর সার্থকশিল্প সৃষ্টি করা যায় প্রশ্নসাপেক্ষ। উত্তেজনা শিল্পীকে তার উৎকর্ষ লাভ থেকে ব্যাহত করে। উত্তেজনা প্রশমিত হয়ে গেলেই বড় শিল্পসৃষ্টি সম্ভব হয়। কিন্তু আমাদের বাঙলাদেশের শিল্পীরা এই নীতির ব্যতিক্রম। শিল্পীদের আত্মীয়-স্বজনের মাথার উপর খাঁড়া ঝুলছে, সেইরকম এক পরিস্থিতিতে যুদ্ধের প্রয়োজনে এবং যুদ্ধ মনে করে বলিষ্ঠ হাতে শিল্পীরা

তুলি তুলে নিয়েছেন। বিশেষ করে শিল্পী কামরুল হাসান এই প্রদর্শনীতে তাঁর প্রতিভার স্ফুরণের যথাযথ নিদর্শনই শুধু রাখেননি তিনি তাঁর পূর্ব সুনাম ও দক্ষতাকে বিপুলভাবে ছাড়িয়ে গেছেন। কামরুল হাসান তাঁর শিল্পকর্মে লোক শিল্পের মোটিফকে কাজে লাগিয়ে কাজ করে এসেছেন এতদিন। লোকশিল্পের মোটিফ কাঠের পুতুলকে মনুষ্যমূর্তির প্রতিভূ হিসেবে কাজে লাগানোয় একটা জড়তা ছিল। এ-ছাড়া তাঁর কাজ বিশেষ একটা জায়গায় এসে পুনঃ পৌনিকতায় ভুগছিল, সেই গণ্ডিকে তিনি এবারে এক ধাক্কায় ভেঙে ফেলেছেন। স্বসৃষ্ট গণ্ডির অচলায়তনকে ভেঙে তিনি এই প্রথম তাঁর চিত্রে সঞ্চারণ এবং প্রচণ্ডতাকে জায়গা দিয়েছেন। 'বাঙলাদেশ কম্পোজিশন' এক ও দুই, এই চিত্র দুটি তার সাক্ষ্য। একটিতে একসার কঙ্কালের ঘূর্ণায়মান অবস্থা, দ্বিতীয়টিতে যেন কোনো অদৃশ্য সার্কাসের চালক এক সার প্রাণীকে ঘূর্ণায়মান অবস্থায় খেলিয়ে চলেছেঃ বাঙলার প্রতিটি প্রাণী, নিরীহ প্রাণী সব যেন ঝাঁপিয়ে পড়েছে কোনো এক অদৃশ্য শত্রুর উপর। আর সেই অদৃশ্য শত্রুটি কে, আমরা জানি, ইয়াহিয়া-টিক্কার হায়েনাগুলো। বাঙলার নিরীহ চাষীও আজ রাইফেল কাঁধে তুলে নিয়েছে। এই নিরীহ লোকটিকেই শিল্পী নিরীহ প্রাণীদের প্রতীকে কাজে লাগিয়েছেন। তাঁর এপ্রিলের পূর্ণিমার চাঁদ রক্তমেখে রাতের চেহারা দেখে শিউরে শিউরে উঠছে, ভূমিতে ধর্ষিত বঙ্গজননীকে দেখে। নীলের প্রাধান্য চিত্রের বক্তব্যকে আরো বাঙময় করে তুলেছে। রঙের বিন্যাসে শিল্পী যথেষ্ট মুন্সীআনার পরিচয় দিয়েছেন এবং তার পূর্বের রঙের বিন্যাস থেকে অনেকটা সরে এসেছেন। লোকশিল্পের প্রাথমিক রঙের বদলে এবার তিনি মিশ্ররঙ ব্যবহার করেন। শিল্পীর মানসিকতাকে স্পষ্টভাবে ধারণ করে আছে ক্যানভাসগুলো।

দেবদাস চক্রবর্তী বাঙলাদেশের অন্যতম প্রতিষ্ঠাবান শিল্পী। তাঁর চিত্রেও লোকমোটিফকে কাজে লাগান হয়েছে। কালীমূর্তি, খড়্গ ইত্যাদি সব কিছু মিলিয়ে শিল্পীর ক্ষিপ্রতা ও জিঘাংসার পরিচয় মেলে। কিন্তু শিল্প উপাদানগুলো চিত্রে যথেষ্ট সম্পৃক্ত হয়নি।

নিতুন কুণ্ডু তাঁর ক্যানভাসে রঙের ব্যবহারে দক্ষ। কিন্তু তাঁর প্রকাশ বড় শীতল। মোস্তফা মনোয়ার তাঁর চিত্রে কার্টুনের প্রাধান্য দিয়ে শিল্পগুণকে ক্ষুণ্ণ করেছেন।

প্রাণেশ মণ্ডল ইলাসট্রেটিভ চরিত্র দিয়ে চিত্রগুণ অক্ষুণ্ণ রাখতে পারেননি।

একেবারে তরুণদের মধ্যে বীরেন সোম এবং স্বপন চৌধুরী যথেষ্ট কৃতিত্বের দাবিদার। বিশেষ করে স্বপন চৌধুরীর ড্রইং। এ-ছাড়া গিয়াসুদ্দিনের জল রং চিত্র সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

দ্বিতীয় প্রদর্শনী পশ্চিমবঙ্গের শিল্পীদের

এ-প্রদর্শনীতে পশ্চিমবঙ্গের নামকরা প্রায় সব শিল্পী অংশ গ্রহণ করেন। চিত্রের সাথে কয়েকটি ভাস্কর্য-কর্মও জায়গা পায়, তবে মূলত চিত্র প্রদর্শনী। প্রদর্শনীর নির্বাচন আর একটু সুষ্ঠু হলে মান আরো বাড়ত। অবশ্য বাঙলাদেশ পরিস্থিতি এমনি এক ঘটনা বা ঘটনার চেয়েও বেশি, যেখানে কড়াকড়ির স্থান থাকে না।

পশ্চিমবঙ্গের প্রদর্শনী দেখে এ-কথাই মনে হয়, কি কৃত্রিম একটা বেড়া দিয়ে দুটি বাঙলার সৃষ্টি করা হয়েছে। দ্বিজাতিতত্ত্ব কি ভীষণভাবে একটা ফাঁকা বুলি। বাঙলাদেশের শিল্পীদের সাথে মানসিকতায় কি গভীর একাত্মতা পশ্চিমবঙ্গের শিল্পীদের। বাঙলাদেশ আক্রান্ত হওয়া যেন এ-বাঙলার নিজের গায়ে আঘাত পড়া। আর শিল্পীর ক্ষেত্রে তা মনে আঘাত লাগা। বাঙলাদেশের শিল্পীদের মতোই এঁরা ক্ষিপ্ত, বেদনাহত, গণহত্যার বীভৎসতায় পীড়িত। ভায়ের জন্যে ভায়ের যে বেদনা, এক সহোদর যেমন আর এক জনের জন্যে কাঁদে, তেমনি ক্রন্দন, তেমনি মুহ্যমান, আবার ক্ষেপে গিয়ে সৈনিক। অলোক কুমার ভট্টাচার্যের 'বিপ্লবের জন্ম' চিত্রে একই সংঙ্গে নব-বাঙলাদেশের জন্ম, দেবতার আশীর্বাদ ও সাধারণ চাষীর রাইফেলধারী বেশ, যথার্থ প্রকাশ।

অন্যতম উল্লেখযোগ্য বিষয়, শিল্পী শ্রীমতী মধু পারেখের পোস্টারটি। কালো পটভূমির উপরের অংশে একটি বোমারু বিমানের অধ্যাস। মাঝে ইংরাজিতে লেখা, 'নিরীহদের হত্যা বন্ধ কর'। নিচে ভূমির শাদায় পাঞ্জাবী লোকশিল্পীদের দেয়াল চিত্রের মাটিতে আঁকা বাঙলাদেশের প্রাণীসমূহ। তাদের নিরীহ ভঙ্গি শিল্পীর হাতে অপূর্ব হয়ে ধরা পড়ে।

বেশির ভাগ চিত্রে পরাবাস্তববাদকে আশ্রয় করা হয়েছে। এই সুররিয়্যাল ট্রিটমেণ্টের ফলে বাঙলাদেশে হত্যাকাণ্ডের বীভৎসতা সুষ্ঠুভাবে ফুটে উঠেছে। সুনীল দাসের 'ধ্বংসলীলা' চিত্রে সাদা কালোয় আঁকা মনুষ্যদেহী বীভৎস মাংসপিণ্ডের প্রকাশ যথার্থ। এই চিত্রের কেন্দ্রে ঝুলে রয়েছে একটি হাত। এই কোলাজচিত্রটি পরাবাস্তববাদী হলেও যথেষ্ট প্রতীকবাদী। রক্তকলুষিত

হাতটি যেন পাকিস্তানের কেন্দ্রের হাত, ইয়াহিয়ার হাত। পরাবাস্তববাদীকে যথেষ্ট ব্যবহার করলেও মূলত প্রদর্শনীর চরিত্র দাঁড়িয়েছে প্রকাশবাদী বা এক্স-প্রেশানিষ্টিক। গণেশ পাইনের 'বন্দর' চিত্রটিও তাই।

গোপাল ঘোষ তাঁর জলরং চিত্রে কালো পটভূমিতে রক্তরঙ সূর্যকে উঠতে দেখছেন। শিল্পী চাতুর্যের সঙ্গে জলরংকে ওপেক করে, তাঁর বক্তব্যকে আরো বাঙময় করেছেন। শৈলেন মিত্র 'লক্ষ্যবিন্দু' চিত্রে পোলক কায়দায় যথেষ্ট নিজস্বতা রেখেছেন। পোলকের ঘূর্ণায়মান ফোর্সকে একটা কাঠামো দান করে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। মনু পারেখ (মিশ্র রীতির কাজ) তাঁর চিত্র 'নতুন আলো'-য় চাপা রঙের মধ্যে একটা দূরাগত আলোর অধ্যাস এবং কাঠামোয় যথেষ্ট মুন্সীয়ানার পরিচায়ক। বরেণ বসুর তলকে টুকরো টুকরো ভাগ করে করা 'বাঙলাদেশ ১৯৭১' চিত্র যথেষ্ট বলিষ্ঠ। রবীন মণ্ডল তাঁর 'শিকার' চিত্রে বাইজেনটাইন রঙিন কাঁচের ব্যবহারের মতো ক্রাইস্ট ও ক্রসের ভেঙে-ভেঙে জ্যামিতিক প্রকাশে দক্ষতা দেখিয়েছেন। যীশু, সেই সরল মানুষটিকে যে-ভাবে হত্যা করা হয়েছে, 'বাঙলাদেশে' বাঙালিদের তাই করা হচ্ছে। এদিক থেকেও চিত্রটি যথেষ্ট অর্থবহ। ঈশা মহম্মদের 'পলায়ন' চিত্রটি 'মুনশ' কায়দায় যথেষ্ট দৃষ্টি আকর্ষণকারী। বিকাশ ভট্টাচার্যের 'বাঙলাদেশে'র প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। স্পে-ধারায় করা এই চিত্রে পুতুলটি নিরীহ বাঙালিদের ভাগ্যের প্রতিমূর্তি যেন। এই পুতুলের মতোই তারা গোটা বিশ্বে পরিত্যক্ত।

স্থাপত্যে চিন্তামণি করের 'পুনর্জন্ম' বিশেষ অর্থবহ। দিলীপ সাহার কাজে রাইফেলের আকারকে যথেষ্ট দক্ষতার সঙ্গে কাজে লাগান হয়েছে। নিরঞ্জন প্রধান ও প্রভাস সেনের কাজ দুটিও দৃষ্টিআকর্ষণকারী।

প্রায় পঞ্চাশ জনের এই প্রদর্শনীতে আরো কিছু কাজ দৃষ্টি আকর্ষণ করে : অমিতাভ ব্যানার্জি, সনৎ কর, নিরোদ মজুদার, গণেশ হলোই, শুভ প্রসন্ন ভট্টাচার্য প্রমুখের কাজ উল্লেখযোগ্য।

দুটি প্রদর্শনীর আয়োজন করেন 'বাঙলাদেশ সহায়ক শিল্পী-সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবী সমিতি।' বাঙলাদেশ শিল্পীদের প্রদর্শনী : ১লা সেপ্টেম্বর থেকে ১৩ই সেপ্টেম্বর ; পশ্চিমবঙ্গের শিল্পীদের প্রদর্শনী : ১৪ই সেপ্টেম্বর থেকে ২৬-এ সেপ্টেম্বর ১৯৭১। স্থান : বিড়লা এ্যাকাডেমি অব আর্ট এ্যাণ্ড কালচার কলকাতা—২৯।

বুলবন ওসমান

বহুরূপীর পাগলা ঘোড়া

বহুরূপীর গত পাঁচটি প্রযোজনার মধ্যে তিনিটি শ্রীবাদল সরকারের নাটক। একটির নাট্যকার শ্রীকুমার রায়, আর একটির শ্রীনীতীশ সেন। এর মধ্যে তিনটির প্রযোজনার দায়িত্বে ছিলেন শ্রীশম্ভু মিত্র (বাকি ইতিহাস, বর্বর বাঁশী, পাগলা ঘোড়া)। দল হিসেবে বহুরূপী এবং প্রযোজক হিসেবে শ্রীশম্ভু মিত্র কিছুদিন ধরেই সমকাল ও স্বদেশের মানুষের সঙ্গে সংলাপ রচনার প্রয়াসে রত আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এ-কাজে উল্লেখযোগ্য কোনো সাফল্য এখনও তাঁদের আয়ত্বের বাইরে রয়ে গেছে। পাশ্চাত্য নাটকের অনুবাদ বা রূপান্তরণ, রবীন্দ্র নাটক বা রবীন্দ্রউপন্যাসের নাট্যরূপকে ঘিরে রক্তকরবী থেকে রাজা অয়াদিপাউস পর্যন্ত বহুরূপীর যে-গৌরবময় নাট্যঐতিহ্য তার সঙ্গে নতুন কোনো তাৎপর্য বা বিস্তার সংযোজন করেনি নতুন এই পাঁচটি নাটক। তাঁদের নবতম প্রযোজনা পাগলা ঘোড়াও দর্শকের বোধ এবং অভিজ্ঞতাকে ধনী করে না আদৌ। বরং সময় ও সমাজভূমি থেকে বিচ্ছিন্ন কয়েকটি মানুষের স্মৃতিমন্থন, প্রেম সম্পর্কে তাদের অভিজ্ঞতার তুচ্ছতা, দৃষ্টিভঙ্গির অসাড় কৈবল্য, এবং অকিঞ্চিৎকর কথার বিরাট বোঝায় পীড়িত এই নাটক আমাদের ক্লান্ত করে।

স্বীকার করে নেওয়া ভালো, নাট্যকার হিসেবে শ্রীবাদল সরকার নাটকের বহিরঙ্গ নির্মাণে যতটা নিপুণ, বাঙলা থিয়েটারের প্রচলিত ফর্মকে ভাঙাগড়ায় তিনি যতটা আগ্রহী, নাটককে আন্তর ঐশ্বর্যে মূল্যবান করে তোলার ব্যাপারে তিনি ততদূর সফল নন। বর্তমান সমালোচকের স্বীকার করতে দ্বিধা নেই যে সমাজধৃত মানুষের চৈতন্য ও পরিপার্শ্বের সংঘাত থেকে যে-জটিলতার সৃষ্টি হয় তার সামগ্রিকতার শিল্পায়নকে সে শিল্পকর্মীর জরুরী কাজ বলে মনে করে থাকে। অগভীর শ্লোগানে পৌছনোর জন্য যে সরলীকরণ তাতে যেমন মানুষ ও তার বেঁচে থাকাকে সম্মান করা হয় না, তেমনি পরিপার্শ্ব-বিচ্যুত মানুষের শব-বিচ্ছেদ মাত্রেই সৎ বা মহৎ শিল্পের শিরোপা পাবে না। এসব কথার

'ক্লিশে'র গন্ধ যদি সুধীজনের সংবেদনশীল নাসিকাকে আহত করে, উপায় নেই। কারণ দেশ-কাল-মানুষের এই আগ্নেয় পরিপ্রেক্ষিতে কলাকৈবল্যবাদের বিলাসিতা সয় না।

বহুরূপী তাঁদের প্রযোজনার জন্য শ্রীসরকারের যে নাটকগুলি এযাবৎ নির্বাচন করেছেন তার কোনটিই মানুষের প্রতি ভালবাসা মমত্ববোধ ও দায়িত্ব অনুভবের দ্বারা চিহ্নিত নয়। একমাত্র ত্রিংশ শতাব্দী-তে মানবেতিহাসের একটি অন্ধ প্রহরকে নাট্যায়িত করেছেন বাদলবাবু, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ বহুরূপীর প্রযোজনাটি একেবারেই ব্যর্থ হওয়ায় তাঁর এই অন্যস্বাদের নাটকটি তার পাওনা স্বীকৃতি পেল না। নাট্যবস্তুর ক্ষতিকারক অকিঞ্চিৎকরতা সত্ত্বেও বাদলবাবুর নাটক অন্যান্য কিছু গুণে নাট্যপাঠক ও দর্শককে আকর্ষণ করেছে প্রায় সব সময়েই। তাঁর সদাজাগ্রত রসবোধ, সংলাপ রচনায় তাঁর দক্ষ কারিগরি, পরিস্থিতি নির্মাণে আশ্চর্য পটুত্ব তাঁকে নাট্যকার হিসেবে আমাদের কাছে সাগ্রহে লক্ষণীয় করে রেখেছে। কিন্তু পাগলাঘোড়া-তে এমনকি এই পরিচিত এবং প্রত্যাশিত গুণগুলিরও ঘাটতি হতাশ ও পীড়িত করে। বস্তুত প্রেম সম্পর্কে কোনো গভীর অনুভবে দীপ্ত নয় এ-নাটক, যদিও এর মৌল বিষয় হচ্ছে প্রেম। সুতরাং এ কোনো কবিতা নয়।—যন্ত্রণার্ত চেতনার কোন বিশ্লেষণও এখানে অভিপ্রেত নয়। সুতরাং প্রেম নামক পুরনো কিন্তু রহস্যময় ব্যাপারটাকে ঘিরে মানুষের বোধে যে-আলোড়ন জাগে, যার ফলে সে নিজেকেই আরো ভালো করে চেনে, তার কোন ইঙ্গিত নাটককে চিহ্নিত করে না। এমনকি চার বন্ধুর চারটি দৃষ্টিকোণ থেকে প্রেমের রহস্যের ওপর নানামাত্রিক আলো ফেলা যেত। তাও হয়ে ওঠেনি। শুধু প্রচুর আড়ম্বর ও অনেক কথার পর যেসব নেপথ্য কাহিনী আভাসে উন্মোচিত হয় তাদের হাস্যকর অকিঞ্চিৎকরতা সমগ্র আয়োজনকেই যেন পরিহাস করে।

প্রযোজনাতেও কোনো নতুন মাত্রা যোগ করা যায়নি দুর্বল-নাট্যশরীরে চার চরিত্রের মঞ্চে উপস্থাপনা এবং তাদের সংস্থান ও চলাফেরার মধ্যে দিয়ে যে অনুচ্চার বাঙময়তা আসতে পারত, প্রযোজককে তা এড়িয়ে গেছে। চরিত্রগুলি বলে না দিলে বোঝা মুশকিল যে তারা শ্মশানে এসেছে শবদাহের কাজে। এবং দীর্ঘসময় ধরে তাদের মদ্যপান ও খেউড়ের পৌনঃপুনিকতা যে শ্রীমিত্রের পরিণত নাট্যবোধ ও রুচিকে আহত করেনি, এতে অবাক মানতে হয়। এ ছাড়া চরিত্রগুলির অতীত জীবন থেকে প্রেমের অভিজ্ঞতার যে টুকরোগুলি

মঞ্চে আনা হয়েছে, তাদের উপস্থাপনাও বৈশিষ্ট্যবিহীন। সমগ্র নাটকে বক্তৃতার ভিড়, গতির দুঃখকর অভাব। অবশ্য শ্মশানের আবহাওয়া সৃষ্টির ব্যাপারে ধ্বনি ও আলোর ব্যবহার নিপুণ। কিন্তু নবান্নের অন্যতম স্রষ্টা শম্ভু মিত্রকে আ-কৈশোর জীবনের ভাষ্যকার বলে জেনেছি। তিনি মানুষ ও তার প্রবৃত্তি ও তার তুচ্ছ দুর্বলতার এ কি প্রতিরূপ নির্মাণ করলেন? তবে কি ভয় পেতে হবে এই ভেবে যে আমাদের কালের শ্রেষ্ঠ নাট্যপ্রযোজক আধুনিকতার মর্মানুসন্ধানে ব্যর্থ হলেন? সমকালের জটিলতা কি তবে তাঁর শিল্পদৃষ্টিকে সম্পূর্ণ এড়িয়ে গেল?

অভিনয়ে শ্রীশাঁওলী মিত্র ও শ্রীদেবতোষ ঘোষ প্রশংসনীয় কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। শ্রীশাঁওলী মিত্র সংলাপ প্রক্ষেপণে, কণ্ঠস্বরের সূক্ষ্ম ওঠাপড়ার ব্যবহারে এবং মঞ্চে চলাফেরার সাবলীলতায় সত্যিই অলৌকিকত্বের আভাস আনতে পেরেছেন। তবে তাঁর অভিনয়প্রতিভা কৃতী পিতামাতার নির্বিশেষ অনুকরণে নিয়োজিত হলে, তাঁর স্বাভাবিক এবং ব্যক্তিগত বিকাশ ক্ষুণ্ণ হতে পারে, এমন আশঙ্কাও জাগছে। শ্রীকুমার রায়ের মতো শ্রদ্ধেয় এবং ক্ষমতাশালী অভিনেতা এই নাটকে অত্যন্ত হতাশ করেছেন। চড়া পর্দায় বাঁধা তাঁর অভিনয় স্থূল, এবং বাচনভঙ্গি কৃত্রিম লেগেছে। শ্রীকালীপ্রসাদ ঘোষ এবং শ্রীশান্তি দাসের অভিনয় অনুল্লেখযোগ্য। শ্রীশাঁওলী মিত্র ব্যতীত অন্য অভিনেত্রীগণ আদৌ দাগ কাটেন না। অবশ্য তাঁদের অভিনেয় অংশগুলিও রচনা ও প্রযোজনায় দুর্বল।

মঞ্চ নির্মাণে শ্রীখালেদ চৌধুরির খ্যাতি ক্ষুণ্ণ হবার বা বেড়ে যাবার কোন কারণ এ নাটকে নেই। শ্রীতাপস সেনের আলোর কাজ অবশ্য খুবই ভাল। মঞ্চে একটা আলো-আঁধারিকে সারাক্ষণ ধরে রাখতে তিনি সফল, এবং নাটকের মেজাজ তৈরিতে এটা প্রবল সাহায্য করে। শ্রীঅশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্গীতের ব্যবহারে কোনো বৈশিষ্ট্যই দেখাতে পারেননি।

আরো অনেক বেশি তাৎপর্যময় নাটকের অনেক বেশি দক্ষ মঞ্চায়নের জন্য বহুরূপীর নতুনতর নাটকের দিকে তাকিয়ে থাকতে হবে। কারণ 'পাগলাঘোড়া' প্রত্যাশাভঙ্গের অভিজ্ঞতা নিয়ে এসেছে।

অশোক মুখোপাধ্যায়

সূত্রধারের দুটি একাঙ্কিকা

গত নববর্ষ দিবসে কলকাতার তরুণ নাট্যসংস্থা সূত্রধর কলামন্দিরের ভূমিতল মঞ্চে দুটি একাঙ্কিকা অভিনয়ের আয়োজন করেছিলেন তাদের প্রথম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে।

গত দশ বারো বছরের মধ্যে কলকাতা ও তার উপকণ্ঠে অনেকগুলি নতুন নাট্যসংস্থা গড়ে উঠেছে। তাদের মধ্যে প্রতিভার তারুণ্যদীপ্তি যেমন উদ্‌ভাসিত হচ্ছে, তেমনি নাট্যরচনা ও অভিনয়-শিল্পে পরীক্ষা-নিরীক্ষার নিরলস আগ্রহও বিস্ময়ের সঙ্গে সচেতন সংস্কৃতিপ্রিয় দর্শকরা লক্ষ্য করছেন। দ্বিতীয় যুদ্ধোত্তর বাঙলাদেশে গণনাট্য সংঘের নবনাট্য আন্দোলন এবং তারপর শম্ভু মিত্র-তুলসী লাহিড়ী-উৎপল দত্তের জীবনঘনিষ্ঠ প্রগতিশীল নাট্যকলাচর্চার প্রয়াস আজ যথার্থই আন্দোলনের প্রাথমিক অস্থিরতা কাটিয়ে একটি স্থির ধারাপথে প্রবাহিত হতে চাইছে। স্বাধীনতা-পরবর্তী বাঙলা দেশের নাট্যসাহিত্য আজ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে। এখন নাট্যামোদী বিপুল সংখ্যক সংবেদনশীল দর্শক তৈরি হয়েছে। উচ্চাঙ্গের নাট্য-প্রতিভা আজ আর অঙ্গুলিমেয় নয়। অভিনয়কলার মানোন্নয়নে এবং মঞ্চের প্রয়োগবিদ্যায় শৌখিন নাট্যগোষ্ঠীর নানাবিধ প্রয়াস ও পরীক্ষামূলক কর্মসূচি পেশাদারি অভিনয়-জগৎকে পর্যন্ত প্রভাবিত করেছে। এখন বলা যেতে পারে, শৌখিন ও পেশাদারি নাট্যক্ষেত্রের সীমারেখা প্রায় মুছে যেতে বসেছে।

সম্প্রতি সূত্রধরের প্রযোজনা প্রত্যক্ষ করে এসব কথা মনে পড়ল। এই দল শৌখিন নাট্যরসিকদের নিয়ে গঠিত। এঁদের মধ্যে আছেন লেখক, বুদ্ধিজীবী, অধ্যাপক, চাকুরিজীবী, ছাত্রছাত্রী, এমনি অনেকেই—যাঁরা নানা বৃত্তির মানুষ। নাট্যানুরাগ এবং নাট্যোন্নয়ন ছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্য এঁদের সংগঠিত করেনি। কিন্তু এঁদের সচেতন সমাজবোধ, পরিচ্ছন্ন রাজনৈতিক দৃষ্টি এবং শিল্পরুচি সহজেই দৃষ্টি ও প্রশংসা আকর্ষণ করে। ইতিপূর্বে এই গোষ্ঠী অগ্নিমিত্র রচিত 'নিকটে ফাঁদ' নাটকের একাধিক অভিনয়ে বিদগ্ধ মহলের প্রশংসা পেয়েছেন। মধ্যবিত্ত জীবনের অন্তঃসারশূন্য সৌজন্যবোধ ও ফাঁপা আভিজাত্যের মুখোশ খুলে ধরার অভিজ্ঞতায় ঐ নাটকটি চতুর সংলাপে,

বুদ্ধিদীপ্ত কাহিনী বিন্যাসে, লঘু কৌতুকের আয়োজনে একটি রমণীয় রসসৃষ্টি করতে পেরেছিল। অগ্নিমিত্র রচিত ও নির্দেশিত একাঙ্কিকা 'জম্বুদ্বীপে আমড়াবৃক্ষ' আমাদের স্বাধীনতা অর্জন ও কপট দেশপ্রেমের উপর প্রহসন-ধর্মী রচনা। বিষয়টি নতুন নয়, কিন্তু পরিকল্পনা ও নামকরণ থেকে পরিস্থিতি রচনা এবং চরিত্রবিন্যাস—সবই এক কথায় অসাধারণ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় বহন করে। অগ্নিমিত্র নামটির আড়ালে যিনিই থাকুন, তাঁর রাজনৈতিক চেতনা ও ইতিহাস-এর যুক্তিনিষ্ঠ অনুগামিতায় শ্রদ্ধা রাখতেই হয়। নাটকে তিনি রাজনীতি করেন নি, কিন্তু রাজনৈতিক ইতিহাসের ভণ্ডামীর পকেটগুলিকে এমন বিপর্যস্ত বিদ্রূপে দেখানো রীতিমত দুঃসাহসিক। শুধু প্রহসন রচনায় অগ্নিমিত্র সাফল্য অর্জন করেন নি, করুণ রস সৃষ্টিতেও তাঁর ক্ষমতার অভাব ঘটেনি—'নিকটে ফাঁদ'এরই সাক্ষ্য। এই নাটকে হীরেন চট্টোপাধ্যায়ের ফেকু, রঞ্জিত দত্তের নেপো, দিব্যেন্দু রায়ের নাফাজী সুঅভিনীত চরিত্র। প্রদীপ ভট্টাচার্য, বিদ্যুৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, রামকৃষ্ণ মজুমদার, অমিত মুখোপাধ্যায় সকলেই দক্ষতার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট চরিত্রগুলি ফুটিয়ে তুলেছেন। হীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের 'নির্বাস বিহঙ্গ' সিরিয়াস নাটক। জীবনসম্পর্কে নৈরাশ্যবাদীর পুনর্বার জীবন-প্রত্যয়ে ফিরে আসার ছকে-বাঁধা কাহিনী হলেও বিভিন্ন চরিত্রের কুশলী সমন্বয়ে, বুদ্ধিচতুর উক্তি-প্রত্যুক্তিতে এবং অভিনয়ের টিম-ওয়ার্কে ছোট নাটকটি মনোযোগ নিবিষ্ট করে রাখে। এই নাটকে যুবক সোমনাথ পাল, ভিখারি হরিজীবন সাহা, মাতাল দিব্যেন্দু রায় ভালো অভিনয় করেছেন। তাছাড়া নিমাই সরকার, অমরশঙ্কর গোস্বামী, অঞ্জলি ভট্টাচার্যের অভিনয়ও উচ্চাঙ্গের। সূত্রধরের অভিনয়-প্রয়াস নতুন নাটক রচনায় ও সঠিক সমাজবিপ্লবের ক্ষুরধার পথে অগ্রসর হলে আমরা প্রীত হব।

ভাস্কর বসু

রাহুমুক্ত রাশিয়া

১৬ই সেপ্টেম্বর মহাজাতি সদনে "রাহুমুক্ত রাশিয়া" পালাখানি দেখে এলাম। অবশ্যই যাত্রারচনায় শোষক এবং শোষিতের সংগ্রাম স্পষ্টতর—তবু নেতা হিসেবে লেনিনকে অত্যন্ত নিষ্প্রভ লেগেছে—এমন কি ট্রটস্কি এবং স্তালিনের অনুপস্থিতি রাশিয়ার বিপ্লবের ইতিহাসকেই বিকৃত করে। আরো বহু ঐতিহাসিক বিভ্রান্তির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। তবু পালাকার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত নাট্যকার রমেন লাহিড়ী প্রকৃত সংগ্রামের উৎস সন্ধান করেছেন। যদিও আমার মতে রাসপুটিন আদৌ রুশ-বিপ্লবের মূল কারণ নয় অথবা জারিনার সঙ্গে তাঁর প্রণয়টাই নাটকীয়তা নয় কিংবা জার নিকোলাইয়ের অপকার্যটাই জনগণের সংঘবদ্ধ হওয়ার মূল কারণ নয়। তবু সব মিলিয়ে একদা রাহুগ্রস্ত রাশিয়ার মৌলিক রূপটি তুলে ধরেছেন পালাকার। রাসপুটিনের সম্মোহনী ক্ষমতাই যাত্রার মূল বিষয়। যথাযথ প্রসঙ্গে প্রাসাদ-বিপ্লবের কথাও এসেছে। পরিণামে লেনিনের নেতৃত্বে শীত প্রাসাদ আক্রমণের এবং বিজয়ের ইতিবৃত্ত যাত্রায় আছে। যদিও এতবড় পরিকল্পনা যাত্রার বিষয় হওয়া উচিত নয়, তবু নিপীড়িত জনগণের জন্য দুঃসাহসের একটা মূল্য আছেই। সর্বত্র সেই মূল্য বর্তমান। দর্শকবৃন্দও যথার্থ অভিনন্দন জানিয়েছে—এখানেই "রাহুমুক্ত রাশিয়া"র সার্থকতা। পালাকারকে সচেতন হতে বলবো—এটা যাত্রা, থিয়েটার নয়। যাত্রায় প্রবেশ-প্রস্থানের একটা গুরুত্ব আছে। এমনকি জনগণের প্রয়োজনভিত্তিক এবং রিলিফ-ভিত্তিক সার্থকতাও দরকার। সর্বোপরি জনগণের-একতার মূলমন্ত্রটা আরো সোচ্চার হওয়া দরকার ছিল। তবু ভুল ধরার কারবার আমাদের নয়—জনগণের সপক্ষে লেখা এ পালাটিকে আমরা সমর্থন জানাবো। অজস্র দুর্বলতা সত্ত্বেও এই যাত্রার জয়যাত্রা আমাদের কাম্য। কারণ আরো অনেক গুণে সাধারণ যাত্রার চেয়ে এটা ভালো। আরো ভালো হলে আমরা সুখী হতাম।

যাত্রাজগতের স্বনামধন্য ব্যক্তিরাই অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করেছেন। সুতরাং অভিনয়ে তাঁদের ঐকান্তিক কৃতিত্বকে অস্বীকার করবো না। শুধু জারিনা এবং জার নিকোলাইয়ের চরিত্র-কল্পনায় কিছু বিভ্রান্তি রয়ে গেছে। অভিনেতা-অভি-

নেত্রীরা যথাসাধ্য প্রচেষ্টা করেছেন—কিন্তু মূলত্রুটি হয়তো স্বয়ং পরিচালকেরই। স্বরারোপে দেখলাম আজীবন সৎ-বিপ্লবী অতিপরিচিত হেমাঙ্গ বিশ্বাসের নাম। কিন্তু সঙ্গীতাংশে সেই মহৎ শিল্পী নিতান্তই অনুপস্থিত। আলোকসজ্জা এত গতানুগতিক যে তার বিশেষ উল্লেখ করার কোনো অবকাশ নেই। তবু ডাশা চরিত্রে কল্যাণী ভট্টাচার্য এবং মিটকার ভূমিকায় অমূল্য ভট্টাচার্যের আন্তরিকতাকে অভিনন্দন জানাতেই হয়। চরিত্র আছে অনেক। কেউ খারাপ অভিনয় করেছেন—এ কথা বলা চলে না, হয়তো অভিনয়ের সার্থকতাই যাত্রার প্রকৃত সার্থকতা। প্রভাস অপেরা এখানেই সার্থক। বর্তমান যাত্রামহলে মাইকের ব্যবহার এসে গেছে। কিন্তু শব্দযন্ত্র ব্যবহারে শ্রীপতি দাস বড় বেশী অসার্থক। সম্ভবত মহাজাতি সদনের শব্দ-প্রক্ষেপণ ব্যবস্থাই এর মূল কারণ। তবু আলোক, সঙ্গীত, শব্দ-প্রক্ষেপণের প্রচুর সুযোগ রয়ে গেছে। এই যাত্রার বহুল প্রচার আমাদের কাম্য। কিন্তু আরো উন্নততর পরিবেশনাও আমরা চাই। আর স্বাভাবিক কারণেই আমরা জানতে চাই যাত্রার মূল চরিত্র কে—রাসপুটিন, না লেনিন? নামকরণ কিন্তু প্রমাণ করে স্বয়ং রাহু রাসপুটিন নায়ক নয় বরং সব কিছু রাহুমুক্ত করার নেতা লেনিনই যথার্থ নায়ক। অথচ যাত্রায় লেনিন তুলনামূলক ভাবে অক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন। লেনিন যে অনন্য চরিত্র একথা প্রমাণ করার দায়িত্ব ছিল পালাকার রমেন লাহিড়ীর। সেই দায়িত্বটুকু পালন করলেও আমরা যথার্থ তৃপ্ত হতাম। তবু এই পালার বহুল প্রচার আমরা সর্বদাই কামনা করি। কারণটা আগেই বলেছি—অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়ের জয়ই সকল আশার মূল বিষয়—অন্তত সেদিক দিয়ে আলোচ্য পালা সার্থক।

অমর গঙ্গোপাধ্যায়

পিকাসোর নবতিতম জন্মজয়ন্তী

এ যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পী পাবলো পিকাসোর নব্বুই বছর পূর্ণ হলো—এ বছর ২৫শে অক্টোবর। ১৮৮১ সালে স্পেনের মালাগা বন্দর-শহরে তাঁর জন্ম। বাবা ছিলেন স্কুলের চিত্রকলা-শিক্ষক। নাম যোশে রুইজ ব্লাসকো। মার নাম মারিয়া পিকাসো লোপেজ। পিকাসো বাবা-মা উভয়ের নামই একসঙ্গে ছবিতে স্বাক্ষর কালে ব্যবহার করতেন প্রথম প্রথম, পাবলো রুইজ পিকাসো। পরবর্তী-কালে শুধুমাত্র পাবলো পিকাসো, এবং পিকাসো।

পিকাসোর শিল্পীজীবনের ইতিহাস বড়ই বৈচিত্র্যময়—নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা আর সাফল্যের দীর্ঘ ইতিহাস। প্রথমে তিনি ছাত্র হিসাবে ভর্তি হয়েছিলেন বারসেলোনার আকাদমীতে, পরে মাদ্রিদে। মাদ্রিদেই তিনি বিখ্যাত শিল্পীদের নানা শৈলী, এমন-কি ভাস্কর্য, কাঠখোদাই সব কিছুই অনুধাবন করলেন এবং এই শতকের গোড়ার দিকে পারীতে এসে স্থায়ীভাবে ডেরা বাঁধেন। পারীতে তখন নতুন শিল্পীদের জয়জয়াকার। পোল সেজাঁ (১৮৩৯-১৯০৬), ভিনসেণ্ট ভ্যান গথ্ (১৮৫৩-৯০), পোল গগাঁ (১৮৪৮-১৯০৩), আঁরি মাতিস (১৮৬৯-১৯৫৪) এঁরা সকলেই তখন পরিচিত। শুধুমাত্র গগাঁ ও ভ্যান গথ-ই সদ্য লোকান্তরিত।

পিকাসো যখন পারীতে তখন কিউবিস্ট আন্দোলন সবে রূপ পরিগ্রহ করছে। ইতিপূর্বে সেজাঁর দক্ষিণ-নিসর্গচিত্রমালা প্রদর্শিত হয়ে গেছে। সে চিত্রমালাকে গাঢ় জমিন (Solid), বক্ররেখা এবং শীর্ষদেশে টাল খাওয়া (জার্কিং) কিউবিক আকারের পূর্বসূরী বলা যেতে পারে। ফভবাদীদের ("আধুনিক জীবন যদিব্যাধিগ্রস্ত হয়ে থাকে, আধুনিক শিল্পও তাহলে ব্যাধিগ্রস্ত। আমরা শিল্পকলার পুনরুজ্জীবন ঘটাতে পারি যদি আমরা শিশু বা সভ্যতাপূর্ব মানুষের মতো শুরু করতে পারি"—এই মতবাদে বিশ্বাসীরা) মধ্যে অনেকে—খনি রসায়নশাস্ত্রকারদের থেকে কেলাস বা ক্রস্টালকে সব কিছুর আকারের আদিরূপ বলে গ্রহণ করলেন। প্রশ্ন উঠতে পারে জর্জ ব্রাথ্ না পিকাসো—কে এই নব্যরীতির আসল উদ্ভাবক।

কিন্তু পিকাসো এই নতুন দিকে এমন ভাবে ঝুঁকে পড়লেন কেন? কিউবিস্ট পর্বের প্রথমে পিকাসো বহুভূজ দিয়ে আকৃতিকে পূর্ণরূপ দেবার কাজ করেছেন, দ্বিতীয় পর্বে পূর্ণ রূপটিকে ভাঙা আকারে ছড়িয়ে দিলেন। মনে

রাখতে হবে ফোটোগ্রাফি আবিষ্কৃত হওয়ার পর পুরো অবয়ব আঁকবার প্রয়োজন ফুরলো; আর ইমপ্রেসিনস্টদের বর্ণের পূর্ণ ব্যবহারে রঙের কাজকর্মের সীমাও ইতিমধ্যে হারিয়ে গেল; ফলে, রঙের চমকও তখন ফুরিয়েছে। নিও-ইমপ্রেসনিস্টরা একেবারে অতি জটিলতায় বৈজ্ঞানিক শীতলতায় ছবির চারিত্র্য, সংজ্ঞা দিলেন। এ-সবের ফলে তীব্র প্রতিক্রিয়ায় নতুন শিল্পীদের মনে হলো, শিল্পতো আসলে কলাকর্ম, প্রকৃতির নিখুঁত চিত্রণ নয়, বরং তা শিল্পীর আবেগেরই রূপায়ণ। কবি গুইলোম অ্যাপলোনিয় পিকাসোর এই নব চিত্রণের ছিলেন অন্যতম শ্রেষ্ঠ পরিপোষক।

পিকাসো প্রথম দিকে মাতিসের নেতৃত্বে হয়েছিলেন ফভিস্ট, ব্রাকের সঙ্গে কিউবিস্ট, আন্দ্রে ব্রেঁতো এবং সালভেদার দালির সঙ্গে স্যুররিয়ালিস্ট, কিন্তু পিকাসো—পিকাসোই।

পিকাসোর ব্লু-পিরিয়ড ও পিঙ্ক-পিরিয়ডের বৈপ্লবিক অনুভাবনার কথা আমরা জানি। পিকাসো ইতিমধ্যে হয়ে উঠেছেন শ্রেষ্ঠ মানবতাধর্মী শিল্পী রুশ-বিপ্লবের বৈপ্লবিক ভাবধারা তাঁর মধ্যে সমাজ পরিবর্তনের আবেগ জাগিয়ে তোলে। স্পেনে ফ্যাসিস্ত আক্রমণের (১৯৩৬) সময় গুয়েনিকা শহরের ধ্বংসাবশেষ দেখে, ফ্যাসিবাদের মানব-বিধ্বংসী কার্যকলাপে সন্ত্রস্ত, বিদীর্ণ-হৃদয়, ক্রুদ্ধ ও শপথময় পিকাসো গুয়েনিকা ছবিটি আঁকেন। কিউবিস্ট স্তরের দ্বিতীয় ধাপের বিচ্ছুরণ পন্থাটি তিনি নতুন ধারায় প্রয়োগ করেন। ১৯৩৭ সালের পারীতে স্পানিশ পাভেলিয়নে প্রদর্শনীটি গোটা বিশ্বের মন জয় করে নেয়। শোনা যায়, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ চলাকালীন অধিকৃত ফ্রান্সে জনৈক জর্মান সৈনিক ছবিটি দেখে পিকাসোকে প্রশ্ন করে, "এ ছবি আপনি এঁকেছেন?" পিকাসো উত্তর দেন, "না, তোমরা এঁকেছ।" Ozenfant এই ছবিটির প্রথম প্রদর্শনীর সময়ই তাঁকে বলেছিলেন, "You have given us a masterpiece! It's plain you have suffered."

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধচলাকালে জর্মান ফ্যাসিস্তদের বিরুদ্ধে রেজিস্টান্স-যুদ্ধে পিকাসো তাঁর শিল্পকর্ম নিয়ে যোগ দেন। গোপন আস্তানায় এবং গোপন স্টুডিওয় চলে তাঁর কাজকর্ম। যুদ্ধের সময়ই তিনি কমিউনিস্টদের বীরত্বে বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন এবং যুদ্ধের পরে আনুষ্ঠানিকভাবে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ গ্রহণ করেন।

বিশ্বব্যাপী শান্তি আন্দোলনেও পিকাসো আজ অন্যতম শ্রেষ্ঠ সৈনিক।

স্টকহোম শান্তি-আবেদনে পিকাসো-অঙ্কিত 'শান্তি কপোতের' ছবি আমরা সবাই দেখেছি। পারমানবিক যুদ্ধ-চক্রান্তের বিরুদ্ধে পিকাসো হলেন সর্বাগ্রগণ্য এক সংগ্রামী যোদ্ধা। আলজেরিয়ার যুদ্ধ বা ভিয়েতনামে ফরাসীদের যুদ্ধের তিনি ছিলেন ঘোরতর বিরোধী। সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তের বিরুদ্ধে এবং সর্বপ্রকার আগ্রাসনের বিরুদ্ধেও পিকাসোর সংগ্রামী মনোভাবের কথা সকলেরই জানা। সোভিয়েত ইউনিয়নের শান্তি-নীতির পিকাসো একজন বিশিষ্ট সমর্থক। মহাকাশ-বিজয়ের স্মারক হিসাবে গাগারিনের সেই আশ্চর্য রেখা-চিত্রটি আমাদের নবউদ্ভিন্ন মানবিকতার রহস্যময় অনুভাবনার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। বাঙলাদেশের উপরে পাকিস্তানের জঙ্গীচক্রের আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদমুখর স্বাক্ষরদাতাদেরও তিনি অন্যতম।

বর্তমানে পিকাসোর চিত্রসংখ্যা প্রায় তের হাজার। দক্ষিণ ফ্রান্সের ভালোরি শহরের তিনি অধিবাসী। এই শহরের পৌরসভাটি এখন কমিউনিস্ট-'নিয়ন্ত্রিত। ভালোরি শহরের রাস্তাঘাট আজ প্রজাতন্ত্রী স্পেনের পতাকায় কীর্ণ। এমন-কি ফ্যাসিস্ত ফ্রাঙ্কো তাঁর চিত্রকলা নিয়ে স্পেনেও আলোচনার অনুমতি দিয়েছেন। লণ্ডনের টেট গ্যালারি তাঁর সম্মানে উড়িয়েছেন নব্বুইটি শান্তি কপোত। ল্যুভর-এ হচ্ছে তাঁর শিল্প প্রদর্শনী। রুশ নর্তক-নর্তকীরা এসেছেন ভালোরিতে, এসেছেন স্পেন থেকে নৃত্যশিল্পীরা। পাবলো নেরুদা উপস্থিত থাকছেন তাঁর জন্ম-জয়ন্তী অনুষ্ঠানে।

পাবলো পিকাসো বলতে নতুন যুগ বোঝায়। নতুন মানুষ। মানব-মহিমাদীপ্ত এই সংগ্রামী শিল্পীর নব্বুইতম জন্মদিনে তাই আমরা জানাই তাঁকে বিপ্লবী অভিনন্দন। মহান শিল্পী পাবলো পিকাসো দীর্ঘজীবী হোন ॥ ২৪.১০.৭১

পাবলো নেরুদা নোবেল পুরস্কার-বিজয়ী

এ-বছর সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন লাতিন আমেরিকার কবি পাবলো নেরুদা। চিলির অধিবাসী নেরুদার নাম 'পরিচয়' পাঠকের কাছে অপরিচিত নয়। ইতিপূর্বে বহুবার পরিচয়-এ তাঁর রচনা, বা তাঁর উপরে একাধিক লেখা প্রকাশিত হয়েছে। নোবেল পুরস্কারের সঙ্গে পুরস্কারদাতা কমিটির রাজনীতির বহুক্ষেত্রে গূঢ় সম্পর্ক থাকে। এমনকি আন্তর্জাতিক ঠাণ্ডা লড়াইয়ের ক্ষেত্রেও পুরস্কারদাতা সমিতির ভূমিকা একাধিকবার চোখে

পড়েছে। আমরা খুশি হয়েছি দেখে যে অন্তত কয়েকবারও সম্প্রতিকালে পুরস্কারদাতা কমিটি সাধুসিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। নেরুদাকে নোবেল পুরস্কার প্রদান এক অর্থে ঠাণ্ডা লড়াইয়ের যোদ্ধাদেরই পরাজয়। কেননা নেরুদা বিশ্বশান্তি আন্দোলনের একজন অনলস যোদ্ধা, সোভিয়েত ইউনিয়নের বন্ধু এবং কমিউনিস্ট। এবং আমরা গর্বিত হয়েছি নোবেল পুরস্কারদাতা কমিটি সাতষট্টি বছরের নেরুদাকে 'একটি মহাদেশের ভাগ্য ও স্বপ্নকে জীবিত করে তোলার আদি শক্তিকে কার্যকরি করে কবিতা রচনা'র জন্য পুরস্কৃত করেছেন দেখে। ইউনিভার্সাল সং-এর রচয়িতা এই কবিকে স্বদেশ থেকে বিতাড়িত হতে হয়েছিল এই স্বপ্নের জন্যই। একটি মহাদেশের ভাগ্যকে সমাজতন্ত্রী ভবিষ্যতে রূপদানের সংগ্রামের জন্যই তাঁকে ঘাতকের অস্ত্র, জল্লাদের ফাঁস দড়ি এবং আততায়ীর গুলি থেকে আত্মরক্ষার জন্য নির্বাসনে গোপনে মাচ্চু পিচ্চুর শিখরে, পেরুভিয়ান আন্দিজের কন্দরে, বলিভিয়ার টিনের খনির শ্রমিকদের বস্তিতে ঘুরে বেড়াতে হয়েছিল। চিলির গতনির্বাচনেও তিনি ছিলেন কমিউনিস্ট পার্টির মনোনীত রাষ্ট্রপতিপদপ্রার্থী। বামপন্থী প্রার্থী আলেন্দের পক্ষে তিনি নাম প্রত্যাহার করে নেন। এখন তিনি চিলির বামপন্থী ও গণতান্ত্রিক যুক্তফ্রণ্ট সরকারের পক্ষ থেকে ফ্রান্সে রাজদূত। তিনি দেখছেন লাতিন আমেরিকার 'ভবিষ্যৎ ও স্বপ্ন' চিলির সমুদ্র সৈকত থেকে গোটা মহাদেশে চিলির মতোই গোটানো কার্পেটের মতো যা খুলে যাবে। কাজ করছেন তিনি তাকেই রূপ দিতে।

পাবলো নেরুদা আসলে টেমুকো শহরের বেড়ে ওঠা নেফতালি রিকার্দো রীসের/ছদ্মনাম। ১৯২৩ সালে প্রকাশিত তাঁর Crepuscalario কাব্যগ্রন্থের গ্রন্থকার হিসাবে পাবলো নেরুদা ছদ্মনামটি প্রথম তিনি ব্যবহার করেন। নেরুদার প্রিয় গ্রন্থকার, চেক লেখক জান নেরুদার নাম থেকে তিনি তাঁর ছদ্মনামের পদবিটি গ্রহণ করেছেন। নেরুদা যখন প্রথম কবিতা লিখছিলেন, তখন লাতিন আমেরিকান আধুনিক সাহিত্যের অবস্থা ছিল নিষ্প্রভ। 'আধুনিকতা'র ধারার প্রধান নায়ক রুবেন দারিও মারা যান ১৯১৬ সালে। লাতিন আমেরিকান জীবনের প্রচণ্ডতার মধ্যে থেকেও দারিও ছিলেন ভের্লেনের বিষণ্ণতায় আবিষ্ট। অবশ্য নিকারাগুয়ার এই কবি তাঁর নিজের অঞ্চলের শ্রমজীবী মানুষের উল্লাসমুখর উৎসবেরও সঙ্গী ছিলেন কবিতার মধ্য দিয়ে। দারিওর মৃত্যুতে লাতিন আমেরিকার স্প্যানিস ভাষাভাষী দেশগুলিতে

যেন ইন্দ্রপতন হলো। শূন্য মঞ্চে কবিরা ফরাসী দেশের নানা মতবাদ, চালচলন কায়দাকানুন অনুসরণে মনোযোগী হলেন। তখনি বেরুলো নেরুদার Crepuscalario—প্রকৃতির সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কিত হয়ে, চিত্রকল্পের আত্মমগ্নতায় এবং স্বকীয় কণ্ঠস্বরের দাক্ষিণ্যে নেরুদা পাঠকদের চমকে দিলেন। আকাঁড়া শব্দ কাব্যিক মিঠিমিঠি শব্দের পাপচক্র কাটিয়ে কবিতায় সসম্মানে আসীন হলো। ক্যাস্টিলিয়ান কবিতার ঐতিহ্য, চিলির লোককাব্যের মহার্ঘ সম্পদ একদিকে যেমন নেরুদা আত্মস্থ করেছিলেন, তেমনি অবহেলা করেননি র‍্যাঁবো বা বোদল্যেরকে। আর তখনি কানে বেজে উঠল বিপ্লবের গুরুগুরু ডমরু মায়াকভস্কি। নেরুদা লিখছেন, "আমরা সেই তরুণ বয়সে মায়াকভস্কির গলার স্বরে চমকে উঠলাম। ধ্বস্ত বিবর্ণ কাব্যের নিয়মকানুন, 'প্রাক্ সূর্যোদয় মুহূর্ত' ও 'ঊষা' ইত্যাকার শব্দের চুলচেরা বিচার নিয়ে মশগুল কবিতার আসরে ফেটে পড়ল এক নতুন কণ্ঠ; মিঠিমিঠি শব্দের ভুবনে আওয়াজ বাজতে লাগল যেন পুরোনো বাড়ি ধ্বসিয়ে দেওয়া রাজমিস্ত্রির হাম্বুর।" একদিকে মায়াকভস্কির 'অহম অয়ম্ ভো,' অপরদিকে 'লিভস অব গ্রাস'-এর রচয়িতা উত্তর আমেরিকার মহান কবি ওয়াল্ট হুইটমানের বলিষ্ঠ জীবনতৃষ্ণা—কবিতার পায়ে নানা মাপের বা ধরণের শিকলবেড়ির প্রতি তাঁর বিরাগ তাঁর 'বডি ইলেকট্রিকে'র গান, নেরুদাকে মুক্ত ও উদ্বেল সমুদ্রভঙ্গের সঙ্গে পরিচয় ঘটিয়ে দিল। শান্তির স্বপক্ষে, আব্রাহাম লিঙ্কনকে জেগে ওঠার আহ্বান জানানো কোলারডো নদীর তীরের প্রতি প্রেমময় অনুরাগের স্বাক্ষরবাহী কবিতা 'কাঠের কুঁদো চেরাইকারী জাগুক, (Let the Railsplitter Awake) দীর্ঘ কবিতাটিতে নেরুদা হুইটমানকে আহ্বান করেছিলেন 'বিজ্ঞ বন্ধু' বলে কবিকে তাঁর মুখের ভাষা আর বুকের বোঝার উত্তরাধিকার দেবার জন্য।

১৯৩৬ সালে নেরুদা ছিলেন স্পেনে। চিলির কনসাল। হিটলার মুসোলিনির সাহায্যপুষ্ট জেনারেল ফ্রাঙ্কো জনপ্রিয় প্রজাতান্ত্রিক সরকারকে উৎখাত করার জন্য আক্রমণ চালালেন। গণতন্ত্রের ভেকধারী মার্কিন-ফরাসি-ইংরেজ শাসকশ্রেণী রইল 'হস্তক্ষেপ বিরোধী' পরম বিড়ালতপস্বী হয়ে নির্বিকার।

"এলো গলাকাটার দল/এলো মরক্কো থেকে বর্বরবাহিনী ও উড়োজাহাজ নিয়ে/সঙ্গে এলো পুরোহিতের দলবল, তারা আশীর্বাদ করলো খুনেদের/" খুনেদের বোমারুর আক্রমণে গুঁড়িয়ে গেল গ্রাম-জনপদ শহর। শিশু-নর-নারীর রক্তে ভেসে গেল স্পেনের নগর-গ্রাম-প্রান্তর। আমাদের কবি রবীন্দ্রনাথ তখনই

লিখেছিলেন,

রাষ্ট্রপতি যত আছে
প্রৌঢ় প্রতাপের, মন্ত্রসভাতলে আদেশনির্দেশ
রেখেছে নিষ্পিষ্ট করি রুদ্ধ ওষ্ঠঅধরের চাপে
সংশয়ে সঙ্কোচে। এদিকে দানবপক্ষী ক্ষুব্ধ শূন্যে
উড়ে আসে ঝাঁকে ঝাঁকে বৈতরণী নদীপার হতে
যন্ত্র পক্ষ হুঙ্কারিয়া নর-মাংস ক্ষুধিত শকুনি,···

স্পেন লড়ছিল, রক্ত দিচ্ছিল। আন্তর্জাতিক ব্রিগেডে দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ বিবেকবান তরুণেরা যোগ দিচ্ছিলেন। ১৯৩৮ সালে মাদ্রিদ প্রতিরক্ষার দ্বিতীয় বার্ষিকীতে প্রকাশিত হলো নেরুদার 'স্পেন ইন হার্ট'। ভূমিকায় লেখা ছিল "গণতন্ত্রের সৈনিকেরা এ-বইয়ের কাগজ বানিয়েছেন, ছাপার অক্ষরগুলি কম্পোজ করেছেন এবং বইটির মুদ্রণ সমাধা করেছেন"।

১৯৪২ সালে নেরুদা যখন মেক্সিকোয় কনসাল—২২-এ জুন ১৯৪১, সোভিয়েত ভূমি ফাসিস্তরা আক্রমণ করেছে। 'স্টালিনগ্রাদের প্রতি' কবিতায় নেরুদা লিখলেন,

হাজার হাজার বুলেটে যখন বিক্ষত ছেঁড়া বুক তোমার
যখন বিষদাঁড়া কাঁকড়াবিছের ঝাঁক তেড়ে আসছে তোমার দিকে···
তখন, হে স্টালিনগ্রাদ—
নিউ ইয়র্ক নৃত্যপর আর লণ্ডন চিন্তামগ্ন।
আমি বলছি, ওরা সবাই শয়তান।
আমিতো আর সইতে পারছি না
আমরা কি করে সইব সেই দুনিয়া
যেখানে বীরেরা একা একা শহীদ হয়ে যায়।

দ্বিতীয় ফ্রন্ট খুলতে গড়িমসি তখন ইঙ্গ-মার্কিন-ফরাসির। 'যায় শত্রু পরে-পরে' নীতি আঁকড়ে ধরে বসে আছে তারা। তারা চাইছে এই সুযোগে সোভিয়েতের ধ্বংস। ইলিয়া এরেনবুর্গ লিখেছেন, নেরুদার কবিজীবনে তিনটি নগর বড়ই প্রভাব ফেলেছে। টেমুকো, মাদ্রিদ ও স্তালিনগ্রাদ।

নেরুদা ইতিমধ্যে কমিউনিস্ট হয়েছেন। মহাযুদ্ধের সময় এরেনবুর্গের একটি গ্রন্থের ভূমিকা লিখতে গিয়ে নেরুদা লিখেছিলেন "আজটেক, আর্জেন্টিনা বা কিউবার কোনো যুবককে কাফকা, রিলকে বা লরেন্সকে নিয়ে চোখের জল

ফেলতে দেখলে আমার রাগ হয়।...আজ যে সংগ্রাম না-করে সে কাপুরুষ। আগেকার দিনের যে সব জের কায়ক্লেশে এখনো টিকে আছে, তাদের নিয়ে মশগুল থাকা অথবা স্বপ্নের গোলোকধাঁধার মধ্যে পথ হাতড়ে বেড়ানো আমাদের দিনের যোগ্য কাজ নয়।...আমাদের সংগ্রামের মধ্যেই আছে শিল্পের উৎস।" সেই মুখবন্ধেই তিনি ঘোষণা করলেন "মহান কমিউনিস্ট পার্টিই মানুষের একমাত্র পার্টি।"

মেক্সিকো থেকে ফিরে নেরুদা কমিউনিস্ট পার্টির প্রার্থী হিসাবে আইন সভায় প্রতিনিধি নির্বাচিত হলেন (১৯৪৫)। কমিউনিস্টরা গঞ্জালেস ভিদেলাকে সমর্থন করেন প্রেসিডেন্ট পদে। এমনকি ভিদেলা তিনজন কমিউনিস্টকে মন্ত্রীর পদও দিলেন। কমিউনিস্টরা নেরুদাকে বললেন, এবার কবি লেখনীই তোমার মূলঅস্ত্র হোক। নেরুদা কবিতা রচনায় মনোযোগী হলেন। কিন্তু ভিদেলা অতর্কিতে ক্যু করলেন। কমিউনিস্ট পার্টির উপরে এলো আক্রমণ। নেরুদা তখনও সিনেটর। সিনেটে নেরুদা গঞ্জালেস ভিদেলার বিরুদ্ধে আনলেন দেশদ্রোহিতার অভিযোগ। বললেন, 'আমি অভিনন্দন জানাই চিলির তাবৎ কমিউনিস্টদের, নির্যাতিত লাঞ্ছিত নর-নারীদের। আমি এই অভিবাদনে বলি আমাদের পার্টির মৃত্যু নেই। জনগণের অসীম দুঃখবেদনার প্রতিরোধেই আমাদের পার্টির জন্ম এবং পার্টির বিরুদ্ধে এই অভিযান পার্টিকে বড় করে তুলছে, তুলছে তেজোদৃপ্ত করে...।"

নেরুদার বিরুদ্ধে হুলিয়া বেরোলো। নেরুদা জনগণের মধ্যে আত্মগোপন করলেন (১৯৪৮)। লিখছেন আশ্চর্য সব কবিতা। হয়ে উঠলেন বিশ্বশান্তি আন্দোলনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সৈনিক। মাদ্রিদ-স্তালিনগ্রাদের পথ পার হয়ে তাঁর কবিতা অবধারিতভাবে মানুষের শান্তি-সংগ্রামের হাতিয়ার হলো। ১৯৫০ সালে তিনি পেয়েছিলেন বিশ্ব শান্তি পুরস্কার, ১৯৫৩-এ স্তালিন পুরস্কার—পরবর্তীকালে এ-পুরস্কারের নাম হয়েছে লেনিন পুরস্কার।

প্রসঙ্গত 'Let the Railsplitter Awake' কবিতাটির শেষ পঙ্‌ক্তিগুলি মনে পড়ে :

Let us think of the entire earth/and pound the table with love./ I don't want blood again/to saturate bread, beans, music :/I wish they would come with me :/the miner, the little girl,/the lawyer, the seaman,/the doll-maker,/to go into a

movie and come out/to drink the reddest wine.../I came here to sing/and for you to sing with me.

আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনে বিভেদ এলে নেরুদা মনে রাখলেন ঐক্যবদ্ধ মানুষের স্বপ্ন, কেননা—

সাক্ষাৎ যাদের সঙ্গে হয়েছিল, তারপর
যারা চলে গেছে
তারা সব স্মৃতিটুকু নয়,
সেই তারা যাদের সমস্ত মুখ আর্দ্র অশ্রুপাতে
গলাচেপে ধরেছে আঙুল, আর
যা কিছু বা ঝরে যায় পত্রপুঞ্জ থেকে
চলে যাওয়া দিনটিকে ছায়া-ছায়া মনে পড়া,
কিংবা যে-সব দিন চলে গেছে আবছা হয়ে
আমাদের শোকের শোণিতে ধুয়ে ধুয়ে···।

১৯৬৫-তে মার্কিন দেশে পি. ই. এন-এর সভায় যোগ দেওয়ায়, বহু প্রগতিশীল লেখক অনুযোগ জানিয়েছিলেন তাঁকে। নেরুদা বলেছেন, "সাহিত্য-শিল্প-সঙ্গীতে আসুন না সবার মনের কাছে পৌছাই, তাদের সবার মনই নাড়া দিই। আমিতো কমিটেড কবি, আমি জানি জনগণের দুঃখবেদনা। আমাকে ভুলবোঝার অবকাশ কোথায়?" জীবনপ্রেমী এই কবি জানেন, তাঁর আশ্চর্য পৃথিবীকে মুক্ত করতে হবে যে পৃথিবীতে—

যখন রাত্রি নেমে আসে, সমুদ্র—
শাদা আর সবুজে পেশোয়াজ বদল করে
তার পর চাঁদ
সমুদ্রশ্যাম তরুণীর মতো
ঘুরন্ত ভাসমান ফেনায় ফেনায় স্বপ্ন দেখে

আমার এ গ্রহটি বদলাবার কোনো সাধ নেই॥

নেরুদার কাছে কবিতা নিঃশ্বাস গ্রহণের মতোই স্বাভাবিক। তাঁর Obras Completas (Losada, Buenos Aires, 1962)-এর পৃষ্ঠা সংখ্যা ১, ৮২৩। নেরুদার কবিতায় রয়েছে বিশাল ব্যাপ্তি ও তার পাশাপাশি অন্বেষণ। তাঁর

modernismo-এর হাত মক্শো করার সময় থেকে শুরু করে তিনটি Residencias-এর বৈভব-বৈচিত্র্য উত্তীর্ণ হয়ে Canto General-এর মন্ত্রোচ্চারণ, Las Uvas Y El Viento-এর ভ্রমণকাহিনী, তিনটি ওড-মূলক কাব্যগ্রন্থের আত্মকথন ও হাস্যরস এবং ১৯৫৮ সালে রচিত Estravagaris পার হয়ে তাঁর কবিতা আজ বিশ্বে নন্দিত। এসপারেন্টো সহ চব্বিশটি ভাষায় তাঁর কাব্য গ্রন্থের অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। অবশ্য খুচরো অনুবাদ হয়েছে পৃথিবীর প্রায় সব কটি লিখিত ভাষায়। তাঁর বিস্তৃত কবিতা থেকে যে-কোনো পাঠকই নিজের মনমতো নেরুদা বেছে নিতে পারেন। ফলে নেরুদার সমালোচকের সংখ্যাও যেমন নগণ্য নয়, ভক্তের সংখ্যাও গণনাতীত। কবিতা নিয়ে খুব একটা বইপত্র তিনি লেখেননি। কবিতা টগবগ করছে তাঁর জীবনে। তবু কখনো কখনো কবিতা নিয়ে আলোচনাসভায় তিনি কিছু কিছু প্রবন্ধ পাঠ করেছেন, যেমন, "The heart of poets, like all hearts, is an inexhaustible artichoke, but in it there are not only leaves for women of flesh and bone, for real loves or recurring dreams, but also for all the temptations of life, vanity included. No true poet is without some vanity, just as there are no great poets unpublished. So I shall go plucking the leaves of my vanity for us to eat together······the other leaves that I pluck from my heart, will be the pure product, vegetal, celestial, or earthly nourishment, poetry······" অথবা On Impure Poetry বিষয়ে তাঁর বক্তব্য, "দিন বা রাত্রির কোনো না-কোনো-সময়ে জিনিষপত্রগুলির দিকে নিবিড়-ভাবে তাকানো খুবই জরুরি: সেই সব চাকা যেগুলি বিস্তৃত ধূলিময় অঞ্চল পাড়ি দিয়েছে, বয়েছে সব্জি বা খনিজদ্রব্যের ভারিভারি মালের ঝাঁকা, বয়ে এনেছে কয়লা খনি থেকে বস্তা, ঝুড়ি, ছুতোরের যন্ত্রপাতির হাতল বা আংটা। সেগুলি মানুষ আর মাটির স্পর্শ নিয়ে ছড়িয়ে আছে উদ্বেল কবি হৃদয়ের শিক্ষা হয়ে। আস্তর গেছে ক্ষয়ে, মানুষের হাতের চিহ্ন আঁকা পড়ে আছে, এ-সব জিনিসপত্রের লাবণ্য কোনো-কোনো সময় শোকাবহ মনে হয় কিন্তু সব সময়ই মনে হয় অচরিতার্থ, আর সেই লাবণ্য বাস্তবের প্রতি এমন এক প্রীতির সম্পর্ক গড়ে তোলে, যাকে হাল্কাভাবে স্বাভাবিকতায় মেনে নেওয়া যায় না।

ব্যবহৃত বা পরিত্যক্ত হওয়া স্তূপীকৃত দ্রব্যসামগ্রী, হাতের বা পায়ের ছাপ রয়েছে সেখানে মানুষের। সেগুলির ভেতরে বা বাইরে রয়েছে মানুষের স্থায়ী চিহ্ন—ওগুলির মধ্যেই জড়িয়ে আছে মানুষের নানা বিভ্রম।

ও-ধরনের কবিতাই আমরা চাইছি, মানুষের হাতের শ্রমনিঃসৃত অ্যাসিড ঘাম আর ধোঁয়ায় যা ভরে আছে, লিলি আর প্রস্রাবের গন্ধ আছে একই সঙ্গে যাদের জড়িয়ে, আমরা যে-সব কাজ আইনীভাবে বা আইন ফাঁকি দিয়ে করে থাকি সব কিছু দিয়ে ভেজানো, ক্ষয়ে যাওয়া কবিতা আমরা চাই।…

মানুষের দেহের মতো খাবারের দাগে আর লজ্জায় জড়োসড়ো, কোঁচকানো; দাগদাগালিতে ভর্তি, স্বপ্ন, জাগরণ, ভবিষ্যকথন, প্রেম বা ঘৃণার ঘোষণা, বোকামি, ধাক্কা খাওয়া, গ্রামীন সারল্য, রাজনৈতিক বিশ্বাস, মেনে না নেওয়া, সন্দেহ, নিশ্চিতি, সরকারী কর সব কিছু নিয়ে পুরনো কাপড়ের মতো অবিশুদ্ধ কবিতা।"

আর তাই নেরুদার Canto General-এ পাওয়া যায় লাতিন আমেরিকার সৃষ্টি ও উদ্বর্তন, তার উদ্ভিদ-ইতিহাস-পশুপাখি-নিসর্গ, তার বীরদের কাহিনী। আর তাতেই আছে তাঁর Yo Soy (আমি) অংশটি।

পাবলো নেরুদার অন্যতম অনুবাদক স্কটিশ কবি অ্যালাস্টাইর রীড নেরুদার বাড়ির একটি চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন; এই বর্ণনায় ব্যবহৃত দ্রব্যসামগ্রীর উপরে নেরুদার আশ্চর্য প্রীতির চিহ্ন পাওয়া যায়।

"Objects everywhere, but objects found, chosen, touched, ships' figureheads leaning out from odd corners, pieces of net and tackle, shells. On the long, heavy table under the window which frames the Pacific, globes, ships under glass, as astrolabe, oddly shaped bottles, charts, papers, agates are spread in confusion. The swirl of the sea fills and even illuminates the room. Suddenly, Neruda comes in, like a captain descending from his bridge."

নিজের সম্পর্কে স্বদেশে নিজের শিকড়ের কথা বলতে গিয়ে নেরুদা বলেন:

আর আমার নাম পাবলো
এতকাল ধরে এই একই সত্তা
আমার প্রেমও আছে, আমার আছে সংশয়,

আমার আছে ঋণ,
আমার আছে বিশাল সমুদ্র জুড়ে খিদমদ্গার বাহিনী
তরঙ্গের পর তরঙ্গ হয়ে তারা আসে ;
আমি এমনই অধৈর্য যে
যে দেশ জন্মায়নি সে দেশ আমি দেখে আসি :
আমি সমুদ্র আর তার দেশবিদেশ দিয়ে যাই আর আসি,
আমি জানি
মাছের কাঁটার ভাষা,
দুরন্ত মাছের দাঁতের ধার
অক্ষরেখাগুলির শৈত্য,
প্রবালের রক্ত, তিমিমাছের স্তব্ধ রাত্রি,
কেননা গিয়েছি একদেশ থেকে ভিন্নদেশ আবিষ্কারের জন্ত
যেখানে সমুদ্রে মিশেছে নদীতে সেই খাড়ি, অসহ্য অঞ্চলগুলি,
এবং বারবারই ফিরে এসেছি, শান্তি পাইনি কোথাও :
আমার নিজের শিকড়ের কথা ছাড়া আর কোন কথাই-বা বলি।"

তরুণ সান্যাল

জন ডেসমণ্ড বার্নাল

পৃথিবীর প্রথম সারির বৈজ্ঞানিক, যাঁর মনের ব্যাপ্তি ও অতলস্পর্শী গভীরতা একটা এন্‌সাইক্লোপিডিয়ার মতন আজ মৃত। জ্ঞানের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই তিনি অনায়াসে বিচরণ করতেন আর তাদের অন্তর্নিহিত যোগসূত্রের সূক্ষ্ম চেহারা ধরতে পারাতে জীবন তাঁর কাছে প্রতিভাত হয়ে উঠতো নানা রঙে। এমন জীবন-রসিক মানুষও বিরল। তাঁর এন্‌সাইক্লোপিডিয় মনকে যেমন তুলনা করতে পারি ইউরোপীয় রেনেসাঁস-এর অন্যতম পুরুষ লিওনার্দো-দা ভিঞ্চির সঙ্গে, তেমনি ইতিহাসের অগ্রগতির সেই একই অমোঘ নিয়মে, আজকের রেনেসাঁসের যুগদর্শন মার্কসবাদে ও মার্কসীয় বিচার পদ্ধতি তথা ডায়ালেকটিক বস্তুবাদে তাঁর আস্থা ছিল অটুট, অধিকার ছিল অপ্রতিহত।

জ্ঞানের নানা ক্ষেত্রে অবাধ বিচরণের মূল্য তাঁকে দিতে হয়েছে রিসার্চের কোনো একটি একক বিষয়ে হিসাবমতো ও নিয়মমতো কাজ না করে, যেটা করতে পারলে ব্রিটেনের অন্যতম বিজ্ঞানী সি. পি. স্নোর মতে, বার দু-তিন নোবেল প্রাইজ পাওয়া তাঁর পক্ষে অসাধ্য ছিল না। আর মার্কসবাদী হলেও অতোবড়ো বৈজ্ঞানিককে ব্রিটেনের রক্ষণশীল বুর্জোয়া শাসকশ্রেণী কিছুতেই উপেক্ষা করতে পারেনি, ব্রিটেনের বাড়ি তৈরির প্রোগ্রাম থেকে দেশরক্ষার সামরিক বিভাগের বহু ব্যাপারে তিনি ছিলেন অন্যতম উপদেষ্টা।

এই বিরাট বৈজ্ঞানিক প্রতিভাই কাজ করেছিল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ইউরোপে দ্বিতীয় রণাঙ্গন খোলার পরিকল্পনাতে। সামরিক অভিযানের ইতিহাসে এটা ছিল অন্যতম দুঃসাহসিক কাজ এবং প্রফেসার বার্নাল ছিলেন তার প্রধান মস্তিষ্কস্বরূপ। অবশ্যই তিনি মার্কসিস্ট তথা কমিউনিস্ট, ব্রিটেনের সমরবিভাগে এ-নিয়ে আপত্তি উঠেছিল, স্বয়ং চার্চিল ও লর্ড মাউণ্টব্যাটেনের হস্তক্ষেপে সেটা তুলে নিতে হয়। কথিত আছে (সি. পি. স্নো লিখেছেন) এই সময়ে প্রফেসার বার্নাল কাজ-কর্মে সাহায্য করার জন্য তাঁর একজন ছাত্রকে যখন সহকর্মী রূপে নিযুক্ত করতে চান, তখন দেখা গেল সামরিক গুপ্তচর বিভাগ

আপত্তি জানিয়েছে এই ছাত্রটির নিয়োগে—যুক্তি ছাত্রটি একজন বিখ্যাত কমিউনিস্টের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখে—কে সে কমিউনিস্ট, অবশ্যই প্রফেসার জে. ডি. বার্নাল!

* * *

প্রফেসার বার্নালের জন্ম ১৯০১ সালে আয়ারল্যাণ্ডে, স্বচ্ছল মধ্যবিত্ত পরিবারে। ক্যাথলিক ধর্মীয় অনুশাসনে মানুষ তিনি, বালকবয়সে যথেষ্ট ধর্মবিশ্বাসীও ছিলেন, পরে অবশ্য মার্কসবাদী। ১৯১৯-এ তিনি প্রথম যখন কেমব্রিজে অধ্যয়ন করত এলেন, প্রায় একই সময়ে এসেছিলেন প্রফেসার ব্ল্যাকেট, আর ক্যাভেন্‌ডিশ লেবোরেটারিতে কাজ শুরু করেছেন প্রফেসার রাদারফোর্ড। কেমব্রিজের বিজ্ঞানজগতে যথেষ্ট আলোড়নের সৃষ্টি করেছিলেন এই তরুণ মার্কসবাদী বার্নাল। কিন্তু পাশ করে তিনি চলে গেলেন ডেভিফ্যারাডে রিসার্চ লেবোরেটারিতে কেলাস (crystal) সম্পর্কে কাজ করতে।

আগেই বলেছি, বার্নালের মন সব কিছু একেবারে তলিয়ে দেখতে চায় এবং খুঁজে বার করতে চায় জ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে একের সঙ্গে অপরের যোগসূত্র। অথচ কেলাসের কাজ করতে হলে প্রচুর রুটিন কাজের একঘেঁয়েমি এড়াবার উপায় নেই। যে-মন এন্‌সাইক্লোপিডীয় ব্যাপ্তি নিয়ে বিচরণ করে সে কিন্তু রিসার্চের একঘেয়েমি, প্রায় যান্ত্রিক কাজ থেকে বিরত থাকেনি। ১৯৭২ সালে কেমব্রিজে কেলাস সম্পর্কে কাজের জন্য একটি লেকচারারের পদ তৈরি করে বার্নালকে নিযুক্ত করা হলো, তবে ক্যাভেন্‌ডিশ্‌ লেবোরেটারির বাইরে, কারণ বিজ্ঞানে রক্ষণশীল প্রায় গোঁড়া রাদারফোর্ড পদার্থ-বিজ্ঞানে তাঁর নিজস্ব বিশিষ্ট বিভাগের কাজের বাইরে অন্য ব্যাপারে রিসার্চ পছন্দ করতেন না।

১৯২৭ থেকে ৩৭ অবধি দশ বছর বার্নাল কেমব্রিজে কাজ করেছিলেন। তাঁর কলেজের লেকচারে ছাত্রদের ভিড় জমতো যথেষ্ট। কিন্তু তখনকার দিনের ছোকরা বিজ্ঞানীরা, হলডেন, ওয়াডিংটন, পিরি—উত্তরজীবনে প্রত্যেকেই এক-একজন মহারথী—এঁরা কেউই বার্নালের ছাত্র বলা যায় না, বৈজ্ঞানিক মতামত তাঁদের তখন গড়ে উঠেছে, তবে অনেক সময় বার্নালের 'নেতৃত্ব' তাঁরা মেনে নিতে প্রস্তুত ছিলেন—এই সকলকে নিয়ে একটা উজ্জ্বল বৈজ্ঞানিক গোষ্ঠি কেমব্রিজে গড়ে উঠেছিল। আর এই তরুণদের (কারুরই বয়স ত্রিশোর্ধে নয়) সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন বয়োজ্যেষ্ঠরা, রাদারফোর্ড তখনও বেঁচে

এবং যথেষ্ট কাজ করছেন, আর চ্যাড্উইক, সোভিয়েতের পিটার ক্যাপিজা, ব্র্যাকেট এবং বিশেষ করে ডিরাক্, আর গণিতজ্ঞ হার্ডি।

এর থেকে আমরা ত্রিশ-দশকের কেমব্রিজের বৈজ্ঞানিক আবহাওয়াটা খানিকটা অনুমান করতে পারি।

এই সময়েই বার্নাল জীববিদ্যার ক্ষেত্রে পদার্থ ও রসায়ন বিজ্ঞানের নিয়মকানুন প্রয়োগ করতে আরম্ভ করেন। তাঁর বক্তব্য ছিল, বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখাতে একই প্রাকৃতিক নিয়মগুলি কাজ করে যাচ্ছে এবং সেগুলিকে যতই আমরা ধরতে ও বুঝতে পারব ততই বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখাতে রিসার্চের নতুন কিন্তু অন্যদিকে আরো সহজ রাস্তা খুলে যাবে। তাঁর একেবারে শেষ পুস্তক 'Origin of Life'-এর ভূমিকাতে তিনি লিখছেন :

"The original differentiation between the physical and the biological sciences was one which I had never accepted even in my schooldays ; and while at Cambridge I had the good fortune to frequent the laboratory which was, after the Cavendish, the centre of scientific advance in that University, the Dunn Biochemical Laboratory under the direction of Sir Frederick Gowland Hopkins. Naturally, I was struck both by the affinities and the differences between the physical and the biological sciences. I was impressed by the precise way in which all biological phenomena, when carefully investigated, turned out to be in accordance with physical laws, including those of Chemistry, and not to involve any special vital principles."

এই বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গিই তাঁকে প্রাণের বস্তুবাদী সংজ্ঞা নির্ধারণে নিয়োজিত করল। পদার্থ-বিজ্ঞানে কেলাসের গঠন-প্রণালী স্থির করতে যে-সমস্ত কৌশল (research technique) তিনি আয়ত্ত করেছিলেন এবার তাদের প্রয়োগ করতে লাগলেন জীববিজ্ঞানের এমাইনো এ্যাসিড, ভিটামিন প্রভৃতির গঠনতন্ত্র বোঝবার কাজে, তারপর ধরলেন প্রোটিন, ভাইরাস এবং শেষ অবধি জল— কারণ বেশির ভাগ প্রাণীর জৈবিক গঠনের মূলে রয়েছে জল। এই জল এবং তরল পদার্থের গঠনতন্ত্র (structure of liquids) আবিষ্কারের কাজ আবার

তিনি পঁচিশ বছর পরে শেষ জীবনে করেছিলেন।

বার্নালের এই বিশেষ কাজ শেষ অবধি অণুর জৈবিক গঠন, (molecular biology) সম্পর্কে নতুন এক বৈজ্ঞানিক শাখার জন্ম দিল। পদার্থ আর জৈবিক বিজ্ঞানের মধ্যে বার্নাল হয়ে দাঁড়ালেন যেন একজন মিড্‌লম্যান, একের পণ্যদ্রব্য যেন অন্যের কাছে পৌছে দিচ্ছেন তিনি।

১৯৩৯-এ লাগলো দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ। প্রথমদিকে যুদ্ধের সাম্রাজ্যবাদী চরিত্রের বিরোধিতা করলেও হিটলার-জার্মানির বোমারু বিমানের আক্রমণ থেকে লোকজনের জীবনরক্ষার্থে বার্নাল সর্বশক্তি নিয়োগ করেন। ১৯৪০-এ লণ্ডনের সেণ্ট প্যাংকরাস রেলওয়ে স্টেশনে (আমাদের শেয়ালদার মতো জনবহুল) একটি না-ফাটা (unexploded) বোমা পড়েছিল। যে-কোনো মুহূর্তে বিস্ফোরণ হতে পারে। সবার আগে ছুটে গেলেন প্রফেসার বার্নাল নিজের জীবন বিপন্ন করে; নিরাপত্তার ব্যবস্থা হবার পরে, তিনি ধীরে-সুস্থে স্টেশন মাস্টারকে খবর দিলেন স্টেশন চালু করতে। এই সাহসের কোনো বহিঃপ্রকাশ নেই, দৈনন্দিন আর পাঁচটা কাজেরই মতো তিনি এটা করেছিলেন, যদিও কর্তৃপক্ষ জানতে পারলে তাঁকে এটা করতে দিতো না।

হিটলার সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণ করার পরে দুনিয়াজোড়া ফ্যাসি-বিরোধী সংগ্রামে ইউরোপে দ্বিতীয় রণাঙ্গন খোলার ব্যাপারে প্রধান ব্রেন যেমন ছিলেন তিনি, তেমনি আবার দ্বিতীয় রণাঙ্গন খোলার দিন (৬ই জুন, ১৯৪৪) তিনি প্রথম সারির সেনাবাহিনীর সঙ্গে নাবিকবাহিনীর লেফ্‌টেনাণ্টের বেশে ফ্রান্সের উপকূলে উপস্থিত ছিলেন নিজের থিওরির সত্যাসত্য যাচাই করতে। দ্বিতীয় রণাঙ্গন খোলার অন্যতম প্রধান সমস্যা ছিল—ফ্রান্সের উপকূলের চেহারা ঠিক কিরকম তা জানা এবং এরজন্য তাঁকে পড়তে হয়েছে বহু পুরনো ঐতিহাসিক নথিপত্র। দ্বিতীয় রণাঙ্গন খোলার ব্যাপারে প্রফেসার বার্নালের পুরো অবদানের কথা এপর্যন্ত লিপিবদ্ধ হয়নি, ভবিষ্যতে হবে কি-না, তাও জানি না।

'পরিচয়'-এর পাঠকগোষ্ঠির পক্ষে বিশেষ গর্বের কথা যে, ১৯৪৪-এর শেষের দিকে তখনকার 'পরিচয়-'এর শুক্রবারের সাপ্তাহিক আড্ডায় একবার ইউরোপ থেকে প্রফেসার বার্নাল এবং চীন থেকে ইউরোপ যাত্রার পথে প্রফেসার নীড্‌হ্যাম, দুজনেই এসে হাজির হন। আসলে প্রফেসার নীড্‌হ্যামেরই একা আসবার কথা ছিল, কিন্তু বার্নাল সেদিনই কলকাতায় পৌছতে তাঁকে

সাদরে আনা হয়। হিটলার পদানত ও ইউরোপের দেশে-দেশে ফ্যাসি-বিরোধী মুক্তিসংগ্রামের কাহিনী আমরা সেই প্রথম তাঁর কাছে শুনতে পাই।

পঞ্চাশোর্ধে প্রফেসার বার্নাল যখন একদিকে বিশ্বশান্তি কাউন্সিলের অন্যতম নেতা এবং বিশেষ ব্যস্ত, ঠিক তখনই তিনি জলীয় পদার্থের গঠনতন্ত্র (structure of liquids)-এর রিসার্চের কাজে নিমগ্ন। তাঁর এক বিশিষ্ট ছাত্রের কাছে শুনেছি, প্রফেসার বার্নালের কাছে রিসার্চ করার কতো সুখ। আমার স্বাভাবিক কৌতূহল ছিল, বার্নালের দুনিয়া-জোড়া এতো কাজের মধ্যে তিনি রিসার্চ ছাত্রদের উপদেশ ও কাজে নির্দেশ দেবার যথেষ্ট সময় পেতেন কি না? ছাত্রটি তাতেই বলেছিলেন, নিয়মিত নির্দেশ ছাড়াও সাময়িক বৈজ্ঞানিক পত্র-পত্রিকাতে ছাত্রের রিসার্চের কাজে লাগতে পারে এরকম যত প্রবন্ধাদি বেরতো, সব বার্নাল আগেই পড়ে, দাগ দিয়ে বা প্রয়োজনমতো নোট দিয়ে ছাত্রের কাছে নিয়মিত পাঠিয়ে দিতেন।

ছাত্র-জীবন থেকেই যিনি মার্কসবাদী মতবাদে গভীর বিশ্বাসী এবং এ-নিয়ে তাঁর বিশিষ্ট সহকর্মীদের সঙ্গে অনেক সময় মতান্তরও হয়েছে, তিনি যে তাঁর অধ্যাপনা জীবনের প্রায় প্রথম থেকেই যুদ্ধের বিরুদ্ধে ও শান্তির স্বপক্ষে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করবেন এবং বিশ্বের প্রতিটি মুক্তিস্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গেই নিজেকে যুক্ত করবেন, এটা প্রায় স্বতঃসিদ্ধ। ত্রিশ-দশকে প্রফেসার বার্নাল ভারতের স্বাধীনতার জন্য সক্রিয়ভাবে ইণ্ডিয়া লীগের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, ১৯৩৪ সাল থেকে কেমব্রিজে বৈজ্ঞানিকদের যুদ্ধবিরোধী সংস্থা গড়ে তোলেন, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ফ্যাসিবাদকে ধ্বংস করতে সর্বশক্তি নিয়োগ করেন, এবং যুদ্ধান্তে যখন স্নায়ু বা ঠাণ্ডা যুদ্ধ আরম্ভ হলো এবং পারমাণবিক যুদ্ধাস্ত্র নিয়ে আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদীদের তড়পানি শুরু হলো, প্রফেসার বার্নালও সক্রিয়ভাবে তখন থেকেই বিশ্বশান্তি আন্দোলনের অন্যতম নেতা রূপে পুরোপুরি নিজেকে নিয়োগ করলেন। আবার এই সময়েই, পঞ্চাশোর্ধে, ১৯৫৪ সালে তিনি লিখলেন 'Science in History,' যেটি আবার ১৯৬৫ সালের পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত তৃতীয় সংস্করণে পুরো চার খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে,* বইটিকে প্রায় একটি এন্‌সাইক্লোপিডিয়া বলা যেতে পারে। বিস্মিত হতে হয় যে, বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তথা শিল্পকলা সাহিত্য প্রভৃতি বহু বিভাগে তাঁর কি স্বচ্ছন্দ আয়াসহীন বিচরণ। এর সম্পর্কে একটি ঘটনার উল্লেখ করা যেতে

* পরিচয়, শ্রাবণ ১৩৭৬ সংখ্যায় লেখকের এই বই সম্পর্কে সমালোচনাটি প্রকাশিত হয়েছে।

পারে। একবার প্রফেসার বার্নাল হাঙ্গেরীর দুজন বিশিষ্ট পুরাতত্ত্ববিদদের সঙ্গে সেখানকার একটি পুরনো আধা-ধ্বংসপ্রাপ্ত গীর্জা দেখতে যান। কোন যুগে কত বছর অতীতে ঐ গির্জাটি নির্মিত, তা নিয়ে দুজন পুরাতত্ত্ববিদের তর্ক জমে উঠে। বার্নাল কথার পিঠে বলে বসলেন, এটি অমুক যুগে তৈরি, কারণ গির্জাটি যে মালমশলা দিয়ে তৈরি হয়েছে, সেটি ইউরোপে ঐ যুগেই বিশেষ করে পাওয়া যেত। তর্কের মীমাংসা হলো।

তেমনি শেষবারে, ১৯৬১ সালে যখন বার্নাল দিল্লীতে বিশ্বশান্তি কাউন্সিলের মিটিং করে কলকাতা এসেছিলেন, তখন কলকাতায় দুই দিন তাঁকে দেখেছি, প্লেন থেকে নেমেই সোজা যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে 'structure of liquids' সম্পর্কে বক্তৃতা করতে; তারপর বিকালে সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে বিশ্বশান্তি সম্পর্কে জনসভাতে বক্তৃতা করতে, রাত্রে প্রফেসার হলডেনের সঙ্গে বহু রাত্রিঅবধি নানাবিধ বিষয়ে আলোচনা করতে—পরের দিনও তাই। বিশ্বশান্তির যোদ্ধা ও অন্যতম নেতার জীবনযাত্রাতে শান্তির জন্য সংগ্রাম ও বিজ্ঞান সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসার মধ্যে কোনো তফাৎ ছিল না, কর্মযোগী ও জ্ঞানযোগীর জীবন একই সূত্রে বাঁধা।

মানুষের বিজ্ঞান, শিল্প, চারুকলার অন্তর্নিহিত যে-যোগসূত্রটির সামগ্রিক রূপটি ধরতে পারলে আমরা পুরো মানুষ হয়ে উঠতে পারি, বার্নালের জীবনসত্তাতে সেই অনবদ্য সুসংহত রূপটির সঙ্গে মিলে গিয়েছিল তাঁর অতলস্পর্শী জ্ঞান ও মার্কসবাদসঞ্জাত মানবিকতা ও কর্মের প্রেরণা; একাধারে তাই তিনি বড়ো বিজ্ঞানী ও দার্শনিক, বড়ো যোদ্ধা ও মানবদরদী, আবার মরমী জীবনরসিক। তাঁর অমর স্মৃতির প্রতি আমরা গভীর শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করি।

দিলীপ বসু

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ

[১৯২০-১৯৭১]

সম্প্রতি পারী থেকে একটি শোকবার্তা এসেছে। বাঙলাদেশের বিশিষ্ট কথা-শিল্পী সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ হঠাৎ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। ওয়ালীউল্লাহ দীর্ঘকাল ফরাসী দেশেই ছিলেন। পাকিস্তান বৈদেশিক মন্ত্রকের অধীনে এবং ইউনেস্কোর কাজে তাঁকে নানা দেশে ঘুরতে হয়েছে বিস্তর। কিন্তু বাঙলা সাহিত্যকে সেবা করা থেকে কখনই তিনি দূরে সরে থাকেন নি। বরং নিরন্তর পরীক্ষা নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে, গল্প-উপন্যাস-নাটকে তিনি ছিলেন প্রগতিবাদী চিন্তার এক বিশিষ্ট নায়ক।

বিভাগ-পূর্ব ভারতে কলকাতায় প্রথম জীবনে তিনি ছিলেন একটি বিশিষ্ট ইংরাজি দৈনিকের সাংবাদিক। দেশ বিভাগের পর তিনি ঢাকায় পাকিস্তান রেডিয়োয় গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত হন। তিনি অবহেলিত সাধারণ চাষী-কেরায়া-মাঝি প্রভৃতির জীবন নিয়ে রচনা করেন তাঁর বিশিষ্ট পরীক্ষামূলক উপন্যাস 'লাল সালু'। 'চাঁদের অমাবস্যা' উপন্যাসটির রচনাকাল ১৯৬৪। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র গল্পগ্রন্থ 'নয়নচারা' ও 'দুই তীর', উপন্যাস 'কাঁদো নদী কাঁদো' এবং 'তরঙ্গভঙ্গ' নাটক জিজ্ঞাসু পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

পাকিস্তান সরকারের প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপে সম্প্রতি তাঁকে ইউনেস্কোর চাকরীটি হারাতে হয়। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ বাঙলাদেশের মুক্তিফৌজে যোগদানের জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। অকস্মাৎ অকালমৃত্যু তাঁর সে ইচ্ছা সফল হতে দিল না। কিন্তু তিনি বাঙলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের দীর্ঘকালীন অনলস যোদ্ধা। যে-নতুন প্রগতিশীল সংস্কৃতি ও জীবনের দাবিতে পূর্ব পাকিস্তান আজ বাঙলাদেশে পরিণত হয়েছে তার ভিৎ তৈরী করার কাজে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহও একজন বিশিষ্ট রূপকার। ওয়ালীউল্লাহ সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গবাসী পাঠকদের ধারণা সীমাবদ্ধ, এই বিশিষ্ট কথাশিল্পী সম্পর্কে এ-বাঙলায় মূল্যায়ন এখনও অপেক্ষিত।

ইকবাল ইমাম

কবিতা পাঠকের দ্বিরুক্তি

"তিরিশের দশকের···বিদ্রোহ"কে "লক্ষ্যহীন" বলতে হবে কেন, আর তার প্রধান পরিচয়ও বা কেন হবে "অপার দেহবিলাস।" অথচ সতীন্দ্রনাথ মৈত্রের মতো একজন প্রাজ্ঞ পাঠক ও কবি তো 'সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা' শিরোনামে পরিচয় সমালোচনা সংখ্যায় (শ্রাবণ ১৩৭৮) এই বলেই শুরু করলেন। ১৯৩০ থেকে ৪০ এর ভেতর তো অজিত দত্তর 'কুসুমের মাস,' 'পাতাল কন্যা,' প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'প্রথমা,' জীবনানন্দের 'ধূসর পাণ্ডুলিপি,' সুধীন্দ্রনাথের 'অর্কেষ্ট্রা', 'ক্রন্দসী', 'উত্তর ফাল্গুনী'; বিষ্ণু দে-র 'উর্বশী ও আর্টেমিস' 'চোরাবালি' 'পূর্বলেখ' অমিয় চক্রবর্তীর 'খশড়া' 'একমুঠো' বেরিয়ে গেল। না-কি কল্লোল, কালিকলম প্রগতি পত্রিকাগুলির প্রসঙ্গ তাঁর মনে ছিল। তবে কি 'তিরিশের দশক'বাঙলা সনের হিসেবে? কিন্তু সেটা তো'সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা'-র অব্যবহিত হবে না। সমর সেন ও বিষ্ণু দে কি তিরিশের দশকের 'অপার দেহ বিলাসের' ক্লান্তির প্রতিক্রিয়া। নাকি ১৯১০ থেকে ১৯৩০ পর্যন্ত সময়ের প্রতিক্রিয়ায় জীবনানন্দ, সুধীন্দ্রনাথের সহযাত্রী। তিরিশের দশকের কবিদের ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিত ব্যাখ্যা করে সতীন্দ্রনাথ মৈত্র মোহিতলাল থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন। মোহিতলালকেই তিরিশের দশকের প্রতিনিধি স্থির করা হয়েছে কবে থেকে?

বার কয়েক 'বন্দীর বন্দনা' আর বুদ্ধদেব বসু-র উল্লেখের ইঙ্গিতমাত্রে তুষ্ট না থেকে সতীন্দ্রনাথ মৈত্র দ্বিতীয় অনুচ্ছেদেই বলে দিয়েছেন স্পষ্টই, "সুভাষের প্রথম আবির্ভাবকে স্বাগত জানালেন" বুদ্ধদেব বসু—"এটা কিন্তু যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ" এবং "সুভাষের কবি প্রতিভার বিশিষ্টতার চাবিকাঠিটিও এরই উত্তরের মধ্যে নিহিত!" অথচ সতীন্দ্রনাথ তো কোনো প্রশ্নই তোলেন নি, "এরই উত্তর" মানে কিসের উত্তর? প্রথম অংশের শেষ অনুচ্ছেদে কিন্তু তিনি বললেন "তাঁর (সুভাষের) আবির্ভাব···সকলকেই খুশি করে তুলেছিল ও এমন কি জীবন দর্শনের আসমানজমিন ফারাক সত্ত্বেও বুদ্ধদেব বসুকেও"। তাহলে, সতীন্দ্রনাথের মতে, সকলে যে কারণে, বুদ্ধদেবও সে-কারণেই খুশি, সুভাষের প্রতি বুদ্ধদেবের স্বাগত সম্ভাষণ আর সকলের খুশিরই অন্তর্গত ছিল! তাহলে সুভাষের "কবি প্রতিভার বিশিষ্টতা" শুধুমাত্র বুদ্ধদেবের প্রশস্তির ভেতরই "নিহিত"—এমন একটা বিস্ময় চিহ্নিত মন্তব্য তিনি শুরুতেই করে নিলেন কেন।

বুদ্ধদেবের কেন 'পদাতিক' ভালো লেগেছিল তাতো তিনি স্পষ্টই বলে রেখেছেন, কোনো অনুমানের ওপর ফাঁক রাখেন নি। সেই ১৯১০ সাল থেকে বাঙলা কবিতার যে নূতন পরীক্ষা শুরু হয়েছিল তার ভেতর ব্যাপক আর নির্মিতি—এ দুটো প্রয়োজনেরই তাগিদ ছিল। পদাতিক এই দুটো প্রয়োজনকে মিলিয়েছিল। বুদ্ধদেব বসু কিন্তু প্রধানত নির্মিতির সাফল্যের জন্যই পদাতিকের কবিকে অভিনন্দিত করেছিলেন। বাঙলাছন্দের মাত্রা গণনার রেওয়াজ সুভাষের কবিতায় পালটে গেল। শব্দ ব্যবহারের বিচারও। বুদ্ধদেব বসুর পদাতিক আলোচনায় শব্দ ও ছন্দ সম্বন্ধীয় মন্তব্যই প্রধান। বুদ্ধদেব বসু সেদিন পাঠককে ছন্দপাঠের বিশেষত্বের দিকে টেনেছিলেন "গোলদীঘির গর্তে" আর "গভে"—শব্দের এমন পার্থক্যের তাৎপর্যের দিকে।

বোঝা যাচ্ছে, তাতে কিছু লাভ হয় নি। কারণ সেই প্রবন্ধ রচিত হয়ে যাওয়ার তিরিশ বছর পরেও সতীন্দ্রনাথ 'পদাতিক'-এর শব্দ ব্যবহার নিয়ে বলেন "কেমন অনিবার্য মিল দুটি চরণকে মিলিয়ে দিচ্ছে, সতেজ প্রাণবান শব্দ সমষ্টি ঝলমল করছে কবিতার শরীরে কিন্তু সব মিলিয়ে যা পাই তাতে মন ভরে না।" মন না ভরতে পারে—কারণ ওটা প্রমাণসহ নয়। কিন্তু কিছু শব্দ 'সতেজ' 'প্রাণবান' থাকে না কি? অথবা কবিই শব্দকে 'সতেজ' 'প্রাণবান' করে তোলেন। আর যে কবি তা করতে পারেন তিনি 'বনফুলের বিখ্যাত পাঠক' 'প্রাচ্য আলংকারিক' 'জর্জ টমসন সাহেব'—বা 'সীমান্ত' পত্রিকা এত কিছুর অপেক্ষা না করেই সফল। তাহলে পরীক্ষাটা হওয়া উচিত ছিল শব্দগুলো নিয়ে শব্দব্যবহার নিয়ে। কিন্তু সতীন্দ্রনাথ দুটো মাত্র উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছিলেন তাঁর "মনে হয়েছে পদাতিকের যুগে সুভাষ বুদ্ধির দিক থেকে বিশ্বাসের জগতে এসে উপস্থিত হলেও, তখনও পর্যন্ত তিনি তাকে হৃদয় দিয়ে গ্রহণ করতে পারেন নি।" এটা তাঁর মনে হয়েছে কারণ তিনি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের শব্দগুলোকে বা বাক্‌ভঙ্গীকে ঐতিহাসিকতায় দেখছেন না।

বিষ্ণু দে, সমর সেন আর সুভাষ মুখোপাধ্যায় নাগরিক মধ্যবিত্তের দৈনন্দিন শব্দ ব্যবহারের একটা কাব্য সমতুল (poetic equivalent) তৈরি করতে চাইছিলেন। এঁদের ভেতরও সূক্ষ্ম ভাগ ছিল। বিষ্ণু দে-র ও সমর সেনের বাচন যথাক্রমে নাগরিক বুদ্ধিজীবী-র ও নাগরিকের হতাশ আবেগের জগতের কাব্য সমতুল। সুভাষের বাক্‌রীতি সক্রিয় রাজনীতির আড্ডা-আসর-মিছিল-মিটিংয়ের কাব্যসমতুল। সতীন্দ্রনাথের মতটি পরীক্ষার জন্য 'সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের

কবিতা' বইটিতে গৃহীত 'পদাতিক'-এর কবিতা কটিতে মুখের কথার রীতি খোঁজাখুজি করতে গিয়ে দেখা গেল কোথায় যে কবির বাক্‌রীতিই চলতি হয়ে যাচ্ছে তা পৃথক করা যাচ্ছে না। মাত্র তিনটি কবিতার উদাহরণ দেখা যায় এতগুলো প্রবচনের ব্যবহার—উচু আঙ্গুরের আশা, সংশোধনের পথ বাৎলেছি, ছুঁয়েছি যখন বুড়িকে, বুলি কপচানো থাসা তো, ভাঙচি ঘটায় শৃগালবুদ্ধি, (আদর্শ) কড়ায় গণ্ডার·· প্রাপ্য গুণে নেন, ব্যর্থমনোরথ পাণ্ডা, স্থান···ভাগাড়ে, নেড়ে দিলেন চিবুক (দলভুক্ত), হা হতোস্মি, বেঁধেছি ডেরা, ফুলের বেসাতি: হিংস্থক হাওয়া দেহে আঁকে চকখড়ি, ফাঁকা ভাঁড়ারের ওস্তাদ সংসারী, পড়ুক অন্ধ ছানি, পাড়ের কড়িও গোনা, ভবলীলা শেষ (পদাতিক)। আবার কবির বাক্‌রীতি প্রায় প্রবচনতুল্য হয়ে উঠেছে তার কিছু উদাহরণের জন্য মাত্র প্রথম দুটি কবিতাতেই দেখা যাক্।—রেডিও তাড়াবে দুপুর মহিলা আসরে, ভুখা সমাজকে ভাঁওতা দিয়েছি সদলে, পাঁঠা যোগ্য প্রেমের প্রসাদী, দীর্ঘ আড্ডা জমবে জনপ্রবাদে, নায়ক অধুনা কংগ্রেসী মনোনয়নে (আদর্শ), নির্ভীক মিছিল শুধু পুরোভাগে পেতে চায় নির্ভুল গায়েন, ইতিহাস স্পষ্ট বক্তা, সবি তো শূন্যের রঙ্গ-বিরঙ্গ পাতায় সংখ্যা দেখে হাওয়াগাড়ি, সাবাস বল্লভ ভাই! নিরপেক্ষ থেকে আর চিত্তে সেই সুখ (দলভুক্ত)। এতেই কি এটুকু প্রমাণ মেলে না যে সুভাষ কৃত্রিমভাবে প্রবচনের ভঙ্গি নেন নি; আসলে সেটাই ছিল তাঁর কাব্যভঙ্গি। "তবে কি নাছোড়বান্দা ফাল্গুন, কমরেড ?" "পর্দায় সর্দার হাওয়া কসরৎ দেখায়" "গোলদীঘির গর্তে চাঁদ ধরা পড়ে গেছে" শব্দের ও বাক্যের নির্মিতিতে কবির দক্ষতার চিহ্ন এই চরণগুলি-ই বুদ্ধদেব বসুর উদাহরণ। আবার সতীন্দ্রনাথও এই কটি লাইন বেছে নিয়েই 'জিজ্ঞাসু'। উপরি উদ্ধৃত পংক্তিগুলিতে যা বলা হয়েছে তা কি "কবির বিশ্বাসের রসে জারিত, না এগুলি তার পূর্ব নির্ধারিত সিদ্ধান্ত, যা তিনি মনোহারী শব্দে ছন্দে বেঁধে পাঠকদের সামনে উপস্থিত করছেন ?" কবিতার পংক্তিতে "বিশ্বাসের রসে জারিত" হওয়ার লক্ষণ কি ? "বিশ্বাসের রসে জারিত" হতে হলে কি "পূর্ব নির্ধারিত সিদ্ধান্ত" হওয়া চলবে না ? হতে হবে তাৎক্ষণিক ? শব্দে ছন্দে মনোহারিতা কি কবির ব্যর্থতারই নজির ? আসলে সতীন্দ্রনাথ এই চরণকটিকে বা পদাতিকে এমন আরো অংশকে বিষয় হিসেবে বিচার করেন নি। করলে দেখতেন, প্রথম চরণের ঐ কমাটির পর প্রশ্নাকারে "কমরেড ?" আর তৃতীয় চরণের চালিয়াতির চালে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শুরুতে নাগরিক মধ্যবিত্তের বাসন্তী কলকাতার মেজাজ

পাচ্ছেন—সেই মেজাজটুকুর নামই কবিতা। 'পদাতিকের' সফলতার ঐতিহাসিকতা এইখানেই যে কবি প্রাকদ্বিতীয়যুদ্ধ নাগরিক মেজাজের সক্রিয়তার একটা সমতুল রচনা করতে পেরেছিলেন।

তাঁর আলোচনার তৃতীয় অংশের শুরুতে "সুভাষের আবির্ভাবই পরবর্তী কবিকুলকে প্রগতিশীল ও দক্ষিণপন্থী—এই দুই প্রতিদ্বন্দ্বী শিবিরে খাড়াখাড়ি ভাবে বিভক্ত করেছে।...এরপর থেকে বাঙলা কবিতা এই দুটি ধারাতেই প্রবাহিত হয়ে এসেছে" এমন একটা মন্তব্যেও, সতীন্দ্রনাথ 'পরিচয়'-এর পাতাতে কোনো প্রমাণ রাখার দরকার বোধ করলেন না। বাঙলাসাহিত্যে কবিদের প্রগতিশীল ও দক্ষিণপন্থী এমন শিবির কি রয়ে গেছে? পাকাপাকি? সামাজিক ক্ষেত্রে প্রগতি-প্রতিক্রিয়ার দ্বন্দ্ব যতোদিন কবিদের ব্যক্তি ভূমিকা অনুযায়ী, তার দ্বারা তাঁরা চিহ্নিতও হবেন।

জাতীয় ধনিকশ্রেণী দেশের সংস্কৃতির ওপর একচেটিয়া কব্জা কায়েমের খোয়াবে কমিউনিস্ট বিদ্বেষের চৌহদ্দিতে জন-আন্দোলনের বিরোধিতাকেই যখন তা-দিতে থাকে আর জন-আন্দোলনের প্রসারিত স্রোতে সব ভাসিয়ে নেয়ার বদলে কমিউনিস্টরা যখন উল্লম্ব লড়াকু নীতির প্রান্তরে চলে যায় তখন তার কৃত্রিম প্রভাবে কাব্যসাহিত্যসঙ্গীতে প্রগতি-প্রতিক্রিয়ার একটা ওপর পট্‌কা ভাগাভাগি চলে। সেই ভাগাভাগির শিল মোহর দেয়া চলতে থাকবেই নাকি, এই ১৯৭১ সালেও, যখন জীবনানন্দ আর বুদ্ধদেব বসুকে 'পরিচয়'-এর পাতায় তীব্র আক্রমণ করেছিলেন যিনি সেই সুভাষ মুখোপাধ্যায়কে শোধনবাদী খেতাব দেবার সমালোচকের বা পাঠকের অভাব হয় না? ইতিহাসে এমন কৃত্রিম ভাগাভাগি আরো কতদিন? কিন্তু সতীন্দ্রনাথ যদি বলতেন, রাজনীতির কবি ও অরাজনীতির কবি—এই দুটি ভাগ তাহলে সে-কথা স্বীকার করে নিতে হতো। সেক্ষেত্রেও তো দেখা যাবে অরাজনীতির কবিদের কাছেও সুভাষ মুখোপাধ্যায়-ই সবচেয়ে স্বীকৃত রাজনীতির কবিদের একজন। কারণ অরাজনীতির কবিতার ভেতর কবিতার নির্মিতির যে একটি স্বাধীন অন্বেষণ আছে—সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতায় তার তৃপ্তি জুটে যায় তাঁদেরও, যাঁরা তাঁর রাজনীতিকে নিতে চান না। সুকান্তকেও এমনি করে গ্রহণের চেষ্টা শুরু হয়েছিল। আর এখন তো রাজনীতির অনেকগুলি বিষয়, বাঙলা কবিতারই বিষয় হয়ে উঠেছে।

সতীন্দ্রনাথ বলেছেন "চিরকুটেই প্রথম দেখতে পাই আমাদের দৈনন্দিন

ব্যবহারের ঘরোয়া শব্দগুলি, গ্রাম্য ইডিয়ম ইত্যাদি আসতে শুরু করেছে কাব্যের আসরে।" যদি এমন মন্তব্য নেহাত করতেই হয় তাহলে আরো নির্দিষ্ট উদাহরণ প্রমাণের সমর্থন আমাদের বোঝার পক্ষে খুব জরুরী। এই আমরা কারা? কাদের দৈনন্দিন ব্যবহার?

শব্দের কোন্ ঘরোয়া? গ্রামের কোন্ ইডিয়ম? মেয়েলি? চাষ আবাদের? জমিদারি জোতদারির? এ-সব পৃথক করে বলা দরকার। দুটি কবিতার তুলনায়ই দেখা যাবে। 'পদাতিক'-এ 'অতঃপর' আর 'চিরকুট'-এর 'চিরকুট' কবিতা দুটির ভঙ্গি একই—আবেদনের। দুটিতেই ইডিয়ম ব্যবহার করা হয়েছে। প্রথমটিতে জমিদারি-জোতদারির ইডিয়ম, দ্বিতীয়টিতে ভূমিহীন চাষীর। 'অগ্নিকোণ'সহ চিরকুটে "কবির ভাষণের গাঢ়তা সহজেই চোখে পড়ে··· নিরাভরণ আন্তরিকতায় কবি উচ্চারণ করেছেন"—সতীন্দ্রনাথের লক্ষ্যে এসেছে। বিশদ বিশ্লেষণের অভাবে এমন মনে হয় ঘরোয়া ঘরানাই বোধ হয় তার কারণ। এমন একটি ধারণা বেশ প্রতিষ্ঠিতও বটে। কিন্তু আলোচ্য গ্রন্থ পরীক্ষা কালে দেখা যাচ্ছে অগ্নিকোণের তিনটি কবিতাতেই তৎসম শব্দের ব্যবহার তুলনামূলক বেশি, অন্তত প্রথম দুটি কবিতা ছন্দের গোঁড়া কাঠামোয় বাঁধা, তৃতীয় কবিতাটিতেও পয়ারের স্রোতেই যুক্তধ্বনিগুলি আলগা ভাসছে। চিরকুটের 'উজ্জীবন' ও 'ঘোষণা'-ও তৎসম শব্দে প্রাচীনতার ভঙ্গিতেই উচ্চারিত এমন-ই কবিকে 'ঘোষণা'-তে 'পৃথ্বী' শব্দটিও ব্যবহার করতে হয়েছে—অনুমান 'পৃথিবী' বোঝাতে 'পৃথ্বী' বোধহয় সুভাষ মুখোপাধ্যায় এই একবারই ব্যবহার করেছেন। সুতরাং সতীন্দ্রনাথ অভিজ্ঞতা, গ্রামবাঙলার সঙ্গে কবির পরিচয় ও মায়াকভস্কির প্রসঙ্গ এনে চিরকুট অগ্নিকোণের নতুনত্বের যে হদিশ দিয়েছেন তা বাস্তবের সঙ্গে মেলে না। 'চিরকুটে' পদাতিকের ভঙ্গি ছেড়ে দিয়ে কবি যেন খানিকটা প্রতিষ্ঠিত কাব্যভঙ্গির আশ্রয় নিয়েছেন। ব্যঙ্গ আর শ্লেষই যেন তাঁর এক ও অদ্বিতীয় বাচন না হয় সেই চেষ্টাতেই হয়তো প্রতিষ্ঠিত ও আচরিত কাব্যরীতির নিরাপত্তা কবির কাছে গ্রহণযোগ্য ঠেকে। শব্দ ছন্দ উপস্থাপনের বিচ্ছিন্ন পরীক্ষায় চিরকুট-অগ্নিকোণ পদাতিকের চাইতে পুরনো।

কিন্তু একটা সংশ্লেষ ঘটে গেছে যার ফলে "আগুনের নীল শিখার মতন" একটি কাব্যপ্রোক্ত "আকাশ" দৈনন্দিন মানুষের মতো "রাগে রী রী করে" বা "মেঘের ধূম্র জটা" আর বজ্রের সংস্কৃত-কাব্যপ্রসিদ্ধি "হাঁক ডাক" আর "মাথা

খুঁড়ে মরা"য় লোকায়তিক আধার হয়ে ওঠে। উপনিষদের উক্তির বিশ্লেষণ স্থকান্ত,—এই কমাচিহ্নিত একটি হার্দ উচ্চারণে এসে দাঁড়ায়।

স্থভাষ মুখোপাধ্যায়ের করিতার লৌকিক রীতি তখনই চোখ ধাঁধানো সংস্কৃত শব্দের ব্যবহার আর প্রাচীন কাব্যকাঠামোকে তিনি কেমন ব্যবহারে এনেছেন তা অনেক সময়ই নজরে পড়ে না।

ফলে মায়াকভস্কি, নাজিম হিকমতের কবিতার তুলনা কেমন অপ্রাসঙ্গিক ঠেকে। স্থভাষের কবিতার লৌকিকতা বারবারই সতীন্দ্রনাথকে মায়াকভস্কি মনে আনিয়েছে। অথচ ইতিহাসের দিক থেকে উল্টোটা ঠিক মনে হয়। সতীন্দ্রনাথের ভাষাতেই রুশ কবির প্রথম জীবনের "অতিমাত্রায় আত্মকেন্দ্রিকতা রুশ বিপ্লবের প্রচণ্ড অভিঘাতে 'একাত্ম' হয়ে গিয়েছিল জনগণের সঙ্গে। স্থভাষ মুখোপাধ্যায়ের ক্ষেত্রেও সীমাবদ্ধ ভাবে এইটিই ঘটেছে।" প্রমাণ হিসেবে লৌকিক ভঙ্গির উল্লেখই তিনি করেছেন।

এই গ্রন্থটি গল্পের বইয়ের মতো পড়ে গেলে চোখে পড়ে যা, তা সতীন্দ্রনাথের আবিষ্কারের ঠিক উল্টো। পদাতিকের কবিতাগুলোতে মিছিল, শহর, শ্রেণী, জাতীয় আন্দোলনের নেতাদের আসা যাওয়া আর শ্লেষের লক্ষ্য হিসেবে উত্তমপুরুষ। মিছিলের মুখ-এর মুখটি কিন্তু মিছিলেরই। আর তারপর, ফুলফুটুক-এর প্রথম করিতা 'জয়মণি স্থির হও' থেকে পর পর 'আমি আসছি' 'সালেমনের মা' 'একটি লড়াকু সংসার', 'লালটুকটুকে দিন', 'সুন্দর', 'পারাপার', 'পুপে' 'কমরেড স্তালিন', ইত্যাদি। যেন, মিছিলের ব্যক্তিগুলি কবিতার বিষয় হয়ে এলো। মায়াকভস্কি নিজের ভেতর থেকে বাইরের সংসারে পা দিয়েছিলেন। স্থভাষ মিছিল থেকে ভেতরের সংসারে পা দিয়েছিলেন। স্থভাষ মিছিল থেকে ভেতরের সংসারে এসেছেন। সে সংসারটা মিছিলেরই উপকরণে তৈরি। তবু মায়াকভস্কির আত্মপরিবর্তনের সঙ্গে পদ্ধতিগত মিলের চাইতে অমিলটাই মুখ্য।

সতীন্দ্রনাথের পদাতিক চিরকুট নিয়েই মুখ্যত আলোচনা; যা এতাবৎকাল হয়েই আসছে, যদিনা 'ফুল ফুটুক' নিয়ে দুচার কথা, 'যত দূরেই যাই' আর 'কাল মধুমাস' নামোল্লেখেই শেষ। অথচ পরিচয়ে স্থভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতার বিবেচনায় তো তাঁর সাম্প্রতিকতম ঝোঁকেরই বিচার থাকার কথা। নইলে এই পরিচয়েই ইতিপূর্বে বহুবার আলোচিত 'পদাতিক' 'চিরকুটে'র নতুন আলোচনা হলে আমরা নানারকম পরস্পর বিপরীত মন্তব্যে নাজেহাল হই মাত্র। তবে নিশ্চয়ই 'পদাতিক' 'চিরকুটে'র পৌনঃপুনিক আলোচনায় পরিচয় সকলের মতামতের প্রকাশ ঘটাতে চায়। সেই আন্দাজেই এই সমালোচনার সমালোচনা, কবিতাপাঠকের।

দেবেশ রায়
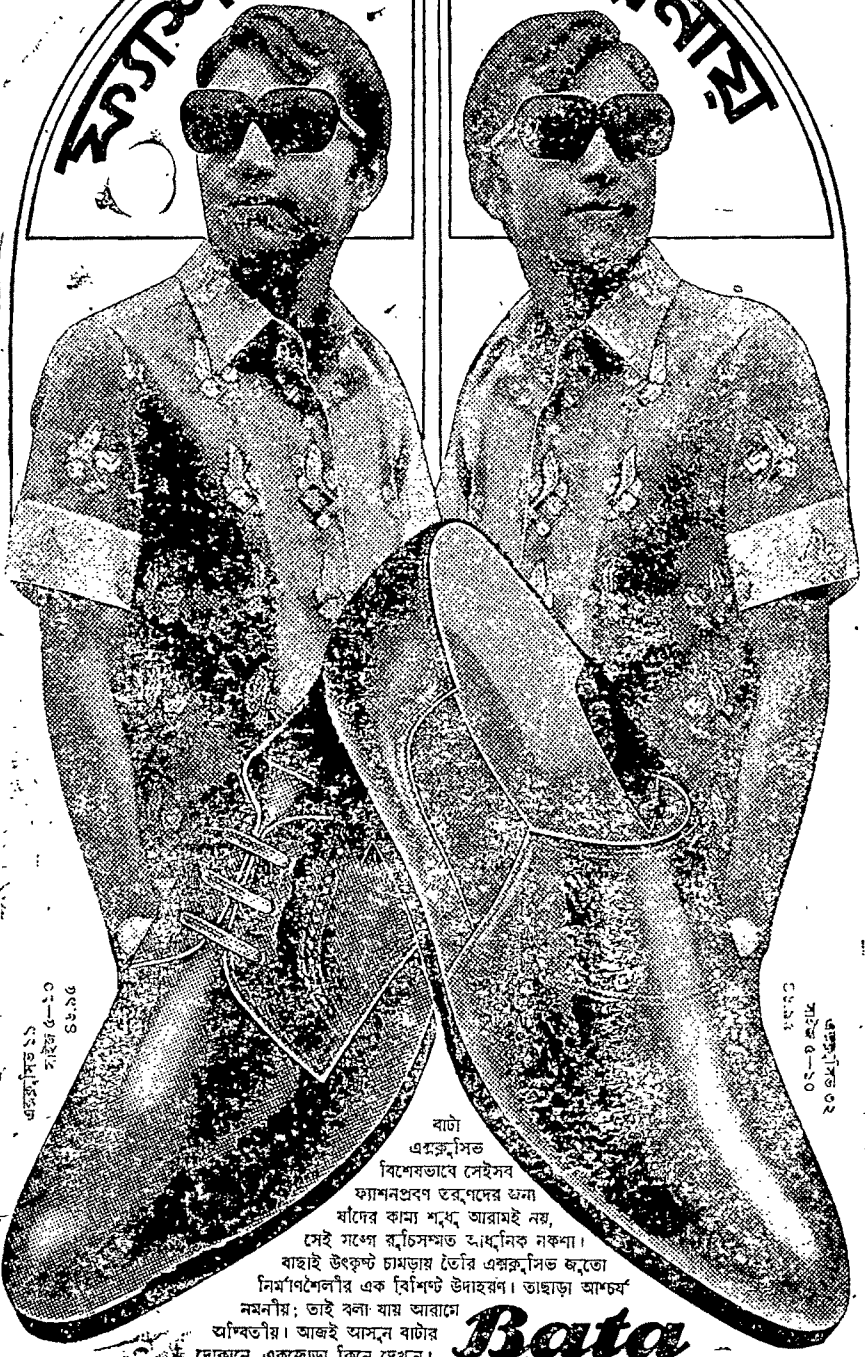
ফ্যাশানের আয়নায়
বাটা
এক্সক্লুসিভ
বিশেষভাবে সেইসব
ফ্যাশনপ্রবণ তরুণদের জন্য
যাঁদের কাম্য শুধু আরামই নয়,
সেই সঙ্গে রুচিসম্মত আধুনিক নকশা।
বাছাই উৎকৃষ্ট চামড়ায় তৈরি এক্সক্লুসিভ জুতো
নির্মাণশৈলীর এক বিশিষ্ট উদাহরণ। তাছাড়া আশ্চর্য
নমনীয়; তাই বলা যায় আরামে
অদ্বিতীয়। আজই আসুন বাটার
দোকানে, একজোড়া কিনে দেখুন।
Bata

পরিচয়
বর্ষ ৪১ । সংখ্যা ৫
অগ্রহায়ণ ১৩৭৮

সূচিপত্র

সম্পাদক

দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় । তরুণ সান্যাল

প্রচ্ছদ : বিশ্বরঞ্জন দে

পরিচয় প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে অচিন্ত্য সেনগুপ্ত কর্তৃক নাথ ব্রাদার্স প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ৬ চালতাবাগান লেন, কলিকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত ও ৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড কলিকাতা ৭ থেকে প্রকাশিত।

পরিচয়
বর্ষ ৪১ । সংখ্যা ৫
অগ্রহায়ণ । ১৩৭৮

জীবনশিল্পী তারাশঙ্কর

নন্দগোপাল সেনগুপ্ত

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়-এর জীবনকালেই তাঁর রচনার গুণাগুণ ব্যাখ্যা করে বই পুঁথি বেরিয়েছিল দুচারখানা। পত্রপত্রিকায় আলোচনাও হয়েছিল। সেসব আলোচনার অনেকটাই হয়ত অনুরাগীজনের বিমুগ্ধ প্রশস্তির মতো, কিংবা স্বাজাত্যবোধের উত্তাপে দেশের একজন অগ্রণী লেখককে বিদেশের বরেণ্যগোষ্ঠীর পাশাপাশি দাঁড় করানোর মনও হয়ত কাজ করেছে কিছুটা পিছন থেকে। তবু জিনিসটা মূল্যহীন নয়। সমসাময়িকের বিচারশালাতেই যে তারাশঙ্করের মোটামুটি একটা মূল্যায়ন হয়েছিল এবং তিনি যে জনতার ভেতর থেকেই বিশেষ একজন রূপে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিলেন, তা বোঝা যায় এইসব রচনায়। ঠিক এরকম সৌভাগ্য জীবিত আর কোনো লেখকের হয়নি। জীবনমুক্ত কজনেরই বা হয়েছে? বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, জীবনানন্দ দাশ, কারো সম্বন্ধেই গণনীয় গ্রহণযোগ্য কোনো বই আজ পর্যন্ত লেখা হয়নি। সমাজে তাঁদের খ্যাতি যাও হয়েছে, তা থেকে জনশ্রুতি রূপেও ছড়িয়েছে তাঁদের পরিচিতি ও প্রসঙ্গ। কিন্তু সংস্কৃতিমানদের সযত্ন দাক্ষিণ্যে তাঁদের সম্বন্ধে তৈরি হয়নি ইতিহাসে ঠাঁই পাবার মতো স্থিতিশীল ঐতিহ্য। সেদিক থেকে তারাশঙ্করকে ভাগ্যবানই বলব।

তিনের দশকের বিশেষ কথাসাহিত্যিক অন্যান্যদের চেয়ে তারাশঙ্কর সারস্বত ক্ষেত্রে এসেছিলেন একটু দেরিতে। কিন্তু একাগ্র উদ্যম ও নিষ্ঠার জোরে অল্প সময়েই অনেক পথ অতিক্রম করে প্রথম সারিতে এসে দাঁড়িয়েছিলেন তিনি। প্রথম আবির্ভাবেই কলমে নূতনত্ব ফুটেছিল তাঁর। সমাজের একান্তে অবহেলিত যে মানুষদের শ্রম ভাঙিয়ে তথাকথিত ভদ্রসমাজ খেয়ে পরে বেঁচে আছেন, অথচ নিচুতলার এই বঞ্চিত মানুষদের দিকে চেয়ে তাকাননি কোনোদিন, তাঁদেরই আসরে নামিয়েছিলেন তিনি তাঁর গল্প-উপন্যাসের

কুশীলব রূপে। বৈষ্ণব বাউল বেদে লাঠিয়াল ভিখারী হাঘরী বিচিত্র মানুষের মিছিল মেলে ধরেছিলেন তিনি বাঙলা সাহিত্যের মাটিতে, হয়ত এই মানুষেরা আঞ্চলিকতার চার দেওয়ালে বন্দী এবং বিশ্ব মানবের বিচিত্র ও বড় বড় সংঘাত সমস্যা থেকে অনেক দূরে অবস্থিত এরা, তবু নিখুঁত পর্যবেক্ষণ, অমিত দরদ ও অতুলনীয় গ্রহণনৈপুণ্যে তিনি তাঁদের জীবন্ত করেছেন এমন সার্থকভাবে যে প্রত্যেকেরই মনে হয়েছে এঁদের মতো চেনা মানুষ বুঝি আর নেই। এই পর্যাপ্ত প্রচণ্ডতাই হলো তারাশঙ্করের রচনার প্রধান বৈশিষ্ট্য এবং এ দিয়েই তিনি মনোহরণ করেছিলেন বাঙলা দেশের।

সময়টা মনে রাখতে হবে আমাদের। তিনের দশকে বাইরের দুনিয়া থেকে এসেছিল কতকগুলো নূতন আলো আমাদের চিন্তার আকাশে। তা ছড়িয়েছিল আমাদের সাহিত্য এবং সমাজচিন্তাতেও। তার ফলেই রবীন্দ্রনাথের ভাব-ভুবন থেকে বেরিয়ে এসে দুঃখকষ্টের বাস্তব দুনিয়ার দিকে তাকিয়েছিলেন সাহিত্যিকরা খোলাচোখে। এর সূত্রপাত হয়েছিল শরৎচন্দ্রেই। কিন্তু শরৎচন্দ্র মূলত ছিলেন মধ্যবিত্তের মানসিকতায় স্থির প্রতিষ্ঠিত। নিচের সোপানের সম্বন্ধে মমতা ছিল তাঁর, গৌণ ভূমিকায় স্বীকৃতিও দিয়েছেন তিনি তাঁদের। কিন্তু সেই মানুষদের মুখ্য প্রবক্তা হতে পারেননি তিনি। কল্লোল কালিকলমের লেখকরা দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন দেশের ওদের পুরোভাগে দাঁড়িয়েই। চোর ডাকাত গুণ্ডা গাঁঠকাটা পতিতাদের প্রবেশাধিকার মঞ্জুর হলো সাহিত্যের মুলুকে। মঞ্জুর হলো কুলিকামিন মাঝিমাল্লা দীন-দুঃখীদের। শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, প্রবোধকুমার সান্যাল, নানাজন খুললেন এই নিরুদ্ধ দুনিয়ার নানা মহলের দরজা জানালা। তারাশঙ্কর এঁদেরই সমধর্মী এবং এক অর্থে সহযাত্রীও যদিও তিনি ঠিক কল্লোল-কালিকলমের সুচিহ্নিত গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত নন। তাঁর প্রথম উপন্যাস 'চৈতালী ঘূর্ণি' ছাপা হয়েছিল ধারাবাহিকভাবে সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়-এর 'উপাসনা' পত্রিকায়।

চৈতালী ঘূর্ণি, পাষাণপুরী, নীলকণ্ঠ, এই তিনখানি উপন্যাস এবং দোটানা, বেদেনী অগ্রদানী প্রভৃতি গল্পই তাঁকে প্রথম খ্যাতিমান করে। তারপর আসে রাইকমল, কবি, নাগিণী কন্যা প্রভৃতি বই যা আমার মতে তারাশঙ্করের শ্রেষ্ঠ তিনখানি রচনা। গণদেবতা, পঞ্চগ্রাম, হাঁসুলি বাঁকের উপকথা, আরোগ্য নিকেতন, অনেক বৃহৎ এপিকধর্মী উপন্যাসই লিখেছেন তিনি এরপর এবং চিন্তা

ভূয়োদর্শন ও জীবনজিজ্ঞাসার অনেক মূল্যবান তথ্যও আছে তাতে। তবু শিল্পকৃতিত্বে গ্রন্থন-পারিপাট্যে, সর্বোপরি মানবিক আবেদনের গভীরতায় এই তিনখানি বইয়ের ঔজ্জ্বল্য বোধহয় অনতিক্রান্তই থেকে গেছে তাঁর। তারাশঙ্করের মন, চোখ ও কলমের মিলিত ত্রিবেণী মূর্তিমন্ত হয়েছে যেন এই ছোট তিনখানি বইয়ে। এত নিটোল নিখুঁত ও এমন গোছান নয় তাঁর অন্য কোনো বইই। ঠাস বুনানি বলেই এর কোনোখানে বাহুল্য নেই, অতিশয়তা নেই, অহেতুক বৈদগ্ধ্য, স্বাদেশিকতা বা আধ্যাত্মিকতার ভেজালে কাহিনীর স্বচ্ছন্দ প্রবাহ আবিল করার প্রয়াস নেই। রবীন্দ্রনাথের চতুরঙ্গ, শরৎচন্দ্রের চন্দ্রনাথ, প্রেমেন্দ্র মিত্রের উপনায়ক এবং মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুতুল নাচের ইতিকথা ছাড়া বাঙলা ভাষাতেই এমন আঁটসাঁট উপন্যাস নেই।

বলে রাখি যে এই অধ্যায় পর্যন্তই তারাশঙ্করের লেখায় আমরা পাই তাঁর নিজস্ব নিরীক্ষণে অর্জিত সেই মানুষদের দেখা, দুঃখের আগুনে পুড়ে পুড়ে সোনা হওয়া যে মানুষরা সত্যিই গণদেবতার প্রতিভূ। তাঁরা এর পরই চেহারা বদল করে ভদ্র মধ্যবিত্ত হয়েছেন তাঁর হাতে এবং স্থিতাবস্থার সমর্থক রূপে ন্যায় নিষ্ঠা ও বিবেকের আলোতেই অন্যায় অনৈক্য ও অসাম্যজয়ের মন্ত্র প্রচার করেছেন। তাঁরা তাঁদের চিন্তায় এবং কর্মে কিছুই নূতন জিনিষ দেননি তা বলব না। কিন্তু তিনের দশকের প্রত্যাশা প্রতিহত হয়েছে, এত মানতেই হবে। সেদিনের নাস্তিবান মানুষদের সেনাপতিরা সবাই অল্পবিস্তর পালা বদলে হলেন অস্তিবানদের পৃষ্ঠপোষক এবং কেউ ধর্মপুরুষপ্রসঙ্গ, কেউ তীর্থ পরিক্রমার কাহিনী লিখতে লাগলেন। কেউ বা কায়েমিস্বার্থের মানসিকতায় যাকে গঠনাত্মক কাজ বলেন, তার সমর্থক রূপে গল্প উপন্যাস লিখতে লাগলেন। অর্থাৎ সকলেই উজানে গা ভাসালেন। তারাশঙ্করকে তাই আলাদা করে দায়ী করা চলে না। কিন্তু কেন এমনটা হলো? কারণ তার বহুবিধ। গোড়ায় যে নূতন আলোর কথা বলেছি, তা এসেছিল বই থেকে। জীবনের মধ্যদিয়ে স্বরূপ যাচাই হয়নি। তাই স্বধর্মে পরিণত হয়নি জিনিষটা। তাছাড়া সত্তক্ষমতাপ্রাপ্ত জাতীয় সরকার বিভ্রান্তির ফাঁদও পেতেছিলেন চারদিকে।

২

চৈতালী ঘূর্ণি, পাষাণ পুরী ও নীলকণ্ঠের কথা গোড়ায় বলেছি। এই তিন খানি বই এবং এর আগে পরে প্রকাশিত শৈলজানন্দের কয়লাকুঠি, নারীমেধ,

প্রেমেন্দ্র মিত্রের পাঁক, অচিন্ত্যকুমারের বেদে, প্রবোধকুমারের কলরব এবং মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদ্মানদীর মাঝি প্রভৃতি বই হাতে পেয়েই বাঙালি পাঠক মনে করেছিলেন বাঙলা উপন্যাসে নূতন দিগন্ত উন্মুক্ত হচ্ছে। সমাজের অবহেলিত মানুষেরা এবার পাবেন সাহিত্যে সার্বিক পুনর্বসতির অধিকার। কিন্তু মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়া সকলেই শেষ পর্যন্ত পরিহার করেছিলেন এই নূতন পরীক্ষার পথ এবং সেই সমস্যাবিব্রত নিম্নমধ্যবিত্তদেরই আনাগোনা কায়েম রেখেছিলেন সাহিত্যের আসরে। এনিয়ে কেউ কেউ বিরূপ মন্তব্য করেছেন তারাশঙ্কর সম্পর্কে। তাঁরা বলেছেন ক্ষয়িষ্ণু জমিদারির ভগ্নস্তূপে দাঁড়িয়ে একদিকে তিনি দীর্ঘশ্বাস ফেলেছেন অন্যদিকে ঐতিহ্যবাদী মধ্যবিত্তের অনড় আত্মপরায়ণতাকে মহিমান্বিত করেছেন। যে জনতার সেনাপতি হবার সাধ জেগেছিল তাঁর প্রথম বয়সে বিপ্লবী দর্শনে নিষ্ঠার অভাবেই তা দানা বাঁধেনি শেষ পর্যন্ত। এ বিচার যে সত্যভাষণের নামে অহেতুক রূঢ়তা কলুষিত তাতে সন্দেহ নেই।

আসলে তারাশঙ্কর বিপ্লববাদী কোনোদিনই ছিলেন না। আদিতে মধ্যপর্বে শেষধাপে, কোনোসময়ই ভাঙনকে গঠনের ভূমিকা বলে মনে করেননি। বরাবরই তিনি স্থিতি বা ঐতিহ্যকে সমাজের আশ্রয় বলে স্বীকার করেছেন এবং অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কারণে যে ভাঙন অনিবার্য ভাবে দেখা দিয়েছে কালের প্রবাহে, তাকে তিনি অলাভজনকই বলেছেন। তবে তিনি ছিলেন মানবদরদীও এবং উনিশ-শতকী উদারতা তথা রোমান্টিকতায় সংবর্ধিত তাঁর চিন্তা। তাই নিচের ধাপে অবস্থিতদের তিনি মমতা ও শ্রদ্ধার দৃষ্টিতেই দেখেছেন। ওপর ধাপের রাজসূয় যজ্ঞে জোগানদার মাত্র নন। তাঁরা স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং মানবিক অধিকারের কোনো অংশেই কারো পিছনে নন, এ কথাও পদে পদে প্রতিপন্ন করেছেন তিনি তাঁর গল্প-উপন্যাসে। অর্থাৎ বিগতের সঙ্গে আজকের, ওপরের সঙ্গে নিচের সমীকরণই হলো তাঁর শিল্পদর্শনের গোড়ার কথা এবং এখানে তিনি যতটা রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের প্রভাবাধীন ততটা নন গোর্কি, চেকভ, টমাস মান, স্তাঁদাল, ইবসেনের। একথার অর্থ তা বলে এই নয় যে তাঁর স্বকীয়তা ছিলনা বা থাকলেও তার গতি ক্ষীণ এবং দ্যুতি যথেষ্ট রকম উজ্জ্বল নয়।

তাহলে তিনি আর এভাবে আলোচনীয় হবেন কেন? তিনি শক্তিশালী এবং দস্তয়েভস্কী, তলস্তয় বা আনাতোল ফ্রাঁস পর্যায়ের না হলেও প্রথম

শ্রেণীর ঔপন্যাসিকই। তাঁর ভূগোল খানিকটা সীমিত নিঃসন্দেহ এবং ইতিহাসবোধও হয়ত সার্বভৌম পরিক্রমায় পুষ্ট নয়, কিন্তু জীবন পরিচয় তাঁর মতো গভীর তাঁর আগে পরের আর কোনো সাহিত্যিকেরই নয়, আর সে জীবনকে বাঙ্ময় করে তোলার জন্যে চাই যে ভাষাসম্পদ ও শাব্দিক ঐশ্বর্য, সেখানেও তিনি তুলনাহীন। সমাজের যে মানুষদের তিনি এনেছেন তাঁর সাহিত্যে, তাঁদের মুখে তিনি ঠিক তাঁদের কথাই বসিয়েছেন। শৈলজানন্দের 'কয়লা কুঠি'তে এবং মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'শহরতলী'তেও এই বাস্তবানুগামিতা পাওয়া যায়। কিন্তু তবু তা থেকে ভদ্র ভাষার রেশ একেবারে মিলিয়ে যায়নি। তারাশঙ্কর এখানে খুবই হুশিয়ার। তিনি যে আবেষ্টনীতে যে গল্প ফেঁদেছেন, সেখানে ঠিক সেই রকম সংলাপ দিয়েছেন। তাই তা প্রাণবন্ত হয়েছে এমন। কিন্তু ঠিক একটা আঞ্চলিকতা সর্বজনের সাহিত্যে সহনীয় কিনা বা তা সর্বজনবোধ্য হয় কিনা সে প্রশ্ন আছে এবং তা উঠছেও নানা সময়। সেই বিতর্কিত প্রসঙ্গের পুনরুল্লেখ না করে সংক্ষেপে বলা যেতে পারে যে তারাশঙ্করের লেখা প্রবহমান নদীর মতো বলেই, এইসব খড়কুটো তাঁর গতি রোধ করতে পারেনি।

আঞ্চলিকতার প্রসঙ্গটাই আর একটু বিশদভাবে বলি শুধু ভাষা বা সংলাপে নয়, দৃষ্টিভঙ্গি ও জীবনদর্শনেও তারাশঙ্কর অনেকটাই আঞ্চলিক। তিনি ছিলেন বীরভূমের মানুষ। বীরভূমের তামাটে শক্ত মাটি, শাল মহুয়ার জঙ্গল, ক্ষীণস্রোতা অজয় কোপাই নদী যেমন ছত্রেছত্রে জীবন্ত হয়েছে তাঁর রচনায় তেমনি একদিকে বীরভূমের বীরাচারী শৈবদের, অঘোরপন্থী, কাপালিক ও তান্ত্রিকদের, অন্যদিকে বাউল, বৈষ্ণব অবধূতদের কঠোর কোমল তত্ত্বজ্ঞান প্রতিফলিত হয়েছে তাঁর বেশিরভাগ কাহিনীতে। তাঁর পৌরুষের আদর্শে শৈব প্রভাব পরিস্ফুট। প্রেমদর্শন গৌড়ীয় বৈষ্ণবের অনুপ্রেরণাসম্ভূত। বিবেক-বৈরাগ্যের বাণীতে ছায়াপাত হয়েছে বাউল দর্শনের। নিজ জন্মভূমির মাটি ও মানুষ এবং তার পুরুষানুক্রমিক ঐতিহ্য এমন অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে আছে তাঁর লেখায় যে এর কোনো-না-কোনোটা ভিন্ন তাঁর কাহিনী মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়াতেই পারে না। কালের ঢেউ ও যুগচিন্তার নানা সরব ও নীরব দাবি তাঁকেও নাড়া দিয়েছে। সাড়াও দিয়েছেন তিনি তাঁর অনেকগুলোতেই। কিন্তু সুর জমেনি তাঁর গানে যতক্ষণ না ঐ মৃত্তিকার প্রাণরস এসে প্রবেশ করেছে তাঁর আখ্যায়িকার অন্তর্লোকে। এটা তারাশঙ্করের দৌর্বল্য

নয়, এ তাঁর শক্তিই এবং এখানে তিনি ফকনারের মতো স্বধর্মনিষ্ঠ। চেষ্টা করে এই সিদ্ধিলাভ করা যায়না।

তারাশঙ্করের প্রধান পরিচিতি তা সত্বেও কিছু জাতীয়তাবাদী রূপে এবং তাঁর বৃহৎ উপন্যাসগুলি সবই উন্নয়ন ও সংগঠনাত্মক জাতীয় ভাবের পরিপোষক এবং এই কারণেই হয়ত শাসকপক্ষ তাঁকে স্বদলে আকর্ষণ করেছিলেন। মনে করলে ক্ষতি নেই যে তাতে তারাশঙ্করের লাভের চেয়ে লোকসানই বেশি হয়েছে। তারাশঙ্করের পরিচিতি এর ফলে গণ্ডিবদ্ধ হয়ে গেছে, যা হওয়ার অনুকূলে কোনো যুক্তি নেই। তিনি সর্বতোভদ্র মানবতার পূজারি। দল, মত ও গোষ্ঠি নিরপেক্ষভাবে বাঙলা ভাষাভাষী সমস্ত মানুষের মন ছুঁয়েই গড়ে উঠেছে তাঁর প্রত্যেকটি লেখা। শেষ বিচারও হবে তাঁর বাঙলার বরেণ্য কথাসাহিত্যিক রূপেই, কোনো বিশেষ রাজনীতিক দলের অনুবর্তীরূপে নয়। এখনো আমরা তাঁর মৃত্যুর শোক পরিবেশ থেকে ষোলআনা বেরিয়ে আসতে পারিনি; তাই সম্যক মূল্যায়ন হওয়ার সময় আসেনি তাঁর রচনার। যে দিন তা হবে, সেদিন দেখা যাবে বিবিধ স্বার্থ ও সুবিধার মুখ চেয়ে আজ যাঁদের দাঁড় করান হয়েছে, দিগবিজয়ী যুগ প্রতিনিধিরূপে তারাশঙ্করের মূর্তি তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে ভাস্বর, তাঁর কৃতি সবচেয়ে ঘাতসহ। তাঁর মতো মানুষের আবির্ভাবে আমাদের সাহিত্য তাই ধন্য হয়েছে। আর তাঁর মতো মানুষের মৃত্যুতে তাঁর বন্ধুজন হয়েছেন অল্পাধিক রোজ কেয়ামতের মুখোমুখি এই জন্যেই।

ভালোবেসে এই জেনেছি

চিত্তরঞ্জন ঘোষ

একটু আত্মহত্যা দিয়ে শুরু করা যাক। শাস্ত্রে নাকি বলেছে, আত্মপ্রশস্তি আত্মহত্যার নামান্তর। অনেক দিন তো অপেক্ষা করা গেল—দেখি আমার কথা কেউ বলে কিনা, কিন্তু না, সবার ঘাড়েই নিজের ঢাক। অতএব আমিও—।

কয়েক বছর আগে ক্যালকাটা পাবলিশার্সের মালিক, আমাদের বন্ধু, মলয় সেন আমাকে বললেন, 'আপনি যে তারাশঙ্কর সম্পর্কে বই লেখার কথা ভাবছিলেন তা আমি তারাশঙ্করকে বলেছি।'

'সে কি! সে-কাজ তো বহু দিন হলো স্থগিত—হয়তো চিরতরে বাতিল। যাই হোক উনি কী বললেন?

'আপনার "বিভূতিভূষণ" বইটা আমার কাছ থেকে নিয়ে পড়লেন।'

'কী রকম লাগল?' কৌতূহল বাড়ল আমার।

'ভালো। আপনি যদি ওঁর ওপর লেখেন তাহলে আপনি ওঁর সাহায্য পাবেন। আপনাকে দেখা করতে বলেছেন।'

সঙ্গে সঙ্গে দুদিক থেকে দুটো প্রতিক্রিয়া হলো আমার। কৈশোরের দিনের অসম্ভব ভালো-লাগা একজন লেখকের সঙ্গে দেখা করার আগ্রহ জোরালোভাবে মাথা চাগিয়ে উঠল। আর অন্যদিকে আমার মন বলতে লাগল—না, না। কারণ, আমি যদি তারাশঙ্করের কাছ থেকে সাহায্য নেওয়ার পর ওঁর সম্পর্কে কিছু লিখি, তবে ওঁর হয়তো প্রত্যাশা থাকবে যে আমি ওঁকে নিরঙ্কুশ প্রশংসা করব। ওঁর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোনো প্রভাব আমি গ্রহণ করব না। আমি লিখলে মুক্ত মনে লিখতে চাই।

উনি ঐ রকম প্রত্যাশা করতেন কিনা তা আমি জানি না। কিন্তু, বাঙলার অধিকাংশ লেখক করে থাকেন তা জানি। আমি বললাম, 'আমি যাব না।'

মলয় সেন বিস্মিত হলেন। 'কেন?'

কারণটা বলে যোগ করলাম, 'তাছাড়া লেখার মতো সময় নেই এখন। শুধু

শুধু ওঁকে বিরক্ত করার কোনো মানে হয় না।'

কিন্তু কথাটা এই দিনেই শেষ হয়ে গেল না। তারাশঙ্করের সঙ্গে মলয় সেনের যোগাযোগ ছিল। তাছাড়া মলয়বাবুর ওখানে তারাশঙ্করের জ্যেষ্ঠ পুত্র সনৎ বন্দ্যোপাধ্যায় আসতেন। ওঁর সঙ্গে ঐখানেই আমার আলাপ। সুতরাং আমন্ত্রণটা বেঁচে রইল, মাঝে মাঝে উচ্চারিত হতে লাগল, আর আমি অভদ্রের মতো 'না, না', বলতে লাগলাম।

মলয় সেন বললেন, 'একদিন দেখা করলে ক্ষতি কী! তাছাড়া তারাশঙ্কর ওঁর এক সেট্ বই আপনাকে দিতে পারেন—আপনি গেলে—। তাই নিয়ে পড়াশুনা করতে শুরু করুন। লেখাটা না-হয় পরে ধীরে-সুস্থে করবেন।'

'না। বই নিলে এক ধরনের কমিট্‌মেন্টের মধ্যে পড়ে যাব।'

সনৎবাবু একদিন বললেন, 'ঠিক আছে, আপনাকে তারাশঙ্করের বাড়িতে যেতে হবে না। আমার বাড়িতে এসে এক কাপ চা খেতে তো আপনার কোনো আপত্তি নেই।'

ক্রমে আমার মনে হতে লাগল, বাড়াবাড়ি হচ্ছে, অভদ্রতা হচ্ছে। সুতরাং তারাশঙ্করের সঙ্গে দিনক্ষণ ঠিক করে এক শুভসন্ধ্যায় মলয়বাবু ও সনৎবাবুসহ পাইকপাড়ায় ওঁর বাড়িতে এসে উপস্থিত হলাম।

তারপরে আরো যাওয়া হয়েছে। নানা কথার টুকরো স্মৃতিতে ছড়ানো রয়েছে। দু একটা বলি।

গান্ধীজী সম্পর্কে ছিল ওঁর অসীম শ্রদ্ধা। বন্ধুদের সঙ্গেও এ নিয়ে তাঁর অনেক বিতর্ক হয়েছে। একবার এক সাহিত্যসভার জন্যে উনি ঢাকায় গিয়েছিলেন। তখন মোহিতলাল ওখানে অধ্যাপক। মোহিতলালের ওখানেই তিনি ছিলেন। মোহিতলাল ওঁর সাহিত্যের অনুরাগী ছিলেন, কিন্তু ওঁর রাজনৈতিক মতের নয়। তিনি অত্যন্ত গান্ধী-বিরোধী। দুজনে রাতে আলোচনা শুরু করেছিলেন সাহিত্য নিয়ে। কিন্তু গান্ধীজী সম্পর্কে তর্ক উঠে পড়ল। এবং সারারাত চলল সে-তর্ক। কেউই ছাড়বার পাত্র নন।

মোহিতলালের তন্ত্রে প্রীতি ছিল, তারাশঙ্করেরও। একবার তন্ত্র সম্পর্কে আমি কথা তুলি ওঁর কাছে। তন্ত্রের গূঢ় সাধন পদ্ধতি সম্পর্কে কতটা আগ্রহী ছিলেন জানি না। কিন্তু আমার মনে হয়েছে, তন্ত্র-সাধনার চারদিকে যে অদ্ভুত একটা আবহাওয়া—বিশেষত শক্তিধর তান্ত্রিকদের অ-সাধারণ চরিত্র—তাঁকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করত।

একবার তারাশঙ্করের বাড়িতে কালীপূজো। রাত। কুলপুরোহিত এলেন। গম্ভীর মুখ। তারাশঙ্করকে বললেন, 'আমি পূজোয় বসছি। আমার বাড়ি থেকে যদি কেউ কোনো খবর নিয়ে আসে আমায় ডাকবে না। যে-খবরই হোক, পূজোয় ব্যাঘাত ঘটাবে না।'

পূজোর আসনে বসলেন। দীর্ঘ সময়। সমস্ত অনুষ্ঠান নিখুঁতভাবে করে উঠলেন। জিজ্ঞেস করলেন, 'আমার বাড়ি থেকে কেউ এসেছিল ?

তারাশঙ্কর জবাব দিলেন, 'না'।

'আচ্ছা, আমি চলি।'

'বসুন, প্রসাদ নিন।'

'প্রসাদ আমার বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়ো। ওখানেই গ্রহণ করব। আমার পুত্র মৃত্যুশয্যায়।'

দীর্ঘ পদক্ষেপে পুরোহিত এগোলেন। বীরভূমের শুকনো মাটি বোধহয় কৃষ্ণপক্ষেও নক্ষত্রের মৃদু আলো প্রতিফলিত করে। একটু জ্যোৎস্নার মতো দেখায়। অনেক দূর পর্যন্ত তাই দেখা গেল পুরোহিতকে—দীর্ঘ পদক্ষেপে সেই শক্তিধর চলেছেন, যিনি এতক্ষণ মায়ের পূজোর জন্য নিজের মনকে ব্যক্তিগত উদ্বেগ থেকে সরিয়ে রেখেছিলেন। তারাশঙ্কর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলেন, এবং চিরকালের জন্য এ-ছবি তাঁর মনে আঁকা হয়ে রইল।

ওঁর বইয়ের পুরো একটা সেট্-এর প্রতি আমার লোভ ছিল না এমন নয়। কিন্তু পূর্ববর্ণিত ভয়ে নেওয়া হয়নি। তখন তাঁর 'মিছিল' বেরোল। এর একটি কপি নিজে হাতে লিখে আমায় দিয়েছিলেন।

বসে আছি ওঁর ঘরে। উনি ভেতরে গিয়েছিলেন কী কাজে। ঢুকে বললেন, 'আমার মেয়ে বলছিল, তোমাকে চেনে। তোমার কাছে পড়েছে।'

'হ্যাঁ, বাণী মণীন্দ্র কলেজে আমার কাছে পড়েছে। এ-বাড়িতে আমার আরো একজন ছাত্র আছে। পলাশ—আপনার ভাইপো।'

সনৎবাবু বললেন, 'যে ভাবে আপনি এগোচ্ছেন তাতে ভয় হচ্ছে কখন আমাকেই ছাত্র বানিয়ে দেবেন।'

তারাশঙ্কর হেসে বললেন, 'আমারও সেই ভয়।'

বহু দিন আগে 'পরিচয়'-এ (চৈত্র, ১৩৫২) 'নবান্ন' প্রসঙ্গে উনি লিখেছিলেন, 'বাঙলার সাহিত্যজীবনে এটি নব-ভাবোপলব্ধির একটি স্পষ্ট ইঙ্গিত।' এটি 'বহুরূপী' পত্রিকার নবান্ন স্মারক সংখ্যায় আমরা পুনর্মুদ্রিত করেছিলাম।

সংখ্যাটি বেরোবার পরে ওঁর হাতে দিলাম। ওঁর লেখাটিও বার করে দিলাম। উনি মনোযোগ দিয়ে দেখলেন, তারপরে বিরক্তির স্বরে বললেন, 'সব ভুল লিখেছিলাম।'

'কেন ?'

'এখন নাটক কিছু হচ্ছে না। হতাশা, অ্যাবসার্ড, এই সব। বাঙলাদেশের সঙ্গে যোগ নাই। লোকে নিচ্ছেও না। আগে একটা নাটকের সংলাপ লোকের মুখে মুখে ঘুরত—প্রবাদবাক্যে পরিণত হয়ে যেত। এখন তেমন হয় ?'

এ-মতে আমার সায় ছিল না। বললাম, 'আপনি রক্তকরবী দেখেছেন।'

'না।'

ভেবেছিলাম, ওঁকে কয়েকটা নাটক দেখাব। কিন্তু ওঁর তখন শরীর খারাপ চোখেরও কষ্ট ছিল। তাই তা আর হয়নি। তর্কটাও জমিয়ে করা যায়নি।

এই দিনই শুনি, 'সেতু' নাটকের চলমান রেলগাড়ির কথা তিনিই মস্কো থেকে ফিরে সেখানকার অ্যানা কারেনিনা প্রসঙ্গে তাপস সেনকে বলেছিলেন। তারাশঙ্করের ধারণা ছিল যে এটা এখানে করা যাবে না. তাপসবাবু তাঁর সে ভুল ভেঙেছিলেন।

এই দিনই তাজ্জব হয়ে শুনেছিলাম, উনি ওঁর কাহিনীর চিত্ররূপের বেশির ভাগই দেখেননি। এমনকি সত্যজিৎ রায়-কৃত তাঁর কাহিনী সম্পর্কেও এ কথা সত্য।

ওঁর বহু লেখা অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় ও ইয়োরোপীয় ভাষায় অনূদিত হয়েছে। এর পূর্ণবিবরণ অধিকাংশ বাঙালি পাঠক জানে না। আমিও জানতাম না। একদিন ওঁর কাছে এর সব বিবরণ শুনেছিলাম। কিন্তু সে-তথ্যে এ-লেখা ভারাক্রান্ত করছি না।

লেখাপত্রের খবর জিজ্ঞেস করায় একদিন বললেন, 'লিখতে পারছি না। প্রায়ই টেলিফোন আসে—দালাল, সি, আই, এ, লেখা বন্ধ করুন, খুন করব, এই সব। এ-সব আমি গায়ে মাখি নাই। কিন্তু মনটা বিশ্রী হয়ে থাকে।'

আর একদিন কফিহাউসের সিঁড়িতে মলয়বাবুর একজন কর্মচারীর মুখে খবর পেলাম, তারাশঙ্কর এসেছেন। গেলাম ক্যালকাটা পাবলিশার্সের দপ্তরে। তারাশঙ্কর খুব-বিমর্ষ গম্ভীর মুখে বসে আছেন। কয়েক দিন আগে একজন হেডমাস্টারকে একটি রাজনৈতিক দলের লোকেরা খুন করেছে। উনি সেখানে গিয়েছিলেন, বিষয়টা ঠিক মতো জানতে এবং পরিবারবর্গকে সহানুভূতি

জানাতে। এই অভিজ্ঞতাটি তখনও তাঁকে আচ্ছন্ন করে ছিল।

বেশ কয়েক বছর আগে তারাশঙ্কর সম্পর্কে একটি লেখা বেরিয়েছে। সেটি ওঁর ভালো লাগেনি। কারণটা দু একবার জানতে চেয়েছি। উনি এড়িয়ে গেছেন। একদিন আর এড়াতে দিলাম না। উনি একটুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইলেন। একবার চোখ বুজলেন। তারপর সরাসরি আমার চোখের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ও লেখককে ভালোবাসে নাই। একটু ভালোবাসতে হয়, নইলে সবটুকু দেখা যায় না। সাধারণ মানুষের ব্যাপারেও যেমন, লেখকের ব্যাপারেও তেমনি। ভালোবাসলে আলো হয়, ভালো করে দেখা যায়। ভালো না বেসে দেখা—অন্ধের দেখা। চিত্তরঞ্জন একটা কথা বলি তোমাকে। যদি কোনো লেখককে ভালো না বাসো তা হলে তাকে নিয়ে লিখো না। যদি ভালোবাসতে পারো, তবেই লিখো।'

কথাটা ভেবেছি বহুদিন। বিশেষত তারাশঙ্কর সম্পর্কে কিছু লেখার প্রসঙ্গ মনে এলে কথাটা সামনে এসে দাঁড়ায়। আর নিজেকে প্রশ্ন করতেই হয়—ভালো কি বাসি?

উত্তর খুঁজতে মনের তলায় ডুব দিতে হয়, অতীতের ওপর থেকে ধুলো ঝাড়তে হয়। কারণ তারাশঙ্করের সঙ্গে আলাপ তো সেদিনের, কিন্তু পরিচয় তো বাল্য থেকে।

কৈশোরে হাতে আসে ওঁর কয়েকটি গল্প। পড়ে অভিভূত হই। খুঁজে পেতে পড়ি চৈতালী ঘূর্ণি, নীলকণ্ঠ, আগুন ও আরো কিছু গল্প। যেন নতুন জগতের সন্ধান পাই। ধাত্রীদেবতা ও কালিন্দী খুব আলোড়িত করে। বাড়িতে আসত শনিবারের চিঠি ও ভারতবর্ষ। শনিবারের চিঠিতে 'দ্বীপান্তর' নাটকটি প্রথম পড়ি। 'ভারতবর্ষে' পড়ি 'গণদেবতা'। কিন্তু সেই 'গণদেবতা' যখন বই হয়ে বেরোয়, পড়তে গিয়ে দেখি, গোড়ার দিক ছাড়া বাকি সব নতুন করে লেখা—প্রভূত পরিশ্রমে। পরিবর্তনটা মনে রাখবার মতো। 'ভারতবর্ষের' প্রথম খসড়ায় ন্যায়রত্নের পৌত্রের বিশ্বনাথের প্রাধান্য ছিল, বইতে দেবুর প্রাধান্য। সমাজের উঁচুতলা থেকে নিচুতলার মানুষের মধ্যে যেন গণদেবতার দেবেন্দ্রকে খুঁজছেন তিনি।

১৩৪৪এ প্রকাশিত প্রগতি লেখক সঙ্ঘের সংকলন গ্রন্থ 'প্রগতি'-তে (সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী ও হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত) তারাশঙ্করের লেখবার কথা ছিল। কিন্তু 'অনিবার্য কারণে' তা হয়নি। পরে এই সঙ্ঘের সঙ্গে

যোগ ওঁর ক্রমে বেড়েছে। এর কর্মকর্তাও হয়েছেন। 'পরিচয়'-এ ধারাবাহিক উপন্যাস লিখেছেন। বামপন্থীমহল ওঁকে বড় লেখকের স্বীকৃতি দিয়েছে। আমাদের কৈশোর-তারুণ্যের ভালোবাসা রাজনৈতিক-সাংগঠনিক সমর্থন পেল।

কিন্তু এ-সুখের সংসার চিরকাল টিকল না। সঙ্ঘের সঙ্গে তারাশঙ্করের বিবাদ এবং বিদায়। এই বিবাদের দোষগুণ-বিচারে আমি যাচ্ছি না। ১৯৪৭-এ দেশ স্বাধীন হলো। বামপন্থীরা সেই আজাদীকে ঝুটা বললেন। তারাশঙ্কর বললেন না। ১৯৪৯-এ বামপন্থী আন্দোলন অতি-সংকীর্ণতার কাণাগলিতে পড়ে গেল। তারাশঙ্করকে আর বড় লেখক বলা হলো না। বলা হলো, প্রতিক্রিয়াশীল, পশ্চাৎমুখী, মনোভাবে ফিউড্যাল ইত্যাদি।

আমরা পড়ে গেলাম ফাঁপরে। এই নবমূল্যায়ন আমাদের মনেও ছাপ ফেলল, তিনি বড় লেখক নন, এ-কথা মনকে বোঝাই। আবার ওঁর লেখা খুঁজে পড়ি, এবং অনেক লেখা পোড়ামনে ভালোও লেগে যায়। আবার বহু 'প্রগতিশীল' লেখায় স্বাদ পাই না। মনের শিক্ষা সম্পূর্ণ হয়নি ভেবে বড়ই বিমর্ষ বোধ করি। এটা আমার একার হলে এত বড় করে বলবার দরকার করত না। কিন্তু আমি জানি, আমার বয়সী সব বামপন্থী লেখক ও পাঠকের এই সংকট ঘটেছে। তারাশঙ্কর সম্পর্কে আমরা দ্বিধাবিভক্ত। ভেতরে অনেক সময় ভালো লাগে, বাইরে সর্বদাই বিরোধিতা করি। ভালোবাসি, এবং বিরূপ। বিমুখ বলে সবটা দেখতে পাই না, এবং অভিযোগ করি—অমুকটা তারাশঙ্করে নেই। বামপন্থীদের তারাশঙ্কর মূল্যায়ন একপেশে রয়ে গেছে।

বামপন্থী সংকীর্ণতার যুগের অল্প পরে বেরোয় 'হাঁসুলিবাঁকের উপকথা'। (১৮ই জুন, ১৮৫১। তারও আগে শারদীয় আনন্দবাজারে) বলা হলো—লেখক নতুন নেতা করালীকে সমর্থন করেননি, পশ্চাৎমুখী বনোয়ারীর প্রতি তাঁর সহানুভূতি। অতএব তারাশঙ্কর পরিত্যজ্য। এই স্থূল এক বাক্যের সমালোচনায় কি অমন একটা বইকে খতম করে দেওয়া যায়?

একবার এক প্রখ্যাত বামপন্থী লেখক আমাকে মিচ্‌কি হেসে বলেছিলেন, 'দু' পাতা পড়লেই বোঝা যায়, হার্ডি সাহেবের বই থেকে তারাশঙ্কর কত নিয়েছেন।'

তখন হার্ডি সম্পর্কে আমার জ্ঞান নিতান্ত সীমাবদ্ধ। তাই নীরবে বেদবাক্য মেনে নিলাম। আজ জানি কথাটা কত ভ্রান্ত। এবং তারাশঙ্কর কোনোদিন হার্ডি পড়েছেন কিনা তাতেও আমার সংশয় আছে।

তবু গালাগাল দেওয়ার জন্যেও তখন অনেকে পড়তেন। ক্রমে না পড়েই গালাগাল দেওয়া সম্ভব হলো। তারাশঙ্কর পড়া অনেকে ছেড়ে দিলেন, অনেকে কমিয়ে দিলেন। এখন এই ব্যবধান বেশ দুস্তর। তরুণদের সঙ্গে কথা বললে এটা স্পষ্ট বোঝা যায়।

কিন্তু হাওয়া তো কিছু ফিরেছে। তারাশঙ্কর শেষ বয়সে ভারত-সোভিয়েত সংস্কৃতি সমিতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ভারত-গণতান্ত্রিক জার্মাণী মৈত্রী সমিতির ১৯৭০-এর রবীন্দ্র-জন্মোৎসবে এসেছিলেন (এইখানেই ওঁর সঙ্গে আমার শেষ দেখা)। সকল মতের শিল্পী-সাহিত্যিকদের বাঙলাদেশ সহায়ক সংস্থার তিনি সভাপতি হয়েছিলেন। অন্যদিকে বামপন্থীদের একাংশ যদিও রবীন্দ্রনাথ ও বিদ্যাসাগরকেও বর্জন করেছে এবং গ্রন্থ ও বিদ্যালয়মাত্রকেই ভস্মীভূত করার পক্ষপাতী, কিন্তু আর একটি অংশে তো খোলা মনের হাওয়া কিছুটা বইতে শুরু করেছে। এখন খোলা চোখে একবার তারাশঙ্করের দিকে তাকানো দরকার।

তাকালে দেখা যাবে, তিরিশের যুগে কল্লোলীয় সাহিত্যের বিরাট এক অংশ যখন কৃত্রিমতা ও 'কন্‌তিনানতালীয়তা'য় আচ্ছন্ন তখন বাঙলাদেশের মাটিতে দৃঢ়পদ স্থাপন করেছিলেন তারাশঙ্কর। বিভূতিভূষণের বাঙলাদেশ প্রধানত মধ্যবিত্ত নিম্নবিত্ত ও নির্বিত্ত ভদ্রলোকের বাঙলাদেশ। তারাশঙ্কর মাটির আরো কাছাকাছি গিয়েছিলেন। বাঙলাদেশের লোকজীবনের এমন বিশদ সহৃদয় উপস্থাপন আর কারো সাহিত্যেই ঘটেনি। কথাটা এখন আমাদের যেন গা-সওয়া হয়ে গেছে। কিন্তু কথাটা তুচ্ছ নয়, অবহেলার নয়।

রুশ বিপ্লবের পর তার চিন্তাভাবনা যাতে ভারতে প্রবেশ করতে না পারে তার জন্যে ইংরেজ সরকার লৌহপ্রাচীর তুলেছিল। কিন্তু নানা ফাটলের পথে সে-ভাবনা এ-দেশে বিন্দু বিন্দু প্রবাহিত হতো। অন্যদিকে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে আমাদের জাতীয় আন্দোলন বিস্তৃত দিগন্তকে অন্তর্ভুক্ত করছিল। এই পটভূমিতে দাঁড়িয়ে সাহিত্যিককে দিগন্তবিস্তারের কথা ভাবতে হয়েছে মৃত্তিকালগ্ন মানুষের গুরুত্বকে স্বীকার করতে হয়েছে। সঞ্জীবনী জনপ্রবাহে স্নাতক হতে চেয়েছে সে। কিন্তু পথ ছিল দুর্গম, কারণ সাহিত্যিকরা সবাই জন্মে ও মর্মে মধ্যবিত্ত। সে-গণ্ডী ভাঙা সহজ নয়। যাঁরা বিদেশী সাহিত্যের আলোয় সবটুকু পথ দেখতে চেয়েছিলেন, তাঁরা পথ হারিয়েছেন, এবং বিদেশীয়ানার কিছু রেণু নীরক্ত গায়ে মেখে কখনো প্রসাধিত হয়েছেন, কখনো সং সেজেছেন। দু

একজন লেখক লোকপ্রাঙ্গনের আশপাশে বা কিছুটা কাছাকাছি এসেছিলেন। কিন্তু উঠানের ভেতরে সবলে ও সহজে প্রবেশ করেছিলেন তারাশঙ্কর।

ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ হলেও এখানে বলি, তারাশঙ্করের দেশের বাড়িতে বহু সাধারণ লোকের নিত্য যাতায়াত ছিল। আর উনিও তাঁদের গাঁয়ে-ঘরে সহজে যেতেন। তাঁর মুখটা ছিল বাঙলাদেশের মাটির দিকে। কল্লোলীয়দের অনেকে বিদেশমুখী। তাই তারাশঙ্কর চলন-বলন-হাবভাবে রয়ে গেলেন গ্রাম্য, অ-'সভ্য' প্রায় রুক্ষ। আর কল্লোলীয়দের অনেকে হয়ে গেলেন বড় বেশি 'সভ্য'। টিপিক্যাল দু' একজন কল্লোলীয় দেখেছি, যাঁদের বাঙলা উচ্চারণ পর্যন্ত বিকৃত কৃত্রিম। আর তারাশঙ্করের কণ্ঠ থেকে রাঢ়ী ভঙ্গি কিছুতেই গেল না।

বিদেশের মহৎ সাহিত্যকে যদি তারাশঙ্কর আত্মসাৎ করে নিতেন, তাহলে তাঁর উপকারই হতো, আরো সমৃদ্ধ ফসল হয়তো তাঁর কলমের মুখে ফলে উঠত। কিন্তু যা হয়নি, সেই 'আরো-ভালো'র জন্যে খেদ করে লাভ নেই। অন্য দিকে কল্লোলীয়দের শিকড় যদি আর একটু বেশি মাটির মধ্যে থাকত, তাহলে বিদেশী রৌদ্র-হাওয়া থেকে প্রাণসংগ্রহের সম্ভাবনা আরো বাড়ত। তবে এই দুই জাতীয় অভাবের মধ্যে দ্বিতীয়টি বেশি ক্ষতিকর। এই কবছরের মধ্যেই কল্লোলীয়দের বহু লেখা আজ বিস্মৃত। আর তারাশঙ্করের লেখা অনেক বেশি বেঁচে আছে।

'ভালো না বাসলে তাকে নিয়ে লিখো না' একথা তারাশঙ্কর শুধু বলতেন না নিজেও মানতেন। লোকসাধারণকে তিনি ভালোবাসতেন, তাই তাদের নিয়ে লিখেছিলেন। তাই অনেক কিছু তিনি দেখতে পেয়েছিলেন, যা ভালোবাসলেই মাত্র দেখা যায়। লোকজীবনে এমন অনেক কিছু আছে যা রুক্ষ, ভীতিকর, নির্মম, কুৎসিত। বহু 'সভ্য' মানুষই তাই বিরূপ, বিমুখ। কিন্তু ভালোবাসলেই মাত্র তার প্রাণকে আবিষ্কার করা যায়। সে-আবিষ্কার তিনি করেছিলেন। তাই বহু সময় তাঁর সাহিত্যে নির্মমতার অন্তরালে মমতা, ভীতিকরতার সঙ্গে ভালোবাসা মিশে থাকে। কল্লোলীয়দের মধ্যে যাঁরা নিচুতলা নিয়ে লিখেছেন, তাঁরা ভালো না বেসে লিখেছেন। তাই তাঁদের লেখা 'সৌখীন' 'ভঙ্গী' মাত্র।

তারাশঙ্করের ভাষা আলগা, তার বাঁধুনি কম, সৌন্দর্য কম—এই অভিযোগ অংশত সত্য সম্পূর্ণ সত্য না। সহজ সুবোধ সাধু ভাষা তাঁর আদর্শ। কিন্তু বার বার তিনি লোকভাষার কাছে এসেছেন নিজের ভাষাকে সঞ্জীবিত করে নেওয়ার জন্য। কয়েকটি বইতে তো লোকভাষার ছাঁদ, শব্দ, ঢং, বাক্‌বিধি

নতুন স্বাদ এনেছে বাঙলাভাষায়। অন্য বইতে যদি এতটা নাও থাকে, তবু তিনি লোকভাষা থেকে কোনো সময়ই খুব দূরে নন। 'সভ্য' মানুষের মুখের ভাষা আর হৃদয়ের ভাষা এক নয়। এই ব্যবধান যত বাড়ে মুখের শুকনো ভাষা তত প্রাণহীন হয় আর সেটা চাপা দেবার জন্য অলংকার বাড়ে, কায়দা বাড়ে। 'সভ্য' মানুষের কাছে এই কায়দাটাই ভাষার আসল মনে হতে থাকে। এই অপমৃত্যুর দিকে 'সভ্য' ভাষার একটা গতি থাকে। এই দুর্গতি থেকে বাঁচাবার জন্যেই শিল্পীকে যেতে হয় লোক-সঙ্গমের পুণ্যতীর্থে। লোকভাষার যুগ আগত। সরল স্রোতে ডুব দিতে হয়। সহজ ও গভীরকে এক করে পেতে হয়, প্রাণের স্পর্শে প্রাণকে জাগিয়ে নিতে হয়। এ-সত্যকে কল্লোলীয়দের অনেকে জানতেন না। তারাশঙ্কর এটি, মানতেন। লোকভাষাকে ভালোও বাসতেন, এর কাছ থেকে দূরে যেতে চাননি তিনি। সরে গেলেও ফিরে ফিরে এসেছেন। এ-ভাষা একটু আলগা বা কোনো কোনো সময় একটু সফেন লাগলেও এর একটা সরল সপ্রাণ শ্রী আছে। নকল নেই, পালিশ কম।

আর ঐ লোকসঙ্গমে গিয়েছিলেন বলেই বহু লোক দেখেছেন। তিনি তাঁর গল্প-উপন্যাসে বিচিত্র চরিত্রের মেলা। অনেক চরিত্র পুনরুক্ত হয়েছে, আবার অনেক চরিত্র খুবই আলাদা আলাদা। যেগুলি পুনরুক্ত, সেগুলিও ক্রমেই উজ্জ্বলতর ও পূর্ণতর।

এরপর নিশ্চয়ই সেই প্রশ্ন আসবে: লোকজীবনকে নিষ্ঠার সঙ্গে খুব খুঁটিয়ে উনি দেখিয়েছেন, বেশ, একথা মানা গেল। কিন্তু তথ্যকে যথাযথ উপস্থাপনেই কি উপন্যাসের দায়িত্ব শেষ হয়? ঘটনার অন্তরালের কারণগুলি কোথায়? কার্যের আভ্যন্তরীণ ব্যাখ্যাগুলি কোথায়? চরিত্রের ক্রিয়া-প্রতি-ক্রিয়ার নিগূঢ় উৎসগুলি কোথায়? কোন্ সমাজশক্তি কোন্ প্রেরণায় অগ্রসর? মানবনীতির কোনো সূক্ষ্ম মানদণ্ডে লেখক কি বিচার-বিশ্লেষণে উৎসাহী?

ভালোবাসার সঙ্গে লোকজীবনের নিষ্ঠাবান তথ্য-সংগ্রহ—এ কাজটিকে তুচ্ছ মনে করবার কোনো কারণ নেই। যথাযথ তথ্যের ভিত্তিতেই মাত্র বিচার-বিশ্লেষণ বা সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব। তারাশঙ্কর প্রথম কাজটিকে প্রথম করেছেন। হাঁ, বিশ্লেষণ তাঁর কম, বা যেখানে আছে সেখানে অন্যের সঙ্গে কোথাও মতের মিল হতে পারে, আবার নাও হতে পারে। অভিজ্ঞতা ও ভালোবাসা সবটুকু না হলেও অনেকটা এগিয়ে দিতে পারে। এইখানেই ডাক

পড়ে ইনটেলেক্‌টের। তারাশঙ্কর এই দিক দিয়ে বেশি এগোননি। তাঁর পথ মূলত হৃদয়ের পথ। বড় লেখকের ক্ষেত্রে হৃদয় ও বুদ্ধি সমান তালে পা ফেলবার কথা। একটা দিকে তিনি কম এগিয়েছেন। কিন্তু হৃদয় ও বুদ্ধির সব্যসাচী মূর্তি গোটা বাঙলা সাহিত্যে কটা?

আর এই সঙ্গে একথাও মনে রাখতে হবে যে বামপন্থী বা মার্কস্‌বাদী সাহিত্যিকদের অধিকাংশেরই একটা সিদ্ধান্ত অথবা তত্ত্ব পূর্বনির্দিষ্ট থাকে, সেইটার সঙ্গে খাপ খাইয়ে সব ঘটনা, বা তথ্যকে আনা হয়। কয়েকটা বাঁধা বুলির বাইরে কোনো বিচক্ষণ অন্তর্দৃষ্টি বা প্রাজ্ঞ বিশ্লেষণের দেখা মেলে না, দরকারও হয় না। এতে তত্ত্বের কী উপকার হয় জানি না, কিন্তু উপন্যাস বা গল্প মরে যায়, নিষ্প্রাণ যান্ত্রিক ও জড়বৎ হয়। কিন্তু মার্কস্‌বাদী অনুসারে প্রথম পদ্ধতিটিই (অর্থাৎ তথ্যের ভিত্তিতে তত্ত্ব বা সিদ্ধান্তে যাওয়ার চেষ্টা) সঠিক। আর বামপন্থী বা মার্কস্‌বাদীদের অনুসৃত দ্বিতীয় পন্থাটি ভ্রান্ত। তারাশঙ্করের পদ্ধতিটা অত্যন্ত ঠিক। একথা মার্কস্‌বাদীদের মানতে হবে এবং তথ্যনিষ্ঠার ক্ষেত্রে তাঁর জুড়ি নেই।

যে বিশ্লেষণসল্পতা বাঙলাদেশে দু একজন বাদে সবারই, তারই জন্যে কি তারাশঙ্করের সব পচে গেল? না। ওঁর যা আছে, তার দিকে আমাদের বিদ্বেষ-মুক্ত স্বচ্ছ দৃষ্টিতে তাকাতে হবে। কী আছে ওঁর?

তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন: "মার্কসের ক্যাপিটাল বা তাঁর লেখা কোনো বই আমি পড়িনি। এদেশে বাঙলাভাষায় প্রকাশিত মার্কসবাদের উপর লেখা প্রবন্ধ কিছু কিছু পড়েছি মাত্র। আমার সম্বল প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা।" এই অভিজ্ঞতা তাঁকে শিখিয়েছে: "হাজার হাজার বৎসর ধরে মানুষের প্রতি মানুষের অন্যায়ের প্রায়শ্চিত্তের কাল একদিন আসবেই। এই আমি বুঝেছিলাম। উনিশশো ষোল-সতের সাল থেকে উনিশশো ত্রিশ-একত্রিশ সাল পর্যন্ত গ্রামে গ্রামে মানুষদের মধ্যে ঘুরে এইটুকু বুঝেছিলাম যে সেদিন আসতে আর দেরী হবে না। রুশ বিপ্লব সেই দিনের ঊষাকাল তাতে সন্দেহ নেই বাতাসটা উঠেছিল সেইখানেই প্রথম; সেখান থেকেই বাতাস উঠে এখানকার গুমটের মধ্যে চাঞ্চল্য তুলেছে। এজন্য মার্কসবাদ পড়তে হয়নি আমাকে। তবে মার্কসবাদের একটি তত্ত্ব অভিনব। এদেশে প্রকাশিত নানা প্রবন্ধের মধ্যে এইটুকু জেনেছি। এদেশে প্রকাশিত নানা প্রবন্ধের মধ্যে একটি সত্যের সন্ধান পেয়েছি যেটি ভারতীয় সত্যের সঙ্গে সমন্বিত হবার অলঙ্ঘনীয় দাবি নিয়ে এসে

দাঁড়িয়েছে। সে হল অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রকে নিয়ন্ত্রণ করবার শক্তি।…কিন্তু তার বাস্তব-সর্বস্বতাকে মানতে পারিনি।" (আমার সাহিত্য জীবন)

'বাস্তব-সর্বস্বতা'কে গ্রহণ করেননি, অর্থাৎ আধ্যাত্মিকতার চাপে তাঁর শেষ দিকের একাধিক উপন্যাস বেশ অধম হয়েছে, এ কথাটি সত্য। তবে মনে রাখতে হবে, নজরুল শেষজীবনে ধর্মবিষয়ে ঝুঁকেছেন, বিভূতিভূষণ পরলোক-চর্চা করেছেন, এবং রবীন্দ্রনাথ আজীবন আধ্যাত্মিক, কিন্তু বামপন্থী বা মার্কসবাদীরা এদের কাউকেই পুরো বর্জন করেন নি। আধ্যাত্মিকতার অপরাধে টলষ্টয় লেনিন কর্তৃক পরিত্যক্ত হন নি।

তারাশঙ্কর রুশবিপ্লবের মধ্যে উষাকাল লক্ষ্য করেছিলেন। মার্কসবাদের মধ্যে একটি সত্যের সন্ধান পেয়েছিলেন। সেটি মার্কসবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, অর্থাৎ ধনসাম্যের প্রয়াস। এটিকে ভারতীয় সত্যের সঙ্গে সমন্বিত করতে হবে, তাঁর কাছে এ দাবি অলঙ্ঘনীয়।

চৈতালী ঘূর্ণিতে সংঘবদ্ধ শ্রমিকদের ধর্মঘট আত্মঘাতী কলহে সাময়িক ভাবে ব্যর্থ হলেও একে কালবৈশাখীর অগ্রদূত বলে লেখকের মনে হয়েছে। কথাটা সেই আমলে 'পরিচয়'-এর 'সংক্ষিপ্ত পুস্তক পরিচয়' বিভাগে এই ভাবে বলা হয়েছে: ' "বাবুদের" self consciousness জাগাবার চেষ্টা, ধর্মঘট প্রভৃতি করা আপাততঃ চৈত্র প্রান্তরের ঘূর্ণির মতই ক্ষীণ আর ক্ষণস্থায়ী হলেও লেখকের বিশ্বাস "চৈতালীর ক্ষীণ ঘূর্ণি অগ্রদূত কালবৈশাখীর"। বইখানি দরদ দিয়ে লেখা। কুলি-বস্তির ছবি সুন্দর ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। (পরিচয় বৈশাখ ১৩৩৯)।'

কোলিয়ারির জীবনের অভিজ্ঞতা তাঁর ছিল। আর তিনি দেখেছিলেন 'জমিদার মহাজন কাবুলিওয়ালার শোষণ তাড়না, ম্যালেরিয়ার আক্রমণ, ঈশ্বরের নীরবতা—গ্রামের চাষীকে টেনে নিয়ে চলছে অবশ্যম্ভাবী ধ্বংসের পথের মৃত্যুর পথে' (আমার সাহিত্য জীবন)। এই দু'দিক থেকে তাঁর মনে চৈতালী ঘূর্ণির সৃষ্টি হয়েছিল। পাষাণপুরীতে এবং আরো অনেকগুলি লেখায় 'অপরাধী'দের মধ্যে মানুষকে আবিষ্কার করেছেন। কালিন্দীতে ভূস্বামীদের পারিবারিক প্রসঙ্গ ও শিল্পপতির সঙ্গে তাদের দ্বন্দ্বের কথা বেশি। কিন্তু এই দ্বন্দ্বের ফল যাই হোক, বলি হয় ভূমিহীন সাঁওতালরা। যাদের সবল হাতের শ্রমে চর বাস ও চাষের যোগ্য হয়েছিল, তারাই অত্যাচারিত

ও বিতাড়িত হলো, এই মর্মান্তিক সত্যকে তিনি উদ্‌ঘাটিত করেছেন গভীর মমতা দিয়ে। ব্যাপক গ্রামাঞ্চলে হিন্দু মুসলমান চাষীদের ঐক্যবদ্ধ খাজনা-বন্ধের আন্দোলন-চিত্র আছে 'পঞ্চগ্রামে'। সাঁওতাল বিদ্রোহের ওপর উপন্যাস রয়েছে তাঁর। রাজনৈতিক আদর্শের প্রভাবে সাধারণ অরাজনৈতিক লোকেরও চেতনা কীভাবে বিস্তার লাভ করে, তার আশাবাদী চিত্র আছে 'ঝড় ও ঝরাপাতা'য় আদর্শবাদী রাজনৈতিক কর্মীর অনশনের সময় 'পাষাণপুরীর' সমগ্র 'অপরাধী' কুলও জাগরণ-শিহরণ অনুভব করেছিল। মন্বন্তরের নায়ক তো খোদ কমিউনিস্ট।

অভিযোগ আছে: তারাশঙ্করের সহানুভূতি পুরনো সমাজের দিকে, নতুন সমাজের দিকে নয়।

এখানে পুরনো নতুন ইত্যাদি কথাগুলো অস্পষ্ট। যতদূর বুঝেছি, পুরনো বলতে সামন্তবাদী ও নতুন বলতে ধনবাদী সমাজ বোঝায়; এবং এই উভয় সমাজের সংঘাতে তারাশঙ্কর নাকি সর্বদাই সামন্তবাদী সমাজের দিকে ঝুঁকেছেন, জমিদারি-ব্যবস্থার প্রতি তাঁর মমতা ছিল।

এই মতটি অতি-সরলীকরণের দোষে দুষ্ট।

একবার শারদীয় উল্টোরথে তারাশঙ্কর কয়েক পুরুষের জমিদারি নিয়ে লেখা একটি দীর্ঘ উপন্যাসের খসড়া প্রকাশ করেন। জমিদারি বিলোপ আইন পাশ হওয়ায় নায়কের সেখানে মনে হয়েছে ঘাড় থেকে একটা ভার নামল। ঐ নায়ক তারাশঙ্করেরই ছায়া।

আমাদের গোটা মধ্যবিত্ত শ্রেণীই তো মধ্যসত্বভোগী শ্রেণী থেকে ভেঙেচুরে এসেছে। সুতরাং পেছন দিকের প্রতি মোহ আছে, তৃষ্ণা আছে। কলোনির ধনবাদ সামনের দিকে মস্ত দরজা কিছু খুলে দেয় নি। তাই সেদিকেও শঙ্কা, অনিশ্চয়তা, দ্বিধা। অথচ ইতিহাসের চাপে যেতে হবে ঐ পথেই। তাই পেছন দিকে তাকিয়ে মাঝে মাঝে দীর্ঘশ্বাস। বাঙলাদেশের গোটা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর এই ত্রিশঙ্কু অবস্থা। এ থেকে তারাশঙ্কর সম্পূর্ণ মুক্ত ছিলেন এমন নয়। জমিদার রবীন্দ্রনাথই কি তা ছিলেন? আজকের প্রায়-নিঃস্ব আমরাই কি তা আছি?

এ ছাড়া আরো কথা আছে। স্বাধীন দেশের ধনবাদ তার উন্মেষকালে ব্যক্তি-আত্মার বিকাশে যতটা সহায়ক থাকে, ঔপনিবেশিক ভারতে তা হয় নি। প্রথম বাধা—বিদেশী শাসক, সে এটা চায় না, এটা তার স্বার্থবিরোধী।

দ্বিতীয়ত, সামন্তবাদী জড় আমাদের ধনবাদের কাঁধে চেপে আছে। স্বাধীন ধনবাদী সমাজে ব্যক্তিস্বাধিকার যতটা পরিমাণে স্বীকৃত, আমাদের এখানে তা নয়। কিন্তু ব্যক্তি তার স্বাধিকার অতটা না পেলেও বহু ক্ষেত্রে আত্মসুখ-সর্বস্ব সমাজবিমুখ স্বার্থপরতায় দীক্ষা নিয়েছে।

তারাশঙ্করে আছে সামন্তবাদী সমাজ, আমাদের পুরনো গ্রাম-সমাজ। কোনো কোনো ক্ষেত্রে আরো পুরনো সমাজের ছায়াও কিছুটা দেখা যায়। (যেমন নাগিনী কন্যার কাহিনী, হাঁসুলি বাঁকের উপকথা ইত্যাদি) এই সমাজে শোষণ, অত্যাচার ও আবদ্ধতা যথেষ্টই ছিল। এই অন্যায়ের পাশাপাশি অন্য স্রোত ছিল, যাকে বলতে পারি ব্যক্তির সমাজমুখিতা। এ কথা ঠিক, শোষণকারীরা এটিকে তাদের শোষণব্যবস্থা বজায় রাখার দিক থেকে ব্যবহার করেছে। কিন্তু সাধারণ লোক সমাজকল্যাণের সৎ চিন্তারই অনুবর্তী ছিল। পরে যখন গ্রামসমাজ ভাঙতে আরম্ভ করল, তখন স্বাধীন দেশের মতো ধনবাদী বিকাশ ঘটল না, ধনবাদী-সামন্তবাদী অত্যাচার কোনো না কোনো ভাবে রয়ে গেল, কিন্তু লোক হয়ে উঠল আত্মসর্বস্ব, অনেকগুলি সামাজিক মূল্যবোধ খোয়া গেল। এটা বহু সৎ মানুষের ভালো লাগে নি। এই জটিল সন্ধিক্ষণে বুঝলে তাঁকে পুরো বর্জনীয় মনে হবে না।

তারাশঙ্করের একটি সত্য ভিত্তি আছে। তিনি মানুষকে দেখেছেন, বাঙলাদেশের মানুষকে, অগণ্য, বিচিত্র। অনুভব করেছেন তাদের। অনুভব করিয়েছেন পাঠককে। মাটি ভেদ করে ওঠা উদ্‌ভিদ যেমন প্রাকৃতিক, স্বাভাবিক, তারাশঙ্করের মানুষগুলিও তেমনি। আর অসাধারণ প্রাণবন্ত। এই প্রবলপ্রাণতায় তারাশঙ্কর সমসাময়িক বহু নিখুঁত কাগজের ফুল ও অনেক সুশ্রী টবের গাছের চেয়ে যোজন-দূরত্বে অগ্রবর্তী। রক্তমাংসে তারা তীব্র স্পর্শগ্রাহ্য। তাদের মৌলিক সত্তা দপদপ করছে। বহু যায়গায় অস্তিত্বের এলিমেণ্টাল বিষয়কে তিনি ধরেছেন দৃঢ় মুষ্টিতে।

'অগ্রদানী'র বিষয় দারিদ্র্য। ভেতরে ঢুকলে দেখা যায়—না, তার চেয়ে বেশি। বিষয়—ক্ষুধা বা অন্য দিক থেকে দেখলে লোভ। বা হয়তো জীবন লালসা। ক্রমেই আমরা অস্তিত্বের সেই আদিমতম স্থানে প্রবেশ করতে থাকি। যেন আগে বাইরে ছিলাম, যত অল্পই হোক আলো ছিল। তারপর এগোচ্ছি, ভেতরে ঢুকছি, একটু একটু করে স্বল্প আলো হচ্ছে স্বল্পতর। অজ্ঞাতসারেই বুঝি পেশী হয়েছে একটু শক্ত, সতর্ক হয়েছি আমর। তারপরে হঠাৎ সেই

নির্মম উদ্‌ঘাটন, কঠিনতম সত্যের সম্মুখীন। মৃত পুত্রের শ্রাদ্ধের পিণ্ড-ভোজন। আমাদের গা শিউরে উঠছে, মন কুঁকড়ে গেছে। কিন্তু ব্রাহ্মণ সেই মর্মান্তিক ভোজন করে চলেছে। এ ভোজন থেকে তার রেহাই নেই। তাকে বাঁচতে হবে। আমাদের বাঁচার—শুধু বেঁচে থাকার—ক্ষুধা এতটাই। যা পরম হৃদয়মূল্যে মূল্যবান, তাকে গ্রাস করে বেঁচে থাকা। মানুষের চরিত্রে আমাদের অস্তিত্বের মধ্যে এ জিনিস আছে, তা যেন জানতাম না আমরা। তারাশঙ্কর তাঁর দৃঢ় অকম্পিত অঙ্কনে সেই অজ্ঞাত অন্ধকার যায়গাটা নির্মমভাবে তুলে এনেছেন। হঠাৎ যেন একটু ভয় করে ওঠে আমাদের। হঠাৎ যেন আমরা সেই মায়া-দর্পণের সামনে পড়ে গিয়েছি, যাতে আমাদের একেবারে ভেতরকার অন্ধকার যায়গাগুলোর ছায়া পড়ে। অমোঘ অন্ধকারের এক হ্যাঁচকা টানে ব্রাহ্মণের মর্মান্তিক সত্য ও অসহায় মূর্তিটি বেরিয়ে পড়েছে, যে কোনো মুহূর্তে আমাদেরও পারে। সঙ্গে সঙ্গে একটি গুরুতর সামাজিক অসঙ্গতির প্রতি আছে অঙ্গুলিনির্দেশ। ব্রাহ্মণের অসহায়তার কারণ এই অসঙ্গতি, তাই এ গল্প একই সঙ্গে নির্মম ও কারুণিক।

'দেবতার ব্যাধ'তে রয়েছে জীবন-মূল্যের আর একটি প্রবল প্রবৃত্তির উদ্‌ঘাটন। ডাক্তার—'দেবতা' কিন্তু যত দেবোপমই হোক, সে মানুষ, অতিমাত্রায় মানুষ তার রক্তে কামনার প্রবল স্রোত। বার বার সে দেবত্বে পৌঁছুতে চেষ্টা করে, আর বার বার কামনা তাকে গ্রাস করে, কিছুতেই উদ্ধার পায়না সে। কামনার প্রকোপকে নির্মম ভাবেই এঁকেছেন লেখক। এখানেও সেই মায়া-দর্পণের সামনে আমরা। এই প্রকোপের প্রাবল্যকে যেন জানতাম না সবটুকু। জেনে একটু ভয় হয়, অসহায় লাগে। যত ঊর্ধ্ব দেবলোকেই উঠি না কেন, মাটির কাছে প্রকৃতির কাছে আমরা এত বাঁধা। এই 'ব্যাধি' গ্রস্ত দেবতার—অর্থাৎ মানুষের—জন্যে লেখকের নির্মম লেখনীতে আছে ভালোবাসা; সত্য উদ্‌ঘাটনের ফাঁকে ফাঁকে সহানুভূতি।

এই সঙ্গেই উল্লেখ করা যায়, লোকজীবনের বিভিন্ন অংশের যৌন প্যাশনের রক্তরাগ তারাশঙ্করে সবল স্বাস্থ্যের অক্ষরে লেখা। কল্লোলীয়দের অধিকাংশ চিত্র সেখানে ধার-করা, বই-পড়া, নিস্তেজ, কখনো বা রুগ্ন।

অভিযোগ আছে—'মিহি' কাজ তাঁর নেই। হতে পারে। তবে মনে রাখতে হবে, তিনি মূলত নাগরিক জীবনের শিল্পী নন। গ্রামজীবনে ও লোকজীবনেই তাঁর স্বক্ষেত্র। সেখানে 'মিহি'র সুযোগ ও সম্ভাব্যতা কম।

সেই জীবনের মধ্যে যতটা যা স্বাভাবিক ভাবে ফুটে ওঠে তিনি তাই এঁকেছেন। পুস্তক-পঠিত মনস্তত্ত্বের জ্ঞান তাঁর চরিত্রের ওপর আরোপ করেন নি—যা হালের অনেক সাহিত্যিক বহু যায়গায় করেছেন। মহাকাব্যের চরিত্রে 'মিহি' দিকটা বড় একটা থাকেনা। সরল সবল রেখার প্রাণদীপ্ত বলিষ্ঠতাই তার বৈশিষ্ট্য। হাঁসুলি বাঁক-ও উপকথার ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে দেশজ এক মহাকথার সমীপবর্তী। গণদেবতা-পঞ্চগ্রামও গ্রামজীবনের এক বৃহৎকথা।

তিনি চরিত্রকে যেমন তার মৌলিক সত্তায় দেখতে চেয়েছেন, প্রকৃতিকেও বোধ হয় তাই। বিভূতিভূষণ বা অন্যান্য সমসাময়িকদের দৃষ্টিতে প্রকৃতি স্নিগ্ধ। কিন্তু তারাশঙ্কর তার ভেতরকার আদি রূপটিও দেখেছেন। ভয়ঙ্কর বিধ্বংসী, নির্দয়। মানুষ তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে তাকে আয়ত্তে আনতে পারলে তবে সে সুন্দর। প্রকৃতি তাঁর কাছে ভয়ের এবং ভালোলাগার।

'পরিচয়' (বৈশাখ, ১৩৪৮) কালিন্দীর সমালোচনা প্রসঙ্গে প্রিয়রঞ্জন সেন লিখেছিলেন : 'রায়হাটের কালিন্দী বা কালী নদীও তেমনই, তাহার মায়া-মমতা নাই—পরিবারে পরিবারে মিলনের চেষ্টা নাই, আছে শুধু একটু কৌতুক করিবার চেষ্টা। মানুষে মানুষে মিলনের চেষ্টাকে, উন্নতি করিবার চেষ্টাকে ফুৎকারে উড়াইয়া দিয়া তাহার প্রকৃতির মধ্যে যে ক্রূরতা আছে তাহাকে প্রকট করিবার চেষ্টা।...তাহার পাশে হাসি-কান্না সবই অনিত্য।'

'ছলনাময়ী' গল্পের নায়ক বলেছে : 'অন্ধ মানুষ জানেনা—নির্মম নিষ্ঠুরা প্রকৃতি ক্রন্দনে টলেনা, প্রার্থনায় নিষ্ঠুরার মত ব্যঙ্গ করে চলে যায়। তাকে আয়ত্ত করতে হয়, জোর করে স্ববশে আনতে হয়—নারীর মত—পৃথিবীর মত। তখনই সে হয় দাসী, মানুষের মনোরঞ্জনে বেশ্যার চেয়েও সে তখন মিষ্টমুখী।'

প্রকৃতিকে বেশ্যার সঙ্গে তুলনা দেওয়া রবীন্দ্রনাথ-বিভূতিভূষণে অসম্ভব ছিল। মা, অথবা প্রিয়া,—প্রকৃতির এই দক্ষিণ মুখই তো আমরা জানতাম তার বাম মুখ দেখালেন তারাশঙ্কর। আমাদের যেন অস্বস্তি হয়, একটু ভয় করে ওঠে। কিন্তু প্রকৃতির মিষ্ট মুখও তিনি দেখেছেন। তবে তা বিমুখতা জয় করবার পরে, নির্দয়তাকে বিদীর্ণ করে তার অন্তরে প্রবেশ করে। ভয় ও ভালোবাসা মেশামেশি করে আছে। প্রকৃতির এই প্রাণঘাতী ও প্রাণদায়ী, রুদ্র ও প্রসন্ন রূপকে তিনি কোথায় আবিষ্কার করেছিলেন? সে কি রাঢ়ের

রুক্ষ প্রকৃতি—যেখানে রূঢ়তাকে ভেদ করেই কোমলতাকে অর্জন করতে হয়? অথবা তন্ত্রপ্রিয় তারাশঙ্কর কি তন্ত্রের মধ্যে এই ভয়ঙ্করী ও মোহিনীকে একাধারে দেখবার প্রেরণা পেয়েছিলেন? অথবা নব্য কোনো বাস্তববিজ্ঞান তাঁর মনের মূলে ঘা দিয়েছিল?

যেভাবেই আসুক, এই বিশেষ দৃষ্টির গুণে পশু সম্পর্কিত গল্পে তারাশঙ্কর অনন্য। পশু প্রকৃতিরই অংশ। 'আদরিণী' ও 'মহেশে' মানুষের পশুপ্রীতির আবেগময় প্রকাশ—কিন্তু তা মানুষের দৃষ্টিকোণ থেকে বলা। পরে পশুর দৃষ্টিকোণ থেকে বলা গল্প পাই—বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বুধীর বাড়ী ফেরা' এবং গোপাল হালদারের 'রাস্তার রাজা'। কিন্তু এদের সব পশুই পোষ-মানা বা গৃহপালিত। হিংস্র ও ভয়ঙ্কর পশুর সঙ্গে ভালোবাসার বিবরণ পাই একমাত্র তারাশঙ্করে। 'কালাপাহাড়ে' দুর্দান্ত মহিষ ও 'নারী ও নাগিনী'তে সর্পিনী। সিংহিনীর সঙ্গে প্রেম—বিখ্যাত বিদেশী একটি গল্পের বিষয়। তারাশঙ্করের সাপিনী একাধারে মৃত্যুরূপা ও প্রেমরূপা। তার অধরে বিষ ও অমৃত।

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী বলেছেন, 'তাঁর অনুগামীর সংখ্যা প্রায় চোখে পড়ে না।' (মানুষ, নভেম্বর ১৯৭১)। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, গোড়ার দিকের সমরেশ বসু ও অমিয় মজুমদার এই বোধহয় উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্তের সম্বল। তারপরে আর তেমন কেউ তো নজরে পড়ে না। এর কারণ কী? জ্যোতিরিন্দ্রের একটা অনুমান: 'পশ্চিমী হাওয়ার গুণ'। হয়তো দ্বিতীয় কারণ—বর্তমান বাঙলা সাহিত্যের নগরমুখিতা। তৃতীয়ত, দেশভাগের পর বাঙলাদেশ কয়েকটি শহর ও শিল্পাঞ্চলের মধ্যে বিশেষভাবে কেন্দ্রীভূত। তাহলে বাঙলা সাহিত্যে কি গ্রাম-মাটি থেকে উদ্ভূত মানুষের দিন শেষ? পরের, পর্বের মানুষ কি আসবে শুধু শহর ও শিল্পাঞ্চল থেকে? যেখান থেকেই আসুক, আজকের মোহন নীরক্ত সাহিত্যের প্লাবনের পরেও যদি তাকে বেঁচে থাকতে হয়, তবে তো তাকে লোকসাগর-সঙ্গমে যেতেই হবে। প্রাণ-ঘট পূর্ণ করবার জন্য বার বার তো যেতেই হয়। তখন কি তারাশঙ্করকে আর একটু বেশি করে আমাদের মনে পড়বে না?

ব্যক্তিগত প্রসঙ্গে আবার ফিরে আসি। যখনই আমার ইচ্ছে হবে, বা দরকার হবে, আমি যেন ওঁর ওখানে যাই—একথা তারাশঙ্কর একাধিকবার আমায় বলেছেন। সনৎবাবু এই কথা আমায় জানিয়েছেন। ওঁর দ্বার আমার জন্য অবারিত ছিল। এবং আহ্বান ছিল। কিন্তু আজ দেখছি, ওঁর কাছে খুবই

কম যাওয়া হয়েছে। আরো যাওয়া উচিত ছিল। ওঁকে আরো দেখা ও বোঝার দরকার ছিল। যাই নি কেন? কারণ খুব সম্ভবত সেই পূর্ব-সঞ্চিত দ্বিধা। একটু এগোনো এবং পিছিয়ে আসা—এই দুয়ের মধ্যে ছিল আমার মন।

কয়েক বছর আগে তারাশঙ্কর ওঁর পরম স্নেহভাজন জনৈক বামপন্থী সাহিত্যিককে হঠাৎ জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'তুমি আমার লেখা পড়?' সেই সৎ সাহিত্যিকটি উত্তর দিতে পারেন নি। তারাশঙ্কর বলেছিলেন, 'আমি জানি তোমরা পড় না।'

তাঁর কাছ থেকে, তাঁর লেখার কাছ থেকে আমরা সরে এসেছিলাম। শেষের দিকে বুঝি একটু হাওয়া বদলের সূচনা দেখা গিয়েছিল। কিন্তু তখনই উনি বিদায় নিলেন।

আর এসব চিন্তা ছাপিয়ে ওঁর একটা কথা আমার কানের কাছে বার বার বাজছে: 'তোমাকে একটা কথা বলি, চিত্তরঞ্জন, যাকে ভালোবাসো না, তাকে নিয়ে কোনোদিন লিখো না।'

লিখিনি এতদিন। একটি বর্ণও নয়। আজ—এই প্রথম লিখলাম, তাহলে কি অন্যায় করলাম? এর উত্তর আমার জানা নেই। শুধু এইটুকু জানি, বাল্যের আচ্ছন্নতার দিনগুলি বাদ দিলে এই মুহূর্তে আমি ওঁর নিকটতম। এত কাছে এর আগে আমি ছিলাম না। সেইটুকুই আমার অধিকার। সেই আমার দায়।

একটি বিষয়ে শঙ্খ ঘোষের সঙ্গে আলোচনা করে উপকৃত হয়েছি।

শান্তি, মৈত্রী ও সহযোগিতার পথনির্দেশ

ভারত-সোভিয়েত শান্তি, মৈত্রী ও সহযোগিতা চুক্তির মূল বয়ান

উভয়ের মধ্যে বিদ্যমান অকৃত্রিম বন্ধুত্বের সম্পর্ককে আমরা আরও প্রসারিত ও সংহত করার বাসনা নিয়ে,

মৈত্রী ও সহযোগিতার অধিকতর বিকাশ উভয় রাষ্ট্রেরই মৌল জাতীয় স্বার্থ তথা এশিয়া ও বিশ্বে স্থায়ী শান্তির স্বার্থকে পূরণ করে, এই বিশ্বাস নিয়ে,

বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তাকে সংহত করা এবং আন্তর্জাতিক উত্তেজনা প্রশমন ও উপনিবেশবাদের অবশেষগুলিকে চূড়ান্তভাবে নিশ্চিহ্ন করার জন্য অবিচল প্রচেষ্টা চালাতে কৃতসংকল্প হয়ে,

বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থাসম্পন্ন রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে শান্তি-পূর্ণ সহাবস্থান ও সহযোগিতার নীতিতে দৃঢ়বিশ্বাস রেখে,

আজকের দুনিয়ায় আন্তর্জাতিক সমস্যাবলী একমাত্রই সহযোগিতার দ্বারাই সমাধান হতে পারে, সংঘর্ষের দ্বারা নয়—এবিষয়ে স্থিরনিশ্চিত হয়ে,

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদের উদ্দেশ্য ও নীতিসমূহ পালন করে চলার দৃঢ়পণ পুনর্ঘোষণা করে,

একদিকে ভারত প্রজাতন্ত্র এবং অন্যদিকে সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র সমূহের ইউনিয়ন,

বর্তমান চুক্তি সম্পাদিত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ; এবং এই উদ্দেশ্যে পূর্ণ ক্ষমতার অধিকারী নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের নিযুক্ত করা হয়েছে :

ভারত প্রজাতন্ত্রের পক্ষে :

সর্দার স্বরণ সিং

পররাষ্ট্র বিষয়ক মন্ত্রী

সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রসমূহের ইউনিয়নের পক্ষে :

মিঃ এ. এ. গ্রোমিকো,

পররাষ্ট্র বিষয়ক মন্ত্রী,—

এঁরা উভয়েই যথাবিহিত ও রীতিসম্মত অভিজ্ঞানপত্র পেশ করে নিম্ন-লিখিত বিষয়ে একমত হয়েছেন।

ধারা ১

চুক্তিবদ্ধ উভয় পক্ষ যথোচিত গুরুত্ব সহকারে ঘোষণা করছে যে দুটি দেশের মধ্যে ও তাদের জনগণের মধ্যে স্থায়ী শান্তি ও মৈত্রী অটুট থাকবে।

উভয় পক্ষই একে অপরের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও আঞ্চলিক অখণ্ডতাকে মর্যাদা দেবে এবং অপরের আভ্যন্তরিক বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা থেকে বিরত থাকবে। চুক্তিবদ্ধ উভয় পক্ষ উপরোক্ত নীতিসমূহ তথা সমানাধিকার ও পারস্পরিক উপকারের নীতির ভিত্তিতে উভয়ের মধ্যে বিদ্যমান অকৃত্রিম বন্ধুত্ব, সৎ-প্রতিবেশীসুলভ মনোভাব ও ব্যাপক সহযোগিতার সম্পর্ককে বিকশিত ও সংহত করে চলবে।

ধারা ২

উভয় দেশের জনগণের স্থায়ী শান্তি ও নিরাপত্তাকে নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে সম্ভাব্য সর্বপ্রকার ব্যবস্থা গ্রহণের বাসনার দ্বারা চালিত হয়ে চুক্তিবদ্ধ উভয় পক্ষ তাঁদের এই দৃঢ়পণ ঘোষণা করেছেন যে এশিয়া ও সারা দুনিয়ার শান্তিকে সুরক্ষিত ও শক্তিশালী করার জন্য, অস্ত্রপ্রতিযোগিতা বন্ধ করাব জন্য এবং কার্যকর আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণাধীনে পারমাণবিক ও চিরাচরিত অস্ত্রসহ সামূহিক ও সার্বিক নিরস্ত্রীকরণ অর্জনের জন্য তাঁদের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবেন।

ধারা ৩

জাতিধর্ম নির্বিশেষে সমস্ত মানুষ ও জাতির সমানাধিকারের মহৎ আদর্শের প্রতি আনুগত্যের দ্বারা পরিচালিত হয়ে চুক্তিবদ্ধ উভয়পক্ষ সকল ধরনের উপনিবেশবাদ ও বর্ণবৈষম্যবাদ ও তার সর্বপ্রকার বহিঃপ্রকাশের নিন্দা করছেন এবং এগুলির চূড়ান্ত ও সামগ্রিক বিলুপ্তির জন্য প্রয়াস চালিয়ে যাবার দৃঢ়পণ পুনরায় ঘোষণা করেছেন।

চুক্তিবদ্ধ উভয়পক্ষ এই সমস্ত অভীষ্ট অর্জনের জন্য এবং উপনিবেশবাদ ও বর্ণগত আধিপত্যের বিরুদ্ধে সংগ্রামে জাতিসমূহের ন্যায়সংগত আশা-আকাঙ্ক্ষাকে সমর্থন করার জন্য অন্যান্য রাষ্ট্রের সঙ্গে সহযোগিতা করবে।

ধারা ৪

সমস্ত জাতির সঙ্গে বন্ধুত্ব ও সহযোগিতাকে শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে পরিচালিত সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রসমূহের ইউনিয়নের শান্তিপ্রিয় নীতিকে ভারত প্রজাতন্ত্র শ্রদ্ধা করে।

সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রসমূহের ইউনিয়ন ভারতের গোষ্ঠী-নিরপেক্ষতা নীতিকে শ্রদ্ধা করে এবং পুনরায় ঘোষণা করে যে এই নীতি বিশ্বশান্তি ও আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা রক্ষায় এবং পৃথিবীতে উত্তেজনা প্রশমনে এক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

ধারা ৫

বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তাকে সুনিশ্চিত করার কাজে গভীরভাবে আগ্রহী হয়ে, এই সমস্ত অভীষ্ট অর্জনের জন্য আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তাদের পাস্পরিক সহযোগিতার উপর বিরাট গুরুত্ব আরোপ করে চুক্তিবদ্ধ উভয়পক্ষ তাঁদের নেতৃত্বস্থানীয় রাষ্ট্র-নায়কদের মধ্যে বৈঠক ও মতবিনিময়ের সাহায্যে সরকারি প্রতিনিধিদল ও উভয় সরকারের বিশেষ দূতদের সফরের সাহায্যে এবং কূটনৈতিক উপায়ের মাধ্যমে উভয় রাষ্ট্রের স্বার্থসংশ্লিষ্ট প্রধান প্রধান আন্তর্জাতিক সমস্যা সম্পর্কে পরস্পরের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করবেন।

ধারা ৬

পরস্পরের মধ্যে অর্থনৈতিক, বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত সহযোগিতার উপর বিরাট গুরুত্ব আরোপ করে চুক্তিবদ্ধ উভয় পক্ষ এই সমস্ত ক্ষেত্রে পারস্পরিক সুবিধাজনক ও ব্যাপক সহযোগিতাকে সংহত ও প্রসারিত করে চলবেন এবং বিদ্যমান বিভিন্ন চুক্তিসাপেক্ষে ও ২৬ ডিসেম্বর, ১৯৭০ তারিখের ভারত-সোভিয়েত বাণিজ্য চুক্তিতে নির্ধারিত সংলগ্ন দেশগুলির সঙ্গে বিশেষ ব্যবস্থাসাপেক্ষে সমানাধিকার, পারস্পরিক উপকার ও সর্বাধিক-আনুকূল্য-প্রাপ্ত জাতিসুলভ ব্যবহারের নীতিসমূহের ভিত্তিতে তাদের মধ্যে বাণিজ্য, পরিবহন ও যোগাযোগব্যবস্থাকে প্রসারিত করবেন।

ধারা ৭

চুক্তিবদ্ধ উভয়পক্ষ বিজ্ঞান, কলা, সাহিত্য, শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য, সংবাদপত্র, রেডিও, টেলিভিশন, চলচ্চিত্র, পর্যটন ও খেলাধূলার ক্ষেত্রে তাদের মধ্যেকার সম্পর্ক ও যোগাযোগকে আরো বিকশিত করে তুলবেন।

ধারা ৮

দুটি দেশের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত পরম্পরাগত মৈত্রীর সঙ্গে সংগতি রেখে চুক্তিবদ্ধ পক্ষদ্বয়ের প্রত্যেকেই যথোচিত গুরুত্বসহকারে ঘোষণা করেছেন যে কোন পক্ষই অপরপক্ষের বিরুদ্ধে পরিচালিত কোন সামরিক মৈত্রীজোটে আবদ্ধ হবেন না অথবা অংশগ্রহণ করবেন না।

চুক্তিবদ্ধ উভয় পক্ষই একে অপর পক্ষের বিরুদ্ধে কোনরূপ আগ্রাসন থেকে বিরত থাকার এবং চুক্তিবদ্ধ অপরপক্ষের সামরিক ক্ষতিসাধন করতে পারে এমন কোন কাজ চালাবার জন্য তার ভূখণ্ড ব্যবহার রোধ করার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন।

ধারা ৯

চুক্তিবদ্ধ উভয়পক্ষই অপর পক্ষের সঙ্গে সশস্ত্র সংঘর্ষে লিপ্ত কোন তৃতীয় পক্ষকে কোনরূপ সহায়তাদান থেকে বিরত থাকার অঙ্গীকার করছেন। কোনো পক্ষ যদি আক্রান্ত হয় অথবা আক্রমনের আশঙ্কার সম্মুখীন হয়, তাহলে চুক্তিবদ্ধ উভয়পক্ষ সেরূপ আশঙ্কা দূর করার জন্য এবং তাদের শান্তি ও নিরাপত্তাকে সুনিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে উপযুক্ত কার্যকর ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য তৎক্ষণাৎ পারস্পরিক আলোচনায় প্রবৃত্ত হবেন।

ধারা ১০

চুক্তিবদ্ধ উভয় পক্ষই গুরুত্বসহকারে ঘোষণা করেছেন যে, কেউই এক বা একাধিক রাষ্ট্রের সঙ্গে এই চুক্তির বিরোধী চরিত্রের কোনরূপ গোপন বা প্রকাশ্য চুক্তিতে উপনীত হবেন না। চুক্তিবদ্ধ পক্ষদ্বয়ের প্রত্যেকেই আরো ঘোষণা করছেন যে তার এবং অন্য কোনো রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে এমন কোন দায়-দায়িত্ব নেই, অথবা এমন কোনো দায়বদ্ধও সে হবে না যা অপরপক্ষের সামরিক ক্ষতিসাধন করতে পারে।

ধারা ১১

এই চুক্তি সম্পাদিত হলো কুড়ি বছর মেয়াদের জন্য এবং চুক্তিবদ্ধ কোন এক পক্ষ চুক্তির মেয়াদ শেষ হবার বারো মাস আগে চুক্তিবদ্ধ অপর পক্ষকে চুক্তির অবসান ঘটাবার ইচ্ছা না জানালে পরবর্তী প্রতি পাঁচ বছরের জন্য এই চুক্তির মেয়াদ স্বতঃই বেড়ে যাবে। এই চুক্তি চূড়ান্ত অনুমোদন সাপেক্ষ এবং এই চুক্তি স্বাক্ষরের এক মাসের মধ্যে মস্কোতে অনুষ্ঠিতব্য চূড়ান্ত অনু-মোদনের দলিল বিনিময়ের তারিখ থেকে বলবৎ হবে।

ধারা ১২

চুক্তিবদ্ধ উভয়পক্ষের মধ্যে এই চুক্তির কোনো এক বা একাধিক ধারার ব্যাখ্যায় কোনোরূপ মতপার্থক্য দেখা দিলে, পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও বোঝাপড়ার চেতনায় শান্তিপূর্ণ উপায়ে দ্বি-পক্ষীয় ভাবে তার মীমাংসা করা হবে।

উপরোক্ত পূর্ণ ক্ষমতা প্রাপ্ত ব্যক্তিরা হিন্দি, রুশ ও ইংরাজি ভাষায় লিখিত ও সবকটির পাঠই সমানভাবে প্রামাণ্য বর্তমান চুক্তিটিতে স্বাক্ষর করেছেন এবং তাতে নিজ নিজ সীলমোহর দিয়েছেন।

এক হাজার নয়শত একাত্তর সালের আগস্ট মাসের নবম দিবসে নয়াদিল্লীতে সম্পাদিত।

ভারত প্রজাতন্ত্রের পক্ষে	সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রসমূহের ইউনিয়নের পক্ষে
স্বাঃ স্বরণ সিং	স্বাঃ এ. এ. গ্রোমিকো
পররাষ্ট্র বিষয়ক মন্ত্রী	পররাষ্ট্র-বিষয়ক মন্ত্রী

এক্স-রে হয়ে গেছে

রাম বসু

সারাদিন সূর্যের এক্সরে। আর পারছি না। ও সব সরাও
আকাশের স্প্রিং-ডোর ঠেলে ধপধপে মেঘ সজ্জিত বাতাস
এক রকম আছি ; বসো ; বিব্রত হয়ো না স্থির হও।

ক্ষতটা কোথায় চিহ্ন এখনো ধরতে পারো নি, না ?
এক্স-রে সরিয়ে চোখ বন্ধ কর, ভিতরে তাকাও, টের পাবে।

মাথার জানালা হাট আলগা করে দাও, এলোমেলো হোক
পাখি পড়া করে পড়ানো হয়েছে, পান থেকে চূণ খসেনি ; তবুও
কী সব হয়ে গেল ! তবে ? মাথার জানালাটা খুলে রেখে দাও।

ধূ ধূ বালির চরে সাবেকি মন্দির, মড়ার খুলির মতো পড়ে থাকে চাঁদ
ডাহুক জোনাকি অন্ধকার সব কথা বলে। আমার কান্না পায়
স্রোতের নুড়ির মতো ঝকঝকে কথা। জানলাটা খুলেই রাখো।
সেদিন দেখলাম পাখির আচমকা ডাকে খুনীর হাতের ছোরা খসে গেল
স্টেথো দিয়ে কি বুঝবে ? হৃদয় এখনো হৃদয়-ই। আশ্চর্য ! না ?

অসহ্য যন্ত্রণা। অনুশোচনার গন্ধ বড় কটু। ওডি-কোলন দাও
আমার স্বপ্নের কেন্দ্রে ষ্টিচ দিতে গিয়ে গজ ছুরি রাখো নি তো স্বপ্নের ভিতরে ?
আমি দেখছি মাথার পাশে কারা দিনরাত্রি যুদ্ধ করেই চলেছে
মানুষের বড় বড় অয়েল পেন্টিং বরফের জলে চুবিয়ে ধরেছে
সমুদ্রের চোরা গোপ্তা পাহাড়ে কাদের লাশ এফোঁড় ওফোঁড় হয়ে বিঁধে আছে
ঝড়ের বিষণ্ণ বোন অন্ধকার গলায় একটানা কেঁদেই চলেছে।

অসহ্য যন্ত্রণা আমার স্বপ্নের মধ্যে ছুরি গজ ও সব রাখো নি ?

একদিন আমার ছায়া দিয়ে গড়ে ছিলাম পাহাড় ; তার নাম সময়
সেই পাহাড় ধ্বসে পড়লো আমার ওপর ; আমি চূর্ণ হয়ে গেছি
পরিণতির কথা বলো না, পরিণতি বলে কিছু নেই ; ছিল না
আমিতো দুই চোখে ধরেছি পাকা ফল ঝলমলে শুদ্ধতা। আর কী !

মাথার জানলা খুলে রাখো। আমি যেন সহ্য করার ক্ষমতা না হারাই
মৃত্যুর পায়ে মুখ রেখে কাতরে উঠলে আমার গলা টিপে দিও
এখন ও সবগুলো সরাও। চোখ বন্ধ করে বুকের ভিতরটা দেখে নি'।

জীবনকে জয় করো

কমলেশ সেন

(গুপ্ত হত্যা ও সন্ত্রাসের রাজনীতির বিরুদ্ধে)

কে কার গভীর প্রাণে
বসিয়ে দিবে হিংস্র বাঘের নখ;
কে কার গভীর প্রাণে
ঢেলে দিবে বিষের তীব্র জ্বালা,
কে কার গভীর প্রাণে
এঁকে দিবে রক্তের নিশানা,
তাই নিয়ে অতলস্পর্শী কত ভাবনা!

অথচ এই প্রাণের গভীরেই আছে
প্রাণ ভুলানো, মন মাতানো
কতো আশ্চর্য গল্পকথা,
এই প্রাণের গভীরেই আছে
প্রাণকে জয় করার, প্রাণকে ভালোবাসার
কতো উর্মিমুখর অগ্নিমালা

যুদ্ধ, যুদ্ধ সারাবেলা

মহাদেব সাহা

নিজেই জানিনে আমি কখন কিভাবে
আমার অস্থির হাত হয়ে ওঠে আক্রোশের উদ্ধত কৃপাণ
শত্রুহননের গাঢ় নেশা বেড়ে ওঠে রক্তময় জিরাফের গ্রীবা
মৃত্যুকে করিনে ভয়, বিপর্যয়, সমূহ বিপদ
উপেক্ষার দড়িতে বাঁধি, প্রকৃতই বুঝি আমি যুদ্ধের দেমাক
আমার মাথার মধ্যে ঝলসে ওঠে আদিম বাস্তব
যে হাত পাখির অঙ্গে রাখতো নরম আনাগোনা
গোলাপের দেহে দুলাতো আঙুল, সে হাত

সহসা দেখি লেলিহান হিংস্রক নিষাদ
আমার সমস্ত দেহে যোদ্ধাবেশ, আমার
সমস্ত রক্তে যুদ্ধের কসম ;
জানিনে নিজেই আমি আমার দুচোখ
কখন সহসা দেখি জ্বলে ওঠে ভীষণ মাইন,
যে চোখ রাখত ভরে এতদিন উদ্দাম সবুজ, বন
বৃষ্টির সহজ ইমেজ, সে চোখ এখন ছাখো এক লক্ষ মধ্যাহ্নের
ঝাঁ ঝাঁ রোদ, বস্তুত আগুন, শত্রুর বিরুদ্ধে প্রহরা সতত
আমার সমস্ত বুক সৈনিকের দীপ্ত রোষ, উথাল পাতাল
বাজপাখি, বোমারু বিমান,
আমার বুকের হাড়ে সারিসারি মাইনের দুর্ভেদ্য ব্যূহ
এই বুকে একদিন ছিল মানবিক স্পর্শ কাতরতা
ডালপালা নিসর্গকানন, নদীর নিঃশব্দ বিস্তার
সে বুকে জ্বলছে চিতা, অহরহ
কবরের করুণ সন্তাপ ধিকিধিকি
যে পা মাড়ায়নি কভু খুনী দজ্জালের মাতাল শহর
রক্তের বুনো দাগ, সে পা এখন ছুটছে সারাক্ষণ
যুদ্ধের সম্মুখে সোয়ার, অশ্বারোহী
ছুটে যাচ্ছে এই পা থেকে পা, হাত থেকে হাত, আঙুল,
এক পা হচ্ছে হাজার পা, পদাতিক
একহাত হাজার হাত
তীরন্দাজ বল্লম শিকারী
চোখ ঠিকরে আগুন পড়ে, বুকে ওঠে ধা ধা করে আদিম রোদ্দুর
অথচ যোদ্ধা নই, পিতৃপুরুষের বংশের ধারায় অনভ্যস্ত
নিরীহ বাঙালি, তবু যুদ্ধ করি, যুদ্ধ, যুদ্ধ সারাবেলা
যখন বাড়ায় হাত আমার বুক থেকে কেড়ে নিতে
একখণ্ড সবুজ জমিন
দেশ যার নাম।

গৃহযুদ্ধের দিন

রত্নেশ্বর হাজরা

গৃহযুদ্ধের দিন আশ্রয় লুটিয়ে পড়ে, অন্ধকারে
আমার তরবারির ফলা ভেঙে যায়—
বুকের উপর শাদা চন্দন মাখা পদ্মফুলের পাপড়ি
ভিজে ওঠে রক্তে   ঘরবাড়ি ভেঙে পড়ে
নির্জনতায় সময়ের ছিন্নভিন্ন শরীর টুকরো-টাকরা ইতিহাস ভূগোল
গৃহযুদ্ধের দিন
        দিগন্ত যে-কোনো শব্দের জন্য প্রস্তুত
যে-কোনো বুনো প্রাণীর আওয়াজ বা প্রজাপতি হত্যার শব্দ
গান থেমে যাওয়ার ব্যথা   তখন
চারদিকে ঠাণ্ডা দিঘি বা হ্রদের কাছে দৌড়ে যেতে চায় পথঘাট
রাস্তায় ওলোট-পালোট প্রাচীন গির্জা থেকে প্ল্যানেটোরিয়াম
স্মৃতিসৌধ এবং মানমন্দির রাজতন্ত্র আর প্রজাতন্ত্র
মানুষ থেকে মানুষ তার ছবি তার গান তার অতীত
বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ দুলে ওঠে মানচিত্রের মধ্যে মানচিত্র—
গৃহযুদ্ধের দিন
        একটা বৃত্ত তার কেন্দ্র বদলায়
        চতুর্দিকে
অসংখ্য শাদা পদ্মের পাপড়ি রক্তে ভিজে ওঠে—

বাঙলার বিবরণ

রণজিত নিয়োগী

মাতাল হাওয়ার মতো সবুজ কপ্টার
কতকাল বিক্ষোভের তাপ
জরিপের শেষে ফের
ফিরে যাবে সুনিকেত ক্ষমতার দ্বীপে!
চিরকাল নির্বিচার বিস্তৃত থাবার তলে
নির্বিকারে চেলে যাওয়া
নিপুণ দাবার চালে নখাগ্রের ব্যস্ত কারিগরি
বাঙলায় আগুন জ্বালে।

বাঙলায় আগুন জলে।

বাঙলা এক মিছিলের দেশ
অথবা ক্ষোভের তাপে চিরস্থায়ী চিতা
মৃতকে পুড়িয়ে ফেলে তারুণ্যের রোদে।
বিস্ফোরণে উন্মুখর বিক্ষোভের পুঞ্জিত বারুদ
পেশল মুঠির বজ্রে বাঙলাদেশ লোহিত পতাকা।
শোষণের যাঁতাকল হরতালে অচল, হেঁকে যায়
নকীবের দ্বিধাহীন আত্মস্থ নির্দেশ বাজখাঁই,
জনপদে সচকিত মনের রাডারে লাল মেঘ।
বাঙলার ফলন্ত বাঁশ
পাশুপত, তারো চেয়ে শক্তিশালী শেল
আকাশকে ছিন্ন করে উঠেছে আকাশে।
আত্মিক সুখের মতো ভীরুতার গোপন বাসর
সজ্জিত রাখেনি কেউ মনের আঁধারে কিংবা
ঘরের মায়ার কড়িকাঠে।
নিষ্কলুষ হোমানলে জ্বলছে মিছিলে
প্রতিটি প্রাণের দুর্গে চেতনার প্রখর অনল :
মুক্তির অঙ্গীকারে আত্মাহুতি সুনীল স্বরাজ।
বাঙলায় হরতাল—যান্ত্রিকতা নিমেষে লোপাট,
সবুজ শোভার মতো ঝড়ো মেঘে পদচারী মিছিলের নদী।
পদাতিক সৈনিকের পদপাতে তাড়িত ধূলায়
বিপ্লবের পুরোভাগে মোহিনী নগরী
রক্তের উদার স্রোতে নিকিয়েছে সন্ত্রাসের পাপ।
কাঁদুনে ধোঁয়ার ছলাকলা
বাঙলার লাল চোখে আনে না জলজ
ক্ষীণ দেহ উদ্ভিদের ঘুম কাতরতা।
কারফিউ থামাতে জানে নি কোনোকালে
সারি সারি মিছিলের আরণ্যক রোদ।
বুকের খনিতে যতো প্রজ্জ্বলিত বোধ
বোধের আগুনে দৃপ্ত উদার স্বদেশ।
মৃত্যু পোড়ে উন্মোচিত স্বরাজের দ্বারে।

মানুষ রতন

দেবেশ রায়

তদন্তের তারিখ পর্যন্ত উনচল্লিশটি মৃতদেহ পাওয়া গেছে। সংখ্যাটি এমন বিশ্বাসযোগ্য যে এক যোগ করে চল্লিশের মতো পূর্ণ বা এক কমিয়ে আটত্রিশের মতো প্রায়পূর্ণ করতে ইচ্ছা হয় না। যেন অনেক আঁতিপাঁতি খুঁজেও, যেন মড়া খুঁজে বের করার দায়দায়িত্ব যাদের—তাদের সমস্ত রকম চেষ্টার শেষেই, ওটা উনচল্লিশ।

কিন্তু সরকার নিরপেক্ষ তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন, ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীরা বারবার বলেছেন দোষী যে-ই হোক শাস্তি হবেই যদিও লোকসভার বোধহয় তরুণ-তম-ই বলে রেখেছেন একটা গণঅভ্যুত্থানের ফলেই নাকি এতো মানুষ মারা গেছে। আপাতত তাতে মনে হতে পারে গণঅভ্যুত্থান ও নরহত্যার ভেতর রাজনীতিতে একটা পার্থক্য আছে। কিন্তু প্রথমত আইনজীবী হিসেবে, দ্বিতীয়ত বিচারপতি হিসেবে, তৃতীয়ত বর্তমানে প্রাক্তন বিচারপতি হিসেবে আমার জানা নেই ভারতীয় পেনাল কোড ও ভারতীয় সংবিধানের আওতায় কতজন মানুষ একত্রিত হয়ে কতজনকে মেরে ফেললে তা দলবেঁধে দাঙ্গা ও হত্যার আওতা ছাড়িয়ে গণঅভ্যুত্থান হবে। অথচ ঘোষণা হয়ে গেছে দোষী বের করা মাত্র তার শাস্তি হবে। দোষী বের করতে না পারলে দোষ তদন্তকারী প্রাক্তন বিচারপতির ঘাড়ে বর্তাবে। ভারতীয় বিচার-ব্যবস্থার প্রায় নির্বিকল্প নিরপেক্ষতা তাতে কলঙ্কিত হবে। সুতরাং দোষী ব্যক্তি বা ব্যক্তিদের খুঁজে বের করার ওপর ভারতীয় বিচার-ব্যবস্থার ওপর নির্ভরশীল শাসন-ব্যবস্থা, সেই শাসন-ব্যবস্থার ওপর নির্ভরশীল লোকসভা-বিধানসভা-মন্ত্রীমণ্ডলী—এসব কিছুর মানসম্মান নির্ভরশীল। আমি জানি নির্ভরতার এই ক্রম নিয়ে বিতর্ক হতে পারে। অনেকে মনে করেন শাসন-ব্যবস্থার ওপর বিচার-ব্যবস্থা নির্ভর-শীল। আমার এতেও আপত্তি নেই। থোড় দিয়েই শুরু হোক আর খাড়া দিয়েই শুরু হোক বড়ি মাঝখানেই থাকে।

কিন্তু এ-ক্ষেত্রে আমার একটু বিপদ হয়েছে। বিপদটা আপাতত আমার

একার হলেও, শেষ পর্যন্ত অনেকেরই। ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী আইনজীবীও। তিনি বলেছেন দোষ বেরলেই শাস্তি। দোষ প্রমাণ হলেই শাস্তি—কথাটি হয়ত, আরো আইনসঙ্গত হতো কিন্তু আইনজীবী তো ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী-ও বটেন। তাই আইনের বিমূর্ত ভাষাকে তিনি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য করে তুলেছেন। খুব গোঁড়া বিচারে অবিশ্যি এতে আইনের বিমূর্ততা নষ্ট হয়, নষ্ট হয় ব্যক্তিনিরপেক্ষতা, নষ্ট হয় ন্যায় ও ধর্মের প্রতি নির্দ্বিধ আনুগত্য,—দোষ খুঁজে বের করার বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা—দোষী খুঁজে বের করার নেহাত একটা ব্যক্তিগত বা দলগত বা পাড়াগতও তল্লাশিতে পরিণত হয়। আইনের সামনে তো মানুষটির কোনো স্বতন্ত্র মূল্য নেই, ব্যক্তি হিসেবে। আইনের সামনে তার শুধু সামাজিকতা আছে—যে সামাজিক সত্তার সংজ্ঞা পেনালকোডের বিভিন্ন ধারায় উপধারায় বারবার নির্দিষ্ট হয়ে আসছে। আইনজীবী হিসেবে আমার কোনো দায়িত্ব নেই কোন্ কোন্ লোক দোষী তা খুঁজে বের করার। আমার দায়িত্ব দোষটা কোথায় তা নির্দিষ্ট করে দেয়া। সেই নির্দেশের ধারা উপধারা মিলিয়ে যাঁরা শাসন-ব্যবস্থাটা চালাচ্ছেন তাঁরা দোষীদের খুঁজে বের করবেন। বোধহয় এই খুঁজে বের করার ভারও তাঁর উপরে বলেই, মন্ত্রীয়শাই বলে ফেলেছেন, দোষী বেরলে তিনি শাস্তি দেবেন। কারণ তিনি তো মন্ত্রীও, ও, ভারপ্রাপ্তও।

দোষ বের করার পদ্ধতি কি হবে তা নিয়েও খানিকটা মতবিরোধিতা হতে পারে। ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ মামলায় সুপ্রিম কোর্টের রায় সরকারের বিরুদ্ধে যাওয়ায় প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন 'জনসাধারণের আশাআকাঙ্ক্ষার কথা আদালতের মনে রাখা উচিত।' পরে, লোকসভার মধ্যবর্তী নির্বাচনের সময় একটা পোস্টার দেয়া হয়—'পঞ্চাশ কোটি মানুষের জয়যাত্রা আদালত শুদ্ধ করতে পারবে না।' তখন কোনো এক বিচারপতি বলেছিলেন 'সরকারের কী সুবিধে আর কী অসুবিধে তা ভেবে তো আর আইনের ব্যাখ্যা চলে না।' আবার এই ক্ষেত্রে ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী বলেছেন—'দোষী বেরলেই শাস্তি।' আবার তাঁর দলের, বোধহয় তরুণতমই লোকসভাসদস্য বলেছেন 'এটা একটা গণ-অভ্যুত্থান।' অর্থাৎ এই পরস্পরবিরোধী দুটি মতের একটিকে আমার নীতি হিসেবে গ্রহণ করতে হবে।

বিপদটা হয়েছে এইখানে যে সামাজিকতা থেকে ব্যক্তিগত স্খলন পতন আদালতের এক্তিয়ারে, সামাজিকতা থেকে সমাজগত স্খলন পতন কার এক্তিয়ার ভুক্ত সেটা স্থির নেই। বিশেষত রাষ্ট্রপতির শাসনকালে সেটা রাজ্যপালের

এক্তিয়ারে না-কি ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীর না-কি উভয়েরই সেটা এখনো স্থির হয়নি। সাতষট্টি সালের ভোটে কংগ্রেসের ভারত জোড়া প্রতিষ্ঠা টলে যাওয়ার পর সেই শূন্যস্থান পূরণ করতে যেখানে যাকে বসানো হয়েছে, ভেবে বসেছে সেখানে সমাজ পরিবর্তনের মূলশক্তি সে-ই আর কেউ নয়। অবস্থা এমন যে, পশ্চিম-বাঙলায় রাজ্যপাল ধরমবীরা-ই সেই সমাজ পরিবর্তনের এজেন্টের ভূমিকায় হঠাৎ আবির্ভূত হয়ে পড়েন। তাতে এমন একটা ভাব তৈরি হয়েছে যে সামাজিকতা থেকে সমাজের সামগ্রিক স্খলন পতন বুঝি সরকারের এক্তিয়ারভুক্ত। বুঝি সরকারই কখনও বন্ধ্ ডেকে, কখনো ধর্না দিয়ে স্থিতিশীল সমাজের অনড়তাকে নাড়িয়ে দিতে পারে, বুঝি বা ভেঙেও,—যাতে নতুন সমাজ-শাসন তৈরী হয়। আবার বন্ধ্ আর ধর্নার পরিবর্তে কেউ যখন হত্যার অস্ত্র শাণিত হাতে তুলে নিতে চায় বা গুপ্ত-হত্যার জন্য কোনো অন্ধকার গোপন আশ্রয়ে গা ঢাকা দিতে চায়, স্থিতিশীল সমাজের অনড়তাকে নাড়িয়ে দিতে বা ভেঙে দিতে, তখন সরকারই আবার সমাজের স্থিতিশীলতাকে রক্ষা করতে পারে। গীতায় বিশ্বরূপ-দর্শন অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণের আমিই রক্ষক, আমিই ভক্ষক, এই আত্মপরিচয় সরকারেও বর্তেছে, ও, সেইসূত্রে রাজনৈতিক দলগুলির ওপরও, এই পার্টি শাসনের সংবিধানের আওতায়। উপমা দিয়ে অবিশ্যি যুক্তির কাজ সারা উচিত নয়। তবে বিচারকের তদন্ত রিপোর্টে কিছুতো অস্পষ্ট থাকা উচিৎ নয়। আমিই রক্ষক, আমিই ভক্ষক—শ্রীকৃষ্ণের রূপই হয়না অনেক সময় কমলেকামিনীর রূপও হয়। বা, বোধহয়, চামুণ্ডারও। সুতরাং রক্ষক হিসেবে নিজেদের ভূমিকাটি দিব্যি বোঝা গেলেও,—বাইরে নেমপ্লেট, ট্যুর প্রোগ্রাম, ব্যক্তিগত অ্যাসিস্ট্যান্ট, স্যার স্যার—ইত্যাদিতে, ভক্ষক হিসেবে নিজের মুণ্ড নিজেই চিবোচ্ছি কিনা সেটা বোধহয় এখনো জানি না। ঐতিহাসিক স্কুল পরীক্ষার পর জানা যাবে যে ইতিহাসে কী কী অজীর্ণ!

সব শুদ্ধু মোট উনচল্লিশটি মৃতদেহ পাওয়া গেছে। চল্লিশ নয়, ত্রিশ নয়, পঁয়ত্রিশ নয়। শুধু উনচল্লিশ। এতেই প্রমাণ হয় চব্বিশ পরগণা ও কলকাতা পুলিশের স্বতন্ত্র প্রয়াস ছিল সঠিক মৃতদেহগুলি বের করার। আমার বিচার্য তদন্তর বিষয় অবশ্যই দেহগুলির মৃত হওয়ার কারণ ও পারলে হত্যাকারীর সন্ধান। পুলিশ যথা সময়ে খবর পেয়েও এই উনচল্লিশটি মৃত্যু ঠেকাবার কোনো চেষ্টা করেছে কি-না, সেটাও আমার তদন্তর আওতাভুক্ত। কিন্তু আমি হত্যার শেষ দিয়ে হত্যার শুরুতে যেতে চাই। হত্যা পুলিশকর্তৃক প্রতিরোধযোগ্য

ছিল কি-না, এ-বিষয়ে প্রবেশের আগে নিহতগণ পুলিশকর্তৃক সংগৃহীত হলো কীভাবে সেটাই প্রধান বিবেচ্য হওয়া উচিত।

মৃতদেহগুলি কীভাবে খুঁজেখুঁজে পাওয়া গেছে তার অনুসন্ধানে পুলিশের সাক্ষ্যে জানা যায় ঘটনার দিন-রাত্রিতে খবর পেয়েই তারা বেরিয়ে পড়ে। বারো তারিখ রাত্রিতে থানায় ডাইরি বইয়ে চারটি টেলিফোনের মেসেজ সেট করা আছে, গাড়ির লগবইয়েও রাত্রিতেই গাড়িগুলি বারবার বেরোনোর প্রমাণ মেলে। তা থেকে অবিশ্যি এ-সিদ্ধান্তে পৌছনো যায় না যে পুলিশ খবর পেয়েছে আর ছুটেছে যদি তের তারিখের খবর বলতে এই বিশেষ ঘটনাকেই বোঝানো হয়, যে-ঘটনায় কিছু উত্তেজিত লোক মারবার উদ্দেশ্য একত্রিত হয়ে খোঁজাখুজি করে নানা জনকে বারো ঘণ্টা ধরে মেরে, ফেলে রেখে গেছে। থানার ডায়রিতে আরো দেখা গেছে যে তের তারিখে এই থানা (আমার সুবিধার্থে এর পর থেকে এক নং থানা বলা হয়েছে) এলাকায় আরো দুটি দাঙ্গা, তিনটি খুন ও চারটি চুরির ঘটনা ঘটে। একটি মেয়ে হারানোর খবরও ছিল, পরে অবিশ্যি মেয়ের বাবা জানায় যে তাকে পাওয়া গেছে। সুতরাং পুলিশ এগুলির তদন্তর উদ্দেশ্যেও গিয়ে থাকতে পারে। এই দাঙ্গা, খুন ও চুরির ঘটনাটা আসলে হয়তো তদন্তর বিষয়ে যে-ঘটনা সেই ঘটনারই নানা অংশ। যাঁরা তখন থানাকে খবর দিয়েছিলেন তাঁরা হয়তো ভেবেছিলেন ওগুলো বিচ্ছিন্ন মারামারি বা খুন বা চুরি। আসলে হয়তো ঐ দাঙ্গা, ঐ খুন ও ঐ চুরিও—এই তদন্তাধীন ঘটনারই অংশ। পরে সমস্ত ব্যাপারটি ঘটে যাবার পরে, নানা জায়গায়, নানা গলি ঘুঁজিতে নানা বারান্দায় বা ঘরে বা মোড়ে বা গঙ্গাতীরে মানে, কলকাতা শহরে ,সামাজিক বসবাসের জন্য প্রয়োজনীয় সর্বত্র, পাড়ার মোড়ের দোকানে বা কারখানায় বস্তির মুখে বা বস্তির পিছন দিয়ে গঙ্গাতীরে যাবার রাস্তাটার মুখে সর্বত্র নানা রকমের সব মৃতদেহ পাওয়া যেতেই তো বোঝা গেল সমস্তটাই একটা ঘটনা। তার আগে পর্যন্ত তো যে মরছে সে ভাবছে শুধু সে মরছে বা যে মারছে সে ভাবছে সেই মারছে। এই যে ঘটনা একটি-ই মাত্র, দুটি নয় তিনটি নয় মৃতদেহ উনচল্লিশই হোক বা উনিশ হোক ঘটনা একটিই তা তো বোঝা গেল বার-তের ঘণ্টা পেরবার পর, সকালের আলোতে মৃতদেহগুলো যখন একসঙ্গে দেখা গেল। সুতরাং বারো তারিখে রাত্রিতে পুলিশ যে বারবার খবর পেয়েছে ও বেরিয়েছে তা-কি নানা ঘটনার মোকাবিলা করতে না-কি একটি ঘটনার? প্রশ্ন ঠিক একটু ঘুরিয়ে দিলে দাঁড়ায় বারো তারিখ রাত্রিতেই কি পুলিশ

বুঝতে পেরেছিল যে ঘটনা একটিই ঘটে যাচ্ছে ? নাকি ভেবেছিল নানা ছড়ানো ছিটনো ঘটনা ঘটে যাচ্ছে যার পরস্পরের ভেতর কোনো যোগ নেই ?

এই প্রশ্ন দুটির সমাধান হওয়া অতীব দরকারি। আমাদের পুলিশবাহিনী প্রত্যক্ষসূত্রে ইংরেজের কাছ থেকে পাওয়া, তাদের কোনো রাজনীতিক শিক্ষায় অনুপ্রাণিত করা হয়নি। যুক্তফ্রন্টের দ্বিতীয় সরকারের আমলে প্রাগ্রসর রাজনৈতিক নেতৃত্বের অধীনে পুলিশ বিভাগ থাকায় তাদের ভিতর কিছু রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ লক্ষ্য করা গিয়েছিল। ফলে, এমন হতে পারে যে এক নং থানার কর্তৃপক্ষ ঘটনার খবর পেয়ে নানা বিচ্ছিন্ন ঘটনার ভেতরকার ঐক্যসূত্র বের করতে পেরেছিল—আর নানা বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত বিক্ষোভ যখন সংহত সংগঠিত রূপ নেয় কোনো রাষ্ট্রশক্তির ক্ষমতা নেই তাকে রোখে, ইতিহাসের অনিবার্যতা বিষয়ে এই নিশ্চয়তাই কি এক নং থানার কর্তৃপক্ষকে সেদিন উৎসাহ দিয়েছিল, নাকি নানা বিচ্ছিন্ন ঘটনার প্রতি শক্তির কেন্দ্র যেমন অনীহ, তেমন ছিল সেদিন এক নং থানার কর্তৃপক্ষ ? আমি আশা করি আমার এই রিপোর্ট নিয়ে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ যখন আলোচনা করবেন তখন থানা কর্তৃপক্ষ ও ইতিহাসের গতি—এ-বিষয়ে একটি সমীক্ষার ব্যবস্থা করবেন।

খবর পেয়ে হোক আর খবর না পেয়ে হোক্ থানা কর্তৃপক্ষ, এক ও দুই নং দুই থানার কর্তৃপক্ষই, ছোটাছুটি করেছিলেন। কারণ, না হলে এক একটা গাড়ি বেরিয়ে ঘুরে আসার সময় একটা করে মৃতদেহ নিয়ে এসে রেখে দিয়ে আবার বেরিয়ে যেতে পারতো না। সেটা তেরই সকাল হতে পারে। সেটা ঘটনার শেষ হতে পারে। কিন্তু মৃতদেহগুলি আবিষ্কারের কারণ এটাই।

একটি বিষয়ে তদন্ত করতে গিয়ে আমি নিরাশ হয়েছি। আমি সন্ধানের চেষ্টা করেছিলাম কোন্ গাড়ি কতগুলো মৃতদেহ টেনেছে। কিন্তু ড্রাইভার বা পুলিশ কেউই এ-বিষয়ে কিছু বলতে পারেনি। কারণ অনেকেই বলেছে রাস্তায় পড়ে আছে দেখে তুলে থানায় রেখে দিয়ে বেরতেই আরো নতুন নতুন মড়া। ফলে কে কখন কোথা থেকে কত মড়া এনেছে তার কোনো হিসেব কষা সম্ভবই হলো না। এমনকি ড্রাইভার ও পুলিশের ভেতর এমনও কেউ কেউ বলেছে যে সবগুলি মৃতদেহই নাকি তারা এনেছে। এর একটি মনোস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা এই হতে পারে যে, মৃতদেহ বয়ে আনার মতো অস্বস্তিকর অভিজ্ঞতার ফলে সবারই ধারণায় প্রায় একটা অনড়তা (fixation) এসে গেছে যে যতো মড়া, সবই তারা। এর আগে একটা ব্যাখ্যা এই হতে পারে

যে এক ও দুই নং দুটি থানা যখন অপরাধী হয়েই আছে, তখন মড়া জোগাড়ে প্রথম হয়ে চাকরি রক্ষা ও সরকারের সহানুভূতিশীল দৃষ্টিতে দুটি ইনক্রিমেণ্ট পাওয়ার সুযোগটা হয়তো কেউ কেউ গ্রহণ করতে চাইছে। নইলে সবার দাবির মড়ার সংখ্যা মোট সংখ্যার তিনগুণ হয় কেন?

তবে কি পুলিশ কর্তৃপক্ষ মানুষ মরে পড়ে আছে জেনে তুলে আনতে গিয়েছিল, নাকি মানুষ বাঁচাতে ছুটে গিয়ে মড়া মানুষ বোঝাই হয়ে ফিরে এসেছে। যাদের মৃতদেহগুলি ধীরে ধীরে ডাঁই হয়ে উঠেছিল, তারা কি পুলিশ কর্তৃক রক্ষণীয় ছিল। নানা রঙের, নানা মাপের মড়াগুলো কি বেঁচে থাকার সময় পুলিশ বা রাষ্ট্রের আশ্রয় পেয়েছিল?

এ-প্রশ্নের মীমাংসাও অতীব দরকারি। বাঁচাতে আর এক সীমান্ত থেকে ছুটে এলে, অর্জুনের, মৃত ছাড়া কোনো অভিমন্যু থাকে না তো!

মড়া পেলে তুলে নিয়ে আসা কোনো থানার কাজ নয়। একজন কন্স্টেবল মড়ার পাশে বসে থাকে। ফোটোগ্রাফার, ডোম ইত্যাদিরা খবর পায়। তারপর ডোম মর্গে নিয়ে যায়। এটা বোঝা যায় থানায় পাহারাদারির কাজে নিয়োগযোগ্য কনস্টেবলের চাইতে মড়ার সংখ্যা বেশি হয়ে গেলে আর একটি মাত্র মড়ার পাশে মাত্র একটি কনস্টেবল বসে থাকা নিরাপদ নয় বলেও বটে—সবগুলো মড়া আর সবগুলো কনস্টেবল থানার বারান্দায় রাখার ব্যবস্থা বর্তমানে বিশেষ অবস্থায় করা হয়েছিল হয়তো। কিন্তু এ-ক্ষেত্রে যেমন থানা কর্তৃপক্ষ নিয়ম পাল্টে নিয়েছেন—সব জায়গাতে তো আর সম্ভব নয়। তাই দু-একটি জায়গায় এক ও দুই নং থানার ভেতর কিছু বাদ-বিসংবাদ হয়েছে। সেক্ষেত্রে আসলে দুই কর্তৃপক্ষই আইনের এক্তিয়ারের ভেতর থাকতে চেয়েছে। আসলে মানুষগুলো মড়া বলেই থানায় থানায় এই গোলমাল হয়—মড়াটা কোন্ থানার। জ্যান্ত লোকেরা তো থানা থেকে থানায় যেতেই পারে. তাই বলে একটা লোক মরার সময় বা মারার সময় যদি এক থানায় পা এক থানায় মাথা, পড়ে থাকে বা ফেলে রাখে তাহলে থানা কর্তৃপক্ষই বা কি করতে পারেন, মড়াটাকে ওখানে রেখেই চিঠিপত্র লেখা ছাড়া।

যেমন বেলা বারোটা পঁয়ত্রিশ মিনিটে খবর পেয়ে এক নং থানার পুলিশ ছুরি ও গুলিচিহ্নিত একটি যুবকের মৃতদেহ পায়। সেখানে উপস্থিত কিছু লোক খবর দেয় যে কিছুদূরে একজায়গায় জলের ভেতর অনেকগুলো মৃতদেহ ভাসছে। প্রথম জায়গা থেকে মড়াভাসিতে যেতে আধ ঘণ্টা সময় লেগেছিল।

সেখানে গিয়ে এক নং থানার পুলিশ কর্তৃপক্ষ দেখে যে তিনটি মৃতদেহ ভাসছে। পরে দেখা গিয়েছিল তিনটি যুবকেরই হাতদুটো পেছনে বাঁধা; গলা চিরে দেয়া, খুলির ভেতর গুলি করা। যে জায়গাটিতে এই মড়াগুলো ভাসে, সেটা একটা চটকলের বস্তির পেছনের সেই মাঠ যেখানে এল-আই-সির কর্মচারীরা বাড়ি বানাবেন বলে সমবায় পদ্ধতিতে জমি কিনেছেন। "সাইট ফর হাউসিং স্কিম—এল-আই-সি এমপ্লয়িজ" লেখা সেই একমাঠ জলে মড়া তিনটি প্রতিমার খড়ের কাঠামোর মতো অদরকারি ভেসে থাকে, যেন শুধু জলে জল হয়ে যেতে। যে-রাস্তাটার ওপর এক নং থানার পুলিশ গিয়ে মৃতদেহ তিনটিকে দেখল সেটাই তাদের পশ্চিমসীমা আর ঐ মাঠটা থেকে দুই নং থানার চৌহদ্দি শুরু হয়। আসলে মাঝখানের ফাঁকা মাঠটা ছিল বলেই দুটি থানার ভেতর সীমানা নিয়ে কোনো গোলমাল কখনো হয়নি। কিন্তু সেই ফাঁকা মাঠটাই জলে ভরে উঠে তিন-তিনটি মড়া ভাসিয়ে একটা শাসনতান্ত্রিক সঙ্কট সৃষ্টি করে। ঐ মড়াগুলো তোলার জন্য একটা নৌকো ভাড়া করতে হতে পারত বা লোক লাগালে হতো। তাহলে এক নং থানা কি করে বলত দুই নং থানার মাঠে মড়া তুলবে বলে তার খরচা হচ্ছে। তাহলে এ-জি ওয়েস্ট বেঙ্গল আপত্তি দিত। সুতরাং এক নং থানার পক্ষে দুই নং থানাকে জানানো ছাড়া কী করার আছে?

এদিকে দুই নং থানা চিঠির জবাবে জানায় যে তিনটি মড়ার পজিশন এক নং থানার শেষ রাস্তার কাছে। সুতরাং সম্ভাবনা এটাই যে এক নং থানার চৌহদ্দিতে খুন সেরে দুই নং থানার মাঠে ফেলে রেখে গেছে। জল ভর্তি মাঠে ডুবজলে দাঁড়িয়ে তো আর খুনোখুনি হয় না। সুতরাং এক নং থানাকেই মড়া তিনটি তুলতে হবে। এক নং থানা অবিশ্যি শেষ পর্যন্ত বলেছিল জল পুলিশকে খবর দেওয়া হোক। কিন্তু সারা বছর শুকনো থেকে যে-মাঠ বর্ষার কমাস জলে ডোবে সেটা জলপুলিশের এক্তিয়ারে বিশেষত "এল-আই-সি এমপ্লয়িজ হাউসিং এস্টেট"-এর সাইনবোর্ডসহ—কিনা তার জন্য আবার স্বরাষ্ট্রবিভাগে খবর নিতে হতো। জবাব আসতে আসতে তো মৃত তিনজনের পরজন্মের গর্ভবাস কালও শেষ হয়ে যাবে। শেষে দুই থানার দুই এস-আই মিলে মড়া তিনটি তোলা হলো।

বর্তমানে আমাদের থানাগুলির ওপর কাজের চাপ অত্যধিক। জনসংখ্যাও প্রচুর বেড়েছে। সেই অনুযায়ী থানার কর্মচারি বাড়ে নাই। এমতাবস্থায়, যদি চৌহদ্দি নির্দিষ্ট নয় এমন সব জায়গায় মড়া পড়ে থাকে, তাহলে, শাসনতান্ত্রিক

অচলাবস্থা সৃষ্টি হবে। তাই আমার সুপারিশ রাখতে চাই যে সরকার নির্দেশ দিন—এর পর থেকে, যতো আচম্বিতেই হোক, মরে পড়ে যাওয়ার বা মেরে ফেলে দেওয়ার সময়, হত্যাকারী ও নিহত দুইজনই যেন খেয়াল রাখে যে একটি থানার ভেতর শরীরের সবটা যেন থাকে। সোভিয়েত রাশিয়া যেখানে স্পুটনিককে সূচ্যগ্র নির্দিষ্ট জায়গায় নামাতে পারে—সেখানে আমরা কি সাড়ে তিনহাত শরীরকে একটা থানার অত বড় চৌহদ্দির ভেতর ফেলতে পারি না? প্রয়োজনবোধে সরকারের উচিত এর জন্য বিশেষ শারীরিক প্রশিক্ষণ চালু করা যাতে মরে পড়ার সময় বা মেরে ফেলার সময় চৌহদ্দির ব্যাপারে কোনো গোলমাল না হয়।

থানা কর্তৃপক্ষ গোলমাল থামাতে গিয়েছিল না মড়াগুলোকে কুড়িয়ে আনতে, সে তর্কের মীমাংসা হবে না। বাহ্যত বা আইনত গোলমাল থামাতে গিয়েও থানা কর্তৃপক্ষ গুহ্যত বা মনে মনে মড়া তুলে আনতেই গিয়ে থাকতে পারে। বা এমনও তো কোনো কোনো অফিসার ভাবতে পারে যে মড়াগুলো তুলে আনলেই গোলমালটা থামবে। সুতরাং মড়া তুলে আনা বা গোলমাল থামাতে যাওয়া দুটো পরস্পর বিপরীত কোনো কাজ নয়।

বৃষ্টিজল ভরা মাঠে তিনটি মড়াকে দেড় দেড় করে দুটো থানায় ভাগ করতে এক নং থানায় মোট সাড়ে বাইশ ও দুই নং থানায় সাড়ে ষোল—মোট উনচল্লিশটি মড়ার প্রতিটির সংগ্রহ তদন্ত করার দরকার নেই। কিন্তু সাক্ষ্যদানকালে পুলিশ কর্তৃপক্ষ যেসব ঘটনার কথা জানিয়েছে তার ভেতর দুটি চারটি উল্লেখ করা যেতে পারে।

খবরের কাগজেও বেরিয়েছে প্রচলিত ধারণাও এই যে সমস্ত গোলমাল থেমে গেলে, অর্থাৎ দলবদ্ধভাবে খুন বা অভ্যুত্থান করতে যারা বেরিয়েছিল তারা খুনটুন বা অভ্যুত্থান-টভ্যুত্থান-সেরে বাড়ি ফিরে গেলে পুলিশ গিয়েছে। তাহলে, তখন তো, নানাসব বাড়িতে দলছাড়া খুনীরা বা অভ্যুত্থিতরা যেমন আলাদা আলাদা ঘুমোচ্ছে বা জিরোচ্ছে তেমনি মড়াগুলোও আলাদা আলাদা ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে। তাদের তুলে আনাটুকু যেন বাকি ছিল।

কিন্তু সাক্ষ্যেও দেখা যায় ঘটনাটি সেরকম নয়। যেমন এস-আই শিকদার বলছে যে কলুপাড়ার মোড়ের দিক থেকে চিৎকার হৈ হৈ শুনে সেদিকে ছুটে যেতে গাড়িটা ব্যাক করে পাশের রাস্তায় ঢুকতেই দেখে আঠার নম্বর বাড়ির দেওয়ালের খাঁজে একটা মড়া মুখ গুঁজে পড়ে আছে। ফলে মড়াটা তুলে নিয়ে

থানায় যেতে হলো। তারপর কলুপাড়ায় যেতে পারল। কলুপাড়ায় শেষ পর্যন্ত যেতে পারেনি বা যেতে হয়নি। হোলির দিন বেলা দুটো তিনটে নাগাদ যেমন, তেমনি, ধূ ধূ ফাঁকা রাস্তার এক-একটা জায়গায় কিছু অবান্তর রঙ, যা অনিবার্যতই প্রধানত লাল, আর চৈত্‌ফাগুনের অলিন্দহেন পথময় পূর্ণিমায় রাতচরা পাখি বা ঝরাপাতা বা তুলো বা ছেঁড়া কানির বিভ্রম যেমন, তেমনি, কিছু এলোমেলো ছেঁড়া জামা আর শক্ত প্যাণ্টে ঢাকা দুটি থর পা, কোমর থেকে বেরিয়ে মাটি আঁকড়ানো, পাঁচ পাঁচটা করে আঙুলে সশস্ত্র, দুটো করে পা,—মরা মানুষের পায়ের তলে ধুলো কেমন অলৌকিক ঠেকে।

একা একটি মানুষের মরে পড়ে থাকার মতো নির্জনতা আর নেই।

গঙ্গা থেকে বি-টি রোড—প্রায় সরল এই রাস্তার দৈর্ঘ্য কল্পনায় এসে গেলে, কত বড় হয়ে যেতে পারে, যাতে তিনটি মানুষের মড়া তিনটি খুব ছোট, ছোট ছোট অঙ্ক শোনায়। সাব ইনস্পেক্টর শিকদারও অবিশ্যি তাই বলেছে যে তিনটির কম কখনো নাকি মড়ারা থাকে না। কিন্তু বি-টি রোড থেকে গান্ধীজীর রাস্তাটার সরল দৈর্ঘ্য কল্পনায় আমার আগে মানুষ, মানুষ, মানুষ শব্দটি যদি প্রধান অর্থে মণ্ডিত হয়ে যেতে পারে তবে, তিন, তিন, তিন—সংখ্যাটি কেমন অনন্ত হয়ে যায়।

কোন ঘটনার ফলে এই উনচল্লিশজন মারা গেছে সে-বিষয়েও আমাকে তদন্ত করতে বলা হয়েছে। কিন্তু মৃত উনচল্লিশের পক্ষ থেকে কথা বলার কারো অভাবে ঐ বিষয়ে তদন্ত করা যাচ্ছে না। মৃত উনচল্লিশ জনের কাউকে কাউকে পুলিশই চিনতে পেরেছে। তাঁদের যে-পরিচয় পুলিশ দিয়েছে তাতে মনে হয় না জীবিত থাকলেও তারা আদালত বা সরকার বা আমার মতো প্রাক্তন বিচারকের সামনে কোনো কথা বলত। তাদের মৃতদেহগুলি যেখানে যেভাবে পাওয়া গেছে তা থেকেও কোনো অনুমান করা যাচ্ছে না। যেমন, নিমাই সান্যাল,—সে আক্রমণ করার জন্য, নাকি আক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে ঐ দেয়ালের খাঁজে ছিল? মৃতদেহগুলি অধিকাংশই মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ে ছিল। এ-বিষয়ে শরীরবিদ্যা বিশেষজ্ঞদের সাক্ষ্যে জানা যায় সেটাই নাকি মানুষের শরীরের নানা অঙ্গের ভার ও ভারসাম্য বিপর্যয়ের ফল। এ-বিষয়ে জনৈক বিশেষজ্ঞ ডারুইনের দি ডিসেণ্ট অভ ম্যান এ্যাণ্ড সিলেকশন ইন রিলেশন টু সেক্স থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন যে ডারুইনের মতে আমাদের প্রাচীন পূর্ব পুরুষ প্রাথমিক বানররা গাছে থাকত, তাদের খাড়া কান, গা ভর্তি লোম,

নারী-পুরুষ নির্বিশেষে দাড়ি ছিল। সেই সাক্ষ্যের কপি আমার এই রিপোর্টের সঙ্গে গেঁথে দেয়া হলো (অ্যানেক্সার ২)। এখানে অনুবাদ দেয়া হচ্ছে। আমাদের নিকটবর্তী পূর্বপুরুষ, বনমানুষ। এর যা উদাহরণ তিনি পেয়েছিলেন তা থেকে ড্রায়োপিথিকাসের উল্লেখ তিনি করেছেন। তাদের স্বাভাবিক নিবাসের পরিবর্তন ঘটায়, বনজঙ্গল পাতলা হয়ে যাওয়ায়, আমাদের এই পূর্বপুরুষরা জীবনপদ্ধতি পাল্টাতে বাধ্য হয় ও ঘাসের জঙ্গলে খোলা মেলায় থাকা শুরু করে। তারপর তারা একেবারে খোলা জায়গায় এসে বসতি স্থাপন করে। এই গুরুতর পরিবর্তন তাদের চলাফেরারও গুণগত পরিবর্তন ঘটায়। আধা-চার পেয়ে, আধা-দুপেয়ে চলন ছেড়ে দিয়ে পুরোপুরি দু-পেয়ে চলনে তারা পোক্ত হয়ে ওঠে। এটা নিশ্চয়ই একটা দীর্ঘ প্রক্রিয়া কিন্তু মাটির ওপর চলার সময় ভারি শরীরের ভার সামলানোর দায় থেকে হাতকে মুক্ত করেছে— আর এই মুক্তির ফলের প্রসার দূরবর্তী। মানুষ এমন এক খাড়া জন্তু থেকেই জন্মাতে পারে যার হাত দুটো মুক্ত, স্বাধীন, আর মস্তিষ্ক অত্যন্ত সংগঠিত।— ডারুইন বলেন গর্ভের দশমাস বাসকালে তার ঐতিহাসিক বিবর্তনের লক্ষ লক্ষ বছরের ইতিহাস মানুষকে পেরতে হয়। কয়েক সপ্তাহ বয়সে মানবভ্রূণ মাছের লক্ষণাক্রান্ত। মানুষের ভেতর মৎস্যলক্ষণ অনেক সময় দেখা যায় যেমন— গলনালীর সঙ্গে যুক্ত কান্‌কা। কয়েকমাসের ভ্রূণের মস্তিষ্কের গড়নে ও শরীর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের চলনে—সর্পাবস্থার প্রতিফলন মেলে। স্তন্যপায়ী স্তরের চিহ্ন হিসেবে কানের পেশীর সামর্থ, কান নাড়াবার ক্ষমতা—ইত্যাদি। মানুষের কিন্তু জন্মাবার পর নবজাত শিশুর হাতদুটো থাকে আঁকড়ে ধরার ধরনে। একটা গাছের ডাল নবজাত শিশুর করতলের ভেতর দিয়ে চালিয়ে দিতে পারলে দেখা যায় ঠিক গাছ থেকে ঝুলবার ধরনে আঙুলগুলো বাঁকা, হাতের মুঠি পাকানো। ডারুইন বলেন বানর থেকে মানুষে বিবর্তন কতকগুলি নির্দিষ্ট বিষয়ের ফলে সহজতর হয়েছে, যথা উন্নত সংগঠনের মস্তিষ্ক, সামনের আর পেছনের অঙ্গগুলির পার্থক্য, খাড়া দাঁড়ানো। ডারুইন বলেছেন, বেঁচে থাকার জন্যই আমাদের পূর্বপুরুষদের গাছ থেকে মাটিতে নামতে হয়েছিল, চারপায়ে বা দুপায়ে হেঁটে মাটির উপরে ঘুরতে হতো। স্যার আর্থার কেইথ বলেন গাছের আনুভূমিক মোটা ডালের ওপর পায়ের গোড়ালিটা রেখে ওপরের ডাল ধরে খাড়া দাঁড়ানোটাই নাকি দুপায়ে হাঁটার প্রাচীনতম ঢং। ডারুইন লিখেছেন— কেবল মানুষই দুপায়ে হাঁটে। এরজন্য নিশ্চয়ই মানুষ তার পূর্বপুরুষ বানরের

কাছে ঋণী। বানরের হাত পা গাছে গাছে আলাদাভাবে পরিবর্তিত হলো। খাড়া দাঁড়ানোর ভঙ্গি মানুষের ধাতে এসে যাওয়ামাত্র, বানরের আধা আঁকড়ানো আধাসামলানো পা থেকে মানুষের শুধুই সামলানোর কাজে অবলম্বন হিসেবে ব্যবহৃত পায়ে-বিবর্তনও শুরু।

এক খাড়া দাঁড়াবার ভঙ্গির এত লক্ষ বৎসরের ইতিহাস বাতিল হয়ে যায় একটা লোক যখন মুখ থুবড়ে পড়ে থাকে। আর মানুষকে যদি খাড়া অবস্থায় মারা হয়, তার মাথার কাজ থেমে যাওয়া মাত্র ঘুরতে ঘুরতে সে উপুড় হয়ে পড়বেই। হয়তো চারপায়ে আনুভূমিক দ্রুততায় সে পালিয়ে যেতে চায় মৃত্যু থেকে, হয়তো দুপায়ের মাঝখানে ঘাড় গুঁজে দেবার কোন সাবেকি অভ্যাস চাড়া দিয়ে ওঠে; মৃত্যুর মুহূর্তে মানুষ হয়তো ফিরে পেতে চায় তার সেই জীবনীশক্তি যার জোরে এই কৃশ শরীরটুকু নিয়ে সে প্রকৃতি আর জীব-জন্তুর সমস্ত প্রত্যক্ষ আক্রমণ থেকে বেঁচে বেঁচে লক্ষ লক্ষ বছর পার হয়ে আসতে পেরেছে।

তাহলে কি বোঝা যাবে মড়াটা পালাতে চাইছিল না-কি মারতে। বোঝা যাবে কী করে পথে-ঘাটে-মাঠে-জলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে যে-মড়াগুলো তাদের খুঁজে পেতে খুঁচিয়ে মারা হয়েছে নাকি যুদ্ধে। যুদ্ধ আর আত্মরক্ষা এমন একাকার হয়ে গেছে!

সুতরাং সমস্ত মৃতদেহ ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়। তাতেও অবিশ্যি একটা শাসনতান্ত্রিক অসুবিধা দেখা দেয়। এক নং থানার মর্গ মোমিনপুরে আর দুই নং থানার মর্গ কলকাতার প্রাচীনতম মেডিক্যাল কলেজে। বৃষ্টিভাসি মাঠের সব তিনটি, দেড় দেড় করে যাদের দুই থানার হিসাবেই ধরা হয়েছে, যাদের উদ্ধার করা হয়েছে দুই থানার মিলিত টিমদ্বারা, তাদের ময়নাতদন্ত হবে কোন্ মর্গে? সারা মাসে উনচল্লিশটা মৃতদেহ ময়নাতদন্ত করা হয় কিনা সন্দেহ যে-মর্গে, একদিনে সেখানে উনচল্লিশটি মৃতদেহ তদন্ত করা মুশকিল বলে সমস্ত মৃতদেহই কলকাতার প্রাচীনতম মেডিক্যাল কলেজে পাঠানো হয়। এতে অবিশ্যি একটা পদ্ধতিগত অসুবিধে দেখা দেবে। ঘটনাটি সম্পর্কে মেমো অভ এভিডেন্স দেবে এক নং থানা অথচ চিকিৎসক সাক্ষ্য থাকবেন দুই নং থানার খাতায়। যা হোক উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ উপযুক্ত সময়ে এ-বিষয়ে বিবেচনা করবেন। ময়নাতদন্তের একটি বিবরণ এসেছে। সে-বিবরণ এই তদন্ত রিপোর্টের সঙ্গে গেঁথে দেয়া হলো। (অ্যানেক্সার পাঁচ)। কিন্তু সেই বিবরণের কতকগুলি

অংশকে আমি এই মূল রিপোর্টের অন্তর্গত করতে চাই। কারণ সেই অংশগুলির ওপর নির্ভর করে আমি কতকগুলি সুপারিশ করেছি। উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের কাছে আমার অনুরোধ আমার সুপারিশগুলি বিবেচনা করার সময় এই ডাক্তারি সাক্ষ্য যে তাঁরা যেন বিশেষ মূল্য দেন—কারণ এই সাক্ষ্য থেকে সমাজের ওপর দূর-বিস্তারিত প্রভাবক্ষম কতকগুলি সিদ্ধান্ত নিতে সরকার বা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ প্রণোদিত হতে পারেন।

ডাক্তাররা তাঁদের সাক্ষ্যের প্রথমেই বলেছেন যে চিকিৎসাশাস্ত্রের দায়িত্ব জিন্দা মানুষকে নিয়ে, মরা মানুষ নিয়ে নয়। জ্যান্ত মানুষের বাঁচার প্রয়োজনেই হয়তো আইনে, তেমন অস্পষ্ট অবস্থায় মানুষের মৃত্যু হলে, শবব্যবচ্ছেদের ব্যবস্থা, যাতে কোনো অপরাধী থাকলে তাকে খুঁজে বের করা যায়। আর বৈজ্ঞানিক দরকারে, অর্থাৎ মানুষকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য মানুষের শরীরের সব তথ্য জানার উদ্দেশ্যে মড়া কাটাকাটি নিশ্চয়ই চলতে পারে।

আজকাল শবদেহ পাওয়ার খুব হিড়িক পড়ে গেছে। প্রায় প্রতিদিনই সকালে খবরের কাগজে শবদেহ পাওয়া যাচ্ছে। লোকজনকে জানিয়ে সকলের চোখের সামনে মরে না গিয়ে রাতবিরেতে আনাচে কানাচে মরে পড়ে থাকা নিশ্চয়ই সন্দেহজনক। এইসব মৃত্যুর কারণ জানা ও খুনীকে খুঁজে বের করা হয়তো, নিশ্চয়ই, দরকার।

সেই মৃত্যুর কারণ জানার জন্য শবব্যবচ্ছেদের প্রয়োজন আইনপুস্তকে লিপিবদ্ধ আছে। সেইজন্য যখনই যা-কিছু মড়া পাওয়া যায় তখনি মর্গে পাঠানো হয়। ডাক্তাররা শবব্যবচ্ছেদ করেন। তারপর কোনো কোনো মড়া ডোম, কোনো কোনো মড়া দু-চারজন আত্মীয় স্বজন, আর কখনো কখনো কোনো কোনো মড়া মিছিল এসে নিয়ে যায়।

কিন্তু প্রতিদিনই যদি মড়া আসতে থাকে, আর প্রতিদিনই যদি আরো বেশি শবব্যবচ্ছেদ করতে হয় তাহলে ডাক্তারদের তো মড়া নিয়েই কাটাতে হবে, জিন্দা মানুষকে আর দেখা যাবে না। বারাসতে নয়, ডায়মণ্ডহারবারে দশ, বহরমপুরে সাত, নোয়াপাড়ায় সাত, কৃষ্ণনগরে, খড়্গপুরে, জলপাইগুড়িতে, সর্বত্র রাত ভোর যদি মড়া পড়ে থাকে ডাক্তাররা তাহলে কী করে? এমনি-ই তো হাসপাতালে রুগি অনুপাতে ডাক্তার কম, তার ওপর যদি মড়া এসে ভরতি হতে থাকে তাহলে জ্যান্ত আর মরা মানুষের মিলিত সংখ্যার অনুপাতে ডাক্তারের সংখ্যা কোথায় দাঁড়ায়।

সেইজন্য ডাক্তারদের পক্ষ থেকে দাবি করা হচ্ছে যে সন্দেহজনক মৃত্যুর পর শবব্যবচ্ছেদের আবশ্যিক ব্যবস্থাটি হয় তুলে দেওয়া হোক্, না হয় সংশোধন করা হোক।

আর এ-সব মৃত্যুর অধিকাংশই তো তেমন সন্দেহজনক নয়। ঘাড়ে টাঙি দিয়ে কোপ মেরে বা পাইপ গানের গুলি দিয়ে মানুষ মারলে তার ভেতর সন্দেহের কোনো অবকাশ থাকে না,—মানুষ মরবেই। সন্দেহ যদি কোথাও থাকে তা হলো হত্যাকারী নিয়ে। শবব্যবচ্ছেদের ফলে হত্যাকারীর পরিচয় পাওয়া সম্ভব নয়। সেটা চিকিৎসাশাস্ত্রের আওতার ভেতরেও পড়ে না। সুতরাং এ-সব শব মর্গে পাঠাবার কী হেতু থাকতে পারে।

তাছাড়া, মৃত্যু যখন একটা নিশ্চিত, অপ্রতিরোধ্য অথচ অঙ্কের শক্তি তখন তাকে চেনা, জানা বা বোঝার দরকার। মৃত্যু যখন ছুরির ফলায় নিশ্চিত বা টাঙির কোপে অমোঘ বা কোনো ধরনের বন্দুকের গুলিতে তীব্র—তখন কে মৃত্যুর হদিশ বের করার জন্য মানুষের খুলি খোলা বা পেট কাটার কী দরকার থাকতে পারে? সমাজ পরিবর্তিত হচ্ছে অথচ সেই অনুযায়ী আইন পরিবর্তিত হচ্ছে না—তার জন্যই এখনো শবব্যবচ্ছেদ আইনের বা মড়া পেয়ে গেলে পরবর্তী কর্তব্যের তালিকার কোনো পরিবর্তন হয়নি।

এই পরিবর্তন এখন খুব দরকারী হয়ে পড়েছে। এমন ব্যবস্থা করা যেতে পারে যাতে শবব্যবচ্ছেদটাই অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। এর একটা সামাজিক উদ্দেশ্যও আছে। যে-সব মৃতদেহ পতাকা টতাকায় ঢেকে শবযাত্রা করতে হয় তাদের মর্গে নিয়ে যাওয়া, মর্গে তাড়াহুড়ো করে কাটাকাটি করা, মিছিলের লোকগুলোকে পাড়া থেকে মর্গের কাছে নিয়ে আসা, অনেকে এতদূর আসতে চায় না, ফলে মিছিল ছোট হয়ে যায়, মিছিল নিয়ে আবার পাড়ায় যাওয়া নানা ক্লাব বা পাঠাগারের সামনে নামানো, আবার শ্মশানে নিয়ে যাওয়া—এ-সব কারণে খুব গোলমাল হয়, ট্রাফিক জাম হয়, লোকজনের অসুবিধা হয় আর শবব্যবচ্ছেদের ফলে সুবিধেটা যে কার হয় কে জানে! কিন্তু এ-সব ক্ষেত্রে শবব্যবচ্ছেদটা যদি আবশ্যিক না হয় তাহলে রাস্তা থেকে মরা মানুষটিকে তুলে মিছিল জলুশ মেরে যে যার মতো তাড়াতাড়ি কাজে ও ঘরে ফিরতে পারে। কাজগুলো দ্রুততর করাই তো আমাদের আধুনিক জীবনের লক্ষ্য। তাই শবব্যবচ্ছেদের বাজে কাজটা বাতিল করে সামাজিক মানুষদের কাজকর্মের সুবিধে করে দেওয়া উচিত।

মৃত্যুর ফলে শরীরের ভেতরে কী সব গোলমাল হয়েছে বা কী সব গোলমালের জন্য মৃত্যুটা হয়েছে সেটা জানা এমন কিছু কঠিন ব্যাপার নয়, যে-কেউ-ই মোটামুটি তা করতে পারে। ডাক্তাররা তাই শরীর সম্পর্কিত ও মৃত্যু ঘটিত কিছু আবশ্যিক তথ্য জানিয়ে দিতে চান। সরকার যদি নেহাতই চান যে রাস্তায় মৃত্যুর তালিকা তাঁরা রাখবেনই তাহলে এই পদ্ধতি অনুসরণ করে যে কেউ একটা নোটিশ থানায় বা পৌরসভায় জমা দিয়ে যেতে পারেন।

যেমন আচম্বিতে মানুষ মরে যাচ্ছে তাতে মরে যাওয়ার মাত্র একটি আঘাতের পূর্বমুহূর্তে তার শারীরিক মানসিক সংস্থান যে-অবস্থায় ছিল তা থেকে বদলে যাবার অবকাশ পায় না। বাজার করে ফিরছে যে, মনে মনে টাকা পয়সার যোগ মেলানোর তন্ময়তার মুহূর্তে ঘাড়ের ওপর তার কোপ নেমে আসে—তাতে কোপের আকস্মিকতার চাইতে স্থায়ী হয়ে থাকবে মানসাঙ্কের ব্যস্ততা। এক কোপে ঘায়েল হওয়ার চাইতে আলু-ঝিঙে-মাছ-সুপুরি ঢেঁকির শাকের দাম যোগ করা অনেক কঠিন শারীরিক-মানসিক ব্যাপার। তাই নিরপেক্ষ বৈজ্ঞানিক গবেষণায় এইরকম একটি শবের ব্যবচ্ছেদে সিদ্ধান্ত বেরবে হিসেব করতে করতে লোকটি মারা গেছে। বা সরস্বতী পুজোয় একটা পুলিশের লোক ধুতি পাঞ্জাবি পরে মেয়ের হাত ধরে হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ একঝাঁক পাইপ গানের গুলিতে পড়ে গেলে—তার শরীরের কোষগুলির রসমোক্ষণ, মাথার স্নায়ু ও শিরা উপশিরার পরীক্ষায় দেখা যাবে সেখানে গুলির বিষ নেই, আছে স্নেহ আর বাৎসল্য ধুতি পাঞ্জাবী, বালিকা কন্যা আর সরস্বতী পুজো যে স্নেহে আর বাৎসল্য ক্ষরণ করিয়েছে।

কারণ মানব শরীরে স্পর্শ, শীত, তাপ—বোঝাবার নানা জায়গা আছে, নির্দিষ্ট জায়গা, কিন্তু ব্যথাবোধ করার কোনো জায়গা নেই, ব্যথার খবর স্নায়ু কেন্দ্রে নিয়ে যাবার কোনো ব্যবস্থা নেই। মানুষের এই শরীরটা ব্যথা পাবার জন্য তৈরিই নয়। চামড়ার মানচিত্র এঁকে বোঝানো যেতে পারে মানুষের শরীরে স্পর্শ, শীত, তাপ সঞ্চারের জায়গা (চিত্র ৬) সব জায়গায় সমান রকম স্পর্শ মানুষ অনুভব করতে পারে না। নিচে একটা তালিকা দেয়া হলো। তাতে বোঝা যাবে কোথায় কতোটা চাপ দিলে স্পর্শ বোঝা যায়।

অঙ্গ	প্রতি মিলিমিটারে কতোটা নিম্নতম চাপ স্পর্শবোধের জন্য দরকার
নাক	২ গ্রাম
পাছা	২.৫
আঙুলের ডগা	৩
আঙুলের পেছন	৫
বাহু, উরুর ভেতর দিক	৭
হাতের পিঠ	১২
পায়ের বাটি, ঘাড়	১৬
তলপেট	২৬
পায়ের আগা, পায়ের তলা	২৮
কই	৩৩
কটিদেশ	৪৮

যে-তলপেটের এক মিলিমিটার জায়গায় ছাব্বিশ গ্রাম মাত্র ওজন পড়লে স্পর্শবোধ ঘটে বা যে-ঘাড়ে ১৬ গ্রাম—সেখানে একটি মাত্র কোপ কী প্রবল যে সমস্ত বোধসীমা পেরিয়ে যায়।

ব্যথাবোধ সঞ্চারের জন্য মানব শরীরে কোনো স্নায়ু নেই। যে সমস্ত স্নায়ুর মাথা আলগা পড়ে থাকে, আর মেরুদণ্ডের সঙ্গে প্রত্যক্ষ জড়িত নয়, সেই সমস্ত মাথাই প্রধানত ব্যথা বয়। শরীরের কতকগুলি অংশ আছে যেখানে শুধুই ব্যথা দেয়া যেতে পারে, যেমন মাথার খুলির কিছু অংশ। এই স্নায়ুর আলগা অংশগুলি কোনো নির্দিষ্ট ধরনের ব্যাথাই বহন করে তা নয়, শীত, তাপ, রাসায়নিক, যান্ত্রিক সব ব্যথাই স্নায়ুকেন্দ্রে পৌঁছে যায়, শুধু একটি শর্ত—শারীরিক সংঘাতটা জোরদার হতে হবে। ব্যথা বোধহয় এমন সমস্ত উদ্দীপনার একটি সাধারণ লক্ষণ—ব্যথার উদ্দেশ্য আঘাত দেয়া। ব্যথাবোধ তাই আত্মরক্ষার প্রবৃত্তিও জাগায়। যে-বোধে আমরা ব্যথা পাই, সেই বোধেই আমরা ব্যথার হাত থেকে বাঁচার প্রস্তুতি নিই।

মানুষের ব্যথা পাবার একটা নিম্নতম সীমা আছে। কখনো এই সীমা বাড়িয়ে দেয়া যায়—তখন মানুষ অনেকটা সইতে পারে। কখনো এই সীমা নেবে আসে—তখন মানুষ একেবারেই সইতে পারে না। কোপ বা গুলি খেয়ে বা খাওয়ার

মুখে মানুষ যে চিৎকার করে ওঠে বা কিছু আঁকড়ে ধরে বা চোয়াল শক্ত করে ফেলে তার কারণ এগুলোর ফলে তার সইবার ক্ষমতা বাড়ে। মৃতদেহের শরীরের এই লক্ষণগুলি পরীক্ষা করে বলা যেতে পারে মানুষটি মরবার আগে জানতে পেরেছিল কি-না যে সে মরছে। এক ধরনের ব্যথা অন্য ব্যথার বোধ খানিকটা অসাড় করে। ঘোড়ার পায়ে নাল ঠুকবার সময় নাকে গিঠ দেওয়া হয় এই কারণেই। তাতে মনে হয়. যদি কিছুদিনের জন্য সারা বাঙলাদেশের সবার জন্য যদি না হয়, অন্তত খুব গোলমালের জায়গাগুলিতে ইনজেকশনের সাহায্যে প্রত্যেকের, প্রত্যেক নাগরিকের একটা স্থায়ী ব্যথা তৈরি করে দেয়া যেতে পারে—তাতে মরণব্যথাটা তারা হয়তো ভুলতে পারবে। খুব কড়া দাঁতের ব্যথা বা পেটব্যথা বা হাঁটুর ব্যথা—মরণব্যথা ভুলিয়ে দিতে পারে। কেউ কেউ অবিশ্যি আপত্তি করে বলতে পারে ব্যথা সারানো ডাক্তারের কাজ, ব্যথা দেয়া নয়। বিষ দিয়েও তো ডাক্তারকে চিকিৎসা করতে হয়—এটাকেও সেভাবেই দেখা উচিত। আর বস্তুত টাঙির কোপ, ছুরির ঘা আর বন্দুকের গুলির তীব্রতর আঘাত ভোলাবার জন্য পেট ব্যথা বা দাঁতব্যথার মতো ছোট ছোট ব্যথা সঞ্চার করার ব্যাপারে ডাক্তারদের কোনো নৈতিক বাধা থাকা উচিত নয়।

যা-হোক, জনসাধারণের সুবিধার জন্য সরকারের প্রচার করা উচিত কোন্ কোন্ জায়গায় ঘা দিলে মানুষের ব্যথা লাগে না। আসলে মরাটা তো কোনো ব্যাপার নয়, মরার আগের ব্যথাটাই তো আসল ব্যাপার। ব্যথা যদি না লাগে তাহলে টের না পেয়ে মরে যেতে খুব একটা আপত্তি তো থাকার কথা নয়। মানুষ যখন মারছেই-আর মরছেই—তখন সরকারের উচিত মারা ও মরাটাকে সহজতর করে দেয়া। সেইজন্য জনসাধারণের ভেতর প্রচারার্থ একটা ইস্তাহারের নকল দেয়া গেল। মন্তব্য করা প্রয়োজন এই ইস্তাহার মালিকানাধীন খবরের কাগজগুলির সঙ্গে সঙ্গে বামপন্থী প্রগতিশীল রাজনৈতিক সংবাদপত্রগুলিতেও প্রকাশ করা উচিত হবে। "বিনা যন্ত্রণায়, বিনা অপারেশনে কোষবৃদ্ধি সারান" ইত্যাদি জাতীয় বিজ্ঞাপনের মতো ছোট ছোট আকারে অনেক বিজ্ঞাপন সব শহরের সর্বত্র লাগিয়ে দেওয়াও যেতে পারে।

মারা ও মরা সম্পর্কে বিজ্ঞপ্তি

গত তিন বৎসর যাবৎ পশ্চিমবাঙলায় মানুষ মারা ও মরা ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছে। সরকার এ-বিষয়ে অবহিত। বারবার সর্বদলীয় সম্মিলনে এ-বিষয়ে

আলোচনা হয়েছে। আরো আলোচনা হবে। সেই আলোচনায় নিশ্চয়ই সকলের পক্ষে গ্রহণযোগ্য একটা সমাধান বেরোবে বলে সরকার আশা করে। কিন্তু তার আগে মারতে ও মরতে যাতে জনসাধারণের কোনো অসুবিধে না হয় সেজন্য সরকার বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে পরামর্শ করে কতকগুলির ব্যবস্থার সুপারিশ করছে। বিশেষজ্ঞগণ সরকারকে জানিয়েছে যে মানবদেহের আন্তরযন্ত্রের— হৃৎপিণ্ড থেকে উদর—কোনো ব্যথাবোধ নেই। অন্ত্র যকৃৎ পাকস্থলী বা হৃৎপিণ্ড কাটলে, পোড়ালে বা টিপলে কোনো ব্যথা লাগে না। প্রথম চার্লসের নিকট ভাইকাউন্ট মণ্টোগোমারিকে নিয়ে যাওয়া হয়, রাজা স্বয়ং তাঁর স্বচ্ছ হৃৎপিণ্ড দেখেন ও টেপেন কিন্তু ভাইকাউন্ট কোনো স্পর্শবোধ করেন না যদিও তিনিই হৃৎপিণ্ডে রাজস্পর্শের সৌভাগ্যধন্য একমাত্র মানুষ। সুতরাং সরকার জনসাধারণকে অনুরোধ জানাচ্ছে—যারা মারতে চায় তারা যেন তীক্ষ্ণ ধারালো অস্ত্রের দ্বারা মানবদেহের আন্তরযন্ত্রে—হৃৎপিণ্ড থেকে উদর পর্যন্ত অংশে একটি মাত্র আঘাত করে—তাহলে চামড়া ভেদ করার সামান্য ব্যথাবোধ করার আগেই পাকস্থলী বা যকৃৎ বা অন্ত্র বা হৃৎপিণ্ড বেদনাহীন বিদ্ধ হয়ে মৃত্যু অব্যবহিত করে দেবে। সরকারের আরো অনুরোধ জনসাধারণ যেন জাঙিয়া বা গেঞ্জির ছলে এমন কোন শক্ত কিছু চামড়ার উপর না পরেন যাতে ছুরি বা টাঙির কোপ বাধাগ্রস্ত হয়। সরকার আশা করে যতোদিন সর্বদলীয় সম্মিলনে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত না হচ্ছে ততোদিন পর্যন্ত যন্ত্রণাহীন মারা ও মরার এই বিশেষজ্ঞসুপারিশ গ্রহণ করে জনসাধারণ সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করবেন।

ডাক্তারেরা আরো বলেছেন যে মারা ও মরার ব্যাপারে মানুষের একটা শারীরিক ও মানসিক বাধা আছে। মানুষ মরতে চায় না—লক্ষ লক্ষ বছর ধরে এটা তার ধাতে এসে গেছে নইলে অশক্ত রুগ্ন যূথপতি ঐরাবত নতুন দাঁতালের কাছে হেরে, তার রাশি রাশি হস্তিনী ছেড়ে যেমন জঙ্গলের নতুনতর গভীরতায় শুঁড়কে অবলম্বনহীন ঝুলিয়ে ঝুলিয়ে চলে যায় নির্জন থেকে নির্জনতরতায় শুধু মরতেই তেমনি মানুষ যায় না কেন, যেতে পারে না কেন। গজরাজ যেমন তার দাঁত দুটোকে শ্বেত প্রসারিত রেখে দেয় পৃথিবীর প্রতি শেষ প্রণামে—এই তো আমার মহার্ঘতম—, তেমনি মানুষ তার তেইশ-চব্বিশ ইঞ্চির ব্যাসার্ধ বিশিষ্ট এই ছোট্ট মাথাটুকুর ভেতরে ২,২০,০০০ বর্গ মিলিমিটার এলাকার বিশ কোটি স্নায়ু শিরা, উপশিরা নিয়ে খাড়া দাঁড়িয়ে পৃথিবীকে শেষ বলে যেতে পারে

না কেন—এইটুকুই তো আমার, কেবল আমারই, এই দাঁড়িয়ে থাকা আর এই মস্তিষ্ক।

কারণ মানুষ, মানুষ হয়ে গেছে। পশু থেকে স্বতন্ত্র হতে হতে মানুষ এমন এক বিচ্ছিন্ন গৌরবে এসে পৌঁছেছে যেখানে সে তার নির্লোম চিক্কন চামড়াটুকু দিয়ে প্রকৃতিকে প্রতিরোধ করতে যায় যেখানে সে সাড়ে তিন হাত দৈর্ঘ্য নিয়ে জলস্থলঅন্তরীক্ষের প্রভুত্ব চায়। কী ক্ষমতা এইটুকু একটা শরীরের যে টাঙি বা গুলির আঘাত সইবে—অথচ কেউ কি কখনো একটা বেড়াল বা কাককে ঢিল পর্যন্ত মারতে পেরেছে? রাত-বিরেতে তো কথাই নেই, দিনের আলোতে সবার মাঝখানে এক একটা আঘাতে মানুষ কেমন অবধারিত মরে, মরে যায়। হায়রে আত্মরক্ষা থেকে মরতে মরতে মানুষ আজ কী অসহায়তার ভেতরে এসে পড়েছে। কম কী হারিয়েছে মানুষ সেই আদিমস্তর থেকে মানবস্তরে আসতে। হারিয়েছে তীব্র ঘ্রাণশক্তি—তাই বুঝতে পারে না কখন আততায়ী প্রস্তুত, হারিয়েছে শরীরের উপর স্তরবিন্যস্ত লোমরাজির প্যাড—তাই বন্দুকের গুলি পিছলে যায় না, টাঙির কোপ ফিরে যায় না, পিছলে যায় না, চামড়ার পেশী-গুলো কোথায় হারিয়ে গেছে, হারিয়ে গেছে পায়ের আঁকড়ে ধরার মতো গড়ন, হারিয়েছে পায়ের আঙুলগুলোর উপর ভর দিয়ে ছুটে যাবার শক্তি। আর তার বদলে পেয়েছে—মানসিক ব্যগ্রতার শারীরিক প্রকাশ চিবুকের শাণিত ভঙ্গি, মাঝখানে স্ফুরিত অধর আর ওষ্ঠ, চুম্বনের বিস্তৃতির জন্য নাক আর উপরের ঠোঁটের মাঝখানে একটু অবকাশ। যে অবকাশ সুন্দরী নারীদের স্বেদবিন্দুতে মুখর আর পেয়েছে দুপায়ে খাড়া দাঁড়াবার ভঙ্গি—ফলে চারপায়ের উপর ভর দিয়ে লাফিয়ে উঠে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে না। আর রয়েছে বিশ কোটি স্নায়ু আর কিছু জলীয় অংশের মিশ্রণে ঘিলু দিয়ে তৈরি একটা মাথা। এই মাথা কিছু রুখতে পারে না, কিছু না। এই মাথা কিছু প্রতিরোধ করতে পারে না, কিছু না। একটা মাত্র হাতুড়ির আঘাতে ভেঙে টুকুরো টুকুরো হয়ে যায় এই মাথা বিশ কোটি স্নায়ু ছাড়াও যার ভেতরে আছে অসংখ্য ফাইবার। দুপায়ের উপর খাড়া এই মাথাটুকুই তো মানুষ এই বিপর্যস্ত পর্যুদস্ত ভঙ্গুর, বিন্দুমাত্র আঘাতে মরে যায় যে সেই মানুষ। মাথার এই দায় থেকে মানুষকে বাঁচাবার একটি মাত্র উপায় আছে।

বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক গোলৎস পরীক্ষাদ্বারা প্রমাণ করেছিলেন যে সেরিব্র্যাল কর্টেক্স যদি মস্তিষ্ক থেকে বাদ দেয়া যায় তাহলে জীবজন্তু খুব তাড়াতাড়ি

অসন্তুষ্ট হয়, রেগে যায়। এমান একটি কুকুর অপারেশনের পর ক্রমাগত চেঁচায় গর্ গর্ করে দাঁত খিঁচোয়। আসলে এই যে রেগে যাওয়া, সমস্ত শরীরটাকে শুধু আক্রমণোন্মত করে রাখা, সেরিব্র্যাল করটেকস বা মাথাটাই হচ্ছে তার প্রধান বাধা। এই রেগে যাওয়া রেগে ওঠা আক্রমণের ভঙ্গি আসলে ভয় আর রাগের মিশ্রিত প্রতিক্রিয়া। সেরিব্র্যাল করটেকস বাদ দেয়া একটি জন্তু সামান্যতম স্পর্শে চরমতম ক্ষেপে যায়।

সেইজন্য ডাক্তাররা সুপারিশ করেছেন পরিবার পরিকল্পনার কর্মসূচি ভ্যাসেকটমি অপারেশনের মতো পশ্চিমবাঙলার জনসাধারণের সেরিব্রাল করটেকস অপারেশনের একটা বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ করা হোক। তদন্তকারী প্রাক্তন বিচারপতি হিসেবে আমি এই সুপারিশ সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করছি। আমি আরো প্রস্তাব করছি এই সেরিব্রাল করটেকস দূরীকরণ অভিযানে জনসাধারণকে উৎসাহিত করার জন্য ঘোষণা করা হোক যে-ব্যক্তি সেরিব্রাল করটেকস অপারেশন করাবে সে-ব্যক্তিকে একটা ট্যানজিসটর রেডিও দেয়া হবে, আর যে ব্যক্তি আর এক ব্যক্তিকে অপারেশনে প্রণোদিত করতে পারবে তাকে দশ বছর মেয়াদি দুশ টাকা মূল্যের একটি সেভিংস সার্টিফিকেট দেয়া হবে।

আমি আরো সুপারিশ করছি এই অপারেশন প্রথম শুরু হোক পশ্চিম বাঙলার রাজনৈতিক দলের নেতাদের দিয়ে। তাহলে তাঁদের উদাহরণে জনসাধারণ উৎসাহিত হয়ে উঠবে। আমাদের সবারই সেরিব্রাল করটেকস যদি দূর করে দেওয়া যায়, আমরা সবাই যদি রেগে উঠতে পারি, দাঁত খিঁচোতে পারি, মস্তিষ্কের বিনিময়ে পূর্বপুরুষের যা যা আমরা হারিয়েছি তার সবই যদি আমরা ফিরে পেতে পারি, আমরা সবাই যদি আত্মরক্ষায় স্বাভাবিক হয়ে উঠতে পারি, আমরা প্রত্যেকেই যদি খুন করতে পেরে যাই—তাহলে আমাদের অভিজ্ঞতা-দ্বারা পরে, কোনো এককালে আমরা খুনবন্ধ করার উপায় উদ্ভাবন করতে পারব। আপাতত মানুষের মাথা বাঁচাবার জন্যই মানুষের মাথা কাটা দরকার।

আমি আরো সুপারিশ করছি　　ককক　ককক　ককক　ককক
আমি আরো সুপারিশ করছি　　ঙঙঙ　ঞঞঞ　ণণণ　ষষষ
আরো আরো সুপারিশ করছি　　ঝঝঝঝঝঝঝঝঝঝঝ
আরো আরো সুপারিশ করছি　　ছছছছছ　জজজজজ　ওওওওও

ত ফ দ ন ক ল ঞ ঞ স হ য প ল র র ত দ উ ন ধ ঠ ঋ ট ঢ র আ ভ ঘ

বাঙলা লোকনাট্যের ধারা ও জসীমউদ্‌দীন

সুনীল মুখোপাধ্যায়

জসীমউদ্‌দীনের লোকজীবনাশ্রয়ী সাহিত্যসাধনা যে শুধু কাব্যের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, নাটকের ক্ষেত্রেও আপন প্রকাশ খুঁজে পেয়েছে, এ সংবাদ আজকের অনেক সাহিত্য-পাঠকই হয়তো রাখেন না। অথচ বাঙলা সাহিত্যে লোকজীবনশিল্পী হিসেবে জসীমউদ্‌দীনের যে প্রতিষ্ঠা তার অনেকটাই দাঁড়িয়ে আছে তাঁর রচিত লোকজীবনাশ্রয়ী নাটকগুলোর উপর। 'রাখালী', 'নক্‌সী কাঁথার মাঠ' ও 'সোজনবাদিয়ার ঘাট'-এর কবির শিল্পী-পরিচয়কে যথার্থই পূর্ণতা দিয়েছে তাঁর 'পদ্মাপার', 'মধুমালা', 'বেদের মেয়ে', 'পল্লীবধূ', ইত্যাদি লোক জীবনাশ্রয়ী নাটকগুলো। এসব নাটক রচনার প্রেরণা তিনি পেয়েছিলেন আমাদের লোকসাহিত্যেরই অন্যতম সম্পদ লোকনাট্যগুলো থেকে। সংস্কৃত ও ইউরোপীয় নাট্যাদর্শে আধুনিককালে বাঙলা নাটক সৃষ্টির পূর্বে যুগ যুগ ধরে এই লোকনাট্যগুলোই বাঙলার পল্লীর, এমন কি শহরেরও, সাধারণ মানুষের চিত্ত বিনোদনে একটি প্রধান ভূমিকা পালন করে এসেছে। লোকসাহিত্যের অন্যান্য রচনার মতো এদেরও কোন লিখিত রূপ হয়তো ছিল না; কিন্তু পালাগানের আকারে লোকের মুখে মুখে নাট্যকাহিনী প্রচলিত ছিল। গানে গানে সে কাহিনী ফুটিয়ে তোলা হতো, অভিনেতারা ফাঁকে ফাঁকে কথার সূত্র জুড়ে দিতেন। যাত্রাগান ও বিভিন্ন পালাগানের মধ্য দিয়ে, লোকনাট্যের এ ধারাটি যুগ থেকে যুগান্তরে উত্তরিত হয়ে আমাদের কালে এসে পৌঁছেছে। যদিও পূর্বপূর্ব যুগের তুলনায় এ-প্রবাহ আজ খুবই ক্ষীণ হয়ে এসেছে, তবু এর আবেদন একালেও যে একেবারে ফুরিয়ে যায়নি, তার প্রমাণ মেলে যাত্রা ও পালাগানের ব্যাপক জনপ্রিয়তা দেখে। মুক্তাঙ্গনে, আসরে অভিনীত হয়ে এসব নাটক এখনও সাধারণ মানুষকে আনন্দে মাতিয়ে তোলে। শাস্ত্রীয় নাটক ও চলচ্চিত্রের ক্রমবর্ধমান আধিপত্যের দিনেও কোনক্রমেই এসত্যকে অস্বীকার করা চলে না।

বাঙলার এই লোকনাট্যের ইতিহাস আজও রচিত হয় নি। এর উৎস ও বিকাশধারা সম্পর্কে নিষ্ঠা সহকারে গবেষণা করার জন্যে কোনো লোকসংস্কৃতি

প্রেমিকও এখন পর্যন্ত এগিয়ে আসেন নি। এ ক্ষেত্রে যা-কিছু সামান্য কাজ হয়েছে, তার সবটারই কৃতিত্ব প্রাপ্য লোকজীবনশিল্পী কবি জসীমউদ্‌দীনের। কবিতার ন্যায় নাটকেও লোকজীবনকে রূপায়িত করতে গিয়ে তিনি শৈল্পিক তাগিদ থেকেই লোকনাট্যের প্রকৃতি, উৎস ও বিকাশ ধারা সম্পর্কে অনুসন্ধান চালাবার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেছিলেন। তাঁর এই অন্বেষার ফলে বাঙলা লোকনাট্যের অজ্ঞাতপ্রায় বিকাশধারার ইতিহাসটি আজ আমাদের সামনে উন্মোচিত হয়েছে এবং আমরা লোকনাট্যের সরণি আশ্রয় করে লোকজীবনে প্রবেশের আর একটি পথ আবিষ্কারে সমর্থ হয়েছি।

লোকজীবনের ঘনিষ্ঠ স্পর্শে এসে লোকসাহিত্যের মাল-মসলা সংগ্রহ করতে করতেই জসীমউদ্‌দীন লোকনাট্যের জন্মসূত্রটি নির্ণয় করতে সমর্থ হয়েছিলেন। বাঙলার বিভিন্ন জেলার মেয়েলি গানে, রাখালী গানে, ছেলে ভুলানো ছড়ায় কথোপকথনের ছলে মাঝে মাঝে নাটকীয় সম্ভাবনা পূর্ণ জীবনদৃশ্যের যে সব অংশ চিত্রিত হয়ে উঠতে দেখা যায়, তার মধ্যেই তিনি বাঙলার বড় বড় লোকনাট্যগুলোর উন্মেষণ লক্ষ্য করেছেন। তিনি বহু লোকসঙ্গীত বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে এদের মধ্যে আমাদের পল্লীজীবনের বহু অংশ নাটকাকারে গ্রথিত হয়ে রয়েছে। নিপুন লোক-অভিনেতারা লোকনাট্যের স্থান বিশেষে এই খণ্ডিত জীবনদৃশ্যগুলো বেশ মুন্‌সিয়ানার সঙ্গে জুড়ে দিয়ে তাকে একটা সহজ শিল্পসম্মত রূপ দিয়ে ফেলেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ জসীমউদ্‌দীন রংপুর অঞ্চলে প্রচলিত 'বাইত্যার তামাসা' নামক লোকনাট্যের 'জল ভর সুন্দরী মেয়ে জলে দিছাও ঢেউ' সঙ্গীতাংশটির কথা উল্লেখ করে বলেছেন যে এ অংশটি বহু রাখালী গান ও বারমাসী গানে পাওয়া যায়। এমনকি যে সব অঞ্চলে 'বাইত্যার তামাসা' প্রচলিত নেই, সে-সব জায়গায়ও গানটি গাওয়া হয়। এর থেকে অনেকটা যুক্তি-সঙ্গত ভাবেই তিনি সিদ্ধান্ত করেছেন যে এ অংশটি প্রচলিত গ্রাম্যগান থেকেই 'বাইত্যার তামাসা' রচনাকার তাঁর নাটকে গ্রহণ করেছেন। অন্যত্র তিনি বাঙলাদেশের গাজীর গানের দলগুলো কেমন করে লোকনাট্য সৃষ্টিতে সাহায্য করেছে, তারও উল্লেখ করেছেন। এই দলগুলো গ্রামবাঙলায় রূপকথা বলে বলে ঘুরে বেড়ায়। গল্পের যথাযথ আবহটির পরিস্ফুটনের জন্য এরা যেমন গানের সাহাযা নেয়, তেমনি গল্পের চরিত্রগুলোর মাধ্যমে মাঝে মাঝে কথোপকথনের অবতারণা করে একটা নাটকীয়তা আমদানির চেষ্টা

করে। পরে ক্ষেত্রান্তরে এই কথোপকথনই ক্রমপরিণতি লাভ করে লোকনাট্যে পরিণত হয়। বস্তুতঃ লোকশিল্পীরা এভাবেই বিচিত্রাস্বাদী লোকনাট্য যুগ যুগ ধরে রচনা করে এসেছেন। আমাদের শিক্ষিতসমাজ সে-সব খবর রাখার গরজ বোধ করেন নি বলে, আমাদের সাহিত্যে তাদের স্থান না হতে পারে; কিন্তু জনসাধারণের রসপিপাসা মিটানোর ব্যাপারে এদের গৌরব তাতে একটুও লাঘব হয় না।

জসীমউদ্দীন লোকজীবন ও লোকসাহিত্যের মর্মমূলে পৌঁছে এই সত্য উপলব্ধি করেছিলেন বলেই সত্যিকার লোকসংস্কৃতি প্রেমিক ও শিল্পীর মন নিয়ে লোকনাট্যের সম্পদকে তথাকথিত ভদ্রসমাজের গোচরীভূত করার প্রয়াস পেয়েছেন। লোকনাট্যের নিদর্শন সংগ্রহ করেই তিনি ক্ষান্ত হন নি, তার ঐতিহ্য আশ্রয় করে লোকজীবন-ভিত্তিক নাটক রচনা করে তাকে আধুনিক শিক্ষিত সমাজের পক্ষে গ্রহণীয় করে তুলেছেন। লোক-নাট্যের যে একটি মানবিক আবেদন আছে, সেটিকে চাবিকাঠি করে এক্ষেত্রে অগ্রসর হয়েছিলেন বলেই কাব্যের ন্যায় নাটকের এ-নতুন ক্ষেত্রেও তিনি আশাতীত সাফল্য অর্জন করেছেন। বলাবাহুল্য বাঙলা লোকনাট্যের বিভিন্ন ধারার সাথে ব্যাপক পরিচিতি ও অন্তরঙ্গ যোগ না ঘটলে লোক জীবন-নাট্যের এই নতুন ক্ষেত্রে অনায়াসে সাফল্য লাভ তাঁর পক্ষে সম্ভব হতো না। বিশ ও তিরিশের দশকে লোকসাহিত্য-সংগ্রহের অভিযানে শরিক হয়ে বাঙলার লোকজীবনের গভীরে প্রোথিত এই রস-সাহিত্যের ঐশ্বর্যভাণ্ডার আবিষ্কারের সৌভাগ্য তাঁর হয়েছিল। ঐ উপলক্ষে লোকজীবন ও লোক-সাহিত্যের অন্যান্য সম্পদের ন্যায় লোক-নাট্যের নিগূঢ় আত্মীয়তা উপলব্ধি করে তিনি এদের শিল্পমূল্য সম্পর্কেও নিঃসংশয়িত হয়েছিলেন। এই উপলব্ধিই যেমন একদিকে তাঁকে প্রেরণা দিয়েছিল বাঙলা লোকনাট্যের প্রকৃতি ও বৈচিত্র্য সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করতে, অন্যদিকে অবশ্য অনেক কাল পরে, লোক-জীবন-ভিত্তিক নাটক রচনায় ব্রতী হতে।

জসীমউদ্দীন তাঁর লোকনাট্য সম্পর্কিত অন্বেষার ফলাফল বিবৃত করেছেন 'আমাদের লোকনাট্য' শীর্ষক একটি প্রবন্ধে। প্রবন্ধটি সংক্ষিপ্ত কিন্তু যথেষ্ট মূল্যবান তথ্য-সম্বলিত। অসম্পূর্ণ ভাবে হলেও আমরা এই প্রবন্ধে পরিবেশিত তথ্যের সাহায্যে বাঙলা লোকনাট্যের বিকাশধারার একটি নির্ভরযোগ্য মানচিত্র নির্মাণ করতে পারি। বাঙলাদেশে সাধারণত তিন রকমের লোকনাট্যের

প্রচলন দেখা যায়—মালদহ জেলার 'আলকাফ', রংপুর, কুচবিহার ও ময়মনসিংহ জেলার 'তামাসা' এবং ফরিদপুর, যশোহর, বরিশাল ও ঢাকা জেলার 'যাত্রাগান'। এসব গীতিধর্মী লোকনাট্যের বিষয়বৈচিত্র্যও যথেষ্ট। মালদহ জেলায় প্রচলিত 'আলকাফ'গুলোর অধিকাংশই ক্ষুদ্র একাঙ্কিকা নাটিকার মতো। বিষয়বস্তু গ্রাম-জীবনের ঘটনা আশ্রয়েই গড়ে ওঠে; এতে পৌরাণিক কাহিনীর উপাদান গ্রহণ করা হয় না। নিত্যনৈমিত্তিক জীবন-প্রবাহ থেকেই নাটকের ঘটনা নির্বাচন করা হয়। নাটকগুলোতে সাধারণতঃ জুয়াখেলা, সুদখোরি, অপব্যয়ের কুফল ইত্যাদি সামাজিক সমস্যার অবতারণা করা হয়। হাস্যরসের ভিতর দিয়ে নীতিশিক্ষাদানের একটি সজ্ঞান প্রয়াস লক্ষ্য করা যায় এ নাটকগুলোতে। হাসির মোড়কে পুরে অনেক নিষ্ঠুর জীবন-সমস্যা সম্পর্কে জনসাধারণকে অবহিত করার এই প্রচেষ্টার মধ্যে লোকজীবনশিল্পীর সুস্থ জীবনচেতনার পরিচয় যেমন পাই, তেমনি পাই সূক্ষ্ম রসবোধের পরিচয়। রংপুর, কুচবিহার ও ময়মনসিংহ অঞ্চলে প্রচলিত 'তামাসা' ও ফরিদপুর-যশোহর-ঢাকা অঞ্চলের 'যাত্রাগানে'র তারতম্য সামান্যই। রংপুর তথা উত্তরবঙ্গের লোকনাট্যগুলোতে গদ্য কথোপকথন সামান্য থাকে, গানে গানেই প্রধানতঃ কথোপকথন চলে। এ ছাড়া উত্তরবঙ্গের লোকনাট্যগুলোর আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, এগুলো প্রায়শই হাস্যরস প্রধান। এমন কি করুণ রসাত্মক বিষয়ও এসব অঞ্চলে হাস্যরসে রূপান্তরিত হতে দেখা যায়। রংপুর জেলার 'মোনাই যাত্রা', 'বলাইগান', 'বোষ্টম-বাদিয়া', 'হুমরা বাইদ্যা', 'ময়নামতির গান' প্রভৃতি লোকনাট্য ব্যাপকভাবে সমগ্র উত্তরবঙ্গে অভিনীত হয়। এ সকল লোকনাট্যের অভিনয় প্রত্যক্ষ করেই জসীমউদ্‌দীন এদের প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। পরবর্তীকালে লোকজীবনভিত্তিক নাটক রচনায় সার্থকতা লাভের জন্যে তিনি যে এসব লোকনাট্যের কাছে যথেষ্ট ঋণী রয়ে গিয়েছেন তার স্বীকৃতি তাঁর নিজের উক্তিতেই পাই? "আমার পদ্মাপার নামক লোকনাট্যখানিতে কতকটা মোনাই যাত্রা লোকনাট্যের অনুসরণ করিয়াছি। 'হুমরা বাইদ্যা' নাটকের মোড়লের চরিত্রের কিছুটা আভাস আমার রচিত 'বেদের মেয়ে' নাটকের মোড়লের চরিত্রে পাওয়া যাইবে।"

আগেই উল্লেখ করেছি উত্তরবঙ্গের 'তামাসা' জাতীয় লোকনাট্যের সাথে পূর্ববঙ্গের যাত্রাগানের মূলগত পার্থক্য খুব বেশি নয়। তবে উত্তরবঙ্গের

লোকনাট্যের মতো পূর্ববঙ্গের লোকনাট্যে গানের প্রাচুর্য থাকলেও, তাতে গদ্য কথোপকথনের স্থানও উল্লেখযোগ্য। হাস্যরসের অপ্রতুলতা না ঘটলেও করুণ-রসের একটি বাস্তব আবহসৃষ্টিতেও পূর্ববঙ্গের লোকনাট্যকাররা যথেষ্ট পারদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন। প্রত্যেক লোকনাট্যে একটি বিশেষ সুরই প্রধান হয়ে দাঁড়ায়। এর রস-সার্থকতা সম্পর্কে জসীমউদ্দীন বলেছেন: "সেই সুরের মাদকতায় নাট্যবর্ণিত সমস্ত কাহিনী যেন মধুময় হইয়া দলের পর দল মেলিয়া ফুটিয়া উঠিতে থাকে।" বলাবাহুল্য যেহেতু 'Our sweetest songs are those that tell of saddest thoughts.' সেই হেতুই করুণরসের সৃজনেই পূর্ববঙ্গের লোকনাট্যগুলোও সার্থকতা অর্জন করেছে বেশি। সেই জন্যেই দেখি করুণ রসের দিকেই শিল্পীদের পক্ষপাত বেশি। এর ফলে লক্ষ্য করি কোনো কোনো লোকনাট্যের প্রথম দিকে হাস্যরসের সমাবেশ ঘটলেও শেষের দিকে ঘটনাপ্রবাহ করুণ হয়ে চারদিকে একটা অপূর্ব নীরবতা সৃষ্টি করে। ফরিদপুর, বরিশাল, কুষ্টিয়া যশোহর প্রভৃতি জেলায় প্রচলিত 'ভাসান যাত্রা', 'আসমানসিংহ যাত্রা', 'জামাল যাত্রা' ইত্যাদি এই জাতীয় লোকনাট্যের সার্থক উদাহরণ। এই লোকনাট্যগুলোতে একটি উদার অসাম্প্রদায়িক মনোভাব প্রায় সর্বত্র লক্ষ্য করা যায়। তাই দেখা যায় হিন্দুমুসলমান উভয় শ্রেণীর মানুষ একত্র হয়ে এসব নাটক অভিনয় করে এবং সমবেত হিন্দু-মুসলমান শ্রোতা একত্রে বসে সে অভিনয় উপভোগ করে। নীতিশিক্ষা বা আদর্শ-প্রচারের একটি সজ্ঞান-প্রবণতা এ জাতীয় নাট্যসৃষ্টি ও অভিনয়ের পিছনে কাজ করলেও, কেউ যদি মনে করেন নীতিশিক্ষাদান বা নীতিকথা প্রচারণাই এগুলোর একমাত্র লক্ষ্য, তা হলে কিন্তু তিনি খুবই ভুল করবেন। কারণ এগুলোতে লোক-জীবনশিল্পীরা নরনারীর জীবন-বাস্তবকে পূর্ণ মূল্যদানের চেষ্টা করেছেন। এবং সে-চেষ্টা প্রায়শ শিল্পসার্থকতামণ্ডিত হয়েছে।

এই লোকনাট্যগুলোর মধ্যে, বিশেষ করে, ভাসান যাত্রা ও পালাকীর্তনের প্রাচীন রসধারার সঙ্গে আমাদের বর্তমান কালের জীবনধারার সংযোগ ঘটায়, এদের আকর্ষণ আজও অনেকটা বজায় রয়েছে। নাটকগুলোর কথোপকথনে আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের সাধারণ কথাবার্তার ভঙ্গীটিই রক্ষিত হয়েছে। অথচ তা' অবলম্বন করেই নাটকের চরিত্রগুলো জীবন্ত হয়ে উঠেছে এবং ঘটনার নানা ঘাত প্রতিঘাত সৃষ্টির মাধ্যমে অপূর্ব রসতরঙ্গ সৃষ্টি করেছে। লোকনাট্যের

কথোপকথনের এই স্বাভাবিকতাই এদের অনায়াস অভিনয়োপযোগী করে তুলেছে। এতে আর একটি সুফল হয়েছে এই যে অভিনেতারা বিভিন্ন চরিত্রের পাঠ বলতে অনেকটা স্বাধীনতা পায় বলে, অভিনয় কালে বেশ স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে এবং আপন আপন অভিনয়নৈপুণ্য দেখানোর পূর্ণ সুযোগ লাভ করে। আবার ঐ কারণেই একদলের অভিনীত নাটকের সঙ্গে অন্যদলের নাটকের গুণগত পার্থক্যও দেখা দেয়। ভাল দলপতির হাতে পড়লে নাটকের উৎকর্ষ সাধিত হয়, অক্ষম দলপতির হাতে পড়লে অপকর্ষ ঘটে। এ ছাড়াও এই লোকনাট্যগুলো সম্বন্ধে আর একটি জিনিস লক্ষ্য করার আছে, তা হচ্ছে এই যে অভিনেতার অভিনয়ের ব্যাপারে যথেষ্ট স্বাধীনতা নেয়ার সুযোগ থাকায় এ নাটকগুলো নানা কণ্ঠের অভিনয়ের মধ্য দিয়ে ক্রমেই খোলস বদলিয়ে চলে। বিভিন্ন অঞ্চলের রুচির বিভিন্নতার জন্যে এদের অংশ বিশেষ প্রলম্বিত হয়, কোন অংশ বা খসে পড়ে। দলবিশেষে কোন অভিনেতা অভিনয়-দক্ষতা দেখানোর জন্যে অনেক সময় অভিনয়ের অংশটি ইচ্ছা মতো পরিবর্তন করেন, আবার দক্ষতার অভাবে অপর অভিনেতা সে অংশ সংক্ষিপ্ত করেন।° এই ভাবে লোকচর্চার মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠে বলেই তো লোকরঞ্জনের জন্যে সৃষ্ট এ নাটকগুলোকে লোকনাট্য বলে। জসীমউদ্‌দীনের ভাষায়, "কোন বিশেষ ব্যক্তির রচনায় নয়, দেশের সকল লোকের রচনায় রূপায়িত হয় বলিয়াই এগুলি লোকনাট্য।"

শুধু যে পূর্ববঙ্গের 'যাত্রাগান' সম্পর্কেই একথা প্রযোজ্য তা নয়, মালদহের 'আলকাফ' এবং উত্তরবঙ্গের 'তামাসা' জাতীয় লোকনাট্যগুলো সম্পর্কেও শেষের এই বক্তব্য প্রযোজ্য। এই লোকনাট্যগুলোর সাহিত্যিক মূল্য ছাড়াও এক গভীর সামাজিক তাৎপর্য রয়েছে। জসীমউদ্‌দীনের মতে: "এই নাটকের ভিতরেই আমাদের গ্রাম্য জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা, কি তাহারা হইতে যাইয়া কি তাহারা হইতে পারে নাই, সেই সুখ-দুঃখের জীবন্ত আলেখ্য রচিত হইয়া আছে। দেশকে যাঁহারা ভালবাসেন, দেশের জনগণের অন্তরের সঙ্গে যাঁহারা আত্মার আত্মীয়তা স্থাপন করিতে প্রয়াস পাইবেন, তাঁহারা এই লোকনাট্যগুলির মধ্যে অনেক কিছু খুঁজিয়া পাইবেন।" বস্তুতঃ লোকনাট্যগুলো লোকজীবন ও লোকমানসের অন্তরঙ্গ পরিচয়ে সমৃদ্ধ বলেই, এগুলোর মধ্য দিয়ে আমরা গ্রাম বাঙলাকে, গ্রাম বাঙলার মানুষকে যথার্থরূপে জানতে ও বুঝতে পারি। লোককাব্যের বাতায়ন পথে প্রথম এই গ্রাম বাঙলার মানুষের জীবনে

প্রবেশের সুযোগ ঘটেছিল জসীমউদ্‌দীনের ; লোকনাট্যের সদর রাস্তায় তার সাথে ঘটেছে তাঁর নিবিড়তর পরিচয় ! আমার মনে হয়, এই আলোতে বিচার করলেই তাঁর লোকনাট্য সৃষ্টিপ্রয়াসটির তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব হবে। রবীন্দ্রনাথ মন দিয়ে যার নাগাল পান নি, গান দিয়ে তাকে স্পর্শ করার কথা ভেবেছিলেন ; জসীমউদ্‌দীন লোককাব্যের বাতায়ন পথে যাকে শুধু স্পর্শই করতে পেরেছেন, লোকনাট্যের সদর রাস্তায় নেমে তার সাথে কোলা-কুলি করে তাঁর অপরূপ মিলন পিপাসা মিটিয়েছেন। তাই জসীমউদ্‌দীনের লোকনাট্য সৃষ্টির প্রয়াসকে বিশেষ মূল্য দিতেই হয়।

জসীমউদ্‌দীনের হাতে বাঙলা লোকনাট্যের পুনরুজ্জীবনই শুধু ঘটে নি, তার জন্মান্তরও ঘটেছে। আধুনিক শিল্পচেতনার পোষকতা থাকায় তাঁর রচিত লোকনাট্যের ভাষাদেহে যুগোচিত পরিমার্জন ছাড়াও অবলম্বিত কাহিনীতে যে সুসংবদ্ধতা দেখা যায় এবং ঘটনাবিন্যাসে যে চাতুর্য ও চরিত্র-চিত্রণে যে দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়, তাতে একে একপ্রকার নতুন সৃষ্টি বললেও চলে। তবু জসীমউদ্‌দীন তাঁর লোকজীবনের সুরাশ্রিত কবিকর্মের ন্যায় তাঁর লোক-নাট্যের ক্ষেত্রেও সর্বদা এর বিশেষ স্বভাবটিকে অক্ষুন্ন রাখার প্রয়াস পেয়েছেন। ঐ উদ্দেশ্যেই তিনি সর্বত্র লোকজীবন থেকেই নাট্যবস্তু সংগ্রহ করেছেন আর তার শিল্পরূপ দানে লোকসঙ্গীত, রূপকথা, কেচ্ছা, লোকগীতিকা, ছড়া, প্রবাদের রাজ্য থেকে অবাধে উপকরণ সংগ্রহ করে কাজে লাগিয়েছেন। সংলাপ রচনা কালে তিনি পল্লী নর-নারীর স্বাভাবিক বাচনভঙ্গীর প্রতি যথাসম্ভব আনুগত্য রক্ষা করে চলেছেন। মোটকথা লোকজীবন থেকে মাল-মশলা নিয়ে, লোক-জীবন ভঙ্গিমাকে পূর্ণ মূল্য দিয়ে জসীমউদ্‌দীন লোক-নাট্যের যে নবদিগন্ত উন্মোচন করেছেন, তা তাঁর লোকসাহিত্যের ঐতিহ্যাশ্রয়ী সাহিত্যসাধনারই ব্যাপ্তি ও গভীরতা সম্পর্কে আমাদের শ্রদ্ধান্বিত করে তোলে। স্বাভাবিক ভাবেই তাঁর কাব্যপ্রচেষ্টার ন্যায় তাঁর নাট্যপ্রচেষ্টাও সুধী সমাজের দৃষ্টিআকর্ষণে সমর্থ হয়েছে। তাঁর লোক-নাট্যগুলোর জনচিত্ত জয়ের ক্ষমতা ইতিমধ্যেই প্রতিপন্ন হয়েছে। সৌখীন অভিনেতা-অভিনেত্রীদের প্রচেষ্টায় বেতারে, রঙ্গমঞ্চে ও আসরে নানাভাবে অভিনীত হয়ে এগুলো সর্বস্তরের লোকের মধ্যে অসাধারণ প্রিয়তা অর্জন করেছে। বলাবাহুল্য লোকনাট্যের এই নতুন দিগন্তে জসীমউদ্‌দীন সার্থকতার মূলে কাজ করেছে লোকচরিত্রে তাঁর অসাধারণ জ্ঞান, লোকজীবন ও লোকমানস সম্পর্কে তাঁর সমৃদ্ধ বাস্তব

অভিজ্ঞতার অধিকার এবং সব কিছুকে সমঞ্জসিত করে শিল্পরূপদানের সহজাত ক্ষমতা।

লোকনাট্য জসীমউদ্‌দীন খুব বেশি লিখেননি। কারণ, সম্ভবতঃ লোক-সাহিত্যের এই দিকটির প্রতি তাঁর মনোযোগ আকৃষ্ট হয়েছিল সাহিত্যিক প্রৌঢ়ত্ব লাভের পরে। লোকনাট্যের যে-সব উপাদান পল্লীসাহিত্যে ছড়িয়ে ছিল, তার সাথে তাঁর পরিচয় অবশ্য ঘটেছিল অনেক আগেই। এ পরিচয়ের দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমরা তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'রাখালী'র অন্তর্ভুক্ত 'সিঁদুরের বেগতি' নামক গীতিনাট্যাংশটির উল্লেখ করতে পারি। তাঁর 'রঙিলা নায়ের মাঝি'র কিছু কিছু গানে এবং অন্যত্র সংকলিত বহুগানেও লোকনাট্যের উপাদান ছড়িয়ে রয়েছে দেখতে পাই। তা ছাড়া তাঁর রচিত পল্লীজীবন গাথা 'নকসীকাঁথার মাঠ' ও 'সোজনবাদিয়ার ঘাট'-এর উচ্চ নাটকীয় বৈশিষ্ট্যও দুর্লক্ষ্য নয়। এতৎসত্ত্বেও লোকনাট্য রচনার প্রেরণা তিনি অনুভব করেছেন অনেক কাল পরে রবীন্দ্রনাথের উপদেশ ও উৎসাহ-প্রাপ্তির ফলে। সে প্রেরণা কার্যকরী হয়েছে আরও পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর নয় বছর পরে মাত্র এই সেই দিন ১৯৫০ সালে। অথচ জসীমউদ্‌দীনের কাব্যসাধনা শুরু হয়েছিল ১৯২৭ সালেরও আগে। লক্ষ্য করার বিষয় এই যে তাঁর কাব্যসাধনায় যখন ভাটার টান এসে গিয়েছে, তখনই জসীমউদ্‌দীন লোকনাট্যের নতুন খাতে চলার গরজ বোধ করেছেন। মোট পাঁচটি পূর্ণাঙ্গ লোকনাট্য তিনি রচনা করেছেন। এগুলো হচ্ছে 'পদ্মাপার', 'মধুমালা', 'বেদের মেয়ে', 'পল্লীবধূ' ও 'গ্রামের মায়া'। এ ছাড়া 'বদল বাঁশী', 'করিম খাঁর বাড়ী', 'জীবনের পণ্য' ও 'গাজন চরের কাইজ্যা' শীর্ষক চারটি ক্ষুদ্র একাঙ্কিকাও জসীমউদ্দীন রচনা করেছেন। এগুলো সবই মোটামুটি লোক-নাট্যের লক্ষণাক্রান্ত। 'বদল বাঁশী' ও 'করিম খাঁর বাড়ী' 'পল্লীবধূ'-নাট্যগ্রন্থের শেষে সংযোজিত হয়েছে এবং 'জীবনের পণ্য' ও 'গাজন চরের কাইজ্যা' জসীমউদ্দীনের সর্বশেষ নাটক (কাব্যনাট্য) 'ওগো পুষ্পধনু'-র কলেবর পুষ্ট করেছে। এসব লোকনাট্য সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনার অবকাশ বর্তমান প্রবন্ধে নেই বলেই আমরা সংক্ষেপে এদের বিষয় ও শিল্পকৌশলগত বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করে প্রসঙ্গটির উপসংহার টানব।

জসীমউদ্দীনের প্রথম লোকনাট্য অভিধেয় রচনা 'পদ্মাপার' ১৯৫০ সালে প্রকাশিত হয়। এটি মূলতঃ একটি অধ্যাত্মরূপক-জাতীয় লোকনাট্য। শৈব, শাক্ত, সহজিয়া সাধনার ধারায়, বাউল মুর্শিদা, মারফতী প্রভৃতি গানের সুরে

বাঙালির অধ্যাত্ম বোধের যে সহজ প্রকাশ ঘটেছে যুগে যুগে, কথার সূত্রে গানের মালা গেঁথে তাকেই জসীমউদ্‌দীন নাট্যরূপ দিয়েছেন 'পদ্মাপারে'। এ নাটক রচনার সূত্র তিনি খুঁজে পেয়েছিলেন রংপুর অঞ্চলে প্রচলিত 'মোনাই-যাত্রা' লোকনাট্য থেকে। 'পদ্মাপার' নাটক রচনায় 'মোনাইযাত্রার' অনুসরণ সম্পর্কে জসীমউদ্‌দীনের স্পষ্ট স্বীকৃতি পাওয়া যায়, লোকনাট্য সম্পর্কিত তাঁর প্রবন্ধে। সে কথা পূর্বেও আমরা উল্লেখ করেছি। লক্ষ্য করার বিষয় মোনাই-যাত্রার ন্যায় এ নাটকের নায়কের নামও মোনাই। নাটকটিতে ভবপথের পথিক মানুষের পরমকে জানা ও পাওয়ার অপরূপ উৎকণ্ঠাই মোনাই সওদাগর ও সুজন মাঝির অনির্দেশ্যের উদ্দেশ্যে যাত্রা ও কথোপকথনের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে। মোনাই এখানে ভবপথের যাত্রী, পরমের উদ্দেশ্যসন্ধানী মানুষের প্রতীক, আর সুজন মাঝি ভবপথযাত্রী মানুষের পথপ্রদর্শক গুরু বা মুর্শিদেরই প্রতীক। পরমকে জানা ও পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা মানুষের চিরন্তন; কিন্তু সে সাধ বা আকাঙ্ক্ষা পূরণ সুদুঃসহ ত্যাগ ও সাধনা-সাপেক্ষ। সে সাধনার পথে সংসারী মানুষের বাধা অনেক। লোভ, মোহ-মাৎসর্য, বিষয়-বুদ্ধি সব সময়ই মানুষকে বিভ্রান্ত করছে। তাই পথের দিশা হারিয়ে ফেলার ভয় রয়েছে প্রতি পদে। বিবেক, বৈরাগ্য ও ভক্তি এ পথের পথিকের বড় সম্বল। কিন্তু শুধু এসবের উপর ভরসা করেই ভবপথিক চলতে পারে না। কারণ পদে পদে সংশয় এসে তার দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করে ফেলে, তাকে ভুল পথে ঠেলে দিতে চায়। এ অবস্থায় সদ্‌গুরুর উপদেশ বা নির্দেশের প্রয়োজনই সবচেয়ে বেশি। তিনিই কেবল তাকে সকল মোহজাল ছিন্ন করে, সংশয় কাটিয়ে উঠে যথার্থ পথে চলবার উপযুক্ত শক্তি ও প্রেরণা জোগাতে পারেন। নতুবা ভবপথযাত্রীর ভরাডুবি অনিবার্য। মোটামুটিভাবে আমাদের বাউল, মুর্শিদী-পন্থার সাধকরা অনন্তের সঙ্গলাভপ্রয়াসী ভবপথিক মানুষের সমস্যাটাকে এইভাবেই তুলে ধরেছেন এবং তার সমাধান নির্দেশ করেছেন। আলোচ্য 'পদ্মাপার' লোকনাট্যে রূপকচ্ছলে এই অধ্যাত্ম জিজ্ঞাসার স্বরূপটিই ব্যক্ত হয়েছে।

নাটকটিতে দেহতত্ত্বের সুপ্রচুর উল্লেখদৃষ্টে অনায়াসে অনুমান করা চলে যে বাঙলার বাউলপন্থী লোকসাধকদের অধ্যাত্মভাবনাই যেন এতে কৌশলে রূপায়িত করা হয়েছে। বাউলরা বিশ্বাস করেন যে ঈশ্বর বা পরমাত্মা মানব দেহেই স্থিতি করেন। তাঁকে দেহাধারেই যথার্থ উপলব্ধি করা সম্ভব; তবে সে জন্যে সুকঠিন যোগমার্গের আশ্রয় নেওয়া প্রয়োজন। তাঁরা বলেন, যোগবলে

দেহস্থ মূলাধারে স্থিত কুলকুণ্ডলিনী শক্তিকে জাগ্রত করে সহস্রদলপদ্মে স্থির পরমাত্মার যোগে যুক্ত হতে পারলেই ঈশ্বরের উপলব্ধি সম্ভব। এ-মার্গ স্বভাবতই দুরধিগম্য। পথ চলতে উপযুক্ত গুরুর সাহায্য, উপদেশ ও নির্দেশনা সর্বদা প্রয়োজন। নানা ভ্রান্তি, প্রলোভন পথিকের বিপদ ডেকে আনতে পারে। তবে সত্যকে জানার আন্তরিক আগ্রহ ও ত্যাগবরণের সামর্থ্য থাকলে শেষ পর্যন্ত সকল বাধা উত্তীর্ণ হয়ে অভীপ্সিত লক্ষ্যে পৌছান সম্ভব। আলোচ্য নাটকে সোনাই সওদাগরের বিচিত্র জটিল অভিজ্ঞতা ভবপথিকের সাধনার কঠোরতারই ইঙ্গিত দিচ্ছে। জসীমউদ্‌দীন সহজ রূপকের আবরণে রূপকথার মতো সুন্দর করেই ভবপথিক অনন্ত সঙ্গলিপ্সু মানুষের এই সংকট ও সাধনার কথা 'পদ্মাপার' নাটকে প্রকাশ করেছেন। তাত্ত্বিক জটিলতা সত্ত্বেও যে এ নাটকের বক্তব্য সহজ ও হৃদয়গ্রাহ্য হয়ে উঠতে পেরেছে, তার জন্যে কৃতিত্বের দাবি অবশ্যই জসীমউদ্‌দীন করতে পারেন। তবে এ কঠোর পরীক্ষার বৈতরণী পার হতে তাঁকে বিশেষভাবে সাহায্য করেছে বাঙলার লোকায়ত জীবন ভাবনা সমৃদ্ধ পল্লীগীতিগুলো। অধ্যাত্ম ভাবনার তাত্ত্বিক রূপ যত জটিলই হোক না কেন, লোককবিরা লোকজীবন থেকে রূপক তৈরি করে তাকে অতি সাধারণ মানুষেরও বোধগম্য করে তোলার আশ্চর্য ক্ষমতা দেখিয়েছেন। জসীমউদ্‌দীন ঐ গানের সরণি অবলম্বন করেই অনায়াসে দুস্তর বাধা অতিক্রম করেছেন। আর একটি কারণেও অধ্যাত্ম জীবনভাবনার জটিলতায় পূর্ণ এ লোক-নাট্যটি লোকচিত্ত জয় করতে পেরেছে। তা হচ্ছে এই যে এই লোকনাট্যে ভাববাদী বাঙালি স্বভাবের মজ্জাগত মধ্যাত্মবোধের সাড়া রয়েছে। যুগ যুগ ধরে শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব, সহজিয়া, আউল, বাউল, মারফতী সাধকদের অধ্যাত্ম সাধনার রসনিষেকে উর্বর সাধারণ বাঙালি চিত্তে লোককবিরা এমন সুকৌশলে এইসব অধ্যাত্মভাবনার বীজ বুনে দিয়েছেন যে একটু ভক্তি বা আবেগের বর্ষণেই তাতে ভাবনার মুকুল ফুটতে শুরু করে। তাই অনায়াসেই তারা তত্ত্বের বেড়ি অতিক্রম করে যে কোনো ভাবনার মর্মমূলে পৌছে যায়। এই জন্যেই তো তত্ত্ব সর্বস্ব হয়েও 'পদ্মাপার' লোকনাট্য হিসেবে অসাধারণ জনপ্রিয়তা লাভে সমর্থ হয়েছে।

'পদ্মাপার' লোকনাট্যের একটি শিল্পগত বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে এতে ঘন ঘন গানের সমাবেশে একটি অবিচ্ছিন্ন গীতিপ্রবাহের সৃষ্টি হয়েছে। গানগুলো সবই পল্লী থেকে সংগৃহীত ; তবে জসীমউদ্‌দীন এগুলোকে কিছুটা পরিমার্জিত,

ক্ষেত্রবিশেষে পরিবর্তিত করে, তাঁর নাটকে ব্যবহার করেছেন। যে ভাষার সূত্রে এগুলোকে গেঁথে একটি অখণ্ড সুরসঙ্গতি দানের প্রয়াস পেয়েছেন, তাও যথাসম্ভব পল্লীর প্রাত্যহিক কথাবার্তারই ভাষা। ফলে পল্লীপ্রাণের যথার্থ স্পন্দনটি অনুভব করা যায় এ-নাটকে। তবে একথা ঠিক যে এ নাটকের চরিত্রগুলোর কথোপকথন ও গানের ভাষায় কিছুটা হেঁয়ালির ভাব লক্ষ্য করা যায়। 'পদ্মাপার' নাটকের ভাববস্তুর নৈর্ব্যক্তিকতাই যে এর জন্যে অনেক পরিমাণে দায়ী তা না বললেও চলে। জসীমউদ্‌দীনের কৃতিত্ব এখানে যে তিনি লোকজীবন থেকে রূপকের উপাদান নিয়ে লোকভাষায় রূপকথার আদল সৃষ্টি করে দুরূহ তত্ত্বভাবনাকেও একটা স্বাদুতা দান করতে পেরেছেন। 'পদ্মাপার' নামকরণটিও তাঁর সহজাত শিল্পবোধের সুন্দর পরিচয় বহন করে। তরঙ্গ-সংক্ষুব্ধ খরস্রোতা পদ্মাপ্রবাহের চেয়ে অনন্ত সঙ্গলিপ্সু ভবপথিকের দুরূহ সাধন পথের শ্রেষ্ঠ উপমান আর কিইবা হতে পারে!

রূপকথাশ্রয়ী লোকনাট্য 'মধুমালা' জসীমউদ্‌দীনের দ্বিতীয় নাট্যগ্রন্থ। বাঙলাদেশের ঘরে ঘরে লোকমুখে প্রচলিত মদনকুমার ও মধুমালার রূপকথা অথবা 'মধুমালার কেচ্ছা' অবলম্বন এটি রচিত হয়েছে। বহুকাল নিঃসন্তান এক রাজা ও রাণীর অনেক তপস্যা ও সাধনার ফল একমাত্র পুত্রের যৌবন-স্বপ্ন-মত্ততার এক আকুল-করা কাহিনী হচ্ছে 'মধুমালা' লোকনাট্যের বিষয়। সঙ্গীদের সাথে বনে শিকার করতে গিয়ে সারাদিন ছুটাছুটির পর ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল রাজপুত্র মদনকুমার। দৈবক্রমে ঐ বনের উপর দিয়ে যাচ্ছিল কালপরী ও নিদ্রাপরী। রাজপুত্রের রূপে মুগ্ধ হয়ে ওরা তারই উপযুক্ত পাত্রী মনে করে ভিনদেশের এক রাজকন্যা মধুমালার সঙ্গে স্বপ্ন-যোগে ঘটিয়ে দেয় তাঁর মিলন। স্বপ্নভঙ্গ হতেই রাজপুত্র আকুল হয়ে ওঠে স্বপ্নে দেখা সেই রাজকন্যাকে পাবার জন্যে। এদিকে রাজকন্যা 'মধুমালা'ও ব্যাকুল প্রতীক্ষায় থাকে তার জন্যে। তারপর কেমন করে বহু দুস্তর বাধার সমুদ্র অতিক্রম করে, বহু দুঃখ-কষ্ট ভোগ করে রাজপুত্র পেলেন সেই মধুমালার দেখা তাই বিবৃত হয়েছে এই নাটকটিতে। বলা বাহুল্য মদনকুমার ও মধুমালার মিলনের মধ্যেই পরিসমাপ্তি লাভ করেছে নাটকটি।

তেরটি বিভিন্ন দৃশ্যে বিন্যস্ত করে এ জনপ্রিয় রূপকাহিনীটিকে লোকনাট্য রূপে গড়ে তুলেছেন জসীমউদ্‌দীন। দৃশ্যগুলোর মধ্যে সঙ্গীতের প্রবাহ সঞ্চার করে দিয়ে তিনি সুকৌশলে তাদের ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ করেছেন। বস্তুতঃ এই

নাটকে গানের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রকৃতপক্ষে গানের সুরে ভর করেই নাটকের কাহিনী প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত এগিয়ে চলেছে। এ সম্পর্কে জসীমউদ্‌দীনের নিজের উক্তি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি বলেছেন: "প্রাচীন গানের আলোক প্রদীপ জ্বালাইয়া এ কাহিনী রূপলোকের দিকে চলিতেছে।" এই যাত্রাপথে কথোপকথন যেন কাহিনীর অগ্রগতির পরিমাণটা নির্ণয়ের জন্যে মাঝে মাঝে কিছুক্ষণ থেমে হিসেব নেয়ার কৌশল মাত্র। নাটকের নরনারীদের স্বপ্নকামনা, ভাবাবেগ, কৌতুকপ্রিয়তা—তাদের চরিত্রের যাবতীয় ক্রিয়াশীলতা ভাষা পেয়েছে ঐ গানের মধ্যেই। পদ্মাপার লোকনাট্যের মতো এখানেও আমরা তাই লক্ষ্য করি গানের সুরেরই প্রাধান্য। অবশ্য লোকনাট্যে সুর প্রাধান্যই স্বাভাবিক ব্যাপার, কারণ লোক কবিরা মন দিয়ে নয় গান দিয়েই সব জিনিসের নাগাল পাওয়ার চেষ্টা করেছেন এবং তার মধ্যেই খুঁজে পেয়েছেন আপন সৃষ্টিকর্মের সার্থকতা। জসীমউদ্দীন লোকনাট্যের এ ট্র্যাডিশন রক্ষা করে চলেছেন সযত্নে।

জসীমউদ্‌দীন এ-লোকনাট্যটি সৃষ্টির প্রেরণা পেয়েছিলেন "গ্রাম্যরূপকথা ও কথন কথার ভাণ্ডার" তাঁর এক অন্ধ দাদার (পিতার চাচা) কাছ থেকে। তিনি নিজেই বলেছেন যে শুধু কাহিনী নির্বাচনেই নয়, এর প্রকাশ ভঙ্গিতেও তিনি তাঁর দাদার অপরূপ কথন ভঙ্গীটিকে যথাসাধ্য অনুসরণ করার চেষ্টা করেছেন। এ নাটক রচনায় তাঁর দাদার কাছে তাঁর অপরিসীম ঋণের কথা সকৃতজ্ঞচিত্তে স্বীকার করে তিনি বলেছেন "এই নাটকের মধ্যে মধুমালার কেচ্ছার পুরাতন গানগুলি যথা সম্ভব রাখিবার চেষ্টা করিয়াছি। সেই গানগুলি সব একই সুরের। সেই পুরাতন সুরের পাখা বিস্তার করিয়া অতীত যুগের ভাবধারা টানিয়া আনিতে প্রয়াস পাইয়াছি।" কারণ তাঁর বিশ্বাস "আমাদের অবচেতন মনে সেই সুর হয়ত আজও বাসা বাঁধিয়া আছে।" আমার মনে হয় পুরাতন গল্পকথার আবহটি যথাযথ সৃষ্টি করতে হলে এর চেয়ে উৎকৃষ্টতর কোনো পন্থা আর থাকতে পারে না। পুরাতন গানগুলো নির্বাচনে জসীমউদ্‌দীন নির্ভুল রসচেতনার স্বাক্ষর রেখে দিয়েছেন। তবে ক্ষেত্রবিশেষে তিন কিছুটা স্বাধীনতাও নিয়েছেন। গানগুলোর মধ্যে কিছুটা বৈচিত্র্যসঞ্চারের জন্যে তিনি কয়েকটি নতুন গানও এ-নাটকে জুড়ে দিয়েছেন। বরিশাল অঞ্চলে প্রচলিত 'আসমান সিংহ' লোকনাট্যের কয়েকটি গানের সুর তিনি নাটকের দুই তিনটি গানে প্রয়োগ করেছেন। তদুপরি নাটকের ঘটনা বিন্যাসেও কিছুটা নতুনত্ব

এনেছেন ঐ 'আসমান সিংহ' লোকনাট্য থেকে কালপরী ও নিদ্রাপরীর কথা-বার্তার প্রসঙ্গটি আমদানি করে। লোকনাট্য 'মধুমালায়' অনুসৃত ভাষাভঙ্গীটি কিন্তু লোকনাট্যের স্বভাবধর্মের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। লোকনাট্যের ভাষায় আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য রক্ষার আবশ্যকতার প্রশ্নটিকে এই অজুহাতে তিনি এড়িয়ে যেতে চেয়েছেন যে কোন বিশেষ অঞ্চলের গ্রাম্যভাষা ব্যবহার করলে তা অন্য অঞ্চলের লোকেরা বুঝতে পারবে না। অতএব সর্বজনবোধগম্য কলকাতা অঞ্চলের ভাষাভঙ্গীকে তিনি শ্রেয়ঃ করেছেন। কিন্তু লোকনাট্যের ভাষায় আঞ্চলিকতা বর্জনের পক্ষে এ যুক্তি যথেষ্ট জোরাল নয় বুঝতে পেরেই তিনি বিনীতভাবে নিজ অসামর্থ স্বীকার করে অন্যত্র বলেছেন; "যে সহজ কথাবার্তায় আমাদের লোকনাট্যগুলি রচিত; আমার রচনায় তাহা সম্যক ফুটাইয়া তুলিতে পারি নাই। কারণ অতি সাধারণ কথায় রস সৃষ্টি করার অপূর্ব ক্ষমতা আমার নাই।" কবির আত্মসমালোচনা পূর্ণ এই উক্তি বিনা প্রতিবাদে আমাদের পক্ষে গ্রহণ করা সম্ভব নয়। তবে বর্তমান ক্ষেত্রে রূপকথার রস-পরিবেষণটি মুখ্য মনে করায় এবং রূপ-কাহিনী বর্ণিত চরিত্রগুলির স্থানিক ও ব্যক্তিক বৈশিষ্ট্য প্রস্ফুটনের অবকাশ না থাকায়, জসীমউদ্দীন ভাষায় আঞ্চলিক রীতি পরিহার করে খুব একটা অন্যায় করেন নি বলেই আমরা মনে করি।

'মধুমালা'র পরে প্রকাশিত হয় জসীমউদ্দীনের বিখ্যাত লোকনাট্য 'বেদের মেয়ে'। এটি নানা কারণে একটি বিশিষ্ট সৃষ্টি। বলতে গেলে এ নাটকেই জসীমউদ্দীন প্রথম বাঙলা দেশের লোকজীবনের বাস্তবকে আশ্রয় করেছেন। 'পদ্মাপার' নাটকে বাস্তবজীবনের প্রতিভাস থাকলেও, লোকজীবন নয়, লোক মানসেরই একটা অধ্যাত্ম-বিশ্বাসশাসিত রূপ প্রত্যক্ষ করা যায়। 'মধুমালা'তো নিছক রূপকথা রাজ্যেরই বাসিন্দা। রূপকথার রসলোকের সিঁড়ি বেয়ে সে অবশ্য নেমে এসেছে লোকজীবনের আঙিনায়। 'বেদের মেয়ে'তেই আমরা সর্ব প্রথম প্রত্যক্ষ করি আমাদের পল্লীবাঙলার নরনারীর স্নেহ-ভালবাসা-সিক্ত অথচ বিয়োগব্যথা কণ্টকিত জীবনকে। আমাদের বেদে সমাজের একটি বলিষ্ঠ চিত্র হিসেবে এই লোকনাট্যটি বিশেষ মূল্য বহন করছে বললে নিশ্চয়ই অত্যুক্তি হবে না। যদিও এ নাটকে 'চম্পা' নাম্নী এক বেদের মেয়ের ট্র্যাজেডিই মুখ্য বিষয়, তবু ঐ ট্র্যাজেডিকে ফুটিয়ে তুলতে গিয়ে নাট্যকার আমাদের বেদে সমাজের একটি বাস্তবানুগ ছবিও উপহার দিয়েছেন। ঐ উপলক্ষে আমাদের

সামনে বৃহত্তর বাঙলার কৃষিনির্ভর গ্রামীণ সমাজের চেহারার সুস্পষ্ট আভাসও উপস্থাপিত করেছেন লেখক। 'বেদের মেয়ে' নাটকে কোনো বিশেষ ঘটনা নয়, বেদের মেয়ে চম্পার নারী-আত্মার ক্রন্দন ধ্বনিই যেন প্রথম থেকে বেজে ফিরেছে। গয়া বেদেকে নিয়ে সে ঘর বেঁধেছিল, স্বপ্ন দেখেছিল এক সুন্দর প্রেমস্নিগ্ধ জীবনের। কিন্তু হতভাগিনী নারী তার অপরূপ সৌন্দর্যের জন্যে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধেই বাধ্য হয়েছিল এক গ্রাম্য মোড়লের কাছে আত্মসমর্পণ করতে। বেদে সমাজের মঙ্গলকে সবচেয়ে কাম্য মনে করে সে ঐ লাঞ্ছনাকে মাথা পেতে নিয়েছিল। কিন্তু কিছুকাল পরে মোড়ল কর্তৃক পরিত্যক্ত হয়ে সে ফিরে আসে তার পূর্বপ্রণয়ী, স্বামী গয়া বেদের কাছে। গয়া বেদে তখন নতুন বেদেনী নিয়ে নতুন ঘর বেঁধেছে। তাই চম্পাকে গ্রহণ করতে রাজী হলো না স্ত্রীর মর্যাদায়। প্রত্যাখ্যাতা চম্পা এ-অবস্থায় বেঁচে থাকার কোনো অর্থই খুঁজে পায়নি। তাই সে অভিমানে পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছে। বিদায়ের আগে সর্পদষ্ট গয়া বেদেকে নিজের জীবন দিয়ে বাঁচিয়ে দিয়ে গিয়ে সে তার প্রেমের মহিমাকেই স্পষ্ট করে তুলে গিয়েছে। চম্পার ব্যথাহত প্রেমের কান্না গোটা নাটকটিতে একটা চূড়ান্ত লিরিক্যাল আবেগ সৃষ্টি করে সকল চরিত্র ও ঘটনাকে ছাপিয়ে মুখ্য হয়ে উঠেছে। সঙ্গত কারণেই তাই সমালোচক বলেছেন, 'বেদের মেয়ে' নাট্যাকারে রচিত হলেও প্রকৃত পক্ষে একটি অনুপম গীতি সৌন্দর্যে চিহ্নিত প্রেমের কাব্য।

অন্যত্র যেমন এ-লোকনাট্যেও তেমনি, লোকনাট্যের স্বভাবধর্ম পুরোপুরি বজায় রাখার জন্যে জসীমউদ্‌দীন সংলাপে আঞ্চলিক ভাষাভঙ্গিকে পূর্ণমূল্য দিয়েছেন এবং লোকসঙ্গীতের সম্পদও ব্যাপকভাবে কাজে লাগিয়েছেন। আগেই প্রসঙ্গান্তরে উল্লেখ করেছি যে এ-নাটক রচনার ব্যাপারে তিনি উত্তরবঙ্গ অঞ্চলে প্রচলিত 'হুমরা বাইদ্যা' নামক লোকনাট্যের কাছে অনেকটা ঋণী। বিশেষত 'হুমরা বাইদ্যা' নাটকের মোড়ল চরিত্রের আদলেই যে তিনি বেদের মেয়ে নাটকের মোড়ল চরিত্র সৃষ্টি করেছেন, এমন আভাস জসীমউদ্‌দীন স্বয়ং 'লোক-নাট্য' সম্পর্কিত স্বরচিত একটি প্রবন্ধে দিয়েছেন। 'বেদের মেয়ে' নাটক রচনার ব্যাপারে জসীমউদ্‌দীন যে লোকনাট্য ও গ্রাম্যগানের কাছে বিশেষভাবে ঋণী তা তিনি নাটকটির দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় অকপটে ব্যক্ত করেছেন। তিনি যে এটিকে সচেতনভাবে গ্রাম্য তথা লোকনাট্যে পরিণত করার প্রয়াস পেয়েছেন, তাও স্বীকার করেছেন। প্রাসঙ্গিক বিধায় এখানে তাঁর উক্তি উদ্ধৃত

করছি : "এই নাটককে গ্রাম্য নাটকে রূপান্তরিত করিতে যাইয়া আমি কোন কোন স্থানে প্রচলিত লোকনাট্যের অংশবিশেষ গ্রহণ করিয়া এই নাটকের পরিপার্শ্বিকতা সৃষ্টি করিতে চেষ্টা করিয়াছি। কয়েকটি গ্রাম্যগানেরও প্রথম পদ লইয়া তাহার সঙ্গে নতুন পদ জুড়িয়া দিয়াছি।" মোটকথা একজন সচেতন শিল্পীর মন নিয়েই জসীমউদ্দীন লোকনাট্য ও গ্রাম্যগানের উপাদান সমীকৃত করে, গ্রহণ, বর্জন, পরিমার্জন ও সংযোজন ব্যাপারে ব্যাপক স্বাধীনতা গ্রহণ করে 'বেদের মেয়ে' লোকনাট্যটি রচনা করেছেন। 'বেদের মেয়ে' নাটকে সংলাপ রচনায় ও চরিত্রচিত্রণে জসীমউদ্দীনের সফলতা নিতান্ত সামান্য নয়। জনচিত্তজয়ী ঐ-লোকনাট্য লোকজীবনশিল্পী হিসেবে জসীমউদ্দীনকে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে অনেকখানি।

'বেদের মেয়ে'র পর প্রকাশিত 'পল্লীবধূ' নাটকটি জসীমউদ্দীনের এই পর্যায়ের চতুর্থ এবং বোধহয় শ্রেষ্ঠ রচনা। 'পল্লীবধূ' পল্লীজীবনের একটি বাস্তব আলেখ্য। পাড়াগাঁয়ে বিবাহাদি ব্যাপার নিয়ে মাঝে মাঝে যে বিভ্রাট দেখা দেয়, দুই প্রতিপক্ষের মধ্যে কি সামান্য কারণে হানাহানি বেঁধে যায় এবং আবার গাঁয়েরই দু চারজন শুভবুদ্ধি সম্পন্ন লোকের প্রচেষ্টায় অতি সহজেই কেমন করে তার মীমাংসা হয়ে যায়, তারই একটি বাস্তব দৃশ্য 'পল্লীবধূ' নাটকে রূপায়িত হয়েছে। পল্লীর আঞ্চলিক ভাষার সংলাপে গ্রথিত এ-নাটকটিতে বর্ণিত জীবনদৃশ্যের সজীবতা খুবই উপভোগ্য হয়েছে। নাটকটির কাহিনীর গতিশীলতা, এর ঘটনাপ্রবাহের আকস্মিক মোড় পরিবর্তন এর নাট্যগুণ অনেকটাই বাড়িয়ে দিয়েছে। 'পল্লীবধূ' নাটকের প্লটটি জসীমউদ্দীন রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে পেয়েছিলেন বলে জানিয়েছেন। তবে নানা কারণে কবির জীবিতকালে নাটকটি রচনা করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি; এমনকি পরবর্তীকালে যখন তিনি লোকনাট্য রচনায় প্রবৃত্ত হন, তখনও এটিকে প্রথম সৃষ্টির মর্যাদা দিতে পারেননি। সে যাই হোক, বিলম্বিত হলেও 'পল্লীবধূ' নাটক রচনায় জসীমউদ্দীন কবি প্রদত্ত প্লটটি প্রায় হুবহু গ্রহণ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে প্লটটি বলে দিয়ে এর ট্র্যাজিক ও কমিক দুই পরিণতির সম্ভাব্যতা সম্পর্কেও বলেছিলেন। ট্র্যাজিক পরিণতিটিই স্বাভাবিক হবে বলে ইঙ্গিত দিয়েছিলেন কবি। তবে জসীমউদ্দীন সে ইঙ্গিত গ্রহণ না করে সুকৌশলে ঘটনাপ্রবাহের মোড় ঘুরিয়ে দিয়ে একে শেষ পর্যন্ত কমেডিতেই পরিণত করেছেন। যদিচ ঘটনা প্রবাহের মধ্যে ট্র্যাজেডি সৃষ্টির সম্ভাবনাগুলো

দেখাতেও তিনি পশ্চাদ্‌পদ হননি।

'পল্লীবধূ' নাটকে বর্ণিত জীবন বৃত্তটি হচ্ছে এইরূপ ঃ গ্রামের ছদন মোড়লের ছেলে আজিম উচ্চশিক্ষা গ্রহণান্তে বহুদিন পর কলকাতা থেকে গ্রামে ফিরেছে। গ্রাম্যরীতিতেই গ্রামের লোকেরা তাকে অভ্যর্থনা জানিয়েছে। যদিচ শিক্ষিত আজিমের কাছে ব্যাপারটা স্থূলরুচির পরিচয় বলেই মনে হয়েছে। সে যাই হোক, দুদিন যেতেই পিতামাতার কাছ থেকে আজিম জানতে পারল, পাশের গ্রামের আলিম মাতব্বরের মেয়ে হাসিনার সাথে তার বিয়ের ব্যবস্থা বহুদিন আগেই স্থির হয়ে আছে; এবার আজিম রাজী হলেই তারা কাজে এগিয়ে যেতে পারেন। নতুন শিক্ষাভিমানী আজিম প্রথমটা গ্রাম্য মেয়ে বিয়ে করার প্রস্তাবটাকে উষ্মাভরে প্রত্যাখান করে। তখন মেয়ের বাবা আলিম মোড়ল অন্যত্র মেয়ের বিবাহের ব্যবস্থা করেন। ইতিমধ্যে দৈবক্রমে হাসিনার সাথে আজিমের একদিন দেখা হয়ে যায়। যৌবনবতী রূপসী হাসিনাকে দেখে আজিম মুগ্ধ হয়ে যায় এবং তাকে বিয়ে করতে অস্বীকার করে ভুল করেছে বুঝে মন খারাপ করে বাড়ি ফেরে। ব্যাপারটা ছদন মোড়লের কানে যায়, তিনি দৌড়ে চলে যান আলিম মোড়লের বাড়িতে এবং তাকে অনুরোধ জানান পূর্ব-প্রস্তাবমত আজিমের সঙ্গে হাসিনার বিয়ে দিতে। কিন্তু আলিম মোড়ল তাতে রাজী হন না, কারণ হাসিনার বিয়ে তিনি অন্যত্র ঠিক করে ফেলেছেন। এই নিয়ে দুই মোড়লের মধ্যে নানা কথা কাটাকাটি হয় এবং শেষ পর্যন্ত নিদারুণ রেষারেষিতে পরিণত হয়। ফলে হাসিনার বিয়ে উপলক্ষে দুই গ্রামের মানুষের মধ্যে দাঙ্গা বাধার উপক্রম হয়। শেষপর্যন্ত সরলপ্রাণ হাজী গৈজদ্দি ভুইঞার সময়োচিত হস্তক্ষেপে ব্যাপারটার মীমাংসা হয়ে যায়। তিনি তার ছেলেকে বিয়ের আসর থেকে তুলে নিয়ে আজিমের সাথে হাসিনার বিয়ে দেওয়ার জন্যে আলিম মোড়লকে আহ্বান জানান। হাজী সাহেবের মর্যাদার প্রশ্ন ভেবে আলিম মোড়ল তাতে সহসা রাজী হন না; কিন্তু ছদন মোড়ল নিজ কন্যাকে হাজী সাহেবের ছেলের সাথে বিয়ে দেবার প্রস্তাব করে সমস্ত ব্যাপারটার একটা সুন্দর ফয়সলার ব্যবস্থা করেন। ফলে আজিম ও হাসিনার বিয়ের মধ্য দিয়ে নাটকটি বাঞ্ছিত মিলনান্তক পরিণতি লাভ করে। 'পল্লীবধূ' নাটকটির সার্থকতা এইখানে যে এতে গ্রাম্যজীবন-বাস্তবের চমৎকার স্বীকৃতি রয়েছে এবং তাকে শিল্পরূপদানে জসীমউদ্‌দীন অনায়াস ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন।

'পল্লীবধূ' নাটক সম্পর্কে সবচেয়ে বড় কথা বোধহয় এই যে জসীমউদ্‌দীনের যাবতীয় লোকনাট্যের মধ্যে এ-নাট্যকেই যথার্থ নাটকীয় গুণের সমাবেশ বেশি পরিমাণে লক্ষ্য করা যায়। বিন্যাস চাতুর্যে নাটকের ঘটনাকে ধাপে ধাপে এগিয়ে নিয়ে গিয়ে তাকে climax-এর চড়া তারে বেঁধে, তারপর সুকৌশলে তাকে প্রসন্ন সমাপ্তির দিকে টেনে নিয়ে তিনি প্রমাণ করেছেন, নাটক সৃষ্টির চাবি-কাঠিটি তাঁর ভালোভাবেই হস্তগত হয়েছে। 'পল্লীবধূ' নাটক সৃষ্টি-কলাকৌশলগত বৈশিষ্ট্যেই অন্যান্য লোকনাট্য থেকে কিছুটা স্বতন্ত্র মর্যাদার অধিকারী হয়েছে। অন্যান্য লোকনাট্যে জসীমউদ্‌দীন মুখ্যত গ্রাম্যগানের সুরে ভর করে মাঝে মাঝে কথোপকথনের আশ্রয় নিয়ে লোকচিত্তজয়ের চেষ্টা পেয়েছেন। সেখানে তিনি গ্রাম্য নাট্যকারদেরই পথানুসারী। 'পল্লীবধূ' নাটকে পারতপক্ষে জসীমউদ্‌দীন গানের আশ্রয় নেননি। এখানে বিশেষ বিশেষ অবস্থার সাথে সঙ্গতি রেখে আঞ্চলিক ভাষায় বলিষ্ঠ সংলাপ রচনা করেই আগাগোড়া কাজ চালিয়েছেন। পল্লী-নরনারীর সুখ, দুঃখ, আনন্দ, বেদনা, ক্রোধের অনুভূতি প্রকাশে তিনি পল্লীর নিজস্ব বাক্‌ভঙ্গিটিকে বিশেষ মূল্য দিয়েছেন বলেই তা আশ্চর্যরূপে বাস্তবধর্মী ও চিত্তস্পর্শী হয়েছে। সরল মৌল আবেগের অধিকারী পল্লী-নরনারীর প্রতিটি চরিত্র স্বল্পাক্ষরে জীবন্ত হয়ে উঠেছে নাটকটিতে। দাঙ্গায় প্রবৃত্ত হতে উদ্যত দুইদল লোকের প্রাথমিক কথার লড়াইয়ের ভাষা নির্বাচনে জসীমউদ্‌দীন 'গ্রাম্য কাইজ্যর' ভাষার রূপটিকে যথাযথ গ্রহণ করায় ঐ দৃশ্যে আমরা গ্রাম্য-জীবনের সাথে প্রকৃতপক্ষে একেবারে মুখোমুখি হতে পেরেছি।। বস্তুত বাস্তব গ্রাম্যজীবনের অভিজ্ঞতার স্বাদ-সমৃদ্ধ এই 'পল্লীবধূ' নাটকটি জসীমউদ্‌দীনের একটি মৌলিক লোকনাট্য সৃষ্টি হিসেবে সমাদৃত হওয়ার দাবী রাখে।

'পল্লীবধূ' লোকনাট্যের শেষে সংযোজিত 'বদলবাঁশী' ও 'করিম খাঁর বাড়ী' শীর্ষক লোকনাট্যের লক্ষণাক্রান্ত ক্ষুদ্র একাঙ্কিকা দুটির কথা এখানেই বলে রাখা যেতে পারে। 'বদল বাঁশী' প্রেমেরই একটি সুর। সরলপ্রাণ পল্লীর ছেলে বছির ও পল্লীর মেয়ে বড়ু পরস্পরকে ভালোবেসেও পায়নি মিলনের সুযোগ। সমাজ বিধানে বড়ু বাধ্য হয়েছে পরের ঘর করতে। যদিও বছিরকে ভুলতে পারেনি সে কোনোদিন। আর বড়ুকে হারিয়ে রিক্তপ্রাণ বছির রাতভর বাঁশীর সুরে প্রাণের বেদন নিবেদন করে স্বস্তি খুঁজে ফিরেছে। অবশেষে বড়ুর দাবীতে বাঁশীটি তার হাতে তুলে দিয়ে প্রেমের ভিখারী বছির নিজেকে একেবারে নিঃস্ব করে দিয়েছে। জসীমউদ্‌দীনের রচনার মনোযোগী পাঠকই লক্ষ্য করে

থাকবেন যে 'বদল বাঁশীতে' তিনি প্রকৃতপক্ষে তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'রাখালী'র নাম কবিতার বক্তব্য ও বিষয়েরই প্রতিধ্বনি করেছেন। 'রাখালী' কবিতার প্রেমের সুরটিকেই তিনি এখানে গান ও কথোপকথনের সূত্রে লোকনাট্য হিসেবে রূপ দেওয়ার প্রয়াস পেয়েছেন। তবে এ-লোকনাট্যে বর্ণিত ঘটনায় তেমন নাটকীয়তা নেই। থাকার কথাও নয়। কারণ কবি এখানে কোনো বাস্তব ঘটনা নয়, ঘটনার শরে বিদ্ধ দুইটি কিশোর-কিশোরীর বেদনাক্লিষ্ট প্রাণের সুরটির প্রতিই মনকে নিবদ্ধ করতে চেয়েছেন। কান পেতে বুঝতে চেষ্টা করেছেন তার ভাষা। তবু প্রেমের এই সুর জীবনাশ্রিতই বটে। জসীমউদ্‌দীনের কৃতিত্ব এইখানে যে সীমাবদ্ধ সুযোগ সত্ত্বেও তিনি গ্রাম্য বাক্‌ভঙ্গি ও গ্রাম্য গানের সুর সংযোগে আলোচ্য একাঙ্কিকায় বাস্তব গ্রাম প্রতিবেশের একটা আভাস এনে দিতে পেরেছেন।

'বদল বাঁশী'র পাশে 'করিম খাঁর বাড়ী' সম্পূর্ণ বিসদৃশ সৃষ্টি। এটি নাটক নয়, একটি জীবনদৃশ্যেরই অতি সংক্ষিপ্ত নাট্যরূপ মাত্র। এতে লোকজীবনে উত্থিত একটি অনতিলক্ষ্য ক্ষুদ্র তরঙ্গেরই যেন একটি ছবি ধরা পড়েছে। একটি মহৎ জীবন ভাবনার অনুষঙ্গ নিয়ে উপস্থিত বলেই এটি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ধর্মপ্রাণ মুসলিম সমাজের সকলস্তরের মানুষের জীবনের সবচেয়ে কাম্যবস্তু হচ্ছে অন্তত একবার মক্কাশরীফে হজ্ করার সুযোগ পাওয়া। সেই সুযোগ পেয়েও কেমন করে এক গ্রামের মাতব্বর শুধু তার গরিব প্রতিবেশী করিম খাঁর দুঃস্থ পরিবারের সর্বনাশের কাহিনী শুনে হজযাত্রা বন্ধ রেখে হজের খরচের জন্যে নির্দিষ্ট টাকা দিয়ে সেই দুঃখী পরিবারের দুঃখ মোচনে ব্রতী হলেন, তারই কাহিনী অত্যন্ত দরদ দিয়ে জসীমউদ্‌দীন তুলে ধরেছেন আলোচ্য নাট্যকণিকাটিতে। ক্ষুদ্রপরিসরে স্বল্পাক্ষরে গ্রাম্য মাতব্বর, মৌলবী সাহেব ও করিম খাঁর মেয়ে এই তিনটি চরিত্রকে ফুটিয়ে তুলেছেন জসীমউদ্‌দীন সহজ নৈপুণ্যে; মূর্ত করে তুলেছেন একটি গ্রাম্য আবহ। দৃশ্যটি রূপায়নে জসীমউদ্‌দীন 'মধুমালা' লোকনাট্যের ন্যায় এখানেও আঞ্চলিক ভাষাভঙ্গির আশ্রয় না নিয়ে কলকাতার কথ্যভাষা প্রয়োগ করেছেন। লোকনাট্যের মূলগত বৈশিষ্ট্য এতে যে ক্ষুণ্ণ হয়েছে তা অস্বীকার করার উপায় নেই। তবে লোক-জীবনের পটেই যে এ-নাট্যদৃশ্যের অবতারণা করা হয়েছে তা আমাদের বুঝতে অসুবিধা হয় না।

পূর্ণাঙ্গ লোকনাট্য সৃষ্টির সর্বশেষ প্রয়াস হিসেবে গণ্য হবে জসীমউদ্‌দীনের

'গ্রামের মায়া' নামক নাটকটি। সাহিত্য-সৃষ্টির কোনো তাগিদ থেকে এটি সৃষ্টি হয়নি ; সৃষ্টি হয়েছে বিশেষ একটি রাজনৈতিক আদর্শের প্রচার কার্যের বাহন হিসেবে। আইয়ুব খান প্রবর্তিত মৌলিক গণতন্ত্র ব্যবস্থার লোক-কল্যাণকর দিকটিকে ফুটিয়ে তোলার প্রয়াস পেয়েছেন কবি এই নাটকে। দেশের সৎ ও কর্মী যুবকদের তিনি আহ্বান জানিয়েছেন দেশগঠনের কাজে এগিয়ে আসতে। দেশ থেকে সকল দুর্নীতি, চোরাবাজারা, কালোবাজারীর পাপ উচ্ছেদ করতে এগিয়ে আসে গ্রামের ছেলে নইম, গ্রামের কবিয়াল হানিফ ও তার সঙ্গীরা। তাদের সাথে হাত মিলায় শহরের ছেলে আসলাম ও তার বোন রাজিয়া। তাদের আন্দোলনে বিপদাপন্ন বোধ করে চোরা-কারবারী আরজান, পাচারকারী আসাদ প্রভৃতি সমাজের দুশমনরা আর তাদেরই তল্পিবাহক গ্রাম্য মৌলবী কলিমউদ্দীন। তারা চক্রান্তে মেতে ওঠে এদের জব্দ করার জন্যে। কিন্তু পারে না। মৌলিক গণতন্ত্রের নির্বাচন উপলক্ষ করে ম্যাজিস্ট্রেট আসেন গ্রামে, গণতন্ত্রের আদর্শ ব্যাখ্যা করতে। আরজান, আরশাদ গ্রামবাসীদের প্রতিনিধি সেজে তাঁকে অভ্যর্থনা জানায় এবং ঐ সভায় আসলাম; দুর্নীতির বিরুদ্ধে জনসাধারণকে রুখে দাঁড়ানোর আহ্বান জানালে, আরজান মুখোস খুলে পড়ার ভয়ে নইম ও আসলামের মতো যুবকদের নিন্দা করে এবং বিদেশীর দালাল বলে তাদের আখ্যা দেয়। কিন্তু তার অপচেষ্টা ব্যর্থ হয়। অতঃপর সুযোগ বুঝে হানিফ বয়াতি সেই আসরেই কাবগান বেঁধে চোরাকারবারী আরজান ও আরশাদের কীর্তি ফাঁস করে দেয়। ফলে আরজানও আরসাদ ধরা পড়ে, এবং তল্পীবাহক মৌলবী কলিমউদ্দীন সহ সাজা পায়। এই হচ্ছে মোটামুটি নাটকটির বিষয়বস্তু।

নাটকটির পরিকল্পনায় মালদহ অঞ্চলে প্রচলিত 'আলকাফ' লোকনাট্যের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। 'আলকাফ' নাটকের ন্যায় কতকগুলো সামাজিক সমস্যার কুফলের কথা এ-নাটকেও তুলে ধরা হয়েছে। বয়াতির গানের সুরে তার তাৎপর্য অনায়াসেই সঞ্চারিত হয়ে গিয়েছে লোকমানসে। সংলাপের ভাষায় আঞ্চলিকতার স্বীকৃতি নাটকটিকে লোকজীবন-ঘনিষ্ঠ রচনা করে তুলেছে তাতেও সন্দেহ নেই। তবে কবি এই নাটকটিকে নিছক প্রচারকার্যের একটি হাতিয়ার করে গড়ে তোলার সজ্ঞান প্রচেষ্টায় এর শিল্প-মূল্য অনেক পরিমাণেই নষ্ট করে ফেলেছেন। নাটকে বর্ণিত কোনো কোনো চরিত্রে একটু প্রাণের আভাস এলেও অধিকাংশ চরিত্রই হয়ে দাঁড়িয়েছে যান্ত্রিক, টাইপ ধরনের। মোট কথা

নাট্যসৃষ্টি হিসেবে 'গ্রামের মায়া' নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর সৃষ্টি বলেই মনে হবে।

'গ্রামের মায়া'র পরেও জসীমউদ্‌দীনের আর একটি নাটক প্রকাশিত হয়েছে। এটির নাম 'ওগো পুষ্পধনু'। এটি কাব্য-সংলাপে গ্রথিত একটি প্রেমের আখ্যায়িকা মাত্র। 'পুষ্পধনু'র বিচিত্র আকর্ষণে হৃদয়ে প্রেমের যে-তরঙ্গ দোলা উঠে নরনারীকে কিভাবে বিড়ম্বিত করে এই সংসারে, সে-বিড়ম্বনা থেকে মুক্তির পথই বা কি তারই ইঙ্গিত দিয়ে কবি এই নাটকটি রচনা করেছেন। লোকনাট্যের সামান্য লক্ষণগুলোও এতে উপস্থিত নয়। কিন্তু এই নাট্যগ্রন্থের শেষে সংযোজিত 'জীবনের পণ্য' ও 'গাজনচরের কাইজ্যা' নামক ক্ষুদ্র একাঙ্কিকাদ্বয় নিঃসন্দেহে লোকনাট্য-লক্ষণাক্রান্ত। প্রথমটিতে তথাকথিত ভদ্র ও বিত্তবান সমাজের মানুষের হৃদয়হীনতার পটভূমিতে গ্রাম্য সরল, দরিদ্র মানুষের আর্ত অসহায়তার ছবিটিই ফুটে উঠেছে। রুগ্ন ছেলের ঔষধ জোটাতে পারেনি দরিদ্র পিতা। তার শেষ সম্বল দিয়ে সে ডাক্তারকে বাড়িতে আনার চেষ্টা পেয়েছে। তবু হৃদয়হীন ডাক্তার সময়মতো আসেনি। ফলে প্রকৃতপক্ষে বিনা চিকিৎসায় ছেলেটি তার মারা গেল। এই মর্মান্তিক জীবনদৃশ্যের অভিনয় পল্লীর ঘরে ঘরে কতই না চলছে। জীবন এখানে বাজারের পণ্যে পরিণত হয়েছে। শুধু অর্থমূল্যেই চলছে তার বেচাকেনা। এই অতি নির্মম সমাজ সত্যটিই লেখক এখানে তুলে ধরেছেন। বিষয়ের সার্বজনীন সামাজিক আবেদন একাঙ্কিকাটিকে লোকনাট্যের গণ্ডী থেকে একটু দূরেই সরিয়ে এনেছে। তবু এতে আমাদের দেশের লোকজীবন-বাস্তবই মর্যাদা পেয়েছে স্বীকার করতে হয়। দ্বিতীয় একাঙ্কিকা 'গাজন চরের কাইজ্যা' 'নক্‌সী কাঁথার মাঠ' কাব্যের চরের জমির ফসল-কাটা নিয়ে দাঙ্গার দৃশ্য অবলম্বনে রচিত হয়েছে। নায়ক রূপা, নায়িকা সাজু ছাড়াও অনেক ক্ষুদ্র চরিত্র এতে ভিড় করেছে। গ্রাম্য বাক্‌ভঙ্গি সর্বত্র অনুসৃত হওয়ায় লোকনাট্যের স্বভাবটি এতে বেশি করে ধরা পড়েছে। 'গ্রাম্য কাইজ্যা' ঝগড়া-ফ্যাসাদের ভাষা দাঙ্গারত দুইপক্ষের মুখে অপূর্ব স্ফূর্তি লাভ করেছে। গ্রাম্য মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষা স্বপ্ন, তাদের প্রাত্যহিক জীবনধারা, সহজ জীবন-প্রীতি, গ্রাম্য রসিকতা সব কিছু নিয়ে ক্ষুদ্র পরিসর একাঙ্কিকাটি লোকজীবনের একটি উজ্জ্বল আলেখ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।

জসীমউদ্‌দীনের লোকনাট্য সাধনা আপাতত এখানেই এসে থেমেছে। অতঃপর জসীমউদ্‌দীন এ-পথে আর এগোবেন কিনা জানি না। তবে লোকনাট্যের নতুন ধারাশ্রয়ে লোকজীবনকে নিবিড়তর করে জানা, চেনা ও বোঝার যে চেষ্টা তিনি করেছেন তা যে বহুল পরিমাণেই সার্থক হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। তাঁর কাব্যের ন্যায় তাঁর লোকনাট্যগুলোর জনপ্রিয়তা এই সত্যেরই ইঙ্গিত দেয়।

আমাদের আশা, গণপ্রজাতান্ত্রিক বাঙলাদেশে তাঁর লোকনাট্য রচনা নতুন রূপ গ্রহণ করবে, দিশারী হবে নবজাগরণের, নতুন দিগন্ত উন্মোচন করার কাজে।

মুক্তিফৌজ

নিখিলরঞ্জন গুহ

ফতেমা বয়স ৩০ বছর	আমিনা বয়স ২০ বছর	হাসান বয়স ১৬ বছর
আসগর বয়স ১ বছর	বসির বয়স ২২ বছর	পীর ফৈজুদ্দীন বয়স ৫০ বছর
ছবেদ বয়স ৪০ বছর	সাইফুল বয়স ২৮ বছর	৩ জন পাকসেনা

দিনটা দুপুর পেরিয়ে এসেছে

গাঁয়ের শেষে ছবেদের কুঁড়ে। আম-জাম গাছে ঘেরা কয়েক কাঠা নিয়ে বাড়িখানা, পিছন দিয়ে চলে গেছে পায়েচলা কাঁচা রাস্তা। রাস্তাটা উঁচু। রাস্তাটা একদিকে গাঁয়ের ভেতরে প্রবেশ করেছে, অন্যদিকে চলে গেছে গঞ্জের দিকে বেঁকে।

ঘরের মধ্য থেকে ছবেদের বৌ ফতেমার গলা শোনা যায়। ফতেমা ওর রোগকাতর শিশুপুত্র আসগরকে সুর করে ছড়া বলে শান্ত করছে, ঘুম পাড়াচ্ছে।

ও-সোনা কান্দে না ঘুমা ঘুমা! ও-সোনা ঘুমায়। সোনা ঘুমাল পাড়া জুড়াল/ বর্গী এলো দেশে/বুলবুলিতে ধান খেয়েছে/খাজনা দিমু কিসে/ও সোনা ঘুমায়।

ছবেদ আসে। বিশেষ চিন্তিত! ছবেদের বয়স ৪০। পরিশ্রমী শরীর। ঘরের দিকে তাকায়। ফতেমা তখনও ছড়া বলে চলেছে···

আয় ঘুম আয়/সোনার চোখে বস/আয় ঘুম আয়···সোনা ঘুমাল পাড়া জুড়াল···ইত্যাদি॥

ছবেদ ফতেমাকে ডাকতে যেয়ে ডাকে না। উঁচু দাওয়ায় উঠে বসে—একটা খুঁটিতে হেলান দিয়ে কাঁধের গামছা দিয়ে মুখ মোছে।

ফতেমা ছেলেকে ঘুম পাড়িয়ে ঘর থেকে বেরোয়। ওর বয়স ৩০। শক্ত গড়ন। মুখে গ্রাম্য কমনীয়তা কিন্তু গলার স্বরে দারিদ্র্যে দারুণ অভিজ্ঞতার রূঢ়তা।

ফতেমা। এত সকাল সকাল ফেরলা! হাট বাজার কৈ? কি আনলা?

ছবেদ। বরিশালে বোমা পড়ছে!

ফতেমা। নতুন কতাতো শুনি না।—ঢাকা গেছে বরিশালও যাইবে। হেই

বোমায় শ্যাষ অইয়া যাওনের আগ অবধিতো প্যাডে দেওন বন্ধ করন যায় না। প্যাড তো অন্য কতা শোনে না দেহি।

ছবেদ। হ'ছ, এবার হেই পছন্দ মতোই এ-হিয়া-খাঁ শুনাইয়া দেবে! দেরি নাই। আমাগো গেরামেও আইলে বুইল্যো। হগোল দিক ধসায়াই আনছে। আর বুঝি ঠেহাইতে পারলে না। ঝালোকাডি উড়াইয়া দেহে—

ফতেমা। আইজগো খাইতে অইবে নাকি? হেয়াও—

ছবেদ। আমার আর খাওনের ইচ্ছা নাই!

ফতেমা। তোমার খাওনের ইচ্ছা নাই। পোলা লইয়া আমার খাওন মাতায় ওড্‌ছে। কিন্তু ওর কি করুম। তিন দিন ধইর‍্যা জর। ওষুধপত্তর তো বাদ। শ্যাষে, দরগাবাড়ি গেছালাম।—পীর সাহেব কইলে— "আব-ই-হায়াত্" দেলাম, এই এক ফোডা খাওয়াইয়া দেও, পোলা তোমার ভালো আইয়া যাইবে—হেই পানি কয় ফোডা লইয়া আইছি।

ছবেদ। হ' পানি পড়াটরাই খাওয়াও। আমাগো পোলাপানের ভাইগ্যে ওষুধ—

ফতেমা। তারপর যে হারাদিনে পত কইতে তো কিছু দেওন যায় নাই। এডাও মরবে। এয়া বাঁচামু কেমনে?

ছবেদ। ঐ সব কু কথা থামাবি?

ফতেমা। কই কি সাধে! এক রতি পোলা হারাদিনে প্যাডে কিছু না পড়লে কেমনে বাঁচে?

ছবেদ। কিয়া? হে-দিন মাইড্ডা আলু উডাইয়া রাখছিলাম না? হেইয়া সেদ্দ কইর‍্যা দেলেতো পারতি। রল্লি গোলার তাইল্যা ভাল জিনিস!—

ফতেমা। ওস্যুইক্যা পোলারে মাইড্ডা আলু খাওয়ামু কিয়া? আর বাপটাতো এহোনো হাইড্ডা চইল্যা বেড়ায়। তুমি মানুষ না আর কিছু?

ছবেদ। হেইডাই তো চিন্তা করতে আছি কেবল!

ফতেমা। কিয়া? চাইর পয়সার বাল্লি আনতে পাল্লানা?

ছবেদ। পয়সা যে ছিল না।

ফতেমা। কিয়া? বিড়ি বেচা পয়সা কি করছ? হাডতো কিছু কর নাই। দুই দিনের বান্দা বিড়ি।—

ছবেদ। বিড়ি তো বেচি নাই!

ফতেমা। তয়?

ছবেদ। মুক্তি ফৌজগো দিয়া দিছি। হগোলডি যে যা পারে, হেগো দেতে আছে। আমি আর কি দিমু? কি দেবার ই বা আছে? বিড়ি কয়ডা দিয়া দেলাম। আর কইছি আমার গতর আছে।—

ফতেমা। (তীব্র স্বরে) তোমার আক্কেল দেইখ্যা, আমার মাতা কুইড্ডা মরতে ইচ্ছা করতাছে। দুধের পোলা অসুখে মরে, আর তুমি দ্যাশসেবা করতে লাগছ? তোমার জান কি পদাথে গড়া?

ছবেদ। শোন্, ফতেমা! হে ভাবনা আমার আছে। কিন্তু বোঝ? অবস্থাডা কি? আমরা কেউই কইতে পারি না, কেডা কতক্ষণ আছি। তমও হগোলডি মিইল্যা শত্তুরের মোকাবিলা করতে আমাগো সব সহায় সম্বল লইয়া না পড়লে—

ফতেমা। তোমার দুই হাজার বিড়িতে সব মোকাবিলা অইয়া যাইবে?

ছবেদ। হেয়া অইবে কিয়া? গঞ্জে একটা জমায়েতে একটা ব্যবস্তা নেওনের কতা অইছে। হেই ব্যবস্তা জোরদার করতে হগোলডিরেই মদত্ করতে আইবে। হেই কতায়—

ফতেমা। হেই কতায় তোমার বিড়ি কয়ডা দিয়া দেলা?

ছবেদ। হ' আমার পয়সা কইতে ঐয়াই সম্বল!

ফতেলা। মেয়া, তোমারে আমি চিনি না কইতে চাও?

ছবেদ। হেয়া, কই কেমনে? তুই যে আমার—

(হাল্কাস্বরে, পরিবেশটা সহজ করায় চেষ্টা করে। কিন্তু ফতেমা আরও কঠিন হয়)

ফতেমা। বিড়ির পয়সা হাচা কও, মিয়া, কি কইর‍্যা আইছো?

ছবেদ। (বিচলিত) হাচা কই! (কাছে যায়) এই দ্যাখ গোন্দো দ্যাখ (ফতেমার মুখের কাছে হা-হা করে মুখ ব্যাদান করে) ও সব আমি খাই নাই! হেয়াতো ছাইড়্যা দিছি। ও সব খাওনের মোন আর আমার নাই। ও বিড়ি আমি হাচাই-ও-ই কমিটিতে জোমা দিছি।

ফতেমা। ওগো দিয়া তোমার কি উপকারডা অইবে—ওয়া সব বড় মাইনষের ব্যাপার? গরিব গো মরণতো চিরকাল। বোমায় মর, বন্দুকে মর, হে নয় না খাইয়া মর।

ছবেদ। না, শোন ফতেমা! এ ব্যাপারডা হে রহম না।—

ফতেমা। আমি হগোল বুজি! তোমারে বোকা বুঝাইছে। আইজ আমার

ওস্থইক্যা পোলা—

ছবেদ। তোর পোলা—আমার আসগর, আইজ যদি হগোলডি এই বে-ইজ্জতের মরণ মরি? বোঝ, আসগর বাঁচবে! আসগররে বাঁচাইতে চাই-বেশি কইর‍্যা চাই দেইখ্যাই তো—

ফতেমা। গরিবগো কতা কেও ভাবে না—ভাবে নাই এডা বোঝ?

ছবেদ। অন্য মাইন্‌ষে আমাগো কতা ভাববে কিয়া! যে য্যার নিজের কতাডাই আগে ভাবে—হেয়া আমি বুঝি না?

ফতেমা। তয়?

ছবেদ। হেইতো? আমার ভাবনাডা—আমার আসগরের ভাবনা আমারই ভাবতে অইতাছে।

ফতেমা। চুপ করো মেয়া! তোমার মিডা কতা আমার সহ্য অয় না। আসগরের লইগ্যা তোমার ভাবনার অন্ত নাই—হেই তুমি এক ফোডা ওষুধ কি পত্তের ব্যবস্তা অবধি করলা না। তোমার লজ্জা করে না?—তুমি বাপ অইয়া—

ছবেদ। লাভ কি অইবে! আইজ পশ্চিমা ডাক্কাইতরা আমার ঘরে আমাগো পুইড়্যা থুইয়া যাইবে। আমরা—

ফতেমা। কি করবা তোমরা? কি করতে পার তোমরা? যে মরদ অইছ, বৌ-পোলারে দুইডা খাইতে দেতে পারো না।

ছবেদ। বোঝ ফতেমা! এই ডাও হেই এক যুদ্ধ। আমাগো মুক্তিযুদ্ধ।

ফতেমা। বড় বড় কতা ছাড়! ঐ হাকড়ান থামাও মেয়া প্যাডে নেশা পড়লে তোমার বড় কতা বাইড়্যা যায়—

ছবেদ। গ্যাখ ফতেমা, তুই এহোলো আমারে বিশ্বাস কর নাই?—কসম।

ফতেমা। তোমারে যে আমি চিনছি!—হাড়ে হাড়ে চিনছি।

ছবেদ। আমি কইতাছি—চেনো নাই। আমরা যা ব্যবস্তা করছি ঐ খান হালারা এগেরামে ঢুইক্যা একটাও য্যাতে বাইরাইয়া না যাইতে পারে হেই ব্যবস্তা—

ফতেমা। আমি বুজছি। তুমি আইজ পুরা মাত্রায়—

ছবেদ। ফতেমা!

তেমা। মেয়া দেহি দিল্লীর খাঁ আইছে! মরদ? তোমরা ঐ মিলিটারী সৈন্যের লগে যুদ্ধ করবা—হে বীরত্ব আইলে কইথ্যা? নিজের আবাস্ত

জমি যখন পশ্চিমা শেখরা আইয়া জোর কইর‍্যা দখল লইলে, হে সোমায় এত বীরত্ব কৈ আছেলে? এ হোন প্যাডের দুইডা ক্ষুদ জোড়াইতে পারো না—

ছবেদ। হেইতো, কইলাম, ঐ হালার পশ্চিমা ব্যবসাইত্‌রাই আইজ আমাগো শত্রু! ওগো চক্রান্তেই এই কুলমলুক নাস্তানাবুদ অইয়া যাইতাছে—হালারা জালিমের গুষ্টি, সীমারের বংশধর। আমাগো বুকের উপর চাইপ্যা বইয়া আমাগো কইলজা উপরাইতাছে। হেইতো আমাগো মুক্তি ফৌজগো হাত শক্ত করতে অইবে—যাতে মুক্তিফৌজরা ঐ ব্যবসাইত্‌গো কল্লা চিরকালের মত গুড়াইয়া দেতে পারে। বোঝ না, এ-হিয়া-খাঁ হাজার মাইল দূরে বইয়া গঞ্জের ইস্‌কান্দারের কাছ থিকা খবর লয়। হালায় কাইল রাত্তিরে পালাইছে—।

ফতেমা। যে-য়াই-কও। ঐ মুক্তি ফৌজরা যেহানে থাকবে, হেই জায়গায়ই ঐ খান সৈন্যরা হানা দেবে। এডাতো একদম সত্য কতা।

ছবেদ। একতা তোরে কেডা কইছে?

ফতেমা। শুনিনা কিছু? বুজিনা? পীর সাহেব সত্য কতাডাই কইলে। আমাগো জেলায় তো কৈ আগে সৈন্যরা আয় নাই? ঐ মুক্তি ফৌজরাই নাকি আমাগো সব এলাকায় থানা গারতে আছে। মুক্তি ফৌজের কোনো মানুষ ছাখলে খবরডা পৌছাইয়া দেতে কইছে।

ছবেদ। পীরসাহেব ফৈজুদ্দিন যহন কইছে কামডা আরম্ভ করনা কিয়া?

ফতেমা। হে মুর্শিদ মনিষ্যি। বে-বুজের মততো কতা কয় না।

ছবেদ। বুজ্‌জি। পানি পড়া আনোনের কালে এই সব কতা শুইন্না আইছো। পানিতে মোস্তের পড়নের কালে কানেও মোন্তর পইড়্যা দেছে। মুর্শিদ মানুষ, হাদিনের পয়গম্বর, হ্যার কতা মিথ্যা অয় ক্যামনে!

ফতেমা। হ' ঠিকই তো? যুক্তির কতাই তো কইছে। তোমারে এহোন কই মিয়া ঐসব মুক্তি ফৌজের ধারে কাছে আর যাইয়া কাম নাই। আমাগো গরিবগো কেও দেখতে আইবেনা।

ছবেদ। আমার কতাও ফৈজুদ্দিনেরে কইয়া আইছো নাকি?

ফতেমা। আগে জানলে তোমারেও অপকর্ম করতে দেতাম আর কি! তোমার বুদ্ধিসুদ্দিতো আমার জানা।

ছবেদ। কি করতা ?

(প্রশ্নে ফতেমা আশ্চর্য হয়ে ছবেদের দিকে তাকায়। ফতেমা স্বামীর দৃঢ়স্বরে আশ্চর্য হয়)

ফতেমা। মানা করতাম।

ছবেদ। মানা শোনতাম না !

ফতেমা। মেয়া ! তোমার রকমডা কি ? তোমার মাতায় কি একটু বুদ্ধিও নাই ? তোমার বৌ আছে পোলা আছে—তোমার সংসার আছে !

ছবেদ। অনেক হাজার হাজার মানুষ বে-দিশা মরতাছে। কারো বৌ, কারো মা, কারো সোয়ামী, কারো সোমোত্ত মাইয়া সব মরতাছে, বে-ইজ্জত্ অইতাছে। বুড়া যুবা, বাচ্চা কেওর রক্ষা নাই অই রাইফেলের হাত থিকা। হগোলডিরই সংসার আছে ঘর আছে, বাঁচোনের ইচ্ছা আছে—কেও রেহাই পাইতাছেনে !

ফতেমা। এয়াতো রায়োট। যত হিন্দুরাই নষ্টের গোড়া। হিন্দুস্তান নাকি আমাগো পাকিস্তান দখল লইতে চায়।

ছবেদ। কায়দে আজমের বংশধর হেয়াও তোরে বুঝাইয়া দেছে ফতেমা—

ফতেমা। নয়তো আমাগো পাকিস্তানে দুঃখডা কি ?

ছবেদ। দুঃখডা এই ফতেমা, পশ্চিম দ্যাশের ব্যবসাইত্রা আইয়া আমাগো আবাদী জমি দখল লইছে জোর কইর‍্যা। আমাগো পক্ষে কোন সরকার নাই ! আমি বিড়ি বান্দি দুই দিন বইয়া। হেয়া বেইচ্চা আমার একদিনের একবেলার এক প্যাডর খোরাকীডাও ওডেনা। কারণ, গঞ্জের বড় ব্যাপারি ইসকান্দার খান গঞ্জে মিটিং কইর‍্যা দাম কোমাইয়া দেছে। হগোলডি হ্যার কতা মাইন্যা লইছে।

ফতেমা। আমারওতো হেই কতা। গরিব গো মরণ সব সোমায়। গরিব গো কেও দেহে না। হে-ই, আইজ এই হিন্দুস্তানের উস্‌কানীতে এই রায়োটে আমাগো কাম কি ? হিন্দুরাইতো নাকি সব খবর দিয়া এই সব করায়। হেয়র পিছনে ঐ কাফের মুক্তি ফৌজরা—

ছবেদ। হ' এ-হিয়া-খান পয়গম্বর ! মোছলমান উদ্ধারে, বাঙলাদেশের গাঙের পানির রং পাল্টাইতে শুরু করছে। হেইতো কীর্তিপাশার মসজিদে শুক্কুর বারের নামাজে জমায়েত পাঁচশো মোছলমানেরে এক লগে খুন করছে।—হেগো বেইশ্‌তে পডাইয়া দেছে।

(এমন সময় ছেলেটা ঘরে কেঁদে ওঠে। ফতেমা ছুটে যায়)

ফতেমা। ওই আবার উডছে! কি করুম। চোখের সামনে এয়া দেহি কি কইর‍্যা। (ঘরের মধ্যে ছুটে যায়)

(ছবেদ বড় অসহায় করুণভাবে তাকায় ঘরের দিকে)

ছবেদ। এয়া বাঁচবে কি কইর‍্যা! কত মায়ের পোলা বুকের উপর রাইখ্যা বলি দেছে।

(ঘরের মধ্যে ফতেমা ছেলেকে শান্ত করছে। প্রবেশ করে একটি যুবতি মেয়ে খুব ব্যস্ত। ওর বয়স ২০, সম্ভ্রান্ত পরিচ্ছদ ও অবয়ব। নাম আমিনা)

(ছবেদ ওকে দেখে আশ্চর্য হয়)

আমিনা। ভাই সাব।

ছবেদ। কি খবর দিদি? তুমি কই যাও?

আমিনা। খবর দিতে বেড়িয়েছি।

ছবেদ। তুমি একলা?

আমিনা। কমরেডরা সাথে আছে।

ছবেদ। কি খবর আনলা?

আমিনা। হাতিয়ার হাতের কাছে যা পাও নিয়ে তৈয়ার থাকো! সময় মতো দুটো ফাঁকা আওয়াজ হবে। শব্দ পেলেই ভাবীকে আন্দির দিকে জংগলের পথে পাঠাবে। ওখানটায় আমাদের রুখতে সুবিধা হবে।

ছবেদ। ব্যাপার?

আমিনা। খবর এলো গঞ্জেও খান সেনাদের 'বোট' ভিরছে। সাবধান থেকো ওরা যে কোনো সময় গাঁয়ে হানা দিতে পারে!

ছবেদ। তোমরা এ সোমায় ঘাটি ছাইর‍্যা?

আমিনা। মানুষগুলোকে একটা খবর দিয়ে অন্ততঃ একটা চেষ্টা করার সুযোগ করে দিতে হয়।

ছবেদ। কিন্তু চরের অভাব নাই! তোমাগো কেও আইতে দেইখ্যা……

আমিনা। (মৃদু হেসে) স্বাভাবিক! চলি—

(ছবেদ ওর চলে যাওয়ার দিকে সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে! ইতিমধ্যে ছেলেকে কোলে করে ফতেমা দোরের কাছে মূক বিস্ময়ে দাঁড়িয়ে।—ও সব ব্যাপারটা লক্ষ্য করছিল)

ফতেমা। কাদের সাহেবের মাইয়া শিক্ষিত অইয়া ?

ছবেদ। এইতো তোমার মুক্তিফৌজ। আমাগো মতো গরিবের লইগা এই বিপদ মাতায় লইয়াও বাইর অইছে সাবধান করতে—

ফতেমা। এহোন কি অইবে।

ছবেদ। যাও না! পীর সাহেবেরে খবর ডা দিয়া আও না!

ফতেমা। হে সৈন্যরা আমাগো .....

ছবেদ। না মোছোলমানগোতো কিছু কইবে না।

ফতেমা। মেয়া! এ অবস্তায় কি করুম। আসগরের গা ভরা জ্বর।

ছবেদ। ঐ যা কইলে আন্দির দিকে পা বাড়া।

ফতেমা। ঘর ছাইড়্যা।

ছবেদ। এ হোন তো যাবি আন্দির জংগল অবদি এর পর জ্যাতা থাকলে—ও পারে···

ফতেমা। কোন যায়গায় কি যামু ?

ছবেদ। লোক পাবিহানে। চিন্তা নাই। হগোলডিই ঐ এক পারই তো যাইবে। যা পা বাড়া পোলা বাঁচাইতে অইলে ঐ মুক্তিফৌজ-গো এলাকায় যাইতে অইবে।

ফতেমা। তুমি ? তুমি কি করবা ?

ছবেদ। (মাচায় গোজা কয়েকটা তীর ও ধনুক বের করে) এই পাতি শিয়াল মারা বিষ তীর লইয়া তৈয়ার থাকতে অয় ?

ফতেমা। তুমি ? ঐ বিষ তীর দিয়া কামান বন্দুকের লগে যুদ্ধ করবা! মেয়া! তোমার মাতা হাচাই-ও-ই খারাপ অইছে।

ছবেদ। মাতা আমার খুব ঠিক আছেরে বিবি জান! আমি যে মুক্তিফৌজের দলে নাম লেহাইছি। আমাগো এই রহম ভাবেই যুদ্ধ করতে অইবে। দামী অস্ত্র বেশি কই পামু। দেশি বুদ্ধিতেই লড়তে অইবে।

ফতেমা। তুমি মুক্তিফৌজ!

ছবেদ। হ জানের দায়ে! নিজেগো জান বাঁচাইতে নিজেরই যুদ্ধ করতে অবেই···। (ঘুমন্ত আসগরের দিকে চোখ পড়ে···কাছে যায়) আমার আসগর যদি বাঁচে ও, ও মুক্তিফৌজ অইবে।

ফতেমা। আসগর ? মুক্তিফৌজ অইয়া গরিবগো লাভ কি ? অইতো বড়লোকের পোলা মাইয়ারাই তো বুদ্ধি দিয়া চালায়।

ছবেদ। বুঝলি না? গরিবরা বেশি কইর‍্যা মুক্তিফৌজে যোগ দিলেই তো গরিব গো বুদ্ধিতে চলবে সব। হেবার তো হেই ভুল ডাই অইছে। আমরা গরিবরা হেগো গলায় চিল্লাইছি। ইস্‌লাম বাঁচলে, মোছলমান বাঁচবে। ইস্‌লাম বাঁচাইতে হেই হিন্দু তাড়াও। আলাদা কইর‍্যা পাকিস্তান কর। মোছলমানরা হগোল উ‌জিরী আজম অইয়া যাইবে। অইল পাকিস্তান। কায়দে আজম কায়দা কইর‍্যা গদীআসীন অইলেন। সম্পত্তিবান বাঘেরা, পশ্চিমের ব্যবসাইত্‌রা থাবা গাইড়্যা বইলে হ্যাশের মাভিতে। হ্যাশের আবাদে তাগো অধিকার। হে সোমায় বুঝি নাই! জাত বিচারে ভুল করছি। আসল সে জাত দুইডা, বড়লোক আর গরিব। সম্পত্তিবান আর আমার মত ছবেদ আলি— দিন রোজগারুইয়া মানুষ।

ফতেমা। (আশ্চর্য) ও-মেয়া! তোমার অইছে কি? তুমি তো দেহি আর আগের হে-ই মানুষ নাই!

ছবেদ। নাইতো! সার বুজ বুজ্‌জি! হেবার হেই পশ্চিমা-ব্যবসাইতগো স্বার্থেই পাকিস্তান অইছে। এই কয় বছরে ওরা হ্যাশের হগোল সুখ-সম্পত্তি কব্জা করছে। আমাগো বানাইছে ওগো হালের গরু— মুহে "ঠুই" দেওয়া। হেইতো, এ যুদ্ধতায় আমাগো বেশি কইর‍্যা সামিল অইতে অইবে। এডা আমাগো স্বাধীনতার যুদ্ধ।

(এমন সময় নেপথ্যে প্রচণ্ড কোলাহল ওঠে। চিৎকার করে ছেলেটা কেঁদে ওঠে)

ছবেদ। ওর, মুখ বন্দ কর! ঘরে যা!

(কোলাহল গুলির শব্দ। নারীকণ্ঠের চিৎকার ইতস্ততঃ কোলাহল……এলোমেলো গুলির শব্দ। ফতেমা-দৌড়ে ঘরে প্রবেশ করে ছেলেকে নিয়ে। ছবেদ—একটা উঁচু যায়গায় উঠে গণ্ডগোল লক্ষ্য করে। নেপথ্যে অট্টহাসি। আমিনার আর্তচিৎকার। ফতেমা ঘরের মধ্য থেকে চিৎকার করে—কি অইলে!)

ছবেদ। সব্বনাশ!…আহারে…দিদিরে কি ভাবে ধইর‍্যা লইয়া যাইতাছে।…

(নেপথ্যে ফতেমা) কারা?

ছবেদ। হানাদার!

(নেপথ্যে ফতেমা) মুক্তিফৌজ?

ছবেদ। ফতেমা আন্দির দিকে পা চালা! আমি গেলাম!—ওহানে মুক্তি ফৌজরা সব ব্যবস্থা করবে! (যেতে উদ্যত)

নেপথ্যে ফতেমা। (দোরের কাছে) কৈ যাও? পাগল অইলা নাকি মেয়া?

ছবেদ। (যেতে যেতে) ফতেমা সাবধান। আসগররে লইয়া পালা। খান সৈন্য আইয়া গেছে। আহারে দিদিরে লইয়া সব্বনাশ করলেতো।

(ছুটে বেরিয়ে যায়)

ফতেমা। (এক লহমা বাইরে বেরিয়ে আসে। বুকের মধ্যে ছেলে)

ও মেয়া কৈ যাও? আমি কি করুম হা আল্লা! তুমি বাঁচাও! ছবেদ মেয়া ভাল মানুষ। ওর কোন দোষ নাই।

(পাকসেনার অট্টহাসি—আমিনার আত্মরক্ষার আর্ত চিৎকার কানে আসে। দিশাহারা ভয়ে ফতেমা ছেলেকে নিয়ে ঘরের মধ্যে লুকোয়)

নেপথ্যে পাকসেনার সচিৎকার কণ্ঠ

: হেঃ হাব্র্‌--হে-এ-এ

এক ফাঁকে একবার ছাড়া পেয়ে আমিনা ছুটে পালাতে চায়—।

(মঞ্চের দিকে আসে—প্রবেশ)

সৈন্যটি চিৎকার করে এসে রাক্ষসের মতো আমিনার চুলের মুঠি ধরে। ···আমিনা আর্তচিৎকার করে—

সৈন্য। আঃ-হাঃ কৈকো শাফারেত্‌ নেহি। আও মেরে প্যারী আসেফ—বাঙালকী লেড়কী—হে—বহুত্‌ সুরত্‌ জামাল দিল গুজার দেও হাঃ-হাঃ-হা···।

(আমিনা ছাড়া পেতে ছট্‌ফট করে। লোলুপ অট্টহাস্যে দিক কাঁপিয়ে তোলে পাকসেনা।)

আমিনা। কমজাত্‌! গিদ্ধড়!

সৈন্য। খামোশ! সালে লেড়কী।

আমিনা। আঃ রক্ষা কর! কে—আছ!

(আমিনার আর্ত অর্ধস্ফুট আর্তনাদ, সাথে সাথে ঘরের মধ্য থেকে—ফতেমার কণ্ঠ থেকে আর্তনাদ নির্গত হয়। সৈন্যটি মুখ তুলতে একটা তীর এসে ওর শরীরে বিদ্ধ হয়। এই সুযোগে আমিনা নিজেকে সৈন্যের হাত থেকে মুক্ত করে—নিজেকে ছাড়াতে গিয়ে ছিট্‌কে পড়ে কুটীরের সিঁড়ির কাছে। তীর বিদ্ধ সৈনিক, ঘুরে দাঁড়ায় যেদিক দিয়ে

তীর এসেছিল সেদিকে ওর হাতের স্টেন উদ্যত করে চিৎকার করে। গুলি করতে করতে ছোটে।)

নেপথ্যে ছবেদের আর্তচিৎকার শোনা যায়—

ছবেদ। আঃ আমিনা দিদি পালাও! ফতেমা! আসগররে লইয়া জান বাঁচা। —আঃ—আঃ—

(বসির, বয়স ৩২ ; সয়ফুল, বয়স ২৮ এরা বাঙলাদেশের যুবক)

(নেপথ্যে গুলি—পাণ্টা গুলি। বোম-এর শব্দ। সৈন্যদের চিৎকার—আর্তনাদ)

(আমিনা নিজেকে সংযত করতে চেষ্টা করে। কি করবে ভেবে উঠতে পারছে না। উদ্‌ভ্রান্ত ফতেমা। ছেলেকে ঘরের মধ্যে রেখে, ওর ঘর থেকে বেরিয়ে আসে)

ফতেমা। আমিনা দিদি!

আমিনা। ভাবী!

ফতেমা। ছবেদ মেয়ার গলা!

আমিনা। ছবেদ ভাই মুক্তিফৌজ। লড়াই করছে।

ফতেমা। (বিচলিত, যেন দিশেহারা) মুক্তি ফৌজ! মিলিটারী!

(ততক্ষণ গুলিবর্ষণ শান্ত হয়েছে। অঞ্চল নীরব হয়ে আসে)

(যুদ্ধক্লান্ত বসির ও সয়ফুল প্রবেশ করে)

বসির। পাঁচটা খানসেনা গ্রামে ঢুকে পড়েছিল!

সয়ফুল। শিকার করতে!—মৃগয়া উৎসবে!

আমিনা। ওরা?

সয়ফুল। সব কটাই শেষ! ওদের ছাউনিতে খবর পৌঁছে দেবার জন্যও কেউ ফিরবে না।

বসির। খবর পৌঁছে দেবার লোকের অভাব কি সয়ফুল! দেখনা, এরমধ্যেই হয়তো পৌঁছে গেছে!

(এরমধ্যে প্রবেশ করে রণক্লান্ত আর এক যোদ্ধা হাসান. বয়স ওর ১৭।১৮, পরিধেয় ছিন্ন, লেগে আছে ধূলো-কাদা। ওর কোমরে একটা রিভলবার গোঁজা)

ফতেমা। ছবেদ মেয়া? (ওরা চকিত হয়)

বসির। হাসান!

হাসান। (রুদ্ধ কণ্ঠে) ছবেদ ভাই শহীদান অইছে দিদি!

ফতেমা। (কণ্ঠ থেকে অর্দ্ধস্ফুট শব্দ বেরোয়) এ্যা! কি কইলা? হেই কি ওর —অস্তিমের—ডাক শোনলাম?

বসির। বেঁচে নাই। (হাসান চুপ)

আমিনা। ছবেদ ভাই…

ফতেমা। ও তীর ধনুক লইয়া দৌড়াইয়া গেল আমিনা দিদিরে বাঁচাইতে! ছবেদ মেয়া…

আমিনা। ছবেদ ভাই বিষ তীরে হারামী সৈন্যটার জান নিল!

ফতেমা। (ভেঙে পড়ে) মেয়া! তুমি এয়া কি করলা! তোমার আসগর রইছে! (বুক ফাটা কান্নায় ভেঙে পড়ে)

আমিনা। ভাবী! দেশের মান রক্ষা করতে, ছবেদ ভাই জান দিল! এ বীরের মরণ! ছবেদ ভাই 'শহীদান' হলো?

ফতেমা। (কেঁদে বলে) এয়া আমার কি অইলে। আইজ কি হেই কিয়ামতের দিন শুরু অইলে। আমি কি করমু? কই যামু? আসগরের মুহের দিকে কেমন কইর্‌রা চামু?

(ওরা সকলে মাথা নিচু করে)

আমিনা। আমরা সব একসাথে আছি ভাবী! আমরা সব একসাথে বাঁচবো! তোমার আসগরের ভার আমাদের সকলের।

ফতেমা। ও কইয়া গেল, ওর আসগররে ও মুক্তিফৌজ বানাইবে।—ওতো জন্মের মত চইল্যা গেল!

(এমন সময় ঘরের মধ্যে ছেলেটা কেঁদে ওঠে)

ফতেমা। ঐ ও ওঠছে! আমি কেম্‌নে ওরে বাঁচামু—

আমিনা। আমি দেখছি ভাবী! আসগরকে আমি দেখছি—(আমিনা ঘরে যায়)

বসির। কাঁদবার বেশি সময় আমাদের নেই দিদি।

হাসান। আমাগো তড়াতড়িই ক্যাম্পে ফেরতে অইবে।

সয়ফুল। হ্যা! এখানে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ার সম্ভাবনা বেশি! গ্রামের এ অংশটা আমাদের ক্যাম্প থেকে অনেক দূরে।

(ওরা চকিত সর্তক নজরে সকলদিক দেখে)

(আমিনা আসগরকে কোলে করে নিয়ে আসে। আসগর তখনো

কাঁদছে।…আমিনা শান্ত করতে চেষ্টা করে। ফতেমা আসগরকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে হু হু করে কেঁদে ওঠে…)

ফতেমা। আসগররে বাপ আমার। তোর তোর বাপজান তোরে কইয়া গেছে তোরে মুক্তিফৌজ বানাইবে।

বসির। ঠিকই বলেছে দিদি! আসগররা একদিন আরো শক্তিশালী যোদ্ধা হবে। ওরা সমস্ত রকম অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়বে। আমাদের আরব্ধ কাজ শেষ করবে। ওদের জীবন প্রভাতের এই বীভৎস অভিজ্ঞতা-ওদেরকে মস্ত বড় বীর করে তৈরি করবে।

(মায়ের কোলে আসগর অনেকটা শান্ত)

আমিনা। ওর ক্ষুধা পেয়েছে ভাবী!

ফতেমা। কি খাইতে দিমু? ঘরে যে কিছু নাই!

হাসান। ওরে আমার ডে দেও দেহি—

বসির। কি করবে?

হাসান। বাঁশ ঝাড়ডার পরেই করীম সাহেবের বাড়ি। বাড়িতো ফাঁকা! ঘরে নিশ্চয় ওর খাওনের মত কিছু পাওয়া যাইবে।

আমিনা। চল! আমি ওকে নিয়ে তোমার সাথে যাই!

বসির। তোমরা এ সময়ে যাবে? দেরী হয়ে গেলে—

হাসান। দশ মিনিটের ব্যাপার। যামু আর আমু। ওর খাওনের কিছুতো যোগার রাখতেও অয়।

আমিনা। (আসগরকে নিতে যায়) চল তাড়াতাড়ি করে—

হাসান। তুমি দিদি এখানে থাহ। তোমার উপর দিয়াতো কোম ধকল যায় নাই? আমি একলাই পারুম।

আমিনা। তুমি?

হাসান। (হেসে) আমার অভ্যাস আছে। ঐ করীম সাহেবের বাড়িতেই আমি ফাই-ফরমাস খাটতাম। দেও দিদি! আসগররে আমারড়ে দেও। আসগর আমার লগে থাকতে কোন ভয় নাই।

(আসগরকে কোলে লয়। আসগর ফুঁফিয়ে ওঠে। আদর করতে করতে হাসান আসগরকে নিয়ে বেরিয়ে যায়)

(ফতেমা কেঁদে কেঁদে যেন নিস্তেজ হয়ে এসেছে। আমিনা কাছেই আছে।)

আমিনা। ভাবী শক্ত হও! আরো শক্ত। শক্ত আমাদের হতেই হবে। বুঝতে পাচ্ছ, একটা পুরো মিলিটারী শক্তির সাথে আমাদের যুদ্ধ করতে হচ্ছে। আমাদের সম্বল শুধু কলজের জোর। অন্যকোন হাতিয়ার আমাদের নেই।

সয়ফুল। ভেঙে পোরো না। দিলে জোশ আন দিদি! আমরা জান দিয়ে, কোরবাণী দিয়ে ঐ কমজাত্ জালিমদের নিকেশ করব।

ফতেমা। (রুদ্ধ কান্নায়) মেয়া হারাদিনে কিছু খায় নাই। তুফারের পরে ঘরে ফেরতে অনেক আ-কতা কু-কতা শুনাইছি।

কই ছেলে মাইড্ডা আলু কয়ডা সেদ্ধ কইর‍্যা দেও,—হেয়া আমি দি-নাই। ও প্যাডে ক্ষুধা নিয়া লড়াই দেতে দৌড়াইলে। আর ফেরলে না।

(ওরা সকলে আপ্লুত। চোখ মোছে সকলে)

বসির। দিদি। তুমি এভাবে আমাদের দুর্বল করে দিও না। আমরা দুর্বল হলে—

ফতেমা। তোমরা মুক্তিফৌজ!

বসির। হ্যাঁ, আমরা মুক্তিফৌজ। ছবেদ ভাইও মুক্তিফৌজ।

ফতেমা। আর আমার আসগরও মুক্তিফৌজ অইবে।

আমিনা। হবেই তো। আমরা ওকে এমন করে গড়ে তুলবো—

ফতেমা। (আবার ভেঙে পড়ে) ও কইছে, ওর আসগররে মুক্তিফৌজ বানাইবে। হেইয়াতে আমি ওরে কত কতা শুনাইছি। অসুইক্কা পোলারে বাপ অইয়া ওষুধ দেতে পারে নাই। পীরের কাছ থিকা পানি পড়া আব-ই-হায়াত খাওয়াইছি—

বসির। তোমার ছবেদ মিয়াও দিদি আর ভাল জিনিস আনতে জান্নত্ গেছে। জান্নত্ থেকে ও আব-জম্-জম্ এর প্রবাহ বই-এ দেবে এই এ-হিয়ার শ্মশান করা দেশটার উপর। আবার আমাদের সোনার বাঙলা সোনা রং-এর স্বর্ণ ধারায় হেসে উঠবে! দিদি।

(বসিরের ডাকে করুণ অশ্রুভরা চোখে ফতেমা তাকায়)

ফতেমা। তোমরা মুক্তিফৌজ!

(হাসান আসগরকে নিয়ে আসে। হাসান সন্ত্রস্ত। আসগর কতকটা উৎফুল্ল হাসানের কাছ থেকে আমিনা আসগরকে কোলে নেয়।

হাসান বসিরকে ডেকে একান্তে বলে)—

হাসান। বসির দাদা!

বসির। খবর কিছু?

হাসান। বাইরে যাওন যাইবে না। হালার খানসৈন্যরা গ্রামের পথ আগলাইছে—

বসির। জানলে কি করে?

হাসান। করীম সাহেবের উঠান থিকা খাল ধার নজরে পড়ে—মিলিটারী টুপীতে ছাইয়া ফালাইছে।

বসির। গ্রামের দিকে আসছে?

হাসান। যদ্দুর নজরে পড়ছে, ওরা মোনে অইল তাবু খাটাইতাছে—

বসির। হয়তো রাতের অন্ধকারে কিছু করার মতলব রয়েছে।

সয়ফুল। (কাছে আসে) কি হলো?

বসির। আপাততঃ আমাদের ক্যাম্পে ফেরার পথ বন্ধ।

আমিনা। (কাছে এসে) কি হবে?

সয়ফুল। ওরা খুব কুইক্ সার্ভিস দিচ্ছে!

হাসান। কইতে অইবে আমাগো দেশি দেউগো এলেম আছে। এত্তালা ঠিক সোমায় মত পৌঁছাইয়া দেছে।

বসির। কারুকে দেখলে?

হাসান। পীর ফৈজুদ্দিনরে দেখলাম কোলা ভাইঙা ওগো দিকে দৌড়াইতাছে।

বসির। পীর ফৈজুদ্দিন!

সয়ফুল। এখন কি করবে?

বসির। আমাদের রাতের জন্য অপেক্ষা করতে হবে।

সয়ফুল। কোথায় কি করবে?

বসির। এখানেই। ওদের অপারেশন হয়ে যাবার পর ছাড়া বেড়োবার উপায় নাই।

আমিনা। বসির ভাই।

বসির। (ফতেমাকে) দিদি! আপাততঃ আমরা তোমার বাড়িতে অতিথি।

(ফতেমা কোন কথা না বলে মুখের দিকে তাকায়)

সয়ফুল। এখানে থাকা কি নিরাপদ?

বসির। ক্যামোফ্লেজ্ করে নিতে হবে।

(সায়ফুল, আমিনা এরা জিজ্ঞাসার চোখে বসিরের দিকে চায়)

বসির। (ফতেমাকে) দিদি, তোমার এই বিচিত্র অতিথিরা তোমার আর একটা সর্বনাশ করবে।

ফতেমা। (ক্লান্ত কণ্ঠে) তোমরা মুক্তিফৌজ!

বসির। হ্যাঁ, তোমার স্বামীকে মুক্তিফৌজ করে শহীদ বানিয়েছি। আর তোমার ঘরটাকেও ভাঙবো। তোমার স্বামীর ভিটেটাও 'শহীদান' হবে।

ফতেমা। যার সোয়ামীই শেষ অইছে, তার ভিটা দিয়া কি অইবে? ওতো এমনেতেই ছাড়তে চলছি।

বসির। তোমার এই ঘরটাকেও ভাঙবো মানে ধ্বংসস্তূপ বানাবো। ওদের চোখকে ফাঁকি দিতে। সেই ধ্বংসস্তূপের মধ্যে আমরা লুকোবো। সময়ের অপেক্ষা করবো। এ ছাড়া কোন উপায় দেখি না।

ফতেমা। হ্যাশটারেই তো ওরা খান খান কইর‍্যা দেছে।

আমিনা। ঠিক ভাবী। সারা দেশটাই আজ ধ্বংসস্তূপ। তার মধ্যে আমরা জীবনের জন্য অপেক্ষা করছি। আমাদের লড়াই এর প্রস্তুতি নিচ্ছি।

বসির। তালে কাজ শুরু করি। তোমরা মেয়েরা ঐ আমগাছতলায় বোস!

(আমিনা ফতেমাকে নিয়ে একপাশে যায়)

বসির। (সয়ফুলকে) দেশলাই আছে?

সয়ফুল। আছে!

বসির। ধ্বংসস্তূপ বানাতে আগুনের কাজ কিছু আছে!

সয়ফুল। আগুনের কাজ বড় বিচিত্র। কখনো পুড়িয়ে মারে আবার প্রাণ বাঁচাবার উপায় হয়।

বসির। হাঃ ব্যবহার গুণে।

হাসান। ঐ যে, দখল লওয়া কামান হান! ঐ দিয়া খান হারামীরা আমাগো মারছে। হেয়ার মুখ ঘুরাইয়া ঐ হারামীগোই শ্যাষ করুম।

(ওরা ওদের কাজ শুরু করে)

মধ্যরাত্রি

(ছবেদের বাড়ির ধ্বংসস্তূপের আড়ালে—

(ধ্বংসস্তূপের পেছনে, ঘরের পেছনের উঁচু রাস্তা আরো স্পষ্ট দেখা যায়। একদিকে ফতেমার কোলে আসগর। সতর্ক আমিনা পাশে।

বসির ও সয়ফুল দুইদিকে সতর্ক প্রহরারত। হাসানকে এখন দেখা যাচ্ছে না। ভেতরে কোথাও আত্মগোপন করে আছে।

দূরে শিয়ালের ডাক শোনা যায়। ওরা চকিত হয়। ফতেমার কোলে ঘুমন্ত আসগর কঁকিয়ে ওঠে। ফতেমা শান্ত করে।...সময় অতিক্রান্ত।

সয়ফুল। (চাপাগলায়) হাসান! হাসান!

হাসান। আছি ভাই সাব। ঠিক আছি।

সয়ফুল। কোথায়?

হাসান। রাস্তার উপর কান পাইত্যা আছি...রাস্তার মাতায় বড় শিয়ালের পাও পড়লেই কইয়া দিমু!

আমিনা। ভাইসাব হাসানকে এদিকে ডাক!

বসির। হাসান রাস্তার দিকে থেকে সরে এস।

(রাস্তার কাছে ঝোপের এক অংশ নড়ে ওঠে)

দূরে—"হুইশেল" এর তীব্র শব্দ!

বসির। (চাপা স্বরে সতর্ক করে) হুশিয়ার।

(আমিনা ফতেমার কাছে আসে)

আমিনা। (ফতেমাকে) ভয় করছে ভাবী?

ফতেমা। (শান্ত নিস্পৃহ স্বরে) না! আমার কোন ভয় নাই!

(গাছের ফাঁক দিয়ে একফালি চাঁদের আলো এসে পড়ে ফতেমার কোলে—ঘুমন্ত আসগরের মুখের উপর)

আমিনা। আসগর! কেমন নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে।

ফতেমা। ওর গায়ে এহোনো জ্বর!

আমিনা। (আসগরের কপালে হাত দেয় জর পরীক্ষা করে) দেখি সত্যইতো! ...ক্যাম্পে পৌছে, ঔষধ দেবোখন।

(আসগর জেগে ওঠে)

ফতেমা। ও-কি? (কোলের দিকে তাকিয়ে) আঃ ঘুমা! ঘুমা!

(ঘুম পাড়ানর চেষ্টা করে। আসগরকে মায়ের বুকে দুধ অন্বেষণ করতে দেখে আমিনা বলে।)

আমিনা। ও-মা! দুধ খাবে! ওরে দুধ দাও আগে।

(দূরে কতগুলো কুকুরের চিৎকার)

হাসান। হুশিয়ার! বড়শিয়ালের সাড়া পড়ছে।

(আবার কুকুরের চিৎকার। একঝাঁক মেশিনগানের গুলি—যেন রাত্রির বুক ঝাঝ্‌রা করে দিচ্ছে)

বসির। সাবধান! কারু মাথা যেন উপরে না ওঠে। কেউ নড়বে না।

(ফতেমার কোলে আসগর কেঁদে ওঠে। ফতেমা শান্ত করবার চেষ্টা করে। কাছে আমিনা সন্ত্রস্ত। সয়ফুল হামা দিয়ে কাছে আসে।)

সয়ফুল। কি হোল?

(রাস্তার উপরে দূর থেকে তীব্র টর্চের আলো পড়ে)

বসির। (চাপাস্বরে) ওরা খুব কাছে।

(ফতেমা আসগরকে কোনরকমে শান্ত করতে না পেরে ওর মুখে কাপড় পুরে দেয়। আসগরের কণ্ঠ দিয়ে গোঙানি বেরোয়।

আমিনা। এ কি! ওর মুখের মধ্যে কাপড় দিলে! আঃ দুধ দাও।

ফতেমা। বুকে দুধ আছে?—যে থামবে!

(ক্ষীণ পদশব্দ জোরালো হয়)

বসির। সব শুয়ে পড়। আমিনা (একটা পিস্তল দেয়) এটা হাতে রাখ

(আমিনা পিস্তলটা নেয়)

বসির। (সয়ফুলকে) সয়ফুল, পজিসনে থাকিবে।

সয়ফুল। হাসান্‌।

হাসান। আমি ঠিক আছি।

সয়ফুল। এ পাশে সরে এস, সাবধানে।

হাসান। মোকা মত আছি। যদি একটা "মেশিন গান" বাগাইতে পারি।

আমিনা। হাসান!

হাসান। দিদি!

আমিনা। আমার কাছে সরে এস!

(হাসানকে আমিনার পাশে আসতে দেখা যায়)

(পদশব্দ জোরালো হয়ে ওদের মাথার উপরে রাস্তার উপর দিয়ে একদল পাক সেনা মার্চ করে বেরিয়ে যায়। ওরা সকলে আড়ষ্ট হয়ে থাকে। তারপর ওদের পদশব্দ মিলিয়ে যায়।)

হাসান। বসিরদা। চালাইয়া দিমু নাকি!

(ওর পিস্তলটা বাগায়)

বসির। পাগল, এটে উঠবি কেমনে পুরো প্লাটুন! আরো পিছে আছে।

(ফতেমার কোলে আসগর ছটফট করে)

আমিনা। ভাবী!

ফতেমা। হারামজাদা জ্বালাইয়া খাইলে।

আমিনা। একটু ধৈর্য ধর।

হাসান। আমার ব্যাগে গুড়া দুধ আছে—পারবা?

আমিনা। ভাবী, ঐ আঙুলে মাখিয়ে ওর মুখে দাও না।

(ওরা আবার সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে। বসির ও সয়ফুল শুয়ে পড়েছে) রাস্তার উপরে একটা মাথা দেখা যায়। পীর ফৈজুদ্দিন। বয়স ৫০, কালো আলখাল্লা পরিধানে। মুখে লম্বা দাড়ি। চোখে পিশাচের দৃষ্টি

হাসান। (এক ফাঁকে মাথা তুলে দেখে) এই রে! বড়শিয়ালের ফেউ!

বসির। (চাপা স্বরে) পীর ফৈজুদ্দিন?

হাসান। দিমু নাকি?

বসির। আঃ চুপ!

(আসগরকে নিয়ে ফতেমা ব্যস্ত)

পীর। (ধ্বংসস্তূপ নিরীক্ষণ করে) ব্যাপারডা কি রহম অইলে? এডাতো কতা ছিলো না। আঃ হা ফতেমা অমন শক্ত মাইয়া। এ্যাঃ পুইরড়া মরলে না—চাপা পইরড়া মরলে। আ—হা-হাঃ (মুখে চোক্ চোক্ শব্দ করে) পদশব্দ।—দুজন পাকসৈন্যের মুখ! ওরা এগিয়ে আসে পীরের কাছে—একজন পীরের ঘাড়ে হাত দেয়। সৈন্যদ্বয় মদোন্মত্ত।

সৈন্য। মিলা কুছ? বোল?

পীর। লইয়া আইছালাম তো জাগা মত! এ দেখি অনেক আগেই লোপাট অইছে। বড় ভাল জিনিসই আছেলে সাহেব।

সৈন্য ১। কেয়া?

সৈন্য ২। কেয়া বোলো শালা বুড্ঢা হারামী?

সৈন্য ১। আরে যেইসে বোলা—তুরন্ত কাম কর।

পীর। ছবেদ আলি মেয়ার ডেরা! ছবেদের আওরৎ বড় ভাল জিনিস। ভাল কামেই লাগতো।

সৈন্য ২। কেয়া বলতা?

পীর। অন্ধধার চলিয়ে সাহেব। ই ধার একঠো যা থা, ওতো খতম

হোগিয়া।

সৈন্য ১। কেয়া ? (পীরের ঘাড় ধরে. পীর আঁতকে ওঠে) শালে বুরবক বাঙাল ! —কুত্তা কাহিকা ?

পীর। (ঘাড়ে হাত বুলায়) আঃ সাহেব গোস্বা কর ক্যান ? দিমুতো কইছি। মিলাইয়া দেগাই একঠো না একঠো।

(মঞ্চে ওরা আড়ষ্ট)

হাসান। (চাপাস্বরে) হালা, নৈল্‌চার আড়ালে গাঁজা !—মুর্শিদ অইছে ! দিদি পীর সাহেবের কতা শোন হে ?

(ফতেমা আসগরকে নিয়ে আড়ষ্ট)

আমিনা। (চাপা রুদ্ধকণ্ঠে বলে) পাপ ! মানব সমাজের পাপ ! দরকার হলে মরণ কামড় বসাব।

(রাস্তার উপরে)

সৈন্য ১। এই সালে ভেড়ীকি বাচ্চে,—কুত্তা কাহিকা, চল কি ধর যায়েগা—

পীর। চলিয়ে। আওরভি আচ্ছা চীজ মিলেগা ! আচ্ছি অওরৎ।

সৈন্য ২। শালে আওরৎ সে কেয়া হুগী। ভার্জিনা দো। ভার্জিন-আ······

পীর। আওরতের কি দেখেছো সাহেব ?

সৈন্য ২। কেয়া শালে ? যেইসে বোলে হম ঐসে কাম। আচ্ছি ভার্জিনা মিলাও—থপ্ সুরত্ আন টাস্‌ট গার্ল।

পীর। ওই, বাতইতো বাতাতা। মিলেগা কাফের বসিরের দলডার খোঁজ পাইলেই অয়। ওরা গ্রামেই আছে—

(নিচে ওরা সতর্ক)

হাসান। পাজীর ঝাড়। উল্লুকটা সব খবর রাহে।

বসীর। চুপ ?

(ওদের থেকে খানিকটা দূরে কি একটা খস্ খস্ শব্দ হয়—সৈন্য দুটো ঘুরে দাঁড়ায়। মুখে অজস্র খিস্তি আউড়ে—ঝোপের যে অংশটা নড়ে উঠেছিল সে অংশটা মেশিন গানের গুলিতে ঝাঁঝরা করে দেয়। সৈন্যরা এগিয়ে যায়। পীর ফৈজুদ্দীনও চলে যেতে মুখ ফেরায়)

নিচে—

ফতেমার কোলে আসগর ছট্‌ফট করে কঁকিয়ে কেঁদে উঠে—মুখের থেকে কাপড়টা সরে গেছে।

ফতেমা। মর হারামজাদা! জ্বালাইয়া খাইলে—

(অস্ফুট শব্দ করে ওর মুখ চেপে ধরে।)

উপরে—

পীরের কানে শব্দ যায়। মুখ ফেরায়। শক্ত লক্ষ্য করে। একটা টর্চ বের করে শব্দের দিকে আলো ফেলে। আলো ওদের মাথা ছাড়িয়ে কিছু দূরে পড়ে। পীর ফৈজুদ্দিন আলোটা একই ভাবে জ্বালিয়ে রেখে একটু উপরে উঠে আসে।

ফতেমা প্রাণপণে আসগরকে চেপে ধরেছে।

ওরা সকলে অনড়।

আসগর যাতে কোন শব্দ করতে বা নড়তে না পারে ফতেমা সে ভাবে সারা শরীর দিয়ে আসগরকে চেপে ধরে। অনড়।

ফৈজুদ্দিন কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে।

নেপথ্যে সৈন্যের চিৎকার।

সৈন্য ১। হেই পীর কি বাচ্চা! চল শালে। পথ বাতলাও—

(আলো নিবিয়ে ফৈজুদ্দিন ফেরে)

সৈন্য। কেয়ারে?

পীর। চলিয়ে সাহেব।

(ওরা চলে যায়। ক্রমে ওদের চলে যাওয়ার শব্দ বিলীন হয়।)

কিছুক্ষণ প্রচণ্ড নীরবতা!

হাসান। (নড়ে চড়ে ওঠে) গ্যাছে!

সয়ফুল। আঃ

বসির। হুশিয়ার!

(দূরে আরো অনেক গুলির শব্দ। আর্তচিৎকার। রাত্রির বুক বিষাক্ত)

বসির। ওঃ শুনছো সয়ফুল! কত প্রাণের আকুল আর্তনাদ!

সয়ফুল। আমরা বড় বে-কায়দায়-ফেসে গেলাম! কিছু উপায় নেই—

হাসান। কওনা বসির দাদা—পেছন দিয়া—দি চালাইয়া—

বসির। ফয়দা উস্থল হবে না!

(ফতেমার কোলে আসগর নড়ে না)

আমিনা। (ফতেমা) ভাবী, আসগর!

ফতেমা। হঃ ঘুমাইছে?

(খালধারের দিক থেকে, রাইফেল বন্দুকের গুলি শোনা যায়)

বসির। (উৎকর্ণ) বন্দুক ! রাইফেলের গুলি !

হাসান। (ওঠে) ভাই সাব আমরা—

বসির। (হাসানকে সংযত করে) সবুর সবটা বুঝতে হবে। কমরেডরা বোধ হয় স্ট্রাটেজী নিতে পেরেছে।

(শব্দ জোরালো হয়। ভারী শব্দ শোনা যায়।
পর পর কয়েকটা ভারী শব্দ হয়।)

বসির। সন্থ পাওয়া লাইট কামানটা গরজাচ্ছে। খানেরা এখানে কোন কামান নামিয়েছে।

সয়ফুল। যতদূর মনে হয়, না ! এখনো ওদের বড় বহর এসে পৌছায়নি !

হাসান। ওরা ঐযে হাল্কা ইংকী নাওয়ে আইয়া নামছে যে—

(ক্রমে সব শান্ত হয়ে আসে) মুক্তিফৌজের অলক্লিয়ার শব্দ—তূর্য ধ্বনি—শোনা যায়।

সকালের আলো দেখা যায়।

(হাসান একলাফে উঠে গিয়ে দাঁড়ায়)

হাসান। (চিৎকার করে বলে) সকাল অইছে !

আমিনা। হাসান।

হাসান। আমাগো যুদ্ধ জেতার শোহরত্।

(বসির সয়ফুল উঠে দাঁড়ায়)

আমিনা। আমাদের জয়তূর্য।

(হাসান রাস্তার ওপাশে একটা উঁচু জায়গায় চেঁচায়। দিনের আলো তখন স্পষ্ট।)

হাসান। খাল ধারে, আমাগো নিশান ওড়ছে। খান সৈন্যগো তাঁবু দখল।

সয়ফুল। (উল্লাসে) বাজে বিষাণ। ওড়ে নিশান !

বসির। বেড়িয়ে চল ?

আমিনা। (ফতেমাকে ডাকে) ভাবীজী উঠে এসো !

(ফতেমা ছেলে কোলে তখনো অনড়)

(আমিনা কাছে যায়। আসগরকে কোলে নিতে গিয়ে থমকে যায়)

আমিনা। এ কি ?

ফতেমা। (ধীর কণ্ঠে বলে) আসগরের জর কুইম্যা গ্যাছে। ওরে পীর সাহেবের থিকা পানি পড়া "আব্-ই-হায়াত্" খাওয়াইছিলাম যে।

আমিনা। (প্রায় আর্তস্বরে) বসির ভাই !

(ওরা সকলে ঘনিষ্ঠ হয়)

বসির। কি হলো ?

ফতেমা। আসগর আর নড়ে না। কান্দে না। ও ঘুমাইছে ও আর নড়বে না—কানবে না—ও সোনা ঘুমায়—সোনা ঘুমাল পাড়া জুড়াল! বর্গী এল দেশে বুলবুলিতে ধান খেয়েছে খাজনা দিমু কিসে—

আমিনা। ভাবী!

বসির। ফতেমা দিদি ?

ফতেমা। ওরে আমি খুন করছি ?

(হাসান কাছে আসে। ফতেমা মৃতপুত্র কোলে উঠে দাঁড়ায়)

হাসান। কি অইছে দিদি ? আসগর ?

ফতেমা। হারামজাদা চিৎকার করলে তোমরা হগোল-ডি ধরা পড়তা।

(ওরা সকলে নিঃশব্দ। ফতেমা একা বলে চলেছে)

ফতেমা। ওর, মুখ চাইপ্যা ওরে শ্বাষ কইর‍্যা দিছি, হ' তোমড়া ধরা পড়লে ত্মাশের কাম অইবে ক্যাগো দিয়া! আর ওতো এ্যামনেও বাঁচতো না। না খাইয়া কতদিন বাঁচবে!

হাসান। আমি যে ওর লইগ্যা গুড়া দুধ লইছি ব্যাগে।—

আমিনা। ভাবী তুমি কি বোলছ—এ তুমি কি করেছ ?

ফতেমা। হুঃ ওর বাপ নিজে মইর‍্যা তোমারে বাঁচাইছে। ও ওর বাপের থাইকা ও বড় কাম করছে। ও মইরা তোমাগো হগোলডিরে বাঁচাইছে!

(ওরা সকলে কাঁদে)

আমিনা। (অশ্রুভরা কণ্ঠে বলে) কারবালা বিয়াবানে ইমাম হাসানের কচি ছেলেটা তৃষ্ণার্ত কলিজা ফেটে করুণ মৃত্যুতে ঢলে পড়েছিল তার নাম ছিল, আসগর।

(ফতেমা মৃত আসগরকে নিয়ে সামনে আসে)

ফতেমা। (অদ্ভুত কণ্ঠে বলে) ওরে, কি মুক্তিফৌজ কওন যায় না ? ও ওর বাপের থিকাও বড় মুক্তিফৌজ। ও মস্ত বড় মুক্তিফৌজ!

আমিনা। (অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে) লাল সেলাম ছোট্ট কমরেড!

(ওরা সকলে লাল সালাম জানায়)

বসির। (অশ্রুভারাক্রান্ত স্বরে বলেন)

লাল পল্টন মোরা সাচ্চা
মোরা সৈনিক, মোরা শহীদান বীর বাচ্চা
মরি জালিমের দাঙ্গায়।
মোরা অগ্নি বুকে ধরি, হাসি মুখে মরি,
জয় স্বাধীনতা গাই

(আবার তূর্য বাজে)

পুস্তক-পরিচয়

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ঃ শ্রী দেবজ্যোতি দাশ, সাহিত্য সাধক চরিতমালা (১০৪) ; ২৲ মাঘ ১৩৭৬। সজনীকান্ত দাশঃ শ্রী দেবজ্যোতি দাশ, সা-সা-চ (১০৫) ; ২৲ বৈশাখ ১৩৭৭। অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণঃ শ্রী দেবজ্যোতি দাশ, সা-সা-চ (১০৬) ; ২৲ ফাল্গুন, ১৩৭৭। গিরীন্দ্রশেখর বসুঃ শ্রীদেবজ্যোতি দাশ, সা-সা-চ (১০৮); ২৲ আষাঢ়, ১৩৭৮। প্রকাশকঃ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, ২৪৩/১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলকাতা-৬

উনবিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকে আধুনিক বাঙলা সাহিত্যের উদ্ভব, বিকাশ ও ক্রম-পরিণতির ক্ষেত্রে যে-সাহিত্যসাধকগণ জীবনাতিপাত করে গেছেন, তাঁদের সকলের সংক্ষিপ্ত তথ্যনিষ্ঠ জীবনীর মালা প্রকাশ করে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ সকল বঙ্গ-সাহিত্য অনুরাগী এবং বঙ্গ-সংস্কৃতির স্বরূপ জিজ্ঞাসু গবেষক-গণের ধন্যবাদ ভাজন হয়েছেন। পূর্বে প্রকাশিত বাঁধাই দশখণ্ডে শতাধিক খ্যাত-স্বল্পখ্যাত অথবা অধুনা অখ্যাত বহু সাহিত্যিকের জীবনচরিত তাঁদের গ্রন্থপঞ্জী, বাঙলা সাহিত্যে তাঁদের বিশেষ দান সম্পর্কে অত্যন্ত বস্তুনিষ্ঠ তথ্যনির্ভর আলোচনার মূল্যে ইতোপূর্বেই পণ্ডিত সমাজে এবং সাধারণ্যেও স্বীকৃত হয়েছে। অত্যন্ত সুখের কথা এই চরিতমালার প্রকাশ আজও অব্যাহত।

গবেষক ও বঙ্গ-সাহিত্য অনুরাগী সকলেই জানেন সাহিত্যসাধক চরিত-মালার প্রায় শতাধিক জীবনী এবং তাঁদের সকলের প্রামাণ্য গ্রন্থপঞ্জী রচনায় সম্পূর্ণ কৃতিত্ব ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের। এই পরিশ্রমী গবেষকের একক প্রচেষ্টায় এই দুরূহ কর্তব্য সুচারুভাবে সম্পন্ন হয়েছে। কোথাও কোথাও যৎসামান্য ত্রুটী থাকলেও সাধারণভাবে প্রমাণ ছাড়া এক পঙক্তিও তিনি লিখতেন না। নিজের আহৃত তথ্যে ভুল আছে জানলে সংশোধন করতে বিলম্ব করতেন না। তাঁর সংস্কারমুক্ত সত্যনিষ্ঠার যে-পরিচয় তাঁর গ্রন্থগুলির মধ্যে ধরা পড়েছে—উত্তরকাল তা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করবে।

বাঙালি জাতির হয়ে এই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ পেয়েছে শ্রী দেবজ্যোতি দাশের লিখিত এই চরিতমালার ১০৪ সংখ্যক গ্রন্থে। স্বয়ং ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনীই তিনি রচনা করেছেন। যে-মানুষ আপনি আড়ালে থেকে অন্য সাহিত্য-সাধকদের জীবনের বহুতথ্য উদ্‌ঘাটন করেছেন—তাঁর জীবনী রচনার মধ্য দিয়েই এই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ পেয়েছে। পাঠকগণ জানলে আনন্দিত হবেন

যে দেবজ্যোতিবাবু এই জীবনী প্রকাশ করে ব্রজেন্দ্রনাথের যোগ্য উত্তরসূরী রূপে প্রশংসনীয়ভাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। বস্তুত ব্রজেন্দ্রনাথের জন্ম, শিক্ষা, কর্ম, সংসারজীবন, গবেষণা ও সাহিত্যকর্মের বিস্তারিত পরিচয় ছাড়াও তিনি ব্রজেন্দ্রনাথের গ্রন্থপঞ্জী, সাহিত্য-পরিষদের বিভিন্ন অধিবেশনে পঠিত প্রবন্ধ ও বিভিন্ন সাময়িক পত্রে প্রকাশিত রচনার একটি সুবিপুল তালিকা নির্মাণে তাঁর অনন্যসাধারণ পরিশ্রম ও তথ্যনিষ্ঠার স্বাক্ষর রেখেছেন। শুধু তথ্যনিষ্ঠাই নয়, তিনি নিঃশঙ্কচিত্তে ব্রজেন্দ্রনাথের অবদানের মূল্যায়নও করেছেন—তাতে দেবজ্যোতিবাবুর শুষ্ক তথ্যনিষ্ঠার অতিরিক্ত একটি সংবেদনশীল মনেরও পরিচয় পাই। এই দ্বিতীয় গুণটি যদি প্রথমগুণের সঙ্গে সমানানুপাতে মিশ্রিত না থাকে তাহলে যথার্থ জীবনীকার হওয়া অসম্ভব। ব্রজেন্দ্রনাথ সম্পর্কে তিনি মন্তব্য করেছেন :

"আবেগ বর্জিত, তারল্যবিরহিত নির্ভয় তথ্যনিষ্ঠা এবং আপন পূর্বসিদ্ধান্ত সংশোধনের নিঃশঙ্ক ঔদার্য—ব্রজেন্দ্র-সাহিত্যের এই গুণ দুইটি উল্লেখযোগ্য। তাঁহার বিচার ও বক্তব্য সকল সময়ে অভ্রান্ত বা অনিবার্য নহে, কিন্তু অবিরত আত্মসংশোধনের যে আগ্রহ তাঁহার রচনায় বারবার সপ্রমাণ হইয়াছে, মৌলিক গবেষণার পক্ষে তাহা এক আদর্শ মনোবৃত্তি।

"তাঁহার মননের যাদুস্পর্শে সংবাদপত্রের বিবর্ণপৃষ্ঠা যেন সহসা মুখর স্মৃতিচারণ আরম্ভ করিল, লোকান্তরিত সাহিত্যসেবীগণ যেন বিস্মৃতির নির্বাসনান্তে জনচিত্তে পুনঃপ্রতিষ্ঠা লাভ করিলেন, পরিত্যক্ত নাট্যশালার নিষ্প্রদীপ মঞ্চে যেন ভূতকালের নটনটীদের বর্ণাঢ্য ছায়ামিছিল অতীত ঔজ্জ্বল্যে পুনরাবির্ভূত হইল। অবিরাম প্রয়াসে যিনি এভাবে পূর্বসূরীদিগের স্মৃতির পুনরুদ্ধার করিয়াছিলেন, মৃত্যুর দুই দশকের মধ্যেই তাঁহার অবদানের স্বীকৃতি সীমাবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে।" ব্রজেন্দ্রনাথ কৃত 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা', 'সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা' এবং 'বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস' সম্পর্কে দেবজ্যোতিবাবুর এই মূল্যায়ন যথার্থ এবং তাঁর কৃতিত্ব ও যোগ্যতার প্রমাণ।

এই কৃতিত্বের পরিচয় তাঁর রচিত সজনীকান্ত দাশের জীবনীতেও (১০৫) ধরা পড়েছে। শনিবারের চিঠির সম্পাদক সজনীকান্তের কৃতিত্ব এবং বাঙলা-সাহিত্যের সেবায় তাঁর দান কতটুকু এ-নিয়ে বোধহয় এখন আর বিতর্কের কিছু নেই। তাঁর গবেষণাত্মক কাজকর্মই বাঙলা সাহিত্যে স্থায়ী আসন পাবে এবং তাঁর অহৈতুকী ব্যঙ্গপ্রবণতা এবং অসহিষ্ণু প্রতিক্রিয়াশীল মনোভাব

প্রকাশিত রচনাগুলি নয়—এ সম্বন্ধে বোধহয় আর দ্বিমত নেই। সজনীকান্তের বৈচিত্র্যময় কর্মজীবন সাহিত্যকর্ম, গবেষণা, প্যারডি-পারদর্শিতা, রবীন্দ্রচর্চা এই সমস্ত দিকগুলিই প্রশংসনীয় নিরপেক্ষতার সঙ্গে আলোচিত হয়েছে।

অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণের জীবনীতেও (১০৬) বাঙলাদেশের একজন বিরল Encyclopaedist বা বিশ্ববিদ্যাচর্চাকারীর প্রবন্ধাবলীর তালিকা অন্যান্য জ্ঞাতব্যের বিষয়ের চাইতেও বেশি মূল্যবান। প্রাচ্যবিদ্যায় ও ভারততত্ত্বে আগ্রহী সকলের কাছে গ্রন্থকারের সুকঠিন পরিশ্রমে সংকলিত তালিকা মূল্যবান বলে বিবেচিত হবে।

কিন্তু বাঙলাদেশে মনোবিদ্যার চর্চায় উদ্যোগী পুরুষ গিরীন্দ্রশেখর বসুর জীবনীটির মতো (১০৮) মূল্যবান গ্রন্থ অল্পই রচিত হয়েছে। রাজশেখর (পরশুরাম) এবং শশিশেখরের ভাই গিরিন্দ্রশেখর যে কেবলই মনোবিদ্যার গবেষণা ও মৌলিক তত্ত্ব প্রণয়নের সঙ্গে সঙ্গে মনোরোগের চিকিৎসায় আধুনিক এবং স্বকীয় পদ্ধতির ব্যবহার করেছিলেন, ফ্রয়েড, জোনস এঁদের সঙ্গে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যোগাযোগ রেখে তাঁদের মতামত কখনও মেনে, কখনও সংশোধন করে ও স্বীকৃতি পেয়ে এই শাস্ত্রটির বিকাশ সাধন করেছিলেন তা নয়। বাঙলাভাষায় তাঁর গবেষণা ও জ্ঞানের কথা পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব সূত্রে বাঙলাকে বিজ্ঞান আলোচনার উপযোগী করে গড়ে তোলার চেষ্টা এবং পরিভাষা রচনায় অনন্য শ্রম ও এর পাশাপাশি তাঁর প্রাচীন ইতিহাসে মুদ্রাতত্ত্বে সমান আগ্রহের কথা, পুরাণের ও শাস্ত্রগ্রন্থাদির বৈজ্ঞানিক নির্মোহ আলোচনা এবং সঙ্গে সঙ্গে শিশুসাহিত্য সৃষ্টি—এই যে এতগুলি দিক তা এককালীন আমাদের কাছে কখনই ধরা পড়ত না যদি না দেবজ্যোতিবাবু পরিশ্রম ও নিষ্ঠার সঙ্গে এই কাজটি না করতেন। গিরীন্দ্রশেখরের জীবনী এর পূর্বে এমনিভাবে প্রকাশিত হয়নি। মনোবিদ্যায় আগ্রহী ব্যক্তিগণের সঙ্গে বঙ্গভাষানুরাগী সকলেই এই বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী মানুষটির সর্ববিধ প্রচেষ্টাকে জানতে পেরে কৃতার্থ হবেন।

বাঙলা সাহিত্যের সেবায় সংস্কৃত পণ্ডিত সমাজ : শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী ; সাহিত্য-সাধক চরিতমালা (১০৭) ; ১'৫০। জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৮।—প্রকাশক : বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা-৬

সাহিত্য-সাধক-চরিতমালার অন্তর্গত এই বইটি একটু আলাদা ধরনের। বাঙলা সাহিত্যের সেবায় বাঙলাদেশের সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতসমাজও যে একসময়ে

নিয়োজিত ছিলেন একথা আমরা মনে রাখি না। সংস্কৃতজ্ঞ এই পণ্ডিতগণ ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকেই নানা বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করেছেন, সংস্কৃত গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ, কখনও কাব্য সংস্কৃতি বেদান্ত ও দর্শনের অন্যান্য শাখার মূলগ্রন্থ সম্পাদন এবং তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেছেন, নিছক সারস্বত সাধনার মধ্য দিয়েই তাঁরা বাঙলা সাহিত্যকে পুষ্ট করেছেন এবং মননশীলতার ধারাকে অব্যাহত রেখে গেছেন। এঁদের রচিত গ্রন্থাবলীর বেশির ভাগই এখন প্রায় দুষ্প্রাপ্য ও অপরিচিত হয়ে গেছে—কিন্তু এঁদের নীরব সাধনার কথা বিস্মৃত হওয়ার মতো অপরাধ আর নেই। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-এর কর্তৃপক্ষ ও পণ্ডিত শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্তী এঁদের অনেকের জীবনী ও সাহিত্য এবং সারস্বত কীর্তির পরিচয়টি তুলে ধরে আমাদের সকলের ধন্যবাদ ভাজন হয়েছেন।

যে বিশিষ্ট পণ্ডিতবর্গের পরিচয় এই স্বল্পায়তন অথচ মূল্যবান গ্রন্থটির মধ্যে তুলে ধরা হয়েছে তাঁরা হলেন চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার (১৮৩৬-১৯১০), সত্যব্রত সামশ্রমী (১৮৪৬-১৯১১), কালীবর বেদান্তবাগীশ (১৮৪২-১৯১১), শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব (১৮৬০-১৯১৩), হৃষীকেশ শাস্ত্রী (১৮৫০-১৯১৩), শশধর তর্কচূড়ামণি (১৮৫১-১৯২৮), পঞ্চানন তর্করত্ন (১৮৬৬-১৯৪০), ফণীভূষণ তর্কবাগীশ (১৮৭৬-১৯৪২), প্রমথনাথ তর্কভূষণ (১৮৬৫-১৯৪৪), দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ (১৮৬৬-১৯৪৮), যোগেন্দ্রনাথ তর্কবেদান্ততীর্থ (১৮৮৭-১৯৬০), হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ (১৮৭৬-১৯৬১) এবং বিধুশেখর ভট্টাচার্য শাস্ত্রী (১৮৭৬-১৯৫৯) এঁদের মধ্যে কেউ কেউ যেমন হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ তাঁর অসংখ্য বই ও মূল সংস্কৃত মহাভারতের অনুবাদের জন্য, বিধুশেখর শাস্ত্রীমশাই শান্তিনিকেতনের সূত্রে এবং প্রমথনাথ তর্কভূষণ তাঁর 'বাঙ্গালার বৈষ্ণবধর্ম' গ্রন্থের জন্য তবু কিছুটা বেশি পরিচিত কিন্তু আর কতটা এঁদের সকলের সম্বন্ধে জানি ? এঁরা কেউ কেউ রক্ষণশীল হলেও বাঙলাদেশের মননশীলতার ধারাকে প্রবাহিত করে নিয়ে চলার জন্যই এঁদের কাছে আমাদের কৃতজ্ঞ থাকতে হবে। সেই দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করলে ঊনবিংশ শতাব্দীর বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাসকারের জন্য এই স্বল্পায়তন গ্রন্থটি একটি মূল্যবান দিকদর্শক হয়ে রইল।

প্রশান্ত দাশগুপ্ত

অন্তর্গত নদী। রবীন সুর। স্বপক্ষ প্রকাশন। নৈহাটী। দাম: তিন টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

দেখা যাচ্ছে যে তরুণতম কবিরা অনুবর্তী হবার চেয়ে স্ববর্গসম্বর্তী হতেই বেশি ভালোবাসেন। দেখা যাচ্ছে তাঁরা আপন বৈশিষ্ট্য সম্পাদন করতেই ইচ্ছুক —কিন্তু সেই ইচ্ছায় বশীভূত হয়ে তাঁরা এমন কোনো উগ্র রেখা টেনে দেন না যাতে তাঁদের মনে হয় হঠকারিতায় দৃষ্টি আকর্ষক। 'অন্তর্গত নদী' কাব্যগ্রন্থখানি পড়তে পড়তে প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া মোটামুটি এই দাঁড়াল। রবীন সুর বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় লিখে থাকেন দেখেছি। তখন তাঁর কবিতা আমার কেবল মাত্র ভালো লেগেছে। দুই মলাটের (মনোজ্ঞ প্রচ্ছদ, এ বিষয়ে পৃথক ভাবে প্রশংসার্হ) মাঝে কবিতাগুলি বন্দী হয়ে যখন ধরা দিল, তখনই কবিতাগুলিকে বোঝা গেল তাদের স্বরূপে।

একথা আমি অস্বীকার করছি না যে এই পরিশ্রমী তরুণতর কবির কবিতায় সদ্য প্রতিষ্ঠিত অনতিতরুণ কবিদের কেউ কেউ ছায়া ফেলেছে। শক্তি চট্টোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, তরুণ সান্যালের কথা এ-প্রসঙ্গে মনে পড়ে। কিন্তু তাঁদের কথা মনে পড়লেও সেটাই শেষ কথা নয়। বরঞ্চ এটাই প্রথম কথা যে কবিতাগুলি পড়তে পড়তে শেষপর্যন্ত একজনের কথাই মনে জাগে—তিনি এই গ্রন্থের কবি রবীন সুর স্বয়ং।

ভাষাবিন্যাসে একটা শক্তসমর্থ পুরুষালি ভাব, ছন্দে সক্ষমতা এবং শব্দচয়নে কাব্যিক যথাযথতাকে ধরার প্রয়াসে 'অন্তর্গত নদী'র কবি স্বল্পে সন্তুষ্ট নন। সহজ কবিয়ালী ভাষা তিনি সযত্নে পরিহার করেন। 'চিঠি' কবিতাটির গাঠনিক শিথিলতার মধ্যেও জীবনের ছাঁদ জীবিকার লয়ে বন্দী হয়েছে। 'সাপ লুডো' বা 'ঝুলিয়া ডাকিনি' মিতভাষণের কৌশলে না-বলা কথাকে আভাসিত করেছে। 'মহুয়া' কবিতাটি ভাবপরিবেশ এবং পটপরিবেশ দুইকেই সার্থকতায় রূপায়িত করেছে।

রবীন সুর এক জীবনতন্ময় অথচ আত্মমগ্ন কবি। তাঁর যন্ত্রণাকে তিনি অভিমানে বড়ো করেন না, অহঙ্কারে ছোট করেন না। বেদনার বা বঞ্চনার ছবি যখন তিনি আঁকেন তখন তিনি এমন একটা সংযত বাগ্‌ভঙ্গি প্রয়োগ করেন যা ঐ বেদনাকে পরিচিত বিশিষ্টতার বাইরে নিয়ে যায়। প্রসঙ্গতঃ 'মর্গ' কবিতাটির কথা মনে পড়ে:

দেয়ালে রক্তের দাগ, জাল ওষুধের শিশি, ঘুমে জাগরণ—
ছবির ভিতরে শুধু মহাপুরুষের ম্লান চোখ,

স্ফীতোদর বণিকের ঠাণ্ডি ঘরে নষ্ট শস্য রয়েছে প্রচুর।

অথবা আর একটি কবিতায় :

মঞ্চে কেউ একা নেই
নেই দৃশ্য কোনো কুশীলব
যতদূর দৃষ্টি যায় চতুর্দিকে উৎকীর্ণ দর্শক
স্বকীয় স্বভাবে আমি চিরায়ত বাচাল সংলাপ
উদ্ভাসিত হতে পারি নেপথ্যের স্থিতপ্রজ্ঞ প্রম্‌টার ছাড়াও।

এই কবির নিজে নিজে কথা বলার তাগিদ প্রশংসনীয়। 'শব্দগুলি খুঁজে রাখো প্রস্তুতির যোগ্য সমাহারে'—এই কবির আত্মগত সংকল্প। সেই সংকল্পই তাঁকে করে তুলেছে দায়িত্বশীল। এই দায়িত্বশীলতার সঙ্গে তাঁর কবিচেতনার সমীকরণ ও একাত্মীভবন এখনই হয়েছে একথা বলব না, এখনি হবার কথাও নয়। এ থেকে শুধু এইটুকুই বোঝা যায় যে, সচেতনতার বশবর্তী হয়েই তিনি লিখে চলবেন।

আর একটা কথা, এখনো তিনি দার্শনিক ভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত নন। বলার চাল, ভঙ্গি, ছন্দ এসবের সঙ্গেই তাঁর নিজের কাছেই একটা প্রশ্নের উত্তর খোঁজা দরকার—কেন এত কিছুর আয়োজন? এ উত্তর আজই তিনি পাবেন না বটে, কিন্তু উত্তরটার নিবিড় অনুসন্ধানের ভিতরেই তাঁর কিছু কিছু পাওনা আছে। আমরাও সেটা পেতে চাইব। অন্যথায় তাঁর কবিতা বক্তব্যে ও আঙ্গিকরীতির দিক থেকে ক্রান্তিধর্মী হতে পারবে না। অথচ এই ক্রান্তিধর্মিতাই একজন কবির প্রাণশক্তি। 'অন্তর্গত নদী'র প্রায় একশত কবিতায় বলবার কথা এবং চালের মোড়ফেরাফিরি বড় দুর্লক্ষ্য। একজন বিকাশোন্মুখ কবির পক্ষে এটা লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য নয়।

তবু 'অন্তর্গত নদী' একজন পাঠককে আশ্বাস দেয়। প্রতিশ্রুতি দেয়। অপেক্ষা করতে বলে পরবর্তী কাব্যগ্রন্থের জন্য। যে গাঠনিক জ্ঞান, যে আবয়বিক concreteness-কে তিনি ভালোবেসেছেন তার একটা পরিণতি রচনার জন্য তিনি সচেষ্ট হবেন—এই বিশ্বাসও এই কাব্যগ্রন্থ দেয়॥

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়

সমাজ-সংস্থা আশা-নিরাশা : অশোক মিত্র। রূপা অ্যাণ্ড কোম্পানি। সাত টাকা।

অশোক মিত্রের এই সুশ্রী পুস্তকখানি দুই ভাগে সাজানো। প্রথম অংশের আটটি প্রবন্ধে ভারতের আর্থিক পরিকল্পনার নানাদিক পরীক্ষা করা হয়েছে। সাধারণভাবে পরিকল্পনার মূল যন্ত্রটিকেও খুলে দেখানোর চেষ্টা হয়েছে। পরিকল্পনার ভূমিকা থেকে পরিকল্পনার তমিস্রা পর্যন্ত পর্যটনের যে-চিত্র গ্রন্থকার এই পর্যায়ে এঁকেছেন তাতে একটা সামগ্রিক পর্যালোচনার আন্তরিক প্রয়াস লক্ষণীয়। কিন্তু আত্মনেপদী রচনা যেমন অল্পকালের জন্য পড়তে বেশ ভালোই লাগে, তেমনই ১৬৯ পৃষ্ঠা ব্যাপী তার আধিক্য ক্লান্তিকর হয়ে ওঠে। তারপর অশোক মিত্রের ভাষাতে এমন এক ধরনের অস্বস্তিকর চটক আছে যার ফলে মনে হতে পারে বিষয়কে ছাপিয়ে তা আত্ম-ঘোষণাতেই ব্যস্ত। এবং ভাষায় একটা গুরুচণ্ডাল দোষও চোখে পড়ে : একদিকে লেখাকে সুগম করার মাত্রা হারানো চেষ্টা, অপরদিকে 'উজ্জ্বল কজ্জল স্বপ্ন শোভা বুনন' থেকে 'প্রাবৃট অশান্তি' পর্যন্ত তাঁর বিলাসী 'প্রব্রজ্যা'। এরকম 'উচ্চকিত বিপ্লবী' লেখকের 'উত্তেজনার রলরোল' যে অচিরেই 'তমিস্র নিরাশা'য় পর্যবসিত হওয়া সম্ভব তা প্রায় ধরেই নেওয়া যায়।

অশোক মিত্র প্রখর বুদ্ধির অধিকারী। নিজের পাণ্ডিত্যে সংস্থিত হয়ে প্রয়োজনীয় কথা সর্বসাধারণের উপযুক্ত করে বলার কৌশলও তিনি বেশ জানেন। কিন্তু বারে বারেই প্রশ্ন ওঠে অশোক মিত্র তাঁর এই প্রবন্ধগুলিতে কি অর্থনীতি বিষয়ে তাঁর বক্তব্য জানাতেই প্রধানত ইচ্ছুক, নাকি এক নতুন ধরনের সাহিত্যিক খ্যাতির জন্য আগ্রহী? যদি দ্বিতীয়টিই প্রধান হয় তাহলে অন্য কথা। এবং বিষয়মুখী আলোচনার নিয়মকানুন থেকে স্খলিত হয়ে আত্ম-মুখী বিলাপের পাপমন্যতায় অবগাহন তাহলে হয়তো তেমন একটা বড়ো ত্রুটি বলে মনে হবে না। কিন্তু ধরে নিচ্ছি গ্রন্থকারের প্রকৃত উদ্দেশ্য তা নয়। তিনি বারো-তেরো বছর আগে সমাজ সংস্থা নিয়ে যে আশা-আকাঙ্ক্ষা রাখতেন তা আজ কেন নির্বাপিত একথাই আলোচনা করতে চান। কিন্তু সমাজের শ্রেণীগত সম্পর্ক না বদলালে ভারতবর্ষের আর্থিক প্রগতি ব্যাহত থাকবে এই প্রত্যয়ে তিনি এতদিন পরে স্থিত হয়েছেন ভাবলে অবাক লাগে। যদি ধরে নিই তাঁর এখনকার এই প্রত্যয়ে পৌঁছনোকে তিনি মোটামুটি মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গিরই সমর্থন বলে ইঙ্গিত করতে চাইছেন, তাহলে কি মনে করব যে বছর বারো-তেরো আগের তাঁর আশাময় দিনগুলিতে তিনি মার্কসবাদ দ্বারা তেমন চালিত

হন নি ? এখন নাকি তিনি বুঝেছেন যে "শেষ পর্যন্ত ইতিহাস তার দ্বান্দ্বিকতার নিয়মে প্রত্যাবর্তন করবেই" এবং "শ্রেণীবিভাজন বাদ দিয়ে অন্য কোনো সত্য নেই।" এসবই তো মৌলিক মার্কসবাদী কথা। অবশ্য পশ্চিমা ধনতন্ত্রের সংকট তথা নয়া-ঔপনিবেশিকতা, নিরক্ষর সমাজে শ্রেণীচেতনা বা শ্রেণীদ্বন্দ্বের প্রকৃতি, শ্রেণীসংগ্রামে ভদ্রলোক বুদ্ধিজীবীদের স্থান, ইত্যাকার বহুবিধ ব্যাপারে তাঁর দেখার ধরন মার্কসবাদী কষ্টিপাথরে কীভাবে যাচাই হবে বলা কঠিন। তাছাড়া, শুধুমাত্র আর্থিক পরিকল্পনায় আস্থা রাখেন কিংবা রাষ্ট্রীয়করণে প্রবল উৎসাহ প্রকাশ করেন বলেই অশোক মিত্রকে সমাজতন্ত্রী কিংবা মার্কসবাদী আখ্যায় ভূষিত করতে হবে এমন সিদ্ধান্তের কারণ নেই। আর্থিক পরিকল্পনা যে-পর্যায়ে পুঁজিবাদীদের গলাকাটাকাটির স্তরকে রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া পুঁজিবাদের স্তরে রূপান্তরিত হতে সাহায্য করে, সেখানে এমন কি বৃহৎ পুঁজিপতিরাও পরিকল্পনা ও রাষ্ট্রীয়করণের প্রসাদ ভোগ করার আশাই পোষণ করে। সোশালিসম্ অন্য ব্যাপার। অবশ্য অপুঁজিবাদী বিকাশের রাস্তায় আর্থিক পরিকল্পনা তথা রাষ্ট্রীয়-করণের বিশেষ গুরুত্ব থেকেই যায়। তবে অশোক মিত্র মহাশয় এদিকে একবারও চোখ ফেরাননি।

অশোক মিত্র মার্কসবাদীদের বিচারে হয়তো বাতিলই হয়ে যাবেন। কারণ তিনি নানাবিধ বিপ্লবী উচ্চারণের পরে পরেই হঠাৎ যেন আত্মগত হয়ে বলে বসেন : "অবশ্য যে সংক্রান্তি আজ অবশ্যম্ভাবী বলে মনে হয়, অনেক সময় কর্মচক্রে তার গতি অন্যরকম হয়ে যায়। সুতরাং আগামী পঞ্চাশ বছরের মধ্যে ধনতন্ত্র সম্পূর্ণ উচ্ছেদ পাবে এরকম প্রকট উক্তিতে পরিপূর্ণ আস্থা না রাখাই ভালো। কারণ ধনতন্ত্রের পক্ষেও হয়তো এখনো সময় আছে, এখনো উপায় আছে।"

বৈদেশিক 'সাহায্য'-কেই বোধহয় অশোক মিত্র সেই উপায় মনে করেন। হয়তো, ধনতন্ত্রের 'উৎপাদানাধিক্য সংকটকে' ঠেকিয়ে রাখার উপায় হিসেবে বৈদেশিক সাহায্যের যৌক্তিকতার থিওরিতে চেপে বসে না থাকলে শ্রীযুক্ত মিত্রদের "ধনবিজ্ঞানের বেসাতি"টাই চালু থাকবে না। এবং সেজন্যই মনে হয় ১৯৫৫ থেকে ১৯৬৭-র ক্রমনিরাশার যুগে বৈদেশিক ঋণ, কালো টাকা ও মুদ্রামূল্য হ্রাসের যে জটিল ষড়যন্ত্র ভারতবর্ষের রূপান্তরকে ব্যাহত করেছে সে সম্বন্ধে লেখক সচেতন ভাবেই নিরুত্তর।

আসলে, বামপন্থাবিলাসী উদারনৈতিকতাবাদী বুদ্ধিজীবী যদি প্রশাসনযন্ত্রের

উঁচু মিনারে অবস্থান করেন তাহলে সেখান থেকে বাস্তবকে উভমুখী দেখবেন সন্দেহ নেই। কারণ ঐ মিনারেই ঠাণ্ডা মাথায় অনেক আপাতবিরোধী থিওরির রসায়ন সম্ভব। এবং সম্ভব যে সেকথা স্টান্টের কৌশলে গ্রন্থকার নিজেই বলেছেন: "ধনবিজ্ঞানের বেসাতি ক'রে ব্যক্তিগতভাবে বর্তমানের নৈরাজ্য থেকে আমি নিজে কম লাভ করিনি, ভবিষ্যতে মনে হয়, আরো করবো, তাহলেও এখন মনে হয় সমাজবিপ্লব বাদ দিয়ে প্রগতি অসম্ভব।" অশোক মিত্র তাঁর এই উক্তির পক্ষে সমীচীন কোনো অন্তর্দ্বন্দ্বে কিংবা গ্লানিতে ক্লিষ্ট কিনা তাঁর অন্তর্যামীই জানেন। তিনি যতই কেন না ফলাও ক'রে তাঁর দুঃখের কথা প্রচার করুন, অনেকেরই তাতে উৎসাহ না থাকতে পারে। তথাচ বলব অশোক মিত্র—এবং সম্ভবত একমাত্র অশোক মিত্রই—তাঁর নানারকম প্রবন্ধের ভিতর দিয়ে এদেশের একটি বিশেষ শ্রেণীচরিত্রের অপদার্থতার কথা ঘোষণা ক'রে চলেছেন। তাঁর বর্ণিত এবং আমাদের চেনাজানা এই শ্রেণীর অন্তর্গত কেউ কেউ হয়তো সত্যিই এক ধরনের ট্র্যাজিক আত্মগ্লানিতে আচ্ছন্ন, ক্লান্তির বলি রেখা সহজেই যাঁদের মুখে চোখে কপালে গাঢ় হয়ে উঠেছে। নিজের ব্যক্তিগত পাপমগ্নতার বোধ নিজের বুকের মধ্যে লুকিয়ে রেখে অশোক মিত্র যদি এই দুই-নৌকার বুদ্ধিজীবীদের আন্তরিক ট্র্যাজিকবোধের আকৃতি-প্রকৃতি বিশ্লেষণী ভঙ্গিতে বোঝাতে পারেন, তাহলেই তাঁর রচনা বিষয়মুখী হবে এবং তা থেকে সমাজতাত্ত্বিকেরাও কিছু জ্ঞান পাবেন। কারণ গ্রন্থকারের জ্ঞানদানের কৌশলটি সত্যিই অসামান্য—নিপুণ অধ্যাপকের স্বাক্ষরবাহী।

সমীর দাশগুপ্ত

ক্যাপ্টেন হুররা

নক্ষত্র" নিবেদিত "ক্যাপ্টেন হুররা" দেখলাম। নাটকটি একদা কিমিতি-বাদী নাট্যকাররূপে চিহ্নিত—বর্তমানে স্বনামধন্য মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের। নাট্যকার হিসেবে ওঁকে আমি গোড়া থেকেই দৃষ্টিগোচরে রেখেছি। আশ্চর্য এক উত্তাপ এবং মমতা নাট্যকারকে বারংবার মানুষের প্রতি মুগ্ধ করে রেখেছে। একমাত্র ওই এক জায়গায় তিনি যথার্থই সার্থক। "ক্যাপ্টেন হুররা" নাট্যকারের বলিষ্ঠ মানবতাবোধ এবং দৃঢ় অগ্রগতিকেই সূচিত করে। মানুষের একতাই মানুষের মুক্তির একমাত্র পথ—কথাই নিঃসন্দেহে বলিষ্ঠ, নাট্যকার তীব্র সচেতনতার সঙ্গে উক্ত ঘোষণা করেছেন। বিভিন্ন মত ও পথের মানুষকে একতাবদ্ধ করার মহৎ সঙ্কল্প ছিল ক্যাপ্টেন হুররার, এই সঙ্কল্প আপনার—আমার—এবং হয়তো সকলেরই। কিন্তু শুধু বক্তব্যই নাটক নয়, বক্তব্যকে সহজ সরল করার দায়িত্ব ছিল নাট্যকারের। মোহিত চট্টোপাধ্যায় কিন্তু কাব্য-তন্ময়তা এবং নাটকীয় জটিলতার দিকেই বেশি আকৃষ্ট হয়েছেন। ফলে ঘটনায় এসেছে সহস্র উদ্ভটত্ব এবং চরিত্রগুলি প্রায় সবই টাইপ। এতে নাটক অতি সহজেই কমে যায়—কিন্তু অত সহজে সহজবোধ্য হয় না। চিন্তার বলিষ্ঠতা আছে বলেই মোহিতবাবুকে আরো স্পষ্টতর হবার অনুরোধ জানাই। দুর্বোধ্যতা বৃহত্তর জনসাধারণকে বঞ্চিত করবার উপায় মাত্র। শহুরে হাততালির প্রকৃত কোনো মূল্য নেই যদি তা গ্রামেও প্রতিধ্বনি না তোলে। "ক্যাপ্টেন হুররা" ঐক্যবদ্ধ মানুষের নাটক। কিন্তু সেই বোধটুকু নিতান্তই বুদ্ধিগ্রাহ্য। একটি জাহাজ—তার ক্যাপ্টেন—এবং একটি ম্যাপ নতুন এক শোষণমুক্ত দেশের সন্ধান দিচ্ছে, এটাই বড় কথা নয়। আসল প্রশ্ন হলো—এই নাটক কতজনকে প্রকৃতই সন্ধানী করে তুলছে। আশা করি নাট্যকার এ-বিষয়ে চিন্তা করবেন।

প্রয়োগনৈপুণ্যে নক্ষত্র-গোষ্ঠির সুনাম অবিসংবাদী। বর্তমান নাটকেও শ্যামল ঘোষ তাঁর কঠিন দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। আঙ্গিক প্রাধান্যের দিকে এঁদের ঝোঁক প্রবল। কিন্তু বর্তমান নাটকে সেই ঝোঁক প্রাধান্য পায়নি। আলো এবং সঙ্গীত সুদক্ষ ব্যবহারের গুণে প্রায় বাড়তি দুটি চরিত্র হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথের দেশপ্রীতিমূলক গানের এমন সার্থক

ব্যবহার আগে শুনিনি। আলোর টাইমিং বিস্ময়কর। যদিও কোনো কোনো অংশে সংলাপ আমার শ্রুতিগোচর হয়নি—তবু সংলাপ উচ্চারণের বিচিত্র ছন্দময়তা নতুন পরীক্ষা। আমার মতে প্রয়োগপ্রধান এই পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়েছেন। শ্বাস-যতির এমন নাটকীয় ব্যবহার যথার্থই সার্থক। দৃশ্যসজ্জা নাটকের প্রয়োজন অনুসারে উপযোগী এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে আরো বেশি কিছু। অভিনয় ক্ষেত্রে কোনো চরিত্রকে বিশেষ প্রশংসা করার পক্ষপাতী আমি নই। আমার ধারণা—এই জাতীয় প্রশংসা পরিণামে শিল্পী এবং দলের ক্ষতি করে। তবু বর্তমান নাটকে ক্যাপ্টেন হুররার চরিত্রাভিনেতা তিনু বন্দ্যোপাধ্যায়কে ধন্যবাদ জানাবই। একটি অত্যন্ত দুরূহ চরিত্রকে তিনি সাবলীল করে তুলেছেন। পরবর্তী চরিত্র ফান্টুস রূপে নীলকণ্ঠ সেনগুপ্ত। চরিত্রের সঙ্গে একাত্মতার উজ্জ্বল উদাহরণ এই অভিনয়। আর বেশি নাম করব না। দলগত নৈপুণ্যই "নক্ষত্রের" বিশেষত্ব। সেদিক থেকে সমগ্র দলকেই সাধুবাদ জানাই একটি অত্যন্ত কঠিন নাটককে সংবেদনশীল রূপায়ণের জন্য। পরিশেষে ইরা চরিত্রে শর্মিষ্ঠা ঘোষ সম্পর্কে কিছু বলা দরকার। ক্ষেত্র বিশেষে তাঁর সাবলীলতা অনবদ্য, কিন্তু কখনো কখনো অপ্রত্যাশিত জড়তা সমগ্র চরিত্র চেতনাকে বিব্রত করেছে। অন্যথায় "ক্যাপ্টেন হুররা" একটি ভিন্ন স্বাদের প্রযোজনা। সব কিছু স্বীকার করেও আমার মৌলিক প্রশ্নটি শ্যামল ঘোষের কাছেও রাখছি—বারংবার জটিল এবং দুর্বোধ্য নাটক করাটা কি সত্যিই আমার দেশের মানুষের প্রতি মমতার পরিচায়ক ?

অমর গঙ্গোপাধ্যায়

নব অরুণোদয়, জয় হোক

সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে নতুন ফ্রন্ট বাঙলাদেশ

৩রা ডিসেম্বর। ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী সেদিন অপরাহ্নে কলকাতায় এক জনসভায় ভাষণ দিচ্ছেন। আরও দুজন বিশিষ্ট কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, স্বয়ং প্রতিরক্ষা মন্ত্রীও সেদিন রাজধানীর বাইরে। আর ঠিক তখনই পাকিস্তানী সমরযন্ত্র ভারতের উপরে নখদন্ত বিস্তার করে ঝাঁপিয়ে পড়ল। ৩রা ডিসেম্বর অপরাহ্নেই পাকিস্তানী বিমানবহর ভারতের অন্যান্য কয়েকটি সামরিক গুরুত্বপূর্ণ স্থানসহ অমৃতসর, পাঠানকোট, শ্রীনগর, এমনকি ভারতের গভীর অন্তঃস্থলে অবস্থিত আগ্রাতেও বোমাবর্ষণ করল! ভারতে সে-দিনই ঘোষিত হলো 'জরুরি অবস্থা'। পাকিস্তান তার আগেই ঘোষণা করে দিয়েছে ভারতের বিরুদ্ধে 'যুদ্ধাবস্থা'। পাকিস্তানের সমরচক্রের এই ঘোষিত যুদ্ধ অঘোষিত যুদ্ধাবস্থার শেষঅঙ্ক মাত্র।

গত ২৫এ মার্চের পর থেকে ভারতের বিরুদ্ধে নানা মাপের আক্রমণ চালাচ্ছিল পাকিস্তান। পাকিস্তানের পেছনে ছিল সাহস জোগাতে সাম্রাজ্য-বাদের পালের গোদা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। এমন কি সমাজবিপ্লবের নামে যারা দরবিগলিত এবং এ-যুগের মূল সত্য 'সাম্রাজ্যবাদ ও জাতীয় মুক্তি-সংগ্রাম-এর মধ্যে দ্বন্দ্ব' বলে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের বিরোধিতা করে, 'সমাজতন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদের বিরোধই মূল বিরোধ' ঘোষণাকে যাঁরা বলতেন 'শোধনবাদ'—সেই চীনের 'কমিউনিস্ট' নায়করাও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে কূটনৈতিক মৈত্রীর ফিকিরে—নাকি কোন অনৈসর্গিক কারণে—দুর্দৈবের মতো পাকিস্তানের সঙ্গী হয়ে উঠলেন। ২৫এ মার্চের রাত্রি থেকে সারা বাঙলাদেশে পাইকারি ভাবে যে-গণহত্যা এবং গণতান্ত্রিক অভিব্যক্তিকে চূর্ণ করার যে-চণ্ড আক্রমণ চলে, তারই ফলে কেবল মাত্র প্রাণ বাঁচাতে ভারতে আশ্রয়প্রার্থী হয়ে আসেন বাঙলাদেশের প্রায় এক কোটি নরনারী। আমরা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বকলম পাকিস্তানী চাপের ব্যাপারে অবহিতই ছিলাম। আমরা জানতাম যে, ভারতে মার্কিন তাঁবেদার মহাজোটের নির্বাচনী ভরাডুবির পর, ভারতের খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হবার ফলে এবং ক্রমশ সমাজতন্ত্রী শিবির বিশেষভাবে সোভিয়েতের সঙ্গে বৈষয়িক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক গড়ে ওঠার জন্য—নয়া উপনিবেশবাদীদের

লম্ফঝম্ফ ভারতে দুর্বল হয়ে পড়ছে। অন্যদিকে পাকিস্তানেও গত বছর ডিসেম্বরের নির্বাচনের মধ্য দিয়ে গণতান্ত্রিক শক্তির বিপুল অভ্যুদয় লক্ষ্য করা গেল। পরিষ্কার বোঝা গেল এ-উপমহাদেশে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের পাততাড়ি গুটোবার সময় হয়েছে। ভরাডুবির আগে পাশব আক্রমণকে শেষ অস্ত্র মনে করে 'গণতন্ত্রের' নামাবলীর তলে লুকানো সাম্রাজ্যবাদের বীভৎস ও ভয়াল আসল রূপটি বের করল এবার তারা। বাঙলাদেশে চালাল তারা গণহত্যা, অন্তত ভয়ে-সন্ত্রাসে যাতে বাঙলাদেশের মানুষ ত্রস্ত হয়; আগামী কয়েক প্রজন্ম ধরে কেবলমাত্র আর্থনীতিকভাবেই দাস নয়—সামগ্রিকভাবে যাতে একটি দাস জাতি—মস্তিষ্কহীন, কর্মশক্তিবিহীন, নিশ্চরিত্র মেরুদণ্ডহীন একটি সংকর জাতি—বাঙালি যেন জন্মাধিকারসূত্রে দাস-জাতি হয়ে পড়ে— ই লক্ষ্যসাধনে তারা ব্যাপকভাবে বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করে, যুবকদের নিশ্চিহ্ন করে, নারীদের ধর্ষণ করে, বাঙলাদেশের নবজাগ্রত জাতীয়তাবোধকে অঙ্কুরেই বিনাশ করতে এই আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে নবজাগরণের নায়ক শেখ মুজিবর রহমানকে তারা বন্দী করল। সাম্রাজ্যবাদীদেরও জানা—এ-যুগে বলিষ্ঠ জাতীয়তা আন্তর্জাতিকতাকেই অঙ্গীকৃত করে, সামিল হয় তা সমাজতন্ত্রের পথে। বাঙলাদেশের এই নব-জাগরণকে তারা চূর্ণ করতেই বদ্ধপরিকর ছিল। আর উপরি লাভ তারা ভেবেছিল—ব্যাপকভাবে হিন্দু বিতাড়নের মধ্য দিয়ে ভারতে দেখা দেবে সাম্প্রদায়িকতা। ভেবে পুলকিত হচ্ছিল, কোটি কোটি শরণার্থীর চাপে ভারতের স্বনির্ভরতার স্বপ্নসাধ হয়ে পড়বে অচরিতার্থ। কিন্তু মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও তার সেবা-দাসেরা সফল হলো না, বরং আক্রমণের প্রতিরোধে শিরদাঁড়া সোজা করে দাঁড়াল বাঙালি জাতি। লক্ষ লক্ষ তরুণ মুক্তিফৌজে নাম লেখাল। স্বাধীনতা ঘোষণা করল বাঙলাদেশ। হলো 'গণপ্রজাতান্ত্রিক বাঙলাদেশ'-এর অভ্যুদয়। ভারতবাসীরা মার্কিনী সাম্রাজ্যবাদের চাপেতো বিহ্বল হলোই না, বরং তারা আন্তর্জাতিক দায়িত্ব পালন করতে আপ্রাণ সমর্থন-সহায়তা দিল এই শরণার্থীদের। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি মজবুত হলো ভারতে। এগিয়ে এল বিশ্ববিবেক। মহান সোভিয়েতভূমি পাকিস্তানী জঙ্গীচক্রকে নিন্দা করলেন। সমাজতান্ত্রিক বিশ্বে ধ্বনিত হলো বাঙালি জাতির প্রতি সমর্থন। কেবল সমাজতান্ত্রিক শিবিরই নয়, দেশে দেশে মানবতায় বিশ্বাসী মানুষ ও শ্রমিক জনগণ বাঙলাদেশের পক্ষে এগিয়ে এলেন। বিশ্বের কমিউনিস্ট পার্টিগুলি, ট্রেড ইউনিয়ন, শান্তি সংসদ ও বহু আন্তর্জাতিক সংস্থা এগিয়ে এলেন বাঙলাদেশের সমর্থনে। ভিয়েতনাম থেকে

কিউবা, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত ও বিজয়ী জাতীয় মুক্তি-সংগ্রামের ফলকশীর্ষ দেশগুলির মানুষ সমর্থন জানায় বাঙলাদেশকে।

বাঙলাদেশের বিরুদ্ধে সুকৌশলী চক্রান্ত

আর এ সময়েই চীনদেশ জাতিসংঘে তার ন্যায্য আসন দখল করলেন। আমরা ভেবেছিলাম, বিশ্বজোড়া সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামের ঝঞ্ঝাকেন্দ্র এখন যখন বাঙলাদেশ, চীন এগিয়ে আসবে বাঙলাদেশের সমর্থনে। বাঙলাদেশে গণহত্যার বিরুদ্ধে তো কোনো কথা তাঁরা বললেনই না বরং ভূতের মুখে রাম নামের মতো ফরমান দিতে লাগলেন—ভারত সোভিয়েতের সঙ্গে আঁতাত করে পাকিস্তানের 'আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ' করছে। দৌড়ে এলেন মার্কিন দেশের ধুরন্ধরেরা। মুক্তিবাহিনীর আক্রমণে ভরাডুবি যদি সত্যিই হয়, তবু ঘুরপথে যাতে আবার ফিরে আসা যায় সেজন্য বেসরকারী স্তরে বাঙলাদেশের পক্ষে একটু আধটু বাতচিতও করলেন তাঁরা এবং সঙ্গে সঙ্গে ব্যাপক গোয়েন্দা জাল বিস্তার করলেন। শোনা যায়, বাঙলাদেশের মুক্তি-বাহিনীর মধ্যেও ফাটল ধরাবার ব্যর্থ চেষ্টা তাঁরা করেছিলেন। চীনা অভিসন্ধি কি, তা বোঝা না গেলেও দেখা গেল পশ্চিমবঙ্গে বাঘা বিপ্লবী পার্টির সর্ষের মধ্যেই বসে আছে পাকিস্তানী অর্থভোগী ভূত। বকলমে আমেরিকার। 'ইন্দিরা ইয়াহিয়া এক হ্যায়' ধ্বনি দিয়ে যে সঙ্কীর্ণতাবাদীরা ২৫এ মার্চের পর রণহুঙ্কার ছেড়েছিলেন, গোটা বাঙলাদেশ মুক্তি আন্দোলনে তাদের দু-একবার বিবৃতি ছাড়া কোনো পাত্তা দেখা গেল না। বরং তাঁরা ব্যাপক গণতান্ত্রিক ফ্রণ্ট গঠন করার জন্য সাহায্য না করে এক তথাকথিত জাতীয় মুক্তি কো-অর্ডিনেশন কমিটি গড়ে দিতে ডেকে আনলেন বাঙলাদেশের ব্যাপকভিত্তিক আন্দোলন থেকে দলছুট এক গুরুত্বহীন অংশকে। 'শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্ব না থাকলে এ বিপ্লব গুরুত্বহীন' ইত্যাদি প্রচারের মধ্যে বিভ্রান্তির বিষ আনতে চাইলেন। ইয়াহিয়ার ভৃত্য ও চর মশিউর রহমান নামে এক বহুরূপীকে তাঁরা কোলও দিলেন। আওয়ামী লীগ, বাঙলাদেশ জাতীয় আওয়ামী পার্টি ও কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে একে সঠিকভাবেই বলা হলো জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করবার কার্যকলাপ।

চক্রান্তের বিরুদ্ধে দৃঢ় ঐক্য

আর এ অবস্থাতেই গত ৯ই আগস্ট ভারত সোভিয়েত মৈত্রী ও

সহযোগিতার চুক্তি স্বাক্ষরিত হলো। বলাইবাহুল্য মহাজোটের সাঙ্গপাঙ্গরা চেঁচামেচি জুড়লেন। বললেন, গেল, গেল, গোষ্ঠীনিরপেক্ষতা গেল। অথচ এঁরা অনেকদিন থেকেই মার্কিন জোটে ভারতকে যোগ দেবার জন্য চাপ দিচ্ছিলেন। আর সঙ্গে সঙ্গে গর্জে উঠলেন বাঘা বিপ্লবীরা। বললেন, 'এ চুক্তি বাঙলাদেশের স্বাধীনতা অর্জিত যাতে না হয়, সেটাই সাব্যস্ত করার জন্য সোভিয়েতের চাপ। এ-চুক্তি ভারত-সরকার কর্তৃক বাঙলাদেশকে স্বীকৃতি দিতে নারাজ করবে।' আমরা বরং খুশি হলাম দেখে যে বাঙলাদেশের সরকার এই চুক্তিকে দু-হাত তুলে স্বাগত জানালেন। বাঙলাদেশের সংগ্রামে ব্যাপক যে-গণতান্ত্রিক ঐক্য গড়ে উঠেছে, তাকে বাস্তব রূপ দিল আওয়ামী লীগ, জাতীয় আওয়ামী পার্টিদ্বয় ও কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিনিধি দ্বারা গঠিত উপদেশক কমিটি। অতিদক্ষিণ ও অতি বামের কার্যকলাপে যখন সাধারণ মানুষ বিব্রত হলো না, তখন অতি দক্ষিণেরা বললেন, বাঙলাদেশকে সমর্থন করলে ভারত টুকরো টুকরো হয়ে যাবে, অতি বামরা বললেন, 'ভারত চলেছে বাঙলাদেশকে উপনিবেশ বানাতে' 'বুর্জোয়া-ল্যাণ্ডলর্ডদের সরকার নতুন খেলা শুরু করেছে।' আমরা বরং দেখলাম, দক্ষিণ-বামদের মুখে ছাই দিয়ে ভারতীয় জনগণ বাঙলাদেশের পক্ষে আরও বেশি ঐক্যবদ্ধ হলেন, দেখা গেল বাঙলাদেশ সরকার ঘোষণা করলেন সমাজতন্ত্রই তাঁদের আদর্শ। ভারতের মাটিতে সাম্রাজ্যবাদ ও তার নতুন দোস্তদের চেলাচামুণ্ডা চমূ ও হঠকারীদের সব প্রচার ও কার্যকলাপ ব্যর্থ হলো।

ঐক্যের সম্মুখে পরাস্ত মার্কিন সেবাদাসরা

তখনই প্রত্যক্ষ আক্রমণের জিগির তুলল পাকবাহিনী। গত ২৩এ নভেম্বর পাক-রাষ্ট্রপতি ইয়াহিয়া খাঁ পাকিস্তানে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করলেন। তার পরেই 'রিজার্ভিস্ট'দের সৈন্যবাহিনীতে ডাকা হলো। ২৭এ নভেম্বর পাক-সামরিক কর্তৃপক্ষ বেসরকারী লরি প্রভৃতি সীমান্তে সৈন্য ও রসদ পাঠাবার জন্য তলব করলেন। পশ্চিম পাকিস্থানে বে-আইনি ঘোষণা করা হলো জাতীয় আওয়ামী পার্টিকে। বাঙলাদেশে পাক-হানাদার সৈন্যরা তাদের ভৃত্য জল্লাদবাহিনী রাজাকার (তথাকথিত স্বেচ্ছাসেবী) বাহিনীদের ধ্বনি দিতে শেখাল 'চলো কলকাতা'। আক্রমণ করল তারা আগরতলা, বালুরঘাট, হিলী। পশ্চিমে পাক-সৈন্যবাহিনীর মুখে বর্বর দুই ধ্বনি, 'ক্রাস ইণ্ডিয়া' ও 'কিস ইন্দিরা'। ৩রা নভেম্বর তারা ভারত আক্রমণ করল বিমান-সাঁজোয়া-নৌ-বাহিনীর

সহায়তায়। ভারত বাধ্য হয়ে আত্মরক্ষায় অবতীর্ণ হলো। ৬ই নভেম্বর ভারত 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাঙলাদেশ'কে রাষ্ট্র হিসাবে স্বীকার করে নিল। সারা ভারত ও বাঙলাদেশে আনন্দের বন্যা বয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে সৌভ্রাতৃত্ব-বন্ধনে আবদ্ধ দুটি দেশের জনগণ শপথ নিলেন, তাঁদের আরব্ধ কাজ সম্পন্ন করার জন্য। ভারতীয় বাহিনী ও বাঙলাদেশের মুক্তিবাহিনীর যৌথকমাণ্ডও ঢাকার পথে এগিয়ে চলল। আর বিজয় যখন মুক্তি ও মিত্রবাহিনীর প্রায় করায়ত্ত তখন বঙ্গোপসাগরে দেখা দিল মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের পিটুনি-নৌবাহিনীর সপ্তম নৌবহরটি। আমরা তার জন্যে অবশ্য তৈরিই ছিলাম। কেননা, 'ভারত-পাক-বাঙলাদেশ' উপমহাদেশে শান্তি বিঘ্নিত হবার একমাত্র কারণ যে বাঙলাদেশের জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে দমন করে গণহত্যা ও সেখানে বন্দুক-রাজ বহাল রাখা আর ভারতে এককোটি শরণার্থী পাঠানো—এ সম্পর্কে একটিমাত্র কথা না বলে, 'যুদ্ধ থামাও যুদ্ধ থামাও' বলে মার্কিন চীনা হাঁকাহাঁকির আসল অর্থ যে পাক-বাহিনীর শূন্যকুম্ভ রণহুঙ্কার-এর জবাব ভারত ও মুক্তিফৌজ সক্রিয়ভাবে দিচ্ছে—একথা আমাদের তখন স্পষ্ট হয়ে গেছে। আমরা জানি যে নয়া ঔপনিবেশিকরা সদ্যস্বাধীনদেশ কব্জা করার জন্য প্রথমে সেখানে এক পুতুলসরকার বানায়, দ্বিতীয়ত তাকে বেঁধে ফেলা হয় সিয়াটো সেণ্টোর মতো সামরিক আঁতাতে। শেষ রক্ষা না হলে নিজেই শেষে নেমে পড়ে সৈন্যসাবুদ নিয়ে। এবার আবার সে সত্যই প্রমাণিত হলো। প্রমাণিত হলো এ-যুগ সাম্রাজ্যবাদের পরাজয়েরই যুগ। সমাজতন্ত্র, আন্তর্জাতিক শ্রমিকশ্রেণী, জাতীয় মুক্তিসংগ্রাম-এর মহান ঐক্যবদ্ধ ফ্রন্টের যুগ।

কে বন্ধু কে শত্রু

৩রা থেকে ১৬ই ডিসেম্বর। ভারতভূমি পাক-সৈন্যদের দ্বারা আক্রমণের শুরু থেকে ১৬ই ডিসেম্বর বাঙলাদেশে পাক দখলদার বাহিনীর নিঃসর্ত আত্ম-সমর্পণের সারা পর্যন্ত ঘটনার বৈচিত্র্য ছিল দিশাহারা হয়ে যাবার মতো। কিন্তু ভারত বা বাঙলাদেশের মানুষ যে দিশা হারাননি, তার একটাই কারণ ছিল, তাঁরা বুঝেছিলেন তাঁরা নিঃসঙ্গ নন। কেননা বিশ্ববিবেকের শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি সোভিয়েতভূমি গৌরবময় ভূমিকা নিয়ে দাঁড়িয়েছিল তাঁদেরই পাশে।

ভারত আক্রান্ত হবার পর ৪ঠা ডিসেম্বর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারতকেই আক্রমণকারী বলে ঘোষণা করল, বলল, "Indian policy in a systematic

way has led to perpetration of the crisis", এবং "India bears the major responsibility for the broader hostilities which have ensued." এবং তারাই বাঙলাদেশের প্রতিনিধিকে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে ভাষণ দেবার জন্য আমন্ত্রণ করার প্রস্তাবের বিপক্ষে জোর তদ্বির করে সফল হলো। অন্যদিকে পাক কাগজে বাঘদের পরাজয় যখন সুনিশ্চিত তখন ভারতকে আক্রমণকারী হিসাবে সাব্যস্ত করে অস্ত্রসংবরণের জন্য নানা ভোল বদল হয়ে মার্কিনী প্রস্তাব আসে—যে প্রস্তাবের অন্যতম রচয়িতা চীনও বটে। বাঙলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম ও ভারতের প্রতিরক্ষা সংগ্রামে তিনটি ফ্রন্ট ছিল। প্রথম ফ্রন্টে বাঙলাদেশের মাটিতে মার্কিন গোলামবাহিনীর বিরুদ্ধে যৌথভাবে লড়ছিলেন মুক্তি ও মিত্রবাহিনী। দ্বিতীয় ফ্রন্টে, ভারতের পশ্চিম সীমান্তে ও সমুদ্রে লড়ছিলেন ভারতীয় বীর পদাতিক; বিমান ও নৌ-বাহিনী। তৃতীয় ফ্রন্টে, জাতিসমূহের দরবারে লড়ছিলেন ভারতের সঙ্গে একযোগে সোভিয়েত মিত্রবাহিনী। জাতিসংঘের নাম কোরিয়ায় ১৯৫০ সালে হস্তক্ষেপের মতো জঘন্য যুদ্ধবাজ চক্রান্তকে বরবাদ করে দেয় পরপর তিনবার 'ভেটো' প্রদান করে সোভিয়েত ইউনিয়ন। কেবল মাত্র আন্তর্জাতিক ভূমিকাতেই সোভিয়েত ভূমি লড়াই করেনি, সোভিয়েত শ্রমিকের তৈরি ট্যাঙ্ক ও বিমানপোত নিয়েও ভারত পর্যুদস্ত করল পাক-জল্লাদ বাহিনীকে। ঢাকা বিজয়ের পথে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয় মুক্তি ও মিত্র বাহিনীর নায়কতায় সোভিয়েত উভচর ট্যাঙ্ক। কেবল তাই নয় ভারত ও বাঙলাদেশকে ব্ল্যাকমেল করার জন্য মার্কিন পিটুনি সপ্তম নৌ-বাহিনীর পেছনে তাড়া করে এলো সোভিয়েত নৌ-বাহিনী। দক্ষিণ এশিয়ায় শান্তি ও স্বাধীনতা রক্ষার জন্য সোভিয়েত ইউনিয়ন দারুণ ঝুঁকি নিল। ভারত-সোভিয়েত মৈত্রী, শান্তি ও সহযোগিতার চুক্তির গুরুত্ব কি অসীম তা দক্ষিণ-বামের সমালোচনার বাড়াভাতে ছাই দিয়ে আবার প্রমাণিত হলো।

'গভীর রাতে লেখা'

বাঙলাদেশে দখলদার পাক-বাহিনীর উদ্দেশে তখন ভারতের স্থলবাহিনীর প্রধান জেনারেল মানেকশ জানাচ্ছিলেন আত্মসমর্পণের নির্দেশ। অযথা লোকক্ষয় নিবারণের জন্যই ঘোষিত হচ্ছিল এই নির্দেশ। কিন্তু মার্কিন ও চীনা সাহায্যের ভরসায় দখলদার বাহিনীর প্রধান তখনও অনড়। গুরুত্বপূর্ণ সামরিক স্থানগুলি

প্রতিমুহূর্তেই মুক্তি ও মিত্র বাহিনীর করতলগত হচ্ছিল। দখলদার বাহিনীর প্রধান নিয়াজি তখনও ভরসা করে আছেন মার্কিন সপ্তম নৌবহরের মৃত্যুবর্ষী বিমানবাহিনী এবং হাজার হাজার দস্যু সৈন্যের উপর। আর যখন দেখা গেল তাতেও আত্মরক্ষা করার উপায় নেই তখন রাতের অন্ধকারে সুপরিকল্পিতভাবে বুদ্ধিজীবীদের ধরে ধরে হত্যা শুরু হলো। শিক্ষক-অধ্যাপক-লেখক-সাংবাদিক-আইনজীবী-যন্ত্রবিদ-চিকিৎসক সেই পৈশাচিক হত্যালীলায় শিকার হলেন। সাম্প্রদায়িকতার বিষে উন্মত্ত আলবদর, মুসলিম ছাত্র পরিষদ প্রভৃতি সংগঠনগুলির এই জঘন্য হত্যাকাণ্ডে প্রত্যক্ষ ভূমিকা ছিল। প্রায় তিন হাজারেরও বেশি বুদ্ধিজীবীকে হত্যার এক চক্রান্ত করে তারা। প্রায় তিনশো বুদ্ধিজীবীকে পাক-দখলদার বাহিনী তাদের সাঙ্গপাঙ্গদের সহায়তায়, আত্মসমর্পণের আগেই হত্যা করে।

বুদ্ধিজীবীদের হত্যা এ-দুনিয়াতে নতুন নয়। মধ্যযুগে অনুরূপ ঘটনার কথা আমরা শুনেছি। ম্যাকার্থিবাদের যুগে এই সেদিনও বুদ্ধিজীবীদের উপরে আক্রমণ এসেছিল আমেরিকায়। ফ্যাসিস্তদের তো 'কালচার' শব্দটি শুনলে পিস্তলের বাঁটে হাত চলে যায়। প্রসঙ্গত মনে পড়ে অন্য একটি ঘটনা। ১৯৩১ সালের ২১এ ফেব্রুয়ারির রাতে সাংহাইতে কুওমিনটাং সরকার চব্বিশ জন লেখক-অভিনেতা-শিল্পীকে গুলি করে হত্যা করে। চীনের গোর্কি লু স্যুন তার প্রতিবাদে লিখেছিলেন 'গভীর রাতে লেখা'। তাতে তিনি বলেছিলেন, "চীনের অতীতে, প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত বন্দীকে শহর ঘুরিয়ে নিয়ে আসত। সে বলতে পারত চিৎকার করে, ইউ এন ওয়াং—আমি নির্দোষ। সে বিচারককে দোষী করতে পারত, ঘোষণা করতে পারত নিজের বীরত্বের কাহিনী। ...সমবেত জনতা অভিনন্দন জানাত তার বীরত্বের জন্য। মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ত তার কথা।"

১৯৩১ সাল, আর ১৯৭১ সাল। ব্যবধান মাত্র চল্লিশ বছরের। এর মধ্যে চীনও ভুলে গেল তার দুঃখদিনের যন্ত্রণার কথা! কোন্ জাত্যন্ধতা এবং অন্ধ সোভিয়েত ও ভারত-বিদ্বেষ তাকে বাঙলাদেশে গণহত্যার বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে দিল না?

চীন কি বোঝেনি, বাঙলাদেশের উপরে আক্রমণের অর্থ তৃতীয় বিশ্বে সাম্রাজ্যবাদীদের ঘাঁটি বিস্তারেরই এক লক্ষ্যণীয় উদাহরণ? চোখের সামনেই তো প্রমাণ হয়ে গেল, বাঙলাদেশে পরাজয়ের পর মার্কিন রণদানবেরা বীভৎস-

ভাবে বোমাবর্ষণ শুরু করে দিল উত্তর ভিয়েতনামে।

আমরা পাক-মার্কিন সামরিক জোটের বাঙলাদেশের উপরে এই ঘৃণ্য আক্রমণের প্রতিবাদ জানাই, ঘৃণা জানাই। গণপ্রজাতন্ত্রী ভিয়েতনামের উপরে মার্কিন বোমাবর্ষণের তীব্র প্রতিবাদ করি। ভিয়েতনামের যুদ্ধাপরাধী হিসাবে জনসনকে বিচার করেছিলেন বেসরকারীভাবে লর্ড বার্ট্রাণ্ড রাসেল-এর নেতৃত্বে বিশ্বের মুক্তবুদ্ধি শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিজীবীরা। খুনি ইয়াহিয়া আর তার মানুষ নামধারী অনুচরদের কি বিচার হবে না? যুদ্ধবন্দী নয়, বিশ্বের দরবারে মানবতার জঘন্য শত্রু হিসাবে এদের মধ্যে যারা চক্রান্ত করেছে ও চক্রান্তকে কার্যকরী করেছে তাদের কি বিচার হবে না? তবে মিথ্যাই জাতিসংঘ, মিথ্যাই তেহেরাণ আলোচনার ফলাফল, ব্যর্থ নুরেমবূর্গের নির্দেশ।

লু স্যুনের 'গভীর রাতের লেখা' থেকেই বলি, অন্তত চীনেরই উদ্দেশে: "চীনের প্রথা—মৃত্যুর পর কাগজ পোড়াতে হয় মৃতের স্মরণে। পোড়ানো কাগজের ছাইয়ের পাহাড় না দেখেও পাশ কাটিয়ে যেতে পারো তোমরা। ধসে পড়া দেয়ালের একটা দাগ হয়তো তোমাদের নজরেও পড়বে না। কিন্তু সেখানে রয়েছে ভালোবাসা আর শোকের স্বাক্ষর, রয়েছে ক্রোধের অগ্নিকণা। মানুষের ভাষায় বুঝি এমন করে তা প্রকাশ করা যায় না। তবু আজ ভাষা চাইছে সেই চাহিদা মেটাতে। ...যখন শুনি, তাঁরা কি করে মরলেন, আমার বুক ব্যথায় ভরে যায়। অন্ধকার ঘরে নিঃসঙ্গতা যখন আমায় আচ্ছন্ন করে. তখনইতো পড়ে জল্লাদের খড়্গ। যখন দান্তের 'দিভাইন কমেদি' পড়ি, তখন নরকের ভয়াবহ বর্ণনা পড়ে বিস্ময়ে মূক হয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু আজ অভিজ্ঞতা আমাকে বলছে, দেখ, দেখ, দান্তের কল্পনাও এর কাছে কত তুচ্ছ।"

নতুন দিগন্ত

এত রক্তপাত, এত বেদনা, এত যন্ত্রণা—তবু এর মধ্য দিয়েই নতুন অভ্যুদয়। ঘটনাপরম্পরায় আমরা সচকিত হলেও একেবারে বিহ্বল হইনি। ভারতবাসী হিসাবে বিশ্বে গণতন্ত্রের মহিমাকে আমরা উজ্জ্বল করেছি বলে, বিনীতভাবে গর্ববোধ করে। সমাজতন্ত্র, সদ্য স্বাধীনদেশের আকাঙ্ক্ষা ও জাতীয় মুক্তির সংগ্রাম—বাঙলাদেশের সংগ্রামকে ভিত্তি করে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লৌহ কঠিন ঐক্যে যেমনটি বিধৃত হয়েছে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর যেন এমনটি আর দেখা যায়নি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির শক্তিহ্রাস যেমন তৃতীয় বিশ্বজুড়ে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামকে শক্তিশালী করেছে, পাক-রণচক্রের

পরাজয় তেমনি ভাবে পাকিস্তানের আভ্যন্তরীণ গণতান্ত্রিক অভিব্যক্তিকে বলদৃপ্ত করবে। বাঙলাদেশের বিজয় ভারত-পাক-বাঙলাদেশ উপমহাদেশে এগিয়ে আনবে নতুন জীবন প্রতিষ্ঠার আয়োজন। দক্ষিণ এশিয়ার শান্তি। ভারতেরও নতুন যাত্রা পথ। ভারত যেমন পাকিস্তানের সঙ্গে ১৭ই ডিসেম্বর এক তরফা-ভাবে যুদ্ধ বিরতি ঘোষণা করে প্রমাণ করেছে তার দৃঢ়প্রতিজ্ঞতার সামর্থ। তেমনি গণপ্রজাতন্ত্রী ভিয়েতনামের সঙ্গে রাষ্ট্রদূত বিনিময়পর্যায়ে সে কূট-নৈতিক সম্পর্কও স্থাপন করেছে। ভারত ঘোষণা করেছে, পশ্চিমী সাম্রাজ্য-বাদী শক্তিগুলির মাতব্বরি সে আর মানবে না। স্বনির্ভরতার যাত্রাপথে বাতিল করে দিয়েছে সে পি. এল. ৪৮০-এর গমের খবরদারি! আমরা জানি, ভারতের মধ্য থেকেও ভারতের বিরুদ্ধে যারা চক্রান্ত করে সেই নয়া ঔপনিবেশিকতার শক্তিগুলি ঘুমিয়ে থাকবে না। এ-দেশে একচেটিয়া পুঁজির তল্পীবাহকেরা চক্রান্ত চালিয়েই যাবে। এখন অবশ্য তাদের ফণা নিচু রয়েছে। এ-দেশকে যেমন তারা শোষণের মৃগয়াভূমি করতে চায়, সমানভাবেই তারা হাত বাড়াতে চাইবে পুনর্গঠনে সাহায্য করার নামে বাঙলাদেশের দিকেও। এ-দেশে সাংস্কৃতিক জীবন যারা জীবনবিরোধী ক্রিয়াকলাপে বন্ধ্যা করে দিতে চায়, সেই মনোপলি প্রেসও তার লোলজিহ্বা নিয়ে সাংস্কৃতিক সহায়তার নামে পা বাড়াবে বাঙলা-দেশে ভারতের প্রতি পূর্ণ ভ্রাতৃত্বপ্রেমী মন ও মননের দিকে। আমাদের এ-যুদ্ধেও জয়ী হতে হবে। ভারত ও বাঙলাদেশের আর্থনীতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক শত্রুদের উৎখাত করতে হবে আমাদেরই যুক্তভাবে।

বাঙলাদেশ এখন স্বাধীন। শেখ মুজিবর রহমান মুক্ত। এবার গঠনের পালা। পুনর্গঠন, পুনর্বাসন, বিকাশ ও গণতন্ত্রীকরণের পালা। বাঙলাদেশে জনশক্তি ও সম্পদ বিধ্বস্ত হয়েছে, পুরো সমাজজীবনই বিশৃঙ্খল হয়ে পড়েছে, সে-সব কিছু মেনে নিয়েও এখন নতুন বাঙলাদেশ গড়ার কাজ। বাঙলাদেশের অফুরন্ত মানবিক ঐশ্বর্য তাকে স্বনির্ভর করবে। ভারত ও সমাজতন্ত্রী বিশ্বের ভ্রাতৃমূলক সহযোগিতা—তাকে সহায়তা দেবে। বিশ্বের মানুষ চায় নতুন গণতান্ত্রিক দিক-নিশানা। বাঙলাদেশের জল-মাটি-হাওয়ায় আছে সেই গণতন্ত্র।

মৃত্যু, নির্যাতন ও বেদনার অগ্নিপরীক্ষায় জন্ম নিল যে বাঙলাদেশ তার জয় হোক। জয় হোক মানুষের—নবজাতকের।

তরুণ সান্যাল

পাক-বাহিনীর হাতে বাঙলাদেশে বুদ্ধিজীবীদের গণ-হত্যার প্রতিবাদে পশ্চিমবঙ্গের লেখকদের বিবৃতি

গত পঁচিশে মার্চ থেকে গোটা বাঙলাদেশই হয়ে পড়েছিল একটি বিস্তৃত বন্দীশিবির। আর এই সামরিক বন্দীশিবিরে বন্দী বাঙালি জাতিকে রাজনীতিক, আর্থনীতিক, সাংস্কৃতিক ও জাতিগতভাবে নিশ্চিহ্ন করার জন্য পাকিস্তানী দখলদার বাহিনী চালিয়েছে চূড়ান্ত আক্রমণ। বাঙালি জাতিকে নিশ্চিহ্ন করে আগামী কয়েকটি প্রজন্ম ধরে একটি দাস জাতি গড়ে তোলার জন্য পরিকল্পিতভাবে তারা বুদ্ধিজীবী ও যুবকদের হত্যা করেছে, নারীদের করেছে ধর্ষণ আর সমাজ ও অর্থনীতির গোড়া ধরে টান দিয়েছে—দগ্ধ, বিপর্যস্ত, ধর্ষিত বাঙলাদেশ যাতে মাথা তুলে না দাঁড়াতে পারে। মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় মিত্রবাহিনীর বাঙলাদেশ-মুক্তিযুদ্ধে যখন এই পাকিস্তানী দখলদার সৈন্যবাহিনী ও তাদের প্রভুদের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী হয়ে দাঁড়াল, বাঙলাদেশের ভাবী লক্ষ্মীশ্রী:কে আগে থেকেই ধ্বংস করার জন্য পরিকল্পনা করল দখলদার দানবেরা। যে-সব বুদ্ধিজীবী, লেখক, যন্ত্রবিদ তাঁদের প্রিয় স্বদেশে জীবন্মৃত হয়ে কোনোক্রমে তখনও বেঁচেছিলেন, সামরিক দস্যুবাহিনী তাদের অনুচর বাহিনীর সঙ্গে একযোগে তাঁদের প্রায় তিনশো জনকে বন্দী করে নৃশংসভাবে হত্যা করেছে। আমরা জানতে পেরেছি, জল্লাদদের তালিকাভুক্ত প্রায় তিন হাজার বুদ্ধিজীবীকে হত্যা করার পূর্বেই বীর মুক্তি ও মিত্রবাহিনীর কাছে সেই ঘৃণ্য ঘাতকবাহিনী আত্মসমর্পন করতে বাধ্য হয়েছে।

পরাজয়ের সম্মুখীন হয়েও প্রতিশোধের জন্য ও বাঙলাদেশের বিকাশকে বিড়ম্বিত করার জন্য পাকিস্তানী শাসককুলের এই জল্লাদবৃত্তি নাৎসীদের মানবতাঘাতী আক্রমণকে ম্লান করে দিয়েছে। অথচ দুনিয়ায় যারা গণতন্ত্র, অতিবিপ্লব প্রভৃতির নামে নিয়মিত শপথগ্রহণ করেন, সেই সব দেশের রাষ্ট্র প্রধানরাতো দূরের কথা, বহুখ্যাত বুদ্ধিজীবীদেরও এই জল্লাদদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধ্বনিত হতে দেখছি না।

একটি জাতিকে সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিহ্ন করার জন্য পরিকল্পনাকারী সভ্যতা ও মনুষ্যত্বঘাতী এই দানববাহিনীর আক্রমণের বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণা ও প্রতিবাদ আমরা জ্ঞাপন করি। হত্যাকারীদের যোগ্য বিচার ও উপযুক্ত শাস্তির জন্য বিশ্ববিবেকের নিকটে আবেদন জানাই। আমরা মনে করি যে-জাতি, রাষ্ট্র বা বুদ্ধিজীবী এই প্রতিবাদে কণ্ঠ মেলাবেন না তাঁরাও এই ঘাতকদের নিন্দা না করার দায়ে জল্লাদদের অপরাধের দায়ভাগী হবেন। আমরা মনে করি, অবিলম্বে বিশ্ববিবেকের আশু কর্তব্য হিসাবে দেশবিদেশের শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিজীবী, আইনজীবী ও বিবেকবান রাজনীতিবিদদের নিয়ে এই গণহত্যার অনুসন্ধান ও বিচারের ব্যবস্থার সূত্রপাত করা একান্ত প্রয়োজন।

বিয়োগপঞ্জী

প্রখ্যাত বিপ্লবী ও সাংবাদিক বিনয় চট্টোপাধ্যায়
বিশ্বখ্যাত বিজ্ঞানী ডক্টর বিক্রম সরাভাই
চলচ্চিত্রের দিক্‌পাল দেবকীকুমার বসু
খ্যাতকীর্তি গবেষক যোগেশচন্দ্র বাগল
তানসেনের বংশধর ওস্তাদ দবির খান
মল্লবীর গোবর গুহ

বিশ্বখ্যাত গ্রীক কবি জর্জ সেফেরিস
'নভি মির'-এর সম্পাদক বিশিষ্ট রুশ কবি আলেকজান্দার ভারদোভস্কি

ঘৃণ্য ঘাতকের হাতে নিহত সংখ্যাতীত
বাঙলাদেশ-এর বুদ্ধিজীবীবৃন্দ

প্রয়াত বিশিষ্টদের প্রতি পরিচয়
শ্রদ্ধা জানাচ্ছে। সম্পাদক